

আষাঢ়—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বিবর্ত্তনবাদ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পৃথিবী চলেছে কোন্ পথে, নাহি জানি,
সম্মুখে পিছে দক্ষিণে, না কি বামে !
জ্যোতিষ জানি না, শুনিনি দৈববাণী,
শুনেছি, তাহার ঘূর্ণিবেগ না থামে।

সেই পৃথিবীরই মানুষের কথা কহি,
বয়স যাহার হাজার দশ বা বিশ ;
জ্ঞানীরা বলেন, নিয়মের বাঁধা রহি'
উন্নতি-পথে চলে সে অহর্নিশ !

পিছনে চাহিলে হয়তো একথা ঠিক,
সম্মুখে আসে পিছু ভাবি আজ যারে,
দু'দিকই সত্য, যে জন যে ভাবে নিক্,
উন্নতি-পথ উল্টা হইতে পারে !

প্রেম, ভালবাসা, সেবা, অহিংসা-বুলি,
মানুষের লাগি' মানুষের ব্যথা যত,
আজিকে সে কথা ঝুলিতে রাখ তো তুলি,
চোখে দেখে' তবু মিছে কেন বিব্রত ?

আদিম মানুষ বেবুন-বংশধর,—
এ কথা সত্য মেনে লও যদি মনে,
সন্তান তার গুহাবাসী বর্ব্বর,—
সে নাকি সভ্য হয়েছে বিবর্ত্তনে !

সাপ বাঘ মো'ষ—যতেক হিংস্র প্রাণী,
দংষ্ট্রা-নখর-শৃঙ্গ-আয়ুধধর,
আপনার মাঝে করি' নানা হানাহানি
আজও তারা বেঁচে রয়েছে পরস্পর !

সভ্য মানুষ একথা শুনিয়া হাসে,
বলে, কি সাধ্য মূর্খ জন্তুদের ?
মোদের লড়ায়ে বাঁচার কথা কি আসে ?
শেষ করে' দিতে পারি মোরা বিশ্বের।

বুঝেছে ধরণী মোদের সে অধিকার,
বিভাবুদ্ধি যন্ত্রতন্ত্র কত !
মোরা যে শ্রেষ্ঠ সৃজন-সভ্যতার
বিবর্ত্তনের শেষ ধাপে উন্নত !

হানাহানি করে' আজও বেঁচে আছে যারা,
মোদের যুদ্ধে সাধ্য কি তা'রা বাঁচে ?
লক্ষ উপায়ে জানি মারিবার ধারা,—
দংষ্ট্রানখরে কতটুকু বিষ আছে ?

সঙীন কামান বন্দুক গোলাগুলি,
বিষের বাষ্প, গ্যাসের গুণগ্রাম,
মারণযন্ত্রে দেখাইব খোলাখুলি—
আণবিক বোমা, দানবিক পরিণাম !

কিসের লজ্জা ? জানি, সে দুর্ব্বলতা,
স্বার্থ ব্যতীত মানিনাক ঈশ্বর !
পাপে ভয় !—সে তো ছেলে-ভুলাবার কথা,
ধর্ম্মে—মিলিত পশু আর বর্ব্বর !

বানর, কুমীর, সাপ, বাঘ—সবে মিলে'
সৃজন মোদের সৃষ্টি-বিবর্ত্তনে,
শ্রেষ্ঠ শক্তি তাই মোরা এ নিখিলে,
পৃথিবীর শেষ মহামাহেন্দ্রক্ষণে !

জয়তু হিংসা জয় বিনাশের জয়,
জয়-জয়ন্ত নব-বোমা-পরিণাম,
ক্ষয়-ক্ষয়ন্ত অক্ষমতার ক্ষয়,
লহ লহ জীব ছিন্নমস্তা-নাম।

মৃত্যুর পারে

রায় বাহাদুর শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বারট্রাণ্ড রাসেল "A free man's worship" নামক সুপরিচিত প্রবন্ধে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,

"বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। ধরা পৃষ্ঠে মানুষের উৎপত্তিরও কারণ আছে। তোমরা বল এক সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, ন্যায়বান ও করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের উৎপত্তি। মানুষ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইলে, তাহাকে কি রূপ দিবেন, তাহা তিনি মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, মানুষের সৃষ্টিও সেই কল্পনার অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ ইচ্ছা ও কল্পনা করিয়া কেহ মানুষ সৃষ্টি করে নাই। যে যে কারণের সমবায়ে মানুষের উৎপত্তি, তাহাতে উদ্দেশ্য অথবা কল্পনা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা তাহারা সকলেই জড় ও অচেতন। মানুষের উৎপত্তি, মানব-সমাজের বৃদ্ধি ও উন্নতি, মানুষের আশা ও ভয়, তাহার ভালবাসা ও বিশ্বাস,—সকলই শুধু পরমাণু-পুঞ্জের আকস্মিক সমবায়ের ফল। উৎসাহ, বীরত্ব, চিন্তা ও ভাবের তীব্রতা—কিছুতেই মৃত্যুর পরপারে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা করিতে পারে না। মানুষের যুগ-যুগান্তরব্যাপী সাধনা, তাহার নিষ্ঠা, তাহার প্রেরণা, মানবীয় প্রতিভার মাধ্যাহ্নিক জ্যোতিঃ সমস্তই, সৌর জগতের বিরাট মৃত্যুর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং মানব-কীর্ত্তির সমগ্র সৌধ বিধ্বস্ত বিশ্বের ধ্বংসাবশেষের নিম্নে অনিবার্য্য সমাধি প্রাপ্ত হইবে। এই মত সর্ব্বসম্মত না হইলেও নৈশ্চিত্যের এতই সান্নিধ্যবর্ত্তী, যে ইহাকে বর্জ্জন করিয়া কোনও দর্শনেরই টিকিয়া থাকা অসম্ভব। কেবল এই সত্যের পরিধির মধ্যেই এবং অনমনীয় নৈরাশ্যের ভিত্তির উপরেই এখন হইতে আত্মার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে।"

রাসেল অপেক্ষাও দৃঢ়তরভাবে অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মানব ও জগতের পরিণাম সম্বন্ধে তাঁহাদের একটুও সন্দেহ নাই। সে পরিণাম অনিবার্য্য বিনাশ।

রাসেলের উক্তি তাঁহার এক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া সার অলিভার লজ বলিয়াছেন "এই নিশ্চয়াত্মক নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তির মধ্যে যে দৃঢ় প্রতীতির সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাকে বিজয়োল্লাসে পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।" বাস্তবিক মানবের এই শোচনীয় পরিণতি ব্যক্ত করিতে লেখকের লেখনি একটুকু ইতস্ততঃ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাই যদি মানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের পরিণাম হয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা শোচনীয় সত্য আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক স্বীয় মতের ফলাফলের জন্য চিন্তিত নহেন। তাঁহার কাজ সত্যের আবিষ্কার—সে সত্য যতই অপ্রীতিকর হউক। মানুষের অস্তিত্ব যদি তাহার পার্থিব জীবনকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে সত্য জানাতেই তাহার মঙ্গল, মিথ্যা আশায় তাহাকে প্রলুব্ধ করা অন্যায়। রাসেল যে একটা নূতন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা নয়। আমাদের দেশে চার্ব্বাক-দর্শনেও দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" ইহা চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগেরই কথা।

কিন্তু রাসেলের এই বিজয়োল্লাসের কি উপযুক্ত কারণ আছে? তিনি

কি বিরুদ্ধবাদীদিগকে বাস্তবিক পরাস্ত করিয়াছেন ? এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চাই যে—রাসেলের মতের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নাই। প্রথমে আমরা দেহের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, মৃত্যুতে চৈতন্যের বিনাশ হইবার যথেষ্ট কারণ নাই। তারপরে দর্শনের (metaphysics) দিক হইতে আমরা বিষয়টির আলোচনা করিয়া সর্বশেষে মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিব।

বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও জগতের অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে, মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হইলেও মানুষের সমগ্র সত্তার বিনাশ হয় না। তাঁহাদের মতে দেহাধিষ্ঠিত আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। আত্মা শব্দ "অত্‌" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "অত্‌ ধাতুর অর্থ গমন করা।" মৃত্যুকালে যাহা জীবদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাই আত্মা। আবার সকল গত্যর্থ ধাতুর অন্য অর্থ জ্ঞান। সুতরাং 'আত্মা' অর্থ "জ্ঞানবান"ও হয়। আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যাহা জ্ঞানের অধিকরণ, তাহাই আত্মা (জ্ঞানাধিকরণত্বং আত্মত্বং)। এই "অধিকরণ" দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহের বিনাশে তাহার বিনাশ হয় না। ইহা চিৎ পদার্থ—চৈতন্যস্বরূপ।

এখন দেখা যাউক দেহের বিনাশে চৈতন্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী কিনা। বৈজ্ঞানিক বলেন, মস্তিষ্ক হইতে চৈতন্যের উদ্ভব, মস্তিষ্ক করণ, চৈতন্য তাহার কার্য্য। পাকস্থলী নষ্ট হইলে, তাহার কার্য্য ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক দ্বারা রক্ত-মেদ-মাংসের উৎপাদন যেমন আর হয় না, তেমনি মস্তিষ্ক নষ্ট হইলে তাহার কার্য্যও আর থাকে না। মস্তিষ্কের কার্য্য জ্ঞান উৎপাদন ও জ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতি বহন করা। মৃত্যুতে মস্তিষ্কের ধ্বংস হইলে, নূতন জ্ঞানও যেমন আর উৎপন্ন হয় না, তেমনি জ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিও থাকে না। যাহাকে আত্মা বলা হয়, তাহার সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতীতি, (perception) জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখবোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারই মস্তিষ্কের কার্য্য। মস্তিষ্কই এ সকলের অধিকরণ। সুতরাং "আত্মা" শব্দ যদি ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্কই এই শব্দ-বাচ্য। মস্তিষ্কের সঙ্গে এ সকলের ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং মৃত্যুর পরে মস্তিষ্কের কার্য্যগুলির থাকিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বাস্তবিক অন্যান্য দৈহিক করণের (organ) সহিত তাহাদের কার্য্যের (function) যে সম্বন্ধ, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞানের যদি সেই সম্বন্ধ হয় এবং মানুষের জ্ঞান, প্রত্যয়, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারগুলি যদি বাস্তবিকই তাহার ইন্দ্রিয়, স্নায়ুযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্য্য হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে তাহাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠা অসম্ভব। কিন্তু সম্বন্ধ যে একই জাতীয়, তাহা বলিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব।

পাকাশয়ের কার্য্য (function) খাদ্য জীর্ণ করিয়া রক্তে পরিণত করা। সেই রক্ত শিরাকর্ত্তৃক হৃদয়ে নীত হয়, সেখান হইতে ফুসফুসে প্রেরিত হইয়া তন্মধ্যস্থ বায়ু হইতে প্রয়োজনানুরূপ অম্লজান গ্রহণ করে এবং অঙ্গার ও জল পরিত্যাগ করে ; পরে হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া শিরা-উপশিরাসহযোগে শরীরের সর্ব্বাংশে পুষ্টি ও তাপ বহন করিয়া লইয়া যায়। শরীরের যে সমস্ত পেশীকর্ত্তৃক এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা মেরুদণ্ড হইতে উদ্ভূত স্নায়ুরাজিকর্ত্তৃক চালিত হয়। স্নায়ুযন্ত্রের সমস্ত কার্য্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না হইলেও, কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং সে ক্ষেত্রেও আমরা পদার্থবিদ্যার (physics) গণ্ডীর মধ্যে থাকি, একটী ভৌতিক কার্য্যের পর অন্য ভৌতিক কার্য্য দেখিতে পাই। সমস্তই আণবিক গতি (molecular movement), ইচ্ছানিরপেক্ষ (reflex)। আমাদের অজ্ঞাতসারে সমস্ত সম্পন্ন হয়। কিন্তু সজ্ঞান ও ইচ্ছাকৃত (conscious voluntary) কার্য্যের ক্ষেত্রে আমরা এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের সম্মুখীন হই, তাহার সহিত আণবিক গতির কোনও সাদৃশ্য আমরা খুঁজিয়া পাই না। উভয়ের মধ্যে কোনও সেতু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সেখানে আমাদের কল্পনাশক্তি স্তম্ভিত হইয়া পড়ে এবং যে তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করি, তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অপরিচিত, আণবিকগতির সাহায্যে তাহাকে বুঝিতে পারা অসম্ভব। আণবিক গতি কিরূপে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছায় রূপান্তরিত হইতে পারে এবং জ্ঞান, অনুভূতি এবং ইচ্ছাই বা কিরূপে আণবিক গতিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্য। বৈজ্ঞানিকপ্রবর অধ্যাপক টিণ্ডাল (Tyndall)ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। চুম্বক-সূচির উপর দিয়া বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত করাইলে সূচি দিক্‌ পরিবর্ত্তন করে। এই প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সহিত মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও তৎপরবর্ত্তী সজ্ঞান মানসিক (conscious) অবস্থার তুলনা করিয়া টিণ্ডাল বলিয়াছেন, "এই দুইটী ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৈদ্যুতিক স্রোত কিরূপে সূচিতে সংক্রমিত হয়, তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলেও, আমরা তাহার কল্পনা করিতে পারি (thinkable) এবং একদিন যে পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু মস্তিষ্কের স্পন্দন কিরূপে মানসিক অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিতে আমরা অসমর্থ। স্বীকার করিলাম, মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং মনের প্রত্যয় (thought) একই সময়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমাদের এমন বুদ্ধি নাই, যাহার সাহায্যে যুক্তিদ্বারা উহাদের একটী হইতে আমরা অন্যটীতে পৌঁছিতে পারি। একসঙ্গে তাহারা আবির্ভূত হয়, কিন্তু কেন হয়, তাহা জানি না। আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি যদি এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, যে আমরা মস্তিষ্কের প্রত্যেক পরমাণু দেখিতে ও অনুভব করিতে পারিতাম, তাহাদের স্পন্দন, সমবায়, বৈদ্যুতিক স্ফুরণ, সমস্তই স্পষ্টভাবে অনুসরণ করিতে পারিতাম, এবং তাহাদের সমকালে জাত মানসিক প্রত্যয় ও অনুভূতির সহিতও যদি পরিচিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলেও 'এই সমস্ত ভৌতিক ব্যাপারের সহিত মানসিক ব্যাপারের কি সম্বন্ধ' এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতাম না। দুই শ্রেণীর ঘটনাবলীর মধ্যে যে 'দুর্লঙ্ঘ্য গহ্বর' তাহা দুর্লঙ্ঘ্যই থাকিয়া যাইবে"। *

* Fragments of Science. Scientific Materialism Quoted in Martineau's Study of Religion. PP-311-12. Vol II.

সুতরাং এ কথা বলিলে অযৌক্তিক হইবে না, যে মস্তিষ্কের মধ্যে আণবিক স্পন্দন, তাহাদের সমবায় ও বৈদ্যুতিক স্ফুরণ, ইহাই মস্তিষ্কের কার্য্য (function), যেমন ভুক্ত অন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা রক্ত, মেদ ও মাংসে পরিণত করা পাকাশয়ের কার্য্য এবং অঙ্গারকে অম্লজান সাহায্যে দগ্ধ করা ফুসফুসের কার্য্য। যে প্রকারের কার্য্য মস্তিষ্কে সম্পন্ন হয়, তাহা এবং চৈতন্যও ইচ্ছার মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য। সুতরাং চৈতন্য, ইচ্ছা ও অন্যান্য মানসিক ব্যাপারকে মস্তিষ্কের কার্য্য বলিবার কোনও যুক্তি নাই। তাহারা যুগপৎ আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে। অধ্যাপক টিণ্ডালের মতে এই দুই জগতের মধ্যে কেবল যে বর্ত্তমানেই কোনও সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না তাহা নয়, ভবিষ্যতেও কখনো তাহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ বুদ্ধিগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। দৈহিক ও মানসিক ঘটনার মধ্যে ব্যবধান যদি এইরূপই দুর্লঙ্ঘ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের একটী হইতে অন্যটী সম্বন্ধে কোনও অনুমান সঙ্গত হইতে পারে না। "দৈহিক ঘটনা ঘটিলেই, তাহার পরে মানসিক ঘটনা ঘটিবে"—একথা বলা যদি সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে দৈহিক কার্য্যের বিরতি ঘটিলেই মানসিক কার্য্যেরও বিরতি ঘটিবে, একথা বলাও সঙ্গত হয় না। দৈহিক ও মানসিক অবস্থার সংযোগ যদি নিয়ত (necessary) না হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিয়োগকে অসম্ভব বলা চলে না। দৈহিক সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোথাও যদি চৈতন্যের সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্যুতে তাহাদের নিবৃত্তিতে চৈতন্যেরও নিবৃত্তি কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এইমাত্র শুধু বলা চলে, যে মৃত্যুর সঙ্গে চৈতন্যের নিদর্শন ও প্রমাণ অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের ভৌতিক কার্য্যাবলির অন্তরালে যে অদৃশ্য জগৎ বর্ত্তমান আছে, তাহার কার্য্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর; তাহার সহিত দেহের কি সম্বন্ধ তাহা আমাদের অজ্ঞাত। সে-জগৎসম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিবার যোগ্যতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নাই।

জড়জগতে শক্তির পরিণাম সত্ত্বেও, সমগ্রশক্তির পরিমাণ-ভেদ নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। প্রকাশের রূপভেদ আছে, গতি তাপে রূপান্তরিত হয়, তাপ গতিতে পরিণত হয়, কিন্তু জগতের সমগ্র শক্তির পরিমাণ ঠিকই থাকে, শক্তির বিনাশ নাই। শক্তির এই অবিনশ্বরতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে Conservation of Energy নামে পরিচিত। মানুষের জীবন ও মৃত্যুতে এই তত্ত্বের প্রয়োগে কি ফল হয়, এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও তৎপরবর্ত্তী ইচ্ছাকৃত (Voluntary) কার্য্যের আলোচনা করা যাউক। মনে করুন, আপনি নির্জ্জনে বসিয়া উপাসনায় রত আছেন। এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আপনার কাছে গিয়া কানে কানে বলিলাম "আপনার বাটীতে আগুন লাগিয়াছে।" শুনিয়াই আপনি লাফাইয়া উঠিলেন, দৌড়িয়া বাড়ী গেলেন এবং শরীরের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া গৃহ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। "আপনার বাটিতে আগুন লাগিয়াছে" এই চৌদ্দ অক্ষর-যুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে আমি যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বায়ুর স্পন্দনরূপে আপনার কর্ণপটহে আঘাত করিয়াছে, এবং শ্রৌত স্নায়ুতে স্পন্দন্ উৎপন্ন করিয়াছে। স্নায়ুদ্বারা সেই শক্তি মস্তিষ্কে চালিত হইয়া তাহাকে স্পন্দিত করিয়াছে এবং মস্তিষ্ক হইতে অন্য স্নায়ুদ্বারা পেশীতে সংক্রামিত হইয়া শরীরকে চালিত করিয়াছে। আমার উচ্চারিত শব্দ কয়েকটী দ্বারা বায়ুতে যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, কর্ণপটহে প্রহৃত শক্তির পরিমাণ তাহার সমান এবং স্নায়ুতে যে শক্তি কর্ণপটহ হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে শক্তির পরিমাণও শেষোক্ত শক্তির সমান। মস্তিষ্কে সঞ্চারিত শক্তির পরিমাণ স্নায়ুপ্রবাহিত শক্তির সমান। কিন্তু মস্তিষ্কের স্পন্দনের সঙ্গে যে শক্তি পেশীতে সংক্রামিত হইল, তাহার পরিমাণ এত বেশী, যে তাহা আপনাকে আসন হইতে টানিয়া তুলিল, এবং তাহার পরবর্ত্তী বিপুল শ্রমসাধ্য কার্য্য আপনার দ্বারা সম্পাদন করাইল। এই নূতন শক্তি কোথা হইতে আসিল? উত্তরে বলা যাইতে পারে মাংসপেশীতে যে শক্তি অব্যক্তরূপে সঞ্চিত ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া কার্য্যকরী হইয়াছে, যেমন বন্দুকের ঘোড়া টিপিলে বারুদের অব্যক্তশক্তি (potential Energy) কার্য্যকরী (Kinetic) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই হিসাবে কি কোনও ভুল নাই? মস্তিষ্ক ও চৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী অধ্যাপক-টিণ্ডাল-কথিত "অলঙ্ঘ্য গহ্বরের" অপর পারের ঘটিত ঘটনার সহিত পেশীতে সঞ্চারিত শক্তির পরিমাণের কি কোনও সম্বন্ধ নাই? আমি যে বাক্যটী আপনার কানে কানে বলিয়াছি, তাহার অর্থের সহিত সে শক্তির পরিমাণের কি কোনও সম্বন্ধ নাই? "আপনার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে" এবং "আপনার বাড়ী নিরাপদে আছে" এই দুইটী বাক্যের মধ্যে প্রভেদ কি শুধু বাক্য দুইটী উচ্চারণ করিতে বায়ুতে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রভেদ? তাহা যদি না হয়, যদি দুই বাক্যের মধ্যে অর্থের যে বিভেদ আছে, তাহার সঙ্গে আপনার দৈহিক কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আপনার মননই (thought) এই বিভেদের কারণ বলিতে হইবে। এই দুই ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে যে আণবিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা বিভিন্ন। কিন্তু এই বিভিন্নতা শ্রৌত স্নায়ুর কার্য্যের ভিন্নতা-হেতুক নয়; বাক্যদ্বয়ের অর্থের ভিন্নতা-হেতুক। অধ্যাপক টিণ্ডালের "দুর্লঙ্ঘ্য গহ্বর" এখানে লঙ্ঘিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন "পূর্ব্বাপরব্যক্ত কারণ ও কার্য্যের শৃঙ্খলের (Chain of antecedence and sequence) মধ্যে কোথাও কি মানসিক ক্রিয়া প্রবেশ করিয়া দৈহিক চেষ্টা ও তৎপরবর্ত্তী মানসিক অবস্থা উৎপাদন করে, অথবা মানসিক অবস্থা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অবান্তর ফল মাত্র এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সহিত তাহার মুখ্য সম্বন্ধ নাই, ইহাই বিচার্য্য। মস্তিষ্কের অণুসকলের মধ্যে কিরূপে মানসিক অবস্থার স্থান হইতে পারে, এবং তাহা এক অণু হইতে অন্য অণুতে কিরূপে গতি সংক্রামিত করিতে পারে, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। এরূপ ঘটনার মানসিক চিত্রাঙ্কনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং মস্তিষ্কের কার্য্য মানসিক ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, এই সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয়। কিন্তু যাহারা মস্তিষ্ককে স্বতশ্চল যন্ত্র (antomaton) মনে করেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে মানসিক অবস্থা মস্তিষ্কের বিভিন্ন আণবিক সংস্থানের ফল।

কিন্তু মানসিক ক্রিয়া কর্ত্তৃক মস্তিষ্কের আণবিক ক্রিয়ার উৎপত্তির ধারণা যেমন আমি করিতে পারি না, তেমনি মস্তিষ্কের আণবিক ক্রিয়া কর্ত্তৃক কিরূপে মানসিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহার ধারণা করিতেও আমি অসমর্থ। যাহা কল্পনাতীত, তাহা যদি অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে উভয় মতই আমার বর্জন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি দুই মতের কোনটিই বর্জন করিতেছি না। জড়বাদের পূর্ব্ববর্ণিত তথ্য সকল নির্ভয়ে গ্রহণ করিয়াও আমি সেই রাজগুহ্য মনকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছি, যাহার স্বকীয় অন্তর্ভেদী ক্ষমতাও আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হয় নাই।"

আচার্য্য টিণ্ডাল যে স্বতশ্চলতাবাদীদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মতে জীবদেহ স্বতশ্চল যন্ত্র বিশেষ। মস্তিষ্ক এই যন্ত্রের কেন্দ্র এবং তাহার ক্রিয়ার দ্বারাই যন্ত্র চালিত হয়। দেহের যাবতীয় চেষ্টা দৈহিক কারণেরই ফল, তাহারা কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। যাবতীয় মানসিক অবস্থা কিন্তু দৈহিক ক্রিয়ারই ফল। তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতীত কোনও মানসিক অবস্থাই উৎপন্ন হয় না। আমাদের ইচ্ছায় শরীরে যে চেষ্টার উদ্ভব হয়, ইচ্ছা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল বলিয়া সে শারীরিক চেষ্টাও মস্তিষ্কেরই ক্রিয়ার ফল। এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত্যুতে মস্তিষ্কের নাশে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার অবসান হইতে বাধ্য। এই মতের একটু আলোচনা আবশ্যক।

মানসিক ক্রিয়া যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অবান্তর ফল (by-products) হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, এই অবান্তর ফল উৎপাদনে মস্তিষ্কের শক্তি ব্যয়িত হয় কি না। যদি এরূপ হয় যে মানসিক ক্রিয়াকে গণনার মধ্যে না ধরিয়াও দৈহিক শক্তি ঠিক থাকে, তাহার কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মানসিক অবস্থার উৎপাদনে দৈহিক শক্তির কোনও অংশ ব্যয়িত হয় না, Conservation of Energyর নিয়ম মনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে এবং মন জড় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। আবার যদি দেখা যায়, দৈহিক শক্তির কিয়দংশ চৈতন্য ও মননের (Consciousness & thought) উৎপাদন ব্যাহত হয়; তাহা হইলে, Conservation of Energyর নিয়মানুসারে দৈহিক শক্তির এই অংশ অন্য ফল উৎপন্ন করিয়া জড়জগতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ। এ ক্ষেত্রে মনও জড়-নিরপেক্ষ নহে, জড় ও মন-নিরপেক্ষ নহে। উভয়ে উভয়ের উপরে ক্রিয়া করিতে সক্ষম। সুতরাং দেহের স্বতচলত্ব থাকে না।

উপরিউক্ত তর্কের ফল যাহাই হউক, আচার্য্য টিণ্ডাল মস্তিষ্ক ও চৈতন্যের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়, তাহা বুদ্ধিগম্য নহে বলিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং মনের ক্রিয়ার পরস্পর সংযোগ যদি এমনি অচিন্তনীয় ব্যাপার হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিয়োগকে অসম্ভব বলিবার কোনও কারণ নাই। অন্ততঃ দেহের সঙ্গে মানসিক জীবনকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিবার সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মৃত্যুতে দৈহিক শক্তির কি পরিণাম হয় তাহা দেখা যাউক। শক্তির রূপান্তর হয় মাত্র। অম্লজান, জলজান, অঙ্গার ও যবক্ষারজান পরস্পর মিলিত হইয়া যে শরীর গঠন করিয়াছিল, মৃত্যুতে তাহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া প্রকৃতির সাধারণ ভাণ্ডারে ফিরিয়া যায়। এই প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শক্তির (Energy) একটুকুও নষ্ট হয় না; কিয়দংশ অব্যক্তাবস্থা (potential state) প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্টাংশ নূতন রাসায়নিক পদার্থের গঠনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই শক্তির মধ্যে মনন (thinking), আবেগ (feeling) ও ইচ্ছা (willing) সংক্রান্ত কোনও শক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সমস্ত মানসিক ক্রিয়া যদি "শক্তি" সংজ্ঞার অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে তাহারা যখন উপরিউক্ত শক্তির মধ্যে নাই, তখন তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহারা যদি শক্তিই না হয়, তাহা হইলে তাহারা ভৌতিক জগতের বাহিরে অবস্থিত, Law of conservation of Energy তাহাদের উপর প্রযোজ্য নহে, এবং প্রাকৃতিক জগতের ভাগ্যের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই, বলিতে হইবে। চৈতন্যকে দেহের অনাবশ্যক সরঞ্জাম বলিব, অথচ দেহের সঙ্গে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিব—ইহা স্ববিরোধী উক্তি মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হয় বলিয়া দেহের সঙ্গে দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যেরও বিনাশ হইতেই হইবে, এমন কোনও যুক্তি নাই। মৃত্যুতে চৈতন্যের ব্যবহারিক নিদর্শনের লোপ হয় সত্য, কিন্তু অন্য নিদর্শনের সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি মৃত্যু হইতে পাওয়া যায় না।

এখন আপত্তি হইতে পারে উপরিউক্ত যুক্তি অনুসারে ইতর জীবেরও দেহান্তরিত সত্তা থাকা সম্ভব। ইতর জীবের অনুভূতি, প্রত্যয় ও সহজাত বুদ্ধি এবং তাহাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার মধ্যেও আচার্য্য টীণ্ডালের "দুর্লঙ্ঘ্য গহ্বর" বর্ত্তমান, এবং তাহাদের দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চৈতন্যেরও যে বিনাশ হইতেই হইবে, ইহা বলা সম্ভব নহে। ইতর জীবেরও যে আত্মা আছে এবং দেহের সঙ্গে তাহার বিনাশ হয় না, এ মত আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে, অন্যত্রও প্রচলিত ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে বর্ত্তমানে অনেকের ইহাতে আস্থা নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে অযৌক্তিক কিছু নাই এবং যুক্তি দ্বারা ইহার খণ্ডনও সুসাধ্য নহে। এই মতে জীবাত্মার যে কেবল মৃত্যু নাই, তাহা নহে—তাহার জন্মও নাই, তাহা অজ, নিত্য, শাশ্বত, স্বীয় কর্ম্মের পুরস্কার ও শাস্তিরূপে নানা যোনি প্রাপ্ত হয়; আজ যে কীট যোনিতে আছে, কাল সে মানুষযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে, যে মানুষ আছে দুষ্কৃতির ফলে সে পশুযোনিতে জন্মিতে পারে। এই মতের খণ্ডন সুসাধ্য না হইলেও, প্রমাণদ্বারা বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা সুসাধ্য নহে। ইতর জীবের অহংকারিক একত্ব (personal identity) আছে কি না, সন্দেহের বিষয়। মানুষে এই একত্ব পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। কৈশোর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলিয়াই জানি। পঞ্চম বৎসর যখন আমার বয়ঃক্রম ছিল, তখনকার "আমি" আর আজকার বৃদ্ধ বয়সের আমি যে একই ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই, যদিও আমার তখনকার দেহ ও বর্ত্তমান দেহের

মধ্যে প্রচুর প্রভেদ, তখন যে যে পরমাণুতে আমার দেহ গঠিত ছিল, তাহার একটীও বর্ত্তমানে আমার দেহে নাই। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে, এই কথা যখন বলা হয়, তখন জীবাত্মা দৈহিক জীবনের স্মৃতি, জ্ঞান ও অনুভূতিসহ বর্ত্তমান থাকে, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, পার্থিব জীবনের সঙ্গে তাহার একত্ব বোধ থাকে, ইহাই বলা আমাদের অভিপ্রেত। মৃত্যুতে দৈহিক একত্ব বিনষ্ট হয়, দেহের পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাদের সমবায়ে ও পরস্পরের সহযোগিতায় দেহে যে ভৌতিক একত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভৌতিক একত্বের বিনাশ হইলেও, মানসিক একত্ব, আত্মিক একত্ব, অহংকারিক একত্বের বিনাশ হয় না; পার্থিবজীবনের জ্ঞান ও স্মৃতি-সংবলিত "আমিত্বে" বিদেহ অবস্থায় নূতন অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হইয়া সেই 'আমিত্বের' ধারাবাহিকতা চলিতে থাকিবে—ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইতর জীবের এই অহংকারিক একত্ব আছে কিনা, পূর্ব্বদিনের স্মৃতি পরদিন তাহাদের থাকে কিনা, তাহাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও অনুভূতি নিজের জ্ঞান, কর্ম্ম ও অনুভূতি বলিয়া তাহারা মনে করে কিনা, তাহা স্পষ্টভাবে আমাদের বুঝিবার উপায় নাই। পার্থিব জীবনেই যদি এই একত্ব না থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে কোন্ একত্ব থাকিবে? এই যুক্তিতে অনেক পরলোক-বিশ্বাসী পাশ্চাত্য পণ্ডিত মৃত্যুর পরে ইতর জীবের স্থায়িত্বে বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে স্থানান্তরে আমরা আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে মানবাত্মার পরিণামই আমাদের আলোচ্য।

জীবদেহগঠনে অসাধারণ কৌশল লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু এই কৌশল হইতে কৌশলী কোনও পুরুষের অনুমান এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা কল্পনা করা বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নিষিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় উদ্দেশ্যের (purpose) স্থান নাই। "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" (natural selection) সমস্ত কৌশলের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ বলিয়া গণ্য। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কার্য্য-সম্পাদনের জন্য বিশেষ বিশেষ দৈহিক করণের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কল্পনা না করিয়াও, মানবদেহের করণগুলি (organs) ও তাহাদের কার্য্যের (function) মধ্যে একটা আনুপাতিক সমতা আশা করা যেমন অন্যায় নহে, সেইরূপ মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি (faculty) এবং তাহার জীবনের গণ্ডীর মধ্যেও একটা সাম্য আশা করা স্বাভাবিক। প্রাণীবিশেষের সহজাত সংস্কার (instinct), তাহার ইন্দ্রিয়প্রত্যয় (perception) ও তাহার রাগ-দ্বেষের পরিচয় পাইলেই আমরা তাহার জীবনের গণ্ডী ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারি। তেমনি বিপরীত ক্রমে কোনও জন্তুর করণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে আমরা তাহার প্রবৃত্তি ও সে কোন্ কার্য্যে পটু, তাহা অনুমান করিতে পারি। প্রাণীদেহের রক্ষণ ও পোষণই তাহার সহজাত সংস্কারের ধর্ম্ম। দেহের স্বাভাবিক শক্তি-দ্বারা তাহার রক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, ক্ষুধা ও তাহার সহকারী লুণ্ঠনপটুতাদ্বারা তাহার পুষ্টি সাধিত হয়, ভয় ও সাহসদ্বারা আত্মরক্ষা হয়, এবং গর্ত্তখনন ও বাসানির্ম্মাণের পটুতাদ্বারা তাহার আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়; অন্তবিধ প্রবৃত্তিদ্বারা বংশরক্ষা ও জাতি-রক্ষা হয়। কীটদিগের বুদ্ধির প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমরা যে আশ্চর্য্যান্বিত হই, তাহাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের প্রয়োজনসাধনে সেই বুদ্ধির উপ-যোগিতাই তাহার কারণ। এই উপযোগিতাদ্বারাই আমরা জীবদিগের সহজাত বুদ্ধির বিচার করি। দেহের জন্য যাহা প্রয়োজন, দৈহিক করণ ও সহজাত সংস্কারদ্বারা যখন তাহা পূর্ণরূপে সাধিত হয়, তখন তাহাদিগকে আমরা নির্দ্দোষ বলি; প্রয়োজন সাধিত হইলেই তাহাদিগের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। ইহার অধিক দাবী তাহাদিগের নিকট করা যায় না। বস্তুতঃ জীবদেহ একটা যন্ত্রবিশেষ। ইহার রক্ষা, সুব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণের জন্য নানা সজ্ঞান ও অজ্ঞান শক্তি ইহার মধ্যে নিহিত আছে, কিন্তু এমন কোনও প্রবৃত্তি অথবা কার্য্যপটুতা নাই, যাহা এই উদ্দেশ্যের পরিপোষক নয়। সুতরাং যখন ইতর জীবের দেহ নষ্ট হয়, তখন তাহাদের এই সকল প্রবৃত্তি ও সহজাত বুদ্ধির অস্তিত্বের কারণও অন্তর্হিত হয়। অতএব ইতর জীবের দৈহিক ও মানসিক জীবনের স্থিতিকাল সমান হইলেও, তাহাতে কোনও অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। আমাদের দৃষ্টি যতক্ষণ আমাদের দৈহিক জীবন অতিক্রম করিয়া না যায়, ততক্ষণ আমাদের সংস্কার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। দেহের ধ্বংসের পরে দৈহিক প্রয়োজন সাধক প্রবৃত্তিগুলির থাকিবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমাদের এমন কতকগুলি প্রবৃত্তিও আছে, যাহারা মুখ্যতঃ দেহের প্রয়োজন সাধক না হইলেও গৌণতঃ বটে। অর্থসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, সুখস্পৃহা, ক্ষমতার লালসা প্রভৃতি এই শ্রেণীর। কিন্তু এই সকল প্রবৃত্তিও রূপান্তরিত হইয়া এমন অনবদ্যরূপ প্রাপ্ত হয়, যে তাহাদিগকে মানবের পার্থিব জীবনাপেক্ষা উন্নততর জীবনের উপযোগী বলিয়াই মনে হয়। ইতর জীবের ক্ষুধা, যাহা প্রত্যেকবার ভোজনের সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, তাহাই যখন মানবে শিল্প, উদ্ভাবন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আনুসঙ্গিক অধিকারের উৎস-রূপে, চুক্তি ও বিনিময়ের ভিত্তিরূপে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা-রূপে দেখা দেয়, তখন বিস্মিত হইয়া আমরা ভাবি, ইতর জীব ও মানবের নিয়তি কি অভিন্ন? যখন দেখি, যে সমস্ত প্রবৃত্তি দেহের সেবকরূপে ইতর জীবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারাই দেহের নির্ব্বন্ধাতিশয্যের উপর জয়লাভ করিয়া দেহের উপর প্রজ্ঞার শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তখন আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়ি। আবার যখন মানুষের ব্যাবর্ত্তক গুণগুলির (distinguishing attributes) চিন্তা করি, তখন তাহাদিগকে দৈহিক জীবনের সাধনরূপে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিস্ময়-বৃত্তির দ্বারা পরিপাক-কার্য্যের সহায়তাও হয় না, শরীরের তাপও নিয়ন্ত্রিত হয় না, কোনও শত্রুও দমিত হয় না। বরং ইহা হইতে যে শ্রমের উৎপত্তি হয়, যে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, তাহাতে দৈহিক স্বাস্থ্য অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু বিস্ময় জীবনের পরিধি প্রশস্ততর করিয়া তাহাকে উচ্চতরস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে, অজানাকে জানিবার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে এবং দেশকালে সীমাহীন পরিপূর্ণতার দিকে জীবনকে আকৃষ্ট করে। সৌন্দর্য্যবোধ আর এক বৃত্তি। ইতর জীবনে ইহার সামান্য কিছু স্থান থাকিতে পারে, পুরুষকে আকৃষ্ট করিবার জন্য। কিন্তু মানুষ ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র হইতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে,

মানবের চিন্তাকে সাহিত্যে রূপান্তরিত ও মানব-চরিত্রকে নাটকীয় বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। দয়া, সমবেদনা ও ভালবাসার স্থান যে ইতর জীবনে নাই তাহা নহে, কিন্তু জীবস্থিতির প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া মানবে ইহারা অনপেক্ষ মঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। যে করুণ গম্ভীরতা ও উদগ্র মহিমা মানবীয় প্রেমে লক্ষিত হয়, তাহাদ্বারা পার্থিব কোনও প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। এই সকল বিশিষ্ট গুণের বিচার করিবার সময় যদি তাহাদের উৎপত্তির ইতিহাস বর্জন করিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভাবি—কোথা হইতে তাহারা আসিল, না ভাবিয়া, কোথায় তাহাদের গতি যদি চিন্তা করি, তাহা হইলে বলিতেই হইবে "এই সমস্ত গুণের বিকাশের জন্যই আমাদের সৃষ্টি, এবং ইহাদের পরিপুষ্টির জন্যই আমাদের দৈহিক শক্তি নিয়োগ করিয়া, ইহাদের সাহায্যে দৈহিক জীবন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে বৃহত্তর জীবনে পৌঁছিতে হইবে।"

উপরে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে ইতর জীব অপেক্ষা উন্নততর প্রকৃতির অধিকারী বলিয়া মানুষের জন্য মহত্তর নিয়তি দাবী করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হইতে পারে আমরা মানুষ ও ইতর জীবের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান কল্পনা করিতেছি এবং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করিতেছি। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের আবির্ভাবের পর.হইতে সমগ্র জীবজগৎকে একই বংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। মানব ও ইতর জীব এক বংশসম্ভূত হইলেও পাশবিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিভেদ বড় কম নয়। অভিব্যক্তিবাদী দার্শনিকেরাও এই বিভেদের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক অধ্যাপক ফিস্‌কের (Fiske) Destiny of Man গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ফিস্‌কে বলেন "প্রারম্ভে মানসিক জীবন (psychical life) দৈহিক জীবনের একটা সরঞ্জাম মাত্র ছিল। শত্রুর হাত হইতে অব্যাহতি, খাদ্য-সংগ্রহ, বংশরক্ষা, ইহা লইয়াই ইতর জীবের জীবন, এবং অঙ্কুরাবস্থায় স্মৃতিশক্তি, প্রজ্ঞা, রাগ, দ্বেষ ও ইচ্ছাশক্তি এই সকল প্রয়োজন সাধনের জন্যই ব্যবহৃত হইত, অন্য কাজ ইহাদের ছিল না। আজি পর্য্যন্তও অধিকাংশ মানুষের জীবনে অন্য উদ্দেশ্য নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাহাদের মানস জীবন এতদূর বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছে যে এই সকল উদ্দেশ্য, সাধনের বৈচিত্র্য, জটিলতা ও গৌণতার মধ্যে সে বিস্তৃতি সহসা আমাদের গোচর হয় না। কিন্তু সভ্য মানবসমাজে দৈহিকসম্বন্ধবিহীন অন্যবিধ উদ্দেশ্যও আমাদের জীবন প্রভাবিত করিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল উদ্দেশ্যকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। "মানুষের জীবন কেবল অন্নেই প্রতিষ্ঠিত নয়"—বহুদিন পূর্ব্বে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। বহু যুগ ধরিয়া আমরা দেখিয়াছি, সহস্র সহস্র লোক মহত্তম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় দেহকে আধ্যাত্মিক জীবনের বিঘ্ন মনে করিয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিয়াছে, অসংখ্য শহিদ তুচ্ছ আবর্জনার মত পার্থিব জীবন বিসর্জন দিয়াছে। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি নিষ্ঠা তাহাদের কার্য্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে। যেমন ধর্ম্মজগতে, তেমনি বিজ্ঞানজগতে, তেমনি সুকুমার কলার রাজ্যে, প্রকৃতির রহস্য জ্ঞাত হইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং রূপে, রসে ও সুরে সুন্দরকে রূপায়িত করিবার ইচ্ছার বশীভূত হইয়া অসংখ্য লোক দেহকে তুচ্ছ করিয়াছে। মহত্তম মানুষের মনোরাজ্যে এই সকল উদ্দেশ্য সর্ব্বোপরি স্থান লাভ করিয়াছে, এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততর স্থান লাভ করিবে। যদি কখনও এমন দিন আসে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকিবে না, মানুষ মানুষকে পীড়ন করিবে না, যখন পীড়ার প্রকোপ দমিত হইবে, এবং প্রত্যেক মানুষ অনত্যধিক পরিশ্রমে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা হইলে সমাজের সেই উন্নত অবস্থাতেও সভ্যতার কার্য্য শেষ হইবে না। অসংখ্য উপায়ে অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে মানুষের সুখ বিধান করিবার জন্য, এবং মানবজীবন যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্য ও সম্পদে পূর্ণ করিবার জন্য তখনও অসীম কার্য্যক্ষেত্র বর্ত্তমান থাকিবে। ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট মানুষের এমন সময় আসিবে—আমি বিশ্বাস করি।—অভিব্যক্তির গতি অতিশয় মন্থর এবং ইহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসংখ্য জীবনবলির প্রয়োজন। কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া এই পরিণামের দিকেই ইহার গতি চলিয়াছে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, প্রারম্ভে মানস জীবন দেহের ভৃত্য থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিণতিপ্রাপ্ত মানবে দেহ আত্মার বাহনমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। জীবনের প্রত্যুষ কাল হইতে দেখিতে পাই, সর্ব্বত্রই এক মহৎ পরিণামের দিকে গতি। সে পরিণাম মানবের সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক গুণের অভিব্যক্তি। এই যুগ-যুগান্তরব্যাপী প্রচেষ্টার পশ্চাতে কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? ইহা কি একান্তই ক্ষণস্থায়ী? বুদ্‌বুদের মত উঠিয়াই ফাটিয়া যাইবে? অলীক দৃশ্য—শূন্যে মিলাইয়া যাইবে? ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিশ্বের প্রহেলিকা অর্থহীন প্রহেলিকা হইয়া পড়ে। যে অভিব্যক্তির ধারায় জগৎ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা যতই আমাদের নিকট স্পষ্টতর হয়, ততই আমরা বুঝিতে পারি, যে মানবাত্মার অবিনশ্বরতা স্বীকার না করিলে, অভিব্যক্তি-ধারা অর্থহীন হইয়া পড়ে। স্বীকার না করিবার কারণ কেহ দেখাইয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমি নিজে মানবাত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করি,—যে অর্থে প্রমাণযোগ্য বৈজ্ঞানিক সত্যে বিশ্বাস করি, সে অর্থে নয়; ঈশ্বরের কার্য্য যুক্তিহীন হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে বিশ্বাস করি।" *

---

* এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুখ্যত: Principal Martineauর "Study of Religion" হইতে গৃহীত। কোন কোন স্থলে Martineauর ভাষাই অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যোগ-বিয়োগ

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

জীবনের একটা দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করে নূতন পরিচ্ছেদে পা দিয়েছি। এবার চাকরী জীবন সুরু করবো—লেখা-পড়ায় যবনিকা এখানেই পড়লো।

এই বয়সটা চঞ্চল হবার। নানান চিন্তা এসে ভিড় করে মাথার মধ্যে, রক্ত হয় উত্তপ্ত। কিন্তু আমার জীবনে এভাবে উগ্র হবার অবকাশ খুব কম। চাকরী একটা সংগ্রহ করতে না পারলে সারা জীবনেই ব্যর্থ হয়ে যাবো, নির্ভরশীল কয়েকজন লোক আমার মুখ চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। কাজেই চাকরী চাই।

দৈনন্দিন জীবনে আর পাঁচজনের মতোই বেঁচে থাকবো। দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অফিসে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর উভয়ের সঙ্গে গল্প করবো, নিতান্ত রোমান্টিক না লাগলেও নেহাৎ মন্দ হবে না। আর বিশেষ করে আরতির মতো মেয়েই যদি বউ হয়।

হবে নাই বা কেন? ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার কথা বাদ দিয়ে দেখা যায়—আরতির লোভ আছে আমাকে জয় করবার···বশ করবার মন্ত্রও তাই সে শিখেছে। ওর মাও আমাকে চায়। আর আমি?

জড়-জীবের মতোই চেতনাহীন চাকরীহীন বঞ্চিত আমি আরতিকে ভালবাসি, শুধু মৌখিক অনুকথায় সে প্রেম জানানো পর্য্যন্তই। কিন্তু ভালো টাকার একটা চাকুরী সংগ্রহ করতে পারলে আরতির বাবার কাছে নিজেকে দাঁড় করাতে পারি, ইঙ্গিতে তখন বলতে পারি আরতির অনুপযুক্ত আমি নয়।

কিন্তু মানুষের মনের রাজ্যে বিধাতার অভিশাপ চিরদিন। সেখানে সে যা করে, তা ভেঙেচুরে ঈশ্বর চমক লাগিয়ে দেন সকলকে। নইলে এখুনি আরতি এসে আমাকে ধরে নিয়ে যেত না লেকের নির্জ্জন একখানা বেঞ্চে।

মনে হল ভালই হল, কিন্তু এর পিছনকার প্রহসনে বড় ব্যথিত হলাম।

আরতি আমার হাতটা চেপে বল্লে—বাবা চিঠি দিয়েছেন···

কথা তারপর আটকে গেল, আরতির অশ্রু-ম্লান চোখ দুটিতে জেগে উঠলো শঙ্কা-ব্যাকুল নির্ব্বাক আবেদন।

দুর্য্যোগের পূর্ব্বে মেঘের আভাস পেলাম।

আরতি কোনো রকমে বলতে চেষ্টা করলে—তিনি লিখেছেন এই অগ্রহায়ণ মাসেই আমার বিয়ে দেবেন—

সাদা গলায় নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই বললাম—ভালই ত'—এতে অত ভনিতা করবার কি আছে, এত উতলা হবারই বা কি আছে? বিয়ে ত' মানুষেই করে।

ক্ষীণ আশার জোনাকি একটি মনের অলিতে গলিতে ঘুরে গেল, সে আলো এত অস্পষ্ট যে মনের সবখানি তাতে দেখা গেল না, তবু কিন্তু আনন্দ আবছায়া হয়ে উঠলো।

আরতি আরো করুণ হয়ে উঠলো—তুমি চিরকাল ছেলেমানুষ হয়েই থাকলে, গম্ভীর হতে শিখলে কই?

একটু সময় নীরবে কেটে যায়, অখণ্ড অপরিমিত সময়ের টিক্ টিক্ করা ঘড়িতে পরিমিত-একটুকু অংশ। তারপরই আরতি অবশ্য আসল কথাটার আভাস দিলে।

আমি বললাম—ভালোই ত আরতি। জীবনে তোমার ছন্দ আসুক—আমি চাই। ছন্নছাড়া আমি, আমাকে আর পথের আলো দেখিয়ো না।

আরতি কাতরভাবে বললে—মার এতে মত নেই, তিনি ও পাত্রটির ঘোর বিপক্ষে।

একথায় মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। কাঁচের খেলনা চুরমার করে শিরিষের আঁটা ঘসে পুনঃ সংহত করার মতোই প্রহসন মনে হয়। আরতি আমার সর্ব্বনাশ না করুক, মনের আনন্দ বিচুর্ণ করেছে নিষ্ঠুর আঘাতে। আরতি মহীয়সী নয়।

জীবনের এই অধ্যায়েই আর এক স্থানে ব্যাহত হয়েছি। চিন্তার স্রোতে বাধা পড়েছে, কিন্তু জীবনের অগ্রগমনে ছেদ আসেনি। দেশে গেছি। পাশের বাড়ীর এক সম্পর্কীয়া কাকিমার প্ররোচনায় পাত্রী দেখতে যেতেই হল, খুড়তুতো ভাই সুরেন আর আমি গেলাম। মেয়েটিকে কাকিমা দেখেন নি—শুনেছেন গুণবতী। কাজেই আমার

স্কন্ধে সে মেয়েটিকে গ্রথিত করতে তাঁরা প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন। আমার চিন্তা-জর্জ্জর মনের কোনো ঢেউ তাঁরা জানেন না। বয়স্ক ছেলে আমি, বিয়ে না করে উড়ু উড়ু হচ্ছি—এই কথাই তাঁদের মাথায় ঢুকেছে।

সুরেন এবং আমি দেখতে গেলাম মেয়েটিকে। সামান্ত খোড়ো চালের একখানি কুটীর। আগাছার ভীড়ে ঘরের আশে পাশে সাপখোপের বাসা থাকা অসম্ভব নয়। ঘরখানি দারিদ্র্যের মূর্ত্তিমান প্রতীক্। গৃহস্বামী একজন বুড়ো থুরথুরে। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে আপ্যায়ন জানালেন কত। তারপর মেয়ে দেখানোর পালা। বাহ্যিক অনাড়ম্বর দেখে সুরেনের তিক্ততা বাড়লো; সে বললে—চলো মেয়ে দেখে কাজ নেই।

আমি চুপ করে বসলাম। সাধারণ ভদ্রতাবশতঃ নড়তে পারলাম না।

বুড়ো লোকটি নিষ্প্রভ নয়ন দুটি তুলে কাতর দৃষ্টিতে তাকালেন আমার প্রতি। আমি বেদনা অনুভব করলাম। ধীরে ধীরে জীবনের শেষের অঙ্কে এসে উপনীত হয়েছেন, মৃত্যুর ইসারায় চকিত হচ্ছেন বার বার, কিন্তু ইহলৌকিক মায়া ত্যাগ করতে পারছেন না। তাঁর বাস্তু-ভিটা, তাঁর মেয়েটিকে নিঃসহায় করতে মন চাইছে না বলেই না-থাকার মতো করে কোনো রকমে টিকে আছেন নড়বড়ে দেহটাকে নিয়ে।

তিনি মেয়েটিকে নেপথ্য হতে চোখের সামনে এনে ধরলেন। দীপ্ত স্বাস্থ্য—সন্দেহ নেই, কিন্তু নিতান্ত গ্রাম্য। সাধারণ আটপৌরে একখানা শাড়ী পরণে, চুলগুলি অগোছালো, মৃদুল বাতাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। আর গায়ের রঙ অস্বাভাবিক কালো, কালো পাথরে কোঁদাই করা প্রাগৈতিহাসিক কোনো মূর্ত্তির মতোই চেহারা।

মেয়ে দেখলাম···দেখলাম যেমন মন্থর পদভরে মেয়েটী এসেছিল এখানে, তেমনি ধীরেই দরজার আড়ালে সরে গেল। নাম নির্ভয়ে এবং সহজেই বলে গেল—'সুন্দরী'।

বুড়ো লোকটি আমার হাত ধরে কেঁদে উঠলেন—আকুলি বিকুলি সে কি কান্না, পাষাণ গলে যায় সে বেদনায়। বয়সের ভারে অবনমিত অসহায় বৃদ্ধ একজন পূর্ণবয়স্ক একটি যুবকের হাত ধরে সাহায্য ভিক্ষা চাইছেন! আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম। কথা দিলাম তাঁর মেয়েটির কোনো বিহিত করবো।

কলকাতায় ফিরেই আরতির সঙ্গে দেখা। ছন্দহীন ছন্নছাড়া জীবনে একটানা শান্তি না থাকুক, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছিলাম টুক টুক করে। তাই এ সময়ে আরতির আবির্ভাব আকাঙ্ক্ষা করিনি। কিন্তু আরতি চপল কণ্ঠে বলল—মার জয় হয়েছে সমীরদা, আমাদের অতীত জীবনে আবার ফিরে যাই চলো।

জীবন সুখ-দুঃখের টানা-পোড়েনে বোনা। যখন হাসির ঝিলিক আসে, দুঃখ ডুবে থাকে; আবার যখন দুঃখের বান ডাকে, সুখের সৌখীন তীরভূমি প্লাবিত করে দিয়ে যায়। সুন্দরীর কালো রঙে জৌলুষ না থাক, তার মধ্যেকার আত্মসচেতন প্রেরণায় একটা নিজস্বতা আছে, যা আরতির মধ্যে নেই। আবার আরতির মধ্যে অনেক ত্যাগ করবার ক্ষমতা, একান্ত নির্ভরশীলতা আছে—যা কালো মেয়েটীর দীপ্ত দুটি চোখে দেখা যায় নি। তাই একের দেখায় অন্যকে ভুলতে হয়, সুখদুঃখের মতোই পরস্পরবিরোধী ভাবের অধিকারিণী এরা।

আমি উন্মনা হয়ে উঠলাম। বললাম—আরতি, জীবন আমার অগ্রসর হয়েছে কিছুদূর, তোমার নাগাল ছাড়িয়ে গেছি।

অর্থাৎ—বলে আরতি দীপ্তজ্যোতিঃ নিয়ে আমার প্রতি তাকালে।

আমি একটা গল্প বললাম। সুশান্ত বলে একটি ছেলে কুৎসিত কালো এক মেয়েকে অরক্ষণীয়ার জ্বালা থেকে মুক্ত করবে পণ করেছে। এতে মেয়েটীর বাবার আকুল আগ্রহ আছে। কিন্তু সেই সুশান্ত আবার অসীমা নাম্নী একটি মেয়ের কাছে বিক্রীতা। অথচ কালো মেয়েটীর বাবাকে কথা দিয়েছে সুশান্ত—

আরতি গল্প শেষ করতে দিলে না। অত্যন্ত রূঢ়-ভাবেই আমার দিকে তাকালে। সে দৃষ্টিতে রুক্ষতা ছিল—কি সর্ব্বহারার অসহায়তা ছিল বুঝতে পারলাম না, আমার সমস্ত মনটা হায় হায় করে উঠলো।

সমীরদা, সেই কালো মেয়েটীর ঠিকানা দাও, আমিই লিখে দিচ্ছি।—আরতি নির্ব্বিকার ভাবে কথা কটি বললে।

আরতি মহীয়সী নয়—একদিন আমার এই কথা মনে

হয়েছে; কিন্তু আজ তার স্মিত ও প্রশান্ত চোখ দুটিতে যে তিতীক্ষা প্রতিভাত হল—তার মূল্য অনেক, সে সুন্দরীকে উদ্ধার করার অনুমতি দিলে। আরতি সত্যিই মহীয়সী!

জীবনের এই টাগ্ অব্ ওয়ারে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। বৃদ্ধের কাতর অনুনয়ের সুর অনুরণিত হল মনের মধ্যে, আর তীব্রভাবে জাগল আলোড়ন—আরতিকে এভাবে হারাবার জন্যে আমি অব্যক্ত হয়ে উঠলাম।

আরতি অতি সহজেই বললে—এ তুমি আগেই বলো নি কেন সমীরদা? স্বার্থই মানুষকে পাগল করে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা ছেঁটে বাদ দিতে পারলে স্বর্গীয় দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে মনটা। এ ক্ষতি শুধু আমার নয়, তোমারও।

আমি আরও অভিভূত হয়ে পড়লাম।

এর পর যবনিকা হয়তো পড়ত এই অধ্যায়ে। কিন্তু আরতির আর একটি কথা মনে গাঁথা রইল। ফুলশয্যার দিন বৈকালে আমাকে জানালে—তোমাকে একান্ত আপনার করে একান্ত আত্মীয় করে রেখেছিলাম বলেই এমন ভাবে পরের হাতে দিতে পারলাম, কিন্তু···

কাজের হৈচৈয়ে কথা শেষ হয় নি। বিকালের অস্ত-সূর্য্য পশ্চিম নভে আবির ছড়াচ্ছে, তারই আভা আরতির গণ্ডদুটোয় প্রতিভাত হয়েছিল—আরতিকে বড় করুণ ঠেকল। কিন্তু জীবনের স্রোত থামল না—নিজের মনে বয়ে চলতে লাগল, শব্দও তুলতে লাগল কুলুকুলু।

সুন্দরী একদা বলেছিল—আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, আরতিদি'র কাছ থেকে রাক্ষুসীর মতো তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি, আমায় তুমি মাপ করো।

সুন্দরীর সেদিন অহেতুক কান্নার তলে বঞ্চনার কোনও রেখা পাই নি, নিতান্ত সরল অভিব্যক্তি বলেই মনে হল।

আর একদিন সে বললে—তুমি আরতিকে বিয়ে কর, আমি তোমাদের দাসী হয়ে থাকবো।

আরও সরল এবং সহজ উক্তি। সুন্দরীর মহত্ব আছে।

কিন্তু আরতিকে আমি বিয়ে করি নি; সে চিন্তা মনেও আসে নি। জীবনে শান্তি না আসুক, অজস্র দুশ্চিন্তাকে পুঞ্জ পুঞ্জ করে সংগৃহীত করার কি মানে হতে পারে?

এমনিভাবেই অখণ্ড সময়কে অতিবাহিত করছিলাম—আর দশজনের মতো। চাকুরী একটি সংগ্রহ করেছি, পত্নীভাগ্যে কিনা জানি না—তবে দু তিন জোড়া জুতো নষ্ট হয়েছে হেঁটে হেঁটে এটা সত্য কথা। একটি মেয়ে এসেছে সংসারে। খল খল হাস্যে এবং অকারণ-কান্নায় ছোট্ট সংসার আমাদের, আরও ছোট্ট ঘরখানি মুখর করে তোলে। খুকিটি সুন্দরীর রূপ পায় নি, কিন্তু চোখ দুটি আশ্চর্য্যজনক ভাবেই অধিকার করেছে।

মন্থর কেরাণী-জীবন টুক টুক করে গন্তব্যের দিকে ধাবমান হচ্ছে। এ জীবনে বৃহত্তর আশা নেই, মহত্তর কোনো সাধনা নেই। শুধু রোববারের দিনটিতে খবরের কাগজে চোখ রেখে নিজের বাইরে যে বিশাল জগৎটা রয়েছে, সেটাকে অনুভব করা যায়। সাধনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না এখানে, বড় হবার আশাও ঠিক তেমনি অবান্তর।

কাগজ পড়ছি, সুন্দরী বৈঠকখানায় এসে হাজির হল। কেমন যেন থমথমে মুখের ভাব। ঝড় উঠবার পূর্ব্বে কালবৈশাখীর আকাশ যেমন রূপ ধারণ করে, তেমনি সুন্দরীর মুখের ভাব।

আজ রোববার। অন্যদিনের তুলনায় কর্ম্মব্যস্ততা অনেক কম। কর্ম্মটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করেই বললাম—হঠাৎ উদয় হলে কি মনে করে এখানে—ডেকে পাঠালে অধীন দেখা দিত নিশ্চয়ই।

সুন্দরী রহস্য উপভোগ করতে পারল না, বুঝতে পারলাম। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছন্দ কোথাও কেটে গেছে ধরতে পারলাম। তাই কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম—আমি দুপুরে একবার বেরোবো আজ, বিশেষ দরকার।

এইবার সুন্দরী ফেটে পড়লো, মেঘের বর্ষণ সুরু হল না, ভীষণ গর্জ্জন জাগলো: না তুমি যেতে পারবে না। এই চিঠি, ঘরে তোমার টেবিলে খোলা ছিল, দেখেছি। আরতির সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। আমার মাথার দিব্যি রইলো।

আরতি রংপুর চলে যাচ্ছে, সেখানে মাষ্টারি পেয়েছে, জীবনচক্রের আবর্ত্তনে কে কোথায় ছিটকে পড়বো, আর হয়তো দেখাই হবে না, তাই নিবেদন জানিয়েছিল শেষ বার দেখা করতে।

সুন্দরী অত্যন্ত ঝাঁঝিয়ে উঠলো—কেন তখন আমাকে বিয়ে করেছিলে? কে চেয়েছিল তোমার করুণা? তুমি সেখানে যেতে পারবে না, আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে অত মেলামেশা কেন? মনে কর আমি বুঝি বোকা, তাই তুমি ইচ্ছামত এখানে সেখানে যাবে—আমি তা বারণ করবো না।

একবার মনে হল বলি—ফুলশয্যার পর আরতির সঙ্গে দেখাই হয় নি একবারও, ভবিষ্যৎ জীবনে যে আবার দেখা হবে—তার সম্ভাবনাও নেই, কিন্তু তবু সুন্দরীর এ কি অহেতুক অমানুষিকতা, নির্লজ্জ হিংস্রতা!

জীবনে এমনই ঘটে। বঞ্চিতকে ঐশ্বর্য্যের আবর্ত্তে এনে ফেললে সে যেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে উঠে, তেমনই অনাদৃতকে সম্ভাষণ জানালে—এই-ই হয়। সুন্দরী আমার জীবন নিয়ন্ত্রণে অধিকার পেয়েছে উড়ে এসে, কিন্তু সত্যকার শক্তিদায়িনী, জীবনের কেন্দ্রে যার অনুরণন প্রতি চাল-চলনে প্রতিধ্বনিত—সে দূরে চলে গিয়ে মহীয়সী হতে পেরেছে।

আমার চিন্তার জগৎ ঘোলাটে হয়ে এল। সুন্দরীর প্রতি আমার যে অনাবিল পরিচয়—এ সেই দুর্ব্বলতারই পরিপূরক কি না কে জানে?

ধান্যাদি খাদ্যশস্য চাষের সমস্যা ও তাহা সমাধানের উপায় নির্দেশ

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এস্‌সি

পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি এবং আসন্ন ব্যাপক খাদ্যসংকটের পূর্ব্বাভাস ভারতবাসীমাত্রেরই মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই খাদ্যসমস্যা সমাধানে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। এই সমস্যা এত জটিল ও সুদূরপ্রসারী যে বহুসময়, অপরিমেয় শক্তি ও অজস্র অর্থব্যয় ব্যতিরেকে ইহার স্থায়ী সুচারু সমাধান সম্ভবপর নহে। খাদ্যশস্য চাষের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; ইহার কোনও একটি উপেক্ষিত হইলেই মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবার সম্ভাবনা। বিষয়গুলি এই :—

(১) ভূমির উর্বরতাবৃদ্ধিকল্পে সম্যক্ পরিমাণ সারের ব্যবস্থা
(২) পতিত জমি আবাদ করা
(৩) অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টিজনিত শস্যহানির প্রতিকার
(৪) উত্তম বীজ সরবরাহ করা
(৫) পশুচিকিৎসার ব্যাপক ব্যবস্থা ও কৃষিঋণ প্রদান
(৬) পঙ্গপাল ও স্থানবিশেষে বন্যশূকরের উপদ্রব নিবারণ
(৭) কৃষকগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা
(৮) জনশিক্ষার প্রসার ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ প্রচেষ্টা

এক্ষণে প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভূমির তুলনায় আমাদের দেশের ভূমির উর্বরতা শক্তি কত কম নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

দেশ	একর প্রতি			
	ধানের ফলন		গমের ফলন	
ভারতবর্ষ	১৩৫৭	পাউণ্ড	৬৫২	পাউণ্ড
জাপান	২৭৬৭	"	১৫০৮	"
মিশর	২৩৫৬	"	১৬৮৮	"
ইটালি	৪৬০১	"	১২৪১	"
ইংলণ্ড	———		১৮১২	"
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	২১১২	"	৯৭৩	"

[illegible] উৎপন্ন ধানের পরিমাণ আড়াই কোটি টন ও গমের পরিমাণ এক কোটি টন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের ৩০ কোটি লোকের পক্ষে দেশের উৎপন্ন চাউল ও আটা একুনে গড়ে মাথা পিছু দৈনিক ছয় ছটাকেরও কম পড়ে। সুতরাং ধান ও গমের ফলন স্বাভাবিক হইলেও দেশের অধিকাংশ লোক যে একবেলায় বেশী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার উপর যুদ্ধাদির দরুণ বিদেশী লোক বেশী আসিয়া পড়িলে বা ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হইলে দেশে যে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অথচ উপরের তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য দেশের মত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ধান ও গমের ফলন অনায়াসেই দ্বিগুণ বাড়ান যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের কৃষি বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এ দেশের ভূমিতে :পটাস এবং ফসফেট সারের বেশী ঘাটতি নাই ; প্রকৃত অভাব হইতেছে নাইট্রোজেনঘটিত উদ্ভিদ্ খাদ্যের। আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিতেই কোনও সার দেওয়া হয় না। অতি অল্প স্থলেই গোশালার সার, পুকুরের পাঁক বা সবুজ সার দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের বড় বড় *সহরের মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা হইতে হাজার করা চারি ভাগ নাইট্রোজেনযুক্ত এক কোটি টন সার প্রস্তুত হইতে পারে এবং উহা প্রয়োগ করিয়া ৬ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। প্রামাণ্য সরকারী রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে অজন্মা না হইলে আমাদের ২০ লক্ষ* টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি বিদ্যমান। সুতরাং বর্তমান আবাদী জমি হইতে এই পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে আমাদের জমিতে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট দিবার প্রয়োজন। আজকাল দেশে মাত্র ২৭ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত হয় এবং বার্ষিক প্রায় ৭৬ হাজার টন বিদেশ হইতে আসে। অবশ্য ইহার অধিকাংশই চা বাগান, ইক্ষুক্ষেত্র এবং তুলার চাষেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধানের জমির ভাগে ইহা পড়ে না বলিলেই চলে।

অনেকেই জানেন, পাথুরিয়া কয়লাকে নির্বাত চুল্লীতে পুড়াইয়া কোক করিবার সময় অন্যান্য উপকারী পদার্থের সহিত যে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়, সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে তাহাকে অ্যামোনিয়ম সালফেটে পরিণত করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লৌহশিল্পের জন্য বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন পাথুরিয়া কয়লা হইতে কোক করা হয়। উহা হইতে ৫০ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট পাইবার কথা, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সে স্থলে মাত্র ২৭ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ টন কয়লা গাদা করিয়া পুড়াইয়া কোক করাতে উহা হইতে অন্যান্য মূল্যবান্ রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে ১০ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। কয়লা একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ্। কয়লার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের উপর দেশের অশেষ কল্যাণ নির্ভর করে। কোনও সভ্যদেশের গবর্ণমেণ্টই কয়লার এইরূপ অপব্যবহার সহ্য করিতেন না। স্বনামধন্য স্বদেশপ্রেমিক রাসায়নিক স্বর্গতঃ অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন এই শোচনীয় অপচয়ের উল্লেখ করিতে গিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে বিচলিত হইয়া পড়িতেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয় রেলওয়েতে প্রতিবৎসর ৭০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কাঁচা কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইঁহারা যদি কাঁচা কয়লা ব্যবহারের পরিবর্তে ঐ পরিমাণ কয়লা কোক করিয়া ব্যবহার করিতেন তবে এই দফায় বার্ষিক সাড়ে ৮৭ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট পাওয়া যাইত। অ্যামোনিয়ম সালফেটের বর্তমান উৎপাদন, আমদানি ও উহা প্রস্তুতের যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হইল সমুদয় ধরিলেও আমাদের চাহিদা মিটাইতে আরও বহু পরিমাণে উহার প্রয়োজন। দেশের যে ১০ কোটি একর জমিতে ধান ও গমের চাষ হয় উহার একরপ্রতি বার্ষিক ৮০ পাউণ্ড অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগে ফসলের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে মোট ৬৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়ম সালফেটের প্রয়োজন। ফসলের এই বৃদ্ধি ধরিলেও আমাদের বর্তমান উৎপাদন দ্বিগুণ করিতে হইলে আরও আড়াই কোটি টন কমতি থাকে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন আবাদের উপযোগী ৭ কোটি একর *জমিতে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট দিয়া ধান ও গমের* চাষ করিলে এই ঘাটতি পূরণ হইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা *যাইতে পারে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ হইলেও সেখানে বার্ষিক ২০ লক্ষ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আশার বিষয় এই যে, সম্প্রতি মহীশূরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে* বাতাসের নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিয়া অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুতের ছোট একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট উল্লিখিত উপায়ে প্রস্তুতের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

অবশ্য দেশে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত হইলেও কৃষক কি দরে উহা পাইবে এবং কি ভাবে ব্যবহার করিয়া ফসলের ফলন বাড়াইতে পারিবে সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করিবার আছে। প্রত্যেক এলাকার জমি ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিলে এবং কোন্ এলাকার জমিতে কি পরিমাণ সার দিতে হইবে তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইলে সার প্রয়োগ নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে দরের পড়তা এবং খাঁটি দ্রব্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী না থাকিলেও সমূহ বিপদ বিদ্যমান। যে দেশে চাউলের মধ্যেই সিকি পরিমাণ কাঁকর মিশাইতে ব্যবসায়িগণ ইতস্ততঃ করেন না—মরণ বাঁচন সমস্যায় অনেক ঔষধ ব্যবসায়ী রোগীকে ঔষধের পরিবর্তে জল দিতে দ্বিধা করেন না, সে দেশে সারের নামে ছাই পাঁশ দিয়া নিরীহ কৃষককুলকে প্রতারিত করা হইবে না তাহারই বা বিশ্বাস কি ? যতদিন পর্য্যন্ত দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিকে প্রতারিত করিলেও পরলোকে বরং ইহলোকেই আমাদিগকে যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে—এই শুভবুদ্ধি আমাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত না হইতেছে, যতদিন সরকারী কর্মচারী সাধারণের ভৃত্য এবং সর্বতোভাবে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহী না হইতেছে তত দিন পর্য্যন্ত সরকারের সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিতনীতি এবং ব্যবস্থাও কার্য্যক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হইবে না বলিয়াই মনে হয়। দেশে ব্যাপকভাবে সার প্রয়োগে ফসলের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পরগণায় কৃষিগবেষণাগার স্থাপন এবং কৃষিবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী, হাতে কলমের কাজে সুদক্ষ কর্মিদল নিযুক্ত করিতে হইবে। ইংলণ্ডে সার প্রয়োগসম্বন্ধে কিরূপ সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী গবেষণা করা হয় পরের তালিকা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

কর প্রতি উদ্ভিদ্‌খাদ্যের পরিমাণ		ঐ সার প্রয়োগে উৎপন্ন গম, যব প্রভৃতির পরিমাণ	ঐ সারের ফলে উৎপন্ন গোলআলুর পরিমাণ
নাইট্রোজেন	২২'৪ পাউণ্ড	৩ হন্দর	১৬ হন্দর
"	৪৪'৮ "	৪'৮ "	২৮ "
"	৬৭'২ "	৫'৮ "	৩৪ "
"	৮৯'৬ "	৬'৫ "	৩৮ "
"	১১২ "	৬'৯ "	৪০ "
ফসফরিক অ্যাসিড			
"	২২'৪ "	০'৫ "	১০ "
"	৪৪'৮ "	০'৯ "	১৮ "
"	৬৭'২ "	১'১ "	২২ "
"	৮৯'৬ "	১'৩ "	২৬ "
"	১১২ "	১'৪ "	২৮ "
পটাস	২২'৪ "	০'৪ "	১২ "
"	৪৪'৮ "	০'৬ "	২০ "
"	৬৭'২ "	০'৮ "	২৪ "
"	৮৯'৬ "	০'৯ "	২৮ "
"	১১২ "	১ "	৩২ "

গবেষণাক্ষেত্রের এই অনুসন্ধানের ফল উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীর সাহায্যে প্রত্যেক কৃষককে হাতে কলমে শেখাইয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন সার কি অনুপাতে, পৃথক পৃথক বা মিশ্রিত ভাবে এবং কত বড় দানা করিয়া দিলে কোন্ শস্যে কোন্ ঋতুতে সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইবে তাহাও স্থির করিয়া দেওয়া হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও কৃষি গবেষণার ফল জানিয়া তদনুসারে সার প্রস্তুত করিয়া কৃষকগণকে সরবরাহ করিয়া থাকেন। খাদ্যশস্যের ফলন আশানুরূপ সন্তোষজনক করিতে হইলে আমাদের দেশেও যে অনুরূপ ব্যবস্থার প্রচলন অপরিহার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সারের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত জলসেচনের ব্যবস্থা চিন্তনীয়। যদিও আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থলেই এখন পর্য্যন্ত বৃষ্টির উপরেই কৃষক একমাত্র নির্ভরশীল, তথাপি অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাইতেছে এই অবস্থা ক্রমেই অচল হইয়া পড়িতেছে। সময়ে দৈবের কৃপালাভে দিন দিনই আমরা বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। সুতরাং ব্যাপকভাবে জলসেচের ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, শস্য জন্মানই অসাধ্য হইয়া উঠিবে। সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর সাময়িক বৃষ্টির অভাবে মধ্য ও পশ্চিম বাংলার ধান চাষ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। জলসেচ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়র ও রাসায়নিক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক। অনেকেই অবগত আছেন যে কোনও কোনও কূপ বা খালের জলে এমন কতকগুলি অপকারী লবণ পদার্থ থাকে যাহাতে ভূমির উর্বরতাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং প্রচুর সার প্রয়োগেও পরে তাহা সংশোধন করা যায় না। ইঞ্জিনের বয়েলারে যেরূপ বিশুদ্ধ জল ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্ষেত্রেও রাসায়নিক উপায়ে জলের অপকারী লবণ পদার্থ দূর করিয়া সেই জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। অবশ্য ইহা অনেক পরের কথা। আপাততঃ জলসেচের প্রাথমিক চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। আসন্ন খাদ্যাভাবের প্রশমনকল্পে অনেকে পদ্মার চর ও বড় বড় বিলের চারিপাশের জমিতে বোরো ধানের আবাদের কথা উল্লেখ করিতেছেন। এরূপক্ষেত্রে অতি নিকটে জল থাকা সত্ত্বেও সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল নষ্ট হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি দুই একটা ট্রেলর পাম্প (Trailer Pump) মোটরলঞ্চে করিয়া মালদহ হইতে মেঘনার মোহানা পর্য্যন্ত যে সব চরে জলিধান বুনা হইয়াছে এবং জলের অভাবে ধান শুকাইয়া যাইতেছে বা চৈত্রের শেষে ও বৈশাখের প্রথম ভাগে ধান ফুলিবার সময় জলের অভাবে নষ্ট হইতে চলিয়াছে সেই সব স্থলে পাম্পের সাহায্যে পদ্মার জল দিবার ব্যবস্থা করেন তবে ঐ সব চরের ধানে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। গত বৎসর শিলাইদহের সন্নিকটে চরে প্রচুর জলিধান হইবে আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু সাময়িক বৃষ্টির অভাবে কৃষকদের সকল আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ৩০ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট একটি ট্রেলর পাম্পে ঘণ্টায় ২ গ্যালন করিয়া পেট্রল প্রয়োজন হয় এবং উহাতে ঘণ্টায় ৩০,০০০ গ্যালন জল পাম্প করা যায়। পদ্মার এই সব নূতন পলিমাটিযুক্ত অতিশয় উর্বর চরগুলির বিস্তার বেশী নয় সুতরাং অনায়াসেই ঐ পাম্পের সাহায্যে জলসেচনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নদী সন্নিহিত অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে চৈত্রের শেষ ভাগ হইতে (বৃষ্টি না হইলে) ঐরূপ পাম্পের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা করিলে দেশের অনেক জায়গাতেই আউশ ধানের চাষ সন্তোষজনকভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এ বি রেলওয়ের বগুলা এবং মাজদিয়া ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী রেললাইন সন্নিহিত বিরাট দহের কালো জলরাশি অনেকেই দেখিয়াছেন। উহার চারিপাশে কত অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে—আবাদী জমিতেও জলের অভাবে ভাল ফসল জন্মে না। ঐ দহের জল সেচের ব্যবস্থা করিলে উহার সন্নিহিত ভূমি হইতে অসংখ্য লোকের খাদ্যাভাব বিদূরিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের এই সব ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দিবার দিন কি আসিবে না? অনাবৃষ্টির মত অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবনেও ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বাংলা দেশের মজা নদীগুলির সংস্কার, রেলপথে আরও অধিকসংখ্যক স্থলে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা এবং বড় বড় বিলগুলির সঙ্গে সন্নিহিত নদীর সংযোগ সাধন করিয়া দিলে এ বিষয়ে অনেকটা উপকার পাইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে দামোদর, তিস্তা প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি স্থলের নিকটে বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া বর্ষাকালীন উদ্‌বৃত্ত জলরাশি ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করিলে তাহা হইতে একদিকে যেমন প্রভূত বৈদ্যুতিকশক্তি পাওয়া যাইবে ও মাছের চাষের সুবিধা হইবে তেমনি ঐ জল সংবৎসর ধরিয়া ছাড়িলে নদীগুলি নৌচালনের উপযোগী থাকিবে ও পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে জলসেচনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সুরাহা হইবে।

বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট

প্রতিষ্ঠিত না হইলে বীজ সরবরাহ ব্যপদেশে কতকগুলি সরকারী কর্মচারী ও স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোকের অর্থলাভ ব্যতীত চাষীরা ইহাতে উপকার পাইবে না, বরং পচা ও নিকৃষ্ট বীজ পাইয়া তাহারা ক্ষতিগ্রস্তই হইবে। দেশব্যাপী প্লাবন বা অনাবৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে শস্যহানি না হইলে নিতান্ত দরিদ্র কৃষকও ,ক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা ভাল ফসলই বীজরূপে সযত্নে রাখিয়া দেয়—এমন কি অভাবে পড়িয়া ধান কিনিয়া বা কর্জ করিয়া খাইলেও সহজে বীজধান খরচ করে না। কৃষি এবং কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় থাকাতে ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

ইহার পরে কৃষিঋণ ও পশুচিকিৎসার কথা। এখন পর্য্যন্ত সত্যিকারের অভাবগ্রস্ত কৃষক ঐ ঋণের দ্বারা উপকৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। গোমড়ক কৃষকের জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্য্যয়। এই সময় স্বল্প সুদে বলদ কিনিবার টাকা না পাইলে দরিদ্র কৃষকের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। এরূপক্ষেত্রে কৃষিঋণ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কিন্তু পল্লীর জনসাধারণের মনের প্রসারতার অভাবে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র কৃষক কদাচিৎ সাহায্য পাইয়া থাকে। পশুচিকিৎসাও এখন পর্য্যন্ত পল্লীবাসী কৃষক সম্প্রদায়ের সত্যিকারের কাজে লাগিতেছে না। সাধারণতঃ মহকুমা সহরেই সরকারী কৃষি চিকিৎসালয় স্থাপিত এবং চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য ও অধিকাংশ স্থলেই ফলপ্রসূ হয় না বলিয়া কৃষকগণ কদাচিৎ পশুচিকিৎসকের সাহায্য লইয়া থাকে। আরও ব্যাপকভাবে এবং যথাসম্ভব কৃষকপল্লীর সান্নিধ্যে পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত না হইলে এবং দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত পশুচিকিৎসায় পারদর্শী উপযুক্তসংখ্যক চিকিৎসক না পাওয়া গেলে সরকারের এই বিভাগ আধুনিক কৃষিবিভাগের মতই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সহায়তা করিতে পারিবে না।

আজকাল পাটকল ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অনেক নেতা মাথা ঘামাইতেছেন, গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছেন ; কিন্তু পল্লীর চাষীদের কথা কয়জন ভাবিয়া থাকেন? বাংলা দেশের অধিকাংশ কৃষকপল্লীই ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের প্রিয় আবাসভূমি। একে কৃষকেরা উপযুক্ত পুষ্টিকর ও পর্য্যাপ্ত খাদ্যাভাবে শক্তিহীন, তারপর বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং তাহার জের ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত চলে। সুতরাং রোগখিন্ন দুর্বল কৃষকের পক্ষে আউশ ও ছিটাইয়া-বুনা আমনধানের জমি ভালভাবে চাষ করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় না। ফলে ঐ সব জমিতে সুবৃষ্টি হইলেও ভাল ফসল জন্মে না। মধ্য বাংলার উঁচু জমিগুলিতে আউশ এবং আমন ধান কাটার পর ২।৩ খানি চাষ দিয়া তৈল শস্য এবং স্থল বিশেষে মাষ কলাই, মুগ, মটর, মসুরী, ছোলা ও খেঁসারীর চাষ করা হইয়া থাকে। অনেকেই জানেন, ছোলা মটর প্রভৃতি ডাল জাতীয় উদ্ভিদের মূল সংলগ্ন ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়াতে বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ হইয়া সারে পরিণত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সব স্থলেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সর্বাপেক্ষা অধিক। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কৃষক রবিখন্দের চাষ করিয়া উঠিতে পারে না। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই 'মাটির মায়া'র কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"কার্ত্তিকে জ্বরে পড়ি' চৈতালী বুনা হ'ল না, ক্ষেত্র রহিল পতিত পড়ি।" সুতরাং খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের ম্যালেরিয়া নিবারণ করা যে সর্বাগ্রে কর্ত্তব্য তাহা সহজেই অনুমেয়। গবর্ণমেণ্টের বাজেট দেখি অধিকাংশ অর্থ দেশরক্ষাকল্পে সৈনিকদের ভরণপোষণেই ব্যয়িত হইয়া থাকে, অথচ বন্দুকধারী সৈন্যদের অপেক্ষা বহুগুণে অপরিহার্য্য এই সকল হলধারী সৈনিকের জন্য গবর্ণমেণ্টের কোনও দরদই লক্ষিত হয় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সরবরাহ সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত দনিতা কার্গুসন লিখিত 'জীবন রক্ষা কল্পে যুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সৈনিক প্রেরণের পূর্বে বিমানপোত হইতে মশকবিধ্বংসী ডি-ডি-টি ছিটাইয়া দেওয়াতে এসব স্থানে যুদ্ধরত সৈন্যদিগকে ম্যালেরিয়া স্পর্শ করিতেও পারে নাই। গবর্ণমেণ্ট একটু মনোযোগী হইলে দেশের ম্যালেরিয়া-প্রধান গ্রামগুলিতে অনুরূপভাবে ডি-ডি-টি ছিটাইয়া চাষী জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে সকল গ্রাম ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং দুই চারি ঘর কৃষক কোনও গতিকে বাঁচিয়া আছে সরকার হইতে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে গ্রামের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পাবনা, রাজসাহী, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, হুগলী, বর্দ্ধমান, ফরিদপুর ও যশোহরের অনেক মহকুমায় বড় নদী হইতে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে অচিরে এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত না করিলে বাংলার বহু উর্বর জমি চাষীর অভাবে অনাবাদী পড়িয়া থাকিবে। সম্ভব হইলে জনবহুল জিলাগুলির ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদিগকে স্বাস্থ্যসম্মত ঘর বাড়ি করিয়া দিয়া এই সব বিধ্বস্ত গ্রামে বসানর চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক।

এতক্ষণ যে সব বিষয়ের আলোচনা করা হইল তাহার কোনটিই বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে না, যতদিন দেশে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা না হয়। কলের প্রত্যেকটি অঙ্গ যেমন পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ, একটির বিকলতায় যেমন সবগুলি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, মানুষের সমাজেও যে ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র সবাই সেইরূপ সংবদ্ধ একথা যতদিন আমরা মনেপ্রাণে অনুভব না করিব—যতদিন পর্য্যন্ত কালী মণ্ডল ও করিম সেখের সুখদুঃখ আমাদের নিজের সুখদুঃখ বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিব ততদিন আমাদের সত্যিকারের বাঁচিবার অধিকার জন্মিবে না। আজাদ-হিন্দ ফৌজ যেমন জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তেমনি আমরাও যতদিন বর্ণ, অর্থ ও শিক্ষার অভিমান ভুলিয়া সকলে একাত্ম হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে না পারিব ততদিন আমাদের সকল পরিকল্পনা ও সমুদয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে মাটির প্রতি মমত্ববোধ, মানুষী শক্তির বিরাটত্বের কথা, সুখ শান্তিতে শতায়ু হইবার প্র্যাকটিক্যাল উপদেশদানে আশান্বিত, উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে' এই মহাবাক্য বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে পালন করিতে হইবে। দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে ইংলণ্ডের দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইয়া তাহারা যুদ্ধপূর্বকাল অপেক্ষা অধিকতর সুখে স্বচ্ছন্দে আছে বলিয়া প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের নিকট শুনিতে পাইলাম। অথচ এই যুদ্ধের ফলেই আমাদের দেশের একশ্রেণী বিন্ধ্য হইতে এভারেষ্টের উচ্চতা লাভ করিয়াছে, আর যাহারা সমতলে ছিল তাহারা ভারত মহাসাগরের অতলে নিমজ্জিত হইয়াছে। জাতীয় চরিত্রের যে ঘৃণ্য দুর্বলতা এই ঐতিহাসিক কলঙ্কের জন্য দায়ী তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ ব্যতিরেকে আমাদের বাঁচিবার অধিকার জন্মিতে পারে না। আশা করি, সম্প্রতি জাগ্রত স্বাধীনতা-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পুণ্য ভাগীরথী প্রবাহের মত আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা, যাবতীয় কলুষ নাশ করিয়া আমাদিগকে নূতন জীবনের মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং সমাজের সকল স্তরের সহানুভূতি ও সাহায্যপুষ্ট স্বাস্থ্যবান্ শিক্ষিত কৃষকগণ দৃঢ় মুষ্টিতে হলধারণপূর্বক আধুনিক বিজ্ঞানের দান কার্য্যতঃ প্রয়োগে খাদ্য সমস্যার সমাধান করিয়া ধন্য হইবেন।



অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

রাত প্রায় ন'টা।

আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। নারকেল গাছটার পাতায় পাতায় রূপালী আলোর ঝিলমিলি। লিচু ও কাঁঠাল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সে-আলো আল্পনা এঁকেছে ধুলোঢাকা ধব্‌ধবে আঙিনায়। গন্ধরাজের মাতাল গন্ধে বাতাস বিহ্বল। পৃথিবী সুন্দর।

ঘরে আর মন টিকল না। ইজিচেয়ারটা টেনে আঙিনায় গা এলিয়ে দিলাম। চোখ দুটো অজ্ঞাতেই বুজে এল।

পল্লীগ্রামে খবরের কাগজ আসে ডাক পিওনের হাতে—সন্ধ্যার একটু আগে।

একটু-আগে-পড়া খবরগুলো মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়ায়:

ভারতবর্ষের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাংগা; ময়মনসিংহের গ্রামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড: কানপুরে দাংগায় জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ......

কেন এমন হয়? এক আলো, এক বাতাস, এক নদীর জল, এক ক্ষেতের ফল। বিপদে দুয়েরি মাথায় নামে দুর্দিনের জলধারা, সম্পদে দুয়েরি আকাশে হয় উজ্জ্বল সূর্যোদয়। তবু কেন এই আত্ম-কলহ? কেন এই সাম্প্রদায়িক দাংগা?

কার যেন পদশব্দে চমক ভাঙল। চোখ তুললাম। আশ্চর্য-দর্শন এক নারীমূর্ত্তি। আলুলায়িত-কুন্তলা, সুনীল-বসনা।

কিন্তু ওকি? আতংকে শিউরে উঠলাম। সুন্দর গৌরবর্ণ মুখে নির্মম অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। শাণিত অস্ত্রের আঘাতে মুখখানি দুই ভাগ হয়ে গেছে। কপালগুলি আগাগোড়া ফাঁক হয়ে গেছে। নাক ও ঠোঁট হয়েছে বিকৃত। ক্ষতস্থান হতে তখনো ঝরছে রক্তধারা।

অজ্ঞাতেই মুখ দিয়ে প্রশ্ন বের হল: কে তুমি মা?

সজল কণ্ঠে উত্তর এল: আমি দেশমাতৃকা।

: তুমি ভারত মাতা? স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার? তোমার এ দশা কে করেছে মা? বল মা, কে সেই নরাধম—

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নারীমূর্তি বাধা দিল: কাকে ভর্ৎসনা করছ বত্‌স? কারে দাও দোষ? ভাই ভাইয়ের বুকে হানছে খড়্গ, তাই তো জননীর মুখ দ্বিখণ্ডিত। তাই তার চোখে অবিরল অশ্রুধারা।

: তুমি আদেশ করো মা, এ আত্মনাশা আত্মকলহ আমি দূর—

মুখের কথা মুখেই রইল। রহস্যময়ী নারীমূর্তি আলো-ছায়া আঁকা পথে পা বাড়াল।

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম: দাঁড়াও মা।

বৃথা এ আহ্বান। নারীমূর্তি এগিয়েই চলল। নীরবে, নিঃশব্দে।

অকস্মাৎ মনে হল, তাঁর সেই নীরব পদক্ষেপে যেন অকথিত আহ্বান। জোছনা-ধোয়া পথ যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে-ডাকে মায়ের কণ্ঠস্বর। আমার অন্তরাত্মা সে-ডাকে সাড়া দিল।

রহস্যময়ী মূর্তির অনুসরণ করলাম।

পচা পুকুরের পাড় দিয়ে, বারোয়ারী কালীমণ্ডপ পার হয়ে, কাটা খাল পিছনে ফেলে চলেছি এগিয়ে। হে রহস্যময়ী অজানা ছায়ামূর্তি! *আরো কতো দূরে আমায় নিয়ে যাবে? কোথায় তোমার পথচলার শেষ?*

একি? ভোজবাজী না ভূতের কারসাজি? কোথায় ভারতমাতা? কোথায় ইংগিতময়ী ছায়ামূর্তি?

এক টুকরো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদের মুখ। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সম্মুখবর্তিনী রক্তাক্ত নারীমূর্তি। আবছা অন্ধকারে আমাকে এ কোথায় সে নিয়ে এল?

এ যে মাঠের শেষে চম্পা বিলের ধারে এসে পড়েছি। এ-পথে যে দিনে-দুপুরে কতো পথিক পথ হারায়। কতো মানুষ হারায় প্রাণ!

বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। ওই তো দূরে দেখা যায় সেই ভুতুড়ে বটগাছ। তারি নিচে কেষ্ট ঠাকুরের দরগা……

সহসা বন্-বন্ করে মাথার ভিতরটা ঘুরতে লাগল। কালের চাকায় লাগল উল্টো টান। বিস্মৃত অতীত ফিরে এল বাস্তব বর্তমানে…

*

* *

অনেক দিন আগেকার কথা।

দশ হাজার গাঁয়ের দত্তবাড়ীর কাছারি ঘরে সখের যাত্রার রিহার্সেল চলেছে। আসর সরগরম।

অনেক ভেবে এবার ধরা হয়েছে 'মান্ধাতা' পালা। যাত্রা করবার মতো একখানা বই বটে।

মহারাজ মান্ধাতা রাজ্য-ঐশ্বর্য হারিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কাঙালের বেশে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। কিশোর পুত্র মুচকুন্দ গানে গানে হরিঠাকুরকে ডাকে। দেবতার ভক্তির পরীক্ষার তবু শেষ নাই। রাক্ষসবেশী ক্ষুধিত দেবতা চায় মুচকুন্দর বক্ষমাংস। সত্যনিষ্ঠ মহারাজ মান্ধাতা নিজ হাতে পুত্র বলি দেয় রাক্ষসের ক্ষুধা মেটাতে। মহারাণীর করুণ এ্যাকটেতে আর মুচকুন্দর সজল সংগীতে বনের পাখী গান ভোলে। শ্রোতাদের চোখে জল ঝরে। পালা দেখতে দেখতে জমে ওঠে। বইয়ের রাজা 'মান্ধাতা পালা।

তাইতো সখের যাত্রার অধিকারী হারাধন দত্ত মশায় নিজে এবার পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়ে তবে এই বই আনিয়েছেন। এবার পুজায় যাত্রামাত্ তিনি করবেনই।

রিহার্সেল চলেছে।

ওস্তাদ নটবর গোঁসাই বেহালার ছড় টানছে নানা ভংগীতে। আর কিশোর মুচকুন্দ ধরেছে গান:

> পড়া ছিল হরিস্তব
> কী সুন্দর মা সুধানব,
> গুণের কথা কি আর কব,—
> ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলেছি।

এমন সময় ভগ্নদূতের মতো কাছারিঘরে ঢুকল সতীনাথ দত্তমশায়ের কর্মচারী ও এ-অঞ্চলের সেরা কমিক এ্যাকটর।

নিরাশ কণ্ঠে বলল সীতানাথ: হল না দত্তমশায়, 'মান্ধাতা' এবারে মতো হাতবাক্সেই তুলে রাখুন।

নটবর গোঁসাইর বেহালার ছড় থেমে গেল। থেমে গেল মুচকুন্দ গান।

দত্তমশায় অসহিষ্ণু গলায় বললেন: *ওসব ফাজলামি এখন রাখো হে মশায়। কাজের কথা কি হল তাই বলো।*

জবাব দিল সতীনাথ দুই হাত ঘুরিয়ে: আর বলাবলির কিছু নাই দত্তমশায়, ফকির আসবে না।

কাছারি-ঘরের মাথায় যেন সহসা বজ্র ভেঙে পড়ল। সকলে এক-সংগে প্রশ্ন করল: আসবে না মানে?

সতীনাথ বাঁহাতের তালু উল্টো করে ডানহাতের বুড়ো আঙুল তার নিচে ঘুরাতে ঘুরাতে জবাব দিল: মানে, ফকিরের আশা লবডংকা। আটঘরের সমস্ত মাতব্বররা একজোট হয়েছে—ফকিরকে আসতে দেবে না।

ফেটে পড়লেন দত্তমশায়: আসতে দেবে না, বললেই হলো আর কি! তোমরা কিচ্ছু ভেবোনা মশায়রা, রিহার্সেল জোর চালাও। না এলে ওর ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে দেব না? ওর বাবার যথাসর্বস্ব যে কট-কওলায় বাঁধা আছে আমার কাছে, সে খেয়াল আছে বাপধনের?

জনার্দন রায় এ যাত্রাদলের পাণ্ডা মানুষ। সে এবার কথা বলল: আপনি থাকুন দত্তমশায়। আগে শুনেই নি ব্যাপারটা কি। তারপরে সে—কলকাটি তো আপনার হাতেই আছে। কী হে সতীনাথ, আসলে ব্যাপারটা কি? এযাবৎকাল ফকির আমাদের দলে পাট করে আসছে, এবারে হঠাৎ তাকে আসতে দেবে না কেন? কি হয়েছে?

সতীনাথ হাত মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল: হয়েছে আমার মাথা, আর আমাদের দলের মণ্ডু। আটঘরের মাতব্বররা সব গোঁ ধরেছে—ফকির মুসলমানের ছেলে, ওকে আর কেষ্ট ঠাকুরের পার্ট করতে দেবে না।

রেগে উঠলেন দত্তমশায়, কেন দেবে না? কেষ্ট ঠাকুরের পার্টটা কি ফেল্‌না নাকি রে মশায়? আরে ওই কেষ্ট ঠাকুর তো আসর মাতাবে। আহা—হা, সেবারে উমানাথ ঘোষালের দলের সেই কেলো ছোঁড়াটা কী গানই করল কেষ্টর পার্টে—

বলেই স্থান-কাল ভুলে দত্তমশায় ডান হাতে তালিম দিয়ে গুণ গুণ করে গান ধরলেন:

> ধীবর আমি মুকুতার তরে
> ঘুরে বেড়াই আমি ভব-সাগরে,
> হল সফল জনম,
> পেয়েছি রতন,
> আলিংগন দাও হে আমায়।

আহা-হা! সে কি গান, যেন অমরতো ঢেলে দেয় কানে। এ-হেন যে কেষ্টর পার্ট, তা ব্যাটাদের মনে ধরছে না। কেন? বলি কী দোষ হয়েছে ও-পার্টের, তাই শুনি?

ফোঁড়ন কেটে কথা বলল সতীনাথ : আপনি তো চান্দা দেখেই দশা পড়ছেন দত্তমশায়। কিন্তু ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। আসলে কেষ্ট ঠাকুর হিন্দুর দেবতা বলেই ফকিরকে সে-পার্ট করতে ওরা দেবে না।

দত্তমশায় শুধালেন : আর এত কাল ধরে-কতো যে কেষ্ট ঠাকুরের পার্ট ওই ফকির করে এল, তাতে দোষ হল না?

চটপট জবাব দিল সতীনাথ : আজ্ঞে সে কথাও আমি ভুলেছিলাম। ছড়াজান মাতব্বর তাতে জবাব দিল—এতকাল যা অইচে তা অইচে, কিন্তুক অমন খারাপি কাম আর মোরা হতি দেব না—দত্ত মশায়রে এ-কতাটা আপনি বুলবেন নায়েব মশায়।

নটবর গোঁসাই কথা বলল : তাহলে উপায়? ও ফকির ছাড়া মাজাতা পালার কেষ্টর কাজ আর কাউকে দিয়ে হবে না—হতে পারে না।

এ-কথায় সকলেই ভেঙে পড়ল। আহারে! এত সাধের বইখানা এমন অ-ঘাটায় ডুবে মরবে। রিহার্সেলের আগুনে ঠাণ্ডা জল পড়ল। আসর ভাঙে আর কি।

গতিক আর সুবিধার নয় দেখে জনার্দন রায় বলল : কি বলেন দত্ত মশায়, তাহলে কি অন্য কোন বইতে হাত দেব? 'অম্বরিশের ব্রহ্মশাপ বা দুর্বাশা দমন বইখান আপনি কেমন মনে করেন?

দত্ত মশায় রেগে উঠলেন : না না, ও সব দুর্বাশা দমন-কমন নয়। আগে ওই ফকির দমন, তারপরে অন্যকথা। এঃ, ব্যাটারা সব সাপের পাঁচ পা দেখেছে না? আর দেখো তো মশায়রা কথার ছিরি! করবে যাত্রা, সখ দাবড়াবে, তার আবার হিন্দুর দেবতা, আর মুসলমানের পীর।

কথা বলল সতীনাথ : সে-কথা একশোবার। আমিও তো তাই বললাম। কিন্তু কার কথা কে শোনে? সব ব্যাটার ওই এক কথা—ফকির যাবে না যাত্রায়।

দত্ত মশায়ের গলা সপ্তমে উঠল : ফকির যাবে না, ফকিরের বাবা যাবে, ওর চোদ্দপুরুষ যাবে। যাবে না! ও সব মিয়ারে আমি চিনি। কত জনার ঘটি-বাটি বাঁধা আছে আমার এই হাত বাক্সে। চাবির এক মোচড়েই সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঃ—

দত্ত মশা'য় যত বলেন, অনুচরগণ তার দশগুণ বলে।

দত্ত প্রশস্তিতে কাছারি বাড়ী মুখর হয়ে উঠল। গড়গড়ায় আওয়াজ উঠল গড়র্—গড়র্—

দত্ত মশায় খোস মেজাজে বললেন : তোমরা সব ভড়কে যেও না হে মশায়রা। রিহার্সেলে ভাল করে তালিম দাও। ও ফকির দমনের ভার আমার।

নটবর গোঁসাই নতুন উদ্যমে বেহালায় ছড় বসাল। ঢোলে পড়ল চাটি।

রিহার্সেল সুরু হল আবার।

প্রথমে যা ছিল সামান্য একটা খেয়াল মাত্র, ক্রমে তাই রূপ নিল অনমনীয় জিদে। দত্ত মশায়ের জিদ—ফকিরকে দিয়ে কেষ্টর পার্ট করাতেই হবে; আবার ও-পক্ষেরও জিদ—কেষ্ট ঠাকুরের পার্ট ফকিরকে করতে দেওয়া হবে না।

কথা চালাচালি, আর দূত ঘোরাঘুরি চলল প্রথম কিছুদিন। মুখে মুখে একপক্ষের অনেক খামখেয়ালী কথা বিকৃত রূপে উঠল যেয়ে অপর পক্ষের কানে। গোলযোগ ঘোরালো হয়ে দেখা দিল।

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা দাঁড়াল গ্রাম্য কলহে। ফকির ও কেষ্ট ঠাকুরের পার্টকে কেন্দ্র করে দশহাজার আর আটঘর গাঁয়ের মান-মর্যাদা যেন সুতোর মালায় ঝুলতে লাগল।

মানুষের গড়া এই কলহে ইন্ধন জোগাল এমন একটা ব্যাপার যার উপর মানুষের কোন হাত নাই। ঘটনাচক্রে দশহাজার গাঁয়ের প্রায় সব অধিবাসীই হিন্দু, আর আটঘর গাঁয়ে শুধুই মুসলমানের বাস।

কাজেই বহু তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াল : দশহাজার বনাম আটঘর বিরোধ—হিন্দু বনাম মুসলমানের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব।

হারাধন দত্ত এ-অঞ্চলের বড় জোত্‌দার ও অর্থবান লোক। তাঁর হাত বাক্সের টাকা না হলে এ-কৃষিপ্রধান দেশের অনেকেরই চলে না। সহজে হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। অনুরোধ-উপরোধ ও হুংকার-হুমকিতে যখন কোন কাজ হল না, তখন তিনি চরম পন্থার আশ্রয় নিলেন।

অমাবস্যার এক কালো রাতে লোকজন পাঠিয়ে সকলের অজ্ঞাতে ফকিরকে ধরে নিয়ে এলেন সটান দত্ত বাড়ীর কাছারিতে। দত্ত মশায়ের রক্তচক্ষুর সামনে ফকির ঢোক গিলে গিলে কেষ্টঠাকুরের পার্টে তালিম দিতে লাগল।

দত্ত মশায় গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন : কেমন হল তো এবার?

আর ওদিকে…

দরিদ্র আটঘরী কৃষকগণ। আহত সাপের মত তারা মনের আগুন মনে চেপে নীরবে দিন কাটাতে লাগল। জন কয়েক মাতব্বর গোছের মানুষ তাদের দিনরাত উস্কানি দেয় : আটঘরের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু বেচারী আটঘরবাসীরা! তাদের অনেকেই দত্ত মশায়ের কাছ থেকে ধার-করা টাকায় বছর চালায়। তাঁর সংগে প্রকাশ্যে লাগবে তারা কোন্ দুঃসাহসে? মনের তীক্ষ্ণ প্রতিশোধ-বাসনা তাই বাঁকা পথ ধরল—

ভাদ্রের বর্ষণ-মুখর রাত।

জনার্দন রায় হাট থেকে বাড়ী ফিরছে।

দোকানের হিসাব পত্র মিলাতে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের সংগীরা সব যে-যার দুর্যোগের আগেই বেলা থাকতে বাড়ী ফিরেছে। পথে জনার্দন একা।

একটানা বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে। তার সাথে সুর মিলিয়ে ডাকছে ব্যাঙের দল। চারদিকে মিশকালো আঁধার।

হঠাৎ একটা তীব্র আলো এসে পড়ল জনার্দনের মুখে।

ভয়ে সে চমকে উঠল : কে ?

সংগে সংগে একখানি লাঠি পড়ল তার মাথায়। জনার্দন চীৎকার করে পড়ে গেল মাটিতে।

কয়েকটি ছায়ামূর্তি চকিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বলে গেল : এই তো মোটে কাট্টো সিন হয়ে গেল।

দুঃসংবাদ হারাধন দত্তের কানে পৌঁছুতে দেরী হলো না।

গড়গড়ার নলটা তাঁর হাত থেকে ঠক্ করে মেঝের পড়ে গেল। ভ্রূদুটো কুচকে চোখদুটি আপনিই বুজে এল। উপরের দাঁত চেপে ধরল নিচের ঠোঁটখানি। কুটচক্রের পাশায় চলল নতুন চালের মহড়া।

কয়েকদিন পরে।

মাঠ থেকে ফিরবার পথে সন্ধ্যার আবছায়া আঁধারে ছড়াজান মাতব্বর নিখোঁজ হয়ে গেল।

দশহাজার—আটঘর বিরোধ এমনি করেই ক্রমাগত এগিয়ে চলল।

আজ এ পক্ষের একজন জখম হয়; কাল ও পক্ষের একজন হয় গুম্। ইয়াসিন মোল্লার যদি মাথা ফাটে, তো সতীনাথের পা হয় খোঁড়া।

কিন্তু সবি চলে অন্ধকারে—রংগমঞ্চের অন্তরালে। রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাতে ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে গোপন চক্রান্ত। রাতের বাতাসে হিস্-হিস্ করে পাকা লাঠির আস্ফালন। কালো অন্ধকারে সহসা ঝিলিক দিয়ে ওঠে—ইস্পাত-ফলক।......

তারি মাঝ দিয়ে বয়ে চলে দশহাজার আটঘরের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা।

'মান্ধাতা' পালার রিহার্সেল সমানতালেই চলে। মাথায় পট্টি বেঁধে জনার্দন মান্ধাতার অ্যাকটো করে। খোঁড়া পা নিয়ে সতীনাথ হাসির হররা ছুটায়। কেষ্ট ঠাকুরের করুণ গান গাইতে গাইতে ফকিরের দুচোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নামে।

বেচারী ফকির। দুই পক্ষের খুন খারাপির নানা স্পষ্ট-অস্পষ্ট কাহিনী ওর কানে আসে। নিরুপায় বেদনায় সব কথা ও শোনে, আর রাতদিন বসে বসে ভাবে। কখনো কখনো নিজেকেই ওর অপরাধী বলে মনে হয় : ওরি জন্যেই তো এই খুন-জখমের পালা...

সেদিনও রিহার্সেল চলছে পুরোদমে।

রাক্ষসের সিনটাই ধরা হয়েছে। মুচকুন্দ ক্রন্দনরতা মায়ের চোখ মুছিয়ে কতো করে বুঝিয়ে বলছে :

> জননী গো, কেঁদো না—তুমি কেঁদো না। এক ক্ষুধার্তের তৃপ্তির জন্য এ ছার জীবন যদি যায়, সে যে আমার পরম গৌরব। তুমি হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও জননী, পরের উপকারে এ-জীবন উৎসর্গ করে তোমার মুচকুন্দর জীবন ধন্য হোক......

মুচকুন্দর পার্ট শুনতে শুনতে ফকিরের চোখের সামনে যেন একটা নতুন দেশ ঝলমল করে উঠল। কোন্ যাদুকরের ইংগিতে থেমে গেল বেহালার সুর, ঢোলের শব্দ হল স্তব্ধ। নতুন আলোয় ঢেকে গেল দত্ত মশায়ের রক্তচক্ষু। তুচ্ছ মনে হল নিজের জীবন—ক্ষুদ্র স্বার্থ—কলহ সংশয়।

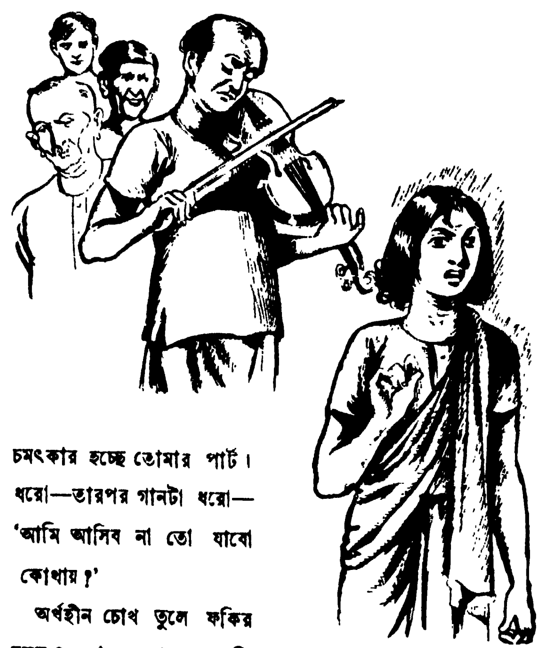
ওর মনে হল : পরের উপকারে এ ছার জীবন উৎসর্গ করে ওর জীবনও তো ধন্য হতে পারে। ওকে কেন্দ্র করেই দশহাজার—আট ঘরের এই প্রাণঘাতী কুৎসিত বিরোধ। নিজের জীবন দিয়ে এক মুহূর্তেই তো এ-বিরোধ ও বন্ধ করে দিতে পারে।

পার্টের মাঝখানে হঠাৎ ফকির থেমে গেল।

প্রম্‌টার গলায় আরো একটু জোর দিয়ে—বলল : বল—তারপর বল—

ফকির স্তব্ধ—বজ্রাহত—বাক্যহীন।

দত্ত মশায় উৎসাহ দিয়ে বললেন : হ্যাঁ—হ্যাঁ, চমৎকার—



'পার্টের মাঝখানে হঠাৎ ফকির থেমে গেল'

চমৎকার হচ্ছে তোমার পার্ট। ধরো—তারপর গানটা ধরো—'আমি আসিব না তো যাবো কোথায় ?'

অর্থহীন চোখ তুলে ফকির বলল : আজ আর আমি গাইতে পারব না দত্ত মশায়, আমার মাথার ভিতরটা যেন কেমনতর করছে—

অগত্যা রিহার্সেল বন্ধ হয়ে গেল।

আর—

সেই রাতেই ফকিরের জীবন-নাটকের রিহার্সেলও চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বিছানার 'পরে ওর রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল। ধারালো দায়ের আঘাতে গলার অর্ধেকটা একেবারে হাঁ হ'য়ে আছে।

ফকির আত্মদান করেছে।

একটি হতভাগ্য তরুণের এই শোচনীয় মৃত্যুতে দশহাজার—আট

ঘরের কুৎসিত কলহের আগুন মুহূর্ত্তে নিভে গেল। দুটি গ্রামের সমস্ত সঞ্চিত অশ্রুজল নিঃশেষে ধুয়ে মুছে দিল জঘন্য সংঘর্ষের কলংক-কালিমা।

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু নরনারী মহাসমারোহে ফকিরের শব দেহকে কবর দিয়ে এল।

*

*   *

একটা বিকট শব্দে আচমকা তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। খাড়া আমগাছটার শুকনো ডালে একটা হুতোম প্যাঁচা ডাকছে।

আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। নারকেল গাছটার পাতায় পাতায় রূপালী আলোর ঝিলমিলি। গন্ধরাজের মাতাল গন্ধে বাতাস বিহ্বল। পৃথিবী সুন্দর।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম।

খবরের কাগজে আজকের পড়া সাম্প্রদায়িক দাংগার সংবাদ আর বহুদিন বহুবার শোনা কেষ্ট ঠাকুরের দরগার কাহিনী মিলিয়ে বিক্ষুব্ধ মনের এই অদ্ভুত স্বপ্ন-রচনা!

কবে এক হতভাগ্য তরুণের বক্ষরক্তে দুটি গ্রামের হীন সাম্প্রদায়িক কলহের কলংক-রেখা মুছে ছিল কে জানে। কে জানে এ-কাহিনীর কতোখানি সত্য, আর কতোখানি কল্পনা।

কিন্তু সীমাহীন প্রান্তরের এক নিরালা বটগাছের নিচে আজো আছে কেষ্ট ঠাকুরের দরগা। ভাঁটফুলের জঙ্গল আর ফণি-মনসার বেড়ায় ঘেরা একখণ্ড মাটির স্তূপ আজো এ-কাহিনীর সাক্ষ্য দেয়। কতো ঘরছাড়া বাউল-সন্ন্যাসী পীর-ফকির সেখানে আস্তানা নেয়। হিন্দুরা দেবতা স্মরণ করে সেখানে দুধ-চিনি দেয়, মুসলমানেরা দেয় সিন্নি। কালস্রোত কুটিল বংকিম রেখায় এগিয়ে চলে।······

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের তল হতে। আবার চোখ বুজলাম। দ্বিখণ্ডিত এক রক্তাক্ত মুখশ্রী চোখের সামনে ভেসে উঠল।

হুতোম প্যাঁচাটা এখনো ডাকছে।···

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

অষ্টম প্রকরণ—গূঢ় পুরুষ-প্রণিধি

দ্বাদশ অধ্যায়

মূল :—আর যাহারা অসম্বন্ধী অথচ অবশ্য ভরণীয়—লক্ষণ-অঙ্গবিদ্যা-জম্ভক বিদ্যা-মায়াগত-আশ্রমধর্ম্মনিমিত্ত-অন্তরচক্র অথবা সংসর্গবিদ্যা অধ্যয়নকারী—তাহারা সত্রী।

সঙ্কেত :—গূঢ়পুরুষপ্রণিধি—গূঢ়পুরুষ অর্থাৎ চরগণের প্রণিধি অর্থাৎ প্রণিধান—কার্য্যে নিয়োগ (গঃ শাঃ); institution of spies (SH)। পূর্ব্বাধ্যায়ে গূঢ়পুরুষোৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কাপটিক-উদাস্থিত-গৃহপতি-বৈদেহক-তাপসব্যঞ্জন চরগণের কথা তথায় বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে সত্রী তীক্ষ্ণ রসদ পরিব্রাজিকা প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইবে। চর হিসাবে উভয় সম্প্রদায়ই সমান ; তবে দুইটি সম্প্রদায়ের বিবরণ একই অধ্যায়ে প্রদত্ত না হইয়া দুইটি বিভিন্ন অধ্যায়ে লিখিত হইল কেন?—এরূপ প্রশ্নের সমাধানকল্পে গণপতি শাস্ত্রী বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই ভেদ কর্ত্তৃভেদের সূচক। কাপটিকাদি পঞ্চ শ্রেণীর চরের কর্ত্তা মন্ত্রি-সহিত রাজা ; পূর্ব্বাধ্যায়ের একটি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়—'তাহাকে (অর্থাৎ কাপটিককে) অর্থ ও মান দ্বারা উৎসাহিত করিয়া মন্ত্রী বলিবেন—রাজা ও আমাকে প্রমাণরূপে গণ্য করিয়া' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, সত্রী প্রভৃতি চার শ্রেণীর চরের কর্ত্তা স্বয়ং রাজা—মন্ত্রী নহেন ; কারণ, একটু পরেই এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—'ইহাদিগকে (সত্রী প্রভৃতি শ্রেণীর চরগণকে) রাজা নিজ জনপদে মন্ত্রী পুরোহিত সেনাপতি যুবরাজ প্রভৃতির পরীক্ষার্থ নিযুক্ত করিবেন' ইত্যাদি। কেবল এই ভেদই পর্য্যাপ্ত নহে—অন্য ভেদও আছে। কাপটিকাদির স্বরূপও সত্রী প্রভৃতির স্বরূপ হইতে ভিন্ন। কাপটিকাদি পঞ্চ শ্রেণীর চর 'সংস্থা'-শব্দ-বাচ্য। ইঁহারা যথাস্থানে (নিজ নিজ ডেরায়) থাকিয়া রাজকার্য্য সাধন করেন—স্বস্থান ছাড়িয়া কোথাও যান না। পক্ষান্তরে, সত্রী প্রভৃতি সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল—ইতস্ততঃ বেড়াইয়াই তাঁহারা রাজার কার্য্য উদ্ধার করেন।

শ্যামশাস্ত্রীর পাঠ—যে চাপ্যসম্বন্ধিনঃ ; গণপতিশাস্ত্রীর পাঠ—'যে চাপ্য সম্বন্ধিনঃ' ইত্যাদি। ইহার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত—আর যাহারা উঁহার (অর্থাৎ রাজার) সম্বন্ধী অর্থাৎ আত্মীয় বা কুটুম্ব। শ্যামশাস্ত্রী 'অসম্বন্ধী' বলিতে রাজার সহিত সম্বন্ধহীন এরূপ অর্থ বুঝেন নাই ; অসম্বন্ধী বলিতে বুঝিয়াছেন যাহার সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই—নিরাশ্রয়—orphan. দুইটি অর্থের যে কোনটিই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য ভর্ত্তব্য—অবশ্য পোষ্য। লক্ষণ—সামুদ্রিকাদি (গঃ শাঃ); science (SH)। অঙ্গবিদ্যা—বেদের ষড়ঙ্গ—শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ;

অথবা অঙ্গমর্দনে বা স্পর্শে শুভাশুভ-জ্ঞান (গঃ শাঃ) ; palmistry (SH)। জম্ভকবিদ্যা—বশীকরণ বা অন্তর্দ্ধান বিদ্যা (গঃ শাঃ); legerdemain (SH)—হাতসাফাই। মায়াগর্ভ—ইন্দ্রজাল (গঃ শাঃ); sorcery (SH) ; ভানুমতীর খেল, ভোজবাজি। আশ্রমধর্ম্ম—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-ভৈক্ষ—এই চতুরাশ্রমের বিষয়। গঃ শাঃ অর্থ করিয়াছেন —মম্বাদিধর্ম্মশাস্ত্র ; সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন বা না করুন—আশ্রম-চতুষ্টয়ের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে মম্বাদিশাস্ত্রে যেখানে যাহা উক্ত হইয়াছে সেই সকল অংশ। নিমিত্ত—শকুনবিদ্যা—পূর্ণকুম্ভ-দর্শনাদি শুভাশুভ-নিমিত্ত ; omens (SH)। অন্তরচক্র—পক্ষি-পশু প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞাপিত শুভাশুভ —পক্ষিশাস্ত্র (গঃ শাঃ)। সংসর্গবিদ্যা—গণপতি শাস্ত্রীর মতে ইহা অধ্যয়ন ক্রিয়ার (অধীয়ানাঃ) কর্ম্ম ; ইহার অর্থ—কামশাস্ত্র ও তদঙ্গভূত গীত-নৃত্যাদি শাস্ত্র ; পক্ষান্তরে শ্যামশাস্ত্রী ইহাকে 'সত্রিণঃ' পদের বিশেষণ ধরিয়াছেন ; অর্থ—সামাজিক সংসর্গ-দ্বারা শিক্ষাকারী সত্রী। শ্যামশাস্ত্রী 'সত্রী' পদের অনুবাদ করিয়াছেন—'classmate spies' লক্ষণ ; হইতে বুঝা যায় সত্রিগণ শিক্ষার্থী শ্রেণীর চর।

মূল :—জনপদে যে সকল শূর আত্মত্যাগপূর্ব্বক হস্তী কিংবা ব্যালের (শ্বাপদের) সহিত দ্রব্যহেতু যুদ্ধ করেন, তাহারাই তীক্ষ্ণ।

সঙ্কেত :—শূর…বীর, brave desperadoes (SH) ; ইহা তাৎপর্য্য বটে, তবে অনুবাদে desperadoes শব্দটি বন্ধনীর মধ্যে দিলে ভাল হইত। ত্যক্তাত্মানঃ—এস্থলে আত্মপদের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদি ; শরীর তুচ্ছ করিয়া—প্রাণের মমতা না রাখিয়া। ব্যাল—শ্বাপদ, ব্যাঘ্রাদি। তীক্ষ্ণ—শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—fiery spies or firebrands.

মূল :—যাহারা বন্ধুগণের প্রতি (ও) নিঃস্নেহ, ক্রূর ও অলস, তাহারাই রসদ।

সঙ্কেত :—বন্ধু—(১) অত্যাগঃসহনো বন্ধুঃ—যিনি বিশেষ অপরাধও সহ্য করেন—তিনিই বন্ধু ; আর (২) পারিভাষিক বন্ধু—মামাত ভাই, মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—those who have no trace of filial affection left in them ; those that are devoid of all affection towards their friends (or relations)—বলা উচিত। ক্রূর—আততায়ী (গঃ শাঃ); cruel (SH)—crooked. অলস—অনুৎসাহ (গঃ শাঃ) ; indolent (SH). রসদ—'রস' শব্দের অর্থ বিষ—এই শ্রেণীর চর বিষদানেও অপরাঙ্মুখ।

মূল :—পরিব্রাজিকা (হইতেছেন) বৃত্তিকামা দরিদ্রা বিধবা প্রগল্‌ভা ব্রাহ্মণী—অন্তঃপুরে কৃতসৎকারা (পরিব্রাজিকা) মহামাত্র-গৃহসমূহে গমন করিবেন।

সঙ্কেত :—পরিব্রাজিকা আর ভিক্ষুকী একই। বৃত্তিকামা—ভোগার্থিনী (গঃ শাঃ) ; জীবিকার্জ্জনে অভিলাষিণী ; desirous to earn her livelihood (SH). প্রগল্‌ভা—very clever (SH) forward বলাই ভাল। মহামাত্রগণের গৃহে সৎকারলাভের আশা পুনঃ পুনঃ গমন করিবেন।

মূল :—ইঁহার দ্বারা মুণ্ডিত-মস্তকবিশিষ্টা (নারীগণ) ও বৃষলীগণও ব্যাখ্যাত হইলেন।

সঙ্কেত :—মুণ্ডাঃ—শাক্যভিক্ষুকীগণ (গঃ শাঃ)। বৃষলী—শূদ্রা পরিব্রাজিকা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, মুণ্ডা ও বৃষলী পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য —ইহাই তাৎপর্য্য।

মূল :—এইগুলি সঞ্চার।

সঙ্কেত :—এই চারি শ্রেণীর চরের নাম 'সঞ্চার' অর্থাৎ—যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, যাযাবর। পক্ষান্তরে,কাপটিকাদি পঞ্চশ্রেণীর চরের নাম—'সংস্থা'। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ—wandering spies.

মূল :—রাজা নিজ রাষ্ট্রে বিশ্বাস্য-দেশ-বেশ-শিল্প-ভাষা-বংশ-নির্দ্দেশবিশিষ্ট তাহাদিগকে (সঞ্চারবর্গকে) ভক্তি ও সামর্থ্যযোগানুসারে মন্ত্রি-পুরোহিত-সেনাপতি-যুবরাজ-দৌবারিক-অন্তর্বংশিক-প্রশাস্তৃ-সমাহর্ত্তৃ-সন্নিধাতৃ-প্রদেষ্টৃ-নায়ক-পৌর-ব্যাবহারিক-কার্ম্মান্তিক-মন্ত্রিপরিষদ্-অধ্যক্ষ-দণ্ডপাল-দুর্গপাল-অন্তপাল-আটবিক (প্রভৃতির নিকট) পাঠাইয়া দিবেন।

সঙ্কেত :—স্ববিষয়ে (মূল)—'বিষয়' অর্থে রাজ্য, জনপদ ইত্যাদি। রাজা নিজ রাষ্ট্রমধ্যে সঞ্চারগণকে প্রচারিত করিবেন অর্থাৎ নানা বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন। কি নিমিত্ত তাহাদিগের নিয়োগ তাহা বলা যাইতেছে। উদ্দেশ্য—মন্ত্রি-পুরোহিতাদির শুদ্ধি-জ্ঞান। মন্ত্রী প্রভৃতি বিশ্বাসী ও সচ্চরিত্র কি না—ইহা বুঝিবার জন্য সঞ্চার-প্রয়োগের প্রয়োজন। ভক্তি ও সামর্থ্যযোগ অনুসারে—ভক্তি সেব্যগতা আর সামর্থ্য সেবকগত। অর্থাৎ —সেব্য মন্ত্রী প্রভৃতির মধ্যে যিনি দেবভক্ত, তাঁহার নিকট দেবভক্ত-বেশধারী চর পাঠান উচিত ; আবার চরগণও তথায় যাইয়া নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ছত্রধারণাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন—গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যার ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ—ইঁহারা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। দৌবারিক—দরোয়ান, প্রতিহারী (গঃ শাঃ)। অন্তর্বংশিক—অন্তঃপুরাধিকৃত—কঞ্চুকিস্থানীয়। প্রশাস্তা—স্কন্ধাবার-সংস্থাপয়িতা (গঃ শাঃ) ; magistrate (SH)। সমাহর্ত্তা—রাজার নিমিত্ত অর্থাহরণকারী ; Collector-general (SH)। সন্নিধাতা—ভাণ্ডাগারাধিকারী (গঃ শাঃ) ; Chamberlain (SH) ; Chancellor of the exchequer বলিলে কিরূপ হয় ? প্রদেষ্টা —কণ্টকশোধনের কর্ত্তা (গঃ শাঃ) ; Commissioner (SH). নায়ক—এক সহস্র—দ্বিসহস্র ইত্যাদি পদাতিকগণের নেতা (গঃ শাঃ)—মোগল আমলে পাঁচহাজারী ইত্যাদি মনসবদারগণের তুল্য ; পক্ষান্তরে শ্যামশাস্ত্রী ইহার ইংরাজী করিয়াছেন—city constable. গণপতি

শাস্ত্রীর ব্যাখ্যায় 'পৌরব্যবহারিক' এক পদ—পুরমুখ্য অথবা পুরপ্রাড়্-বিবাক। শ্যামশাস্ত্রীর মতে পৌর পৃথক্ পদ—পুরশাসনকর্ত্তা, officer-in-charge of the city; আর ব্যবহারিক—ব্যবসার অধ্যক্ষ—superintendent of transactions. কার্ম্মান্তিক—আকরাদি কর্ম্মে অধিকারী (গঃ শাঃ); superintendent of manufactories (SH)। গণপতি শাস্ত্রীর মতে—'মন্ত্রিপরিষদাধ্যক্ষ' এক পদ—মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষ অথবা দ্বাদশমণ্ডলাধিকার-নেতা; কিন্তু শ্যামশাস্ত্রীর মতে মন্ত্রি-পরিষৎ ও অধ্যক্ষ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পদ; 'অধ্যক্ষ' বলিতে বুঝাইতেছে—বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ। দণ্ডপাল—সৈন্য-সেনামুখাদির নেতা (গঃ শাঃ); commissary-general (SH). দুর্গপাল—প্রাকারাদি-রক্ষী (গঃ শাঃ); officer-in-charge of fortifications (SH)। অন্তপাল—রাজ্যসীমারক্ষী (গঃ শাঃ), সীমান্তরক্ষক; officer-in-charge of boundaries (SH)। আটবিক—আটবী-রাজ্যাধিপতি (গঃ পাঃ); অথবা বনভূমি-রক্ষক; officer-in-charge of wild tracts (SH).

মূল :—তাঁহাদিগের বাহ্য আচরণ ছত্র-ভৃঙ্গার-ব্যজন-পাদুকা-আসন-যান-বাহন-গ্রাহী তীক্ষ্ণগণ নির্ণয় করিবে।

সঙ্কেত :—তাঁহাদিগের—মন্ত্রি-পুরোহিতাদির। চার (মূল) আচরণ। বাহ্যং চারং বিদ্যুঃ (মূল)—বাহ্য আচরণ জানিবে—shall espy the public character (SH)—বাহিরে ইঁহারা কিরূপ আচরণ করেন, ছত্রাদি-গ্রাহক তীক্ষ্ণ চরগণ তাহা জানিবে। ছত্র—ছাতা। ভৃঙ্গার—জলপাত্রবিশেষ, গাড়ু; vase (SH)—ইহা ভুল। ব্যজন—পাখা, চামর ইত্যাদি। পাদুকা—জুতা, খড়ম ইত্যাদি। আসন—সিংহাসনাদি, বসিবার কাষ্ঠাসনাদি। যান—গোযান, অশ্বযান, শিবিকাদি। বাহন—অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি, conveyance (SH); vehicle বলা ভাল।

মূল :—উহা সত্রিগণ সংস্থাসমূহে অর্পণ করিবে।

সঙ্কেত :—উহা—তীক্ষ্ণ-শ্রেণীর চরগণ মন্ত্রিপুরোহিতাদির যে বাহ্য আচরণ ছত্রাদি-বহনকালে জানিতে পারিবেন—সেই বাহ্য আচরণ। সংস্থাসমূহ—পঞ্চ সংস্থা—কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতি, বৈদেহক, তাপস—পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত।

ব্যাপারটি এইরূপ :—তীক্ষ্ণ-শ্রেণীর চরগণ ছত্রাদি-বহন-ব্যপদেশে মন্ত্রি-পুরোহিতাদির বাহ্য আচরণ জানিয়া সত্রিগণের নিকট বলিবে—সত্রিগণও ভ্রমণ-ব্যপদেশে তীক্ষ্ণগণের নিকট হইতে উক্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কাপটিকাদি সংস্থার নিকট উহা জানাইবে। তীক্ষ্ণগণ স্বয়ং সংস্থাকে সংবাদ জানাইবার সুযোগ পায় না—কারণ তাহাদিগকে বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর ন্যায় সর্ব্বদা মন্ত্রি-পুরোহিতাদির সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হয়—সংস্থাদিগের নিবাসে যাওয়া তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, সত্রিগণ প্রায় ভবঘুরের মত—সামুদ্রিক-ভোজবাজি প্রভৃতি শিখিয়া উহার সাহায্যে জীবিকার্জ্জন-ব্যপদেশে তাহারা সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়—অবাধে সকল স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীক্ষ্ণগণের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংস্থাকে উহা জানাইয়া দেওয়া তাহাদিগের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। (ক্রমশঃ)

আসবে

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

—ঠাকুরপো, ঠাকুরপো শিগ্‌গির দেখে যাও—

বৌদির চীৎকারে নীচে নেমে আসি।

জানলার ধারে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি বলেন—দে'খ, ওই দে'খ—ঠিক আমার মলয়ের মত না? একেবারে অবিকল—ডাকো—ওকে তুমি ডাকো ঠাকুরপো—

আশ্চর্য! সত্যি এমন আশ্চর্য মিল দেখা যায় না। স্কুল ফেরৎ ছেলের দলে খাকী প্যাণ্ট্ পরা ওই ছেলেটী আমার ভাইপো মলয়ের মত দেখতে। ষোলো আনা মিল না হ'লেও বারো আনা মিল।

বৌদির অনুরোধে তাকে ডেকে নিয়ে এলাম অনেক কষ্টে রাজী করে। এসে ভীরু হরিণের মত তাকায় আর বলে, আমি বাড়ী যাব, আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

বৌদি কাছে টেনে নেন, আদর করে বলেন, ভয় কি খোকা—থাক না একটু আমার কাছে।

ছেলেটী কি ভেবে চুপ করে থাকে, আদর নেয়। একটী রেকাবীতে খাবার সাজিয়ে বৌদি ছেলেটীকে খেতে দেন। ছেলেটী খায়।

—মলয়, তুমি আমার মলয়,—বৌদি বলেন।

—বারে, আমি মলয় হব কেন, আমি তো অমর,—ছেলেটী প্রতিবাদ করে বলে।

গভীর আগ্রহে বৌদি আবার বলে ওঠেন—না তুমি মলয়, আমি তোমায় মলয় বলে ডাকবো কেমন ?

চোখে জল দেখে অমর অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকে, তারপর ঘাড় নেড়ে বলে,—আচ্ছা।

খাবারে আর আদরে সে খুশী হয়, তাই যাবার সময় বলে যায়,—আবার আসবো !

সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

যেদিন আমাদের ফাঁকী দিয়ে মলয় চিরদিনের জন্যে চলে যায়।

দুপুর বেলা—দাদা তখন অফিসে। পাড়ার লোক ডেকে তাকে নিয়ে যাই। বৌদি একা থাকেন।

শ্মশান থেকে ফিরি সন্ধ্যার পর। দেখি দাদা শুয়ে আছেন, মাঝে মাঝে এক একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক নিঙড়ে বার হয়ে আসছে। আর বৌদি মলয়ের খেলনাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে তার মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। চোখে তাঁর জল নেই—মুখে নাই হাহুতাশ—অচল অটল মূর্ত্তি, যেন বেদনার প্রতিচ্ছবি। দৃষ্টি তাঁর খেলনাগুলির প্রতি স্থির অচঞ্চল। আমার মনে হল এর চেয়ে কাঁদলে যেন ভাল হ'তো। অনেক ডাকে সাড়া দিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—আবার আসবে !

আবার এল।

মলয় তাহলে ভুলে যায় নি আমাদের। হাসি আনন্দে সবার মন ভ'রে উঠলো। সমস্ত বাড়ীখানি শিশুর কলকণ্ঠে মুখর হ'লো।

দাদা খেলনা কিনে আনেন—নিত্য নূতন খেলনা।

অমর রোজ আসে স্কুল থেকে সোজা আমাদের বাড়ী। অনেকক্ষণ থাকে, খেলা করে, পড়ে, তারপর খাওয়া দাওয়া হ'লে রাত্রে তাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

তার বাড়ীর লোকেরা সব শুনেছেন, তাই কিছু বলেন না। অত্যন্ত ভাল লোক তাঁরা।

একদিনের ঘটনা···

অমর এসেছে; এসেই তার নজর পড়লো মলয়ের ফটোটার দিকে—দেয়ালে সেটা টাঙানো ছিল।

—দাও, দাও পেড়ে দাও,—আকুল কণ্ঠে বায়না ধরলো সে।

ওকি দেওয়া যায়। পড়ে হয় তো ভেঙ্গে যেতে পারে।

কোনও কথা সে শোনে না, বলে,—এক্ষুণি পেড়ে দাও, ওতো আমার ছবি।

বৌদি আর স্থির থাকতে পারেন না, তাই পেড়ে দেন' তার হাতে। ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে সে কত আদর করে—চুমু খায় ছবির মুখে।

বৌদি হাসেন—তৃপ্তির হাসি—তারপর চোখ তাঁর ভ'রে যায় জলে।

একদিন হঠাৎ সে এল না, শুনলাম তার জ্বর হয়েছে।

বৌদি বললেন,—আমায় নিয়ে চল ঠাকুরপো, আমি এখনি যাব।···তাঁকে নিয়ে গেলাম।

সে এল না, তাই বৌদিই সেখানে থেকে যান।

দুই মা সেবা করে—দুজনেরই বুকের ধন।

তবু তাকে রাখা গেল না।

ধরণীর আলো, ছায়া, মাটী,—জননীর স্নেহ, মায়া, প্রীতি সব ছেড়ে সে চলে গেল।

প্রতিদিন ঘড়ীতে চারটে বাজে···বৌদি দাঁড়ান জানলার ধারে।···

স্কুল ফেরত ছেলের দল বাড়ী যায়।···

অধীর উৎসুকে ভরা চোখ দুটী মেলে বৌদি চেয়ে থাকেন তাদের পানে। কি এক অজ্ঞাত আশায় তাঁর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।···হয়ত—হয়ত তেমনি করেই আবার সে আসবে···



সূর্য্য আর উঠবে না

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইলা এসে তাড়া দিয়ে যায়—রাত যে একটা বাজে, রাখো তোমার গবেষণা, শরীরের কি দশা হয়েছে দেখো দিকিন্, আমাকে না কাঁদিয়ে বুঝি তোমার সুখ হয় না।

ছিঃ ইলা, তুমি না বিজ্ঞানের ছাত্রী—

বিরূপাক্ষ বৈজ্ঞানিক, পাঁচতলা বাড়ীর সবার উপর ফ্ল্যাটে সে আর ইলা নীড় বেঁধেছে আজ তিনবছর। সারাজীবনের রক্তজলকরা অর্থে স্ত্রীর গহনা ও পৈতৃক বাড়ী বেচা টাকায় গড়ে তুলেছে নিজের মনের মত ছোট্ট একটি বীক্ষণাগার, কিনেছে বড় টেলিস্কোপ, সারারাত ধরে সে চেয়ে থাকে নির্ণিমেষ নয়নে অগাধ রহস্যভরা সীমাহীন নীল আকাশের পানে নীহারিকা ঘেরা তারার দিকে, ভক্ত যেমন করে আকুল হয়ে তাকায় তার উপাস্যের দিকে, প্রিয়া যেমন করে ব্যাকুল হয়ে চায় প্রিয়তমের দিকে।

খাতা পেন্সিল নিয়ে বিরূপাক্ষ টুকে যাচ্ছে নিজের গবেষণার ফল, তারা সকলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাপ, ঘনত্ব ও চাপ কতখানি অণু পরমাণুর সঙ্ঘর্ষের ফলে আণবিক শক্তির কতখানি মুক্ত হয়ে ব্যোমরশ্মিরূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, হিলিয়ম পরমাণু গঠনের জন্য কতটা হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রয়োজন—কতটা ইলেক্ট্রন্ কতটা বিপরীত গুণ বিশিষ্ট পজিট্রনের সঙ্গ খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ সে বলে—ইলা জানো, আমার গণনা যদি সত্যি হয়, তবে এমনদিন আসবে, হয়ত কালই, যেদিন এই পৃথিবীতে সূর্য্য আর উঠবেনা, অতি প্রবল আণবিক আলোড়নের ফলে সবিতা হবেন অদৃশ্য এক্সিস্ থেকে কেন্দ্রচ্যুত। কণ্ঠস্বর তার সুগম্ভীর হয়ে ওঠে, আবেগময় জড়তা মাখানো স্বরে বলে—আমি দেখতে পাচ্ছি, সেদিন আসছে, এগিয়ে আসছে মহাকালের করাল ছায়া, সব কালো নিকষ কালো, সব অন্ধকার, তাপমৃত্যু নয়, হঠাৎ একদিন সকালে উঠে লোকে দেখবে আকাশে ওঠেনি সূর্য্য, সপ্তাশ্ববাহিত অরুণের রথচিহ্ন তিরোহিত, মুছে গেছে আলোর রেখা। আস্তে আস্তে থেমে আসবে জীবজগতের জীবন স্পন্দন সুষুপ্তির অন্তরালে।

ইলা বলে—কত লক্ষ কোটী বছর পরে তা হবে তা নিয়ে আজ আর তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, তুমি ঘুমুবে চল। বিরূপাক্ষ চুপ করে যায়, নিজের মনে বিড়বিড় করে চার্ট ও গ্রাফের দিকে পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকে, বড় বড় ফর্মুলা কসে। ইলা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মনে পড়ে তার কুমারী জীবনের বহু টুকরো টুকরো স্মৃতিভরা ক্ষণগুলির সমগ্র স্বপ্ন। এম্-এস্‌সি পাশ করে একদিন সে এসে দাঁড়িয়েছিল, দুরু দুরু বক্ষে বিরূপাক্ষের ল্যাবোরেটারীর সামনে। বিরূপাক্ষ কাজ করে যাচ্ছে তন্ময় হয়ে—আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কে—কি দরকার!

ইলা এগিয়ে দেয় স্যায়ান্স এসোসিয়েশানের চিঠিখানি।

ওঃ আপনি এখানে কাজ করবেন, বেশ ত—

একঘণ্টা চুপচাপ থাকার পর আবার চমক্ ভাঙে—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, কাজ আরম্ভ করে দিন্। সাইক্লোট্রন্ জানেন?

ধীরে ধীরে ইলা এই অদ্ভুত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। দেখে সেইখানেই পাশের এক ছোটঘরে তাঁর আস্তানা, দেখা যায় খাটের উপর ছেঁড়া চাদর, আনলায় মলিন জামা, বেয়ারাটাই দেখা শোনা করে। খাবার আসে কাছের রেষ্টুরাণ্ট হতে, অর্দ্ধেক জিনিসই তার অখাদ্য। রিসার্চের চেয়ে তার ভাল লাগে রিসার্চকর্ত্তাকে। মনে হয় এই আপনভোলা বৈরাগী মানুষটির বুঝি পরিচর্য্যা হচ্ছে না, দরদ দিয়ে সেবা করবার কেউ নেই। জেগে ওঠে তার মনে নতুন ছন্দ, একটা অস্পষ্ট অস্ফুট ইঙ্গিত। গড়ে তোলে একটু আরামের আয়োজন, এপাশে একটা ষ্টোভ্ দুটো কাপ, সস্‌প্যান্ চা কফি ডিম, ওপাশে একটা ছোট্ট টেবিল ফ্যান্, গরমের দিনে যখন এক্সপেরিমেণ্টের সময় মাথার উপরকার ফ্যান্ বন্ধ রাখতে হয়, তখন যাতে হাওয়াটা ঠিক্ গায়ে লাগে তার ব্যবস্থা। বই খাতা নোটসগুলি পরিপাটিরূপে গোছানো, ইনডেক্স করা। বিরূপাক্ষ যখন যা চায়, তা হাতের কাছেই পায়, হাতড়াতে হয় না। নজরে পড়ে—তার বিছানার চাদর সাদা ধবধবে,

প্যাণ্টের নিখুঁত ভাঁজ, ছোট্ট টিপয়ে সযত্নে বোনা রঙীণ্ টেবিল ক্লথ, ফুলদানীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, কাঁচের পাত্রে ভেজা বেলফুলের হাল্কা গন্ধ। মাসের পর মাস যায়, চলে বিজ্ঞান তপস্বীর নিভৃত সাধনা, তপস্বিনীর নীরব সেবা।

হঠাৎ একদিন সে ডাকে—ইলা, চা খেয়েছি আজ? বেলা তখন তিনটে বেজে গেছে, মনে পড়ে সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি ত। কেউ সাড়া দেয় না, সে ধমকে ওঠে বেয়ারার উপর—দিদিমণি কোথায়? সে চমকে উঠে বলে, আজ ত দিদিমণি আসেননি। ভিতরে ভিতরে গ্লেসিয়ার যে গলতে সুরু করেছে তার খবর সে নিজেই জানে না। বেয়ারাকে চা আনতে বলে। কিন্তু বাইরের চা লাগে বিস্বাদ···ফেলে দিয়ে সে উঠে পড়ে।

বেয়ারা আশ্চর্য্য হয়ে যায়—সাহেব চলল কোথায়?

আধঘণ্টা ঘেরাঘুরির পর মনে পড়ে ইলার ঠিকানা জানা নেই ত, ফিরে এসে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে—এই দিদিমণির বাড়ী জানিস্? বেয়ারা তাকে নিয়ে যায় সার্কুলার রোডের ছোট একটি ফ্ল্যাটে। মা ও মেয়ে নিভৃতে বাস করেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, অন্তরের মহিমা নিয়ে। শান্ত, শিষ্ট, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। খবর পান ইলার আজ চার পাঁচদিন ধরেই জ্বর হচ্চে। অথচ সে রোজ বিরূপাক্ষের কাছে যায়, ল্যাবোরেটারীতে কাজ করে। আজও সে বেরুচ্ছিল, মাথাঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বিরূপাক্ষ চুপ করে গিয়ে দাঁড়ান্ তার শয্যার পাশে, জ্বরতপ্ত কপালে রাখেন হাত—চোখ চাইল ইলা, শশব্যস্ত হয়ে বললে—আপনি? আপনার খাওয়া হয়েছে? হয়নি শুনে মাকে বলে—শীগ্‌গির, দুখানা লুচি এক কাপ চা নিয়ে এসো। শতকাজ ফেলে সারাসন্ধ্যা বসে থাকেন বিরূপাক্ষ তার রোগ শিয়রে। তার রুটিন্ যায় উল্টে। পরের দিনও যথাসময়ে সে গিয়ে দাঁড়ালো ইলার রোগশয্যার পাশে। তারপর এই যাওয়া আসা তার নিত্যকার হয়ে উঠলো—যতদিন না ইলা সেরে ওঠে।

কলেজে ছেলেরা লক্ষ্য করে তার কণ্ঠস্বরে এক কমনীয়তা, চোখের দীপ্তিতে মাধুর্য্য, চলনের ভঙ্গী দৃপ্ত কিন্তু নমনীয়। 'হোল কি' গবেষণা হয় কমনরুমে, হাসে ছাত্রীর দল। একদিন সবাই শুনলে অপত্নীক বিরূপাক্ষ কনফার্মড ব্যাচিলার বেশী বয়সে বিয়ে করেছেন। নমিতা সেন খবরটা ফাঁস করে দিলে। বললে, জানিস এ বিয়ে নয় বিয়ের চেয়ে বড়—যুগলে সাধনা হবে। তারপর বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে—প্যাক্ট হয়েছে যোগাভ্যাসে। ইলা বসে আছে—কখন তপস্যা ভাঙবে।

থর থর করে কাঁপতে থাকেন বিরূপাক্ষ উত্তেজনায়—ইলা, ইলা ঐ দেখো, তিন লক্ষ বছর আগে যে নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হয়েছে, আকাশপথে তার জ্বলন্ত রেখা, কোথায় লাগে তোমাদের সূর্য্যি ঠাকুরের মাটির পিদিমের আলো, তিন হাজার কোটিগুণ বেশী তেজ, প্রণাম করো সেই তেজস্কর বিরাট্‌কে। ইলা ভয় পেয়ে যায় তার অধীর উন্মত্ত আবেগ দেখে, বলে—ওগুলো মায়া তারা, কোটি সহস্র বছর আগেকার প্রতিবিম্ব, কেন এই মায়ার পিছনে ঘুরছ? সে কেঁদে ফেলে—আমি তোমায় নিয়ে বাঁচতে চাই, এইসব আজগুবী রাখো, চল শোবে চল। বিরূপাক্ষের মাথা দিয়ে বেরুচ্চে আগুন, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। ইজি চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে তার লম্বা চুলের ভিতর হাত বুলিয়ে দেয়, তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। বহুক্ষণ পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল, ছোট্ট ছেলেটির মত। তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে ভাবনার আর শেষ থাকে না ইলার। ডাক্তার কত ভয় দেখিয়ে গেছেন।

ঘড়িতে এর্লাম দেওয়া থাকে, বিরূপাক্ষের ঘুম ভাঙে নিক্তির কাঁটা হিসাবে। জেগে উঠে সে তাকায় এদিক্ ওদিক্। মাথার ভিতরটা যেন খালি লাগছে। 'ইলা' বলে সে চীৎকার করে ওঠে—তোমায় বলিনি আমি যে সূর্য্য আর উঠবে না, দেখো আমার কথা ঠিক্ কিনা—সব কালো, সব অন্ধকার।

তার বিস্ফারিত চোখ দুটি অর্থহীন দৃষ্টিহীন।

ইলা গুমরে কেঁদে ওঠে।

কাঁদো কেন আমার গণনা সত্যি, কেঁদো না, পৃথিবীত একদিন যেতই—আজ না হয় কাল!

ইলা বলে—না না···রুদ্ধ আবেগে কথা বেরোয় না।

রাঁচির মেণ্টাল হসপিটালে এক রোগীকে দেখা যায়, রোজ বিকালে বসে থাকে মাঠের কচি ঘাসের সবুজের ওপর। কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কারুর সঙ্গে বাদ-বিতণ্ডা নেই, কোন গোলমাল নেই—শান্ত সৌম্য শুধু মাথা উঁচু করে চেয়ে থাকে—ইলা, বলিনি তোমায়—সূর্য্য আর উঠবে না।

একটি ক্ষীণকায়া মহিলা এসে দাঁড়ায় তার পাশে—ব্যথাতুর দৃষ্টিতে উদ্গত অশ্রু গোপন করে।

প্লাসটিক্‌স

শ্রীসুবর্ণকমল রায়

আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্লাসটিকের নাম প্রচলিত নয়। এই রসায়নিক পদার্থটার ভবিষ্যৎ এত উজ্জ্বল যে সকলেরই প্লাসটিক সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হওয়া উচিত।

প্লাসটিক বহুবিধ আছে। ইহারা সকলে মিলিয়া জৈব রসায়নের একটি প্রকাণ্ড অধ্যায় জুড়িয়া থাকে। ইহাদের ব্যবহারিক ক্ষমতা এত বিস্তার লাভ করিতেছে যে ভাবীযুগকে প্লাসটিক যুগ বলিলে ভুল হইবে না। ইহারা সকলেই রাসায়নিকের হাতের জিনিষ। কার্ব্বলিক, ফরম্যালডিহাইড (যথা ব্যাকেলাইট), ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড, ভিনাইল, ইত্যাদি বহুবিধ রাসায়নিক নাম উহাদের আছে। প্রস্তুতির জটিলতা বাদ দিয়া একমাত্র ব্যবহারিক তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। রাসায়নিকের দিক দিয়া ইহারা সকলেই আঠাজাতীয় পদার্থ। ইহাদ্বারা বহু অত্যাবশ্যক, নিত্যব্যবহার্য্য পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। আমরা ভারতবাসীও কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া ধন্য হইতেছি। বিদ্যুৎ ছিপি (Electric plug), সিগারেট ভস্ম পাত্র, চুলের কাঁটা, তামাকের নল, ইত্যাদি বহুবিধ প্লাসটিক আমাদের দেশে আসিয়াছে। মার্কিন রাসায়নিকগণ ইহাদ্বারা যাদুবিদ্যা খেলিতেছেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামে যেন নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। প্লাসটিক যে কি অপরূপ সম্পদ, যুদ্ধের পরে আমরা তাহা বিশদভাবে জানিতে পারিব।

যাদুকর রাসায়নিক তাহার রসায়নাগারে অণু পরমাণুর কি অপূর্ব্ব খেলাই খেলিতেছেন। নিত্য নূতন সম্পদ দান করাই যেন উঁহাদের একমাত্র ব্যবসা! এই সেদিন 'পলিথিন্‌' (polythene) নামে একটি প্লাসটিক রাসায়নাগারে জন্মলাভ করিয়াছে। এ জিনিষটা যুদ্ধের এত বড় সম্পত্তি যে বিস্তৃত প্রস্তুতপদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত মার্কিণ রাসায়নিক কাহাকেও জানিতে দেন নাই। ইহারা থার্মোপ্লাসটিক জাতীয় অর্থাৎ তাপদ্বারা ইহাদের নরম করা যায় এবং ইচ্ছা করিলে রবারের মত লম্বা করা যায়। এই থার্মোপ্লাসটিকগণ তাঁতিদের হাতে যাইয়া সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদাকারে মানুষের মনোরঞ্জন করিতেছে। যে কোন পর্য্যায়ের কাপড়, মোটা বা মসৃণ প্লাসটিক সূত্রে তৈয়ার হইতেছে। আবার তুলা বা পশম পরিচ্ছদ প্লাসটিক আবরণ পাইয়া নানাগুণে বিভূষিত হইতেছে। একজন আমেরিকান রাসায়নিক বলিয়াছেন, তিনি যুদ্ধের পরে এমন সুন্দর পশম পরিচ্ছদ তৈয়ার করিবেন যাহা কখনও ব্যবহারে সঙ্কুচিত হইবে না, অথচ জীবন পাইবে অনেক বেশী এবং ব্যবহার দ্বারা আসল পশম কি নকল তাহা টের পাইবার সাধ্য থাকিবে না। পলিথিন্‌ যদিও প্রচুর তৈয়ার হইতেছে, যুদ্ধের চাহিদার জন্য অসামরিক অধিবাসীদের এখনও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সবটাই যুদ্ধদৈত্য খাইয়া ফেলিতেছে। উঁহাদের রাসায়নিক গঠনভঙ্গি এমন সুন্দর যে বিদ্যুৎ অন্তরক (Insulator) হিসাবে ইহার খুব সুনাম। ইহা ১১০° ডিগ্রি তাপ সহ্য করিতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে কোন থার্মোপ্লাসটিকই ফুটন্ত জলের তাপ সহ্য করিতে পারে নাই। কাজেই জিনিষটা কতবড় সুবিধাদায়ক হইয়াছে সকলে তাহা বিবেচনা করিবেন। প্লাসটিকটার আর একটী গুণ, ইহা অম্ল, ক্ষার, সূর্য্যতাপ, তৈল বা পেট্রোলদ্বারা বিনষ্ট হয় না। ইহাতে রবারের সমস্ত গুণ আছে, অপগুণ নাই। ইহা অত্যন্ত মজবুদ্‌। এ প্লাসটিকের কোন পাত্র যে কোন আঘাত সহ্য করিতে পারে। ইহাকে নরম বা শক্ত করা রাসায়নিকের হাতের খেলা। যুদ্ধের চাহিদা শেষ হইলে উক্ত চমৎকার পদার্থটার দ্বারা কি কি বস্তু তৈয়ার হইবে সে সম্বন্ধে এখনই বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন দেখিতেছেন। রেডিও অন্তরক (Insulator), টেলিভিসন অন্তরক, হিসাবে ইহার স্থান হইবে সর্ব্বোপরি। পোষাক পরিচ্ছদের রাজ্যে ইহা রাজত্ব বিস্তার করিবে। পশম, কার্পাস ইহার সংস্পর্শে থাকিয়া নবশক্তি ও নবরূপ নিয়া আসরে নামিবে। শিল্পিগণ ইহা আরও নূতন নূতন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মেজের ইট্‌ (Tile), ধোওয়ার উপযুক্ত দেওয়াল কাগজ, হাতুড়ীর মাথা, টাইপরাইটারের চাবী, ষ্টিয়ারিং হুইল (Stearing Wheels) ইত্যাদি কয়েকটার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধের হাটে পলিথিন যেমন গুলজার করিয়া বসিয়াছে, পুরাতন প্লাসটিকগুলিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। উঁহাদের মধ্যে একটির দ্বারা ফাইটার প্লেন (Fighter plane) এর মধ্যে রকেট (Rocket) ছুঁড়িবার জন্য একপ্রকার পাত্র তৈয়ার করিয়া রাখা হয়। প্লাসটিকগুলি সাধারণতঃ খুব হালকা বলিয়া হাজার হাজার উড়োজাহাজের শরীরে ইহারা বর্ত্তমান। প্রাস (Projectile) ছুড়িবার ভীষণ আঘাত ইহারা বেশ সহ্য করিতে পারে।

বর্ত্তমানে কাষ্ঠখণ্ডের চরিত্র প্লাসটিকের দ্বারা বদলাইয়া যাইতেছে। প্লাসটিকলিপ্ত কাষ্ঠখণ্ডে শক্তি ও সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয়। শুনা যায় অতি নরম কাষ্ঠখণ্ডও প্লাসটিকের সংস্পর্শে আসিয়া অতীব কাঠিন্য পাইয়া থাকে। আবার ইচ্ছামত তাকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করা যায়। প্লাসটিক কাঠের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার চরিত্র ও আকৃতি এরূপ সৌন্দর্য্যময় করিয়া তোলে যে সাধারণ মানুষ ইহা কাষ্ঠখণ্ড কি অপর কোন অপরূপ পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে না। এরূপ কাঠের গুণের অবধি নাই। ইহা ফাটে না, ভাঙ্গে না, ফুলিয়া উঠে না, এমন কি বহু জীবাণু ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। প্লাসটিকের মহিমায় অপদার্থ কাণ্ডখণ্ডও পরমপদার্থে পরিণত হইয়াছে। আমাদের আসবাবপত্র এখন যে কোন কাষ্ঠখণ্ডে তৈয়ার করিব—প্লাসটিক দ্বারা

উহার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিব। কাঠের পাটাতন এখন হইতে ইষ্টক মেজে হইতে সহস্রগুণে মজবুত ও সুশ্রী হইবে।

সিলিকোন্স নামক অপর একটি প্লাসটিকেরও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। জৈব প্লাসটিকের সঙ্গে সিলিকণ্ যুক্ত হইয়া এজাতীয় প্লাসটিক তৈয়ার হইয়াছে। এদিকে বহুদিন পূর্ব্বেই দৃষ্টি দেওয়া ছিল, বর্ত্তমানে উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। এমন সুন্দর বিদ্যুৎ রোধক পদার্থ দুনিয়ায় আর প্রস্তুত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহা দ্বারা ইলেক্‌ট্রিক মটর তৈয়ার হয়। পূর্ব্বের একটি মটরের এক তৃতীয়াংশ আকার পাইয়াও ইহা সমপরিমাণ অশ্বশক্তি দান করিতে পারে।

প্লাসটিকসের গুণাবলী আর কত আলোচনা করা যায়। মৎস্য-শিকারের বংশদণ্ড প্লাসটিকের আবরণ পাইয়া বা যুক্ত হইয়া এরূপ মজবুদ হইয়াছে যে, জলে ভিজিয়া বা অপর কোন কারণে ইহা সহসা নষ্ট হয় না। মৎস্য-শিকারীদের এখন আনন্দের সীমা নাই। বর্ত্তমান রাসায়নিকগণ ইহাকে খাদ্য ও নানাভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। গল্‌ফ (Golf) খেলায় দণ্ড, বিলিয়ার্ড বল, শিকারীর যন্ত্রপাতি সবটাই প্লাসটিকের অবয়ব পাইতেছে। ধাতু পদার্থের টানাটানির জন্য ইহা যুদ্ধের বাজারে ধাতুদের স্থান জুড়িয়া বসিতেছে। বায়ুযান, জলযান ও অন্যান্য যান বাহনের শরীরে যেখানে ধাতু পদার্থ দরকার সেখানেই প্লাসটিক থাকিয়া জমকালো হইয়া বসিয়াছে। ইহাকে এমন শক্ত করা যায় যে ইস্পাত পর্য্যন্ত হার মানিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে প্লাসটিক রাজত্ব মাত্র আরম্ভ, ভবিষ্যতে ইহার প্রভুত্ব পৃথিবীর সর্ব্ব ব্যাপারে প্রকাশ পাইবে।

বাসক

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এস্‌সি ও কবিরাজ শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ভিষকরত্ন

আরও বেশী খাদ্য জন্মাও—এই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী স্বদেশী ঔষধ তরু জন্মাও এই প্রচারটাও চলিত হওয়া উচিত। এই দরিদ্র দেশের দরিদ্রদের জন্য সুলভ ঔষধ প্রাপ্তির ব্যবস্থা হউক।

বাসক একটি অতি উপকারী গাছ। উহাকে অতি সহজেই জন্মান যাইতে পারে। বর্ষা সম্মুখে আসিতেছে। কয়েক দিবস ব্যাপী বৃষ্টির সময় বাসকের কয়েকটি ডাল যে কোনও রকমে মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই বাসক গাছ জন্মিবে। একটু জায়গা পাইলে একটি বাসক গাছ এক বৎসরের মধ্যেই বেশ বড় হইয়া উঠিবে। উহা তখন একটা সমগ্র পল্লীর ঔষধ সরবরাহের কাজ করিতে পারিবে।

বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী-ক্ষয়ী-কাসী কিমর্থমবসীদতি ॥

অর্থাৎ বাসক যদি বিদ্যমান থাকে, জীবনের জন্য যদি আশা থাকে তবে রক্তপিত্ত রোগী, ক্ষয় রোগী ও কাস রোগী কেন অবসন্ন হয়?

ঐ মহামূল্য শ্লোকটি গরুড় পুরাণে আছে এবং পরে উহা বঙ্গ সেন, চক্রদত্ত, ভাবমিশ্র প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন কালের আয়ুর্ব্বেদীয় লেখকগণ নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন।

বাসকের পত্র, গাছের ছাল, মূলের ছাল বা সমগ্র সরু মূল ও পুষ্প ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। কাঁচা বাসক ছেঁচিয়া উহার রস ব্যবহার হয়। সিদ্ধ করিয়া উহার কাথ ব্যবহার হয়। বাসকের কাথের সহ সিদ্ধ ঘৃতও ব্যবহার হয়। বাসকের কাথ গুড়ের সহ পাক করিয়া উহার অবলেহও ব্যবহৃত হয়।

দরিদ্রদের জন্য যে ঔষধ দিতে হইবে উহার হাঙ্গামা কম হওয়া প্রয়োজন। শার্ঙ্গধর হইতে উদ্ধৃত এই প্রেস্‌ক্রিপসনটি (যোগ) বিশেষ উপযোগী।

বাসকঃ সরসঃ পেয়ো মধুনা রক্তপিত্তজিৎ।
জ্বর কাস ক্ষয় হরঃ কামলাপিত্তশ্লেষ্মহা।

বাসকের রস মধুর সহিত পান করিবে; উহা রক্তপিত্ত (শরীরের যে কোন স্থান—ফুসফুস, পাকযন্ত্র, গলা, অর্শ, নাসা, গর্ভাশয়—প্রভৃতি হইতে রক্তপাতকে আয়ুর্ব্বেদে রক্তপিত্ত বলে) জয় করে; জ্বর, কাস, ক্ষয়রোগ ও কামলারোগ নাশ করে এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা দমন করে। মধু অভাবে চিনি ও গুড় ব্যবহার করিলেও চলে।

এমন দরিদ্রও আছে যাহাদের পক্ষে স্বরস প্রস্তুত করিবার আয়োজন করাও দুরূহ। সেরূপ অবস্থায় নিম্ন মতের প্রয়োগটিতে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। একটি বাকস পাতা (রোগীর দেহের অনুপাতে বড়, মাঝারি বা ছোট) দুটি বেলপাতা, চারিটি গোলমরিচ এবং এক চিমটি লবণ (সৈন্ধব হইলে ভাল) রোগীকে চিবাইয়া খাইতে দেওয়া হয়। সর্দ্দি, কাশি ও গায়ের বেদনা সংযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপযোগী। প্রাতে একবার সেব্য। এই অতি সাধারণ ঔষধ রোগী প্রথম দিন অবজ্ঞার সহ সেবন করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন আগ্রহের সহ গ্রহণ করে।

যেখানে কাঁচা বাসক সংগ্রহ করা যায় না, সেখানে শার্ঙ্গধরের নিম্নলিখিত যোগটি চলিবে:—

রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্ত জ্বরস্তথা।
কেবলো বাসকঃ কাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ।

অর্থাৎ কেবল বাসকের কাথ মধুরসহ সেবিত হইলে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও শ্লেষ্মা এবং পিত্তসংযুক্ত জ্বরনাশ করে। দুই তোলা শুষ্ক দ্রব্য আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া শেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া একবারে বা দুইবারে সেব্য। ইহা পাচন প্রস্তুতের সাধারণ নিয়ম।

বাসকের পাতার চুরুট করিয়া সেবন করিলে হাঁপানি উপশম হয় (রাখাল দাস ঘোষ Materia Medica and Thera peutics)।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৫

কিছুদিন পরে—

শেষ পেপার পরীক্ষা দিয়া অপর্ণা ও অমল দারভাঙ্গার লিফ্‌টের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণাই প্রথম কথা কহিল—চল হাঁটতে হাঁটতেই যাই। তোমার কেমন হ'ল ?

—ভাল না, ভাল হওয়ার কথাও নয়। সেকেণ্ড ক্লাসের তলার দিকে কোনমতে নামটা থাক্‌তে পারে। কিন্তু সে দুর্ভাগ্যকে আমি নির্ব্বিচারেই গ্রহণ ক'রবো—তোমার ফার্ষ্ট ক্লাস থাক্‌বে ত ?

অপর্ণা একটু বিনয় সহকারে কহিল—একেবারে নিরাশ হইনি। তবে আশাও খুব বেশী নেই।

—যা হোক, তোমার পরীক্ষাটা যে খারাপ হয়নি এ সান্ত্বনা আমার থাক্‌বে।

কথা বলিতে বলিতে অপেক্ষাকৃত জনহীন স্থানে আসিয়া অপর্ণা কহিল—এখন কি বাড়ী যাবে ?

—হ্যাঁ, সেই মায়ের স্নেহাঞ্চল ছাড়া এখন আর কোন সান্ত্বনাই নেই।

—কবে যাবে ?

—তিন চার দিনের মাঝেই—একটু থামিয়া কহিল—আজই সম্ভবতঃ তোমার সঙ্গে শেষ দেখা।

অপর্ণা অমলের মুখের উপর সোজা দৃষ্টি রাখিয়া কহিল—না। পরশু আমাদের ওখানে যাবে, সন্ধ্যার পরে তারপর বাড়ী যাবে।

—এখনও কি যাবার প্রয়োজন আছে ?

—আছে, প্রয়োজন শেষ আমি এখনও ক'রতে পারিনি। চলো, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

—চল, আপত্তির কোন কারণই নেই।

দু'জনে চা খাইয়া আবার ময়দানের সেই গাছটির ছায়ায় গিয়া বসিল—সেখানে একদিন তাহারা ঝরাপাতার মত জীবনের বৃন্ত হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাতাসের মাঝে ভাসিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। অমল আজ যেন কেন একটা অনুদার ঔদাস্য বোধ করিতেছিল—যেন তাহার যাহা কিছু বলিবার যাহা কিছু করিবার সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ অপর্ণাই তাহার পদপ্রান্তে শরাহত পক্ষী-শাবকের মত রক্তাক্ত দেহে সাহায্যের আবেদন করিবে।

অপর্ণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—তুমি সেদিন মাকে যা বলে এসেছ সবই শুনেছি। মার মত কি তা তোমার বুঝ্‌তে বাকি নেই, কিন্তু আমি আজ কি ক'রবো ?

—আমার কাছে যুক্তি চাও ? কি করা উচিত ?

—হ্যাঁ, আমি আজ তোমার কাছে কিছুই বল্‌তে বাকি রাখবো না। যা ব'ল্‌তে চাই তা তুমি জানো। আমাকে যদি আজ···বাপ-মা সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাস্‌তে হবে—

একটা অপ্রকাশ্য বেদনায় অপর্ণার চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল, সে ভাষা হারাইয়া চুপ করিল। অমল ধীরে মধুর কণ্ঠে কহিল—দেখ অপর্ণা, দারিদ্র্য কি তা তুমি জানো না, সে যে কি দুর্ব্বিসহ লাঞ্ছনা তাও তুমি জানো না। তোমাদের ওখানেই, তোমার মার সাম্‌নে এই দারিদ্র্যের ক্ষত যেন আমাকে কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্তের মত লজ্জায় ম্রিয়মান ক'রে দিয়েছে। তুমি উপন্যাসে হয়ত পড়েছ কিন্তু সত্যিকার অভিজ্ঞতা তোমার নেই। জগতের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে গ্রহণ করবার মত বুকের বল যদি তোমার থাকে—এবং সেই ভুলের জন্য জীবনে কখনও অনুশোচনা ক'রতে হবে না এমনি শক্তি যদি থাকে—নেমে এস, দু'জনে ভাসি—আর যদি তা না থাকে তবে ফিরে যাও। মনকে ব্যসনের প্রলেপে সুরভিত ক'রে রেখো—সব ভুলে যাবে—

আজকার এই কথা অমলের অভিমানপ্রসূত, না তিরস্কার, না সত্য কথা—তাহা অপর্ণা বুঝিতে পারিল না, অসহায় দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

অমল পুনরায় কহিল—তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে যদি আমাকে ব'ল্‌তে হয় তবে তোমার মা-বাবার সঙ্গে আমাকে একমত হ'তে হয়। তোমার মাঝে সে শক্তি নেই—যে শক্তি

থাকলে জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষে সংগ্রাম করিতে পারে।

অপর্ণা দ্বিধাতুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তুমি সুখী হবে না?

—আমার সুখদুঃখের প্রশ্ন ওঠে না, ব্যাপারটা তোমার। আমাকে সুখী ক'রতে তোমাকে ঐশ্বর্য্য ছেড়ে ধূলায় নেমে আসতে বলা যায় না। আমার জন্যে সে ত্যাগ ক'রতে পারো কিনা সে তোমার বিচার্য্য, আমার নয়।

অপর্ণা আর্দ্র চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—তবে কি এইখানেই শেষ?

—না, শেষ এখানে হবে না। সারাজীবন অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী র'য়ে আমরা আজকার হারানো মণিকে খুঁজবো—কিন্তু কখনই পাবো না—সেই না পাওয়ার অতৃপ্তি আমাদের গৃহকে, মনকে, কর্ম্মকে আচ্ছন্ন করে আমাদের জীবনকে শুষ্ক কঠোর ক'রে রাখবে। আমার বিশ্বাস আজ যদি তুমি সমস্ত ছেড়ে আমার পিছু পিছু নেমে এসো তা হ'লেও সেই অতৃপ্তি সমানে চ'ল্‌বে। মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে পায় না কখনও, অন্তত এই পৃথিবীর ধূলায়—কাজেই তুমি থাকো। আমার মানসী-প্রিয়ার স্থান আমাকে পূর্ণ ক'রতে হবে অন্য উপায়ে। তুমি রবে আমার জীবনে না-পাওয়া, তাই সমগ্র বিশ্বের মাঝে তোমাকে পাবো একান্ত আপনার ক'রে, একান্ত প্রিয় বলে—তোমার জীবন তুমি আনন্দে, ব্যসনে পূর্ণ ক'রে ধন্য হও—আমি নিষ্ফলের দলে রবো তাতে আমার অভিমান নেই, দুঃখ নেই; আজ যেন আমি সব কিছুরই অতীত।

অমল থামিল। অপর্ণাও কিছু বলিল না। মাটির পরে দৃষ্টি রাখিয়া আনমনে অপর্ণা দূর্ব্বা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল। ক্ষণকাল পরে অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আমাকে আশ্রয় দেওয়ার সাহসও কি তোমার নেই।

অমল ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—না, তোমার নিজে এসে অধিকার ক'রবার শক্তি যদি না থাকে তবে আমার সে সাহস নেই। আমি জানি সেকেণ্ড ক্লাস পেলে কি হবে, হয় স্কুলমাষ্টারী না হয় সদাগরী আফিসে কেরাণীগিরি। সেই অস্বচ্ছল গৃহে তোমার স্থান নেই, যদি না তুমি সমস্ত ত্যাগ ক'রে আপনি এসে আশ্রয় নাও। তুমি জানো না—

অমল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে চুপ করিয়া গেল। অপর্ণা চাহিয়া দেখে অমলের চোখ দুইটি তাহার মতই আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। অপর্ণা অমলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ব্যথিত হইল কিন্তু এমনি উত্তেজিত ভাব-তরঙ্গের সম্মুখে তাহার অসহায় ভাষা আর একবার প্রতারণা করিয়া গেল।

অমল অপর্ণার হাতখানিকে দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া কি যেন বলিতে গেল—ওষ্ঠ কয়েকবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। অমল অব্যক্ত একটা বেদনাকে দৃঢ়মুষ্টিতে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া যেন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কিছু না বলিয়াই দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেল—

অপর্ণা বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে একাকী অসহায়ভাবে বসিয়া থাকিয়া দেখিল—অমল চলিয়া গেল, একবার ফিরিয়াও চাহিল না। তবুও সে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়াই রহিল।

সমগ্র রাত্রি একটা অনির্দ্দিষ্ট তিক্ত বেদনায় কাটিয়া গিয়াছে—ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াও ঘুম আসে নাই। অমল অপ্রসন্ন মনেই সকাল ৮টায় জাগিল এবং ক্লান্ত ও অবসন্ন অন্তরে আজকার কর্ত্তব্যের কথা মনে হইল। আর একটি স্থানেও শেষ বিদায় লইয়া আসিতে হইবে। খোকাকে পড়ান ছাড়িতে হইয়াছে, সেখানে মাহিনা বুঝিয়া আনিতে হইবে এবং হয়ত রমলাকে বলিয়া আসিতে হইবে—এই অকিঞ্চিৎকর পরিচয়কে ভুলিয়া যাইও, যদি আমাকে একটুও ভালবাসিয়া থাকো তবে তাহাও ভুলিও।

রমলাদের বাড়ীতে সে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বেলা প্রায় দশটা। তাহার বাবা আফিসে গিয়াছেন, খোকা স্কুলে যাইতেছে, তাহার মাতা পিতার সঙ্গে পিত্রালয়ে গিয়াছেন। রমলা বাড়ীতে অন্যান্য ভাই-বোনদের সঙ্গে রহিয়াছে—সে কলেজে যাইবে না।

পড়িবার ঘরে রমলা চা ও প্রচুর খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। অমল হাসিয়া বলিল—এত খাবার কি একজনে খেতে পারে?

—কষ্ট করেই না হয় খেলেন। আর কবে—সম্ভবতঃ আর দেখাই হবে না। রমলা আঁচলের খুঁট হইতে দু'খানা নোট খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল। পুনরায় বলিল—বাবা দিয়ে গেছেন—

অমল চা খাইয়া শেষ করিলে, রমলা বলিল—আপনি ত আমাদের কথা ভুলে যাবেন, কিন্তু আমি এখানে

াপনার লেখা কবিতা গল্প কাগজে পড়ে কত কথা রণ ক'রবো। মনে মনে হয়ত ভাববো—এর মাঝে তীতের কোন প্রশ্ন আছে কে তা জানে!

অমল টাকাটা পকেটে রাখিয়া কহিল—ভগবান করুন াপনারা যেন আমাকে মনে রাখতে পারেন। এ ভাগ্যকে কেউ ত মনে রাখবে না।

—আপনার সঙ্গে যার এতটুকুও পরিচয় আছে, সে াপনাকে ভুলতে পারবে না।

—শুনেও তৃপ্তি।

রমলা কি যেন একটা প্রসঙ্গ তুলিবে স্থির করিয়াছিল, কন্তু তুলিতে পারিতেছিল না। তাই নেহাত আকস্মিক-াবেই প্রশ্ন করিল—এইখানেই কি আমাদের পরিচয়ের শষ?

অমল কাল বৈকালে যেমন করিয়া এই প্রশ্নের জবাব য়াছিল আজও ঠিক তেমনি করিয়াই মুখস্থ কবিতার ত সেই কয়েকটি কথা বলিয়া গেল। রমলা সোৎসুক-ষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া শুনিতে লাগিল। পরিশেষে বনত মুখের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপাইয়া প্রশ্ন করিল—ামাকে ভুল বুঝেছেন কিনা জানি না, তবে আপনার কি ছুই ব'লবার নেই আজ?

—যা ব'লবার ছিল তা না বলাই ভাল। যখন যেতেই বে তখন সংশয়ের বোঝাকে ফেলে রেখে যাওয়া ত্যন্ত কাপুরুষতা হবে। দুঃখের সঙ্গেও সংশয় জীবনকে য়ত কিছু সান্ত্বনা দেবে।

—আমি কি এখানে এমনি ক'রেই রবো?

অমল ধৈর্য্য হারাইয়াছিল—কলিকাতার এই ঐশ্বর্য্যকে াড়িয়া ফিরিয়া যাইতে সে অত্যন্ত উৎসুকভাবে নির্দ্দিষ্ট ট্রেণের সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাই বলিল—স্ মিত্র আজ সত্য কথা ব'লতে আপত্তি নেই। মনটা ামার এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছে যেখানে সেটা কোন মুহূর্ত্তেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। আমি কি 'রতে পারি, আমার মত অভাগা আপনার কোন্ হায্য ক'রতে পারে? আমাকে যদি ভালবেসে থাকেন বে সেই স্মৃতিকে পুণ্যস্মৃতি মনে করে সারাজীবন গৌরবে বহন করা যেতে পারে, সে করুণাকে স্মরণ 'রে আনন্দ করা চলে কিন্তু আপনার মত, যারা ফুলের শ্রী-সৌন্দর্য্য-কোমলতা নিয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে তাদের মত মেয়েকে কেমন ক'রে আমার জীর্ণ কুটীরে অশেষ দৈন্য দুঃখের মধ্যে আহ্বান করি? সেখানে সেই বিবস্ত্র নিগ্রহ যে আমাকে ক্রমাগত বৃশ্চিকের মত দংশন ক'রে ফিরবে—

রমলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—কিন্তু সে নিগ্রহকে আমি যে আপনার জন্যে সাগ্রহে সানন্দে সহ্য ক'রতে পারি এ কথাটা কোন দিন জানাতে পারি নি। সমাজ সংসার সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম ক'রবার শক্তি আমার আছে। এ বিশ্বাস আপনার না থাক্‌লেও আমার আছে—

—আর সে মন-বল চিরদিন সমান ভাবেই থাক্‌বে?

—থাক্‌বে—না থাক্‌লেও তার জন্যে অভিযোগ করা যাবে না।

অমল মুখ তুলিয়া চাহিল—রমলাকে এমন ভাবে কথা বলিতে সে কোন দিন দেখে নাই। তাহার কণ্ঠের দৃঢ়তা, তাহার নিষ্পলক চক্ষুর শ্রান্ত দৃষ্টি অমলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এই মেয়েটির অন্তরে এমন শক্তি ছিল, এমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার শক্তি ছিল তাহা সে পূর্ব্বে কখনও কল্পনা করে নাই। এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—দারিদ্র্য কি, কি তার জ্বালা তা গল্প উপন্যাসে বোঝা যায় না মিস্ মিত্র, সেখানে সমস্ত মানব-মন, ভালবাসা প্রীতি শ্রদ্ধা সবার উপর একটি সত্য জেগে রয়—সেটা অপার লজ্জা, অপার একটা ঘৃণা। সব পারলেও মানুষ সেটা সহ্য ক'রতে পারে না—

রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আরক্তমুখে কম্পিতকণ্ঠে কহিল—তবে আমার অন্তরের কি কোনও মূল্য নাই আপনার কাছে? এই নির্ল্লজ্জ আত্মপ্রকাশ, এই ভালবাসা, ...এই কি শেষ বিদায়? তীব্র অভিমানে, তীব্রতর দুঃখে, হতাশায় রমলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অমল অকস্মাৎ রমলার এই চোখের জলে বিব্রত হইয়া পড়িল। রমলার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু আকর্ষণে বুকের অতি সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আমাকে ভুলে যান, আমি যতই নিষ্ঠুর হই, যতই নির্ম্মম হই আপনাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যের গভীরতম

প্রদেশে নিয়ে যেতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা ক'রবেন—যে অযোগ্য সে অযোগ্যই, তার দুর্ভাগ্যকে মার্জ্জনা ক'রবেন—

অমল রমলাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, দরজা ঠেলিয়া দ্রুতপদে রাস্তায় আসিয়া নামিল। আপনার অবাধ্য চোখ দুইটিকে পরিষ্কার করিয়া আবার চলিতে লাগিল—

উপর্য্যুপরি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মাঝে অমলের সমস্ত অন্তর দুঃখে বেদনায়, আপনার প্রতি, অদৃষ্টের প্রতি, দারিদ্র্যের প্রতি ধিক্কারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এই পরিবেশকে ত্যাগ করিবার দুর্জ্জয় বাসনাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না, তাই আজই রাত্রে জন্ম-পল্লীর স্নেহাঞ্চলে ফিরিয়া যাইবে স্থির করিল এবং সেই ঝোঁকে অযত্ন বিন্যস্ত রুক্ষ একরাশ চুল ও আধময়লা একটা সার্ট গায়ে দিয়াই সে অপর্ণার বাড়ীতে যাইয়া উঠিল।

তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে, শ্রাবণের সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে অবলুপ্ত হইয়া পৃথিবীর উপরে কালো যবনিকার মত আলোকের পথ রোধ করিয়া বিধবার অবগুণ্ঠনের মত বেদনার্ত্ত ভঙ্গিতে চাহিয়া আছে। অমল সহজ সরল পদক্ষেপে সাম্‌নের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—আলোকোজ্জ্বল কক্ষে, অপর্ণা, করুণা ও তাহাদের মাতা বসিয়া আছেন।

মাতা অভ্যর্থনা করিলেন—এস অমল, কবে বাড়ী যাবে?

অমল সাম্‌নের চেয়ারটায় বসিয়া কহিল—আজই।

—আজই? কেন?

—হ্যাঁ, বৃথা অপেক্ষা ক'রে লাভ কি?

অপর্ণা অমলের চেহারা দেখিয়া শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিল—চেহারা অমন হ'য়েছে কেন?

—পরীক্ষার পড়া পড়তে পড়তে।

—অপর্ণা জানে একথা কত বড় মিথ্যা। পরীক্ষার জন্য সে আদৌ চিন্তা করে নাই, তাহা হইলে নিশ্চিত সেকেণ্ড ক্লাসকে সে এমন করিয়া মানিয়া লইতে পারিত না।

অবান্তর কথার মাঝে চা ও খাবার আসিল। অমল খাবারটা ঠেলিয়া রাখিয়া চা খাইয়া ফেলিল। অপর্ণা প্রশ্ন করিল—এটা খেলে না যে!

—ইচ্ছে নেই।

অমলের শুষ্ক কঠোর কণ্ঠস্বর ও কোটরগত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে অপর্ণা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই অবনত মস্তকে সে টেবিলটার উপরে কি যেন দেখিতেছিল।

মাতা বলিলেন—শুনে বোধ হয় সুখী হবে, শ্রাবণের শেষেই অপর্ণার বিবাহের দিন স্থির ক'রেছি অজিতের সঙ্গেই। তোমার বুদ্ধি ও উদারতার প্রশংসা শত মুখে ক'রবো। তোমার কথা আমি ভুলতে পারবো না—মনে যে ইচ্ছা ছিল তা ত হ'ল না।

অমল কহিল—আনন্দেরই ত কথা। আনন্দিত হব না কেন?

—সে পর্য্যন্ত ত তুমি থাকলে না, আবার কি আসতে পারবে?

—এ শুভকার্য্যে যোগদান ক'রবার ইচ্ছে রইল—আশা করি এসে পড়তে পারবো—

—বেশ বেশ, খুব চেষ্টা ক'রো। অপর্ণাও আজ যখন এ বিয়েতে মত দিয়েছে তখন আর দেরী করা সঙ্গত বোধ ক'রলাম না। তা হ'লে অঘ্রাণে হ'তে পারতো—

অমল দুঃখে লাঞ্ছনায় নিরুত্তর হইয়া গেল। বাড়ীতে যক্ষ্মারোগী তিলে তিলে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে জানিয়াও যেমন চরম মুহূর্ত্তে আত্মীয় পরিজন হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠে; শেষ কথা কয়েকটির সঙ্গে সঙ্গে অমলের অন্তরও তেমনি অসহ্য বেদনায় মোচড় খাইয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অকস্মাৎ বুকের মাঝে একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে এমনি একটা শূন্যতার আঘাতে সে বসিয়াই রহিল কোন জবাব দিল না, অপর্ণার পানেও চাহিল না।

মাতা ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে অপর্ণা ও অমল মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—অনেকক্ষণ। তীব্র ভর্ৎসনায় অপর্ণাকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে মনে করিয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেমন করিয়া কথায় সে তাহার তীব্র হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিবে বুঝিয়া পাইল না—যদি আজ ডাকিয়া আনিয়াছিলে এই কথাই শুনাইতে, তবে এ ডাকার অর্থ কি? এমন করিয়া নিষ্ঠুর করাল ছুরিকাঘাতে তাহার হৃদয়কে কেন মুহূর্ত্তে রক্তাক্ত করিয়া দিলে? কিন্তু অমল কিছুই বলিতে পারিল না। দাঁড়াইয়াই রহিল—

অপর্ণা ধীরে ধীরে আনমিত আঁখির দৃষ্টি তুলিয়া অমলের মুখের উপর রাখিল। আয়ত বেদনার্ত্ত দুই চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু মুক্তার মত গড়াইয়া আসিয়া গণ্ডে থামিল। অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন কণ্ঠে সে কহিল—এখনই যাবে ?

অমল প্রবল চেষ্টায় আত্মদমন করিয়া, উৎসারিত অশ্রু-বিন্দুর কণ্ঠ রোধ করিয়া কহিল—হু এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদে সিঁড়ি পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। চোখের ঝাপসা দৃষ্টির সাহায্যে পথ চলা যায় না—ঘনান্ধকার আকাশের গায়ে অপর্ণাদের আলোকোজ্জ্বল বাড়ীখানা তাহারই অশ্রুর প্রলেপে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই হৃদয় শোণিতে রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের মত তাহা অন্ধকারে আপনাকে হারাইতে চলিয়াছে। অন্ধ দৃষ্টিতে লোহার গেটটা ধরিয়া অমল দাঁড়াইয়া রহিল, পুঞ্জীভূত অভিমান ও বেদনা কণ্ঠের মধ্যে উন্মত্ত কোলাহলে তাহাকে মূক করিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে কহিল অপর্ণা তুমি জানো না, তোমারই জন্যে আজ তোমাকে ত্যাগ করিয়া গেলাম—জীবনের সমস্ত সঞ্চয় উষ্ণ রক্তাপ্লুত ছিন্ন হৃদপিণ্ডের মত পথপ্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়া গেলাম—তুমি জানিলে না, জানিবে না।—জীবনের চরমতম বিদায় মুহূর্ত্ত আজ মৌন-বেদনায় কতখানি দুর্ব্বিসহ।

ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল—ধীরে ধীরে ঘন বৃষ্টির অন্তরালে অপর্ণাদের আলোকোজ্জ্বল জানালা একটি একটি করিয়া আকাশের পটে নিভিয়া গেল। অমল ভিজিতে ভিজিতে গাঢ়তম দীর্ঘশ্বাসে বিদায়ক্ষণ ঘোষণা করিয়া একাকী, অত্যন্ত একাকী—সহরের একক জনারণ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিল। ক্রমশঃ

শেষ নমস্কার

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

তুমি ছিলে ক্ষুদ্র এক তারকার প্রায়
অতি দূর মহাশূন্যাকাশে
স্তিমিত কিরণ যার ব্যর্থ হ'ল শুধু
ধরণীর অন্ধকার নাশে ;

সার্থক জনম তার জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে
সেথায় সে উজ্জ্বল রতন,
বৃথা হল আসা তার মরত-ভবনে
জানে শুধু মর্ত্তবাসীজন।

হয়ত ভুলিয়া যাবে দুদিনের পরে
তার কথা কেহ নাহি ক'বে,
যে কুসুমে পূজিয়াছে বাণীর চরণ
একদিন তাও শুষ্ক হ'বে।

পূর্ণতার সাধনায় ক্ষুদ্রের অঞ্জলি,
মানি তার আছে প্রয়োজন,
কে বল রোধিবে তারে, বিন্দু বারি যথা
করিয়াছে সাগর সৃজন।

আজীবন সঙ্গীহারা অভিশপ্ত সম
বন্দী ছিলে ব্যাধি-কারাগারে,
আত্মীয় স্বজন যারা, স্নেহভরে কভু
আসেনিক হৃদয়ের দ্বারে।

অন্তর-কুসুম তব, ধূপশিখা সম,
নিঃশেষে জ্বলিয়া গেছে হায়,
চিররুদ্ধ রয়ে গেল, সৌরভ সুরভি,
আপন অন্তর সীমানায়।

আশৈশব বন্ধু যারা দূর হ'তে শুধু
সাধিয়াছে কর্ত্তব্য সবার,
আরো দূর হ'তে তারা জানায় তোমারে
বন্ধুত্বের শেষ নমস্কার।

* স্বর্গগত কথা-সাহিত্যিক কাশীনাথ চন্দ্রের উদ্দেশে।

দৈব-দুর্যোগ

শ্রীকানাই বসু

বাড়ী আসিয়া যখন পৌছিলাম, তাহার অল্পক্ষণ আগেই দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তখনও চিহ্ন ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে।

রেল গাড়ীর সংঘর্ষ (collision) কখনও দেখি নাই, দৃশ্যটা কিরূপ ভয়াবহ হয় সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নাই। শুনিলাম, সংঘাত হইয়াছে যে দুইটি ট্রেণের, তাহাদের একখানি নাকি ছিল মালগাড়ী, যুদ্ধের মালপত্র বোঝাই, অপর খানি মেল ট্রেণ, যাত্রী ঠাসা। কেহ বলিল, তুফান মেল, কেহ বলিল, না ইম্পিরিয়াল ব্লু মেল। ক'বছর আগে এক আত্মীয় বিলাত হইতে ফিরিতে ইম্পিরিয়াল ব্লু মেলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গল্প বাড়ীতে সবাই শুনিয়াছে। ব্লু মেলের ছবিও দেখিয়াছে। সেই হইতে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের কাছে ব্লু মেল অতি পরিচিত, প্রায় ঘরের জিনিস হইয়া গিয়াছে।

যে মেলই হোক, অজ্ঞ লোকের চোখে বিধ্বস্ত গাড়ীর কোনটা মাল ও কোনটা মেল, ধরা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমার সঙ্গে বলিয়া দিবার, বুঝাইয়া দিবার একজন ছিল। সেই সবজান্তা গাইডই দেখাইয়া দিল, কোনটা ইঞ্জিন, কোনটা গার্ডের গাড়ী, কোনটা কোন পক্ষের ইত্যাদি। উপুড় হইয়া পড়া মালগাড়ীর ইঞ্জিনটা তখনও ফোঁস ফোঁস করিতেছে—বাষ্প-সমাকুল সেই আর্ত্তনাদ কখনও আস্তে, কখনও জোরে বাহির হইতেছে। আর তাহারই অল্প দূরে এক গার্ডের গাড়ী দুর্যোগের রক্তাক্ত প্রমাণ গায় মাখিয়া ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত মূর্ত্তিতে উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছে। কাছে থাকা নিরাপদ নহে, হঠাৎ কোন ঝঞ্ঝাট বাধিয়া যাইবে, মনে করিয়া অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিলাম।

ঘটনাস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া জলযোগে বসিয়াছি, রহিম আসিয়া কাছে বসিল ও গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল—"বাবা, দুর্দান্ত মানে কি জান?"

ইসলাম-সমাজী নই, সংসারে রাম রহিম জুদা না করা হয়, এই উদ্দেশ্যেই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখিয়াছি রহিম। রহিমের প্রশ্নটি সময়োচিত। এই সময়টিতে প্রত্যহ তাহার জ্ঞানচর্চ্চা প্রবল হয়। উত্তর-স্বরূপ এক টুকরা রসগোল্লা তাহার মুখে তুলিয়া দিলাম। যথাসম্ভব সত্বর সেই বাধা গলার ভিতর নামাইয়া দিয়া রহিম বলিল—"দুর্দান্ত মানে আমি জানি বাবা। দুর্দান্ত মানে দুরন্ত। দাদা দুর্দান্ত, মানে দাদা দুরন্ত।"

পিছন হইতে রহিমের জননী আসিয়া বলিল—"আচ্ছা, হয়েছে। আর খেতে হবে না এখন। যাও, বেড়িয়ে এস তো রহিম। বাইরে কেমন মজা হয়েছে দেখে আয় দিকি।"

ধ্যানী বুদ্ধের মতো গম্ভীরমূর্ত্তি রহিম নীরবে বসিয়া রহিল। হাঁ, না, কোনও জবাব দিল না। স্পষ্ট বুঝা গেল, বাহিরের মজা অপেক্ষা ভিতরের আনন্দই রসজ্ঞ রহিমের কাছে বেশি মূল্যবান।

আমি আর এক টুকরা খাবার তাহার মুখে দিলাম, অবিচলিত মহিমায় মৌন রহিম তাহার রসাস্বাদনে মনোনিবেশ করিল।

তাহার গাম্ভীর্য্যের রকম দেখিয়া রহিম-জননী মুখ টিপিয়া হাসিলেন। ইহা পুত্রের বুদ্ধিজনিত গৌরবের হাসি। তিনি বলিলেন—"রাক্ষোস ছেলে। যতক্ষণ খাবার শেষ না হবে, পৃথিবী রসাতলে গেলেও নড়বে এখান থেকে মনে করেছ?"

তাহা মনে করি নাই। কিন্তু সে-কথা এমন নির্ম্মমভাবে বলা উচিত বোধ করি না। কারণ আমি বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি, অতিশয় নিস্পৃহতা সত্ত্বেও রহিম যে আমার প্রদত্ত মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার উল্লেখে সে হৃদয়ের অন্তস্তলে লজ্জা অনুভব করে। তাহার জননী স্নেহ-ভরা হৃদয় লইয়াও পুত্রের হৃদয়ের পানে চাহে না, যকৃতের প্রতিই তাঁহার সমধিক দৃষ্টি।

কিন্তু হৃদয় যে যকৃতেরও উর্দ্ধে, তাহা স্মরণ করিয়া আমি বলিলাম—"তুমি ওর আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কথা কও কেন অমলা? ও তো খেতে চায় নি। সেই গল্পটা জান তো? একটা ছেলে দোরে বসে মুড়ি খাচ্ছে। আর একটি অচেনা ছেলে এসে বল্লে—হ্যাঁ ভাই, তোদের পাখী

কথা কয়? এ ছেলেটি বল্লে—পাখী? পাখী তো নেই আমাদের। তখন নতুন ছেলেটি বল্লে—তবে এক গাল মুড়ি দে না ভাই। দেখ, অচেনা ছেলের কাছে প্রথমেই মুড়ি চাইলে লোকে হ্যাংলা বলতে পারে। কিন্তু আলাপ পরিচয় হয়ে গেল যখন, তখন বন্ধু লোকের কাছে চেয়ে নিতে ভদ্রতায় বাধে না। তোমার রহিমের শিষ্টতা তো তার চেয়ে ঢের বেশি গো। আমার সঙ্গে এতদিনকার আলাপ, জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্নোত্তর আলোচনা করছে। কিন্তু একবার আঙুল দিয়েও খাবারের ইঙ্গিত করে নি।

অমলা ঈষৎ হাসিল। এ তাহার স্বামীর নির্বুদ্ধিতাজনিত ক্রোধের হাসি। কিন্তু হাসিলে ক্রোধের মর্য্যাদা থাকে না বলিয়া হাসি দমন করিয়া অমলা বলিল—"তুমি থামো তো। আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না তোমায়। তুমিই তো আস্কারা দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে হ্যাংলা করে তুলেছো। উঠে এসো বলছি খোকা।"

এইবার রহিম সকল গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও উঠিল। যতক্ষণ রহিম, তুই, ততক্ষণ পার আছে। কিন্তু জননী যখন খোকা, তুমি, ধরিয়াছেন, তখন আর কৌশল খাটিবে না, ইহা তাহার সহজাত দিব্যবুদ্ধি (instinct)তে সে বুঝিয়াছে।

কিন্তু যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া যে দৃষ্টিতে সে চাহিয়া গেল আমার পানে, তাহা দেখিলে, কেতাবী ভাষায় বলিতে গেলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়। অমলা পাষাণ অপেক্ষা কঠিন নহে, তবে সে দৃষ্টি সে দেখে নাই, আমি দেখিয়া কিরূপে স্থির থাকি? তাড়াতাড়ি আধখানা নারিকেল নাড়ু রহিমকে দেখাইয়া পানের ডিবার ভিতর লুকাইয়া রাখিলাম। শান্ত, সুশীল মাতৃ-অনুগত রহিম দরজার কাছ হইতে বলিল—"আমি বেড়িয়ে আসছি বাবা, তোমার জল খাওয়া হলে আসব। তুমি খেয়ে নাও।"

শুধু রহিম নয়, ছেলেমেয়েরা সকলেই অমলাকে অতিশয় ভয় করে। ওদের দোষ দিতে পারি না, ওই অঞ্চলে আমারও খুব সাহসী বলিয়া খ্যাতি নাই।

২

ক্লাবে ভোজ ছিল, ফিরিতে অনেকটা রাত হইল। অমলা তখনও তাহার রান্নাঘরের, ভাঁড়ার ঘরের ও কয়লার ঘরের মণিমাণিক্যাদি চাবি বন্ধ করিতে ব্যস্ত।

সবে তন্দ্রা আসিয়াছে। অকস্মাৎ যেন শুনিতে পাইলাম সেই ইঞ্জিনের বাষ্পোচ্ছ্বাস শব্দ। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

দুর্যোগ দুর্দৈবের কথা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু সংসার ভুলিতে দেয় কই?

সেই শব্দই বটে।

হাত বাড়াইয়া ইঞ্জিনটাকে কাছে টানিয়া লইলাম। আদরের স্পর্শ পাইয়া উচ্ছ্বাস বাড়িয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে রামু?"

এক অক্ষরের অশ্রুসিক্ত জবাব পাইলাম "মা···"।

বলিলাম—"মা মেরেছিল বলে? ছিঃ কাঁদতে নেই। তুমি ছোট বোনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে—অত জোরে কি ধাক্কা দিতে আছে বাবা?"

ক্রন্দনজড়িত স্বরে জবাব আসিল—'ধাক্কা দিইনি তো। এক লাইনে এসেছিল, তাই কলিশন হয়ে একসিডেণ্ট হয়ে গেল, গার্ডের গাড়ীর সঙ্গে।"

সেই কলিশনের জন্যই অমলা আসিয়া দুর্দান্ত ইঞ্জিনকে ঠেঙ্গাইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী রহিমের বিবরণে জানিয়াছিলাম। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—"ছোট্ট গার্ডের গাড়ী, তোমার মতন আমেরিকান ইঞ্জিন তো নয়। অত জোর কলিশন কি করতে হয় বাবা? গার্ডের গাড়ীর দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে গেছে যে। তাইতো মার খেয়েছ। তার জন্যে এতক্ষণ পরে, তুমি বড়ভাই, তোমাকে আবার কাঁদতে আছে? ছিঃ। ঘুমোও।"

এক মুহূর্ত্ত পরে অন্ধকারের মধ্যে শুনিলাম—"সেজন্যে কাঁদিনি তো।"

"তবে?"

আর জবাব নাই। অথচ ইঞ্জিনের ষ্টীম বাড়িয়া চলিল।

নাঃ, অমলা ঠিকই বলে। আমাকে কেহ ভয় করে না। আদর দিলে মাথায়ই ওঠে বটে।

আবার কিছু সাধ্যসাধনা, আদর আপ্যায়নের পর শুনিলাম—"মন কেমন করছে বাবা।"

"কি বিপদ! এত বড় ছেলে, নয় বৎসর বয়স হইল, রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার মন কেমন করিতে শুরু করিল। সুখের আর সীমা নাই! ভয় করে না বলিয়া কি আমার সম্বন্ধে এতটাই নির্ভয় হইতে হইবে। প্রচণ্ড এক ধমকের দ্বারা ভয় করিতে শিখাইব ভাবিতেছি—এমন সময় শুনিলাম—

অর্দ্ধস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ কয়টি কথা,—"সেই মা'র জন্যে মন কেমন করছে, বাবা।"

চমকিয়া রামেশ্বরকে আরও কাছে টানিয়া লইলাম। বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে বলিল—"সেই যে রেলগাড়ী করে মা চলে গেল—তাই মন কেমন করছে···"

আর সে বলিতে পারিল না। আমিও কিছু বলিতে পারিলাম না।

স্মৃতির চোর-কুঠারীতে কোন রুদ্ধকক্ষের দ্বার কখন কোন বাতাসে হঠাৎ খুলিয়া যায়, সে রহস্যের মীমাংসা কে করিবে। তিন বৎসরের ভাই বোনহীন রামেশ্বরকে লইয়া রামেশ্বরের জননী একদিন রেলে করিয়াই গিয়াছিলেন বটে, একা রামেশ্বরকে লইয়া ফিরি, তাঁহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কথা এই নয় বৎসরের রামেশ্বরের ভাইবোন খেলাধুলা-ভরা মনে অকস্মাৎ কেন আসিয়া পড়িল। কেনই বা এই অন্ধকার নিদ্রাহীন শয্যায় তাহাকে এমন করিয়া কাঁদাইল। এ কান্নার কি সান্ত্বনা দিব আমি?

রামেশ্বর যে অতি দুঃখী, তিন বৎসর হইতে আজ অবধি গোপন মনে দুঃখের পাষাণ ভার বহিয়া বহিয়াই যে এই শিশু দিনযাপন করিতেছে, একথা বলা এই কাহিনীর উদ্দেশ্য নহে। কারণ একথা সত্য নহে। শিশুচিত্ত কোনও দুঃখকেই অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধিয়া রাখে না।

প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলাম, রামেশ্বর তাহার ছোট ভাই বোন তিনটিকে লঙ্ঘন করিয়া কোন এক সময়ে অমলার পাশে গিয়া শুইয়া গভীর নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছে।

এবং উভয়ের কে যে কাহাকে ধরিয়া আছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আলোর বিদায়

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

হায়!
আসিল বিদায়,
উৎসবের আয়োজন মাঝে
মোহিনী সোহিনী তাই সহসাই বাজে,
বেলা শেষ হয়ে আসে, মুছে আসে প্রান্তরের ছায়া,
নয়নে স্বপন রচি বিছাইয়া নবতর মায়া
দিন চলে যেতে চায়, অস্ফুট বেদনাধ্বনি
ছল ছল জলমাঝে শুনি;
শেষ সব কাজ
আজ।
তাই
কথা কার পাই
শুনিতে অন্তরমাঝে; প্রাণমন
কার সম্ভাষণ তরে সে উন্মন,
কার মৃদু আলিম্পন অনন্ত আকাশ মথি আসে,
কার মৌন ব্যাকুলতা উতলা মাতাল বায়ুশ্বাসে,
অধীর অথির হল পরাণ চঞ্চল,
উচ্ছ্বসিল কম্প্র বনতল;
পাইনু সহসা
ভাষা।
এই
ম্লান দিবসেই
ভুলাইয়া স্বপন আমার
অস্তরাগে ভরে গেল অন্তর আবার,
বসন্তের ঝরাফুল পরাগ ছড়ানো পথ বেয়ে
পরিপূর্ণ হরষের রসে ভরা পাত্র তরে চেয়ে
বিফলে জাগিছে আশা; তারি তরে দুখ
আশাহীন অবসন্ন বুক।
বিফল বেদনা?
না, না।
দিনে
শুধু তারে বিনে
মুছে যায় পৃথিবীর আশা,
ধরা হতে ভেঙ্গে পড়ে কল্পনার বাসা,
সোনার কমল ফুটে পত্রাকাশে কোথা হয় হারা,
বিজন আঁধার কোণে তরুশাখা মিছে দুলে সারা,
রূপের মন্দির তলে নাহি রূপলেশ,
ক্ষণপ্রভা ছলনার বেশ;
স্বপ্ন সহচরি,
মরি?
মধু
আলোকের শীধু;
উদ্বেলিত দিবাসিন্ধু তটে
হাসির হেমাভাছোঁয়া দিগন্তের পটে
সুখ স্মৃতি তরে ম্লান ঘনায় আঁধার সাঁঝশেষে,
ধীরে জাগে শুকতারা, আধফোটা পুষ্প কলি হাসে;
আনন্দের অলক্তক, কল্পনার ডালি
সবি আছে প্রেমদীপ জ্বালি;
আর নাই, তাই
যাই।
গানে
যাবে অস্তপানে;
অচল শিখরে তব তরে,
স্বপ্নমৌন সুধা রহিবে অনন্ত ভরে,
আমি যাব ভুলপথে; সেথা কাঁটা বিঁধিবে চরণে,
মোরে হেরি' পাণ্ডু শশী নভতলে বরিবে মরণে;
হে বিজয়ী, কল্যাণ কামনাখানি রাখি
চলে যাবে কোন্ পথে পাখী—
তারে বেস-ভালো,
আলো।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

৪

রথ প্রাসাদদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। দ্বার তখনও উন্মুক্ত ছিল। রথ তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রাসাদোদ্যানে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে একজন রক্ষী আসিয়া পথরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমরা কে? কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? মহামান্য ক্ষত্রপের সহিত সাক্ষাতের এখন সময় নহে।"

সারথী তখন অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া রথের গতি রোধ করিয়াছিল। মহাস্থবির রথ হইতে অবতরণ করিয়া রক্ষীকে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক অনামিকার একটি অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিলেন। দ্বার-রক্ষী অঙ্গুরীয় দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিল। সারথীকে দ্বারে রথ লইয়া অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া আমরা পদব্রজে উদ্যানপথে সৌধাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

প্রাসাদোদ্যানের আলোকমালা তখনও নিভিয়া যায় নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যায় যেমন ক্ষত্রপবাগোদ্যানে দীপমালা প্রজ্বালিত হইয়া থাকে, অদ্যও তেমনই হইয়াছিল এবং শত সহস্র খদ্যোতের ন্যায় উদ্যানপথে, বাপীতটে ও বেষ্টনীতে প্রদীপগুলি তখনও জ্বলিতেছিল। উপরে, দ্বাদশীর চন্দ্র তরল নিদাঘ জ্যোৎস্নার অনাবিল শুভ্রতায় জগতের সকল মলিনতা বিধৌত করিয়া দিতেছিল। নিশীথিনীর এই উন্মুক্ত উৎসবপ্রাঙ্গণ হইতে অন্ধকার দৈত্য নির্ব্বাসিত হইয়া নিবিড় নিকুঞ্জে, বৃক্ষবাটিকায় ও লতামণ্ডপে ঘন পত্রাবলীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। উদ্যানবৃক্ষের পত্রাবলীর অন্তরাল হইতে দু-একটা বিরহী বিহঙ্গের আকুল কাকলী শুনা যাইতেছিল। এমন রাত্রিতে—রজনীর এমন অমল ধবল গৌরবের মধ্যে এই দীপাবলীর খদ্যোতদ্যুতির কি আবশ্যক ছিল বুঝিলাম না। যে রূপসী বর্ণে ও সৌষ্ঠবে গরিমাময়ী—বসন ভূষণে তাহার রূপ প্রসাধিত ও বর্দ্ধিত হয় না। অলঙ্কারে ও ভূষণে সৌন্দর্য্যকে সংক্ষেপ করিয়া দেয়। রূপের অনাবিল উদারতা ও উন্মুক্ত নগ্নতা কখনও দেখিয়াছ কি?—আর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ কি?—কিন্তু রূপসীও অলঙ্কার ভালবাসে এবং বসন-ভূষণের ভারে অজ্ঞাতসারে আপনার সৌন্দর্য্যগৌরব খর্ব্ব করিয়া ফেলে।

সৌধ দ্বারে আমরা উপস্থিত হইলে একজন রক্ষী আসিয়া আমাদের এই অসময়ে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মহাস্থবির মহাশয় বলিলেন যে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমরা এই অসময়ে মহামান্য ক্ষত্রপের দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিয়াছি।

রক্ষী বলিল "মহামান্য ক্ষত্রপ এরূপ সময়ে সাধারণতঃ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। আপনাদের সর্ব্বসময়ে প্রাসাদে আসিবার অনুমতি আছে কি? এবং সেই অনুমতির নিদর্শনস্বরূপ কিছু দেখাইতে পারেন কি?"

মহাস্থবির অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। রক্ষী অভিবাদনপূর্ব্বক সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল এবং আমাদের সহিত সম্মুখের কক্ষে গিয়া কক্ষস্থিত ঘটিকা যন্ত্রে তিনবার আঘাত করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। আমরা তাহার উপদেশ মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘটিকা যন্ত্রটি তিনবার শব্দিত করিলাম। প্রকোষ্ঠান্তর হইতে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল। আমরা একটি প্রশস্ত মণ্ডপ পার হইয়া দ্বিতলে উঠিবার সোপান-মূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সোপানাবলম্বনে আমাদিগকে উপরে যাইতে বলিয়া কর্ম্মচারী চলিয়া গেল।

প্রাসাদের দ্বারদেশে ও সকল কক্ষগুলিতে গন্ধদীপ জ্বলিতেছিল। দশটি করিয়া দীপ প্রত্যেক কক্ষকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। মণ্ডপটি কক্ষগুলি অপেক্ষা প্রশস্ততর। চারিটি কোণে দশটি করিয়া চল্লিশটি প্রজ্জ্বলিত গন্ধদীপের আলোকে এই প্রশস্ত মণ্ডপটি ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। সোপানের মূল হইতে শেষ অবধি আলোকমালায় সুশোভিত ছিল।

আমরা সোপানাবলী পার হইয়া দ্বিতলের একটি প্রশস্ত চত্বরে উপস্থিত হইলাম। চত্বরে অনেকগুলি দীপ জ্বলিতেছিল। এই চত্বরের উত্তরপ্রান্তে একটি কক্ষের রুদ্ধদ্বারে একজন রক্ষী শূল হস্তে পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। আমরা তাহার নিকটে গেলে সে অভিবাদনপূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া দিল এবং আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল। আমরা ভিতরে গেলে সে আমাদিগকে ঐ কক্ষস্থিত ঘটিকায় একবার আঘাত করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমরা তাহার নির্দ্দেশ মত ঘটিকায় একবার আঘাত করিয়া পেলব আচ্ছাদনী মণ্ডিত তিনখানি যাবনিক কাষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রাসাদের সকল কক্ষগুলি রাজোপভোগযোগ্য তৈজসাদিতেও সুশোভন দ্রব্যসমূহে সুসজ্জিত। গৃহতলে বহুমূল্য পশুলোম নির্ম্মিত সুকোমল আস্তরণ বিস্তৃত, তদুপরি কোমল সুদৃশ্য আচ্ছাদনী মণ্ডিত যাবনিক কাষ্ঠাসন সমূহ সুবিন্যস্ত। গবাক্ষসমূহে চীনাংশুকের আতপত্র এবং ভিত্তিগাত্র ভাস্কর্য্যোদ্ভিন্ন ও বর্ণচিত্রে পরিশোভিত। প্রকোষ্ঠে, মণ্ডপে ও

চত্বরে মর্ম্মর নির্ম্মিত অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পনিদর্শনসমূহ মূর্ত্তিমতী কবিকল্পনার ন্যায় বিরাজিত। কোথাও মার ও মারবধূ(১) সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও উলঙ্গিনী মারবধূ আপনার নগ্ন সৌন্দর্য্য গর্ব্বে, বিলাসবিভ্রমে ও অচঞ্চল লাস্যে প্রতিষ্ঠিতা; কোথাও বা নগ্নদেহ যাবনিক-মার, এরস্, তাহার কামনাপ্রমুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; আবার কোথাও বসন্তোৎসবে সুন্দরীগণ পানদেবতা ডিওনোসিঅসকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছে—নৃত্যপরা হইয়াও গতিহীনা—চঞ্চলা হইয়াও অচঞ্চলা।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার পর একজন যবন সৈনিক আমাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল এবং মস্যাধার, লেখনী ও তিনখণ্ড ভূর্জ্জপত্র আমাদিগকে দিয়া আমাদের নাম লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিল। আমরা পত্রখণ্ডগুলিতে আপনাপন নাম লিখিয়া সৈনিকের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম। সৈনিক মস্যাধার ও লেখনী যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পত্র তিনখণ্ড লইয়া আমাদিগকে পুনরভিবাদনপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে সৈনিক ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার অভিবাদনপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহার সহিত আসিতে অনুরোধ করিল। আমরা তাহার সহিত সম্ভাষণাগারে প্রবেশ করিলাম। প্রকোষ্ঠটি অতি পরিপাটির সহিত সজ্জিত ও সুশোভিত। ভিত্তিগাত্র স্বল্পোচ্চিত্র ভাস্কর্য্যে(২) বর্ণচিত্রে উদ্ভাসিত। কক্ষতলে সুকোমল পেলব আস্তরণ বিস্তৃত। সম্মুখে বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত প্রশস্ত রৌপ্যবেদিকা ও তদুপরি রৌপ্য-সিংহাসন। বেদিকা পার্শ্বে মূল্যবান আচ্ছাদনী মণ্ডিত অনেকগুলি রৌপ্য নির্ম্মিত যাবনিক আসন সুবিন্যস্ত। আমরা বেদিকার সম্মুখে তিনটি আসনে বসিয়া ক্ষত্রপের সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সিংহাসনের পশ্চাতে, বেদীর উপরে শূলহস্তে চারিজন যবন সৈনিক চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল।

যে সৈনিক আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল সে আমাদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক চলিয়া গেল। ইহারা যুদ্ধবিদ্যার সহিত অভিবাদনটাও বোধহয় বেশ শিখিয়া থাকে। দিনের মধ্যে ইহাদিগকে কতবার অভিবাদন করিতে হয়? ইহাও বুঝি ইহাদের একটা কর্ত্তব্য! সৈনিক চলিয়া গেলে বাহিরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইল।

তখন পার্শ্বের কক্ষ হইতে উৎসবের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য ও আনন্দকলরোল পার্শ্বের বিলাস প্রকোষ্ঠকে প্লাবিত করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। সম্ভাষণকক্ষ হইতে বিলাসপ্রকোষ্ঠের সকল কথা ও গান—সমস্ত কলরবই—আমরা শুনিতে পাইতেছিলাম। তখন রমণীকণ্ঠে গাহিতেছিল—

"সে আসিবে কখন?
আকুল হৃদয় আমার মানে না বারণ!"

মনে হইল যেন ইহা সাফোর একটি গান। গৃহচ্যুত যবন এই সুদূর বিদেশে আসিয়া, তাহার দস্যুবৃত্তির মধ্যে, তাহার জাতীয় ভাষা, কবিতা ও চিন্তার ভিতর দিয়া, তাহার দেশমাতৃকার পূজা করিয়া থাকে এবং এই চিরপ্রবাসে তাহার সুদূর প্রাচীন প্রিয় মাতৃভূমির স্মৃতিকে তাহার বিয়োগবিধুর প্রাণের মধ্যে জাগরিত করিয়া রাখে।

আবার গাহিল—

"অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লয়ে
বসে আছি পথ চেয়ে
হতাশে পরাণ ছায়—আঁধার-জীবন।

হাঁ—সাফোই বটে—মনে পড়িতেছে।—এত সৌন্দর্য্য—এত ব্যাকুলতা—এত অতৃপ্তি, লালসা ও পিপাসা আর কোনও যাবনিক কবিতায় কখনও উপভোগ করি নাই। তখন, কৈশোরে, উচ্চ আদর্শে ও চিন্তায় আমার জীবন পরিব্যাপ্ত ছিল;—মধুরভাবের—রসাবেশের—মানবহৃদয়ের গুপ্ত লালসা ও তৃষ্ণার সকল কথা ভাল বুঝিতাম না। কিন্তু এখন যৌবনের এই অকাল অবসানের মধ্যে—যখন আমার জীবন একটা অবর্ণনীয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এই নিরাশা ও বেদনার মধ্যে,—এই লজ্জা ও হীনতার মধ্যে,—সাফো অনেক সময়ে আমার সকল দীনতা ভুলাইয়া দেয়,—এখনও জীবনের অনেক নির্ম্মম মুহূর্ত্তে সকল কালিমা মুছাইয়া দিয়া একটা অভিনব বিমল জ্যোৎস্নার আভাবের মত মাঝে মাঝে আমার মনের নিবিড় অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে।

"সখিলো কেমনে বলি
হৃদি যে ওঠে আকুলি—
কেমনে বুঝাব ওলো—হয়েছি কেমন?"

সঙ্গীত থামিয়া গেল—মনে হইল যেন এক অমৃতনির্ঝর, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৌরাণিকী আখ্যায়িকার কোনও এক কোপনস্বভাব ঋষির অভিসম্পাতরচিত মরুপ্রান্তরে, বিলীন হইয়া গেল।

বেদীর পার্শ্বে সম্ভাষণাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন যবন সৈনিক দ্বারদেশে আসিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া গেল:—

"বাসিলেঅস(৩) হের ময়ানুগৃহীত পরম সৌগত ধর্ম্মরক্ষিত পরম ভট্টারক ত্রাতা ক্ষত্রপ আর্ক্কেলাঅস আথেনীয়(৪)।"

আমরা সকলে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং যাবনিক অভিবাদননিয়মানুযায়ী আনতমস্তকে হস্ত প্রসারিত করিলাম। রক্ষীগণ তাহাদের হস্তস্থিত শূল সসম্ভ্রমে নত করিল।

ক্ষত্রপ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। আমরা উপবিষ্ট হইলে একজন যবন কর্ম্মচারী আসিয়া যথারীতি আমাদিগকে অর্ঘ্যচন্দন দিয়া গেল, আমরা তাহা গ্রহণ করিলাম।

ক্ষত্রপ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আর্য্য মহাস্থবির, গৃহপতি স্থবভদ্র ও গৃহপতিপুত্র দেবদত্ত, কি

(১) মার, যাবনিক Eros বা মদন। মারবধূ, যাবনিক Psyche বা রতি।

(২) Bas relief.

(৩) বাসিলেঅস্ গ্রীক বা যাবনিক শব্দ, ইহার অর্থ রাজা বা সম্রাট্।

(৪) আথেন্সবাসী বা আথেন্স যাঁহার জন্মস্থান।

অভিপ্রায়ে এত ব্যস্ত হইয়া, অদ্য এই অসময়ে, আপনারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ?"

আমাদের নামোচ্চারিত হইবামাত্র আমরা যথাক্রমে আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করিলাম।

পিতা নিবেদন করিলেন—

"মহামান্য ক্ষত্রপ মহোদয়, অদ্য আমরা বড় বিপদগ্রস্থ হইয়া আপনার নিকট এই অসময়ে আবেদন করিতে আসিয়াছি। আপনি আমাদের সর্ব্ববিষয়ে রক্ষক—এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র আপনিই কর্ত্তা।"

ক্ষত্রপ বলিলেন—

"গৃহপতি স্কন্দদত্ত, আপনাদিগের আবেদন বিবৃত করিলে আপনাদিগকে আমি বিপন্মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইব।"

পিতা গৃহপতি পালক ও তাঁহার পুত্র প্রজ্ঞাবর্দ্ধনের বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

ক্ষত্রপ বিবিধ প্রশ্নপ্রসঙ্গে বুঝিলেন যে সপুত্রপালক নির্দ্দোষী এবং রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে উৎপীড়িত। তিনি তাঁহাদের মুক্তির আজ্ঞাপত্র স্বহস্তে লিখিয়া এবং যথারীতি স্বাক্ষর ও মুদ্রাঙ্কিত পূর্ব্বক একজন রক্ষীর হস্তে নগরপালের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন—

"আর্য্য মহাস্থবির, গৃহপতি ও গৃহপতিপুত্র, আমার শাসিত রাজ্যে কর্ম্মচারীগণের দ্বারা এইরূপ উৎপীড়নের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি নগরপালকে আজ্ঞা দিলাম যেন তিনি সপুত্রপালককে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে পঁহুছাইয়া দেন। আমি এ বিষয়ের সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া এরূপ অত্যাচার যাহাতে আর কখনও না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব প্রতিশ্রুত রহিলাম। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। শুনিতেছি বাহ্লিক-গন্ধারসাম্রাজ্য যবনবিদ্বেষ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। যদি তাহা সত্য হয়—এবং আমি যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে বোধ হয় ইহা সত্য—তাহার মূলগত কারণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিরাকরণে বাহ্লিক-গন্ধারের ক্ষত্রপ ও মণ্ডলেশ্বরগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। এ সম্বন্ধে আপনাদেরও উচিত যাহাতে সাধারণের মন হইতে এরূপ ভাব বিদূরিত হইয়া দেশে বিবিধ জনসমাজের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি বিরাজিত থাকে তাহার আনুকূল্য করা। আশা করি আপনাদিগের ন্যায় সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ এবং পৌর ও জনপদবর্গ আমার এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিয়া আপনাদিগের নিজের প্রতি ও দেশের প্রতি আপনাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইবেন।"

ক্ষত্রপ বেদী হইতে অবতরণপূর্ব্বক সম্ভাষণাগার ত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রয়াণের সময়ে আমরা তাঁহাকে যাবনিক প্রথানুযায়ী অভিবাদন করিলাম। তিনিও প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। আমরা প্রাসাদের কর্ম্মচারীবিশেষের সাহায্যে প্রাসাদের কক্ষশ্রেণী একে একে পার হইয়া অবশেষে দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম।

ততক্ষণ কক্ষান্তরে ক্ষত্রপের প্রীতিসমুদ্ভাসিত নৈশ সম্মেলনসভা হইতে আনন্দোৎসবের সঙ্গীততরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল।

"তুমি কি বুঝিবে সখি কত তারে ভালবাসি ?
আমি যে শারদ নিশা সে মম পূর্ণিমা শশী।"

আমরা যখন কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে নীত হইতেছিলাম, তখনও এই গান দূরশ্রুত হইলেও তাহার কথাগুলি অস্পষ্ট হয় নাই।—

"ফুটিতে পারি না সখি,
তারে না হৃদয়ে রাখি,
সে বিনা আমি যে শুধু নিবিড় আঁধাররাশি।"

তাহার পর আর বুঝিতে পারিলাম না। তখন কেবল এই গানের অস্পষ্ট কথাগুলির তীব্র লালসা ও উদ্দাম বিলাস ক্ষীণায়মান সুরলহরীতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

আমরা প্রাসাদদ্বারে কর্ম্মচারীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, উদ্যান পার হইয়া রথে আরোহণ করিলাম; পিতার আদেশে সারথী মহাস্থবিরকে পঁহুছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে রথ বিহারাভিমুখে চালিত করিল।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে ক্ষত্রপসম্ভাষণ নামক
চতুর্থ বিবৃতি। ক্রমশঃ

গঙ্গাজল

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

এই বস্ত্রসঙ্কটের দিনে ধব্‌ধবে মলমলের পাড়হীন সাড়ি বিশ্বনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ধর্ম্মতলার ছত্রিশ জাতির ভিড়ের মাঝে অবলীলাক্রমে মহিলা বিচরণ করছিলেন। যাত্রাপথে ফুটপাথের দোকানদারের বিবিধ পণ্য পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। শ্রদ্ধায় আমেরিকান, চীনাম্যান, নিগ্রো, ভারতীয় এবং ব্রিটিশ সকলে তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। বিশ্বনাথ তার কণ্ঠস্বর শুনে নাই, একথা অলীক। অন্ততঃ কত দাম, একথা সে তিনবার শুনেছিল। কিন্তু সে সত্য অবজ্ঞা ক'রে তার চিত্ত নির্দেশ করলে যে পথচারিণীর কথা শোনা সে যাত্রায় তার নিজের পথ-ভ্রমণের কাম্য কর্ত্তব্য।

নির্ভীক বিধবা। চৌরঙ্গী পার হয়ে ময়দানে পৌঁছবার সময়, প্রথম অর্দ্ধপথ বার কতক ডানদিকে তাকালে, পরে পথের পশ্চিমার্দ্ধে বামদিকে দেখে ট্রামের চক্রপথে এসে

পৌঁছিল। সবার এক একটা বিভিন্ন পথের ট্রামগাড়ি লক্ষ্য। বিশ্বনাথের লক্ষ্য সামনের মহিলা।

যখন এক বুক ভিড় নিয়ে বালীগঞ্জের গাড়ি এলো, মহিলা বুঝলে, স্থান নাই, স্থান নাই, পূর্ণ সে গাড়ি। লেড্‌লর ঘড়ি দেখ্‌লে। ছটা পঁচিশ। ফাগুনের হাওয়া জনতার শ্রম অপনোদন করছিল। সল্টেড্ বাদামওয়ালা তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির সদুদ্দেশে বিচিত্র শব্দ করছিল। বিশ্বনাথ গোটাকতক পাক্ খেয়ে যখন মহিলার সম্মুখে এলো, তাদের চার চক্ষু মিলিত হল। সাহসী বিশ্বনাথ চট্ করে করজোড়ে বল্লে—নমস্কার।

এক গুণতে যত সময় লাগে তার এক উনিশ ভাগ সময়ের মধ্যে মহিলা তাকে যাচাই করলে। মনে গুমরে উঠ্‌লো অতি ক্ষুদ্র শব্দ—হুঁ!

বিশ্বনাথ বল্লে—ক্ষমা করবেন। আমি ভিড়ের তুফানে আপনার পিছনে এসে পড়েছিলাম। দেখলাম আপনার আঁচলে একগোছা চাবী ঝুলছে। কোনো দুর্বৃত্ত অক্লেশে ফাঁস টেনে চাবীর গোছাটা খুলে নিতে পারে।

শ্রীমতী অমিয়বালা হাসলো। বল্লে—ধন্যবাদ। কিন্তু দুর্বৃত্ত চাবীর গোছাটা নিলে, আমার অনেকটা কষ্ট কমিয়ে দেবে। আপনি নেবেন? শূন্য বাক্সের চাবি।

হরি! হরি! বিশ্বনাথ হতভম্ব হল। এক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ রণনীতি হ'তে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক্ হ'তে হবে অশোভন। সে বল্লে—আজ্ঞে, মানে হচ্চে, আপনি বুঝি বিরক্ত হলেন?

এবার অমিয়বালা তুষ্টির হাসি হাসলে। সুস্মিতার বদনকমল বিমোহিত করলে বিশ্বনাথকে। শ্রীমতী বল্লে—বিরক্ত হইনি। বিস্মিত হয়েছি। হয়তো কৃতজ্ঞ হয়েছি। কারণ পেটের দায়ে আমাকে নিত্য পথ চল্‌তে হয়। প্রগতিশীল নবীন জগত আমার মুখ দেখে। সে জগতের প্রথম লোক আপনি আমার শূন্য বাক্স পেটেরার মাত্র চাবী দেখে তাদের মঙ্গলকামনা করলেন।

বিশ্বনাথ এতটা সাহস প্রত্যাশা করেনি। সে নিরুত্তর হল। যুবতীর হৃদয়ে দয়া উপজিল। সে বল্লে—কিছু মনে করবেন না। আমিও নবীন জগতের। তাই বৈধব্য আমাকে কাশীবাসী করেনি। ট্রাম আসছে। নমস্কার।

শকট এলো, সশব্দে চলে গেল বক্ষে নিয়ে অমিয়বালাকে। শ্রীমান বেকুক্ বেকুক্ মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল যাত্রী-বিশ্রাম ঘরের সম্মুখে। তার অবসাদ ঘুচ্‌লো যখন তার সহকর্মী অমরেন্দ্রনাথ এসে তার মাথায় টোকা মারলে।

তারা উভয়ে অনেক কথা কইল। পরে স্থির হ'ল পরদিন সাড়ে পাঁচটা হ'তে বিশ্বনাথকে এই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কাজের জন্য।

বিশ্বনাথ সুস্থ হ'ল।

(২)

শ্রীমতী অমিয়বালা মজুমদার বিধবা কর্ম্মী। বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। কিন্তু তার সাধের কর্ম্মভূমি গৃহস্থের অন্তঃপুর। প্রতিদিন অমিয়বালা টানাটানির সংসারে ঘোরে অভাব অভিযোগের উৎসুক সন্ধানে। আর সচ্ছল সংসারে ঘুরে উদ্বৃত্ত পদার্থ সংগ্রহ করে। বাঙালী বিধবার অভাব-অভিযোগই তার চিন্তার বিষয়। তাদের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব এবং নিরাশ জীবনের বিভীষিকা অমিয়বালার নিজের কঠোর নির্জ্জনতা ভুলিয়ে রেখেছিল। যে সব সংসারে সে হাসিমুখে চাল-ডাল তরি-তরকারী বিতরণ করতো, সেথায় সে ছিল দিদিমণি। যে সব ধনী গৃহিণী তাকে সাহায্য করত তারা তাকে সসম্মানে আত্মীয় ভাব্‌তো। মিষ্ট ছিল অমিয়ার ভিক্ষা। সে চাহিত না, অপরাধিনীর মতো লোকের দ্বারস্থ হ'ত। ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী হাতে নিয়ে, নিজের অপরাধ স্বীকার করতো। বল্‌তো—কত কষ্ট আপনাদের দিচ্ছি, লজ্জা হয় বারবার বিরক্ত করতে।

সেদিন সকালে বিদ্যালয় যাবার সময় অমিয়বালা শুনলে একদল তরুণের তর্কের প্রসঙ্গ—আপদ আর বিপদের প্রভেদ।

আপদ, বিপদ অমিয়বালার চিত্তের রস-সম্পদ নিঃশেষ করেনি। তার বিচিত্র মাতৃভূমি বঙ্গদেশের মত, এত ভঙ্গেও তার প্রাণ ছিল রঙ্গে-ভরা। তাই তার প্রজ্ঞা তরুণদের তর্কের সমাধান করলে। দেশের দুরবস্থা নিশ্চয়ই বিপদ। কিন্তু ধর্ম্মতলার মোড়ে সেই অপরিচিতের আপত্তিকর নির্নিমেষ চাহনী এক আপদ। ট্রামে ব'সে সে হাঁসলে।

পৌনে ছটায় যখন বিশ্রাম-ছাউনীর বাহিরে পুস্তকের দোকানের ধারে, বিশ্বনাথ মল্লিক তার মুখের দিকে

, সে চাহনীকে উপেক্ষা না ক'রে শ্রীমতী দৃষ্টি করলে তার দিকে। সে দৃষ্টিতে শাসন ছিলনা, ভ্রকুটি ছিলনা, বিরক্তি ছিলনা, হয়তো প্রচ্ছন্ন উৎসাহ ছিল। অতএব বিশ্বনাথের পক্ষে—নমস্কার, বলা হ'ল আশু কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যপালনে আনন্দিত হ'ল বিশ্বনাথ। তার আনন্দ উল্লাসে পরিণত হ'ল, যখন মহিলা বল্লে—আজ কি দেখছেন? চাবি না ছবি?

সাহসে সাহস আসে। রসিকতা উদ্বুদ্ধ করে রস রসহীন প্রাণেও। ভরসা ক'রে বিশ্বনাথ বল্লে—সত্য কথা বল্‌ব? ছবি দেখছিলাম—শুধু পটে আঁকা নয়।

মহিলা বল্লে—ভালো। আপনি কবিতা পড়েন।

সে নিরালায় গেল বাগানের ধারে। যুবক অনুসরণ করলে। শিক্ষয়িত্রী বাধা দিল না।

বিশ্বনাথ বল্লে—আপনি নিত্য একেলা এই ভিড়ের মাঝে ঘোরেন। এখানে কত বিদেশী—

অমিয়বালা বাধা দিয়ে বল্লে—ভয়, মানে ভয় না হ'ক ঝঞ্ঝাট স্বদেশীকে নিয়ে। বিদেশীরা বড় একটা গ্রাহ্য করে না।

মল্লিক বল্লে—স্বদেশীর অপরাধ কি? শুনবেন, এরকম বিধবা দেখলে, অতি প্রতিক্রিয়াশীল বাঙ্গালীও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মত বদ্‌লালে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

অমিয়বালা অতটা দুঃসাহস আশঙ্কা করেনি। সে সামলে নিয়ে বল্‌লে—চীনদেশে কি বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে?

একটা চীনা গাড়ীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, কার্জন বাগিচার সন্নিকটে।

বিশ্বনাথ বল্লে—ভারতের এক শ্রেণী ছাড়া সকল সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত।

অমিয়বালা বল্লে—ওঃ! তাই। একবার একটি চীনা ভদ্রলোক আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। আর সবচেয়ে মজার কথা, সে আমার নাকের সুখ্যাতি করেছিল। বুঝুন।

বিশ্বনাথ বল্লে—অবশ্য ক্ষমা করবেন, তিলফুল জিনি নাশা, বাঁশীর মত নাক, প্রভৃতি যে সব বর্ণনা আছে আদর্শ নাকের, সেগুলা আপনার নাসিকা সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

—হতে পারে আপনার মত কাব্য-রসিকের বিচারে। কিন্তু চীনা—যার আদর্শ-নাসিকা দেখলে আতঙ্ক হয় বুঝিবা অধিকারিণীর দম্ বন্ধ হয়—

বিশ্বনাথ বল্লে—বিপরীত ভাব আকর্ষণ করে পরস্পরকে।

শিক্ষয়িত্রী বল্লে—সে কথা সত্য বিজলী বা চুম্বক সম্বন্ধে। কিন্তু নাক যে একটা তরঙ্গ,একথা বিজ্ঞান এখনও মানেনি।

বিশ্বনাথ শিক্ষিত। তার শ্রদ্ধা বাড়ছিল মহিলার প্রতি। সে বল্লে—মনোবৃত্তি বা রূপ সম্বন্ধেও কথা অনেকটা সত্য।

মহিলা বল্লে—শাশ্বত সত্য নয়। তাহলে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক্ না কেটে তার নাসিকা-প্রবাহে আকৃষ্ট হ'য়ে সূর্য্যবংশে এবং রাক্ষসবংশে উদ্বাহ তরঙ্গ প্রবাহিত করত।

—আপনি সুপণ্ডিত এবং মানে—

—সুশ্রী।—বল্লে অমিয়বালা। কিছুক্ষণ পরে বল্লে—আপনি ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন? সুস্থ সাধু শিক্ষিত ভদ্রলোক আপনি নিশ্চয়।

বিশ্বনাথ ভয় পেলে। অথচ একেবারে নিজেকে অশিষ্ট, অসাধু বা অশিক্ষিত ব'লে পরিচয় দিতে পারলে না। সে বল্লে—কথাগুলা আপেক্ষিক। অবশ্য আমি দুষ্ট নই।

অমিয়বালা হেসে বল্লে—তাহ'লে আমি দুষ্ট। বিপরীত চিত্তপ্রবাহ যখন মিলন-প্রয়াসী—

বিশ্বনাথ বুঝলে সে কোথায় এসে পড়েছে। আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হ'ল তার মন। সে বল্লে—ক্ষমা করবেন আমার অশিষ্টতা। আমি অন্যায় করেছি আপনার সঙ্গে অযাচিতভাবে আলাপ ক'রে। মানুষ সকল কাজ বুঝে করে না। ক্ষমা করুন।

এবার অমিয়বালা হাসলে, ক্ষমার হাসি, বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার উদার হাসি। সে বল্লে—ক্ষমার কোনো কথা নাই। যখন আলাপ হ'য়েছে, আমরা পরিচিত। আপনি আমার উপকার করতে পারেন—বন্ধু হিসাবে।

—বিলক্ষণ—বল্লে বিশ্বনাথ।

বাকী কথা পরে হবে। মহিলা তাকে একখণ্ড কাগজ দিল, নাম ঠিকানা লেখবার। সে সুবোধ বালকের মত সহি দিল। মহিলা তাকে নিজের ঠিকানা দিল, বিদ্যালয়ের নাম দিল।

মহিলা চলে গেল। বহুক্ষণ বাগানের বেঞ্চে বসে ভাবলে বিশ্বনাথ মল্লিক। শেষে আপনমনে বল্লে—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

(৩)

ফাল্গুন ১৩৫১ সালে কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মাঝে সরকার প্রকাণ্ড বোমা বৃষ্টি করলে। হঠাৎ সকল দোকান-

দারের মজুত মাল শীল করা হ'ল। যে ব্যবসায়ীর দখলে যত মাল ছিল, তার ফর্দ্দ হ'ল, ব্যবসায়ীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হ'ল, সরকারী হুকুম ব্যতীত কেহ কাপড়ের বেচা-কেনা করতে পারবে না। তারপর যা' আদেশ জারি হ'ল প্রত্যক্ষভাবে সে ইতিহাস এ আখ্যায়িকায় অপ্রাসঙ্গিক। সে ভবিষ্যত নির্দ্দেশের সমাচার তখন ব্যবসায়ীমহল অবিদিত ছিল।

কলিকাতার সকল গুদাম একদিনে শীল করা অসম্ভব। কিন্তু প্রথমদিনের অভিযান ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করলে। কালাবাজারের কল্যাণে বহু ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্ম্মচারী কমলার কৃপা আকর্ষণ করেছিল। একদিন বহু নাড়াবুনো যেমন কান্তে গলিয়ে খরতাল গড়ে কীর্ত্তনীয়া হ'য়েছিল, তেমনি বহু সচ্চরিত্র ব্যক্তি সোনা রূপা বেচে কাপড় কিনেছিল। কিন্তু সরকারের এ কি দুর্ব্যবহার! আর বাঙ্গালী কাগজওয়ালাদের! বস্ত্র নাই, বস্ত্র নাই, তো লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যের মাল কোটী টাকায় কেনে কে? তখন আশু বিপদে রক্ষার উপায় সময় থাকতে মাল সরানো, এ সিদ্ধান্ত করলে বহু ব্যবসায়ী।

শ্রীমতী অমিয়বালা মাসিক দশ টাকা ভাড়া দিয়ে দু'খানি ঘরে বাস করতো। নতুন দুখানি ঘর, আয়তনে ক্ষুদ্র। অথচ বিধবার পরিশ্রমে সেই ছোটো কামরা দুটি ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঐ ডামাডোলের দিনে হটাৎ তার গৃহের সম্মুখে সমাসান হ'ল শ্রীযুক্ত টহলরাম ঘরপুরিয়া। সে তার সঙ্গে কথা বল্লে, কথার মাত্রা ছিল মায়িজি।

—মায়িজি একঠো কামরা মিলে যাহার মধ্যে আমি তিনটা গাঠ কাপড় রাখবো কয়দিনের তরে—বল্লে টহলরামজি।

সে আরও বোঝালে। দেশে ধর্ম নাই। সরকারের মতিচ্ছন্ন হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য মেরে দিয়ে ইংরাজ চায় বিলাতী মালে বাজার ছেয়ে ফেলতে। তাই মানুষের ঘরের কড়ি দিয়ে কেনা মাল জাবদ্ ক'রে পুলিস জুলুম সুরু করেছে।

শ্রীমতী ছিন্নবসনাদের কথা ভাবলে। বস্ত্রাভাব ও অন্নাভাব বৈধব্যকে আরও কঠোর ও নির্মম করে তুলেছে।

সে ধীর শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে—গুদাম নিয়ে আপনি কি করবেন?

সে বল্লে—এর মাঝে মায়িজি আমি তিন গাঁট, ছয়শত জোড়া সাড়ি ধুতি লুকায়ে রাখব মায়িজি। গণ্ডগোল কাটিয়ে গেলে নিয়ে যাব মায়িজির কামরাটি হ'তে।

—আমায় যদি পুলিসে ধরে?

টহলরামজি ঘরপুরিয়া খুব হাসলে। বল্লে—তার সম্ভাবনা নেই। এটা বাঙ্গালী পাড়া গৃহস্থ পাড়া। কেহ সন্ধান পাবে না মায়িজি।

শ্রীমতী অমিয়বালা অগত্যা স্বীকৃত হল। মাসিক ভাড়া একশত টাকা। কিন্তু সে লেখা চাহিল। পরে না গণ্ডগোল হয়।

টহলরাম তাকে দু'খানা পত্র দিলে—একখানা বে-নামী। যদি পুলিসে সন্ধান পায় তা' হলে শ্রীমতী সেই বেনামী বেইমানী রসিদটা দেখাবে মালের মালিকানা প্রমাণের জন্য। আর তার আসল রসিদ আর ঘরের একটা চাবী সে অন্যত্র লুকিয়ে রাখবে। একটা চাবী থাকবে ঘর-পুরিয়ার নিকট। বোঝাপড়ার সময় সেই ফর্দ্দ কাজে লাগবে। তবে যেহেতু ব্যাপারটা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে সংঘটিত ও সব লেখাপড়া বাজে।

এই সব গুপ্ত বন্দোবস্তর ফলে শ্রীমতী অমিয়বালাকে মাত্র একটি কক্ষে বাস করতে হয়েছিল। অন্য কক্ষে ছিল লুক্কায়িত ধুতি সাড়ি।

৪

অমিয়বালা খবরের কাগজ পড়ে, যাদের বাড়ি ভিক্ষা করতে যায়, তাদের কাছে শোনে। তার উপকারী বন্ধুরা অনেকে উকীল-ঘরণী।

যখন টহলরাম তার কাছে তিন গাঁট কাপড় রেখেছিল, শ্রীমতী অমিয়বালার অন্তরে শয়তানী ছিল না। মাসিক একশত টাকায় সে অনেক বিধবার সহায়তা করতে পারবে, এই ছিল তার আইন-ভাঙ্গা কার্যর উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন সে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝলো, তার মনে এলো দুষ্টামী। ঘরপুরিয়া মাঝে মাঝে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মানুষটা কালা বাজারে বহু অর্থ লাভ করেছে। এ মালের দাম বারো হাজার টাকা, বেচতে পারলে সে অন্ততঃ বারো হাজার টাকা লাভ করতে পারবে। একদিন সে জিজ্ঞাসা করিল—আর ধরা পড়লে?

টহলরামজি বল্লে—সে আমার অদৃষ্ট। সরকার মালটা বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবে, আমি জেলে যাব মায়িজি।

শ্রীমতী শিহরে উঠলো। সে নিজে ধরা পড়লে কি হবে জিজ্ঞাসা করলে।

টহলরাম বল্লে—মায়িজি আপনি সেই চিঠিখানা দেখাইয়ে দিবেন। সরকার দেখবে মালের মালিক গঙ্গারাম। তাকে খুঁজে পাবে না। মালটা জাবদ্ করিয়ে নিবে। সরকারের লাভ। দেশে বিচার নাই। কলিকাল মায়িজি।

শ্রীমতী প্রকাশ্যে বল্লে—মোটেই বিচার নাই। মনে মনে বল্লে—তাহলে তাজমহলের পাশে ভাঙ্গা কুটীরে পূর্ণ থাকে সমাজ? সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদের নাম কলিকাল। ঠাকুর ঘরে না বসা আসল যুগ-ধর্ম নয়। তিন-পাদ অধর্ম যার বিশেষত্ব, যে কলিকালের ধর্ম দারিদ্র্যের কঠোরতা বাড়ানো—আর তেলা মাথায় তেল ঢালা।

সেদিন উকীল কেদারবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবার পর শ্রীমতী অমিয়বালার মস্তিষ্কের কু-বুদ্ধি-কেন্দ্রে হিল্লোল উঠলো। যাকে হয়তো পৃথিবী বলবে দাগাবাজি বা বিশ্বাসঘাতকতা, সেটা নিশ্চয় এক্ষেত্রে ধর্ম, নির্ণয় করলে বিধবা। আর সত্যই যদি জগদীশ্বরের বিচারে কর্মটা হয় পাপ, সে নরকে গিয়ে অন্ততঃ এই তৃপ্তি পাবে সে তার বে-ইমানী বহু উলঙ্গকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করেছে।

সুতরাং পরদিন যখন টহলরামজি তাকে মাসিক ভাড়া দিতে এলো, সে ভাড়া নিল না। তাকে বল্লে—পুলিসের গোয়েন্দাকে দেখেছি এখানে। আপনি আর আসবেন না।

টহলরাম ভীত হ'ল। সে বল্লে—রাতারাতি সে মাল সরাবে। কিন্তু শ্রীমতী দৃঢ় হল। তার অমল মধুর হাসি উবে গেল। চোখের সে মিষ্টি চাহনী পরিবর্ত্তিত হ'ল কঠোর দৃষ্টিতে।

সে বল্লে—ওটি হবে না মশায়। আপনি দেশের বুকের অনেক রক্ত খেয়েছেন। আমি এই সাড়িগুলি গরীবদের বিলিয়ে দ'ব। আপনার প্রায়শ্চিত্ত হবে।

তার বুকে পিস্তল রাখলে শ্রীযুক্ত টহলরামজি ঘরপুরিয়া অত মর্মাহত হত না। অমিয়বালা তাকে বোঝালে যে সে পুলিসে খবর দিলে কাপড় তো সরকার পাবে, টহলরামের উপরি লাভ হবে কারা-ভোগ। পাড়ার লোক সাক্ষী দেবে যে কাপড় ঘরপুরিয়াবাবুর। টহলরাম পুলিসে খবর দিলে, অমিয়বালা বলবে সে কিছু জানে না। দোষী টহলরাম। ভাড়াটের কামরায় কি আছে না আছে, সেকথা জমিদারের জানবার কথা নয়।

শ্রীযুক্ত টহলরামজি ঘরপুরিয়া বহু টহলদারী ক'রে সামান্য অবস্থা হ'তে ধনী হয়েছিল। সে বুঝলে এক মারাত্মক কাঁকড়ার দাড়া তার টুঁটি টিপে ধরেছে। কুসুমে কীট থাকে। কিন্তু এমন সুন্দর দেহে কাঁকড়ার দাড়া থাকে! সে ভয় দেখালে, অনুনয় করলে, বিনয়-নম্র সম্ভাষণে বিধবার মনস্তুষ্টির প্রভৃত চেষ্টা করলে, কিন্তু শ্রীমতী অমিয়-বালা কঠোর নির্মম।

শেষে রফা হ'ল। অমিয়বালা মাত্র এক গাঁট দুশো জোড়া সাড়ি রাখবে। বাকী দু গাঁট তাকে রাতারাতি সরিয়ে নিয়ে যাবার অবকাশ দেবে। যখন অমিয়বালার দুশো জোড়া সাড়ি বিতরণ শেষ হবে সে ফেরত দেবে তার চিঠি। তার মাঝে ধরা পড়লে সে বাজে নামের চিঠিখানা দেখাবে পুলিসকে। মা কালীর নামে দিব্য করলে উভয়ে, কেহ কাকেও ধরিয়ে দেবে না।

আবার শিক্ষয়িত্রীর শ্রীমুখে সেই অমিয় হাসি ফুটে উঠলো। সে জুয়াচোর নয়, উৎপীড়ক নয়, অত্যাচারী নয়। সে কুসুম, তার মনে গোখরো সাপের বাসা নাই।

টহলরামজিকে অমিয়বালা বল্লে—আপনি ধনী, আমাকে মা বলেছেন আমি আপনার কন্যা। বাপের কাছে জুলুম ক'রে চেয়ে নিলাম চার পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু কত পুণ্য আপনার হ'ল।

বাস্তবকে সত্য জেনে আজ টহলরাম ব্যবসায়ী মহলে মানী। সে বল্লে—বেশ তো মা। মা কালী আমায় দয়া করুন, আমি আপনার শুভ কাজে আরও পয়সা দ'ব।

৫

পূজার মধ্যে প্রায় দেড়শত জোড়া সাড়ি লাভ করেছিল তিনশত বিধবা। পূজার পরেও বিতরণ কার্য্য পূর্ণ হয়নি।

একদিন উকীল কেদারবাবু অমিয়বালাকে বল্লেন—মিসেস মজুমদার, কাল ধর্মতলায় আপনি সে লোকটির সঙ্গে কথা কইছিলেন, তাকে জানেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

কেদারবাবু বল্লেন—ও পুলিসের লোক।

শ্রীমতী বল্লে—সে কথা জেনেছিলাম এক পক্ষ পূর্বে। ওকে চিনি প্রায় এক মাস। বোধ হয় টহলরামকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে সন্দেহ করেছেন।

কেদারবাবু বিড়িতে একটা শেষ টান দিয়ে বল্লেন—একটু সাবধানে থাকবেন।

অমিয়বালা হেসে বল্লে—যার কাজ তিনি দেখবেন। আর হাঁটতে পারি না—জেলে গেলে বিশ্রাম পাব।

কেদারবাবুর স্ত্রী তার চিবুক ধরে বল্লেন—অমন অলক্ষণের কথা বোলোনা মা। তোমার কপালে—

—কপালের কথা তো জানি না মাসিমা। হাতের কথা জানি। তিনি হাতের নোয়া খুলে নিয়েছিলেন বলেই তো এই হাতে চোরাই মাল বিলিয়ে আমার মত দুঃখিনীদের মুখে হাসি দেখেছি।

সে যখন চলে গেল, কেদারবাবু কাণ্ট, হেগেল, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা এবং মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বের বিধান আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করলেন যে শ্রীমতী অমিয়বালা যদি পাপী হয় তো ঐ রকম পাপই মহা পুণ্য,স্বর্গে যাবার সোপান।

৬

এবার যেদিন বিশ্বনাথ মল্লিক অমিয়বালার সাক্ষাৎ পেলে উভয়ের জড়তা ছিল না। বিশ্বনাথ অমিয়বালার সঙ্গে একই ট্রামে উঠলো, একই মোড়ে নামল।

অমিয়া বল্লে—আমার কুটীরে স্থান নাই। আপনাকে আস্‌তে বলতে পারি না।

বিশ্বনাথ বল্লে—বিলক্ষণ।

অমিয়া বল্লে—আমার ঘরে কিছু নাই। একখানি কামরা।

—পাশের ঘরে কি থাকে?

অমিয়বালা বল্লে—একজন ঘর ভাড়া নিয়েছে। আসুন না আমার দীন কুটীরে। তবে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মত বদলাবেন না।

বিশ্বনাথ প্রীত হল। সে বল্লে—রক্ত মাংসর শরীর নিয়ে মানুষ রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাক্।

এককোণে একটা জলের জালা ছিল—জলের জালা, কিন্তু তার মধ্যে ছিল জোড়া কতক নূতন কাপড়। মল্লিকের প্রশ্নের উত্তরে সে বল্লে—এর মধ্যে আছে গঙ্গাজল।

বিশ্বনাথ বল্লে—আপনি তো খুব নিষ্ঠাবতী।

মহিলা বল্লে—নিষ্ঠা আমার না। এর ভেতরের গঙ্গাজল নিয়ে বেহালায় যাব। এক বিধবার বাড়িতে কুলঙ্গীর ভিতর তাঁর গঙ্গাজলের ঘট আর পূজার সামগ্রী থাকতো। পাড়ার একটা মুরগী ঢুকে সেখানে ডিম পেড়ে দিয়ে এসেছে। এই গঙ্গাজল দিয়ে তার পূজার উপকরণ শুদ্ধ করতে হবে।

রসিকতা কি সত্য কথা তা ঠিক্ করতে পারলে না বিশ্বনাথ। কিন্তু তার মনের মাঝে দুটো বিরোধী ভাব তাকে অশান্ত করছিল। এমন রসিকা সুন্দরী মহিলা—এক কথা রিপোর্টে লিখে দেওয়া উচিত—এর পরে সন্দেহ ভিত্তিহীন। কিন্তু তবু একবার পাশের ঘরটা দেখতে পারলে হ'ত। বিবেক, ধর্ম্মবুদ্ধি, নিমক, কর্ত্তব্য প্রভৃতি শব্দ এ আলোচনায় তার মনের মাঝে গুমরে উঠলো। কিন্তু সত্য কথা বলতেই বা দোষ কি তার কাছে,যার আঁখি হ'তে শুক্ তারার জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়ে, যা'র কথা রসে ভরা।

সে বল্লে—আপনাকে একটা খবর দ'ব মিসেস মজুমদার। পরিহাস করবেন না। এবার আপনার ভাড়াটে এলে ঘরের মাঝে কি আছে দেখে নেবেন। দিনক্ষ্যাণ খারাপ।

সে ভারত-রক্ষা আইন, বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ অনুশাসন প্রভৃতির কথা তাকে বোঝালো।

সব শুনে অমিয়বালা বল্লে—বিধবাদের বিলাবার জন্য যদি কেহ ওর মাঝে কাপড় রাখে।

—আইনের চোখে সধবা, বিধবা বা কুমারী সমান।

অমিয়বালা বল্লে—গঙ্গাজল দেখবেন?

সে জালার মধ্যে হাত পুরে একজোড়া ধুতি বার করলে।

বিশ্বনাথ লাফিয়ে উঠলো। বল্লে—তাহ'লে সত্য।

—কি সত্য?

বিশ্বনাথ বল্লে—ডিপার্টমেণ্ট সন্দেহ করে যে আপনার বাড়িতে কাপড় লুকানো আছে। আপনি দু একজোড়া করে নিয়ে বাজারে বেচে আসেন। আমি পুলিসের কর্ম্মচারী। আপনাকে লক্ষ্য করার ভার আমার উপর। তাই এক মাস পূর্বে যেচে আলাপ করেছি। তার পর কিন্তু—

এবার দলিতা ফণিনীর মত বিধবা গর্জ্জে উঠলো। বল্লে—এর চেয়ে অধিক ভাববার শক্তি আপনাদের নাই। হ্যাঁ আমি কাপড় সংগ্রহ করেছি। সেগুলা দরিদ্র নারায়ণের সেবায় যায়। কিন্তু একথা কি সন্দেহ করেছে ডিপার্টমেণ্ট

যে এ গুদামের মাল সরবরাহ করেছেন তাদেরই লোক শ্রীবিশ্বনাথ মল্লিক।

—বিশ্বনাথ মল্লিক ?

—এই সহি কার ? কি লিখেছেন মনে নাই ? পড়ে দিচ্ছি—

প্রিয় ভগ্নি

আমি বহু কষ্টে কয়েক জোড়া কাপড় সংগ্রহ করেছি। আপনি দরিদ্রাদের বিতরণ করবেন। আমি সরকারের হুকুম নিয়েছি। কিন্তু আমাকে মনে রাখবেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত উদার। রূপ-গুণ-মুগ্ধ

শ্রীবিশ্বনাথ মল্লিক

ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট

বিশ্বনাথ শিহরে উঠলো। সহি তার বাকিটা জাল।

তাকে বোঝালে অমিয়বালা। শেষে বল্লে—সত্যই ভায়ের মত মানুব যদি দরিদ্রের অনিষ্ট না করেন। কিন্তু জেলে দেবার জাল পাতলে আমাকেও জাল জুয়াচুরি করতে হবে। সহি করেন কেন ? এ কথা ডিপার্টমেণ্ট জিজ্ঞাসা করবে। উত্তর ভাবুন। আমার সাক্ষী আছে, এ চিঠি আপনার।

নিঃশব্দে বিশ্বনাথ গৃহত্যাগ করলে। রিপোর্ট লিখলে সন্দেহ ভিত্তিহীন।

তবুও সাবধানী কেদারবাবুর পরামর্শে অমিয়বালা বাকী কাপড়গুলা অন্যত্র রেখে এলো। জালায় ভরলে পবিত্র গঙ্গাজল।

আজাদ-হিন্দ-সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(২)

ইংরাজী ভাষার "গ্র্যাণ্ডার" বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বাঙ্গলায় যদি তাহার দ্বারা জাঁকজমক বুঝায় তবে তাহার সহিত সুভাষচন্দ্রের মনের মিল ও অন্তরের সম্প্রীতি ছিল। খদ্দর ত্যাগের প্রতীক এবং গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেস, চাকচিক্য বর্জ্জন কংগ্রেসের অন্যতম মূলনীতি বলিয়া বিঘোষিত করিলেও কংগ্রেসে জাঁকজমক ও চাকচিক্যের অভাব কোনদিন দেখা যায় নাই। গান্ধীজী কংগ্রেসকে শহর হইতে দূরে পল্লীগ্রামে অথবা গণ্ডগ্রামে যেখানেই কেন লইয়া যান্ না, জাঁকজমক এবং চাকচিক্য হাত ধরাধরি করিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, রঙ্গভরে, লাস্যসহকারে গীতিনাট্যের 'ব্যালে'র মত, সেইখানেই সহযাত্রী হইয়াছে। মোটা সূতায় হাতে-বোনা খাটো ও 'গড়' খদ্দরও রাজাধিরাজ মহারাজার প্রাপ্য মান ও মর্য্যাদা পাইতে অভ্যস্ত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, গান্ধীজী স্বয়ং ! গান্ধী-আরুইন চুক্তির দিনের কথা আমার মনে আছে। আমি তখন দিল্লীপ্রবাসী, খদ্দরের কটীবাসপরিহিত 'অর্দ্ধউলঙ্গ' এই ব্যক্তিটি যখন পুরাতন দিল্লী হইতে নয়া দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি প্রাসাদে গমনাগমন করিতেন, তখন জড় প্রস্তরনির্ম্মিত রাজপথ পর্য্যন্ত সজীব হইয়া উঠিত ; সুবিশাল ও সুবিস্তৃত রাজধানীও ইন্দ্রপুরীতুল্য, জাঁকজমকে খচিত ও চাকচিক্যে সচকিত হইয়া উঠিত।

আজ আবার নূতন করিয়া তাহারই পুনরভিনয় দেখিতে পাইতেছি। আজ দিল্লীতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী-মিশন ভারতবর্ষের সহিত বুঝা-পড়া করা যায় কিনা, কোন্ কোন্ সর্ত্তে বুঝা-পড়া হইতে পারে তাহারই বুঝা-পড়া করিতে বসিয়াছেন। এ সময়ে গান্ধীজী দিল্লীতে না থাকিলে, দিল্লীর যজ্ঞ দক্ষ-রাজার নিষ্ফল যজ্ঞ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। তাই গান্ধীজী দিল্লীতে উপনীত। কিন্তু অবস্থিতি, ভাঙ্গি-পল্লীতে। দু'চার দিনের জন্য দিল্লী প্রবাস করিতে আসিয়া দেখি, সেই ভাঙ্গি-পল্লী রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদকেও তুয়ো দিতে বসিয়াছে। এই মেথর পাড়ায় স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের ঘন ঘন আগমন ঘটিতেছে ; পাতিয়ালার মহারাজের কানের ও আঙ্গুলের ভূষণগুলির দ্বারা আধখানা দিল্লী আমি নিলামে কিনিতে পারি ; (অবশ্য যদি নিলামে উঠে) ভূপালের নবাব যে এখানে পদার্পণ করিবেন তাহা কি তাঁহারই স্বপ্নেরও অগোচর ছিল না ? বড়লাট সাহেবের অর্থসচিব প্রবল পরাক্রান্ত আর্চিবল্ড রাউল্যাণ্ড সাহেব নাসিকায় রুমাল না দিয়াও এই পাড়ার এই কুটীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেছেন, ইহাও চাক্ষুষ করা যাইতেছে। নারায়ণ ভুরি-ভোজনের স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া বিদুরের কুটীরে ক্ষুদান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; রাজা অশোক স্বর্ণ সিংহাসন অপেক্ষা ভূম্যাসনে বসিতে ভালবাসিতেন ; গান্ধীজী হরিজন-পল্লীকে দুনিয়ার 'বড়' লোকদের পাতে তুলিয়া দিলেন। ভাঙ্গি পল্লী জাঁক জমকে জম জম, গান গুঞ্জনে গম্ গম, চাকচিক্যে চকিত ও 'গ্র্যাণ্ডারে' সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

বহুকাল পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-পর্য্যটক তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, 'গান্ধীজীর মত কুৎসিত ও কদাকার লোক সচরাচর দেখা

যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই কদাকার কুৎসিত লোকটির চতুষ্পার্শে এমন একটি শুচিস্নাত সুরুচিসম্পন্ন 'রাজশ্রী' বিরাজ করে যে, যে কোন লোক তাহার সন্নিধানে আসিবামাত্র অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যত দম্ভোদ্ধত চিত্ত ও উন্নতশির যে দেশেরই মানুষ হোক না কেন, এই সহজ, শান্ত, স্তব্ধ, ও সুবিন্যস্ত পর্ণকুটীরের অধিকারীর সম্মুখীন হইবামাত্র নিজের অজ্ঞাতসারে বিনয়ে নত হইয়া আসে। পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে, খুব সাদাসিদা, অমসৃণ খদ্দরের ভূমি-শয্যা, কুটীরে আসবাবপত্র আদৌ নাই, অথবা থাকিলেও এতই অল্প ও তুচ্ছ যে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কুটীরাধিকারী লোকটি কটীবাস পরিহিত, উত্তরীয় আছে কিম্বা নাই, দেখা যায় না। চোখে মোটা কাচের চশমা—একখানি ফ্রেম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খদ্দরের দড়ি তাহার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। আর রূপের বর্ণনা সে ত আগেই করিয়াছি! কিন্তু ঐ দুর্ব্বল, কৃশকায়, জীর্ণ ও কদাকার লোকটির সম্মুখীন হইবামাত্র মনে হইল, আগন্তুকের নিকট হইতে রাজকীয় মর্য্যাদা আদায় করিয়া লইবার জন্যই সে বসিয়া আছে; প্রাপ্য না দিয়া উপায় নাই। পৃথিবীর বহু নরপতি যে সম্মান দুরাশাতেও আশা করিতে পারেন না, এই আরক্ত-উজ্জ্বলনয়ন, অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকিরটি অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে অভ্যস্ত।' [হাফ নেকেড ফকির।]

আজ খদ্দর সূক্ষ্ম ও মসৃণ হইয়াছে; কিন্তু খদ্দরের জন্মকালে খদ্দর পরিধান করিয়া ভদ্দর হওয়া সম্ভব হইলেও খদ্দর ছিল মোটা, মেঠো ও অভদ্র। 'বুনো' ঘোড়া 'ব্রেক' করিতে সেকালের কুক্ বা হার্ট ব্রাদার্সকে যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইত, ভদ্দর হইবার বাসনায় খদ্দরধারণোদ্দেশ্যে কটীদেশ 'ব্রেক' করিতে আমাদিগকে তদপেক্ষা কম বেগ পাইতে হয় নাই। সেকালে খদ্দরে 'বাবু' সাজা সাধ্যাতীত ছিল বলিলে বেশী বলা হয় না। গান্ধীজীর অবশ্য বাবুয়ানির বালাই নাই (কটীবাস বাবুয়ানির বিপরীত বিকাশ), তিনি বিলাতের বাকিংহাম প্যালেসের অধিশ্বর-অধিশ্বরীকেও খদ্দরেই 'ধন্য' করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, তস্য পুত্র দিগ্বিজয়ী জওহরলাল, আমাদের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, ভস্ম কখনই অগ্নিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না—খদ্দরেও রূপ ফাটিয়া পড়িতে পারে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উন্নত শিরে গান্ধীজী একদা একসঙ্গে তিনটি শিরোপা চাপাইয়া দিয়াছিলেন। সেদিন, যতীন্দ্রমোহন ছিলেন বাঙ্গলার কংগ্রেসের নেতা, আইন সভায় কংগ্রেসের দলপতি ও কলিকাতার মেয়র: একই সময়ে তিনটি সম্মানজনক পদের অধিকারী। আমাদের প্রাচীন কাব্যাদি গ্রন্থে পুরুষের রূপের একটা মান (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) ছিল, সেকালের সমাজে সেই রূপের একটা মান (মর্য্যাদা) ও ছিল। আজ পুরুষের রূপের ত কথাই নাই, নারীর রূপ বর্ণনাও অচল এবং কাজে কাজেই অদৃশ্য। অবশ্য বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত পরিণতি বটে! সাহিত্য সমাজের মুকুর! সমাজে যাহা আছে, সাহিত্যে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়; সমাজে যাহা নাই, সাহিত্যে তাহা আসিবে কিরূপে? যেদিন দেশে খাদ্যের অভাব হইয়াছে, রূপের চিন্তা সেইদিন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। আজ দুর্ভিক্ষ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে বটে; কিন্তু সূচনা বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষকবলিত দেশের কবি ক্ষুধার জ্বালা অঙ্কিত করিতে পারিলেও রূপ-জ্যোতিঃ তাঁহার ধারণার অতীত। আজ যদি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সশরীরে আগমন করিতেন, তাহা হইলে প্রতাপ রায় কিম্বা শৈবলিনী থাকিতে তাহার দিগ্বিজয়ী লেখনীও অবশ ও অলস হইত। থাক্ সে কথা।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রূপের মানও পূরণ করিয়াছিলেন, প্রাপ্য মান ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘোন্নত দেহ, বিশাল বৃষস্কন্ধ, গৌর বর্ণ, সুকুমার আনন, খগ নাসা, আয়ত লোচন, আজানুলম্বিত বাহু মোটা খদ্দরের চাপে বিবর্ণ বা মলিন না হইয়া উজ্জ্বল বিভায় বিকশিত হইতেই দেখা যাইত। সেনগুপ্ত বারবার পাঁচ বার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সদগুণরাশির তাঁহার অভাব ছিল না, কিন্তু কাব্যবর্ণিত রূপও যে অনেকখানি কার্য্য আপনা হইতেই সাধিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কথায় বলে, পহেলা দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারী। কথা সঙ্গত। সুভাষের সম্বন্ধেও কথাগুলি খাটে; সর্ব্বাংশে না হোক অংশতঃ নিশ্চয়।

গান্ধীজী, মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় খদ্দরকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, রাষ্ট্রসাধনার অঙ্গের সহিত খদ্দরের গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু, সর্ব্বত্যাগীর ভূষণ করিলেও সন্ন্যাসীর গেরুয়া করার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না ইহা সকলেই জানে। কংগ্রেসী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে,ঘর সংসার ভাসাইয়াছে,বিলাস ব্যসন তাহাদের নিকট অস্পৃশ্য,তথাপি কংগ্রেস সন্ন্যাসীর আশ্রম বা উদাসীর মঠ হয় নাই। তাই গান্ধীজীর ভাল লাগে কি ভাল লাগে না, তাঁহার ইচ্ছা আছে কিম্বা নাই ইহার সন্ধান করিতে উদ্যোগ আয়োজন কেহ করে নাই এবং কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় শক্তি অর্জ্জন করিয়া যতই শক্তিশালী হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের জাঁকজমকও বাড়িয়াছে। কাহারও পছন্দ অপছন্দর প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক ও অবান্তর। সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে জাঁক-জমকের আকর্ষণ ফুলের অভ্যন্তরে মধুর মত ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত, সংমিশ্রিত ছিল।

ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ সুভাষচন্দ্রের হাতে আসিয়া পড়িল। লীগের বহু শাখা প্রশাখা সুবিস্তৃত দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডে পরিব্যাপ্ত। ভারতবর্ষীয় কংগ্রেসের অনুসরণে সেখানেও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সাধনা চলিতেছিল। বৃটিশের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পরাধীন জাতির মনে উল্লাস ও উদ্দীপনার প্রবল প্রবাহ সেখানেও প্রবাহিত। বৃটিশ-পরিত্যক্ত ভাগ্য-বিড়ম্বিত ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, সেই সময়ে, সেই অবস্থায়, সেই পরিবেশে সহজ ও স্বাভাবিক হইলেও, সেই পরদেশে, ভূমিশূন্য রাজ্যে একটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে রাজসিকতা, তাহার জাঁকজমক ও চাকচিক্য কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্রেরই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তাহা আমরা নিঃসন্দেহে, দৃঢ়তার সহিত নিশ্চিত অনুমান করিতে পারি। পরদেশে ভূমিশূন্য রাষ্ট্র গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইতে ক্যাবিনেট সংগঠনের যে ঔজ্জ্বল্য,তাহাও সুভাষচন্দ্রের

অন্তরের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। বহুদিন, ন্যূনপক্ষে এক যুগাধিককাল পূর্ব্বে তাহার সূচনা এই কলিকাতা সহরেই দেখিয়াছিলাম। দুই আর দুই যেমন চার হয়, পাঁচ কিছুতেই হয় না, তেমনই সেদিনের সঙ্গে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠার দৃশ্যের সামঞ্জস্য অস্বীকার করা অসাধ্য।

আমরা সকলেই জানি, সুভাষবাবু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হইয়াছিলেন। একবার—বোধহয় ১৯২৮ সালে, তাঁহাকে মেয়র নির্ব্বাচিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বাদ-বিসম্বাদের ফলে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া বি, কে, বসু (আমাদের 'মিতা' বিজয়কুমার বসু) মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ইহার আড়াই বৎসর পরে, সুভাষবাবু যখন কারাগারে আবদ্ধ (আগষ্ট ১৯৩০) তখন তিনি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মেয়র্যালটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কারামুক্ত হইয়া কয়েকমাস কাজ না করিতেই পুনরায় কংগ্রেসীর স্থায়ী আবাস—রাজার অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। গান্ধীজী যেমন একটিবারমাত্র কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ক্ষান্ত এবং তদবধি সভাপতি প্রস্তুতকারক (কুম্ভকার ?) থাকিয়া সন্তুষ্ট আছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনেও সুভাষবাবু তদ্রূপ মেয়র-মেকার থাকিয়াই খুশী। চিত্তরঞ্জন দাশ দুইবার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পাঁচবার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দুইবার মেয়র হইয়াছেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু ঐ একবারই, তা'ও ঐ কয়েক মাসেরই জন্য।

মেয়র—মহানগরীর সর্ব্বপ্রধান নাগরিক, পদটি সম্মানার্হ এবং বিশেষ মর্য্যাদাব্যঞ্জক। লণ্ডনের মেয়রকে লর্ড মেয়র বলা হয়। লর্ড মেয়রের পদের অসামান্য মর্য্যাদার কথা আমাদের পাঠক-সমাজের অবিদিত থাকিবার কথা নহে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের আমূল সংস্কার সাধন করিয়া যে মনস্বী ব্যক্তি লণ্ডনের ধাঁচে মেয়র পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মস্থান কলিকাতা মহানগরীর মেয়র পদটিকে অনুরূপ সম্মানসমৃদ্ধ করিবার বাসনা পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বলিখিত জীবন কথায় 'এ নেশন ইন দি মেকিং'এ তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। লণ্ডনের লর্ড মেয়রের ব্যাঙ্কোয়েট্ লর্ড মেয়রের ডিনার ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। হয়ত দরিদ্র ভারতবর্ষের মেয়রগণকেও সেই 'টামসিক' গড্ডালিকা-স্রোতে ভাসিতে হইত কিন্তু দরিদ্রনারায়ণের সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ লণ্ডনের প্রান্তবাহিনী টেমস্ নদীর পরিবর্ত্তে সগররাজকুল উদ্ধারিণী স্বর্গমন্দাকিনী পূতবাহিনী ভাগীরথীর পুণ্যস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, লর্ড মেয়রের চিত্র সেই স্রোতে কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার হদিস পাইবার উপায় নাই। প্রসঙ্গতঃ এ কথাটা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, ইংরাজের সহিত ভারতবর্ষের যখন জান্ পহ্চান্ও ছিল না, আমাদের ভারতবর্ষের বহু নগরে তখনও মেয়রের উচ্চাসন ছিল এবং নাগরিকগণ যোগ্য ব্যক্তিকে মেয়র নির্ব্বাচন করিত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র। মেয়র্যালটি ইংরাজের অভিনব দান বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

সুভাষচন্দ্র বসু মেয়র। একদিন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, কর্পোরেশনে একটা রিসেপসান্—পরিচয় সভা—অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। পরিচয়-সভায় কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কর্পোরেশনের পদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দকে মেয়রের সহিত পরিচিত করাইবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে যে না পারে এমন নহে। এক সময়ে এই সুভাষচন্দ্র বসু এই কর্পোরেশনেরই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন ; পরে কাউন্সিলার অথবা অল্ডারম্যান ও ভিন্ন ভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে বহুকাল হইতে কর্পোরেশনের সহিত প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত আছেন। পদস্থ কর্ম্মচারিদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহকর্ম্মী অথবা সহকারী ছিলেন, এখনও আছেন ; অধিকন্তু প্রায় সকলেই সুপরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে ও এমন অবস্থায় রিসেপসানের প্রস্তাব যেন, বাস্তবিক কেমন-কেমন ! কিন্তু মেয়র যখন বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন তখন তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করাই সুসঙ্গত। প্রস্তাব কাহার ভাল লাগিল, কাহার লাগিল না ; কে কি বলিল না বলিল, ইহা নিতান্তই অবান্তর।

এইখানে একটা মজার গল্প বলি। গল্পটি আমি সুভাষবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে, সুতরাং গল্প হইলেও গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত "ফরওয়ার্ড" পত্রের তখন ভারি বোল্ বোলাও। সুভাষচন্দ্র বসু "ফরওয়ার্ড"-এর কর্ম্মাধ্যক্ষ। কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত একটা লেন-দেনের সম্পর্ক "ফরওয়ার্ড" পত্রের ছিল – সকল সংবাদপত্রেরই থাকে। কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে কর্ম্মচারীটি 'মাল' সরবরাহ করিত, সেই ব্যক্তি কিছু 'উপরি' আদায় করিত, সকল ক্ষেত্রেই তাহার বাঁধা বন্দোবস্ত। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, সংবাদ সম্পর্কে সংবাদপত্রের সম্পাদক যেমন সর্ব্বনিয়ন্তা, তাগিদ খাইতেও তিনি, লোককে চতুর্ব্বর্গ—খুশী করিতেও তিনি, "ঐ যাঃ !" হারাইয়া ফেলিতেও তিনি। পয়সা কড়ির ব্যাপারে তেমনই ম্যানেজারই 'শেষ কথা।' কর্ম্মচারীটি "ফরওয়ার্ড" পত্রের ম্যানেজারের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য 'উপরি' আদায় করিত। সে-কি ছাই কল্পনাতেও ভাবিতে পারিয়াছিল যে খবরের কাগজের আপিস হইতে ঐ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছোকরা অচিরকালমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া বসিবে। তাহার চিরাচরিত 'ফেল কড়ি মাখ তেল' নীতির প্রয়োগে "ফরওয়ার্ডের"ম্যানেজারকে,কোনও সময়ে বোধ করি একটু বেশী মাত্রায় উত্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ছিনে জোঁকের মত, জলোকা জালার আকার ধারণ না করা পর্য্যন্ত শোষণের বিরাম ছিল না। সুভাষবাবু যখন তক্ত তাউসে (চীফ একজিকিউটিভ অফিসার) বসিয়াছেন, তখন একদিন কার্য্যব্যপদেশে নিরীহ জলোকার প্রবেশ। চীফের ঘরে তখন অন্যান্য কর্ম্মচারীও ছিলেন। চীফ সকলকে একে একে 'ছুটী' দিয়া, সর্ব্বশেষ সেই ব্যক্তির ফাইল ধরিলেন। ফাইল ত ছাই-পাঁশ ! চীফ মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতেই তাহার অন্তরাত্মা খাবি খাইতে সুরু করিয়াছিল। কেশবিরল কোন্ অশুভদর্শন ব্যক্তির মুখ দেখিয়া প্রভাত হইয়াছিল, তাহারই হিসাব নিরাকরণে সে যখন আকাশ পাতাল চিন্তামগ্ন, চীফ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি…এই নহে ? রক্তমোক্ষণকারী জলোকা মুহূর্ত্তে সিক্ত-মার্জ্জার ; সবিনয়ে নিবেদন করিল, তাহাই বটে !

পিতামাতা ঐ নামই রাখিয়াছেন। প্রশ্ন হইল, আমি যখন "করওয়ার্ডে" ছিলুম, আমার কাছে আপনি প্রায়ই যেতেন, মনে পড়ে কি? কণ্ঠতালু তখন চৈত্র বৈশাখের বাঁকুড়া জেলার ধান্তক্ষেত্র; অন্ত্রমধ্যস্থ প্লীহা লিভার ফুটি-ফাটার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আক্কেল নামক বস্তুটি (যদি থাকিয়া থাকে) বন্দুকের আওয়াজ করিবার উপক্রম করিতেছে; অজ্ঞাত অদৃশ্য স্থানে বসিয়া টায়ফয়েডের রোগীর মত বাসুকী মাথা চালিতেছে; পদতলে ধরিত্রী টলমল—টলমল করিতেছে। এখনই এই মুহূর্ত্তে, ঐ কলমের একটি টানে চাকুরী জীবনের অন্তই "শেষ রজনী" হইতে পারে—চাকুরী-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর মানসিক অবস্থা যে লোক না বুঝিতে পারে তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা, বাঙ্গালী জীবনই ব্যর্থ। বাঙ্গালী চীফও তাহা না বুঝিবেন কেন? বলিলেন, যা করেছেন—করেছেন; আর করবেন না; মাইনেতেই সন্তুষ্ট থাকবেন, 'উপরি'র সন্ধান করলে চাকরী থাকবে না। লোকটি নাকি স্বস্থানে ফিরিয়া 'পতন মূর্চ্ছা' হইয়াছিল। তাহার পর একমাস জ্বরে ভুগিয়াছিল। জ্বরের মধ্যে কেবল ভুল বকিত; বলিত, ইস্! কে জানে যে সে এই! 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইয়াছিল; এই লোকটিও "এই সেই, সেই এই" রবে বাড়ীর লোককে দুশ্চিন্তিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কর্পোরেশনের চীফ জে-সি-মুখার্জ্জি মনে মনে যতই হাস্য করিতে থাকুন, (অবশ্য হাস্য করিয়াছিলেন কি-না তাহা আমি দেখিতে যাই নাই; তিনিও আমাকে সাক্ষী রাখিয়া দন্তরুচিকৌমুদী করেন নাই) মেয়রের বাসনা চরিতার্থ করিতে বিলম্ব করিলেন না। কবে, কোথায় ও কোন্ সময়ে রিসেপসান্ হইবে এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী মেয়রের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবেন, কে আগে কে বা পরে, তাহার তালিকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী—শুধু কর্ম্মচারী কেন, করপোরেশন সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকই বেশ সচকিত হইয়া উঠিল। একটা মজা উপভোগ করিবার উপকরণ জুটিয়া গিয়াছে বলিয়া আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। নূতন লাট সাহেব আসিলে রিসেপসান হয়, তাহারা জানে; লাট সাহেবরা জেলায় গেলে রিসেপসান হয় ইহাও তাহারা শুনিয়াছে। কিন্তু মেয়রের রিসেপসান, অভিনব বটে! যাহাই হৌক, রিসেপসান বেশ জাঁকজমকের সহিত—হইয়া গেল। চীফ একজিকিউটিভ অফিসার পদস্থ কর্ম্মচারিদের একে একে মেয়রের সহিত করমর্দ্দন করাইয়া দিলেন। "পরিচিত করাইয়া দিলেন"—এই কথাগুলি আমি ইচ্ছা করিয়াই লিখিলাম না; লিখিলে মিথ্যা বলা হইত; কারণ মেয়রও সকলের সুপরিচিত; কর্ম্মচারীও প্রায় প্রত্যেকেই মেয়রের পরিচিত।

যে কথাটি বলিবার জন্য এতখানি ভূমিকা করিলাম এবং প্রবন্ধ-সূচনাতে যে কথা বলিয়াছি, এখন সেই কথায় ফিরিয়া আসিতে হয়। জাঁকজমকের প্রতি সুভাষচন্দ্রের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল; আমাদের গোলোকবাসিরা বলিয়াছে, (গত মাসে আপনারা তাহা পাঠ করিয়াছেন।) উত্তর বঙ্গের বন্যাত্রাণ শিবিরের পক্ষে একান্ত অনাবশ্যক ও অশোভন (অবশ্য গোলোকের মতে!) হইলেও, রাতারাতি ক্যাম্প কমাণ্ডেণ্ট, ডেপুটী কমাণ্ডেণ্ট, এসিষ্টাণ্ট কমাণ্ডেণ্ট, এ্যাডজুটাণ্ট, এটাচি কত হরেক রকমের পদ ও রকম বেরকমের পদবী সৃজিত হইয়া গেল। শিবির হইতে তের মাইল দূরে পোষ্টাফিসের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য মেল্ রাণার সিষ্টেম প্রবর্ত্তিত হইল। হাসির কথা বলিব আর কত? প্রকাণ্ড একটা পেটা ঘড়ি আসিয়া গেল। কি না, খাবার ঘণ্টা দিতে হইবে! ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে থালা, গ্লাস হাতে ফল্ ইন। এ কি স্কুল, না কলেজ, না পুলিশের ফাঁড়ী যে প্রকাণ্ড ব্ল্যাক বোর্ড আমদানী করিবার দরকার হইয়া পড়িল? ক্যাম্প কমাণ্ডারের ক্যাম্পের দেওয়ালে ব্ল্যাক বোর্ড বিলম্বিত—সকালে নোটিশ, বিকালে বিজ্ঞাপন, সন্ধ্যায় ইস্তাহার, নিশীথে জরুরি বিজ্ঞপ্তি! বিবাহ যেমন-তেমন হৌক না কেন, তিন পায়ে আলতার বহর দেখে কে?

গোলোকের লোকেরা যাহাই বলুক না কেন, শৃঙ্খলা-সুবিন্যস্ত শিবির পরিচালনার ভিতর হইতে যথা কাচের ফানুসে আবৃত আলোকের রশ্মির মত চাকচিক্য ও জাঁকজমক বিকীর্ণ হইতেছিল, নিতান্ত অন্ধ ব্যতিরেকে কাহারও চক্ষু এড়াইতে পারে না। বলা বাহুল্য সমস্তই সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা।

হইলই বা বন্যার্ত্তত্রাণ শিবির। দুঃস্থের সাহায্য করিতে আসিয়া দুস্থ সাজিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছে তাহাদের উপর সম্ভ্রম না জন্মিলে সাহায্যের সম্পূর্ণ সুফল সম্ভব হইতে পারে না। দুঃখীর ঘর-করণার পানে দুঃখী খুব ভরসাপূর্ণ নয়নে চাহিতে পারে না। শিবির সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাসম্পন্ন হইলে তবে না আর্ত্ত, আতুর দুঃস্থ ভরসা করিবে; প্রত্যাশা করিতে পারিবে; মনে বল পাইবে! দুঃখীর ঘরকন্না করিলে চলিবে না, শিবিরকে শিবির করিতে হইবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। প্রতিপক্ষ প্রবল, প্রভূত পরাক্রমশালী, ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল সহস্রগুণ অধিক। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র বিরাজমান। জলে তাহার জাহাজ, সবমেরিণ, টর্পিডো, মাইন; স্থলে ট্যাঙ্ক, গান্, কামান; বিমানে তাহার বম্বার, বিমান। তত্তুলনায় আজাদ হিন্দ ফৌজ অতীব নগণ্য। অস্ত্র অপ্রতুল, স্বেচ্ছাদত্ত দানের উপরে গঠিত ধনবল! কোথায় গান্, কোথায় ট্যাঙ্ক, কোথায় বিমান! কোথায় কি!

জাপানীর আছে—সবই আছে; কিন্তু তাহাতে ইহাদের কি! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনেক টাকা, তাহাতে কাহার কি! জাপান যদি বুঝিত এই পাপিষ্ঠদের সহায়তায় ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশকে খেদাইয়া খেঁদুমণিদের দিল্লীর দরবার হইবে তাহা হইলে দুষ্প্রাপ্যও সুপ্রাপ্য হইত; কিন্তু সুভাষ বোসের হাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দেখিয়াই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে; জাপানী হাত গুটাইয়াছে। ফসলের আশা থাকিলে তবে না দাদনী দাদন দেয়। আজাদীর কিছু নাই, তবু সব আছে। কেননা জন্মভূমির শৃঙ্খল মোচনের ব্রত ধারণ করিয়াছে। চড়া সুরে বাঁধা অন্তরের সেতার। ভিক্ষার গান গাহিবে না; মিনতির সুর ধ্বনিবে না; যাত্রায় বাজনা বাজিবে না।

সুভাষ বলিয়াছিলেন, তোমরা দেহের শোণিত দাও, আমি ভারতের

স্বাধীনতা দিব। তাহারা তাহাতেই সম্মত হইয়াছে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য তাহাদের শোণিতের প্রয়োজন আছে; নেতাজী বলিয়াছেন, শোণিত দিতে হইবে; তাহারা শোণিত দিতে চলিয়াছে এই মাত্র। শোণিত দানের পর স্বাধীনতা আসিল কিম্বা আসিল না, তাহা তাহারা দেখিতে আসিবে না; তাহারা তাহা জানিতেও চাহে না। নেতাজী বলিয়াছেন, স্বাধীনতা আসিবে, তাহারা স্থির বিশ্বাসে বুঝিয়াছে, স্বাধীনতা আসিবে। স্বাধীনতা কে ভোগ করিবে সে সমস্যা তাহাদের নহে। তাহারা জন্মভূমির—মাতৃভূমির বন্ধন মোচন করিতে উদ্যত; পারা না পারার প্রশ্নও তাহাদের নহে; তাহারা জানিয়াছে শোণিত মূল্যে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে হইবে; তাহারা মূল্য দিতে চলিয়াছে। অন্য চিন্তা তাহাদের নাই; অন্য চিন্তা তাহারা করে নাই।

কিন্তু তাহাদের নেতাজী অন্য চিন্তাও করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়েই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইউরোপ ও এসিয়ায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অক্ষশক্তি-অন্তর্ভুক্ত যতগুলি রাজ্য ও রাষ্ট্র ছিল, নিজ রাষ্ট্রকে তাহাদের সমতুল্য বিজ্ঞাপিত করিয়া রাষ্ট্রযোগ্য মর্য্যাদা দাবী করিলেন। দস্যু, লুঠেরা, ঠেঙ্গাড়ের দল ভারতবর্ষ জয় করিতে চলিয়াছে, সুভাষচন্দ্রের রাজ-অন্তঃকরণ এই দীনতা, হীনতা, এই মর্য্যাদাশূন্য অপবাদ সহিতে পারিল না। আমি মনে করি, এই সময়ে সুভাষের সহিত সুভাষের একটা নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। যে সুভাষ তাহার ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অধিনায়করূপে ভারতবর্ষকে বিদেশীর কবল হইতে উদ্ধার করিতে চলিয়াছে, আর যে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের অতীত ও ভবিষ্যতের মর্য্যাদার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি, এতদুভয়ে বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই আমি মনে করি। ইতিহাস শিবাজীকে লুঠেরা, ঠেঙ্গাড়ে ও দস্যু নামে অভিহিত করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। সুভাষচন্দ্রের অভ্যন্তরে যে রাজর্ষি-সুভাষের বসতি ছিল, বিদ্রোহে—অন্তর্বিরোধে—তাহারই জয় হইল। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিল। জার্ম্মানী, জাপান ও ইতালী স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রকে স্বীকার করিল; সমান মর্য্যাদা দিল। সুভাষের বাসনা পূর্ণ হইল।

ভুলাভাই দেশাইয়ের কথা স্বতঃই মনে পড়িতেছে। অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি ভুলাভাই, উদ্ধত রণজয়ীর পাশববলদৃপ্ত সামরিক আদালতে বিজিত, নিপীড়িত ও নির্য্যাতীত মানবের সহজাত অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিভা, যে মানবিকতা ও যে বাগ্মিতার প্রখর রবিরশ্মি বিকীরণ করিয়া গিয়াছেন, সুসভ্য পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা অপূর্ব্ব ও অভিনব। শৃঙ্খলিত সারমেয়ের শৃঙ্খল মোচনের অধিকার আছে; রজ্জুবদ্ধ গো, অশ্ব-মহিষেরও সে অধিকার আছে; পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গমও মুক্তি কামনায় পিঞ্জর ভেদ করিবার অধিকারী; সর্পেরও ফণা তুলিবার অবাধ অধিকার আছে; অধিকার নাই কেবল পরাধীন ও পরপদানত মানবের। সৃষ্টির আদি হইতে সৃষ্টির অন্তকাল পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি-সাধনার নাম, বিদ্রোহ! পরাধীন মানব সভ্যজগতে করীভুক্ত কপিত্থবৎ থাকিতে বাধ্য। তাই পরাধীন মানবজাতির মুক্তি প্রচেষ্টা সভ্যতার তুলাদণ্ডে অমার্জ্জনীয় মহাপরাধ বলিয়া বিবেচিত। ভুলাভাইয়ের স্মৃতি অক্ষয় হোক। বিশ্ব-বিজয়ী বৃটিশের সামরিক আদালতে তিনি পাণ্ডিত্য প্রভাবে, ন্যায় ও যুক্তিতর্কের প্রতাপে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন যে, জড়জগতে যাহাই হোক না কেন, জীবজগতে পরাধীনতার নাগপাশ মোচনের চেষ্টা জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, মহান ব্রত, চরম ও পরম সাধনা। যে জীব সে ধর্ম্মাচরণে বিরত, মহান ব্রত উদযাপনে পরাঙ্মুখ, সাধনায় উদাসীন, জীবজগতে সে ঘৃণ্য। পক্ষান্তরে, ব্রতধারী যে মানব ধর্ম্মসাধনা করিয়াছে, সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ যাহাই কেন হোক না, জীবজগতে সে বরেণ্য। মানবের শ্রেষ্ঠ ব্রত পালনে যদি জীবনাবসানও ঘটে, অনন্ত পুণ্য ও অক্ষয় স্বর্গ তাঁহার আয়ত্তাধীন। পৃথিবীর বিজিত ও পরাধীন মানুষ ভুলাভাই দেশাইয়ের কথা শুনিয়া ধন্য হইয়াছে। সামরিক আদালত দণ্ড সম্বরণ করিয়াছে; দণ্ডপ্রদাতা অপরাধীত্রয়কে মুক্তিদান করিয়াছেন। স্বর্গে যদ্যপি দেবতারা থাকেন, তাঁহারা ভুলাভাইয়ের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। তাই দেখি, সামরিক আদালতের বিচার শেষে স্বর্গের স্বর্ণমণ্ডিত পুষ্পকরথ মহারথী ভুলাভাইকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ধন্য ভুলাভাই, ধন্য তুমি! এই ভাইটিকে ভারতবর্ষ ভুলিবে না।

এই স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রই ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে বৃটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপর রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। কাহারও পক্ষে হীনতা বা মর্য্যাদাহানির কথা আর উঠিতে পারে না। দাবা-বোড়ের খেলায় রাজাকে রাজাই মারিতে পারে; মন্ত্রীকে মারিতে মন্ত্রীর দরকার হয়; হাতীকে হাতী দিয়া, ঘোড়াকে ঘোড়া দিয়া, নৌকাকে নৌকা দিয়া টিপিতে হয়—নহিলে খেলার নিয়ম ভঙ্গ হইয়া পড়ে; সম্মানের হানি হয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে জাঁকজমক ও চাকচিক্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন। সংসারবিরাগী, সর্ব্বত্যাগী কংগ্রেসী হইলেও সুভাষের মধ্যে 'সুপ্ত' রাজসিকতা, তাহাও এই সময়ে পরিপূর্ণ গৌরবে জাগরিত হইয়া উঠিল। রাষ্ট্র বহু বিভাগে বিভক্ত হয়। রাজস্ব বিভাগ, শাসন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, যুদ্ধ বিভাগ। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টেরও বহু বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে মন্ত্রী নিযুক্ত। মন্ত্রীরা সকলেই বিশ্বাসী, সুযোগ্য। দুঃখীর ঘরকন্না নহে—রাজর্ষির রাষ্ট্রতন্ত্র।

সুভাষ গঠিত রাষ্ট্রতন্ত্রে, নারীও পুরুষের সহিত সম মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর নেত্রী লক্ষ্মী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম পরিচালিকা। নব্য-ভারতের স্রষ্টা, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে নারীর দাবী অস্বীকার করিলে, ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মর্য্যাদা যেমন ক্ষুণ্ণ হইত, আজিকার পৃথিবীকেও তেমনই অবজ্ঞা করা হইত। সমগ্র এসিয়ায় যিনি জাগ্রত নব-জীবনের, নবীন ও দূরাগত জগতের গান শুনাইয়াছেন, তাঁহার রচিত রাষ্ট্রতন্ত্র পক্ষপাতমূলক বা একদেশদর্শী হইতে পারে না।

বন্দে মাতরম্

জয় হিন্দ

পথ-হারা

শ্রীবিমল বসু

বসন্ত-উৎসব। শীতের শীর্ণতা ও রুক্ষতা শেষ হয়ে গেছে। সরসতার ও বর্ণের স্পর্শ লেগেছে বনে বনে পথে প্রান্তরে আর মানুষের মনে। দলে দলে নরনারী চলেছে বিচিত্র বসনে, কণ্ঠ ভরে উঠেছে আনন্দ-গানে। আনন্দে প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—কথায় কাজে চলায় ফেরায় পোষাকে প্রসাধনে। অসংখ্য নরনারী চলেছে—কেউ গাড়ীতে, কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ পাল্কীতে, কেউ বা পদযানে। বসন্ত-উৎসবের মেলা যেখানে, অসংখ্য নরনারী চলেছে সেখানে। একটি ছোট্ট ছেলে তার মা আর বাবার সঙ্গে হেঁটে চলেছে। বসন্তকালের বাতাসে, সকাল বেলাকার রোদে, বনে প্রান্তরে পুষ্প শোভায় যে আনন্দ-আহ্বান, ছোট্ট ছেলেটির হাসিতে খুশিতে দ্রুত চলা ফেরায় তারই ছায়া ও প্রাণস্পর্শ।

পথের মাঝে একটা পুতুলের দোকান। চলতে চলতে খোকা থমকে দাঁড়াল রঙীণ পুতুল দেখে।···'ওরে খোকা আয়, চলে আয়···' মা ডাকলো খোকাকে। তার বাবাও যোগ দেয় সে-ডাকের সঙ্গে। অনিচ্ছার সঙ্গে খোকন এগিয়ে চলে পায়ে পায়ে। পুতুলটাকে নেবার তার ইচ্ছা খুব। মনটা কেমন করে রঙীণ পুতুলটার জন্যে। কিন্তু সে জানে তার মা-বাবার কঠোর নিষেধের ভ্রূভঙ্গির কাছে তার এই চাওয়াটা নিমেষে মিথ্যা হয়ে যাবে। তবু সে আবদারের সুরে বলে: 'আমি ঐ পুতুলটা নেবো···'

তার বাবা তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকায়। মায়ের মন খুশিতে কোমল আবেগে ভরা, বসন্ত-উৎসবের আনন্দ গুঞ্জন, সকাল বেলাকার বসন্ত বাতাসের স্পর্শ তার মনে কোমলতার আবেশ এনেছিল। তাই মা খোকনকে ভোলাবার জন্যে বলে উঠ্‌লো: 'দেখ, খোকন, সামনের দিকে চেয়ে দেখ।'

পুতুল না পাওয়ার জন্যে তার ছোট্ট মনে যে অভিমান আর ক্ষোভ জেগেছিল তা নিমেষে ধুয়ে মুছে গেল—মায়ের কথা মতো সামনের দিকে তাকিয়ে। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে সোনার বন্যা যেন। গলে যাওয়া সোনার ম্লান আভায় সারা মাঠ ভরা। সরষের ক্ষেত। সেই দিগন্ত বিস্তৃত সোনালী ঢেউয়ের পাশেই একটা সরু নদী বয়ে চলেছে গলে-যাওয়া সোনার ম্লান আভা বুকে নিয়ে। অশান্ত বাতাস এসে মাঝে মাঝে ঢেউ তুলছে এই সোনার সমুদ্রে, নদীর জলের সোনালী ছায়ায় লাগছে তার কাঁপন। নদীর ধারেই অনেকগুলো মাটী ছাওয়া ঘর। দূর থেকে সব ছবির মতো আঁকা মনে হয়। সেখানেই হলদে পোষাক-পরা অসংখ্য নরনারীর আনন্দ-কণ্ঠের বিচিত্র ঐক্যতান। একটা অদ্ভুত আনন্দ-গুঞ্জন যেন মাঠ নদী বন পেরিয়ে ঊর্দ্ধে নীল আকাশের বুকে আঘাত জানাবার চেষ্টা করছে। খোকনের চোখ আনন্দে ভরে উঠলো। অদ্ভুত আনন্দ-অনুভূতি জাগলো তার একবার। একবার চকিতে সে তার মা বাবার মুখের দিকে তাকাল। দেখলো সেখানেও লেগেছে এই আনন্দ স্পর্শ। অনাবিল আনন্দে তার চোখ দুটো যেন নেচে উঠলো। চঞ্চল পদে সে নেমে এলো পায়ে-চলা পথের ওপর। দূর প্রান্তর থেকে নাম-না-জানা ফুলের মিঠে গন্ধ বাতাসকে মধুরতর করে তুলেছে। অজস্র ফুল, আর নানা রঙের মৌমাছি আর প্রজাপতি দেখে খোকন পথ থেকে নেমে এলো মাঠে। রামধনু রঙের প্রজাপতিকে সে ধরবে, মধু-লোভী মৌমাছিকে সে বন্দী করে রাখবে তার ছোট্ট হাতের মুঠোর মধ্যে। দ্রুতপদে সে অনুসরণ করে চলেছে কখনও প্রজাপতিকে, কখনও মধু-লোভী মৌমাছিকে। সমস্ত প্রকৃতি, মাঠ, বন, ফুল, পাখী, মৌমাছি, প্রজাপতি যেন খোকনকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। মায়ের ডাকে তার যেন স্বপন ভাঙ্গে—'খোকন, পথের ওপর এসো,···খোকন!'

কিছুক্ষণ সে তার মা বাবার সঙ্গে চলে কিন্তু আবার সে পেছিয়ে পড়ে। পথের ধারে নানান ধরণের বিচিত্র বর্ণের কীটপতঙ্গ দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। সকাল বেলাকার রোদ পোহাবার জন্যে অন্ধকার গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে আসে বিচিত্র বর্ণের কীটপতঙ্গের দল,খোকন অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে।

…'খোকন, এসো শিগগিরি'…আহ্বান আসে আদেশের স্বরে। চমক ভেঙ্গে আবার সে দ্রুতপদে চলতে সুরু করে। দৌড়ে সে যায় তার মা বাবার কাছে। একটা লতাপাতায় ঘেরা কুঞ্জবনের মতো পরিচ্ছন্ন স্থান। তার কাছে একটা ইঁদারার পাড়ে বসে তার মা বাবা বিশ্রাম করতে সুরু করে। বট গাছের বিস্তৃত শাখা প্রশাখার তলায় সানন্দে জেগে উঠেছে নানান ধরণের ফুলের গাছ। ফুল ফুটে আছে অজস্র, যেন আত্মনিবেদন করছে নিজেদের সূর্য্য দেবতার কাছে। আর্দ্র বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ মেশানো। বিচিত্র পরিচ্ছন্ন মনোরম সকাল। খোকন এ-সব চেয়ে দেখতে দেখতে নিমেষে ভুলে গেলো তার মা বাবার কথা। কুঞ্জবনে প্রবেশ করতেই দেবতার আশীর্ব্বাদের মতো অসংখ্য ফুল ঝরে পড়লো তার মাথায় কাঁধে, হাতে পায়ের কাছে। আনন্দে শিউরে উঠে সেগুলো সে কুড়াতে সুরু করলো। সহসা কোথায় ঘুঘু ডেকে উঠলো। আনন্দে সচকিত হয়ে সে ছুটে এলো তার মা বাবার কাছে, আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলো: 'বাবা…মা, ঘুঘু—ঘুঘু ডাকছে…।' তার হাত থেকে তার সযত্নে কুড়ানো ফুলগুলো তারই অজ্ঞাতে ঝরে পড়ে গেল। অবাক চোখে সে তাকিয়ে রইল তার মা বাবার মুখের দিকে। সে চোখ আনন্দ জিজ্ঞাসায় ভরা। কোথায় হঠাৎ ডেকে উঠলো কোকিল কুহু কুহু করে, সে আনন্দে চঞ্চল হয়ে দৃষ্টি ফেরাল সেদিকে।

…'খোকন আয়, আয় খোকন…' মা বাবার ডাকে তার যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। তার মা-বাবা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে মেলার দিকে সরষের ক্ষেতের উপর দিয়ে পায়ে চলা আঁকা বাঁকা পথ ধরে। সেও তাদের অনুসরণ করে চললো। খানিক চলার পর তারা এলো একটা গ্রামের বহির্প্রান্তে। খোকন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—মেলা-যাত্রী অসংখ্য লোকের ভীড়। ক্রমে এলো তারা মেলার প্রবেশ পথে। বিচিত্র কণ্ঠের স্বরে সে স্থান মুখরিত। মেলার প্রবেশ পথেই বসেছে খাবারের সারি সারি দোকান, দোকানদার হাঁকছে: রসগোল্লা…বরফি…জিলাপী… দোকানটা চমৎকার করে সাজানো। খাবারগুলো কি চমৎকার ভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে মন্দিরের চূড়ার মতো করে রেখেছে! চোখ বড়ো বড়ো করে খোকন তাকিয়ে রইল। অস্ফুট কণ্ঠে খোকন বল্লো: 'আমি বরফি নেবো…' কিন্তু প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই সে এগিয়ে চল্লো; কারণ সে জানতো বরফি চাইলেই তা সে পাবে না। তার মা বাবা বরং তাকে ধমক দেবেন পেটুক আর লোভী বলে।

…গোল-মোহরের মালা চাই, গোল-মোহরের মালা… ফুলওয়ালা হাঁক দিলো। বাতাসে ভেসে আসা ফুলের মিষ্টি গন্ধে খোকনের বুক ভরে যায়। স্তূপাকার করা ফুলের মালার দিকে এগিয়ে গিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে খোকন বলে:…'আমি ফুলের মালা নেবো…' কিন্তু সে জানে এ মালা চাইলেও সে তা পাবে না। তার মা বাবা বরং তাকে ধমক দেবে: 'দূর বোকা, এত সস্তা জিনিস কখনও নেয়…' তাই সে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে।

একটা বেলুনওয়ালা নানান রঙের বেলুন বিক্রি করছে। সুতোয় বাঁধা বিচিত্র বর্ণের বেলুনগুলো নেবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। অথচ এই ব্যস্ততা যে নিষ্ফল তাও সে বুঝল। হয়ত শুনে বাবা মা তাকে ধমক দেবে: বেলুন নিয়ে খেলবার আর দরকার নাই। তাই সে এগিয়ে চলে।…

সাপুড়ে বাঁশী বাজিয়ে সাপের খেলা দেখাচ্ছে। ঝাঁপির ভেতর থেকে একটা সাপ হাঁসের মতো গলা বার করে স্থির হয়ে বাঁশী শুনছে। বাঁশীর মিষ্টি আওয়াজে খোকন শুনতে পেলে ঝরণার ঝিরি ঝিরি কলতান। এগিয়ে গেল সে সাপুড়ের দিকে। তার পরমুহূর্ত্তেই তার মনে পড়লো সাপুড়েদের কাছে বাঁশী না শোনার জন্যে তার বাবা তাকে বারণ করেছিল। তাই খোকন পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে চললো।…

এবার এগুতেই তার চোখে পড়লো ছোটদের সবচেয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ের জিনিস—নাগরদোলা, চক্রাকারে কত ছেলেমেয়ে কত নর-নারী দুলছে ঘুরছে। খোকন নিবিড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তাদের দোলা আর আনন্দ উচ্ছ্বাস। আনন্দে উত্তেজনায় তার চোখ দু'টো নাচতে লাগলো। বিস্ময়ে তার ঠোঁট দু'টি আধ-খোলা হয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তার মনে হলো সেও নাগরদোলায় দুলছে, ঘুরছে। এই আনন্দে সাড়া না দিয়ে সে থাকতে পারলো

না। সমস্ত দ্বিধা আর সঙ্কোচ কাটিয়ে সে চীৎকার করে বলে উঠলো···'বাবা, আমি নাগরদোলায় চড়বো, ওমা, আমি নাগরদোলায় ঘুরবো'···কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে সে ফিরে তাকাল তার মা বাবার দিকে, কিন্তু কই তারা? সামনে নেই! পিছনে? কই নাতো! পাশেও নেই তো! কোথায় মা বাবা?···কান্না তার বুক ঢেলে শুষ্ক কণ্ঠ বেয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগলো। হঠাৎ চীৎকার করে সে ডেকে উঠলো: বাবা! মা···। সে পাগলের মতো দৌড়তে সুরু করলো। ভয়-ভরা চোখ বেয়ে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা পড়তে লাগলো। একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে, কখনও সামনে কখনও পিছনে সে দৌড়তে লাগলো ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো—আর আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো: বাবা গো বাবা, মাগো মা··· ভিজে গলার তীক্ষ্ণকণ্ঠের তার সেই আর্ত্তনাদ যেন সহসা আনন্দগুঞ্জনকে ছাপিয়ে ওঠে আকাশের বুকখানাকে বারংবার বিদীর্ণ করতে লাগলো। তার মাথার হলদে ছোট্ট পাগড়ী খুলে একাকার হয়ে গেছে। ঘামে তার অতি চমৎকার পোষাকটা কাদা আর ধুলোয় মাথামাথি হয়ে গেল। তার পালকের মতো হাল্কা শরীর সীসের মতো ভারী ও কঠিন হয়ে গেল।

রাগে ভয়ে দুর্ভাবনায় খানিক এদিক ওদিক দৌড়ে শেষে হেরে গিয়ে সে হঠাৎ এক জায়গায় নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। চেঁচিয়ে কান্না তখন ফোঁপানীতে পরিণত হয়েছে। অদূরে সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়ানো হলদে পোষাক পরা নরনারীকে সে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো। তারা হাসছে, কথা বলছে। কিন্তু খোকন সেই অসংখ্য নর-নারীর মতো তার অতি পরিচিত ও প্রিয় দুখানা মুখকে কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলো না।

দেবতার মন্দিরের কাছে বিরাট জনতা, অসংখ্য মানুষের আনাগোনা সে মন্দিরকে ঘিরে। সেদিকে হঠাৎ সে দৌড়ে গেল এবং জনতার স্রোতের মধ্যে যেন সহসা ঝাঁপিয়ে পড়লো। বড়ো মানুষদের পায়ের তলা দিয়ে কোন রকমে এগিয়ে যেতে লাগলো—আর চীৎকার করে ডাকতে লাগলো: বাবা! বাবা! মাগো! মা, মা···কিন্তু সেই আনন্দ উন্মত্ত জনতার উচ্ছৃঙ্খল আনন্দধ্বনির মধ্যে তার কণ্ঠস্বর যেন হারিয়ে গেল। অসংখ্য মানুষের পাদপীড়নের মাঝেও ব্যাকুল চোখে সে তার মা বাবাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। আনন্দ উন্মত্ত মানুষের পদাঘাতে পদদলিত হয়ে যাবার উপক্রম হতেই সে চীৎকারে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ভিজে ভিজে গলায় শেষবারের মতো ডেকে উঠলো: বা—বা মা—মা! তার আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়ে একজন অতিকষ্টে নিচু হয়ে মাটি থেকে তাকে দুহাত দিয়ে ওপরে তুলে কোলে করে নিল।

সেই উন্মত্ত জনস্রোত থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে লোকটি তাকে উদ্দেশ করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বল্লে: আহা! কার বাছারে! কি করে এলি এই ভীড়ে···

খোকন কি তার উত্তর দেবে! সে শুধু কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো: আমার বাবা কই? বাবা! মা কই? মা···

নাগরদোলার কাছে গিয়ে লোকটি তাকে ভোলাবার জন্যে বল্লো: নাগরদোলায় চড়বে খোকা?···কান্নায় তার বুক ভরে আছে। সে তবু বল্লো: আমি বাবার কাছে যাবো! মার কাছে যাবো···

সাপুড়ে তখনও সাপের খেলা দেখাচ্ছে। লোকটি তাকে নিয়ে গিয়ে বল্লে: শোন খোকন, কেমন মিষ্টি বাঁশী···খোকন কিন্তু চীৎকার করে কেঁদে উঠলো: মা কই? মা! বাবা কোথায়?

রঙীণ বেলুন দেখলে খোকন চুপ করবে এই ভেবে লোকটি তাকে নিয়ে গেল বেলুনওলার কাছে।···রামধনু-রঙের বেলুন নেবে খোকন?···

—'আমি বাবার কাছে যাবো, আমি মার কাছে যাবো'—খোকন বেলুনের দিকে না চেয়ে কাঁদতে লাগলো।

—'কি চমৎকার ফুলের মালা দেখো খোকন, কি মিষ্টিগন্ধ? একটা মালা গলায় দেবে?'···

—'মার কাছে যাবো, মা কোথায়?'···

—'চলো ঐ খাবারের দোকানে, মজা করে বরফি খাবে তুমি।'···

—'আমি মার কাছে যাবো, বাবার কাছে যাবো।'···

খোকন শুধু আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদতে লাগলো। *

---

* বিদেশী গল্প অনুসরণে।

স্বাধীনতার রূপান্তর—কোরিয়া

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীনের মত পূর্ব্ব এশিয়ার আর একটি দেশও স্বাধীনতা হারিয়েছিল এক অশুভক্ষণে। তবে তফাৎ এই যে, এখানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা ঘাঁটা পাতবার আগেই এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান ঘাঁটা পেতে বসেছিল। তার কারণ এই হতভাগ্য দেশটা জাপানের প্রতিবেশী, জাপান-সমুদ্রের পরপারে মাত্র ১১০ মাইলের ব্যবধানে এর অবস্থিতি। এই দেশটী কোরিয়া। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের শক্তিসূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ার স্বাধীনতার আলো নিভে যায়। ভারতের মতই কোরিয়াকে নিজস্ব সম্পদ বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে হতে হয় রিক্ত, নিঃস্ব। অন্নের চিন্তাই কোরিয়াবাসীদের প্রবল হয়ে দেখা দেয়। দারিদ্র্যের চাপে তাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি লোপ পেতে থাকে। অথচ ভারত ও চীনের মতই কোরিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বের একটা প্রাচীন তীর্থ ছিল।

কোরিয়া অধিকার করে জাপান দেখলে যে প্রাকৃতিক সম্পদে কোরিয়া ঐশ্বর্য্যশালিনী—এর মাটীতে ফলে সোনা, এর পাহাড়ে পাহাড়ে কয়লা, লোহা, রূপা, তামার ভাণ্ডার। হাতের কাছে এই দেশটীকে তখন তারা শোষণে প্রবৃত্ত হল। মাঠের ফসল গেল জাপানীদের খাদ্য হয়ে, আর খনিজ-সম্পদ গেল তার শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনার খোরাক জোগাবার জন্য। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে বৃটেন যদি ভারতকে শোষণ করতে পারে তাহ'লে মাত্র একশো মাইলের ব্যবধানে পেয়ে জাপানই বা শোষণ করতে ছাড়বে কেন? তার সাম্রাজ্যবাদ তো ইউরোপীয় আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত।

জাপান নিজ স্বার্থে কোরিয়াকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নূতনভাবে গড়ে তুলতে লাগল। রাস্তাঘাট তৈরী হল, রেল বসল, আধুনিকপ্রথায় চাষবাসের ব্যবস্থা হল। এ সমস্ত ব্যাপারেই কোরিয়াবাসীরা শ্রমিকের কাজ পেয়ে ধন্য হল—পরাধীন জাতির ভাগ্যে তার বেশী আর কি জুটতে পারে! দেখতে দেখতে কোরিয়ার বেশীর ভাগ জমির মালিকানা গেল জাপানীদের হাতে, কোরিয়ান প্রজারা অত্যধিক খাজনায় নূতন করে জমির পত্তনী নিতে বাধ্য হল। এ ছাড়া আবার কোরিয়ানদের মধ্যেই এক দল লোক জাপানের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে দেশবাসীদের শোষণে সাহায্য করতে লাগল, প্রতিদানে তারা জমিদারী পেলে। এইভাবে কৃষিপ্রধান কোরিয়ায় কৃষকদের দুর্দ্দশার শেষ রইলো না। তারপর জাপানীদের মূলধনে বড় বড় শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল—কোরিয়ানরা সেখানে মজুরের কাজ পেলে। পরাধীনতার পাত্র কাণায় কাণায় ভরে উঠল।

কোরিয়াবাসীরা এই শোষণের চাপে নীরব হয়ে রইল না। ভিতরে ভিতরে তারা চালাতে লাগলে আন্দোলন—খুঁজতে লাগল পরাধীনতার গ্লানি মোচনের পথ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সেখানকার জনসাধারণের মাঝে আত্মচেতনা জাগ্রত হয়। মাঝে মাঝে আন্দোলন প্রবল হলে শাসকশক্তির শাসনদণ্ড উদ্যত হয়ে তার প্রতিরোধ করতে থাকে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তার এই আন্দোলন আজও সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। মিত্রশক্তি অবশ্য তাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বটে, কিন্তু সব প্রতিশ্রুতিই কি পালিত হয়?

এশিয়ায় কোরিয়ার অবস্থিতি সামরিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার মত সকলের দৃষ্টি কোরিয়ার প্রতি নিবদ্ধ। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে কোরিয়া আবার সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রশান্তমহাসাগরে রুশ বন্দর ভ্লাডিভষ্টকে শীতকালে বরফ জমে, কিন্তু কোরিয়ার বন্দরগুলি শীতকালেও ভাল থাকে। প্রশান্তমহাসাগরে প্রবেশপথ রূপে সোভিয়েট যেমন কোরিয়ার উপর আধিপত্য রাখতে চায়, তেমনই প্রশান্তমহাসাগরে মার্কিন আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য আমেরিকা চায় রাশিয়াকে প্রতিহত করতে। দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে এই ভাবে কোরিয়া হয়ে উঠে বিশ্বের দুই মহাশক্তির পরীক্ষা ক্ষেত্র।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে জাপান বিনাসর্ত্তে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ফলে জাপানীরা কোরিয়া ছেড়ে যায়। কিন্তু যাবার আগে তারা কোরিয়ার বিপ্লববাদীদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে যায়। কোরিয়ান বিপ্লবীরাও বিশ্ব-রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখেই চলেছিলেন। লি-উন-হেউং কোরিয়ার বিপ্লবীদলের নেতা। যুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে জাপানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। জাপানীরা যাবার সময় তাঁর পরিচালনাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্বীকার করে যায়। এই ভাবেই তারা এতকালের শোষণের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়াস করে। তারা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। কিষাণ, শ্রমিক ও যুব-প্রতিষ্ঠানগুলিরও বৈধতা স্বীকৃত হয়।

লি-উন-হেউংয়ের নেতৃত্বে দেখতে দেখতে সমগ্র কোরিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়। আগষ্ট মাসের শেষে দেখা যায় যে, কোরিয়ার ১৪৫টি সহরে পিপল্‌স কমিটি গঠিত হয়েছে। এই সকল কমিটি জাপানীদের হাত থেকে শাসনভার নিজেদের হাতে নেয়। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোরিয়ার রাজধানী সিউলে এক জাতীয় প্রতিনিধি-পরিষদের অধিবেশন হয়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছয় শতাধিক প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। এই সম্মেলনে একটা কেন্দ্রীয় পিপলস কমিটী ও একটা শাসনতন্ত্র রচয়িতা কমিটী গঠিত হয় এবং কোরিয়ার অস্থায়ী সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলনে অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা ও একটা সার্ব্বভৌম সরকার গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অস্থায়ী সাধারণতন্ত্র

যে কার্য্যসূচী গ্রহণ করে তাকে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কার্য্যসূচী বলা যেতে পারে। জাপ-মালিকদের সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে চাষীদের মধ্যে বণ্টন, খনি, কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জলের কল, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা, ছোট খাটো ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি, নারী পুরুষের সমানাধিকার, অষ্টাদশবর্ষীয়ের ভোটাধিকার, দৈনিক আট ঘণ্টার অনধিক শ্রমের ব্যবস্থা, মজুরী ও জীবনযাত্রার নিম্নতম মান বিধিবদ্ধকরণ, খাদ্যের বরাদ্দপ্রথা প্রবর্ত্তন ও চোরা কারবার বন্ধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য থেকে লোক নিয়ে পুলিস ও সেনাবাহিনী গঠন—এই কার্য্যসূচীর প্রধান বিষয়।

এই কার্য্যসূচী সমগ্র কোরিয়ার সমর্থন পায়। ট্রেড ইউনিয়ান, কিষাণ ইউনিয়ান, যুবসঙ্ঘ, নারীসঙ্ঘ, পিপল্‌স পার্টি ও প্যাক-হিউন-যুংয়ের নেতৃত্বে গঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টি সকলেই এই কার্য্যসূচীতে সন্তোষ জ্ঞাপন করে। এই ভাবে সর্ব্বদলের সমর্থনপুষ্ট কোরিয়ান সাধারণতন্ত্র জাপানীদের হাত থেকে নিজ দেশের শাসন চালাবার জন্ম প্রস্তুত হয়।

এমন সময় কায়রো সম্মেলন থেকে রুজভেল্ট-চার্চ্চিল ও চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করলেন যে, যথাসময়ে কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। মার্শাল ষ্ট্যালিনও এই ঘোষণা সমর্থন করলেন। ঠিক হল যে জাপ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্ম রাশিয়া কোরিয়ার উত্তরার্দ্ধ ও আমেরিকা কোরিয়ার দক্ষিণার্দ্ধ দখল করবেন। সরল কোরিয়াবাসীরা "বিশ্বের স্বাধীনতা রক্ষার্থ" যুধ্যমান প্রবল মিত্রশক্তির ঘোষণায় বিশ্বাস না করে পারলে না। জাপশক্তিকে উৎখাত করবার জন্ম তারা মিত্রশক্তির সাহায্য প্রয়োজন বলেও মনে করেছিল।

এই ব্যবস্থা মত উত্তরে এল রুশ ও দক্ষিণে এল মার্কিন। এসেই তারা জাপ সৈন্যদের নিরস্ত্র করার কাজে প্রবৃত্ত হল। কোরিয়ার লোকেরা ভাবলে যে এ সব কাজ মিটে গেলেই 'যথাসময়' আসবে এবং তারা স্বাধীনতা পাবে। এইভাবে মাস তিন কেটে গেল। ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক হল। এই বৈঠকে ঘোষণা করা হল যে কোরিয়াকে পাঁচ বৎসরকাল মিত্রশক্তির অছিগিরির অধীনে থাকতে হবে। ঊর্দ্ধপক্ষে এই অছিগিরির মেয়াদ হবে পাঁচ বৎসর। মিত্রশক্তি কোরিয়াতে থেকে কোরিয়ানদের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করে দেবে। আরও স্থির হয় যে যতশীঘ্র সম্ভব কোরিয়াতে রুশ-মার্কিন সমরনায়কদের এক বৈঠক হবে। এই বৈঠকে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার ভাগরেখাকে তুলে দিয়ে অবাধ-বাণিজ্য ও বৈষয়িক আদানপ্রদানের পন্থা নিরূপিত হবে এবং এক সম্মিলিত রুশ-মার্কিন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হবে। এই কমিশন সমগ্র কোরিয়ার জন্ম একটী গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

এই ঘোষণায় সমগ্র কোরিয়ায় প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হল। পাঁচ বছরের অছিগিরির প্রস্তাবকে তারা সুনজরে দেখতে পারলে না। পারবেই বা কেন? স্বাধীনতা পাবার অধীর আগ্রহে যারা অপেক্ষা করছে তাদের যদি বলা হয় আরও পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করতে—তাহলে ক্ষোভ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক বৈকি। তাই মিত্রশক্তির অছিগিরি ঘোষণার প্রতিবাদে কোরিয়ার সহরে সহরে, পল্লীতে পল্লীতে বিক্ষোভ সুরু হল। অনেক ক্ষেত্রে উন্মত্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে অছি শক্তিগুলিকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে এবং বিক্ষোভের ফলে সংঘর্ষে হতাহতের সংখ্যাও কম হয় নি। কিন্তু প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের বিক্ষোভ কতখানি আর সফল হতে পায়। কোরিয়াবাসীদের ভাগ্যেও তাই ঘটল। কিছুকাল পরে বিক্ষোভ বন্ধ হয়ে গেল। বাইরের বিক্ষোভ বন্ধ হলেও অন্তরের অসন্তোষ কি দূর হয়েছে? পরাধীন জাতির মর্ম্মবেদনা কি শান্ত হয় কোনদিন? অশান্তির আগুন বক্ষে নিয়েই তারা প্রতীক্ষা করছে সেই শুভ দিনটার—যেদিন আপন দেশে তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবে।

এখন অছিগিরির অধীনে কোরিয়ার অবস্থা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উত্তরে সোভিয়েট শাসনাধীন এলাকার অবস্থা ও দক্ষিণে মার্কিন শাসনাধীন এলাকার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

উত্তরার্দ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া কঠোর হস্তে জাপ বিতাড়ন করতে থাকে। সমস্ত চাকুরী থেকে জাপানী ও জাপ তাঁবেদার কোরিয়ানদের তারা বরখাস্ত করলে। জনসাধারণ তাদের এই নীতিতে সন্তুষ্টই হল। সাইবেরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে যে সকল কোরিয়ান কম্যুনিষ্ট ছিল রুশ সেনারা তাদের নিয়ে এসে কোরিয়ানদের পিপল্‌স পার্টিগুলির সহিত সহযোগিতা করতে থাকে এবং এই প্রকার স্বাধিকারসম্পন্ন কমিটী গঠনে উৎসাহ দেয়। জাপানী মালিকদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কোরিয়ান চাষীদের মধ্যে বিলি করে এবং কোরিয়ান জমিদারদের খাজনা কমিয়ে চাষীরা যাতে ফসলের শতকরা ৭০ ভাগ পায় তার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করে। সমস্ত কল-কারখানা, জলের কল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি শ্রমিকদের কমিটীর হাতে ন্যস্ত হয় এবং শাসন পরিচালনার ভার দেওয়া হয় পিপল্‌স কমিটী-সমূহের হাতে। (আগামী বারে সমাপ্য)

ক্যাপ্টেন

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্ম কর্ম্ম তব তরে সখি
সব পারি ছেড়ে দিতে—

তাই তব প্রেম বুঝি, নয় খাঁটি
সন্দেহ জাগে চিতে।

কামালউদ্দীন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ

দ্বিতীয় পটখানিতে অঙ্কিত রহিয়াছে উটের লড়াইয়ের চিত্র। উষ্ট্র দুইটি মাথা নীচু করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিরত। একটির মুখ কালরঙের, অপরটির সাদা। উষ্ট্রপাল দুইজন আপন আপন উটের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে। অনতিদূরে একজন শ্মশ্রুগুম্ফধারী ব্যক্তি হাত তুলিয়া বাহবা দিতেছেন, পোষাক দেখিয়া তাঁহাকে পদস্থ লোক বলিয়াই মনে হয়।

তৃতীয় চিত্রটি তৈমুরের জীবনী হইতে গৃহীত। অশ্বারোহী সৈন্যদল শত্রুশিবির আক্রমণ করিতেছে। চিত্রে আঁকা আছে তিনটি তাঁবু, দুইটি কাছাকাছি, আর একটি কিছুদূরে খাটান। তাঁবুর সাদাদড়িগুলি চিত্রের সম্মুখভাগে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া—মোটের উপর বিন্যাসধারার ঐক্যসংস্থাপনে সাহায্য করিয়াছে। যুদ্ধের চিত্রে গতিচাঞ্চল্য যে বিশেষভাবে প্রকটিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! উপরের অংশে শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহীদিগের অশ্বগুলি চিত্রবিচিত্র অঙ্গচ্ছদে আবৃত, ঘোড়াগুলির গায়ে কে যেন আলিপনা আঁকিয়া দিয়াছে। চিত্রকর দেখাইয়াছেন দলবদ্ধ সাদী সৈন্য একেবারে শিবিরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—সংঘাত অত্যাসন্ন। সোয়ারদিগের বর্ষার মাথায় সংলগ্ন রহিয়াছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা (hemon)। চিত্রের নিম্নভাগে রেসালার অশ্বারোহী ও পদাতিক তীরন্দাজ, এই দুই শ্রেণীর সৈন্যই সমবেত। এ দিকটায় পূর্ব্বাহ্নেই যুদ্ধ বাধিয়াছে। নিম্নের ডাহিন কোণে একজন আহত যোদ্ধ্‌পুরুষ কাত হইয়া পড়িয়া আছেন। লোকসংখ্যা এ চিত্রে বড় অল্প নয়, কিন্তু ব্যক্তিগুলির মুখের ভাব তেমন সুপরিস্ফুট হয় নাই।

বায়জাদ ইউরোপীয় শিল্পীর নকলনবিশী করিয়াছেন, অন্ততঃ একটিমাত্র তসবির সম্বন্ধে, এ অপবাদ কোনও কোনও পাশ্চাত্য লেখক প্রচার করিতে ছাড়েন নাই। মূল চিত্রখানি ইতালীর চিত্রকর জেন্তিলি বেলিনি অথবা জেন্তিলিনি বেলিনি (Gentillini Bellini) কর্ত্তৃক অঙ্কিত জেম্ (Djem) সুলতান নামক একজন তুর্কি (Turkish) রাজকুমারের প্রতিকৃতি। ষোড়শ শতাব্দীর এ চিত্রখানিও বার্লিংটন হাউস প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। যখন এ চিত্র নকল করা হয় তখন বায়জাদের বয়স নাকি প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর। যৌবনের পূর্ণসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি বেলিনি অঙ্কিত প্রতিকৃতির একখানি রেখাচিত্র (Drawing) সহজে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন একথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। হঠাৎ বিদেশী চিত্রকর অঙ্কিত বিদেশী রাজকুমারের চিত্রের প্রতি তাঁহার এরূপ অনুরক্তির কারণই বা কি থাকিতে পারে?

বর্ত্তমানে লেলিনগ্রাড্ নামে পরিচিত সেণ্ট পিটার্সবর্গের হার্মিটেজ মিউজিয়মে রাজতন্ত্রের যুগে একখানি বড় ছাদের চিত্র রক্ষিত ছিল। এখনো তাহার সন্ধান হয়তো সেইখানেই পাওয়া যাইবে। এ চিত্রে অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত জেম্ সুলতানের প্রতিকৃতিও সন্নিবিষ্ট ছিল জানা যায়। এ চিত্রখানি যে বায়জাদের আঁকা নয় সে সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ নাই। আর এক কথা, বার্লিংটন হাউস প্রদর্শনীর এ চিত্রে বায়জাদের নাম কতকটা স্থূল ছাঁদের হরফে লেখা, খাঁটি বায়জাদীয় চিত্রে চিত্রীর নাম যেরূপ সূক্ষ্মাক্ষরে লেখা থাকে সেভাবে লেখা নয়। একথা যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে কৌতূহল বশতঃই হউক, বা অঙ্কন পদ্ধতির কোন বৈশিষ্ট্যগুণে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, বায়জাদ এ চিত্রখানি নকল করিয়াছিলেন তথাপি বলিব এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা একবারেই নিরর্থক, কারণ পাশ্চাত্যপ্রভাবে বায়জাদের নিজস্ব শিল্পভঙ্গী কোন অংশেই বিকৃত হয় নাই।

তখনকার দিনে বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকের বা পরিপালকের আকৃতি ক্ষুদ্রকচিত্রে সন্নিবিষ্ট করা শিল্পীদিগের মধ্যে একপ্রকার রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজামীর সেকেন্দর নামার একটি চিত্রে বায়জাদ সুলতান হোসেন মির্জ্জার মুখচ্ছবি সেকেন্দরের (Alexander-এর) আকৃতিতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। সেকেন্দর এ চিত্রে গুহাবাসী কোনও তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ মানসে সমাগত।

একখানি ধূসরবর্ণের (In grisaille) শোভাসাধক চিত্রে দেখিতে পাই যে একটি ময়োরেলে (Pie) জাতীয় পক্ষী বৃক্ষশাখায় বসিয়া যেন সুকৌশলে ভারসমতা রক্ষা করিতেছে। এ চিত্রের বিভিন্ন অংশ বিষয়-বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুকৌশলে পরিকল্পিত। পিঠভূমে বৃক্ষ ও শৈলাদি সমাকীর্ণ অধিত্যকা উচ্চাবচভাব রক্ষা করিয়া অতি সযত্নে অঙ্কিত। এ আলেখ্যখানিকে নিখুঁত নিসর্গচিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মুখভাগের একটি বৃহদায়তন চেনার বৃক্ষের গায়ে একখানি মই লাগান, এই মই ধরিয়া একব্যক্তি সবেমাত্র উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইনিই বোধহয় বায়জাদ। আর একজন যিনি বৃক্ষতলে পাদচারণায় নিযুক্ত, তাঁহাকে দেখিলেই অভিজাতবংশীয় বলিয়া বুঝা যায়। নিম্নে, ক্ষুদ্রাক্ষরে, ইনি যে সাহ্ তামাস্প একথা কয়টি লিখিত আছে। চিত্রের একাংশে "পুরাতন ভৃত্য বায়জাদ" এই একটি ছত্রে শিল্পীর আত্মপরিচয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সাহ তামাস্প ১৫২৪ খৃঃ অব্দে মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কথিত আছে যে তিনি বায়জাদ ও তাঁহার শিষ্য সুলতান মহম্মদের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পারসীক শিল্পে বায়জাদের প্রভাবের যথাযথ পরিমাপ সহজসাধ্য নয়। তিনি শুধু হিরাট ও সিরাজ শৈলীর সমন্বয় সাধন করেন নাই, বিশেষজ্ঞগণের মতে সমকালীন পারসীক শিল্প চৈনিক-প্রভাব মুক্ত

হইয়াছিল তাঁহারই প্রতিভাবলে। বায়জাদ শিল্পী ও বিদগ্ধসমাজের প্রশংসালাভ করেন প্রধানতঃ তাঁহার দৃঢ় ও জোরাল রেখার লাবণ্য সম্ভারে। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার ও শিল্পের একনিষ্ঠ অনুশীলন ফলে, কি কলা কৌশলে, কি বর্ণ বিন্যাসে, কি রেখাঙ্কন নৈপুণ্যে চিত্র শিল্পের এই তিনটি আঙ্গিকেই তিনি শ্রেষ্ঠতম কৌলীন্য অর্জন করিয়াছিলেন।

বায়জাদ আদিতে হিরাট শৈলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন বটে, কিন্তু পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রের দ্বিতীয় যুগের শিল্পাদর্শ (norm) প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহারই কর্তৃক, সিরাজ ও হিরাটের দুইটি স্বতন্ত্র শৈলীর সমন্বয়সাধন ফলে। সাহরুখের এক ভ্রাতা (১) সিরাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সিরাজে একটি নূতন শিল্পপদ্ধতি গড়িয়া উঠে। হিরাটের শিল্পকেন্দ্রে অত্যধিক চৈনিক প্রভাব দৃষ্ট হইত। তৈমুরীয় বংশের উৎসাহে যে চিত্রণ-পদ্ধতির উদ্ভব হয় তাহার আদিস্থান ছিল সাহরুখের রাজধানী হিরাট। সিরাজ শিল্পের মৌলিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। হিরাট শিল্পীর রংদানিতে (paletteএ) যে সকল রং ব্যবহৃত হইত তাহা যে শুধু অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রাখর্য্যসম্পন্ন ছিল তা নয়, বর্ণযোজনার বেলায় এগুলির প্রয়োগবিধিও ক্রমেই হইয়াছিল জটিলতর। সিরাজ শৈলীতে কিছু "মাটো" বা স্বল্পকান্তি রঙের ব্যবহার থাকিলেও সুসঙ্গতিগুণে সেগুলি ছিল বড়ই নয়ন স্নিগ্ধকর, আর বর্ণাভাসের (tonalityর) লালিত্যই ছিল এ শৈলীর বিশেষত্ব। সিরাজের শিল্পীরা উগ্রতাজ্ঞাপক রক্তবর্ণ, বিষাদাত্মক অসিতবর্ণ ও প্রোজ্জ্বল হরিৎ-বর্ণের ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া বর্ণগ্রামের সৌসামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন। হিরাট শিল্পে এই তিনটি তীব্র রঙের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত ছিল। সিরাজ শৈলীতে প্রাণপ্রদ বর্ণের ব্যবহার যে কম ছিল তা নয়, কিন্তু স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্য গুণের বিকাশে চিত্রীর চিত্রপট অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইত।

যে সকল বিভিন্ন উপাদান ঐতিহ্যের অঙ্গে সমাবিষ্ট, সার্থক সংযোগ ও সংমিশ্রণ ফলে বায়জাদ সেগুলি একীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠতর উপলব্ধি ও তাঁহার শক্তিমত্তার গুণে। দুরূহ আদর্শ ও জটিল পরিকল্পনা এই কৌশলী শিল্পীর দক্ষতায় সহজেই তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া যাইত। চিত্রী হিসাবে বায়জাদ ছিলেন বাস্তবতাবাদী। আবার বিজ্ঞানবিৎ মনস্তত্ত্বজ্ঞের ন্যায় মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে অভিজ্ঞতা তদঙ্কিত চিত্রেই পরিস্ফুট দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ধরণ ধারণ বা তাঁহাদের বিভিন্ন পদ্ধতি তিনি যেখানেই আবশ্যক মনে করিয়াছেন গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; কিন্তু সর্ব্বত্রই যে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপটি বসাইয়া দিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিল্প প্রতিভার বিশিষ্ট চিহ্ন বলিয়া গ্রহণীয়।

(১) ইব্রাহিম সুলতানই সম্ভবতঃ এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার শাসনকাল—১৪১৪-১৪৩৫ খৃঃ অঃ।

বায়জাদের চিত্রগুলি সভ্যজগতের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে উপযুক্ত অনুশীলন করিতে হইলে মার্কিণ ও ইউরোপের নানা দেশের সংগ্রহশালার নিদর্শনগুলি না দেখিয়া উপায় নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ১২।৯।৪১ তারিখের একখানি পত্রে অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে কিছু পূর্ব্বেই বায়জাদ অঙ্কিত একখানি রেখাচিত্র লণ্ডনের কোনও নীলাম ঘরে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব নূতন ছবি এখন আর মেলা ভার। এতদ্দেশীয় সমঝদারদিগের নিকট বায়জাদের যশোভাতি এখনও ম্লান হয় নাই (১)। সম্ভ্রান্ত বংশীয় কোনও মুসলমান চিত্র-বিক্রেতা লেখককে বলিয়াছিলেন "যদি বায়জাদের ছোট একখানি ছবিও সংগ্রহ করিতে পারিতাম তাহা হইলে অর্থশালী হইতে আর বিলম্ব হইত না।"

ইস্তানবুলের ইলদিজ্ গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত বায়জাদের যে একখানি প্রতিকৃতি ম্ঁসিয়ে সাকিসিয়ানের গ্রন্থে (২) প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে তাঁহাকে জ্ঞানানুশীলনে রত পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। চিত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার দেহ ছিল একহারা ধরণের, মেদবাহুল্য-বর্জ্জিত, কৃশ প্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ নাসিকা ও প্রতিভাদীপ্ত চক্ষুদ্বয় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিচ্ছদ নীলাভ ফিরোজা (Turquoise) বর্ণের, আঙ্গরাখাটির রঙ ফিকা বাদামী। এইখানি ব্যতীত তাঁহার অপর কোনও চিত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

বায়জাদ বাঁচিয়াছিলেন অনেক দিন। এমন দীর্ঘজীবী শিল্পী প্রাচ্য-দেশে অধিক দেখা যায় না। যিনি প্রাদেশিক শিল্পকে জাতীয় শিল্পে উন্নীত করিয়াছিলেন; সেই মনিষীকে নাকি শেষ জীবনে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া যথেষ্ট দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল। সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে জর্জ্জরিত দেহ ক্ষীণদৃষ্টি অন্ধপ্রায় বৃদ্ধ চিত্রীর জীবন সন্ধ্যা তাব্রিজেই অতিবাহিত হয়। ম্ঁসিয়ে গোলুবিয়েভ অনুমান করেন যে তাব্রিজেরই কোন মেপল্‌স্ (maples), সাইপ্রেস্ (সরু) আদি বৃক্ষ সমাবৃত প্রাচীন উদ্যান বাটিকার শান্তিময় পরিবেশে বায়জাদ তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় যাপন করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার স্তিমিত শিখা জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়—তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

জনৈক রসজ্ঞ ইংরাজ লেখক (৩) বলিয়াছেন যে পারস্যে চিত্রের বিষয়-বস্তু ও উপকরণাদি অনেক স্থলেই যথারীতি সজ্জিত অবস্থায় শিল্পীর

(১) Current Thought, Vol. III, No 4, p. 210 ff, January—March, 1942.

(২) La miniature pernsee de XIIe a XVIIe siecle.

(৩) Thomas Sutton, Some Persian Miniatures, Rupam, No I920. p. I14.

চক্ষের সমক্ষে উপনীত হইয়া থাকে। নীল আকাশের পৃষ্ঠপটে প্রাসাদ ও মসজিদের নীল মিনা করা মিনার ও গম্বুজগুলি অধিকতর গাঢ় নীল-বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া কি শোভাই না ধারণ করে! অমরত্বের প্রতীক, উদ্যানের চিরহরিৎ সাইপ্রেস তরু শাখা আন্দোলিত করিয়া শিল্পীকে যেন তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম লাভার্থ আহ্বান করিয়া লয়। এ আহ্বান শিল্পী প্রত্যাখান করিবেন কিরূপে? তিনি বৃক্ষতলে তাঁহার অত্যন্ত আসনটিতে সুখে সমাসীন, তাঁহার দৃষ্টি প্রাঙ্গণ সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রবেশ দ্বারের দিকে সম্বদ্ধ। তাঁহার সম্মুখস্থ রাজপথ বাহিয়া চলিতেছে বিবিধ বর্ণের পরিচ্ছদধারী বিচিত্র জনস্রোত; নিকটেই বাজার বসিয়াছে তাই ইহাদের সমাগম। তাহাদের কোলাহল শিল্পীকে অণুমাত্র বিক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই, তিনি স্থির চিত্তে বসিয়া আপন মনে আপনার কাজ করিয়া চলিয়াছেন। বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত শিল্পী-শ্রেষ্ঠ বায়জাদের স্থির ধীর কর্ম্মপ্রণালীর ঠিক এইরূপ একটি চিত্রই কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয় যদিও বাস্তবের সহিত ইহার মিল না হইবারই সম্ভাবনা অধিক। বিহজাদের কোন সন্তান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সমাধি পার্শ্বেই সমাহিত তাঁহারই এক ভ্রাতুষ্পুত্র যিনি চিত্রকর না হইয়া লিপিকরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। বায়জাদের শিল্পধারা বর্ত্তিয়াছিল তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যের উপর।

ছেলেবেলার কথা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (ক্যাণ্টাব), বার-এট-ল

নিজের জীবনী লেখবার যদি কখনও অবসর হয়, তাহলে আমার বাল্য-জীবনের কথাই তাতে সব চেয়ে বড় জায়গা দখল করবে; কেননা আমার স্মৃতিতে বাল্যজীবনের ছবি যেমন সুন্দর, সুস্পষ্ট এবং সরল আনন্দপূর্ণ, তেমন জীবনের অন্য কোন অংশের স্মৃতি মোটেই নয়। বাল্যের জগৎ—সে ছিল সত্যই এক অপূর্ব্ব জগৎ। নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা, নিত্য নূতন অনুভূতি, নিত্য নূতন পরিচয় মনের মধ্যে আনন্দের এক অন্তহীন প্রবাহ বইয়ে দিতো। বাল্যের সেই জীবনে বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না, আর সেই বিস্ময় থেকে আসতো অফুরন্ত আনন্দ। সেদিন আর ফিরে পাবো না, সে আনন্দও আর ফিরে পাবো না, তবে সে জীবনের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন ফল্গুধারার মতই এখনও জীবনকে আমার আনন্দময় করে রেখেছে।

প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা। শিশু বালকের জীবনে, আজ যা অতি তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, তাই তখন অতি বিরাট, অতি বিপুল বলে মনে হত। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামটা তখন কত বড় বলে মনে হতো, গ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাঙ্গা-চোরা রাস্তা চৌরঙ্গীর সুগঠিত প্রশস্ত রাজপথের চেয়েও চওড়া বলে মনে হতো। আর সেই গ্রাম্যপথ বেয়ে ঘোড়ার গাড়ীর চলাচল যে বিস্ময় এবং আনন্দের সৃষ্টি করতো, তার তুলনায় চৌরঙ্গীর যানবাহনের অন্তহীন চলাচল শতাংশের একাংশ বিস্ময়ের সৃষ্টিও করে না। আমাদের গ্রামে একটা পুকুর আছে সেটাকে "বড় পুকুর" বলা হয়, আকারে সে পুকুর ডেলহাউসী স্কোয়ারের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু তবু ছেলেবেলায় সে পুকুর দেখেই সমুদ্রের আভাস পেয়েছি, আর তার জলের হিল্লোলে সাগরতরঙ্গের আহ্বান শুনেছি। বাল্যের ক্ষুদ্র জগৎ আমাদের কাছে বিরাট এই বিশ্বের এক প্রতীক রূপেই দেখা দিয়েছে, আর প্রকৃত পক্ষে সেই ক্ষুদ্র বিশ্ব যে ভাবে আমাদের কৌতূহলের আহার যুগিয়েছে, পরবর্ত্তী জীবনে এই সসাগরা ধরণীও সে ভাবে আমাদের কৌতূহল তৃপ্তি করতে কিম্বা আনন্দ বিধান করতে পারে নি।

আকাশে তো চাঁদ আমরা রোজই দেখি, কিন্তু ছেলেবেলার চাঁদা-মামাকে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। রাত্রে কোন আত্মীয়ের হাত ধরে যখন গ্রাম্যপথ বেয়ে চলতুম, তখন সহাস্য মুখে চাঁদামামা আমার দিকে চাইতেন, আর আমিও তাঁর দিকে চাইতুম। আমি যেমন পথবেয়ে চলেছি, তিনিও তেমনি আমার সঙ্গে তাল রেখে আকাশ বেয়ে চলেছেন। চমকিত হয়ে আমি দাঁড়াতুম, চাঁদামামাও আকাশ পথে দাঁড়াতেন। আমি আবার পথবেয়ে চলতে সুরু করতুম, চাঁদামামাও আকাশপথে চলতে সুরু করতেন। আনন্দে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। আত্মীয়কে সম্বোধন করে বলতুম, দেখুন, দেখুন, চাঁদামামা আমায় কত ভালবাসেন। আত্মীয় আমার মানরক্ষা করে বলতেন, তা বাসবেন না, তিনি যে তোমার মামা হন। গর্ব্বে, আনন্দে বুক আমার ফুলে উঠতো। তারকারা আকাশে মিট মিট করে চাইতো, তাদের দেখে বিস্ময় এবং পুলকের অপূর্ব্ব এক জগতের সিংহ-দ্বার আমার চোখের সামনে খুলে যেতো। আমি সাত-ভাই-চম্পার কথা ভাবতুম, সপ্তর্ষিদের কথা ভাবতুম, আকাশের সিংহাসনে সমাসীন খোদার কথা ভাবতুম, তাঁর বিবস্ত ফেরেস্তাদের (দেবদূতদের) কথা ভাবতুম। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি মনে আমার ভাবের জোয়ার আনতো। আনন্দে আমার মন অভিভূত হয়ে যেতো।

সবেমাত্র জীবনে প্রবেশ করেছি, তখন সব জিনিসই বিস্ময়কর বলে মনে হতো। আমাদের গ্রামের মাঠটি কত বড়, কত রহস্যময় বলে মনে হতো। সন্ধ্যায় আমরা মাঠপ্রান্তে এসে দাঁড়াতুম, মাঠের শোভা দেখবার জন্যে, আকাশের শোভা দেখবার জন্যে। অস্তগামী সূর্য্যের বর্ণচ্ছটায় আকাশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করতো—লাল, নীল, শ্বেত, হরিৎ প্রভৃতি রংএর সমাবেশে বর্ণের যে হিল্লোল দিকচক্রবালে দেখা দিত, তার গৌরব প্রকাশের ক্ষমতা চিত্র-শিল্পী শ্রেষ্ঠ Turnerএর তুলিকারওনাই, আর সেই

গগন পথবেয়ে যখন বলাকার দল তাদের আবাস স্থানের উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ গতিতে উড়ে যেতো, তখন তারা অব্যক্ত সুরের যে হিল্লোল তুলতো কোন কবির লেখাই তার সম্যক ঝঙ্কার আনতে সক্ষম হয় নি।

সন্ধ্যাসমাগমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলে যেতেন, প্রকৃতি কাল নৈশ আবরণে দেহ আচ্ছন্ন করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মাঠের প্রান্তদেশে আলেয়ার দল ছুটোছুটি করতো। কতরকম অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় খেয়াল যে জেগে উঠতো তার বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়।

এখন এই বৃদ্ধ বয়সে কত রকমের পশু, কত রকমের পক্ষী প্রত্যহ দেখতে পাই, অথচ প্রাণে কোন ভাবের হিল্লোল দেখা দেয় না। ছেলেবেলায় গাছে একটা টুনি পক্ষী দেখে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠেছে, 'বৌ কথা কও' পাখীর আবেদন শুনে মন রূপকথার সোনালি রাজ্যে প্রবেশ করেছে, কোকিলের ডাক শুনে আনন্দে মন প্রাণ ভরে গিয়েছে। এখন বসে বসে ভাবি, কোথায় গেল সে আনন্দ, কোথায় গেল সে অনুভূতি, কোথায় গেল সে বিস্ময়, আর কোথায় গেল প্রকৃতির সঙ্গে সেই নিবিড় আত্মীয়তা বোধ। কবি Wordsworth এর মত মনে হয়, জীবনের স্রোতে স্বপ্নরাজ্য থেকে আমি অনেক দূরে এসে পড়েছি। স্বর্গের যে স্বল-স্বলে স্মৃতি নিয়ে জীবনে প্রবেশ করেছিলুম, সে স্মৃতি ক্রমেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। শৈশবজীবনে ফিরে যাবার জন্য প্রাণ আবার চঞ্চল হয়ে উঠে। আর যখন বুঝি যে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, তখন একা বসে সেই সোনালী শৈশব-জীবনের কথাই ভাবি, ক্ষণিকের তরে আনন্দের উৎস প্রাণে আবার সঞ্জীব হয়ে উঠে, মন্দাকিনী ধারার কল্লোল বাস্তব-জীবনে আবার শুনতে পাই।

সুন্দর বনের নদীপথে*

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ, এম-এল-এ

দূরে খুলনার নদীতীরের আলো, একটা লাইট হাউসের আলো পাক খাচ্ছে, আমাদের জাহাজ আড়কাটীর জন্য ঘন ঘন বাঁশী বাজাচ্ছে।

সকালে যখন উঠলাম তখন আকাশ স্নিগ্ধ নির্মল হয়ে গেছে। সুন্দরবন ও খুলনার সীমানা পার হয়ে যশোরের দিকে এগোচ্ছি। খুলনা থেকে বরিশাল যাবার দুটো পথ আছে। খুলনা থেকে সিধে আঠারবাঁকী নদী হয়ে মোল্লাহাট যাওয়া যায়। কিন্তু এ নদীতে সব সময়ে জল থাকে না, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ নদীতে যাওয়া চলে, তাও খুলনা অভিমুখী ষ্টীমার ছাড়া উল্টো পথের ষ্টীমার নাকি তখনও যেতে পারে না। সেজন্য আমাদের একটু ঘুরে কালিয়া-টোনা হয়ে মোল্লাহাট যেতে হচ্ছে। ভোর বেলায় ডেকে বেরিয়ে দেখি চারপাশের দৃশ্য সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বন আর সমুদ্রের কোন হাতছানি নেই। চারপাশে যশোর জেলার নিজস্ব বড় বড় গাছ, ধানখেত, গ্রাম, গঞ্জ, তার মধ্যে মধ্যে ফুট আড়াইশো তিনশো চওড়া নদী বয়ে চলেছে। জল খুব বেশী নেই, জায়গায় জায়গায় জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতে জাহাজের যাবার পথের ইঙ্গিত দেওয়া আছে, যাতে জাহাজ কম জলে গিয়ে না পড়ে। নদীর ধারে ধারে নারিকেল গাছ, বট এবং অন্যান্য বড় বড় গাছ, লোকজন স্নান করছে, কাপড় কাচছে, ছেলেরা খেলা করছে। খালাসিদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, গাজির খাল পার হয়ে এসে আমরা আলিবক্স্ নদীতে পড়েছি। আসলে নদীটার নাম হ্যালিফ্যাক্স চ্যানেল, এরা তার রূপ বানিয়েছে আলিবকস্ নদী। একটু পরেই নবগ্রাম, বারুইপাড়া পার হয়ে প্রসিদ্ধগ্রাম কালিয়া পার হওয়া গেল।

আমাদের বিভিন্ন জায়গার নাম জানবার কৌতূহল দেখে ষ্টীমারের লোকজন সম্ভবতঃ ভয় পেয়েছে। সারেং মদন মিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে কেবল তিনটী অক্ষর শোনা যায়—'জানি নে'। যে আড়কাটীটী খুলনায় উঠেছে তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বেশ বলছিল, কিন্তু যেই কাগজে নামগুলো লেখা হল—অমনই সে বার দুই তিন 'ল্যাখ্‌ছেন ক্যান্' বলে সেই যে মুখ বন্ধ করল আর তার মুখ খোলানো গেল না। অগত্যা এই ষ্টীমারের ক্লার্ক ভদ্রলোকই আমাদের একমাত্র সহায়। তাঁকে অতুলবাবুর 'নদীপথে' পড়তে দেওয়া হল, পড়ে তিনি বললেন ভদ্রলোক রসিকও

*গত ফাল্গুন সংখ্যায় এই কাহিনীর প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল

বটেন সাহিত্যিকও বটেন, কিন্তু একজায়গায় একটু ভুল করেছেন। যে জায়গাটাকে তিনি মধুমতী বলেছেন—মধুমতী আসলে তার একটু পরে, টোনার কাছে। ও জায়গাটা ঐ 'আলিবক্‌স্‌' নদী।

টোনা পার হয়ে আমরা প্রকৃতই মধুমতীতে পড়লাম। নদীর ধারে কতকগুলি টিনের গুদাম ঘর, লোকজন যাওয়া আসা করছে, দুএকটা ষ্টীমার চল্‌ছে। পাড়ের ধারে অজস্র নারিকেল সুপারি গাছ, টিনের ঘর, গ্রামের কর্মব্যস্ততা। এখানে চালা ঘরের চেয়ে টিনের ঘরই বেশী। নদীর পাড় দিয়ে লোকে হেঁটে হেঁটে চলেছে—ঘর বাড়ী, গরু বাছুর। এক-আধটা ছেলে বাছুরকে জল খাওয়াতে এনেছে, অত্যন্ত ছোট ছোট জেলেডিঙি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও কোথাও নদীর ধারে মেয়েরা বাসন মাজছে।

সাড়ে বারটার সময় মোল্লাহাট পার হলুম। কিছুদিন পূর্বে সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্য মোল্লাহাটের নাম ঘন ঘন শোনা গিয়েছিল। এখানে আড়কাটী বদল হল। নতুন আড়কাটীর নাম আবদুলগণি, বাড়ী নোয়াখালী। লোকটী খুব ভদ্র এবং বেশ চট্‌পটে। এক-আধঘণ্টা অন্তর আমাদের নানা কথা বুঝিয়ে দিতে লাগল এবং আমাদের ভৌগলিক জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করতে লাগল। সারাদিন মধুমতীতে চলেছি। দুপাশে নতুনত্ব কিছু নেই, যেমন রেলগাড়ী থেকে বাংলার এ অঞ্চলের দৃশ্য সাধারণতঃ দেখা যায়, তেমনি। নদীর ধারে ধানক্ষেত, ধান ভাল হয় নি, অনেক জায়গায় হলদে আভা হয়ে গেছে। একটু দূরে বড় গাছপালার সারি। বোঝা গেল বর্ষাকালে নদীর সীমানা সেই পর্যন্ত। যতই বরিশালের দিকে এগোচ্ছি ততই নদীর সুস্পষ্ট পাড় মিলিয়ে আসছে। নদীর প্রস্থ বেশী না হলেও ধারে অল্প অল্প জল, ধানখেত ও চরের মধ্যে খানিকটা খানিকটা প্রবেশ করেছে। অনেকগুলি বিপরীতগামী ষ্টীমারের সঙ্গে দেখা হল, তার মধ্যে একটীর নাম 'মহামুনি', আর একটীর নাম 'কানাডা'!

বিকেল পাঁচটায় নাজিরপুর পার হলুম। নদী থেকে ছোট গঞ্জ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। একটু দূরেই একটা হাট বসেছে দেখা গেল। মধুমতী ও আর একটা ছোট খালের মোহনায় হাটটা বসেছে। কয়েকটা ছোট ছোট চালা, ছোট নৌকোতে কিছু কিছু জিনিষ, কয়েক শ' লোক কেনাবেচা করছে। একটী খুব ছোট মেয়ে (বছর তিনচারেকের হবে) খুব টক্‌টকে লাল শাড়ী পরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে নদীর ধারে হাটের পাশে বেশ মুরুব্বির মত পায়চারি করছে।

পরের ষ্টেশন শ্রীরামকাটিতেও দেখা গেল হাট বসেছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা, অজস্র ছোট ছোট নৌকোয় লোকে হাট থেকে ফিরছে। দুই একজন আরোহীও কিছু সওদা নিয়ে নৌকোগুলি বেয়ে তর্‌ তর্‌ করে চলেছে। দুপাশে ঘন নারকেল সুপারির বন। এক একটা জায়গায় আর একটা নদী মধুমতীতে এসে মিশেছে। সেখানে প্রায়ই একটা '*y*' অক্ষরের মত হয়েছে। আমরা নীচের থেকে আসছি, নজরে পড়ছে দুইদিকে দুই বাহু বিস্তৃত হয়ে গেছে, সামনেটা গোল হযে রয়েছে, বড় বড় গাছ। ঠিক মনে হয়, সামনে



মাদারিপুর

আর রাস্তা নেই, আমরা যেন ঐ সামনের বাগানে গিয়ে ঢুকব।

এ দেশের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে—বড় বড় ধানখেতের মধ্যে এইরকম বড় গাছের খানিকটা করে ঘন সন্নিবেশ। তার একটা কারণ আছে। শোনা গেল, এখানে এবং নোয়াখালিতেও, লোকে বাড়ী করবার সময় প্রথমে একটা পুকুর কাটে, তার মাটী এক পাড়ে উঁচু করে সেখানে বাড়ী করে। তারপর চারদিকে নানা রকম গাছ লাগিয়ে দেয়। সুতরাং অবারিত কাঁচাসবুজ ধানখেতের মধ্যে বড় বড় গাছের গাঢ় সবুজ দ্বীপ দেখলেই বুঝতে হবে ওগুলি বসতি—ছোট দ্বীপগুলি এক-আধটী বাড়ী, বড়গুলি এক-একটী পাড়া।

ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে, নদীর ধারে দু একটা আলো দেখা

যাচ্ছে, এমন সময় আমরা হুলারহাট পৌছলাম। হুলারহাট একটা জংশন। এর থেকে একদিকে নদীপথে বাগেরহাটের দিকে যাওয়া যায়। অন্যদিকে বরিশাল। আমরা বাগেরহাটের রাস্তা ত্যাগ করে বরিশাল-অভিমুখে কাউখালীর দিকে এগিয়ে চল্‌লাম। আড়কাটী আমাদের জানালে যে কাউখালীতে ঘণ্টা দুই নঙ্গর হবে। কাউখালী থেকে প্রায় ঝালাকাটি পর্যন্ত একটা সরু খাল দিয়ে যেতে হয়; এই বারণী খালটা এতই সরু যে তা দিয়ে এক সঙ্গে আপ ও ডাউন ষ্টীমার যেতে পারে না। সেইজন্য ডাউন বরিশাল 'ইস্‌প্রিট্' (Express) জাহাজ খুলনার দিকে না বেরিয়ে গেলে বারণী খালে ঢোকা যাবে না। আমরা কাউখালী পৌছবার মুখেই দেখলুম ষ্টীমার ষ্টেশনে একটা লাল সিগনাল জ্বলছে। অতএব দাঁড়ান গেল। একটু পরেই আর একটা ষ্টীমার পিছন থেকে এসে আমাদের ঠিক সামনে নঙ্গর করলো। এই ষ্টীমারের সারেংটা নিশ্চয়ই কিছু চঞ্চল প্রকৃতির, আমাদের মদন মিয়ার মত পাকা ধীর স্থির নয়। এগিয়ে নঙ্গর করার অর্থ, সে আমাদের আগেই খালে ঢুকবে। থেকে থেকে সার্চলাইট জ্বালছে এবং বাঁশী বাজাচ্ছে। আমাদের সারেং-এর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে নিশ্চিন্তে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। কিছুক্ষণ বাদেই 'ইস্‌প্রিট্' জাহাজ আলোয় ঝলমল করতে করতে খাল থেকে বেরিয়ে কাউখালী ষ্টেশনে লাগল, যাত্রী নিয়ে চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে গেল। তবু বাতি সবুজ হয় না। অন্য ষ্টীমারটি ঘন ঘন বাঁশী দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের সারেং অটল। সে চোঙা দিয়ে কাউখালী ষ্টেশনের সঙ্গে পূর্ব্বেই কথা কয়ে জেনেছে যে 'ইস্‌প্রিট্' জাহাজ আসার সুযোগ নিয়ে আরও একটা ষ্টীমার খালে ঢুকে পড়েছে, সেটা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, খালের অপর মুখ থেকে এ মুখে এই টেলিফোন এসেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয় ষ্টীমারটা এসে পৌছল। আমাদের সহযাত্রী অপর ষ্টীমারটা নঙ্গর তুলে আলো জেলে দাঁড়িয়েছিল, এই ষ্টীমারটা পৌছান মাত্র সিগনাল বাতি সাদা বা সবুজ হবার আগেই সে রওনা হল। মদন মিয়ার চোখে এটা হল Violation of the rules of the game, আমাদের জাহাজের মাথার উপর থেকে গম্ভীর কণ্ঠে অপর জাহাজটাকে উদ্দেশ করে বললে "সাদা বাতি অয় নাই, চলি যাও যে?" এই বলে গম্ভীরতর কণ্ঠে আদেশ দিল, "আবেদ, নঙ্গর তোল্।" ধীরে ধীরে নঙ্গর তুলে আমরা মন্থর গতিতে বানরীপাড়ার খাল বাঁয়ে রেখে কাউখালীর খালে প্রবেশ করলাম। অল্প কোয়াশা, সার্চলাইট ভাল খেলছে না। শুনলাম রাত্রি দুটো তিনটের সময় বরিশাল পার হব। আমাদের ছোট সারেং এমতাজ আলি দেওয়ান বলে গেল যে স্রোতের সাহায্য পেলে আমরা আর ছত্রিশ ঘণ্টায় গোয়ালন্দ পৌছব।

মঙ্গলবার—

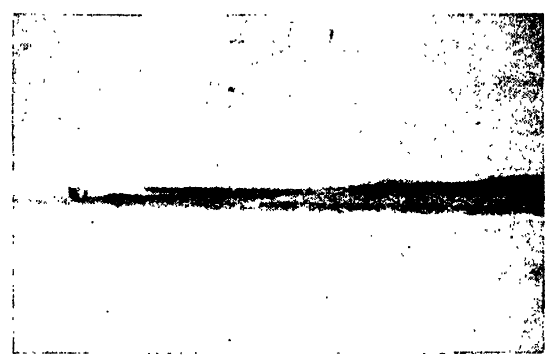
ভোর বেলায় কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখি একটা বড় নদীতে এসে পড়েছি। ষ্টীমার দাঁড়িয়েছে এবং একজন পাইলট নেমে যাচ্ছে। এ হল আমাদের চতুর্থ আড়কাটী, বোধ হয় ঝালকাটিতে উঠেছিল, এখানে নেমে গেল। নতুন যে পাইলট উঠে এল তার নাম লালজী—অতি বৃদ্ধ, খালি গায়ে একটা চাদর জড়ান। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে জায়গাটার নাম নন্দীবাজার, যমুনা নদীর উপরে; আমরা মোড় নিয়েই আড়িয়ল খাঁয় পড়ব এবং মাদারিপুর পর্যন্ত আড়িয়ল খাঁ হয়ে একটা খালে ঢুকব এবং সেই খাল দিয়ে চরমুগুরিয়া হয়ে কুতবপুরে পদ্মায় পড়ব। রাত্রি তিনটেয় বরিশাল পার হয়েছি।

আড়িয়ল খাঁ। নামটা শোনবামাত্র সমস্ত কল্পনা উন্মত্ত হয়ে উঠল। কেন জানি না, পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত নদীর মধ্যে এই নদীর নামটা ছেলেবেলা হতেই আমার কাছে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর মনে হয়েছে। পদ্মা অবশ্য সব চেয়ে বড় নদী, তার সঙ্গে পরিচয়ও অল্প বিস্তর আছে—আড়িয়ল খাঁ আমার সম্পূর্ণ কল্পনার নদী, একেবারেই অদেখা—তবু কতদিন যে পদ্মার চেয়েও এই নামটাতে বেশী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি তার ইয়ত্তা নেই। বোধ হয় নামটার মধ্যে মুসলমানি আমেজ এবং তার সঙ্গে কেমন যেন নবাব-বাদশাহী ঐশ্বর্য ও উদ্দামতার ধারণা ('খাঁ' বলতে কেমন যেন উদ্দাম পুরুষালি majestyর কথা মনে আসে।)—আর সেই সঙ্গে ছেলেবেলায় পড়া কোনও একটা উপন্যাসে বর্ষার উন্মত্ত আড়িয়ল খাঁর উন্মাদ ডাক ও উদ্দাম কল্লোলের বর্ণনা—এ দুটো মনের মধ্যে গভীর হয়ে বসে আছে। তাই আড়িয়ল

খাঁর নাম শুনলে, পশ্চিমবঙ্গবাসী আমি, মন উদ্দাম রোমাঞ্চে বরাবরই চঞ্চল হয়ে ওঠে, এতই চঞ্চল হয় যে পদ্মার নামেও তেমন হয় না। বইয়ে পড়া সেই আড়িয়ল খাঁর অশান্ত উন্মাদ ডাক আজও যেন আমার মনের মধ্যে ডাকতে থাকে।

সেই আড়িয়ল খাঁ! সাগ্রহে চেয়ে আছি—আমরা নন্দীবাজার পার হয়ে আস্তে আস্তে আড়িয়ল খাঁয়ে এসে ঢুকলাম। এই কি সেই নদী? কূলে কূলে ভরা, পাড়গুলি জলের সঙ্গে মিশে গেছে (এদিককার কোন নদীরই তটভূমি উঁচু নয়, একেবারে জলের লাগোয়া, বর্ষাকালে নিশ্চয়ই দুপাশে বহুদূর প্লাবিত হয়ে যায়), এক মাইল দেড় মাইল চওড়া। কিন্তু বড় গাছের সারি তটভূমি হতে বহু দূরে, দুধারের বড় গাছের সারের মধ্যে ব্যবধান আড়াই তিন মাইল হবে। বোঝা গেল, এখন যেখানে ধানখেত বা চর, বর্ষায় সেগুলি প্লাবিত হয়ে দুই ধারের বড় গাছের সার পর্যন্ত নদীর সীমানা বিস্তৃত হয়। এখন নদী তার চেয়ে বহু ক্ষীণকায়—মোটের উপর শান্তও। কিন্তু খুলনা-যশোর জেলার নদীর মত এ আর ঘরোয়া নদী নয়। ধারে বিশেষ কোনই বসতি নেই। মধ্যে মধ্যে ধানের ক্ষেত অথবা চর—আর ধূ ধূ করছে নদী। ক্বচিৎ দু একটা টিনের ঘর। আশ্চর্য লাগল, যখন নদী বর্ষায় চারপাশ প্লাবিত করে বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে তখন এই ঘরগুলি ভেসে যায় না? আর ভেসে না গেলেও এরা থাকে কেমন করে? গ্রাম তো বহুদূরে? উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে একটি ছোট টিনের ঘরে একটা কি দুটো প্রাণী থাকে কি করে? নিশ্চয়ই নদীর সঙ্গে তাদের মিতালি আছে। যখন বান ডেকে নদী তাদের চারপাশে ঘিরে ধরে তখন তারাও নিশ্চয়ই জোর হাতে বৈঠা ধরে নদী পার হতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। আর ঘরোয়া কোনও দৃশ্যও চোখে পড়ে না, যেমন মধুমতীর পাশে পাশে পড়ে। অতুলবাবু ঠিকই লিখেছেন যে "এ নদীতে উদার পদ্মার মুক্তির ডাক এসে পৌঁচেছে।" উপরে শেষ শরতের নির্মল প্রসন্ন আকাশ, সাদা সাদা মেঘ, নীচে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর ফাঁকা, কোনও কিছুতে দৃষ্টি রুদ্ধ হবার নেই, বাঁকের মুখে নদীর সীমানা পাওয়া যায় না; এদিক ওদিক বড় বড় খাল বেরিয়েছে, ডাইনে এবং বাঁয়ে বহুদূরে বড় গাছের সার ঈষৎ নীলাভ হয়ে দেখা যাচ্ছে, কাঁচা হলুদের মত রোদে ধানখেতগুলি অপরূপ দেখাচ্ছে, ক্বচিৎ দু' চারটে পালতোলা নৌকো চলছে। আমরা স্থিরগতিতে বিনা আয়াসে জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি, গায়ে ফুরফুরে হাওয়া লাগছে, মন কেমন একটা অনির্বচনীয় রসে ডুবে আছে।

বেলা একটার সময় নদীর বাঁকে মাদারিপুর দেখা গেল। নদীর ধারে টিনের ঘর, ষ্টীমার ষ্টেশন, কিছু নৌকা। মিনিট দশেকের মধ্যেই আর একটা বাঁক পার হয়ে চরমুগুরিয়া দেখা গেল। গোয়ালন্দর আগে কোথায়ও আমাদের থামবার কথা নয়। কিন্তু এখানে আমাদের একটা ফ্ল্যাট ছাড়তে হবে, তাছাড়া আমাদের কিছু সব্জী কিনবার দরকার হওয়ায় সারেংকে থামবার জন্য অনুরোধ করার ফলে এখানে ষ্টীমার থামল। আজ



দূর হইতে গোয়ালন্দ

হাটবার, হাট লেগেছে। তরকারির মধ্যে বেগুন, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ বিক্রি হচ্ছে। আম পাওয়া গেল। ভাল কলাও পাওয়া গেল। হাটে রকমারি জিনিষ চোখে পড়ল। পূর্ববঙ্গে অধুনা বিখ্যাত বা কুখ্যাত সাদা হাঁড়ি ও কালো হাঁড়ি বিক্রি হচ্ছে। শোনা যায়, সাম্প্রদায়িক বিভেদ এতই চরমে উঠেছে যে দুই সম্প্রদায় একই রঙের হাঁড়িও বরদাস্ত করতে পারে না। আলাদা রঙের হাঁড়ি ব্যবহার করে। মাটির ছাঁচ (পিঠে গড়বার) বিক্রি করতে এনেছে। এক জায়গায় দেখলাম বেদের মেয়েরা চিকিৎসা করছে, সামনে নানা রকম হাড় জড়িবুটী নিয়ে বসে আছে—তারই সাহায্যে মাথাধরা, বাত ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা চলছে। কিন্তু মাছ বা দুধ অনেক সন্ধান করেও পাওয়া গেল না। পশ্চিম বাংলার লোকদের কাছে পূর্ববঙ্গে

সুলভ দুধ ও মাছ প্রায় গল্প কথার মত লোভনীয়, কিন্তু সেই দুটীই অনুপস্থিত। যুদ্ধের ছায়া এসব সুখ সুবিধা শুষে নিয়েছে। তার উপর এবার এ সব অঞ্চলে জলপ্লাবন হয়ে যাওয়ায় তরিতরকারী সবই দুর্মূল্য—বাইরের আমদানি জিনিষে চলছে। একটা আম পাঁচ আনা, বেগুন আট আনা সের, আলু পাঁচ সিকে সের, কই মাছ তিন টাকা কুড়ি। আমাদের সারেং এবং খালাসিরা কিছু মুরগী কিনল, বড় মুরগী একটার দর সাড়ে তিন চার টাকা!

চরমুগুরিয়ায় একটী ফ্ল্যাট ছাড়া হল বটে, কিন্তু নতুন একটী এসে জুটল। আমাদের সিধে গোয়ালন্দ যাবার কথা ছিল, কিন্তু এটীকে তারপাশায় পৌছে দিয়ে তবে গোয়ালন্দ যাবার অর্ডার এসেছে। তার অর্থ, আমরা কুতবপুরে পদ্মায় পড়ে বাঁয়ে না বেঁকে অকারণে ডানদিকে তারপাশা পর্যন্ত যাব। এতে অবশ্য আমাদের লোকসানের চেয়ে লাভই হল। ষ্টীমার গোয়ালন্দ পৌঁছানর কথা ছিল ভোরবেলায়, অথচ আমাদের চট্টগ্রাম এক্‌সপ্রেসের জন্য বেলা তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হত। যদি ষ্টীমার বেলা এগারোটার সময় গোয়ালন্দ পৌছায় তাহলে স্নানাহার করে বেশ নিশ্চিন্তে নামা যেতে পারবে, অপেক্ষাও করতে হবে কম, পদ্মার দৃশ্যও কিছু দেখা যাবে।

চরমুগুরিয়ার কিছু আগেই আড়িয়ল খাঁ ত্যাগ করে চরমুগুরিয়ার খাল ও ময়নাকাটার খাল হয়ে আমরা কুতবপুরের দিকে অগ্রর হচ্ছিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা আটটার সময় কুতবপুর পৌছন গেল। শুনলাম প্রকৃত পদ্মায় পড়তে আমাদের প্রায় আরও একঘণ্টা লাগবে।

বুধবার—

কাল প্রায় দশটা রাত্রে দেখা গেল ষ্টীমারের সার্চলাইটে একদিককার কূল পাচ্ছে বটে কিন্তু অন্যদিকের কূল পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে জলের চেহারাও বদলে গেল। বোঝা গেল পদ্মায় পড়েছি। রাত্রি বারটা নাগাৎ ভাগ্যকুল পৌছে আমাদের সঙ্গী ফ্ল্যাটটীকে সেখানে রেখে তারপাশা-গামী ফ্ল্যাটটীকে নিয়ে তারপাশা রওনা হলুম। সেখানে সে ফ্ল্যাটটীকে পৌছে দিয়ে ফিরবার পথে আমাদের সঙ্গী ফ্ল্যাটটীকে আবার নিয়ে গোয়ালন্দর দিকে যাত্রা শুরু হল। ভোরবেলায় আলো ফুটতেই চোখে পড়ল পদ্মার বিরাট জলরাশি; আমরা ডান পাড় ঘেঁষে চলেছি, বাঁ পাশের পাড় নজরেই পড়ে না, শুধু নীলাভ রেখা চোখে পড়ে মাত্র। দু একটা সাদা-গেরুয়া পাল-তোলা নৌকো ভেসে আসছে। পূর্বে পদ্মায় বহু নৌকো থাকত, এখন তার সংখ্যাল্পতার কারণ বোধ হয় নৌকা-বিতাড়ন নীতি। স্থানে স্থানে পাড় ভাঙছে, খেজুর গাছ কয়েকটা ভাঙনের মুখে জলে ঝুঁকে পড়েছে। নানা ষ্টীমার যাওয়া আসা করছে। 'গুরথা' ও 'ভামো' বলে দুটী ষ্টীমার সৈন্য বোঝাই হয়ে গোয়ালন্দের দিকে চলে গেল। আপ ঢাকা এক্‌সপ্রেসের ষ্টীমার আমাদের পার হয়ে ঢাকা অভিমুখে গেল।

প্রায় বারটার সময় আমরা গোয়ালন্দে পৌছলাম। গোয়ালন্দ একটা খুব বড় গঞ্জ বলে ধারণা ছিল, কিন্তু নদীর ধারে তার কোনও পরিচয় মিল্‌লো না। গুটিকয় টিনের ঘর, একটা ফ্ল্যাটে ষ্টেশন-আফিস, একটা ওয়েটিং ফ্ল্যাট, সাত আটটা ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে, 'এমু' নামক চাঁদপুরযাত্রী ষ্টীমার আপ চট্টগ্রাম এক্‌স্‌প্রেসের জন্য ঘাটে লেগে আছে, 'ভঁইসা' নামে একখানি ছোটো লঞ্চ এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। মাছের বাজার শোনা গেল একমাইল দূরে।

সারেংকে বিদায় জানিয়ে আমরা ধীরে ধীরে ষ্টীমার ছেড়ে নেমে এলাম। ক'দিন ষ্টীমারে ঘর বাঁধার পর তা ছাড়তে যেন মায়া লাগছিল। নদীপথ এবং জলযানের সঙ্গে আত্মীয়তা ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে কোহিস্থানী ব্রহ্মপুত্র অভিমুখে রওনা হল। আমরাও অপেক্ষমান ডাউন চট্টগ্রাম এক্‌স্‌প্রেসে উঠে বসলাম।

বাস্তবিক বাংলাদেশের কত বিচিত্র রূপ আছে তা যাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দেখেন নি তাঁরা অনুভব করতে পারবেন না। একদিকে বীরভূমের কাঁকর ছড়ানো লাল-গেরুয়া মাঠ আর তালবন শালবন, অন্যদিকে সুন্দরবনের জলে-ভরা গাছে-ঢাকানিবিড় শ্যামল সৌন্দর্য্য—একদিকে রাঢ়ের অবারিত দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, অন্যদিকে পদ্মার দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি—এগুলির আস্বাদ এতই বিচিত্র এবং নতুন রকম যে কথায় তা বোঝানো যায় না। বিশেষতঃ সুন্দরবনের দৃশ্য একেবারেই নতুন মনে হয়। প্রকৃতি নিজে তাকে যেন বাগান সাজিয়েছেন, সে বাগান আজও তার আদিম সৌকুমার্য্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি। গাছে জলে ছোঁয়াছুঁয়ি, বড় নদী ছোট খাল মাটিকে চক্‌চকে করে রেখেছে, রস

জোগাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। দুপাশে সবুজ যবনিকা, তার মধ্যে রূপালি জল একখানি বাঁকা ইস্পাতের ফলার মত ঘুরে ঘুরে গিয়েছে, চারপাশে গম্ভীর অথচ প্রসন্ন শান্তি—কলিকাতাবাসীর পক্ষে এ অনুভূতি একেবারেই নতুন। যাঁরা কলিকাতার অবিরাম কলকোলাহলে অভ্যস্ত, কানে দিনরাত কোনও না কোনও আওয়াজ প্রবেশ করবেই, গভীর নিথর অন্ধকার কখনও দেখা যায় না, কোনও না কোনও আলো রাত্রিকে ক্ষত করবেই—তাঁদের পক্ষে এই ঝিঁঝিঁ ডাকা নিস্তব্ধতার এবং জোনাকি জ্বলা অন্ধকারের নিবিড় প্রশান্তি আশ্চর্যরকম মানসিক বিশ্রাম। আর শুধু বিশ্রাম নয়, সেই সঙ্গে নতুন আস্বাদ আর বিচিত্র অনুভূতি।

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী *

আমি মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে রওয়াক্-উল্-হনুদ্এর দিকে রওনা হ'লাম। আজ্হারএর শেষ সীমানাস্থিত বহু প্রাচীন ইমারৎ ভেঙ্গে ফেলা হ'য়েছে। তার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র মসজিদও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। কারণ এই প্রান্তরে নূতন ক'রে আজ্হারএর জন্য গৃহবাটিকা নির্ম্মিত হ'বে। আমরা আজ্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক মাদ্রাসা দেখে নিলাম। ছোট ছোট শিশুরা বেঞ্চে ব'সে ব্লাক-বোর্ড লক্ষ্য ক'রে কবিতা মুখস্থ করছিল সুর বেঁধে, যেমনি ক'রে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা অভ্যাস ক'রে। আজ্হারের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষালয়গুলি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। যে প্রাথমিক পাঠ অভ্যাস করে এবং যে অত্যুচ্চ শ্রেণীতে গবেষণা করে, উভয়েই আল্-আজহারী। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন যে, আজ্হার সম্বন্ধে পৃথিবীর বহু স্থানে অনেক ভ্রান্ত ধারণা র'য়েছে— একজন আজ্হারী বলে পরিচয় দিলেই তাকে মুসলিম শাস্ত্রে বিরাট পণ্ডিত ব'লে মনে করা হয়। ভারতবর্ষে দু'একটি মুসলমান আজ্হারএর অতি প্রাথমিক শিক্ষালাভ ক'রে নিজেদের শেখ্ ব'লে পরিচয় দিয়েছে এবং লোকচক্ষুতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রেছে। অবশ্য আজ্হারএর শেখ্—যিনি সমস্ত স্তরগুলি নিয়মিতভাবে অতিক্রম ক'রেছেন—তিনি পণ্ডিত। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই রওয়াক্-উল্-হনুদ্।

আজ্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বহু বৃত্তি ও দান র'য়েছে। সেই অর্থের উপস্বত্ব থেকে এবং সাময়িক দানের অর্থ থেকে বহু ছাত্রের বাসস্থান এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। বিশিষ্ট উৎসব উপলক্ষে কেহ কেহ সাময়িক খাদ্যাদি আজ্হারএর ছাত্রগণকে 'খয়রাত' করেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ও চীন ভিন্ন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের রাষ্ট্রশক্তি মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিচিত্র রওয়াক্ তৈরী ক'রেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁ'রা তাঁ'দের ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থাও ক'রেছেন। আজ্হারএর সমস্ত ছাত্রই বিনা বেতনে শিক্ষা পায়। পূর্ব্বে তৎসঙ্গে প্রতিদিন দশ পয়সা হিসাবে খাদ্যের জন্য খয়রাত পেত। ইদানীং ভারতবর্ষ ও চীনের (জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীনে) ছাত্রেরা এই দান গ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াকাফ্ (দেবোত্তর বিভাগ) একটু বেশী সাহায্য করেন। রওয়াক্-উল-হনুদ্ আজ্হারএর ছাত্রাবাসের অংশবিশেষ। মিশরে মাটির নীচে ঘর তৈয়ারী হয়। অবশ্য সাধারণতঃ মাটির নীচের ঘর গুদাম, চাকর ও কর্ম্মচারীর বাসস্থান এবং রন্ধনশালা রূপে ব্যবহৃত হয়।



বেদুইন পরিচ্ছদে লেখক

রওয়াক্-উল্-হনুদ্ পশ্চিমমুখী বারান্দাযুক্ত একটি ভূ-নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠ; এই প্রকোষ্ঠে দুইটি কক্ষ আছে। তৈজসপত্রের মধ্যে একটি খাট এবং একখানি কম্বল। প্রতি বৎসর শীতকালে ছাত্রদের একখানি ক'রে কম্বল খয়রাত করা হয়। বারান্দায় জলের কল ও রন্ধনের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে এই রওয়াক্-উল্-হনুদে দুইজন বাঙ্গালী মুসলমান এবং একজন

চীনদেশীয় মুসলমান ছাত্র আছেন। তন্মধ্যে একজন প্রায় দশ বৎসর আছেন। তাঁর নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায়, নাম লোকমান সিদ্দিকী। দ্বিতীয় পাবনার অধিবাসী, মিশরে নূতন এসেছেন, পায়ে হাঁটা পথে জেরুজালেম থেকে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য ক'রে। তিনি এখনও আজ্‌হারএ ছাত্ররূপে গৃহীত হ'বার অনুমতি পান নাই। তিনি মিঃ মহীউদ্দিনকে অধ্যাপক হাবিবকে ব'লে তাঁর বাসস্থানের একটা ব্যবস্থা ক'রার অনুরোধ ক'রলেন। লোকমান সিদ্দিকী আমার কাছে দুঃখ ক'রলেন—রওয়াক্-উল্-হনুদের "মুদীর" (সচিব) একজন মাদ্রাজী মুসলমান। তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং এই নিয়ে লোকমানের সঙ্গে প্রায়ই বচসা হয়। শেষ পর্য্যন্ত কয়েক মাস আগে লোকমান বাঙ্গালীর এই অপমান সহ্য ক'রতে না পেরে মাদ্রাজীটির মাথায় লগুড়াঘাত করে। এই ব্যাপারটি আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। লোকমান এই কথাগুলি খুব গর্ব্বের সঙ্গে আমাদের ব'লে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর রওয়াকে



চা-দ্বীপ—জাজিরাৎউস্-সায়

এসে একদিন তাঁর সঙ্গে আহারাদি ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। এই প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের সুজনতা এবং আত্ম-সম্মান জ্ঞান আমার বেশ ভাল লাগল।

লোকমান আমাকে ব'ল্লেন,—এখানে আবু নসর নামক একজন ভুপালনিবাসী মুসলমান প্রায় কুড়ি বৎসর আছেন। তাঁকে নিয়ে শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব। আমরা রওয়াক্ থেকে প্রায় দেড়টার সময় ফিরে এসে আজ্‌হার মসজিদে প্রবেশ ক'রলাম।

৬ই অক্টোবর, '৪৪

আজকে ভোরবেলা ওয়াই-এম্-সি-এতে কাটালাম। পরশুর জাপানী বুদ্ধমূর্ত্তির পাশে দাঁড়িয়ে তোলা ছবি ভাগলপুরে পাঠিয়ে দিলাম। আমার মাথায় আস্ত্রাখান টুপী দেখে আমারই হাসি পাচ্ছিল। দুপুরবেলা আমার ঘরে একজন মাদ্রাজী, যুদ্ধের হাবিলদার কেরাণী এলেন। ওয়াই-এম-সি-এ সোলজার্স ক্লাবে মাদ্রাজীর সংখ্যাই বেশী। এরা এম্-ই-এফ্ (মিডেল-ইষ্ট-ফোর্স) এর অন্তর্গত। ছোট ছোট ছুটিগুলি এরা এই ওয়াই-এম-সি-এ সোলজার্স ক্লাবেই কাটায়। এখানে গান, বাজনা, রেডিও, খবরের কাগজ, তাস, পাশা, দাবা, পিঙ্‌পঙ্, কেরম খেলার বন্দোবস্ত র'য়েছে। এই কান্টিনে নিত্য ব্যবহারের অনেক জিনিষ কিনতে পাওয়া যায়, যথা,—খাম, পোষ্টকার্ড, কাগজ, ডাকটিকিট, গামছা, মোজা, আণ্ডারওয়ার, মাথার তেল, চিরুণী, ব্রুস, চকলেট, টফি ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশী বিক্রিয় হয় সিগারেট। মিশরীয় সিগারেটের বাইরে খুব নাম আছে, যদিও এখানে কোন তামাক পাতা জন্মায় না। সিগারেটের দাম এখানে ভারতবর্ষের চেয়ে তিনগুণ। বাটার একটি জুতার দোকান এই ওয়াই-এম-সি-এ কান্টিনে আছে। চা, হিন্দুস্থানি সেও, লাড্ডু, জিলিপীও পাওয়া যায়। ভোর আটটা থেকে দুটো, এবং বিকাল চারটে থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। ভোরবেলা ব্রেকফাষ্টের জন্য ডিম, পাঁওরুটি, মাখন, চা, পাওয়া যায়। দুপুরে ডিনারের জন্য অনেক রকম বন্দোবস্ত র'য়েছে। যার যেমন অভিরুচি সে নগদ দাম দিয়ে তাই খেতে পারে, অবশ্য অফিসার এবং সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে একই জিনিষের



ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে লেখক

দামের তারতম্য আছে। রাত্রে ডিনারেরও তাই ব্যবস্থা। প্রত্যেককে শোবার ঘরের জন্য ভাড়া দিতে হয় দৈনিক পাঁচ পিয়াষ্টার (সাড়ে বার আনা)। তার মধ্যে খাট, তোষক, দুইটি কম্বল, একটি বিছানার চাদর,

একটি বালিশ এবং একটি টেবিল দেওয়া হয়। স্নানের বন্দোবস্ত অফিসারদের বেশ ভাল। কিন্তু সৈন্যদের ব্যবস্থা অতি সাধারণ।

আমার সঙ্গে কয়েকজন বাঙ্গালী চিকিৎসা বিভাগের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তার মধ্যে চাটগাঁয়ের মেজর সেন এইমাত্র ইতালি থেকে এসেছেন। খাওয়ার টেবিলে লিবিয়া, গ্রীস এবং ইতালির গল্প ক'রলেন। কাহিনীগুলি খুবই সুন্দর এবং তাঁর অভিজ্ঞতা বিচিত্র।

মিঃ মহীউদ্দিন ছটার সময় আমাকে ফোনে জানালেন,—ডাঃ হাসান তাঁকে আমার বাসস্থান সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন। গিজার পথে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে বায়েৎ-উল-আরাবী নামে একটি আরব দেশীয় ছাত্রাবাসে একটি প্রকোষ্ঠ আমার জন্য নির্দ্ধারিত হ'য়েছে, দক্ষিণা মাসিক দশ পাউণ্ড (১৩৫৲)। তিনি বল্লেন যে, কাল আমাকে নিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁর অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেবেন।

সন্ধ্যায় শেখ লোকমান এবং আবু নসর ভূপালী আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। ভূপালী এসেই প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, মহীউদ্দিনের সঙ্গে আমার কি ক'রে পরিচয় হ'লো? এবং আমাকে সাবধান করিয়ে দিলেন যে ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করি। কারণ, মহীউদ্দিন একজন গুপ্তচর (?)। এ সংবাদ তিনি ব্রিটিশ কন্‌সালেট থেকে পেয়েছেন। লোকমান এ বিষয়ে ভাল-মন্দ কিছুই ব'ল্লেন না। আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে আবু নসরের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, সত্যি কি তাই? মনে একটু অস্বস্তি বোধ ক'রলাম। তারপরে আবু নসর লেখাপড়া সম্বন্ধে এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মধারার আলোচনা ক'রলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক লেখাপড়া জানেন। তিনি মহীউদ্দিনের উপর অত্যন্ত রুষ্ট। তিনি নিজেকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ছাত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে গর্ব্ব অনুভব ক'রলেন, অথচ মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর বন্ধু ব'লেও খুব তৃপ্তিলাভ ক'রলেন।

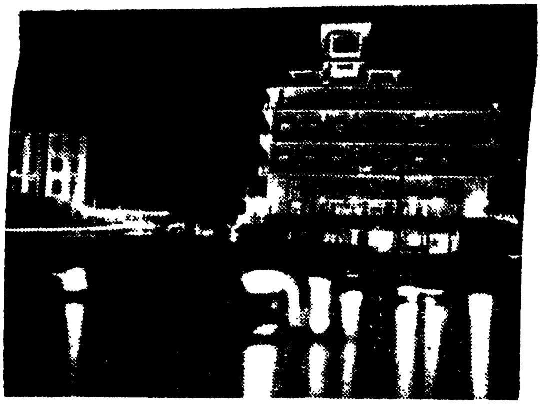
৭ই অক্টোবর, '৪৪

মিঃ মহীউদ্দিন ন'টার সময় ওয়াই-এম-সি-এতে এলেন। কাল আবু নসরের নিকট থেকে তাঁর বিষয় শুনে মনটা একটু তিক্ত হ'য়ে র'য়েছে। বাইরে তাঁকে কিছু প্রকাশ ক'রলাম না। তবু নিজে একটু সাবধান হ'তে বাধ্য হ'লাম। আমরা বায়েৎ-উল-আরাবীর দিকে চল্লাম। প্রায় ওয়াই-এম-সিএ থেকে সাত মাইল দূরে পিরামিডের পথে একটা ক্ষুদ্র ত্রিতল গৃহ, উত্তর ও পূর্ব্বদিক উন্মুক্ত। আমার কক্ষটা নীচে। চারটা জানালা র'য়েছে। সামান্য একটু বসবার ঘর, পাশে স্নানাগার;—সোফা, ড্রেসিং টেবিল, ইজিচেয়ার, রাইটিং টেবিল, ড্রেসিং বুরো, বড় আয়না,—বেশ সুবন্দোবস্ত। বিছানা, স্প্রিংএর খাট, পুরু জাজিম, তোষক, ধব্‌ধবে সাদা বিছানার চাদর, দু'টা কম্বল—জিনিষগুলি বেশ ভাল। ম্যানেজার আমাকে খাবারের ঘর, চায়ের ঘর, রন্ধনশালা, স্নানের ঘর,—দেখিয়ে দিলেন। আমি ইচ্ছা করলে বাইরে খেতে পারি,—তিনি ব'লে দিলেন। আমি দশ পাউণ্ডে ঘরটা ভাড়া নিয়ে অগ্রিম টাকা দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন—আপনি ইচ্ছা ক'রলে 'তালাবাৎ-উৎ-সারকি-ইনী'এ থাকতে পারেন। তাতে আপনার মাসে দশ পাউণ্ড বেঁচে যাবে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ল্লাম,—এটা গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা; আমি একজন অধ্যাপক এবং মিশরে অবস্থানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে টাকা দিয়েছেন, এ অনুগ্রহের দান আমি গ্রহণ ক'রতে পারি না। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষেও গ্লানিকর। সুতরাং এই অনুগ্রহ একজন উপযুক্ত দরিদ্র ছাত্রকে দিলে আমি কৃতার্থ হ'ব। আপনি ডাঃ হাসানকে আমার হ'য়ে ধন্যবাদ জানাবেন। যা' হোক, আমি ম্যানেজারকে টাকা দিয়ে ব'ল্লাম,—কাল বেলা দশটার সময় এখানে আসব।



ভারতীয় সৈনিকদের এক প্রীতি সম্মেলনে লেখক

প্রায় বারটার সময় আমরা এসে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ হাসানের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি আমাকে বল্লেন—বায়েৎ-উল আরবীতে থাকবার একটা সর্ত্ত হ'চ্ছে—এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট থাকা চাই। সুতরাং তিনি আমাকে ডি, লিট্ উপাধির জন্য গবেষণার অনুমতি চাইতে ব'ল্লেন। আমি ব'ল্লাম—আমার পক্ষে দুই বৎসর এদেশে থাকা অসম্ভব। তিনি ব'ল্লেন,—আপনি একটা চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে



লেখকের হোটেল

পাঠিয়ে দিন। তার উপর নির্ভর ক'রে আমি আপনার জন্ত যথাযথ ব্যবস্থা ক'রব।

ডাঃ হাসান অত্যন্ত ভদ্রলোক। তাঁর অফিস ঘরটী অতি সুসজ্জিত। মেঝেতে মূল্যবান কার্পেট। অভ্যাগতদের জন্ত গদি-আঁটা চেয়ার, তাঁর নিজের ঘূর্ণ্যমান চেয়ার, অতিকায় বিচিত্র কারুকার্য্যময় টেবিল, রৌপ্যের কলমদানি, দু'টী টেলিফোন—একটী সংবাদ গ্রহণের, অপরটী সংবাদ প্রেরণের। এখানে প্রত্যেক বড় কর্ম্মচারীর দু'টী ক'রে টেলিফোন থাকে। তার বসবার ঘরের একপাশে সভা-কক্ষ। আর একটু দূরে সেই কক্ষে ভোজনের ব্যবস্থা। এখানে একজন কর্ম্মচারীর অন্ততঃ দুইটী ভৃত্য। সমস্ত জিনিষটাই রাজকীয় বিশ্ববিত্তালয় উপযোগী রাজকীয় ব্যবস্থা। ডাঃ হাসান ডিন অফ দি ফ্যাকাল্‌টি অফ আর্টস্। সুতরাং তাঁর সম্মান ও বিলাস-ব্যবস্থা তাঁর পদমর্য্যাদার উপযুক্ত।

দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে প্রদর্শনী

বর্ত্তমানে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষের যে করালমূর্ত্তি ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহা যে পঞ্চাশের মন্বন্তরকে অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহা এখন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বাহির হইতে খাদ্যতণ্ডুলের আমদানি করিতে না পারিলে দুর্ভিক্ষ রোধ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এ বিষয়ে সরকারী চেষ্টার ত্রুটী নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বহু আশা পাওয়া গেলেও এক কণা তণ্ডুলও পাওয়া যায় নাই।

সকল দিক আলোচনা করিবার জন্ত এবং সরকারী বে-সরকারী সকলের মনোযোগ ও দৃষ্টি একান্তভাবে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীশৈলপতি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশে কমার্শিয়াল মিউজিয়মে একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। অবস্থা অত্যন্ত গুরু এবং এরূপ প্রদর্শনীর নিতান্ত প্রয়োজন আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ৯ই মে কলিকাতার মেয়র মিউজিয়মের একাদশ বার্ষিকী উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। কলিকাতার কমার্শিয়াল মিউজিয়মই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক এবং শিল্পবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সকল ব্যাপারে এরূপ মিউজিয়মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বিশেষ মূল্যবান এক বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কথা বলেন তাহা বিশেষপ্রণিধানযোগ্য। দেশের মধ্যে যদি বৎসরের পর বৎসর অন্নকষ্ট থাকে, আর লোকে তাহার জন্ত বিব্রত থাকে, তাহা হইলে শিল্প বাণিজ্য সকলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকে অন্তান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে অক্ষম এবং তাহার ফলে শিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ধনী অপেক্ষা মধ্যবিত্ত লোক সংখ্যায় অধিক এবং অধিকতর পরিমাণ মূল্যের মাল ক্রয় করিয়া থাকে। তাহারাই যদি অন্নাভাবে বিব্রত থাকে, শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রেতার অভাব ঘটে। এরূপ অবস্থায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব নয়। অন্ন না থাকিলে লোকে অনাহারে মরে; কিন্তু যাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকে, তাহারা সমাজের ভারস্বরূপ। তাহাদের কিঞ্চিৎ আয়বৃদ্ধি করিতে পারিলে তবে তাহারা সুস্থ সবল জীবন যাপন করিতে পারে। কৃষি না হইলে খাদ্যদ্রব্যের অনুপপত্তি ঘটে এবং কৃষির উন্নতি এই কারণে প্রয়োজন। তাহাই অন্নকষ্ট দূর করিবার মূল উপায়। তাহা ছাড়া শিল্পের প্রসার না হইলে লোকের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। উদ্বৃত্ত পয়সা হাতে না থাকিলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই অনেকের অনশন অর্দ্ধাশন ঘটিতে থাকে। ইহার সঙ্গে পশুপালন নিতান্ত প্রয়োজন। অবসর সময়ে যেমন কুটীর শিল্প পরিচালনা করা যায়, সেই ভাবে পশুপালন করা চলে। পশুপালন দ্বারা দুধ মাংস ডিম প্রভৃতি পাইলেই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মিটে এবং লোকের আয় বৃদ্ধিও হয়। কৃষি, শিল্প ও পশুপালন—এই তিনের সমন্বয়ে দেশের অন্নাভাব দূর করিয়া জাতিকে সুস্থ সবল করা যাইতে পারে। তাহা না হইলে কোনও কালেই দুর্ভিক্ষ রোধ করা যাইবে না; দেশের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইবে। কমার্শিয়াল মিউজিয়মকে, তিনি এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে বলেন। বাঙ্গালা সরকার সহযোগিতা দ্বারা প্রদর্শনীকে পূর্ণাঙ্গ করায় তিনি তাঁহাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সকল জ্ঞান আরও ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়া প্রয়োজন, সুতরাং বে-সরকারী প্রদর্শনীতে সরকারী সহযোগিতা একান্ত দরকার। ডাঃ অমূল্য উকিল কলিকাতায় একটী স্থায়ী কৃষিপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া মনে করেন। এখন বিজ্ঞানের যুগ; চিকিৎসা, অন্নের প্রাণশক্তি প্রভৃতি ব্যাপারে যেমন বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, সেই

ভাবে কৃষির ব্যাপারে বিজ্ঞানের সাহায্য লইলে অন্নাভাব দূর করা কষ্টসাধ্য নয় বলিয়া তিনি মনে করেন।

কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পিত প্রদর্শনীর উপযোগিতা বোধ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব্বরকমে সাহায্য দান করিবার জন্য খাদ্য বণ্টন বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর ডাঃ কে-মিত্রকে প্রেরণ করেন। ১০ই মে তিনি মানবদেহে বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত রেশনের প্রভাব সম্পর্কে সরকারী মনোভাব ব্যক্ত করেন। ডাঃ মিত্রের মতে বর্ত্তমানের রেশন হইতে মাত্র ১২০০ ক্যালরি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন ২৪০০ বা ২৬০০ ক্যালরি। দেশের মধ্যে তণ্ডুলের অভাব তাঁহাদের এই সংক্ষেপিত রেশন দিতে বাধ্য করিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার প্রভাব জাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। হয়ত সে কথা ঠিক নয়; কারণ যে তণ্ডুল সরকার দেন তাহা ছাড়া মানুষ অন্যান্য নানারকম খাদ্য খাইয়া থাকে। শাক পাতড়া, ডাল কলাই, আম জাম তাল প্রভৃতি খাদ্য হইতে প্রাপ্ত ক্যালরি তণ্ডুল হইতে প্রাপ্ত পুষ্টির সহিত যোগ দিতে হইবে। তাহা ছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজে শিশু, রোগী, গর্ভিনী ও স্তন্যদায়িনী মাতার জন্য দুগ্ধ বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মাদ্রাজে মাঠা তোলা দুধ বণ্টিত হইতেছে। এক সময় শেষোক্ত দুধের প্রতি মানুষের যে বিরাগ ছিল তাহা দূর হইয়াছে। তাঁহার মতে লোকের অধিকমাত্রায় কলাই জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। জোয়ার বাজরা ভুট্টায় অনভ্যস্ত বাঙ্গালী রুটী খই প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া এ সকল খাদ্যগ্রহণ করিলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবে না। তাহা ছাড়া প্রতিদিন কিছু চীনাবাদাম ছোলা প্রভৃতি যে যেমন পারেন, তাহা গ্রহণ করিবেন। চীনাবাদামের আটা বা ময়দা স্বল্পপরিমাণে ব্যবহার করা চলিতে পারে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ সভাপতির বক্তৃতায় পুরাতনপ্রথায় রক্ষিত নানা খাদ্যাদির উল্লেখ করিয়া তাহা ভোজন করিতে বলেন। সরকারী ব্যবস্থার নানা ত্রুটীর উল্লেখ করিয়া তিনি যাহাতে লোকে ডাল প্রভৃতি সহজে এবং স্বল্পমূল্যে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন।

বাঙ্গালা সরকারের খাদ্য পরিকল্পনা জানিবার জন্য সকলের দারুণ আগ্রহ। যতই দিন যাইতেছে, লোকের আতঙ্ক ততই ঘনীভূত হইতেছে। ১১ই মে বাঙ্গালা সরকারের মাননীয় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ আহম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে মিঃ নির্ম্মল দেব কৃষি বিভাগে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেন। বাঙ্গালা সরকারের খাদ্য বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ রাজন লোককে আশ্বাস দেন যে আতঙ্কের কারণ নাই। কিন্তু অবস্থা যে গুরুতর, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সকলে যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে খাদ্যের অপচয় নিবারণ, অতিরিক্ত ভাণ্ডার না-করা এবং সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন প্রভৃতি নীতি পালন করেন সেই অনুরোধ জানান। পশু চিকিৎসা বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, পালিত পশুর উন্নতি সাধন এবং যে সকল স্থানে প্রয়োজনাতিরিক্ত দুগ্ধ প্রভৃতি সময়ে সময়ে উৎপাদিত হয় তাহার সুষ্ঠু ব্যবহারের উপায় নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে এখনই প্রত্যেক বাড়ীতে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহাতে দুধ নষ্ট না হয়। আজকাল তাপ নিয়ন্ত্রণের অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহার আশ্রয় লওয়া দরকার।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ ১২ই মে তাঁহার সংগৃহীত নানাপ্রকার শুষ্ক বা রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য দ্বারা মন্বন্তরে কি ভাবে কয়েকদিনও প্রাণ রক্ষা করা যায়, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরদিন 'মন্বন্তরে নারীদিগের কর্ত্তব্য' বিষয়ে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে যে সভা হয় তাহাতে 'শিল্প দ্বারা আয়ের পথ' বিষয়ে শ্রীযুক্তা শোভা মহলানবিশ সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রকৃতপক্ষে নারীর উপযোগী বহু শিল্পকলা রহিয়াছে। তাঁহাদের কাজে ব্যাপৃত করা এবং সেই সকল উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা করা বর্ত্তমানের একটী প্রধান কাজ। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে করণীয় নানা ব্যবস্থার মধ্যে সকলের মধ্যে সুষ্ঠু বণ্টন, অভাবগ্রস্ত-দিগের মধ্যে ত্বরিত সাহায্য এবং প্রয়োজন হইলে সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়া প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন। সভানেত্রী মহোদয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেককে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে বলেন।

আমাদের মনে হয় এ সময় কবি রবীন্দ্রনাথের "নগরলক্ষ্মী" কবিতায় বর্ণিত ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার কর্ত্তব্যই মাতৃজাতির নির্দ্দিষ্ট কাজ বলিয়া গ্রহণ করা উচিৎ। সেই যে "কাঁদে যারা অন্নহারা, আমার সন্তান তারা" যেন প্রতি অন্তরে ধ্বনিয়া উঠে। প্রতি পরিবারের কর্ত্রী যদি একটি নিরন্নকে বাঁচাইবার ভার লন, তাহা হইলে বহু লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে।

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় খাদ্যকমিটি গঠনে অসহযোগ করিয়াছে, অতএব ১৯৪৬ সালের কংগ্রেস কর্ম্মীর আর করিবার কিছু নাই বলিয়া একটা ধারণা জন্মিয়াছে। সেই মনোভাব হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক মৃত্যুর কারণ হইতে পারে বলিয়া শ্রীভূপতি মজুমদার এম্-এল্-এ সভাপতির অভিভাষণে সকল কংগ্রেস কর্ম্মীকে খাদ্য বণ্টন অর্থাৎ লোকের প্রাণ-রক্ষার ব্যাপারে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিতে বলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ভয়শূন্য হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া যুবকদের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে অনুরোধ জানান। তাঁহার বিশ্বাস যাহারা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা আজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইবে না।

মিউজিয়মে প্রদর্শিত প্রাচীরপত্রগুলি অতিমাত্রায় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সাধারণতঃ সারা ভারতবর্ষের লোকের জন্য ৬ কোটী ১০ লক্ষ টন খাদ্য তণ্ডুলের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে অপচয়, বীজ প্রভৃতি বাদ দিলে ৫ কোটী ১০ লক্ষ টন হইলে কোনও রকমে চলিতে পারে। এ বৎসর ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টন পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং মোট ঘাটতি ৬০ লক্ষ টন। বর্ত্তমানে রেশনে যে খাদ্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ৯৬০ ক্যালরি পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। ১৫০০ ক্যালরি না হইলে জীবন নাশ হয়। আমেরিকা অধিকৃত জাপানেও লোকে প্রতিদিন ১৫৭৫ ক্যালরি পাইতেছে; আর যে ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়া মিত্রশক্তি যুদ্ধ জয় করিয়াছে, সেই মিত্রশক্তি, বিশেষতঃ আমেরিকা আজ কোনও

সাহায্য করিতেছে না। ফলে আজ আশঙ্কা হইতেছে ৫০ লক্ষ হইতে দেড় কোটী ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমেরিকা যত "সৎকথা" শুনাইতেছে, গণনা করিয়া সেই কটা গম দিলে, বহু লোকের প্রাণ রক্ষা পাইত। বাঙ্গালা দেশ সরকারী মতে ঘাটতি অঞ্চল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশেও কমবেশী পরিমাণ খাদ্যতণ্ডুল আমদানি না করিলে অন্নকষ্ট হয়। *সেই হিসাবে পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেহার, সিন্ধু, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। এবারে সিন্ধু কতক পরিমাণ তণ্ডুল রপ্তানি করিতেছে, অপর কোনও প্রদেশ হইতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে বলিলেই শস্য বৃদ্ধি পায় না,* তাহার জন্য জল, বীজ, সার প্রভৃতির প্রয়োজন। তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করিয়া কেবল প্রচার কার্য্য করিলে অর্থ নষ্ট হইতে পারে, শস্য উৎপন্ন হয় না। প্রায় চল্লিশ কোটী লোকের অন্ন যোগাইতে হইলে তণ্ডুল উৎপাদনের পরিমাণ ১০ ভাগ, কলাই ২০ ভাগ, অন্যান্য খাদ্যাদি ৫০ ভাগ, শাকসব্জি ১০০, স্নেহজাতীয় বস্তু ২৫০, দুগ্ধ ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি করা দরকার। সরকারী মত, চেষ্টা করিলে ইহা অসম্ভব নয়। নানা প্রাচীর ও প্রচার পত্রে বহুবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কমার্শিয়াল মিউজিয়ম কর্তৃক প্রকাশিত "Food Crisis—1946" খাদ্য সমস্যার *উপর অতি মূল্যবান্ পুস্তিকা; আমরা সকলকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।*

২২শে মে তারিখে বিশিষ্ট নাগরিকদিগের সভায় বিভিন্ন আলোচনা হইয়াছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীমাখনলাল সেন, শ্রীমৃণালকান্তি বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বহু সুধী উপস্থিত থাকিয়া আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাতিলের ব্যবস্থা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার ফিরাইয়া লওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশে রেলপথ বসানো পর্য্যন্ত নানা কারণে অকারণে ভারতসরকারের স্কন্ধে ঋণের পর্ব্বত জমিয়া উঠিয়াছে। বিগত দুই মহাযুদ্ধের বিপুল পরিমাণ খরচ চালাইতেও ভারতসরকার দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছেন। এই ঋণভারের দরুণ ভারতসরকারকে বৎসরে বহু টাকা সুদ গণিতে হয়। আগে যে সব ঋণ গৃহীত হইয়াছিল, তৎকালীন টাকার বাজারের বিবেচনায় তাহার সুদের হার ছিল বেশী। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধোত্তরকালে নূতন ঋণপত্র অপেক্ষাকৃত কম সুদে বিক্রয় করা সম্ভব হইলেও ভারতসরকারকে আগেকার ঋণপত্রসমূহের স্বীকৃত সুদের হার এখনও রক্ষা করিতে হইতেছে। এ অবস্থায়, বর্ত্তমান সস্তা টাকার যুগের সুবিধা লইয়া ভারতসরকার যদি প্রাকযুদ্ধকালীন বেশী সুদ দিবার সর্ত্তে সংগৃহীত ঋণ আইনসঙ্গত ভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এখনকার বাজারের উপযোগী অল্প সুদের নূতন ঋণপত্র বাজারে ছাড়িয়া সুদের দরুণ কিছু টাকা বাঁচাইতে পারেন, তাহা তাঁহাদের দিক হইতে অবশ্যই অন্যায় বা অসঙ্গত নয়। বাস্তবিক ভারতসরকারের আর্থিক বনিয়াদ এখন যে ভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের খরচ কমাইবার যে কোন চেষ্টার মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে।

গত ২৩শে মে ভারতসরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ২৭৩ কোটি টাকার শতকরা বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা সুদের যে কোম্পানীর কাগজ বাজারে চালু রহিয়াছে এবং যাহা পরিশোধের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ নাই, সেই ঋণপত্রগুলি ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতসরকার সমমূল্যে পরিশোধ করিয়া দিবেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে যাহারা নগদ টাকা ফিরিয়া চাহেন না, ভারতসরকার তাঁহাদিগকে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের পরিবর্ত্তে মেয়াদহীন শতকরা ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ সমমূল্যে অথবা ১৯৭৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরিশোধনীয় শতকরা ২৸০ আনা সুদের ঋণপত্র প্রতি ১ শত টাকার হিসাবে ৯৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিবেন। ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ এই ভাবে অল্পতর সুদের ঋণপত্রে রূপান্তরকরণের ফলে সুদের দরুণ ভারতসরকারের বৎসরে প্রায় দেড় কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩॥০ আনা সুদের মেয়াদহীন কোম্পানীর কাগজ ১৮৪২ সাল হইতে মোট ৫ কিস্তিতে বাজারে ছাড়া হয়। সর্ব্বশেষ বিক্রয় চলে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। বিভিন্ন কিস্তিতে কত পরিমাণ কোম্পানীর কাগজ বাজারে ছাড়া হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :-

১৮৪২-৪৩ সাল	১২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা,
১৮৫৪-৫৫ সাল	৩৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা,
১৮৬৫ সাল	৬৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা,
১৮৭৯ সাল	১৭ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা,
১৯০০-১৯০১ সাল	৭৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা,
মোট	২৭২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতসরকারের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে যেরূপ, তাহাতে এই ভাবে বেশী সুদের ঋণপত্র বাতিল করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে অল্পতর সুদের ঋণপত্র বাজারে ছাড়িলে ভারতসরকারের আর্থিক সুবিধাই হইবে। বাস্তবিক এখন যেকালে প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলিতে চলতি আমানতে শতকরা বার্ষিক ।০ আনা ও সেভিংস আমানতে শতকরা বার্ষিক ১ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইতেছে এবং শতকরা ৩ টাকা সুদের ২৫ কোটি টাকার কোন সরকারী মেয়াদী ঋণপত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে বিক্রীত হইয়া যাইতেছে, তখন কোম্পানীর কাগজের জন্য শতকরা ৩।৷০ আনা হিসাবে সুদ প্রদান ভারতসরকারের দারুণ আর্থিক ক্ষতি। মেয়াদহীন ৩।৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ পরিশোধের জন্য যুদ্ধোত্তর এই প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির সময় নির্দ্ধারণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

৩।৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের প্রচলন বন্ধের সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারসমূহে লক্ষণীয় তেজী ভাবের সঞ্চার হয়। পক্ষান্তরে এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ৩।৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের বাজার দর ১০৩ টাকা হইতে ১০১৸৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছিল। শেয়ারসমূহের এই যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে ইহার প্রধান কারণ, বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির যুগে শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটাইয়া যাহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে ব্যাঙ্কের জমা রাখা টাকার নামমাত্র সুদের মায়া ছাড়িয়া এইবার বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের দিকে মনোযোগ দিবেন এবং ফলে চাহিদার জন্য শেয়ারসমূহের ক্রমোন্নতিই ঘটিবে। ৩।৷০ আনা সুদের কাগজ বাজারে অতঃপর চালু থাকিবে না বলিয়া ইতিমধ্যেই ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ এবং অপরাপর মেয়াদী ঋণপত্রের লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে।

ভারতসরকার সস্তা টাকার যুগের সুবিধা লইয়া সুদের দরুণ বৎসরে দেড় কোটি টাকা বাঁচাইবার এই যে পরিকল্পনা করিয়াছেন সাধারণভাবে ইহার জন্য সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু তবু ইহার আর একটি দিক আছে। এ পর্য্যন্ত ভারতের যত দানশীল মনীষী বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়াছেন, প্রায় সকলের টাকাতেই ৩।৷০ টাকা সুদের মেয়াদহীন কোম্পানীর কাগজ কেনা আছে। এই টাকা হইতে লব্ধ সুদের হিসাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এই দুর্দ্দিনে সেই দায়িত্ব সম্প্রসারিত হইবার স্থলে সরকারী হস্তক্ষেপে যদি সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে বিপুল জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা। ইহা ব্যতীত এদেশের ৩।৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ বহু বিধবা ও শিশুর একমাত্র আশ্রয়। ভারতসরকার এই কোম্পানীর কাগজের প্রচলন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও নিরুপায় অনাথ-অনাথাদের ক্ষতিপূরণের কোনপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহার ফল অবশ্যই মারাত্মক হইবে। ইহা ছাড়া গভর্ণমেন্টের এই ব্যবস্থায় বীমাকোম্পানী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। এই সব প্রতিষ্ঠানের মোটা টাকা বাধ্যতামূলকভাবে কোম্পানীর কাগজে লগ্নী থাকে। অতঃপর সরকারী ঋণপত্র হইতে ইহারা যদি কম সুদ পায় তাহা হইলে তাহারা সেই ক্ষতি জনসাধারণের উপর দিয়া অবশ্যই পূরণ করিয়া লইবে। বলা বাহুল্য ইহার ফলে জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবে ইহাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি বক্তব্য এই যে, ৩।৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের প্রচলন রদ করিয়া ভারতসরকার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসী এবং জনহিতকর সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘাড়ের উপর দিয়া বৎসরে দেড় কোটি টাকা বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু ভারতের পাওনা যে ১৮ শত কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় পচিতেছে, তাহা হইতে রেলবিভাগের হিসাবে ব্রিটেনে গৃহীত সাত শত কোটি টাকা ঋণপরিশোধ করিলে তো বৎসরে সুদের দরুণ ৩০ কোটি টাকা বাঁচিতে পারে। এই দেনা শোধের ব্যাপারে ভারতসরকারের আশানুরূপ আগ্রহ দেখা যায় না কেন? আলোচ্য কোম্পানীর কাগজের সুদ অধিকাংশক্ষেত্রে দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণসাধন করে, খরচ কমাইবার জন্য এই দুর্দ্দিনে এখনি ইহার দিকে নজর না দিয়া অনেক বেশী সুদের বিদেশী দেনা আগে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করা কি ভারতসরকারের কর্ত্তব্য নয়?

আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক চুক্তি ও ভারতবর্ষ

আমেরিকায় ব্রেটন উড্‌স সহরে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক উন্নতিকল্পে একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যে সকল বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সকল দেশের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হয় নাই। তবু এই ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে যে সকল দেশ সদস্য হইবে তাহাদিগকে স্বাক্ষরের পূর্ব্বে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং অনুষ্ঠানপত্রে মোটামুটি আশাপ্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টই ব্যবস্থা পরিষদের প্রত্যক্ষ সম্মতি গ্রহণ করিয়া তবেই সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

উক্ত ব্রেটন উড্‌স সম্মেলনে মিত্রপক্ষীয় যে সব দেশ সদস্য হইতে পারে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই তালিকায় ভারতবর্ষের নাম আছে এবং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের তহবিলে ভারতবর্ষের নামে ৪০ কোটি ডলার হিসাবে ৮০ কোটি ডলার চাঁদা ধরা হইয়াছে। চাঁদা প্রদানকারী দেশের এই তালিকায় ভারতের স্থান হয় ষষ্ঠ। তখন স্থির হইয়াছিল যে, যে সকল মিত্রপক্ষীয় দেশ এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের প্রাথমিক সদস্য হইবে, তাহাদিগকে ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে দেয় চাঁদা জমা দিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯৪৫ সালের শরৎকালীন অধিবেশন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। পরিষদের অধিবেশনে ব্রেটন উড্‌স চুক্তিতে ভারতবর্ষের

যোগদান উচিত কি না সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই। তৎকালীন অর্থসদস্য স্যার জেরেমী রেইসম্যান পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আশ্বাস দেন যে, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের পূর্ব্বে ভারতসরকার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিষদকে আলোচনার সুযোগ দিবেন। তারপর অবশ্য অর্থসচিব তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। ১৯৪৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বড়লাট অকস্মাৎ এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের ভার সপরিষদ নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ২৭শে ডিসেম্বর তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে আমেরিকাস্থ ভারতীয় এজেন্ট জেনারেল স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ভারতের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা ভারতবর্ষের পক্ষে সত্যকার লাভজনক কি না তাহা লইয়া গভীর আলোচনার প্রয়োজন ছিল। আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধনের বহু বড় বড় কথা এই চুক্তি-পত্রে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকের ধারণা এই চুক্তি কার্য্যতঃ ভবিষ্যত পৃথিবীর আর্থিক ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন কায়েমী স্বার্থ—প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। সম্প্রতি ফেডারেশন-চেম্বারের বার্ষিক সভায় বিদায়ী সভাপতি স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডারের সদস্যের পক্ষে নিজ স্বার্থে অন্য দেশের বাণিজ্য ও কর্ম্মসংস্থানের ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন চলিবে না এবং সদস্য দেশের শিল্পসংরক্ষণ নীতি শিথিল রাখিতে হইবে বলিয়া যে বিধান সংযোজিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি শিল্পে পশ্চাৎপদ উন্নতিকামী দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। অষ্ট্রেলিয়া শিল্পের দিক হইতে অনেকটা অগ্রসর, তবু অষ্ট্রেলিয়ার একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি এই আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করিতেছেন। এ অবস্থায় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চাপে সর্ব্বস্বান্ত ভারতবর্ষের পক্ষে বিনা চিন্তায় একরাশ টাকা দিয়া শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক বিধিনিষেধের গণ্ডী মানিয়া লওয়া অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হয় নাই। রাশিয়াকে পরিকল্পনা রচয়িতাগণ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডারের স্থায়ী সদস্যপদ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পাছে ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের দ্বারা ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক ষড়যন্ত্রজালে জড়াইয়া পড়িতে হয়, সেজন্য রাশিয়া ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর দূরের কথা, আজ পর্য্যন্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে নাই এবং চিন্তা-ভাবনার শেষ করিয়া কবে যে রাশিয়া যোগ দিবে তাহাও এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। শুধু রাশিয়া নয়, চাঁদা বা সম্মানের দিক হইতে পরিকল্পনানুসারে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের স্থান ভারতবর্ষের নীচে হইলেও অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডও আপাততঃ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য হইতে অস্বীকার করিয়াছে। সবচেয়ে মজার কথা, এই তিন দেশের অস্বীকৃতির ফলে প্রস্তাবিত মুদ্রা-ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী ইহাদের প্রাথমিক সদস্য হইবার শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত সময় হইতে এক বৎসর পিছাইয়া দিয়া ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্থির করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ যে মানসিক দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন এবং যাহার ফলে তাহারা সকল দিক হইতে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ পাইয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষেও সেই দৃঢ়তা দেখান অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশী শাসকসম্প্রদায় কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে বলিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের সম্মতি ছাড়াই ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদারী সপ্রমাণ করিতে ভারতসরকার একান্ত তাড়াহুড়া করিয়া ১৯৪৫ সালের মধ্যে ব্রেটন উড্‌স চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরপর্ব শেষ করিয়াছেন।

আশার কথা, আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের বিধানপত্রে লেখা আছে যে, কোন দেশ অসুবিধাবোধ করিলে লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্ত্তমান জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত এই যোগদান অর্থহীন বা ক্ষতিকর মনে করিলে বাহির হইয়া আসাও ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার জনমত বা জনস্বার্থ উপেক্ষার দুঃসাহস যে কখনই করিবেন না, তাহা আমরা অনায়াসেই আশা করিতে পারি। ১।৬।৪৬

আশা

শ্রীমতী দীপ্তি দেবী

মনে জাগে শুধু—বড় হইবার আশা।
হে সর্ব্ব, এ গর্ব্ব নয়—তোমারি তো দান্
বুঝে নেছে প্রাণ।
শুধু তোমার ইঙ্গিত স্মরণ করিয়া,
মনে হয় আমি উঠিব গড়িয়া,
মোর মাঝে তব যত কিছু সাধ,—
তোমার কৃপায় হউক অবাধ,
শুধু চরণে দিও গো বাসা।
মনে জাগে শুধু বড় হইবার আশা।

সে ইঙ্গিতে মোর উঠেছে জাগিয়া
সুপ্ত বাসনা যত,
প্রবল করেছে আগ্রহ মোর
হইলাম ব্রতে রত।
গোপনে তোমায় সম্মুখে রাখি,
তোমারি আদর্শ ধরি,
নীরব মনের কথাটি কেবল
তোমারেই ব্যক্ত করি।
তোমার স্মৃতিটি লইয়া আমার
থাক্—কাঁদা-হাসা,
মনে জাগে শুধু বড় হইবার আশা।
তোমার পরশ পাই যেন প্রাণে
ওগো মোর প্রভু,
সেই লয়ে যাবে পথ দেখাইয়া
তোমার কথাটি গোপনে কহিয়া—
তব—দুয়ারে কভু না কভু।
তারি প্রতীক্ষায় রবে এই দীনা।
শুনি অনাহতে বাজে তব বীণা—মিটিবে পিপাসা।
মনে জাগে শুধু বড় হইবার আশা।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

১২

যুগলবাবুকে একেবারে বাগানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যেতে হল, গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে' দাঁড়াতে হ'ল একটি কোনে এবং যাতে ঘাড় ফিরিয়ে এদের দিকে না তাকায় তার জন্যে কটা-চুল সেই মেয়েটিকে পাহারা পাঠানো হল। যুগল সামলে নিয়েছিল এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল ওদের মতো করে' ওদের আনন্দে যোগ দিতে। সুতরাং সে অনড় হয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কটাচুল মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে দিতে আর সকলের সঙ্গে ইশারায় ইঙ্গিতে বলতে লাগল কি যেন সব। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিল এইবার মজার কিছু একটা হবে, ষড়যন্ত্র চলছে একটা। হঠাৎ কটাচুল মেয়েটি হাত নাড়তেই সবাই উঠে পালিয়ে গেল ঊর্দ্ধশ্বাসে।

"চলুন, চলুন আপনিও আসুন" অনেকে চুপি চুপি বললে পুরন্দরবাবুকে।

"কেন, ব্যাপার কি—"

"আঃ চেঁচাবেন না। উনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন না যতক্ষণ পারেন, আমরা পালাই চলুন। শিমুল আসছে ওই দেখুন" কটা-চুল মেয়েটিও ছুটে পালিয়ে এল নিঃশব্দে! সকলে ছুটে পুকুরের ওধারে চলে গেল। অর্থাৎ যুগল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে বিপরীত দিকে একেবারে। পুরন্দরবাবু সেখানে গিয়ে দেখলেন সুমিতা খুব রাগ করে' কঙ্কনা আর পারুলকে বকছে খুব।

"রাগ কোরো না দিদি, লক্ষীটি"—পারুল ভোলাবার চেষ্টা করছে তাকে।

"আচ্ছা বেশ, মা-কে আমি বলব না, কিন্তু আমি আর থাকছি না এখানে। ভদ্রলোককে দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে পালিয়ে আসাটা কি ভদ্রতা! কি মনে করবেন ভদ্রলোক, ছি, ছি, ছি"

সুমিতা চলে গেল। সুমিতা যুগলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু আর কেউ হল না, বরং আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল সবাই। ঠিক হ'ল যুগল ফিরে এলে কেউ যেন তাকে লক্ষ্য না করে। পুরন্দরবাবুও না।

"আসুন কানামাছি খেলা থাক"—কটাচুল মেয়েটি বললে।

মিনিট পনের পরে যুগল ফিরে এল। সত্যি অনেকক্ষণ সে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কানামাছি খেলা খুব জমে উঠেছে, চীৎকার হাসি হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে সবাই। যুগল রাগে কাঁপতে কাঁপতে সোজা চলে গেল পুরন্দরবাবুর কাছে। তার কামিজের হাতাটায় টান দিয়ে বললে—"শুনুন একবার"

"কি মুশকিল, বার বার কত শুনবেন উনি আপনার কথা। আবার রুমাল চাই নাকি"

যুগল পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে গেল একধারে।

"এবার নিশ্চয় আপনি, মানে আপনি ছাড়া—"

যুগলের দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল।

পুরন্দরবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন—"ওরকম করবেন না আপনি, তাহলে ওরা আরও ক্ষেপে যাবে। আপনি চটছেন বলেই না ওরা চটাচ্ছে আপনাকে। বেশ সহজভাবে মিশুন না, সব ঠিক হয়ে যাবে"

পুরন্দরবাবুর কথাগুলো যুগলের প্রাণে লাগল মনে হল, সে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে' দলের মধ্যে ফিরে গিয়ে কানামাছি খেলায় যোগ দিলে, যেন কিছু হয় নি। মেয়েরাও আর তাকে বিশেষ বললে না কিছু। বিশ্বাসহন্ত্রী শিমুলের (কটা-চুল মেয়েটির) সঙ্গেও সে বেশ সহজ ভাবে মেশবার চেষ্টা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু এটা কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে যুগল পারুলের সঙ্গে কথা কইতে সাহস করছে না, যদিও তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোঁক ছোঁক করে'। মনে হ'ল পারুলের ঘৃণা এবং অবজ্ঞাটা সে যেন তার প্রাপ্য বলেই মেনে নিয়েছে—এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস বা সামর্থ্য কোনটাই তার আর নেই যেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও আবার তারা শেষকালে তাকে আর একটা খোঁচা দিতে ছাড়লে না।

লুকোচুরি খেলা হচ্ছিল। যুগল একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল। তারপর তার কি মনে হল সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা ঘরে গিয়ে আলমারির পিছনে লুকোল। দেখতে পেয়ে গেল সবাই সেটা! শিমুল তার পিছু পিছু গিয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় শিকল তুলে দিয়ে পালিয়ে এল। তারপর সবাই চলে গেল আবার সেই বটগাছটার দিকে। যুগল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখল কেউ তাকে খুঁজতে আসছে না, তখন সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। কাছে-পিঠে কাউকে দেখতে পেলে না। কপাট খুলতে গিয়ে দেখে কপাট বাইরে থেকে বন্ধ! চীৎকার করবার উপায় নেই—বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কাছেপিঠে চাকরবাকরও দেখতে পাওয়া গেল না একটিও। সুমিতাও ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুতরাং বেচারাকে বন্দী হয়েই বসে থাকতে হল খানিকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে একে একে ফিরে এল সব।

যুগলবাবু আপনি এখানে বসে' কি করছেন। কি মজা হল এতক্ষণ। আমরা থিয়েটার থিয়েটার খেলছিলাম। পুরন্দরবাবু কি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। যুবকের পার্ট করলেন, এমন সুন্দর হয়েছিল।

"আপনি বসে' আছেন কেন। আসুন আপনাকে দেখেও মুগ্ধ হওয়া যাক একটু"

"এখনও খেলা শেষ হয় নি নাকি" হেমাঙ্গিনী দেবীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, বাগানে বসে' মেয়েদের সঙ্গে চা খাবেন বলে' বেরিয়ে এলেন তিনি।

"কি হচ্ছে সব"

"দেখুন না যুগলবাবু ওপরে বসে আছেন"—মেয়েরা আঙুল দিয়ে যুগলবাবুকে দেখিয়ে দিলে। রেগে টং হয়ে' তিনি জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন।

"তোমাদের সঙ্গে সামনে দাপাদাপি করতে কে পারে বল"

হেসে তিনি চাইলেন যুগলের দিকে। যুগলও হাসবার চেষ্টা করলে একটু। পুরন্দরবাবু আসাতে পারুল বিশেষ করে' কেন যে খুশী হয়েছে তা একটু পরে সে নিজেই প্রকাশ করলে পুরন্দরবাবুর কাছে—অবশ্য গোপনে।

কল্পনা পুরন্দরবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। পারুল সেখানে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। পুরন্দরবাবুকে পারুলের কাছে রেখে কল্পনা চলে গেল।

পারুল তাঁকে বললে—"আমার একটি উপকার করবেন? আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না, সেইজন্যে আপনি আসাতে বিশেষ করে' খুশী হয়েছি আমি"

"কি উপকার"

"যুগলবাবু যতই বলুন আপনি যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নন তা আমার বুঝতে বাকী নেই। আপনি একটি কাজ করুন দয়া করে', এইটি ফেরত নিয়ে যান, ওঁকে দিয়ে দেবেন কোনসময়ে। আমিও ওঁকে দিতে পারতুম, কিন্তু আমি আর জীবনে ওঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না। আপনি একথাও জানিয়ে দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলে' দেবেন ভবিষ্যতে উনি যেন জোর করে' কোন উপহার দিতে না আসেন কিম্বা আমার সঙ্গে মেশবার চেষ্টা না করেন। করলে অপমানিত হবেন শুধু। এই উপকারটি আমার করবেন?"

ব্রেসলেটের বাক্সটা আঁচলের তলা থেকে বার করলে পারুল।

"আমাকে আর এর মধ্যে জড়িয়ো না, দোহাই" পুরন্দরবাবু সকাতরে বললেন।

"জড়াব না? কেন? আচ্ছা বেশ! বেশী করতে হবে না কিছু আপনাকে"

হঠাৎ পারুলের গলা কেঁপে গেল, ঠোঁট ফুলে উঠল, জল এসে পড়ল চোখে। পুরন্দরবাবু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

"না, না, আমি তা বলছি না—আচ্ছা দাও দাও—আমারও একটা বোঝাপাড়া আছে ওর সঙ্গে"

"আমি জানি আপনার সঙ্গে ওর ভাব নেই" সুর বদলে গেল পারুলের, "হতেই পারে না ওরকম লোকের সঙ্গে ভাব। উনি এসেছেন আমাকে বিয়ে করতে! আস্পর্দ্ধা কম নয়। আপনি আজই ফিরে দেবেন এটা, কেমন? এ নিয়ে বাবার কাছে যদি কাঁদুনি গাইতে যান উনি, মজাটা দেখিয়ে দেব তাহলে"

হঠাৎ পিছনের ঝোপটা থেকে নীল-চশমা-পরা সেই ছোকরা বেরিয়ে এল। "ওটা ফিরিয়ে দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য"—ছোকরা বললে—"বুঝলেন, মানে নারীদের প্রতি কিছুমাত্র সম্মানবোধ থাকলে এরকম জবরদস্তির প্রতিবাদ করা প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই কর্ত্তব্য" কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই পারুল হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

"না গো মা! কি আক্কেল তোমার অজিত। সরে' যাও এখান থেকে! আড়ি পেতে কথা শুনতে লজ্জা করে না? তোমাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম—এ কি কাণ্ড—যাও এখান থেকে"

পা ঠুকে এক ধমক দিতেই অজিত সরে' পড়ল। তবু পারুলের রাগ যায় না। রাগে গরগর করতে লাগল সে।

"এমন জ্বালাতন করে এরা" হঠাৎ পুরন্দরের দিকে ফিরে সে বললে "আপনি বুঝবেন না ঠিক। ভারী অবুঝ সব। আপনার হয়তো মজা লাগছে, কিন্তু এমন লজ্জা করে' আমার—"

"একেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ না কি" হেসে পুরন্দরবাবু জিগ্যেস করলেন।

"কক্‌খনো না! একে? আচ্ছা, কি করে ভাবতে পারলেন আপনি!"

হঠাৎ লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল তার "এ তার বন্ধু একজন। কি রকম অদ্ভুত সব বন্ধু দেখুন তো···বন্ধুত্ব করবার লোক পায় নি আর। দেখুন আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এ কথা বলতে পারি না—এটা ফিরিয়ে দেবেন তো?"

"বেশ দেব"

"বড্ড ভাল লোক আপনি, খুব ভাল লোক"

দুচোখে আলো ঝলমল করে' উঠল তার। বাক্সটা পুরন্দরবাবুকে দিয়ে বললে—"আজ অনেক গান গেয়ে শোনাব আপনাকে। অনেক—অনেক। সত্যি খুব ভাল গাইতে পারি আমি, জানেন? তখন মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আবার আসবেন ত? আর একবার অন্তত আপনাকে আসতেই হবে—খুব খুশী হব তাহলে। আপনাকে সব কথা বলব পরে—সমস্ত খুলে বলব। আর কাউকে বলবেন না যেন—"

মুচকি হেসে ভুরু নাচিয়ে ছুটে চলে গেল সে।

পারুল তার কথা রেখেছিল, চা খাবার সময় দুটো গান তাঁকে শুনিয়েছিল। সুন্দর মিষ্টি চড়া গলা। চা খাবার জন্যে ভিতরে এসে পুরন্দরবাবু দেখলেন যুগল গম্ভীরভাবে বিশ্বম্ভরবাবু ও হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বসে কি কথা কইছে—হয়তো বিবাহপ্রসঙ্গেই আলোচনাটা সে শেষ করছে। দু'দিন পরে তো তাকে চলে যেতে হবে ন'মাসের জন্য। সবাই যখন ঘরে ঢুকল সে কারও দিকে ফিরে তাকাল না, পুরন্দরবাবুর দিক থেকে বিশেষ করে' মুখটা ঘুরিয়ে নিলে।

কিন্তু পারুল গান আরম্ভ করতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পারুলকে একটা কি জিগ্যেস করলে একটু হেসে, পারুল কোন উত্তর দিলে না। এতে কিন্তু এতটুকু দমল না যুগল, কিছুমাত্র ইতস্তত না করে' এমনভাবে সে সোজা গিয়ে পারুলের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল যেন স্বভাবতঃ ওইটেই তার স্থান এবং কোন কারণেই সেখান থেকে সে একচুল নড়বে না।

পারুলের গান শেষ হয়ে গেলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বললে—"আপনি একটা গান করুন না,"

"আগে গাইতাম, অনেকদিন গাই নি। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে'"

পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসলেন তিনি।

"মা পুরন্দরবাবু গান গাইছেন" মেয়েরা আনন্দে কলরব করে' উঠল। কর্তা গিন্নি বারান্দা থেকে ভিতরে এসে বসলেন। পুরন্দরবাবু রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা ধরলেন—

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখী, জাগো জাগো

পারুল তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে চেয়েই তিনি আবেগভরে গাইতে লাগলেন। আগেকার মতো গলা আর ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাইতেই মাত করে' দিলেন। সমস্ত প্রাণ ঢেলে গাইছিলেন তিনি—অন্তরের কামনা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠতে লাগল প্রতি ছত্রে ছত্রে। প্রতি কথায় ফুটে উঠতে লাগল আকুতিময় আবেগ, মর্ম্মের আবেদন, বাসনার বহ্ন্যুৎসব। প্রদীপ্ত চোখে পারুলের দিকে চাইতে চাইতে তিনি গাইতে লাগলেন

জাগো আকুল ফুল সাজে
জাগো মৃদু কম্পিত লাজে
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখী, জাগো জাগো।

পারুলের সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ জাগল, ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্ত্তে পুরন্দরবাবুর মনে হল তার চোখে যেন সলজ্জ আমন্ত্রণের একটা আভাস দেখতে পেলেন তিনি। অন্য শ্রোতারাও মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। গান থেমে যাবার পর একটা নিবিড় স্তব্ধতা যেন ঘনিয়ে এল ক্ষণকালের জন্য—সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে একটা কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সুমিতার চোখ দুটো যেন জলজল করছে।

বিশ্বম্ভরবাবু নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

"গানটা বেশ, কিন্তু একটু, ওর নাম কি, যাকে বলে" গলা খাঁকারি দিয়ে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। রবিঠাকুরের গানের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারলেন না তিনি।

"পুরন্দরবাবুর গলা তো চমৎকার" হেমাঙ্গিনী দেবী সুরু করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু যুগল তাঁকে কথা শেষ করতে দিলে না। সে এক কাণ্ড করে' বসল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে পারুলের হাত ধরে হিড় হিড় করে' তাকে পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল, তারপর পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে বললে—

"এক মিনিট, বাইরে চলুন তো একবার"

ঠোঁট দুটো কাঁপছিল তার।

পুরন্দরবাবু দেখলেন বাইরে না গেলে এখনই হয়তো সে যা তা একটা কাণ্ড ক'রে বসবে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন।

"আপনাকে এখনই এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে, বুঝলেন"

"কেন? বুঝতে পারছি না ঠিক"

উত্তেজিত কণ্ঠে যুগল বলতে লাগল "মনে আছে আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে বলেছিলেন তখন আমি বলি নি, সময় হলে বলব বলেছিলাম; এখন সময় হয়েছে, বুঝলেন, চলুন যাই। আর এখানে থাকা চলবে না"

পুরন্দরবাবু ক্ষণকাল ভাবলেন, যুগলের মুখের দিকে চাইলেন একবার, তার পর রাজি হয়ে গেলেন।

"আচ্ছা বেশ, চলুন তবে"

হঠাৎ চলে যাওয়ার প্রস্তাবে কর্ত্তাগিন্নি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মেয়েরা আপত্তি করতে লাগল।

"আর এক কাপ করে' চা খেয়ে যান অন্তত" হেমাঙ্গিনী দেবী অনুরোধ করলেন।

"যুগল একধারে মুখ কালো করে' দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বম্ভরবাবু তার কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ হ'ল কি"

"যুগলবাবু কেন আপনি পুরন্দরবাবুকে নিয়ে যাচ্ছেন" মেয়েরা অনেকেই ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগল। পারুল যুগলবাবুর দিকে এমন একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, কিন্তু গোঁ ছাড়লে না।

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন, "যুগলবাবুর দোষ নেই। আমারই জরুরি একটা এনগেজমেন্ট আছে এখন—আমি ভুলে গিয়েছিলাম—যুগলবাবু মনে করিয়ে দিলেন সেটা। আমাকে যেতেই হবে"

পুরন্দরবাবু হাসিমুখে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সুমিতাকে নমস্কার করলেন বিশেষ করে'।

"আপনি আসাতে ভারী আনন্দে কাটল দিনটা। আবার আসবেন" বিশ্বম্ভরবাবু বললেন ভদ্রতা করে'।

"এলে সত্যিই ভারী খুশি হব" হেমাঙ্গিনী দেবীও বললেন হেসে।

"পুরন্দরবাবু আবার কবে আসবেন"—মেয়েরা অনেকেই বলে উঠল।

গাড়ীতে যখন চড়েছেন তখন একটি কণ্ঠস্বরে একটা বিশেষ মিনতি যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল—পুরন্দরবাবুর মনে হল।

"আসবেন আবার পুরন্দরবাবু, লক্ষ্মীটি—আসবেন নিশ্চয়"

পুরন্দরবাবু মুখ বাড়িয়ে দেখলেন সেই কটা-চুল মেয়েটি।

১৩

কটা-চুল মেয়েটির মুখখানা বার বার মনে পড়তে লাগল, কিন্তু তবু পুরন্দরবাবুর মনের অন্ধকার যেন ঘুচল না। সমস্ত দিনটা যদিও হল্লা করেই কেটেছে—খেলা, হাসি, গান, অতগুলি মেয়ের সঙ্গ—অন্তরের গ্লানি কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অপসারিত হয় নি মন থেকে। গান গাইবার লোভটা কিছুতেই দমন করতে পারলেন না তিনি এবং সেই জন্যেই বোধহয় অত আবেগভরে গাইলেন।

"ছি ছি কি কাণ্ডটাই করলাম—এমনভাবে চলে আসাটা" মনে মনে

আফশোষ হচ্ছিল কিন্তু তখনই নিজেকে সম্বরণ করলেন। অনুতাপ করাটা আত্মসম্মানহানিকর বলে' মনে হতে লাগল—তার চেয়ে বরং রাগ করা ঢের ভাল।

"গাড়োল!" যুগলের দিকে আড়চোখে চেয়ে মনে মনে বললেন তিনি।

যুগল নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একটি কথাও বলে নি—যা বলবে তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল বোধহয়। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ মুছছিল। "ঘামছে ব্যাটা"—পুরন্দরবাবু স্বগতোক্তি করলেন।

একবার শুধু যুগল গাড়োয়ানকে জিগ্যেস করলে—"বড়টড় করবে না কি, মেঘ করেছে দেখছি"

"উঠবে ঠিক। যা গুমোট করেছে সমস্ত দিন"

ঈশান কোণে সত্যিই মেঘ উঠেছিল একটা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

বাড়ি পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

"আমি আপনার বাসাতেই যাব এখন কিন্তু" যুগল আগে থাকতেই বলে রেখেছিল।

"আসতে পারেন, কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই"

"আমি বেশীক্ষণ থাকব না"

গাড়ি থেকে নেবেই যুগল চাকরটার খোঁজ করতে ভিতরে ঢুকে গেল।

"কেন, চাকর কি করবে এখন"

যুগল কোন উত্তর দিলে না। পুরন্দরবাবু আলো জ্বালতেই যুগল চেয়ারে বসল। পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনের বিরক্তি যথাসাধ্য গোপন করে' শেষে বললেন—"দেখুন, সব কথা আমি জানতে চেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আর আমার কিছু জানবার প্রবৃত্তি নেই। আমাদের মধ্যে জানাজানির আর কোন প্রয়োজন আছে বলে'ই মনে হচ্ছে না। সুতরাং আপনি এখন বাড়ি যান, আমি খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। রাত হয়ে গেছে"

"আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা কিন্তু হওয়া দরকার যে" পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে যুগল বেশ শান্তভাবেই কথাগুলো বললে।

"বোঝাপড়া! কিসের বোঝাপড়া? এই বলবার জন্যে আপনি ডেকে নিয়ে এলেন আমাকে?"

"হ্যাঁ—এই"

"বোঝাপড়া করবার কিছু নেই তো—বোঝাপড়া অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে"

"ও তাই না কি" বলে যুগল চুপ করে' গেল।

পুরন্দরবাবুও কোন উত্তর না দিয়া পরিক্রমণ সুরু করলেন। পাপিয়ার মুখখানা মনে পড়ছিল বারবার। অনেকক্ষণ নীরবতার পর হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি বোঝাপড়া করতে চান আপনি?"

যুগল চেয়ে চেয়ে দেখছেন তাঁকে এতক্ষণ।

"আর ওখানে আপনি যাবেন না" সহসা করুণ কণ্ঠে বলে' উঠল সে এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ও, আপনি ওই সব ভাবছেন নাকি" পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন, "আচ্ছা, আজ সমস্ত দিন আপনি কি কাণ্ডটা করলেন বলুন খুব একটা উপদেশাত্মক বক্তৃতার সুরে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ সুরটা বদলে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"আজ আমিও যতটা হীন করেছি এত হীন বোধহয় জীবনে কখনও করি নি—আপনার সঙ্গে জেদে রাজি হ'য়ে—দ্বিতীয়ত ওখানে ওদের সঙ্গে ...এত ছেলেমানুষি যা তা কাণ্ড সব...নিজেকে ওসবের সঙ্গে লজ্জা হচ্ছে আমার...ছি ছি...আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল...আর আ যে কাণ্ডটা করলেন তা কি কোন ভদ্রলোক করে'—আমাকে এমন অপ্রস্তুত করবার মানে কি—কিন্তু আপনাকে কিছু বলছি না সেজন্যে—আমার দুর্বুদ্ধির জন্যে শাস্তি পাওয়া উচিত—ভয় নেই আর যাব না সেখানে...ওদের সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই আমার"

সদম্ভে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

"সত্যি? সত্যি বলছেন?" যুগল তার আনন্দ যেন আর চাপতে পারছিল না। পুরন্দরবাবু তার দিকে ঘৃণাব্যঞ্জক একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' আবার পদচারণা সুরু করলেন।

"আপনি তাহলে আবার বিয়ে করে' সুখী হবেন ঠিক করে ফেলেছেন?"

"হ্যাঁ"

"তাতে আমার কি" পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন," ও যদি বোকামি করে উচ্ছন্ন যায় আমার কি এসে যায় তাতে! আমি বড় জোর ঘৃণা করতে পারি, যদিও ঘৃণারও উপযুক্ত ও নয়"

"স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করাই তো আমার কাজ" কাচুমাচু হ'য়ে একটু হেসে যুগল বললে, "আপনিই তো একথা বলেছিলেন একদিন আপনার একটি কথাও ভুলি না আমি, যা বলেন সব মনে থাকে"

এক বোতল মদ এবং দুটো গ্লাস নিয়ে চাকরটা ঘরে ঢুকল।

"ও এই জন্যেই চাকরের খোঁজ হচ্ছিল। এখন আপনাকে খেতে দেব না আমি—"

"মাপ করবেন পুরন্দরবাবু, না খেলে পারব না আমি। আমাকে ছোটলোক বলে' ভাবুন ক্ষতি নেই—কিন্তু খেতে দিন আমাকে"

"আমার শরীর ভাল নেই, এখন আমি শুতে যাই"

"হ্যাঁ এই যে—এখনি এখনি—গলাটা ভিজিয়ে নি শুধু একটু"

তাড়াতাড়ি সে আধ গ্লাসটাক খেয়ে ফেলে চোঁ করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাকী অর্দ্ধেকটা শেষ করলে বসে'। তারপর সস্নেহে চাইলে সে পুরন্দর বাবুর দিকে। চাকরটা বেরিয়ে গেল।

"আঃ—" পুরন্দরবাবু অস্ফুট কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"দেখুন, ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ওকে" যুগল বাগিয়ে সুরু করলে আবার।

"কি? ও, তাদের কথাই ভাবছেন এখনও"

"ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ভাংচি দিচ্ছে। ওর বয়সই বা কি। ছাড়া মেয়েদের একটু আধটু আদিখ্যেতা তো থাকবেই। ভারী চমৎকার আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকব ওর। তবু মন পাব না বলে

গাড়ি, বাড়ি, গয়না, সামাজিক সম্মান এসব পেলেও বদলাবে না? নিশ্চয় বদলাবে"

"ওকে ব্রেসলেট্ জোড়া ফেরত দিতে হবে" মনে পড়ল পুরন্দরবাবুর। ভ্রূকুঞ্চিত করে' পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সেটা আছে কিনা।

"আপনি বলছেন আমি সুখী হব ঠিক করেছি কি না? না ঠিক করে উপায় কি! আর বিয়ে না করলে সুখী হবই বা কি করে! বলুন, আপনিই বলুন"—করুণকণ্ঠে বলতে লাগল সে—"আমার গতি কি হবে, তাহলে ভেবে দেখুন" বোতলটা দেখিয়ে বললে—"এতেই ডুবে যেতে হবে শেষে, কিন্তু এ তো কিছু নয় যে নরক আমাকে টানছে তার শতাংশের একাংশও নয়। বিয়ে করে' ভদ্র একটা জীবনকে যদি আঁকড়ে ধরতে না পারি তাহলে ডুবে যাব আমি। নূতন একটা আদর্শ পেলেই ঠেলে উঠব আবার দেখবেন"

"কিন্তু এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন শুধু শুধু" বলেই পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন। তার পর বললেন, "আচ্ছা আমাকে ওখানে টেনে নিয়ে গেলেন কেন আপনি! উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার?"

"পরখ করা…" বলেই যুগল বিব্রত হয়ে পড়ল।

"কি পরখ করা?"

"ফলাফলটা।…মানে, এই হপ্তাখানেক থেকে ওখানে যাচ্ছি তো," একটু বিব্রত হয়ে পড়ল সে—"আপনাকে দেখে সেদিন হঠাৎ মনে হল পর-পুরুষের সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে' তা তো জানা নেই। পরীক্ষা করে' দেখলে হয় একদিন। বোকামি আর কি। কোন দরকার ছিল না। অত্যন্ত বেশী আশা করেছিলাম…আমার চরিত্র এমনই—কি আর বলব বলুন…মানে…"

হঠাৎ মুখ তুলে চাইলে সে। পুরন্দরবাবু দেখলেন—চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

"সত্যি কথা বলছে তো" পুরন্দরবাবু ভাবলেন এবং মনে মনে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন—

"বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা ভাল করে'"

"ছেলেমানুষি আর কি! তাছাড়া ওর ওই মেয়ে বন্ধুগুলো! ঝোঁকের মাথায় আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে' ফেলেছি মাপ করবেন। আর কখনও এমন হবে না"

"আমি সেখানে আর যাবই না"

"হ্যাঁ, সেইজন্তেই আশা করছি যে এ রকমটা আর কখনও ঘটবে না"

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"কিন্তু আমি ছাড়া আরও পুরুষ আছে তো সংসারে—তাদের সামলাবেন কি করে"

যুগলের মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আপনার মুখে একথা শুনে দুঃখিত হলাম পুরন্দরবাবু। পারুলের সম্বন্ধে আমার ধারণা মোটেই হীন নয়"

"ক্ষমা করবেন, আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু। আমার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে আপনার ধারণা যেমন প্রচণ্ড, আমার চরিত্রের ওপর আপনার বিশ্বাসও তেমনি অগাধ দেখছি"

"হ্যাঁ ঠিকই তাই…অতীতে এর প্রমাণ পেয়েছি যে"

"আপনি এখনও তাহলে আমাকে একজন চরিত্রবান পুরুষ বলে' মনে করেন!"

অন্য সময়ে নিজের এ প্রশ্নে নিজেই চমকে উঠতেন পুরন্দরবাবু।

"আমি বরাবরই তাই ভেবেছি আপনাকে"—চোখ নীচু করে যুগল বললে।

"হ্যাঁ তাতো ঠিকই—তা আমি বলছি না,—আমি বলছিলাম যে অতীতে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা এখনও—মানে—"

"হ্যাঁ এখনও তা ঠিক আছে"

"আপনি এবার যখন কোলকাতায় এসেছিলেন তখনও আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল আপনার?"

পুরন্দরবাবু কৌতূহল দমন করতে পারলেন না কিছুতেই।

"হ্যাঁ। আমি বরাবরই আপনাকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলেই জানি"

যুগল চোখ তুলে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে। পুরন্দরবাবুই ভয় পেয়ে গেলেন হঠাৎ—কিছু একটা হয়ে পড়ুক এ তিনি চান না—যে ভদ্র আবরণটা দু'জনের মধ্যে এখনও আছে তা সরিয়ে দেবার মোটে ইচ্ছে নেই তাঁর। ভয় হতে লাগল আবরণটা খসে' পড়ে বুঝি!

"আমি আপনাকে ভালবাসতাম পুরন্দরবাবু" যেন এইবার সমস্ত খুলে বললে এই রকম একটা ভাব করে' যুগল সুরু করলে "বর্দ্ধমানে যখন ছিলেন আপনি, সত্যিই আমি আপনাকে ভালবাসতাম। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি"

যুগলের গলা কাঁপতে লাগল, পুরন্দরবাবুর আরও ভয় হ'ল—"আপনার তুলনায় সত্যিই নগণ্য ছিলাম আমি, লক্ষ্য করবার কথাও নয়। তা ছাড়া প্রয়োজনও ছিল না কোন। গত ন বছর আপনার কথা কিন্তু বার বার মনে পড়েছে আমার, কারণ আমার জীবনে ওই বছরটাই সব চেয়ে সুখের ছিল। ওর চেয়ে ভাল সময় আর আসে নি" (যুগলের চোখ দুটো চক চক করতে লাগল) "আপনার অনেক রসিকতা, অনেক কবিতার লাইন, অনেক জিনিস মনে পড়ত আমার। আপনি যে একজন উদার-হৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তি—শুধু শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি—এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আপনিই একবার বলেছিলেন—'মহৎ প্রেরণার উৎস মহৎ প্রতিভা নয়, মহৎ হৃদয়'—আপনি হয়তো ভুলে গেছেন—কিন্তু আমি ভুলি নি। আপনারও হৃদয় যে মহৎ সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলাম আমি তাই সমস্ত সত্ত্বেও আপনার উপর বিশ্বাস হারাই নি"

হঠাৎ তার থুতনিটা কাঁপতে লাগল। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। যেমন করে' হোক কথার মোড়টা ফেরাতে হবে। কিন্তু সহসা নিজেই সংযম হারিয়ে ফেললেন তিনি।

"থাক থাক হয়েছে হয়েছে, কি বকছেন যা তা" এই কথা বলতে বলতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন "এ সব কথা বলবার মানে কি—বার বার বলছি শরীর ভাল নেই আমার—তবু আপনি ক্রমাগত ভ্যান ভ্যান করে'

বকেই চলেছেন বকেই চলেছেন—বকে' বকে' আমাকে উন্মাদ প্রায় করে' তুলেছেন, তবু আপনার তৃপ্তি হচ্ছে না—ইঙ্গিতে ইশারায় ঠারে-ঠোরে এক অজানা অন্ধকারে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে চলেছেন আমাকে—অথচ সব মিথ্যে, ধাপ্পাবাজি, জুয়োচুরি বাড়াবাড়ি—এইটেই সব চেয়ে মারাত্মক—বাড়াবাড়ি—বাড়াবাড়ি। একটুও সত্যি নয়—সব বাজে মিথ্যে কথা। দুজনেই সমান পাজি আমরা, দুজনেই অন্ধকারের ঘৃণ্য জীব। একটুও ভালবাসেন না আপনি আমাকে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেন—বলেন তো এখুনি প্রমাণ করে' দিতে পারি সে কথা। আপনি মিছে কথা বলছেন। আপনি যে আমাকে আজ ওখানে জোর করে' টেনে নিয়ে গেলেন তা আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা করবার জন্যে নয়—বাঁকাপথে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ওই মেয়েটাকে দেখিয়ে আমার হিংসা প্রবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করে আপনি উপভোগ করতে চাইছিলেন সেটা—"দেখেছেন কি রকম খাসা মেয়ে জোগাড় করেছি এবার। আমারই হবে ও। কি করতে পারেন এবার করুন"—এই ছিল আপনার মনোভাব! আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন আমাকে। ঘৃণা না করলে কেউ কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে না, সুতরাং আপনি যে আমাকে ঘৃণাই করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার"

চীৎকার করতে করতে সমস্ত ঘরে যেন ছুটোছুটি করতে লাগলেন তিনি। আত্মসংযম হারিয়ে যুগলের কাছে নিজেকে যে এমন ভাবে হীন করে' ফেললেন এই ভেবে অত্যন্ত খারাপও লাগছিল তাঁর। কিন্তু সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে।

"আপনার সঙ্গে মিটমাট করে' ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল আমার পুরন্দরবাবু"

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে যুগল বলে' উঠল হঠাৎ, তার থুতনিটা কাঁপতে লাগল।

ভয়ঙ্কর রাগ হল পুরন্দরবাবুর—তাঁর মনে হল এত অপমান বুঝি তাঁকে জীবনে কেউ কখনও করে নি।

"আবার আমি আপনাকে বলছি আমার শরীর ভাল নেই—এমন করে' লাগবেন না আমার পিছু। আপনি কেন লাগছেন তাও জানি, আপনি আশা করছেন যে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলে একটা ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি বার করে' নেবেন আমার মুখ থেকে। কিন্তু জেনে রাখুন ভিন্ন জগতের লোক আমরা এবং···এবং আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা চিতা প্রসারিত রয়েছে"—হঠাৎ বলে' ফেললেন তিনি এবং বলেই বুঝলেন কি করে' ফেলেছেন।

"আপনি জানেন" হঠাৎ যুগলের মুখখানা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গেল—"আপনি জানেন আমার কাছে সে চিতার অর্থ কি"—

হাস্যকর অথচ ভয়ঙ্কর একটা ভঙ্গীতে পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের বুক চাপড়ে সে বলে উঠল "এইখানে জ্বলছে সে চিতা, আমরা দুজনেই সে চিতার ধারে দাঁড়িয়ে আছি তা ঠিক, কিন্তু আমার দিকেই আঁচটা লাগছে বেশী"—পাগলের মতো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল—"অনেক বেশী, অনেক বেশী—"

হঠাৎ অত্যন্ত জোরে ইলেকট্রিক ঘণ্টাটা বেজে ওঠাতে দুজনেই প্রকৃতিস্থ হল। এত জোরে বাজতে লাগল যেন কেউ ঘণ্টাটা ভেঙে ফেলতে চায়।

"কে এলো? আমার কাছে যারা আসে তারা কখনও এত জোরে ঘণ্টা বাজায় না তো"

পুরন্দরবাবু হকচকিয়ে গেলেন একটু।

"আমার কাছেও না" মৃদুকণ্ঠে যুগলও বললে, একটু ভয়ে ভয়ে। ঘণ্টার আওয়াজের চোটে সেও আত্মস্থ হয়েছিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে' পুরন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং কপাটটা খুললেন।

"আপনিই কি পুরন্দরবাবু?" কনকনে জোর গলায় প্রশ্ন করলে কে একজন।

"হ্যাঁ, কি চাই"

"যুগল পালিত এখানে আছেন শুনলাম। তাঁর সঙ্গে এখনি দেখা করতে চাই আমি"

পুরন্দরবাবু কমবয়সী ছোকরাটিকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। যদিও তাঁর ইচ্ছে করছিল লাথিয়ে ছোকরাকে দূর করে' দিতে—কিন্তু তা আর করলেন না।

"আসুন, এই যে যুগলবাবু এখানেই আছেন—"

ছোকরাটির বয়স সত্যিই কম, উনিশ কুড়ির বেশী হবে না, কমও হতে পারে। তার মুখের কিশোর-শ্রী, স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি, দৃপ্ত উন্নত মস্তক দেখলে তাই মনে হয়। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবীতেই চমৎকার মানিয়েছিল তাকে। একটু লম্বা ধরণের, মাথায় কোঁকড়ান চুল, বড় বড় কালো চোখে নির্ভীক দৃষ্টি। সুশ্রী ছেলেটি। খুব গম্ভীরভাবে ঘরে এসে ঢুকল সে।

"আপনিই যুগলবাবু? ও"

বেশ গম্ভীরভাবে সে যুগলবাবুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে। "ও" কথাটাও এমনভাবে বললে যে যুগল ভড়কে গেল একটু।

পুরন্দরবাবু আভাসে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, যুগলের মনেও কিসের যেন ছায়াপাত হল একটা। চোখে মুখে আশঙ্কা ঘনিয়ে এল তার। আচরণে কিন্তু সে কোন বিচলিতভাব প্রকাশ করলে না। বেশ গম্ভীরভাবেই বললে—"আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ইতিপূর্ব্বে হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার থাকতে পারে? ভুল করেন নি তো"

"আগে আমার কথাটা শুনে নিন, তারপর যা বলবার বলবেন"—বেশ একটু অভিভাবকী ভঙ্গিতে কথা ক'টি বলে ছেলেটি টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস দুটোর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ সে দিকে চেয়ে থাকবার পর যুগলের দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠে বললে—"দিলীপ হালদার"

"দিলীপ হালদার মানে?"

"আমিই। আমার নাম শোনেন নি?"

"না"

"ও- শোনবার কথাও নয় আপনার। একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে। বসব? বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি"

"বসুন বসুন"

পুরন্দরবাবু বলে' উঠলেন, কিন্তু তার আগেই ছোকরা একটা চেয়ার টেনে বসেছিল। পুরন্দরবাবুর বুকের ব্যথাটা যদিও বাড়ছিল ক্রমশঃ, কিন্তু এই ছেলেটির আকস্মিক আগমন এবং সপ্রতিভ ব্যবহার বেশ লাগছিল তাঁর। তার তরুণ সুন্দর মুখশ্রীতে পারুলকে মনে পড়ছিল।

"আপনিও বসুন না" যুগলের দিকে চেয়ে ছেলেটি বললে এবং মাথা নেড়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

"না, আমি বেশ আছি"

"ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পুরন্দরবাবু, আপনি যদি থাকতে চান থাকুন"

"আমি আর যাব কোথায় নিজের বাসা থেকে"

"আপনার যা খুশী। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি থাকলে বরং ভালই হয়। পারুলের কাছে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে—"

"পারুলের কাছে? বাঃ! কখন শুনলেন এর মধ্যে?"

"আপনারা চলে আসবার ঠিক পরেই। আমি সেখান থেকেই সোজা আসছি। যুগলবাবুকে একটা কথা বলতে চাই—" যুগলের দিকে ফিরে তারপর বললে—"আমরা—মানে পারুল আর আমি—ছেলেবেলা থেকে পরস্পরকে ভালবেসে আসছি এবং ঠিক করেছি যে আমরা বিয়ে করব। আপনি হঠাৎ আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে হাজির হয়েছেন, আমি বলতে এসেছি যে আপনি সরে পড়ুন। আমাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে কি আপত্তি আছে আপনার?"

"নিশ্চয়! বিশেষ আপত্তি আছে"

"ও, বাবা, তাই না কি!"

ছেলেটি গম্ভীরভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিলে।

"আমি আপনাকে চিনি না, সুতরাং আপনার সঙ্গে এসব আলোচনার কোন মানে নেই"

এই বলে' যুগল বসে পড়াটাই সমীচীন মনে করলে।

"বলেছিলাম আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এখনি তো আপনাকে বললাম যে আমার নাম দিলীপ হালদার—পারুল আর আমি দুজনেই দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং আমি আপনাকে চিনি না' বলে' ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে। আমার সব বক্তব্যও শোনেন নি আপনি এখনও। তাছাড়া আমার কথা না হয় ছেড়েই দিন —আপনি পারুলকে যে এমন বেহায়ার মতো জ্বালাতন করছেন রোজ— এই কথাটাই তো বিশেষ করে আলোচনাযোগ্য"

একটি একটি করে' মুখ টিপে টিপে কথাগুলি এমন ভাবে সে বললে যে মনে হল যেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই অপ্রিয় কথাগুলো বলতে হচ্ছে তাকে।

"দেখ ছোকরা"—আত্মবিস্মৃত যুগল চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ছোকরা তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিলে তাকে।

"দেখুন, অন্য সময় হ'লে আপনার ওই 'ছোকরা' কথায় আপত্তি করতুম আমি। এখন করব না, কারণ একথা আপনাকেও মানতে হবে যে কম বয়সটাই আমার একমাত্র মূলধন এক্ষেত্রে। আজ সকালে যখন পারুলকে ব্রেসলেট উপহার দিচ্ছিলেন তখন আপনিও ছোকরা হতে পারলে বেঁচে যেতেন"

"মহা ফাজিল তো" পুরন্দরবাবু মনে মনে বললেন।

"যাই হোক" যুগল উত্তর দিলে "আপনার সঙ্গে তর্ক করব না আমি। আমার মনে হচ্ছে আপনি যে সব কারণ দেখাচ্ছেন তা আপনার মনগড়া, ও সব নিয়ে কোন কথা আর আমি কইব না আপনার সঙ্গে, কইলে নিতান্ত ছেলেমানুষি হবে তা আমার পক্ষে। কাল আমি বিশ্বম্ভরবাবুর কাছে গিয়ে খোঁজ করব। আপনি এখন যেতে পারেন"

"দেখছেন কি রকম লোক" বলে' দিলীপ পুরন্দরবাবুর দিকে চাইলে "আজ এত অপমানিত হয়েও লজ্জা হয় না ওঁর! উনি আমাদের নামে নালিশ করতে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে যেতে চান আবার! এর থেকে কি প্রমাণ হয়? প্রথমত প্রমাণ হয় যে আপনি অত্যন্ত আত্ম-সম্মানহীন একগুঁয়ে লোক, দ্বিতীয়ত প্রমাণ হয় যে আপনি এই বর্ব্বর সমাজের নিষ্ঠুরপ্রথার সুযোগ নিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে জোর করে পারুলকে বিয়ে করতে চাইছেন তার মতের বিরুদ্ধে। পারুল আপনাকে ঘৃণা করে এইটুকু জানামাত্রই থেমে যাওয়া উচিত আপনার, সে আপনার ব্রেসলেট পর্য্যন্ত ফেরত দিয়েছে—এর পরেও যাবেন আপনি।"

"ব্রেসলেট আমাকে ফেরত দেয় নি সে। ওসব একদম বাজে কথা"

"ফেরত দেয় নি! আপনি বলতে চান পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে আপনি ব্রেসলেট ফেরত পান নি?"

"আঃ, ডোবালে দেখছি" মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করে' পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' বললেন—"হ্যাঁ পারুল আমাকে এইটে ফেরত দিতে দিয়েছিল যুগলবাবু, আমি নিতে চাই নি, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়লে না....এই নিন....এমন মুস্কিলে ফেলেছেন আমাকে আপনারা"

ব্রেসলেটের বাক্সটা বার করে' পুরন্দরবাবু টেবিলের উপর রাখলেন। যুগল বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল।

"আপনি এটা এতক্ষণ দেন নি যে" একটু রূঢ়কণ্ঠেই দিলীপ বলে' উঠল।

"হয়ে ওঠে নি। মনেই ছিল না"

"অদ্ভুত কাণ্ড"

"কি বললেন?"

"একটু অদ্ভুত নয়? যাক গে...."

পুরন্দরবাবুর ইচ্ছে করতে লাগল উঠে ছোঁড়ার কান মলে' দেন, কিন্তু তিনি হেসে ফেললেন, ছোকরাও হাসতে লাগল। যুগল কিন্তু একটুও হাসল না, তার অবস্থা ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরন্দরবাবু যখন দিলীপের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন তখন যদি তিনি যুগলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কি ভয়াবহ কাণ্ড হচ্ছে তার মনের ভিতর। কিন্তু তবুও পুরন্দরবাবুর মনে হল, এই দুঃসময়ে যুগলের পক্ষ নেওয়া উচিত।

"দেখুন দিলীপবাবু, একটা কথা শুনুন আমার" বন্ধুভাবে আরম্ভ করলেন তিনি "এ বিষয়ে অন্য কোন আলোচনা না করেও একটা কথা বলতে চাই শুধু আমি। পারুলের পাণি-প্রার্থী হিসেবে যুগলবাবুর একাধিক যোগত্যা আছে—প্রথমত ওঁরা যুগলবাবুকে আগে থাকতে চেনেন ওঁর সম্বন্ধে সব জানেন, দ্বিতীয়ত উনি বড় চাকরি করেন একটা, তৃতীয়ত ওঁর বিষয়সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে—সুতরাং আপনার মতো একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আকস্মিক আবির্ভাবে উনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন একটু। আপনিও হয়তো খুব উপযুক্ত পাত্র—কিন্তু আপনার বয়স এত কম যে উনি আপনার কথা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছেন…তাই এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক ওঁর পক্ষে"

"আপনার বয়স এত কম—মানে কি বলতে চান আপনি! আমি উনিশ বছরে পড়েছি…আইনত আমার বিয়ে করবার বয়স হয়েছে।"

"তা হয়েছে। কিন্তু কোন মেয়ের বাবা আপনার হাতে কন্যাসম্প্রদান করবে বলুন? আপনি ভবিষ্যতে হয়তো কোটিপতি হবেন, কিম্বা মানবজাতির মুক্তির পথ আবিষ্কার করবেন কিন্তু এখন আপনাকে দেখে কোন মেয়ের বাপই পাত্র হিসেবে পছন্দ করবে কি না সন্দেহ। উনিশ বছর বয়সে লোকে নিজের দায়িত্বই নিতে পারে না, আর আপনি আর একজনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন এবং সেও আপনার মতো ছেলেমানুষ। এইটেই কি উচিত? আমার যা মনে হচ্ছে খোলাখুলি বলছি বলে' রাগ করবেন না, আপনি নিজেই আমাকে মধ্যস্থতা করতে ডাকলেন বলে' বলছি"

দিলীপ একটু সবিস্ময়ে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবুর দিকে। তারপর বলল "আপনার মুখ থেকে এসব কথা শুনব প্রত্যাশা করিনি। পারুল যা বললে আপনার সম্বন্ধে তাতে আমার একটু অন্য রকম ধারণা হয়েছিল। এখন দেখছি আপনারা সবাই একরকম, সব শিয়ালেরই এক রা। আপনাদের ওসব জ্ঞানগর্ভ যুক্তি অনেক শুনেছি, কিন্তু তা মানবার উপায় নেই, কারণ একটা প্রবলতর যুক্তি আমাদেরও আছে"

"কি সেটা"

"আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এবং অনেক দিন থেকে বাসছি। সুতরাং আপনার ওসব যুক্তি শুনব না আমরা। আপনার বয়স কত হল—পঞ্চাশ?"

"সে জেনে আর কি হবে আপনার। যা বলবেন বলুন"

"মাপ করবেন, কৌতূহলটা সামলাতে পারলাম না। যাক গে—হ্যাঁ—দেখুন আপনি যে এখনই বলছিলেন—আমি কোটিপতি বা মহামানব কিছুই হব না হয় তো—কিন্তু বিয়ে করে যে সংসার চালাতে পারব সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন অবশ্য আমি নিঃস্ব, পারুলদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছি—বিশ্বম্ভরবাবুকে জ্যাঠামশাই বলি"

"ও, তাই না কি"

"আমার বাবা আর বিশ্বম্ভরবাবু খুব বন্ধু ছিলেন। আমরা পশ্চিমে থাকতাম। একবার প্লেগে আমাদের বাড়ির সবাই মারা গেল—এক আমি ছাড়া। জ্যাঠামশাই আমাকে মানুষ করেছেন—বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়েছেন আমাকে। জ্যাঠামশাই লোক খুব ভাল, বুঝলেন—"

"জানি"

"কিন্তু ওঁর মতামত বড় সেকেলে ধরণের। এখন অবশ্য আমি আর ওঁদের বাড়ি থাকি না, আলাদা মেসে থেকে রোজকারের চেষ্টা করছি"

"কতদিন থেকে?"

"চার মাস"

"চাকরি পেয়েছেন?"

"পেয়েছি একটা ছোটখাট গোছের। পঁচাত্তর টাকা মাইনে, তার আগে আর একটা পেয়েছিলাম, মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা পেতাম তখনই আমি বিয়ের কথা বলেছিলাম"

"কাকে?"

"জ্যাঠামশাইকে"

"তিনি প্রথমে হেসেই উঠলেন, তারপর চটে গেলেন। পারুলকে আমার সঙ্গে দেখাই করতে দিতেন না। আসল কারণ কি জানেন? উনি আমাকে ওকালতি পড়তে বলছিলেন—কিন্তু উকীল হয়ে কি হবে বলুন তো! তার চেয়ে রোজকার করাই তো ভাল এখন থেকে। তাই ওঁর রাগ। আমি সেইজন্যে আর যাই না বড় সেখানে। পারুল কিন্তু ঠিক আছে এসব সত্ত্বেও। আমি জানি সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই"

"আপনি ওদের বাড়ি যান না বলছেন, তাহলে পারুলের সঙ্গে কথা হল কি করে?"

"কেন, ওদের বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে। সেই কটা-চুল মেয়েটিকে মনে আছে? সে আমাদের দিকে,—কঙ্কনা দিদিও। ওকি আপনি অমন করলেন যে? বাজের শব্দে ভয় করে না কি আপনার—"

বাইরে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

"না, আমার বুকের কাছটা ব্যথা করছে অনেকক্ষণ থেকে"

সত্যিই পুরন্দরবাবু ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ছিলেন। একটু কুঁজো হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"ও, তাহলে আমি যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি থাকাতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার"

"না কিছু অসুবিধে নেই"

"চললাম তবু। হ্যাঁ দেখুন, অখিলবাবু—ও, যুগলবাবু বুঝি আপনার নাম—দেখুন যুগলবাবু কি ঠিক করলেন আপনি তাহলে।"

হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে যুগলের দিকে চাইলে সে।

"পারুলকে রেহাই দিচ্ছেন তো? দিন, বুঝলেন। দিলেন তো?"

"না—" যুগল অধীরভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল তার—"আপনি দয়া করে' আমাকে রেহাই দিন"! তর্জ্জনী আস্ফালন করে দিলীপ বললে—"ভুল করছেন আপনি কিন্তু তা বলে' দিচ্ছি। পারুলকে আমি চিনি, সে মরে যাবে তবু আপনাকে বিয়ে করবে না। হিসেবে ভুল করবেন না। ন'মাস পরে ফিরে এসে দেখবেন খাঁচা খালি, পাখী উড়ে গেছে। এরকম 'ডগ্ ইন্ দি ম্যানজার' পলিশির মানেটা কি বুঝতে পারছি না। মাপ করবেন উপমার খাতিরে কথাটা বললাম। জিনিসটা ভেবে দেখুন না, চেষ্টা করুন অন্তত।"

"দেখুন আপনার বক্তৃতা শোনবার ইচ্ছে নেই আমার। আপনি যা যা বলে গেলেন সব মনে থাকবে আমার। আপনি যে সব অভদ্র ইঙ্গিত করলেন তা নিয়ে এখন বাদপ্রতিবাদ করতে চাই না। কাল এর ব্যবস্থা করব"

"অভদ্র ইঙ্গিত? তার মানে! আমার এ কথাগুলো যদি আপনার অভদ্র ইঙ্গিত বলে' মনে হয় তাহলে আপনার মনই অভদ্র বুঝতে হবে। আচ্ছা বেশ, কালকের জন্যে প্রস্তুত থাকব আমি। কিন্তু যদি…আঃ আবার বাজ পড়ল একটা…আচ্ছা চলি। নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুশি হলাম" পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নেড়ে দিলীপ বেরিয়ে গেল। বাইরে ঝড় উঠল একটা। ক্রমশঃ

ভারতে বৃটিশ মন্ত্রিমিশন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৬ সাল একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। বিলাতের শ্রমিক-সরকার মুক্তিকামী ভারতকে এতদিনে তাহার মুক্তির বাণী শোনাইলেন। কবে সেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে পরাজয় স্বীকার করিয়া যে পরবশতা গ্রহণ করিয়াছে আজিও তাহার অবসান ঘটে নাই। পরাধীনতার এই শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য ভারতীয়গণ সিপাহী-বিদ্রোহ করিয়াছে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অসহযোগ চালাইয়াছে, আগষ্ট আন্দোলন করিয়াছে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়িয়াছে তবুও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হইতে পারে নাই। সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা ছলে বলে আমাদের সকল মুক্তি-আন্দোলনকেই পণ্ড করিয়া দিয়াছে। গৃহ বিবাদের সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক অস্ত্র দিয়া দেশ শাসনের ও শোষণের সুযোগ লইয়াছে। এতদিন পরে বৃটিশ মন্ত্রিমিশন এদেশে আসিয়া, ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করিয়া, ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র এবং তাহা কি ভাবে ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত হইবে তাহারই এক খসড়া প্রকাশ করিলেন।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম বিলাতে ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য পরিষদের সভাপতি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং নৌসচিব মিঃ আগষ্ট আলেকজাণ্ডারকে শীঘ্রই ভারতে প্রেরণ করিবেন। বৃটিশ মন্ত্রিমিশন ভারতে আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে ১৫ই মার্চ্চ তারিখে প্রধান মন্ত্রী এটলি পুনরায় জানান—ভারতবর্ষকে শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের সাহায্য করিবার জন্যই আমার সহকর্ম্মিগণ ভারতে যাইতেছেন। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে কি ধরণের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে ভারতীয়গণই তাহা স্থির করিবেন। ভারতবাসী সত্বর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা।......ইহাও আমি মনে করি যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার রহিয়াছে এবং যথাসম্ভব সত্বর ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

এই ঘোষণার পর লর্ড পেথিক লরেন্স মন্ত্রিমিশনের নেতা হইয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও মিঃ আলেকজাণ্ডারকে সঙ্গে লইয়া ২৪শে মার্চ্চ তারিখে ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়াই দিল্লী সহরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায় ও দলের সকল নেতার সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। তারপর কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম উদ্দেশ্যে ১৯শে এপ্রিল তারিখে মন্ত্রিমিশন কাশ্মীর রওনা হইলেন। কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া মন্ত্রিমিশনের সদস্যগণ আলোচনা কেন্দ্রকে দিল্লী হইতে সিমলা শৈলে স্থানান্তরিত করিলেন। এইবার এইখানে ত্রি-দলীয় বৈঠকের ব্যবস্থা হইল। মন্ত্রিমিশন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও লীগ প্রেসিডেন্ট প্রত্যেককে তাঁহাদের সহিত আরও তিনজন করিয়া মনোনীত ব্যক্তি লইয়া আলোচনা চালাইবার অনুমতি দিয়া আমন্ত্রণ জানাইলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রহিলেন, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও খান আবদুল গফুর খাঁ। কংগ্রেসের উপদেষ্টা হিসাবে মহাত্মা গান্ধীও সিমলা আসিলেন। লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ, নবাব মহম্মদ ইস্মাইল এবং মিঃ আবদুর রফী নিস্তারকে সঙ্গে লইলেন।

৫ই মে বেলা ১০টায় ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের সভাপতিত্বে সিমলায় ত্রি দলীয় বৈঠক বসিল। কয়েক দিন বৈঠক চলিল, কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মতানৈক্য মিটিল না। তাই ১২ই মে সন্ধ্যায় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া বৈঠকের অবসান ঘটে। বৈঠক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান—ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ সিমলা বৈঠকে একমত হইতে না পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে বৈঠক সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শেষ হইয়া যাইতেছে না। ইহার পর যাহা করণীয় তাহা আমরা শীঘ্রই জানাইব।

পূর্ব্বের সমস্ত মীমাংসালোচনার অভিজ্ঞতা হইতে মিশনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি আজাদও এই সর্ত্ত করাইয়া লইয়াছিলেন যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শ্রমিক গভর্ণমেন্টের ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করিতেই হইবে।

১৬ই মে অপরাহ্নে মন্ত্রিমিশন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বিলাতের কমন্স সভায় এবং ভারতের সর্বত্র ইহা একই সঙ্গে বেতার যোগে প্রচার করা হয়। ইহার পরদিন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে বেতার বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—

বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে, যথা (ক) বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, (খ) পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, (গ) বাঙ্গলা, আসাম। বৃটিশ বেলুচিস্থানকেও (খ) ভাগের মধ্যে ধরা হইবে।

বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া শীঘ্রই একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যানবাহন এই যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং এই সকল বিষয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহেরও ক্ষমতা ইহার থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল ক্ষমতা থাকিবে তাহা ছাড়া অপর সমস্তই প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে।

বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ও ব্যবস্থা পরিষদ থাকিবে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে প্রতি দশ লক্ষে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে।

মোট সদস্য সংখ্যা থাকিবে ৩৮৫ জন, তন্মধ্যে বৃটিশ ভারত হইতে ২৯২জন এবং দেশীয় রাজ্য হইতে ৯৩জন।

বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলি হইতে নিম্নলিখিত হারে সাধারণ (মুসলিম ও শিখ ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ই সাধারণের অন্তর্ভুক্ত) মুসলিম ও শিখ প্রতিনিধি থাকিবে—

"ক"

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	মোট
বোম্বাই	১৯	২	২১
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	১৭
বিহার	৩১	৫	৩৬
উড়িষ্যা	৯	০	৯
মোট	১৬৭	২০	১৮৭

"খ"

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
সিন্ধু	১	৩	০	৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০	৩	০	৩
	৯	২২	৪	৩৫

"গ"

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	মোট
বাঙ্গালা	২৭	৩৩	৬০
আসাম	৭	৩	১০
	৩৪		

যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক সরকারের শাসন ব্যবস্থায় একটি বিধান থাকিবে যে, ব্যবস্থা পরিষদে ভোটাধিক্যের বলে প্রতি দশবৎসর অন্তর শাসনতন্ত্রের পুনর্বিবেচনা দাবী করিতে পারিবে।

নুতন শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে, নিজের প্রদেশ মণ্ডলী হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে।

মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা প্রচারিত হইবার পর এই বিষয়ের আলোচনার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। ২৪শে মে তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ১ হাজার শব্দ সম্বলিত এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মিশনের পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ এবং কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট হওয়ায় বর্তমানে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইতেছে না। মিশন-প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাইলে, পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এ সম্বন্ধে সঠিক প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে।

মিশন-প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া মিঃ জিন্না ২২শে মে তারিখে এক বিবৃতিতে জানান—মন্ত্রিমিশন পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন অস্বীকার করায় জন্য আমি দুঃখিত। আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে পাকিস্থান স্বীকারেই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব, ইহা দ্বারা কেবল যে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ই উপকৃত হইবে তাহা নহে, ভারতের সর্বসাধারণেরই মঙ্গল হইবে। মনে হয় কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই মিশন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাই হউক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে আমি কিছু বলিতে চাহি না, শীঘ্রই দিল্লীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কাউন্সিলের বৈঠক বসিবে, বৈঠকে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী মন্ত্রিমিশনের খসড়া প্রচারিত হইবার পর হইতেই উহা সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। হরিজন পত্রিকায় মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—বৃটিশ মন্ত্রিমিশন বর্তমানে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা ভারতের কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা ত নাইই, বরং এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। মন্ত্রিমিশন দেশের সকল দলের সহিত আলোচনা করিয়া এমন একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন যাহাতে সর্বদলের স্বার্থ সমন্বয়ের চেষ্টা রহিয়াছে।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর দান চিরস্মরণীয়। তাঁহার রাজনীতিবোধও অতুলনীয়। সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষে ইহা মঙ্গলকর ভাবিয়াই তিনি গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। মিশনের প্রস্তাব পড়িয়া মনে হয় মন্ত্রিমিশন অখণ্ড ভারতের প্রতি একটি শুভেচ্ছা লইয়াই যেন এই পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, পরিকল্পনায় ভারতকে প্রদেশ গোষ্ঠীতে বিভক্ত করায়, আপাত দৃষ্টিতে পাকিস্থান সমর্থন বলিয়া মনে হইলেও আসলে ঠিক তাহা নহে। কারণ, আসাম বাঙ্গালার সহিত যুক্ত হইলে, হিন্দু-লঘিষ্ঠ বাঙ্গালা শক্তিসম্পন্ন হইবে। আসাম-বাঙ্গালা-মণ্ডলে হিন্দু ও কংগ্রেসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই মণ্ডলে আসামের ত কোন ক্ষতি হইবেই না অধিকন্তু বাঙ্গালার মঙ্গল হইবে। তাহা ছাড়া আসাম বাঙ্গালার সহিত যুক্ত হইলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া বরং তাহার শীঘ্র উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতম বিচারালয় প্রভৃতির জন্য আসামকে এখনও বাঙ্গালার উপর নির্ভর করিতে হয়। আসাম মণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিশালী প্রতিকূল প্রতিবেশীর পার্শ্বে একা না থাকিয়া তাহার সহিত যুক্ত থাকিলে তাহাতে উভয়েরই মঙ্গল। আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সহিত একপ্রদেশ গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পাওয়ায় সেখানে কংগ্রেসী মুসলমানরা সিন্ধু ও পাঞ্জাবের লীগ বিরোধী মুসলমানদের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয়তাবাদ প্রচারের সুযোগ পাইবে, এবং অন্যান্য লীগ বিরোধী সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলে তাহাদেরও সংখ্যা কম হইবে না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দান উপেক্ষা করিবার নহে। তাই মনে হয় মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনায় উত্তরকালে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি অবসানেরই একটি গোপন ইঙ্গিত রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সেই ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াই দেশের কল্যাণের জন্য ইহা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

৪-৬-৪৬

বিজয়ী

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

পাঞ্চালীর মুক্তবেণী মহাভারতের যুদ্ধকাব্য রচনা করিয়াছিল। যুদ্ধ তাণ্ডবের পিছনে অভিমান-ক্ষুব্ধা পাঞ্চালীর দৃপ্তগরিমা না থাকিলে মহাভারতকে মহাকালের বক্ষে অমর করিতে পারিত না। বীর্য্যশুল্কা তিনি—তাই পাণ্ডববীর্য্য পরিচয়ে কৌরব-গ্লানির উত্তর চাহিয়াছিলেন, তাই পঞ্চমুখী ভুজঙ্গীর মত পঞ্চপাণ্ডবকে ক্ষুব্ধ করিয়া ধ্বংসনাট্য কুরুক্ষেত্রের প্রথম ও শেষ ছন্দ যোজনা করিয়াছিলেন।

মহাভারতেরও পূর্ব্বে বীর্য্যশুল্কায় যে প্রথম মানবমহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহারও ছন্দে দেখিতেছি, মুক্তবেণী কালভুজঙ্গের মত তর্জ্জন করিতেছে—

দদৃশে কম্পিতা বেণী ব্যালীব পরিসর্পতী—(২৫ সঃ সুন্দরকাণ্ড)। কিষ্কিন্ধ্যার অলোকতুল্য দূত অশোককাননে শিংশপা বৃক্ষমূলের তাপসীকে দেখিয়া 'কালভুজঙ্গী' বলিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। রাঘবগৌরবকে বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না, স্বর্ণলঙ্কার মহারাজকে জানাইতেও তাই বিলম্ব হয় নাই—'পঞ্চমুখ ভুজঙ্গী তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তুমি জানিতেছ না—'

গৃহে যাং নাভিজানাসি পঞ্চাস্যামিব পন্নগীম্। (৫১ সঃ সুন্দর) সেই পঞ্চমুখী ভুজঙ্গীই লঙ্কাকাণ্ডের কাব্যকে ক্ষোভিত করিয়াছিলেন। মহর্ষির কাব্যমুখে জনকনন্দিনীকে এমনই ভুজঙ্গী বলিয়া কে পরিচিত করিল? সে কিষ্কিন্ধ্যার দূত, যাহার অমরকীর্ত্তি সুন্দরকাণ্ডকে পরম কাব্য করিয়া রাখিয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যার অলোক-প্রভা গুহাপ্রাসাদ যাঁহার দ্বারা অলঙ্কৃত, চন্দ্রাননা স্বর্গপ্রতিমা তারা যাঁহার মহারাণী, রাঘবযুগল যাঁহার অগ্নিমিত্র, সেই মহারাজ, দক্ষিণভারতের সেই মহাসম্রাট্—সুগ্রীবের শ্রেষ্ঠ অমাত্য হনুমান্ যখন সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য আপন জীবন পণ করিলেন, যখন শুধু রাঘব কারণেই সেই দুঃসাহসিকতার অভিযানে অগ্রসর হইলেন,—তখন সেই অপূর্ব্বক্ষণে সুন্দরকাণ্ডের মুখারম্ভ হর্ষমুখর হইয়া উঠিল, মহর্ষির কাব্য উচ্ছলিত হইল, আর তারই সাথে কল্পনার আনন্দে ও গুঞ্জনে নিসর্গের সকল শোভা সকল আড়ম্বর বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

'ববৃধে রামবৃদ্ধ্যর্থং'—শুধু রাঘব কারণেই হনুমান্ দেহের বৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। সমুদ্রলঙ্ঘনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ হনুমানের লাঙ্গুল-শোভা দেখে নাই, সমুদ্রলঙ্ঘনের উদ্যোগলগ্নে 'লাঙ্গুলের' আবির্ভাব হইল। কৃত্রিম যোজনায় হনুমানের দেহবর্দ্ধন হইল—তাই সমুদ্রলঙ্ঘনের পূর্ব্বে এত ঘটা এত স্তুতিবাদ, তাই. শুধু কৃত্রিম বলিয়াই এত 'লাঙ্গুল'কীর্ত্তি।

রঘুবংশবিন্যাসে তাই মহাকবি কালিদাস বলিলেন—মমতাহীন ব্যক্তি যেমন সংসারসাগর পার হয়, হনুমান্ তেমনই নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইলেন।

—মারুতিঃ সাগরংতীর্ণঃ সংসারমিব নির্ম্মমঃ।

কোনও সংস্কৃতি-অভিমানী হনুমান্জীর বহুপূজিত লাঙ্গুলশোভিত রোমস্পন্দিত মূর্ত্তিকে সংস্কৃতির কলঙ্ক বলিয়া ঘোষিত করিবেন কি?

ঋষ্যমূকের সমীপচারী রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া হনুমান্ 'কপি'-রূপ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ের কুশীলবের মতই এই বেশ-পরিবর্ত্তন। বানর মানবেরই জাতি, বৈষম্য শুধু সংস্কারে ও আচারে। লাঙ্গুলই যদি কপিত্বের প্রধান পরিচয় হয়, ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া হনুমান্ সে লাঙ্গুল লুকাইলেন কোথায়? সুন্দরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হনুমান্ সমুদ্রলঙ্ঘনের বিপুল বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। কাব্যের কথায়, নিজ রূপকে হ্রস্ব করিলেন। সমুদ্রলঙ্ঘনের কৃত্রিম বেশবাস হনুমান কোথাও নিশ্চয়ই লুকাইয়া রাখিলেন, নহিলে অশোককাননে জানকীদর্শনের কালে যাঁহার লাঙ্গুল পরিচয় নাই, পরেই লঙ্কাদাহনের সময়েই আবার লাঙ্গুল কোথা হইতে আসিল? লুকানো সাজসজ্জা আবার বাহির করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, এই একমাত্র ভাষ্যই সম্ভব হইতে পারে।

লঙ্কাপুরী প্রবেশের সময় খর্ব্বরূপের পরিচয়ে কবি বলিলেন—'বৃষদংশ-মাত্রঃ', অর্থাৎ টীকাকার অনুযায়ী মার্জ্জার প্রমাণ। অথচ মার্জ্জার দেহধারী হনুমানের লঙ্কাপ্রবেশই লোকশাস্ত্রবিদিত। কমলাকান্ত যদি এই মার্জ্জার লইয়া কিছু গবেষণা করিতেন তাহা হইলে আমরা উপকৃত হইতাম। মহাকাব্যের খুশীমতো রূপ পরিবর্ত্তন, বেশ বা সাজসজ্জার অর্থাৎ 'মেক্-আপ্' পরিবর্ত্তন বা গ্রহণ মাত্র,—কোনক্রমেই দেহ বা অবয়ব পরিবর্ত্তন বুঝায় না।

দুঃসাহসিকতার অভিযানে কোথা হইতে যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে সবেমাত্র চূড়া তুলিয়া মৈনাক পাহাড় মূর্ত্তিমান্ বাধা হইয়া দাঁড়াইল। শাস্ত্রবিদ্ হনুমান্ ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলেন না—তিনি জানেন পাহাড়চূড়া অনন্ত অনাদি নহে, তাহারও মাঝে অবকাশ আছে, পুরাকালে বজ্রে তাহার গর্ব্ব খর্ব্বিত হইয়াছে, আকাশকে অন্তরালে সে কিছুতেই রাখিতে পারিবে না। সেই সাহসে ভর করিয়া পাহাড় চূড়ায় তিনি অবতীর্ণ হইলেন—পাহাড় তাঁহাকে ফলে মূলে সবহুমান অভ্যর্থনা জানাইল। পথের ক্লান্তি তাঁহার কিছু দূর হইল। 'মেঘদূতের' মেঘসখাকে যক্ষ যে বিশেষ পাহাড়চূড়ায় ক্লান্তি দূর করিতে বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীহনুমানকে এই মৈনাকী অভ্যর্থনারই স্মৃতি।

সাগর অভিযানের দ্বিতীয় অঙ্কে কবিকাল্পনিকা সুরসা আকাশসাগর ব্যাপিয়া হনুমানকে প্রতিরোধ করিল। সুদূরআকাশবিহারী অজ্ঞান-পথচারী মহাবীরের বক্ষও হয়ত সংস্কারবশে মৃদু কম্পিত হইয়াছিল। বিশাল অগাধ সমুদ্র বারে বারে মুখব্যাদান করিয়াছে এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীটিকে গ্রাস করিবার জন্য, কিন্তু রামকার্য্য সাধনই যাহার মন্ত্র

তাহার সম্মুখে কুসংস্কার কল্পনা ভয় এই তিনের কোনও সমাদর নাই। মহাকাশে মহাবেগে মেঘজাল ছিন্ন করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

উপরে সম্মুখে দূরে মহাকাশসত্তা বিস্তৃত, নিম্নে অনন্তব্যাপ্তিমগ্ন সাগর,—মহাবীরকে গ্রাস করিয়া দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত নীলিমা। মহাবীর ভাবিতেছেন, কপিরাজ মহাকায় মহাবীর্য্য ছায়াগ্রাহী জীবের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাদের দেশ কোথায়! অমনি কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া সিংহিকা আকাশপাতাল মুখব্যাদানে আবির্ভূত হইল। চন্দ্রকে যেন রাহু গ্রাস করিল। শাস্ত্রবিদ্ হনুমান জানেন রাহু কল্পনার সৃষ্টি, জানেন ছায়াগ্রাহী জীব অজ্ঞানতার ভয় মাত্র। তাই আচ্ছন্ন কল্পনাকে ছিন্নমর্ম্ম করিয়া তিনি অভিযানব্রতী হইলেন।

—ভীমমন্ত কৃতং কর্ম্ম মহৎ সত্বং ত্বয়া হতম্—(১ম স্বর্গঃ সুন্দর) হনুমান্! তুমি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ, তোমারই বলবীর্য্যে মহাবলারাক্ষসী নিহত হইয়াছে।'—সত্যই, হনুমান ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছেন—অজ্ঞাতদেশ সম্বন্ধে বহুদিনের কাল্পনিক সংস্কারকে ধ্বংস করিয়াছেন, মহাবল 'ভয়'কে তিনি নিহত করিয়াছেন।

মর্ত্ত্যের অমরাবতীতে যখন হনুমান অবতীর্ণ হইলেন—যখন পূর্ণচন্দ্র-কিরণে স্বর্ণলঙ্কার অভিষেকে মুগ্ধ হইলেন,—তখন সেই অভিযানের বিজয়-পথে প্রথম চিন্তা আসিল—এখানে এপথে আর কে আসিবে? কে এই বিপুল মদগর্ব্বঐশ্বর্য্যকে পরাভূত করিবে?

ইন্দ্রপুরীসমা রাবণান্তঃপুরের শোভায় হনুমান্ বিস্মিত হইলেন। স্খলিত নীলকান্তহার, মুক্ত কাঞ্চিদাম, শ্লথ কেশপাশ,—দেবজ্যোতি-ললনাদের আলস-বিলাস, ইহারই মধ্য দিয়া হনুমান্ অন্বেষণ করিতেছেন রাঘবকুলনন্দিনী সীতায়। কমলমালাসম তারকাজালসম সংশ্লেষ ও আসক্তি যেখানে ছড়ানো, তাহারই মধ্য দিয়া ব্রহ্মচারী ভ্রমণ করিতেছেন রামকার্য্য সাধনে। একবার ভুল করিয়াছিলেন রাবণমহিষীর রূপমহিমা ও ঐশ্বর্য্যগরিমা দেখিয়া। ভাবিয়াছিলেন ইনিই হয়তো জানকী, কিন্তু পরক্ষণেই রামচরিত স্মরণ করিয়া দৃঢ়চিত্ত হইলেন—সে রামকণ্ঠমণি স্বয়ংজ্যোতি, অলোকলাবণ্যা। তিনি তো এ অন্তঃপুরচারী কখনও নহেন। তাই তাঁহার বিস্ময় হইল—

কামং দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ। (১১সঃ সুন্দর)

এ কি করিয়াছি! রাবণান্তঃপুরললনাদের মধ্য দিয়া আমি অসঙ্কোচে ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু কই, মনে তো কোনও বিকার উপস্থিত হয় নাই! সাগর লঙ্ঘন অভিযানে যে জয়ী, যে স্বর্গের ঈপ্সিতা ললনারাজ্যের মধ্যেও নিস্পন্দচিত্ত, সে সীতানুসন্ধান করিবে না, শিংশপা বৃক্ষমূলের অপরাজিতা-টিকে আবিষ্কার করিবে না তো আর কে করিবে?

হনুমান দেখিলেন অপরাজিতা মহাভুজঙ্গীর নিশ্বাস স্বর্ণলঙ্কাকে কালযুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। রামনাম কীর্ত্তনে যাঁহাকে সঞ্জীবিত করিলেন, আপন সামর্থ্যেই তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লঙ্কাপারে আসিবার কথা বলিলেন—

ত্বাং তু পৃষ্ঠগতাং কৃত্বা সন্তরিষ্যামি সাগরম্।

'তোমাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া সাগর পার হইয়া যাইব—আজই তোমাকে রাঘবযুগলের সাথে মিলিত করিয়া দিব।'

জানকী তাঁহাকে কৌশল করিয়া বুঝাইলেন—'পৃষ্ঠ হইতে যদি পতিত হই, যদি রাক্ষসেরা জানিতে পারিয়া তোমার অনুধাবন করিলে আমি ভীত হইয়া চ্যুত হই, সাগর জলে নিমগ্ন হই যদি. কিংবা রাক্ষসেরা যদি কাড়িয়া লুকাইয়া রাখে নূতন করিয়া মানব বানর এমন কি দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরের অজ্ঞাত প্রদেশে?'

বীর্য্যশুল্কা নারী বলবীর্য্যে সসম্মানে ফিরিতে চাহেন—গোপনে নহে, পরপুরুষের বীর্য্যবলে নহে। রামচন্দ্র যদি ফিরাইতে পারেন তবেই। হনুমান স্বর্ণলঙ্কার কালরজনী অপেক্ষা করাই শ্রেয় বুঝিলেন।

বিদায় নেবার পূর্ব্বে স্বর্ণলঙ্কাকে দূতের মাহাত্ম্য বুঝাইতে মানস করিলেন। রাবণের লঙ্কাকে হনুমান স্বর্গের অমরাবতী হইতেও রূপৈশ্বর্য্যময়ী বলিয়াছেন—বহু দিন পরে বাংলার কবি মধুসূদন এই মহাকাব্যের বিশেষতঃ সুন্দরকাণ্ডের গরিমাকে বহু সম্মানিত করিয়াছেন, কিন্তু সেই অমরার বাঞ্ছিতা নগরীকে যখন হনুমান্ দগ্ধ করিলেন, যখন রাঘবকুলনন্দিনীর অভিমানকে বহুমানিত করিয়া স্বর্ণপুরীর ধ্বংস-কাব্যে উপক্রমণিকা লিখিলেন, তখন বাংলার কবি স্বর্ণলঙ্কার মোহবশে আপন কাব্যের লক্ষ্য বিপথগামী করিলেন।

লঙ্কা দগ্ধ করিয়া হনুমান অকস্মাৎ খুশী হইয়াই চিন্তিত হইলেন। 'এ কি করিয়াছি! দগ্ধ লঙ্কার অশোককানন কি দগ্ধ না হইয়াছে? জানকী রামদূত কর্ত্তৃক অগ্নিদগ্ধা! এ কি সম্ভব হইয়াছে!—'

'অসম্ভব!' মহাকবি হনুমানকে আকাশবাণীমুখে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শাস্ত্রবিদ্ ঋষি বিজয়ী হনুমান্ দৃঢ়চিত্তে উচ্চারণ করিলেন—

—'নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ত্ততে'— (৫৫ সঃ সুন্দর)

অগ্নিকে দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। জানকীরূপ অগ্নিই শুধু স্বর্ণলঙ্কাকে গ্রাস করিয়াছে, সে অগ্নিকে আর কে গ্রাস করিবে?

... মহেন্দ্রপর্ব্বতে প্রত্যাবৃত্ত হনুমানকে অভ্যর্থনা হইল অপূর্ব্ব ছন্দে, মহাকবির অপূর্ব্ব কাব্যমাধুর্য্যে ও ভাবসম্ভারে। মধুবনকে নিঃশেষ করিয়া যে মধুপান তাহাতেই সুন্দরকাণ্ডের মধুসমাপ্তি নহে, লঙ্কাকাণ্ডের সুপারম্ভে জানকী সংবাদে প্রীতিভরে রামচন্দ্র যখন 'আলিঙ্গনই আমার যথাসর্ব্বস্ব' বলিয়া বাহু প্রসারিত করিলেন হনুমানের প্রতি,—সুন্দরকাণ্ডের সেই শেষ গৌরবটীকা।

পরপারের অশোক কাননে শিংশপামূলের অপরাজিতার স্বপ্ন বুঝিবা এপারে সার্থক হইতে চলিয়াছে।

সাময়িকী

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

গত ২৫শে বৈশাখ হইতে ১ সপ্তাহ কাল ধরিয়া বাঙ্গালার ও ভারতের সর্ব্বত্র, প্রায় প্রতি গ্রামে ও প্রতি গৃহে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানাদি হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের আলোচনার ফলে রবীন্দ্রনাথকে সকলের নিকট নূতন ভাবে পরিচিত করিয়া দিবার সুযোগ হইয়াছিল। এই উপলক্ষে দেশের সর্ব্বত্র নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখনও পর্য্যন্ত উক্ত ধন-ভাণ্ডারে ২৫ লক্ষ টাকাও সংগৃহীত হয় নাই। ভাণ্ডারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিরাট পরিকল্পনা লইয়া দেশবাসীর নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত না হইলে সে পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যারম্ভ করা যাইবে না। ইতিমধ্যে ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মিঃ কেসির চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের কলিকাতাস্থ পৈতৃক ভবন ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাকে জাতীয় সম্পত্তিরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করাই স্মৃতি সমিতির একান্ত ইচ্ছা। আমাদের বিশ্বাস, বিলম্বে হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হইবে না।

আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য—

ভারতব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া পড়িয়াছে। এই দুর্ভিক্ষে ভারতের কয় কোটি লোককে প্রাণ হারাইতে হইবে তাহা সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন। মে মাসেই বাঙ্গালা দেশে চাউলের মণ কোন কোন স্থানে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। বহু জেলায় চাউল দুষ্প্রাপ্য, কাজেই লোক অখাদ্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে ও তাহার ফলে শীঘ্রই যে দেশে অকালমৃত্যু আরম্ভ হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গত ৫ মাস কাল গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা ভাবী দুর্ভিক্ষের কথা ঘোষণা করিয়াছে ও ভারতের বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবে বলিয়া স্তোক দিয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দুর্ভিক্ষ যাহাতে না হয়, সে জন্য কোন ব্যবস্থাই করে নাই। এমন কি, দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবার পরও কোথাও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে খাটাইয়া তাহাদের চাউল দিবার ব্যবস্থা করে কোন জনহিতকর কাজও আরম্ভ করে নাই। এখনও সরকারী গুদামসমূহে হাজার হাজার মণ খাদ্যশস্য পড়িয়া নষ্ট হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। যে সময়ে সংবাদপত্রসমূহের পৃষ্ঠা চাউলের অভাবের সংবাদে পূর্ণ, সে সময়েও সরকারী বড় কর্ত্তারা "বাঙ্গালায় চাউলের অভাব হইবে না" বলিয়া ঘোষণা বাণী প্রকাশ করিতেছেন। সত্য সত্যই দেশে হয় ত খাদ্যের অভাব হয় নাই—সরকারী অব্যবস্থার ফলে দেশে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেকে মনে করেন, এই ভাবে দুর্ভিক্ষ আনয়নের পিছনে রাজনীতিক কারণ বিদ্যমান। দেশে গত এক বৎসর কাল রাজনীতিক আন্দোলন প্রবল ভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল। লোককে অন্নসমস্যায় বিব্রত করিলে তাহাদের আর রাজনীতিক চিন্তার অবসর থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ লোক না খাইয়া নির্জীব হইয়া পড়িলে তাহার পক্ষে সাহসিকতার কাজ করাও অসম্ভব হইয়া যাইবে। সেইজন্যই হয় ত এই দুর্ভিক্ষকে ডাকিয়া আনার প্রয়োজন হইয়াছিল। কি ভাবে মানুষকে হীনবল করা হইতেছে, তাহা রেশন ব্যবস্থা দ্বারাই বুঝা যায়। পূর্ব্বে প্রতি লোকের প্রতি বেলা আহারের জন্য ১ পোয়া চাউল দেওয়া হইত, এখন সে স্থলে ৩ ছটাক চাউল দেওয়া হয়, পরে উহা আধ পোয়া করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯০ জনেরও অধিক লোকের ১ বেলায় ১ পোয়া চাউলের

ভাত না খাইলে পেট ভরে না। কারখানাবহুল স্থান-গুলিতে শ্রমিকদিগকে চাউলের বদলে ছোলা বেশী করিয়া দেওয়া হইতেছে ; তাহার ফলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মে লোক ক্ষুধার জ্বালায় ছোলা খাইয়া উদরাময়ে প্রাণ হারাইতেছে। অধিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ সাহায্য ব্যবস্থা না থাকায় জনসাধারণের সে বিষয়ে উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তাহারা কোন প্রকারে চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে নাই। যে দেশে শাসক সম্প্রদায় উদাসীন, সে দেশে স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত মানুষের এই ভাবে দুর্গতি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—

আবার ভারতের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। অতি অল্প মাত্র কারণ হইতে দাঙ্গা ভীষণ আকার ধারণ করে। এলাহাবাদে ও বোম্বায়ে এরূপ অতি সামান্য কারণে দাঙ্গা হইয়াছিল। বেরিলি ও আলিগড়ের হাঙ্গামা ত লাগিয়াই আছে। বাঙ্গালা দেশে বর্দ্ধমানের কালনা মহকুমায় ও যশোহরের নড়াইল মহকুমায় হাঙ্গামার ফলে বহু ক্ষতি হইয়াছে। সিমলা বৈঠকে কংগ্রেসের সহিত মুসলেম লীগের আপোষ হইল না। বাঙ্গালায় লীগ-নেতা মিঃ সুরাবর্দ্দী কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া স্থায়ী সচিবসঙ্ঘ গঠনে সমর্থ হন নাই। তাহাই এই সকল দাঙ্গার মূল কারণ কি না কে জানে? অথচ সিন্ধু দেশের প্রধান মন্ত্রী সার গোলাম হেদায়েতুল্লা সম্প্রতিও বলিয়াছেন, কংগ্রেসের সহিত মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠন করা না হইলে সিন্ধু দেশেও স্থায়ী সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হইবে না। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানকে একত্র বাস করিতে হইবে। মন্ত্রী মিশনের সদস্যরাও বলিয়াছেন, ভারতে মিঃ জিন্নার পরিকল্পনা অনুসারে পাকিস্থান করা সম্ভব নহে। হিন্দুরা কোন দিন মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া ভারতে হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠার কথা মনেও করেন না। কাজেই উভয় সম্প্রদায় যদি পরস্পরের প্রতি মনোভাব পরিবর্ত্তন না করে, তবে এই বিবাদ ত দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে—তাহার ফলে জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। হিন্দুই মরুক, আর মুসলমানই মরুক, দেশের ক্ষতি সমানই হইবে।

আসন্ন রেল ধর্ম্মঘট—

নিখিল ভারত রেল শ্রমিক সংঘের পক্ষ হইতে ভারতের রেল কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ বিবৃত করিয়া যে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ফলে সারা ভারতের রেল কর্ম্মচারীরা গত ১লা জুন নোটীশ দিয়াছেন যে আগামী ২৭শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে তাঁহারা একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিবেন। ভারতের রেল সমূহের ব্যয় অপেক্ষা আয় কত বেশী, তাহা গত কয় বৎসরের রেল-বাজেট হইতে দেখা গিয়াছে। সেই উদ্বৃত্ত টাকায় যাত্রী সাধারণেরও কোন উপকারই করা হয় না। রেল যাত্রীদিগকে রেল ভ্রমণে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা রেল বিভাগে কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন, তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ দেওয়াও কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। বহু দিন হইতে রেল কর্ম্মচারীরা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। এখন তাহা সত্যই অসহনীয় হইয়াছে ; সেজন্য ধর্ম্মঘট করা ছাড়া তাঁহারা অন্য কোন উপায় দেখিতেছেন না। ধর্ম্মঘটের ফলে রেল শ্রমিক ও দেশবাসী সকলের যে দুঃখ দুর্দ্দশা হইবে, সে কথা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কি কোন প্রকার আপোষে অগ্রসর হইবেন না?

পরলোকে শরৎ মুখোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার বাকুলিয়া নিবাসী শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ২রা এপ্রিল ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র ভার-উত্তোলন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এস-গুহ—

হাওড়া লিলুয়া আইরণ ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ মেকানিকাল ও ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এস-গুহ শিল্প সংগঠন শিক্ষার জন্য সম্প্রতি জার্ম্মানীতে গমন করিয়াছেন। তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে জার্ম্মানীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের পর সে বিষয়ে তাঁহার অভিমত লণ্ডনে এক প্রতিষ্ঠানকে জানাইবেন। তাঁহার মত কর্ম্মীকে এ কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া গভর্ণমেণ্ট যোগ্যতার সমাদর করিয়াছেন।



শোভাযাত্রা সহ মেজর-জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জ্জী ফটো—তারক দাস

রাজবন্দীদের মুক্তিলাভ—

২৩শে মে তারিখে দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে শ্রীযুক্ত অনিল রায়, জ্যোতিষ জোয়াদ্দার, ভূপেন্দ্র রক্ষিত, ধীরেন্দ্র সাহা ও ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালার সকল নিরপত্তা বন্দীর মুক্তি হইল। কিন্তু বিভিন্ন মামলায় দণ্ডিত ৪০ জন রাজবন্দী এখনও মুক্তিলাভ করেন নাই। গত ১৯শে মে দমদম জেল হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী, আশুতোষ কাহানী, নরেন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র ঘোষ, রসময় সুর, সুনীল দাস, শান্তি গাঙ্গুলী ও সত্যব্রত মজুমদার মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নূতন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—

বাঙ্গালাদেশ হইতে নিম্নলিখিত ৭২ জন কংগ্রেস নেতা এবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মোঃ আসরাফুদ্দীন আমেদ চৌধুরী, সুশীলচন্দ্র দেব, কিরণশঙ্কর রায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, দেবেন দে, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রনাথ সেন, সত্যরঞ্জন বকশী, নরেশচন্দ্র বসু, বনবিহারী বল, দুর্গাপদ সিংহ, রামেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পরিমলকুমার রায়, শচীন্দ্রনাথ মাইতি, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, শান্তিময় দত্ত, নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, শরৎচন্দ্র বসু, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, লালবিহারী সিংহ, কুমারচন্দ্র জানা, যতীন্দ্রনাথ গুহ, সুশীল পালিত, লাবণ্যলতা চন্দ, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হাসিময় রায়, সুধীরচন্দ্র রায়-চৌধুরী, আবদাস সত্তর, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, ফকিরচন্দ্র রায়, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু, সৈয়দ নৌসের আলি, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিজয় ভট্টাচার্য্য, তারাপদ লাহিড়ী, অনন্ত-প্রসাদ সেন, সীতারাম সাকসেরিয়া, হবিবর রহমন চৌধুরী, গোলাম রসিদ খান, কমলকৃষ্ণ রায়, রাধাকিষণ নাওটিয়া, সত্যনারায়ণ মিশ্র, অমূল্য ঘোষ, রামসুন্দর সিং, লাবণ্য প্রভাদত্ত, লীলারায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন গুপ্ত,

দাশরথি চৌধুরী, অরুণচন্দ্র গুহ, সুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভূপতি মজুমদার, নিখিলরঞ্জন গুহরায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, বিজয়চন্দ্র রায়, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ রায়, প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ জীবনরতন ধর, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

মিঃ এস-এম ওসমান—

ইনি বিহারের পাটনা জেলার অধিবাসী হইলেও বাল্যকাল হইতে কলিকাতায় আছেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল। ১৯২০-২১ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে ২ বার কারাবরণ করেন। তিনি কলিকাতা ২৬ জাকেরিয়া ষ্ট্রীটের প্রেসিডেন্সি মুসলেম এচ-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সিটি কলেজের কমার্স বিভাগের অধ্যাপক। এবার ইনি কলিকাতার মেয়র হইয়াছেন।



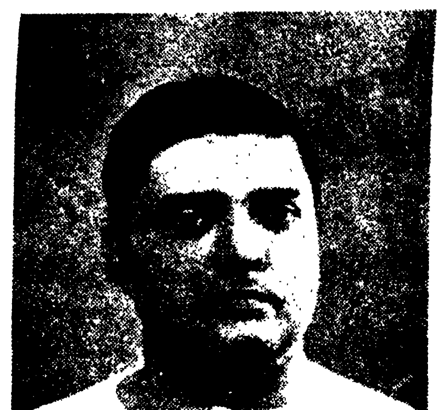
কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র—মিঃ এস-এম-ওসমান

যুক্তপ্রদেশে সাংবাদিকগণের সুবিধাদান—

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসদলের মন্ত্রিসভা স্থানীয় সাংবাদিকগণের কার্য্যকাল, বেতন, কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এক নূতন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেছেন। সেজন্য তাঁহারা সাংবাদিক, সংবাদপত্রের মালিক ও অন্যান্য নেতাদের লইয়া এক সম্মিলনে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন এবং আমেরিকায় এ বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, সেরূপ ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন। বাঙ্গালাদেশের ব্যবস্থা পরিষদেও সেইরূপ বিল উপস্থাপনের ব্যবস্থা হইলে বাঙ্গালার সাংবাদিকগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে।

শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়—

ইনি ১৯৩৬ সালে ২০নং ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়া আছেন। তিনি খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি ২০নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি। এবার ইনি কলিকাতার ডেপুটী মেয়র হইয়াছেন।



কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন ডেপুটী মেয়র—
শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

লণ্ডনে এবার বৃটীশ সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিকগণের এক সম্মিলন হইবে। তাহাতে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও দেশসেবক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা ৭ই জুন লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। *



হাওড়া পুলের উপর দিয়া শোভাযাত্রা সহ মেজর-জেনারেল শাহ নওয়াজ ও মহবুব আমেদ ফটো—পান্না সেন

কাঙ্গাল হরিনাথ উৎসব—

গত ২১শে বৈশাখ শনিবার নদীয়া জেলার কুমারখালিতে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। কাঙ্গালের গৃহে কাঙ্গালের সুবৃহৎ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবের দিন ভোরে ঐ স্থান হইতে গ্রামবাসীরা মিছিলে বাহির হইয়া কাঙ্গাল-রচিত সঙ্গীত গান করিয়া ৩ মাইল দূরস্থ তাঁহার সাধন স্থলে গমন করেন ও প্রত্যাগমন সময়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের গ্রামগুলি হইতে বহু কীর্ত্তনের দল কাঙ্গাল গৃহে আসিয়া সারাদিন কীর্ত্তন উৎসব সম্পাদন করে। অপরাহ্নে উপস্থিত সকলকে ভুরিভোজে তৃপ্ত করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় কাঙ্গালের জীবনী, সাধনা ও সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছিল। কাঙ্গালের পুত্রপৌত্রাদি এই সকল উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা হইলেও দেশবাসী সকলের উৎসব সম্পর্কে অসাধারণ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। কাঙ্গাল তাঁহার ধর্ম্ম ও সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়া শুধু ঐ অঞ্চলে নহে, সারা বাঙ্গালা দেশে যে আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার স্বর্গলাভের ৫০ বৎসর পরেও সেই আদর্শপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেশবাসী সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। কাঙ্গাল হরিনাথের রচনাসমূহ পুনরায় প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিলে তদ্দারা দেশবাসী উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন—

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রীযুত সত্যপ্রসন্ন সেন কয়মাস পূর্ব্বে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কারখানাসমূহ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'হেভী-কেমিকেল ও ইলেকট্রো-কেমিকেল্' সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শদাতা মনোনীত হইয়াছেন। সেন মহাশয়ের বিদেশ-ভ্রমণের কাহিনী 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইতেছে।



হাওড়া ষ্টেশন হইতে আই-এন-এ রিলিফ্ অফিস অভিমুখে মোটরযোগে মেজর-জেনারেল এ-সি চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

ফটো—পান্না সেন



শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় শাহ নওয়াজ ও মহবুবের বক্তৃতা

ফটো—পান্না সেন

শশিভূষণ স্মৃতি-উৎসব—

গত ২রা জুন রবিবার অপরাহ্নে ২৪পরগণা সোদপুরের নিকটস্থ তেঘরিয়া গ্রামে স্বর্গত দেশকর্ম্মী শশিভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের একবিংশ বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু উৎসবে পৌরহিত্য করেন এবং অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য্য 'শশিভূষণ' বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সম্পাদন করেন। ২৪পরগণা জেলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাস, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শশীবাবুর জীবন ও কার্য্যের কথা সভায় বিবৃত করেন। স্থানীয় বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের অধিকতর উন্নতি বিধান করিয়া উৎসবকে শ্রীমণ্ডিত করার চেষ্টা প্রয়োজন।

পরলোকে সুধীন্দ্র বসু—

আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু গত ২৬শে মে আমেরিকায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় গমন করেন ও গত ৩০ বৎসর কাল তথায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালকগণের তিনি অন্যতম। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দেশপ্রেমের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ—

লণ্ডনে যে বৃটীশ সাম্রাজ্যের সাংবাদিক সম্মিলন হইতেছে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য ভারত হইতে একদল সাংবাদিককে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐ দলের সদস্যরূপে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ গত ২রা জুন বিলাতে গিয়া পৌছিয়াছেন।

খাল খনন সমস্যা—

কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত ৩০ মাইল দীর্ঘ ও ১ মাইল প্রস্থ এক নূতন খাল খনন করিয়া সে পথে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। হুগলী নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় ও হুগলী নদীপথে সমুদ্রে যাইতে বিলম্ব হয় বলিয়া ঐ খাল খননের প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ঐ নূতন খাল খনন করা হইলে দেশবাসীর উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইবে। যে সকল গ্রামের উপর দিয়া খাল যাইবে, সে সকল স্থানের অধিবাসী গৃহহীন হইবে ও তাহাদের চাষের জমী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাগ ছাড়া নূতন খাল দিয়া জল যাইলে পুরাতন নদী ক্রমে মজিয়া গিয়া বহু লোকের ক্ষতি সাধন করিবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও দেশ-প্রেমিক অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি এবিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বিষয়টির প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মনে হয়, একদল বিদেশী ব্যবসায়ীর স্বার্থ-

সিদ্ধির জন্য এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহাতে যে অসংখ্য দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, পরিকল্পনা প্রস্তুতকারীরা আদৌ সে বিষয়ে চিন্তা করেন নাই।



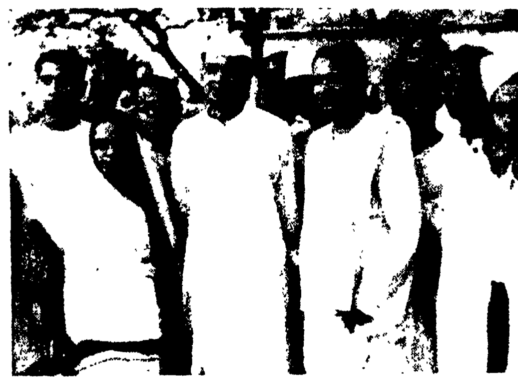
শা' নগর শ্মশান ঘাটে ৺যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্মৃতিমন্দির ভিত্তি স্থাপনে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশীয় রাজ্য সমূহে গণ্ডগোল—

বৃটীশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা অন্দোলনের ঢেউ দেশীয় রাজ্যগুলিতে পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে। ফরিদকোট রাজ্যের প্রজারা শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ভীষণাকার ধারণ করিলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তথায় যাইয়া শাসনকর্ত্তার সহিত প্রজাদের আপোষ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মিলনের সভাপতি। কাশ্মীরেও অনুরূপ গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহা গুলীবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কাশ্মীর প্রাচীন রাজ্য—তথায় শাসক হিন্দু, কিন্তু অধিকাংশ প্রজা মুসলমান। সেখানেও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসনকর্ত্তারা যদি যুগের উপযোগী হইয়া না চলেন, তবে অশান্তি অনিবার্য্য। আজও কি তাঁহারা মনোভাব পরিবর্ত্তনে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন না?

পোষ্টকার্ডের মূল্য হ্রাস—

আগামী ১লা জুলাই হইতে পোষ্টকার্ডের মূল্য কমিয়া ৩ পয়সা স্থলে ২ পয়সা হইবে এবং রিপ্লাই কার্ডের দামও ৬ পয়সা স্থলে ৪ পয়সা করা হইবে। পোষ্টকার্ডের দাম ১ পয়সা স্থলে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া ৩ পয়সা হইয়াছিল।



দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ফটো—কানন মুখোপাধ্যায়

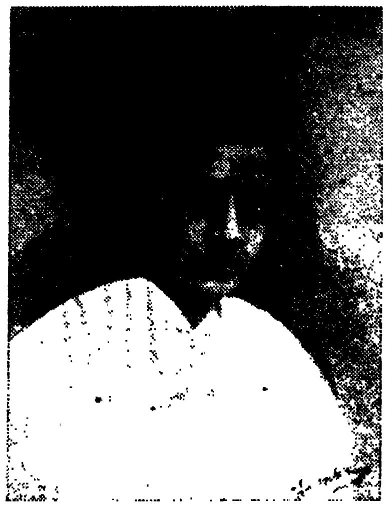
বোম্বায়ে রূপায়তন—

গত ১৭ই মে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ নৃত্যকলা কেন্দ্র রূপায়তনের ষষ্ঠ বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ শ্রীসুখেন্দু দত্তের পরিচালনায় একটী বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। যন্ত্রশিল্পী শ্রীবসন্ত গোরক্ষ সঙ্গীত পরিচালনা করেন। ছাত্রছাত্রীগণ মণিপুরী, রঙ্গপূজা, পুষ্পচয়ন, পল্লীনৃত্য, ভারতনাটাম্, কথাকলি এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতসহ কয়েকটী নৃত্য প্রদর্শন করেন। সহরের বহু বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী ভদ্রলোক কুমারী নাগরত্না, কুমারী জয়ন্তী গায়ঙ্কর, কুমারী বিমলা দিবেকর, কুমারী মীরা কপিকর, শ্রীনবীন পারেখ ও শ্রীথোপকারের প্রতিভার প্রশংসা করেন।

পরলোকে কাশীনাথ চন্দ্র—

নদীয়া রাণাঘাটের খ্যাতনামা তরুণ সাহিত্যিক কাশীনাথ চন্দ্র গত ৮ই বৈশাখ রবিবার মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। নিজের চেষ্টায় সামান্য অবস্থা হইতে অল্প দিনের মধ্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

বহুদিন রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি গল্প লিখিতেন। তাঁহার গল্প সকল মাসিক পত্রেই প্রকাশিত হইত। আবৃত্তি ও নাটকাভিনয়ে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।



কাশীনাথ চন্দ্র

পরলোকে প্রফুল্লচন্দ্র বসু—

কলিকাতা দর্জ্জিপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও জেনারেল পোষ্টাফিসের সহকারী কোষাধ্যক্ষ প্রফুল্লচন্দ্র



প্রফুল্লচন্দ্র বসু

বসু মহাশয় ৫৮ বৎসর বয়সে গত ১৩ই বৈশাখ পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি আইন ব্যবসায়ী অমরচন্দ্র বসুর পুত্র ছিলেন। যন্ত্র সঙ্গীতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

রাজবলহাটে বার্ষিক উৎসব—

রাজবলহাট হুগলী জেলার একটি বড় গ্রাম। তথায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে হেমচন্দ্র স্মৃতিপাঠাগার ও অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নামে অমূল্যচরণ স্মৃতি প্রত্নতত্ত্বশালা আছে। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তথায় যথাক্রমে পাঠাগার ও প্রত্নতত্ত্বশালার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল ভড় 'হেমচন্দ্র' সম্বন্ধে কবিতা পাঠ করেন ও অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় ও যত্নে গ্রামখানি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জহরলাল ভড় পাঠাগারের জন্য যে প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন তাহারই একাংশ প্রত্নতত্ত্বশালারূপে ব্যবহৃত হইবে ও পাঠাগার কর্তৃপক্ষই প্রত্নতত্ত্বশালা পরিচালন করিবেন। ডাক্তার বিভূতিভূষণ দে, নিতাইচরণ দাস, মন্মথনাথ হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। রাজবলহাটে নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান হইতেছে। সেখানকার রাজবল্লভী দেবী ও বিরাট কালীমূর্ত্তি দর্শনীয় বস্তু। মার্টিন কোম্পানীর চাঁপাডাঙ্গা লাইনে আটপুর ষ্টেশনে নামিয়া দূরে রাজবলহাট গ্রাম। স্থানীয় জনসাধারণের গ্রামপ্রীতি, গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা এবং সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রশংসনীয়।

কাণপুর শ্রমিকদিগের গৃহসমস্যা—

খ্যাতনামা অর্থনীতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া কাণপুরের শ্রমিকদের গৃহ সমস্যা (Industrial Housing in Cawnpore) সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি সম্প্রতি তাঁর রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ভারতের শিল্প কেন্দ্র ও বর্ত্তমান সহরগুলি কোনরূপ পরিকল্পনা ব্যতিরেকে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে যে বস্তি সমস্যার

সৃষ্টি হইয়াছে তাহার রূপ খুবই বিভীষিকাপূর্ণ। যুদ্ধে সহরের লোক সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর ভারতে কাণপুর সর্ব্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। বর্ত্তমানে ১৭১টি সুবৃহৎ মিল ও কারখানা এই সহরে অবস্থিত। যুদ্ধ পূর্ব্বেকার প্রায় ৪ লক্ষ হইতে কাণপুরের জন সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৯ লক্ষে



শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

পৌঁছিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষই শ্রমিক। উক্ত রিপোর্টে দেশ বিদেশের গৃহ সমস্যা ও বস্তি সমস্যা সমাধানের বহুবিধ উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং লেখক অবশেষে সমস্ত ভারতের ও সেই সঙ্গে কাণপুরের শ্রমিকদের গৃহসমস্যা সমাধান কল্পে নিজস্ব মতামত ও নির্দ্দিষ্ট পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সাধারণ শ্রমিকরা (unskilled wage earner) স্বাস্থ্যসম্মত বাসোপযোগী গৃহের ভাড়া দিতে অক্ষম। এমতাবস্থায় সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে এই গৃহসমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব নয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিল-মালিকগণের নিজ নিজ শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ ব্যবস্থার বিরোধী। এই প্রথায় শ্রমিকদিগের মিলের বাহিরে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করা হয়। এই প্রথা শ্রমিকসঙ্ঘের প্রসারতা লাভের পক্ষেও প্রতিকূল। কোন কারণে মিলের চাকুরী খোয়াইলে এই সব শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে বসবাসের স্থানটুকুও খোয়াইতে হয়।

সেনভূম সাহিত্য সম্মেলন—

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া জেলার 'তিলুড়িতে' সেনভূম সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন এবং পুরুলিয়ার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত অন্নদা চক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথি ছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থান হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়া সম্মেলনে যোগদান করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতা, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ পাঠের পর যুগ্মসম্পাদক শ্রীযুক্ত গোলকপতি সেন বিভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন। স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত রামময় রায়ের উৎসাহে ও যত্নে সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হয়।

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য—



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পিএইচ-ডি

রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ২৪পরগণা ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের দৌহিত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবাগীশের পুত্র। জানকীবল্লভের বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মিলন—

গত ২৫শে ও ২৬শে জুন বাঁকুড়া চণ্ডিদাস চিত্রমন্দির হলে সুকবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারাগতি সামন্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত সদানন্দ সান্যাল

সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সকল উদ্যোগ আয়োজনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনে একটি বঙ্গীয় প্রেস রিপোটার্স সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর



বাঁকুড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রেস রিপোটার্স সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন
ফটো—বাঁকুড়া ষ্টুডিও

সান্যাল উহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত অনিলধন ভট্টাচার্য্য সাধারণ সম্পাদক হইয়াছেন। আগামী বর্ষে মুর্শিদাবাদে সম্মিলন হইবে স্থির হইয়াছে।

নেতাজী ভবন—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় জানাইয়াছেন যে তিনি ও তাঁহার দুই বন্ধু তাঁহাদের পৈতৃক বাসভবন ৩৮।২ এলগিন রোডের তিন চতুর্থাংশ (উহার মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর এক চতুর্থাংশ আছে) দায়মুক্ত করিয়া ক্রয় করিয়াছেন। তাহা পৃথক করা হইয়াছে। এই অংশে সুভাষচন্দ্রের শয়নকক্ষ ও পাঠাগার অবস্থিত। উহা শীঘ্রই ট্রাষ্টডীড করিয়া দেশের কাজে দেওয়া হইবে ও উহার নাম 'নেতাজী ভবন' রাখা হইবে। ঐ বাড়ীর দুইটি ঘর (সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত) বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিয়া বাকী সকল ঘর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের লোকজনের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—

'চিকাগো ট্রিবিউন' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ আলফ্রেড ওয়াগ প্রকাশ করিয়াছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ফরমোজার তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান নাই, তাঁহাকে ঐ দুর্ঘটনার ৪ দিন পরে ইন্দোচীনে দেখা গিয়াছিল ; কলিকাতা পুলিসের একজন কর্ম্মচারী দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ায় সুভাষচন্দ্রের খোঁজ করিতে গিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভারতে প্রত্যাগমনের সুযোগ খুঁজিতেছেন। তিনি ভারতে ফিরিলে কেহ তাঁহাকে দণ্ড দানের সাহস করিবে না।

ডাক্তার শ্রীঅজিতকুমার বসু—

রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনিলাল বসুর পৌত্র ও বিচারপতি ৺স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের দৌহিত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত অজিতকুমার



ডাঃ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বসু

বসু এবার লণ্ডনের এফ-আর-সি-এস হইয়াছেন। গত বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস পরীক্ষায় পাশ করেন। ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর কোন বাঙ্গালী উভয় উপাধি পান নাই। অজিতকুমার কলিকাতা ছোট আদালতের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসুর পুত্র।

নূতন রাষ্ট্রপতি—

৯ই মে তারিখে সিমলা হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য জে-বি কৃপালানী ঘোষণা করিয়াছেন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯২৯ সালে

লাহোরে, ১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌয়ে ও ১৯৩৭ সালে ফৈজপুরে তিনি কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। ১৯২৮ সাল হইতে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য আছেন।

পরলোকে দ্বিজদাস দত্ত—

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় গত ৫ই এপ্রিল ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার কর্ণেল



৺দ্বিজদাস দত্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। অড়হর, নেপিয়ার ঘাস, চীনাবাদাম, সয়াবীন প্রভৃতি চাষ সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালা দেশে ঐ সকল জিনিষের প্রচার করিয়াছিলেন। ৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোপেশ্বর জয়ন্তী—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসব গত ২০শে মে নাটোরের মহারাজার সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে সম্পাদিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত দামোদর দাস খান্না প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গোপেশ্বর বাবুর আজীবন সঙ্গীত সাধনার কথা বিবৃতি করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সঙ্গীত সম্বন্ধে গোপেশ্বরবাবুর দানের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে গোপেশ্বর বাবু তাঁহার সারা জীবনের সঙ্গীত আলোচনার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন। গোপেশ্বরবাবুর সম্বর্দ্ধনা দ্বারা দেশবাসী বাঙ্গালার সঙ্গীত চর্চ্চার সমাদর করিয়াছেন।

মহানাদে প্রাচ্য-ভবন প্রতিষ্ঠা—

হুগলী জেলার মহানাদ একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পালের



মহানাদে 'মনোরমা গ্রন্থাগার' ও 'প্রাচ্যভবনের' উদ্বোধনী সভায়

ফটো—বিষ্ণুপদ কর

চেষ্টায় তথায় 'মনোরমা গ্রন্থাগার' ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য 'প্রাচ্যভবন' স্থাপিত হইয়াছে। গত ২১শে বৈশাখ বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র ঐ গ্রামে যাইয়া প্রতিষ্ঠান দুইটির উদ্বোধন উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। স্থানীয় জমীদার ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রশেখর কর তাঁহার স্বর্গতা পত্নীর নামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। মহানাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বাঙ্গালী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। ঐ গ্রাম বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলের পার্শ্ববর্ত্তী।

নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—

হাওড়া নিবাসী শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর মল্লিক তাঁহার স্ত্রী কমলা দেবীর নামে হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার দিননাথ

ইউনিয়নের রোড়হল গ্রামে যে নূতন বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি



নূতন বিদ্যালয়

শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ঐ গ্রামে যাইয়া তাহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

কলিকাতায় সম্বর্দ্ধনা—

আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব মেজর জেনারেল এ-সি-চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি দিল্লীতে মুক্তি লাভ করিয়া গত ৯ই মে ৪ বৎসর পরে কলিকাতায় আসিলে সহরবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। তিনি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে আই-এম-এস চাকরী করিতেন ও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন। যুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুর যাইয়া তিনি জাপানী কবলে যান ও পরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করেন। মণিপুরে অধিকৃত স্থানসমূহের তিনি গভর্ণর হইয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৬ই জুন সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এক মাইল দীর্ঘ মিছিলে তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে সহরে আনা হইয়াছে।

সিমলায় উৎসব—

গত ৮ই মে সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনীর সদস্যগণ ও ইউনিয়ন একাডেমীর ছাত্রগণ একযোগে কালীবাড়ীতে প্রতিমা মিত্র হলে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। সম্মিলনীর যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুত দ্বিজেন মল্লিকের চেষ্টায় উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হয়। শ্রীযুত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

দাদাঠাকুর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বাবাঠাকুরের তলায় ও ভাই, দাদাঠাকুরের পুজো!
আশীর পরেও পেরিয়েছে চার, হয়নি তবু কুঁজো।
পাল্লা দিয়ে ছুটতো যারা সবাই নিলো ছুটি,
একলা শুধু দাদু'ই আজও চলছে গুটি গুটি!
যে বয়সের মানুষ খোঁজে অবসরের ফাঁক—
সেই বয়সেই হঠাৎ 'দাদু' বাজিয়ে বাণীর শাঁখ,
দিনের শেষে দেবীর পূজা প্রথম করেন শুরু;
সবাই দেখে অবাক, বলে—পূজারী নয়—গুরু!
শুভ্র শুচি হাসির ফুলে সাজিয়ে পূজার ডালা
মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয় ভক্তি-অশ্রু ঢালা।
করুণ রসে সিক্ত সরস স্নিগ্ধ দুর্ব্বাদল—
দেবীর মুখে ফোটায় হাসি ঝরায় চোখে জল!

ভণ্ড যারা খুললো মুখোস সেই কলমের টানে,
সহজ মানুষ ছড়িয়ে দিল উদার আলো প্রাণে;
গরীব যারা তাদের ঘরেও কী ধন আছে জমা,
পুরুষ বাঁচে পৌরুষে, না, নারীর পেয়ে ক্ষমা?
ধনীর বুকে নিঃস্ব কোথা সঙ্গোপনে কাঁদে,
কিসের জোরে কোমল জাতি কঠোর মনে বাঁধে—?
দাদুর 'কবুলতির' পাটায় সব পড়েছে ধরা
দুখের রাতের দেওয়ালী তাঁর হৃদয় আলো করা।
আত্মভোলা ছিলাম সবে সুপ্তি-ঘন লোকে
তিনিই ডেকে জানিয়ে দিলেন আমরা কী ও কে?
কল্পলোকের কৈলাসে যে তিনিই কেদারনাথ
স্বয়ম্ভু সে শিল্পী শিবে জানাই প্রণিপাত।

খেলা-ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট দল বিলেতে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে প্রথম দু'টো খেলায় মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। অভ্যাসের প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ এবং ভ্রমণের অবসাদে তারা স্বাভাবিক খেলা দেখাতে সক্ষম হয় নি। ক্রমশঃ দলের খেলায় উন্নতি হ'লেও ভারতীয় দলের অমরনাথ মুস্তাক আলী এবং হাজারী এখনও পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারেন নি। মার্চ্চেন্টের মত শক্তিশালী ব্যাটসম্যানও প্রথম দিকে খুবই হতাশ ক'রেছিলেন। এখন তাঁর খেলা এমন খুলেছে যে, তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম 'ওপনিং ব্যাটসম্যান'-এর পর্য্যায়ে সম্মানীত করা হয়েছে। এতদিন বোলার হিসাবেই এস-ব্যানার্জির নাম ছিল। এবারের অভিযানে তিনি 'ব্যাটসম্যানে'র পর্য্যায়ে স্থান পেয়েছেন। তিনি এবং সিটিসারভাতে সারে দলের সঙ্গে খেলায় শেষ উইকেটের জুটিতে ২৪৯ রান তুলে ইংলণ্ডের শেষ উইকেটের ২০৫ রানের রেকর্ড ভেঙ্গেছেন।

অমরনাথ ব্যাটিংয়ে হতাশ করলেও তাঁর বোলিং ভাল হচ্ছে। এবার দলের চৌখস ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম পেয়েছেন বিনু মানকাদ। তাঁর বোলিং ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং প্রশংসনীয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দল ওরসেষ্টার দলের কাছে তাদের এবারের প্রথম খেলায় ১৬ রাণে পরাজিত হয়েছে। ১৯৩২ সালের খেলায় ভারতীয় দল ৩ উইকেটে বিজয়ী হয়েছিল; ১৯৩৬ সালে ওরসেষ্টার দল পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়।

খেলা আরম্ভ হয় ৪ঠা মে, ফলাফল : ওরসেষ্টার—১৯১ (সিঙ্গলটন ৪৭ ; মানকাদ ২৬ রাণে ৪ উইকেট) ও ২৮৪ (হাওয়ার্থ ১০৫ ও সিঙ্গলটন ৬৩ ; মানকাদ ৭৪ রাণে ৪ উইকেট)

ভারতীয় ক্রিকেট দল—১৯২ (মোদী—৩৪ ; পার্কাস ৫৩ রাণে ৫ ও হাওয়ার্থ ৪৭ রাণে ৩ উইকেট) ও ২৬৭ (৯ উইকেট ; মার্চ্চেন্ট ৫১, আর এস মোদী ৮৪, ব্যানার্জী ৫৯ নট আউট ; হাওয়ার্থ ৫৯ রাণে ৪ উইকেট)।

এবারের প্রথম খেলায় ভারতীয় দল মাত্র ১৬ রাণে পরাজিত হ'লে বিলাতের ক্রিকেট মহল ভারতীয় দলের এ পরাজয়কে খুব অগৌরবের মনে করেনি। খারাপ আবহাওয়া এবং অনভ্যাসের দরুণই ভারতীয় দলের এ পরাজয়ের কারণ ঘটেছিল। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে আর-এস-মোদী এবং এস ব্যানার্জী দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন।

ভারতীয় দল বনাম অক্সফোর্ড ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট দল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের দ্বিতীয় খেলাটি ড্র করে।

৯ই মে খেলা আরম্ভ হয়। খেলার ফলাফল—

অক্সফোর্ড ঃ ২৫৬ (এম পি ডোনেলি—৬১, সেল—৪৭ ; মানকাদ ৫৮ রাণে ৪ উইকেট সিন্ধে ৭৩ রাণে ৪ উইঃ) ও ২৪৫ (৩ উইকেট ; ডোনেলি ১১৬ নট আউট ; নাইডু ৬০ রাণে ৩ উইকেট)

ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ ২৪৮ (হাজারী ৬৪, মোদী ৪৯)

১৯৩২ সালের ১৮—২০শে মে। ভারতীয় দল ৮ উইকেটে বিজয়ী হয়েছিল। ভারতীয় দল—৩২৪ ও ৩২ (২ উইকেট) ; অক্সফোর্ড—১৩২ ও ২১৯।

১৯৩৬ সাল, ৬—৮ই মে। খেলা ড্র। ভারতীয় দল ৩৫২ ও ১০৩ (৫ উইকেট) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ২০২ ও ২৯৭।

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম সারে ঃ

নিখিল ভারতীয় ক্রিকেট দল সারে দলকে তাদের তৃতীয় খেলায় ৯ উইকেটে পরাজিত করছে। এই জয়ই তাদের প্রথম। খেলা—১১, ১৩, ১৪ মে। ভারতীয় দল টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করে। সি-টি সারভাতে এবং এস ব্যানার্জ্জী উভয়েই প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন। তাঁদের শেষ উইকেটের জুটিতে ২৪৯ রাণ ওঠে। এই রাণ শেষ উইকেটের ২৩৫ রাণের ইংলণ্ডের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে নতুন রেকর্ড করেছে। ১৯০৯ সালে কেন্টের ফিরলার এবং এফ ডোলি ওরসেষ্টারসায়ারের বিপক্ষে শেষ উইকেটে ২৩৫ রাণ তুলে রেকর্ড করেছিলেন। পৃথিবীর শেষ উইকেটের রেকর্ড ৩০৭ রাণ। ১৯২৮-২৯ সালে মেলবোর্ণে ইণ্টার ষ্টেট ক্রিকেট খেলায় দু'জন অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড় উক্ত রাণ তুলে রেকর্ড করেছিলেন। এবার খেলায় সারের প্রথম ইনিংসে সি-এস-নাইডু ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম 'হ্যাট-ট্রিক' করেন; তিনি ১২ ওভার বলে ৩টা মেডেন নিয়ে ৩০ রাণ দিয়ে ৩টে উইকেট পান। সারের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩৫ রাণে শেষ হলে তাদের ফলো-অন করতে হয়। ৩১৯ রাণ পিছিয়ে থেকে সারে দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। আরম্ভ খুবই ভাল হ'ল। তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৩৮ রাণে শেষ হল, আর জে গ্রেগরী ১০০ রাণ করলেন।

ফলাফল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

৪৫৪ (সি-টি সারভাতে নট আউট ১২৪, এস ব্যানার্জ্জী ১২২, গুল মহম্মদ ৮৯ এবং মার্চ্চেণ্ট ৫৩ রাণ; এ বেডষ্টার ১৩৫ রাণে ৫ এবং পার্কার ৬৪ রাণে ৩ উইঃ) ও ২৪ (১ উইকেট)।

সারে ঃ ১৩৫ (এল ফিসটক ৬২; সি এস নাইডু ৩০ রাণে ৩টে, মানকাদ ৮ রাণে ২টো, ব্যানার্জ্জী ৪২ রাণে ২টো, হাজারী ২০ রাণে ২টো উইঃ)

১৯৩২ সালের আগষ্ট ১৩, ১৫ এবং ১৬। খেলা ড্র। সারে—৩৮৭ (৯ উইঃ) ও ৯৫ (৩ উইঃ)। ভারতীয় ক্রিকেট দল—২০৪ ও ৩২২ (৮ উইকেট)

১৯৩৬ সালের ২০, ২২ এবং ২৩শে জুন। স্থান কেনিংটন ওভাল। খেলা ড্র। ভারতীয় দল—২২৬ ও ৪২১ (৫ উইঃ)। সারে—৪৫২ ও ৫২ (৩ উইঃ)

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম কেম্ব্রিজ ঃ

ভারতীয় দল এক ইনিংস এবং ১৯ রাণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে। এই নিয়ে তাদের এবার বার বার দু'বার জয় হ'ল। ভারতীয় দলের পক্ষে পতৌদী ১২১ এবং আর এস মোদী ১০৩ রাণ করেন। সারভাতে প্রথম ইনিংসে ৩৮ রাণে ২টী এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৮ রাণে ৫ উইকেট পেয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখান। ফলাফল ঃ **কেম্ব্রিজ—১৭৮ ও ১৩৮** (সাটানওয়ার্ক ৪৩); **ভারতীয় ক্রিকেট দল—৩৩৫** (আর এস মোদী ১০৩ এবং নবাব পতৌদী ১২১)

১৯৩২ সালের ৮, ৯ ও ১০ই জুন। ভারতীয় দল ৯ উইকেটে বিজয়ী হয়েছিল। কেম্ব্রিজ—৯২ ও ২৭৪। ভারতীয় দল—৩০৮ ও ৫৯ (১ উইঃ)

১৯৩৬ সালের ৩০শে মে এবং জুন ১লা ও ২রা। খেলা ড্র। ভারতীয় দল—১৬১ ও ৩ (কোন উইকেট না গিয়ে)। কেম্ব্রিজ—২১৭।

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম লিসেষ্টার ঃ

বারিপাতের দরুণ খেলা বেশ সুবিধা হয়নি। খেলা ড্র গেছে। ব্যানার্জ্জী, গুলমহম্মদ, নিম্বলকার, মোদী এবং সারভাতে এ খেলায় যোগদান করেন নি, বিশ্রাম নিয়েছিলেন। মার্চ্চেণ্ট ১১১ রাণ করেন। উভয় দলের মধ্যে তাঁরই একমাত্র সেঞ্চুরী ছিল। অমরনাথ ব্যাটিংয়ে এবার কিছুই করতে পারছেন না তবে এ খেলায় তাঁর বোলিং মারাত্মক হয়েছিল।

ফলাফল—**ভারতীয় ক্রিকেট দল—১৯৮** (মার্চ্চেণ্ট ১১১; টিলে ৩৩ রাণে ৩ উইঃ) ও **১০৭** (৬ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড; মার্চ্চেণ্ট ৫৭; স্মপ্রে ৩৩ রাণে ৩ উইঃ) **লিসেষ্টার—১৪৪** (বেরী ৬৭; অমরনাথ ১৪ রাণে ৪ উইঃ) ও ২৪ (১ উঃ)

১৯৩২ সালের আগষ্ট ২০, ২২ ও ২৩। ভারতীয় দল ১ ইনিংস ও ১৫ রানে বিজয়ী হয়; ভারতীয় দল—৪১৮ (৮ উইঃ)। লিসেষ্টার সায়ার—১০৬ ও ২৯১)

১৯৩৬ সালের ২০, ২১ ও ২২শে মে। খেলা ড্র। ভারতীয় দল—৪২৬ ও ১৭১ (৬ উইঃ) লিসেষ্টার—৩২৭ ও ৪৭ (কোন উইকেট না পড়ে)

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম স্কটল্যাণ্ড:

ভারতীয় ক্রিকেট দল ১ ইনিংস এবং ৫৬ রানে স্কটল্যাণ্ড-দলকে হারিয়ে দেয়। নবাব পতৌদী অসুস্থ থাকার দরুণ মার্চ্চেণ্ট ক্যাপটেন হন। ভারতীয় দল টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। হাজারী ১০২ রাণ করেন। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে ২৪৭ রাণ উঠে। স্কটল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ১০১ রাণে শেষ হয়। সারভাতে ৩০ রাণে ৫টা উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি স্কটল্যাণ্ডের মার্শাল, ক্লার্ক এবং হজকে চায়ের পর ৯০ রাণের মাথায় তৃতীয় ওভারের প্রথম তিন বলে 'বোণ্ড' করে 'hat-trick' করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর মোট এভারেজ দাঁড়ায়—১৫ ওভার, ২০ মেডেন, ৪২ রাণ এবং ৭টা উইকেট।

ভারতীয় ক্রিকেট দল—২৪৭ (হাজারী ১০২, সারভাতে ৩০। ম্যাক্‌কেনে ৯২ রাণে ৬ উইঃ)। **স্কটল্যাণ্ড—১০১** (এট্‌কিনসন ৫৯; সারভাতে ৩০ রাণে ৫ এবং হাজারী ৩৯ রাণে ৩ উইকেট) ও ৯০।

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম এম সি সি:

ভারতীয় দল এম সি সি দলকে এক ইনিংস এবং ১৯৪ হারিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

২৫শে মে বিখ্যাত লর্ডস মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপটেন এম-সি-সির ক্যাপটেন ভ্যালেনটাইনকে হারিয়ে নিজদলের মার্চ্চেণ্ট এবং মুস্তাক আলিকে ব্যাট করতে পাঠান। ৪০০০ হাজার দর্শকের সামনে খেলা সুরু হ'ল। প্রথম দিনের খেলার শেষে ভারতীয় দলের ৭ উইকেটে ৩৭৩ রাণ উঠল। মার্চ্চেণ্ট ১৪৮, হাজারী ৯৪ এবং মোদী ৪৮ রাণ ক'রে আউট হয়ে গেলেন। মার্চ্চেণ্ট তাঁর স্বাভাবিক দর্শনীয় খেলা দেখিয়ে পৃথিবীর খ্যাতনামা 'ওপনিং-ব্যাটসম্যানে'র মধ্যে অন্যতম প্রমাণ করলেন। ২৭শে মে দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করলেন হিন্দেলকার ও সারভাতে। তাঁদের প্রথম ইনিংস ৪৩৮ রাণে শেষ হ'ল, হিন্দেলকার ৭৯ রাণ করলেন। সারভাতে ২১ নট আউট রইলেন। নবাব পতৌদী অসুস্থ বোধ করায় খেলতেই নামেন নি। এম-সি-সি দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩৯ রাণে শেষ হ'ল। ইয়ার্ডলে দলের সর্ব্বোচ্চ ২৯ রাণ করলেন। অমরনাথ ৪১ রাণে ৪ এবং মানকাদ ৪০ রাণে ৩ টে উইকেট পেলেন। এম সি সি দলকে 'ফলো-অন' করতে হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৬০ রাণে ৩টে উইকেট পড়ে খেলা সে দিনের মত শেষ হ'ল। মানকাদ ১৩ রাণে ৩টে উইকেট পেলেন। বৃষ্টির দরুণ তৃতীয় দিনের খেলা দেরীতে আরম্ভ হ'ল। এম-সি-সি দলের দ্বিতীয় ইনিংসেও কোন সুবিধা হ'ল না। অমরনাথ এবং মানকাদের বোলিংয়ে এম-সি-সি দলের দারুণ ভাঙ্গন দেখা দিল। তাদের ১০৫ রাণে ইনিংস শেষ হ'ল। মানকাদ ৩৭ রাণে ৭ এবং অমরনাথ ৪২ রাণে ৩টে উইকেট পেলেন। অমরনাথ ব্যাটিংয়ে এবার তাঁর সুনাম অনুযায়ী সুবিধা করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর বল খুব কাজের হয়েছে। মানকাদের তুলনা নেই। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—এই তিনটাতেই তিনি চৌখস।

১৯৩২ সাল। ভারতীয় ক্রিকেট দল—২২৮ (সি-কে নাইডু ১১৮); এম-সি-সি—২০০ (৭ উইকেট; সি-কে নাইডু ৩১ রাণে ৪ উইকেট) বৃষ্টির জন্য দেড় দিনের খেলা বন্ধ করা হয়। খেলা ড্র যায়।

১৯৩৬ সাল। এম-সি-সি ৪ উইকেটে বিজয়ী হয়। এম-সি-সি: ৩৮২ (জে হিউম্যান ১১৫, হেণ্ডেন ৮৮, আর ওয়্যাট ৬৫, জে এ্যালেন ৫৪; ৭০ রাণে ব্যানার্জি ৩৬ইঃ) ও ৩৬ (কোন উইকেট না গিয়ে) ভারতীয় দল—১৮৫ (মুস্তাক আলি ৪৭) ও ২৩০ (জাহাঙ্গীর খাঁ ৮০ এবং ব্যানার্জি নট আউট ৪৭; সিমস ৬৪ রাণে ৪ উইঃ)

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম হাম্পসায়ার:

ভারতীয় ক্রিকেট দল ৬ উইকেটে হাম্পসায়ার দলকে হারিয়েছে।

হাম্পসায়ার—১৯৭ (জি হিল ৪৯; সি এস নাইডু ৩৩ রাণে ৩ উইকেট) **ও ১৪২** (বিলী ৫৬; হাজারী ১৮ রাণে ৪ উইঃ)

ভারতীয় দল—১৩০ (মানকাদ ৩০; নট ৩৬ রাণে ৭ উইঃ) ও ২১২ (৪ উইঃ মোদী ৪১, হাফেজ ৪০, মার্চ্চেণ্ট ৩৬)

১৯০২ সালে হাম্পসায়ার এক ইনিংস ১০৩ রাণে বিজয়ী হয়েছিল।

ভারতীয় দল : ৫১ ও ১১৯। হাম্পসায়ার : ২৭৩

১৯৩৬ সালে ভারতীয় দল ২ উইকেট বিজয়ী হয়।

ভারতীয় দল ১৯২ ও ১৯৯। হাম্পসায়ার : ২৩৮ ও ১৫১।

ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা ১লা মে থেকে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বিভাগের লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হয়ে গেছে। মোহনবাগান ক্লাব ১৪ খেলায় ২৫ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম আছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাদের খেলা ড্র গেছে। ইষ্টবেঙ্গল একটা কম খেলে ২২ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল ভবানীপুর ক্লাবের কাছে হেরেছে। তৃতীয় আছে ই-বি-রেলওয়ে, ১২ খেলায় ১৮ পয়েণ্ট। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ১২ খেলায় ১৭ পয়েন্ট হয়েছে। ভাবনীপুরের ১০ খেলায় ১৫ পয়েণ্ট। গত বছরের মত এবারও শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা চলবে এবং এই দুই দলের মধ্যে যে কোন এক দল লীগ বিজয়ী হবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয় বিভাগে মাড়োয়ারী ক্লাব উপস্থিত প্রথম এবং জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দ্বিতীয় যাচ্ছে।

* * * *

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন খেলায় এ বছর থেকে পুনরায় উঠা-নামা (Promotion & Relegation) চলবে বলে আই-এফ-এর সাধারণ সভায় স্থির হয়েছিল কিন্তু কোন বিশেষ সভায় উঠা-নামা এবারও বন্ধ থাকবে বলে বিবেচনা করা হয়। ফলে জুনিয়ার ক্লাবগুলির মধ্যে উত্তেজনা এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাদের অভিযোগ, যে অজুহাতে এতদিন লীগের খেলায় উঠা-নামা বন্ধ ছিল বর্ত্তমানে সেই অজুহাত অচল, যুদ্ধ শেষ হয়েছে সুতরাং এই উঠা-নামা পূর্ব্বের মতই এবার থেকে আই-এফ-এর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী চলা উচিত। এরূপ প্রকাশ, এ বছর থেকেই উঠা-নামা নাকি সুরু হবে।

বেতারে খেলাধূলার প্রচার ঃ

অনেকদিন হ'ল ক'লকাতার বেতার কেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষ ফুটবল খেলার মাঠ থেকে খেলার খবর প্রচার করে আসছেন। ইংরাজিতে খবর বলা হলেও বলার ভঙ্গিমা অশিক্ষিত জনসাধারণের মনেও খেলার গুরুত্ব বিস্তার ক'রে আশা এবং নিরাশার সঞ্চার করতে লক্ষ্য করেছি। এ ছাড়া বেতার কর্ত্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বাংলাতে খেলাধূলা সম্পর্কে বর্ক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করেছেন, উদ্দেশ্য খুবই ভাল। কিন্তু বক্তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বিষয়বস্তুকে পরিষ্কার ক'রে বলতে পারেন না এবং তাঁদের ভাষার জড়তা বিষয়বস্তুকে আরও দুর্ব্বোধ্য করে তোলে। আসছে বার থেকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করা হবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উপনিবেশ" (৩য় পর্ব)—২৲
শ্রীচরণদাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "তেপান্তর"—২৲
শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত "এই বিংশ শতাব্দী"—১৷৹
শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় প্রণীত উপন্যাস "হাওয়ার নিশানা"—৩৲
জসীম উদ্‌দীন প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "রূপবতী"—১৷৹
সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মণিপুরের যুদ্ধ"—১৷৹, "জাপানের বন্দী"—৸৴৹
প্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস "বঁধুয়া মিলাল বিধি"—২৷৹
শ্রীনবীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত "বাংলার কুটীর শিল্প"—৷৴৹
অনিলকুমার ভট্টাচার্য প্রণীত গল্পগ্রন্থ "অন্নকূট"—১৷৹
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "তোমাদের সুভাষচন্দ্র"—৩৲
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত গল্পগ্রন্থ "ঘুম"—২৲
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "বাংলার নারীজাগরণ"—১৷৹
মণীন্দ্র দত্ত প্রণীত "নতুন যুগের রূপকথা"—৸৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "জয় পরাজয়"—১৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটিকা "বিদ্রোহী"—৷৹
শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "অদ্ভুত ভাগ্যচক্র"—১৷৹
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস প্রণীত ভ্রমণকাহিনী "ইয়োরোপা"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

সাঁঝের পল্লী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



শ্রাবণ—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ্-ডি

(১)

রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্য্যায়ের রচনাগুলি—'প্রান্তিক' (জানুয়ারি, ১৯৩৮), 'আকাশ-প্রদীপ' (এপ্রিল, ১৯৩৯), নবজাতক (এপ্রিল, ১৯৪০), 'সানাই' (জুন, ১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (জানুয়ারি, ১৯৪১), 'আরোগ্য' (মার্চ্চ, ১৯৪১), জন্মদিনে (এপ্রিল, ১৯৪১) ও 'শেষলেখা' (আগষ্ট ১৯৪১)—এই কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রকাশিত কবিতা-সমূহ ঠিক কালানুক্রমিক পর্য্যায়ে বিন্যস্ত হয় নাই—অনেক পুরাতন রচনা পরবর্ত্তীকালে মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ কবির জীবনের শেষবৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষলেখা'য়—রচনার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই, সমস্ত রচনায় প্রায় একই ধারার অনুবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থগুলি সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে উহাদের মধ্যে নূতন আরম্ভের সূচনা ও পূর্ব্বারব্ধ সুরের পরিণতি অনুভূত হয়। 'পূরবীতে' কবির কাব্যে যে আসন্ন বিদায়ের ম্লান গোধূলিচ্ছটা সংক্রামিত হইয়াছে, মহাপ্রস্থানের যে ভূমিকা রচিত হইয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী রচনাসমূহের মূল সুর নির্দ্দেশ করে। আর গদ্য কবিতায় তিনি যে নূতন পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আবেগের সুর না চড়াইয়া, ছন্দের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ও ঝঙ্কারের সাহায্য না লইয়া, গভীর হৃদয়ানুভূতির সহজ নিরাভরণ অভিব্যক্তি দ্বারা তিনি যে চিরাচরিত কাব্যরীতির আমূল সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তাঁহার সমস্ত পরবর্ত্তী-রচনায় অল্পাধিক পরিমাণে মুদ্রিত হইয়াছে। 'বলাকা'তে সর্ব্বপ্রথম তিনি ক্রমপ্রসারণীল ভাবোচ্ছ্বাসের অনুবর্ত্তনের নিগূঢ় প্রয়োজনে, নিয়মিত ছন্দবিন্যাসের বন্ধন অস্বীকার করেন ; পরবর্ত্তী কাব্যসমূহে এই অনিয়মিত, মাত্রামুক্ত ছন্দের সাহায্যে তিনি জীবনের সাধারণ আবেষ্টনীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত নীচু সুরের বিক্ষিপ্ত আবেগ ও ভাব-রোমন্থনের সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গী সৃষ্টি করিয়াছেন। গদ্য কবিতায় একেবারে ছন্দ বর্জ্জন করিয়া কেবল ভাবের অন্তর্নিহিত আবেদনের উপর নির্ভরশীল হইয়া তিনি দুঃসাহসিকতায় চরম পরীক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন। শেষজীবনের কবিতাগুলিতে তিনি আবার ছন্দবর্জ্জনের আতিশয্য পরিহার করিয়া মধ্যপথ অনুসরণ করিয়াছেন। এই দীর্ঘবর্ষব্যাপী পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার পরিণত ফল তাঁহার শেষ রচনাগুলির আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'নবজাতকের

দুই একটি কবিতাতে নূতন সুরের ইঙ্গিত মিলে, কিন্তু এই অভিনবত্বের প্রত্যাশা পরবর্তী রচনায় পরিণতি লাভ করে নাই। এই সমস্ত কবিতার অন্তরলোকের প্রেরণা আসিয়াছে 'পূরবীর' পূর্ব্বস্মৃতি-পর্য্যালোচনার উন্মনা, বিদায়-ব্যথায় অশ্রু-আভাসে করুণ, চরম প্রস্তুতির প্রশান্তিতে স্থির মনোভাব হইতে; ইহাদের বহিরঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে 'বলাকা' হইতে 'পুনশ্চ' ও 'শ্যামলী' পর্য্যন্ত প্রসারিত ছন্দো-পরীক্ষার ফল-বিচারের দ্বারা।

অশীতিবর্ষে সমাসন্ন কবির এই রচনাগুলি আরও একটি কারণে পাঠকের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্রেক করে। কবিরা চির-তারুণ্যের প্রতীক্ ও চির-সুন্দরের উপাসক হইলেও জরার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কল্পনার সরসতা শুষ্ক হয়, ও তাঁহারা সচরাচর মৌলিক বিকাশ ছাড়িয়া অতীত সুরেরই পুনরাবৃত্তি করেন। যে সমস্ত ইংরেজ কবি—যথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দীর্ঘজীবী ছিলেন তাঁহাদের শেষ বয়সের কবিতায় শুষ্ক, বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তির প্রভাব লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহার শেষ কবিতাগুলির মধ্যেও কল্পনার সাবলীল স্ফূর্ত্তি, প্রতিভার বিস্ময়কর মৌলিকতা, স্বচ্ছ ও গভীর-স্তর-প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বার্দ্ধক্যের পরিণত অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবনদর্শন অক্ষুণ্ণ, অম্লান সৌন্দর্য্যবোধের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদিগকে অপরূপ অর্থগভীরতা-মণ্ডিত করিয়াছে। কাজেই এই কবিতাগুলি, তাহাদের সহজ কাব্যোৎকর্ষ ছাড়াও, দুঃসাধ্যসাধনের যে অতিরিক্ত মর্য্যাদা আছে, তাহা লাভ করিয়াছে।

এই কবিতাগুলির মধ্যে দুইটা বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, দার্শনিক দিব্যদৃষ্টির আশ্চর্য্য স্বচ্ছতা ও প্রসার; দ্বিতীয়, কাব্য-সাধনার উপর কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক রোগের অনুভূতির প্রভাব। এই দুইটা গুণই ইহাদের অনন্যসাধারণ আবেদনের হেতু। দার্শনিকতা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায় নূতন আবির্ভাব নহে—তাঁহার মধ্যবয়স হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রচনাই ইহার রহস্যবোধে নিবিড়, ইহার সাঙ্কেতিকতার কম্পমান আলোকে চঞ্চল। তিনি আমাদের এই জড়ধর্ম্মী, অভ্যাসের অনুবর্ত্তনে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে আবদ্ধ, অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন জীবন যাত্রার মধ্যে প্রাণশক্তির বিচিত্র, সদা—জাগ্রত লীলা, অসীমের বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় ক্ষণিক আভাস-ইঙ্গিত ও মুহুর্মুহ স্পর্শ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অগণিত রন্ধ্র পথে ভাব-বিনিময় ও নিবিড় একাত্মতা-বোধ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে দার্শনিক অনুভূতির যত সহজ ও সর্ব্বসঞ্চারী প্রসার, পৃথিবীর অন্য কোনও কবির রচনায় তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ। যে সমস্ত কবির কাব্যে দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্য, যাঁহারা কবিতার মধ্য দিয়া দার্শনিক সমস্যার বিচার ও আলোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার কবিতা হইতে হয়ত জীবনসম্বন্ধে একটা বিশেষ মতবাদ সঙ্কলন করা যায়, কিন্তু ইহা তাহার কাব্যে গৌণ, মুখ্য নহে। তিনি কবিতার মধ্য দিয়া দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আসল স্বরূপকে—ইহার বহিরাবরণ-ভেদকারী দিব্যানুভূতি, জীবনকে অপার্থিব জ্যোতিতে রঞ্জিত ও অপ্রত্যাশিত অর্থগূঢ়তায় মহিমান্বিত করার সহজ প্রবণতা, অসীমের প্রতি আকুতি, অপ্রাপণীয়ের অনুসরণের ব্যাকুলতাকে—সৌন্দর্য্যময় অভিব্যক্তি দিয়াছেন; বাক্যমনের ধারণাতীত রহস্যবোধকে রূপের জালে বন্দী করিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিকতা তত্ত্ব-প্রতিপাদন নহে, নূতন সত্য ও অনুভূতির চমকপ্রদ আবিষ্কার। বস্তুতঃ দার্শনিক কবির আদর্শ অতিশয় দুরধিগম্য। চিন্তার মৌলিকতা, সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় ভাব-ব্যঞ্জনার সহিত কাব্য-সৌন্দর্য্য ও সার্থক রূপায়নের সমন্বয় সাধন খুব কম কবিরই সাধ্যায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথ যে এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে দার্শনিক-ভাবপ্রবণ কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে।

দার্শনিক অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্থায়ী উপাদান হইলেও 'প্রান্তিক' হইতে যে পর্য্যায়ের আরম্ভ তাহার মধ্যে এই সুরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এতদিন দার্শনিক মনোভাবের প্রধান উপজীব্য ছিল এক পলাতক, মুহুর্মুহ আবির্ভাব-বিলয়শীল সত্তার অনুসরণ; ইহার মধ্যে লুকোচুরি খেলার লীলা, ধাঁধালাগানো অনুভূতির বিদ্যুচ্চমক, পুলকিত বিস্ময় ও ক্ষণিক বিষাদের দোলা, পূর্ণ উপলব্ধির পরিবর্ত্তে আভাস-ইঙ্গিতের আলো-ছায়ার কম্পন—এক কথায় কৌতূহলী তরুণ কবিচিত্তের উপর রহস্যবোধের ইন্দ্রজাল-রচনা—ইহাদেরই প্রাধান্য ছিল। ইহাদের মধ্যে গভীর সত্যের যে ব্যঞ্জনা তাহা যেন ক্রীড়াচ্ছলে, লঘু চপল গতি-ভঙ্গীতে, নৃত্যচ্ছন্দে কবির অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। জীবনের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ লইয়া কবি একদিন যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যের শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস শুভ্রতা যেন কল্পনার ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত ও পরিবর্ত্তনশীল ভাবের আন্দোলনে আবেগ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব-হিসাবে 'প্রান্তিকে' যে সত্য আলোচিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতার আলোচনার সহিত অভিন্ন। কিন্তু আলোচনার ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্। যে সত্যকে কবি এতদিন ক্রীড়াচ্ছলে আবাহন করিয়াছেন, লীলা-সঙ্গিনী-রূপে-কল্পনা করিয়া যাহার সঙ্গে প্রীতি-স্নিগ্ধ, পরিহাস-মধুর সম্পর্ক রচনা করিয়াছেন, বিস্মৃত-যবনিকার অন্তরাল হইতে যাহার হাতছানি তাঁহাকে রহিয়া রহিয়া উন্মনা করিয়াছে, জীবনের সীমান্তরেখায় দাঁড়াইয়া আজ তাহাকে তিনি নূতন মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। লঘু, তরল সুরের পরিবর্ত্তে উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বিস্মিত কৌতূহলের পরিবর্ত্তে স্থির, নিঃসংশয় উপলব্ধি, অনুযোগ-ক্ষোভ-গুঞ্জনের পরিবর্ত্তে নিরাসক্ত, প্রসন্ন অভিনন্দন—পরিবর্ত্তনের ধারা সূচিত করে। এ যেন শুভ্র, অখণ্ড তুষার-আবরণের নীচে তরঙ্গ-চাঞ্চল্যের সমাধি, কম্পিত, বিচ্ছিন্ন আলোক-রশ্মিসমূহের অচঞ্চল কেন্দ্রসংহতি। 'প্রান্তিকের' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে মৃত্যুর প্রতি এই মনোভাব খাঁটি ক্লাসিকাল রীতির প্রশান্ত, অনাবিল মহিমায় সুস্পষ্ট, জড়িমাহীন অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ একদিকে রোমান্টিক মনের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সহিত ক্লাসিকাল রচনার স্বচ্ছ, প্রসাদগুণ-সমৃদ্ধ প্রকাশভঙ্গীর, অপরদিকে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সহিত কাব্যসৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ সার্থক সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

'প্রান্তিকে' মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যে মতবাদ অভিব্যক্ত করিয়াছেন,

তাহা ভারতীর সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংশ, উপনিষদ ও গীতার সত্যদ্রষ্ট্রা-ঋষিদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। মৃত্যু যে জীবনের খণ্ডিত পরিচয়কে সম্পূর্ণ করে, আত্মার আদিম বিশুদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধারের দ্বারা জীবন প্রক্ষিপ্ত ক্লেদ-গ্লানি মুছিয়া লয়, বিশ্বজগৎ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সহিত ইহার প্রচ্ছন্ন আত্মীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, রঙ্গালয়ের অভিনেতার ছদ্মবেশ ত্যাগের ন্যায় জীবনের নানাবর্ণরঞ্জিত আবরণীকে পরিহার করাইয়া ইহাকে একাকীত্বের নিঃসঙ্গ মহিমার শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে—এই সমস্ত ভারতীয় দর্শনের চিরপরিচিত সত্যকে কবি নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছেন ও অপরূপ কবি-কল্পনার সাহায্যে ইহাদিগকে কাব্য-সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করিয়া অরূপকে রূপের ইন্দ্রজালে বন্দী করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষির জয়গীতি, নব আবিষ্কারের উদাত্ত ঘোষণা সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে, এক বিংশ শতাব্দীর কবির কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নহে, ব্যাখ্যাতার বুদ্ধিপ্রধান আলোচনা নহে, উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ, রক্তধারার গোপনপ্রবাহে সঞ্চারিত, অধ্যাত্ম চেতনার নব উন্মেষ।

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সঞ্চয় হইতে বিদায় গ্রহণের বেদনা কবি তাঁহার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সংশয়লেশহীন বিশ্বাসের সাহায্যে জয় করিয়াছেন। মৃত্যুর আসন্ন আবির্ভাবকে কবি প্রশান্ত স্বীকৃতির সহিত বরণ করিয়া লইয়াছেন—পূর্ব্ব কবিতার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, অপরিতৃপ্ত কৌতূহল, পরিচিতকে বিসর্জ্জন দিয়া অপরিচিতের দিকে নিরুদ্দেশ-যাত্রার উৎকণ্ঠিত উত্তেজনা, বিশ্ববিধানের রুদ্ধদ্বারে আবেগকম্পিত করাঘাত, সাগর সঙ্গমের অতিসন্নিহিত নদীস্রোতের ন্যায়, তাহাদের সমস্ত কলকাকলী শান্ত নীরবতার মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছে। কবি নিরাসক্ত উদাসীনতার সহিত তাঁহার অন্তিম-চেতনালগ্ন ব্যক্তিজীবনের ক্রমবিলীয়মান সত্তার ছবি আঁকিয়াছেন। জীবনের অযাচিত দান, অজস্র ঐশ্বর্য্যের প্রতি প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন; নিজ অস্তিত্বের অকুণ্ঠিত জয়ঘোষণা করিয়াছেন; খ্যাতি-লোলুপতা, পরমতের মানদণ্ডে নিজের মূল্য যাচাই করিবার দীনতা নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছেন; জীবনের রূক্ষ পথে যে অসীমের স্পর্শ রহিয়া রহিয়া তাঁহার সত্য পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করিয়াছিল, সেইগুলিকে ধারাবাহিকতার সূত্রে গাঁথিয়াও জয়মাল্য রচনা করিয়া কণ্ঠে পরিয়াছেন ও জন্মমুহূর্ত্তের আধ্যাত্মিক আভিজাত্য যেন তাঁহার মৃত্যুকালে অক্ষুণ্ণ থাকে এই প্রার্থনা জানাইয়া তিনি চিরবিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কবির ভাষা এই মহিমাময় অনুভূতি ও চিন্তাপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন, এই চেতনাপ্রান্তবাহী, ক্ষুরধারার ন্যায় তীক্ষ্ণ, দুর্গম পথে চলিতে ভাষার অসহযোগিতার জন্য একবারও তাঁহার পদস্খলন হয় নাই। ত্রিংশবর্ষবয়স্ক ইংরেজ কবি শেলি তাঁহার কাব্য-সমাপ্তির তোরণ-দেশে "জীবন কি?" এই অমীমাংসিত প্রশ্ন ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন। অশীতিবর্ষ-দেশীয় প্রাচ্য কবির শেষ রচনায় এই দুঃসমাধেয় প্রশ্নের যে উত্তর মিলিয়াছে তাহার অপেক্ষা সন্তোষজনক মীমাংসা কোন মানব কবির লেখায় মিলিবার আশা করা যায় না।

(২)

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রচিত গ্রন্থগুলির—'আকাশ-প্রদীপ,' 'নব-জাতক' ও 'সানাই'এর মধ্যে 'প্রান্তিকে'র এই সুর-গাম্ভীর্য্য শোনা যায় না। কবির কল্পনার সহজ মহিমা ও লঘু, পরিহাস-তরল সুরটি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নূতন আরম্ভের সূচনা কিছু কিছু অনুভূত হয়, কিন্তু এই সূচনাপূর্ণ পরিণতি পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। এই অভিনব সুরের লক্ষণের মধ্যে (১) প্রাত্যহিক জীবনের বিচ্ছিন্ন-বস্তু-বহুল ভূমিকার মধ্যে গভীর ভাব-ব্যঞ্জনা ও অসীমের অনুভূতির সহজ প্রতিষ্ঠা, (২) আগামী যুগের জীবন ও কাব্যচ্ছন্দের পূর্ব্বাভাস ও আধুনিক যুগের প্রয়োজনমূলক যান্ত্রিকতার কাব্যাভিষেক এবং (৩) অলস, শিথিল, কাব্য-সাধনার নিবিড় ঐকান্তিকতার আদর্শ হইতে স্খলিত, কল্পনার স্বচ্ছন্দবিহার ও পলাতক, ক্ষণস্থায়ী ভাবানুভূতিসমূহের (moods) সার্থক রূপায়ন ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য (১) ও (৩) শ্রেণীর কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঠিক নূতন আবির্ভাব বলা যায় না; তবে ইহাদের পৌনঃপুনিকতা ও এই সুর আবাহনে কবির সিদ্ধহস্ততা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। দ্বিতীয় সুরটী 'নবজাতক', 'পক্ষীমানব', ও 'সাড়ে নটা'—এই তিনটি কবিতায় বিস্ময়কর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 'নবজাতকে' আগামী যুগের মানবের মধ্যে যে আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহার প্রত্যুদ্গমন ধ্বনিত হইয়াছে। 'পক্ষীমানবে' যে আকাশবিমান বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের মধ্যে বীভৎস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবি তাহাকে শাশ্বত সৌন্দর্য্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের দিক্ দিয়া ধিক্কৃত করিয়াছেন—আকাশের অসীম শান্তি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের স্নিগ্ধ দীপ্তির সহিত তাহার আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন। উড়োজাহাজ সম্বন্ধে আধুনিক ইংরেজ কবিদের রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! Spenderএর 'On an Aerodrome' কবিতাটী সচেষ্ট পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-সমষ্টির সন্নিবেশ মাত্র—শেষের দিকে সামান্য একটু ভাবোচ্ছ্বাস, একটু মৃদু প্রতিবাদ প্রয়াস বস্তুপুঞ্জের দ্বারা অভিভূত হইয়া ব্যর্থপ্রায় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আলোচনাটাকে যে উচ্চ কবি-কল্পনা ও উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন, ইংরেজ কবির পদাতিক, তথ্যভারাবনত কল্পনা সেখানে পৌঁছায় না। 'সাড়ে নটা'র কবি বেতারের বিদ্যুৎবাহিনী সঙ্গীতধারাকে বাস্তব তুচ্ছতার সংস্পর্শহীনা আদর্শ লোকবাসিনী অভিসারিকার ও মেঘদূতের যক্ষের বিরহগাথার তুলনা করিয়া প্রয়োজনমূলক আবিষ্কারকে সৌন্দর্য্যলোকে উঠাইয়াছেন, কাজের জিনিসকে কাব্যে স্থান দিয়াছেন। আধুনিক বস্তুতন্ত্রতা কেমন করিয়া কবি-কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত হইতে পারে, কেমন করিয়া ইহা প্রয়োজনের যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত বাঁধা পথ ছাড়িয়া সৌন্দর্য্যের লীলা বিসর্পিত শোভাযাত্রায় স্থান গ্রহণ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি তাহার চমৎকার প্রমাণ। আধুনিক ইংরেজ কবির মধ্যে কেহ কেহ—যেমন Louis Mac Nieoe ও Spender—ট্রেণের গতি সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহারা বস্তুলোক ছাড়াইয়া রূপের সঙ্কেত-লোকে

পৌঁছায় নাই। সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে কাব্যের আত্মীয়তা-স্থাপনের সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় যে এই সম্ভাবনা সার্থক হইয়াছে তাহা দাবী করা যায়।

প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর অনেকগুলি সুন্দর কবিতা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'আকাশ-প্রদীপে'—'ধ্বনি', 'বধূ'. 'জল', 'নামকরণ' 'তর্ক'; 'নবজাতকে'—'এপারে-ওপারে' 'রাত্রি', 'অস্পষ্ট' 'সানাইএ' 'সানাই'—এই সমস্ত কবিতা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটাতে অবচেতন মনের অতি সূক্ষ্ম, অনির্দ্দেশ্য অনুভূতি, মোহাবেশের ক্ষণস্থায়ী, রঙ্গীণ বুদ্‌বুদগুলি কল্পনার মায়াতন্তু নির্ম্মিত জালে ধরা পড়িয়া শব্দ-ধ্বনি-ময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ('অস্পষ্ট', 'রাত্রি'—নবজাতক)। কতকগুলিতে পূর্ব্ব স্মৃতি রোমন্থনের শিথিল অবকাশপথে সঞ্চরণশীল আপাতদৃষ্টিতে অসংবদ্ধ টুকরা টুকরা খণ্ড সৌন্দর্য্যের সমাবেশ এক গভীর, সার্ব্বভৌম সত্যের ব্যঞ্জনায় অর্থগৌরব ও রূপসংহতি লাভ করিয়াছে—'আকাশ প্রদীপের' 'ধ্বনি', 'বধূ', 'জল' 'তর্ক' প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। 'নামকরণ' কবিতাটীতে একটা অকারণ খেয়ালের মাধ্যমে যে গভীর, সর্ব্বব্যাপী সৌন্দর্য্যবোধ, নারীর রূপ মহিমার যে অতলস্পর্শ, নিখিলপ্রসারী রহস্যগূঢ়তা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বিরল। 'এপারে-ওপারে' ('নবজাতক') ও 'সানাই' ('সানাই') কবিতায় বাস্তব জীবনের বিশৃঙ্খল, সৌন্দর্য্য সুষমাহীন, পুঞ্জীভূত বস্তুস্তূপের চাপে ক্ষুব্ধ প্রতিবেশে অকস্মাৎ এক নিবিড় অনুভূতি বা অসীমের ব্যঞ্জনা। কালোর নিকষে সোনার আলোর ন্যায়, উদ্ভাসিত হইয়াছে—বিপরীত পটভূমিকায় ইহাদের আবেদন মধুরতম হইয়া উঠিয়াছে। 'প্রথমোক্ত কবিতায় বাঙ্গালী সংসার যাত্রার স্থূল কর্ম্মপ্রচেষ্টা, ইতর আমোদ প্রমোদ ও জীবনের মুহূর্মুহূ পরিবর্ত্তনশীল গতিচ্ছন্দের ভিতর দিয়া যে সরল, সহজ প্রাণপ্রবাহ হিল্লোলিত হইয়া উঠে—কবি তাহার সহিত নিজের আত্মকেন্দ্রিক, প্রাণের গতিশীলতা হইতে বুদ্ধিবাদের উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে উৎক্ষিপ্ত জীবনের তুলনা করিয়া সামান্যের স্পর্শের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন—কবির এই মৃদু আকৃতির স্পর্শে শ্রীহীনতাও কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। 'সানাই'এ বিবাহ-বাড়ীতে অশোভন লোলুপতা, উর্দ্ধশ্বাস ব্যস্ততা, নানাবিধ উপকরণ-বাহুল্য ও প্রতিবেশের কুশ্রীতার মধ্যে সানাইএর সুর অমর্ত্ত্যলোকের এমন একটা ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা বহন করে, যাহার প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত অসঙ্গতি, সমস্ত রূঢ় ছন্দোহীনতা এক অলক্ষ্য অন্তর্গূঢ় সুষমায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটা কবিতায় প্রথম দিকের অসংলগ্ন, অপরিমিত বস্তু সমাবেশ পরিণতির মানদণ্ডে সার্থক কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছে—কবি কুৎসিতকে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সোপানরূপে ব্যবহার করিয়া কুৎসিতের কাব্য প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আগুন জ্বালানোতেই কাষ্ঠস্তূপের সার্থক অস্তিত্বের সমর্থন। অবশ্য এই রকমের কবিতায় সর্ব্বত্র যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহা বলা যায় না। অনেক স্থলে ইন্ধনের অবিন্যস্ত প্রাচুর্য্যের জন্যই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয় নাই। কবি-কল্পনা আগুন জ্বালাইবার জন্য যে ফুৎকার দিয়াছে তাহা যথেষ্ট শক্তিশালী নহে; সময় সময় মনে হয় যে কবির এ বিষয়ে ইচ্ছারই অভাব। 'সানাই'এর "বাসাবদল' কবিতাটার উদ্দেশ্য বোধ হয় নিছক তথ্যবিবৃতি। ইহার পিছনে কোন কাব্য-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস বা গভীর অনুভূতি স্ফুরণ দেখা যায় না। "দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের ব্যাণ্ডের মত"—এই উপমার মধ্যে যে ছবির আভাস তাহা Eliot এবং "Ke a patient etherised upon a tableর" সহিত সাদৃশ্য মনে মনে পড়াইয়া দেয়। Eliot এর সমস্ত কবিতাটীতে ধূসর ক্লান্তির ও অর্থহীন, যান্ত্রিক জীবনযাত্রার শূন্যতা এক তীব্রভাবে পরিকল্পিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেকটী রেখা, প্রত্যেকটী উপমা ভাবসংহতির প্রয়োজনে সার্থক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের খোঁড়া কোন দিন বিকৃত প্রতিবেশের অঙ্গীভূত হয় নাই—ইহা কেবল খঞ্জ কল্পনার বাহন মাত্র। আর মনে হয় যে এই খঞ্জত্বের অভিনয় কবির সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত—তাঁহার কল্পনার উচ্চৈঃশ্রবা কেবল খেয়ালের বশে পঙ্গু সাজিয়াছে। "অনসূয়া" কবিতাটীতে প্রথমদিকের ক্লেদ ও আবর্জ্জনার স্তূপীকরণের সহিত শেষ দিকের প্রেমের কল্পলোকরচনার কোন সার্থক যোগ অনুভব করা যায় না—কবি যেন কেবল ডানার জোর দেখাইবার জন্য পচা নর্দ্দামা হইতে অতীত যুগের স্মৃতি-সুরভিত ভাব-রাজ্যের স্বচ্ছনীল আকাশে উড্ডীন হইয়াছেন। এই কবিতাগুলিকে প্রতিভার দুঃসাহসিক পরীক্ষা বা অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ের জন্য অসাফল্যের নিদর্শনরূপে ধরা যাইতে পারে। 'আকাশ প্রদীপে' 'ময়ূরের দৃষ্টি' ও 'কাঁচা আম' গদ্যচ্ছন্দ বা ছন্দোহীনতায় প্রত্যাবর্তন। এই দুইটা কবিতাতে কবিত্বের প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্যকণা ছন্দসঙ্গীতের চাপে নিবিড়তা লাভ করে নাই। ইহাদের মধ্যে নীহারিকাপুঞ্জের অস্থির ঝলক, তারকার সংহত-রশ্মি, সম্পূর্ণমণ্ডল দীপ্তিতে পরিণত হয় নাই। (আগামী বারে সমাপ্য)



বিবেক

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি প্রায় এগারোটা।

কালীঘাটগামী লাষ্ট্ ট্রামখানির ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্ট-মেণ্টের সামনের দিকের একটি সিটে ইন্দ্রনাথ চুপ ক'রে বসেছিল। তার লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—পাশের এক বৃদ্ধ আরোহীর পানে। চলন্ত ট্রামের ফুরফুরে বাতাসে বৃদ্ধ অনিচ্ছা সত্বেও একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'যে পড়েছিলেন। অনেকক্ষণ থেকেই বসে বসে তিনি ঢুলছিলেন, এখন ট্রামের গতি বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঢুলনিও বেশ বর্দ্ধিত হতে লাগলো। হঠাৎ একসময় তাঁর ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্রকায় স্যুট্কেশটি—যেটি অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে তিনি নিযে যাচ্ছিলেন, নীচে পড়ে গেল।

ইন্দ্রনাথের চক্ষু দুটি সহসা উজ্জ্বল হযে উঠলো।

সামান্য মাইনের কেরাণী সে, সংসারের নিত্যকার অভাব-অভিযোগের জ্বালায় অস্থির। সুতরাং সেই সব অভাবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাকে অনেক কিছুই করতে হয়। কথাতেই আছে—'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' ইন্দ্রনাথেরও হ'যেছে তাই। প্রথম প্রথম সে একটু অস্বস্তি বোধ করতো—বিবেক তার বাধা দিত, কিন্তু এখন এসব ব্যাপারে সে রীতিমত অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তার মতে—যুদ্ধের বাজারে সকলেই যখন তাল বুঝে যথাসাধ্য দু'পয়সা কামিযে নিচ্ছে—ভালো মন্দ ধর্মাধর্ম কেউই যখন বিচার করছে না, তখন সেই বা কেন ধর্মের ভয়ে হাত গুটিযে বসে থাকবে? তার ওপর এ কারবারে মূলধনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, শুধু একটু বুদ্ধি আর সাহস থাকলেই ব্যস্…কাজ সাফাই।

বৃদ্ধের স্যুট্কেশটি পড়ে যেতেই ইন্দ্রনাথ বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। স্যুটকেশের মধ্যে যে মূল্যবান কিছু আছে সে সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না; বৃদ্ধের সাবধানতাই সে বিষয় তাকে সজাগ ক'রে দিয়েছিল। একবার লোলুপ দৃষ্টিতে সে স্যুটকেশটার পানে তাকালে…এমন সুযোগ উপেক্ষা করা সমীচীন নয়! ট্রামের অন্যান্য যাত্রীদের দিকে একবার সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলে—নাঃ, তার ওপর কারো নজর নেই! তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এক সময় সে ত্রস্ত হাতে স্যুটকেশটা তুলে নিযে গম্ভীরভাবে ট্রামের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং ট্রামের গতি একটু মন্থর হ'তেই ঝাঁ ক'রে নেমে পড়লো।

কিন্তু তার গন্তব্য স্থান যে এখান থেকে অনেকখানি—সেই কালীঘাটের শেষ প্রান্তে। এত রাতে এরকম অবস্থায় এতটা পথ হেঁটে যাওয়া কি উচিত?

ঠিক সেই সময় একটা রিক্সা পথের অপর প্রান্ত দিযে চৌরঙ্গী অভিমুখে ঠুং ঠুং ক'রে চলেছিল।

ইন্দ্রনাথ রিক্সাটা দেখতে পেযেই ডাক্ দিলে—'এই রিক্সা, এই…ভাড়া যাবি?'

—'কেনো যাবে না বাবু।' রিক্সাওয়ালা রিক্সা ঘুরিযে তার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলে—'কুথা যাইতে হ'বে বাবু?'

—'শা'নগর। কত নিবি?'

—'দশআনা বাবু।'

—'দশআনা! আচ্ছা ঠিক হ্যায়—চল্।'

ইন্দ্রনাথ রিক্সায় উঠে বসল। দর কসাকসির সময় তার নেই—এখন যা হোক ক'রে বাড়ী পৌঁছুতে পারলে হয়।

রিক্সায় বসে অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর অন্য একটা চাবির সাহায্যে টানাটানি করতে করতে সে স্যুটকেশটা এক সময় খুলে ফেললে। স্যুটকেশের মধ্যে কি বস্তু আছে তা না জানা পর্যন্ত সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। স্যুটকেশের ডালাটা মুক্ত হ'তেই আনন্দে তার চক্ষু দুটি জ্বল জ্বল ক'রে উঠলো।…স্যুটকেশটি বহুমূল্য স্বর্ণালংকারে ও বাণ্ডিল বাঁধা নোটে প্রায় পরিপূর্ণ। গহনাগুলি সবই নূতন!

ইন্দ্রনাথ ভাবলে—ভদ্রলোক হয়ত' নিজ কন্যার কিংবা কোনও আত্মীয়-কন্যার বিবাহের জন্যই এসব তৈরী করিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন! তার মুখে এক প্রকার অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো। কার জিনিস, কার ভোগে আসে!…একজন হয়ত' সারাজীবন কতো পরিশ্রম ক'রে খেয়ে না খেয়ে উপায়ের পয়সা জমিয়ে রেখে গেল, আর একজন নিশ্চিন্ত

আরামে তা ভোগ করতে লাগলো। দুনিয়ার নিয়মই এই! লোকটি হয়তো···

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা সরু গলির দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে রিক্সাওয়ালাকে সম্বোধন ক'রে ব'লে উঠলো—'এই রোখো, রোখো। ব্যস্ ব্যস্, আর নয়।'

রিক্সা থামতেই সে সুটকেশটা শক্ত ক'রে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে নেমে পড়লো এবং রিক্সাওয়ালার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েই দ্রুতপদে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

খানিকটা যেতে না যেতেই পিছন থেকে কার আহ্বান শোনা গেল—'বাবু, বাবু।'

ফিরে তাকাতেই দেখলে—রিক্সাওয়ালাটা ছুটতে ছুটতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে দাঁড়িয়ে পড়লো। রিক্সাওয়ালাটা হাঁপাতে হাঁপাতে তার সামনে এসে বললে—'বাবু, আপনি এইটো রিক্সায় ছেড়ে আইছিলেন।' বলেই একখানি দশটাকার নোট সে তার দিকে এগিয়ে দিলে।

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে নির্বাক। এও কি সম্ভব···এমন অপূর্ব সুযোগ পেয়েও এই দরিদ্র লোকটা তা গ্রহণ করতে চায় না! এর কাছে দশ টাকার মূল্য ও' অল্প নয়! তবুও··· কে যেন তার পিঠে সজোরে একটা চাবুক বসিয়ে দিলে। রিক্সাওয়ালার পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সে যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলা দিয়ে কথা বেরুলো না। রিক্সাওয়ালা তার হাতে নোটখানা গুঁজে দিয়ে একগাল হেসে বললে—গরীব আদিমী বাবু, রিক্সা টেনে খাই, লেকেন চুরি জুয়াচুরি কভি করা নেই। অধর্মকা পয়সা ভোগ হোতা নেই বাবু। আচ্ছা বাবু যাতা হ্যায়।

রিক্সাওয়ালা চলে গেল। ইন্দ্রনাথের পা' দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে এঁটে দিয়েছে। স্থির নির্ণিমেষ নেত্রে রিক্সাওয়ালার গমন পথের পানে সে চেয়ে রইলো। তার মুঠির বাঁধন শিথিল হ'য়ে সুটকেশটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল।···

যুদ্ধোত্তর বৃটেন ও অ্যামেরিকার রাসায়নিক শিল্প

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এম্-এস্‌সি

আপনারা অনেকেই জানেন দ্বিতীয় মহাসমর সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে ও পরে বিভিন্ন মিশন ও কমিশনের সভ্যরূপে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি বিলাত ও অ্যামেরিকায় গিয়াছিলেন নূতন জ্ঞান-আহরণের জন্ত। ভারতীয় রাসায়নিক শিল্প সমিতির প্রতিনিধিরূপে এবার আমারও বিলাত এবং অ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনের সুযোগ লাভ হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাসমর বিশ্ববাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখিয়ে দিয়েছে যে কারও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্ত অপরের উপর নির্ভর করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। এই সত্য উপলব্ধি ক'রে তাকে কার্য্যে পরিণত ক'রতে অ্যামেরিকাবাসী যতদূর অগ্রসর হয়েছে তার তুলনা মেলা শক্ত। বিলাত ও অ্যামেরিকার যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি তাহা অধিকাংশই রাসায়নিক-সংক্রান্ত এবং এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা:—(১) হেভী বা ভারী কেমিক্যাল কারখানা, (২) ফাইন্ কেমিক্যাল কারখানা ও (৩) কেমিক্যাল যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান।

অনেকেই সম্ভবতঃ জানেন—সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডা, কষ্টিক-সোডা প্রভৃতি যে সব রাসায়নিক দ্রব্য অপর অধিকাংশ রাসায়নিক-শিল্পের প্রাণস্বরূপ এবং যেগুলি বিরাট পরিমাণে প্রস্তুত হয়ে থাকে সেগুলিকে হেভী বা ভারী কেমিক্যাল বলা হয়। ঔষধপত্রাদি, যেমন মেপাক্রিন্, হাইড্রোক্লোরাইড্, ভিটামিন সি, সালফানিলঅ্যামাইড্, প্রভৃতি পদার্থ টনে টনে প্রস্তুত হলেও সেগুলিকে বলা হয় ফাইন্ কেমিক্যাল। হেভী কেমিক্যাল কারখানা দেখতে গিয়ে সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাদের বিরাট আয়তন ও আনুষঙ্গিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির প্রতি। সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানায় ঘূর্ণ্যমান গন্ধক চুল্লী, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে চুল্লীতে গন্ধক সরবরাহের ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রসাহায্যে উত্তাপের মাত্রানির্ণয় এবং গ্যাসের গতিবেগ স্থিরীকরণ এবং 'লেড চেম্বার' প্রক্রিয়ায় সোরার পরিবর্তে কয়লা গ্যাসের অ্যামোনিয়া থেকে প্রস্তুত অক্সাইড্ অব্ নাইট্রোজেনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ওদেশের কারখানাতে দৈনিক ১০০ টনের কম সালফিউরিক অ্যাসিড্ প্রায়ই উৎপন্ন হয় না—অনেক ক্ষেত্রেই আবার দৈনিক ৫০০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়ে থাকে। অথচ আমাদের দেশে দৈনিক দশ বার টন সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হলেই আমরা খুব বেশী মনে করি। একটি প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় আবার এই যে

যাঁরা সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই সে অ্যাসিড অপর লাভজনক দ্রব্যসম্ভারে পরিণত করে থাকেন। জমির সার হিসাবে সুপার ফস্‌ফেট সুপরিচিত। সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা সংলগ্ন বিরাট আয়তনের সুপার ফস্‌ফেট কারখানাগুলি দেখে তাক্ লেগে যায়। এই সব কারখানায় দিবারাত্র কাজ হয় এবং সুপার ফস্‌ফেট কারখানার কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ ক'রে থাকেন। ঐ গবেষণাগারে সুদক্ষ গবেষকগণের সাহায্যে সারের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন ফসলের কিরূপ সম্বন্ধ তা স্থির করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার প্রত্যেক জিলার কৃষিপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। জিলা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত কৃষিবিদ্‌গণ তাঁদের এলাকার কৃষকদের সঙ্গে মিশে ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা হাতে কলমে অর্জন করছেন। সুতরাং কোন্ সার প্রয়োগে কৃষকদের কি সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে অবিলম্বে জিলার কৃষিপ্রতিষ্ঠানের মারফত কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে ও সেখান থেকে সে খবর কারখানায় প্রেরিত হচ্ছে এবং কারখানার কর্তৃপক্ষ তদনুসারে তাঁদের সারের আকৃতি-প্রকৃতি আবশ্যক মত পরিবর্তন ও সংশোধন করে দিচ্ছেন। গুঁড়া সার বেশীদিন রেখে দিলে পাথরের মত শক্ত ডেলা হয়ে যায় সেজন্য আজকাল মোটা মোটা দানাযুক্ত সার ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। ফসলের প্রকৃতি অনুসারে উদ্ভিদ্-খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলি বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে মিশ্র সারের প্রচলন আজকাল ক্রমশঃ বেশী দেখা যাচ্ছে। এদিকে কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণাগারে নূতন নূতন সারের উপযোগিতা সম্বন্ধেও গবেষণার বিরাম নাই। ইউরিয়ার নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। প্রাতঃস্মরণীয় স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ ইউরিয়াষ্টিবামিনের কল্যাণে ইউরিয়া কথাটি না শুনেছেন এমন লোক কমই আছেন। এই ইউরিয়া একটি শাদা দানাদার পদার্থ; অ্যামোনিয়া এবং কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের রাসায়নিক সংমিশ্রণে আজকাল প্রভূত পরিমাণে ইউরিয়াও সব দেশে প্রস্তুত হচ্ছে এবং তার অধিকাংশ ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইড রেজিন নামক প্ল্যাষ্টিক প্রস্তুত কল্পে নিয়োজিত হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে ইউরিয়া প্রয়োগে অ্যামোনিয়ম সালফেটের মত উপকার পাওয়া যায় কিনা তদ্বিষয়ে আজকাল জোর পরীক্ষা চলেছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ইউরিয়া একটি অপরিহার্য্য সাররূপে পরিগণিত হবে। সকলেই জানেন অ্যামোনিয়ম সালফেট জমির পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট সার। ওদেশের অনেক অ্যামোনিয়ম সালফেটের কারখানায় ব্যবহৃত সালফিউরিক অ্যাসিড কয়লার মধ্যে যে গন্ধক থাকে সেই গন্ধক থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। বিশেষ প্রকারের চুল্লীতে কয়লা পুড়িয়ে কোক করবার সময় আলকাতরা প্রভৃতি উপকারী পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে একটি মূল্যবান মিশ্র গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাসে অন্যান্য দরকারী পদার্থের সঙ্গে অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন সালফাইড নামক গ্যাস থাকে। সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করতে লাগে প্রধানতঃ সালফার ডাই-অক্‌সাইড এবং ঘটক বা ক্যাটালিষ্ট হিসাবে দরকার হয় নাইট্রিক অক্‌সাইডের। কয়লার গ্যাসে প্রাপ্ত অ্যামোনিয়ার কিয়দংশ পুড়িয়ে নাইট্রিক অক্‌সাইড করা হয় এবং হাইড্রোজেন সালফাইড পুড়িয়ে করা হয় সালফার ডাই-অক্‌সাইড। সুতরাং এই দু'টি পদার্থের সাহায্যে কোক্-চুল্লীর সন্নিকটেই সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়েছে। তার পর এই সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কয়লা গ্যাসে প্রাপ্ত অবশিষ্ট অ্যামোনিয়ার সংযোগে প্রস্তুত হচ্ছে অ্যামোনিয়ম সালফেট। এই উপায়ে বাহিরের গন্ধক আমদানি না করেও ঐ সব দেশে বহু টন অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রতি বৎসর প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেগুলি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে ভূমিতে প্রয়োগ করায় অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। আর আমাদের দেশে এখনও প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ টন কয়লা গাদা করে পুড়িয়ে কোক্ করা হচ্ছে; ফলে কয়লা থেকে যে সব উপসামগ্রী (বাই প্রোডাক্ট) পাওয়া যেত—প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের সেই অমূল্য সম্পদ বাতাসে মিশে যাচ্ছে। পদে পদে জাতীয় সম্পদের এরূপ শোচনীয় অপচয় হওয়ার ফলেই আজ শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে বাস ক'রেও আমাদের লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে ম'রতে হচ্ছে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই সব অপচয়ের প্রতিকার না করলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষাই দায় হয়ে পড়বে।

সালফিউরিক অ্যাসিডের পরেই ক্লোরিন ও সোডা-কষ্টিক তৈরীর বিপুলকায় যন্ত্রাদি সমন্বিত প্রকাণ্ড কারখানাগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকেই জানেন লবণ জলের ভিতরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত করলে লবণের উপাদান দুটি—সোডিয়ম ধাতু ও ক্লোরিন গ্যাস পৃথক হয়ে পড়ে। এই সোডিয়ম ধাতু জলের সংস্পর্শে কষ্টিক দ্রবে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উত্থিত হয়। বিশেষ ধরণের নির্বাত পাত্রে ঐ কষ্টিক দ্রব ঘনীভূত ক'রে হাইড্রোজেন গ্যাস পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে করে কষ্টিক গালিয়ে ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রের সাহায্যে শুকিয়ে সেগুলিকে পাতলা 'পটেটোচিপের' আকারে উপযুক্ত পাত্রে রাখা হয়। কষ্টিক তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে যে প্রভূত পরিমাণে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় সেগুলিও বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত হয়ে থাকে। ক্লোরিন গ্যাসকে বিশুদ্ধ ও তরলীভূত করে সিলিণ্ডার এবং ট্যাঙ্কগাড়ী ভর্ত্তি করে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে। তুলো, পাট ও কাগজ শাদা ধবধবে করার (bleach) জন্য এই ক্লোরিন প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মশা মাছি ছারপোকা আরসুলা ও ক্ষেতের ফসল নষ্টকারী কীট পতঙ্গ বিনাশক ডি ডি টি ও গ্যামএক্‌সেনের নাম অনেকেই শুনেছেন। এগুলি তৈরী করতে অজস্র ক্লোরিন দরকার হয়। তারপর যে মনোক্লোরোবেনজিন ডিডিটির একটি প্রধান উপাদান সেই ক্লোরোবেনজিন থেকে কার্বলিক অ্যাসিডও তৈরী হয়ে থাকে। পেণ্টাক্লোরোফিনল কাষ্ঠ সংরক্ষণে অত্যাবশ্যক বলে এবং ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ও ন্যাপ্‌থেলিন উইপোকা নাশকরূপে প্রমাণিত হওয়ায় এই সব উপকারী পদার্থ প্রস্তুত ব্যপদেশে ক্লোরিনের চাহিদাও অসম্ভবরূপে বেড়ে গিয়েছে। তার পর আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে ক্লোরিন সংযোগে এই সব পদার্থ প্রস্তুতকালে অজস্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও জন্মে। উপসামগ্রী বা বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে এই উপকারী অ্যাসিড এত অধিক পরিমাণে পাওয়া

যাচ্ছে যে মামুলী প্রথায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরী প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। হাইড্রোজেন দিয়ে তুলাবীজের তৈল প্রভৃতি শক্ত করা হয়ে থাকে। দালদা প্রভৃতি এই ভাবে তৈরী হয়। সোডিয়াম সালফাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করতেও এই হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনও রসায়নশিল্পই ওদেশে একক দাঁড়িয়ে নেই। মূল শিল্পের সঙ্গে যে সব আনুষঙ্গিক পদার্থ বেরোয় সেগুলি তারা যথাযথ লাভজনক কাজে খাটানোর ফলে আসল উৎপন্ন দ্রব্যের দাম অসম্ভব কম পড়ে। আমাদের দেশে টাটা কোম্পানীর মিঠাপুরের কারখানায় বর্তমানে কষ্টিক সোডা তৈরী হচ্ছে বটে, কিন্তু তার বাইপ্রোডাক্ট ক্লোরিন ও হাইড্রোজেনের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে তাঁদের তৈরী কষ্টিকের দাম আমদানী মালের চাইতে বেশী পড়ে যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্যালসিয়ম কার্বাইডের কারখানা দেখার সুযোগ আমার ঘটে নাই। তবে কার্বাইড থেকে প্রাপ্ত অ্যাসিটেলিন গ্যাস থেকে প্রস্তুত অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও অ্যাসেটিক অ্যান্‌হাইড্রাইড প্রস্তুত ও বিশুদ্ধীকরণ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আজকাল ওদেশে এই উপায়ে প্রস্তুত অ্যাসেটিক অ্যান্‌হাইড্রাইড থেকে ক্লোরোফরম তৈরী হচ্ছে; ফলে তার দামও অ্যালকহল ও ব্লিচিং পাউডার থেকে প্রস্তুত ক্লোরোফরমের চেয়ে অনেক সস্তা। আমাদের দেশে অ্যালকহল এবং ব্লিচিং পাউডারের যে দাম তাতে করে ক্লোরোফরম তৈরী করে প্রতিযোগিতায় ওদের সঙ্গে দাঁড়াতে পারা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উপকূল প্রদেশে ইলমেনাইট নামক খনিজ আছে। এই খনিজ নামমাত্র মূল্যে ঐ দেশে চালান গিয়ে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার টাইটেনিয়ম অক্‌সাইড নামক মূল্যবান্ পেণ্ট প্রস্তুত হচ্ছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে আমাদের রাসায়নিক কবির কথাটি মনে পড়ে গেল—"আমাদেরই ঘরে আছে অগোচরে কত অমূল্য ধন, চিনিতে না পারি অসহ কষ্ট সহি মোরা আজীবন।"

ঐ সব দেশের অ্যাস্‌পিরিণ, সালফোনঅ্যামাইড্, অ্যাটেব্রিন, স্যালিসিলিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা দেখে বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান বলে মনে হয়। কারণ বর্তমান বিপুল আয়তনের ঔষধপত্রের কারখানাগুলিতে কোনও একটি জিনিষেরও অপচয় না হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অসংখ্য যন্ত্রাদির সমাবেশ সাধন করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য সুদক্ষ কেমিষ্ট এবং কিরূপ পাত্রে বা কোন্ প্রকারের যন্ত্রে সেই প্রক্রিয়া লাভজনক ভাবে সম্পন্ন হবে তা নির্দ্ধারণ ও কার্য্যে পরিণত করার জন্য অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত থাকেন। ভিটামিন এ ও ডি'র নাম অনেকেই জানেন। কড্‌লিভার অয়েলে এই পদার্থ থাকে এবং রুগ্ন শিশু ও প্রসূতীদের পক্ষে এই ভিটামিনগুলি বিশেষ উপকারী। অ্যামেরিকায় 'মলিকিউলার-ডিস্‌টিলেশন' নামক প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হওয়ায় সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্যে বিরাট আকারের যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করে হাঙ্গরের যকৃৎ-তেল থেকেও ঐ ভিটামিনগুলি পৃথক করে বহু পরিমাণে তৈরীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে করাচি ও বোম্বাই উপকূলে আরব সাগরের হাঙ্গর ধরে তার লিভার-তেল প্রস্তুতের কারখানা হয়েছে, কিন্তু ঐ প্রকারে বিশুদ্ধ না করলে ঐ তেলে দেশের সত্যিকারের মঙ্গল কতদূর হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পেনিসিলিন প্রস্তুতের কারখানা ওদেশের আর একটি বর্ণনীয় বিস্ময়কর বস্তু। সুবৃহৎ কারখানায় অসংখ্য অভিজ্ঞ গবেষক, রাসায়নিক, চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ারের সমাবেশে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলছে কি করে দিনের পর দিন ঐ মহৌষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ক্রমশঃ সহজতর করে পেনিসিলিনের দাম কমান যায় ও সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। রেডিও ভালভের উত্তাপ সাহায্যে উহা নির্বাত অবস্থায় শুষ্ক করবার পদ্ধতিও সাফল্য লাভ করেছে এবং তাতে ক'রে পেনিসিলিনের স্থায়িত্ব এবং কার্য্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে শুনা যায়। Infra red দ্বারা উত্তপ্ত নির্বাত পাত্রে কমলা নেবুর রস শুকিয়ে রাখলে সেই গুঁড়া পুনরায় জলে মিলে অবিকল টাটকা কমলা নেবুর রসের মত স্বাদ গন্ধ ও উপকারিতা পাওয়া যায়।

ঐ সব দেশের এবংবিধ বিস্ময়কর শিল্পোন্নতি প্রত্যক্ষ করে স্বতই মনে হয়—আমরা শিল্প বিষয়ে এত পশ্চাৎপদ কেন? আমাদের মস্তিষ্কের তেজের অভাব, না উদ্ভাবনী শক্তির অল্পতা—যার জন্য আমরা সর্বপ্রকারের শিল্পদ্রব্যের জন্যই পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছি। অ্যামেরিকায় তিনজন ভারত সন্তানের অসামান্য কৃতিত্ব ও শিল্পক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেখে আমাদের হতাশ হবার কোনও কারণ নেই বলে মনে হয়। অ্যামেরিকার সায়ান-অ্যামাইড কর্পোরেশনের একটি শাখায় গবেষণা শাখার অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত আছেন ডক্টর সুব্বারাও। এঁর আদি নিবাস মহীশূর রাজ্যে। উত্তর চিকাগোর অ্যাবট লেবরেটরিতে পেনিসিলিন সুলভে উৎপাদন করে ডক্টর নাইডুর দান অতি উচ্চ স্তরের বলে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। মহারাষ্ট্র দেশবাসী ডক্টর কোকাটনুর বেনজিনসালফোনেট থেকে কার্বলিক অ্যাসিড তৈরীর একটি সহজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে যশস্বী হয়েছেন। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত ভারতবাসী উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেলে ফলিত বিজ্ঞানেও সত্যিকারের মৌলিকত্ব দেখাতে পারেন। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি একনিষ্ঠ মমত্ব-বোধ নিয়ে কাজ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দূরদৃষ্টির অধিকারী হলে আমাদের গবেষকগণও উচ্চাঙ্গের গবেষণা করতে পারেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে এবং দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত অপক্ষপাতদৃষ্টি শিল্পপতিগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে আমাদের দেশীয় গবেষক ও পরিচালকের সাহায্যেই নূতন নূতন লাভজনক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারবে। আশা করি সেই শুভক্ষণ সমাগতপ্রায়।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

মাণিকলাল বেলা ৯টার সময় গিয়ে বিনোদকে খবর দিলে—"উঠে পড়ুন, অনেক বেলা হয়েছে যে! সব রওনা করে দিয়েছি—বাড়ী খালি।"

বিনোদ এতক্ষণ কি অবস্থায় ছিলেন, তিনিই জানেন। —"এ্যাঁ সত্যি বলছো, সত্যি সব চলে গেছেন?"

মাণিক—"আপনার সামনে মিছে কথা···

বিনোদ—"না, তা জানি, তবে—কিছু না খেয়ে সব···"

মাণিক—"রাতের খাবার পরে খেতে পারবেন কেনো? চা আর জলযোগ যা করিয়েছি, দিনে আর তাঁদের খেতে হবে না। কচি কাচার জন্যে সঙ্গে কেবল দুধ দিয়েছি।"

"বাঁচালে"—বলে বিনোদ যেন স্বপ্নভঙ্গে উঠে বসলেন। —"একটু চা দেবে না?"

মাণিক—প্রস্তুত আছে—কোয়ার্টারে চলুন। মায়ের খবরটাওতো নেওয়া চাই। আর লেডি ডাক্তারকেও শত ধন্যবাদ দেওয়া চাই। তিনি না থাকলে যে কি হোত, ভাবতে পারি না! যে ফ্যাঁসাদ করেছিলেন!

বিনোদ। তাঁরা যে কষ্ট করে আসবেন, তা জানতুম না মাণিক। বড় সুখী করেছেন।

মাণিক। আজ্ঞে হ্যাঁ!—মেয়েরা কয়েদীর মত বিদেশে পড়ে থাকেন, একটা উপলক্ষ পেলে কষ্টের কথা তাঁদের মনেই আসতে পারে না—চলুন। বিনোদ অপরাধীর মত গিয়ে বাড়ী ঢুকলেন।

সেখানে রাণীও এইমাত্র যেন "মেজর-অপারেশনের" পর ক্লোরাফর্মের আচ্ছন্নতা মুক্ত হয়েছেন। তিনি আনন্দ মধুর মৃদুহাস্তে—"খুব যা হোক্", বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। রাতের ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় উৎসব বেশটাও তখনও বদলানো হয় নি।

—"এ কি—এসব কোথা থেকে এলো? একদম রাজকন্তা যে!"

—"আহা, কিছু যেন জানেন না! বাপ মায়ে তো মিছে রাণী নামটা রাখেন নি।"

—"ধার করা রাজকন্তে"?

অভিমানের সুরে—"ইস্—তা'হলে আমি পারতুম কি না, সে মেয়ে আমি নই।"

—"সে কি আর আমি জানি না", বলে বিনোদ একটু হাসলেন। অভিমান অপসৃত হোল।

বটুয়া চা আর একটা ডিসে একটা আপেল দিয়ে গেল।

সকালে আবার ফল কেনো? "নিয়ে যা বটুয়া—এর পরে দিস।"

লেডী ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করতে করতে—"হ্যাঁ, সকাল বটে—বেলা দশটা মাত্র। কাছারীতে বাবুদের কলম চলছে!"

বিনোদ—"আসুন, আসুন, শত নমস্কার। খুব বাঁচিয়েছেন। যে ভুল করেছিলুম, আপনি না থাকলে, তা থেকে মান রক্ষার পথ আমার ছিল না। আমি নিমন্ত্রণ পত্রই দিয়েছিলুম—যেমন দিতে হয়। কেউ যে আসবেন, সে দুর্ভাবনা মোটেই ছিল না। উঃ, কি রক্ষাই করেছেন, নচেৎ কোথাও পালাতুম।"

লেডি ডাক্তার সহাস্তে বললেন—"পালানো আবার কাকে বলে তা তো বুঝলুম না। কাল রাত থেকে খুঁজছি, ডাক্তারের পাত্তাই নেই। রাণীকে সাজালুম, রাজা কোথায়, দেখাই কাকে?"

—"এই তো দেখলুম—কোথায় গেলেন?"

—"এখন তো আওতানো বাসি ফুল দেখলেন। হ্যাঁ বলুন তো, হারছড়াটী কোথা থেকে গড়ালেন? বেহারে ও হার জন্মায় না—কি মানিয়েই ছিল! কিন্তু তাতে আমার কাজ বাড়িয়েছেন, সকলকে শিল্পীর ঠিক ঠিকানা দিয়ে চিঠি লেখবার হুকুম পেয়েছি—শাড়ীখানি সম্বন্ধেও। তাঁরা বোধহয় ভাবেন, সকলকেই যেন রাণীর মত মানাবে!" এই বলে হাসলেন তিনি—

বিনোদ—"কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন!"

লেডী ডাক্তার—না ডাক্তারবাবু, আমি বাক্যিদত্ত

হয়েছি, এখখুনি চাচ্ছি না, আপনারা কথা কোন, আমি এখন চললুম।—আর দাঁড়ালেন না।

বিনোদ হতভম্ব—"মাণিক মাথা খেয়েছে দেখছি। একবার দেখতে হোল।" ঘরে ঢুকলেন—হার রাণীর গলাতেই ছিল, পিসীমা খুলতে নিষেধ করেছেন। শাড়ী বিছানাতেই ছিল, উল্টে পাল্টে ভালো করে দেখলেন। —"তোমার পছন্দ হয়েছে তো রাণী—পিসীমাকে প্রণাম করেছ তো?"

"ইস্—ভাগ্যিস বল্লে, ওটা বুঝি মেয়েদের শেখাতে হয়!"

"না তা বলছি না, হট্টগোলের মধ্যে পিসীমাও ব্যস্ত, আর তোমার অবস্থা নিজের হাল দেখেই বুঝতে তো পারছি।"

"নিজের সঙ্গে আর তুলনাটা কোর না।—পুরুষ বটে!"

"তাই ভাবছ না কি? আমার যশোভাগ্যিটে ধসা পয়সার মত। খাঁটি তামা হলেও অচল! মাণিক ভীষ্মের শরশয্যা বানিয়ে আমায় শুইয়ে রেখেছিল, মন কিন্তু ত্রিভুবন ঘুরছিল, স্বস্তি ছিল না, এক মুহূর্ত্তের।"

"ত্রিভুবন মানে?"

"তুমি, তোমার অবস্থা, লেডী ডাক্তারের বাড়ী ও ব্যবস্থা—আর বাইরের তাঁবু আমাকে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছিল।"

"ইস্—মশায়ের বড় খাটুনি গেছে দেখছি!"

বাইরে কার ডাক্ শুনতে পেয়ে উঠে পড়লেন।

বিনোদ বাইরে গিয়ে দেখেন হাসপাতালের বড়কর্ত্তা দাঁড়িয়ে। নমস্কার করে এগুলেন। 'এসো' বলে, তিনিও তাঁর আপিসের দিকে চললেন। বিনোদ নানা কথা ভাবতে ভাবতে সশঙ্কে সঙ্গ নিলেন।—কি ব্যাপার?

আপিসে বসবার পর C. S. বললেন—"তোমাকে আমি Chabra dutyতে পাঠিয়েছিলুম। ভাল কাজ করেছ, O/c কে খুসী করেছ তাতে আমাকেও ততোধিক খুসি করা হয়েছে। কিন্তু দু'মাস পরে এসেই নির্বোধের মত এমন ভুলটা করলে কেনো? এত বাড়াবাড়ি করাটা কি ঠিক্ হয়েছে?"

বিনোদ। (কাতর ভাবে) আপনি আমার Boss, দয়া করে বিশ্বাস করুন।—এসব পিসিমার মেয়ে বুদ্ধিতে হয়েছে, আমাকে জানতে দেন নি। তাঁর হাতে কিছু ছিল—বিধবার সম্বল। বোধ করি সবই খুইয়ে থাকবেন। আমি এখনও সে সব খবর নিতে পারি নি। এসে আভাসেই একটু বুঝে, তাঁকে সে অবস্থায়—Advance Stageএ বাধা দিতে যাওয়া বৃথা জেনে নিজে অসুখের ভান করে Hospital bed নিয়ে পড়েছিলুম—কিছুতে Joinও করি নি Sir"—

সিভিল সার্জেন—"আমি তা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তোমার অফিস কর্ত্তারা, সে কথা তো বুঝবেন না, অনেকেই সস্ত্রীক এসেছিলেন। সকলের মন তো সমান নয়। তায় প্রদেশটা বেহার। বুঝতে পারছো?"

বিনোদ—আমি আপনাকে আর কি বলবো—দেখে শুনে আমার বুদ্ধিলোপ পেয়ে গেছে Sir, আপনি বাঁচান, সৎ পরামর্শ দিন—

সিভিল সার্জেন—এখন too late, বিনোদ,—তায় মেয়েরা দেখে গেছেন, সেটা কত গুণ magnified হয়ে কি আকার ধরেছে তাতো বোঝ। বিশেষ হারের বর্ণনাটা —আর তার ওজন এতক্ষণ পচাত্তর ভরিতে পৌঁছে থাকবে। মেয়েদের দোষ দিচ্ছি না, তাঁদের আন্দাজ বইত নয়, সুমিষ্ট ভুল করতেই পারেন। বড় বড় ইকনমিষ্ট শাস্ত্রবিদ্‌রা কসেমেজে কাজ করেন—সোনার দর এখন একশোর ওপর ভরি চলেছে—তার ঊর্দ্ধগতি—

বিনোদ। বলেন কি, বিশ পচিশই জানি। ওর খোঁজের তো দরকার হয় না Sir, কি করে জানবো—

হঠাৎ একটু উত্তেজিত ভাবে—"আচ্ছা Sir—এটা যদি আমার শ্বশুর বাড়ীর present হয়, তাঁরা তাঁদের মেয়েকে দিয়েছেন। এমন তো হয়েও থাকে।"

সিভিল সার্জেন। (সহাস্যে) বলছিলে যে মাথা কাজ করছে না! এই ত অনেক দুর চলে গেছ!

বিনোদ। (একটু অপ্রস্তুত ও বিনীত ভাবে)—বিপদেও যে law নেই Sir—

সিভিল সার্জেন। যাক্ ও কথা। তোমাকে ভালবাসি, তাই সাবধান করবার জন্য ডেকেছিলুম। চাকরিই যখন মূলধন, সেটা বাঁচিয়ে চোলো। আপিসে ভাল মন্দ লোক

থাকেন—আছেনও। এক O/cর Certificate এই "জেলসি Complex" এনেছে, তার ওপর এই সমারোহের রসান আমার ভাল লাগে নি। তাই কথাগুলো বললুম। যাও, সাবধান হয়ে কাজ কোর।

বিনোদ খুবই চিন্তিত হলেন। একটু নীরব থেকে শেষে বললেন—"কিছুই তো করি নি Sir, কি করে কি হয়েছে এখনো তা জানি না।—মা আছেন, অদৃষ্ট আছে, আর আপনি রইলেন—যা হয় করবেন।"

সিভিল সার্জেন। তুমি তো জানো বিনোদ, আমি independent (স্বাধীন) নই—আপিস পশ্চাতে আছেন। আমি সবি অনুমানের কথা বললুম—সাবধান থাকা ভালো। শেষ তুমি যা বলেছ—তাই সার কথা—মা আছেন। যাও ভেব না।

বিনোদ নমস্কার করে ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে ফিরলেন। "আমি সত্যই নিজে ও সব করিনি—মা জানেন। ভাল দেখায় না বলে কয়েকখানা নিমন্ত্রণপত্র লিখেছিলুম বটে"—

* * *

মাণিক মুখিয়েই ছিল। দেরী দেখে ছটফট করছিলো। ডাক্তারকে দেখে চমকে গেল—

"ব্যাপার কি বলুন দিকি? আপনাকে এমন দেখছি কেনো?"

বিনোদ। আমি তো বারবার তোমাকে বলেছি, চাকরি করা আমার দ্বারা চলবে না। তোমরা সেইটে এগিয়ে দিলে। বুঝছি, ভালো ভেবেই সব করেছ, কিন্তু —দেখছি—"গুণ হয়ে দোষ হইল"

মাণিক। (চিন্তিত ভাবে) সব বলুন দিকি শুনি, শোনাতে যদি আপত্তি না থাকে—

বিনোদ। তোমাকে বলতে আমার কোনদিনই কোন আপত্তি ছিল না, নেইও। তোমাকে বলবো না তো কাকে আর বলবো। বোসো—শোন।

তারপর এক এক করে সব কথা শোনালেন। পরে বললেন—তুমি তো জানো—O/C আমার সম্বন্ধে কি লিখেছেন তা জানি না—হারের কথা, সাড়ির কথাও জানিনা। কিন্তু তার charge আমার ওপরেই চেপেছে। —তা ছাড়া আর কার ওপরেই বা চাপবে?

মাণিক। কিসে আর কেনো, তা তো বুঝতে পারছি না মশাই। চাকরিতে ঢুকে একটা কথা বুঝেছি বটে, "যদি অনিষ্টই না করতে পারলুম তো আমরা বড় কিসের?" বড়দের বড় কাজই তো খোঁচা খোঁজা। যারা under এ আছে তাদের জন্যে ওঁদের ভাণ্ডারে অনিষ্ট করবার অস্ত্র অগুন্তি। কম পড়লে কারখানায় শিল্পীর অভাব নেই, তাদের কাজই অস্ত্র invent করা আর যুগিয়ে দেওয়া। বড়দের সন্তুষ্ট করে নিজের চাকরি বজায় রাখাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

—দেশে মধ্যবিত্ত সংসারে নেমকর্ম্ম তো বাদ যায় না দেনা করেই হোক্ বা যেমন করেই হোক তা করতে হয়, হয়েও আসছে। অনেক তো দেখা হয়েছে, তার চেয়ে বেশীটে কিসে হয়েছে? তাতেও লোক একখানা গয়না দেয়, সিল্কের সাড়ীও দেয়, অন্ততঃ দেড়শো মেয়েও খায়। কি বেশীটে হয়েছে বুঝলুম না। প্রভেদটা কেবল বেহারে থাকা, এই তো?

বিনোদ। তাতো সব বুঝেছি মাণিক। ও কথা বলাও চলে না, বলে ফলও নেই—থাকে তো উলটো ফলই আছে।

মাণিকের সব কথা শেষ হয়নি, সে উত্তেজিতভাবেই বললে—

"সত্য কথাটা 'জেলসি'—আমরা থাকতে তাঁবেদারের আস্পর্দ্ধা সইব নাকি? তা হলে আর বড় হলুম কিসে? কিন্তু তাঁদের জ্যাঠা খুড়োরা মেয়ের বিয়েতে যখন শতাধিক বরযাত্রীদের সপ্তাহ ধরে লাড্ডু পুরী পেঁড়া খাওয়ায়, দিনরাত বাজনা আর বাজী চলে—পাড়ায় কাক পক্ষী তিষ্টুতে পারে না, সেটা বুঝি কিছু নয়? তখন সেটা 'প্রথামত।' অন্যদের প্রথা থাকতে নেই, পালনও করতে নেই। রামের বেলা কথা নেই—শ্যামের ঘাড় ভাঙা চাই।"

বিনোদ। অতো উত্তেজিত হচ্ছ কেনো। এর "প্যাথাটিক্" সাইডও রয়েছে যে। বিভীষণেরাও যে আছেন, তার সঙ্গে তাদের চাকরি বজায়, উন্নতি, বাড়ীর বেকারদের ব্যবস্থা, সব তো রয়েছে। আবার সংস্কৃত অক্ষরে লেখাও যে পড়া হয়েছে—"স্বকার্যম উদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ" —তাঁরা তো অজ্ঞ নন্। বেচারাদের কার্য্যোদ্ধারের ঐ একটী অর্থাৎ মণিবের মন বুঝে—অন্যের ছিদ্রান্বেষণ। স্বজাতির অনিষ্ট চিন্তা—

মাণিক। স্বজাতি কি মশাই? বাঙালী কবে আবার কার স্বজাতি হল। যাক্, আপনি পাপ কথা থামিয়ে দিয়ে ভালই করলেন। মাকে ধরে আছেন সেইটা ঠিক রাখবেন, কোন চিন্তা নেই—ভাববেন না।

বিনোদ। নিজের সুবিধা আর জামায়ের চাকরির জন্য এসব বাপে করবে না তো কে করবে?

মাণিক। বলেন কি মশাই? অন্যের অন্ন মেরে?

বিনোদ। ওর মধ্যে অন্যরূপ আনছো কেনো—অন্য—অন্যই, নিজের চেয়ে তো তারা আপনার নয়—বড় নয়—

মাণিক। অন্যেরো যে প্রতিপাল্য আছে, আমাদের চাকরি তো কেবল নিজের জন্য নয়। কত জনের যে অন্ন মারা হয়। এত বড় পাপ—

বিনোদ। পাপ কথাটা সাফ ভুলে যাও। কখনো মাছ মারনি বুঝি? লম্বা সুতো ছেড়ে খেলিয়ে তুলতে দেখনি? ভগবানও long rope রাখেন, দেদার সুতো ছাড়েন—টেনে তোলেন না। মাছ তো হাতে আছেই, এক সময় হাতে আসবেই। তাঁর কাজ কে বুঝবে? সে বুঝতেও চাই না। ভাবছি—কালই রওনা হব? তারপর মা আছেন···

মাণিক। তবে আর কি? আমি আপনার মুখ থেকে কথাটিই শুনতে চাইছিলুম। ওর ওপর আর কথা নেই—থাকে তো সে সব বাজে। আমাদের সেই ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোই ভালো। সেখানে বত্রিশ সিংহাসন পাতাই আছে—নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাজে কথাই বাঁচিয়ে রাখে,—চলুন। আগে বুঝতুম না, আপনিই বুঝিয়ে দিয়েছেন। আপনিও আর ভাববেন না। বড়দের "পারলিয়ামেণ্টরি টক্", আমড়ার চেয়েও টক্ হয়ে গেছে। কেবল পরচর্চ্চা আর পরের অনিষ্ট চিন্তায় বাহাদুরি।—চলুন মশাই—শুভস্য শীঘ্রম্—

বিনোদ। না আমি আর ভাবছি না মাণিক। ভাবছি—ও 'হার' ছড়াটা এলো কোথা থেকে, আর তার পরিণাম।

মাণিক। পরিণাম আবার কি মশাই? ফেলে দিতে হবে নাকি? এ সব ক্ষেত্রে উপহার বলে উপদ্রব থাকেই। যুধিষ্ঠির নিজের মনোমত গড়া জিনিস উপহার দিয়েছে। একথা কোথাও প্রকাশ করতে নিষেধও করেছে। মায়ের বড় পছন্দ হয়েছে, ও রাখতেই হবে হুজুর—

"কি করে?"

"সে আমি ভেবে নিয়েছি মশাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিনোদ নীরব। বটুয়া চা দিয়ে গেল, বলে গেল—"স্নানের জল প্রস্তুত।"

"এ ছোকরার নাড়ীজ্ঞান দেখে অবাক হয়েছি"—বলে' বিনোদ হাসলেন।

মাণিক তাঁর হাসির অপেক্ষাই করছিল। বললে—অনেকদিন কিছু শোনা হয়নি। আপনার সে সব কথা কোথায় গেল? মাকে বলতেন "মধ্যবিত্তের সোনার কাটি সঞ্জীবনী সুধা—তার ক্ষুধা যে আমাকে পেয়ে বসেছে।"

উভয়ে হাসলেন।

বিনোদ। সত্যি মাণিক, তার চেয়ে আর ভালো কিছু নেই। কিন্তু নিজের জাত সম্বন্ধে বড় হতাশ হয়ে পড়ছি। বাংলার দুর্দ্দিনই কেবল চোখে পড়ছে। কিছুদিন পূর্ব্বের আমরা সেই বাঙালী তো—যারা একদিন গেয়েছিল "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" ইত্যাদি। তখন দেশ আর জাতিই ছিল তাদের সব। দেশ মানে অনেকেই হিন্দুস্থানই ভাবতো। কতটা ভালবাসার টানে সেটা হয়েছিল। সেটা ভাববার কথা। যাক্ আজ কেবল চাকরি নিয়ে কথাটাই—মনে আসছে অল্পদিন মধ্যেই সেই স্বদেশ বলে—মূল্যবান কথাটিকে "প্রদেশ" বলে কথাটি এসে, কত বড় আগ্রহে ও প্রেমে গ্রাস করে' ফেলেছে! মন্দ বলছি না, যদি না তাতে বিভিন্ন "প্রদেশ" বলে স্বাতন্ত্র্য এনে এক হবার "দেশ বুদ্ধিটিকে" নষ্ট করা হোতো। লোভে পাপ বেড়েই থাকে—স্বাভাবিক সেটা। তার ফলও সকলে জানেন, কিন্তু সামলাতে পারেন না। যাক্ সে কথা। আমার কথা বাঙালী নিয়ে। পূর্ব্বে বাঙালীরাই সকল দেশের (প্রদেশ বলছি না, তখন তা ছিলও না) সকল আপিসেই কাজ করতেন, প্রধানও ছিলেন, তাঁদের সংখ্যাধিক্যও ছিল। পরে স্থানে স্থানে স্কুল কলেজ বাড়ার সেখানকার (children of the soil) যোগ্য হয়ে আপিসে ঢুকেছে। সেই অনুপাতে বাঙালীও কমছে। তাতে আক্ষেপের কিছু নেই, বরং সেইটাই উচিত ও দেশ-ভক্তদের আনন্দের কথা। বেহারে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে,

পাঞ্জাবে এখনো পূর্ব্ব সংশ্রবে আপিসে কয়েক জন করে বাঙালীও আছেন এবং উচ্চস্থান অধিকার করেও আছেন —সময় হলেই যাবেন। কিন্তু নূতন লোকের যখন দরকার হয়, সকলেই নিজের নিজের জাত ঢোকাবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে থাকেন—সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কেবল লক্ষ্য করবার কথাটা এই, তাতে মুসলমান, পাঞ্জাবী, মাদ্রাসীর স্থানও আছে, নাই কেবল বাঙালীর! যোগ্য লোক না পেলে সুযোগ্য বাঙালী যুবক কেউ উপস্থিত হলে, সে আপিসে এখনো কেউ বাঙালী বড়বাবু থাকলে, তিনিও ইতরের মত খিঁচিয়ে ওঠেন—বলেন এখানে কেনো—তোমাকে কে আসতে বলেছে—আমার চাকরি খেতে এসেছ! এখনি চলে যাও বলছি—ইত্যাদি।

যুবকটি যদি বলে—"বিদেশে বড় কষ্টে পড়েছি মশাই, চাকরি হওয়াহয়ি আমার ভাগ্যের কথা। আপনি দয়া করে' না হয় আমার দরখাস্তখানা আর পাঁচ জনের সঙ্গে কেবল পেস্ করে' দিন না। আমি বাঙালী, আপনি না দয়া করলে আর কে করবে বলুন।"

শুনে বাঙালী বড়বাবু অগ্নি শর্ম্মা হয়ে বলেন—" "বিরক্ত কর না—যাও বলছি।"—গরজ বড় বালাই, তবুও সে বলে "স্থানীয় যোগ্য Candidate যখন নাই, আপনি একটু বললেই হতে পারে। অন্য সব জাতই তো নিজের জাতের জন্যে চেষ্টা পাচ্ছে, আপনি বাঙালী—গরীবের দরখাস্তখানা নিন দয়া করে।

বাঙালী বড়বাবু অতিষ্ঠ ভাবে—"যাবে না? দেখবে, —'চাপরাসী' বলে জোর হাঁক দেন!"

"যাচ্ছি মশাই, আপনার চাকরি বজায় থাকুক—দোহাই ও দয়াটা আর করবেন না।" বেচারা বিমর্ষ মুখে প্রস্থান করে। এই অবস্থা। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বদেশী যুগে এই বাঙালীর মুখ থেকেই moral courage কথাটি যখন তখন কানে আসতো। বোধ করি এ তারই reaction with vengance আত্মসম্মানবোধের সুদে আসলে শ্বাস-রোধ! একেই বলে গোয়েবি চাল, সে সাত সমুদ্দুর পার হয়ে এসেছে—মন্ত্রী ছাড়লেই মাৎ।

"তার জন্যেও ক্ষোভ নেই, ক্ষোভ ওই চাকরির লোভ যা আত্মসম্মানকে আত্মসাৎ করেছে—মনুষ্যত্ব রাখছে না, ভবিষ্যৎও থাকছে না। চাকরি করা আর চলবে না মাণিক।"

মাণিক। আবার যে কাজের কথা আনলেন। আমার দরখাস্ত ছিল—বাজে কথার যে।

বিনোদ। (সহাস্যে) ভুলে গেছি। যেখানকার যা, সে আমাদের ফুলের ভবনে না খুলে আসবেনা। তবে আজ যাক, কালই বেরিয়ে পড়ি চলো। O/Cর ভাবটা দেখি—

"যে আজ্ঞে, আমি পা বাড়িয়েই আছি।"

"সেই ভালো, বাজে কথা এখানে জমবে না।"

বটুয়া এসে বললে—"নাইবার জল দিয়েছি বাবু।"

উভয়ে নাইতে উঠলেন।

শ্রাবণে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

সজল আকাশ বেদনা গম্ভীর
ঝর্ ঝর্ ঝরে জল;
বিরহের ধারা পরাণ ব্যথিয়া
সারা নভে টলমল।
কে যেন কাহারে চাহিয়া আকুল,
কোথা যেন কার হয়ে গেছে ভুল;
দুখে তার ওই ঝরে নীপ ফুল
কাঁদায়ে বিশ্বতল।

বরষা এসেছে বিপুল বরণে
কালো ছায়া মেঘে মেঘে,
হারানো প্রিয়ার দুটী কালো আঁখি,
স্মরণে উঠিছে জেগে।
বরষার রূপে এ নয়ন ধারা
আজি ঝরে ঝরে হলো যেন সারা;
হৃদয় আজি কে সদা কূলহারা
বিরহের বাণী-বেগে।

বিন্দুর ছেলে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পারিবারিক স্নেহধারা স্বাভাবিক ও চিরনির্দ্দিষ্টপথে প্রবাহিত না হইয়া ভিন্ন পরিখাতে প্রবাহিত হইলেই যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে পারিবারিক জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা লইয়া শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসিকা আছে। বিন্দুর ছেলে তাহাদের মধ্যে একখানি। বিন্দুর সন্তান হয় নাই। সে অহমিকা ও অভিমানের তুঙ্গ শৈলের অন্তরালে অফুরন্ত মাতৃমমতার উৎসধারা লইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল। সে তাহার বড়জায়ের সন্তান অমূল্যধনকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্যের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহিল, তাহাতে পারিবারিক জীবনে বিপর্য্যয় কেন ঘটিবে? বিপর্য্যয় যাহাতে ঘটে লেখক তাহার আনুষঙ্গিক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমত: বিন্দুর সন্তানস্নেহ এত বেশি প্রবল করিয়া দেখাইয়াছেন যে বিন্দু যশোদাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং অমূল্যর গর্ভধারিণী সেখানে খুড়ী মাসীর পর্য্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। বিন্দুর স্নেহাতিশয্য কতকটা স্বাভাবিক, কতকটা তাহার নিজেরই স্বভাবগত। এইরূপ স্নেহাতিশয্য যে অনেকটা স্বাভাবিক তাহা বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবিত ও মৃত গল্পের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো বেশি (অর্থাৎ মায়ের চেয়েও বেশি) হয়। কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না, তাহার উপর কোন সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি। কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোন দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না। কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।"

বিন্দুর স্নেহাতিশয্যই যাদবের ক্ষুদ্র সংসারে একটা বিপর্য্যয় ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুইভাইএর পরিবারে যে কোন একটি বধূ বাহির হইতে আসিয়া বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারিত সত্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অমূল্যধনই নবাগতা বধূ বিন্দুর হৃদয় জয় করিয়া সে পথরোধ করিয়া ফেলিয়াছিল। শরৎচন্দ্র তৃতীয় একটি ব্যক্তির সহায়তা লইয়াছেন। এই তৃতীয় ব্যক্তি স্বতন্ত্র শরীরী জীব নয়। বিন্দুর মধ্যেই তিনি দুইটি নারীর একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। বিন্দুর দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বই তাহার প্রথম ব্যক্তিত্বের স্নেহাতিশয্যকে অবলম্বন করিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতেছে। এই বিপ্লবই এই উপন্যাসিকাখানির উপজীব্য।

বিন্দুর দ্বিতীয় স্বরূপটির পরিচয় এই—বিন্দু ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্ততি—অসামান্যা রূপসী। দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ সে সঙ্গে আনিয়াছিল। "ছোটবৌ যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছিল—তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার ও অভিমান সঙ্গে আনিয়াছিল।" মাধব ওকালতি পাশ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার এইরূপ বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছিল। যাহাই হউক, বিন্দুর স্বামীও অযোগ্য নয়। স্বামিগৌরবও তাহার ছিল। অশিক্ষিতা ও বড়লোকের আদুরে দুলালী বিন্দুর পক্ষে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। সেজন্য বিন্দুর তেজ অসীম, মুখে কটুভাষা, মেজাজ রুক্ষ, কোনপ্রকার প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, পরিবারের সকলের কাছে দাসভাব সে চায়। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র রঙের উপর রসান চড়াইয়া বলিয়াছেন—তাহার মেজাজ গরম হইলে বা মনে কোন আঘাত লাগিলে তাহার আবার ফিট হয়। কাজেই পরিবারের সকলেই সন্ত্রস্ত।

এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া শরৎচন্দ্র অন্নপূর্ণা, সন্তানবৎসলা উদার-হৃদয়া বিন্দু ও কটুভাষিণী অভিমানিনী বিন্দু এই তিনটি নারীর মধ্যে অমূল্যধনকে অবলম্বন করিয়া একটা দ্বন্দ্বসংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা একটা Triangular action & reaction এর রূপ ধরিয়াছে। এই সংঘর্ষের ফলে যে বৈচিত্র্যময় বিপর্য্যয় তাহাই হইয়াছে শরৎচন্দ্রের রসোপাদান। এই দ্বন্দ্বসংঘর্ষের অধিকাংশই বাচনিক। তুচ্ছ কথা লইয়া বাড়াবাড়ি জেদাজেদি এবং মান অভিমানের পালা চলিয়াছে। ইহা এতই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার যে কথা-সাহিত্য ছাড়া অন্যত্র ইহার কোন মূল্য নাই। উপাদান বা উপজীব্য যাহাই হউক, শরৎচন্দ্রের অপূর্ব রচনাগুণে ইহা অপূর্ব রস সৃষ্টি করিয়াছে।

পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা অমার্জ্জিতা নারীদের রেষারেষি, রসকলহ ও মান অভিমানের ব্যাপার, সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি নাগরিক পাঠকপাঠিকার হাস্যোদ্রেকই করিবে। কিন্তু যাঁহারা রস কাহাকে বলে বুঝেন, তাঁহারা স্থান-কাল-পাত্রপাত্রীর কথা বিস্মৃত হইয়া ইহাতে রসের সার্বজনীন আবেদনটি উপভোগ করিতে পারিবেন।

বিন্দুর ছেলে সাধারণ ছোট গল্প নয় বটে, পুরাপুরি উপন্যাসও নয়। সেজন্য শরৎচন্দ্র বিন্দুর চরিত্রের ক্রমোন্মেষ দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। চরিত্রের পরিচয় দিয়া প্রথম পরিচ্ছেদেই বিন্দুকে একেবারে উগ্রমূর্ত্তিতে রান্নাঘরে অমূল্যর দুধের সন্ধানে খাড়া করিয়াছেন।

অমূল্য ঠিক সময়মত দুধ পায় নাই ইহাতেই বিন্দুর অসহ্য অধীরতা—ইহাতেই বিন্দুর স্নেহাতিশয্যের অভিব্যক্তি আরব্ধ হইয়াছে। তারপর অমূল্য পাছে কোন দৈহিক আঘাত পায় এজন্য বিন্দুর উৎকণ্ঠা অন্নপূর্ণার চেয়ে ঢের বেশি, পরের ছেলের সঙ্গে তাহার তুলনা সে সহ্য করিতে পারে না, কিশোর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানের অঙ্গস্পর্শ লাভ স্নেহার্ত্তির একটি লক্ষণ, বড়লোকের ছেলে যে ভাবে প্রতিপালিত হয় বিন্দু অমূল্যকে সেই ভাবে প্রতিপালন করে, তাহার আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদের জন্য সে এতই ব্যয় করে, যে অন্নপূর্ণা অবাক হইয়া যায়। অমূল্যর জন্য সে স্বামীর সঙ্গেও কলহ করে,অমূল্যর গর্ভধারিণীর অধিকারও সে সবলে হরণ করে। অমূল্য তাহার প্রাণাধিক,তবু সে অভিমানে আত্মহারা হইয়া অমূল্যকে মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত করিয়া নিজেরই চরম নিগ্রহ সাধন করে। এইরূপ স্নেহাতিশয্যে

অমূল্যর ইহ-পরকাল নষ্ট হইবার কথা, কিন্তু বিন্দুর মাতৃস্নেহ একেবারে মূঢ় ও অন্ধপ্রকৃতির নয়। অমূল্যর সর্বাঙ্গীণ ভবিষ্যৎ কল্যাণই সে কামনা করিত, তাহার সংকল্প ছিল অমূল্যকে দশের মধ্যে একজন করিয়া তুলিতে হইবে। অমূল্য গণ্যমান্য কৃতবিদ্য হইয়া উঠিবে—তাহার মা হওয়ার গৌরবই তাহার জীবনের লক্ষ্য। অমূল্যর সম্বন্ধে সে উচ্চ আশা পোষণ করে- সে বলে—"ও আশায় যদি কোন দিন ঘা পড়ে তবে আমি পাগল হ'য়ে যাব।" বিন্দু অমূল্যর প্রকৃত কল্যাণ চায় বলিয়াই তাহার পারিবারিক জীবনে বিপ্লব ঘটিয়াছিল। অমূল্যর কল্যাণের জন্যই সে রসনা সংযত করিতে না পারিয়া তাহার গর্ভধারিণীর স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কর্মফলের মাসীমার স্নেহাতিশয্যের সহিত বিন্দুর স্নেহাতিশয্যের পার্থক্য এইখানে। কর্মফলের বন্ধ্যা মাসীমা তাঁহার অন্তরের নিরাশ্রয় মাতৃমমতার একটি অবলম্বন পাইয়াছিল তাহার ভগিনীপুত্রে। এই ভগিনীপুত্র সন্তানের সাময়িক অনুকল্প মাত্র। সে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তাহার স্নেহের প্রকাশ করিত। যেমনই প্রৌঢ় বয়সে তাহার অঙ্কে একটি সন্তানের আবির্ভাব হইল—অনুকল্প (Substitute) তখন চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। বিন্দুচরিত্র শরৎচন্দ্র এমনভাবে পরিকল্পিত করিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয়—তাহার অঙ্কে সন্তানের আবির্ভাব হইলেও অমূল্য অমূল্যই থাকিত—জ্যেষ্ঠপুত্রের মূল্য সে হারাইত না। বিন্দু যেন রামের সুমতির নারায়ণী ও 'মেজদিদির' হেমাঙ্গিনীর সহোদরা।

রামের সুমতিতে দিগম্বরীর আবির্ভাব যেমন অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া একটি ছোট গল্পকে উপন্যাসিকায় পরিণত করিয়াছে, বিন্দুর ছেলেতে এলোকেশী তাহার বারো-আনা-চার-আনা-চুলছাঁটা টেরিকাটা পুত্র নরেনকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তেমনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া গল্পটিকে অনেকটুকু আগাইয়া দিয়াছে। ইহাদের আসার আগে পর্যন্ত যে দুইজায়ে দ্বন্দ্বকলহ চলিতেছিল—তাহাকে রসকলহই বলা যাইতে পারে—উহা সম্পূর্ণ বাচনিক। উহার জ্বালা বচনপুষ্প ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছায় নাই। এই বাচনিক দ্বন্দ্ব নিরবচ্ছিন্ন হৃদয়-মাধুর্য্যের প্রবাহে ফেনিল বুদ্বুদমাত্র।

এলোকেশী-নরেনের আবির্ভাবের পর হইতে মাধুর্য্যের ধারাটিতে আবিলতার সঞ্চার হইতে থাকে। তারপর একদিন সহসা হলাহল উত্থিত হইল। সেই হলাহল এলোকেশী নরেনকে স্পর্শও করিল না। ইহারা Catalyctic agent এর কাজ করিল মাত্র। সেই হলাহলে সবচেয়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল বিন্দু। পরিবারের বাকি চারিজন পরিজনও সে বিষ-জ্বালার অংশ লাভ করিল।

এই বিষও অন্তর হইতে উদ্গত হয় নাই। ইহার জন্মও দন্তে নয়—রসনায়। কাজেই ইহা সাময়িক জ্বালার সঞ্চার করিয়া মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ শেষ পর্য্যন্ত বিলীন হইল। তাই শেষ পর্য্যন্ত পরিবারটির মধ্যে শান্তি ফিরিয়া আসিল। যেখানে অন্তরে বিরোধ নাই—সেখানে বাচনিক বিরোধ হৃদয়ধারাকে ক্ষণকালের জন্য আবিল করিলেও বর্ষান্তে শরদাগমে নদীধারার মত তাহা আবার নির্মল হইয়া যায়। রোষ অভিমান ইত্যাদি সহৃদয় মানুষকে কিছুকালের জন্য অপ্রকৃতিস্থ করে। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার কটুকথা, রোষ অভিমান ইত্যাদিরই অভিব্যক্তি, অন্তরের অন্তস্তলের অভিব্যক্তি নয়—প্রকৃতিস্থ অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই ঐ অভিব্যক্তি সে মানুষকে লজ্জাই দেয়, অনুশোচনার সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্র এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। তবু বিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত বাকী ছিল। সে কেবল নিজের কথাই ভাবিত, তাহার মিতভাষী ধীর শান্ত স্বামীটির মাথা যে যাদব ও অন্নপূর্ণার চরণে বিকাইয়া আছে তাহা সম্যক্‌রূপ উপলব্ধি করে নাই। সে অভিমান, অহমিকা ও অন্ধ মাতৃমমতার মোহজালের ফাঁকে ফাঁকে যাদব ও অন্নপূর্ণার মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু শ্বশুর পরিবারের অন্তর্গূঢ় জীবন-সত্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করে নাই। তাই তাঁহার নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

তাহা ছাড়া, সে রূপ, যৌবন, অর্থ ও লক্ষ্মীশ্রী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু মাতৃজীবনের তপস্যার বল সঙ্গে আনে নাই। সে অতি অনায়াসে অমূল্যকে অঙ্কে পাইয়াছিল। স্তন্যদাত্রী রূপে বিন্দু, বিন্দু বিন্দু করিয়া বুকের শোণিত দান করে নাই। অমূল্যধনকে লাভ করিবার জন্য সে কোন তপস্যাই করে নাই। অতি সহজেই সে মা হইয়াছিল, কিন্তু মা হওয়ার কোন দুঃখই সে স্বীকার করে নাই। সেই তপস্যা, সেই দুঃখ-স্বীকার তাহার বাকি ছিল। সামান্য বাচনিক দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত বিন্দুকে দিয়া তাহাই করাইয়াছেন।

মায়ের মত দুঃখিনী এ সংসারে কে আছে? সন্তান মাতৃহৃদয়কে যে ধূলায় লুটাইয়া রাখে। মা হইতে গেলে কি মান-অভিমান, ঔদ্ধত্য-অহমিকা চলে? বিন্দু মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতেছিল। শরৎচন্দ্র তাহাকে দুঃখ বেদনায় দহন করিয়া প্রকৃত মা করিয়া তুলিয়াছেন।

অন্নপূর্ণা দুঃখীর কন্যা—সমস্ত জীবন দুঃখকষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। মাধবকে তিনি জননীর স্নেহে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন! মাধবের উপর তাঁহার অক্ষুণ্ণ অধিকার ছিল—সে অধিকার তাহার পত্নীর উপর তিনি দাবি করিতেন। বিন্দুর অহমিকা তাঁহার অসহ্যই হইত, কিন্তু বৈমাতুর অমূল্যধন দুইজনের মধ্যে এমন বাঁধন বাঁধিয়া দিল যে বিন্দুর সকল উপদ্রবই তাঁহার সহনীয় হইয়া উঠিল। বহুদিন পর্য্যন্ত সে বিন্দুর সকল উপদ্রবই সহিয়া চলিত। কিন্তু সে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বধূ। কোন বিষয়ে আতিশয্য তাহার অশোভন মনে হইত। তাই সে মাঝে মাঝে বিন্দুর আচরণে দোষ ধরিত। তাহা ছাড়া, বিন্দুর মত খামখেয়ালী মেজাজের সঙ্গে সব সময়ে ঠিক তাল রাখিয়া সে চলিতে পারিত না, কখনও প্রতিবাদ করিত, কখনও আবোল-তাবোল বলিয়া ফেলিত, যাহা বলা উচিত নয় এমন কথাও দুই একটা বলিয়া ফেলিত।

সে সোজা মানুষ, সোজা পথে চলিত, ঘুরপেঁচ বুঝিত না। এলোকেশী ও নরেনের আচরণের মধ্যে কিদৃশতা আছে—তাহাও সে বুঝিত না, সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণ কিসে তাহাও সে বুঝিত না। সে ভাবিত, আর পাঁচজনের ছেলে যেমন করিয়া মানুষ হয় তাহার ছেলেও তেমনি

করিয়াই মানুষ হইবে। অন্নপূর্ণার তুলনায় বিন্দুর রুচি অনেকটা মার্জিত ও দূরদর্শী।

অভিমানের আঘাত বার বার সহ্য করিতে করিতে নিরভিমানা অন্নপূর্ণার অন্তরেও অভিমান জাগিয়া উঠিল। ধনের যেমন একটা অভিমান আছে—দারিদ্র্যেরও তেমনি একটা অভিমান আছে। এই দারিদ্র্যের অভিমান চরমতম দুঃখ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু ধনের কাছে অবনত হয় না। অন্নপূর্ণা চরমতম দুঃখ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত হইল। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দুইজায়ের মধ্যে যাহাই হউক, অন্নপূর্ণা বিন্দুর হৃদয়ের মর্মস্থলের সংবাদ রাখিত, বিন্দুকে সত্যই ভালবাসিত এবং অভিমানের দ্বারা তাহার নিজের মহাপ্রাণতাও নষ্ট হয় নাই। তাই সে শেষ পর্যন্ত সকল অপমান ভুলিয়া বিন্দুকে বুকে টানিয়া লইল। অবশ্য এজন্য শরৎচন্দ্রের আয়োজন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে—বিন্দুকে মৃত্যুশয্যায় টানিয়া আনিয়াছেন। (শরৎচন্দ্রের অনেক রচনাতেই পূর্ব্বাংশ ও উত্তরাংশের মধ্যে মাত্রা-সাম্য ও ভার-সাম্য নাই।) বিনা বিচ্ছেদে একজন অন্যজনের মূল্যমর্য্যাদা—সম্যক্ উপলব্ধি করে না। বিচ্ছেদের অনলালোকেই অন্নপূর্ণা ও বিন্দু দুজন দুজনকে ভাল করিয়া চিনিল।

শরৎচন্দ্র বিন্দুচরিত্র ফুটাইয়াছেন বহুভাষণের দ্বারা, আর মাধব চরিত্র ফুটাইয়াছেন মিতভাষণে। যাদবের কাছে ও অন্নপূর্ণার কাছে মাধব যে কত ঋণী তাহা বুঝাইবার জন্য একবার মাত্র মাধব বিন্দুর কাছে অনেকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলি যেমন প্রখর, তেমনি মুখর। পুরুষ চরিত্রগুলি ঠিক বিপরীত। অনেকটা সাংখ্যের পুরুষ। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসিকায় দেখাইতে চাহিয়াছেন—অন্তঃপুরের নারীগণ যাহা লইয়া দ্বন্দ্বকলহ করে তাহা যে কত তুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমাদের শিক্ষিত পুরুষগণ বেশ বুঝেন। তাহা ছাড়া, যাহার সঙ্গে আর্থিক লাভালাভের কোন সংস্পর্শ নাই তাহা লইয়া উপার্জ্জনক্ষম পুরুষরা আদৌ মাথা ঘামায় না। কখনও হাসিয়া, কখনও এক আধটি কথা বলিয়া তাহারা বালকবালিকাদের কথার মত স্ত্রীলোকদের কথাও উড়াইয়া দেয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অন্তঃপুরের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ তাহাদিগকেও স্পর্শ করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তখন পুরুষদের সজাগ হইয়া উঠিতে হয়। স্ত্রৈণ পুরুষগণ আপন স্ত্রীর বিধানই নতশিরে মানিয়া লয়। তাহারা ভাবে আর সকলকে ত্যাগ করা যায়, স্ত্রীকে ত ত্যাগ করা যায় না। আর সবল-চিত্ত পুরুষগণ ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া একটা সুসঙ্গত ব্যবস্থা করে। অন্নপূর্ণা-বিন্দুর দ্বন্দ্ব শেষপর্য্যন্ত মাধবকেও স্পর্শ করিল। অন্নপূর্ণা যখন মাধবের কোন দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন মাধবের ক্ষোভের আর অবধি থাকিল না, স্ত্রীর প্রতি তাহার অভিমান হইল অত্যন্ত দারুণ। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া একটা তুমুল কাণ্ড বাধানো বা লোক হাসানো, একটা ব্যাপার ঘটানো মাধবের-চরিত্রের সঙ্গে সমঞ্জস নয়। সে মনে মনে স্ত্রীকে একরূপ প্রেমলোক হইতে দূরে সরাইয়া দিল। মাধবের ক্ষোভ ও অভিমান যেরূপ মিতভাষায় লেখক ফুটাইয়াছেন—তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীরই নিদর্শন। মাধবের ক্ষোভ অভিমান এমনই পুরুষোচিত এবং গূঢ়গহন যে বিন্দুরও তাহা উপলব্ধি করিতে বেশ বিলম্ব ঘটিয়াছে। মাধব অবশ্য ইহাও জানিত—এ বিচ্ছেদ টিকিবে না। বিন্দুর হৃদয়বত্তার প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও ছিল। সে জানিত, অমূল্যই সব মিটাইয়া দিবে। সে নীরবে পুনর্মিলনের সুদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভাশুরের সহিত ভ্রাতৃবধূর স্নেহমধুর সম্পর্কের কথা আমাদের দেশের সাহিত্যে কোথাও নাই। বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। আমাদের সমাজে ভাশুর ভাদ্রবধূর মধ্যে বাক্যালাপও নাই—দেখাসাক্ষাৎও নাই। অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দু পরিবারে তাহা ছিল না। কাজেই এ সম্পর্কটি সাহিত্যেও স্থান পায় নাই। দেখাসাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ না থাকিলেও ভ্রাতৃবধূর সেবাপরিচর্য্যা ভক্তিশ্রদ্ধা নিত্যই ভাশুরের কাছে পৌঁছায় এবং ভাশুরের স্নেহও নানাভাবে ভ্রাতৃবধূ অন্তঃপুরের অন্তরালে থাকিয়াও অনুভব করে। কাজেই উভয়ের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক আমাদের পারিবারিক জীবনে পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান আছে। সাহিত্যে ইহা শরৎচন্দ্রের প্রথম আবিষ্কার। ইহাকে শরৎচন্দ্র সুপ্রকট করিয়া তুলিবার জন্য অবশ্য একটু বেশিমাত্রায় emphasis দিয়াছেন।

যাদব দরিদ্র ছিলেন, ভাইকে বি-এল পাশ করাইয়া চেষ্টা করিয়া ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্ততি অসামান্যা রূপসী বিন্দুর সঙ্গে ভাইএর বিবাহ দিয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত সংসারের প্রতি না তাকাইয়া তিনি মাধবের কল্যাণের দিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ছোটবৌ জগদ্ধাত্রী। ছোটবৌ বিন্দু তাহার কন্যার স্থান অধিকার করিয়াছিল—কেবল কন্যা নয়, জননী ও কন্যা যেন একাধারে। তাহার কোন দোষ ত্রুটী তিনি স্বীকার করিতেন না। বিন্দু ও যাদবের চরিত্র-মহত্ব ও স্নেহাতিশয্যের মর্য্যাদা স্বীকার করিত। দুই জায়ে যে দ্বন্দ্ব কলহ হইত তাহা যাদবের কানে যাইত; কিন্তু তাহা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। বিন্দু যে তাঁহাকে কোন বিশিষ্ট গুণের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিল তাহা মনে হয় না। প্রাণাধিক ভ্রাতা মাধবের সে পত্নী—ইহাই তাঁহার স্নেহাতিশয্যের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যাহাকে সন্ধান করিয়া বাছিয়া করিয়া ঘরে আনিয়াছেন সে যে অসামান্যা, এইরূপ একটা আত্মগৌরবও তাঁহার মনে ছিল।

তাহাছাড়া, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ লইয়া ধনবানের কন্যা তাঁহার অতি সাধারণ ঘরে আসিয়াছে—স্নেহাতিশয্যের পক্ষে ইহাও কারণ। অমূল্যের প্রতি স্নেহার্ত্তি বিন্দুকে প্রকারান্তরে গুণবতী করিয়াও তুলিল। মাধব উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে, আর এমন লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে আসিয়াছে; যাদব তাই নিশ্চিন্ত হইয়া আফিম খাইতেন আর গুড়গুড়ি টানিতেন। মাধবের উপার্জ্জন বাড়িতেছিল। যাদবের মনে ধারণা হইল—ঐ লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সংসারে শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাও যাদবের স্নেহাতিশয্যের কারণ।

কিন্তু এই যাদবকেও আঘাত পাইতে হইল। বিন্দু অন্নপূর্ণাকে ক্রোধের বশে এমন কথা শুনাইল যাহাতে অন্নপূর্ণা ছেলের দিব্য দিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—বিন্দুর বা বিন্দুর স্বামীর অর্থ গ্রহণ করিবে না। যাদব

বিন্দুর অপ্রকৃতিস্থ মুহূর্ত্তের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু অন্নপূর্ণার দৃঢ় সংকল্পকে উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কাজেই যাদবকে গুড়গুড়ি ছাড়িয়া উদরান্নের জন্ত বৃদ্ধ বয়সে ১২ টাকা মাহিনার চাকরি স্বীকার করিতে হইল। বিন্দুকে অপরাধিনী মনে না করিয়া তিনি বোধ হয় নিজের অদৃষ্টকেই দায়ী করিলেন। তবে বিন্দুর হৃদয়ের অভিজাত-বংশসুলভ উদারতা ও মহত্বের প্রতি তিনি শেষ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা হারান নাই। তাহা ছাড়া, তিনি মাধবকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাই তিনিও মাধবের মত নীরবে সুদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিন্দুর উত্তুঙ্গ অভিমান তাহার নিজের জ্বালাযন্ত্রণা যেমন বাড়াইতেছিল পুনর্মিলনে তেমনি বিলম্ব ঘটাইতেছিল। অন্নকষ্ট অপেক্ষা বিন্দুর বিচ্ছেদই যাদবের দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। অন্নপূর্ণার জন্ত প্রয়োজন হইতে পারে, যাদবের জন্ত বিন্দুর জীবনে চরম মুহূর্ত্ত সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে বিন্দুর কোন সাংঘাতিক পীড়া হয় নাই। অত্যধিক অভিমানই পীড়া, অত্যধিক অভিমানভরে ভাবাকুলা রমণীরা যাহা করে বিন্দু তাহাই করিতেছিল। এইরূপ চরিত্র লক্ষ্য করিয়াই প্রবচন আছে—ভাঙবে ত মচকাবে না। বিন্দু ঔষধপথ্য ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছিল। মাধবকে যে ভাবে মৌখিক উইলের কথা বলিয়াছিল, তাহাতে মাধব জীবনের আশা নাই ইহাই স্থির করিয়াছিল। জীবনের আশা নাই বলিবারও প্রয়োজন ছিল অন্নপূর্ণাকে আনিবার জন্ত। যাদব অমূল্য অন্নপূর্ণা আসিবামাত্র বিন্দু সুস্থ হইল—সংঘাতিক রোগ হইলে তাহা সম্ভব হইত না। যাহাই হউক, বিন্দুর স্নেহার্ত্তি ও আভিমানিক লীলায়, মাধবের নিষ্ক্রিয়তায় ও মিতভাষণে ও যাদবের অন্ধ স্নেহাতিশয্যে একটু বেশি মাত্রায় Emphasis পড়িয়া Realistic রচনাকে Idealistic করিয়া তুলিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র অন্নপূর্ণা চরিত্রই এই রচনায় বাস্তবতার মেরুদণ্ড। *

* শ্রীমান দেবনারায়ণ গুপ্ত বিন্দুর ছেলেকে নাট্যরূপ দিয়াছেন। এই নাট্যরূপেই বিন্দুর ছেলের রসরূপ আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই নাট্যরূপকে বিন্দুর ছেলের ব্যাখ্যাবিবৃতিও বলা যাইতে পারে; কথাবস্তুর যেখানে যেখানে অবকাশ বা ফাঁক ছিল, নাট্যকার তাহা ভরিয়া দিয়াছেন। নাট্যকারের সংযোজন শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব রচনাভঙ্গীর মর্য্যাদা-হানি হয় নাই। তবে ইহাতে নাট্যকারকে অনেক স্থলে ব্যঞ্জনা হরণ করিতে হইয়াছে—রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী করিতে হইলে ইহা অনিবার্য্য। অপ্রধান চরিত্রগুলি মূল চরিত্রগুলির পরিপুষ্টির জন্তই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসিকায় অবতারিত হইয়াছিল। নাট্যকার নাটকের কলা-কৌশলের প্রয়োজনে সে চরিত্রগুলিরও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া অমূল্যর বাল্যচরিত্র ইহাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অমূল্য যাহাতে একটা পুতুল না হইয়া পড়ে, সেদিকে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল—সেই উদ্দেশ্যেই নরেন্দ্র চরিত্রের অবতারণা। নাট্যরূপে অমূল্য আরও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যরূপে কয়েকটি গান সংযোজিত হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে যাদবেন্দ্ররচিত বাৎসল্যরসের পদটির সংযোজনায় প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর রসবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যশোদার মুখের ঐ কথা-গুলিতেই সমগ্র রচনাটির প্রাণবস্তু নিহিত আছে। ধাত্রীমাতৃত্বের দিক হইতে যশোদা ও বিন্দুতে কোন তফাৎ নাই।

উদাসী

শ্রীকমল মৈত্র

কে তুমি উদাসী ফিরিছ একাকী
কাহারে ডাকি'
কাহার আশায় নাচিছে তোমার
চপল আঁখি।

খুঁজিছ যারে
পার কি তারে
বাঁধিতে কভু
হৃদয়ে রাখি'!

পথের মাঝেই নানান কাজে,
লুকায়ে আছে,
আঁখির তারায় হৃদয় দোলায়
জড়ায়ে লাজে।
তোমার পানে
নিবিড় টানে
চলিতে দানে
তোমারে ফাঁকি।
বৃথাই বুঝি ফিরিছ খুঁজি তাহারে ডাকি

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

৫

আমরা যখন প্রাসাদ ত্যাগ করিলাম তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র তখন পশ্চিমে চলিয়াছে। রাজপথে জনসমাগম বিরল। বিপণীসমূহের লোকসকল তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় শেষ করিয়া দোকান-পাট বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। আমাদের রথের শব্দ শুনিয়া, এই নিশীথ সময়ে কে যায় তাহা জানিবার জন্য, পথিপার্শ্বস্থ বিপণীসমূহের অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার হইতে ও গৃহসকলের গবাক্ষ শ্রেণী হইতে কেহ কেহ আমাদিগের দিকে চাহিয়াছিল।

কতকদূর আমরা নীরবে আসিয়াছিলাম ; পিতা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—

"আর্য্য মহাস্থবির, ক্ষত্রপের কথাগুলি উপলব্ধি করিতে পারিলেন কি ?"

—করিয়াছি তাত এবং তাহাই ভাবিতেছি।

—কি ভাবিতেছেন, আর্য্য ?

—ভাবিতেছি, অনেক কথা ; কিন্তু এখন পথে সে সকল কথার আলোচনার স্থান নহে এবং তাহার সুবিধাও হইবে না। ক্ষত্রপের গুপ্তচরে সমগ্র গন্ধারদেশ পরিব্যাপ্ত। মিথ্যা ও বিদ্বেষ-সম্ভূত সংবাদ এই সকল চর ক্ষত্রপ ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বিদ্বেষ আমাদের জাতীয়তার, একপ্রাণতার ও ঔদার্য্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরাই আপনাদিগের প্রতি যখন কর্ত্তব্যবিমুখ, তখন বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী শাসক যে প্রজার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য ভুলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? এখন আবার সাম্রাজ্যের চারিদিকে শত্রু—অন্ধকার ক্রমে ঘন হইয়া যবনের সাম্রাজ্যকে ছাইয়া ফেলিতেছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ও বিশ্বাস-ঘাতকতা। আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে সকলেই বড় করিয়া দেখিতেছে। শাসকবৃন্দ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া সন্ত্রস্ত ও ভীত। তাহারা বুঝিয়াছে যে এই প্রাচ্য যাবনিক সাম্রাজ্যে এখন জরা ও স্থবিরতা আসিয়া দেখা দিয়াছে।

—কিন্তু অত্যাচার ত কমে নাই—বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে—জনসাধারণকে উৎপীড়নে ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

—তাত, আপনি ভুলিতেছেন—এখন এইরূপ অবস্থাই স্বাভাবিক—দুর্ব্বল হস্ত হইতে যখন শাসন দণ্ড স্খলিত হইবার উপক্রম হয় তখন শ্লথ মুষ্টিকে দৃঢ় করিবার প্রয়াস মানবসমাজের ইতিহাসে একটা চিরন্তন সত্য।

—আর, আমরাও কত ক্ষুদ্র, কত নীচ, কত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি! আজ এই যবন শাসনের দুর্দ্দিনেও আমরা আমাদের শাসক প্রভুদের দ্বারপ্রান্তে লোলজিহ্বা কুক্কুরের মত তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি এবং সুযোগ বুঝিয়া পদলেহন করিতেছি।

—ইহাও পরাধীনতার একটা অনিবার্য্য ফল। জাতীয়তার পরিধি স্বল্পপরিসর হইয়া পড়ে—ব্যক্তিগত গণ্ডীতে পর্য্যবসিত হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল অন্তর্দ্রোহ—তাহাও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট দেখা দিয়াছে। আমাদিগকে একেবারে দুর্ব্বল ও অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে। এই নির্জ্জীব দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার না হইলে আর কোনও আশাই নাই। আমাদিগকে সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন করে নাই—আমরা নির্জ্জীব—জীবনহীন—আমরা মৃত। এই মৃত দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারের আবশ্যক, তবে এই জাতীয় দেহের জরাব্যাধি দূর হইবে। এই জাতির পুনর্জ্জন্ম না হইলে আর রক্ষা নাই। আমূল পরিবর্ত্তন,—বিপ্লব,—তাহা না হইলে আর রক্ষা নাই।

—তাহা হইবারও ত কোনও আশা দেখা যাইতেছে না!

—হয় ত একটা অভিনব অভ্যুদয়ে বর্ত্তমানকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। প্রাচীন ধ্বংসের ভস্মস্তূপ হইতে নূতন জাতীয়তার সৃষ্টি হইবে। কিরূপে যে হইবে তাহা হয়ত আমাদের এখনও কল্পনাতীত। অপ্রত্যাশিত প্লাবনের জলোচ্ছ্বাস যেমন শুষ্ক ধরিত্রীর মৃত ও নষ্ট উর্ব্বরতাকে সঞ্জীবিত করে, জাতীয়তার পুনর্জ্জন্ম মানব-সমাজে অনেকটা সেইরূপই হইয়া থাকে।

—সে ত এখন একটা আশার স্বপ্ন রচনা মাত্র। তাহার সম্ভাবনা এখন সুদূর ভবিষ্যতের তমোগর্ভে নিহিত।

—কে জানে?—হয়ত শীঘ্রই হইতে পারে। বাহ্লিক-গন্ধার সাম্রাজ্যের সুদূর চক্রবালে যে ক্ষুদ্র একখানা মেঘ দেখা দিয়াছে, তাহার সংবাদ রাখেন কি, তাত? এই আপাতক্ষুদ্র মেঘখণ্ড যে সর্ব্বগ্রাসী হইয়া সমগ্র আকাশকে ছাইয়া ফেলিবে না—একথা কে বলিবে?—একটা প্লাবন যে আসিবে—তাহার পূর্ব্বাভাষ ইতিমধ্যেই দেখা দিতেছে।

—কিন্তু সুবিধা পাইলেই কি বহিঃশত্রু আসিয়া আমাদের রক্তশোষণ করিবে?—আর আমরা তাহাদের পদধূলি অঙ্গে মাখিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব?

—কিন্তু আমাদের জাতির অদৃষ্ট সম্বন্ধে এখনও একেবারে আমি

হতাশ্বাস হই নাই ;—দুঃখের দারুণ কশাঘাতে—অদৃষ্টের নির্ম্মম তাড়নায় —কালের গতিতে—হয়ত এক অভিনব অভ্যুদয়ে—এক নবীন প্রাণ-সঞ্চারে মৃত সঞ্জীবিত হইবে। হয়ত সেদিন শীঘ্রই আসিবে।

—শীঘ্রই ?—কত শীঘ্র ?—এই আশার মোহে আর আমাদের কতদিন কাটিবে। অনেক দিন ত এইরূপ আশার ছলনায় আমরা ভুলিয়া আছি ;—আরও কতদিন আমরা নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডের মত এই নবীন অভ্যুদয়ের আশায় দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া থাকিব—কবে আমাদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া ?

কিছুক্ষণ উভয়ে মৌন রহিলেন। তাঁহাদের কথায় আমার অন্তরে একটা অভিনব ব্যঞ্জনা ও প্রেরণা অনুভূত হইতেছিল।

পিতা বলিলেন, "আর কতদিন এইরূপে শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় আমাদের কাটিবে ? এই বাহ্লিক গান্ধারের স্বর্ণভূমি কত জাতির রক্তে রঞ্জিত হইল—কতবার কপিসার ও বক্ষুর নির্ম্মল রজতধারা লোহিত হইয়া গেল—কত পুরাতনের তিরোভাবের সহিত নূতনের আবির্ভাব হইল ! কিন্তু আমাদের জড়ত্ব আর ঘুচিল না। আমরা সেই নির্জ্জীব হইয়াই পড়িয়া রহিলাম,—সে শুভ মুহূর্ত্ত আর আসিল না,—মৃতদেহে আর নূতন প্রাণসঞ্চার হইল না।"

—কিন্তু, তাত, মনে রাখিবেন আমরা কত হীন হইয়া পড়িয়াছি,—কিরূপ জড়ত্বে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—এই মোহের ঘোর কাটিতে কিছু সময় লইবে ত ? এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়া যদি আমাদের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা প্রবুদ্ধ হয়, আর বাহিরের আক্রমণ যদি বর্ত্তমানকে মুছিয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদের সেই ঈপ্সিত দিবস শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে।

পিতা মহাস্থবিরের সব কথা ভাল করিয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক শুনিলেন কি না, জানি না। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী হইয়া থাকিবার পর একটা ব্যথাপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"আজ আমরা কত হীন ও দুর্ব্বল ! গৃহ-বিবাদে ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় শতধা বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত। বাহির হইতে যে শত্রু আসিতেছে তাহাদিগের সকলকেই আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইতেছে। তাহাদের পদাঘাত আমরা হাসিমুখে সহ্য করিতেছি !—উৎপীড়িত হইয়া উৎপীড়নের প্রতিকার করিবার সামর্থ্য বা অধিকার আমাদের নাই। প্রতিকারের প্রয়াসমাত্রই রাজদ্রোহ ! আমাদের দেশ আজ আমাদের নয়,—স্বদেশে আজ আমরা গৃহহীন প্রবাসী,—গৃহে থাকিলেও আজ আমরা স্বদেশের ও স্বগৃহের সকল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত,—এই জীবনের অবসানেই আমাদের সকল দুঃখের শেষ,—মৃত্যুই আমাদের মুক্তি,—আর কোনও পথ নাই।

—তাত, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন—মৃত্যুই আমাদের সকল দুঃখের—সকল যন্ত্রণার অবসান আনয়ন করিবে।—কিন্তু সেরূপভাবে মরিতে ত আজও শিখিলাম না—যে মরণে একটা জাতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে—যে মৃত্যু নির্জ্জীব জীবাশ্মের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে ! আমাদের মত জন কয়েকের মৃত্যুতে যদি দেশ বাঁচিয়া উঠে—জাতি প্রবুদ্ধ হয়—তাহা হইলে এইরূপ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এ মরণ কেবল যে আমাদের দুঃখযন্ত্রণার অবসান আনয়ন করিবে তাহা নহে—ইহা অবদান—ইহা জাতিকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে—তাহাদিগের মধ্যে অভিনব প্রেরণার সঞ্চার করিবে।

—কিন্তু এই অবদানের কথা দেশকে কে বুঝাইবে—আমাদের দেশের জনসাধারণ কিরূপে ইহা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবে—কিরূপে এই মহাসত্য প্রণিধান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে—তাহা ভাবিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে কে ?—কেই বা সাধারণকে কর্ম্মপন্থা দেখাইয়া দিবে ?

—তাত, নিশ্চিন্ত থাকুন, সবই হইয়া যাইবে, কাহারও বা কিছুর অভাব হইবে না। সময়ের প্রতীক্ষা করুন।

—আমি ত হতাশ হইয়াছি !

—ধৈর্য্য ধরুন ; সময় আসুক সব ঠিক হইয়া যাইবে ; শীঘ্রই আসিবে সেদিন। প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন সেই শুভদিনের।

মহাস্থবির মৌন হইলেন। উভয়ের আর কোনও কথা হইল না ; এবং তাহার সময়ও ছিল না, কারণ রথ ততক্ষণ বিহারদ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।

পিতা-পুত্রে আমরা তখন মহাস্থবিরের সহিত রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বিহার দ্বারে তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া বিদায় লইলাম। তিনি বিহারে প্রবেশ করিলে আমরা রথে পুনরারোহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রয়াণ করিলাম।

রাত্রি অধিক হইলেও পথিপার্শ্বস্থ কোনও কোনও গৃহে তখনও আনন্দের কলরোল শ্রুত হইতেছিল। পথেও দুই একজন বিলাসী আসবোন্মত্ত যুবক স্খলিত পদে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল। কেহ বা তাহার অনির্দ্দিষ্টা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে জড়িতস্বরে প্রমত্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা সঙ্গীত জানাইতে প্রয়াস করিতেছিল। কোথাও বা বারবিলাসিনী তাহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া নায়কের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত ছিল—বোধ হয়, উৎসবা-নন্দের পর প্রেমিক বিদায় লইতেছিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের প্রথমার্দ্ধে আমরা প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে আর্য্যপালক ও তাঁহার পুত্র প্রজ্ঞাবর্দ্ধন আমাদের প্রাঙ্গণে আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তাঁহারা এত শীঘ্র গৃহে ফিরিয়াছেন দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছিলাম। রাত্রি অধিক হওয়াতে আমরা অধিকক্ষণ বিশ্রম্ভালাপে অতিবাহিত না করিয়া পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে তৎপর হইলাম। আর্য্যপালক ও তাঁহার পুত্র আমাদিগের নিকট সমধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং আমরাও যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিলাম।

ইতি দেবদত্তের আত্ম চরিতে গৃহপ্রত্যাগমন নামক পঞ্চমবিবৃতি।

৬

বৈশাখী পূর্ণিমায় আমি মুণ্ডিতশীর্ষ হইয়া যথাবিধি স্নান করিয়া ভিক্ষুর পীতবাস পরিধানপূর্ব্বক উপোসথ পালন করিলাম এবং দীক্ষা গ্রহ-ণোদ্দেশ্যে মহাস্থবিরের নিকট উপনীত হইলাম। আমার সঙ্গে পিতা, মাতা ও চিত্রলেখা গিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে মহাস্থবিরের হস্তে

সমর্পণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। পুরুষপুর বিহারের নিয়মানুসারে দীক্ষার পর এক মাসকাল আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক বিহারের ভিক্ষাবাসে ভিক্ষুগণের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহাদের ব্যবস্থা ও বিধি-মানিয়া চলিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় সংঘারামের চৈত্যগৃহে ভিক্ষুদিগের পাতিমোক্‌খ সংঘ * সংগঠিত হইল; এবং বৈশাখী পূর্ণিমায়, পাতিমোক্‌খ সংঘে, আমি সদ্ধর্ম্মী বলিয়া গৃহীত হইলাম। অনুষ্ঠান শেষ হইলে সম্মিলিত ভিক্ষু ও শ্রমণগণের সহিত আমি চৈত্যগৃহের বাহিরে আসিলাম। সেদিন উপসোথপালন দিবস। আহ্বান মণ্ডপে ধর্ম্মকথন আরম্ভ হইল। অনেক সদ্ধর্ম্মী গৃহপতি-গণ উপসোথপালনান্তে সপরিবারে ধর্ম্মশ্রবণোদ্দেশ্যে মণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত এই ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছিলাম।

প্রথম প্রহরান্তে, যখন ধর্ম্মকথন হইয়া গেল, তখন আর্য্য মহাস্থবির বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সুমধুর স্বরে গাহিলেন—

আমি প্রণমি তোমার চরণে।
দুরজয় মারে করি পরাজয়,
সংসারের যত গ্লানি, দুঃখ ভয়
মুছিয়া দিয়াছ—
দিয়াছ অভয়,
তাই, এসেছি তোমার সদনে।
আমি প্রণমি তোমার চরণে।
তোমার করুণা
অমিয় নিঝর,
সুধা ধারা তাহে—
ঝরে নিরন্তর,
আমি করিয়াছি পান,
পেয়েছি সন্ধান
তৃষ্ণা † বিহীন
প্রশান্ত নিব্বান ‡
তোমার করুণ নয়নে।
ওগো রাখ মোরে তব ভবনে।
আমি প্রণমি তোমার চরণে।

এই মঙ্গল গাথা আবৃত্তির পর আমরা সকলে ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। সকলে মিলিতকণ্ঠে "ত্রিশরণ" * আবৃত্তি করিলাম।

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।" †

ধর্ম্মশ্রবণে সপরিবারে সমাগত গৃহপতিগণ, সমবেত ভিক্ষু ও শ্রমণমণ্ডলী বিদায় গ্রহণ করিলে আর্য্য মহাস্থবির আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার বিহারবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেলেন। কক্ষটি আর্য্য মহাস্থবিরের শয়ন গৃহের পার্শ্বে অবস্থিত। আয়তনে প্রশস্ত—একপার্শ্বে বিস্তৃত শয্যা—অপরদিকে গৃহকোণে একটি ধাতুময় দীপাধারে একটি ধাতুনির্ম্মিত প্রদীপ জ্বলিতেছে। কক্ষের অপর কোণে একটি ধাতুনির্ম্মিত কলসী ও একটি ঝারি—দুইটাই জলপূর্ণ—এবং ভিক্ষুর নিত্যব্যবহার্য্য অপর কয়েকটি তৈজসপত্র রক্ষিত আছে। শয্যার নিকট কক্ষতলে একখানি প্রশস্ত দর্ভাসন বিস্তৃত।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া আর্য্য মহাস্থবির আমাকে বলিলেন—

"এই কক্ষ তোমার বিহারবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষু-জীবনের পবিত্রতা তোমাকে একমাসকাল অতি সতর্কতা ও কঠোরতার সহিত পালন করিতে হইবে। এখন, তোমার এই দীক্ষার পর, কয়েকটি কথা তোমাকে আমার বলিবার আছে।—আমার সহিত গর্ভগৃহে আইস।"

মহাস্থবির আমাকে লইয়া সংঘারামের চৈত্যগৃহে প্রবেশ করিলেন। চৈত্যের গৃহপ্রাচীরে একটি গুপ্ত কীলকে চাপ দিবামাত্র প্রাচীরের এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সরিয়া গেল এবং নীচে নামিবার সোপানশ্রেণী দৃষ্ট হইল। সোপানের অলিন্দে দীপশ্রেণী পূর্ব্ব হইতেই জ্বলিতেছিল। মহাস্থবির আমাকে নিম্নে অবতরণ করিতে বলিলেন। আমি নামিলাম। মহাস্থবির সোপানাবলীর শীর্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অপর একটি কীলকের সাহায্যে অপসৃত প্রস্তরখণ্ডকে যথাস্থানে সন্নিবেশপূর্ব্বক আমার সহিত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া আমরা একটি প্রশস্ত কক্ষে উপনীত হইলাম। গৃহটিতে সাধারণ বাতায়ন বা গবাক্ষের সম্পূর্ণ অভাব। বায়ু চলাচলের জন্য গৃহের ছাদের ও নিম্নের অলিন্দের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি সুবৃহৎ ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি নলের দ্বারা সংঘারামের প্রাচীরের ভিতর দিয়া বাহিরের উন্মুক্ত বায়ু কক্ষ মধ্যে আনিতেছে ও গৃহের বদ্ধ বায়ুকে বাহিরে মুক্ত করিয়া দিতেছে। বাহির হইতে সংঘারামের প্রাচীর-শিখরে ও গাত্রে যে অসংখ্য বৃহদাকার জালাবৃত ছিদ্র দৃষ্ট হয়, আজ তাহাদিগের সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম। প্রকোষ্ঠটি ভূগর্ভে এবং সংঘারামের চৈত্যগৃহের ঠিক নিম্নে অবস্থিত।

---

* পাতিমোক্‌খ সংঘ ভিক্ষুদিগের পূর্ণিমা সম্মেলন। এই সম্মেলনে বা সংঘে ভিক্ষু ও শ্রমণগণ আপনাদিগের কায়মনোবাক্যে আচরিত পাপের বিবরণ সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিয়া বৌদ্ধ মতানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেন এবং ইহাতে নবীন দীক্ষার্থীগণও দীক্ষা লাভ করিয়া সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধ বলিয়া গৃহীত হন। পাতিমোক্‌খ সংঘ প্রতি পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

† তৃষ্ণা—আকাঙ্ক্ষা, মানসিক তৃষ্ণা।

‡ নিব্বান—বৌদ্ধমুক্তি, নির্ব্বাণ।

* (পালি) তিসরণং বা সরণত্তয়ং। ইহা সর্ব্বাস্থিবাদী (হীনযান) বৌদ্ধদিগের প্রাথমিক দীক্ষামন্ত্র বা creed.

† (পালি) "বুদ্ধের শরণ লইলাম। ধর্ম্মের শরণ লইলাম। সংঘের শরণ লইলাম।"

ঘরের আয়তন বেশ প্রশস্ত। প্রস্থে প্রায় ত্রিশ হস্ত এবং দৈর্ঘ্যে ও উচ্চতায় যথাক্রমে ষাটি ও চতুর্দ্দশ হস্তের ন্যূন হইবে না। এই কক্ষের একপ্রান্তে মর্ম্মর নির্ম্মিত পঁচিশটি সুবৃহৎ আধার রক্ষিত ছিল। আধারগুলি সুরক্ষিত এবং ইহাদের উপরকার আবরণগুলিতে সংলগ্ন এক একটি প্রস্তর কীলক সাহায্যে উদ্ঘাটিত হয়। প্রত্যেক আধারের সম্মুখের গাত্রে এক-একটি লিপি খোদিত আছে।

কক্ষটির চারিকোণে ও মধ্যস্থলে দশটি করিয়া পঞ্চাশটি গন্ধদীপ জ্বলিতেছে এবং ইহাদের উজ্জ্বল আলোকে কক্ষটি উদ্ভাসিত। গৃহপ্রান্তে, প্রস্তরাধারগুলির সম্মুখে একখানি পশুলোম নির্ম্মিত আস্তরণ বিস্তৃত। আর্য্য মহাস্থবির আমাকে এই শয্যার উপর বসিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বসিলেন; আমিও তাঁহার সহিত উপবেশন করিলাম। আমরা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখে বসিয়াছিলাম যাহাতে কথোপকথনের সুবিধা হয়।

মহাস্থবির বলিলেন "দেবদত্ত, আজ বৈশাখী পূর্ণিমা—সদ্ধর্ম্মীগণের * অতি শুভদিন—আজ এই অমল শুভ্রবাসরে তোমার দীক্ষা হইল—আশা করি ও আশীর্ব্বাদ করি যেন অদ্য এই শুভদিনের শুভ সূচনা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে সার্থকতা ও সাফল্য আনয়ন করে। তোমার জন্মদিনে আমি অঙ্ক পাতিয়া গণিয়াছিলাম। গণনা করিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে কখনও অপর কোনও জাতকের ভাগ্যে দেখি নাই। সন্দেহ হইল ভুল হইয়াছে—খড়ির অঙ্ক মুছিয়া ফেলিলাম, আবার গণিলাম—সেই একই ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ। বিশ্বাস হইল না—আবার খড়ি পাতিলাম—অনেক ভাবিলাম—অনেক কষিলাম—বুঝিলাম ভুল হয় নাই। তোমার করকোষ্ঠি দেখিলাম—আমার গণনার সহিত মিলিয়া গেল। বুঝিলাম যে আমাদের মধ্যে আজ এক অভিনব প্রতিভার উদয় হইয়াছে। তখনই জানিয়াছিলাম যে ধর্ম্ম ও সংঘকে বিধর্ম্মীর নির্য্যাতন হইতে তুমিই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। যাঁহার পথ চাহিয়া আমরা এতদিন বসিয়া আছি তিনি আসিয়াছেন।—যে দিনের উদয়ের আশায় আমরা উৎসুকনেত্রে সুদূর গগনপ্রান্তে এতদিন চাহিয়া চাহিয়া কাটাইয়াছি, আজ তাহার রক্তিমরাগ পূর্ব্বদিগন্তে দেখা দিয়াছে। অদ্য এই শুভ পূর্ণিমায়—এই পবিত্রতম চৈত্যের গর্ভগৃহে তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছি কেন জান?—দেখিতেছ তোমার সম্মুখে মাল্য চন্দন রক্ষিত হইয়াছে—আজ তোমার অভিষেকের দিন। কিন্তু তোমার এই অভিষেকের কথা কেবল তুমি আর আমি জানিব। আর জানিবে জনকয়েক যুবক—যাহাদিগকে আমি দরিদ্র, উৎপীড়িত ও সহায়হীন সাধারণের রক্ষাকল্পে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই ব্রতীসংঘের অদ্য হইতে তুমি নেতা হইলে। নূতন ব্রতীদের প্রতি পূর্ণিমায় ব্রতগ্রহণের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানের তুমি অদ্য হইতে পৌরহিত্য করিবে, আমি তোমার সহায়তা করিব মাত্র। ব্রতীসংঘের সকল অনুষ্ঠান ও সম্মেলন এই পবিত্র গর্ভগৃহে হইবে এবং তাহাদের সময় ও কার্য্যসূচী যথাসময়ে আমি তোমাকে অবগত করিব। এখন তুমি এই পবিত্রতম স্থানে, অদ্য এই শুভ্র পূর্ণিমাবাসরে, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সংঘের জন্য, তুমি আপনার সকল চিন্তা বিস্মৃত হইয়া,—সকল সুখদুঃখকে ভাসাইয়া দিয়া,—সংসারের সকল হীন ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বন্ধন ছিন্ন করিয়া,—আপনার সকলপ্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া,—তোমার এই অভিনব কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। মানবের প্রতি মানবের পাশব অবিচার ও অত্যাচার—নির্ম্মম, নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতা—দূর করিতে চেষ্টা করিবে। তজ্জন্য যদি কঠোর ও নির্ম্মম হইতে হয় তাহাও হইবে।—শপথ কর!"

আমি আমার দীক্ষাগুরু আর্য্য মহাস্থবিরের জানুস্পর্শ করিয়া বলিলাম—"শপথ করিলাম, আর্য্য!"

—তবে আইস! ব্রতগ্রহণ কর! আজ হইতে তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর এই বিশাল প্রদেশের জনসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ইহা একপ্রকার প্রব্রজ্যা; আপনার সকল সুখদুঃখ—মঙ্গলামঙ্গল—বিসর্জ্জন করিয়া জনসমাজের ঐহিক মঙ্গলকামনায় নিরত থাকিবে;—অত্যাচারীর উচ্ছেদসাধন করিবে;—বিধর্ম্মী, নিষ্ঠুর, মাংসোপাসক যবনকে স্বর্ণভূমি বাহ্লিক-গন্ধার হইতে বিতাড়িত করিবে,—কিংবা যদি আবশ্যক হয় ত তাহাদিগকে বধ করিয়া নির্ম্মূল করিতেও দ্বিধা বোধ করিবে না। শপথ কর!

—শপথ করিলাম, আর্য্য!

নিকটে একটি পাত্রে পুষ্পমাল্য ও অপর একটি ক্ষুদ্র পাত্রে রক্তচন্দন রক্ষিত ছিল। আর্য্য মহাস্থবির আমাকে সুগন্ধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা এক বিন্দু রক্তচন্দন লইয়া আমার কপালে টীকা রচনা করিয়া দিলেন।

আমি আর্য্য মহাস্থবিরের পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

মহাস্থবির বলিলেন "আজ যে এই রক্তচন্দনের টীকা তোমার কপালে অঙ্কিত করিয়া দিলাম—দেখিও যেন তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। তুমি আজ যে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে সে রাজ্য সুখ ও বিলাস বর্জ্জিত। সে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আত্মত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে।—তাহা যেন কখনও বিস্মৃত হইও না।"

—কখনও ভুলিব না, আর্য্য।

—দেশ ও ধর্ম্মের উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক অর্থের আবশ্যক—তাহাও এই প্রাচীন সংঘকর্ত্তৃক বহুদিন হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। ঐ যে পঁচিশটি মর্ম্মর নির্ম্মিত সুবৃহৎ রত্নাধার দেখিতেছ—উহাতে এই সুমহান্ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অর্থ ন্যস্ত আছে। এস তোমাকে তাহা দেখাইয়া দি। এই সকল সঞ্চিত অর্থ আজ হইতে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম—দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সংঘের জন্য, আর্ত্তের জন্য, আবশ্যকবোধে ইহার সদ্ব্যয় করিবে।

আমরা উভয়ে উঠিয়া প্রথম রত্নাধারটি নিকট গেলাম, দেখিলাম তাহার উপরে খোদিত রহিয়াছে "শ্রেষ্ঠী অমরদাসের দান।" একটি কীলক সাহায্যে রত্নাধারের আবরণ উদ্ঘাটিত হইল। দেখিলাম এই সুবৃহৎ আধার সুবর্ণ দিনারে পূর্ণ। পঁচিশটি আধারই এইরূপ

* বৌদ্ধদিগের।

স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ এবং পঞ্চবিংশ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও সংঘের মঙ্গলকামনায় এই অর্থ পুরুষপুরের সংঘের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আর্য্য মহাস্থবির এই সকল রত্নাধারে স্তূপ ধনরত্নসমূহ আমাকে দেখাইয়া আবরণগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

মহাস্থবির এই গর্ভগৃহে রক্ষিত ধনসমূহ দেখাইয়া আমাকে পুনরায় বসিতে বলিলেন, এবং তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় আমার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—

"সকলই আজ তোমাকে দেখাইয়া দিলাম—সকল কথাই প্রকাশ করিলাম—যাহা কিছু সংঘের হস্তে ন্যস্ত ছিল তাহা আজ তোমাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু যদি তুমি তোমার কর্ত্তব্যে অবহেলা কর—যদি দেশ, ধর্ম্ম, সংঘ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের সুযোগ তোমার নিজের স্বার্থের জন্ম অবহেলা কর—যদি অসংযত হৃদয়ে মারের প্রলোভনে পড়িয়া তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হও, —তাহা হইলে আমার আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিসম্পাত তোমার মস্তকে বর্ষিত হইবে—দীর্ঘনিশ্বাসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তোমাকে দগ্ধ করিবে —দেশব্যাপ্ত সমগ্র অত্যাচার ও অবিচারের ভার তোমাকে নিষ্পেষিত করিবে—বিমর্দ্দিত করিবে।

—স্বীকার করিলাম—শপথ করিলাম—আপনার কর্ত্তব্যপথ হইতে জ্ঞাতসারে কখনও বিচ্যুত হইব না—আর যদি কখনও হই—তাহা হইলে যে কোনও শাস্তি আপনি আমার জন্য ব্যবস্থা করিবেন তাহা আমি নতশিরে গ্রহণ করিব।

—বৎস, এখন তুমি আমার ব্যবস্থার অতীত। তুমি এখন হইতে আপনার ব্যবস্থা আপনি করিয়া লইবে। শাস্তি বা পুরস্কার এ সব এখন তোমার অধিকার। সংঘের মত গ্রহণ করিয়া এখন হইতে তুমি আপনার কর্ত্তব্য আপনি নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। অদ্য হইতে তোমার অনুমতি ব্যতীত এই গর্ভগৃহে কেহ প্রবেশ করিবে না। আমি এখন হইতে তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া, তোমার আদেশানুসারে, এই সকল অর্থ রক্ষা করিব। জনসাধারণের হিতকল্পে যেরূপভাবে ইচ্ছা সেইরূপে তুমি এই অর্থের সদ্ব্যয় করিবে। এখন এস—এই গর্ভ গৃহের আরও একটি গুপ্ত পথ আছে তাহা দেখাইয়া দি। এই পথ আর কেহ জানে না। আবশ্যক হইলে এই পথ দিয়া তুমি গমনাগমন করিতে পারিবে।"

আমরা উত্তরে উঠিলাম। গর্ভগৃহের উত্তরদিকে এক পার্শ্বে একটি লৌহ কিলক দেখাইয়া দিয়া মহাস্থবির আমাকে বলিলেন—

এই কীলকটি বামদিকে ঠেলিয়া দিলে গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত হইবে। দ্বারের অপর পার্শ্বে এইরূপ আরও একটি কীলক আছে; ওদিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে সেটিকে দক্ষিণ দিকে ঠেলিতে হয়। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্ম বিপরীত দিকে ঠেলিবে।

আর্য্য মহাস্থবির এই কথা বলিয়া গৃহকোণ হইতে দুইটি মশাল লইয়া প্রজ্বালিত করিলেন। একটি আমার হস্তে দিয়া এবং অপরটি স্বয়ং বাম হস্তে লইয়া, দক্ষিণ হস্তে কীলকটি বামদিকে হেলাইলেন।— ভিত্তিগাত্রের একটা সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সরিয়া গিয়া এক অন্ধকারময় প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। আমরা মশাল হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মহাস্থবির অপর দিকে লৌহ কীলক বিপরীত দিকে ঠেলিয়া গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে অভিষেক নামক ষষ্ঠ বিবৃতি। (ক্রমশঃ)

মনস্তাত্ত্বিক

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

[প্রহসন]

হাল্কা বাজনা: Spring Fantasia গোছের।—সুরটা একটু নিস্তেজ হয়ে আসতেই প্রযোজক বললেন, নমস্কার! আসুন প্রথমেই আপনাদের সঙ্গে আজকের অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীদের একটা মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। পরেশ বাপ-মা-মরা ধনী সন্তান, স্নেহশীলা মাসিমা' হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণের কাছে ছোট থেকে লালিত-পালিত-বর্দ্ধিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দর্শনশাস্ত্রে ও মনোবিজ্ঞানে এম-এ দিয়েছে। অশোক, পুণ্ডরীক, উমেশ প্রভৃতি তাঁ'র বন্ধু, অন্তরঙ্গ বা সহপাঠী। সুশীলা হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণের কন্যা, সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বাণী, সরমা প্রভৃতি কেউ সমবয়সী, কেউ সমবয়সী না-হয়েও বান্ধবী। আশে-পাশের বাড়িতে থাকে।

হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণ একটু স্থূলকায়া। স্বামী চরণদাস—নিরীহ, ক্ষীণকায়, নেহাৎ ভদ্রলোক। স্ত্রী তাঁ'র নিজের দেহ-পরিধি এমন কিছু অসামান্য মনে করেন না এবং এ-নিয়ে কেউ কোন মন্তব্য করলে বিলক্ষণ চটে যান।

আরো একটি পাত্রী আছে—পুঁটী। এর পরিচয় দেবেন পরে।

প্রথম দৃশ্য সুরু হচ্ছে দারুণ উৎকণ্ঠার ভিতর। আজ পরেশের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হ'বে। সকাল-সকাল খেয়ে পরেশ বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি। যে-কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে। বেলা গড়িয়েছে অনেকটা: হেমাঙ্গিনী দেবী একটু গড়াগড়ি দিচ্ছেন—তাঁর ভাষাতেই বললুম—এমন সময়

এখানেই প্রযোজক থামলেন

প্রথম দৃশ্য

সুশীলা ছুটে ঘরে ঢুকল। থমকে দাঁড়ালে সে, কেননা হেমাঙ্গিনীর নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে সুশীলা মা'কে ডাকল।

সু। মা'! শুনছ? (বাধাপ্রাপ্ত নাসিকা গর্জন)—বলি, কা'রা সব বেড়াতে এয়েছেন—দেখবে এসো!...

হে। নাঃ, তোর জ্বালায় এ-বাড়িতে তিষ্ঠোবে কা'র সাধ্যি! রোগা শরীরটা নিয়ে আর পারিনে বাবু! সারাটা দিন সংসারের ঝক্কি পুইয়ে যেই না একটু শুয়েছি, অমনি সুরু হয়েছে মেয়ের চীৎকার। বাঘ পড়েছে, না ডাকাত?

সু। বাঘ নয়। ডাকাত-ও নয়। পাড়া থেকে সবাই বেড়াতে এয়েছেন, দেখোই না'সে। বাণীর দিদি—সেই এলাহাবাদে যা'র বিয়ে হয়েছে, সরমার মা', সরমা, রাধুর পিসি, বাণী তো আছেই—আরো সব: তা'দের সবাইকে কি চিনি নাকি আমি? সব বসে আছেন ঐ ঘরে।

হে। বাপ্‌রে! ফর্দ যা' দাখিল করেছ একখানা—পারি নে আমি। ছোঁড়াটার পরীক্ষায় কি হয়েছে তা'র ঠিক নেই কিছু: দুর্ভাবনায় চোখ বুজতে পারি নে—তুই আছিস শুধু সারাখানা বাড়ি চষে বেড়াতে। নিয়ে আয় তা'দের এখানেই।

দুপ্‌দাপ্‌ করে বেরিয়ে গেল সুশীলা। দরজায় বিষম শব্দ হ'ল। হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণ চমকে উঠলেন

হে। উঃ ঠিক যেন টাট্টু ঘোড়া। কী মেয়ে যে হয়েছে! সারা দিন দস্যিপনা; বাপের আদরে মাথাটা গ্যাছে নষ্ট হ'য়ে। বিয়েটা দিয়ে ফেললে শান্তি হয়। মেয়েটার দিকে চাওয়া যায় না, ঠিক যেন কলাগাছের মত বেড়ে যাচ্ছে।

মহিলার দল একে-একে প্রবেশ করতে লাগলেন—চুড়ি, ভাওাল ইত্যাদির শব্দ

—মাথাটা বুঝি তুলতেই পারছেন না আজ? সুশীলার কথায় বড্ড দুঃখ হ'ল?

—পরেশের বুঝি আজ পরীক্ষার খবর বেরুবে? তা' সে তো খুব ভাল ভাবেই পাশ করবে?

—সুশীলার মুখে আপনার কথা শুনি কত! রোজই ভাবি বেড়াতে আসব—তা—

—এ তো ভাল কথা নয়, এ্যাতো ভুগ্‌লে। ভাল ডাক্তার দেখান—এম্নি কথা সব

হে। অসুখ বলেছে বুঝি? তেমন কিছু নয়। আসলে মেয়েটা বড্ড ভালবাসে আমায়—একটুতেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। যত দরদ আমার জন্তে; কর্তার দিকে তেমন টান নেই কিনা!...কদিন ধরে বড্ড দুর্ভাবনা যাচ্ছে।

বাণী। সুশীলা তো কিছু বলে নি মাসি মা'? ব্যাপার কি?

হে। পরেশ আমায় কি করবে ঠাকুরই বলতে পারেন।

সরমার মা। এ নিয়ে কেন ভাবছেন বলুন দেখিনি? পরেশ আমাদের সোনার টুকরো ছেলে, প্রতিবার জলপানি পাচ্ছে। সরমা তো বলে পরেশবাবুর মত ভাল ছাত্র দর্শনের ক্লাসে আর নেই।

হে। তা' সে যা' বলেছে সরমা ঠিকই। তবে কি জানেন, সেই সত্য যুগ কি আর আছে? আজকাল সব কিছুতে গোলমাল আর বিভ্রাট, কত রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তা'র ঠিক নেই কিছু। দুশ্চিন্তা কি আর সাধে করি দিদি!

বাণীর দিদি। বাণী বলছিল যে মনস্তত্বে নাকি পরেশবাবুর খুব দখল। যে-রকম পড়তে দেখতুম—বাব্বা—ভীষণ ভাল ছাত্র নিশ্চয় পরেশবাবু।

হে। তাই তো বলি, তুমিই বাণীর দিদি!—সে' দিন বিয়ে হ'ল, জামাই তোমার থাকে পশ্চিমে—দিল্লী, না আগ্রা। তোমার চেহারাখানা তো বেশ ফিরে গিয়েছে; পশ্চিমের হাওয়া তো...

সু। দিল্লী-আগ্রা নয় মা'—এলাহাবাদ। এই তো বলে গেলুম আমি তোমায়!

হে। ওই হ'ল তোর দোষ। তুই এদের একটু পানটান খাওয়াবি না, আমার ভুল শোধ্‌রাতে লাগবি মাষ্টারণীর মত? এই মেয়ের জ্বালায় আর পারি না।

সবার তরল হাসিতে ঘর ভরে উঠল। ঝড়ের মত ঢুকল পরেশ—মাসীমা', ও মাসিমা, ও সুশীলা—বলি ব্যাটাদের কাণ্ডখানা দেখলে তো? উঃ অনেক লোক রয়েছেন যে এখানে!! এক ছুটে বেরিয়ে গেল; ঢুকল সুশীলা

সু। শোন মা' দাদা ভাল পাশ করেছেন। কিন্তু জাখ বাণী, দাদা মহাসাধের Experimental Psychologyতে ভয়ানক কম নম্বর পাওয়াতে First Class Second হয়ে গ্যাছেন।

বাণী। বলিস কি?

সু। এই তো জেনে এলাম। ধরো তো মা' তোমাদের পান, দোক্তা, জর্দা, সুর্তি, গুণ্ডী—আরো-আরো সব রেখে যাচ্ছি। দাদা ক্ষেপে গেছে। এখনই আবার হয়ত গিয়ে পরীক্ষককে লাগিয়ে দেবেন দু'এক ঘা। জানো তো—একটা ফৌজদারী না-হলেই হয় এখন।

বা। তোকে আবার রাঁচী যেতে না-হয় সুশী। যে-রকম গোলমাল সুরু করেছিস।

সু। তা' যা' হয় দেখব। দাদা তো বলছেন একবার বেড়াতে যা'বেনই। চল্লাম আমি দাদার কাছে। আর কিছু দরকার পড়লে ঝিকে ডেকো মা'—ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছি।

সুশীলার প্রস্থান। সকলে: আচ্ছা আর এক সময় আসব। পরেশ এসেছে এখন। যা'বেন আমাদের বাড়ি একটু ঘুরে আসবেন। তা'তে কিছু হয় নি। আমরা তো কাছেই রয়েছি। না, কষ্ট করে আপনাকে আর উঠতে হ'বে না। অসুস্থ শরীর—ইত্যাদি

বাণী। আমি একটু পরে যাচ্ছি দিদি।

হে। সেই ভাল মা'। তুমি একটু ডেকে দাও তো ওদের?

ঝির প্রবেশ

ঝি। মা' ডেকেছেন আমায়॥

হে। সুশীলা বলেছে তো? তা' এ-ও বলি তোমাদের বাছা, এ্যাতো ঘুমও তোমাদের চোখে আছে। এদিকে দুশ্চিন্তায় আমরা চোখ বুজতে পারছি নে একটু। সুখে আছ—বাপু সুখে আছ। এমনটি হেমাঙ্গিনী ঠাকরুণ ভিন্ন আর কেউ সহ্য করবে না।

ঝি। গা হাত পা' টিপে দেব মা'?

হে। ঠাকুরকে আগে বল, ওদের চা আর খাবার দিতে। না সেও ঘুমিয়েছে?

ঝি। উনুন ধরেছে, দিদিমণি ঠাকুরকে তুলে দিয়েছে। পা'টা টিপে দি একটু?

হে। তা' দিতে হয় দাও। মোট কথা অত ঘুমিও না তোমরা। মুনিবের সুখ দুঃখটা একটু বুঝতে শিখো!

পরেশ, সুশীলা ও বাণীর প্রবেশ

বা। দেখেছেন মাসীমা' ফার্ষ্ট ক্লাস্ পেয়ে দাদার মুখের অবস্থা?

হে। বল্, সব খুলে বল্। সব শুনছি আমি।

এ সব ক্ষেত্রে হেমাঙ্গিনী বিশেষ গাম্ভীর্যের অভিনয়ে পটিয়সী

প। বলো না মাসীমা', কবে কোন্ যুগে বই পড়ে পাস্ করে বসে আছেন এক-একজন প্রফেসার। নোতুন কোন জিনিস সামনে ধরলেই বে-কায়দায় পড়েন। এ্যাতো ঘেটেঘুটে একেবারে uptodate থিয়োরিটি ঝেড়ে লিখলাম। কিছু বুঝলে না। খারাপ নম্বর দিল Experimental Psychologyতে? অথচ এর মধ্যেই আমার হ'বে জীবনে প্রতিষ্ঠা! এ দুঃখ আমার জীবনে ঘুচবে না মাসি?

হে। পাশ করেছিস তো?

প। আমাদের শাস্ত্রীয় জন্মান্তরবাদ, পূর্বস্মৃতি আর ইউরোপের অচেতন-অবচেতন মন নিয়ে এত বড় আলোচনাটা নোতুন ভঙ্গীতে করলাম...উ হুঁ হুঁ। এ দুঃখ...

হে। বলি পাস্ করেছিস্ তো? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। তোরা সব হাঁ করে দেখছিস কি আমার দিকে? কথা বলছিস না কেন?

প। করেছি। ব্যাটারা সেকেণ্ড করে দিয়েছে আমায়। পেলে একবার।

দাঁত কড়মড় করে উঠল পরেশ

হে। (হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন) আজ যদি দিদি বেঁচে থাকতেন। এ-দুঃখ আমি আর সইতে পারি না। দিদি গো!

সু। চলে আয় বাণী, চলে এসো দাদা। ভাল পাস্ করে এসেছে দাদা—মা'র যত কান্না। এক্ষুণি না-কাঁদলে চলতো না? চলে এসো তোমরা। মা'কে সামলাতেই হিম্‌সিম্ খেয়ে যাই আমি।—ঐ ভাখো, বাবা এসে গেছেন। ...বাবা, দাদা ফার্ষ্ট ক্লাস্ পেয়ে পাস্ করেছে। এবারে একটা বিয়ের যোগাড় দেখো। (যেতে যেতে)—চলে এসো তোমরা আমার ঘরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুশীলার ঘর। বাণী, সুশীলা, পরেশ, চরণদাস
চা খেতে খেতে

চ। রিসার্চ করতে যদি মত হয়, তবে কালই আমি ডাঃ বসুর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

প। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।

চ। পুণ্ডরীক, অশোক, উমেশ ওরা সবাই আসবে সন্ধ্যার পরে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বুঝে দেখো।

সু। বাবা, তুমিও দেখছি ভীষণ কাজের লোক হয়ে উঠলে। এখনই আবার লেখাপড়া, রিসার্চ সুরু করা কেন?

চ। সে কথা ঠিক। তবে পরেশ মনস্তত্বে খারাপ নম্বর পেয়ে যে রকম দুঃখিত হয়েছে, তা'তে একটা ডক্‌টোরেট্ ওকে নিতেই হ'বে।

বা। আমি মেসমশাইয়ের পক্ষে আছি।

চ। আমি উঠি এখন; মক্কেল আসবে কয়েকজন।

চরণদাসের প্রস্থান

সু। জানো দাদা, পুনীকে আজ পাওয়াই যাচ্ছে না দুপুরের পর থেকে? এতো খাওয়াই পরাই ওকে—অথচ ভাখো গিয়ে পাড়ার যত বাজে বিড়ালের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াবে।

বা। খবর্দার সুশী। পুনীর দিকে তোর স্নেহের ভিতরগত তাৎপর্য তোকে এত করে বুঝিয়ে দিলাম না!

সু। তা' তো দিয়েছ। কিন্তু পুনীকে না দেখলে যে ভালই লাগে না আমার, তার কি?

বা। মাসীমা কি বলেছেন জানো?

পা ও সু। কি? কি বলেছেন মা?

বা। বলেছেন, পুনীর উপর সুশীলার যে-রকম মায়া পড়েছে তা'তে বরের বাড়ি দানসামগ্রীর সঙ্গে ওটাকেও পাঠাতেই হ'বে।

পরেশের ও বাণীর উচ্চহাস্য। সুশীলা গজগজ করে উঠল, কারুর সহ্য হ'বে না পুনীকে। ওকে নিয়ে আর পারি নে আমি। দেখি এল কি না। চা পর্যন্ত খেলে না হতভাগী! সুশীলার প্রস্থান

বা। পরেশদা' আজ কিন্তু গল্প বলতে হ'বে। এখন তো পরীক্ষার চিন্তা নেই।

প। কোন্ গল্পটা বলব বলো। ভাল কথা—তোমাকে দাদা বলতে বারণ করিনি আমি?

বা। হুঁ। সেই যে মেয়েটা কী সব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে চেঁচাতো "তিত্‌কল" "তিত্‌কল" বলে?

প। ঠিক, ঠিক—মনে পড়েছে। বলবো বইকি ?

বা। আর সেই গল্পটা। সেই যে ছেলেটা এক ধামা ব্রমাইড খেয়েও ঘুমোত না। অথচ একটা কবিতা পাঁচ বার ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেই ঘুমিয়ে পড়তো…

প। নিশ্চয় বলবো। আরও একটা নোতুন গল্প বলবো।

বা। আচ্ছা পরেশ দা—পরীক্ষার দুর্ভাবনায় তুমি মুটিয়ে—মানে, তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'য়েছে। তোমার বাইসেপ্‌টা তো আরো শক্ত হয়েছে ?

প। অথচ জানো, আমি ডাম্বেল্‌-টাম্বেল্‌ করিনে ?

বা। তা'লে কি করে হ'ল ? দাদা তো বলেন যে, লীডারম্যান্‌ না *এমনই একজন কার system অনুসরণ না করলে বাইসেপ্‌ আর হ'তে হ'বে না ? সাইকোলজী ?*

প। "বস্‌" ! আই মীন্‌, কেন হ'বে না ? জানো আসল ব্যাপারটা হ'চ্ছে মডার্ণ—

বা। সাইকলজী ?

প। নিশ্চয় ! আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র হচ্ছে একেবারে আদিম ! এর চেয়ে সংস্কার আর কিছুতেই আবশ্যক নয়। ফোড়া হ'লে, সামান্য একটু টেম্পারেচার উঠলে আমরা চাই কি ডাঃ রায়কে ডেকে বসি। অথচ যত লোক দেখছ ; অসংখ্য, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি লোক তোমার আশে-পাশে কিল্‌বিল্‌ করছে ; সব হচ্ছে গিয়ে অসুস্থ।

বা। বলো কি পরেশ দা' ?

প। অসুস্থ বই কি ! কেউ পুরোপুরি মানসিক স্বাস্থ্যের মালিক নয়। মানসিক হিসাবে একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ খুব কমই পাবে। প্রত্যেকেরই একটু-আধটু গোলমাল আছে। কেন ? বলিনি, দাদা বল্‌বে না ? অথচ এই গোলমালের বিষয় তা'রা নিজেরাই বুঝতে পারছে না।

বা। বুঝতে পারছে না কেন ? মনের তো ব্যথা-বেদনা, শান্তি-অশান্তি আছে। দেহের অসুখ হ'লে যেমন উদ্বেগ হয়, মনের—

প। তা' কেমন করে হ'বে ? গোলমাল ঘটে—তোমাকে তো কতবার বলেছি—অবচেতন বা অচেতন মনের জটিলতা থেকে। সচেতন মনে গোলমাল সহজেই ধরা যায়।

একটা বিড়ালের ডাক শুনা গেল

বা। আমার কিন্তু রীতিমত ভয় করছে পরেশ দা'।

প। নাঃ, স্মৃতি বাস্তবিকই ফ্যাকাল্টী নয়। বার-বার নিষেধ করছি তোমায়—

বা। অবচেতন মনে আমার কোন গোলযোগ ঘটেনি তো ? আমি যে কবে স্বপ্ন দেখব তা' কিছু বলা যায় না।

ছুটতে ছুটতে সুশীলার প্রবেশ

সু। পুশীকে তোমরা দেখেছ ? অবাক হয়ে তাকিয়ে আছ সব… আসতে-আসতে দেখলুম পুশীকে এদিকেই আসতে।

প ও বা। কই না !

সু। চুক্‌-চুক্‌। পুশী ! হতভাগী গেল কোথা ? চুক্‌-চুক্‌ ! চা খাবি নে ? আজ ওকে কিছুতেই বেড়াতে দেব না, বুঝলে দাদা ? ও মা—ঐ না পুশী তোমার পেছনে দাদা ? তোমরা কেউ দেখলে না ? খুব সাইকোলজী হচ্ছিল বুঝি।

প। তাই তো !

বা। জানিস ?

সু। কী ?

বা। ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে ?

সু। Experimental Psychologyর কথা বল্‌ছিস্‌ তো ? সে তো দেখতেই পাচ্ছি !

বা। আরে না, না—তোর বেড়াল মানে পুশীর কথা বলছিলাম। ওটা ভুতুড়ে নিশ্চয়। মাঝে মাঝে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। তোর তো নয়নের মণি ? তুই পর্যন্ত দেখতে পেলি নে। অথচ ভাখ্‌, চেয়ে ভাখ—সবাই এখন দেখতে পাচ্ছি, তোর কোলে বসে দিব্যি গোঙ্‌রাচ্ছে !

পুশীর সম্মতিসূচক ডাক্‌ শুনা গেল। বোধহয় ওদের ভাষায় "হিয়ার, হিয়ার !" বললে। পুশীকে আদর করতে-করতে সুশীলা বেরিয়ে গেল।

বা। পুশীকে যা' ভালবাসে সুশীলা, একটা বন্দুক দিলে আর রক্ষে থাকবে না।

প। কেন ?

বা। দুম্‌-দাম্‌ পাড়ার সমস্ত বেড়াল ও সাবাড় করে ফেলবে এক দিনে। ওরাই তো পুশীকে নিয়ে যায় সুশীলার কাছ থেকে ভুলিয়ে।

প। জেলাসি। সেক্স্‌ জেলাসি। এর নানান ভঙ্গী আর রূপ আছে। তোমার অনুমান সত্যি হ'লে বলতে হয় যে সুশীলার জেলাসিটা হিংস্র। অনেকটা ওথেলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। তফাৎ এই যে…

বা। ওর স্নেহই তো অস্বাভাবিক। আপনি তো সেদিন বল্‌ছিলেন।

প। সুশীলার মত একটি মেয়ের পক্ষে…

সরমাকে নিয়ে সুশীলার প্রবেশ—

সু। এসেছেন তো সরমা দি'। কিন্তু ব্যাপার বড় গুরুতর। কা'কে অভিনন্দন জানাবেন বলুন ? আপনাকে নিশ্চয় অদৃশ্য করে ফেল্‌বে ; যে-রকম Experimental Psychologyতে মনোনিবেশ করেছে।

বা। আমার কথা মানতে বাধ্য তুই। যে কোন একটা দিকে অসম্ভব ঝোঁক পড়লে মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটবে। যে-পণ্ডিত সব ভুলে গিয়ে কেবল বই আর বইয়ের কথায়…

প। একাগ্রতা আর অসুস্থ খেয়াল এক নয়।

সু। পিসীমা'র কাছে জানলুম আপনার সাফল্যের কথা—এইমাত্র। তাই এলাম পরেশবাবু। Congratulations !

বা। ধন্যবাদ !

সু। ঐ যে পুশী ছুটে দিয়েছে। পুশীই আমাকে শেষ করবে একদিন।…পারি নে। (আগামীবারে সমাপ্য)

স্বাধীনতার রূপান্তর—কোরিয়া

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

প্রথম মহাসমরের সময় কোরিয়ার বিপ্লব আন্দোলনের কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কোরিয়ায় যে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন চলেছিল সেই আন্দোলনের নেতা সিঙ্গম্যান রী ১৯১৯ সালে কোরিয়াতে এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জাপানীরা তখন এই আন্দোলনের নেতাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। বিতাড়িত নেতৃবৃন্দ প্রধানতঃ আমেরিকা ও সাইবেরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিঙ্গম্যান রী চলে যান আমেরিকায়। সেখান থেকে তিনি কোরিয়া সম্পর্কে প্রচার চালাতে থাকেন। তিনি খোলাখুলি ভাবেই সোভিয়েট-বিরোধী। আমেরিকানরা তাঁরই প্রচার থেকে কোরিয়া সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানলাভ করে।

দ্বিতীয় মহাসমরের সময় নির্ব্বাসিত কোরিয়ান নেতাদের আন্দোলন চলে দুইটী বিভিন্ন ধারায়। কয়েকজন নেতা চুংকিংয়ে গিয়ে মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের আশ্রয়ে একটী অস্থায়ী কোরিয়ান গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন। কিম-কু হলেন এই গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার। আমেরিকা থেকে সিঙ্গম্যান প্রভৃতি ১৯১৯ সালের অবশিষ্ট নেতারা তাঁকে সমর্থন জানালেন। কিন্তু কিম-কু কোনমতে চিয়াং-কাইশেককে কোরিয়ানদের বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠনে রাজী করাতে পারলেন না। ফলে কোরিয়ান যুবসম্প্রদায়ের তিনি আস্থা হারালেন। এদিকে চীনা কম্যুনিষ্টদের আশ্রয়ে কোরিয়ান স্বাধীনতা লীগ গঠিত হল। এই লীগ উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করতে লাগল এবং কোরিয়ার গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে। কাজে কাজেই কোরিয়ার যুবসম্প্রদায়ের উপর এই স্বাধীনতা লীগের প্রভাবপ্রতিপত্তিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল। জেনারেল কিম-মুচেং ও কিম-হলসেউংয়ের সৈনাপত্যে তারা প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করলে। তারপর রাশিয়ানরা যখন উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করল তখন স্বাধীনতা লীগ লালফৌজের সহযোগিতা করতে লাগল। লালফৌজ তাদের পুলিসের কাজে নিয়োগ করলে এবং কোরিয়ান সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হল। এইভাবে রাশিয়ানরা কোরিয়ান জনসাধারণ দ্বারা গঠিত সাধারণতন্ত্রকে সমর্থন করে' এবং চীনা কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে' অল্পকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সুতরাং কোরিয়ার উত্তরার্দ্ধে রুশ শাসনাধীন এলাকায় জনগণ প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে এবং অছিগিরি ব্যবস্থাকে রাশিয়া সাফল্যমণ্ডিত করেছে বলা চলে।

দক্ষিণার্দ্ধে মার্কিণ সেনানায়করা সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অবলম্বন করলেন। কোরিয়ান সাধারণতন্ত্র ও পিপল্‌স্ কমিটিসমূহ তাঁরা স্বীকার করলেন না। জাপানী অফিসারদের জায়গায় তাঁরা মার্কিণ সামরিক অফিসার নিযুক্ত করে কাজ চালাতে লাগলেন। কোরিয়া সম্পর্কে নিজেদের কোন জ্ঞান না থাকায় তাঁরা ওয়াশিংটন থেকে সিঙ্গম্যানরীকে বিমান যোগে আনিয়ে এক সুরক্ষিত প্রাসাদে রাখলেন এবং তাঁর সমর্থনপুষ্ট চুংকিংস্থ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ও কিম-কুকে শিউলে আনালেন। মার্কিণ অধিনায়ক হজ ঘোষণা করলেন যে কিম-কু ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা কোরিয়ান নাগরিক হিসাবে এসেছেন, গভর্ণমেণ্টের কোন মর্য্যাদা তাঁদের দেওয়া হয় নাই। তাঁরা কিন্তু কোরিয়াতে এসেই বিবৃতি প্রচার করতে লাগলেন মন্ত্রিসভার সদস্য বলে ঘোষণা করে' এবং লোকের সঙ্গে মন্ত্রীরূপে দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। আমেরিকানরাও তাদের যে ভাবে নানা প্রকার সুবিধা দিতে লাগলেন, তাতে লোকের মনে ধারণা জন্মাল যে কিম-কু গভর্ণমেণ্টকে আমেরিকানরা স্বীকার করে নিয়েছে।

এদিকে কোরিয়াতে যাঁরা গুপ্ত আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাঁরা কিম-কু গোষ্ঠীকে খুব সুনজরে দেখলেন না। কোরিয়ানরা অবশ্য তাঁদের সকলকে বিদেশে জাপ-বিরোধী প্রচার কার্য্যের জন্য শ্রদ্ধার চোখেই দেখত। কিন্তু কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ

না থাকায় জনসাধারণ তাদের হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছিল না। এমন সময় তাঁদের নিজেদের আচরণে তাঁরা জনসাধারণের শ্রদ্ধার আসন থেকে একেবারে নেমে গেলেন। কোরিয়ান সাধারণতন্ত্র গঠিত হলে পিপল্‌স কমিটীসমূহ এই সাধারণতন্ত্রের সভাপতিপদে সিঙ্গম্যানরীকে বরণ করে নিতে চাইলেন। কারণ ১৯১৯ সালের বিপ্লবের সময় তিনি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট করেছিলেন। সিঙ্গম্যানরী ওয়াশিংটন থেকে দেশে ফিরে এলে যখন তারা তাঁর কাছে গেল, তখন তিনি সভাপতির পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। কিম-কু, কিম-কিউসিক প্রভৃতি সকলে ও কোরিয়াবাসীদের এই গণপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে অস্বীকৃত হলেন। এই ভাবে তাঁরা জনসাধারণের সহানুভূতি হতে নিজেদের বঞ্চিত করলেন।

কিম-কু'র দল কোরিয়ার ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে জোর দহরম মহরম চালাতে লাগলেন। অবশ্য তাদের এরূপ করবার কারণ হল আমেরিকানদের ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতি টান। তাঁরা ভাবলেন যে এই ভাবেই তাঁরা আমেরিকানদের সমর্থন পাবেন। এম্নি করে কিম-কুর দল ও সাধারণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ সুরু হল। ডিসেম্বর মাসে যখন মস্কোতে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের বৈঠক হয় তখন কোরিয়াতে সাধারণতন্ত্র ও কিম-কু'র দল উভয়েই কোরিয়ার গভর্ণমেণ্ট বলে প্রচার করতে থাকে। জেনারেল হজ তখন ঘোষণা করলেন যে বর্ত্তমানে মার্কিণ সামরিক শাসন ছাড়া কোন গভর্ণমেণ্টই কোরিয়াতে নেই। এর পরেও সাধারণতন্ত্র যখন কয়েক স্থানে কাজ চালাতে লাগল জেনারেল হজ তখন তার প্রতিনিধিদের কারারুদ্ধ করলেন। তা সত্ত্বেও পিপল্‌স পার্টি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্দ্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটি নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলল অকুতোভয়ে।

মস্কো সম্মেলনের পর সমগ্র কোরিয়ায় যে গণবিক্ষোভ সুরু হয় কিম-কু'র দলও সেই সুযোগে ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টা করে। তারা আমেরিকানদের সহিত অসহযোগ ঘোষণা করে এবং পুলিসবাহিনীকে বিদ্রোহে আহ্বান জানায়। কিন্তু জনসাধারণের উপর কিম-কু দলের প্রভাবের অভাবে তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জেনারেল হজ কিম-কু ও কিউসিককে ভবিষ্যতে সদাচরণের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিয়ে নেন। কিম-কু' দলের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও মস্কো সম্মেলনের পরে অছিগিরি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোরিয়ায় যে গণ-বিক্ষোভ হয়েছিল কোরিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

আমেরিকানদের শাসন ব্যবস্থাতেও কোন উন্নত পন্থা অবলম্বন করা হয় নি। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কোরিয়ান ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে জাপ কাঠামোকেই বজায় রেখে চলেছে। জাপানীদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও কল কারখানা ইত্যাদি অধিকার করে মার্কিণ সেনা-বিভাগের লোকেরা নিজেরাই পরিচালনা করতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোরিয়ান ব্যবসায়ীদের হাতে পরিচালন ভার দেওয়া হয়। আমেরিকানরা কোরিয়ান চাষীদের দুঃখ লাঘবের কোন চেষ্টাও করে নি। কেবল জাপ জমিদারদের স্থান নিয়েছে মার্কিণ খাজনা আদায়কারীরা। রাজধানী শিউলে মার্কিণ সামরিক গভর্ণমেণ্ট ৩৫ হাজার জাপানী গৃহ ও দোকান অধিকার করেন। কোরিয়ার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হাতে এইগুলির পরিচালনা ভার দেওয়া হয়। কোরিয়ান জমিদারগণ পূর্ব্বের মতই প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে চলেছে—ফসলের তিন ভাগের দুভাগ চাষীর এবং একভাগ জমিদারের। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমেরিকানরা সাধারণ লোকের তুলনায় অবস্থাপন্ন লোকদেরই পছন্দ করে। কৃষিপ্রধান কোরিয়ার চাষী, মজুর ও সাধারণ লোকের অবস্থা উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা যায় নি। সুতরাং জাপ শাসনের পরিবর্ত্তে মার্কিণ সামরিক শাসনে দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসীরা উপকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না।

এসিয়ার এই দেশটীতে আমরা সোভিয়েট ও মার্কিণ পদ্ধতির পাশাপাশি যে চিত্র দেখতে পাই তাতে মার্কিন ব্যবস্থাকে আমরা বৃটীশ ব্যবস্থার অনুরূপ বলে মনে করতে বাধ্য হই। সুতরাং সেখানে পাঁচ বছরের অছিগিরি কত বছরে যে বিদায় নেবে কে জানে?

প্রৌঢ়

শ্রীজুড়নজীবন মুখোপাধ্যায়

প্রৌঢ়ত্ব ষোল-আনা বাস্তবতা; কাজেই সাহিত্যেও যেমন তার উচ্ছ্বাসের স্থান নেই, সংসারেও তার দেনা-পাওনা সবই নিরস। কবিতার উৎস ফুলকে নিয়ে, কিন্তু ফলেই যখন তার পরিণতি, অর্থাৎ যখন তার সাংসারিক প্রয়োজন সব থেকে বেশী তখন সে ভাবরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত। যৌবনের মাধবীকুঞ্জে যে কুহুরব চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত ক'রেছিল তার স্মৃতিটুকু আছে, হয়ত একটু উপলব্ধিও আছে কিন্তু অনুভূতির অবসর নাই। তার প্রকাশ ধৃষ্টতা। গৃহিণী বল্‌বেন রোগের লক্ষণ। তবুও অনাবিল কর্ত্তব্য ও কার্য্যের মধ্যে একটু আনন্দ, একটু উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে।

সেইজন্যই একদিন শনিবারে একখানা সিনেমার টিকিট্ কিনে বাড়ী ফিরলুম। একটু স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও এ বয়সে লোভ হয়, তাই একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট্ নিয়েছিলাম। বেরুবার সময় গৃহিণী ব'ল্লেন, "সেজেগুজে চ'ল্লে কোথায়?"

অপরাধীর স্বরে উত্তর দিলাম "এই একটু বায়স্কোপ যাচ্ছি, একখানা পাশ পেলাম কিনা।" শেষ কথাটা অবশ্যই মিথ্যা—কিন্তু যে মিথ্যাতে কারও অপকার বা ক্ষতি হয় না বরং কারও উপকারের সম্ভাবনা তাহা সত্য ভাষণের মতই সুফলপ্রসূ ও মঙ্গলকর।

গৃহিণী মন্তব্য ক'র্লেন, "সাতজনের মাথা ব্যথা প'ড়ে গেছে তোমায় পাশ দিতে, মিথ্যে কথা বল কেন? এ বয়সে সখ দেখে আর বাঁচি নে।"

কৌতুকহাস্যে উত্তর দিলাম—"ধরা না প'ড়ে উপায় কি? অভিন্ন-হৃদয় কিনা, আমার প্রাণে যা' আছে তোমার প্রাণে তা' আপনিই প্রকাশ।"

রসিকতা বিচলিত ক'র্ল না। রাগত মুখে ব'ল্লেন, "ধ্যাষ্টামো অনেক শুনিছি, ক্ষান্ত দাও।" বাস্তবিক এ বয়সে গৃহিণীর অভিমান, ঠোঁট উল্টিয়ে মৌন থাকা, ফোঁস ফোঁস করা, সজল চোখ এ সব মনে হ'লে হাসি আসে। ও মুখে শুধু মানায় শাসন ও তিরস্কারের ভঙ্গী, গৃহিণীপনার পূর্ণ বিকাশ। হায় রে প্রৌঢ়ত্ব।

একটু সকাল সকাল বেরিয়ে সিনেমা-গৃহে আসন গ্রহণ কর্লাম। সাম্‌নের দিকে থার্ডক্লাশ ভদ্র যুবকবৃন্দে ভর্ত্তি। আমার নিকটবর্ত্তী সীট্‌গুলিতে অর্থাৎ সেকেণ্ড ক্লাশে 'প্রকৃত ভারতের' সান্নিধ্য অনুভব কর্লাম। অর্থাৎ দেশীয় সৈন্য, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি অবাঙ্গালী মেয়ে পুরুষ, 'হাতের কাজের' লোক যাকে বল্‌বেন ফ্যাক্টরী প্রভৃতির শিল্পজ্ঞ ও যন্ত্রজ্ঞের দল—এঁরা সকলেই বিরাজমান আছেন। মনে হ'ল মাছ মাংস সব্জী বিক্রেতারাও অনেকে আছেন। এই যে বহু বিষয়েয় এক শ্রেণীতে সমাবেশ এ শুধু সম্ভব হ'য়েছে অর্থের সমতা থেকে ও সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোক যে আর্থিক বিষয়ে এক ধাপ নীচে পেছিয়ে গেছেন সেটাও যেন উপলব্ধি হ'ল। 'সাম্য' 'সাম্য' যতই করি, এই অবসরটুকুতে একটী পরিচিত অথবা সমশিক্ষিত বা সমশ্রেণীর ভদ্রলোককে পার্শ্বে পেলে যে আনন্দলাভ কর্ত্তুম ও দুই পার্শ্বের দু'টী খালি সীটে এইরূপ দুইজন প্রতিবেশীকেই মনে মনে যে আকাঙ্ক্ষা কর্‌ছিলুম—তা প্রকাশ না ক'র্লে মিথ্যা ভাষণ হবে।

আকাঙ্ক্ষা ক'র্লেই ত আর সফল হয় না। পার্শ্বদেশে এসে যিনি আসন পরিগ্রহ ক'র্লেন তাঁর পরিধানে সবুজ রঙের লুঙ্গি, গায়ে লাল ছিটের হাফ-হাতা 'কুর্ত্তা', মাথায় একটা সাদা গোল টুপি, চুলে তীব্র গন্ধ কেশ-তৈল। গ্রীবাদেশে স্বল্প দীর্ঘ ও পুষ্টিহীন কেশগুচ্ছ—যাকে সাধারণে "ছাগল-দাড়ি' ব'লে অভিহিত করে। কিয়ৎক্ষণ পরে অপর পার্শ্বে যিনি আসন গ্রহণ ক'র্লেন তিনি একজন মহিলা—বয়স ত্রিংশ-উর্দ্ধে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, গণ্ডদেশে কৃত্রিম গৌরবর্ণের আভাস আছে, অধর ও ওষ্ঠের লালিমাও স্বাভাবিক মনে হয় না। বোধ হয়, নার্স, অথবা টেলিফোন্ বা অন্য কোন অফিসের কর্ম্মচারিণী। সঙ্গী অভাবে একাকিনী, আমারই মত অবসর সময়ে আনন্দ আহরণে সমাগতা।

সামনের দিকের আসনশ্রেণী থেকে পিছনে দৃষ্টিক্ষেপ সুরু হ'য়েছে। যুবকের দলের কতকগুলি আমার দিকেও কয়েকবার তাকিয়ে দেখ্‌লো। মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো। কাজেই অপরের অনুমান শক্তিকে ভিন্ন পথে প্রচলিত ক'র্বার জন্য পার্শ্বস্থিত পুরুষ-প্রতিবেশীর সহিত বাক্যালাপ সুরু ক'রে দিলাম। তখনও ছবি আরম্ভ হ'তে পাঁচ মিনিট বাকী।

বন্ধুটীর পরিচয় পেয়ে বিশেষ খুসী হ'লুম। ইনি রাজমিস্ত্রিদের 'ঠিকাদার'। আজকাল 'কাজ-কামের' সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও 'মাল-মশলা' ও 'মজুরের' অভাবে আশানুরূপ অর্থোপার্জ্জন হ'চ্ছে না ইত্যাদি। প্রাণের মধ্যে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। কয়েক মাস ধ'রে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও একটা 'মিস্ত্রী' পাওয়া যাচ্ছে না যে একান্ত প্রয়োজনীয় দু'চারটা কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। ভাঁড়ার ঘরে কয়েকটা 'তাক' না থাকাতে মহার্ঘ্য আহার-সম্ভার তছরূপ হ'চ্ছে, ছাদের জল নিকাশের নল ফেটে গেছে; দু'এক স্থানে বালির কাজ একান্ত প্রয়োজন। গৃহিণী বিশ্বাসই করেন না যে গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ ও 'রাজমিস্ত্রী' স্বয়ং রাজার থেকেও দুর্লভ হ'য়ে প'ড়েছে। এই ঠিকাদার বন্ধুটীর সাহায্যে আমার বাড়ীর উক্ত কার্য্য-গুলি যে সম্পন্ন হবে, তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এই কাজটি যে উদ্ধার করা সম্ভব হবে এই আশায় অভিনয় দর্শনের আনন্দ খর্ব্ব হ'য়ে গেল। সেই প্রৌঢ়ত্ব; সাংসারিক সুবিধায় আনন্দ অন্য সমস্ত আনন্দকে পিছনে ঠেলে রেখে দিয়েছে।

ছবি আরম্ভ হ'ল। বাঙ্‌লা গল্প। প্রত্যেক চরিত্রটী অসাধারণ। মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ে এবং সত্যকার মানুষকে নিয়ে 'ছবি'র গল্প নাকি জমে না। তাই দেখ্‌ছি গৃহকর্ত্তা ধনী ও অর্দ্ধোন্মাদ ফলে ইংরাজীতে পুরো eccentric বলা চলে। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট অভিনেতা এই অংশে অভিনয় ক'র্ছে'ন। গৃহিণী বর্ষীয়সী হ'লেও সম্পূর্ণ আধুনিকা বা তা' হ'তেও অধিক। আধুনিকত্ব সৃষ্টি করেন ও আধুনিকাদের নেত্রীত্ব করেন। সভা-সমিতি ও বিবিধ সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্টা। একমাত্র কন্যাকে অশেষ প্রকারে শিক্ষিতা ক'র্ছে'ন। কন্যার সঙ্গীতের স্বর মিষ্ট না হ'লেও তাঁর ধারণা বিপরীত ও সে ধারণা পোষকতা ও অনুমোদন করার জন্য একটী যুবকের দল সে বাটীতে অপরাহ্ণ ও অবসর-সময়ে একটী পাকা আশ্রয় পেয়ে নিয়েছে। তারাও সকলেই অর্দ্ধোন্মাদ—কেন না রাজত্ব ও রাজকন্যা পাওয়ার লোভে সকলেরই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে; জামাতৃপদের উমেদারি ক'র্ত্তে ও কন্যাটীর প্রেম আকর্ষণ করার জন্য তাদের বেশভূষায়, বাক্যে ও ভঙ্গীতে যে নব নব রূপের প্রযোজনা সম্পাদন করে তাহা সত্যই পরম হাস্যকর। একদিকে এই মার্জ্জিত পাগলা-গারদ, অপরদিকে মজ্‌দুর-সঙ্ঘের চিত্র। মজদুরেরা চায় যে ধনিক ও তাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান থাকুক, তবে তাদের কিছু পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিক। তাদের নেতা দাড়ি কামায় না, পর্য্যাপ্ত মদ খেয়ে নেশা-করার সু-দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল ক'রে রাখে ও একজন রমণী শ্রমিকের প্রতি আদর্শ কমিউনিষ্ট প্রেমে বিভোর হ'য়ে পড়ে। এ প্রেমে বাধা নাই, বন্ধন নাই, মনের একাগ্রতা ও হৃদয়ের নিষ্ঠার প্রয়োজন করে না, একজনের পায়ে দাসত্ব-স্বীকার করার গ্লানি থেকে মুক্তি আছে। এখানে পুরুষের তপস্যা গাছতলায় ব'সে মদ খাওয়া—যতক্ষণ না প্রিয়তমা সহানুভূতি ও অনুকম্পাতে গ'লে প'ড়ে, অপর কোনও পুরুষ-প্রেমিকের সাহচর্য্য ত্যাগ করে এসে হাত ধরে তুলে নিয়ে যায়।

ইণ্টারভ্যাল্ হ'লো। প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্ব'লে উঠ্‌লো। ঠিকাদার মশাই জিজ্ঞাসা ক'র্লেন "বাবু মশায়, তামাসাটা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন।" তার অপরাধ কি? কোন্ সমাজের কোন্ চিত্র যে দেখ্‌ছি তা নিজেই বুঝ্‌তে পারছিলুম না। তবুও তাকে বুঝিয়ে দিলাম এবং সেই সঙ্গে আমার বাটীর প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্যটা সম্পন্ন ক'রে দেওয়ার একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় ক'রে নিলাম। আমার ঠিকানাটাও তাকে একটা কাগজে লিখে দিলাম। হঠাৎ একটা শীতল হাওয়ার সবেগ তরঙ্গ ব'য়ে গেল। বাইরে খুব মেঘ হ'য়েছে। বৈশাখ শেষের প্রচণ্ড বর্ষণ এক ঘণ্টা ধ'রে অক্লান্তভাবে যে ধারাপাত করলে তাতে পথ ঘাট ডুবে গেল। ছবি ততক্ষণ শেষ হ'য়েছে।

গাড়ী পাওয়া অসম্ভব। পার্শ্বের মহিলাটী বিপর্য্যস্তভাবে ব'ল্লেন—"কি ক'রে বাড়ী ফেরা যাবে।" জ্যোৎস্নারাত্রি ছিল, কিন্তু মেঘান্ধকারে চন্দ্রদেব অন্তর্হিত। রাস্তা ঘাটও জলে জলময়। দু-চারখানা রিক্‌সা বেশী ভাড়ার প্রত্যাশায় হাঁটু

জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সির চিহ্নও নাই।

যাত্রীর তুলনায় রিক্সার সংখ্যা অত্যন্ত কম। যাঁরা মেয়েছেলে নিয়ে এসেছেন তাঁরা যে কোনও ভাড়াতে রিক্সা বন্দোবস্ত ক'রে ফেল্‌ছেন। আমি মতলব ঠিক ক'রে ফেলেছি। দু'বারের সিনেমার টিকিটের দাম দিয়ে এক মাইল পথ যাওয়ার জন্য রিক্সা নেবো না। জুতো-টা হাতে ক'রে হেঁটে চ'লে যাবো। মনকে প্রবোধ দিলাম, দুনিয়ার বিধান, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে।

মহিলাটী পাশে-এসে ব'ল্লেন, "মশায়, আমি ত জলে নেমে গিয়ে রিক্সা ডাকতে পারছি না; আমাকে দয়া ক'রে সাহায্য করুন—রিক্সা একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিন।"

অন্যমনস্কভাবে কহিলাম—"অনেক ভাড়া চাইছে।"

"নিরুপায়, বাড়ী ত পৌঁছুতে হবে।"

"তা বটে"—রিক্সা ঠিক ক'রে তাঁকে উঠিয়ে দিলাম। বকা-ছোক্‌রার দল আমার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় চিন্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। আবার হুড়-হুড় ক'রে বৃষ্টি এল। মহিলাটী ব'ল্লেন, "হেঁটে কেমন ক'রে যাবেন। আমিও ত মাণিকতলায় থাকি—একই দিকে—আসুন, উঠে আসুন।"

বৃষ্টিতে কেউ কোনও দিকে লক্ষ্য করার অবসর পাচ্ছে না, সেটা লক্ষ্য ক'রে নিয়েই রিক্সাতে উঠে পড়্‌লাম ও ব'ল্লাম "দেখুন, ভাড়াটা কিন্তু দু'জনে আধা-আধি দেবো। দু'জনেই যখন পরস্পরের অপরিচিত তখন কারও উচিত নয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাওয়া।" তিনি রাজী হ'লেন; আমিও পাশাপাশি বস্‌লেও এই 'ভাগাভাগির' ব্যবস্থাতে পরস্পরের ব্যবধানটা বজায় রাখ্‌তে পেরে সন্তোষলাভ কর্‌লাম। এই যে সাংসারিক হিসাব এটা প্রৌঢ়ত্বের। এ বয়সে বিচার ও মীমাংসা যেমন ক'রে বহু দার্শনিকও মনস্তত্ত্ব তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করে, মনের আবেগে ভেসে যায় না—এ-টা প্রণিধানযোগ্য নয় কি!

পরদিন ঠিকাদার মশাই বাড়ীতে এসে যখন কাজ সুরু ক'র্লেন গৃহিণী হেসে ব'ল্লেন, "ভাগ্যিস্ সিনেমায় গিয়েছিলে, পোড়া যুদ্ধের বাজারে যেন সব জিনিষের মড়ক হ'য়েছে—নইলে মিস্ত্রী পাওয়া যায় না, বালি সিমেণ্ট মেলে না। মাঝে মাঝে সিনেমায় যেও, যদি এমন কাজ বাগিয়ে আস্‌তে পার।"

এক চক্ষু হরিণ

অধ্যাপক শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

হাতে-নাতেই ধরিয়া ফেলিলাম। রেজিষ্টারী খুলিয়া চোখে পড়িল সরোজ গত চারদিনই present, অথচ ওকে কলেজে দেখি নাই। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। নীরেন সরোজের proxy দিতেই ধরিয়া ফেলিলাম। সাতদিনের percentage তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিলাম এবং পড়ানো শুরু করিবার আগে ছোটোখাটো ব্যাপারে নৈতিক শিথিলতাই যে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল, একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র বক্তৃতায় তাহা ছেলেদের সমঝাইয়া দিলাম।

বাসায় ফিরিয়া B.A পরীক্ষার খাতা দেখিতে বসিয়াছি গৃহিণী একটি চিঠি দিয়া গেলেন। ছোট্ট চিঠি—

জামাইবাবু:

দিদির চিঠিতে জানলাম আমাদের centreএর Economics First Paper আপনার কাছে গেছে। Bar F. N. 15 Registerd NO 2593 of 1942 আমার বন্ধু নিরুপমা রায়। ও ভাল দেয়নি—মোট ২৬ নম্বর উত্তর করেছে। অন্য Paper গুলোতে পাশ করে যাবে। ওকে পাশ করানো চাই-ই। আমার বিশেষ অনুরোধ জানবেন। মনে করবেন আমার কাগজ। ইতি—

রমা

রমা মেজো শ্যালিকা—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। ওর তীক্ষ্ণ রসনাকে ভয় করি, স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। সুতরাং—

গেজেটে পাশের তালিকায় Bar F. N. 15এর নাম ছিল।

সংস্কৃতির বিনিময়

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

একাধিক পুরাণে একটি কৌতুকপ্রদ শ্লোক আছে।

ঋক্ষবানরযুক্তেন রথেনাশাঞ্চ দক্ষিণাম্
গায়ন্ নৃত্যন্ ব্রজেৎ স্বপ্নে বিন্দ্যাম্ মৃত্যুমুপস্থিতম্।

স্বপ্নে ভল্লুক বা বানরযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া নৃত্য ও গান করিতে করিতে আপনাকে দক্ষিণদিকে গমন করিতে দেখিলে মৃত্যু উপস্থিত জানিবেন।

মৃত্যুলক্ষণের মাহাত্ম্যমণ্ডিত এই শ্লোকটির কোথাও সুখকর ভাষ্য বা টীকা দেখি নাই। তাই নিম্নোক্ত ভাষ্য করিতেছি।

আমরা—কোটি কোটি ভারতবাসী যুগ যুগ ধরিয়া রামনামে মগ্ন হইয়া বন্য বানর ও ভল্লুক সেনাদলের সাথে জানকীসন্ধান-সাফল্যে উল্লসিত হইয়াছি। বন্য বানর ও ভল্লুকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহানন্দে জানকীর উদ্ধার কামনায় ভারতের দক্ষিণ সীমানা কুমারিকায় যাত্রা করিয়াছি। আমরা যুগ যুগ বন্যবানর ও ভল্লুক সেনার দাক্ষিণ্যে সেই জয়যাত্রার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়াছি। সেই দাক্ষিণ্যে কাঠবিড়ালটিও কিছু অংশ দাবী করিয়াছে। আমাদের স্বপ্নকে মোহন করিয়া কৃত্তিবাসী ছন্দ শোনাইয়াছে, কেমন করিয়া বন্যবানরশ্রেষ্ঠ হনুমান আপন পুচ্ছেও (লেজ ইতি ভাষা) পাহাড় চূড়া বহিয়া আনিয়া সেতুবন্ধ বিষয়ে নলকে সাহায্য করিয়াছিলেন, শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া নলের মাথায় পাহাড় চাপাইতে গিয়াছিলেন—এখন কি কেমন করিয়া তিনি কাঠবিড়ালীকে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া আমরা লাঙ্গুলমহিমার স্বপ্ন দেখিয়াছি, লাঙ্গুলমহিমায় সাগরলঙ্ঘন কীর্ত্তন করিয়াছি, লাঙ্গুলাস্ফালনে লঙ্কাবিজয়ের অর্দ্ধেক অঙ্ক রচিত করিয়াছি। বন্য বানর ও ভল্লুকের লাঙ্গুলমহিমার মধ্যে দক্ষিণদেশে যাত্রা করিয়াছি। আমরা মরিয়াছি। বন্য বানর ও ভল্লুকের উল্লাসে যেদিন উল্লসিত হইয়াছি, সেই প্রথম স্বপ্নের দিন হইতে আমরা তিলে তিলে মরিতেছি। যেদিন হইতে দেবযোনি মানবজাতি বীর বানরজাতিকে বন্য বানরের সাথে লাঙ্গুলে শোভিত করিয়া, অতীতের বীর্য্য-অভিযানের গরিমাকে কলঙ্কিত করিয়া মহা-ভক্তিতে আমরা গদগদ হইয়াছি, শাস্ত্রবচন অনুযায়ী সেদিন হইতে আমরা তিলে তিলে মরিতেছি। বীর্য্যমণ্ডিত অতীতকে যেদিন হইতে বিকৃত করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি, সেদিন হইতে আমাদের সংস্কৃতিতে বিকৃতি আসিয়াছে।

তাই বকরাক্ষসের গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে, হিড়িম্বা ও তাড়কা রাক্ষসীকে নরখাদকী ও তীক্ষ্নখদংষ্ট্রী রূপে অঙ্কিত করিয়া রাক্ষসমাহাত্ম্য জানিয়াছি। কিন্তু ভীম-হিড়িম্বার মিলনের মধ্যে যে অনাবিষ্কৃত ইঙ্গিত রহিয়াছে, কোনও দিন তাহা ধরিতে পারি নাই। মানবে ও রাক্ষসে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ নহে। মানবী ও রাক্ষসী সভ্যতায় পরস্পরে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ।

বীর্য্যশুল্কায় যে রামায়ণের গরিমা, তাহারই মুখ্যনায়ক ইক্ষাকু-সন্তান বীর্য্যবান্ রামচন্দ্রের বিরহে কৃত্তিবাসী কাঠবিড়ালী ও সহানুভূতি জানাইয়া অমর হইল। সংস্কৃতি ও অতীত সভ্যতার বিষয়ে আমাদের অজ্ঞানতা তথাপি আমরা স্বীকার করিব না!

মধ্যমপাণ্ডবের ন্যায় রাঘবকুমার যদি রাক্ষসকুমারীর প্রেম নিবেদনে ক্ষণেকও প্রীত হইতেন, তবে সীতাহরণ হইত না, লঙ্কাকাণ্ড বাধিত না। রাঘবকুমার অনার্য্যার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেন। মানব-সংস্কারে বাধিল হয়ত। আশ্চর্য্য এই, অশোক-কাননে সীতাকেও রাক্ষসীরা সম্ভাষণ করিল অনার্য্যা বলিয়া। রাক্ষসী-সংস্কার সীতাকে ইহাই বুঝাইতে চাহিল—'স্বর্ণলঙ্কা যখন পদতলে বিকাইতে চাহিয়াছে, তখন জীবনটাকে ভোগ করিয়া লও, ভিখারী নিঃস্ব রামের জন্য ক্রন্দন অনার্য্য মনোবৃত্তি।'

দানবরাজ আপন কন্যা মন্দোদরীকে দান করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। দানবে রাক্ষসে সংমিশ্রণ হইয়াছে। রাবণ-ভ্রাতা রাক্ষস কুবের অলকার অধিপতি—যক্ষদেশের রাজা। সুতরাং রাক্ষস ও যক্ষেও রামায়ণ যুগে মিশ্রণ সুরু হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের নবম অধ্যায় অনুসারে, কয়েকটি ব্রহ্মসন্তান জাত হইয়াই ক্ষুধা-কাতর হইয়া জলরাশি পানে উদ্যত হইল, অন্য কতকগুলি সন্তান তাহাদের কবল হইতে জলরাশি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। এই রক্ষাকারক সন্তানসমূহ 'রক্ষা করিব' বলায় রাক্ষস নামে পরিচিত হইল, এবং যাহারা জলরাশি পান করিয়া ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহারা যক্ষ নামে অভিহিত হইল। সাগরবক্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই যক্ষ ও রাক্ষসের পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণ। হিমালয় ও হেমকূটেই যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরের সনাতন বিকাশ, কিন্তু সাম্রাজ্যলিপ্সা তাহাদিগকে বহুদূর সমুদ্ররাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল।

ত্রেতাযুগের তৃতীয়াংশে মনুবংশীয় রাজা তৃণবিন্দুর অনুপমা কন্যা ইলবিলার সহিত পুলস্ত্যের বিবাহ হয়। তাঁহাদের সন্তান বিশ্রবা ঋষি। সেই বিশ্রবা ঋষির পত্নী বৃহস্পতিগোত্রসম্ভূতা দেববর্ণিনীর সন্তান যক্ষেশ্বর কুবের। সুতরাং রামায়ণযুগে অযোধ্যায় ও অলকায় রক্তের সম্বন্ধ ঘনীভূত হইয়াছে, যক্ষ ও মানব সংস্কৃতি পরস্পরে মিলিতেছে। মহাভারতের যুগেও যক্ষের রাজ্য রহিয়াছে—কিন্তু মনুবংশের বিস্তারমুখে তাহা ক্ষীণতম হইয়া লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। ক্রমে যক্ষরাজ্যের রাজা হইল মনুসন্তান, সুতরাং পৌরাণিক রীতি অনুসারে যক্ষেরাও রাজার নামে হইল মানব। মেঘদূতের

যক্ষপ্রিয়া অনন্তকালের মানবপ্রিয়া হইয়া এই সিদ্ধান্তকে সার্থক করিয়াছে।

সেই বিশ্রবা ঋষির অপরাপত্নী রাক্ষসকন্যা কৈকসীর সন্তান রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পনখা। রাবণের পিতামহী ইলবিলা মনুবংশীয় রাজকন্যা, সুতরাং লঙ্কার রাক্ষসরাজবংশের সহিত ভারতের মনুরাজবংশের রক্তের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর অলকায় ও স্বর্ণলঙ্কায় বৈমাত্রিক সম্বন্ধ। যক্ষ ও রাক্ষস সংস্কৃতি ধর্মেরও তাই যেন পরস্পর বৈমাত্রিক সম্বন্ধ।

বিভীষণ পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বকন্যা। সুতরাং রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব সংস্কৃতির মিলনেও তাঁহাদের উভয়ের নাম চির-ভাস্বর। দেখিতেছি, একটি রাজবংশেই মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও ঋষির রক্ত সমন্বয়, এক লঙ্কার রাজসংস্কৃতিতে সার্ব্বজনীন ধর্ম, সংস্কার ও সভ্যতার সাগরসঙ্গম। সারা পৃথিবীর ঐশ্চর্য্য যিনি হরণ করিয়া আনিলেন—চৌর্য্যবৃত্তিতে নহে, আপন বীর্য্য বলে, যিনি বহু রাজর্ষি ও মহর্ষিকে লজ্জিত করিয়া আপন তপোবলে সেই বীর্য্যশক্তি অর্জ্জন করিলেন, ত্রিভুবনকে উপেক্ষা করিয়া তাঁর অবজ্ঞার নিনাদ আরব্যরজনীর গঞ্জনেশায় জাত দৈত্য-দানবের হুঙ্কার নহে, তাহা অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞকারী রাজরাজের ন্যায় বীর্য্যগরিমা। তপোবলে মহাকালকে যিনি স্তম্ভিত করিলেন, মরণকে যিনি পুত্তলিকার ন্যায় তুচ্ছ করিলেন, যিনি ইন্দ্রত্বকে করিলেন খর্ব্ব, তিনি যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে আপন বীর্য্যশক্তিকে নিবেদন করিলেই, 'দুষ্প্রবৃত্তি দশানন' এ অপবাদ আসিত না, শাস্ত্রবাণী সে মহারাজ শক্তিকে কুণ্ঠিত করিত না। রাক্ষস স্বর্গধর্ম্মী নহে, তাই মানবশাস্ত্রে মানব কথায় তাহার উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মের ও ভোগনীতির সমর্থন নাই। রাক্ষস বিধাতার কিছু স্বতন্ত্র সৃষ্টি নহে, স্বর্গধর্ম্ম যে অবিশ্বাস করিল সেই-ই রাক্ষস—অবমাননা করিলে তো কথাই নাই। দানব সন্তান হইলেও প্রহ্লাদ তাই 'দানব প্রহ্লাদ' নহেন, 'ভক্ত প্রহ্লাদ'। তিনি স্বর্গধর্ম্ম-বিশ্বাসী। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও দানবের ধর্ম্মই হইল ভোগ ও বিলাস। যক্ষ সে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয়ে মগ্ন, আর গন্ধর্ব্ব ভোগ করে কাম। রাক্ষস ও দানব, ঐশ্বর্য্য ও কাম নীতির সাধক তো বটেই, অধিকন্তু পরবীর্য্য অসহিষ্ণু। রাক্ষস ও দানব হইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না, জন্মিয়া হয় দানব রাক্ষস। চন্দ্রবংশের যাদব শাখায় তাই না কংস হইল রাক্ষসরাজা, তেমনই তো জরাসন্ধ ও শিশুপাল হইল দৈত্যদানব।

রূপাভিমানী গন্ধর্ব্বেরা আপনাদের সংরক্ষিত গোষ্ঠির মধ্যে চলিতে চাহিত। ললিতকলায় ও রূপচর্চ্চায় তাহাদের বিলাসমধুর দিন ছিল গাঢ় মগ্ন। পরাক্রম প্রকাশ তাহাদের ঐতিহ্যের বাহিরে, তবে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। সেই গন্ধর্ব্বকুল হইতে দেবদৈত্যদানব কর্ত্তৃক কন্যাহরণ পৌরাণিক ভারতের দৈনন্দিন কাহিনী। গন্ধর্ব্বকন্যার মধ্য দিয়া গান্ধর্ব্ব সংস্কার অতি সহজেই বিভিন্ন জাতি যেমন দেবদানব যক্ষ প্রভৃতির মধ্যে সংক্রমিত হইয়া গেল।

অমরাবতীর ঐশ্বর্য্যে শক্তিমান্ দেবজাতি যাজ্ঞিক ধর্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ত্রিভুবনের নর-নারীর নিকট হইতে যজ্ঞের দক্ষিণা নামে দেবরাজ ইন্দ্রের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যজ্ঞীয় ধর্ম্মের নামে দেবজাতির এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা দানবেরা সহিল না, তাহারা বারে বারে স্বর্গ লুণ্ঠন করিল, সুমেরু শিখরের সেই ইন্দ্রপুরী হইতে বারে বারে দেবললনা হরণ করিল। মানবেরা (মনুবংশীয় রাজগণ) দেবদানবের সঙ্ঘর্ষে দেবজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অথবা দেবজাতি-প্রবর্ত্তিত যাজ্ঞিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, দেব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বাদ হইতে একরকম বঞ্চিতই রহিলেন। অন্যদিকে, দানবেরা দেব ঐশ্বর্য্যে বলবান হইয়া দেবললনার মধ্য দিয়া অমরাবতীর আভিজাত্য সুধা পান করিলেন। দেব-ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়া দানবরাজ অমরাবতীর সিংহাসনে আপন পার্শ্বে যেদিন দেবমর্য্যাদা দেবেন্দ্রাণীকে দানব ইন্দ্রাণী করিয়া লইলেন, যেদিন দানব কর্ত্তৃক ইন্দ্র পরিবর্ত্তন হইলেও ইন্দ্রাণীর পরিবর্ত্তন হইল না, সেদিন হইতেই দেব-আভিজাত্য গোপনে দানব-মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইল। গন্ধর্ব্বের মতো আপন গোষ্ঠীর মধ্যে দেব আভিজাত্যকে দেবতারা সংরক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, মানবের সহিত এত প্রিয়সম্বন্ধ থাকিলেও তাই দেবকন্যার আত্মনিবেদনে মানবকুল অলঙ্কৃত হয় নাই, তাই না মানব-কন্যাও দেব-পত্নী হইতে পারে নাই। দানবেরা দেবজাতির সেই রক্ষণশীলতার সুযোগ লইয়া দেব-আভিজাত্যকে বারে বারে লুণ্ঠন করিয়া দানব-মর্য্যাদার সহিত মিলাইয়া দিল। পৌরাণিক ভারতে অমরাবতীর যে আসন ছিল, রামায়ণ যুগে তাহা আর নাই। পৌরাণিক যুগে দানবকেই দেবজাতির অপকারক বলা হইয়াছে, কিন্তু রামায়ণে রাক্ষসরাজ রাবণ দেবদানব ও ঋষির অপকারক। দেখিতেছি, দেবদানব সমমর্য্যাদাভুক্ত হইয়াছেন। মহাভারত যুগে দেবজাতির মাহাত্ম্য কাল্পনিক ও গল্পকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুমেরু শিখর ভাঙিয়া অমরাবতীকে মানবেরা বণ্টন করিয়া লইয়াছে।

দানবজাতি দেবতাদের পরে আভিজাত্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের আভিজাত্যের ক্ষয়ও তাই দেবজাতির কিছু পরে আরম্ভ হইয়াছে। যেদিন দানব নন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ্রবংশকে অলঙ্কৃত করিলেন, সেদিন হইতেই মানব-আভিজাত্য দানবের নিকটে মর্য্যাদা লাভ করিল। মহাভারত যুগে যাদবকুলগৌরবের চরণে দানব কন্যা উষার আত্মনিবেদনে মানব-আভিজাত্যের যুগ-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। মহাভারতের যুগ হইতে দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রক্ষের আভিজাত্য ও সংস্কৃতির সহিত মানবের আভিজাত্য ও সংস্কৃতির রাসায়নিক মিশ্রণ হইয়া, পৌরাণিক ভারতের স্থানে নবীন ভারত জাত হইল। মনুবংশীয়গণের অবলম্বিত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইয়া সকল জাতিকে এক করিয়া মানব করিয়া লইল।

রামায়ণের বানরজাতি দেবগন্ধর্ব্ব রক্ত সম্বন্ধে জাত। এই বীর্য্যবান্ জাতির সহিত অগ্নি-মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাঘব কর্ত্তৃক লঙ্কাবিজয় সম্ভব হইয়াছিল। তাহারাই করিল জানকী-সন্ধান, তাহারাই দেখাইল পথ, তাহারাই করিল সেতুবন্ধ। জানকী রাবণকে অনুরোধ করিয়া এক বৎসর কাল সময় ভিক্ষা লইয়াছিলেন রামচন্দ্রকে প্রতীক্ষা করিবেন বলিয়া। সেই এক বৎসর অতীত হইলে মহাকাব্যের কী-যে রূপ হইত কে জানে। হনুমান্ যেদিন জানকীর সন্ধান পাইলেন আর মাত্র

কিঞ্চিদধিক দুই মাসকাল বাকী। ইহারই মধ্যে সমস্ত বানরজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কুমারিকায় আনয়ন, লঙ্কা ও ভারতের সংযোগ স্থাপন এবং রাবণবিজয়, বিদ্যুৎবাহিনী বানরসেনার সেই অমিত-কীর্তি পৌরাণিক ভারতের চির অমর পৃষ্ঠা হইয়া রহিবে। সেই দেবগন্ধর্বের আভিজাত্য-মণ্ডিত বানরজাতির অমর সেনানী 'মহাদেবো হনুমান্ সত্যবিক্রমঃ' জাতীয় জীবনের কোন্ কলঙ্কে লাঙ্গুল-শোভিত হইলেন ?

কৌতুকের বিষয় এই, বাণবিদ্ধ বালী যখন রামচন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, বানরজাতির জাতিবিবাদে তিনি কেন হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন রামচন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন যে ইক্ষ্বাকুদের রাজ্যে বালী কর্তৃক সুগ্রীব জীবিত থাকিতে সুগ্রীব-পত্নী অর্থাৎ ভ্রাতৃজায়াকে ভোগ মানব-ধর্মবিরোধী, সুতরাং বালী অ-ধর্মী এবং বধ্য। কিন্তু সুগ্রীব যেদিন স্বীয় পত্নীকে অসঙ্কোচে পুনরায় গ্রহণ করিলেন, সেদিন বানরজাতি ধর্ম-নিয়মে তৎ-পত্নী রুমাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হইল না। মনুবংশগৌরব রাঘবভ্রাতৃযুগল কেমন করিয়া ইহা সহিলেন? কেমন করিয়াই বা মানবশাস্ত্র ও ইতিহাস তখনও যে সম্বন্ধ স্বীকার করে নাই, যুবরাজ অঙ্গদও স্বীয় মাতার যে নূতন সম্বন্ধে লজ্জিত—বিধবা তারা কর্তৃক সুগ্রীবের মহারাণীর পরিচয় গ্রহণ, ইহাতে রাঘবযুগল সানন্দে সম্মতি দিলেন? বানরজাতির সহিত মানবের সম্প্রীতির ফলে, মানবশাস্ত্রের নূতন সংস্কার হইল, নূতন নিয়মের সংস্থান হইল। মানব সংহিতা এ সম্বন্ধ স্বীকার করিল। ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব স্বীকার করিল বলিয়া, বানরজাতির রাজবংশ অযোধ্যার মানবরাজের অধীনে মানব গৌরব লাভ করিল। উভয় জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির বন্ধন স্থাপিত হইল।

এমনি করিয়া সকল জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম ও আভিজাত্যকে আপনার সংহিতাকার দ্বারা মর্য্যাদা দান করিয়া মানব পরিচয় সার্বজনীন হইল। যে দানবজাতির পরকন্যাহরণবৃত্তি পৌরাণিক শাস্ত্রে বহু নিন্দিত, সেই দানবেরই বৃত্তিতে কৌরব কর্তৃক পরকন্যাহরণ শাস্ত্রে নিন্দিত হইল না, প্রশংসিত হইল। দানব সংস্কারকে মানব যুগধর্মে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। বাৎস্যায়নের শাস্ত্রও হয়ত যুগধর্মে গান্ধর্বশাস্ত্রেরই মানব সংস্করণ এবং অধুনা সার্বজনীন সংস্করণ হইতে পারে। অধুনাকার মনু-সংহিতা সর্বধর্মাশ্রয়ী এবং সার্বজনীন।

আমাদের একটি সনাতন সংস্কার আছে যে রাক্ষস সর্বগ্রাসী, অন্ততঃ যজ্ঞভক্ষণকারী। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কথা অনুসারে, পূর্বে তিন কোটী সন্দেহ নামক রাক্ষস সূর্য্যকে প্রতিদিন গ্রাস করিতে উদ্যত হইত। ক্রমে এই কারণে সূর্য্যের সহিত তাহাদের দারুণ যুদ্ধ হয়। এই সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া ওঙ্কার সংযুক্ত ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত মহাজল নিক্ষেপ করেন, সেই জল বজ্ররূপ ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছে।

অর্থাৎ অগ্নি ও সূর্য্যোপাসনা স্বরূপ ঋক্‌মন্ত্রকে বহু সন্দেহ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞধর্মবিস্তারের মুখে পৌরাণিক ভারতের বহু শক্তিশালী সংস্কৃতি বাধা দান করিয়াছে। জয়শীল মানবের নবধর্ম প্রবর্তনে যাহারা সম্মত হয় নাই, তাহারাই রাক্ষস। তাই রাক্ষসে ও দেবমানবে সঙ্ঘর্ষ। পুরাণকার বলিতেছেন, ঋকমন্ত্রেরই বজ্রশক্তিতে রাক্ষসের হইল নিধন, বৈদিকাগ্নি হইল সর্বসম্মত।

স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর ত্রিভুবনপতি রাবণ রাজা ব্রহ্মরাক্ষসগণের সামগান শ্রবণে জাগরিত হইতেন। মহাকাব্য যখন এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলিতেছে, তখন রাবণ রাজা রাক্ষস হইলেন কেন? দেখিতেছি, বেদাগ্নি যাঁহার তপোবল, তিনিই দেবঋষির অপকারক। মীমাংসা এই যে, যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া অমরাবতীবাসী দেবনামক জাতির অধিপতি ইন্দ্রের নামে সঙ্কল্প কি দক্ষিণাদান, অর্থাৎ আধিপত্য স্বীকার—ত্রিভুবনজয়ী রাবণরাজার পক্ষে এ অসম্ভব। আপন তপোবলে ত্রিলোক বিজয়ের শক্তি যিনি অর্জন করিয়াছেন, এই ঋষিপুত্র সর্বশাস্ত্র-বেত্তা মহারাজ রাক্ষস হইয়া গেলেন রাক্ষস দেশের রাজা বলিয়া? না স্বর্গদ্বেষী বলিয়া?

যজ্ঞাগ্নি তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই, পরাভূত করিল কাম। স্বর্ণলঙ্কাবিজয়ের ফলে, সর্বজাতির সহিত রক্তে সম্পর্কিত, সর্বজাতির সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, সকল তীর্থসঙ্গমে জাত, তথাকার সেই অপূর্ব আভিজাত্যের সহিত সারা ভারতের বিনিময় হইল সেতুবন্ধ পথে।

বুলেট্ বনাম মলাট্

আমিনুর রহমান

অনেকদিন পর সে দিন কলেজস্ট্রীটে এক বইয়ের দোকানে বিশুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিশুদা আমার 'পোষ্টকার্ড' বইখানা বেরুবার আগে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন তাই জিজ্ঞেস করলুম "এই যে বিশুদা, এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলেন? সেই ডামাডোলের বাজারে একদিন যা দেখা, আমার কাছ থেকে একখানা বই নিয়ে গেলেন, সেই থেকে আর পাত্তাই নেই। তারপর কেমন লাগল বইখানা?" বিশুদা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন "আরে রেখে দেও তোমার ঐ 'পোষ্টকার্ড', কি ফ্যাসাদেই না পড়েছিলুম ঐ অলুক্ষণে বইটা পড়তে নিয়ে।" আমি ত তাজ্জব বনে গেলুম। সামান্য একটা গল্পের বই পড়তে দিয়েছিলুম তার জন্য কোন মানুষ যে ফ্যাসাদে পড়তে পারে কিম্বা আমাকে না-হক্ খানিকটা কথা শুনতে হতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। এতকাল ত বন্ধুবান্ধবদের

কাছ থেকে বইটার তারিফ শুনেই এসেছি, কারুও সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে শুনিনি। বিশুদার খাপ্পা হবার কারণ ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম "কেন বইটার দোষ কোনখানটায় পেলেন?" বিশুদা সমান উষ্ণতার সঙ্গেই বললেন "দোষ কোনখানটায় নেই তাই শুনি? বলি কোন প্রেসে ছাপিয়েছ হে?" বইটার ছাপা চমৎকার হয়েছে বলেই আমার ধারণা, তাই বললুম "কেন বেশ ঝরঝরে ছাপা হয়েছে ত?" বিশুদা বিদ্রূপ করে বললেন "হ্যাঁ ঝরঝরে বলে ঝরঝরে, একেবারে ঝরে পড়ছে, এদিকে আমার যে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হতে চলেছিল সে খবর রাখ?" আমি অধীর হয়ে বললুম "কোই না ত? কেন কি হয়েছিল?" বিশুদা ভেংচি কেটে বললেন 'হয়েছিল আমার গুষ্টির মাথা, বেঘোরে প্রাণটা খোয়াই নি তাই চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। উঃ এখনও ভাবলে গা শিউরে ওঠে, পেতুম যদি একবার তোমাকে সে দিন, তাহলে—" দোকানে মিঃ সরকার আর মিঃ রায় আমাদের আলাপ আলোচনা বেশ উপভোগ করছিলেন, এতক্ষণে তাঁরাও অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন। বিশুদাকে বাধা দিয়ে বললেন "ব্যাপারটা আগে খুলে বলুনই না।" বিশুদা তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনবার শ্রোতা পেয়ে একটু যেন তৃপ্ত হলেন, তারপর বলতে সুরু করলেন "আরে ভাই দুর্ভোগের কথা আর বল কেন। সে দিন ঠিক কি বার ছিল মনে নেই তবে ট্রাম বাস সব ষ্ট্রাইক, পথে ছাত্রদের প্রশেসন, গুণ্ডাদের গুণ্ডামি, পুলিশের লাঠি, আর মিলিটারীর গুলি সবই তাক্ বুঝে চলছে। আমি ঐ অকালকুষ্মাণ্ডর লেখা বইখানা বগলদাবা করে গেলুম ছকুখানসামা লেনে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধুটি চোদ্দ নম্বর বাড়ীতে থাকেন আমি খুঁজে মরছিলুম একশ চোদ্দ নম্বর বাড়ী। দুপুর রোদে টো টো করে ছকুখানসামা লেনের আঁকা বাঁকা গলি বার কতক টহল দিয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ী মুখো হয়ে হাঁটা শুরু করলুম। রাস্তায় তখন লরী পোড়ান আর পুলিশের ঠেঙ্গানি দুই-ই চলছিল। সেই দুর্য্যোগের মধ্যে কোন রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে এগলি সেগলির ভেতর দিয়ে হন্ হন্ করে পা চালিয়ে এগুচ্ছিলুম। গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত, দর দর করে ঘাম ঝরছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এসে আটকা পড়লুম। রাস্তার মোড়ে ভীড় জমেছে, আর এগুনো যায় না। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন ভীড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছি হঠাৎ কোত্থেকে একটা মিলিটারী পুলিশের গাড়ী হুশ করে বেরিয়ে এসে দুচারটে দুম দুম করে গুলি ছুঁড়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচসাতটা লোক টুপটাপ করে পড়ে গেল। অধিকাংশ লোক বাপ্ বাপ্ বলে পড়ি কি মরি করে পালাল। একদল ছোকরা আহতদের উদ্ধারে ছুটে এলো। একটা রেড্ ক্রশ্ মার্কা সিভিলসাপ্লায়ের লরী এসে দাঁড়াল, আহতদের ধরাধরি করে তাতে তোলা হল। এরই মধ্যে তিন চারটে ছোকরা—বলা নেই কওয়া নেই—ধাঁ করে আমাকে পাঁজা করে তুলে নিয়ে গিয়ে লরীতে চাপিয়ে দিল। আমি ভয়নক রকম আপত্তি করলুম "আরে কোরছেন কি মশাই, ছাড়ুন ছাড়ুন, আমার চোট লাগে নি।" কে কার কথা শোনে। একজন বখাটে ছোকরা আবার সান্ত্বনা দিতে লাগল "নার্ভাস হবেন না, ভয়ের কোনই কারণ নেই, এক্ষুণি হাসপাতালে গিয়ে ফাষ্ট এড্ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ট্যাণ্ডেজ করে আপনাকে বাড়ী পৌছে দেওয়া হবে।" গেরো আর কাকে বলে, পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে, এরা কি সহজে রেহাই দেবে। তাও আবার লরীতে বসে থাকবার জো নেই, ধরে বেঁধে শুইয়ে দিয়েছে। একটা ডাক্তার ছিল লরীতে, দেখে ত মনে হল ঘোড়ার ডাক্তার, উঃ চেহারা দেখেই রুগি কোল্যাপস্ মেরে যায়। তিনি একে একে সবার ক্ষত পরীক্ষা করছিলেন, যাতে বেশি রক্তপাতে পথেই না রুগি কাবার হয়ে যায়। আমার কাছে এসেই ফড়্ ফড়্ করে নতুন জামাটার বগলের কাছটা হাতখানেক ছিঁড়ে ফেলল। আমি হাঁ হাঁ করে উঠলুম, গুণ্ডা গোছের দুই ছোকরা আমাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল, মোটে নড়তেই দিল না। ডাক্তার আমার কাঁধ, বগল, বুক ভাল করে দেখে বললেন, "কোই হে, এর কোন্ জায়গাটা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে।" আমি তেরিয়া হয়ে বললুম "আপনাদের মাথা আর মুণ্ডু হচ্ছে, খামকা রক্ত পড়তে যাবে কেন মশাই, আমার লেগেছে নাকি?" একটা ছোকরা বলল "লাগে নি ত রক্তে জামা ভিজল কি করে, নিশ্চয় কোথাও বুলেট লেগেছে।" আমি ঘাড় কাত করে চেয়ে দেখি সত্যিই ত জামার বগলের কাছটা

লালে লাল হয়ে গেছে, আমি একেবারে আঁৎকে উঠলুম, ভাবলুম হয়ত হাতে বুলেট লেগেছে, তাইতো হাতটা অবশ হয়ে গেছে, সেই জন্য হয়ত জ্বালা যন্ত্রণা বোধ করতে পারছি না। আমার মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলুম, সব যেন কেমন গুলিয়ে গেল, আমিও ক্রমে এলিয়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হল আমি তখন মেডিকেল কলেজে। চোখ চাইতেই সেই বখাটে ছোকরাটা বলে উঠল "বলিহারি সাহস মশায়ের, খুব ভড়কে দিয়েছিলেন আমাদের। যান এখন বাড়ী যান্।" আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম "কি করে যাব? ব্লিডিংএ শরীর বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে, আমার যে উঠবার শক্তি নেই।" ছোকরাটা বিদ্রূপ করে বলল "রক্তপাত না ঘোড়ার ডীম। উঠুন, উঠুন, বেড খালি করুন। আর এই নিন আপনার বই। ভবিষ্যতে কোন দিন লাল মলাটের বই বগলে করে রাস্তায় ঘুরবেন না।" লাল মলাটের বই? তখন হুঁশ হল তাইত 'পোষ্টকার্ড' বইটার কভার ডিজাইন এত বেশি লাল কালি দিয়ে ছেপেছে যে এমনি হাতে করলেই হাত লাল হয়ে যায়, আর দুপুর রোদে তা বগলে করে ঘুরলে রং চুঁইয়ে পড়বে সে আর আশ্চর্য্য কি। বড্ড অপ্রস্তুত হয়েছিলুম, তার ওপর ভীড় করে সবাই তামাসা দেখছে, লজ্জায় মুখ দেখান দায়। কোন রকমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। তাতেই কি বিপদের শেষ। আমার ঐ ছেঁড়া লাল জামা আর উস্কখুস্ক চেহারা দেখে রাস্তায় কম করে দুশ দশ জন লোক সহানুভূতি দেখাতে এলো "আহা বড্ড লেগেছে দেখছি, গোলমালটা কোন ধারে বেধেছিল? কোন জায়গায় গুলি লাগল? হেঁটে যাবেন না, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন"...ইত্যাদি। অতি কষ্টে সেই সব তাল সামলে বাসায় পৌঁছুলুম। ভাবলুম বাঁচা গেল। কিন্তু জের তখনও মেটে নি, বাড়ীর মধ্যে পা দিয়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলুম। গিন্নির সামনে পড়তেই আমার ঐ অবস্থা দেখে একেবারে আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো "ওমা একি সর্ব্বনাশ হল গো, আমার কি উপায় হবে গো, কে কোথায় আছিস শীগগির আয় রে, মুখপোড়া সাহেবদেরমরণ হয় না রে",...অর্থাৎ আমাকে কিছু বলবারই ফুরসৎ দিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে পিল পিল করে লোক জমা হতে লাগল। পাড়া-পড়শি, মেয়ে-মদ্দা, ছেলে-বুড়ো, সবাই আমাকে ঘিরে হাহুতাশ করতে সুরু করে দিল। উঃ তাদের বুঝিয়ে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা। সবাইকে ঠাণ্ডা করে নাওয়া খাওয়া সারতে বেলা পাঁচটা বেজে গেল, আর এদিকে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম সেই সকাল আটটার সময় শুধু এক কাপ চা খেয়ে। আচ্ছা বলুন দেখি মশাই, কার না রাগ হয়। এমনটি হবে জানলে ও হতভাগাটাকে বই ছাপবার পরামর্শ দিতুম।

আমার দোষ যে কোন খানটায় হল, তা এখনও বুঝলুম না। যাক্ লাভের মধ্যে একটা ছোট গল্পের প্লট পাওয়া গেল।

জৈন কর্ম্মবাদ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি, ডি-লিট

জৈনদিগের মতে ব্রত পালন, ভিক্ষু এবং দরিদ্র সেবা, নিরন্নকে অন্নদান, এবং দীনদরিদ্রদিগকে খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুদানের দ্বারা কর্ম্মকে বিনষ্ট করা যায়। জৈনেরা বিশ্বাস করে যে পার্থিব বস্তুর প্রতি মমতা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। মানবের দেহ, মন এবং বাক্য পার্থিব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। রাগ, দোষ, লোভ, মোহ ও মানকে প্রশ্রয় দিলে কর্ম্ম বিপন্ন হয়। মিথ্যা বিশ্বাস হইতেও কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। হিন্দুদিগের মতে পাপকর্ম্মের জন্য ভগবান মানবকে শাস্তি দেন; কিন্তু জৈনরা বলেন কর্ম্ম মানবকে শক্তি দেয় এবং ইহা নিজে বিনষ্ট হয়। হিন্দুরা মনে করেন যে কর্ম্ম নিরাকার, কিন্তু জৈনদিগের মতে ইহা সাকার। জৈনেরা স্বভাব, স্থায়িত্ব এবং সারত্ব হিসাবে কর্ম্মকে ভাগ করে। কর্ম্মের আত্মার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। জৈনেরা বলেন যে কর্ম্ম আট প্রকার—(১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম অর্থাৎ আমাদের নিকট হইতে জ্ঞানকে লুক্কায়িত রাখা; (২) দর্শনাবরণীয় অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাস হইতে আমাদের দূরে রাখা; (৩) বেদনীয় কর্ম্ম অর্থাৎ আমাদের সুখের মিষ্টতা ও দুঃখের তিক্ততা আস্বাদ করায়; (৪) মোহনীয় কর্ম্ম অর্থাৎ ইহা পার্থিব মমতা এবং ইন্দ্রিয় সুখ হইতে উৎপন্ন হয়; (৫) আয়ুকর্ম্ম অর্থাৎ কতদিন ধরিয়া প্রাণী ইহজগতে বাস করিবে তাহা নির্ণয় করে; (৬) নাম কর্ম্ম অর্থাৎ ইহা চারটী অবস্থার মধ্যে কোনটী আমাদের গতি হইবে তাহা নিরূপণ করে, নাম কর্ম্মের অনেক বিভাগ আছে; (৭) গোত্র-কর্ম্ম অর্থাৎ গোত্র কিংবা জাতি মানবের জীবন, পেশা, বাসস্থান, বিবাহ,

খাদ্য এবং ধর্মপালন প্রভৃতি বিষয়গুলি নির্ধারণ করে। গোত্র কর্মের দুইটী প্রধান ভাগ আছে। প্রাণী উচ্চ বংশে কিংবা নীচ বংশে কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে কর্ম তাহা স্থির করে। আর একটী কর্মের আমরা উল্লেখ করিতে পারি; ইহা অন্তরায় কর্ম নামে বিদিত। এই কর্ম লাভ, ভোগ, উপভোগ এবং বীর্যের অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত।

জৈনদিগের মতে আত্মা সর্বপ্রথমে কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে এবং সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আত্মা পুনর্জন্মের দ্বারা পক্বতা লাভ করে এবং কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা বিচার করিতে সমর্থ হয়। মানব তাহার অতীত সৎকার্য্যের দরুণ কিংবা গুরুর শিক্ষার ফলে প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারে, আচারের সার্থকতা বুঝিতে পারে এবং বারটী ব্রত অবলম্বন করে। জৈনেরা বিশ্বাস করে যে যখন মানব অযোগী কেবলীগুণস্থানকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সমস্ত কর্ম নষ্ট হয় এবং সিদ্ধিলাভের জন্ম মোক্ষের দিকে ধাবিত হয়।

বৌদ্ধদিগের মতে ভারতবর্ষের কোন একজন প্রাচীন গৃহী কর্মবাদের প্রথম প্রবর্তক। সূত্রকৃতাঙ্গ নামে জৈনগ্রন্থে ভারতবর্ষে তৎকালীন প্রচলিত অনেকগুলি কার্যবাদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্ম কার্যবাদ কিংবা কর্মবাদের অন্তর্ভুক্ত। জৈনগুরু মহাবীরের মতে কার্যবাদ এবং অকার্যবাদ বিভিন্ন; অজ্ঞানবাদ এবং বিনয়বাদও বিভিন্ন। গৌতম বুদ্ধেরও ইহাই মত। বৌদ্ধধর্মের কার্যবাদ এবং জৈনদিগের সম্যগ্দৃষ্টি এক নহে। অকার্য, নাস্তিকতা এবং শীলব্রত পরামর্শ (অর্থাৎ আকারবাদী) জৈন সম্যগ্দৃষ্টির অন্তর্গত। জৈনদিগের কার্যবাদ বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অকার্যবাদ, অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ এবং আরও অনেক প্রকার কার্যবাদ হইতে ইহার প্রভেদ কি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

জৈনগ্রন্থ সূত্রকৃতাঙ্গের মতে অকার্যবাদ ছয় প্রকার:—(১) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম নষ্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীগণ বিনষ্ট হয়। দেহাবসানে মানবত্ব নষ্ট হয়। প্রত্যেক মানবের আত্মা আছে এবং যতদিন দেহ থাকে ততদিন আত্মা থাকে। (২) যখন মানব কোন কার্য করে বা অপরকে কোন কার্য করায় তাহার আত্মা কোন কার্য করে না কিংবা অপরকে কোন কার্য করায় না। (৩) পাঁচটী পদার্থ আছে এবং আত্মা ষষ্ঠ পদার্থ। এই ছয়টী পদার্থ নষ্ট হয় না। (৪) মানবের নিজের নিজের আত্মা সুখ, দুঃখ এবং মোক্ষ অনুভব করে। সৃষ্ট জগৎ দেবতার দ্বারা শাসিত। ইহা অশান্তি হইতে উৎপন্ন। জগৎ অসীম এবং অনন্ত। এই সকল মত বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত চারিটী প্রধান দার্শনিকের মতের অনুরূপ, যথা:—বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত অজিতের নাস্তিকবাদ, কাত্যায়নের অনন্তবাদ এবং কাশ্যপ ও গোশালের অদৃষ্টবাদ। আত্মা দেহ হইতে পৃথক থাকিতে পারে না। দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়। জৈনদিগের মতে ছয়টী পদার্থের প্রারম্ভ ও শেষ নাই। তাহারা অনন্ত। সমস্ত বস্তুর আত্মা আছে। তাহারা ব্যক্তির দ্বারা সৃজিত, প্রকাশিত এবং নিপুণভাবে সংশ্লিষ্ট। কেহ কার্য মানে এবং কেহ মানে না। ইহারা উভয়েই অদৃষ্টকে বিশ্বাস করে। অদৃষ্ট হেতু ইহারা জগতে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের মতে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই অজ্ঞানবাদ। অজ্ঞানবাদীরা মনে করে যে তাহারা খুব বুদ্ধিমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ভাব সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের শীলব্রত পরামর্শ এবং জৈন অজ্ঞানবাদ অভিন্ন। শীলব্রত পরামর্শ শব্দের অর্থ এই যে কতকগুলি শীল এবং কতকগুলি ব্রত পালনের দ্বারা মানব বিশুদ্ধতা লাভ করে। যাহারা বিনয়বাদ পোষণ করে তাহাদের মতে ধার্মিক লোক সুশিক্ষার নিয়মাবলী উপলব্ধি করিয়া ধার্মিক জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ করে।

নিম্নলিখিত কার্যবাদগুলি জৈনদিগের নিকট ভাল বলিয়া মনে হয় না:—(১) বিশুদ্ধ মানবের আত্মা মোক্ষ প্রাপ্ত হইলে পাপ কর্ম হইতে দূরে থাকে কিন্তু এই অবস্থাতেও আত্মা দোষের দ্বারা পুনরায় কলুষিত হইতে পারে। (২) যদি কোন মানব দেহনাশ করিবার ইচ্ছায় একটী লাউকে শিশু মনে করিয়া আঘাত করে তাহা হইলে সে হত্যাপরাধী হইবে। যদি কোন মানব একটী লাউকে ভাজিবার উদ্দেশ্যে কোন একটী শিশু মনে করিয়া ভাজে তাহা হইলে সে হত্যাপরাধী হইবে না। মহাবীরের মতে নিজের কর্মের দ্বারা নিজের সুখময় অবস্থা আনয়ন করা যায়। নিজের কর্মের দ্বারা মানবের সুখ দুঃখ আসে। ব্যক্তিগত-ভাবে মানব জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং একবার পতিত হইলে আর উঠিতে পারে না। মানবের রাগ, বিজ্ঞান, বেদনা, বুদ্ধি সকলই তাহার নিজের। সকল প্রাণী তাহার কর্মহেতু এই জগতে জন্মগ্রহণ করে। পাপী লোক নূতন কর্মের দ্বারা পুরাতন কর্মকে নষ্ট করিতে পারে না। ধার্মিক ব্যক্তি কার্য হইতে বিরত হইয়া কার্যের বিনাশ সাধন করে। ইহাই জৈনদিগের "নবতত্ত্ব"। ইহা ক্রিয়াবাদ (কার্যবাদ) হইতে বিকশিত। কর্ম দুই প্রকার, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। আত্মা কর্মের প্রভাব অনুভব করে। পাপ এবং পুণ্য সকল প্রকার কার্যই আত্মাকে জন্ম এবং মৃত্যুর সহিত সংশ্লিষ্ট করে। সুব্রত পালনের দ্বারা আত্মার উপর কর্মের সংগৃহীত ফল বিনষ্ট হয়। জৈনদিগের মতে ইহাই নির্জরা। সংক্ষেপে বলিতে হইলে মহাবীরের মতে অন্য কিছুই নহে, জাতি কিছুই নহে, কর্মই সর্বস্ব এবং কর্মনাশের উপর মানবের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি নির্ভর করে।

আত্মার কার্যকেই কর্ম বলে। কর্মই আত্মাকে নিজের উৎপত্তি স্থলে কিংবা পূর্ণজ্ঞান এবং চিরশান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠানে নিবদ্ধ করে। চার প্রকার অনিষ্টকর কার্য (পাতিয় কর্ম) আত্মাকে পার্থিব জগতে বদ্ধ করিয়া রাখে। চার প্রকার অনিষ্টকর কর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১) যে কর্ম জ্ঞান নাশ করে, (২) যে কর্ম বিশ্বাস নাশ করে, (৩) যে কর্ম আত্মার বিকাশের অন্তরায় হয়, এবং (৪) যে কর্মের দ্বারা আত্মা প্রতারিত হয়। জৈন অধ্যাত্ম বিদ্যায় কর্মের স্থান উচ্চে। জৈনধর্ম কর্মজনিত পাপগুলিকে দূর করিতে মানবকে শিক্ষা দেয়।

জৈন কর্মবাদ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা

করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন :—১। সূত্রকৃতাঙ্গ, ২। উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ৩। ঔপপাতিক সূত্র, ৪। নবতত্ত্ব, ৫। কল্প সূত্র, ৬। উবাসগদসাও, ৭। দ্রব্যসংগ্রহ, ৮। পঞ্চাস্তিকায়, ৯। আচারাঙ্গ সূত্র, ১০। সুত্তনিপাত, ১১। বিসুদ্ধিমগ্‌গ, ১২। ধম্মপদ, ১৩। মহানিদ্দেস, ১৪। অভিধম্মাবতার, ১৫। অভিধম্মথ সংগহ, ১৬। মত্তকভত্ত জাতক, ১৭। সংযুত্ত নিকায়, ১৮। দীর্ঘ নিকায় ১৯। অথসালিনী ২০। পটিসম্ভিদামগ্‌গ, ২১। বিভঙ্গ, ২২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২৩। যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি, ২৪। জৈন সূত্র (এস-বি-ই), ২৫। মৎপ্রণীত মহাবীর, তাঁহার জীবন ও শিক্ষা ২৬। মিসেস্ ষ্টিভেন্‌সন্ প্রণীত দি হার্ট অব্ জৈনিসম্, এবং ২৭। নাহার ও ঘোষ প্রণীত এপিটম্ অব্ জৈনিসম্।

নেই তাই খাচ্ছ

শ্রীমোহিতকুমার গুপ্ত

ওমা একি হলো ?

রমানাথ সামনে দাঁড়াতেই সকলে একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার করে উঠল। সন্ধ্যার আবছায়ায় রমানাথের মুখটা খুব স্পষ্ট না দেখা গেলেও সে যে বিশেষ ভয় পেয়েছে, মনে হলো না। তবে কি যেন একটা অভাবনীয় ঘটে গেছে সে ভাবটা সকলের মুখেই পরিস্ফুট।

এই রকম তীব্র আহ্বানেও রমানাথ নিরুত্তর রইল। স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নীরবে সে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো। ঘুরতেই মুখোমুখি হলো বাড়ীর ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ের সঙ্গে। খেলাধূলো সাঙ্গ করে হাস্‌তে হাস্‌তে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে তারা এইমাত্র বাড়ী ফিরলো। রমানাথকে প্রথমে ভাল করে লক্ষ্য করেনি। তাদের হর্ষোল্লাসের মাঝে রমানাথের মুখটা যেন হঠাৎ ক্যামোফ্লেজ-মুক্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মত দ্রষ্টব্য হয়ে উঠলো। রমানাথকে কেন্দ্র করে বারকয়েক তারা লাট্টুর মত ঘুরে গেল। তারপরই অদম্য উৎসাহ-ভরা গ্যাসে-পোরা বেলুনের মত ছেলেপিলেগুলো এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়ল। সকলেরই চোখে-মুখে যেন লেখা "ওমা, একি ?"

বিস্ময়সূচক অস্ফুট-শব্দের-হাউইয়ে জায়গাটার হাওয়া গেল বদলে। ছোট বড় নানা রকম সাইজের হাউই পেটফেঁসে বেরোবার চেষ্টা করতে লাগল। তার মধ্যে কেউ কেউ যেন আবার সফেন-উচ্ছ্বসিত খাঁটি বায়রণের-সোডার বোতল। ভুস্-ভুসে হাসি, কুল্-কুলে হাসি, আর খুক্-খুকে হাসির উচ্ছ্বাসে ঘরটা ভেসে যাবার দাখিল।

বর্ষীয়সীরা মন্তব্য করলেন—ছি ছি, কি ঘেন্না! মেয়ে-পুরুষে আর তফাৎ রইল না।

রমানাথ তখন প্রায় সদর দরজার কাছে। কি যেন ভেবে হঠাৎ সোজা চলে গেল তিন-তলায়। যাবার সময় শুন্‌তে পেল, তখনও পুরোদমে হুল্লোড় চল্‌ছে। কি বিশ্রী, বিট্‌কেল, এ-ম্যা এবং আরো কত কি।

রমানাথকে ওপরে যেতে দেখে একতলা, দোতলায় যে-যেখানে ছিল দুড়্‌দাড়্ করে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ির পাশে সকলেই ব্যগ্রোৎসাহে ভিড় করে রইল চাতকের মত তিনতলা অবধি দৃষ্টি চালিয়ে। সম্প্রতি এক শাহন্‌ওয়াজকে দেখে কলকাতার শহর ঠিক এমনই ভাবে ঝুঁকে পড়েছিল।

ঝড়ের মত রমানাথ যেই ওপরে গেল, নিমেষে নিস্তব্ধ হয়ে গেল বাড়ীটা। তিন-তলায় অকস্মাৎ ভিসুভিয়াসের তাণ্ডবলীলা সুরু হয়ে গেল।

'কেন জিজ্ঞেস করলি ?'

'যত সব অনাছিষ্টি।'

'আমাদের কালে কখনো এমন ছিল না।'

বলা বাহুল্য, রমানাথও চুপ করে ছিল না। তারও গলা শোনা গেল—'আমার ইচ্ছে।'

আবার সব চুপচাপ। দেখতে দেখতে সিঁড়ির ভিড় পাতলা হয়ে বাড়ীময় সব ছড়িয়ে পড়লো। কুচোকাচাগুলো চাঁচাছোলা গলায় যথারীতি চীৎকার সুরু করে দিলে—দিল্লী চলো, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ, জয়হিন্দ। বৌয়েরা সেলায়ের কলে, কুটনোর বঁটিতে, পানের বাটায় ও মেয়েরা অভ্যাসমত কেউ কেউ বারান্দায়, জানালায় বা ছাদের আল্‌সের পাশে চলে গেল।

রমানাথ যখন নীচে নাম্‌লো, সিচুয়েশন্ তখন একরকম নর্ম্যাল্ বলা যেতে পারে। ছেলেপিলেগুলোও চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রমানাথ ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলে। দেওয়ালের ব্র্যাকেটে সবুজ আলো রমানাথের চোখে খুব মনোরম ঠেক্‌লো। আশ্চর্য্য, আলোর তলায় ওয়াল্‌-ক্লকের কাঁটা দুটোও সটান্‌ হয়ে শুয়ে পড়ে স'-নটা বাজিয়ে রেখেছে এরি মধ্যে! পাকা দু'ঘণ্টা কেটে গেছে?

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল রমানাথের আন্দাজ নেই। হঠাৎ দেখলে ঘড়ির কাঁটা দুটো বেমালুম কখন্‌ সাফ হয়ে গেছে। এখন স'-নটা কি আড়াইটে বোঝবার কোন উপায় আর নেই। কাঁটা নেই অথচ ঘড়ি! কোন মানে হয় না। কি দরকার অত বড় একটা কাঁচ-বাঁধানো কাঠের ফ্রেম্‌কে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবার? এক-দুই-তিন থেকে বারোটা রোমান্‌-সংখ্যা-আঁকা ঘড়ির ডায়াল্‌টার ওপর রমানাথের দৃষ্টি অন্ধের মত চলাফেরা করতে লাগলো।

কাঁটাশূন্য তেলা ডায়াল্‌টার ওপর রমানাথের অত্যন্ত করুণা হলো। বারোটা অঙ্ক বুকে নিয়েই গর্ব্বে ঝক্‌ঝক্‌ করছে, অথচ বেচারার এ জ্ঞান নেই যে যার জন্যে তার কদর সেই সমঝদার সময়ের-ঠিকেদার যমজসেপাই বড়-ছোট দুই-কাঁটা উধাও হয়েছে। দম্‌-দেওয়া দুটো ক্ষুদে-ক্ষুদে চোখ দিয়ে ঘড়িটা রমানাথের দিকে চেয়ে-চেয়ে বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে মনে হলো। দুটো ক্ষুদে চোখই তার ক্রোধে জ্বলে উঠলো—কী, আমাকে করুণা? বোকা কোথাকার, কাঁটা এক-ডজন গেলে দু'ডজন আসবে। কিন্তু কল্‌-কব্জা বিগড়োলে দুশো কাঁটা থাক্‌লেও তাকে ঘড়ি কেউ বল্‌বে না। বল্‌বে—'ঘোড়া।'

তিরস্কারে রমানাথের ক্ষুব্ধ মন আস্ফালন করে উঠলো এবং মুখ থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে এলো—'ঘোড়ার ডিম্‌'।

জান্‌লায় খস্‌খস্‌ আওয়াজ শুনে রমানাথ তাকিয়ে দেখে সেনের বুড়ো ঘোড়াটা গরাদেতে নাক ঘস্‌ছে। শ্যামবাজার থেকে শালার ঘোড়া অসময়ে কেন? রমানাথের শালার ঘোড়ার গাড়ীর বিজনেস্‌। ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ঝলকে-ঝলকে ফেনা গড়াচ্ছে, আর ক্ষুরের খটাখট্‌ ঘর্ষণে শান্‌-বাঁধানো ফুটপাথ থেকে আগুনের ফুল্কি ঠিক্‌রোচ্ছে ফুলঝুরির মত।

রমানাথ বল্লে—কি খবর?

ঘোড়াটা হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে—ডাকলে কেন?

রমানাথ আশ্চর্য্য হয়ে গেল—সেকি? তোমায় ত আমি ডাকিনি।

আলবৎ ডেকেছ, নইলে এম্‌নি আমি ছুটে আসিনি।

রমানাথ বল্লে, কখন আবার তোমায় ডাকলাম?

আর এক ঝলক্‌ ফেনা উগরে, পায়ে আগুনের ফুল্কি উড়িয়ে চিঁহিঁ-হি আওয়াজে কানে তালা ধরিয়ে দিলে এক্‌রোখা ঘোড়াটা—ঘড়িও দেখতে জান না বল্‌তে চাও? ন্যাকামী করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কখন ডাক্‌লাম? কটা বেজেছে নিজেই দেখ না?

ঘোড়াটারও যত রোষ, ঘড়িটাও যেন তত হাসিতে ফেটে পড়ছে। এদিকে নাক-মুখ দিয়ে হড়হড় করে ফেনা গড়াচ্ছে, আর ওদিকে ঘড়ির স্প্রিংটা ঘড়-ঘড় করে এক-নাগাড়ে উল্টো দিকে ঘুরে আল্গা হয়ে চলেছে। বিশ্রী আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়।

রমানাথ প্রাণপণে কানে আঙুল দিয়ে চেপে রইল।

সেনের ঘোড়া দাঁত বার করে বল্লে—খবরদার আর যেন মুখ আল্গা করো না। মনে করেছ যে ঘোটক-সম্প্রদায় চিরকাল বাঙালীর ঐ অর্ব্বাচীন উক্তি নির্ব্বিবাদে সহ্য করে যাবে? যখন-তখন কায়দার মাথায় যে 'ঘোড়ার ডিম্‌' বলে বসো, তাতে আমাদের আভিজাত্যে কত বড় আঘাত লাগে তা জাতীয়তাকামী হয়েও তোমরা বুঝতে পার না?

রমানাথ জিজ্ঞেস কর্‌লে—কেন?

ঘোড়া তার চিঁহি গলায় বল্লে—ঘোড়ার 'বাচ্চা' বল্লে ক্ষতি নেই, কিন্তু 'ডিম্‌' অসহ্য। আমরা যদি তোমাদের বলি 'মানুষের ডিম্‌'—মাথা ঝম্‌ঝিম্‌ করে না তাহলে? গোঁফ সুড়্‌সুড়্‌ করে না? একটুতেই ত গোঁফে তা' দিতে সুরু করো—পাখীদের ডিমে তা' দেওয়ার মত।

কেঁদো কাঠবিড়ালীর লেজের মত একজোড়া সুপুষ্ট গোঁফ রমানাথের নাকের নীচে ধনুকে জ্যা-দেওয়ার মত টং-করে আস্ফালন করে উঠলো—ভীষণ রাগে ও অপমানে। গোঁফের সরু ডগা দুটো পুষির লেজের মত পাকিয়ে কয়েকবার কেঁপে উঠ্‌ল। রমানাথ বল্লে, তোমার কোন যুক্তি আমি শুন্‌তে চাই না। আসছে ইলেক্‌শনের পর এসেম্‌ব্লিতে তোমাদের পার্টি-রিপ্রেসেন্টেটিভ্‌ মারফৎ দাবী পেশ করো, তখন দেখা যাবে। কাপুরুষের মত নিরীহ

লোককে একা পেয়ে বাড়ীতে আক্রমণ করো না, ভাল হবে না। বি স্পোর্টস্‌ম্যান্‌-লাইক্।

'ভেরি-ওয়েল'—মনে থাকে যেন কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা থেকে রেস্‌-গ্রাউণ্ডে বেটিংএর পেছনে আমরাই আছি। সেনের ঘোড়াটা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো। তারপর চিঁহি-হি শব্দে দশদিক কাঁপিয়ে ক্ষুরে ক্ষুরে আগুনের ঝিলিক্ তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘোড়াটা।

একি দিনকাল হলো, বাংলাভাষাও ব্যবহার করা যাবে না প্রাণ-খুলে? রমানাথ নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে লাগ্‌লো।

ঠিক্ তাই—ঘড়িটা টক্ করে বলে উঠলো—ভাষা আছে ব্যবহারের জন্যে, অপব্যবহারের জন্যে নিশ্চয় নয়।

চোপ্‌রাও, এক ঘুঁসিতে তোমার বাঁদরামি ঘুচিয়ে দেবো।

ঘড়িটা হেসে উঠ্‌লো।—সুইজারল্যাণ্ডের মস্ত কারখানা থেকে গড়ে-পিটে, ঘসে-মেজে আমি এসেছি। আঘাতের ভয় আমি করি না। আঘাতের ভেতরেই আমার জন্ম, আমার প্রাণ। তা ছাড়া, তুমি আজ যদি আমায় ছেলেমানুষী করে ভাঙো, কালই আবার ছুটবে মিস্ত্রীর কাছে আমাকে তৈরী করবার জন্যে। ঠিক কিনা? শুধু মাঝখান থেকে তোমার হাত কেটে রক্তারক্তি হবে। তার চেয়ে ছুটো মজবুত কাঁটা নিয়ে এসো। বুকে আমার বিঁধে দাও, সময় শুনে বাঁচি। কতক্ষণ আর এ ভাবে থাকব?

সুইজারল্যাণ্ডের কাঁটা ত আমার নেই। এখানকার কাঁটায় তোমারও আভিজাত্য হানি হতে পারে ত? রমানাথ ব্যঙ্গ করল।

তোমার টাক ঢেকেছ পরচুলো দিয়ে, তাতে যদি তোমার মাথা নীচু না হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কাঁটা দিয়েও আমার মান বাঁচানো চল্‌বে বলে মনে হয়—ঘড়ি জবাব দিলে।

বেশ, আমি তোমায় কাঁটা দেবো। কিন্তু ঘোড়ারা কি সত্যি সত্যিই ক্ষেপে গিয়ে ধর্ম্মঘট করবে শেষ পর্য্যন্ত, যদি বাংলাভাষা থেকে ঐ কথাটা বাদ না দেওয়া হয়?

না, হঠাৎ বাদ দিয়ে বস্‌লে বাগ্‌দেবী রুষ্টা হতে পারেন। কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরং একটা বোর্ড তৈরী করা হোক্ অবিলম্বে, অনুসন্ধান করা হোক্ কথাটার অন্য কোন ভাল অর্থ আছে কি না। যদি থাকে ত ভালই, অভিধানগুলোয় একটা শুদ্ধিপত্র সেঁটে দিলেই হবে। আর তা যদি নিতান্তই অসাধ্য হয়, তাহলে সরকারের অনুমতি-ক্রমে একটা ট্যাক্স বসিয়ে দিলেই হবে ঐ কথাটার ব্যবহারের ওপর। একবার ব্যবহার কর্‌লে এক সিকি, দু'বার দু'সিকি, তিনবারে তিন এইভাবে। সেই টাকা দিয়ে ঘোটক-কুল-উন্নয়িনী সভা প্রতিষ্ঠা করে রাস্তায় রাস্তায় পোষ্টার্ দিয়ে ঘোড়ার পুষ্টি, কৃষ্টি অর্থাৎ ক্ষুরের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

'এতেই কি ঘোড়ারা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে? ফাঁকা বুলির ওপর তারা আস্থা স্থাপন করবে কেন? তারা যদি বলে ঐ কথাটার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চাই-ই-চাই। নইলে রেসে ঘোড়া দৌড়বে না, কর্পোরেশনে ময়লা ফেলবে না, প্রাইভেট মালিকদের উল্টে রাস্তায় ফেলে দেবে, গাড়ী টেনে খানায় ফেলে দেবে, কোচম্যান্‌দের্ চাট মারবে?

ঘড়িটা বিজ্ঞের মত জবাব দিলে, বেশীদিন ভাঁওতা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে, ঐ রকম হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আজকাল দিনকাল বড় ভাল নয়। কেঁচো খুঁড়তে সাপ হামেশাই বেরোচ্ছে। তার চেয়ে প্রধান প্রধান ঘোড়ার আড্ডা থেকে প্রতিনিধি ডেকে রেস্ গ্রাউণ্ডে একটা ইমার্জেন্ট্ মিটিং কল্ করুন কালই, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

তা হলেই হবে? রমানাথ প্রশ্ন করলে।

তবে একটা কথা, তাদের দ্বিতীয় অবশ্যম্ভাবী অভিযোগটা সম্বন্ধেও অবহিত থাকবেন একটু।

যথা—রমানাথ জিজ্ঞাসা করলে।

ওদের ঘাড়ের রোঁয়া আর লেজের ভার ছেঁটে-কেটে লঘু করতে চেষ্টা করবেন না। ওরা 'ডিম্' আন্দোলনে সফলকাম হলেই 'রোঁয়া' আর 'লেজ' আইটেম্ ছুটো নিয়ে ভীষণ উঠে পড়ে লাগ্‌বে।

তুমি এত কথা কি করে জানলে?—রমানাথ আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ তিনটাই আমার অনুগত শিষ্য—সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, রমানাথবাবু? ওদের মারফৎ সব খবরই আমি রাখি। ঘড়ি খুব মুরুব্বি চালে জানালো।

তাহলে আমার ভবিষ্যৎটা একবার বল দেখি—অনুনয় করলো রমানাথ।

ঘড়ি ফিক্ করে হেসে বল্লে—ওপর-চালাকি ক'রো না মাইরি। ফেল কড়ি মাখ তেল। সোজা কারবার, মারপ্যাঁচ নেই। আমার কাঁটা দুটো জোটাও আগে, পরে অন্য কথা। ভুলিয়ে ভালিয়ে অনেক গোপনতত্ত্ব জেনে নিয়েছ।

দেবো, দেবো, নিশ্চয় দেবো।

তিন সত্যি করলে ত?

হ্যাঁ—রমানাথ বল্লে। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বল।

ঘড়ি বল্লে—আজ নগদ কাল ধার।

কিন্তু আমার ধার ক্ষুর-ধার—বলে উঠ্লো টেবিলের কোনে-রাখা কামাবার ব্লেডটা। রমানাথ সেদিকে তাকাতেই চুম্বকের মত তড়াক্ করে ব্লেডটা লাফিয়ে রমানাথের শক্ত গোঁফ-জোড়াটা কুচ্ করে দিলে কেটে। পাইলটের বুকে আঁটা "জোড়া-পাখা" সিম্বলের মত গোঁফ জোড়াটা একটা ডাইভ্ দিয়ে ঘড়িতে গিয়ে কাঁটার জায়গায় আট্‌কে গেল। সুইজারল্যাণ্ডের কাঁটা দুটোর বদলি হিসেবে গোঁফ-জোড়াটা এমন কিছু বেমানান্ হলো না।

ঢং ঢং করে গোটাকতক ঘণ্টা বাজিয়ে ঘড়িটা সোল্লাসে বলে উঠ্লো—থ্যাঙ্কস্, বিগ্ ব্রাদার ব্লেড।

'নাকের বদলে নরুন্ পেলাম্'। বন্ধুত্বের ঋণ অপরিশোধ্য। তোমাকে চাইলে লোকে আমাকে স্মরণ করবে আজ থেকে—তোমার নতুন নাম দিলাম—'সেভেন্-ও-ক্লক্'।

খুশীতে ব্লেড চক্‌চক্ করে উঠ্লো।—থ্যাঙ্ক্ ইউ সো মাচ। কিন্তু নামটা আমার 'ডলারের দেশ' থেকে রেজিস্ট্রি করিয়ে দাও। নইলে লক্ষ্মীর মত "মেয়েদের ব্রত কথা"য় থাক্‌বো আমি চিরাবদ্ধ হয়ে—জগদ্বিখ্যাত হওয়া আমার ভাগ্যে ঘট্‌বে না।

ঢং করে একটা ঘণ্টা দিয়ে ঘড়ি বল্লে—তথাস্তু।

একটা বাজতেই রমানাথ চোখ খুলে দেখ্‌লে একটা আরশোলা তার দীর্ঘবিলম্বিত শুঁয়ো দিয়ে তার সদ্যো নির্গুম্ফ ঠোঁটের ওপর সুড়্‌সুড়ি দিচ্ছে।

আরশোলাও তাকে টেক্কা দিলে আজ গোঁফে।

এত বছরের পুরোন নেহাৎ আপনার গোঁফ-জোড়াটা বিকেলে কামানো এস্তোক্ বাড়ীর সকলের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে। আরসিতে ভাল করে দেখে রমানাথ মনে মনে বল্লে, বড় জোর মাস খানেক। তার মধ্যে গজিয়ে উঠ্‌বে নিশ্চয়ই।

স্বপ্নটা মনে পড়তেই রমানাথের হাসি পেল বেদম্। কি বিদ্‌ঘুটে।

গোঁফ হারিয়ে গল্প লাভ? সেই ছড়াটা রমানাথের মনে পড়ল—

নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।

সাধ

শ্রীবীণা দে

সাধ হয় মনে ও রাঙা চরণ
ধু'য়ে দি' নয়ন জলে,—
নয়নেরই জলে করিয়া সিনান
লুটাই ও পদতলে।
মনে সাধ হয় পরশিতে তায়,
ছুঁতে লাগে মনে ডর,—
কী জানি কী হবে বুঝিবা বাজিবে
না স'বে ছোঁয়ার ভর।

সখী, বঁধু সে কোমলতম—
কেননা হইল আমার এ দেহ
পেলব কুসুম সম?

বড় সাধ হয় জুড়ি' ও হৃদয়
মালা হ'য়ে দুলে থাকি,—
হৃদয়ে হৃদয় লীন হয় যেন
কিছু নাহি রয় বাকি।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

১৫

"দেখলেন? দেখলেন কাণ্ডটা?" দিলীপ চলে যেতেই যুগল পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গেল।

"আপনার কপালটাই খারাপ" পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন—অর্থাৎ যা মনে এল বলে ফেললেন। বুকের ব্যথাটা এমন বেড়ে উঠছিল যে ভেবে চিন্তে উত্তর দেবার ধৈর্য্য থাকছিল না তাঁর আর।

"আমার প্রতি সহানুভূতিবশতঃই আপনি ব্রেসলেটটা ফেরত দেন নি নিশ্চয়"

"সময় পেলাম কোথা…"

"আপনার কষ্ট নিশ্চয়ই হয়েছিল, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনি"

"হাঁা কষ্ট হয়েছিল বই কি" বাধ্য হয়ে পুরন্দরবাবুকে বলতেই হল। তিনি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করলেন—পারুলের আগ্রহাতিশয্যেই যে ব্রেসলেটটা নিয়ে এসেছেন তাও বললেন।

"পারুল অত জোর না করলে কিছুতেই নিতাম না আমি…এমনিতেই তো নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছি"

"পারুল আপনাকে সম্মোহিত করে' ফেলেছিল, সোজা কথা বলুন না"

"কি যা তা বলছেন। এখনই তো দেখলেন যে পারুলের আপনার উপর বিরাগের কারণ আমি নই। ভিতরে অন্য লোক আছে"

"আছে। কিন্তু আপনিও সম্মোহিত হয়েছিলেন"

যুগল চেয়ারে বসে' গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল।

"আপনি কি ভাবছেন ছোঁড়াটার ভয়ে ভড়কে যাব আমি? কালই চাটনি বানিয়ে ফেলব ব্যাটাকে, বুঝলেন। ধোঁয়া দিয়ে যেমন করে মশা তাড়ায়, ঝাঁটা দিয়ে ধুলো ঝাড়ে—তেমনি করে' বিদেয় করব"

এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে' আবার ঢাললে। বেশ 'মাই ডিয়ার' হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

"পারুলবালা দিলীপকুমার, মাণিকজোড় আমার, মরি মরি—হি—হি—হি" রাগে বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল তার। আর একটা বাজ পড়ল খুব জোরে—এক ঝলক বিদ্যুতের আলো জানালা দিয়ে ঢুকল। বৃষ্টিও সুরু হল মুষলধারে। যুগল উঠে জানালাটা বন্ধ করে' দিলে।

"আপনাকে জিগ্যেস করছিল বাজ পড়লে আপনি ভয় খান কি না। হি—হি—হি। আপনার বয়সও পঞ্চাশ ঠাউরেছে—অ্যাঁ—খিঃ খিঃ—"

পৈশাচিক ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

"মনে হচ্ছে রাতটা এখানেই কাটাবেন আপনি" অতি কষ্টে পুরন্দরবাবু কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। ব্যথাটা বেশ বেড়ে উঠছিল—"আমি শুয়ে পড়ছি, আপনি যা খুশী করুন"

"এই বৃষ্টিতে বেরুই কি করে' বলুন"

"বেশ তো থাকুন না, যত খুশী মদ গিলুন, গিলে শুয়ে পড়ুন"

পুরন্দরবাবু সোফাটায় লম্বা হয়ে শুলেন এবং মৃদু আর্ত্তনাদ করলেন।

"রাত্রে থাকতে বলছেন আমাকে? ভয় করবে না আপনার?"

"কিসের ভয়?" মাথা তুলে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"না, কিছু নয়। সেবার ভয় পেয়েছিলেন না? তাই বলছি—"

"এত বাজে কথাও বলতে পারেন"

পুরন্দরবাবু রেগে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন।

যুগলের মুখে একটা অদ্ভুত নীরব হাসি ফুটে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। সমস্ত দিনের মানসিক ও দৈহিক উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যথার চোটে ঘুমুতে পারলেন না বেশীক্ষণ, ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আস্তে আস্তে উঠলেন তিনি বিছানা থেকে। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে, সমস্ত ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরতি, টেবিলের উপর খালি বোতলটা পড়ে রয়েছে, আর একটা সোফায় যুগল ঘুমুচ্ছে। চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে, জামা জুতো কিছু খোলে নি। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ। দুঃখ হল। জাগালেন না তাকে। আস্তে আস্তে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ব্যথার চোটে শুতে পারছিলেন না। ভয় করছিল তাঁর এবং ভয় করবার কারণও ছিল। এ রকম ব্যথা মাঝে মাঝে বছরে দু'একবার হয় তাঁর, এর ধরণধারণ জানা আছে ভাল করে'। লিভারের ব্যথা। প্রথমে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট টাটান ভাব হয়, তারপর বুকের কোন একটা জায়গায় কাঁধের কাছে বরাবর টন টন করতে থাকে। তার পর বেড়ে চলে ক্রমশঃ। দশ ঘণ্টা বার ঘণ্টা চলে, শেষে মনে হয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল বুঝি। বছর খানেক আগে শেষবার হয়েছিল। এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন যে হাত পর্য্যন্ত নাড়তে পারছিলেন না—ডাক্তারে পাতলা চা ছাড়া আর কিছু খেতে দেয় নি। পরে একবার ক্রমাগত বমি হয়ে তবে কমল। শেক দিলেও কমে যায় অনেক সময়। যখন কমে তখন হঠাৎ কমে যায়।…দেখতে দেখতে ব্যথাটা বেড়ে উঠল খুব। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। এত রাত্রে ডাক্তার ডাকা মুস্কিল—হুট্‌ করে ডাকতেও চান না—কতকগুলো বাজে ওষুধ গেলাবে এসে। ব্যথায় কাতরাতে লাগলেন…কাতরাণির শব্দে যুগলের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল সে এবং হতভম্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন।

"আপনার ব্যথাটা বাড়ল না কি? শেক দিন, কম্প্রেস্। চাকরটাকে ডাকব?"

"না থাক"

কিন্তু যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল। এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যেন তার একমাত্র ছেলের প্রাণ-সংশয়। পুরন্দরবাবুর কথায় কর্ণপাত না করে' সে চাকরটাকে উঠিয়ে ষ্টোভ জ্বেলে গরম জল চড়িয়ে দিলে।

"দু'তিন কাপ গরম গরম চা খেয়ে ফেলুন"

নিজেই চা করলে। চা খাইয়ে তার পর গরম গরম কম্‌প্রেস দিতে লাগল পুরন্দরবাবুর গেঞ্জি আর রুমালের সাহায্যে।

"খুব গরম গরম দিন, খুব গরম গরম"

পুরন্দরবাবু যত আপত্তি করতে লাগলেন, যুগলের উৎসাহ তত বাড়তে লাগল।

"আর একটু চা খাবেন? জল আছে এখনও, খুব গরম খেতে হবে কিন্তু"

আবার সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আধ ঘণ্টা পরে ব্যথাটা সত্যি কমল। যুগলের ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ কম্‌প্রেস্ দেওয়া, কিন্তু পুরন্দরবাবু আর কিছুতেই রাজি হলেন না।

"এবার ঘুমুতে দিন একটু"

"বেশ বেশ। ঘুমোন—"

"আপনি যাবেন না, থাকুন। ক'টা বেজেছে?"

"পৌনে দুটো"

"থাকুন আপনি, যাবেন না"

"না, যাব না"

মিনিটখানেক পরে পুরন্দরবাবু যুগলকে ডেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—"আপনি, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী মহৎ। আমি সব বুঝতে পারছি, সব···অনেক ধন্যবাদ আপনাকে"

"ঘুমিয়ে পড়ুন, বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি আমি"

পা টিপে টিপে যুগল নিজের বিছানার দিকে চলে গেল।

বাতি নিবিয়ে দেবার পর পুরন্দরবাবু যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা স্পষ্ট মনে ছিল তার। কিন্তু যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন জেগে ওঠার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি ঘুমুতে পারছেন না, নিদারুণ ক্লান্তি সত্ত্বেও কিছুতেই ঘুম আসছে না তাঁর। শেষে তাঁর মনে হতে লাগল যেন জেগে জেগে কিসের একটা ঘোরে আছেন তিনি, তাঁর আশপাশে কি সব ছায়া মূর্ত্তি ঘুরছে, তাদের কিছুতেই তাড়াতে পারছেন না—অথচ এটা যে স্বপ্ন—সত্যি কিছু নয়—এ জ্ঞানও তাঁর আছে। ছায়ামূর্ত্তিগুলো সবই পরিচিত: ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে দলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, আরও আসছে, সিঁড়িতে ভীড় জমে গেছে। ঘরের মাঝখানে যে টেবিলটা আছে···তার পাশে কিন্তু একটিমাত্র লোক বসে আছে··· ঠিক একমাস আগে যেমন দেখেছিলেন তেমনি। ঠিক আগের স্বপ্নে যেমন দেখেছিলেন এবারও লোকটা টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে আছে, চুপ করে বসে আছে, একটি কথা বলছে না। কিন্তু এবার লোকটা যেন বেঁটে...অনেকটা যুগলের মতো। "সেবারও যুগলকেই দেখেছিলাম না কি" পুরন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন। লোকটার মুখের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলেন—এ অন্য লোক। বেঁটে কেন এত? আশ্চর্য্য! চীৎকার, কোলাহল, কলরবে চতুর্দ্দিক ভরে উঠল। গতবারের চেয়ে এবার লোকগুলো যেন আরও বেশী উত্তেজিত, সবাই মার-মুখী আর সবাই তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁকে লক্ষ্য করে' সবাই কি যেন বলছে—চীৎকার করেই বলছে—কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারছেন না তিনি ঠিক। "এ কিছু নয়, স্বপ্ন,"—দু'একবার ভাবলেন তিনি—"ঘুম আসছে না, তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছি শুধু"—কিন্তু ওই চীৎকার, ওই লোকের ভীড়, ওদের তর্জ্জন গর্জ্জন এত বেশী রকম জীবন্ত যে মাঝে মাঝে সন্দেহও হচ্ছিল। সত্যি স্বপ্ন? উঃ কি চীৎকার! এরা চায় কি? কিন্তু···স্বপ্নই, তা না হলে যুগলের ঘুম ভেঙে যেত ঠিক। ওই তো সোফায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে! তারপর হঠাৎ এক কাণ্ড হল···আগের বারও ঠিক এমনি হয়েছিল। সবাই একসঙ্গে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে গেল, কিন্তু দুয়ার দিয়ে বেরুতে পাচ্ছে না, আর একদল ঢোকবার চেষ্টা করছে। যারা ঢোকবার চেষ্টা করছে তারা যেন ভারী কি একটা বস্তু বয়ে আনছে—সিঁড়ির উপর তাদের পদশব্দ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে একটা গুরুভার বহন করে' আনছে তারা, কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে—হাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে যারা ছিল তারা চীৎকার করে' উঠল সমস্বরে—এনেছে, এনেছে। সকলের দৃষ্টি পুরন্দরের উপর পড়ল গিয়ে, সকলেই সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাতে লাগল—এমন ভাবে যেন এইবার পুরন্দরকে কবলের মধ্যে পাওয়া গেছে। এটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে আর সাহস হল না পুরন্দরবাবুর। তিনি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে গিয়ে বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে সকলের মাথার উপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন কি আনছে ওরা। বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছে কে যেন! তারপর হঠাৎ—আগেরবার যেমন হয়েছিল—ঠিক তেমনিভাবে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল—ঠিক তিনবার। এত স্পষ্ট, এত বাস্তবিক যে স্বপ্ন বলে' উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু সেবার যেমন দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন এবার তা গেলেন না। কি ভেবে যে গেলেন না, বস্তুত কোন ভাবনা সে সময় তাঁর মনে এসেছিল কি না, তা বলা শক্ত—কিন্তু কি করা উচিত তা কে যেন তাঁর কানে কানে বলে দিলে। তিনি একটা আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং যুগল যেখানে শুয়েছিল সেই দিকে ছুটে গেলেন। হাত বাড়াতেই আর একটা হাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগল এবং সে হাতটা তিনি মুটো করে' চেপে ধরলেন—ও, তাহলে একজন তাঁর বিছানার কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল এসে। ঘরে অন্ধকার বিশেষ নেই, ভোরের আলো ঘরে ঢুকছে। হঠাৎ একটা তীব্র যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন তাঁর বাঁ হাতের আঙুল-গুলোতে—যেন একটা ধারাল ছুরি কিম্বা ক্ষুর তিনি মুটো করে' ধরেছেন···সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে একটা গুরুভার পতনের শব্দ হল!

পুরন্দরবাবু যুগলের চেয়ে অন্ততঃ তিন গুণ বেশী শক্তিশালী, তবু বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হল—পুরো তিনটি মিনিট। তারপর তিনি তাকে চিৎ করে' কেবল তার হাত দুটো বেঁকিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে গেলেন, তারপর তাঁর মনে হল হাত দুটো বাঁধা উচিত। কাটা বাঁ হাত দিয়ে

তাকে চেপে রেখে, ডান হাত বাড়াইয়া তিনি পরদার দড়িটা ছিঁড়ে নিলেন। কি করে' এত কাণ্ড করতে পারলেন পরে তা ভেবে নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন। এই তিন মিনিট দুজনের মধ্যে কেউ একটি কথা বলেন নি, জোরে জোরে নিশ্বাসের শব্দ আর ধস্তাধস্তির অস্ফুট শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ ছিল না। হাত দুটো পিছনে বেঁধে তাকে মেঝের উপর চিৎ করে' ফেলে রেখে পুরন্দরবাবু উঠলেন এবং জানালাগুলো খুলে দিলেন। সকাল হয়ে গেছে। জানলার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ড্রয়ারটা খুলে একটা ফরসা তোয়ালে বার করে' হাতে জড়ালেন সেটা—রক্ত পড়ছিল। দেখতে পেলেন মেঝের উপর একটা খোলা ক্ষুর পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে মুড়ে খাপে বন্ধ করে' ফেললেন। কাল সকালে কামাবার পর ক্ষুরটা তুলতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। যুগল যে সোফাটায় শুয়েছিল তারই পাশে ছোট টেবিলটার উপর পড়েছিল ক্ষুরটা। ক্ষুরটা ড্রয়ারে বন্ধ করে' রেখে দিলেন। এই সমস্ত করে' তারপর যুগলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি।

যুগল ইতিমধ্যে মেঝে থেকে কোনক্রমে উঠে একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসেছিল। তার গায়ে একটা কামিজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। পায়ে জুতোও ছিল না। কামিজের হাতটা রক্তে ভেজা। পুরন্দরবাবুর রক্ত। তার চেহারা অদ্ভুত রকম বদলে গিয়েছিল—সে লোকই নয় যেন। পিছনে হাত দুটো বাঁধা থাকাতে ভালভাবে চেয়ারে বসতে পারে নি, বাঁকাভাবে বসেছিল। সমস্ত মুখটা যেন মুচড়ে গিয়েছিল, মুখের রংও কেমন যেন অস্বাভাবিক নীলচে গোছের,চিবুকটা মাঝে মাঝে কাঁপছিল থর থর করে'। পুরন্দরবাবুর দিকে নির্নিমেষে চেয়েছিল সে…কিন্তু সে চাউনিতে যেন দৃষ্টি নেই, প্রাণহীন ভাষাহীন চাউনি। হঠাৎ সে বোকার মতো হাসলে একটু, তারপর জলের কুঁজোটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ইতস্তত: করে' বললে—"একটু জল খাব"। পুরন্দরবাবু একগ্লাস জল গড়িয়ে মুখের কাছে ধরতেই সে তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে কয়েক ঢোঁক জল খেলে, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টতে একবার চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে, তারপর আবার খেতে লাগল। জল খাওয়ার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে' বসে রইল। পুরন্দরবাবু নিজের বালিশ এবং চাদরটা নিয়ে পাশে ঘরে শুতে গেলেন, যুগলের ঘরটায় তালা বন্ধ করে দিলেন।

কালকের ব্যথাটা আর ছিল না। কিন্তু এই প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির পর অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছিলেন তিনি। সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। সমস্তই কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হতে লাগল। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছিল, চোখের সামনে অন্ধকারের মতো ঘনিয়ে আসছিল কি একটা—আবার চমকে উঠে পড়ছিলেন। মনে পড়ে যাচ্ছিল সব, তোয়ালে জড়ানো হাতের কাটা আঙুলগুলো জ্বালা করছিল…আবার প্রাণপণে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপারটা। একটা বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন…এ কাজ করবার মিনিট দশেক আগে সে নিজেই জানত না বোধ হয় যে এ কাজ সে করবে। ক্ষুরটা হঠাৎ চোখে পড়ে' গিয়েছিল।

"প্রথম থেকেই যদি ওর উদ্দেশ্য থাকত আমাকে খুন করা, তাহলে নিজেই ও ছোরা বা ক্ষুর নিয়ে আসত। আমার ক্ষুরের উপর নির্ভর করত না—তাছাড়া আমার ক্ষুর তো বাইরে থাকে না কখনও—কালই ভুলে ফেলে রেখেছিলাম…" নানা চিন্তার মধ্যে এই কথাটা বারবার মনে হতে লাগল তাঁর।

ছ'টা বাজল। পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন, জামাকাপড় বদলালেন, তারপর যুগলের ঘরে গেলেন। তালা খুলতে খুলতে তাঁর মনে হল শুধু-শুধু তালা বন্ধ করতে গেলাম কেন, দূর করে' তাড়িয়ে দিলেই হত। ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন। যুগল হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে কি করে' যেন। জামা জুতো পরে' তৈরি হয়ে বসে আছে চেয়ারে। তিনি ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—"এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না, বলবার কিছু নেই—"

"বেরিয়ে যান"—পুরন্দরবাবু বললেন—"আপনার ব্রেসলেট নিয়ে যান।"

দ্বারের কাছ থেকে যুগল ফিরে এল,• ব্রেসলেটের বাক্সটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। পুরন্দরবাবুও সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করবেন বলে' তার পিছু পিছু গেলেন। যুগল নাবতে নাবতে একবার ফিরে চাইলে, পুরন্দরবাবুর চোখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, কি একটা বলবে বলে' যেন ইতস্তত করতে লাগল।

"যান"—হাত নেড়ে পুরন্দরবাবু বললেন।

সে নেবে গেল। পুরন্দরবাবু খিল বন্ধ করে' দিলেন।

১৬

পুরন্দরবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন, একটা বোঝা যেন মন থেকে নেবে গেল। ভারী আরাম বোধ করলেন তিনি। অনির্দ্দিষ্ট যে যন্ত্রণাটা এতদিন ভোগ করছিলেন সেটার যেন অবসান হয়ে গেল সহসা। তোয়ালে-বাঁধা হাতটা তুলে দেখলেন—"হ্যাঁ মিটে গেল এবার সব!" সেদিন পাপিয়ার কথাও মনে হল না একবার। যেন রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গে সে স্মৃতিও ধুয়ে গেছে মন থেকে।

মস্ত ফাঁড়া যে একটা কেটে গেল এ অবশ্য বুঝেছিলেন। এই লোকগুলো যারা খুন করবার এক মিনিট আগে পর্য্যন্ত জানে না যে তারা খুন করতে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা ছুরি পেলে কম্পিত-হস্তে যখন তারা একটা ঘুমন্ত লোকের গলায় ছুরি বসাতে যায়—তখন রক্তের ফিনিক একবার হাতে লাগলেই—এই ভীরু লোকগুলোই অন্য রকম হয়ে যায় হঠাৎ—সমস্ত মাথাটা ধড় থেকে নাবিয়ে দিতে পারে তখন বিনা দ্বিধায়।

তিনি বাড়িতে থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার, তা নাহলে কিছু একটা ঘটে যাবে বুঝি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কারও সঙ্গে কথা কইবার ভয়ানক ইচ্ছে করছিল, এমন কি অপরিচিত লোকের সঙ্গেও। এই জন্যেই বোধহয় ডাক্তারের কথা মনে পড়ল তার—কাটা হাতটা ভাল করে' ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নেবার অজুহাতে ডাক্তারের বাড়ি গেলেন তিনি। ডাক্তারবাবু

পূর্ব্বপরিচিত লোক, যত্ন করে' কাটাটা দেখলেন, কি করে' কাটল জিগ্যেস করলেন। পুরন্দরবাবু হাসলেন একটু, আর একটু হলে সব খুলে বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করলেন। ডাক্তারবাবু নাড়িটা পরীক্ষা করে একদাগ ওষুধও খেতে দিলেন, তারপর বললেন, যে কাটা তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, সেরে যাবে দু'চার দিনে। সেদিন আরও দুবার সমস্ত কথা খুলে বলবার প্রলোভন হ'ল তাঁর—একবার তো সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোকের কাছে। আগে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপই করতে পারতেন না তিনি পথে ঘাটে।

একটা দোকানে গিয়ে বই কিনলেন, কোট করাতে দিলেন একটা দর্জির কাছে। নীলিমা দেবীর কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না, তিনি আশা করছিলেন তারাই এসে পড়বে। হোটেলে ঢুকে খেলেন ভাল করে'। লিভারের ব্যথাটা আবার যে চাগাতে পারে এ কথা মনে হল না। তাঁর যে কোন ব্যাধি আছে একথা আর তাঁর মনেই হচ্ছিল না। তিনি যখন ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে যুগল পালিতকে অমন অবস্থায় পেড়ে ফেলতে পেরেছেন তখন তাঁর আর কোন অসুখই নেই। সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন। যখন বাসায় ফিরলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। সমস্ত বাসাটায়ই কেমন যেন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে ভাব। তবু চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এমন কি যে রান্নাঘরে কখনও ঢোকেন না, সেখানেও উঁকি দিয়ে দেখলেন একবার। কপাটে খিল দিয়ে আলোটা জ্বাললেন। খিল দেবার আগে চাকরটাকে ডেকে একবার জিগ্যেস করলেন—যুগলবাবু এসেছিল কি? যেন যুগলবাবুর আসা সম্ভব এর পর!

ঘরে খিল দিয়ে ড্রয়ারটা খুললেন, ক্ষুরটা বার করে' ভাল করে' দেখলেন আবার। সাদা বাঁটটায় রক্ত লেগে আছে এখনও একটু। আবার বন্ধ করে রাখলেন সেটাকে। ঘুম পেতে লাগল, ভাবলেন আর দেরী না করে' এখনই শুয়ে পড়ি, কাল শরীরের গ্লানি কাটবে না তা' না হলে। কাল যে বিশেষ কিছু একটা ঘটবে এ কথা খালি মনে হচ্ছিল।

কিন্তু যে চিন্তাটা সমস্ত দিন তাঁকে একমুহূর্ত্তের জন্ম ছাড়ে নি, সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে যে কথাটা তিনি ক্রমাগত ভেবেছেন এখন সেই চিন্তাগুলোই তাঁর ক্লান্তমস্তিষ্কে ভীড় করে' আসতে লাগল আবার। ঘুম এল না।

"আমাকে খুন করবার কথাটা তার হঠাৎই না হয় মনে হয়েছিল কাল, মানলাম—কিন্তু এর আগে কখনও কি সে একথা ভাবে নি একবারও?" শেষে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি—"যুগল আমাকে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু খুন করবার কথা তার মনে হয় নি"—সংক্ষেপে—যুগল তাঁকে অজ্ঞাতসারে মারতে চেয়েছিল সচেতন ভাবে নয়। যদিও এটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে—কিন্তু এইটেই সত্য। যুগল এখানে চাকরির জন্তেও আসে নি—পূর্ণ গাঙ্গুলীর জন্তেও আসে নি—যদিও চাকরির চেষ্টাও করেছিল পূর্ণ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিল, পূর্ণ গাঙ্গুলী ফাঁকি দিয়ে সরে' যাওয়াতে মর্ম্মাহতও হয়েছিল খুব—কিন্তু তার পর তো আর পূর্ণ গাঙ্গুলীর কথা একদিনও বলে নি—না, আসলে এসেছিল ও আমার জন্তে, আর সেইজন্তেই পাপিয়াকে নিয়ে এসেছিল…"

যুগল আমাকে খুন করতে পারে এ কথা কি ভেবেছিলাম আমি? তাঁর মনে পড়ল, ভেবেছিলেন। যুগলকে পূর্ণ গাঙ্গুলীর শবানুগমন করতে যেদিন দেখেছিলেন সেইদিন তাঁর মনেও এ আশঙ্কা হয়েছিল বই কি। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন…কিন্তু ঠিক এ রকম নয়…এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি ঠিক…না, খুন করবে এটা ভাবেন নি।

"এ কি কখনও সত্যি হতে পারে? আমাকে কত ভালবাসে, কত শ্রদ্ধা করে—কালই তো বলছিল বুক চাপড়ে চাপড়ে—পুঁতনিটা কাঁপছিল! সব মিছে কথা? মোটেই না। ও রকম লোক আছে। ওরা একাধারে নীচ এবং মহৎ—স্ত্রীর প্রণয়ীকে স্বচ্ছন্দে শ্রদ্ধা করতে পারে ওরা। স্ত্রীর সঙ্গে কুড়ি বছর বাস করল তার এতটুকু স্খলন চোখে পড়ল না অথচ। আমার কথা, আমার ব্যবহার, আমার কবিতার লাইন—ন'বছর ধরে' শ্রদ্ধাসহকারে মনে করে' রেখেছে ও। অথচ আমি এর কিছুই জানতাম না। কিন্তু কাল তো বলেছিল "আমি বোঝাপড়া করতে চাই"—এটা কি ভালবাসার লক্ষণ? হতে পারে বই কি। আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে বলেই অত্যন্ত ভালবাসে হয় তো…"

বর্দ্ধমানে থাকতে হয় তো—হয় তো কেন নিশ্চয়ই—খুব বেশী রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিল লোকটা আমাকে দেখে…ওরা সহজেই অভিভূত হয়। আমাকে একটু ভাল লাগতেই শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল আমাকে মনে মনে। কি দেখে ভাল লেগেছিল জানতে ইচ্ছে হয়… হয় তো আমার কামিজের ছিট বা সিগারেট-হোলডার দেখে! ওই সবে খুব মুগ্ধ হয় ওরা। কামিজের ছিটটুকু ওরা দেখতে পায়, বাকীটা সৃষ্টি করে' নেয় কল্পনায়। তার পর ভক্ত হয়ে পড়ে। আর…। আমার লোককে মুগ্ধ করবার ক্ষমতাও হয় তো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। …এসে বললে আপনাকে জড়িয়ে ধরে' আমি কাঁদতে এসেছি…অথচ এসেছিল খুন করতে…। পাপিয়াকেও এনেছিল সঙ্গে করে'।"

হঠাৎ পুরন্দরবাবুর মনে হল—"কি জানি, হয় তো আমিও যদি কাঁদতাম ওর গলা জড়িয়ে, তাহলে হয় তো ও আমায় ক্ষমা করত। ক্ষমা করতেই তো এসেছিল। ক্ষমা করবার ভয়ানক একটা আগ্রহ ছিল তার।…প্রথম ধাক্কাতেই কিন্তু বদলে গেল লোকটা, সুরই বদলে ফেললে। মেয়েলি সুরে সুরু হয়ে গেল ভ্যানভ্যানানি আর প্যান-প্যানানি। সব বলবার জন্তে ইচ্ছে করে' মাতাল হয়ে আসত, কিন্তু সবটা মাতলামিই হয়ে পড়ত আর কিছু হত না। মদ না খেলেও ও কিছু বলতেও পারত না। ভাঁড়ামি করা স্বভাব লোকটার…আমাকে দিয়ে চুমু খাইয়ে কি ফুর্ত্তি…তখনও ঠিক করতে পারে নি বোধ হয় যে খুন করবে, না ভাব করবে। দুইই করবার ইচ্ছে ছিল বোধ হয়।

উদারহৃদয় পিশাচই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। প্রকৃতি তাদের মা নয়, সৎ মা—তাদের পীড়ন করে কেবল, স্নেহ করে না। পাগল করে' তোলে শেষ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবে—আমাকে নিয়ে গেছে বউ দেখাতে! কি বোকা! বউ! যুগল পালিতের বউ! ওর মতো গাড়োলই ভাবতে পারে যে ও আবার বিয়ে করে সুখী হবে। কচি মেয়েটার দফা নিকেশ করবার চেষ্টায় আছে…তোমার দোষ নেই যুগল…তোমার আশা আকাঙ্ক্ষাও তোমারই মতো অদ্ভুত। অদ্ভুত যে তা নিজেও বোধ হয় বুঝত, তাই শ্রদ্ধেয় পুরন্দরকে দিয়ে নিজের খেয়ালটাকে যাচিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়েছিল! আমাকে দিয়ে বিয়েটা সমর্থন করিয়ে নেবার তাই বোধ হয় এত আগ্রহ।…ভুলে ক্ষুরটা যদি বাইরে ফেলে না রাখতাম তাহলে বোধ হয় কিছু হত না। তাই কি? আমার জন্যেই যদিও এসেছিল তবু এড়িয়েই চলছিল আমাকে, পনর দিন তো দেখাই করে নি। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে নিয়ে পড়েছিল প্রথমে।……কাল আমাকে কম্প্রেস দেবার কি ধুম! কাকে ভোলাচ্ছিল? আমাকে, না, নিজেকে?"

একই কথা নানাভাবে ক্রমাগত ভাবতে লাগলেন পুরন্দরবাবু, শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে অনুভব করলেন মাথাটা বেশ ধরে' আছে—শুধু তাই নয়, নতুন ধরণের একটা আতঙ্কও বসে আছে সারা মন জুড়ে।

নতুন ধরণের আতঙ্কটা বেশ অপ্রত্যাশিত। তাঁর মনে হতে লাগল যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে যুগল পালিতের কাছে যেতে হবে। কেন? কি দরকার? তা তিনি জানেন না, জানতে চানও না—এইটে শুধু অনুভব করছিলেন যে যেতে হবে। কারণ যা-ই হোক। এই পাগলামির—পাগলামি ছাড়া আর কি—একটা ওজুহাতও জুটে গেল শেষ পর্য্যন্ত। তাঁর ভয় হচ্ছিল যুগল পালিত হয়তো গলায় দড়ি দেবে। কেন? তখনই মনে হল অনুরূপ অবস্থায় পড়লে আমিও হয়ত দিতাম।

শেষ পর্য্যন্ত যুগলের বাসার দিকেই অগ্রসর হলেন তিনি। ভাবলেন চাকরটার কাছে খোঁজ নিয়ে চলে আসব। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হল তার কাছে নতজানু হয়ে গলদশ্রুলোচনে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি না কি? এইটে করলেই তো চূড়ান্ত হয়ে যায়!

কিন্তু ভগবান রক্ষা করলেন তাঁকে—হঠাৎ দিলীপ হালদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। দিলীপ ঊর্দ্ধশ্বাসে আসছিল—ভয়ানক উত্তেজিত মনে হল।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। যুগলবাবু কি করলে জানেন শেষ পর্য্যন্ত?"

"গলায় দড়ি দিয়েছে না কি"

"কে গলায় দড়ি দিয়েছে? কেন?"

"না না কিছু নয়—কি বলছিলেন বলুন"

"কি যে অদ্ভুত কথা সব বলেন আপনি! গলায় দড়ি দিতে যাবে কোন দুঃখে। চলে গেল। আমি তাঁকে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসছি। উঃ। কি ভয়ানক মদ খায়। একটা বোতল পুরো খেয়ে ফেলেছে। ট্রেণে গান গাইছিল, আপনাকে নমস্কারও জানিয়েছে। আচ্ছা, লোকটা একটা স্কাউণ্ড্রেল, নয়?"

পুরন্দরবাবু অট্টহাস্য করে' উঠলেন।

"সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল শেষ পর্য্যন্ত। অ্যাঁ! চলে গেল!"

"হ্যাঁ। জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে খুব লাগান-ভাঙান করলে, কিন্তু কিছু হল না। পারুল কিছুতে রাজি হল না। আপনার কথা খুব বলছিল কিন্তু। মানে বিরুদ্ধে—। যাই বলুক, আমাদের কিন্তু আপনার উপর শ্রদ্ধা এতটুকু কম না। আপনি যে ভদ্রলোক তা একনজরেই বোঝা যায়। আজকাল মুশকিল কি হয়েছে জানেন, শ্রদ্ধা করবার মতো লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত। বুড়ো হলেই শ্রদ্ধেয় হয় না, কি বলেন? ও আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছে…এই নিন—ভুলেই যাচ্ছিলাম"

পুরন্দরবাবু চিঠিটা নিয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে'।

"আপনার হাতে কি হল?"

"কেটে গেছে"

"কি করে?"

"এমনি, ছুরিতে—তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে"

"আমাদের? সে এখন সুদূরপরাহত! তবে এই ফাঁড়াটা খুব কেটে গেল। আচ্ছা চললাম তাহলে আমি। আমার অনেক কাজ…চলি"

মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে দিলীপ হালদার গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরন্দরবাবু বাড়ি ফিরে এসে চিঠিটা খুললেন। খামের ভিতর যুগলের লেখা একটি ছত্রও ছিল না। চিঠির কাগজ এত পুরোণো যে হলদে হয়ে গেছে, কালীর রংও বিবর্ণ। চিঠিখানা অপর্ণা তাকে লিখেছিল…বহুদিন আগে! এ চিঠি তো তিনি পান নি! এর বদলে আর একটা চিঠি পেয়েছিলেন। এ চিঠিতে অপর্ণা তার কাছে বিদায় চাইছে। লিখেছে যে আর একজনকে সে ভালবেসেছে। সে যে সন্তানসম্ভবা সে কথাও লিখেছে। "যদি বলেন আপনার সন্তানকে আপনার কাছে পৌঁছেও দিতে পারি…হাজার হোক আপনারও একটা কর্ত্তব্য আছে তো"…এ কথাও লিখেছে।

পুরন্দরবাবুর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল সহসা। চিঠিখানা পড়তে পড়তে তিনি কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন—যুগল যখন চিঠিখানা প্রথম পড়েছিল তখন কি রকম মুখভাব হয়েছিল তার।

১৭

ঠিক দুটি বছর অতীত হয়েছে।

পুরন্দর রায় চৌধুরী লক্ষ্ণৌ চলেছেন। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে, শুধু নিমন্ত্রণ নয়, চমৎকার সম্ভাবনাও আছে একটা। একটি সুরসিকা সুন্দরীর সঙ্গে অনেক দিন থেকে আলাপ করার ইচ্ছে—এই বন্ধুটির সাহায্যে সে বাসনা চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা আছে। এই দু'বছরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাঁর। যে সব মানসিক পীড়ায় তিনি সর্ব্বদা

উদ্বিগ্ন থাকতেন তা আর নেই। দু'বছর আগে কোলকাতায় মকোর্দ্দমার হাঙ্গামার মধ্যে যে সব অদ্ভুত 'মৃতি' পাগল করে' তুলত তাঁকে—সে সব তিরোহিত হয়েছিল। নিজের সে সব দৌর্ব্বল্যের কথা স্মরণ করে' এখন মাঝে মাঝে লজ্জিত হন শুধু। এখন প্রতিজ্ঞা করেছেন ও জাতীয় দুর্ব্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেবেন না কখনও। তখন কারও সঙ্গে মিশতেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতেন, নোংরাভাবে থাকতেন...সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যেত তাঁর ব্যবহারে—এখন আর সে সব কিছু নেই। এখন সকলের সঙ্গে মেশেন হাসেন, কথা কন, যেন কিছুই হয় নি। এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অবশ্য মকোর্দ্দমাটা জিতেছিলেন তিনি। তিন লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন সব শুদ্ধ। তিন লক্ষ টাকা অবশ্য খুব বেশী টাকা নয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমতঃ—দাঁড়াতে পেরেছেন যে এতেই খুশী আছেন তিনি। প্রথম যৌবনে বোকার মতো অনেক টাকা উড়িয়েছেন এবার শিক্ষা হয়ে গেছে। যদি না ওড়ান তাহলে যা আছে তা তাঁর জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। হুজুকে মাতবার আর প্রবৃত্তি নেই...নিজের ক্ষুদ্র স্বর্গেই সন্তুষ্ট আছেন তিনি। নিজের পছন্দ মতো খাবারটি, দু একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু, এক আধটি বান্ধবী, খান কয়েক ভাল বই—এর বেশী কিছু কাম্য নেই তাঁর আর। এই জীবনেই ক্রমশঃ মশগুল হয়ে পড়ছিলেন তিনি। আগেকার উদ্দাম পুরন্দরবাবু আর ছিলেন না। চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়েছিল। বেশ শান্ত গম্ভীর প্রফুল্ল মুখ-শ্রী হয়েছিল এখন। বলি-রেখা-গুলো পর্য্যন্ত ছিল না। রংও ফিরে গিয়েছিল।

প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় বসেছিলেন তিনি। পরের ষ্টেশন মোগলসরাই। আর একটা মনোরম কল্পনায় তা দিচ্ছিলেন তিনি বসে' বসে'। ভাবছিলেন "কাশীটা ঘুরে গেলে কেমন হয়। কাশী থেকে তারপর লক্ষ্ণৌ যাওয়া যাবে। কাশীতে মীনা বসে' বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে গেলে মন্দ হয় না।" মীনা তাঁর আর একজন প্রাক্তন বান্ধবী। মোগল সরাইয়ে নেবে পড়বেন কি না ঠিক করতে পারছিলেন না। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল যে দ্বিধার আর অবসর রইল না।

মোগলসরাই ষ্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ি থামে। কিছু খেয়ে নেবার জন্যে পুরন্দরবাবু গাড়ি থেকে নাবলেন। কেলনারের কাছে গিয়ে দেখেন একটা ভীড় জমে' গেছে। একটি সুসজ্জিতা যুবতীকে কেন্দ্র করে দুটি লোক খুব উত্তেজিত হয়েছেন...একটি মাড়োয়ারি এবং একটি বাঙালী ছোকরা। যুবতীটির অলঙ্কার এবং পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক দেখলে হাসি পায়...কিন্তু তিনি সুন্দরী এবং যুবতী—সুতরাং না হেসে সবাই হাঁ করে' চেয়েছিল তাঁর দিকে। মাড়োয়ারিটি না কি পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় মেয়েটির গায়ে হাত দিয়েছে...বাঙালী ছোকরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তা। প্রতিবাদ করাতে মাড়োয়ারি অপমানসূচক কথা বলেছে কি একটা। বাঙালাটি যদিও বলিষ্ঠ যুবক, কিন্তু এত মদ্যপান করেছেন যে দাঁড়াতে পারছেন না ভাল করে'। মাড়োয়ারি তাঁর এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তম্বি করছে। মেয়েটি সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে একধারে এবং মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে—"আপনি সরে' আসুন বীরেনবাবু" বলছে; এমন সময় রঙ্গস্থলে পুরন্দর প্রবেশ করলেন এবং নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে' যা করলেন তা বাস্তবিকই নাটকীয়। এক বিরাট চপেটাঘাতে মাড়োয়ারিকে নিরস্ত করে' ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন—"বসুন আপনারা কেলনারে গিয়ে। এর ব্যবস্থা আমি করছি। এখানকার দারোগার সঙ্গে আলাপ আছে আমার।"

পুরন্দরবাবুর চেহারা এবং পরুষ ব্যবহার দেখে মাড়োয়ারি হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে ব্যবসায়ী লোক, ভীড়ের মধ্যে স্ত্রী-অঙ্গের লালিত্যটুকু বিনাপয়সায় উপভোগ করতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছে যদিও—কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধিই তাকে বাঁচালে শেষ পর্য্যন্ত। পুরন্দরবাবু-জাতীয় লোকদের সে চেনে, এদের কি করে' বশ করতে হয় তাও জানা আছে। ঝুঁকে সেলাম করে' বললে "মাফি মাংতে হেঁ হুজুর। ভীড় মে হাত লাগ গিয়া থা"

পুরন্দরবাবু তাঁকে ছেড়ে দিলেন। মহিলাটির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "চলুন আমরা চা খাই গে"

বীরেনবাবু টলছিলেন। তিনি নমস্কার করে' বললেন—"ধন্যবাদ মশাই। বেশ করেছেন, খুব করেছেন। ব্যাটা মেড়ো..."

"চলুন চা খাওয়া যাক" পুরন্দরবাবু আবার বললেন।

"উনি যে ট্রেণ থেকে নেবে কোথা গেলেন" মহিলাটি এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন বিরক্তি ভরে।

"উনি আসবেন এখুনি। জিনিস সামলাচ্ছেন"—বীরেনবাবু বললেন। "আপনারা কেলনারে বসুন ততক্ষণ। আমি খুঁজে আনছি তাঁকে। কি নাম ভদ্রলোকের—"

"যুগল পালিত"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে যুগল পালিত ভীড় ঠেলে এসে হাজির হল। পুরন্দরবাবুকে দেখে চমকে উঠল সে—যেন ভূত দেখেছে। হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইল। তার স্ত্রী তাকে যা বলছিল তা যেন সে শুনতেই পাচ্ছিল না, পুরন্দরবাবুকে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। তার স্ত্রী বলছিল—"এই ভদ্রলোক না থাকলে যে কি মুশকিলেই পড়তাম আমি—"

পুরন্দরবাবু হেসে উঠলেন।

"আরে! যুগলবাবু নাকি"—তারপর তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—"আমরা দুজন পুরোনো বন্ধু...। আপনাকে পুরন্দরের কথা বলে নি কখনও?"

"না, বলেনি তো"

"বলা উচিত ছিল। দিন কর্মালি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিন। বিয়ের সময় একটা খবরও তো দিলেন না। আচ্ছা লোক আপনি মশাই—"

যুগল আমতা আমতা করে' বললে—"ও হ্যাঁ—বিয়ের সময় নানা গোলমালে—হ্যাঁ...ললু...ইনি ইনি আমার বন্ধু...পুরোনো বন্ধু পুরন্দরবাবু—"

বলতে বলতে থেমে গেল সে হঠাৎ—ছোটো চোখ দিয়ে দু'ঝলক আগুন বেরুল যেন।

পুরন্দরবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'নলু'ও প্রতি-নমস্কার করে' বললেন, "ভাগ্যে আপনি ছিলেন, তা না হলে কি মুশকিলেই যে পড়তাম"

পুরন্দরবাবু সকলকে নিয়ে কেলনারে ঢুকলেন।

একটু পরেই পরিচয় হয়ে গেল ভাল করে'। পুরন্দরবাবুর পরিচয় শুনে নলু একমুখ হেসে বললেন—"আপনিও বেড়াতে বেরিয়েছেন? চলুন না আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার। আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি সেখানে একমাসের জন্তে। চলুন না, যাবেন?"

"বেশ তো। দিন দশেক পরে যেতে পারি"

যুগল পালিতের মুখখানা কালো হয়ে গেল।

বীরেনবাবু হাত ঘড়ি দেখে বললেন—"আর বেশী দেরী নেই কিন্তু। এবার ওঠা যাক—"

পুরন্দরবাবু হরিদ্বারে যাবেন শুনে বীরেনও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। চা খাওয়া কোনরকমে সেরে সে নলুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেণে উঠল। যুগল পালিত বসে রইল। ওরা চলে যেতেই সে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে স্খলিতকণ্ঠে জিগ্যেস করলে—"সত্যিই আসছেন আপনি হরিদ্বারে?"

"আপনি একটুও বদলান নি দেখছি"—হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু—

"আপনি সত্যিই ভেবেছেন আমি যাব? পাগল না কি, আমার সময় কোথায় হা—হা—হা—"

যুগল পালিতের মুখও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"ও যাচ্ছেন না তাহলে—"

"না যাচ্ছি না, ভয় নেই আপনার"

"কিন্তু উনি যদি জিগ্যেস করেন কেন এলেন না কি বলব আমি!"

"যা খুশী বলবেন। বলবেন আমার পা ভেঙে গেছে—"

"বিশ্বাস করবেন না সে কথা"

"না করলেই বা। ও বাবা, গিন্নির ভয়ে যে একেবারে অস্থির দেখছি" যুগল হাসবার চেষ্টা করলে একটু কিন্তু পারলে না। পুরন্দর-বাবুর ব্যঙ্গটা কশাঘাত করলে যেন তাকে।...গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। পুরন্দরবাবু ঠিক করে' ফেলেছিলেন এ গাড়িতে আর যাবেন না, এখানেই ব্রেক জার্নি করবেন। ষ্টেশন প্লাটফর্মে থাকতে তাঁর ভারী ভাল লাগে। জিনিসপত্র ওয়েটিংরুমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পুরন্দরবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"এই বীরেনবাবুটি কে"

"ও আমার দূর সম্পর্কের একজন ভাই হয়। ভাল ফুটবল খেলত। একটা চাকরিও করে' দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলে না। মদেই মাটি করেছে ওকে..."

পুরন্দরবাবুর মনে হল—"বাঃ, ঠিক জুটে গেছে, ষোলকলা পূর্ণ একেবারে"

"যুগলদা, আসুন না"

বীরেন গাড়ি থেকে ডাকতে লাগল।

যুগল পালিত উঠতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে বললেন—"এখন যদি আপনার স্ত্রীকে গিয়ে বলি যে আপনি রাত্রে আমাকে খুন করতে গিয়েছিলেন কেমন হয় তা হলে"

"অ্যাঁ, কি যে বলেন" যুগলের মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে গেল।

"যুগলদা, যুগলদা ও যুগল দা—"

বীরেনবাবুর জড়িত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

"আচ্ছা যান আপনি"

"সত্যিই আপনি আসছেন না তো?"

"শপথ করব? ট্রেণ ছাড়ছে যান"

এই বলে' পুরন্দরবাবু সহৃদয় সাহেবী ভঙ্গীতে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন শেক হাণ্ড করবার জন্তে। বাড়িয়েই কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হল, যুগল হাত বাড়ালে না। এমন কি সরিয়ে নিলে।

গাড়ি ছাড়বার তৃতীয় ঘণ্টা পড়ল।

মুহূর্ত্তে দু'জনের মধ্যে কি একটা কাণ্ড ঘটে গেল যেন। কি একটা যেন ছিঁড়ে গেল, কেটে গেল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে যুগলের ঘাড়টা ধরে কাটা হাতটা তার মুখের সামনে ধরে বললেন—"এই হাত আমি বাড়িয়ে দিতে পারলাম, আর আপনি সেটা নিতে পারলেন না"

যুগলের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—"আর পাপিয়া?"

হঠাৎ তার ঠোঁট, গাল, থুতনি সব থর থর করে কেঁপে উঠল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

পুরন্দরবাবু তাকে ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"যুগল দা, কি করছ তুমি, ট্রেণ যে ছাড়ে—"

গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা গেল।

যুগল পালিত হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল এবং চলন্ত ট্রেণে লাফিয়ে উঠে পড়ল। পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে'।

সম্পূর্ণ

উপমা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

উজল চোখে কাজল দিলে—
কবির চোখে হয় প্রতীতি

যেমন কালো ভৃঙ্গ দলে-
পদ্মদলে জানায় প্রীতি।

শাক ও গাড়ী

ভাস্কর

সেদিন বাজারে গিয়াছিলাম।

এটা সেটা কিনিবার পর দেখি বাজারের একপাশে একখানি কলাপাতার উপর একরাশ ন'টে শাক। জিজ্ঞাসা করিলাম, কত করে ?

ছ'আনা সের।

ন'টে শাক ছ'আনা সের! বল কি? কত করে দেবে ঠিক করে বল।'

আজ্ঞে ছ'আনা করে।

তিন আনা করে দেবে ?

না।

চার আনা করে ?

আজ্ঞে না। ছ'আনার কম হবে না।

আচ্ছা, দাও এক পোয়া।

শাক ওজন হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার পাল্লায় ফের নেই তো।

এই দেখুন না।—বলিয়া দাঁড়িপাল্লা তুলিতেই ডানদিকটা ঝুঁকিয়া পড়িল অনেকখানি। দোকানী অপ্রস্তুত হইয়া একমুঠা শাক তুলিয়া ফেলিয়া দিল ঝুড়িতে। বলিলাম, এমনি করে লোককে ঠকাও বুঝি? বলিতেই আরও সঙ্কুচিত হইয়া আরো একমুঠা শাক ফেলিয়া দিল ঝুড়ির ভিতর।

বলিলাম, প্রায় একপয়সার শাক ঠকিয়ে নিচ্ছিলে।

বাড়ী ফিরিয়া বাজারের জিনিষপত্র গুছানোর সময়ে, কেমন করিয়া শাকওয়ালা আমাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং কেমন করিয়া তাহার ঠকাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, এমন সময়ে চাকর আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। বলিল, লোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

এনভেলাপের মধ্যে একখানি বিল। দি গ্রেট এশিয়াটিক মোটর এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড পাঠাইয়াছে। কয়দিন ধরিয়া গাড়ীর এঞ্জিনটা একটু নক্ করিতেছিল। উহাদিগকে বলিয়াছিলাম, কারবুরেটরটা একটু পরিষ্কার করিয়া দিতে। এটা তাহারই বিল।

বিলে কাজের তালিকা দেওয়া আছে—এঞ্জিনের ঢাকনি খোলা, কারবুরেটরের দিকে চাহিয়া থাকা, পেট্রলের নল খুলিয়া দেওয়া, চোকলেভারের মুখের স্পিল্‌ট-পিনের ডগা একত্র করা, পিন টানিয়া বাহির করা, লেভার সরাইয়া রাখা, অ্যাকসিলারেটরের স্প্রীং খোলা, এঞ্জিনের গা হইতে কারবুরেটর খুলিয়া আনা, ফ্লোট চেম্বারের ঢাকনি খোলা, ফ্লোট বাহির করা, ফ্লোট-চেম্বারের তলায় পিতলের তারের জাল খুলিয়া বাহির করা, ছোট ছোট বক্সরেঞ্চ দিয়া জেটগুলি খোলা, জেটের মুখে ফুঁ দেওয়া, সরু তার ঢুকাইয়া জেটের মুখ পরিষ্কার করা, জেটগুলি পুনরায় রেঞ্চ দিয়া আঁটা, জালের ঢাকনি পুনরায় বসান, ফ্লোটটিকে পুনরায় চেম্বারে বসান, চেম্বারের মুখ ঢাকনি দিয়া বন্ধ করা, ঢাকনির উপরের স্প্রীংক্লিপ পুনরায় আটকাইয়া দেওয়া, এঞ্জিনের গায়ে কারবুরেটর পুনরায় আঁটিয়া দেওয়া, চোক্-লেভারের ডগা আটকানো, স্পিল্‌ট-পিন পরানো, পিনের মুখ ফাঁক করিয়া চাপিয়া দেওয়া অ্যাক্সিলারেটরের স্প্রীং পুনরায় আটকানো, কারবুরেটর টিউন করা, নেকড়া দিয়া মোছা, এঞ্জিনের ঢাকনি বন্ধ করা, ট্রায়ালের জন্য পেট্রল খরচ আড়াই গ্যালন, ইত্যাদি—মোট থোক—৬৭৸০ বিলের পরিমাণ শুনিয়া গৃহিণী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, কি একটু পরিষ্কার করতে অত টাকা!

এমন বেশি আর কি বিল করেছে। বিলিতি দোকান হ'লে—

বাহিরে লোক অপেক্ষা করিতেছিল। বিলের টাকা লইয়া স্বচ্ছন্দমনে চলিয়া গেল।



গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি

শ্রীগান্ধী সেবক

বাংলায় গান্ধীজীর অবস্থানকালে তাঁহার আবাসস্থল সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে বাংলার-কংগ্রেস-কর্মীদের এক সম্মিলন হয়। গান্ধীজী কংগ্রেসকর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ভিত্তির উপরই আলোচনা করেন। রাষ্ট্রভাষা অর্থাৎ হিন্দুস্থানী শিক্ষার উপর জোর দিয়া তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন এবং উপস্থিত সকল কংগ্রেস কর্মীদের নিকট হইতে ছয়মাসের মধ্যে হিন্দুস্থানী শিক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন।

ঐ সময়ে গান্ধীজী লিখিত Constructive Programme নামক পুস্তিকার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি কোন কোন ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় উহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা বাংলার প্রত্যেক কর্মীর কর্মপথের সহায়ক হইবে।

বাংলার তথা ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া এই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির কয়েকটি বিষয় লইয়া বর্তমান প্রবন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। বস্তুতঃপক্ষে গঠনমূলক কর্মসম্বন্ধে গান্ধীজী গত ২৫ বৎসর যাবৎ এত বলিয়াছেন, এত আলোচনা করিয়াছেন যে ইহার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—তবুও মনে হয় বিষয়টি আমাদের সম্মুখে যতই তুলিয়া ধরা হইবে, যতই ইহা লইয়া আলোচনা করা যাইবে, ততই ইহা হইতে নূতন আলোক, নূতন প্রেরণা পাওয়া সম্ভব হইবে। গান্ধীজী কর্মের সূত্রস্বরূপ অষ্টাদশবিধ সংগঠন কার্য্যের তালিকা দিয়াছেন—১। সাম্প্রদায়িক ঐক্য ২। অস্পৃশ্যতা বর্জন ৩। মাদকতা নিবারণ ৪। খাদি ৫। অপর গ্রাম-শিল্প ৬। গ্রাম-পরিচ্ছন্নতা ৭। বনিয়াদি শিক্ষা ৮। বয়স্ক শিক্ষা ৯। নারী সেবা ১০। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যজ্ঞান ১১। প্রাদেশিক ভাষা ১২। রাষ্ট্রভাষা ১৩। আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠা ১৪। কিষাণ ১৫। শ্রমিক ১৬। আদিবাসী ১৭। কুষ্ঠরোগী ১৮। ছাত্র; ইহা ছাড়া আইন অমান্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। গান্ধীজী এই অষ্টাদশবিধ সংগঠনকার্যের সূচী দেওয়ার সময় বলিতেছেন যে, এই সূচী স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। ইহা কর্মপথের প্রদর্শক মাত্র। দেশসেবকগণ ইহা হইতে সংগঠন কার্য সূচী—অপর কথায় স্বরাজ সংগঠনের কর্মধারার আভাস পাইবেন—এবং নিজের কর্তব্যপথ ঠিক করিতে পারিবেন। অহিংসার কার্যকরী রাস্তা হইতেছে এই সংগঠনকার্য।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে অহিংসপন্থা অবলম্বন করিয়া যদি আমাদিগকে স্বরাজ পাইতে হয়—'যদি' বলি কেন—বর্তমান সময়ে অহিংস পথ ছাড়া আর কোন পথই দেখা যায় না। তাহা হইলে অহিংসাকে কার্যকরী (Dynamic) অহিংসায় পরিণত করার একমাত্র পথই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির অবলম্বন। গান্ধীজী অনেক বার বলিয়াছেন, অহিংসা ভীরুর ধর্ম নহে—তথা অলসের—কর্মবিমুখের ধর্ম নহে—অহিংসা স্বতই কর্মপ্রেরক—ক্রীয়াশীল। অহিংসা কর্মপ্রেরণাই আনে—কর্মবিমুখতা আনে না। গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি ও অহিংসা একে অপরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—একেকে বাদ দিয়া অপরটি চলিতে পারে না—এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে—অহিংসার বিশ্বাস—অহিংসার শক্তির প্রকাশ যেমন প্রবল হইতে প্রবলতর হয়, তেমনি অহিংসাকে ভিত্তি করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে গান্ধীজী প্রদর্শিত এই সংগঠন পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পথই নাই। যে-রাষ্ট্র হিংসার ভিত্তির উপর পরিচালিত হয় তাহাকে যেমন রাষ্ট্র-সংরক্ষণ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য এক ধরণের সংগঠন কার্য করিতে হয়—যেমন সৈনিকদের শিক্ষা ও সৈন্য পোষণ ও সংরক্ষণ, অস্ত্র তৈরী ইত্যাদি—যাহা গত যুদ্ধের অনেক পূর্ব হইতেই জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ করিয়া আসিতেছিল, সেইরূপ যে-সমাজ বা রাষ্ট্র অহিংসার ভিত্তির উপর পরিচালিত হইতে চায় সেই সমাজ বা রাষ্ট্রকেও অহিংসার দৃষ্টিতে সংগঠনকার্য্য অবলম্বন করিতে হয়। গান্ধীজীর প্রদর্শিত গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি—এই অহিংস সমাজ ও রাষ্ট্র রচনারই কর্মপদ্ধতি। এই দৃষ্টিবিন্দু অবলম্বন করিয়া আমরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিক হইতে কয়েকটি বিষয় মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার আমদানী—ইংরাজ রাজত্বের একটা কীর্তি—ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্বের স্তম্ভ হিসাবেই তাহারা এই জিনিষটার সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা একটা কৃত্রিম সৃষ্টি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই কৃত্রিম সৃষ্টি চোখে পড়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে ভারতবর্ষে বহু রকম ধর্মনীতি ও উপাসক সম্প্রদায় আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে—এক একজন ধর্মনায়ক এক এক সময়ে ভারতবর্ষের জনসমাজের সম্মুখে ধর্মের এক একটা বিশেষ রূপ তৎসাময়িক পরিবেশের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ধার্মিক-জীবনযাত্রার বিশেষ নীতি ও পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছেন। কত লোকে তাহা গ্রহণ করিয়াছে—কত লোকে করে নাই। যে লোকসমষ্টি সেই নীতি বা জীবনযাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে তাহারাই একটা বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় নামে ক্রমে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার কালের প্রভাবে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই ধর্মপথের বৈচিত্র্য কখনো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি অবলম্বন করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করে নাই। হয়ত ভারতবর্ষ যখন যে

ধর্মাবলম্বী রাজার শাসনে রহিয়াছে সেই ধর্মের প্রভাব জনসমাজে অধিক হইয়াছে—কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থাকে জটিল করিয়া দেশের অখণ্ডত্ব নষ্ট করে নাই। মুসলমান রাজত্বের সময়ও ইহাই দেখা যায়। বহিরাগত পাঠানেরা ও মোগলেরা এদেশে আসিয়া দেশ জয় করিয়া এদেশবাসীই হইয়া পড়েন। তাহারা ভারতবাসীই হইয়া যান—তাহাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আইন-পোষিত সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু ইংরাজ এ দেশকে আত্মসাৎ করিয়া এদেশবাসী হন নাই। তাহারা তাহাদের স্বদেশের পোষণ-ক্ষেত্র হিসাবেই এদেশকে ব্যবহার করিতে থাকেন—স্বদেশকে পুষ্ট করার একটা উৎস হিসাবে ভারতবর্ষকে তাহাদের তাঁবে কায়েম রাখিতে চান। ভারতবর্ষের অতীতের কৃষ্টি—সমাজব্যবস্থা—সভ্যতা সমস্ত ধ্বংস করিয়া আফ্রিকার ন্যায়—অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় নিজেদের উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন—কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে ভারতবর্ষের সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে ইংরাজ সমর্থ হন নাই—যদিও সেই সভ্যতার আজ যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা কংকালের মতই আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টার গতিপথে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদরূপ অস্ত্রের রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রয়োগের আবিষ্কার তাহাদের দ্বারাই হয়। বিদ্বেষকে তাহারা একটা নীতিহীন আইনের শৃঙ্খলায় পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

আমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখি তবে সহজেই দেখিতে পাই হিন্দু ও মুসলান উভয়ের ধর্মের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতাই উভয় ধর্মের মূলনীতি। অপরকে বলপূর্বক ধ্বংস করিয়া প্রভাব বিস্তারের শিক্ষা কোন ধর্মই দেয় না। কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে যদিও কোন প্রসিদ্ধ লীগনেতার একটি উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে Islam teaches tooth for tooth—ইসলাম আঘাতের বদলে আঘাতের শিক্ষাই দেয়—তবুও একথা জোরের সহিতই বলিতে হয় যে কখনোই ইসলাম এইরূপ শিক্ষা দেয় নাই—বা দেয় না। বিচারপতি আমীর আলী প্রণীত The spirit of Islam নামক প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। সমস্ত ধর্মনীতিই অনধিকারীর ব্যাখ্যায় ধর্মের মূলনীতি হইতে বিকৃত হয়—অপব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত নীতির নীচে চাপা পড়ে এবং বর্তমান যুগে সর্বক্ষেত্রেই তাহা হইতেছে—সত্য অসত্যের নীচে চাপা পড়িতেছে। এইরূপ অবস্থারই মহান চিন্তানায়ক ও মহান ধর্মনায়কদের আবির্ভাব হয় এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সৎশিক্ষা ও সৎচিন্তার আলোক পাইয়া সত্যপথের সন্ধান পায়—

ইসলামের শিক্ষার মর্ম

যখন মোহম্মদের অনুবর্তীরা তাঁহার স্বজাতি কোরাইশদের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকেন, তখন মোহম্মদ তাহাদিগকে উৎপীড়নের হাত হইতে বাঁচার জন্য খৃষ্টান রাজার দেশ আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে অসৎ ধর্মীদের প্রতি উদারতা প্রকাশ করা হইত। কোরাইশরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আবিসিনিয়ার রাজার নিকট মোহম্মদের অনুবর্তীদের আশ্রয় না দিতে ও তাহাদিগকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিতে বলিয়া পাঠান। রাজা তখন মোহম্মদের অনুবর্তীদের নিকট তাহাদের ধর্মের মর্ম কথা জানিতে চান—মোহম্মদের অনুবর্তীদের মুখপাত্র জাফর তখন বলেন—

"Jaffar acting as spokesmau for the fugitive spokes" Thus : "O king, we were plunged in the depths of ignorance and barbarism ; we adored idols, we lived in unchastity, weate dead bodies, and we spoke abominations ; we disregarded every feeling of humanity, and the duties of hospitality and neighbourhood ; wo knew no law but that of the strong, when God raised among us a man, of whose birth, truthfulness, honesty and purity we were aware ; and he called us to the unity of God.......He forbade us the worship of idols ; and enjoined us to speak the truth, to be faithful to our trusts, to be merciful and to regard the rights of neighbours ; he forbade us to speak evil of women,......and to abstain from evil ; to offer prayers, to render alms, to observe fasts. We have believed in him, we have accepted his teachings and his injunctions. For this reason our people have risen against us......(Page 27-28,

তাৎপর্য—"হে রাজা! আমরা অজ্ঞতা ও বর্বরতার মধ্যে ডুবিয়াছিলাম। আমরা পুতুল পূজা করিতাম—আমরা দুর্নীতির মধ্যে বাস করিতাম—আমরা মৃতদেহ আহার করিতাম—এবং কুবাক্য বলিতাম—মানবতার সর্ব অনুভবই অগ্রাহ্য করিতাম—গায়ের জোরের আইন ছাড়া অন্য কোন নীতিই আমাদের ছিল না। এমন সময় ঈশ্বর আমাদের মধ্যে এমন একজন মানব প্রেরণ করিলেন—যাঁহার আত্মপরিচয়, সত্যনিষ্ঠা সাধুতা পবিত্রতা সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের একত্ববোধের মধ্যে আহ্বান করিলেন,......পুতুলপূজা করিতে নিষেধ করিলেন এবং সত্যবাক্য বলিতে, আমাদের উপর ন্যস্ত বিষয়ে বিশ্বাসরক্ষা করিতে, দয়াশীল হইতে, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে আদেশ করিলেন ;......নারীজাতির সম্বন্ধে অসৎ কথা বলিতে—পাপ কার্য ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন—উপাসনা করিতে—দান করিতে—উপবাস করিতে আহ্বান করিলেন—আমরা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছি তাঁহার শিক্ষা ও নির্দেশ মানিয়া লইয়াছি। এই জন্যই আমাদের স্বদেশের লোকেরা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে..."

ইসলাম ধর্ম কি উদার শিক্ষা দেয় এই কথা কয়টি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়—আঘাতের প্রতি আঘাত এই শিক্ষার মধ্যে নাই।

ইসলাম রাষ্ট্রে সহনশীলতা

ইসলাম ধর্মাধীন রাষ্ট্রে পরধর্মীর প্রতি কিরূপ আচরণ প্রবর্তিত হইবে সেই সম্বন্ধে মোহম্মদের কিরূপ উদার নির্দেশ ছিল নিম্ন উক্তি হইতে বুঝা যাইবে—

"To (the Christians of Najran and the neighbouring territories, the security of God and the pledge of His

prophet are extended for their lives, their religion, and their property—to the present as well as the absent and others besides; their shall be no interference with (the practice of) their faith or their observances; nor any change in their rights or previleges, no bishop shall be removed from his bishopric; nor any monk from his monastery, nor any priest from his priesthood, and they shall continue to enjoy everything great and small as hereto-fore; no image or cross shall be destroyed; they shall not oppress or be oppressed; they shall not practice the rights of blood vengeance as in the days of ignorance; no tithes shall be levied from them nor shall they be required to furnish provisions for the troops-" (Page 246-247)

"নাজরান এবং পার্শ্ববর্তী স্থানের (খ্রীষ্টান) অধিবাসীদিগের—তাঁহাদের জীবন, ধর্মবিশ্বাস, এবং বর্তমান ও অতীতের সম্পত্তি এবং অন্য সমস্ত অধিকার রক্ষার সম্পর্কে ঈশ্বরের আশ্রয় এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতিশ্রুতি অর্পণ করা আছে। তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানাদির উপর এবং তাঁহাদের অধিকার ও সুবিধাদির পরিবর্তনের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না; কোন বিশপকে তাঁহার বিশপত্ব হইতে, কোন সন্ন্যাসীকে তাঁহার মঠ হইতে, কোন পুরোহিতকে তাঁহার পৌরহিত্য হইতে বিচ্যুত করা হইবে না এবং তাঁহারা এতাবৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ যা কিছু সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা ভোগ করিতেই থাকিবেন। কোন মূর্তি কিংবা ক্রুশচিহ্ন ধ্বংস করা হইবে না; তাঁহারা অত্যাচার করিবে না—অত্যাচারিতও হইবে না। তাঁহারা অজ্ঞতার যুগের মত রক্তারক্তির দ্বারা প্রতিহিংসার অধিকার পালন করিবে না। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন দশমাংশ (কর) আদায় করা হইবে না এবং সেনাবাহিনীর আহার্যও তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিতে বাধ্য করা হইবে না। (পৃঃ ২৪৬-৪৭)

ইস্‌লামের আদর্শ সম্বন্ধে মোহম্মদের উপদেশ

"Cultivate humility and forbearence; comport yourself with piety and truth. Take count of your actions with your own conscience, for he who takes such counts reaps a great reward, and he who neglects incurs great loss. He who acts with piety gives rest to his soul; he who takes warning understands the truth; he who understands it, attains perfect knowledge." (Page 378)

"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতা অভ্যাস কর; আচরণে ধর্মপরায়ণতা ও সত্য অনুষ্ঠান কর। নিজের বিবেকের সহিত কৃতকর্মের হিসাবনিকাশ কর; যে এইরূপ করে সে মহৎ ফল লাভ করে; যে অবহেলা করে, সে বৃহৎ ক্ষতি স্বীকার করে। যে ধার্মিকতার সহিত কাষ করে, সে নিজ আত্মাকে শান্তি দেয়; যে সাবধানবাণী শুনে সে সত্য উপলব্ধি করে; যে উহা উপলব্ধি করে, সে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।"

এই উক্তিগুলি হইতে ইসলামের শিক্ষা, অপর ধর্মীর প্রতি আচরণ—ইসলামের আদর্শের মূল কথাগুলি জানা যায় এবং এই ধর্মনীতির ঔদার্য উপলব্ধি করা যায়। আজ অন্যান্য ধর্মের ন্যায়ই অপব্যাখ্যাকারকের হাতে এই নীতিসমূহ বিকৃত হইয়েছে।

এই সকল বিষয় বিচার করিয়া আমরা যদি একটা সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, বিভিন্ন ধর্মনীতি পরস্পরকে সহন করে—আঘাত করে না—নীতিগুলি মানবজীবনকে সদ্‌ভাবে পরিচালিত করার বিভিন্ন পথ মাত্র, তাহা হইলে এই বিভেদ এক মুহূর্তেই উঠিয়া যায় ও রাষ্ট্র ব্যাপারে এই সাম্প্রদায়িক অনৈক্য লইয়া ঝগড়া হয় না।

ইংরাজ-শাসন-তন্ত্র যে আমাদের উপর আইন করিয়া এই বিরোধ চাপাইয়াছে তাহা আমরা এই কথাটি বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারি যে, যে ইংরাজ শাসনতন্ত্র তাহার শক্তি বজায় রাখার জন্য এই বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে—সেই শাসনতন্ত্র তাহার স্বদেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কি করিতেছে! আজ যদি পার্লামেণ্টে প্রোটেষ্টাণ্ট, রোমান-ক্যাথলিক, মেথোডিষ্ট, ইহুদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্র এবং প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিত—তবে কি সেই দেশেও রাষ্ট্রব্যাপারে ভারতবর্ষের মত সাম্প্রদায়িক অনৈক্য গড়িয়া উঠিত না? ইংরাজ জানে ইহা একটা কৃত্রিম সৃষ্টি এবং সেইজন্যই নিজের দেশে তাহা হইতে দেয় নাই। কোন দেশেই এইরূপ সাম্প্রদায়িকতার নীতি রাষ্ট্রব্যবস্থার অবলম্বন নয়।

খাদি ও গ্রামশিল্প

বর্তমানে খাদ্য ও বস্ত্রপরিস্থিতি এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে—চারিদিকে খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব। সংগঠনের ও সেবার মনোভাব লইয়া যদি আমরা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তবে এই সংকটকে পরাভূত করার রাস্তা সহজ হইয়া পড়ে। গান্ধীজী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সূতা কাটিয়া বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে দিনের পর দিন আহ্বান করিতেছেন, এই আহ্বানে যদি আজও আমরা সম্পূর্ণভাবে সাড়া দেই—তবে বস্ত্রের অভাব একটা কথা মাত্রেই পর্যবসিত হয়। গান্ধীজী চরখাকে ত শুধু বস্ত্রাভাব মোচনের দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি ইহাকে অহিংস রাষ্ট্র রচনার-প্রতীক বলিয়া দেখেন। ইহা দরিদ্রের অন্ন যোগায়; ধনীকে দরিদ্রের সহিত এক হওয়ার পথ দেখায়—দরিদ্রকে অন্ন দিয়া স্বরাজের সৈনিক হওয়ায় শক্তি দেয়, রাষ্ট্রনায়কের বা রাষ্ট্রসেবকের হাতে স্বরাজের অহিংস অস্ত্ররূপে বিরাজ করে। ইহা স্বরাজযজ্ঞের সাধন অর্থাৎ অবলম্বন। পশুশক্তির আশ্রয়ে সৈনিকেরা বন্দুক কামান বিমান প্রভৃতি হাতিয়ার লইয়া যুদ্ধ করে—অহিংসার যুদ্ধের ইহা হাতিয়ার। এককালে যজ্ঞ করা হোম করা লোক সেবার অঙ্গ ছিল—অগ্নি ছিল তাহার সাধন অর্থাৎ অবলম্বন। আজ আমরা ইহা মনে করিতে পারি বর্তমান ভারতের লোক-সেবাযজ্ঞের সাধন—অর্থাৎ অবলম্বন চরখা। আদর্শক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বস্তুতান্ত্রিক ব্যবহারিক ক্ষেত্র পর্যন্ত—চরখার স্থান বিস্তৃত। উহা একদিকে যেমন বস্ত্রসংকট দূরীকরণের হাতিয়ার, তেমনি অহিংসার ভিত্তিতে স্বরাজ-যজ্ঞের সাধন।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই চরখাকে অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রাম্যশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে এবং উঠিতেছে। চরখা, অন্য গ্রামশিল্প ও কৃষি—একের সহিত অপরে যোগযুক্ত; কৃষির সহিত গো-সেবা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

ভারতবর্ষের সভ্যতার ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় ভূমি, উদ্ভিজ্জ, গো-জাতি এবং মানুষ—এই চারের সমন্বয়ে এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ গরুর সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করিয়াছে—শস্যোৎপাদন করিয়াছে—সেই শস্য নিজে আহার করিয়াছে—গরুকে খাওয়াইয়াছে—গরুর সেবা করিয়া তাহাকে পুষ্ট করিয়াছে এবং গরু হইতে তাহার শ্রেষ্ঠ খাদ্য-দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া মানুষ নিজে পুষ্ট হইয়াছে। এই ভাবে সর্বাঙ্গীণ শারীরিক পুষ্টিসাধনের পশ্চাতে একটা উদার চিন্তার প্রেরণা রহিয়াছে যাহা তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টিকে সাহায্য করিয়াছে। প্রাচীনকালের তপোবনের গো-পালন একটা কথার কথা নয়—জনক রাজার ক্ষেত্র-কর্ষণও একটা কথার কথা নয়। রামচন্দ্র রাজা হইলেন—মুনি ঋষিগণকে সহস্র সহস্র গো-দান করিলেন—মুনিরা এই গোধন লইয়া কি করিতেন? অবশ্যই আধুনিক কথায় তাঁহাদিগকে dairy farming এর ন্যায় বিরাট গো-সেবার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে হইত। শিষ্যদের শিক্ষার অবলম্বন তাহাই ছিল। মুনিরা ছিলেন Trustee অছি মাত্র। বিরাট গোধনের পরিচর্য্যা ও গো-জাত খাদ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ—তাহারা অছির ন্যায় করিতেন—এবং শিষ্যদিগকে সেই শিক্ষার শিক্ষা দিয়া সদ্‌গৃহস্থ তৈরী করিতেন। এই সকল কথার উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, এই বিষয়গুলি চিন্তা করিলে পথের সন্ধান পাওয়া যায়। আজ যদি এই সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখি—ফসল জন্মাই—গোরুর সেবা করি, তবে ভূমি ও গোরু আমাদের খাদ্য দিবে, পুষ্টি দিবে। এই উভয়কে আমরা ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া খাদ্য এবং পুষ্টি পাই না—এখানে অর্থনীতির প্রশ্ন—সস্তা ও দুর্মূল্যতার প্রশ্ন আসে না। সহজভাবে ধরা যাউক আমার একটু জমি আছে—দুই চারিটা গোরু আছে—খাটিয়া যদি ফসল উৎপন্ন করি এবং সেই ফসল নিজে আহার করি—গোরুকে খাওয়াই, গোরুর নিকট হইতে জমির সার ও শ্রেষ্ঠ খাদ্য দুগ্ধ গ্রহণ করি তবে নিজের খাদ্যের অভাব, পুষ্টির অভাব, স্বচ্ছন্দে মিটাইতে পারি। একটা গ্রাম যদি সমষ্টিগতভাবে ইহা করে, তবে গ্রামের অভাব মিটাইতে পারে। নিজের ঘরে বা গ্রামে কিছু উদ্বর্ত হইলে অন্যকে দিয়া বিনিময়ে অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি, দুর্দিনের জন্য সমষ্টিগতভাবে সংরক্ষিত রাখিতে পারি। গ্রাম-সেবকদের যদি এই মনোভাব আসে এবং গ্রামবাসীকে যদি এই দিকে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়—তবে কে রাজত্ব করিতেছে—এবং সে কবে দুঃখ ঘুচাইবে এর জন্য বসিয়া না থাকিয়া আমরা সমস্ত দুঃখমোচনের ভার নিজেরাই হাতে লইতে পারি। কংগ্রেস-সেবক তথা গ্রামসেবক নিজেই নিজের জীবনের আচরণ দ্বারা ইহা দেখাইবেন, লোকে দেখিবে—শিখিবে—এবং তখন নিজেরা করিবে। আজকের বিরাট খাদ্য সংকটের সমাধানের পথ সহজভাবেই পাওয়া যায়। যদি আমরা ভূমি ও গোরুর দিকে তাকাই—একটু জমিও যদি অপব্যবহৃত হইতে না দেই—গোরুকে একটুও যদি অবহেলা না করি। খাদ্য তো শুধু চাউল আর ডালই নয়—শাক্ সবজি আমাদের খাদ্যে থাকেই না। ইহা খাদ্যের আট আনা অংশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে; যদি জমির ও গোরুর প্রতি যদি উপেক্ষা না করি তবে এই আট আনা আজও সহজেই পাইতে পারি।

এই চতুঃসমন্বয় হইতে গ্রামশিল্প একটার পর একটা গড়িয়া উঠিয়া গ্রামকে তথা সমগ্র দেশকে স্বাবলম্বী করিতে পারে। এইরকম প্রচেষ্টাই ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমষ্টির শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র দেশকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে—তখন স্বরাজকে কি কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে?

রাষ্ট্রভাষা

প্রথমেই বলিয়াছি গান্ধীজী সোদপুরের কংগ্রেসকর্মী সম্মিলনে উপস্থিত কর্মীদের দ্বারা ছয়মাসের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন। আমি অবশ্যই মনে করি কর্মীরা সততার সহিত সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন এবং পালনের চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকের মনেই এই প্রশ্ন আসে গান্ধীজী রাষ্ট্রভাষার জন্য এত আগ্রহশীল কেন? অনেকে আবার এইরূপ প্রশ্ন করেন, "আমি বাংলার কোন নিভৃত কোণে বসিয়া গ্রামের কাজ করিতেছি—আমার কর্মক্ষেত্রে বাংলা ছাড়া কোন ভাষারই ব্যবহারের প্রয়োজনই নাই। আমার রাষ্ট্রভাষা শিখিবার দরকারই বা কি, শিখাইবারই বা দরকার কি? আমার তো ভিন্ন প্রদেশবাসীর সহিত কথোপকথনের কোন যোগ নাই, প্রয়োজনও হইতেছে না। ইহা সত্ত্বেও গান্ধীজী প্রত্যেক কর্মীকে রাষ্ট্রভাষা শিখিতে বলিতেছেন কেন?"—কিন্তু গান্ধীজী কি শুধু রাষ্ট্রভাষার কথা বলিতেছেন—প্রথমে তিনি প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের সহিত যোগস্থাপনের কথা বলিতেছেন। তাহা ছাড়া সমস্ত ভারতের সহিত চিন্তাবিনিময়ের জন্য রাষ্ট্রভাষা অবলম্বনের কথা বলিতেছেন। এই চিন্তা-বিনিময় একটা প্রধান এবং মৌলিক বিষয়—যাহা সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রগত ঐক্য সম্পাদনের অবলম্বন। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিতে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে—সমস্ত প্রদেশ, জেলা, গ্রাম—এমন কি ব্যক্তি পর্য্যন্ত স্ব স্ব স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার জন্য স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করিতেছে—অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকৃত হইতেছে;—আবার ভাবের আদানপ্রদানের, চিন্তা-বিনিময়ের ভিতর দিয়া একটা বিরাট ঐক্য সাধন করিতেছে অর্থাৎ কেন্দ্রীকৃত হইতেছে—ভারতবর্ষের অহিংস রাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব সাধন—এই ভাবে বিকেন্দ্রীকৃত ও কেন্দ্রীকৃত হইয়া সাধিত হইতেছে—এই কেন্দ্রী-করণের জন্যই সার্বজনিক রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু ইহা প্রাদেশিক ভাষাকে অবহেলা করিয়া নয়।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাই—ইংরাজ আমাদিগকে আমাদের ভাবের ঘরে জয় করিয়াছে—তাই না তাহাদের বাঁধন এত শক্ত, আমাদের এত মোহগ্রস্ত করিয়াছে! যে ভাবে তাহারা আমাদিগকে ইংরাজী শিখাইয়াছে—অর্থাৎ সোজা কথায় যেভাবে শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে আমাদিগকে আগাগোড়া আমাদের স্বকীয় চিন্তাধারা হইতে বিচ্যুত ও

মোহগ্রস্ত করিয়া, দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই ভাবের ঘরের পরাজয়ের গ্লানি দূর করিতে হইলে প্রাদেশিক ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষাই একমাত্র অস্ত্র। প্রাদেশিক ভাষার প্রতি অবহেলা এবং রাষ্ট্রভাষা না থাকা—আমাদিগকে জনসাধারণ হইতে এমন ভাবে দূরে রাখিয়াছে যে নিজ মাতৃভাষায় তাহাদিগকে কিছু বলিতে গেলে বুঝাইতে সক্ষম পর্য্যন্ত হই না—ইংরাজী শিক্ষিতের চিন্তা ইংরাজীকে অবলম্বন করিয়াই গঠিত হয় বলিয়া। এই জন্যই যদি কোন কর্মী বাংলার গ্রামে বসিয়া কাজ করেন এবং সেখানে রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগের কোন ক্ষেত্রও না থাকে, তবুও সর্বভারতের সহিত চিন্তার যোগ ও বিনিময় এবং তাহা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করার জন্য তাঁহার রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে—শিখাইবারও প্রয়োজন আছে।

উপসংহার

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় কেবল কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সামান্য উল্লেখ মাত্র হইল বলা যায়। এক্ষণে কেবল একটা কথা সংক্ষেপে বলিয়াই শেষ করিব। গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে যে সকল গ্রাম-শিল্পের সৃষ্টি হইবে—তাহার উৎপাদন ও বিতরণ সমস্যাকে বর্তমান অর্থনীতি অর্থাৎ টাকার মানদণ্ড ও তাহার আভিজাত্য আঘাত দিবে—সস্তা বা মহার্ঘ্য এই প্রশ্ন গ্রামশিল্পকে আঘাত করিবে। কুটীর-শিল্প-সঞ্জাত এবং কৃষি-সঞ্জাত দ্রব্যমাত্রই আপেক্ষিক-ভাবে বিনাশশীল—টাকাটা সেইভাবে অবিনাশী পদার্থ। আমি বাজারে সব্‌জি বা দুধ বিক্রয়ার্থ লইয়া গেলাম, দুইটাই বিনাশশীল—আমাকে তখনই বেচিতে হইবে। টাকাটা সেইরূপ বিনাশশীল নয়—যাহার হাতে আছে—তাহার গরজ না থাকিলে সেই শক্তিশালী হইল এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট মূল্যেই আমাকে বেচিতে হইবে। এই স্থলে এই টাকা পদার্থটি গঠনমূলক কর্মসঞ্জাতশিল্পকে আঘাত করে—এই আঘাত হইতে বাঁচিতে হইবে। এইজন্য কংগ্রেসসেবক তথা গ্রামসেবক—গ্রামকে স্বাবলম্বী করার দৃষ্টিতে এই টাকার মানদণ্ডের অহিতকারিতা নিজে বুঝিতে এবং অপরকে সমঝাইতে চেষ্টা করিবেন। গ্রাম স্বাবলম্বী হইলে মুখ্যভাবে গ্রামের সামূহিক ধনবৃদ্ধি হইবে, তখন টাকা ধনের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও তাহার আভিজাত্য আপনা আপনি কমিবে। গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতির মূলে এই টাকার আভিজাত্যের পরাজয়ের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে—ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। টাকার এই আভিজাত্য দূরীকরণের মধ্যেই আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ২-১২-১৩৫২

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

দ্বিসহস্রবর্ষ আগে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
হে কবি, নিখিল চিত্ত সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ রসে
সিক্ত করি সিপ্রাতটে মেঘালোকে গাহিলে যে গান
আজিও রসিক চিত্তে ধ্বনি তার করিতেছে দান
আনন্দ-অমৃত-ধারা। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ছন্দে তার
আন্দোলিত লক্ষ-হিয়া শ্রদ্ধাপুষ্পে তব বন্দনার
করিতেছে আয়োজন আজো বহু শতাব্দির পরে।
তারি সাথে কালিদাস, বঙ্গ তোমা নমস্কার করে।

স্বদেশেরে শস্যপূর্ণ করেছিল শক্রদর্প হরি'
একদা যাহারা—যাহারা আপন শির গর্বোন্নত করি'
বেড়াইত ধরণীতে, তাহাদেরে শুনাইতে কবি
মধু-ঝরা মেঘদূত, তাহাদেরে দেখাইতে ছবি
বিচিত্র সৌন্দর্যে ভরা ভারতের নদী-গিরি-বন
বিরহ বেদনাপূর্ণ সৃষ্টিছাড়া মানুষের মন।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি যাহারা করিয়াছিল পান
তব কাব্য-নির্ঝরের স্নিগ্ধ নীর, পাবে না সন্ধান
তাদের বিক্রম, বীর্য, গুণগ্রাহী বিদগ্ধ-হৃদয়
আমাদের মাঝখানে। সে সকলি হয়েছে বিলয়।
নির্লজ্জ হইয়া মোরা পরপদে মাথা করি নত
বিনা প্রতিবাদে সহি প্রতিদিন অসম্মান শত,
নিস্পন্দ হইয়া শুনি ক্ষুধিতের নিত্য হাহাকার
জননীরে বস্ত্রহীনা হেরি মনে মানি না ধিক্কার।

আজি এই বর্ষাগমে আষাঢ়ের আসন্ন-সন্ধ্যায়
তোমার অমর আত্মা নামি যদি আসিত ধরায়
মেঘদূতে হে দরদী, কোন্ গান উঠিত বাজিয়া?
কি ক্রন্দনে আন্দোলিত বিচলিত হত তব হিয়া?
স্বাধিকার-প্রমত্তের নির্বাসিত যক্ষের লাগিয়া
ফেলিলে নয়ন-বারি, বেদনায় দিলে পাঠাইয়া
ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুত-সন্নিপাত মেঘদূতে
তাহার প্রিয়ার লাগি। তোমার সে অশ্রুতে অশ্রুতে
দেখিল বিস্মিত বিশ্ব কবিতার নব মুক্তামালা
শুনিল কবির কণ্ঠে বিরহ-সঙ্গীত প্রাণঢালা।
স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট মোরা স্বাধিকার-প্রমাদের ফলে
কাটাই দুঃসহ কাল দুর্গতি-বন্ধুর-গিরি-তলে,
জীবন প্রকোষ্ঠ হ'তে খসি পড়ে মর্য্যাদা-বলয়,
অতীত স্মরিয়া গণ্ড বেদনায় হয় অশ্রুময়।
এ জাতির লাগি তুমি কারে দূত পাঠাইবে আজ?
কোন্ কাব্য বিরচিবে বাণীপুত্র কবিকুলরাজ?

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৬

অমল আজ কয়েক দিন বাড়ী আসিয়াছে কিন্তু মায়ের চোখে তাহার মানসিক ও সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্ত্তন আত্মগোপন করিতে পারে নাই। অমল পালাইয়া পালাইয়া সংগোপনে একটা অব্যক্ত অপ্রকাশ্য বেদনার দহনে ক্ষয়িষ্ণু শিলার মত ধীরে ধীরে যে শুকাইয়া যাইতেছে সেকথা মা বুঝিয়াছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। অমল কোথা হইতে বুকে কাঁটা বিঁধাইয়া রক্তাক্ত দেহে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা তিনি বুঝেন নাই বটে, কিন্তু সে ক্ষতে শীতল জননী-স্নেহের প্রলেপ দিয়া আরোগ্য করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু অমল কেবলই লুকাইয়া বেড়ায়, তাহার সাম্‌নে ধরা দেয় না।

অমল দ্বিপ্রহরে শুইয়াছিল—শ্রাবণের আকাশ মেঘ-মেদুর। পুরাতন দালানের স্বল্পালোকে গৃহ আরও অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। মাতা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—তোর কি হয়েছে বল ত—

অমল মিথ্যা কথা কহিল—কিছুই ত হয়নি মা।

একটু হাসিয়া মা কহিলেন—তোকে এত বড় করলুম, আর আজ তোর মনকে তুই আমার কাছে গোপন করবি, এ কি সম্ভব? কি হয়েছে বল—

—পরীক্ষা ভাল হয়নি তাই। সেকেণ্ড ক্লাস হলে ত ভাল চাকুরী হবে না মা—

—ভাগ্যকে কেউ রোধ ক'রতে পারে না বাবা। পড়ার খরচ ওরা দিতে চেয়েছিল, যদি হ'ত,তবে হয়ত এমন খারাপ হতো না—কিন্তু ভাগ্য বলবান। সেজন্যে দুঃখ করিস্‌ নে। ভগবান দিলে সেদিন সমস্ত একসঙ্গে সুদে আসলে উঠে আসবে—

অমল কোন সান্ত্বনাই পাইল না। সে আর একটি প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মা তাহাই বলিলেন, —ভাল হোক মন্দ হোক্ পরীক্ষা ত হ'য়ে গেল, এখন গৌরীর মাকে কি ব'লবো। আমার কথায় তারা অন্য সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছে—আর গৌরীকে ঘরে না আন্‌লে আমারও যেন শান্তি নেই, ওর স্থান আর কেউ পূরণ ক'রতে পারবে না—

অমল জবাব দিল না। কি হাস্যকর তাহার জীবন? আজ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি কি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট আছে? জীবনের যত সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে সে ফেলিয়া আসিয়াছে বর্ষণমুখর সেই সন্ধ্যায়—সে আর ফিরিবে না; কিন্তু মার এই ইচ্ছাকে, এই সস্নেহ বাসনাকে সে কেমন করিয়া ফিরাইয়া দিবে?

মা ধীরে ধীরে কহিলেন—গৌরীকে তুই চিনিস্‌ না। আমি চিনি—তার অন্তরের কথা আমার কাছে গোপন নেই—তার অন্তর জলের মত স্বচ্ছ হ'য়ে আছে আমার কাছে। যেদিন তাকে ব'ললাম, আমার ঘরে বোধ হয় তোকে আর আনতে পারলাম না গৌরী, তখন তার মুখে যে বেদনা ভেসে উঠেছিল তা'ত আমার সবই জানা। জীবনে কোনদিন সুখ যাকে বলে তা ভোগ করিনি, তোর মুখের পানে চেয়ে দিনের পর দিন কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রেছি, কিন্তু প্রতিবাদ করিনি। তোকে আমি জোর ক'রবো না, তবে—

মা আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্ত করিয়া দিয়া তেমনিভাবে বসিয়া রহিলেন।

অমল দ্রুত ভাবিয়া যাইতে লাগিল—জীবনে সে ত কাহাকেও সুখী করিবার পক্ষে একান্তই অযোগ্য। মায়ের ইচ্ছা ও অনুরোধকে এখুনি মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে—যেমন করিয়া অপর্ণারমা একটি কথায় তাহার তাসের ঘর উড়াইয়া দিয়াছিল—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। নিজের জীবনের প্রতি একটা চরম ধিক্কারে তাহার অন্তর বিষাক্ত হইয়াছিল তাই ভাবিল,—যদি পরের জন্যে সে আজ অকিঞ্চিৎকর জীবনের বাসনাকে ত্যাগ করে তবে তাহাতেই বা কি ক্ষতি? মাতা পার্শ্বে বসিয়াই অশ্রুমোচন করিতেছেন—গৌরী তাহারই জন্য মুখ ভার করিয়া বিষাদার্ত্ত চিত্তে দিন গণিতেছে।

অমল কহিল—আজ চাকুরী নেই। গৃহে অন্নের সংস্থান নেই, এই বুভুক্ষু গৃহের মাঝে আর একজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে কি খেতে দেবে মা ?

মা হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন—তোর জ্ঞানবুদ্ধি হবার আগে যে তোর ভাবনা ভেবেছে সেই আজ গৌরীর ভাবনা ভাববে। যে দিন হামাগুড়ি দিয়ে এই উঠানে ঘুরে বেড়াতিস্ সেদিন তোর ভাবনা কে ভেবেছিল ? আজ তুই নতুন ক'রে আমার ভাবনা ভাবছিস্—তাই না ?

অমল চুপ করিয়া রহিল, এ প্রশ্নের বিরুদ্ধে যুক্তি থাকিতে পারে কিন্তু জবাব নাই। স্নেহের গভীরতম প্রকাশের জবাব নাই, তাই অমল চুপ করিয়াই রহিল।

মা আবার বলিলেন—জোর ক'রে কখনই আমি তোকে বিয়ে দেব না। তবে আমার সারা জীবনের ইচ্ছা তোকে জানালাম, তোর যেমন ইচ্ছা করিস্। আমার জীবনের আজ শেষ, তোর আরম্ভ—কাজেই আমার ইচ্ছার আজ কোন মূল্য নাই—

অমল বিচলিত হইয়াছিল। সে প্রশ্ন করিল—গৌরীকে বিয়ে ক'রলে তুমি কি সত্যিই সুখী হবে মা ?

মা বলিলেন—হ্যাঁ। পরকালে যেয়েও এ শান্তিকে আমি ভুলবো না। তোকে কেবলমাত্র গৌরীর হাতে দিয়েই নির্ভাবনা হ'তে পারি, অন্য কোথায়ও রেখে আমার শান্তি নেই।

অমল মরিয়া হইয়া, কোন চিন্তা না করিয়া জবাব দিল—তবে তাই হোক্। তোমার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করাই আমার তৃপ্তি। আমার কাছে এর চেয়ে বড় দেবার আর কিছু নেই—

শ্রাবণের শেষে এক শুক্লা রজনীর কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত নিশীথে অমলের সহিত গৌরীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রচুর অর্থ ও বস্তুর অপচয় এবং অকারণ আড়ম্বরের মাঝে।

আজ ফুলশয্যার রাত্রি। ভিজা গাছের ফাঁকে শুভ্র জোছনা উঠানে, গৃহে, অমলের ফুল-সুরভিত শয্যায় আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানের ভিজা পাতা হইতে একটা প্রথম যৌবনের মত চাপা উত্তপ্ত তৃষ্ণা যেন রহিয়া রহিয়া বাতাসে দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিতেছে। আকাশের গায়ে শুভ্র, ধূসর, কালো নানা অবয়বের মেঘমালা পাল তুলিয়া চলিয়াছে—দূরের পানে।

উৎসব বাড়ীতে কর্ম্মকোলাহল প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। পাড়ার এয়োস্ত্রীগণ মাঙ্গলিক আচার শেষ করিয়া বর-বধূকে ফুলশয্যায় রাখিয়া গিয়াছে। চারি পাশে গভীর নিশীথের একটা স্তব্ধতা রহিয়া রহিয়া শঙ্কিত শব্দে যেন ধরিত্রীর হৃদ্‌কম্পন অনুভব করিতেছে—

অমল শয়নগৃহে একটা চেয়ারে বসিয়া, আলোটা সাম্‌নে রাখিয়া অনির্দ্দিষ্ট, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ভাবনার মাঝে সমাহিত হইয়া ছিল। পার্শ্বেই শুভ্র মাল্যে শোভিত শয্যায় এক রঙীণ কাপড় পরিয়া অবগুণ্ঠিতা গৌরী নির্জীব জড় পদার্থের মত স্পন্দনহীন দেহ এলাইয়া শুইয়া আছে। অমল সেদিকে চাহিয়া দেখে নাই।

মাতা উঠান হইতে আদেশ করিলেন—অমল, ক'দিন ঘুমোস্ নি। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়। শরীর খারাপ ক'রবে।

অমল আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল—অবগুণ্ঠিতা গৌরীর পাশেই। পূবের জানালা দিয়া মেঘাবগুণ্ঠিত চাঁদের ম্লান আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিফলিত আলোকে গৌরীকে দেখা যায়। আত্মীয়পরিজনহীন বাড়ীখানি নীরব—

অমল ভাবিতেছিল—অপর্ণাকে লইয়া বালিগঞ্জের একখানা বাগান বেষ্টিত বাড়ীতে গৃহ রচনা করিবে কিন্তু আজ সে কোথায় ? আজকার দিনে সেও হয়ত এমনি স্বামী পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহারই কথা ভাবিয়া চলিয়াছে—না হয় পিতৃগৃহে একাকী শয্যায় পড়িয়া অতীতের সঞ্চিত স্মৃতি গণিয়া গণিয়া মনের নিভৃত কোণে সঞ্চয় করিতেছে। সে যেমন আজ জীবনের ঘনিষ্ঠতম, নিকটতম, প্রিয়তম সঙ্গীর সঙ্গে বৃহত্তর আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে চলিয়াছে, সেও হয়ত তেমনি করিবে—হয়ত করিবে না। হয়ত দু'দিনের ব্যসন বিলাসকে ভুলিয়া জীবনের সঙ্গে নূতন উদ্যমে চলিবে—

……আর গৌরী! শয্যার একাংশ অধিকার করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে হয়ত তাহারই সম্বোধনের জন্য, দুর্ব্বলতম আহ্বানের জন্য অধীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ও জগতে সম্পূর্ণ নিরপরাধা, বৎসরাধিক নীরব করুণ চাহনিতে কি চাহিয়াছে তাহা সেই জানে—হৃদয়ের মাঝে নিভৃত

কোণে হয়ত তাহারই মন্দির রচনা করিয়াছে। ওই কোমল, সুন্দর পবিত্র সহিষ্ণু নারীকে অসুখী করিবার মাঝে, তাহাকে বঞ্চিত করিবার মাঝে কোনো পৌরুষ নাই, কোন বীরত্ব নাই।

গৌরীর হাতের সোনার চুড়িগুলি জ্যোৎস্নালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। সে হাতখানাকে ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিল—গৌরী এদিকে এসো—

গৌরী নড়িল না। অমলের হাতখানার মাঝে গৌরীর কোমল শুভ্র হাতখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—সেখানাকে ছিনাইয়া লইবার শক্তি তাহার নাই। অমল মৃদু আকর্ষণে গৌরীকে বুকের অতি সন্নিকটে টানিয়া আনিল—তাহার বুকের মাঝে গৌরীর ভীরু অন্তরের দুরু দুরু শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে—উন্মোচিত অবগুণ্ঠন, গৌরীর অনাবৃত অসাড় মুখখানি জ্যোৎস্নালোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—

অমল ভাবিতেছিল—বালিগঞ্জের পার্কে জ্যোৎস্নালোকিত অপর্ণার সেই মুখখানির কথা—সে অতুল সৌন্দর্য্য তাহার অন্তরকে কি দুর্নিবার আকর্ষণেই না টানিতেছিল—কিন্তু তাহার উপরে ওষ্ঠ সংস্থাপিত করিয়া হৃদয়ের সুধা নিঃশেষে পান করিবার তৃষ্ণা তাহার মিটে নাই। সে পিপাসা বুকে লইয়া ফিরিয়াছে আজ নূতন লোকে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ-কল্পে। অমল ধীরে নিঃশব্দে সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত মুখখানাকে একটি চুমায় আরক্ত করিয়া দিল।

কম্পমান চকিত গৌরী জানিল না আজ সে যে চুম্বন তাহার দেহে লাভ করিয়াছে তাহা অন্তরের প্রান্ত দিয়া লুকাইয়া বালিগঞ্জ পার্কের জ্যোৎস্না-স্নাত আর একটি ওষ্ঠের উপর পড়িয়া তাহাকে কত বড় প্রবঞ্চনা করিয়াছে!

অমল অকস্মাৎ থামিয়া গেল—জীবনের প্রথম ব্যভিচারের অনুশোচনায়, আপনার নীচতায়, প্রবঞ্চনায়, একটা অপরিসীম লজ্জায় সে সঙ্কুচিত হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ক্ষরিত উত্তপ্ত অশ্রু উৎসারিত করিয়া মনে মনে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এই মানব হৃদয়! এই প্রেম! এই জীবন! আজ এমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পার্শ্বে থাকিলে হয়ত তাহার ব্যভিচারী অন্তর গৌরীর ওষ্ঠ বারবার গোপন চুম্বনে রাঙাইয়া তুলিত। সমগ্র জীবনে এই ব্যভিচারের অভিশাপ বহ্নিশিখার মত পরিব্যাপ্ত হইয়া মানুষের অন্তরকে অতৃপ্তির অনলে পোড়াইয়া অঙ্গার করিয়া তুলিয়াছে। তার অহঙ্কার নিষ্ফল—একেবারেই নিষ্ফল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রায় সাত বৎসর পরের কথা।

অপর্ণা ফার্ষ্ট ক্লাস পাইয়াছিল, কিন্তু অমল পায় নাই; সুতরাং প্রফেসারী চাকুরী তাহার জুটে নাই। বর্ত্তমানে এক সওদাগরী আফিসে সে চাকরী করে, বেতন আশি টাকা। অজিতবাবুর সহিত অপর্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অমল ও তাহার জীবনের যোগসূত্রও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। গৌরী আজ অমলের গৃহবধূ—তাহাদের একটি ছেলে—বয়স বছর চারেক হইবে। নাম সাধারণ—খোকা। অমল কবিতা লেখা ছাড়িয়া মাঝে মাঝে গল্প লিখে, কারণ তাহাতেই কিছু পাওয়া যায়। তাহার মা আজিও বাঁচিয়া আছেন—গৌরীর হাতে নিজ পুত্রকে দিয়া প্রস্থান করিতে পারেন নাই।

কয়েকদিন মাত্র হইল অমল নতুন বাসায় উঠিয়া আসিয়াছে—বাসা ভাল বলিয়া নয়, ভাড়া কম বলিয়া।

বড় একটা বাড়ীর ছায়ায়, কলিকাতা শহরের একটী নগণ্য গলিতে অমলের এই বাসা। দু'খানি ঘর একতলায়। বাড়ীটী একতলা তাই আলো বাতাস কিছু আছে, একটু বাঁধানো উঠান—তাহার এক পাশে একখানা ছোট টালির চালায় রান্নাঘর—পাশে কল, চৌবাচ্চা। অমলের কবি-মন নিরস উঠানের এক কোণে টবে করিয়া কয়েকটী ফুলগাছ করিয়াছে—তাহার পাশেই পাশের বড় বাড়ীখানার ভাঙা কাঁচকণ্টকিত বিরাট প্রাচীর। তার পরে ওই বাড়ী, আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়া ছোট বাড়ীখানার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ও বাড়ীর ঝুল বারান্দায় দাঁড়াইলে, এ বাড়ীর ভিতরে প্রায় সবই দেখা যায়, কিন্তু এ বাড়ী থেকে ও বাড়ীর ওই বারান্দা আর রঙীণ পর্দ্দার ঝটপটি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। এক ঘরে মা ও তাহার পূজার সরঞ্জাম প্রভৃতি থাকে, অন্য ঘর অমলের বাস-গৃহ। ঘরের সামনের বারান্দাটা খোকার ক্রীড়াঙ্গন, ভাঙ্গা ঘোড়া, লাঠি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি নানা মহার্ঘ বস্তু সেথায় ক্রমাগতই সঞ্চিত হইয়া উঠে। খোকা কখনও নগ্ন অবস্থায়

কখনও ইজের পরিয়া সমস্ত উঠান পরিক্রমা করিয়া বেড়ায় এবং ফাঁক পাইলে সদর দরজা পার হইয়া রাস্তায় চলিয়া যায় এবং বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়া যাহা কিছু দেখে তাহাতেই অপূর্ব্ব আনন্দ প্রকাশ করে।

সেদিন শনিবার। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, কলিকাতায় তখনও শীত পড়ে নাই। কিন্তু উত্তরের বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। অমলের ফিরিবার সময় হইয়াছে তাই গৌরী সদর দরজায় কান রাখিয়া কি যেন একটা সেলাই করিতেছিল। ঘন ঘন কড়ার শব্দ হইতেই সে উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল—অমলের কড়া নাড়িবার সুর তাহার কাছে পরিচিত—

অমল বাজার হইতে কিছু ফুলকফি প্রভৃতি তরকারী ও মাংস কিনিয়াছিল—বড় রুমালের পোঁটলাটা নাটকীয় ভঙ্গিতে গৌরীর মুখের নিকটে তুলিয়া ধরিয়া অমল আধুনিক সিনেমা-সঙ্গীতের সুরে মৃদু কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—তোমার তরে এনেছি বহি হিয়া, তুমি নিলে না প্রিয়া—

গৌরী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—তোমার লজ্জা সরম হ'ল না? মা শুন্‌লে কি ভাববেন বল ত? ছেলেটাও ত রয়েছে—

খোকা মায়ের পিছনে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে হাসিতেছিল যেন সেও পিতার রসিকতাটা বেশ উপভোগ করিয়াছে। গৌরী তাহাকে সাম্‌নে আনিয়া কহিল—তোমার কাণ্ড দেখে খোকাও হাস্‌ছে—

—তোমার ছেলে ত, একটু অকালেই রসবোধ জন্মেছে—

গৌরী জবাব দিল—পৈতৃক ধারা ত পাওয়া চাই।

মাতা কহিলেন—অমল নাকি রে?

অমল দ্রুত সংযত হইয়া কহিল—হ্যাঁ মা। ফুলকফি আর মাংস এনেছি মা।

—বেশ, কিন্তু এত দেরী ক'রলি কেন?

—ওই বাজারেই একটু দেরী হল। তোমার সাধের বৌমা যা মাংস রাঁধেন তা'ত খাওয়াই যায় না—আজ মাংস রেঁধে একবার দেখিয়ে দিতে হবে—

মাতা কথা কহিলেন না—এ দাম্পত্য কলহকে মনে মনে তিনি উপভোগ করিতেন। কিন্তু গৌরী তাহাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—রাঁধুক মা আজ, আপনি কিন্তু দেখিয়ে দিতে পারবেন না।

মা হাসিয়া কহিলেন—আচ্ছা।

অমল যথেষ্ট বীরত্ব সহকারে বারান্দায় মাংস রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গৌরী তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া ফাই-ফরমাজ খাটিতেছে—মসলা বাটা, তরকারী কুটিয়া দেওয়া, তোলা উনুনে আঁচ দেওয়া প্রভৃতি এবং পুত্র খোকা সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়া কখনও শিল হইতে পেষা মসলা চুরি করিয়া তাহার নারিকেলের মালায় সঞ্চিত করিতেছে, কখনও মাতার চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে এবং গৌরীর ধমক খাইয়া শান্ত চিত্তে ভাঙ্গা ঘোড়াকে জোড়া দিতে মনোযোগ দিতেছে।

গৌরী কার্য্যান্তরে গিয়াছে, অমল মাংস সিদ্ধ হইতে দিয়া হয়ত একটু ঘরে যাইবে তাই খোকাকে বলিল—এ দিকে আসিস্ নে খোকা, ওখানে বসে খেলা কর—

অমল চলিয়া গেল, খোকা হৃষ্ট মনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখে কেহ কোথাও নাই, কেবল দূরের বড় বাড়ীটার বারান্দায় কে যেন বসিয়া বই পড়িতেছে। খোকা উনুনের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে ভাবিল, কিরূপে শ্রদ্ধেয় পিতাকে সে সাহায্য করিতে পারে। বুদ্ধির অভাব ছিল না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পিতাকে সে ঘটি হইতে জল ঢালিয়া দিতে দেখিয়াছিল, সে সংক্ষেপে এবং সত্বর বাকীজলটুকু কড়াইতে ঢালিয়া দিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই—দূরের সেই লোকটি তাহার দিকে চাহিয়া কেবল হাসিতেছে। সেও সগর্ব্বে নিজ কর্ম্মের পৌরুষে একটু হাসিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল—

অমল ফিরিয়া দেখে ঝোল ত আদৌ কমে নাই বরং কড়াই পরিপূর্ণ হইয়া ফুটন্ত ঝোল নীরব হইয়াছে। অমল ডাকিল—মা এ দিকে এস, শিগ্‌গির—

মাতা আসিলেন। অমল অভিযোগ করিল—এই ছাখো, আড়ি করে কত জল দিয়ে গেছে তোমার বৌমা।

মাতা অবিশ্বাস করিয়া কহিলেন—গৌরী ত পাগল নয় যে, জল ঢেলে দেবে।

—না, তোমার বৌএর কি আর দোষ হতে পারে ?

গৌরী আসিয়া দেখিল, আশ্চর্য্যও হইল—কিন্তু অমলের গাম্ভীর্য্য ও বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। অমল কহিল—দেখ, আবার হাস্‌ছে—

মা তবুও অবিশ্বাস করিলেন। অমল পুত্রকে প্রশ্ন করিল—খোকা তোর মা জল দিয়েছে কড়াইতে—না ?

খোকা গম্ভীরভাবে কহিল—হ্যাঁ।

মাতা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—খোকা, ঘটি নিয়েছিলি ?

—হুঁ।

—এর ভেতরের জল কি হ'ল ?

—জল ? খোকা উঠিয়া আসিয়া কড়াইটা দেখাইয়া কহিল—এখানে দিলুম।

গৌরী হাসিয়া উঠিল। মা হাসিলেন, অমলও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—বংশ পরম্পরায় আমার কল্যাণে লেগেছ—ও মাংস কি আর খাওয়া যাবে ?

গৌরী টিপ্পনি করিল—উঠান বাঁকা কিনা! (ক্রমশঃ)

আজাদ হিন্দ সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

খৃষ্ট অব্দ ১৭৫৭এ ভারতবর্ষের কালরাত্রির আরম্ভ। ভারতবাসী কাল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নরপতির বিলোপ ঘটাইয়া বাঙ্গালী খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছিল। প্রায় দুইশত বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালী সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ; তথাপি, প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে অথবা পাপ খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাপাপের শাস্তিও মহাদণ্ড !

একশত বর্ষ পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জনজাগরণের প্রাথমিক সূচনা দেখা গিয়াছিল। ১৮৫৭ সালে জনবিক্ষোভের সূত্রপাত। বৃটিশের ভাগ্য বিপর্য্যয়েরও তখনই আরম্ভ।

তাহার পর হইতে, ভারতের অস্তমিত ভাগ্যরবি পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টায় বিরত হয় নাই। ১৮৫৭ অব্দের কাহিনী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের নামে শীতল শোণিত আজও উষ্ণ হয়। ১৯৪২ অব্দও স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিল। আমাদের সৌভাগ্য, খৃষ্টীয় অব্দ ১৯৪২কে আমরা চাক্ষুষ করিতে পারিয়াছি। ১৯৪২এ ভারতের ভিতরে ও বাহিরে যে জন যজ্ঞারম্ভ হইয়াছে, তাহার পূর্ণাহুতি কবে হইবে জানি না, আবার শতবর্ষ, ১৯৫৭ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কি না তাহাও বলিতে পারি না ; তবে যেদিনই সে-দিন হোক না কেন, যজ্ঞান্তে, ১৭৫৭এর প্রায়শ্চিত্ত যে হইবেই, স্থলে জলে অনলে অনিলে অন্তরে বাহিরে দিব্যাক্ষরে তাহা লিখিত থাকিতে দেখা যাইতেছে। ১৯৪২এর আগষ্ট মাসে ভারতের অভ্যন্তরে যে স্মরণীয় শুভক্ষণে "কুইট্ ইণ্ডিয়া" ধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছিল, ভারত সীমান্তের পারেও সেই দিনই কে-জানে কোন্ কুহক মন্ত্রে সেই "কুইট ইণ্ডিয়া" ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি ভীম গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল।

এই সাদৃশ্য, এই সামঞ্জস্য, এই ঐক্যতানবাদিত সামগান একই সময়ে বহু দূর দূরান্তে মহাসমুদ্র-ব্যবধানে সুদূর ভূখণ্ডে সম্ভব হইল কেমন করিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা আমি করিব না ; কারণ, প্রয়োজনেরও অভাব বটে, বাহুল্যও বটে ! আমি কেবল এই কথা বলিব যে মনুষ্যের অগোচরে বোধ করি বা অন্তরীক্ষে বসিয়া যিনি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন —বিশ্বের জড় ও জীবের ভাগ্য চিরদিন যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহারই ইঙ্গিতে, ভারতের ভিতরে ও বাহিরে পরাধীনতার লৌহ-নিগড় ছিন্ন করিবার উদগ্র বাসনা একই সময়ে—একই মাহেন্দ্রক্ষণে পরাধীন ভারতবাসীকে "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

অসম্ভব সম্ভব নহে ত কি ? ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে জাতীয় মহাসভার কর্ম্মপরিষদ "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়াছিলেন। কাগজের-কলমের কালী শুষ্ক হইল-কি-হইল না, ৮ই আগষ্ট নিশান্তের পূর্ব্বেই জাতীয় সমিতির লোকজন পোঁটলীপুটলীসহ, মায় গান্ধীজী পর্য্যন্ত, অজ্ঞাত স্থানে চালান হইলেন। অহিংসাব্রতধারী মানুষ কয়জন, গো-চারণের গাভীদল যেমন যষ্টিহস্ত গোপবালকের অগ্রে অগ্রে নিঃশব্দে চলে, সেইরূপ চলিতে চলিতে গো-শালায় প্রবেশ করিলেন ; ঝাঁপ বন্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না। কথায় কথায় সংযোগ ছিন্ন নহে, প্রকৃত পক্ষে সকল সংযোগই বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু "কুইট্ ইণ্ডিয়া"র গতি রোধ করিতে পারা গেল না ; শব্দ ব্রহ্ম—শব্দময় ব্রহ্মাণ্ডের বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে জানিত যে শব্দও বিপ্লবের বিষবাষ্পে ভরা ছিল !—অনতিবিলম্বে বায়ুমণ্ডলও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। আমেরিকার (আমেরিকার ত ? না, চোরের ধন বাটপাড়ে মারিল ?) এ্যাটম্ বম্ব তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই ; বিশ্বযুদ্ধের রথী মহারথীগণ তখনও তাহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। কিন্তু অহিংসার যজ্ঞকুণ্ডোত্থিত "কুইট্ ইণ্ডিয়া" শব্দমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষ কাঁপাইয়া দিল।

আমেরিকার এ্যাটম্ বম্ব (আবার একবার জিজ্ঞাসা করি, এ্যাটম্ বম্ব

আমেরিকার বটে ত ?) জাপানের মাত্র দুইটি নগরীর উপরে বর্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে সাতদিন মধ্যে ছয় বৎসরের পুরাতন ও জটিল মহাব্যাধি—বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। কুইট ইণ্ডিয়া বন্ধের ইতিবৃত্ত আজও লিখিত হয় নাই। এই বম্ব কোথায় কোথায় পড়িয়াছিল তাহার বিবরণ আজও অপরিজ্ঞাত। যে বিন্দু পরিমাণ সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে বিক্রমে, ইহাকে আঁটিয়া উঠিতে বিশ্বযুদ্ধজয়ী (জয়ী ত বটেই !) বৃটিশকেও নাজেহাল হইতে হইয়াছিল। ভারতের ভিতরে—বোম্বাই প্রদেশের সাতারা, বাঙ্গালার মেদিনীপুর, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া, মাদ্রাজের রাজমাহেন্দ্রী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষে ইতিহাস পূজিত হয়। এই ইতিহাসও পূজা পাইবে।

আর ভারতের বাহিরে, দক্ষিণ পূর্ব্ব-এসিয়া খণ্ডে, "কুইট ইণ্ডিয়া"র প্রতিধ্বনি স্থাবর জঙ্গম বিকম্পিত করিয়া দিয়াছিল। ভারত-অভ্যন্তরে নিঃস্ব, নিরস্ত্র, নিঃসহায়ের নির্ঘোষ ; আর বাহিরে, অস্ত্রের ঝন্ঝনাৎকার। শ্রাদ্ধ বাড়ীর অন্তঃপুরাঙ্গনে কীর্ত্তনের খোল করতালের ঝঙ্কার ; আর বহিরঙ্গনে অগ্রদানী রেয়োভাটের কলহ-কোলাহল।

১৯৪২ ও পরবর্ত্তীকালের ঘটনাবলীকে বিদ্রোহ ও বিপ্লব আখ্যায় অভিহিত করিলেও তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। ১৯৪২এর পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে—সেদিনের খুব বেশী বিলম্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না—তখন দেখা যাইবে যে এই সময়কার বিপ্লব বা বিদ্রোহ যাঁহারা ঘটাইয়াছিলেন, আর্ট ফর আর্টস্ সেক্, বিদ্রোহের জন্যই বিদ্রোহ, বিপ্লবের খাতিরেই বিপ্লব, ভাঙ্গার উদ্দেশ্যেই ভাঙ্গা, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। ভারত ভিতরে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, ডু অর ডাই—করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে ; আর, ভারতের বাহিরে যাঁহারা কুইট ইণ্ডিয়া সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের যিনি নেতা, তাঁহার বাণী ছিল, তোমরা শোণিত দাও, আমি স্বাধীনতা দিব। দেখা যাইতেছে, কথা দু'টির মধ্যেও অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে। করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে স্বতঃই অনুমিত হয় একটা কিছু করিবার বা গড়িবার ইচ্ছা ছিল। কি করিবার বা কি গড়িবার বাসনা ছিল, তাহা ব্যক্ত হইতে পারে নাই। কারণ, আগেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের কালী না শুকাইতেই লর্ড লিংলিথগো "রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে" করিয়াছিলেন। লর্ড মহোদয় করিৎ-কর্ম্মা ও ত্বরিত-গতি লোক, আজই, এখনই যাহা করা যাইতে পারে কাল বা একটু পরের জন্য রাখিয়া দিবার ধৈর্য্য তাঁহার ছিল না।

তথাপি মনে হয়, গান্ধীজীর মনের মণি-কোঠায় কি বাসনা, পুষ্প-কোরকে রেণুর মত রত্নাকর-গর্ভে রত্নরাজির মত সঙ্গোপনে বসতি করিতেছিল তাহার সম্যক গবেষণা আজ যদি না'ও হইয়া থাকে, একদিন তাহা হইবে ; সেদিনও কি খুব দূরে ? নিশ্চয়ই না। আজীবন সত্যাশ্রয়ী, নিঃসংশয়িতরূপে শান্তিকামী, অহিংসাব্রতচারী মানুষটি কোন্ কাজ করিয়া মরিতে চাহিয়াছিলেন (করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে), অনুসন্ধিৎসু ভারত একদিন তাহা বাহির করিবেই। সেই ত ভারতের বৈশিষ্ট্য। অতীতের বর্ণসূত্রে ভারত চিরদিন আবদ্ধ। ভারতের মহান বর্ত্তমান যে মহীয়ান অতীতের পটভূমিকাতেই পরিস্ফুট, ভারতবাসীর তাহা অজ্ঞাত নহে।

'গরুর পাল' পুণা ও আমেদনগরের 'গোশালায়' আশ্রয় প্রাপ্ত হইবার পরে দেশময় যে সকল অনাচার ও অত্যাচারমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সকল কার্য্য কি গান্ধীজীর করেঙ্গে-র অন্তর্ভুক্ত ? বিশ্বাস করা কঠিন। দিকে দিকে টেলিগ্রাফের তার কাটা গেল, রেলের লাইন উপাড়িয়া ফেলিল, ডাকঘর পুড়িল, নির্দ্দোষ নিরপরাধ মরিল, থানা জ্বলিল—এই সকল কাজ করিয়া মরেঙ্গে—মরিতে বলা বা মরা কি গান্ধীজীর অভিপ্রেত ছিল ? মনে ত হয় না। বরং মনে হয়, সাতারার পত্রী সরকার, মেদিনীপুরের গ্রাম-রাজ ও ভারতের বাহিরে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই ঐ করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের মধ্যে বাসনা অন্তর্নিহিত ও অব্যক্ত ছিল।

বিদ্রোহ, আমরা অনেকগুলি দেখিয়াছি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্রোহ পরিচালিত হইতে দেখা গিয়াছে। তাহার পশ্চাতে করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের উচ্চাদর্শ ছিল কি ? বড় জোর, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই," ঐ পর্য্যন্ত। বাঙ্গলার অগ্নিযুগও দেখিয়াছি। 'আনন্দ মঠের' খণ্ড অনুকরণে কতকগুলা হত্যা ও লুণ্ঠন। দেশময় আতঙ্কের সৃষ্টি ছাড়া, কৈ, করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের মত সর্ব্বত্যাগের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেও ত দেখি নাই। ১৯১৯ হইতে দফায় দফায় সমুদ্রোচ্ছাসের মত কত আন্দোলনই ত আসিল—রাউলাট বিদ্রোহ, খিলাফৎ আন্দোলন, ডাণ্ডী মার্চ্চ, লবণ সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য—এমন আরও কত আন্দোলন আসিল, দেশ ওলট পালট করিতে চাহিল ; লাখে লাখে লোক জেলে গেল, হাজার হাজার লোক মরিল, শতকে শতকে সর্ব্বস্বান্ত হইল—কিন্তু কৈ, সাতারার মত জেলা শাসন, মেদিনীপুরের মত গ্রাম রাজ, আজাদ হিন্দ সরকারের মত স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা ত শুনা যায় নাই। যাঁহারা নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন, তাঁহারা অবশ্যই সাতারার পত্রী সরকার, মেদিনীপুরের গ্রাম রাজ ও সুভাষের আজাদ হিন্দ সরকারের আংশিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন এবং ইহাও তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইংরাজের রক্ত চক্ষু, অলিতে গলিতে সেন্সর, কঠিন আদেশ, সমুদ্যত দণ্ড সত্ত্বেও যতটুকু খবর বাহির হইতে পারিয়াছে তাহাতেই জাগ্রত ভারতের অনমনীয় দৃঢ়তা, অজ্ঞাতপূর্ব্ব সঙ্ঘবদ্ধতা, কল্পনাতীত সংগঠনকুশলতা দেদীপ্যমান হইয়াছিল। বৃটিশের অপরিমেয় পশুবল—অপরিসীম ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল, ছল্-বল-কৌশল অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়াই ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ভারতবাসী উন্নতশির স্ফীতবক্ষ অচঞ্চল পদবিক্ষেপে তাহার কুইট্ ইণ্ডিয়া অভিযান অকুতোভয়ে পরিচালিত করিয়াছিল। তাহার মুখে, তাহার চোখে, তাহার বুকে লিখিয়া রাখিয়াছিল, করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে।

স্রোত-হারা তটিনীর মত, ভারতের গণ-সরকার ও জন-রাজ আজ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ; দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডের আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টও অবলুপ্ত, কিন্তু মহাযের প্রেতাত্মার মত তাহাদের ছায়া-দেহ আজও

ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে স্থলে জলে প্রান্তরে কান্তারে অণুতে পরমাণুতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে জয় হিন্দ হাঁকিয়া ফিরিতেছে। মানুষ আজ এক ভাষায় কথা কহে ; এক ভাবধারায় চিন্তা করে ; আজ তাহার এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য ; আজ তাহার কামনা বাসনা সাধ অভিলাষ—করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে। ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, মিশরে, পারস্তে, ইরাণে, পালেষ্টাইনে করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গেরই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। কলিকাতার রাজপথে—ধর্মতলা ষ্ট্রিটে, বোম্বাইয়ের জাহাজ ঘাটে, জব্বলপুরের শস্ত্রাগারে—আর কত নামই বা করিব ?—সর্ব্বত্রই ঐ করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে জয় হিন্দ রবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাস্তব-অবিশ্বাসী এতদুভয়ে সংযোগ দেখিতে পায় না ; কিন্তু চক্ষুষ্মান বাস্তববাদীর সে ভ্রম হইবার নহে। আজিকার ভারতবর্ষে, "জয় হিন্দ" শীতলশোণিত মুমূর্ষুকেও উজ্জীবিত, উদ্দীপ্ত করে। হারাধন প্রাপ্তিতে জননীর যে আনন্দ, "জয় হিন্দ" ধ্বনিতে ভারতবাসীর আজ সেই আনন্দ ; সে যেন তাহার হারানিধি অমূল্য সম্পৎ ফিরিয়া পাইয়াছে। বন্দেমাতরমে যেটুকু ফাঁক ছিল, জয় হিন্দ তাহা ভরিয়া দিয়াছে।

১৯২৯ হইতে ১৯৩৩ বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি, বিহারের ভূমিকম্পের মত মাথা নাড়া দিয়াছিল। দাম্ভিক বৃটিশ, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধীশ্বর বৃটিশের সম্রাটের প্রবল প্রতাপ প্রতিনিধিকেও দীন-দরিদ্র ভারতের এক অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকিরের সহিত একাসনে বসিয়া একই কাগজখণ্ডে লিখিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর দান করিতে হইয়াছিল। কলমও এক কি-না তাহা অবশ্য জানা যায় নাই, তবে এক হওয়াই সম্ভব। সেদিনের কথা আজও আমাদের মনে আছে। বিলাতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স আহ্বান করিয়া অধীন ও অবনত ভারতের সঙ্গে বুঝা পড়া করিতে হইয়াছিল। কৌপীন-সম্বল ফকিরের যাত্রায় বিলম্ব হয়, বৃটিশ সিমলা শৈল হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেণ ছুটাইয়াছিল। বোম্বাইয়ে জাহাজকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। লণ্ডনের রাস্তার আইন কানুন টেমস্ নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া এই অর্দ্ধ-উলঙ্গ ফকিরের সুবিধা করিয়া দিতে পথ পায় নাই। ফকিরের মোটরের অগ্রে অগ্রে ফায়ার ব্রিগেড ঘণ্টা বাজাইয়া রাস্তা সাফ্ রাখিত। বৃটিশ জানিত, ঐ ফকিরই করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে—করিতেও পারে, মরিতেও পারে। আবার, রাখিলেও রাখিতে পারে, মারিলেও মারিতে পারে।

১৯৪৬ সালে আর লণ্ডনে কনফারেন্স নহে। সম্ভব হইলে খাস্ পার্লিয়ামেণ্টও ভারতে আসিয়া হাজির হইত। তাহার প্রয়োজন হয় নাই। গন্ধমাদন আসিয়াছে, বিশল্যকরণী আহরণ করিয়া লইতে পারা যাইবে। গরজ বড় বালাই ! 'বদনে রদন নড়ে ওদনে বঞ্চিত' ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স দুই মাসাধিককাল এই গরমে, ফুটি-ফাটা আম-পাকা জাম-পাকা কাঁঠাল-পাকা গ্রীষ্মে উত্তপ্ত প্রস্তর দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। বড়ই "মদেক সদয়েষু" ভাব। 'সবিনয় বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারমিদং কার্য্যঞ্চাগে' মুখবন্ধ করিয়া আলাপ (প্রলাপ ?)ও আলোচনা চালাইতেছেন। থিয়েটারের বিরহিনী নারীর গীতি গীত হইতে শুনা যাইতেছে—

"আমি বিলাইতে চাই আমারে।"

চাকা যে ঘুরিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যুদ্ধকালের বৃটেনের ভাগ্য-নিয়ামক বুল-ডগানন উইনষ্টন চার্চ্চিল বাঁধা দাঁতে মোটা চুরুট ধৃত করিয়া যেদিন দম্ভভরে ও সদর্পে বিঘোষিত করিয়াছিলেন যে "বৃটিশ মহা-সাম্রাজ্যের নীলাম-বিক্রয়ে ঘণ্টাধ্বনি করিবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই" এবং "বৃটিশের যাহা আছে, চিরদিনই তাহা থাকিবে" সেইদিন, অন্যে না জানিলেও, অন্যের জানিবার সুযোগ না থাকিলেও, তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না যে পদ্মা নদীর পাড় ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছে এবং পদ্মার ভাঙ্গন্ এমন নহে, ভাঙ্গন্ একবার সুরু হইলে শেষ যে কোথায় তাহা জানাও যেমন সম্ভব নহে, কল্পনা করাও তেমনই অসম্ভব। হিটলার-মুসোলিনী-তোজো এক পক্ষে, চার্চ্চিল-রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন অন্য পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে যখন নরমেধযজ্ঞানুষ্ঠিত করিতেছিলেন তখন আমাদের জানা না থাকিলেও, ইংলণ্ডে চার্চ্চিল ও ভারতে লিংলিথগোর নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না যে নীলামের ইস্তাহার প্রস্তুত ; ঘণ্টা বাজিতে যেটুকু বিলম্ব।

ঘণ্টা বাজিতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। বিশ্বরণতাণ্ডবের যখন অবসান ঘটিল, নীলামের ঘণ্টা তখনই ঘোররবে বাজিয়া উঠিল। তাহার পূর্ব্বেকার, অর্থাৎ যুদ্ধকালীন ঘটনা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন আছে।

বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ ; ততোহধিক বিচিত্র প্রবৃত্তি আমাদের এই ভারতের অধিবাসীর। পরাধীনতার বেদনা, লাঞ্ছনা, গ্লানি, অপমান, নির্য্যাতন ও নিপীড়ন ম্যালেরিয়ার পালা জ্বর, দুর্ভিক্ষের অল্পাহার, অর্দ্ধাহার, অনাহারের মত নিতান্তই গা-সহা হইয়া গিয়াছে। বিশ্বের মানব-জাতি যখন স্ব স্ব দেশের স্ব স্ব জাতির স্বাধীনতা রক্ষণে, স্বাধিকার সংরক্ষণে, এমন কি অধিকার সম্প্রসারণে জীবনমরণ সংগ্রামে প্রমত্ত, আমার দেশ ভারতবর্ষের নরনারীও স্বাধীনতা অর্জ্জন মানসে "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্রে মাতিয়াছে, ভারতের বাহিরেও "দিল্লী চলো" হুঙ্কারিতেছে, সেই সময়েও বিচিত্র-এই-দেশ ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর মনুষ্য ইংলণ্ডের চার্চ্চিল-আমেরীর দয়াদাক্ষিণ্যের দরগার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করতঃ নিষ্ক্রিয় স্থাণুবৎ অবস্থান করাই গৌরব বোধ করিলেন। শুধু কি তাহাই ? এই আনবিক রশ্মির যুগেও মধ্যযুগীয় ধর্ম্মগত, সম্প্রদায়গত, অবগুণ্ঠপ্রায় ভোঁতা অস্ত্রের সন্ধান করিয়া কলহানলে সমিধ্ নিক্ষেপ করিতেও লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করিলেন না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা বিরাট শক্তিশালী অংশের, দর্শকের ভূমিকা অভিনয়েই কালাতিবাহিত হইল। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ !

(ক্রমশঃ)

গীতায় কৃপাবাদ

শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

শ্রীভগবানের কৃপার সীমা নাই। তিনি কৃপাসিন্ধু, যাহার একবিন্দু পাইলে জীব নশ্বর-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। এহেন অমূল্যনিধি কে না চায়? কিন্তু ইহা পাইবার উপায় কি? এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল বলেন শ্রীভগবানের কৃপা পাইতে হইলে আমাদের কিছুই করণীয় নাই, ইহা অহেতুকী, অর্থাৎ ইহা কোন কারণ সাপেক্ষ নহে। সুকৃত দুষ্কৃত নির্বিশেষে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি কৃপা করেন। কৃপাক্ষেত্রে কখনই ভাল মন্দ বিচার করেন না। নিজের পুরুষকার দ্বারা কেহ কখনও তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারে নাই ও পারে না। ইহা সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কাজে আমাদের কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। এই শ্রেণীর লোককে অতঃপর আমরা কৃপাবাদী নামে অভিহিত করিব।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ঐ মত একেবারেই অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, যে কৃপার কণিকামাত্র পাইলে জীব চিরতরে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহা কখনও বিনামূল্যে বিতরিত হইতে পারে না বা অযাচিত ভাবে দানের বস্তু নহে। উহা পাইতে হইলে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া অর্থাৎ আমাদের যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করা প্রয়োজন এবং যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও উহা উপযুক্ত মূল্য হইল না মনে করিয়া ভক্ত কাতর কণ্ঠে বলিয়া থাকে, প্রভু আমি অতি অধম, আমার কোন ক্ষমতা বা গুণ নাই; নিজ গুণে আমায় কৃপা করো। ইহাকে কি অহৈতুকী কৃপা বলা হইবে, না ইহা প্রকৃত ভক্তের বিনয়োক্তি মাত্র? তাঁহারা বলেন কৃপা কখনও অহৈতুকী হইতে পারে না। ভক্তি বরং অহৈতুকী হইলেও হইতে পারে, যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তি, কিন্তু কৃপা কখনই অহৈতুকী হইতে পারে না।

কৃপাবাদীরা তাঁহাদের মতের সমর্থনে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, জীবজগত রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান যে সমস্ত বস্তু দান করিয়াছেন যথা—জল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ, ফল, মূল প্রভৃতি জীবের আত্ম-বস্তু, সে সমস্ত সম্বন্ধে সাধু অসাধু ভাল মন্দ বিচার করেন নাই, ভাল মন্দ নির্বিশেষে সকলেই তুল্য রূপে উহা ভোগের অধিকারী। সূর্য্য রশ্মি ও চন্দ্র কিরণ রাজপ্রাসাদেও যেরূপ, দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরেও তদ্রূপই পড়িয়া থাকে। বায়ু, জল যেমন সাধুর জীবন রক্ষা করে, তেমনই অসাধুরও জীবনরক্ষা করিয়া থাকে। বৃষ্টির জল যেমন পবিত্র স্থানে পড়িয়া থাকে অপবিত্র স্থানেও ঠিক তদ্রূপই পড়ে; ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার এ সমস্ত কৃপার দান অহৈতুকী। এই কৃপা লাভ করিতে জীবকে কোন বেগ পাইতে হয় না, অর্থাৎ অযাচিতভাবে ভালমন্দ নির্বিশেষে সকলেই পাইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে ইহাই শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এখন দেখা যাক, সত্যই কি ইহা অহৈতুকী কৃপা। সত্যই কি উল্লিখিত দান জীবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে? ইহার বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে শ্রীভগবান জীব সৃষ্টি করিয়াছেন কি জীবের হিতের জন্য, না তাঁহারই কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? শাস্ত্রকারগণ বলেন, তিনি একা ছিলেন, লীলা করিবার জন্য বহু হইয়াছেন। তাহা হইলে জীব তাঁহার লীলায় বস্তু, সেই জীবকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা ত তাঁহার অবশ্যকরণীয়, নচেৎ জীব লুপ্ত হইয়া গেলে তাঁহার লীলা চলিবে কিরূপে! সুতরাং কেবলমাত্র জীব রক্ষার ব্যাপারে তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজ প্রয়োজনেই করিয়াছেন। উহাকে জীবের প্রতি কৃপা কিরূপে বলা যাইতে পারে? জীবের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় অর্থাৎ জীবত্বের পরিবর্ত্তে শিবত্ব প্রাপ্তি হয় ভগবানের এমন কোন পারমার্থিক দানকে কৃপা বলা যায়। উহা কখনও অহৈতুকী হইতে পারে না এবং পাত্রাপাত্র নির্বিচারে প্রদত্ত হয় না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে শ্রীভগবানকে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইতে হইত। রাম ও যদু দুজনেই মহাপাপী, তন্মধ্যে রাম অধিকতর পাপী। আজীবন তাহারা দুষ্কার্য্য করিয়া কাটাইয়াছে, ভুলিয়াও কোন দিন সৎকার্য্য করে নাই; ইহাদের মধ্যে রামকেই ভগবানের কৃপা হইল, সে উদ্ধার হইয়া গেল। ইহা কি ভগবানের যোগ্য কর্ম্ম? একথা বলিলেও কৃপাবাদীরা বলিয়া থাকেন, ভগবানের কার্য্যের সমালোচনা করিবার মানুষের কি অধিকার আছে? তাঁহার কার্য্য তিনিই ভাল বুঝেন, তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তবে তিনি স্বৈরাচারী নহেন, যাহা ইচ্ছা করেন না। আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না তাই ঐরূপ ভাবি। এক্ষণে দেখা যাক শ্রীভগবান শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কি উক্তি করিয়াছেন :—

শ্রীভগবান কহিলেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥ গীতা ৯-২৯

অনুবাদ :—

সর্ব্বভূতে সম আমি, দ্বেষ্য প্রিয় কেহ নাই।
যে ভজে ভকতি ভরে সে আমাতে আমি তায়॥

অর্থাৎ আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কাহাকেও ভাল বা মন্দ বাসি না; সকলেই আমার কাছে সমান। তবে যাঁহারা ভক্তি ভরে আমার ভজনা করেন, কেবল তাঁহারাই আমার আপনার ও কৃপাভাজন হইয়া থাকেন।

আরও বলিয়াছেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং * বহাম্যহং ॥ গীতা ৯-২২

অনুবাদ :—

যে সবে অভিন্ন ভাবে ভাবে মোরে ভজে আর।

যোগ ক্ষেম বহি আমি নিত্যযুক্ত সে সবার।

তবেই দেখা যাইতেছে ভগবান বিনা কারণে বা হেতুতে কাহাকেও কখনই কৃপা করেন না, যাঁহারা নিজ নিজ সুকৃত কার্য্য দ্বারা তাঁহার প্রিয় ও আপনার হইতে পারেন কেবল তাঁহারাই তাঁহার কৃপাভাজন হইতে পারেন।

এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি শ্রীমদ্ভাগবতেও শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—

"ন তস্য কশ্চিদ্দয়িত সুহৃত্তম, নচাপ্রিয় দ্বেষ্য উপেক্ষ এববা

তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা, সুরদ্রুম যদ্বৎ উপাশ্রিতো হ যঃ ॥"

ভাঃ ১০-৩৮-২১

অনুবাদ :—

নাহি কেহ সুহৃত্তম নাহি কেহ প্রিয় তার,

নাহিক অপ্রিয় দ্বেষ্য নাহি কেহ উপেক্ষার।

তথাপি যে যথা ভজে ভক্তে ভজে ভগবান ;

কল্পতরু আশ্রিতেরে যথা ফল করে দান॥

অর্থাৎ কেহ তাঁহার শত্রু বা মিত্র আপনার বা পর নাই। সকলকেই তিনি সমভাবে দেখিয়া থাকেন। তবে যাঁহারা ভক্তিভরে তাঁহার ভজনা করেন শ্রীভগবান তাঁহাদিগকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। যেমন কল্পতরু আশ্রিতদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার শরণাগত না হইলে কেহ তাঁহার কৃপালাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। গীতাতে অন্য স্থানে শ্রীভগবান নিজ মুখেও ঐ কথা বলিয়াছেন যথা—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।

* * * * * গীতা ৪-১১

অনুবাদ :—

যে ভাবে যে সেবে মোরে তুমি তারে তথা।

যে আমাকে যেরূপ ভাবে ভজনা করে আমিও সেই ভাবেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করি, অর্থাৎ যে—যে ফলের কামনায় আমার আশ্রয় লয় সেই ফল প্রদানের দ্বারা আমি তাহাকে পরিতৃপ্ত করি। তবেই দেখা গেল তাঁহার শরণাগতি ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। শরণাগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হয়, নচেৎ "অহৈতুকী কৃপা, কৃপা" বলিয়া চিৎকার করিলেও কিছুই হয় না।

এখন দেখিতে হইবে সে উপাসনা কিরূপে করা যাইতে পারে। ইহার উত্তর শ্রীভগবান গীতাতেই দিয়াছেন।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।

অনন্যেন যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥" গীতা ১২-৬, ৭

অনুবাদ :—

সর্ব্ব কর্ম্ম সঁপি মোরে মম পরায়ণ,

অনন্য মনে যে মোরে করয়ে ভজন,

অর্পিত আমাতে চিত্ত, করি আমি তাঁর

মরণ-সংসার-সিন্ধু হইতে উদ্ধার॥

অবশেষে গীতা শেষ করিবার সময় যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও অহৈতুকী কৃপার কোন উল্লেখ নাই, থাকিতেও পারে না, যথা—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" গীতা ১৮-৬৫

অনুবাদ :—

পূজ নম মোরে মোতে রাখ ভক্তিমন,

পাবে মোরে, এ প্রতিজ্ঞা, তুমি প্রিয়জন।

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" গীতা ১৮-৬৬

অনুবাদ :—

সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি একা আমার আশ্রয় ধর।

সর্ব্ব পাপে তরাইব শোক তুমি নাহি কর॥

গীতাতে এরূপ শ্লোক বহু আছে, উহাদের সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

এইখানে একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীমান অর্জ্জুন ভগবানের প্রিয়সখা ছিলেন, এমন ব্যক্তিও যে পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগত শিষ্য হইতে না পারিয়াছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত পরম গুহ্য গীতারহস্য শুনিতে পারেন নাই এবং শ্রীভগবানও সে পর্য্যন্ত ইহার গূঢ় রহস্য তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। অর্জ্জুন বলিলেন :—

"কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥" গীতা ২-৭

অনুবাদ :—

দৈন্য দূষিত চিত্ত, ধর্ম্ম বিমোহিত,

জিজ্ঞাসি তোমারে নারায়ণ।

কহ কিসে ভাল হবে, শিখাও আমারে তবে

(আমি) শিষ্য তব লইনু শরণ।

* কোন বস্তু লাভ করার নাম যোগ, তাহার রক্ষা করার নাম ক্ষেম।

হে বাসুদেব, আমি আত্মীয় বন্ধুগণের ভাবী বিনাশজনিত, দুঃখ এবং কুলক্ষয়াদি জনিত দোষ অনুভব করিয়া আত্মহারা হইয়াছি অতএব আমি বর্ত্তমান বিষয়ে ধর্মান্ধ হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি আমার পক্ষে যাহা প্রকৃত শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করেন তাহা বলিয়া দিন। পুরুষোত্তম, আমি শিষ্যভাবে আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি আমাকে বর্ত্তমান বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করুন। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তিনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে না পারিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত শ্রীভগবান অর্জ্জুনের ন্যায় প্রিয় সখাকেও অহৈতুকী কৃপা করেন নাই, আর আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিদিগকে অযাচিত ভাবে কৃপা করিবেন ইহা মনে করাও মূঢ়তার কার্য্য।

কৃপাবাদীরা একটি হালের নজির দেখাইয়া অপর পক্ষকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, সেটি হইতেছে জগাই মাধাই উদ্ধার। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইঁহারা সুপরিচিত। ইঁহারা নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণকুমার, জ্ঞান হইয়া অবধি দুষ্কার্য্যে রত ছিলেন। এমন দুষ্কার্য্য ছিল না যাহা তাঁহারা করেন নাই। তাঁহাদিগকে দেখিলে লোকেরা স্ত্রী পুরুষ সকলেই সশঙ্কিত হইয়া দূরে পলায়ন করিত। তাঁহারা সর্ব্বদাই মদ্যপানে মত্ত হইয়া থাকিতেন। একদিন তাঁহারা শ্রীচৈতন্য প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দেন এবং অবধূত নিত্যানন্দকে প্রহার করেন। সেই দিনই তাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে আর সেরূপ হয় না। এই দুই ব্যক্তির এইটিই প্রথম জন্ম নয় ইহা নিশ্চিত।* তাহার পূর্ব্বেও অনেকবার জন্ম হইয়াছে এবং জন্মান্তরের কর্ম্মফল অনেক সঞ্চিত ছিল। প্রথমে তাঁহারা দুষ্কর্ম্মের ফলে দুরাচারী হইয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের সুকৃত কর্ম্মের ফলভোগের কাল উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন, এইরূপ মনে করাই কি সঙ্গত নয়?

সুতরাং এখানে অহৈতুকী কৃপার কথা তুলিবারও কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। ইহা সত্য বটে ভগবান ফলদাতা, কিন্তু জীব নিজ কর্ম্ম বলে ফল পাইবার যোগ্য না হইলে কিরূপে ফল পাইতে পারে। আর একটা কথা আমরা প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই ; কারণ বা হেতু ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নিত্য। জগন্নাথই বা ইহার ব্যতিক্রমে কার্য্য করিবেন কেন? তিনি তাঁহার নিজকৃত বিধান লঙ্ঘন করিলে জগতে যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া জগত ধ্বংস মুখে পতিত হইবে, ইহা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি শ্রীভগবান সর্ব্বজীবে সমদর্শী, জীবগণ তাহাদিগের নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা তাঁহার প্রিয়, কৃপার বা অকৃপার পাত্র হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একটি জাগতিক দৃষ্টান্তও দেখান যাইতে পারে। আমরা সংসারে দেখিতে পাই পার্থিব পিতা সকল সন্তানকেই সমান দেখেন এবং সকলেরই মঙ্গল কামনা করেন, কিন্তু কার্য্যগুণে কেহ আপনার, কেহ বা পর হইয়া যায়। যে পিতার আদেশ উপদেশ পালন-পূর্ব্বক পিতার অনুগত হইয়া থাকে সেই পিতার প্রিয় ও কৃপার পাত্র হয়। যাহারা তাহা না করে এবং পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে, পিতার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না তাহাদের প্রতি পিতারও স্নেহ মমতা থাকে না এবং তাহারা পিতার কৃপালাভ করা দূরে থাকুক পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিতার ত্যাজ্যপুত্র নামে অভিহিত হয়। স্বর্গীয় পিতার পক্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? এ সম্বন্ধে সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এক মত। বাইবেলের অমিতব্যয়ী পুত্রের (Prodigal son) দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

উল্লিখিত সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে শ্রীভগবান হেতু বা কারণ ব্যতীত কাহাকেও কৃপা করেন না। গীতা গ্রন্থের কোন স্থানে অহৈতুকী কৃপার উল্লেখ বা ইঙ্গিতমাত্র নাই এবং ইহার অনুকূলে কোন যুক্তিও দেখা যায় না—কথাটি শুনিতে বড় ভাল। আমরা যাহা ইচ্ছা করিব, ভগবানের আদেশ উপদেশ মানিব না, বৈধাবৈধ ভালমন্দ কার্য্যের বিচার করিব না, ভগবানের নাম করিব না এবং তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিব না, আর তিনি আসিয়া অজস্রধারে আমাদের উপর কৃপা বর্ষণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা লাভের বিষয় কি হইতে পারে। ইহা দায়িত্ববিহীন অলস ব্যক্তির জল্পনা মাত্র। এই মতবাদ সংসারে প্রবল হইলে ইহা সমূহ অমঙ্গলের কারণ হইবে। এমন সোজা পথ ছাড়িয়া কে আর ভগবানকে লইয়া মাথা ঘামাইবে, তাঁহার ভজনা বা উপাসনা করিবে? বিনা ব্যয়ে বস্তু পাইলে কে উহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিবে? তবে বেনামী বস্তুর মূল্য কোন কালেই নাই ও থাকেও না। উহা পাওয়া বা না পাওয়া উভয়ই সমান। উহাদ্বারা কিছুমাত্র আত্মোন্নতি হইবার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং এই মতবাদ প্রবলভাবে প্রচলিত না হওয়াই মঙ্গলের বিষয়।

* টীকা—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

গীতা ৪—৫

অনুবাদ—

বহু জন্মগত পার্থ তোমার আমার,
জানি সব, নাহি কিছু জান তুমি তার।

শ্রমিকদলের পররাষ্ট্রনীতি

শ্রীনগেন দত্ত

ইংলণ্ডের শ্রমিকদল ধারে ও ভারে দুই ভাবেই কাটিতেছেন। রক্ষণশীল দল হইতে পৃথক হইয়া নিজেদের দলগত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুরুতর সমস্যা সমাধান করিবার কাজে শ্রমিকদল হাত দিয়াছেন। কাজে হাত দিয়া যে পরিমাণ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন তাহাতে ঝানু রক্ষণশীলেরাও অবাক হইয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলও বেভিন সাহেবের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সেদিনও পার্লামেণ্টে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আমি মিঃ বেভিনের নীতির অপক্ষপাতী নই; তাহা হইলে বিষয়টা দাঁড়াইতেছে এইরূপ যে পররাষ্ট্রনীতিতে কি শ্রমিকদল কি রক্ষণশীল দল এক অন্যের পৃষ্ঠ কণ্ডূয়ন করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল যে অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল-দলকেও শ্রমিকদল হার মানাইয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিঃ চার্চ্চিল মার্কিণদের একপ্রকার আষ্টে-পৃষ্ঠে ললাটে বাঁধিয়াই যুদ্ধে নামাইয়াছিলেন। যুদ্ধে মার্কিণদের যতটা লাভ না হইয়াছে তাহার চাইতে ব্রিটিশের লাভ হইয়াছে প্রচুর। সে এবারের মত বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঁচিবার লাওয়াই রক্ষণশীলেরা যাহা ঠিক করিয়াছিল, শ্রমিকেরা করিয়াছে তাহার অনুরূপ। যুধ্যমান ইংলণ্ড যাহা করিয়াছে, শান্তিকামী ইংলণ্ডও আজ তাহাই করিতেছে। যুদ্ধের সময়কার ইঙ্গ-মার্কিণ মিতালীর কথা বাদ দিয়া শান্তির সময়কার মিতালীর কথাই বলিতেছি। প্যালেষ্টাইন সমস্যায় শ্রমিকদল মার্কিণদের ল্যাজে বাঁধিয়া লইয়াছেন,ভাবটা এই—যদি গোলযোগ ঘটে তবে উভয়েই দাঁড়াইব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেমন রক্ষণশীলদল স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে মধ্য-প্রাচ্যের ইস্‌লামের দেশগুলির উপর প্রত্যক্ষ শাসন ও পরোক্ষ প্রভাব রাখিতে হইলে আর একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আঁতাত প্রয়োজন, তেমনি তথাকথিত প্রগতিপন্থী শ্রমিকদল বুঝিয়াছে যে মধ্য-প্রাচ্য শাসন করিতে হইলে একটু নব্যপন্থী সাম্রাজ্যবাদী আঁতাত প্রয়োজন হইবে। ইংলণ্ড আজ নানা কারণে ফরাসীর সহযোগিতা পাইতেছে না। তার মধ্যে প্রধান কারণ হইল ফরাসীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন। এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনকে শ্রমিকদল ঠিক ঠিক মানিয়া লয় নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেণ্ট রেমোর চুক্তি অনুসারে ফরাসী সিরিয়া ও লেবাননের উপর যে রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব পাইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তাছাড়া ফরাসীর আভ্যন্তরীণ ভাঙাগড়া ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ দুই নীতিকেই প্রভাবান্বিত করিবে, এই অবস্থায় ফরাসীর পররাষ্ট্রনীতি অথবা ঔপনিবেশিক নীতি ইংলণ্ডের সঙ্গে তাল মিলাইয়া না-ও চলিতে পারে। প্রাক্-যুদ্ধকালীন ইঙ্গ ফরাসী পররাষ্ট্রনীতি যেমন এ-ওর কোল ঘেঁষিয়া চলিয়াছিল, তেমনি যুদ্ধোত্তরকালীন ইঙ্গ-মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতিও এ-ওর কোল ঘেঁষিয়া চলিবে। ইহাই হইল শ্রমিকদলের নব্য পররাষ্ট্রনীতির গতি।

মার্কিণদের রাজা নাই কিন্তু রাজত্বের বালাই আছে, তাই তাহারা ইলংণ্ডের সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া লইয়া সাম্রাজ্য শাসনের দীক্ষা আরম্ভ করিতেছে। পোর্টো-রিকো, পানামা ও ফিলিপাইনে মার্কিণরা যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের মাসতুত ভাই ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আসলে মার্কিণরাও স্বাদ পাইয়াছে। তাই এবারে শ্রমিকদলের সঙ্গে হাত মিলাইয়া প্যালেষ্টাইন কমিশনের সভ্য হইয়াছে; পক্ষান্তরে শ্রমিকদলও নব্যসাম্রাজ্যবাদী মার্কিণদের সঙ্গী করিয়া নিজেদের শ্রমিক আদর্শগত ধর্ম্মকর্ম্ম বজায় রাখিতেছেন। শ্রমিকদলের পররাষ্ট্রনৈতিক ধর্ম্মকর্ম্ম এইরূপ যথা—প্যালেষ্টাইনে, ইহুদি-আরব সমস্যা; ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা; মালয়ে চীনা-ভারতীয়-মালয়বাসীর সমস্যা; সিংহলে ভারতীয় সিংহলবাসী সমস্যা। ইদানীং বার্ম্মায় আবার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, আফ্রিকায় সাদা-কাল সমস্যা—ইহার প্রত্যেকটিই কিন্তু শ্রমিক সরকারের হাতে দানা বাঁধিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সব ভেদনীতি রক্ষণশীলদলের সৃষ্টি—ইহার জন্য বেচারী শ্রমিকেরা কি করিবে। উত্তর হইতেছে, শ্রমিকদল আজও এমন কোন নীতি প্রচার করেন নাই যাহাতে এই ভেদ বৈষম্যমূলক নীতির খণ্ডন হইতে পারে। শ্রমিকদলের দৃষ্টিভঙ্গি যদি বৈপ্লবিক হইত তবে তাহারা লেনিনের মত ক্ষমতা হাতে পাইয়া বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিতেন যে আজ হইতে রাশিয়ার যত extraterritorial Rights যেখানে যাহা আছে তাহা প্রত্যাহৃত হইল। এই সব বিষয় ইংলণ্ডের শ্রমিকদল যথেষ্ট চতুর। মিঃ বেভিন মিশরের আলোচনা প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টে একথা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে তিনি সাম্রাজ্য হারাইতে নারাজ। আবার মিঃ এট্‌লি ভদ্রলোকের মত কহিতেছেন যে, ভারতবর্ষ যদি চায় তবে সাম্রাজ্যের বাহিরে থাকিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের বহু এবং বিচিত্র শৃঙ্খল আছে, যদি এমন হইত যে একটি শৃঙ্খল পায়ে বাঁধা আছে তাহা কাটিলেই মুক্ত হওয়া যাইবে, তবে না হয় চেষ্টা করা যাইত। সাম্রাজ্য হইতে মুক্ত হইবার স্বাধীনতা ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদিকেও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কই তাহারা কি এক পা-ও নড়িয়াছে? তার কারণ সাম্রাজ্যের সমাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও বর্ণনৈতিক ধারা এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে ও এমনভাবে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের মুঠোর মধ্যে রহিয়াছে যে এক যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছাড়া অন্য নীতিতে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি নাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাহা করিয়াছে, আজ এ্যটম বোমার যুগে তাহা

কতটা মতবশর তাহাও ভাবিবার। সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদ-নীতির প্রধান উপজীবিকা হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইহা অল্পবিস্তর সব দেশেই আছে। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদীরা থাবা মারিয়াছে সেখানেই ঘা হইয়াছে। ব্রিটিশ সিংহের থাবায় ঘা আর শুকাইতে চাহে না—অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা আর ফুরায় না। ইংলণ্ডের শ্রমিকদলও এই সমস্যা ফুরাইতে দিতে চাহে না। তার প্রমাণ আরব-ইহুদি সমস্যা, হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা, মালয়-চীন-ভারতীয় সমস্যা। প্রতিবিধান শুধু সলাপরামর্শ, আর কমিশন।

পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি চলিতে পারে, বুঝাপড়াও হইতে পারে —কিন্তু যেটি হয় না সেটি হইতেছে মিল-মিশ। শক্তি চতুষ্টয়ের পররাষ্ট্র-সচিবেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—একটা মিলমিশ করিতেই হইবে। প্রথম একদফা চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, সেবারে ইতালীকে লইয়া অর্থাৎ ইতালীর পূর্ব্বকার উপনিবেশগুলি লইয়া রীতিমত দড়ি টানা-টানি হইয়া গিয়াছে। এই সব দড়ি টানাটানির প্যাঁচে পড়িয়া বিশ্ব-শান্তি দম আটকাইয়া রহিয়াছে—বেচারি হাঁফ ছাড়িতে পারিতেছে না। সেবার বেভিন সাহেব বলিয়াছিলেন যে লিবিয়ার প্রতি তাহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, কেননা ব্রিটেন লিবিয়াবাসীদের স্বাধীনতা দিবে এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রিটেন গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আরব জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দিবে বলিয়া এক উচ্চাঙ্গের প্রচার চালাইয়াছিল—সমস্ত আরব আজ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে তাহা বিশ্ববাসী মাত্রেই জানেন। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ব্রিটেনকে মিশর ত্যাগ করিতেই হইবে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে মিশরের কোল ঘেঁষিয়া যদি পরোক্ষ প্রভুত্ব ও বিমান ঘাঁটি বজায় রাখা যায় তবে মিশরের রণনৈতিক গুরুত্বের খানিকটা ক্ষতিপূরণ সম্ভব হইতে পারে। তাছাড়া আণবিক বোমার আবিষ্কারের পর হইতে বিশ্বরাজনীতিতে ভীষণ ওলট-পালট সুরু হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া যুদ্ধের নীতি ও তাহার কলা-কৌশলেও খানিকটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। আণবিক বিজ্ঞান যুদ্ধবিশারদদের বুদ্ধির দরজা খুলিয়া দিয়াছে—পূর্ব্বে যে সব বুদ্ধির দরজা দিয়া শত্রুপক্ষ নিধনের নীতি আনাগোনা করিত সে সব বুদ্ধির দরজা-কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা যুগোপযোগী নয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাই কূটনীতিও নতুন করিয়া শাখা-প্রশাখা মেলিতেছে। তাই বেভিন সাহেব সংহত ও স্বাধীন লিবিয়ার জন্ত মাথা ঘামাইতেছেন। সেবারে বেভিন সাহেবের সাধে বাধ সাধিয়াছিল মলোটভ। তিনি লিবিয়াকে আন্তর্জাতিক যৌথ-শাসনের-মধ্যে আনিতে চাহিয়া মৌচাকে ঢিল মারিয়াছিলেন। ফল উভয় পক্ষে হুল ফুটানো হইয়াছিল মাত্র। আসল সমস্যার সমাধান হয় নাই। তারপর রাশিয়া ইতালীর নিকট যে ক্ষতি পূরণ চাহিয়াছিল তাহাতে আমেরিকা আপত্তি করিয়াছে—এই বলিয়া যে ও বোঝাও আমাকেই বহন করিতে হইবে। অতএব যাতে কিছু কম হয় তার ব্যবস্থা হউক, তার অর্থ আমেরিকার সঙ্গেও রাশিয়ার মন কষাকষি চলিবার উপক্রম হইয়াছিল—এই সব দ্বন্দ্ব ও বিরোধের পট-ভূমিকা পূর্ব্ববারের সম্মেলন হইতেই রচনা হইয়া আছে। একবার শুধু এর যে কোন একটা ধরিয়া টান দিলেই সেতারের মত সমস্ত তারগুলিতে প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে। বস্তুত ঘটিয়াছেও তাহাই। মিঃ মলোটভ এবার খুব জোর করিয়া ইতালীর ক্ষতিপূরণের সমস্যাটা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। এবার মিঃ বেভিন ও মিঃ বার্ণস্ দুই-ই একযোগে একসুরে বলিতেছেন—যে হাঁ টাকাটা দেওয়া হইবে বই কি, তবে "উহা প্রাক্তন শত্রু অধিকৃত দেশ হইতে এবং ইতালীর বাণিজ্য ও যুদ্ধ জাহাজ হইতে পূরণ করা হইবে।" মিঃ মলোটভ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়াছে এবং ইহা যে যথেষ্ট নহে এমন মতামত প্রকাশ করিয়াছে। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব বিদো মলোটভের মতের খানিকটা পাশ কাটিয়া আসিয়া কহিয়াছেন যে ইতালীর যদি বছর দুয়েকের মধ্যে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় তবে মলোটভের দাবী মিটিতে পারে। ইতালীর যদি সেই "সুদিন" আসে তাহা হইলে চলিতে পারে। মলোটভ দাবী করিতেছেন যে ইতালীর চলতি ধনোৎপাদন ব্যবস্থার উপর হইতে আগামী ছয় বৎসরের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকাটা শোধ করিয়া দেওয়া হউক। বেভিনের আপত্তি এইখানটায় সবচেয়ে বেশী, তিনি বলেন যে রাষ্ট্রসংঘে ইতালীকে "সর্ব্বাপেক্ষা অনুগৃহীত রাষ্ট্র" বলা হইয়াছে ; সোভিয়েট ও ফরাসীর ইতালী সম্পর্কে এইরূপ প্রস্তাবের ফলে অনুগ্রহের ব্যাপারটি মাঠে মারা যায়। অতএব বেভিন সাহেব এই বিষয় বিরোধিতা না করিয়া পারেন না। ইতালীর আসল বিরোধ এতদিনে ডানা বাঁধিয়াছে। ওয়ারস্ ও মস্কোর আপত্তি সত্ত্বেও ব্রিটেন ইতালীতে পোল- সৈন্যবাহিনী প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছেন। এটা মলোটভ নিশ্চয়ই প্রীতির চক্ষে দেখিবেন না এবং ইহা লইয়া যে গোলযোগের সূত্রপাত হইবে তাহার পরিণতিতে বড় বড় সমস্যা আসিয়া জড় হইবে। সে ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিণ আঁতাত আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিবে। ইতালীতে পোলবাহিনী রক্ষার গুরুদায়িত্ব ব্রিটেন মাথা পাতিয়া কেন লইতেছে ইহা লইয়া একটা জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই হইবে। তাছাড়া সৈন্যাধ্যক্ষ এণ্ডার্স্ দশ লক্ষ সৈন্যর নিকট যে ফতোয়া দিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমান পোল-সরকারকে রীতিমত মস্কোর 'তাঁবেদার' বলা হইয়াছে। এই তাঁবেদারী খেতাবটা মলোটভ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা বলা মুস্কিল।

ইতালীর মধ্যে থাকিয়া বর্ত্তমান পোল সরকারকে সায়েস্তা করিবার মতলবটা এ ভাবে ভাঁজিলে, ফরাসী সীমান্তে থাকিয়া স্পেন সরকারকে সায়েস্তা করিবার মতলবও কোন কোন শক্তি ভাঁজিতে চাহিবে, সে অবস্থায় বেভিন সাহেব কি করিবেন ?

ফরাসী নির্ব্বাচনের পর

ফরাসীর আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে অনেকেরই মনে হইয়াছিল যে, ফরাসী বুঝি সমাজতন্ত্রী বা কম্যুনিষ্ট হইয়া গেল। আসলে যে ব্যাপারটা অন্যরূপ, তাহা পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ফরাসীর বড়কর্ত্তারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। ফরাসী সমাজ-তন্ত্রীও হয় নাই, কম্যুনিষ্ট হবার কথা এখন ভাবিবার অবসর হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচনের ফলে যাহা বোঝা গেল এম্-আর-পি,

সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট তিন দলই আসিয়াছে; তবে এম্-আর-পি দলে ভারি। ইতিপূর্ব্বে দেখা গেছে যে, সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট দলের সংহতির বিরুদ্ধে এম্-আর-পি দল বিরোধিতা করিয়াছে এবং তখনই অনেকের মনে হইয়াছিল যে ফরাসী বামপন্থী হইবে কি দক্ষিণপন্থী হইবে। কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী উভয় মিলিয়া যে শাসনতন্ত্রের বিধান রচনা হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ একমাত্র এম্-আর-পি করিয়াছে—হয়ত এইরূপ হইতে পারে যে বামপন্থী সংহতি হঠাইতে গিয়াই এম্-আর-পি বেশী দক্ষিণপন্থী ঘেঁষা হইয়া গিয়াছে। তবে কোন কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞ দর্শকদের মত যে বাহির হইতে এম্-আর-পি যতই দক্ষিণপন্থী ঘেঁষিয়া চলুক না কেন তাহাকে অন্যান্য অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিতে হইবে। বস্তুত পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী বিদোঁ যে সরকার গঠন করিবেন তাহাতে কম্যুনিষ্ট দল সহযোগিতা করিবেন স্থির করিয়াছেন; তবে এই সম্মিলিত সরকারকে বেতন ও পেনসন সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট প্রগতিমূলক নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই অবস্থায় এম্-আর-পিকে একেবারে দক্ষিণপন্থী থাকিয়া কাজ চালান মুস্কিল হইবে। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার বা চিন্তা করিবার আছে। ফরাসীর বর্ত্তমান সরকারের ঔপনিবেশিক নীতি কি হইবে? ইন্দো-চীনের নেতারা বর্ত্তমানে ফরাসীতে যে আলোচনা চালাইতেছেন তাহার ফলাফল দেখিয়া বিচার করা যাইবে ফরাসী সরকার কতটা প্রগতিপন্থী এবং কম্যুনিষ্ট দলের প্রগতিমূলক নীতি কতটা সত্য তাহাও প্রমাণিত হইবে তাহাদের সেই ঔপনিবেশিক নীতির সমর্থনের সঙ্কটকালে। বর্ত্তমান বিশ্ব রাজনীতির আলোড়নের মধ্যে একটা সরকার তাহার নিজের দেশের জনসাধারণের ওপর কিরূপ ব্যবহার করিল বা সেই সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করিল—তাহা খুব বড় কথা নয়। সত্যিকারের সেই সরকার প্রগতিমূলক কিনা তাহার পরীক্ষাস্থল হইল নিপীড়িত দেশও উপনিবেশগুলি।

ইতালীতে সাধারণতন্ত্র

ইতালীতে আবার সাধারণতন্ত্রের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজা উর্ম্বার্তো সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। House of Sovey এর প্রভুত্ব ও শাসন আজ আশী বছর পরে জনসাধারণের দাবী তলায় পড়িয়া নিজ অবনতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবুও রাজতন্ত্রবাদীরা লড়িতে ছাড়ে নাই। কিন্তু যে জনসাধারণ এতদিন রাজতন্ত্রের এবং তার পক্ষপাতী ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের নিষ্পেষণের রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়াছিল আজ তারা তাদের দুঃখের শেষ দীপ জ্বালিয়া নিবেদন করিয়াছে। ইতালী রাজতন্ত্রমুক্ত হইয়াছে। ইতালীতে গ্যারিবল্ডির স্বপ্ন সফল হইয়াছে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বাংলার বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট

বাংলায় আবার ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষোত্তর মহামারীতে যাহারা মরিয়াছিল, তাহারা একরূপ মরিয়া বাঁচিয়াছে, কিন্তু সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে যে দরিদ্রের দল অখাদ্য খাইয়া ও স্বাস্থ্য হারাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সুমতি এবং ভগবানের অনুগ্রহলাভের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এবারের দুর্ভিক্ষে তাহাদের আর রক্ষা নাই। গত দুর্ভিক্ষের পর গ্রেগরী কমিটি ও দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন খাদ্যউৎপাদন ও সংগ্রহ এবং মজুত ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্বিপাক প্রতিরোধের যে সকল সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন তাহাদের মূল্য অনস্বীকার্য্য হইলেও এই হতভাগ্য দেশের কপালে কমিশন দুইটির অভিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের সৎপরামর্শদান অরণ্যে রোদন হইয়াছে। যাহাদের হাতে বাংলার খাদ্যনীতি পরিচালনার ভার ছিল, তাহারা অবিমিশ্র অকর্ম্মণ্যতায় এই প্রদেশে শুধু তীব্র অভাবই ডাকিয়া আনেন নাই, বাংলার খাদ্যস্বচ্ছলতা সম্পর্কে অবিরাম মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা সময় থাকিতে ভারতের অপরাপরপ্রদেশগুলির ও পৃথিবীর সমৃদ্ধতর দেশগুলির সহানুভূতি হইতে বাংলাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আজ বাংলার গ্রামাঞ্চলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, কলিকাতার মত সহরে পুলিসের সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও অসংখ্য নিরন্ন ভিড় জমাইতেছে, জুন মাসের প্রথম ১৩ দিনেই কলিকাতা হইতে পুলিস সংগ্রহ করিয়াছে ৩৩১ জন নিরন্নকে, অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ শুরু হইবার পরও এপ্রিল মাসে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ব্যক্তিগত খাদ্য প্রতিনিধি মিঃ হুভার যখন ভারতের অভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলি স্বচক্ষে দেখিতে আসিলেন, তখন বাংলার খাদ্যকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একবার বাংলায় আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। বাংলার চরম খাদ্যসঙ্কট অনুভূত হইয়াছে মার্চ্চ মাস হইতেই, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানী কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথের উপর দুজন স্ত্রীলোক অনশনে মৃত্যুবরণ করিয়াছে; আশ্চর্য্যের কথা, বাংলাসরকারের খাদ্যগুদামসমূহের ডিরেক্টর ৩ই এপ্রিলও কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাংলায় যথেষ্ট খাদ্য মজুত আছে বলিয়া এখানকার অবস্থা ভারতের অনেক প্রদেশের চেয়ে ভাল। বাংলাসরকারের খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এস-কে-চ্যাটার্জ্জি

ভাষণে যে বেতারে যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহাতেও তিনি এ বৎসর দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা না থাকার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের কথা বাদ দিতেছি, জনসাধারণের বিশ্বাসের পাত্র ও জনসাধারণরূপে মুসলীম লীগের সদস্যবৃন্দ বর্ত্তমানে বাংলার গদীতে বসিয়াছেন। এই লীগদলীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দি গত ৩রা জুন চাঁদপুরের এক সম্বর্দ্ধনা সভায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাংলায় যে অভাব হইয়াছে তাহা চোরাবাজার ও আতঙ্কে হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের জন্য হয় নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদের বিগত অধিবেশনে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক সান্ন্যাল মহাশয় যখন কলিকাতার পথে দুইজন নিরন্নের মৃত্যুর সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা চালাইবার চেষ্টা করেন, তখন বাংলার লীগনেতা মিঃ এ আর সিদ্দিকি এইরূপ নিরন্নের মৃত্যুকে কলিকাতার মত সহরের সাধারণ ঘটনারূপে অভিহিত করিয়া বাংলার খাদ্যপরিস্থিতি লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ফতোয়া দেন। একদিকে এইভাবে যখন প্রত্যক্ষ অভাবকে অস্বীকার করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছেন, অন্যদিকে তখন তাঁহাদেরই পরিচালনার ত্রুটিতে বাংলার বিভিন্ন খাদ্যগুদামে রাশি রাশি খাদ্য পচিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া দেশের অন্নাভাব আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং অসহায় জনসাধারণের একমাত্র আশ্রয়স্থল মন্ত্রীমণ্ডলী যখন বাংলার খাদ্যপরিস্থিতির শোচনীয়তা অস্বীকার করিতেছেন, তখন বিগত দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাগ্রস্ত এই হতভাগ্য দেশে আবার মহামন্বন্তরের ক্ষিপ্রতর পদসঞ্চারই স্বাভাবিক। অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ এখনও সচেতন না হইলে এবং বাহিরের সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না গেলে এবারের দুর্ভিক্ষে ১৯৪৩ সালের চেয়ে বেশী ক্ষতি বাংলাকে সহ্য করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুসহায়ও স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সমগ্রভাবে ধরিলে ভারতের এবারের খাদ্যের অবস্থা ১৯৪৩ সালের চেয়েও খারাপ।

অবশ্য বাংলাদেশের অবস্থা এমনিই ভাল নয়। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে স্বীকার করেন যে, ৪জন লোকবিশিষ্ট প্রতি কৃষক পরিবারের অন্ততঃ ৫ একরের বেশী জমি থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কৃষক, অথচ বাংলার ৭৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ পরিবারের ২ হইতে ৫ একর জমি আছে। চাষীদের অবস্থা গত দুর্ভিক্ষের সময় আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার চাষীরা ৭ লক্ষ ১ হাজার একর ধানজমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত সেই বিক্রীত জমির মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৯০ হাজার একর চাষীদের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, যে জমি হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশেই গত দুই বৎসর ধরিয়া স্বাভাবিক ফসল উৎপন্ন হইতেছে না। ইহার উপর ১৯৪৫ সালে পূর্ব্ববঙ্গে অতিবৃষ্টি এবং পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির জন্য প্রভূত পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে। মোটের উপর পরিচালকবর্গের অযোগ্যতা ছাড়া প্রকৃতির অভিশাপও বাংলার এই ভয়াবহ অন্নসঙ্কটের অন্যতম কারণ। বাংলাসরকারের খাদ্যবিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, এবার এই প্রদেশে মোট ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য কম পড়িবে। এ বৎসরের মোট খাদ্যউৎপাদন ধরা হইয়াছে ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন। আমাদের মনে হয়, খাদ্যপরিস্থিতির শোচনীয়তা ঢাকিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ঘাটতির পরিমাণ কম করিয়াই প্রচার করিতেছেন। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা অনুমান করিয়াছেন যে, এই ঘাটতি অন্ততঃ ১০ লক্ষ টন হইবে। এই অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

প্রকৃত ঘাটতি যতই হউক, খাদ্যনীতিতে শৃঙ্খলার অভাবে এবং সরকারী ব্যবস্থায় লক্ষণীয় ত্রুটির ফলে চোরাকারবারীরা কর্ম্মব্যস্ত হইয়া উঠায় এবৎসর গত দুর্ভিক্ষের ন্যায় বাংলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চরম সঙ্কটের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হইবে। বাংলাসরকারের রেশন এলাকায় খাদ্য যোগাইবার যেমন দায়িত্ব আছে, রেশনহীন ঘাটতি এলাকায় খাদ্য পাঠাইবার তেমনি কর্ত্তব্য আছে। অথচ সরকারের মজুত শস্যের পরিমাণ যেরূপ তাহাতে এই কর্ত্তব্য পালন বাংলাসরকারের পক্ষে সত্যই কঠিন। বর্ত্তমান রেশন এলাকার সহিত নূতন আরও ৮টি সহর যুক্ত হইতেছে। হয় তো চাপে পড়িয়া রেশন এলাকা আরও বাড়িবে। চাষীদের পক্ষে আমন ধান উঠিবার পরে বাজারে শস্য পাঠাইবার সময় জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস। এই চারমাস চলিয়া গিয়াছে। বাংলাসরকার আশা করিয়াছিলেন যে ৯৭ লক্ষ টনের শতকরা ৫০ ভাগ আন্দাজ সাধারণভাবে বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবে। বাজারে যতই আসিয়া থাক, বাংলাসরকার প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে মাত্র ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন চাউল মজুত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সম্প্রসারিত রেশন এলাকার লোকদের সহিত বর্ত্তমান বরাদ্দভোগী ৫৫ লক্ষ লোকের সারা-বৎসরের অন্ন জোগাইতে হইবে। কাজে কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থায় বাংলা সরকার আশানুরূপ যোগ্যতার পরিচয় দেন নাই। বাহির হইতে ভারতে যে সাহায্য আসিবে, পূর্ব্বেকার হিসাব-বাতিল করাইয়া বাংলা যদি ঘাটতি প্রদেশ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে এবং সেই সাহায্যের একটি বড় অংশের ভাগীদার হইতে পারে, তবু সমস্যা সমাধানের আশা করা যায়। সমস্যা যে কত জটিল, তাহা বাংলার বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চাউলের মূল্য পৌঁছিবার সংবাদ হইতেই বুঝা যাইবে। গত ১২ই জুনের ষ্টেটসম্যানে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন স্থানের প্রতিমণ চাউলের নিম্নরূপ সর্ব্বোচ্চ দর দেখা যায়:—মুন্সিগঞ্জ—৩২৷৷০ আনা, নারায়ণগঞ্জ (মিরপুর ও বন্দরহাট) ৩৫ টাকা, ঢাকা সদর—৩০ টাকা, নোয়াখালি ৩৫ টাকা, ফরিদপুর ৩৫ টাকা, সিরাজগঞ্জ ২৫ টাকা। ময়মনসিংহ উদ্বৃত্ত অঞ্চল হিসাবে চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু ডেলী ওয়ার্কারের বিশেষ সংবাদদাতা ইহাকে এখন ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতেও চাউল ক্রমে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। তমলুকে মাত্র কয়দিন আগে একটি অসহায় নিরন্ন স্ত্রীলোক তাহার শিশুকন্যাকে বিক্রয় করিতে অসমর্থা হইয়া পুষ্করিণীতে

মারিতে যায়, কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় শিশুটি রক্ষা পায়। নোয়াখালি প্রভৃতি কয়েকটি সহরে বিয়ের জন্য শোভাযাত্রা করিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল অবস্থা নিঃসন্দেহে দেশের চরম সঙ্কটের ইঙ্গিত দিতেছে। দুর্ভিক্ষ কমিশন তাহাদের রিপোর্টে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, চাউলের মূল্য অসম্ভব বেশী হওয়ার জন্যই ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ এত তীব্র হইয়াছিল। এবার ইতিমধ্যেই বাংলার নানাস্থানে যেভাবে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে সর্বনাশ আসন্ন বলিয়া অনুমান করা কঠিন নয়।

এই ভীষণ দুর্বিপাক হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সরকারী কর্তৃপক্ষকে যে অজস্র সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থতা লইয়া সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বাহির হইতে যথাসম্ভব আমদানীর সহিত বাংলার যেখানে যত চাউল ধান দেওয়া আছে সমস্ত এখন সংগ্রহ করা দরকার। যাহাতে এক মুষ্টি চাউল এসময় বাহিরে যাইতে না পারে তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি দিতেই হইবে। শুনা যাইতেছে এখনও নাকি বীরভূম-জেলা হইতে প্রতি মাসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মণ চাউল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। বরিশাল হইতেও একইরূপ অভিযোগ আসিয়াছে। এই সব অভিযোগ সত্য হইলে আর্ত্ত দেশবাসী গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বহীনতা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না।

দেশে খাদ্যশস্য যথাসম্ভব মজুত করিবার সহিত গভর্ণমেণ্টকে খাদ্য আমদানী, সংরক্ষণ, বণ্টন ও অপচয় নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া খাদ্যনীতি পরিচালনা করিতে হইবে। বাংলাকে আগে স্বচ্ছল অঞ্চল বলা হইয়াছে, এখন ভারতবর্ষ যে সাহায্য পায় বাংলা তাহার বিশেষ ভাগ পায় না। বাংলা সরকারের উচিত, বাংলার শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতির প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপযুক্ত সাহায্য আদায়ের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান অবস্থায় যোগ্য উপদেষ্টা কমিটির সাহায্যে একটি সুনির্দিষ্ট খাদ্য পরিকল্পনার কার্য্যকারিতাই বাংলা সরকারকে দায়িত্ব-হীনতার লজ্জা হইতে রক্ষা করিতে পারে। যেখানে যেখানে অন্নের অভাবে মানুষ মরিতেছে, সেই সব জায়গাকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করিয়া স্থানীয় অসহায় অধিবাসীদের আইনমত সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিতে হইবে। বিদেশী যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি জানিতে চাহেন, বাংলার পরিস্থিতি তাহাদের জানাইয়া দেওয়ার ফল ভাল হইবারই কথা। দুঃখের বিষয় বাংলা সরকার এদিক হইতে অত্যন্ত উদাসীন।

গভর্ণমেণ্ট যদি সাধু ও দায়িত্বশীল হন, খাদ্য তথা মানুষের প্রাণ লইয়া চোরাকারবারীদের ছিনিমিনি খেলা কমিয়া যাইতে বাধ্য। চোরা-কারবার দমনের জন্য সরকারের যে কোন কঠোরতায় কেহই বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। এ বিষয়ে ঢাকার রিলিফ অফিসার মিঃ গফুর সুন্দর একটি পরামর্শ দিয়াছেন। মিঃ গফুর বলিয়াছেন যে, যে অঞ্চলে মানুষ না খাইয়া মরিবে, সেই দুর্ঘটনার জন্য তথাকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীকে দায়ী করিতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী চোরাকারবারের প্রশ্রয় না দিলে ইউনিয়নের মধ্যে চোরা-কারবার জাঁকিয়া উঠা কঠিন, কাজেই অন্নাভাবের সঠিক সংবাদের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীকে দায়ী করিলে যথেষ্ট সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। তবে সংবাদাদি প্রদানের দায় নিজেদের জড়াইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকায় এই সব লোক হয় তো শেষ পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া চৌকীদার প্রভৃতিকে হাত করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে সঠিক তথ্যাদি কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর নাও হইতে পারে। এই জন্য সবচেয়ে ভাল হয় যদি স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের ন্যায় জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিটিকে এই সংবাদ সরাসরি প্রেরণের এবং খাদ্যনীতি পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যপ্রণালী একেবারে ত্রুটিশূন্য না হইলে মুনাফাখোরদের উৎপাত তথা দেশবাসীর কষ্ট দূর হইবার আশা খুবই কম।

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্যধারা এই প্রদেশের অধিবাসীদের স্বার্থের অনুকূল নয়। জাতির চরম সঙ্কট সময়ে জাতীয় মন্ত্রীসভার আবশ্যকতা এখন অত্যধিক। দুর্ভিক্ষ এড়াইবার জন্য নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি বাংলায় একটি দল-নিরপেক্ষ মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা আর যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকারে খাদ্য-রপ্তানী বন্ধ করা, বাহির হইতে আমদানী ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা, সর্ব্বত্র সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা, খাদ্য সংগ্রহ ও লাভ করার বর্ত্তমান সরকারী নীতি বর্জ্জন করা, মজুত সরকারী খাদ্যের অপচয়ের জন্য সরকারী কর্ম্মচারী ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীকে পৃথক অথবা যুক্তভাবে দায়ী করা, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক পথ খুলিয়া দেওয়া, মুনাফা-খোরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ও সশ্রম কারাদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা, খাদ্য সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা, চাউলের মূল্য হ্রাস করা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবস্থানুযায়ী কৃষক প্রজা পার্টির এই সব প্রস্তাবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য এবং এইগুলি যাহাতে কার্য্যকরী হয় তজ্জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

বাংলা সরকারের হাতে মজুত শস্যের অবস্থা যেরূপই হউক, সমগ্র প্রদেশে রেশন এলাকা সম্প্রসারণ করিয়া বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণই নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। রেশন এলাকায় খাদ্য বরাদ্দ কমিতে কমিতে বর্ত্তমানে যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে লোকের প্রাণ বাঁচানই দুষ্কর। কিন্তু এই খাদ্যসঙ্কোচ যদি সারা দেশের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করিতে না পারে, তাহা হইলে রেশন এলাকায় লক্ষ লক্ষ লোকের এত দুর্ভোগ নিরর্থক। সমগ্র দেশে রেশনিং চালু হইলে গভর্ণমেণ্টের খাদ্য সংগ্রহের যেমন সুবিধা হইবে তেমনি চোরাকারবার অবশ্যই কমিয়া যাইবে। তবে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে নির্ভর করিতে হইবে জাতীয়তাবাদী নিঃস্বার্থ দেশসেবীদের লইয়া গঠিত কমিটিগুলির উপর। অবশ্য বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের কাঠামো যেরূপ তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণকর এত ব্যবস্থা হইবার আশা কল্পনাবিলাস বলিয়াই মনে হয়।

সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার জন বয়েড ওর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাব করিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সাল শেষ হইবার আগে কিছুতেই বর্ত্তমান খাদ্য সঙ্কটের অবসান হইবে না। বলা বাহুল্য, খাদ্যের দিক হইতে স্বভাবতঃ ঘাটতি বাংলাদেশের সঙ্কটও অন্ততঃ ১৯৪৮ সালের প্রথম অবধি চলিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কাজে কাজেই এখন বাংলা সরকারের দায়িত্ব বোধ থাকিলে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রকার খাদ্য পরিকল্পনাই এক সঙ্গে কার্য্যকরী করা উচিত। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা এবং সমগ্র প্রদেশে রেশন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই ভাবে সারা বাংলায় রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইলে বাংলা সরকারের পক্ষে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের ব্যবহার্য্য নিম্নশ্রেণীর চাউলের উপর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক নীতি অনুযায়ী সরকারী অর্থ সাহায্য প্রদানের সুবিধা হইবে। এই অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন এখনও যথেষ্ট, কিন্তু এদিক হইতে বাংলা সরকারের ঔদাসীন্য বিস্ময়কর। সাবসিডি হিসাবে এতদিন ব্রিটিশ সরকার বৎসরে ২৫ কোটি পাউণ্ড খরচ করিতেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের এই অর্থ সাহায্যে ব্রিটেনের জনসাধারণ কম মূল্যে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছে। এবারের নূতন বাজেটে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর-অব-এক্সচেকার ডাঃ হিউ ডাল্টন ১৯৪৬ সালের এই প্রকার সাবসিডির পরিমাণ ৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ধরিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ব্রিটেনের নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের তুলনায় ভারতের তথা বাংলার এই শ্রেণীর লোকেদের সাবসিডির প্রয়োজন অনেক বেশী। জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল বহু বিষয়ে এদেশের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ সাতসমুদ্র পারের ব্রিটিশ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্যগ্রতা দেখান, এই গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণের কল্যাণকর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সাবসিডি পরিকল্পনা তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করে না কেন?

অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য

অষ্ট্রেলিয়া একটি ক্রম উন্নতিশীল দেশ এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়া ক্রমশঃই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। ভারতবর্ষও যতই স্বায়ত্ত শাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণের অধিকতর সুযোগ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এতকাল ভারতের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল না। যুদ্ধের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক পরনির্ভরশীলতা বাড়িয়া যাওয়ায় ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের পণ্য লেনদেনের অবস্থা এখনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আশা করা যায় যত দিন যাইবে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ততই লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইবে। উভয় দেশই প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা ভারতের তুলনায় অনেক কম হইলেও অষ্ট্রেলিয়দের জীবনযাত্রার মান ভারতীয়দের তুলনায় অনেক ঊর্দ্ধে। কাজেই এই দুইদেশের বহির্বাণিজ্য প্রসারিত হইলে উভয় দেশই উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক কোন অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে, তাহা নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারত গভর্ণমেন্টের বাণিজ্য কমিশনারের সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৪৪-৪৫ সালের রিপোর্ট হইতে মোটামুটি বুঝা যাইবে। এই রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৪৫ সালের আর্থিক বৎসরে ভারত হইতে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল অষ্ট্রেলিয়ায় চালান গিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে, অর্থাৎ যুদ্ধ বাঁধিবার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ভারত হইতে মাত্র ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের পণ্য অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, যুদ্ধের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের বহু বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ভারতীয় পণ্যের এই রপ্তানী বৃদ্ধি বিশেষ আশার কথা। ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট ১ কোটি ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের অষ্ট্রেলিয় মাল ভারতে আমদানী হয়। ইহার পরবর্ত্তী বৎসরে ভারতে আমদানীকৃত অষ্ট্রেলিয় পণ্যের পরিমাণ ছিল ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড। ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় যে সব পণ্য চালান গিয়াছে তন্মধ্যে তিসি, চটের থলে, শিমুল তুলা, সুপারী, মশলার গুঁড়া, চামড়া, লাক্ষা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কার্পেটের অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর চাহিদা দেখা গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই তিসি চালান যায়। ১৯৪৩-৪৪ সালে ও ১৯৪৪-৪৫ সালে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৩১ হাজার পাউণ্ড ও ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার মূল্যের তিসি ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় চালান গিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আলোচ্য সময়ে ভারতে প্রধানতঃ মাখন, পনীর, মধু, মাংস, দুধ, সর, বিস্কুট, ময়দা, মোরব্বা প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য এবং কয়েক প্রকার ধাতু, যন্ত্রপাতি, চিনামাটির জিনিষ, কাঁচের জিনিষ, ঔষধ, সার, পশম, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি আমদানী হইয়াছে।

ভারতের বিরাট বাজারে অষ্ট্রেলিয় দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকিলেও চেষ্টা করিলে ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় পণ্য রপ্তানীর পরিমাণও অনেক বাড়াইতে পারা যায় বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে সব জিনিষ ভারতে আমদানী হয় তন্মধ্যে পশম প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র পণ্য ছাড়া অপর সকল জিনিষই ভারতে সহজেই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা চলে। পক্ষান্তরে তিসি, পাট, তুলা, চামড়া বা কার্পেটের ন্যায় যে সব দ্রব্য এখন ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী হইতেছে, তাহাদের চাহিদা ক্রমবর্দ্ধমান এবং অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারতীয় বাণিজ্য কমিশনার তাঁহার ১৯৪৪-৪৫ সালের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, পণ্যাদি প্রেরণের সময় ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ পণ্যের গুণ ও পণ্য প্রেরণের সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অষ্ট্রেলিয়ায় এই সকল দ্রব্যের কাটতি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাইবে। বাণিজ্য কমিশনার ভারতীয় ব্যবসায়ীবৃন্দকে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট পণ্য প্রেরণ সম্বন্ধে এবং সুদৃশ্য লেবেল বা মোড়ক লাগানো, সুন্দরভাবে প্যাক করা প্রভৃতি বিষয়ে যত্ন লইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি উভয় দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারের ব্যবসায়িক খুঁটিনাটির সম্পূর্ণ খোঁজখবর লইতে বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহিত তাহার বাণিজ্য প্রসারিত হইবে সত্য, কিন্তু ঘরের কাছে অষ্ট্রেলিয়ার সহিত তাহার বাণিজ্য সম্পর্ক অবশ্যই ঘনিষ্ঠতর হইবে। ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্যের যে ক্রমোন্নতি এখন দেখা যাইতেছে, সামান্য যত্ন লইলেই এবং মোটামুটি পারস্পরিক হৃদ্যতা বজায় থাকিলেই তাহা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকিবে বলিয়া মনে হয়। অষ্ট্রেলিয়ার লোক সংখ্যা ক্রমশঃ লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। এ সময় ভারতীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্যে পণ্য মান্যের দিক হইতে ভারতের পক্ষে সামান্য অনুকূল বাণিজ্যিক গতিতেই খুশী না হইয়া অথবা শুধু কাঁচামাল রপ্তানী না করিয়া বাণিজ্য কমিশনারের পরামর্শমত এবং নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্ববিধ ভারতীয় পণ্যের বৃহত্তর বাজার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে ভারতের ভবিষ্যত অর্থনীতির দিক হইতে তাঁহারা মহান অবদান রাখিয়া যাইবেন সন্দেহ নাই! ২৭।৬।৪৬

ভারতে বৃটিশ মন্ত্রিমিশন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

২

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণার পর ৩রা জুন নয়াদিল্লীতে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁর বাসভবনে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে। সভায় সমস্ত সদস্যই উপস্থিত ছিলেন, ইহা ছাড়া মৌলানা সব্বির আহম্মদ ওসমানী বৈঠকে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। সিমলায় মন্ত্রিমিশন ও বড়লাটের সহিত মিঃ জিন্নার যে সকল আলোচনা হইয়াছিল এবং ৩রা জুন অধিবেশন বসিবার পূর্ব্বে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের সময় মিঃ জিন্নার যে কথাবার্ত্তা হয়, ওয়ার্কিং কমিটির সমক্ষে তিনি তাহাই বিবৃত করেন। পরদিন দুইবার অধিবেশন বসে এবং তাহাতেই মিশন প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনা শেষ করেন। ৫ই জুন প্রাতে মুসলীম লীগ কাউন্সিলের যে বৈঠক হয় তাহাতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মতামত পেশ করা হয়। এই লীগ কাউন্সিল মিঃ জিন্নার মতে তাঁহাদের পার্লামেন্ট। বিভিন্ন প্রদেশের নির্ব্বাচিত ৪৭৫জন প্রতিনিধি ইহার সদস্য। কাউন্সিলের উদ্বোধনকালে লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্না বলেন—বৃটিশ ও হিন্দুগণ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় যদি সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অসম্মতি সত্ত্বেও আমরা উহা অর্জ্জন করিব। পাকিস্থান ছাড়া আমাদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই। মন্ত্রিমিশন সার্ব্বভৌম পাকিস্থান গঠনকে অস্বীকার করায় তীব্র নিন্দার কারণ হইয়াছেন। তবে যদিও তাঁহারা কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছেন তাহা হইলেও আসলে পাকিস্থানের ভিত্তি তাঁহাদের প্রস্তাবের মধ্যে রহিয়াছে। হিন্দুগণ এই প্রস্তাব পাইয়া বড়ই খুশী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা একটি চিনি মাখান বড়ি মাত্র। চিনি গলিয়া যাইলেই আসল বড়ি বাহির হইয়া পড়িবে। তিনি আরও বলেন যে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তবে লীগ কাউন্সিল এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তারপর কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যকেই তিনি নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানান। মিঃ জিন্না বলেন যে কাউন্সিল হইতে সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক এবং এই কমিটিই গোপন বৈঠকে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক।

পরদিন মুসলীম লীগ কাউন্সিলের সভায় অধিকাংশ সদস্যের ভোটে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রায় তিনশতাধিক উপস্থিত সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৩জন সদস্য ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সভায় অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের সহিত লীগের পক্ষ হইতে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য মিঃ জিন্নার উপর সমস্ত ভার দেওয়া হয়।

মিঃ জিন্নাকে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দেখিয়া দেশবাসী অনেকেই খুশী হন। কারণ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই সমস্ত ফাঁসিয়া গিয়াছে। এইবারও প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লির ১৫ই মার্চ্চের বক্তৃতার পর হইতে মন্ত্রিমিশনের ঘোষণার পর পর্য্যন্ত যত প্রকার সম্ভব আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্না শেষ পর্য্যন্ত দেখিলেন যে প্রতিবাদ করিয়া বিশেষ ফলোদয় হইবে না; তাই যতটা পাওয়া যায় এই ভাবিয়াই মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

৬ই জুন হইতে বোম্বাইএ দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের মন্ত্রিদের সম্মেলন শুরু হয়। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং নবগঠিত শাসনতন্ত্র ও অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির কি ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হইবে তাহাই আলোচনা হয়।

৯ই জুন বিভিন্ন শিখদলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক পন্থিক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মাষ্টার তারা সিং শিখদিগকে মিলিতভাবে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে বলেন। পরদিন সহস্রাধিক শিখ তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মীয় আকালী তখ্‌তের সম্মুখে বিরোধিতা

করিবার শপথ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার সময়ে প্রায় এক লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল।

৯ই জুন অপরাহ্নে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল। বৈঠকে এগারজন সদস্য ব্যতীত মহাত্মা গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। ১৬ই মে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পর কংগ্রেস তিনদিনব্যাপী যে সভার অধিবেশন করেন সেই অধিবেশনে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের নিকট হইতে তাঁহাদের পরিকল্পনার অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ বিষয়গুলির স্পষ্ট বিবরণ চাওয়া হয়। সেই সকল প্রশ্নের উত্তরে বড়লাট যাহা জানান ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি আজাদ সদস্যদের সমক্ষে তাহাই বিবৃত করেন। বড়লাট রাষ্ট্রপতি আজাদের নিকট অস্থায়ী গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা ও কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে যে পত্র দেন ওয়ার্কিং কমিটি তাহা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। বড়লাট জানান যে, সমস্ত ব্যাপারে অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেন্টকে অবাধে কাজ করিবার সুবিধা দান করা হইবে। বস্তুতঃ অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট স্বাধীন গভর্ণমেন্টের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাহির হইতে ইহার উপর কোনও চাপ দেওয়া হইবে না।

ঐদিন ওয়ার্কিং কমিটি অস্থায়ী গভর্ণমেন্টে সদস্য নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সংখ্যা সাম্যনীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসকে :জানান যে অর্ন্তবর্ত্তীকালীন গভর্ণমেন্টে মোট ১২জন সদস্য থাকিবে, তন্মধ্যে ৫জন কংগ্রেসের, ৫জন লীগের, অপর দুইজনের মধ্যে একজন শিখ আর একজন ভারতীয় খৃষ্টান—তাঁহাদিগকে বড়লাট মনোনীত করিবেন। বড়লাট কংগ্রেসের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই মিঃ জিন্নাকে এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টে মুসলীম লীগকে কংগ্রেসের সমান আসন দেওয়া হইবে, এমনকি লীগ সদস্যদের কোন্ কোন্ বিভাগের ভার দেওয়া হইবে তাহারও আভাষ দিয়াছিলেন। মিঃ জিন্না এই আশ্বাসেই আগ্রহের সহিত মন্ত্রিমিশনের দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উভয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের এই অযৌক্তিক সংখ্যা-সাম্যের প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন।

১১ই জুন মধ্যাহ্নে মহাত্মা গান্ধী লাটভবনে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা কালে বড়লাট মহাত্মা গান্ধীকে মিঃ জিন্নার সংখ্যা-সাম্যের দাবী মানিয়া লইবার জন্য কংগ্রেসে নিজ প্রভাব প্রয়োগের অনুরোধ জানান। এই সংখ্যাসাম্যের নীতি অযৌক্তিক ও অন্যায় বলিয়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে জানাইয়া দেন। ইহাছাড়া গণপরিষদে বাঙলা ও আসামের শ্বেতাঙ্গদের ভোট এবং বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানের আপত্তি জানান।

১২ই জুন সন্ধ্যার মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনাসভায় গণপরিষদে ইউ-রোপীয়ানদের ভোটাধিকারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন তাঁহারা শাসকজাতির লোক। আইনতঃ সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে, এমন কি নির্ব্বাচনে ভোটদানেরও অধিকার তাঁহাদের নাই। বাঙলা ও আসামের শ্বেতাঙ্গদের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী বলেন—ভগবানের দোহাই তাঁহারা যেন দরিদ্র ভারতবাসীর শাসনকার্য্যে এবার হস্তক্ষেপ না করেন। তিনি ভারতের শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ করিয়া বাঙলা ও আসামের শ্বেতাঙ্গদের গণপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণে জিদ না করিতে আবেদন জানান।

ইহার কয়েকদিন পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের শ্বেতাঙ্গদল তাঁহাদের এক মিলিত সভায় ঘোষণা করেন যে তাঁহারা গণপরিষদে কোন সদস্য প্রেরণ করিবেন না।

ইহার পরে বড়লাট মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা করিয়া আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাতে তিনি জানান যে অস্থায়ী গভর্ণমেন্টে ১২ জনের পরিবর্ত্তে ১৩ জন সদস্য থাকিবে। এই ১৩ জনের মধ্যে ১ জন তপশীলী হিন্দু লইয়া কংগ্রেসের ৬ জন, মুসলীম লীগের ৫ জন, শিখ সম্প্রদায়ের ১ জন ও ভারতীয় খৃষ্টান ১ জন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা লীগের অসঙ্গত দাবী কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না। ভারতের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা একচতুর্থাংশের কম বই বেশী নহে। মুসলীম লীগের বাহিরে কংগ্রেস, জমিয়ৎ-উল-উলেমা, মোমিন, অহ্রার প্রভৃতি বিভিন্ন দলে অসংখ্য মুসলমান রহিয়াছে। ইহাদের বাদ দিয়া মুসলীম লীগকে ভারতের সকল মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করিলেও তাঁহারা অস্থায়ী গভর্ণমেন্টে মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশের বেশী দাবী করিতে পারেন না। কোনও গণতান্ত্রিক নীতির বিচারে এক-চতুর্থাংশকে এইরূপ প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত নহে। লীগ অধিকাংশ মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মাত্র, আর কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী মুসলমান সহ ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস ১৫ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী সরকার গঠনের দাবী করেন এই ১৫ জনের মধ্যে ১০ জন কংগ্রেসের ও ৫ জন লীগের।

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত বিশেষ করিয়া আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত আলোচনা যাহাতে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত না হয় তাহার জন্য মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট যথেষ্ট চেষ্টা করিতে থাকিলেন। ১৬ই জুন তারিখে তাঁহারা অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠন সম্পর্কে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে জানান যে ১৪ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠিত হইবে। তাঁহারা নিম্নলিখিত এই ১৪ জনকে অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন।

কংগ্রেস—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু
সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব
সি রাজা গোপালাচারী
জগজীবন রাম (অনুন্নত)

লীগ—

মিঃ এম, এ, জিন্না

নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ

আবদুর রব নিস্তার

খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন

নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ

শিখ—

সর্দার বলদেব সিং

ভারতীয় খৃষ্টান—

ডাঃ জন মাথাই

পার্শী—

স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার

তাঁহারা বিবৃতিতে আরও জানাইলেন যে, আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ অস্বীকৃত হইলে পরামর্শক্রমে অপর কাহাকেও তাঁহার স্থলে পুনরায় আমন্ত্রণ করা হইবে।

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন বলিলেন, এখন যে ভাবে অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠিত হইবে ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য ইহাকে নজীর হিসাবে গণ্য করা হইবে না। উপস্থিত অসুবিধা অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই একটি শক্তিশালী সর্ব্বদলীয় সরকার গঠনের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এই বিবৃতিতেই আরও বলা হইল যে, কংগ্রেস ও লীগ অথবা উহাদের মধ্যে একটি দল যদি উপরোক্ত নিয়মে কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে ১৬ই মে তারিখের ঘোষণা মানিতে ইচ্ছুক এবং যথাসম্ভব প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া অস্থায়ী সরকার গঠন করা হইবে।

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের প্রকাশিত এই অস্থায়ী গভর্ণমেন্টের সদস্য-তালিকায় দেখা যায় যে মুসলীম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যে কয়জন মুসলমান সদস্য অস্থায়ী সরকারে আমন্ত্রিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই লীগদলভুক্ত। অতএব অস্থায়ী গভর্ণমেন্টে যোগদানে লীগের কোনও আপত্তি রহিল না। তাহারা যোগদানের জন্য প্রস্তুতই রহিলেন। মুসলীম লীগ দেখিলেন যে বড়লাট যদিও ১২ জনের পরিবর্ত্তে ১৪ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠন করিতে যাইতেছেন তাহা হইলেও লীগকেই একমাত্র মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে, এবং বর্ণহিন্দুর সহিত মুসলমান সদস্যের সংখ্যাসাম্য রক্ষা করা হইয়াছে। মিঃ জিন্না বড়লাটকে শুধু এইটুকু জানাইয়া দিলেন যে আর যেন কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা না হয়। বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের এই প্রস্তাবে লীগের দাবীকে যেমনি মানিয়া লওয়া হইয়াছে কংগ্রেসকে ঠিক তেমনি ভাবেই অস্বীকার করা হইয়াছে। কংগ্রেস ইহার জন্মকাল হইতেই জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, দেশের মুক্তি সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কত ক্লেশ, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহারাই আজিকার এই রাজনৈতিক আলোচনার সুযোগ আনিয়াছে। কিন্তু বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন কংগ্রেসকে মুসলমানেরও প্রতিষ্ঠান বলিয়া অস্বীকার করিলেন। মন্ত্রিমিশন গত তিনমাস যাবৎ মৌলানা আজাদকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে জানিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা চালাইলেন, তবুও তাঁহারা কংগ্রেসকে মুসলমানেরও প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা অস্থায়ী গভর্ণমেন্টে মুসলমান প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা হইতে কংগ্রেসকে বঞ্চিত করিলেন। এমন কি মুসলমানপ্রধান উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে যেখানে কংগ্রেসী মুসলমানদেরই আধিপত্য রহিয়াছে, লীগের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, সেখান হইতেও একজন লীগ সদস্যকে মনোনীত করা হইল।

কংগ্রেস বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের এই প্রস্তাব কখনই স্বীকার করিতে পারেন না। ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইলে কংগ্রেসকে তাহার আত্মসত্তার বিলোপ করিতে হয়। এতদিনের প্রতিষ্ঠা তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। মিশন কংগ্রেস মনোনীত শিখ ও ভারতীয় খৃষ্টান সদস্য গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মিঃ জিন্নাকে তুষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেস মনোনীত জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে গ্রহণ করিলেন না। কংগ্রেস অস্থায়ী গভর্ণমেন্টে ডক্টর জাকির হোসেনের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিশন তাঁহার স্থানে গতবারের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী মুসলমানের নিকট পরাজিত মিঃ আবদুর রব নিস্তারকে গ্রহণ করিলেন। ইহা ছাড়া কংগ্রেস অস্থায়ী গভর্ণমেন্টে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই মিশন হরেকৃষ্ণ মহাতাবকে তাঁহার স্থানে গ্রহণ করেন। কংগ্রেস ইহারও তীব্র প্রতিবাদ জানান।

অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেন্টে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান, একজন মহিলা সদস্য না লওয়ায় এবং শরৎচন্দ্র বসুর স্থলে হরেকৃষ্ণ মহাতাবকে গ্রহণ করায় মহাত্মা গান্ধী মিশন প্রস্তাবের বিশেষ প্রতিবাদ করেন। তাহা ছাড়া সরকার পক্ষের স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার এবং নির্ব্বাচনে পরাজিত লীগ সদস্য আবদুর রব নিস্তারকে গ্রহণ করাতেও তিনি আপত্তি জানান।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটকে জানাইলেন যে শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ারের স্থলে অন্য কোনও পার্শীকে লইতে হইবে। আর প্রস্তাবিত অস্থায়ী সরকারে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্য নাই, উহাতে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং লীগের ৫ জনের অতিরিক্ত আর একজন লীগ সদস্য গ্রহণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হউক। অস্থায়ী সরকারে আরও দুইজন অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ করা যদি একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে কংগ্রেসে যে ৫ জন বর্ণ হিন্দুর নাম করা হইয়াছে তাহার একজনের পরিবর্ত্তে কংগ্রেস একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রেরণ করিবে, তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের এই দাবীর পর বড়লাট হরেকৃষ্ণ মহাতাবের পরিবর্ত্তে শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় আপত্তিতেও

তেমন কোন বিতর্কের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু জটিলতার সৃষ্টি হইল জাতীয়তাবাদী মুসলমান লইয়া। মিঃ জিন্না বড়লাটকে এক পত্রের দ্বারা জানাইয়া দিলেন যে, কোনও বর্ণহিন্দুর পরিবর্ত্তে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে লওয়া হইলে লীগ তাহা মানিয়া লইবে না। মিঃ জিন্নার এই অসঙ্গত ও অন্যায় দাবীই বিঘ্নের সৃষ্টি করিল। কংগ্রেসের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ৫ জন হিন্দু এবং ৬ জন মুসলমান অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে স্থান পাইত। কিন্তু মিঃ জিন্না এমনি গোঁ ধরিয়া বসিলেন যে কোনও জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে মুসলমানের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিতে আদৌ স্বীকৃত হইলেন না। বড়লাটও মিঃ জিন্নার এই জিদের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। বাধ্য হইয়াই অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্টে যোগদানের প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস বড়লাট ও মিশনের ১৬ই জুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কংগ্রেস যে হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলিত প্রতিষ্ঠান—এই সম্মান বিসর্জ্জন দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

২৪শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিমিশন ও বড়লাটের ১৬ই জুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ঐদিন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের পর একটি ক্ষুদ্র পত্রে কমিটির সিদ্ধান্ত বড়লাটকে জানাইয়া দেওয়া হয়। পরদিন কংগ্রেস ছয়শত শব্দ সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা, কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের মত ইহারও শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, কংগ্রেস তাহার জাতীয়রূপ পরিত্যাগ করিয়া কোন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে পারেন না। কৃত্রিম বা অসঙ্গত সংখ্যা-সাম্যও তাঁহারা মানিতে পারেন না। আর কোনও সম্প্রদায়কে কোন বিষয় বাতিল করিবার অধিকার দিতেও সম্মত নহে।

এইভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী দীর্ঘ আলোচনার পর মন্ত্রিমিশনের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব বর্জ্জন করিয়া মিশনের দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেসের নিকটে মিশন প্রস্তাবের একটি গ্রহণ ও একটি বর্জ্জন ছাড়া উপায় রহিল না।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করায় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর আশির্ব্বাদ ও পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। গণপরিষদের কাজকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের নিকট তাঁহার আবেদন জানান। তিনি তাঁহাদিগকে গণপরিষদের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে বলেন এবং নিজেরও পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে পর ২১শে জুন বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন একযুক্ত বিবৃতিতে জানান যে, সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের যে আয়োজন চলিতেছিল তাহা সম্ভবপর হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত। তবে আমাদের ১৬ই জুন তারিখের বিবৃতির অষ্টম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পুনরায় এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। যে পর্য্যন্ত না একটি অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকার গঠিত হইতেছে ততদিন ভারতের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের লইয়া একটি "কেয়ারটেকার" বা তত্ত্বাবধায়ক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে মন্ত্রি-মিশনকে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্টের সমক্ষে তাঁহাদের বিবৃতি দিতে হইবে। তাঁহাদের পক্ষে আর ভারতে অবস্থান সম্ভবপর নয়। অতি শীঘ্রই তাঁহারা দিল্লী ত্যাগ করিবেন। দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্মতি থাকায় এখন শাসনতন্ত্র রচনার কার্য্য চলিতে পারিবে বলিয়া মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট আনন্দ প্রকাশ করেন।

এদিকে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের ১৬ই জুনের ঘোষণা অনুযায়ী অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠন আপাততঃ স্থগিত হওয়ায় লীগ প্রেসিডেণ্ট মিঃ জিন্না ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তিনি জানাইলেন, বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনের এইরূপ কার্য্যকে মুসলীম লীগ কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারেন না। মিঃ জিন্না জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, ১৬ই জুনের বিবৃতির অষ্টম অনুচ্ছেদে ইহা উল্লেখ রহিয়াছে যে কোনদল অন্তর্বর্ত্তী-কালীন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে ইচ্ছুক থাকিলে তাহাদের লইয়াই সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। মুসলীম লীগ রাজী থাকায় তাহাকে লইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন না করার জন্য মিঃ জিন্না বড়লাট ও মন্ত্রিমিশনকে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দায়ী করিলেন।

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন মিঃ জিন্নার এই অভিযোগ খণ্ডন করিয়া বলেন যে তাঁহারা আদৌ বিশ্বাসভঙ্গ করেন নাই। তাঁহারা ১৬ই জুনের বিবৃতির অষ্টম অনুচ্ছেদ অনুযায়ীই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইলেন, অষ্টম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যদি কোনও দল অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে যোগ দিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে ১৬ই মে তারিখের মূল প্রস্তাব মানিয়া লইতে ইচ্ছুক, যথাসম্ভব প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া অস্থায়ী সরকার গঠিত হইবে। কংগ্রেস ১৬ই মের মূল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে যাইয়া কংগ্রেসকেও তাহার মধ্যে আনিতে হয়। তাই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন আপাততঃ বন্ধ থাকিল। কিছুদিনের মধ্যেই আবার অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিষয় নূতন করিয়া আলোচনা করা যাইবে। মিঃ জিন্না আরও অভিযোগ করেন যে তাঁহার ওয়ার্কিং কমিটি অধিবেশনের শেষে তাঁহাকে কংগ্রেসের অস্বীকৃতির কথা জানান হয়। কিন্তু বড়লাট বলেন যে ঐদিন ২৫শে জুন দুপুরে কংগ্রেসের অস্বীকৃতি প্রাপ্তির পর অপরাহ্নে মিঃ জিন্নাকে আহ্বান করিয়া তাঁহারা উহা জানাইয়াছেন এবং অষ্টম অনুচ্ছেদের যেভাবে অর্থ করিয়াছেন তাহা জানাইয়া তাঁহার মত চাহেন। ঐদিন সন্ধ্যায় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে। অবশেষে মিঃ জিন্না গণপরিষদের নির্ব্বাচন আপাততঃ বন্ধ রাখিবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বড়লাট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

২৯শে জুন এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে যতদিন না বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত পুনরায় আলাপ আলোচনা চালাইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, ততদিন একটি অস্থায়ী তদারকী

সরকার কাজ করিবে। ইহা বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন। তদনুসারে সম্রাট শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে স্যার জর্জ্জ স্পেন্স, স্যার এরিক কোট্‌স, স্যার রবার্ট হাচিংস, স্যার কণরান স্মিথ, গুরুনাথ বেউর, স্যার আকবর হায়দারী, মিঃ এ, এ, ওয়াগ ও জঙ্গীলাট স্যার ক্লড অচিনলেকের নাম অনুমোদন করিয়াছেন।

বড়লাট সদস্যদিগের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে দপ্তর বণ্টন করিয়াছেন—

স্যার ক্লড অচিনলেক—সমর

স্যার গুরুনাথ বেউর—বাণিজ্য ও কমনওয়েলথ রিলেসন্স

স্যার এরিক কোট্‌স—অর্থ

স্যার কনরানস্মিথ—যুদ্ধকালীন যানবাহন, রেলওয়ে, বিমান ও ডাক

স্যার রবার্ট হাচিংস—কৃষি ও খাদ্য

স্যার আকবর হায়দারী—শ্রম, পূর্ত্ত, খনি, বিদ্যুৎ, প্রচার, স্বাস্থ্য ও চারুকলা

স্যার জর্জ্জ স্পেন্স—শিক্ষা ও আইন

মিঃ এ, এ, ওয়াগ—স্বরাষ্ট্র, শিল্প ও সরবরাহ।

৩রা জুলাই বড়লাটের পূর্ব্বের শাসন পরিষদের সদস্যদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়।

২৯শে জুন তারিখে মন্ত্রিমিশন দিল্লী ত্যাগ করেন। বিমান ঘাঁটিতে বিমানে উঠিবার পূর্ব্বে ভারত সচিব লর্ড পেথিকলরেন্স সাংবাদিকদের বলেন—আমরা যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাতে যদি শীঘ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের সুবিধা হইয়া থাকে তবে তাহা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে।

ঐদিন রাত্রে করাচীতে সিন্ধু গভর্ণরের অতিথিরূপে থাকিয়া পরদিন ৩০শে জুন সকালে লর্ড পেথিকলরেন্স, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স সদলবলে করাচী হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন।

মন্ত্রিমিশন প্রায় তিনমাসকাল ভারতে অবস্থান করিয়া আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথে কিছুটা আলোক সম্পাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে স্বাধীনতার বীজ রহিয়াছে। তাই কংগ্রেস গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করায় তিনি ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পূর্ণ সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মিশন-প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত সেই স্বাধীনতার বীজকে আজ মহীরুহে পরিণত করিবার দিন আসিয়াছে। আজ ব্যক্তিগত দলগত স্বার্থের কথা উপেক্ষা করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মুক্তিকাম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের লইয়া গণ-পরিষদকে একটি প্রকৃত সার্ব্বজনীন পরিষদে পরিণত করিতে হইবে। খ্যাতনামা দেশনায়কেরা স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্র গঠনে অগ্রণী হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য।

মুক্তিসেনা

শ্রীশান্তশীল দাশ

নব জাগরণ আসে দিকে দিকে,
জাগার লগ্ন এসেছে আজ,
দীর্ঘ দিনের সুপ্তি টুটেছে
বন্দীরা সাজে যুদ্ধ সাজ।
মৃত্যুরে আর করে না শংকা,
ঘুচে গেছে আজ মৃত্যুভয়,
মরণের কাছে বুক পেতে দেয়
কিশোর সেনানী দীপ্তিময়।
দুর্গম পথ, আঁধার রাত্রি,
দুর্যোগ মাঝে শংকাহীন
মুক্তি সেনানী চলে দলে দলে
অবিরাম গতি, রাত্রি দিন।
অসংখ্য 'মার' বাধা দেয় পথে
নির্ম্মম হাতে অস্ত্র হানে;
রক্তে ধরণী লাল হ'য়ে যায়,
মরণেও নাহি শংকা মানে।

চক্ষে তাদের নূতন স্বপ্ন,
অদ্ভুত সাহস বক্ষে ধরে,
চলেছে আপন লক্ষ্যের পথে
বিপদ বিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে।
দেবতার বরে জয়ী আজ তারা,—
দুর্গম যত পন্থা হো'ক,
আসুক ঝঞ্ঝা, কাল মহামারী,
সহস্র বাধা, মৃত্যুশোক,
তাদের গতি যে দুর্দমনীয়
রোধিবার আছে শক্তি কার?
'মাভৈঃ' মন্ত্রে চলে বীরদলে
অম্বর ভেদি হুঙ্কার।
নূতন-প্রভাত-সূর্য তাদের
শিরে দেয় তার আশীষ শত,
দিকে দিকে আজ ওঠে জয়গান,
বিশ্ব জগত শ্রদ্ধানত।

সাময়িকী

মধ্যবিত্তগণের দুরবস্থা—

বাঙ্গলা দেশে দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহ কিরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, সে সম্বন্ধে ভারতীয় সংখ্যা-বিজ্ঞান সমিতি গত ১৯৪৫ সালের মে হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৪ মাস তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৮ শত পরিবারের হিসাব সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন—যে সকল পরিবারের মাসিক আয় ৫ টাকা বা তাহা অপেক্ষা কম, তাহাদের আয়ের শতকরা ৮৯ ভাগ শুধু খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। আর যাহাদের আয় ৫১ টাকা হইতে ১০০ টাকার মধ্যে তাহাদের আয়ের শতকরা ৭৮ ভাগ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। কাজেই শিক্ষা, চিকিৎসা, কাপড় চোপড়, যাতায়াত, আমোদ প্রমোদ, সামাজিকতা প্রভৃতির জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হয়। মধ্যবিত্ত পরিবার-সমূহের ব্যয় কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, সমিতি তাহারও হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালে যে পরিবারের মাসিক ব্যয় ছিল ১০০ টাকা, ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে তাহার ব্যয় হইয়াছে ২৮২ টাকা—অথচ আয় কাহারও ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। এই ত আহারের অবস্থা। কলিকাতা সহরে বাসস্থানের অবস্থা আরও ভীষণ। প্রতি পরিবারের লোক সংখ্যা ৬ জন ধরিলে দেখা যায়, মোট ৪২৮টি পরিবারের মধ্যে ১৯০টি পরিবার মাত্র ১ খানি ঘরে, ১৪৭টি পরিবার প্রত্যেকে মাত্র ২ খানি ঘরে বাস করে। ৪২৮এর মধ্যে মাত্র ২৫টি পরিবার ৬ খানি করিয়া ঘর-ওয়ালা বাড়ীতে বাস করে। সমিতি এই হিসাব প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কি মধ্যবিত্তগণের এই দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কোন ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

রেল ধর্ম্মঘটের নোটীশ ও আপোষ—

সমগ্র ভারতের রেলকর্ম্মীরা গত ২৮শে জুন হইতে এক-যোগে ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করার নোটীশ দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে যে অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হইত, যুদ্ধ শেষে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে, অথচ বাজারে জিনিষের দাম না কমায় ঐ আয়ে তাহাদের পক্ষে সংসার প্রতিপালন করা অসম্ভব হইয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনার ব্যবস্থা করায় আপাততঃ ধর্ম্মঘট বন্ধ আছে। তিনটি দাবীই প্রধান ছিল (১) যুদ্ধের সময় যে সকল অস্থায়ী লোক লওয়া হইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মচ্যুত করা হইবে না—তাহাদের চাকরী বজায় থাকিবে (২) বেতন, ভাতা ও চাকরীর অন্যান্য সর্ত্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে—সে জন্য যে কমিশন বসিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ মত রেল কর্তৃপক্ষ সমস্ত উদ্বৃত্ত আয় কর্ম্মীদিগকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। বেতন ও ভাতার পরিমাণ বাড়িবে। (৩) যতদিন না কমিশনের নির্দ্দেশ পাকাভাবে গৃহীত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মীরা অধিকতর ভাতা প্রভৃতি পাইবেন। দেশের সর্ব্বত্র লোক অভাবগ্রস্ত—কাজেই রেল-কর্ম্মীরা সকলের কথা বিবেচনা করিয়া নিজেরা অপরকে অসুবিধার মধ্যে না ফেলিয়া এই সকল ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে রেল কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমান প্রতিশ্রুতি মত কাজ করিয়া রেল-কর্ম্মীদিগের অসুবিধা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

কাশ্মীর রাজ্য ও পণ্ডিত নেহরু—

কাশ্মীর রাজ্যে প্রজা সাধারণের সহিত রাজার বিরোধ চলিতেছে। তাহার ফলে প্রজাদলের নেতা সেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সেখ আবদুল্লার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা ও রাজার সহিত প্রজাদের আপোষ করিবার জন্য কাশ্মীর যাইতেছিলেন। রাজার লোক তাঁহাকে বাধা প্রদান ও গ্রেপ্তার করিয়াছিল। পণ্ডিত নেহরু নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনের সভাপতি: যেখানে দেশীয় রাজাদের সহিত প্রজাদের বিরোধ বাধে, পণ্ডিত নেহরু তথায় যাইয়া বিরোধ মিটাইয়া

দিয়া থাকেন। কাশ্মীরের মহারাজা তাহা না করিয়া পণ্ডিতজীকে গ্রেপ্তার করায় সারা ভারতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজা পণ্ডিতজীর সহিত পরামর্শ করিয়া আপোষ ব্যবস্থা করিলে তাঁহার সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি তাহা না করায় রাজ্যের অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া যাইবে। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত মহারাজা পণ্ডিতজীকে আটক না রাখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন ও তাঁহাকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বৃটীশ ভারতের প্রজারা যে সময় স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন পণ করিয়া চেষ্টা করিতেছে, সে সময় কাশ্মীরের মহারাজা কি করিয়া যে প্রজাদিগকে বলপ্রয়োগ দ্বারা শাসন করিতে চাহেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না।

খুলিয়াছে। তাহার ফলে মোট কলেজের সংখ্যা হইল ১০৫টি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা দিন দিন কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা এই কলেজের সংখ্যার হিসাব হইতেই বুঝা যায়। গত ১০ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪২টি নূতন কলেজ খোলার অনুমতি দিয়াছেন। এ বৎসর ১৭টি স্থান হইতে নূতন কলেজ খোলার অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল—১০টি স্থানকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সহর ছাড়া গ্রামেও যে কলেজ চালান যায়, লোক এখন তাহা বুঝিয়াছে। সে জন্য ৭টি গ্রামে নূতন কলেজ হইয়াছে। ১২টি কলেজে শুধু বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তন্মধ্যে ৮টি বাঙ্গালায় ও ৪টি আসামে অবস্থিত। বাঙ্গালায় মৈমনসিংহ জেলা আয়তনে



নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন—আড়িয়াদহ

বাঙ্গালা ও আসামে কলেজ—

গত বৎসর বাঙ্গালা ও আসামে মোট ৯৫টি মাত্র কলেজ ছিল। বাঙ্গালায় ছিল ৭৯টি ও আসামে ছিল ১৬টি। এ বৎসর বাঙ্গালায় ৭টি ও আসামে ৩টি নূতন কলেজ

সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেখানে ৪টি কলেজ চলিতেছে। বাঙ্গালায় মেডিকেল শিক্ষার স্থানের অভাব অত্যন্ত বেশী। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এবার ১১৫ জন ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ১১৭ জন নূতন ছাত্র গ্রহণ করা হইবে।

দুইটি কলেজে প্রবেশার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১০০০ ও ১১৪০ জন। কাজেই বহু ছাত্রই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে না। গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হইয়া এ বাবদে অধিক অর্থ ব্যয় করিলে উচ্চ শিক্ষার প্রসার অনেক অধিক হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—

রেঙ্গুণে 'নেতাজী ভাণ্ডার কমিটী'র সদস্যগণের বিচারে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের গত ১লা জুলাই বিমানে রেঙ্গুন যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঝড় বৃষ্টির জন্য সেদিন কোন বিমান রেঙ্গুন যাত্রা করিতে পারে নাই, শরৎবাবুকে দমদম বিমান ঘাঁটি হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে যোগদানের জন্য ৩রা জুলাই রেলে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ৮ই জুলাই বিমানে তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার কথা। ২০শে জুলাই নাগাদ তিনি রেঙ্গুনে যাইবেন।

যুক্তপ্রদেশে তদন্ত আরম্ভ—

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী অনাচার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস দলের মন্ত্রীসভা তাঁহাদের সকলের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত উত্তর বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলার ব্যবস্থা করা হইবে।

কাগজের কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব—

শ্রীযুক্ত কে, কে, সেন চট্টগ্রামবাসী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। গত ১৭ই জুন বাঙ্গালার সাময়িক পত্র সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্রিকা অফিসে সম্বর্দ্ধনা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন—'আমি কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করার সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিয়াছি। বাঙ্গলায় এত অধিক কাগজ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের একটিও কাগজের কল নাই। চট্টগ্রাম জেলায় ২০ মাইল দীর্ঘ ও ২০ মাইল প্রস্থ এক জঙ্গল আছে। তথায় প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। সেই বাঁশ দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিলে সারা বাঙ্গালার অভাব দূর করা যাইবে। গঙ্গার ধারে বা কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীর ধারে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া একটি কল প্রতিষ্ঠা করিলে প্রত্যহ ১৫।২০ টন কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। সেই কাগজ বাজারে ৯ পয়সা পাউণ্ডের স্থলে ৫ পয়সা পাউণ্ডে বিক্রয় করা চলিবে। শ্রীযুক্ত সেন যাহা বলিয়াছেন, বাঙ্গালার ধনী ব্যবসায়ীদের সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

শ্রীমান সুব্রত রায়চৌধুরী—

দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসী শ্রীযুত গুণেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুব্রত তাঁহার বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের জন্য ছাত্রাবস্থাতেই খ্যাতি



শ্রীযুক্ত সুব্রত রায়চৌধুরী

করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে যাইয়াও ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ও তথায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া সুনাম লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়াছেন। পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য তাঁহাকে 'একজিবিসন' নামক বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে। এবার গণিত পরীক্ষায় শ্রীযুত সভাপতি ও অর্থনীতি শাস্ত্রে শ্রীযুত আই-জে-পেটেল নামক দুইজন ভারতীয় ছাত্রও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতা পুস্তকপ্রকাশসংঘের সভাপতি শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে প্রকাশক সংঘ গত ৪ঠা মে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সভায় কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সভাপতিত্ব করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য রমেশবাবু পুস্তক প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সভায় রমেশবাবু তাঁহার অভিভাষণে প্রকাশকগণকে সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার সঙ্গে পুস্তক ব্যবসায় চালাইতে অনুরোধ করেন।



শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিদায় সম্বর্দ্ধনা

ঘুস গ্রহণ ও চোরা বাজার—

মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত টি প্রকাশম্ মাদ্রাজে ঘুস গ্রহণ ও চোরা বাজার বন্ধ করিবার জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই নূতন বিভাগে যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহাদের নাম বা পরিচয় প্রকাশ করা হইবে না। এমন কি কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী এই বিভাগে যাইবেন, তাহাও গোপন থাকিবে। এই বিভাগের লোকগণ বাজারে বাজারে ঘুরিয়া সাধারণের অভাব অভিযোগের কথা কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন। এখন সকল দোকানী প্রত্যেক খরিদ্দারকে ঐ বিভাগের লোক মনে করিয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতেছে—ফলে মাদ্রাজে ঘুস-গ্রহণ ও চোরা বাজার কয়দিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চোরা বাজার ধরিবার জন্য এই গোয়েন্দার দল গঠন মাদ্রাজে অসামান্য সাফল্য আনয়ন করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় চোরা বাজার ও ঘুস গ্রহণ ব্যবস্থা অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশি। বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডল কি শ্রীযুত প্রকাশমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারেন না?

'ইলাবাসে' নবীনচন্দ্র উৎসব—

গত ৪ঠা মে কলিকাতা বালীগঞ্জ হিন্দুস্থান পার্কে কবি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের বাসগৃহ ইলাবাসে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনের উদ্যোগে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক সভা হইয়া গিয়াছে। কবি



শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সভাপতিত্বে নবীনচন্দ্র শতবার্ষিকী

ফটো—নীরেন ভাদুড়ী

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সভায় পৌরহিত্য করেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত কালীপদ তর্কাচার্য্য, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার, শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এবং সভাপতি মহাশয় স্বয়ং কবি নবীনচন্দ্রের প্রতিভার আলোচনা করিয়াছিলেন।

পরলোকে বাণী দেবী—

অধ্যাপক কবি শ্রীযুত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাণী দেবী গত ৩০শে জুন রবিবার টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র ২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিতেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি নিজ জীবন গঠন করিয়াছিলেন।

ব্যবস্থা পরিষদে প্রথম সভা—

গত ১৫ই মে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের প্রথম অধিবেশনে লীগ দলের মনোনীত খাঁ বাহাদুর নুরুল আমিন ও মিঃ তোফাজ্জল আলি যথাক্রমে পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিরোধী প্রার্থীরা কম ভোট পাইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন।

পরলোকে প্রেমসুন্দর বসু—

ভক্তসাধক হরিসুন্দর বসুর পুত্র অধ্যাপক ডাক্তার প্রেমসুন্দর বসু গত ২৭শে এপ্রিল ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার ভাগলপুরস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রেমসুন্দরবাবু পণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রাণ ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি ১৯১২ সালে এম-এ পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৩০ সালে মণ্টপিলার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-লিট এবং প্রাগ-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এচ্ ডি উপাধি পাইয়াছিলেন। বহু বৎসর ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২১ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সেবা করেন। ১৯২৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি ভাগলপুর সদাকৎ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, মহিলা কলেজের অধ্যাপক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সভাপতি ও নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ছিলেন। রাজনৈতিক জগতে মহাত্মা গান্ধী ও ধর্ম্ম জগতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার আদর্শ ছিল। ১৯৩০ সালে বিদেশ ভ্রমণের পর তিনি আবার জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

পরলোকে দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী—

খ্যাতনামা পণ্ডিত দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী গত ২৯শে বৈশাখ বরিশালে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুর জেলার ধানুকার অধিবাসী। গত ৬৬ বৎসর কলিকাতা কুমারটুলীতে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেছিলেন।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত ফটো—তারক দাস

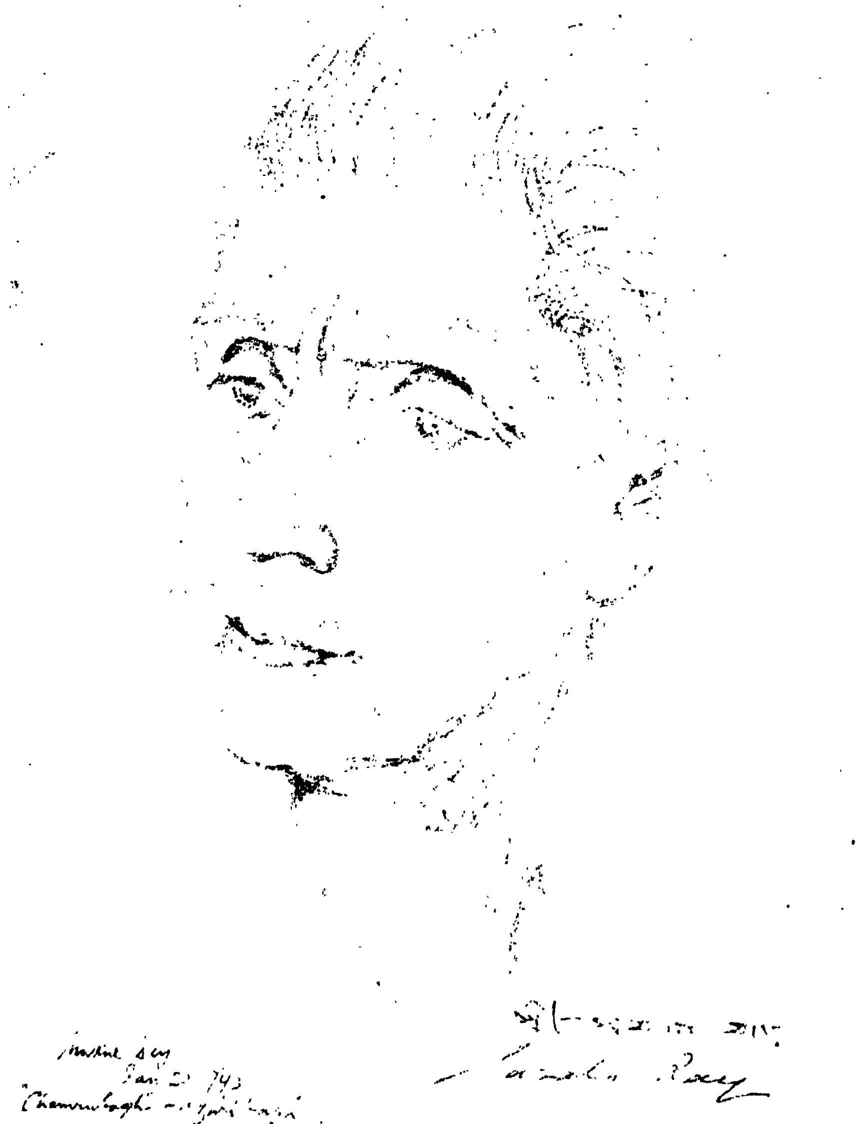
রেল-বিভাগের অপব্যয়—

নিখিল ভারত রেল শ্রমিকসংঘের সহসভাপতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—গত ৫ বৎসরে সৈন্যদিগকে ভাড়া ও অন্যান্য বাবদে সুবিধা দেওয়ার ফলে রেল বিভাগের দুইশত কোটি টাকা আয় কম হইয়াছে। তাহা ছাড়া গত ৫ বৎসরে লাভের ২২৫ কোটি টাকা ভারত গভর্ণমেণ্টের সাধারণ তহবিলে দান করা হইয়াছে। কাজেই রেলের আয় কম বলিয়া যে শ্রমিকদের কম বেতন দেওয়া

হয়, একথা ঠিক নহে। রেল-কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে পারেন।

পরলোকে সরলা রায়—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডক্টর পি-কে-রায়ের পত্নী ও খ্যাতনামা দেশনেতা দুর্গামোহন দাশের কন্যা সরলা রায় গত ২৯শে জুন রাত্রিতে ৮৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সারা জীবন প্রচার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা সেক্রেটারী এবং গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সদস্য ছিলেন ও নিখিল ভারত মহিলা



সম্মিলনের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা বর্ত্তমান।

জগতের পরিবর্ত্তন—

গত ১১ই জুন ইটালী দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাইনর গ্যাসপারী প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন ও সম্রাট স্বয়ং দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইন স্বাধীনতালাভ করিয়াছে ও তথায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফিলিপাইন মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধীন ছিল, মার্কিণ স্বেচ্ছায় উক্ত দেশকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। জগতের এই সকল ঘটনা স্মরণীয়। পরাধীন ভারত কবে স্বাধীনতালাভ করিবে?

শ্রীযুক্ত আনন্দ সহায়—

শ্রীযুক্ত আনন্দ সহায় পূর্ব্বে জাপানে ও চীনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন, পরে তিনি নেতাজীর আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। গত বৎসর সাইগনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুর জেলে আটক রাখা হয়। গত ৩রা মার্চ্চ তিনি মুক্তি লাভ করিয়া পরে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কন্যা আশা 'ঝান্সীর রাণী' সৈন্যদলে সাব-অফিসার ও তাঁহার ভ্রাতা সত্যদেব সহায় সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহারাও আনন্দ সহায়ের সহিত ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বাংলায় মৎস্যজীবীদের দুরবস্থা—

গত ৩রা জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতা সরকারী দপ্তর-খানায় এক সাংবাদিক সম্মিলনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এচ্‌-এস্‌ সারওয়ার্দ্দী বাঙ্গালা দেশের মৎস্যজীবীদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছেন। সূতার অভাবে তাহারা জাল বুনিতে পায় না ও জালের অভাবে মাছধরা ছাড়িতে বাধ্য হয়—এই অবস্থা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র। সম্মিলনে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আবদুল গফরাণ এবং কমিশনার মি. এস-এন-রায় ও ডিরেক্টার জেনারেল মিঃ এস-কে-চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যতদিন না চোরাবাজার ও ঘুসগ্রহণ বন্ধ হয়, তত দিন শুধু আলোচনা দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যাইবে না।



মেজর-জেনারেল এ-সি চ্যাটার্জ্জীর সভাপতিত্বে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবস পালন ফটো—পান্না সেন

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি—

গত ১লা জুলাই বোম্বাই আমেদাবাদে রথযাত্রা উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে ৩১ জন নিহত ও ২৫০ জন আহত হইয়াছে। ঢাকা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানেও ঐ দিন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছিল। তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনা নিরীহ ভারতবাসীদিগকে কি ভাবে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবে যে ভারতের হিন্দুমুসলমান জনগণের মনে সুবুদ্ধির উদয় হইবে, তাহা কে জানে?

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য—

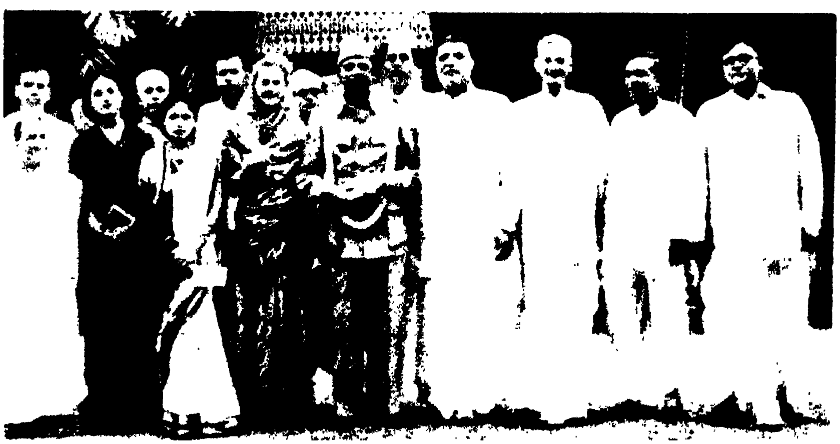
নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে ও দিল্লীস্থ ভারতগভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস মহাশয়ের চেষ্টায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভাইস-চ্যান্সেলার সার মরিস গাওয়ার বাঙ্গালার কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক-যুগ সম্বন্ধে

এ বৎসর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেছেন। দিল্লীতে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা এই প্রথম সাফল্যমণ্ডিত হইল—ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দ ও গৌরব বোধ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আমরা প্রয়োজন মনে করি। দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সংহতি না থাকায় তথায় বাঙ্গালীদের কোন চেষ্টাই শীঘ্র সাফল্যমণ্ডিত হয় না। অথচ দিল্লী সহরে বহু সরকারী ও বেসরকারী বাঙ্গালী বাস করেন। তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইয়া প্রবাসে বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইলে তাহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কল্যাণজনক হইতে পারে ও নানা কার্য্য উপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালী সর্ব্বদা দিল্লীতে যাতায়াত করেন, তাঁহারাও লাভবান হইতে পারেন।

চট্টোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যও ভাল নাই। ইহাদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী শীল—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লণ্ডনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী শীল বহুবৎসর পরে ভারতে আসিয়াছেন। গত ১লা জুলাই কলিকাতায় ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—শীঘ্র জগতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি আরও বলেন—ভারতের সমস্যা শুধু আমাদের সমস্যা নহে—ইহা সমগ্র জগতের সমস্যা। কাজেই শীঘ্র এ সমস্যার সমাধান হইবে।



কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক পৌর অভিনন্দনের প্রাক্কালে মেজর জেনারেল এ-সি চ্যাটার্জ্জী

ফটো— তারক দাস

জেলে বন্দীদের অবস্থা—

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদ দত্ত সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্ত্তী একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন কর মধ্যে মধ্যে উন্মাদ হইয়া যান। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বাতে ভুগিতেছেন। সুরেশ দাশ, হেম বক্সী, নলিনী দাশ ও সুনীল চট্টোপাধ্যায় রোগে ভুগিতেছেন। ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বল ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীও হৃদরোগে ভুগিতেছেন। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত পবিত্র রায়, হরিদাস মিত্র ও সঞ্জীব

মহাত্মা গান্ধীর ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা—

মহাত্মা গান্ধী গত ৩০শে জুন যখন দিল্লী হইতে পুনা যাইতেছিলেন, তখন পথে পুনা হইতে ৬০ মাইল দূরে তাঁহার স্পেশাল ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা করা হইয়াছিল। আরোহীদের প্রবল ঝাঁকানি লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ আহত হন নাই। লাইনের উপর কে বা কাহারা অনেক পাথর রাখিয়া দিয়াছিল। ঐ দিন সন্ধ্যায় উপাসনার সময় গান্ধীজি বলেন—"কেহ আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে, ইহা আমি ভাবিতেও পারি না। জনগণের সেবা করিবার জন্য আমি ১২৫ বৎসর বাঁচিব বলিয়া আশা করি।" উক্ত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে রেলকর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিতেছেন।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ সম্মিলন—

আগামী ২১শে অক্টোবর কলিকাতায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজ সম্মিলন হইবে। সে জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্শীকে সাধারণ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয়—কলিকাতা ১নং উডবার্ণ পার্কে স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতাবাসী সকলকে এই সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সহিত সংযোগিতা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষ—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহযোগী সম্পাদক স্বামী যোগানন্দজী সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছেন—

তমলুক—সুতাহাটা থানার ২নং ইউনিয়নের হোড়খালি, পার্ব্বতীপুর, রামনগর, আগাদোর, উদ্ধবমল, ১নং ইউনিয়নের এঁড়োখালি ও কুকড়াহাটীর নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ দেখিলাম—বহু পূর্ব্বেই চাষী ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ খাদ্যাভাবে বিশেষ ভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ৩নং ইউনিয়নের বিরিঞ্চি বাড়িয়া মাধবপুর হরিপুর, বাণেশ্বর চক, চাপি প্রভৃতি গ্রামসমূহের অবস্থা আরও শোচনীয়। গোলাপচকের মুসলমান পাড়ার দুস্থ অর্দ্ধনগ্ন নর-নারীগণের অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহাতে অবিলম্বে তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। গবর্ণমেণ্টের টেষ্ট রিলিফের ফলে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণ কিছু কিছু কার্য্য পাইয়াছে ও পাইতেছে; কিন্তু সে কার্য্যও প্রায় শেষ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ যাহারা ৫০ হইতে ১০০ বিঘা জমির মালিক তাহাদেরও দুই বেলা অন্ন জুটিতেছে না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। পার্ব্বতীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন ছেলেই না খাইয়া স্কুলে আসে।

বিগত দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতাহাটা থানার হোড়খালি নামক স্থানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষোত্তর সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেবাকার্য্য চালান হইতেছে। সেখান হইতে ঔষধপথ্য, বার্লি প্রভৃতি বিতরণ করা হইতেছে।



মেদিনীপুর দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলের সেবাকার্য্যে হোড়খালী দাতব্য চিকিৎসালয়

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার নেতা ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি। মহাসভার এক অধিবেশন উপলক্ষে তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন। গত ১৩ই জুন বিমানে দিল্লী হইতে ফিরিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ফুসফুস যন্ত্রের দুর্ব্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গের জন্য কয়দিন তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়াছিল। শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি এখন ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। বাঙ্গালা দেশে আজ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অভাব খুবই বেশী। আমরা প্রার্থনা করি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের সেবায় নিরত থাকুন।

ভারতে মার্কিণ প্রতিনিধিদল—

ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মার্কিণ দেশ হইতে একদল প্রতিনিধি এদেশে আসিয়াছেন। তাঁহারা গত ১লা জুলাই কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন—তাঁহাদের নাম (১) ডক্টর থিয়ডর স্মালুজ—নেতা (২) জন জেশপ (৩) জোশেফ উইলেন (৪) মিস্ মেরী কেল্লার (৫) ব্রাউনি স্মিথ (৬) ডাঃ পিকার।

সঙ্গে আরও ২ জন আছেন—টলিষ্ট ও হোরেস আলেকজাণ্ডার। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে কি ভারতবাসী মার্কিণ হইতে খাদ্য-সাহায্য লাভ করিবে—না শুধু দেখিয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য শেষ করিবেন ?

শিক্ষকের সম্মান—

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকরূপে বহু বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশের শিক্ষকগণের অভাব অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি নিজেও কলিকাতার ভূতনাথ মহামায়া



শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

ইনিষ্টিটিউশন নামক একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। শিক্ষকগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

পরলোকে খাঁ বাহাদুর মোমিন—

পরলোকগত নবাব আবদুল জব্বরের পুত্র খাঁ বাহাদুর এম-এ-মোমিন গত ১৮ই জুন ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান, ওয়াকফ কমিশনার প্রভৃতি পদে কাজ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার কাসিয়ারা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

শিক্ষা বিভাগের নূতন ডিরেক্টার—

হুগলী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর এ-এম-এম-আসাদ বাঙ্গালার সরকারী শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ডিরেক্টার মিঃ এ-কে-চন্দ বর্ত্তমান লীগ মন্ত্রিসভার অধীনে কাজ করিতে অসমর্থ হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য ছুটী লইতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল স্নেহময় দত্ত ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল রায়বাহাদুর জিতেন্দ্রমোহন সেন তিনজন হিন্দু শিক্ষাব্রতীর দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। লীগ মন্ত্রিসভার পরিচালনাধীন গভর্ণমেণ্টে সবই সম্ভব।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ—

বিলাতে যে ভারতীয় সাংবাদিক দল গিয়াছেন তাঁহাদের গত ২১শে জুন ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন' পত্র সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক



শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ফটো—পান্না সেন

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সাম্রাজ্যের সাংবাদিক সংঘ প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিয়াছিলেন। ঘোষ মহাশয় বক্তৃতায় ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছিলেন।

অধ্যাপক বি-সি-গুহ—

ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ফলিত রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাকে ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগে চিফ টেকনিকাল পরামর্শদাতা করা হইয়াছিল। তিনি ৬ মাসের জন্য সম্মিলিত

রাষ্ট্রসংঘের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কমিশনের কার্য্যে ৬ মাসের জন্য বিলাত গিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

অধ্যাপক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম-এ মহাশয় সম্প্রতি



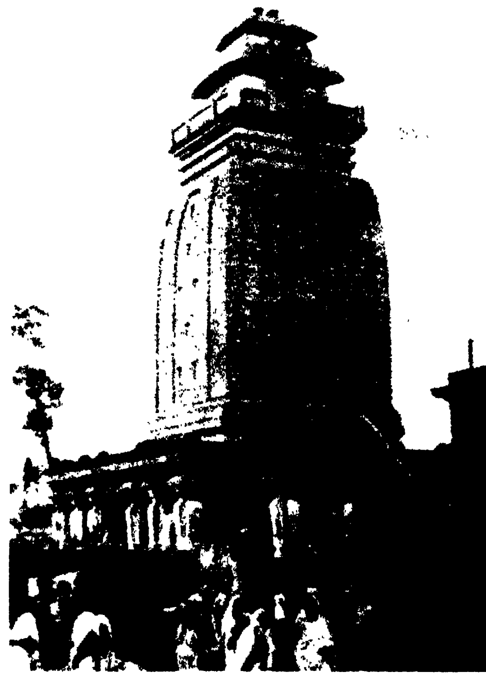
ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন—

২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে গত ৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৬ রবিবার শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ (ডি, পি, আই) মহাশয়ের সভাপতিত্বে আড়িয়াদহ গ্রামে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জেলা পরিষদের পক্ষ হইতে সমাগত সুধীগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ও একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত সুশীল ঘোষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় পরিষদের উন্নতি কামনা করিয়া একটী মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে দেশবন্ধুর সমাধি মন্দির

ফটো—বিষ্ণুপদ কর

কম্পাউণ্ডার ধর্ম্মঘটের অবসান—

গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালসমূহের কম্পাউণ্ডারগণ ১২ দিন ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করার পর গত ২৮শে জুন হইতে তাঁহারা আবার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় মাসিক ২০ টাকা ও মফঃস্বলে মাসিক ১০ টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। সকলেই সপ্তাহে ১দিন ছুটী পাইবেন এবং বেতনের হারও শীঘ্রই বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা—

বাঙ্গালার উচ্চতর পরিষদ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ৯টি সদস্যপদ খালি হইয়াছিল। লীগ দলের ৬ জন ও কংগ্রেস দলের ৩ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—তাঁহাদের নাম—

কংগ্রেস দলের (১) শ্রীপতিরাম রায় (২) চারুচন্দ্র সান্যাল (৩) সৈয়দ বদরুদ্দোজা। লীগ দলের (১) সি-এ-ক্লার্ক (২) তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (৩) ইউসুফ আলি চৌধুরী (৪) সৈয়দ আবদুল মজিদ (৫) মহম্মদ তৌফিক (৬) খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী।

লেখিকার সম্মান প্রাপ্তি—

বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'লীলাপদক' পুরস্কার



শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান লাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি!

ডাক্তার রামমনোহর লোহিয়া—

খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রী নেতা ডাক্তার রামমনোহর লোহিয়া গোয়ায় যাইয়া সেখানকার পর্ত্তুগীজসাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফলে তথায় তাঁহাকে ৪৪ ঘণ্টা থানায় আটক থাকিতে হইয়াছিল। গোয়ার অধিবাসীরাও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। ডাক্তার লোহিয়া সেই আন্দোলন সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন।

পরলোকে ডাঃ মদনমোহন দত্ত—

হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা পাট ব্যবসায়ী প্রসন্নকুমার দত্তের পুত্র ডাক্তার মদনমোহন দত্ত এল-এম-এস গত ২৮শে জুন তাঁহার কলিকাতা সার্কুলার রোডস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মদনবাবু ১৯০৪ সালে ডাক্তারী পাশ করিয়া ১৯০৫ সাল হইতে মেডিকেল কলেজে কাজ করেন। তিনি দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ৪ বৎসর 'ডাঃ চন্দ্র বৃত্তি' পান ও কিছুকাল কসৌলীতে



ডাঃ মদনমোহন দত্ত

জলাতঙ্ক রোগের গবেষণা করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ক্যাম্বেলে ফিজিওলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—বহুবৎসর তিনি ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির পরীক্ষক ছিলেন। তিনি অমায়িক ও সরল ব্যবহারে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। চিকিৎসকগণের নাট্য সংঘ, খেলাধূলা প্রভৃতিতেও তিনি উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন।

ভ্রম সংশোধন—

ভারতবর্ষের গত বৈশাখ সংখ্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রখানি ঢাকার মডার্ণ ইলেক্ট্রো ষ্টুডিও কর্ত্তৃক ফটো গৃহীত। ভ্রমক্রমে উক্ত ষ্টুডিও'র নাম উল্লেখ করা হয় নাই। সে জন্য আমরা দুঃখিত।

ভ্রমণ-কাহিনী

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

দেশ ভ্রমণের ন্যায় এমন চিত্তচমৎকারী ব্যাপার খুব কমই আছে এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তের ন্যায় সরস, শুচিতা-সমন্বিত, কল্পনাপ্রসারী পাঠ্যও বোধ হয় বিরল। অ-দেখা দেশ যেন দূর হইতে হাতছানি দিয়া ডাকে, আর—একবার-দেখা দেশ বন্ধুর মতো পরিচিত স্বরে সম্ভাষণ করে। কিন্তু এমনটি বেশী দিন থাকিবে কি না সন্দেহ। কারণ বিজ্ঞানের প্রসাদে দেশকালের ব্যবধান সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। তিন মাসের ক্লেশকর ভ্রমণ যখন তিন দিনে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে চলিয়াছে, তখন কোনো দেশ আর রহস্যমণ্ডিত থাকিবে কি? ভ্রমণ বৃত্তান্তের মোহ হয়ত আর তেমন থাকিবে না। কিন্তু মানুষের মনে যে আদিম চঞ্চলতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা হয়ত কোনো দিন শান্তিলাভ করিবে না এবং নূতন নূতন দেশ-দর্শনের অশান্ত স্পৃহাও পরিতৃপ্ত হইতে চাহিবে না। সিনেমার কল্যাণে এই অতৃপ্ত চঞ্চলতা আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

দেশ-ভ্রমণ যদি ভৌগোলিক অভিজ্ঞতা-লাভেই পর্যবসিত হইত তাহা হইলে তাহার নূতনত্ব হয়ত অচিরে লোপ পাইতে পারিত। কিন্তু ভ্রমণবৃত্তান্ত শুধু ভৌগোলিক সংস্থানের বিবরণ নহে, সে সকল বিবরণ সাহিত্যের কোঠায় পৌঁছিতে পারে না। রসোত্তীর্ণ হইতে হইলে, নদনদী পাহাড়-প্রান্তরের অতীত এক রাজ্যের সহিত পাঠকের পরিচয় লাভ করাইতে হয়, যাহা চির নূতন। ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্য দিয়া আমরা পাই পর্যটকের মানস-জগতের স্পর্শ। প্রত্যেক পর্যটকের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেইজন্য একই দেশ—আমার দেখা তোমার দেখা নয়; এবং তোমার দেখা আমার দেখা নয়। দেখিবার এমন একটি বৈচিত্র্য আছে, যাহা ব্যক্তি-মানসের রূপে রসে মিশিয়া অপূর্ব হইয়া উঠে। নায়াগ্রাপ্রপাতই হউক, আর সুইট্জারল্যাণ্ডের আল্প্স্ই হউক, ইহারা চিরন্তনের এক একটি টুক্‌রার মতো কালের অস্থির প্রবাহকে উপেক্ষা করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। কিন্তু দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী তাহাদিগকে নবীনতার মোড়কে পুরিয়া পরিবেশন করে। আমরা চাই তাহাই উপভোগ করিতে। এমন কি চিত্রশালা প্রভৃতি অচির-প্রতিষ্ঠানগুলিও যোগ্য পর্যটকের চিত্তরসে চর্চিত হইয়া উপভোগ্য হইয়া উঠে।

আর দেশ ত মাটির নয়। দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার আধিভৌতিক উপাদানের বহু ঊর্দ্ধে। বিরহী যক্ষ যেমন ধূমজ্যোতি-সলিলমরুৎসন্নিপাতকে অতিক্রম করিয়া মেঘের কলেবরে এক পরম রসাল প্রাণসত্তার কল্পনা করিয়াছিলেন, তেমনি দর্শক যদি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' মাটীর পৃথিবীকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন, তবেই তাঁহার বৃত্তান্ত সার্থক হয়। একই দেশ তাহার সৌন্দর্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দেয় ভক্তের নিকট, রসিকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে, তাই তাহার চিত্র আমাদের প্রাণে জাগায় নূতন নূতন সাড়া। বিশ্বের চিরন্তন আলেখ্যকে রসিক সমাজের জন্য নূতন নূতন রঙে আঁকিয়া লইতে হয়; তবেই তাহা প্রাণস্পর্শী হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একখানি পুরাতন ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিলে অন্যায় হইবে না। রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ ইয়ুরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন জলপথে। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত Three Years in Europe নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। লোকের আগ্রহ দেখিয়া লেখক ইহার বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি একস্থলে ইয়ুরোপের সংস্কৃতির একটি তুলনামূলক সমালোচনা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, উহাই গ্রন্থখানির প্রধান আস্বাদ্য বিষয়।

"......পাছে জীবিকানির্ব্বাহের কোন স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সেই ভয়ে ইংলণ্ডীয় মহিলারা, হয় উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হন, নয়

চিরজীবন পিতামাতার গৃহে বাস করিয়া আলস্যে কাল হরণ করেন। চিরদিন জনকজননীর অধীনতা নানা অসুখ-প্রসবিনী জানিয়া কাজে কাজেই যুবতীগণ বিবাহ করিতে ব্যাকুলা হন। ইংলণ্ডীয় যুবাপুরুষেরা আত্মমর্যাদা ও গৌরব পাছে ক্ষয় হয়, এই ভয়ে আপনার মানের উপযুক্ত-রূপ পরিবার-প্রতিপালনের উপায় স্থির না করিয়া সহসা বিবাহ করিতে স্বীকার করেন না।···বিবাহের বাজারে যুবা পুরুষ তত পাওয়া যায় না, কিন্তু যুবতী স্ত্রী এত অধিক পাওয়া যায় যে তন্মধ্যে অনেকে অ-বিক্রেয় হইয়া ফিরিয়া যান।···আমাদের দেশে পিতামাতা যেমন কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন, ইংলণ্ডের যুবতীগণ আপন আপন বিবাহ জন্য সেইরূপ ব্যস্ত, অথচ মাতাও সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন না। সভা মধ্যে যুবতী কন্যা স্বাধীনতা প্রকাশ করেন না, সর্বজন-মনোরঞ্জিনী ও চারুশীলা হন।···এবম্বিধ কৌশল ও প্রতারণা দ্বারা সভ্য জাতির মধ্যে রমণীগণ পুরুষের মন আকর্ষণ ও বিবাহ সম্পাদন করিতে যত্ন করেন। এরূপ চতুরতা নিতান্ত গর্হিত না হইতেও পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা যে মানবপ্রকৃতি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যে বিবাহ প্রণালী প্রচলিত আছে, অনেকে তাহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন।···কিন্তু ইংলণ্ডীয় যুবকগণ স্বেচ্ছামত দারপরিগ্রহ প্রথানুসারে স্বানুরূপ স্বভাব-যুক্তা রমণী বাছিয়া লইতে পারেন, সুতরাং বিনা বিবাদ বিসম্বাদে জীবনযাত্রা-নির্বাহের ও চিরকাল দাম্পত্য-প্রণয়ের সুখসম্ভোগের অমোঘ উপায় স্থির করিতে পারেন—যিনি একথা বলেন তিনি হয় ইংরাজী কুসংস্কারাবিষ্ট, নয় নিজে প্রেম-সরোবরে নিমগ্ন। ফল কথা এই যে, অস্মদ্দেশীয় বালক যেরূপ ভাবী স্ত্রীর স্বভাব কিছুই জানিতে পারে না, ইংলণ্ডীয় যুবা পুরুষগণ শুভ-বিবাহের দিন পর্যন্ত ভাবী পত্নীর প্রকৃত স্বভাব প্রায়ই জানিতে পারে না।"

এই যে সামাজিক জীবনের চিত্রটি পর্যটকের লেখনী মুখে ব্যক্ত হইল, ইহা সকলের পক্ষেই উপভোগের সামগ্রী এবং লেখকের মানসলোকের যে আলোকে উহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই সাহিত্যের সম্পদ্।

আর একজন সাহিত্যিক আই-সি-এসএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রহণ করা যাক্। শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ যুবক এবং সাহিত্যপ্রেমী। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে (ইয়োরোপা ২য় সংস্করণ—বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত) সাহিত্যিক মানসের যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে ইহাকে সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। লেখকের অন্তরস্পর্শী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইয়ুরোপের যে বর্ণচ্ছটা ফুটিয়াছে, তাহা ঐ দেশের ছবিটি নূতন করিয়া আঁকিয়া লইয়াছে। রবিরশ্মি সকলের চোখেই শ্বেত শুভ্র উজ্জ্বল। কিন্তু স্ফটিকের মধ্য দিয়া দেখিলে যে রঙের উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনি নয়নমনোহর। লেখক সেইরূপ শুভ্র স্বর্ণ কিরণকে তাঁহার মনের স্ফটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বর্ণনা সার্থক আনন্দবহ হইতে পারিয়াছে। দেবেশচন্দ্র কোনও উদ্দেশ্য লইয়া ভ্রমণ করেন নাই। তিনি দেখিয়াছেন অনেক, শিখিয়াছেনও অনেক ; কিন্তু তাঁহার অন্তর-সঞ্চিত ও মনীষাদীপ্ত অভিজ্ঞতা কখনও উদ্দেশ্যের ভার পাঠকের মনের উপর চাপায় না। তাঁহার দৃষ্টিও যেমন উদার, লিখিবার ভঙ্গীও তেমনি মনোমুগ্ধকর। রচনার গুণে সামান্য ঘটনাও চিন্তাকে জাগায়, কল্পনাকে জাল বুনিতে প্রেরণা দেয় এবং আনন্দের মোহ বিস্তার করে। ইয়োরোপা সেইরূপ একটি সার্থক রচনা। ভ্রাম্যমানের চিন্তাশীল মনের স্পর্শ ইহার প্রতি পত্রে পাওয়া যায়। সাহিত্যের রসে পাক করিয়া তিনি ইংলণ্ডের লেক্ ডিষ্ট্রিক্ট্, জার্মাণী, স্পেন, প্যারিস্টা প্রভৃতি যে সকল বহু পরিচিত স্থানের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাই এই ভ্রমণবৃত্তান্তকে সত্যই অতুলনীয় রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সাহিত্যিক মনের স্পর্শ, কবিজনোচিত চিত্ত-বৈভব এই স্বল্পায়তন গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছে। তাঁহার লেখায় সন তারিখের বালাই নাই। তাহার কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য দেশকালের ব্যবধানকে স্বীকার করে না। লেখকের দৃষ্টি যে সাহিত্যের রস সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দুই একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে আশা করি।

"লণ্ডনে 'ফ্যামিলি' খুব কম, 'হোম' আরও কম। সামাজিক রীতি নীতি বন্ধন সব যেন আধুনিকতার বন্যা-স্রোতের মুখে একে একে ভেসে গেছে। তার ফলে

ঘরকে পর ক'রে পুরুষ বেরিয়েছে একা; নীড় থেকে নারী এসেছে বাহিরে একাকিনী। পুরুষের হৃদয়ের বিচরণ-ক্ষেত্র বেড়ে গেছে অনেক, আর নারী হয়েছে সাহসিনী। সে আর পুরুষের কাছে অর্দ্ধেক সৃষ্টি ও অর্দ্ধেক কল্পনা নয়। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সে জীবিকা-অর্জ্জনেও, তাই তার সম্মানের আসনটুকুও প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে সসম্মানে লোপ পেয়ে গেছে। এখন আর কেহ তাকে বাসে বা ট্রেণে অভিবাদন ক'রে বসবার জায়গা ছেড়ে দেবে না; সে-ও তা চায় না। সে চায় পুরুষের কাছে সমান ব্যবহার; সে হচ্ছে সহকর্ম্মিণী, সহধর্ম্মিণী হওয়া তার কাছে আজ বড় কথা নয়। সে হচ্ছে আগে কম্‌রেড, পরে কামিনী। নারী হারিয়েছে তার লালিত্য, যদিও যৌবনের লাবণ্য তার বেড়েই গিয়েছে হয়ত। সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে তার মধ্যে খেলায়, ব্যায়ামে ও নানাভাবে প্রাণ স্ফূর্ত্তি পেয়েছে; কিন্তু প্রাণপ্রিয়া মূর্ত্তি নিয়ে উঠতে পারছে না। তাই সে আর বিপুল রহস্যের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নেই। সে হচ্ছে তবু নারী, কবিতার নায়িকা সে নয়। * * *

* * * * "That it fades from kiss to kiss" একথা যে জেনেছে তাকে মূল্য দিতে হয়েছে বহু; তার হৃদয় তাই হয়ে উঠেছে চঞ্চল ও অনেকনিষ্ঠ। পথে পথে কত নব পরিচয়, নব অনুভব, স্মৃতির পথ বেয়ে কত মূর্ত্তির আনাগোনা; তার মধ্যে কোন্‌টি প্রতিমা হ'য়ে পূজা পাবে তার কি ঠিক? আর তার বিসর্জ্জনের সময় আসবার আগেই অন্য মূর্ত্তির ছায়া এসে পড়তে পারে। হয়ত একটি আগেরটির চরণচিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে লোপ করে দিল, কারণ স্মৃতি ত প্রীতির আসন জুড়ে বসে থাকতে পাবে না। জীবন্ত এরা—চায় জীবন্ত প্রেম। স্মৃতি হিমশীতল, তার মধ্যে ত প্রাণময়তার কবোষ্ণ স্পর্শ, নিশ্বাস-সুরভি নেই। * * * * এ-সব আদর্শ নিয়ে কিন্তু আধুনিকার জ্বালা কম নয়। স্বাধীনতার কল্যাণে না টিক্‌ল তার ঘর, না জুট্‌ল বর, না ঘটুবে হয়ত জীবনে প্রিয়তমের আবির্ভাব।......"

(নগর ও নাগরিক)

১৮৬৮ আর ১৯৩৫—ইংলণ্ডের নারী সমাজের অবস্থা কত বদলাইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে সাহিত্যের ধারণাও কত বদলাইয়াছে; মিঃ দত্ত ও মিঃ দাসের রচনা হইতে তাহারও একটু আভাস পাওয়া যায়।

ভার্সাইয়ের যে চিত্র লেখক ইয়োরোপায় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা যেন জীবন্ত। আমি নিজে সেই অনুপম নগরী দেখিয়াছি। লেখকের বর্ণনায় আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই অনিন্দ্য অপ্‌সরীর রূপ নূতন সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। একটু পড়িয়া শুনাই:

"...রাজ-সমারোহ ও বিলাসের দিক্ দিয়ে ভার্সাই ছিল প্যারিসের সম্পূরক। এখানকার বিরাট্ প্রাসাদের চারিদিকে দিগ্‌বলয় যে শ্যাম অরণ্যানীর সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন তার মধ্যে যে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ফ্রান্সের মূর্ত্তি লুকিয়ে আছে। এত রূপ ও পাপ, ঐশ্বর্য্য ও ষড়যন্ত্র, বিলাস ও বিফলতা বুঝি ইয়ুরোপে আর কোথাও ছিল না। কত সুন্দরীর নৃত্যচটুল চরণাঘাতে এ প্রাসাদের মর্মর এইমাত্র বুঝি মুখরিত হয়ে উঠেছিল; কক্ষ হতে কক্ষান্তরে যেতে বাতাসে কলহাস্যের আভাস এখনি ভেসে আস্‌তে পারে; লালসার অতৃপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস বুঝি এই ক্ষুধার্ত্ত পাষাণে লেলিহান শিখা বিস্তার ক'রে স্পর্শ রেখে গেছে।..."

(বিশ্বের পিয়ারী)

'ইয়োরোপা'র অনেক স্থলে দুর্লভ চিন্তাশীলতার ছাপ পড়িয়াছে। সেইজন্য একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, বহুবার পড়িয়া ইহার রসাস্বাদন না করিলে গ্রন্থকারের এই অনবদ্য রসসৃষ্টি সমন্বিত ভ্রমণ-সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যাইবে না।



কাঙাল হরিনাথের বাউল সংগীত

শ্রীসুশান্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি

জলধর-গুরু কাঙাল হরিনাথের নাম বাঙ্‌লায় সর্বজনবিদিত। বাঙ্‌লার ইতিহাসে যে সকল মহাপুরুষ দেশের ও দশের জন্ম সর্বস্ব-ত্যাগ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সিদ্ধ সাধক কাঙাল হরিনাথ তাঁহাদের অন্যতম। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীমৎ নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা এবং বাউল সংগীতের আদি রচয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বাউল সম্প্রদায় হইতে সহজীয়া পন্থী ও সাঁইপন্থীগণের উদ্ভব হইয়াছে। সহজীয়া পন্থীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাঙ্‌লার আদি কবি চণ্ডীদাস এবং সাঁই পন্থীদিগের শীর্ষস্থানীয় গুরু ছিলেন স্বর্গীয় মহাত্মা লালন ফকির। তাঁহার আস্তানা ছিল কুষ্টিয়ার সন্নিকটস্থ কালীগংগা নদীর তীরবর্ত্তী সিউড়া গ্রামে। সেই আস্তানাটী অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্‌লার মহাকবি চণ্ডীদাস বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সহজীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার রচিত পদাবলী রাধাকৃষ্ণের লীলামৃত বর্ণনায় বাঙলা দেশকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। অপরপক্ষে মহাত্মা লালন সাঁইজীর সংগীতগুলি বহুলাংশে বাউল সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মোটের উপর, বাউল সংগীতের উৎপত্তি নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র হইতেই হইয়াছিল।

বীরভদ্ররচিত সংগীত কদাচিৎ বাউলগণের মুখে শোনা যায়। কিন্তু সিদ্ধসাধক স্বর্গীয় কাঙাল হরিনাথই সমগ্র বাঙ্‌লা দেশে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কুমারখালিতে প্রথম প্রথম ইহার বড় প্রচার ছিল না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র, সি-আই-ই মহোদয়, স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (দধিমাষ্টার), স্বর্গীয় রায় জলধর সেন বাহাদুর (জলদা), স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল সরকার, স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, ও বেনোয়ারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহায়তায় একটা বাউল সংগীতের দল সংগঠিত হয়। এই বাউল দল 'অচিন ফকিরের দল' নামে পরিচিত ছিল। কিছুদিন পর ফিকিরচাঁদ নামক একজন ভ্রাম্যমান ফকির দৈবক্রমে তাঁহাদের দলে যোগদান করেন। ফিকিরচাঁদ ফকিরের নামানুসারে এই দলের নাম রাখা হল—'ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল।' এই দল সংগঠনকালীন কাঙালের দৃষ্টি এইদিকে নিপতিত ছিল না। তিনি 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা এবং সাধন কার্য্যেই সময় অতিবাহিত করিতেন। কিছুদিন পরে কাঙাল এই দলের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সংগীতগুলি 'কাঙাল ফকিরচাঁদ' ভণিতায় অভিহিত করেন। এই বাউল দলের সর্বপ্রথম সংগীত—'ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী, সত্য পথের সেই ভাবনা।' এই গানটীর রচয়িতা ছিলেন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার। প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রসন্নকুমারেরও অনেক সংগীত কুমারখালী এম, এন, প্রেস হইতে প্রকাশিত 'বাউল সংগীত' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। তবে, এই গ্রন্থখানি কাঙালের নামে প্রচারিত। সমগ্র সংগীতগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ' ভণিতায় রচিত, সেগুলি কাঙাল স্বয়ং রচনা করিয়াছেন এবং যে গানগুলি মাত্র 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতায় রচিত, সেগুলি অক্ষয়, প্রসন্ন, প্রফুল্ল অথবা জলধরের রচিত বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু কোন্ গানটী কাহার রচিত, তাহা নির্দেশ করা সুকঠিন।

কাঙাল হরিনাথের ধর্মোন্মাদ ভাব, এবং বাউল সংগীতের মধ্য দিয়া সাহিত্য চর্চা তাঁহাকে বাঙালীর নিকট চিরপূজ্য করিয়া রাখিয়াছে। পুরাতন কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র, পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা, মহাকবি চণ্ডীদাস, বাঙ্‌লা ভাষায় মহাভারতকার কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্‌লা সাহিত্যকে ফল-পুষ্পে ও শাখা-প্রশাখায় যে প্রকারে সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন, কাঙালও তেমনি বাউল সংগীতের মধ্য দিয়া বাঙ্‌লা সাহিত্যকে স্রোতস্বতী কল্লোলিনীর ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ মালায় উদ্‌বেলিত করিয়া তর তর বেগে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অথচ, অতি সহজ, প্রাঞ্জল ও ভাব মাধুর্য্যপূর্ণ ভাষায় 'বাউল সংগীত' গ্রন্থে যে গানগুলি সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত সমাজ ত দূরের কথা, গোচারণকারী রাখালগণ, এমন কি নৌকাবাহী মাঝি মাল্লার মুখেও শোনা যায়। রাখালেরা গোরু চরাইতে চরাইতে বাল্যসুলভ চপলতায় উচ্চকণ্ঠে যখন গাহিতে থাকে—'আর কোরব এ রাখালি কতকাল' এবং মাঝি মাল্লারা ক্ষেপনীর তালে তালে স্রোতস্বতীর ঊর্ম্মিমালার ঘাতপ্রতিঘাতাহত গতিশীল নৌকার উপরে বসিয়া সুললিত কণ্ঠে যখন গাহিতে থাকে—'ভাই মাঝি! সামাল সামাল ডুবল তরী, ভবনদীর তুফান ভারী', তখন মহাত্মা কাঙালের সাহিত্য সাধনার কথা সহজেই মনে পড়িয়া যায়। সংগীতগুলির ভাষা, অতি সরল গ্রাম্য ভাষায় রচিত হইলেও ভাব-মাধুর্য্যে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে উহার স্থান অতি উচ্চতর স্তরে।

কাঙালের বাউল সংগীতগুলিকে প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) দেহতত্ত্ব। (২) ভাবতত্ত্ব। (৩) সাধনতত্ত্ব। (৪) সমাজতত্ত্ব। (৫) শেষ বা অন্তিমতত্ত্ব।

বাউল সংগীতের মধ্য দিয়া কাঙাল বহু তত্ত্বেরই বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাউল সংগীতের সমস্তগুলির ভাবগ্রহণ করিলে সাধারণত মনে এই পাঁচ প্রকার ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। কাঙালের পুণ্য স্মৃতিপূত বাউল সংগীতগুলি নানা ভাবে, নানা প্রসংগে অদ্যাবধিও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে কাঙালের কবি-কল্পনা বাউল সংগীতের মধ্যে সাহিত্য চর্চ্চার একটী বাস্তব অভিব্যক্তি।



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের খেলা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। প্রথম বিভাগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবারও লীগ পেল। লীগের খেলার শেষের দিকে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে যেমন উত্তেজনা তেমনি খেলায় জোর প্রতিযোগিতা চলেছিল। প্রথম বিভাগের লীগে মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল দলের রিটার্ণ ম্যাচই এ বছরের যে শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলা সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এদের লীগের প্রথম খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায় এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোন দলেরই তেমন ভাল হয় নি। লীগের রিটার্ণ ম্যাচে মোহনবাগান ক্লাবের আক্রমণ ভাগ খেলার প্রথম থেকেই একযোগে ইষ্টবেঙ্গল দলের রক্ষণভাগ একাধিকবার আক্রমণ ক'রে তাদের বিপর্যস্ত ক'রে তুলে; ঐ দিনের খেলার প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগান দলের কম ক'রে তিন গোলের ব্যবধানে অগ্রগামী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ভাগ্যদেবী তাদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। অনেকদিন পর মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে চমৎকার বল আদান-প্রদানে বোঝাপড়া দেখা গেল। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা অদ্ভুত প্রেরণা নিয়ে খেলে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের বল জুগিয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের তুলনায় রক্ষণভাগের খেলাই দর্শকদের চোখে পড়ে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের কেউ খেলায় যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে নি, তারা সমর্থকদের হতাশ করেছে। ঐ দিনের খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোহনবাগান দল একটি চমৎকার গোল করে। রেফারী অফসাইডের অজুহাতে গোলটি বাতিল করেন। এ গোল সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট মত বিরোধ দেখা দেয়। রেফারী যথেষ্ট সন্দেহজনক অবস্থায় অফ্‌সাইডের নির্দ্দেশ দেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর বিবৃতি মোটেই সন্তোষজনক হয় নি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রায় ৬ মিনিট বেশী খেলানোর কারণও বোঝা গেল না। মোহনবাগানের আরও দুটো খেলা বাকি—স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ডালহৌসীর সঙ্গে অন্ততঃ খেলা ড্র করতে পারলেও মোহনবাগান এবার অপরাজেয় থাকবে। এ রেকর্ড কোন ভারতীয়দল করতে পারেনি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছরের লীগের খেলায় ভালই খেলেছে, দুর্ব্বল দলের কাছে পয়েণ্ট নষ্ট করে নি। সুতরাং তাদের এ সম্মান অর্জ্জন সম্পর্কে সন্দেহ করার কারণ নেই। লীগে তারা মাত্র একটা খেলায় হেরেছে লীগের প্রথমার্দ্ধে মহমেডান দলের কাছে ১-০ গোলে। ভাল খেলা ছাড়াও ভাগ্যদেবী, রেফারীর ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অনুকূল ঘটনা তাদের সহযোগিতা করেছে। এই প্রসঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তাদের দুটি খেলার ঘটনাই উল্লেখ করা চলে। মোহনবাগানের সঙ্গে প্রথম খেলায় মেজর হলওয়েল গোলের নির্দ্দেশ দিয়ে পরে লাইন্সম্যানের নির্দ্দেশ মত মোহনবাগানের গোলটি অফসাইড্‌ অজুহাতে বাতিল করেন। রেফারী লাইন্সম্যানের থেকে ঘটনা স্থলের নিকটবর্ত্তী ছিলেন এবং সেইমত খেলার অবস্থা অবলোকন করেই গোলের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। এই গোল বাতিলের ফলে খেলা ড্র যায়। রিটার্ণ ম্যাচেও প্রায় অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। মোহনবাগানের চমৎকার গোলটি লাইন্সম্যানের নির্দ্দেশমত অফ্‌সাইডের অজুহাতে রেফারী সার্জ্জেণ্ট ম্যাকব্রাইড বাতিল করেন। ফলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব দুটি খেলাতেই পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। মোহনবাগান ক্লাবের দুর্ভাগ্য।

এ দুর্ভাগ্য ছাড়া মোহনবাগান ক্লাব খেলার দোষে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে প্রথম খেলায় এবং এরিয়ান্স দলের সঙ্গে রিটার্ণ ম্যাচ ড্র করেছে। এই দুটি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট না করলে তারাই শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকতো। কাষ্টমস ক্লাব এবার লীগের তালিকায় শেষ স্থান অধিকার করেছে সুতরাং তাদের দ্বিতীয় বিভাগে আসছে বছর থেকে খেলতে হবে। ভবানীপুর ক্লাব নামকরা খেলোয়াড় পেয়েও লীগে বিশেষ স্থান পেতে পারলো না। লীগের ২টো খেলাতেই তারা মহমেডান স্পোর্টিং দলকে হারিয়েছে—যা মোহনবাগান বা ইষ্টবেঙ্গল পারে নি। মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে তাদের কি দুর্ভোগ না পেতে হয়েছে! দুটো খেলার পরই খেলোয়াড়রা আহত হয়েছে এবং এক দল লোক ক্লাবের তাঁবু ভেঙ্গে ফেলেছে। পুলিশের হস্তক্ষেপেও বিশেষ কোন ফল হয় নি। কোন দলেরই সমর্থকদের পক্ষে এ রকম ব্যবহার শোভন নয়। ভবানীপুর ক্লাব ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাদের রিটার্ণ ম্যাচে নাম-করা খেলোয়াড়দের বসিয়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দল গঠন ক'রে দর্শকদের হতাশ করেছিল। এরকম পরিবর্ত্তনের কোন কারণ জানা যায় নি। নাম-করা সব খেলোয়াড়ই ত সুস্থ ছিল এবং এই ম্যাচের পূর্ব্বে তারা খেলায় যোগ দিয়েছিল এবং আশ্চর্য্যের কথা ঠিক পরবর্ত্তী ম্যাচে তাদের খেলতে দেখা যায়। ক্লাবের পরিচালক মণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ খেলায় যতদূর সম্ভব শক্তিশালী দল গঠনই ক'রে থাকেন—এ ক্ষেত্রে তার উল্টো ব্যবস্থা দেখছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গত বছর লীগের রিটার্ণ ম্যাচেও ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় ভবানীপুর ক্লাব ইসমাইল এবং তাজমহম্মদের মত নাম-করা কয়েকজন খেলোয়াড়কে বসিয়ে তাদের জায়গায় অন্য খেলোয়াড় মনোনয়ন ক'রে দল তৈরী করেছিল। ভবানীপুরের ঐ সব খেলোয়াড় সুস্থ দেহেই মোহনবাগান গ্রাউণ্ডে দলের খেলা দেখতে এসেছিল। এবার লীগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ভবানীপুর দলের এ রকম খেলোয়াড় পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে নি বলেই জনসাধারণ কোন যুক্তিই খুঁজে পায় নি, সত্যই আশ্চর্য্যের কথা।

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

জুন ৮, ১০ ও ১১। **ভারতীয় দল—৩৭৬** (৬ ডিক্লেয়ার্ড ; এল অমরনাথ নট আউট ১০৪, মানকাদ ৮৬, হাজারী ৭৯, ভি এম মার্চ্চেণ্ট ৫২); **গ্লামরগান—১৪৯** (মানকাদ ৬৮ রানে ৪ এবং সারভাতে ৩০ রানে ৫ উইকেট) ও ৭৩ (৭ উইকেট; মানকাদ ৩১ রানে ৩ এবং সারভাতে ১৯ রানে ২ উইকেট)। খেলা ড্র।

জুন ১২, ১৩ ও ১৪। **কেম্ব্রিজ সার্ভিসেস—**১ম ইনিংস—**২৪১** (৪ উইকেটে ডিক্লে; ডিউয়ার্স নট আউট ৯৯) ও **১৩৫** (হাজারী ৬৬ রানে ৭ উইকেট পান); **ভারতীয় দল—১৫৯ ও ১১৬** (৫ উইকেট; মার্চ্চেণ্ট এইবার প্রথম গোল্লা করেন)। খেলা ড্র।

জুন ১৫ ১৭ ও ১৮। **ভারতীয় দল—৩৪৫** (৫ উইকেটে ডিক্লে; পতৌদির নবাব নট আউট ১০১, মার্চ্চেণ্ট ৮৬, ভি এস হাজারী ৪৯; ৭২ রানে বাটলার ২ এবং জেমসন ৫৮ রানে ২ উইকেট পান।

নটিংহাম্পসায়ার—২৪ (১ উইকেট); বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলা ড্র।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ঃ

২২শে জুন লর্ডস মাঠে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তিনদিনের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হ'ল। ভারতীয় দলের ক্যাপটেন পতৌদির নবাব টসে জয়লাভ ক'রে দলের প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ নিলেন। পরিষ্কার আবহাওয়া এবং খেলার উপযোগী মাঠ। ভারতীয় দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান মার্চ্চেণ্ট এবং মানকাদ ব্যাট করতে নামলেন। দর্শকসংখ্যা খেলার সূচনায় ২৫,০০০। বহু দর্শক যানবাহনের ভীড়ের জন্য টিকিট কিনেও যথাসময়ে মাঠে পৌছতে পারেনি। মার্চ্চেণ্ট প্রথম খেলে বাউসের প্রথম বল মেরে দু' রান তুললেন। আধ ঘণ্টা খেলার পর দলের ১৪ রান উঠলো। দলের ১৫ রানে মার্চ্চেণ্ট নিজস্ব ১২ রান ক'রে বেডসারের বলে ক্যাচ তুলে গিবের হাতে ধরা দিলেন। অমরনাথ তাঁর স্থানে এসে বেডসারের শেষ বলটা আটকালেন। কিন্তু বেডসারের পরবর্ত্তী ওভারের বলে এল-বি-ডবলউ হলেন, কোন রান না করেই। অমরনাথ দর্শকদের নিরাশ করলেন। বেডসারের বলের সুন্দর 'লেংথ' এবং 'ইন-সুইঙ্গারস' ভারতীয় দলের খেলার সূচনাতেই এরকম বিপর্য্যয়ের কারণ ঘটালো; টসে জয়লাভের সুযোগ পেয়েও ভারতীয় দলের বিশেষ সুবিধা হ'ল না। লাঞ্চের পর খেলার বেশ ভাঙ্গন ধরলো। নবাব পতৌদিকে ইংলণ্ডের

নতুন টেষ্ট খেলোয়াড় এগিন বেডসারের বলে চমৎকারভাবে ধরে ফেললেন এবং এক রান পরে গুলমহম্মদ রাইটের বলে বোল্ড হ'লেন। দলের এই ভাঙ্গনের মুখে হাফিজ এসে আর এস মোদীর জুটী হলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই খেলা আরম্ভ করলেন। হাফিজকে তাঁর ২০ রানে বেড়সার একবার আউট করবার সুযোগ নষ্ট করলেন। হাফিজ মোদীর থেকে খুব তাড়াতাড়ি রান তুলতে লাগলেন। ৫০ মিনিটে নিজের ৪৩ রান তুলে বাউসের বলে দলের ১৪৭ রানে বোল্ড হলেন। সপ্তম উইকেটের জুটীতে ৫০ মিনিটে ৫৭ রান উঠে। এর পর দলের ১৫৭ রানের মাথায় ৮ম এবং ৯ম উইকেট পড়ে গেল। ২৩০ মিনিট খেলে ২০০ রানে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। আর এস মোদী নট আউট ৫৭ রান করলেন, তাঁর রানই দলের সর্ব্বোচ্চ হ'ল। বেডসার ২৯·১ ওভার বলে ১১টা মেডেন নিয়ে এবং ৪৯ রান দিয়ে ৭টা উইকেট পেলেন। বেডসার এই প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেললেন। ভারতীয় দলের ব্যাটিং খুবই 'স্লো' হয়েছে।

চা পানের পর ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস আরম্ভ করলো। সূচনা খুব ভাল হ'ল না। অমরনাথ প্রথম বোলিং আরম্ভ করলেন; তাঁর সঙ্গে জুটী হলেন হাজারী। ইংলণ্ডের ১৬ রানের মাথায় পর পর বলে অমরনাথ হাটন এবং কম্পটনকে আউট করলেন। ঠিক এর পরের বলে হ্যামণ্ড প্রায় রান-আউট থেকে অব্যাহতি পেয়ে অমরনাথের hat-trick নষ্ট করলেন। ইংলণ্ডের ৭০ রানের মধ্যে অমরনাথ আরও ২টো উইকেট পেলেন। ইংলণ্ডের নামকরা ব্যাটসম্যান হ্যামণ্ড, হাটন এবং ডেনিস কম্পটনকে যথাক্রমে ৩৩,৭ এবং শূন্য রানে আউট করে বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখালেন। ব্যাটিংয়ে তিনি নিরাশ করলেও তাঁর বোলিং মুখ রক্ষা করলো। ২০ ওভার বলে ১৪টা মেডেন নিয়ে এবং ৪২ রান দিয়ে তিনি ঐদিন মোট ৪টে উইকেট পান। দিনের শেষে ৪ উইকেটে ইংলণ্ডের ১৩৫ রান উঠলো। হার্ডষ্টাফ এবং গিব যথাক্রমে ৪২ এবং ২৩ রান ক'রে নট আউট রইলেন। সরকারীভাবে জানা গেল ২৯,০০০ দর্শক প্রথম দিনের খেলার উপস্থিত ছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করলেন ইংলণ্ডের নট আউট ব্যাটসম্যান হার্ডষ্টাফ এবং গিব। দর্শক উপস্থিত হয়েছে ২০,০০০ হাজার। অমরনাথ নতুন বল নিয়ে নার্শারীর শেষ দিক থেকে বল দিতে আরম্ভ করলেন। অমরনাথের দ্বিতীয় বলে হার্ডষ্টাফ এক রান করলেন। গিব ঐ ওভারের সব বল ঠেকিয়ে গেলেন। হাজারী বল দিতে লাগলেন প্যাভিলিয়ানের দিক থেকে। ইংলণ্ডের রান খুব ধীরে উঠতে লাগলো। ১৪৭ মিনিট ইনিংস খেলার পর হার্ডষ্টাফের ৫০ রান পূর্ণ হ'ল। হার্ডষ্টাফের এই নিয়ে পর পর চারটে 'হাফ-সেঞ্চুরী'। ৮৫ মিনিট ব্যাট ক'রে হার্ডষ্টাফ শত রান পূর্ণ করলেন। টেষ্ট খেলায় তাঁর এই চতুর্থ সেঞ্চুরী এবং ভারতীয় দলের বিপক্ষে প্রথম। ১৯৩৮-৩৯ সালের সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে খেলায় তিনি ৩টে সেঞ্চুরী করেন। গিব বেশ সুবিধা করতে পারছিলেন না, ৪৫ মিনিটে ১৩ রান উঠলো। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুব ভাল হচ্ছিল। বোলিং এত ভাল হচ্ছিল যে, দশ মিনিটে মাত্র একটা ক'রে রান উঠছিল। ইংলণ্ডের ২০২ রানে গিব মানকাদের বলে কাট মেরে স্লিপে প্রায় বুক সমান ক্যাচ তুলে ফেলেন। হাজারী এ সুযোগ নষ্ট করেন। ইংলণ্ডের ২৫২ রানে গিব ৬০ রান ক'রে মানকাদের বলে স্লিপে হাজারীর হাতে ধরা পড়ে আউট হ'লেন। হার্ডষ্টাফ এবং গিবের জুটীতে ১৭৫ মিনিটে ১৪২ রান উঠে। গিব ৪টে বাউণ্ডারী করেন। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ড ৮৬ রানে এগিয়ে গেল। এদিকে ৬টা উইকেট পড়ে গেছে। হার্ডষ্টাফ নট আউট ১২৮। লাঞ্চের সময় গেট বন্ধ হয়ে যায়। মোট ২৬,৮০০ টাকার বিক্রী হয়। লাঞ্চের পর জোর বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিউসপেপার" পুরস্কার ঘোষণা করলো—দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের যাঁরা সেঞ্চুরী করবেন তাঁরা প্রত্যেকে ৫০ গিনি ক'রে পাবেন; এছাড়া বোলিং এ্যানালিসিসে যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন তিনি এবং তাঁর পরবর্ত্তী বোলারও ২৫ গিনি করে পাবেন। লাঞ্চের পর ৫০ মিনিট খেলার পর ৩৪৪ রানে স্মেলসের উইকেট ২৫ রানে পড়লো। বেলা ৪টার সময় মোট ৩৮৫ মিনিট খেলার পর ৪২৮ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। হার্ডষ্টাফ ২০৫ রান করে নট আউট রইলেন। ইনিংসের পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে হ'লে ভারতীয় দলের তখন ২২৮ রান প্রয়োজন।

মার্চ্চেন্ট এবং মানকাদ ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের

খেলা আরম্ভ করলেন এবং প্রথম থেকেই দর্শনীয় মার দিয়ে নির্ভীকভাবে খেলতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৪ উইকেটে ১৬২ রান উঠলো। মার্চ্চেণ্ট ২৭, মানকাদ ৬৩, মোদী ২১ ক'রে আউট হলেন। হাজারী এবং পতৌদি যথাক্রমে ২৬ এবং ১৬ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা পুনরায় অকৃতকার্য্য হ'লেন। পতৌদি ২২, অমরনাথ ৫০ ক'রে আউট হলেন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৫ মিনিট খেলার পর ২৭৫ রানে শেষ হ'ল। বেডসার ৩২·১ ওভার বল দিয়ে ৩টে মেডেন নিয়ে এবং ৯৬ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেলেন। স্মাইলস পেলেন ৩টে ১৫ ওভার বলে ২টো মেডেন নিয়ে ৪৪ রান দিয়ে। রাইট ৬৮ রানে পেলেন ২টো উইকেট।

ইংলণ্ড লাঞ্চের ৩৫ মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। জয়লাভের জন্য ইংলণ্ডের আর মাত্র ৪৮ রান প্রয়োজন। লাঞ্চের পূর্ব্বেই কোন উইকেট না হারিয়ে এ রান তুলে ফেললো হাটন এবং ওয়াসব্রুক যথাক্রমে ২২ এবং ২৪ রান ক'রে। ২ রান অতিরিক্ত উঠলো। ইংলণ্ড ১০ উইকেটে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পরাজিত করলো।

ভারতীয় দল—ভি মার্চ্চেণ্ট, ভি মানকাদ, এল অমরনাথ, ভি এস হাজারী, আর এস মোদী, নবাব পতৌদি, (ক্যাপটেন), গুল-মহম্মদ, আবদুল হাফিজ, সি সি এস নাইডু, এস জে সিন্ধে, ডি ডি হিন্দেলকার।

ইংলণ্ড—ডবলউ হ্যামণ্ড (গ্লুসেষ্টার, ক্যাপটেন), পি এ গিব (ইয়র্কসায়ার)—উইকেট কিপার, লেন হাটন (ঐ), বিল বাউজ (ঐ), টম স্মাইলস (ঐ), জো হার্ডষ্টাফ (নটিংহাম), ডেনিস কম্পটন (মিডলসেক্স), চার্লি ওয়াসব্রুক (লাঙ্কাসায়ার), জে টি এ্যাকিন (ঐ), ডগলাস রাইট (কেণ্ট), এলেক্ বেডসার (সারে)।

জুন ২৬, ২৭, ২৮।

ভারতীয় দল—৩২৮ (মার্চ্চেণ্ট ১১০, মোদী ৬৩, অমরনাথ ৫২, ক্লার্ক ৬৩ রানে ৩ এবং রবিনসন ২৭ রানে ২ উইঃ) ও **১৭১** (১ উইঃ মার্চ্চেণ্ট নট আউট ৭২ এবং অমরনাথ নট আউট ৮২ রান।

নর্থ হ্যাম্পটনসায়ার—৩৬২ (ব্রুকস ৮২, টিমস ১০৭, ব্যারোন ৬৪; মানকাদ ৯৯ রানে ৫ এবং সিন্ধে ৪৮ রানে ৩ উইকেট)। খেলা ড্র।

জুলাই ১, ২।

ল্যাঙ্কশায়ার—১৪০ (সি ওয়াস ব্রুক ৫৮, ব্যানার্জ্জী ৩২ রানে ৪ ও অমরনাথ ৪৮ রানে ৩ উইঃ) ও **১৮৫** (এ্যাকিন ৫৫, মানকাদ ১৭ রানে ৩ উইকেট)।

ভারতীয় দল—১২৬ (পতৌদি ৩৫, সি এস নাইডু ২৯; পোলার্ড ৪৯ রানে ৭ উইঃ) ও **২০০** (২ উইঃ মার্চ্চেণ্ট নট আউট ৯৩ এবং পতৌদি নট আউট ৮০)।

ভারতীয় দল ৮ উইকেটে জয়ী হয়েছে।

উইম্বলডন টেনিস ঃ

বিখ্যাত উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসের ফাইনালে ফ্রান্সের yvon petra ৬-২, ৬-৪, ৭-৯, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার জিওফারী ব্রাউন্‌কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন। এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে এই তাঁর প্রথম জয়। yvon petra লম্বায় ৬ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দী ব্রাউনের বয়সের তুলনায় ৯ বছরের বড়। খেলার শেষে বলেছেন "Brown gave me the hardest game of my life and he is a wonderful player and his two-handed fore-hand is very powerful…" petra ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়ানসীপের জন্য শীঘ্রই ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে ফরেষ্ট হিলে ইউনাইটেড ষ্টেটস চ্যাম্পিয়ানসীপে যোগদানের জন্য যাত্রা করবেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস পাউলিন বেট্‌জ (ইউনাইটেড ষ্টেটস) ৬-২, ৬-৪ গেমে মিস লুইস ব্রাউকে (ইউনাইটেড ষ্টেটস) হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবলসে টম্ ব্রাউন এবং জ্যাক ক্রামার (ইউনাইটেড ষ্টেটস) ৬-৪, ৬-৪, ৬-২ গেমে জিওফ ব্রাউন এবং ডেনি পেলসকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে টম ব্রাউন ও মিস ব্রাউ (ইউঃ) ৬-৪, ৬-৪ গেমে জিওফ ব্রাউন এবং মিস ডোরোথি বুণ্ডিকে (ইউঃ) পরাজিত করেছেন।

খেলার মাঠ না যুদ্ধক্ষেত্র ?

ফুটবল খেলায় জয়লাভের জন্য দু'পক্ষে জোর প্রতিযোগিতা খুবই স্বাভাবিক এবং ফলে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা উপেক্ষণীয়। এ রকম প্রতিযোগিতামূলক খেলা মোটেই নিন্দনীয় নয়, বরং এ রকম খেলাই খেলোয়াড়দের খেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করে এবং দর্শকেরা খরচা করে খেলা দেখেও তৃপ্তি পায়। কিন্তু খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে খেলোয়াড়রা যখন যে কারণেই হউক খেলার আইন উপেক্ষা ক'রে সংযম হারিয়ে ফেলে তখন খেলা আর খেলার পর্য্যায়ে থাকে না। এ অবস্থায় যে খেলা খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হয় তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সম্প্রতি ক'লকাতার মাঠে প্রথম বিভাগের লীগের কয়েকটি খেলায় তার পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম সূত্রপাত হয় ভবানীপুর বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের প্রথম খেলায়। সে খেলায় ভবানীপুর ১-০ গোলে জয়ী হয়। খেলার শেষে ভবানীপুর দলের খেলোয়াড়রা উচ্ছৃঙ্খল দর্শক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তারা ভবানীপুর ক্লাব টেণ্ট পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে মারপিট করে এবং তাঁবু নষ্ট করে ; ইট পাটকেল, সোডার বোতল নিক্ষেপের ফলে বহু নিরীহ পথচারী এবং মাঠের দর্শকেরা আহত হয়। প্রকাশ, পুলিশ এই উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে আয়ত্তে আনবার কোন বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ঐ দুই দলেরই রিটার্ণ ম্যাচে। ভবানীপুর এ খেলায় ১ গোলে জয়লাভ করলো বটে কিন্তু তাদের তাঁবু ফুটো হ'ল, খেলোয়াড়রা আহত হ'ল। এরকম ঘটনার অবসান এইখানেই হ'ল না।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের রিটার্ণ খেলায় উভয় দলের খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের মধ্যে আশা নিরাশার কি উঠানামা—ঠিক এই সন্ধিক্ষণে ইস্টবেঙ্গল দলের নায়ার বীভৎসভাবে মোহনবাগান ক্লাবের গোলকিপার ডি সেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যে প্রথম উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন ; তার পর রাখাল মজুমদার বল ছেড়ে মোহনবাগানের একজনকে লাথি মেরে খেলার মাঠের আর একদফা আবহাওয়া নষ্ট করলেন। রেফারী সতর্ক ক'রে ফাউল দিলেন। কিন্তু এইখানেই এর শেষ হ'ল না। দর্শকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল খেলার ঠিক পর। মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবু ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল, সভ্যরা আহত হ'লেন। মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ অফিসে জানিয়েছেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তাঁবুর সীমানা থেকে ইট এবং সোডার বোতল এসে মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবু নষ্ট করেছে, সভ্য এবং দলের সমর্থকদের আহত করেছে। এই ব্যাপারে নাকি অপর পক্ষের কোন কোন সভ্য জড়িত আছেন এবং তাঁদেরই উৎসাহে একদল উচ্ছৃঙ্খল দর্শক এ কাজে সহায়তা করেছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে আই এফ এ যদি যথাযথ কঠোর ব্যবস্থা না করেন তাহলে মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ কর্ত্তৃক পরিচালিত সমস্ত ফুটবল টুর্ণামেণ্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করবেন স্থির করেছেন।

যতদূর জানা যায়, মোহনবাগান ক্লাব তার দীর্ঘ দিনের জীবনে কখনো কোন দলের বিপক্ষে এমন কি খেলায় হেরে গিয়ে আইনের সুবিধা পেয়েও দলের স্বার্থের জন্য 'protest' ক'রে নি। এই তাদের প্রথম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইউরোপীয় দল এবং রেফারীদের মধ্যে যখন ভারতীয় বিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠে তখন জাতির সম্মানার্থে মোহনবাগান ক্লাব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।

আই-এফ-এ বর্ত্তমানে ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখন দেখা যাক্ আই-এফ-এ এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। খেলার মাঠে খেলা পরিচালনা করা ছাড়া মাঠের দর্শকদের নিরাপত্তার ভার তাদের উপরই, কেবল পুলিশের উপর চাপিয়ে দিলে পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে অযোগ্যতার পরিচয় দেবেন।

* * * *

আই-এফ-এর পরিচালনার মধ্যেও বহু ত্রুটি আছে। সে সব ত্রুটি সংশোধনের কোন রকম লক্ষণ নেই। সব থেকে বড় ত্রুটি আই-এফ-এর সুপারিশে যে সব রেফারী খেলা পরিচালনা করেন তাঁদের বেশীর ভাগই খেলার মাঠে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। কি রকম কষ্ট স্বীকার ক'রে এবং সমস্ত সম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে খেলার মাঠের টিকিট সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণকে মাঠে যেতে হয় তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আই-এফ-এর সভ্যভুক্তির নেই। থাকলে জনসাধারণের প্রতি তাঁরা এতখানি কঠোর হ'তেন না।

যুগের অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে; আই-এফ-এর পরিচালকমণ্ডলী যদি তাঁদের খুশিমত বিচার বুদ্ধি নিয়ে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ উপেক্ষা ক'রে জেদ বজায় রাখেন তাহলে খুবই ভুল করবেন।

* * * *

দায়িত্বশীল এবং কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমর্থন করবেন এবং আমরাও করি; কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যেমন কেউ সমর্থন করে না তেমনি আমরাও করি না।

এই প্রসঙ্গে খেলার মাঠে যে সব অপ্রিয় ঘটনার উল্লেখ করা হ'ল তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়—পরাজয়ের ফলে একদল সমর্থকদের বিক্ষোভ অন্যদিকে বিজয়গর্ব্বে আর একদল সমর্থকদের উন্মত্ততা বলা চলে। এই দু'য়ের ফলাফল কতখানি জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর এবং পীড়াদায়ক তা ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার কঠোর ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত। (৯।৭।৪৭)

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "এই পৃথিবী"—৩৲
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত "বাঙ্গালা সাহিত্য" (১ম খণ্ড)—৪৲
শ্রীশম্বুক প্রণীত উপন্যাস "পৃথিবীর মানুষ নয়" (১ম-২য় খণ্ড)—১।৹
শ্রীজনরঞ্জন রায়-সম্পাদিত "যুগবাণী"—।৹
গোপাল ভৌমিক প্রণীত "নেতাজী"—২৲
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস"—৪৲
বনস্পতি-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "পিনাকীর পরাজয়"—২৲
সতীকুমার নাগ প্রণীত "ছোটদের নেতাজী"—১।৹
শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী-সম্পাদিত "বাংলা বর্ষলিপি" (১৩৫৩)—১॥৹
শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত "সপ্ত সমুদ্রের রণাঙ্গনে"—২॥৹
রণজিৎ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "জন্মভূমি" (দশহরা সংখ্যা)—১৲
সুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "সহচরী"—২॥৹
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "পূজনীয় দস্যু"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এবার আশ্বিন মাসের মধ্য ভাগেই শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা। সেজন্য মহালয়ার পূর্ব্বেই সকল গ্রাহকদের নিকট কাগজ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমরা আশ্বিনের প্রথমেই কার্ত্তিক সংখ্যা, ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আশ্বিন সংখ্যা এবং শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহে ভাদ্রের সংখ্যা প্রকাশ করিব। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথা সময়ে বিজ্ঞাপনের কপি প্রেরণের ব্যবস্থা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ঝান্সী-রাণী বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়িকা—লক্ষ্মী স্বামীনাথম্

রঞ্জিতকুমার বসু (গৃহীত ফটো হইতে)



ভাদ্র—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

উমার যৌবন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এলো যৌবন প্লাবনের মত শৈলসুতার অঙ্গতটে,
গিরিপুরে জয়বারতা রটে।
অরুণ কিরণে বিকশিত অরবিন্দসম
হ'লো তনু তার মোহনতম,
সুকুমার চতুরস্রশোভি
তূলী-দিয়া-আঁকা যেন বা ছবি।
পীন গরিমায় ভরিয়া উঠিল যেখানে যা ছিল অপূর্ণতা,
ঘন পল্লবে পুষ্পিতা যেন শৈললতা।

এলো যৌবন চরণে উমার সবার আগে,
গাঢ় ভক্তিতে রঞ্জিত করি রক্ত-রাগে,
অরুণ নখের বরণের দ্যুতি উচ্ছলিয়া—
জ্যোৎস্নাঙ্গুলি ধীরে তুলি তুলি গিরিসুতা যবে যায় চলিয়া
হাঁটিতে মাটিতে স্থলারবিন্দ ফুটায়ে যায়,
ফুটে যা শাখায় তা-ই পায় পায় সারা আঙিনায় লুটায়ে যায়।

এলো যৌবন উমার চলনে ধন্য করিয়া মৃত্তিকায়,
জাগে নব লীলাভঙ্গী তায়।
যৌবন-ভারে গিরিজা মরাল-গমনে চলে,
এমন চলন শিখিল সে কোথা? কবিরা বলে,—
ঐ যে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর বাজায়ে যায়,
ভূধর-দুহিতা কমল পায়
লীলাঙ্কিত সে পদক্ষেপের মঞ্জীর শুনি শিখিতে গীতি,
লভিবার তরে প্রতি-শিক্ষায় পুরস্কৃতি
রাজহংসীরা শিখাল তারে
চলন-ভঙ্গী অলস গমনে শ্রোণির ভারে।

এল যৌবন তেয়াগি চরণ ঊর্দ্ধপানে
জঙ্ঘায় নব কান্তি আনে।
জঙ্ঘাযুগল চারু বর্ত্তুল অনতিপীন
অনতিদীর্ঘ ক্রমশঃ ক্ষীণ,

শ্রীপুষ্টি তার কি আর ক'ব ?
রূপ-বিধাতার সৃষ্টি নব ;
করিতে তাদেরে সুবলয়িত
বিধির নিধির ভাণ্ডার হ'লো নিঃশেষিত,
বাকি অঙ্গের রচনা-কার্য্য করিতে শেষ
উপাদান তরে নিঃস্ব বিধাতা সহিল কত না যাতনা-ক্লেশ।

এলো যৌবন উমার উরুর গুরুশ্রীতে,
দিল যে কান্তি নাহি তা করভে নাহি তা' কদলী তরুশ্রীতে -
সুন্দরীদের উরুর উপমা দিবার ছলে
হয় করভোরু নয় রম্ভোরু কবিরা বলে ;
চির কর্কশ করি-করভের কি গৌরব ?
অতি সুকুমার তরুণী উমার উরুর উপমা অসম্ভব
তাহার সঙ্গে। কদলী তরুরও উপমানে আছে অযোগ্যতা,
অতিশীতলতা দোষে সে দুষ্ট, তুলিও না আর তাহার কথা।

এলো যৌবন উমার মেখলা-ধারণ-ধামে
মণ্ডিত যাহা রণিত কণিত কাঞ্চীদামে—
সেই শ্রোণিধাম কত অভিরাম বুঝানো দায়,
শুধু এই বলি বুঝানো যায়,—
তিন ভুবনের অন্য নারীর স্বপ্নাতীত
চন্দ্রশেখর অঙ্কে যা হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
চির-গৌরবে লভিবে ঠাঁই,
তার কান্তির বর্ণনা করি, স্পর্দ্ধা নাই।

এলো যৌবন উমার অঙ্গে সুষমার আর নাই যে সীমা
আনে কটিতটে নব তনিমা।
কটিতট তার বেদীমধ্যের মতন ক্ষীণ,
ঊর্দ্ধে তাহার হ'লো আসীন
মকরকেতুর আরোহণে কিবা সোপানসম
সুবলিত চারু ললিত ত্রিবলি রম্যতম।

এলো যৌবন উমার তনুর উরঃস্থানে
অসিতচুচুক স্ফীত পাণ্ডুর উরোজ-যুগলে ঘনিমা আনে।
ব্যবধানে আজ হেন অবকাশ কিছু না রাজে,
মৃণাল-তন্তু তাও যে পশিবে তাদের মাঝে।
এলো যৌবন উমার বাহুতে সঞ্চার করি বর্ত্তুলতা,
বলি এইবার তাহারি কথা।
শিরীষের সাথে উপমা তাহার কভু না মানি,
সে ফুলদলের শকতি জানি,
শিরীষ-কুসুম-শর নিক্ষেপি মীনকেতন
জিনিতে মহেশে হারাল একদা নিজ জীবন।

উমা-বাহুপাশে বাঁধিল সে শেষে কণ্ঠখানি,
যার বন্ধনে বন্দী হইল পিনাক-পাণি।
তাহার সাথে
শিরীষদলের উপমা চলে কি বর্ণনাতে ?

হ'লো যৌবন উমার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত,
মুক্তাফলের মালিকা তাহাতে বিলম্বিত,
মুক্তাফলের বাড়িল কি শোভা, কণ্ঠের শোভা বাড়িল তার,
দু'য়ের মিলনে বুঝা না যায়।
একের হয়েছে ভূষণ আর
মুক্তার ভূষা উমার কণ্ঠ, কণ্ঠের ভূষা মুক্তাহার।

এলো যৌবন উমার মুখে
ইন্দু-কমলে এক সাথে রমা বিরাজ করেন আজিকে সুখে।
নিশীথে চন্দ্রে বিহার করিয়া হারাতেন তিনি কমলালয়,
দিবসে চন্দ্রে হারাতেন তিনি কমলে করিয়া সমাশ্রয়।
পেয়ে উমা মুখ শ্রীদেবতার
রহিল না আজি সে ক্ষোভ আর।

এলো যৌবন শৈলসুতার দন্তাধরে
হাস্য ধারায় আস্য' পরে।
লোহিত কুসুম কিসলয়ে যদি হ'তো নিহিত,
হ'ত যদি মোতি প্রবালের পরে সমারোপিত,
উপমা চলিতে পারিত তাতে
উমার অরুণ অধর-লগ্ন শুভ্র মধুর হাসির সাথে।

এলো যৌবন উমার মধুর কণ্ঠরবে।
অমৃতবর্ষী কণ্ঠে কথা সে কহিত যবে
কেমনে বুঝাব সে স্বরের সুর মধুর কত ?
কোকিলের স্বরও পীড়িত কর্ণ বেসুরো বেতারা বীণার মত।

এলো যৌবন উমার লোচনে দৃষ্টিরে তার চপল করি'
বায়ুচঞ্চল নীলোৎপলের উপমানত্বে সফল করি',
গিরিবিহারিণী হরিণীর কাছে উমা কি পাইল দৃষ্টি তার ?
অথবা হরিণী গিরিবালার
দৃষ্টি-ভঙ্গী করে হরণ,
এ দ্বিধা কে করে নিরাকরণ ?

এল যৌবন উমার ভ্রূযুগে লীলাচঞ্চল বঙ্কিমায়,
যেন অঞ্জন-শলাকাঙ্কিত পুলকাঙ্কিত ভ্রূলতা তায়।
হেরি যাহা স্মর লজ্জা ভরে
আপন ধনুর গুণের গর্ব্ব আর না করে।

এলো যৌবন শৈলসুতার মৌলি-দেশে,
ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশে।
চমর-বধূরা ভ্রমর-কৃষ্ণ পুচ্ছ-লোমের গর্ব্ব করে,
লালন করে এ সজ্জারে বহু যত্ন ভরে,
পশুদের যদি লজ্জা থাকিত, তাহারা তবে,
উমার কেশের গুচ্ছ হেরিয়া সগৌরবে
মত্ত হতো না পুচ্ছ-ভারে,
তুচ্ছ বলিয়া গণিত তারে।

এলো যৌবন রূপ-বিধাতার চরম বাসনা পূর্ণ করি'
উমার সকল অঙ্গ ভরি',
বিশ্বের যত শ্রীউপকরণ রূপ-উপাদান জুটায়ে শেষে
যেখানে যা সাজে সেখানেই তার সন্নিবেশে,
একটি পাত্রে সবগুলি বিধি দেখার তরে
উমা-তনুখানি সৃজন করে।
সব উপমান মিলিয়াছে যেথা কোথায় মিলিবে তার উপমা ?
তিল-তিল রূপ-লাবণ্যে সে যে তিলোত্তমা।
(কুমার-সম্ভব)

কর্মযোগ—কর্মফল

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

কর্মফল কি ? কর্মফল বলতে ঠিক কি বোঝায় ?

কর্মের প্রেরণা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, যত্ন, উৎসাহ, ধৃতি, দক্ষতা—এর কোনোটিকেই যেন কর্মফল ব'লে না ভাবি, বিশেষ ক'রে প্রেরণা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে—কেননা এরা কর্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কর্মের পরিণতি বা ফল নয়। এদের পরিত্যাগ করলে কর্মকেই তো পরিত্যাগ করা হল। প্রেরণা-বিহীন, লক্ষ্যশূন্য, নিরুৎসাহ, অপটু কাজ আবার কাজ না কি ? সে তো কাজ নয়, ফাঁকি। কাজে ফাঁকি দিলে নিজেকেই ফাঁকিতে পড়তে হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই আমাদেরি দেশে। গীতা বলেছেন কর্মফলে উদাসীন, নিরাসক্ত হও। আমরা উল্টা বুঝে কর্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে, উদ্দেশ্যে, উৎসাহে, ধৃতিতে, যত্নে উদাসীন হ'য়ে স্বাধীনতা হারিয়েছি, মান সম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তি সবই আমাদের গেছে। বিশ্বের জাতি সঙ্ঘে জ্ঞানী হয়েও আমরা ভিক্ষুক। অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েও আমরা পরের কাছে দাসত্ব করছি।

সঙ্গ, আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সমস্ত শব্দই কর্মফল প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে গীতায়—একথা যেন না ভুলে যাই। বনস্পতি যেমন ফল ফলাবার জন্যে অতন্দ্রিতে কাজ ক'রে চলেছে, তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, আলস্য ঔদাসীন্য নেই, মানুষও তেম্‌নি 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ' হ'য়ে কাজ করুক। তরুর মতোই সমস্ত প্রয়াসকে সফল করাই তার ব্রত হোক্। আবার ঐ তরুর মতোই সমস্ত ফলটিকে নিঃস্বার্থে দান করাই তার প্রার্থনা হোক্। "সর্বারম্ভ পরিত্যাগী"—গীতায়-ব্যবহৃত এই কথাটির আসল অর্থটি ভুললে চলবে না। ইহলোকে এবং পরলোকে ফলাকাঙ্ক্ষা ক'রে যে কর্মোত্তম, তাকেই বলে "আরম্ভ", কাজ সুরু করাকে গীতার ভাষায় আরম্ভ বলে না।

এবার ধরা যাক্ সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দার কথা। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রেরণা, ধৃতি, দক্ষতা, উৎসাহ প্রভৃতি যেমন কর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এগুলি সে রকম নয়। আবার এরা কর্মের সাক্ষাৎ "পরিণতি" বা "ফল" বলতে যা বোঝায় ঠিক তাও নয়। তবে কর্মফলের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে তা সবাই জানে। তরুকে ফল বহন করতে দেখলে বলি—তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তুমি যখন দরিদ্রের জন্যে একটি চিকিৎসালয় গড়ে তুললে, তখন বলি তোমার চেষ্টা ও কর্ম জয়যুক্ত হয়েছে, তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ, তুমি যা করতে চেয়েছিলে তা তুমি লাভ করেছ, তুমি স্তুতির যোগ্য। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ প্রভৃতি বিষয়ে ত্যাগের নির্দেশ গীতা দেন নি, কেননা এগুলি কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও আসলে কর্মফল নয়, তাই গীতা বলেছেন এ সবে সমান থেকো। "তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী", "সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ", "সিদ্ধ্য সিদ্ধেঃ সমোভূত্বা", "সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ", "নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বম্ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু", "সমঃ দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ", "তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরঃ"—প্রভৃতি নানা শ্লোকাংশ গীতা থেকে উদ্ধৃত ক'রে একথা দেখানো যেতে পারে। এর মানে অতি সহজ। কাজের ফল যদি আশানুরূপ না হয়, সিদ্ধি যদি না আসে, তাই ব'লে ভেঙে পড়লে চলবে না। আবার কাজের ফলটি খুব ভাল হয়েছে ব'লে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পাড়া মাথায় ক'রে বেড়ানোও নয়। দুঃখ সুখে, জয়ে-পরাজয়ে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে কি রকম থাকবে ?—সমঃ ধীরঃ, স্বস্থঃ। আপনাতে আপনি সংযত হ'য়ে, ধীর, মৌনী থাকবে। নিজেকে ছড়িয়ে পড়তে, গড়িয়ে পড়তে, ভেঙে পড়তে দেবে না। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতির সঙ্গে সুখ দুঃখ নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা। সুখ দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, সুখ দুঃখে সমান থাকবে, এই হল গীতার নির্দেশ। অনেক ধর্মমত আছে—যাতে বলে ধর্মানুমোদিত এই এই কাজ করলে তুমি পাপ থেকে বাঁচবে, দুঃখকে এড়িয়ে যেয়ে সুখকে লাভ করবে। কিন্তু গীতা এমন কোনো দুঃখ এড়াবার 'শর্টকাটের' নির্দেশ দেন নি। বাস্তবিক দুঃখ জিনিষটা

তো এড়িয়ে যাবার নয়, যার দুঃখ নেই, এ জগতে সেই যে সব চেয়ে বড়ো দুঃখী, সব চেয়ে বড়ো দুর্ভাগা। আমাদের মনুষ্যত্ব দুঃখের দ্বারাই দুর্লভ, সাধনা, তপস্যা, অভ্যাস, যত্ন—সমস্তই দুঃখের দ্বারা দুর্গম। জগতে যা-কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের, কিন্তু তাঁর এই এক বিধান আছে, মানুষ আপন দুঃখের দ্বারাই তাঁর জিনিষকে নিজের জিনিষ করতে পারবে। স্বয়ং ঈশ্বরও আমাদের বহু দুঃখের দ্বারা আরাধ্য—তিনি আমাদের দুঃখ রাতের রাজা। তাঁকে আমরা কী দিতে পারি? পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং—সে সব তো তাঁরি জিনিষ। তাঁকে দিতে পারি শুধু আমাদের দুঃখে-ঝরা চোখের জল, যা একমাত্র আমাদেরি নিজস্ব। আমাদের পিতৃপ্রপিতামহগণ দুঃখকে কোনো দিন এড়িয়ে যেতে বলেন নি, বলেছেন বক্ষকে বিস্ফারিত করো, চিত্তকে, দৃঢ়বলে বলীয়ান করো, পড়ুক সেখানে দুঃখের বজ্র—হে বীর, তুমি বিচলিত হয়ো না—যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

শ্লোকে শ্লোকে, অধ্যায়ে অধ্যায়ে গীতা বারংবার বলেছেন—কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করতে হবে, কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করতে হবে। আর কোনো সাধনা, আর কোনো তপস্যা যদি নাও করতে পারো, গীতা বলেছেন, যদি তোমার মনকে, বুদ্ধিকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট করতে অসমর্থও হও, যদি ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে সব-কাজ করতে সক্ষম নাও হও, তবু

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১২।১১

যদি এ সব করতে নাও পারো, তাহলে আমাতে (ঈশ্বরে) যোগ আশ্রয় ক'রে (ঈশ্বরে কর্মসমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় ক'রে) সংযত চিত্তে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করো।

সুতরাং কর্মযোগের সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে সর্বকর্মফল ত্যাগ করো। কর্মমাত্রেই বন্ধন রচনা করে। মুক্তিকামী তবে কি সর্বকর্ম ত্যাগ করবেন? গীতা দেখালেন সেটা অসম্ভব। বেঁচে থাকতে গেলে কিছু না কিছু কাজ করতেই হবে। অতএব কর্মফল ত্যাগ করো, কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করো, তাহলে কর্ম আর তোমায় বাঁধবে না। এই কথাটি খুব যে শক্ত কথা তা নয়, আপন মনে ধীরভাবে ভেবেই এর যথার্থ অর্থটি উপলব্ধি করতে হবে। যে সত্যগুলির ওপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তারা কখনোই দুর্বোধ্য জটিল নয়। জটিলতা দুর্বলতারই নামান্তর। গীতায় রাজযোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে কর্মযোগের ব্যবহারিক অনুষ্ঠান বোঝাতে যেয়ে শ্রীভগবান বলেছেন—তা 'সুসুখং কর্তুম্'—তার আচরণ অতি সুখেই, অতি সহজেই করা যায়। কাজেই খুব যে কষ্টে-শ্রেষ্ঠে, খুব যে কায়ক্লেশে গলদ্ঘর্ম হয়ে কর্মযোগের তথ্য বুঝতে হবে, আর তা বোঝাতে যেয়ে জটিল তর্কজালের অবতারণা করতে হবে তা মোটেই নয়। কর্মযোগ 'সুসুখং কর্তুম',—এর প্রণিধানে, এর আলোচনায়, এর আচরণে আনন্দ আছে, সে-আনন্দ আমাদের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে।

'কর্ম' বলতে কি বোঝায় এর পূর্বে সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। গীতা মানুষকে যে-কর্ম করতে আহ্বান করেছেন সে হচ্ছে সর্বজীবের যাতে মঙ্গল হয় এই রকম কর্ম। কর্মের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন গীতা—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।"

এ শ্লোকাংশটির মানে নিয়ে অনেক মতভেদ থাকলেও এর মোটামুটি অর্থ বুঝতে কোনো কষ্ট নেই। কর্ম হচ্ছে সেই ত্যাগ বা সেই সৃষ্টি (সৃষ্টি মানেই তো ত্যাগ) যার দ্বারা সর্বজীবের জীবনধারণের উপায়সমূহ বিহিত হয় (ভূত=জীব; ভূতভাব=জীবের জীবত্ব, জীবের জীবনধারণ; তারি উদ্ভব=সর্বজীবের জীবনোপায়সমূহ বিধান করা)—এক কথায়, সর্বজীবের মঙ্গল করা বলতে আমরা যা বুঝি, তাই। কর্মের এই সংজ্ঞাটি মনে রাখলে কর্মফলত্যাগের ঠিক অর্থটি বুঝে নিতে আর কোনো গোল থাকে না। কর্ম মানে যখন কায়মনোবাক্যে সর্বজীবের মঙ্গল সাধন, তখন কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যা-কিছুই উদ্ভূত হোক্ না,—অপরের মঙ্গল, অপরের কল্যাণ, কর্মীর পুণ্য—সে সমস্ত কর্মফলে কর্মীর আর কোনো অধিকার নেই; বিসর্গের জন্যে, ত্যাগের জন্যে, পরমমঙ্গল সৃজনের জন্যে যখন কর্মের আরম্ভ, তখন পরিপূর্ণ ফলত্যাগেই কর্মের স্বাভাবিক পরিণতি।

এম্‌নি ক'রে কাজ করলে কাজ আর বন্ধনের কারণ হয় না, সে নিজেই নিজের বন্ধন ক্ষয় ক'রে চলে যায়। পা' দুখানি পথ চলবার জন্যেই তৈরি হয়েছে, কিন্তু যে-মুহূর্তে আমাদের চলার শেষ হল, সে-মুহূর্তে পা' দুটি পথ ছেড়ে ঘরে এসে পৌঁছাল। পথকে না ছাড়লে তো ঘরকে পাবার উপায়ই নেই। হাত দুখানি কাজের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু যে-মুহূর্তে কাজের শেষ হবে, সেই মুহূর্তেই হাত দুটিকে কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিতে হবে; নইলে কাজের যে সমাপ্তিই হয় না, নইলে হাত যে জোড়াই থেকে যায়। তাই হাত দুটির কোনো কিছুকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না, প্রাণপণে যা করেছি, প্রাণপণে তাকে ছেড়ে চলে আসতে হবে। এরি নাম কর্মফলত্যাগ।

আর এক দিক থেকে ভাবা যেতে পারে। ফলত্যাগের মানে যখন ভাবছি, ফলবৃক্ষটির কথা তখন মনে পড়ছে না? ফলের উপমা ফলবৃক্ষের দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে। এই যে আমাদের প্রতিবেশী বনস্পতি মায়ের মতো স্নেহচ্ছায়ায় ঢেকে রেখেছে, প্রতি বৎসর ফুলফলের অজস্র উপহার তার অন্তরলোক হতে বহন ক'রে আনছে আমাদের জন্যে—'নিয়তং কুরু কর্মত্বং' ঝঙ্কৃত হচ্ছে এ-বাণী তার পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায়। কী অজস্র প্রাণশক্তিতে সে কম্পমান, কী অনলস ক্লান্তিবিহীন তার প্রচেষ্টা! দগ্ধ বৈশাখের দিনে তার যে-মূর্তি দেখেছি, সে শুধু মহাযোগীর তপস্যাকেই মনে করিয়ে দেয়—

"কঠোর তপে মন্ত্র জপে, তৃষিত তরুমূল,
ঝরিয়া পড়ে পাতা—
বনস্পতি তবুও তোলে মাথা।" (রবীন্দ্রনাথ)

কিসের জন্যে তার এ সাধনা? ধরিত্রীর জরাজীর্ণতা, মরুময় কঙ্কালতার,

রৌদ্রদগ্ধ বিশুষ্কতা ঘুচিয়ে দিয়ে, তাকে শ্যামল ক'রে, মনোরম ক'রে সাজাবার ভার নিয়েছে এই তরু—

"মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তি দান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে, যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-উর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়
দুস্তর শৈলের বক্ষে, প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যান-লিপি লিখি দিলে পল্লব অক্ষরে
ধূলিরে করিয়ে মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।" (রবীন্দ্রনাথ)

মানুষের মনের মৃত্যু তার অন্ধকার কোটর থেকে অহরহঃ পরুষকণ্ঠে হাঁক দিচ্ছে, মানুষের সব আনন্দকে সে গ্রাস করতে চায়, তার জীর্ণকঙ্কাল উন্মুক্ত ক'রে রসহীন উষর বিলুপ্তির মরুভূমিতে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। কে তাকে এই ধ্বংসের হাত হতে বাঁচাবে? কে নিয়ে যাবে দ্বীপে দ্বীপে নবজীবনের সঞ্জীবনী ধারা?—বনস্পতির মতো মানুষের কর্মযোগী। কে তার জরা ঘুচিয়ে দেবে, কে তাকে নিদারুণ পরাভব হতে রক্ষা ক'রে অনন্ত প্রাণরসে, অনন্ত যৌবনে তাকে পরিপূরিত করবে?—বনস্পতির মতো মানুষের কর্মযোগী।

ভেবে ত্মাখো, তরুজীবনে সকল উদ্দেশ্য, সকল প্রেরণা, সকল কর্মের সার্থকতা তার ফলে। কেননা এই ফলের দ্বারাই সে তার প্রাণের ধারাকে ধরণীতে অক্ষুণ্ণ রাখবে, যে-ব্রত নিয়ে সে এসেছে,—"মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান মরুর দারুণ দুর্গ হ'তে"—তারি উদ্‌যাপন হবে এই ফলেরি দ্বারা। কিন্তু, "সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌।"—কিন্তু এক পরমতম আশ্চর্য্য এই ত্মাখো, যার জন্যে তরুর এতবড়ো সাধনা, তার এতবড়ো তপস্যা—সেই ফলটিকেই তরু কখনো নিজে নেবে না। নিঃশেষে একে বিলিয়ে দেবার জন্যেই সে কেবলি নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুলছে। জীর্ণপত্রপল্লব যা-কিছু তার পায়ের তলায় পড়ে যায়, তাকে সে মাটির রসের সঙ্গে গ্রহণ করে, পরিপাক করে, কিন্তু বৃন্তচ্যুত হ'য়ে বীজটি যখন পড়ে মাটিতে, তখন তার বেলা সম্পূর্ণ অন্য নিয়ম। তরুর শত সহস্র ক্ষুধিত শিকড়ের একটি শিকড়ও এই বীজের দিকে যাবে না—বনস্পতির কঠোর নিষেধ আছে সেখানে। মানুষকেও তার কর্মফলটি এম্‌নি পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরকে নিবেদন ক'রে দিতে হবে, কঠোর নিষেধ যেন থাকে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ওপর—খবরদার, এ তোমার ভোগের জন্যে নয়।

আবার ত্মাখো যতদিন ফলটি না পাকে, শক্ত মুঠিতে তরুরা তাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে, আপন সবুজ পাতার মধ্যে সবুজ ফলটিকে সুগোপনে রক্ষা করে, "যতন্তে চ দৃঢ়ব্রতাঃ"—উদ্‌যাপনের যে দেরি আছে, তাই এই সুদৃঢ় প্রযত্ন। কিন্তু ফল যেই পাকল, আর তাকে লুকিয়ে রাখবার প্রয়োজন নেই, তাকে এখন দিয়ে দেবার দিন এসেছে। তাই তার রঙ গেল বদলে। আর তাকে আঁকড়ে ধরবার দরকার নেই, তাকে এখন ছাড়তে হবে—তাই ত্যাগের বৈরাগ্যে বোঁটায় আকর্ষণ শিথিল হয়ে এল। তরু তা'তে গন্ধ দিল ঢেলে, নিমন্ত্রণ পাঠালে বাতাসে। ক্ষুধিত পথিক এল, পাখীরা এল। যে এল, সেই প্রসাদ পেয়ে গেল। বীজগুলি ছড়িয়ে পড়ল স্থান হ'তে স্থানান্তরে, দেশ হ'তে দেশে। এম্‌নি ক'রে তরু তার প্রাণের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখল, এমনি ক'রে সে মৃত্যুকে করল উপহাস, এম্‌নি ক'রে তার মুক্তি এল। এ না ক'রে সে যদি ফলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকত চিরদিন, কিংবা নিজে ভোগ করত—বিষয়ী মানুষ যেমন ক'রে বিষয় আঁকড়ে থাকে, বিষয় ভোগ করে—তাহলে স্বার্থ তার বৃহদর্থকে গ্রাস করত, শুখিয়ে যেত তার প্রাণের প্রবাহ, আসত তার মহতী বিনষ্টিঃ, তার চরম সর্বনাশ।

কর্মফলত্যাগী মানুষটিও ঠিক ঐ বনস্পতির মতো। এ জগতে মানুষ যদি একটিমাত্র হ'ত, তাহলে আর ভাবনা ছিল না, সে যা করতো তাই শোভা পেতো। কিন্তু মানুষ তো একটি নয়, তাই তাকে সকলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে, নিজের শ্রমের অন্ন সকলের সাথে ভাগ ক'রে খেতে হবে। এরি নাম মঙ্গল, গীতায় এরি নাম 'কর্ম'। সবাইকে দাবিয়ে রেখে নিজে যে বড়ো হতে চায়, সকলের অন্নে যে তার অতৃপ্ত লোভের ভাগ বসাতে চায়—তার সেই অন্যায়কে ঈশ্বর সহ্য করেন, ক্ষমা করেন না। একদিন আসে—যখন তার সেই গগনস্পর্শী দম্ভের প্রাসাদ খান্‌ খান্‌ হ'য়ে ভেঙে পড়ে, যেখানে যেখানে তার প্রভুত্ব ছিল, নির্য্যাতন ছিল, সেখানে সেখানে থরথরিয়ে মাটি কেঁপে ওঠে। কত দর্পের সৌধচূড়া এম্‌নি করে ভেঙেছে, ভাঙছে, ভবিষ্যতে ভেঙে পড়বে। অন্যায় চিরস্থায়ী হয়েছে, এমন দেশ কেউ ত্মাখাতে পারো, এমন ইতিহাস কেউ কি পড়েছো?

প্রাচীন ভারতবর্ষ তারস্বরে ঘোষণা করেছে ঐ দম্ভের পথ, ঐ লোভের পথ, ঐ অন্যায়ের পথ, অধর্মের পথ পরিত্যাগ করো,—

"অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

অধর্মের দ্বারা আপাততঃ বৃদ্ধি পাওয়া যায়, আপাততঃ ভাল হয়, আপাততঃ শত্রুগণকে পরাজিত করা যায়, কিন্তু সমূলে বিনাশ পেতে হয়।

আমাদের দেশ অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে তাই একটিমাত্র পথই দেখিয়েছে, মঙ্গলের পথ, কল্যাণের পথ। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। কর্মযোগীর যা-কিছু সাধন, যা-কিছু তপস্যা, যা-কিছু ব্রত, যা-কিছু প্রচেষ্টা সমস্তই কেবল পরের মঙ্গলের জন্যে। তাঁর কাজে যখন ফল ধরে, বহু আয়াসে, বহু প্রযত্নে সে-ফলটি তিনি পাকিয়ে তোলেন, একান্ত নিঃশেষ ক'রে একদিন তাকে সকলের মাঝে বিলিয়ে দেবার জন্যে। তিনি নিজে তা গ্রহণ করেন না, কেন না তিনি জানেন নিজে নিলে মঙ্গলের স্রোত আর বইবে না, স্বার্থের মরুবালুকায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই ত্যাগের দ্বারা তাঁর কাজ ক্রমাগত আনন্দের মাঝে মুক্তিপেতে থাকে, কাজ আর তার হ'য়ে

টুঁটি চেপে বসে থাকে না। বিষয়ীর বিষয় তাকে মৃত্যুকালেও শান্তির শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে দেয় না, জীবনকালেও তার অনন্ত ভয়। এই বুঝি তরী ডুবল, এই বুঝি ধন লুণ্ঠিত হল, এই বুঝি যান ভাঙল, বাহন মরল! ত্যাগ আমাদের কাছে বড়ো কঠিন, কেন না, আমাদের ভালবাসা যে জাগে নি। আমরা শুধু নিজেকে ভালবাসি, তাই নিজের দিকে সব কিছু টেনে রাখতে চাই। এও একরকমের ত্যাগ, যা-কিছু সবকে নিজের দিকে ত্যাগ, এবং তাতেই আমাদের আনন্দ, কেন না নিজের দিকেই যে আমাদের ভালবাসা আছে, আকর্ষণ আছে। নিজের দিক থেকে ভালবাসা যখন অন্যদিকে যাবে, তখন সেদিকে ত্যাগও আনন্দময় হয়ে উঠবে। কর্মযোগী হলেন আদর্শ প্রেমিক, সকলের প্রতি তাঁর অন্তরের টান আছে, কাকেও তিনি দূরে রাখেন না, সবাই তাঁর আপন। তাই তাঁর কর্মফল পরের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা তাঁর সমস্ত কাজই আনন্দের মাঝে মুক্তি পেতে থাকে, কর্ম আর কোনো বন্ধনই রচনা করে না। এমনি ক'রে তাঁর জীবন ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে, তাঁর প্রেম, তাঁর আনন্দ সকল সীমা অতিক্রম ক'রে অসীমতায় ছড়িয়ে যায়, তিনি "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে", ব্রহ্ম হ'য়ে উঠতে থাকেন, তিনি জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে,—জন্ম-মৃত্যু জরার দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে অমৃতলাভ করেন।

আমাদের দেশের এই কর্মযোগের শিক্ষা—যা বহুশতাব্দীর রাষ্ট্র বিপ্লব, অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্লাবন, সব কিছুকে অতিক্রম ক'রে আজও আমাদের চিত্তের দ্বারে দ্বারে করাঘাত ক'রে ফিরছে,—আমরা যেন তাকে আজ দ্বার খুলে দিই, অবনতমস্তকে হৃদয়ের শ্রদ্ধায় তাকে যেন গ্রহণ করি। বাইরেকার কোনো তন্ত্রমন্ত্রে আমাদের কিসেরই বা প্রয়োজন? যার ঘরে অমূল্য ভাণ্ডার, সে যাবে অপরের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে! আমাদের আজকের এই দৈন্য, এই লজ্জা, এই হীনতা—এ কেবল আমরা নিজেদের এই উদার আদর্শ হারিয়েছি বলেই। যে যেখানে আছো সবাই কর্মযোগের ব্রত অবলম্বন করো, নিজেকে আর দীনহীন অধম পাপিষ্ঠ বলে ভেবো না, নাত্মানং অবমন্যেত, নিজেকে আর অবমাননা কোরো না, নাত্মানং অবসাদয়েৎ, নিজেকে আর অবসাদগ্রস্তও কোরো না। মনে রেখো, কর্মযোগ কিছুই সুকঠিন কাজ নয়, দুরূহ কাজ নয়, ভুলো না গীতার মাভৈঃ বাণী, "সুসুখং কর্তুম্ অব্যয়ম্", ভুলো না, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। কেন নিজেকে দুর্বল ভাবা? কেন অবমাননা নিজেকে? তুমি যে-খাঁটি,—সেই-খাঁটিই আছো, তুমি যে সোনা,—সোনায় কখনো কলঙ্ক পড়ে? শুধু নিজেকে জাগিয়ে তোলো, দীপ্ত তেজে উদ্ভাসিত হও। নাইবা থাকল আমাদের দম্ভের রাজপ্রাসাদ, পীড়নের শতায়ুধ, অন্যায়ের উদ্ধত সঞ্চয়। ও পথ আমাদের দেশের পথ নয়, ও মত্ আমাদের আর্য পিতৃপিতামহদের মত নয়, ও পথে কল্যাণ আসবে না, মঙ্গল আসবে না। অন্যায়কারিদের ভগবান্ একদিন বোঝাবেন তবে ছাড়বেন, দম্ভের চূড়া একদিন ধ্বসবেই ধ্বসবে, একদিন আসবেই আসবে—যেদিন সমস্ত মিথ্যা, সকল ভণ্ডামি সূর্যোদয়ে তিমিররাশির মতোই নিঃশব্দে দূর হ'য়ে যাবে, যেদিন এই আমাদেরই দেশের আদর্শ কর্মযোগীর ধ্যান-মৌন শান্ত গম্ভীর রূপ, তাঁর অতন্দ্রিত সেবার ব্রত, তাঁর ঈশ্বরে কর্মফলসমর্পণ জগৎসংসারকে অতি ঘোর প্রমত্ততা হতে বাঁচাবে।

সাদাসিধা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেখছ যাহা সহজ সাদা—
রহস্য তায় লুকিয়ে আছে,
সুদুর্লভ ও সুলভে রয়,
প্রভেদ নাহি দূর আর কাছে।
গন্ধ রহে যেমন ধূপে,
লাবণ্য রয় যেমন রূপে,
নীলিমা রয় সাগর জলে
সমীর বুকে অনল রাজে।

২

সাদা আলোক সহজ সরল
তাতেই তো সাত রঙের খেলা,
সাদা বালুর বেলায় বসে
মহাভাবের কুম্ভমেলা।
সাদা শিবের বক্ষ পরে,
রঙ্গময়ী নৃত্য করে,
কান্তিতে তার কান্ত ভুবন'
দগ্ধ ভুবন তাহার আঁচে।

৩

অপূর্ব্ব ওই সৌরজগৎ
মুগ্ধ বা হই নিত্য দেখে,
কোন সুদূরে? কিন্তু তারাই
ললাট লিপি মোদের লেখে!
সাগর টানে যে অঙ্গুলি',
হেলায় হানে যে দম্ভোলি,
বুকের সেতার সেই যে বাজায়
মুখর ধরা যার আওয়াজে।

৪

অচেনা নন কেমন করে—
তবু তাঁরে বলবো চিনি?
চোখ ও মনে লাগছে ধাঁধাঁ
তিনিই ভুবন, ভুবন তিনি,
সবই জটিল, সবই সোজা,—
জড় কি চেতন যায় না বোঝা,
সংজ্ঞা এবং গঙ্গা যে বয়
সব পাষাণের ভাঁজে ভাঁজে।

মনস্তাত্বিক

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

[প্রহসন]

তৃতীয় দৃশ্য

সপ্তাহখানেক পরে এক রবিবার। চরণদাস, পুণ্ডরীক, উমেশ, অশোক, পরেশ

চ। টাকা তো অনেক লেগে যা'চ্ছে দেখছি। কলেজের গবেষণাগারে হ'তে পারে না?

অ। পরেশ চাইছে রীতিমত একটা ক্লিনিক্ খুলতে। স্বাধীনভাবে রিসার্চ করতে পেলেই তো খুব ভাল।

উ। তা' ছাড়া ধরুন যদি হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি কেস আমার এখানে রীতিমত আরাম করতে পারি? তাহলে ক্লিনিক্ সাজাবার খরচা উঠতে ক'দিন লাগবে আর?

পু। ব্যাপারটা-যে ভাল সে-কথাতো স্বীকার করেন আপনি?

চ। কেউ লেখাপড়া করবে, নুতন জ্ঞান আহরণ করতে চেষ্টা করবে, এটাকে খারাপ বলবো কেন পুণ্ডরীক?

পু। তা'লে তো হয়েই গেল! শুভস্য শীঘ্রং।

চ। কিন্তু অভিজ্ঞ ডাক্তার বা অধ্যাপকের সাহায্য ছাড়া হঠাৎ এতগুলো টাকা খরচ করে বসা—তা' পরেশ তো রয়েছে এখানে, যা' ভাল বোঝ—

প। আমাদের Experimental এর চার্জে সেই পণ্ডিতটিই রয়েছেন পথ আগলে। মানুষ যা' বিশ্বাস করে না—চাকুরীর খাতিরে তাই দিনের পর দিন কি করে বক্তৃতা করে বলতে পারেন?

চ। ডাঃ গুহর কথা বলছিস্? কেন, চমৎকার লোক তো!

পু। চমৎকার না হাতী।

অ। পরেশ বলছে যে ডাঃ গুহ আসলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অবিশ্বাসী। অথচ তা'রই অধ্যাপক তিনি। নেহাৎ ঠাণ্ডা নরম মতবাদ তবু বরদাস্ত করেন, নুতনত্ব বা বাড়াবাড়ি হ'লে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।

উ। মতভেদ পণ্ডিত সমাজে থাকবে: বিশেষ মনস্তত্ব যখন অঙ্ক নয় যে দুই আর দু'য়ে চার হয় বলে মানতেই হ'বে।

চ। সে তো সত্যি।

প। কিন্তু তা' বলে ভিন্ন মতাবলম্বীর উপর অসহিষ্ণু হওয়া ভাল?

চ। তা' কেন হবে? একটা বিরুদ্ধ মতের বিচার ধীরভাবে না করতে পারলে শিক্ষাই তো মাটি হ'ল।

প। সেজন্তই বলতে চাই আমি যে ওর অধীনে মামুলী গবেষণা করে—যথা প্রাচীন ভারতে আধুনিক মনোবিজ্ঞান বা এমনিতরো কিছু একটা—আমার লাভ হ'বে না।

চ। সে যা' ভাল মনে কর। টাকা তোমার নিজেরই রয়েছে বিস্তর। পুণ্ডরীক যে estimate দিয়েছে, তা'র পক্ষে যথেষ্ট টাকাই তোমার আছে। ও-রকম গোটাকয় ক্লিনিক্ তোমার অর্থে হ'তে পারে। কিন্তু টাকা থাকলেই খামকা খরচ করাটা ঠিক নয়।

উ ও পু। খামকা খরচ বলছেন কেন?

চ। আসলে তোমাদের স্কীমের বিরুদ্ধে আমি নই। শুধু মিঃ গুহ যদি অবিচার করে থাকেন তবে অন্য কারুর অধীনে কাজ করা যায় না কি? ওকালতির মত মামুলী পেশাতেও আমরা কতকাল শিক্ষানবিশী করেছি।

পু। যদি আমরা ঠেকি, তখনো নিশ্চয় কারুর দ্বারস্থ হ'তে বাধবে না।

অ। এখানে স্বাধীনভাবে ক্লিনিক্ থাকলেও তো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা চলতে পারে। অথবা…সেখানকার আইডিয়া এখানে বসে develop করা চলতে পারে।

চ। কি বল পরেশ, চেক্ লিখে দেব? না হয় আরো একটু ভেবে দেখ। আমার আবার মক্কেল ঠেঙাতে হ'বে খানিকটা সময়।

প। ক্লিনিক্ করেই দেখা যাক্ না, আরও হ'তে পারে। চেক্টা পরেই নেব। আরো একবার দরকারী জিনিসপত্রগুলি ঘুরে ফিরে দেখে আসছি ওদের নিয়ে। ঘরের মাপে সব হ'লেই ভাল। বাইরে থেকে যে-সব যন্ত্রপাতি আনতে হ'বে, তার অর্ডারটা কিছুদিন পরেই না-হয় দেওয়া যাবে।

বন্ধুদের নিয়ে পরেশের প্রস্থান। এলেন হেমাঙ্গিনী

হে। ওরা সব চলে গেল? টাকার কথা কি বলছিলে? দিদি-জামাইবাবু কি ওর জন্ম কিছু রেখে যান নি?

চ। গিয়েছেন। সে-কথা সকলের মোকাবিলা বললাম তো আমি।

হে। তা' পরেশ যখন ডাক্তার হবে, ডাক্তারখানা লাগবে না ওর?

চ। ডাক্তারখানার টাকা আমি দিচ্ছি। কিন্তু পরেশের সে সব চেয়ে দরকার একটি বৌ—তা' তুমি দেখছ নিশ্চয়?

হে। তা' আর দেখছি .নে। বয়স হয়েছে, এত ভাল পাস্ করলে, চোখে ঘুম নেই সেই চিন্তায়।

চ। সে তো দেখতেই পাচ্ছি গিন্নী। ঘুম চটে গেলেই তো—অবশ্য খুব অনেকখানি হ'ল—আসল কাজ হাসিল হ'ল না। একটা

সম্বন্ধ ঠিক করতে হ'বে ; ছেলের আবার মেয়ে পছন্দ হওয়া দরকার, দেনা-পাওনার কথা স্থির করতে হ'বে, হাঙ্গাম কি কম ?

হে। পরেশ তো বলছে আগে সুশীর বিয়ে দিতে।

চ। তুমি তো জান হেম, সুশীর বিয়ে নিয়ে আমাদের কোন ভাবনা নেই। সুশী তোমার দেখতে ভাল, আমাদের একটিমাত্র সন্তান। ওকে বিদায় করলেই তো সংসারটা শূন্য হয়ে যা'বে…তা'ই—তা' সে যখন ইচ্ছে ওকে পাত্রস্থ করা চলে, টাকা পয়সা দরকার হ'লেও তো কোন কষ্টই হ'বে না…

হে। ওকে বিয়ে দিয়ে এখানেই রাখা চলে না ? মেয়েটাকে ছেড়ে পরেশও যদি শেষে চাকুরী পেয়ে বা বিয়ে করে কোথাও সরে যায়…

চ। তা'ই বুঝি তাড়াতাড়ি ক্লিনিক্ বসিয়ে পরেশকে এখানে শক্ত করে ধরতে চাইছ ? বলিহারি হেম ! তুমি যদি শাম্‌লা-গায়ে ওকালতি করতে, আমি নিশ্চয় বলছি আমার চেয়েও তোমার পসার হ'ত। তা' ছাড়া ফিগারটাও…

হে। তা' আমার বুদ্ধি তো তবু তুমি নাও না ?

চ। নেই না আবার ! কেন ?

হে। কই সুশীর বিয়ের কথাটায় তো হুঁ-হাঁ করছ না !

চ। ঘর-জামাই ? ওতে আমার মত নেই, জানো ত ? বিশ্বনাথ তো চমৎকার ছেলে তোমার। ছ মাস বাদেই ফিরবে। ওদের বিয়ে হ'লে মেয়ের সংসার, নাতি নাত্‌নীর মুখ দেখে আমরা কাশী-গয়া কোথাও চলে যা'ব। কলকাতা আর ভাল লাগে না। পরকালের কথা তো ভাবতে হয় হেম ?

হে। কিন্তু পুণ্ড্রীকই বা খারাপ হ'ল কেমন করে ? পরেশ বলছিল যে এক বিধবা মা' ছাড়া কেউ নেই ; গরীবের সংসার।

চ। চাকুরী করে না। কি খাওয়াবে শুধু এম্-এ পাস করে ?

হে। পুণ্ড্রীক তো আইনও পড়ছে। তুমিই আর্টিকল্ করতে পার।

চ। কিন্তু বিশ্বনাথের সম্বন্ধ তো এক রকম পাকাই বলতে পার। ঘনশ্যামের সঙ্গে ছোটবেলায় পড়েছি, তারপর এ অবধি এক সঙ্গে কাজ কর্ম্ম করছি। তা'রই কাছে কথা দিয়ে রাখব না…

হে। সে আমি দেখব। গোটা সংসারখানাই তো আমার মাথায় ! কিন্তু কথা কেন দিতে গেলে তুমি ? জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে কি আগ্ থেকে বলতে পারে কেউ ? বাণী বলছে সুশীরও অমত হ'বে না। বিলাত-ফেরৎ বিশ্বনাথ—সুশীকে কষ্ট দেয় যদি, আমরা তা'কে শাসন করতে পারব ? পুণ্ড্রীক থাকবে আমাদের এখানে, আমাদের একতারে।

চ। বেশ, বেশ। তা' তুমি আরো একটু ভেবে দেখ। বিশ্বনাথদের বাড়ির চাল একেবারে দেশী সনাতনী। বিলাত গেলে আগে যা' হ'ত এখন তা' হয় না। বাণীতো সুশীর কথা বলেছে, সুশী বাণীর কথা বলেনি কিছু ? পরেশের তো অনেক যায়গা থেকে প্রস্তাব আসছে, রীতিমত অস্থির হয়ে উঠেছি আমি—বিশেষ করে হাইকোর্টে বন্ধুবান্ধবদের মহলে। তুমি আবার শেষে কি বলবে তা'ই জিজ্ঞাসা করছি। দিতে-থুতে চাইছে অনেকেই।

হে। তা' আবার চাইবে না ! পরেশ কি আমাদের তেমনি ছেলে ! কিন্তু সুশীকে তো কিছু জিজ্ঞাসা করিনি ?

চ। তা' সুযোগ বুঝে জেনে নেয়া যাবে। আমি তা'লে উঠি। মক্কেল আসবার কথা আছে। পুণ্ডরীক ?

ত্রস্তে পুণ্ডরীকের প্রবেশ

পু। দেখেছেন, শুনেছেন আপনার মক্কেলের কথা ?

চ। কি হ'লো ?

পু। একে বলে ভদ্রতা ? আপনার কোন সম্মানই রাখলে না। ব্যাটাকে…

চ। স্থির হয়ে বসো পুণ্ডরীক। কথাটা খুলে বলো শুনি।

পু। সেই ঝুনঝুনওয়ালার কথা। কাল পর্য্যন্ত ঠিক—আপনি ফোনে বলেও দিলেন—ঘরটা দেবে ক্লিনিকের জন্য। সেই ভেবে মাপমত জিনিসপত্র ঠিক্‌ঠাক্ করলাম গোটা শহরটা ঘুরে বিস্তর হয়রানি হয়ে আর ২১।৵ আনা ট্রাম্‌খরচা করে। এখন বলছে বাবুসায়েব দৈব ওষুধ ঔর মাদুলীর ব্যবসা করেন তো হামি দু'দশটা ঘর দিব। কেপিটেল্‌ভি দিব। ঐসব হিষ্টিরিয়া-ফিষ্টিরিয়া আমি বুঝি না। ঐসব কারবারের জন্য ঘর হ'বে না !

হে। এত বড় কথা ! আমার ঘরই তো পড়ে আছে দু'টো। এখানে করো তোমরা ডাক্তারখানা !

চ। (আতঙ্কিত) এখানকার ঘর—মানে আমার বৈঠকখানার পাশে হিষ্টিরিয়া…

হে। না হয়, বাগানের ধারের ঘরটা দিচ্ছি। পিছনের গলির ওপর মুখ থাকবে। হলো তো ? ঝুনঝুন্‌ওয়ালা ঘর দেবে না বলে পরেশ আমার ডাক্তার হ'বে না ? ছেড়ে দাও তুমি ও-রকম মক্কেল ?

চ। তা' তো নিশ্চয় ! আমি আজই ঝুনঝুন্‌ওয়ালাকে ডেকে বল্‌ব।

পু। আমাদের বলে ঐসব বুজরুকী, লোক-ঠকানো কারবারে তা'র পাটনার হ'তে ? দেখুন তো মা ?

হে। (তাইত, ঠিক বলেছ বাছা। তোমরা লেখাপড়া শিখে রোগ আরোগ্যি করবে, না লোকটা চাইছে ঠকিয়ে পয়সা…

সুশীলার প্রবেশ

সু। তুমি এখানে বসে আছ মা' তা' কি করে জানব বলো ? সারাটা বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে হাঁপ ধরে গেছে আমার।

হে। কেন, এক দণ্ড আড়াল হ'লে কী এমন হুলস্থূল বেঁধে যায় তোদের ?

সু। কয়লা জ্বলছে, ঠাকুর বসে আছে, চাল দেবে না বের করে ? ভাঁড়ারের চাবীটা তো ওদের কাছেই দিয়ে দিতে পার ? দাও না হয় আমাকেই ?

হে। বাবা পুণ্ডরীক তুমি রাত্তিরে এখানেই খেয়ে যাবে। ঠাকুরকে বলিস, একটু বুঝে সুঝেরান্না করতে।

পু। আমি ওদের খবরটা দিয়ে আসি মা'। ওরা বোধ হয় মাড়োয়ারীর সঙ্গে একটা রফা করবার জন্ম বসে আছে। দরকার কি তা'কে ভজিয়ে—নিয়ে আসি গে। খবরটা পেয়ে পরেশভাই যা' খুশী হ'বে! পুণ্ডরীকের প্রস্থান

হে। যাই দেখি ঠাকুরকে সব বলে আসি। সুশী যা' হয়েছে—ও আবার হ'বে সংসারী! বলে, চাবী ফেলে দাও ওদের হাতে। তাহলে আর রক্ষে আছে! হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান

চ। বোস্ দেখি মা' ঐখানটায় একটু স্থির হয়ে।

সু। তুমি রাগ করেছ বাবা?

চ। কেন রে?

সু। ক' দিন থেকে দেখ পুশীটার বড্ড ব্যামো, কিচ্ছুটি খেতে চায় না। রাত্তিরে কেবল ডাকে। গলায় শিকল দিয়েছি বলেই নাকি স্বপ্নই দেখে, দাদার ডাক্তারখানাটা না-হওয়া অবধি কিছুই ঠিক করা যাচ্ছে না। মনটা তাই বেজায় খারাপ; তোমার কাছে আর বসতে পারি না। রাগ করেছ তুমি?

চ। রাগ করিনি। তুই কদিন আসিস্নি, ওদিকে পাকা চুলে মাথাটা ভরে গেল প্রায়। সেদিন তো বিশ্বনাথের বাবা বলেই ফেল্লে, চরণ-যে বুড়ো হয়ে গেলে?

সু। ইস্। উনি বুঝি বুড়ো হ'ন নি?

চ। উনি বুড়ো হ'লেই বুঝি তোর বাবাকেও বুড়ো হ'তে হ'বে? বুড়ো হ'লেই তোর মা'কে নিয়ে কাশী চলে যা'ব সুশী।

সু। ইস্। আমি কালই তোমায় ঠিক করে দেব। একটা শাদা চুলও কেউ বা'র করতে পারবে না। বাবা···তোমার বিশ্বনাথ কবে ফিরবে বিলাত থেকে?

চ। এই এলো আর কি! তোর মাসীমা' কিন্তু সেদিন বার বার বলছিলেন—তোকে নিয়ে যেতে।

সু। চলো না বাবা? পোড়া মক্কেলগুলো ছাড়বেই না তোমাকে —কি করে আর যাই। ওদিকে পুশীটার হয়ে বসেছে শক্ত ব্যামো···

চ। কিন্তু তোর দাদার বিয়েটা তাড়াতাড়ি না-দিতে পারলে তো চলছে না সুশী। পুশীর অসুখ, তোর মা'র তো চোখে ঘুম নেই—তুই আর কত সামলাবি। রোজ বোধ হয় হিম্সিম্ খাচ্ছিস?

সু। ও-কথা বলো না বাবা। আমি ওর মধ্যে একেবারে নেই—বলে দিচ্ছি।

চ। তুই না-থাকলে আমার উপায়টা কি হ'বে এ-সংসারে, বল। পুশীর চেয়েও আমি তোর কৃপার পাত্র।

সু। তবু—দাদার বিয়ে এক ভীষণ ব্যাপার। চেহারা যা'ই হোক্, সম্পূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য হওয়া চাই-ই। এর চেয়ে রাজকন্তা আর আধেক রাজত্বও ভাল ছিল!

চ। কেন, মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মেয়ে তো অনেক রয়েছে! রাঁচীর বাইরেই তো বেশীর ভাগ লোকের বাস!

সু। তুমি-আমি বল্লে কি হ'বে? দাদা বলছেন যে সম্পূর্ণ মানসিক সুস্থ লোক নাকি কোটিতে একটি মিলা ভার। কি করি বলো ত?

চ। কেন, বাণী, সরমা—এদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ না।

সু। বাণী অবশ্য স্বপ্ন দেখেনা—তবে কিছুই বলা যায় না। ওদিকে ভুল বকে নাকি খুব। দাদা বার-বার বলেও সামলাতে পারছেন না।

চ। সরমা তো চমৎকার মেয়ে! বাণীর চেয়ে তো সরমা অনেক ভাল আমার মতে।

সু। দাদা বলেন, ওর কপালটা এত ছোট যে ব্রেন্ কিছুতেই ভাল হ'তে পারে না।

চ। বলিস কি! বাণীতো কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ওদিকে সরমা প্রথম বিভাগে আই-এ অবধি পাশ করেছে: বেশ একটু গম্ভীরও?

সু। তা' কি করবে বল? দাদা বলেন—এখন হয়ত হচ্ছে না; ভবিষ্যতে সরমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তাঁর কথা প্রমাণিত হ'বেই।

চ। তা' কি জানিস সুশী, ছোট কপাল মেয়েদের পক্ষে একটা সৌন্দর্যের অঙ্গ ছিল আমাদের কালে। তা' পরেশের তো আবার সেদিকে লক্ষ্য নেই। মানসিক সুস্থতা···

সু। সে দেখা যা'বে বাবা। ক্লিনিক্‌টার বন্দোবস্ত তাড়াতাড়ি করে দাও তুমি। দাদার আহার, নিদ্রা তো ফের সুরু হোক্। বাণীরও খুব উৎসাহ।

চ। ওর-ও বেড়াল আছে নাকি?

সু। উহুঁ। ও বোধ হয় নিজেই রোগী হয়ে পড়বে। (দ্রুত) আমি ঠিক জানিনা বাবা।

চ। বেশ, বেশ! তোর মা'ই সব ঠিক্‌ঠাক্ করে দিয়েছেন। আমার শুধু টাকাটা তুলে দেওয়া। আজ রোব্‌বার, কালই ব্যাংক্ থেকে তুলে দেব।···মক্কেল বসে আছে। এখন উঠা যাক্ সুশী।

সু। আমিও যাই বাবা। পুশীটার...

চতুর্থ দৃশ্য

তিন দিন হ'ল ক্লিনিক্ খোলা হয়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছে পুণ্ডরীকের দল। স্থান: পরেশের ক্লিনিক্।

সুশীলা। (প্রবেশ করে) কী দাদা, রুগীপত্তর এল?

পরেশ। কই আর এল। পুণ্ডরীক বলেছে শীগ্‌গীরই···

সু। পুশীকে কবে take up করছ বল? এখন তো অবসর দেখ্‌ছি তোমার। হিষ্টিরিয়া কি মানুষ ছাড়া হ'তে নেই?

প। বেড়ালের কি মন আছে না কি?

সু। রিসার্চ করে তো আর দেখোনি!

প। Ideaটা ভাল অবশ্য! পড়ে দেখব।

সু। তোমার গুরুদেব তো শুনি প্রথমে মাছের পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করেছিলেন। পুশী কি মাছেরও অধম নাকি?

বাইরে থেকে বাণী। ভেতরে আসতে পারি সুশী?

সু। আয়, আয় বাণী।

প। এ কী চেহারা হয়েছে বাণী তোমার? ঘুম হয় নি বুঝি কাল? স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছ?

বা। কাল ঐ অলুক্ষণে চেয়ারটায় বসিয়ে কি সব আজে-বাজে প্রশ্ন করলেন—রাতে আর ঘুমুতে পারলাম না।

সু। বাণীই তা'লে ক্লিনিকে বৌনি করেছে দাদা? তোমার প্রথম রুগী?

প। হাঁ। ওর কেস্‌টা খুব সহজও নয়। ওর স্মৃতির ধারায় কোথাও একটা মস্ত গোলমাল রয়েছে। তা' ছাড়া আজকাল ঘুম হচ্ছে না বলে সন্দ' হচ্ছে। একাগ্রতারও ভীষণ অভাব। কাল কিছুতে হীপ্‌নো-টাইজ্ করা গেল না। আচ্ছা বসো দেখিনি বাণী—ঐ চেয়ারটাতে…

সু। চেয়ারটাতে বসতে ভারী আরাম দাদা।

বা। দাঁত তুলবেন না তো?

প। দেখছিস্ সুশী হাতে-নাতে প্রমাণ! কাল তোমায় বললাম না যে ওটা ডেন্টিষ্টের চেয়ার নয়; দিব্যি ভুলে বসে আছ?

বা। বসলুম। এবার সুরু করুন জেরা। বাপস্!

সু। দেখি পুশীটা কি করছে…… সুশীলার প্রস্থান

প। কাল নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছ?

বা। হাঁ।

প। বল, খুলে বল। ডাক্তার আমি। কোন লজ্জা করবে না। লুকোলেও নিস্তার নেই। হিপ্‌নোটাইজ করে সব পেটের কথা টেনে বার করে ফেলব।

বা। হিপ্‌নোটাইজ্ তো করাই আছে! কপ্রাও কি বাকী আছে কিছু?

প। বাজে কথা। কবে হিপ্‌নোটাইজ্ করলাম? আচ্ছা এখন তাকাও দিকি—সোজাসুজি—তাকাও বলছি। পড়বে না মোটে—তাকাও!

বা। লজ্জা নেই আমার?

প। মনে হয় না তো। কালকের স্বপ্নটা বল্‌বে, না নেক্‌স্‌ট্ কেস্ ডাকব?

বা। সে কে আবার?

প। পুশী। বেড়ালের মন আছে কিনা দেখা নেহাত্ দরকার। সুশীলার Ideaটা ফেলবার নয়। মহামতি ফ্রয়েড্……

বা। না, না……এই সুরু করছি আমি……কাল শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছে না…এপাশ-ওপাশ করছি।…পাশের ঘরে দিদি অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছেন। ছোট ছেলেটা কাঁদছে…হুঁসই নেই।

প। তারপর?

বা। তারপর আর কি ডাক্তার সাহেব, জানালাটা খুলে দিলাম। দেখি চাঁদ উঠেছে আকাশে। কল্‌কাতার চাঁদ—দুর্লভ জিনিস পরেশ-দা'—প্রকাণ্ড একটা সোনার থালার মত—দেবে আমায়?…চেয়ে থাকলাম।

প। ঘাড় ব্যথা হ'ল, নার্ভগুলি সব টন্‌টন্ করতে লাগল?

বা। ভীষণ কান্না পেল। কাঁদতে-কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

প। স্বপ্ন দেখলে?

বা। হাঁ। মস্ত একজন দেবতা—সোনার মত গায়ের রং, কী সুন্দর! —চাঁদের মাঝ থেকে নেমে এসে বলছেন—তোকে আমি নিয়ে চলে যাব বাণী। তোর কষ্টে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। দয়া হয়েছে।

প। Interesting! তারপর? তোমার কষ্টটা কি?

বা। আমি বললাম এত করে নানানভাবে সবই বলছি। সে কি আসলেই বুঝতে পারছে না? না বুঝেও না বুঝবার ভান করছে?

প। চোখ বুজে ফেললে যে?

বা। ঘুম পাচ্ছে। চোখ বুজলেই সেই চাঁদের মত দেবতাকে দেখতে পাই আমি। এ-দুঃখ ভোগার চেয়ে তাঁর সঙ্গে চলেই যা'ব আমি।

প। চোখটা খোল বাণী। এখনই তো আর রওনা হচ্ছ না? চোখ বুজলে তোমাকে বড্ড বোকা, বড্ড ছেলেমানুষ দেখায়।

বা। না। চোখ খুললে স্বপ্নটা বেমালুম ভুলে যাব আমি। তখন আর হয়ত বলতেই পারব না।

প। Serious case! বহুকাল ভোগাবে দেখছি।

বা। দেবতা প্রশ্ন করলেন, যা'কে তোর কথা বল্‌ছিস—সে কি ছেলেমানুষ? আমি বল্লাম, চব্বিশ বছর বয়স; ছেলেমানুষ হ'তে যা'বে কেন?

প। চব্বিশ বছর?

বা। হাঁ। দেবতা আবার প্রশ্ন করলেন, মূর্খ নাকি? বললাম, তার উল্‌টো বরং। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো পরীক্ষা ভ্যানক ভালভাবে উৎরেছে। দেবতা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমার তখন কি কান্না! যদি বলে বসেন যে লোকটা ভণ্ড?

প। তারপর কী বল্লেন সেই মস্ত দেবতা?

বা। অনেকক্ষণ গেল। দেবতা চোখ বুজে থাকলেন। আমি কেবল কাঁদছি। ভোরে উঠে দেখলাম পরেশ দা'—স্বপ্নটা আমার মিথ্যা নয়। বালিশ আমার সত্যি ভিজে আছে চোখের জলে।

প। দেবতার কথা বলো বাণী। দেবতা কি বল্লেন না কিছু?

বা। দেবতা বল্‌লেন, তা'কেই তুই জিজ্ঞাসা করিস বাণী।

প। করেছিলে?

বা। করছি তো। জবাব পাচ্ছি কই! দেবতা বল্‌লেন, লোকটা ভণ্ড নয়—লোকটা আসলে মূর্খ। পরীক্ষা পাস্ করলেই কি আর লোক জ্ঞানী হয়!

প। (উচ্চকণ্ঠে) সুশীলা, পুশী, ও পুশীর মালিক!

দ্রুতবেগে সুশীলার প্রবেশ

সু। কি দাদা? বাণীর দেবতা কি কান পাকড়েছে তোমার?

প। শীগ্‌গির বলে দে তুই মাসীমা'কে যে এসব serious case

মোটেই নয়। বাণীর সম্পূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য রয়েছে; ক্লিনিকে আর আসতে হবে না।

সু। মা' (চীৎকার) মা'···

প। আরে তোর মা' নয়। বাণীর মা'—মাসীমা'র কথা বলেছি তোকে।

ততক্ষণ হাঁসফাঁস করে হেমাঙ্গিনী ঘরে প্রবেশ করছেন

হে। চেঁচাচ্ছিস্ কেন এই সক্কালবেলা—কী যে···

সু। চলো শীগ্‌গির বাবার কাছে। দাদা রায় দিয়েছেন—বাণীর মানসিক স্বাস্থ্য একেবারে নিখুঁত। ক্লিনিক্ মানে কেল্লা ফতে!

প। ত্যাখ্‌, সুশী!

সু। চুপ্‌ কর দাদা। বড় কম ভোগান্তি করে ছাড়নি তুমি। রাজ্যভরে মানুসের আর বিয়ে হচ্ছে না কিনা। চলো মা'।

হে। অত জোরে টান্‌ছিস্ কেন! পড়ে যাবো যে। কী যে দস্যি একখানা হয়েছিস্ তুই! (উভয়ের নিষ্ক্রমণ—বাইরে শাঁখ বেজে উঠল।)

পরমাণু-বোমা

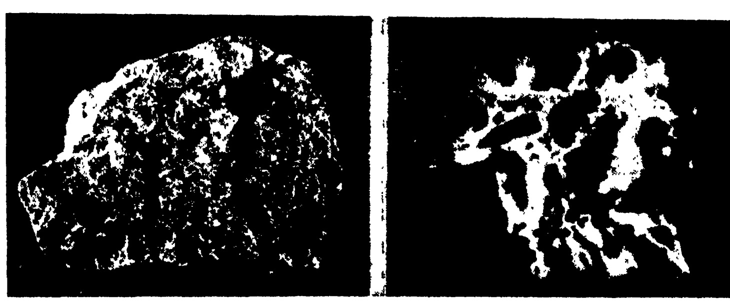
অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এসসি

"এই প্রচণ্ড তেজ যেমন মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে তেমনি ধ্বংসাত্মক কার্যেও অনুরূপ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ডিনামাইট ফাটাইয়া বা বোমা বিস্ফোরণে যে ধ্বংস কার্য করা হয় তাহার মূল কথা অতি অল্পকাল মধ্যে প্রভূত তেজ উৎপন্ন করা। তিল পরিমাণ য়ুরেনিয়াম (২৩৫) প্রয়োগে একটি অতিকায় যুদ্ধ-জাহাজকে ঘায়েল করা যাইতে পারে—যে কার্য করিতে বর্তমানে হাজার হাজার মণ ভারী টর্পেডোর দরকার হয়।

আজ যাহা অস্পষ্ট কল্পনায় রহিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে তাহা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। সেদিন কয়লার কৌলীন্যের অবসান ঘটিবে। বর্তমান কালের শক্তি উৎপাদনকারী অতিকায় যন্ত্রদানবেরা ক্ষুদ্র য়ুরেনিয়ম কণিকার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া অবসর গ্রহণ করিবে—একথা হয়ত নিছক কাহিনী বা কল্পনা নয়।"

—১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত কোন সাময়িক পত্রিকায় লিখিত লেখকের একটি প্রবন্ধের উপসংহারে উপরোক্তরূপ মন্তব্য ছিল। তারপর ১৩৫২ সালের ২১শে শ্রাবণ পরমাণু বোমার শক্তিতে জাপানের হিরোসিমা নগর নিমেষে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ২,৮০০০০ লোক মুহূর্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মহলে পরমাণু বোমার আবির্ভাব আকস্মিক বা অচিন্তনীয় না হইলেও নিখিল-বিশ্বজনের মনে অন্য কোন আবিষ্কারই এতটা অনুসন্ধিৎসা জাগায় নাই। শিক্ষিতা শিক্ষিত সকলের মনেই প্রশ্ন—কি রহস্য সেই তেজ-বিমোচনে, যাহার শক্তিমত্তায় যে দুর্ধর্ষ জাতি বৎসরের পর বৎসর বিশ্বে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল তাহারা সহসা নির্বীর্য হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। এই গোপন শক্তির উৎস নিহিত রহিয়াছে পরমাণুর অন্তরে। পরমাণু বোমাকে চিনিতে হইলে পরমাণুর স্বরূপ জানিতে হইবে।

বিশ্বে পদার্থ অগণিত হইলেও মৌলিক পদার্থের সংখ্যা নির্দিষ্ট—মাত্র ৯২টি। এই ৯২টি মৌলিক পদার্থের স্বতন্ত্র গুণ ও ধর্ম রহিয়াছে। ইহাদের দুই বা ততোধিকের নানাপ্রকার সম্মিলন ও সংমিশ্রণেই যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। পদার্থের পরমাণু বা 'এটম' যাহাকে বলা হয়, তাহা এই ৯২টি পদার্থেরই সূক্ষ্মতম ও অবিভাজ্য অংশ। মৌলিক ৯২ রকম পরমাণু ছাড়া আর কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। পরমাণুকে এককালে অবিভাজ্য মনে করা হইত, কিন্তু পরবর্তীকালে পরমাণুর অবিভাজ্যতা পরীক্ষা দ্বারা খণ্ডিত ও মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এতাবৎকাল পরমাণুকে ভাঙা যাইত না তবে উহারা কখন কখনও নিজেরাই ভাঙে

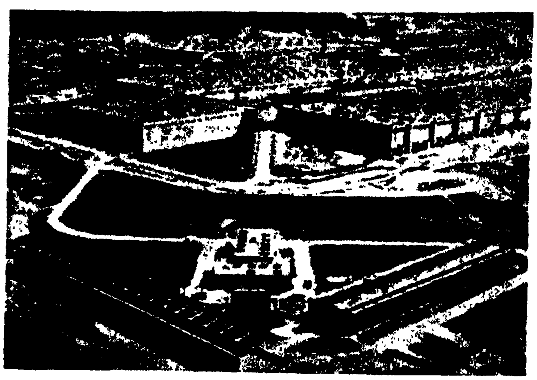


য়ুরেনিয়মের খনিজ প্রস্তর পিচব্লেড দিবালোকে গৃহীত ফোটো (বামে)
অন্ধকারে গৃহীত ফোটো (দক্ষিণে)

সেটা যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছিল। পরমাণু ভাঙিলে তাহা হইতে তিন রকম কণিকা পাওয়া যায়, তা সে পরমাণু যে পদার্থেরই হউক না কেন। অর্থাৎ পরমাণু ভাঙিয়া গেলে তখন আর তার মৌলিকত্ব থাকে না। পরমাণু তৈয়ারীর উপাদান মোটামুটি তিন জাতীয় ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। জটিল বিশ্লেষণে অবশ্য আরও তিন রকম কণিকার অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, পজিট্রন, মেসন ও নিউট্রিনো—তবে সেগুলি আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে অবান্তর। ইহাদের মধ্যে ইলেকট্রন খুবই

হালকা কণিকা এবং ইহার যে বিশেষ গুণ রহিয়াছে তাহারই প্রকাশকে আমরা বলি নেগেটিভ তড়িৎ। ইলেকট্রনকে তাই বলা হয় নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত। প্রোটন কিন্তু খুব ভারী কণিকা—অবশ্যই ইলেক ট্রনের তুলনায়। ইহার গুণ ইলেকট্রনের বিপরীত, বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত। নিউট্রনে কোন তড়িৎ সংস্থান নাই কিন্তু ইহারা প্রোটনের মতই ভারী। এই তিন জাতীয় কণিকারা বিভিন্ন সংখ্যায় জোট বাঁধিয়া এক একটা পদার্থের পরমাণু তৈয়ারী করে। এই জোট বাঁধিবার একটা আইন আছে। সকল রকম পরমাণুতেই ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকিবে এবং তাহা ছাড়া ইলেকট্রন প্রোটনের সংখ্যানুযায়ী অল্পাধিক নিউট্রনও থাকিবে। মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস সব চেয়ে হালকা পদার্থ, ইহার পরমাণুর উপাদান ও গঠন খুবই সাদাসিধা—একটিমাত্র প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন।

পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রোটন ইলেকট্রনের পারস্পারিক অবস্থাটা অনেকটা আমাদের সৌরজগতের মত বলিয়া কল্পনা করা হয়। সূর্য



পরমাণু বোমার কারখানা (টেনেসী ভ্যালী)

(গ্রহদের তুলনায়) ভারী পিণ্ড—গ্রহবর্গ অনেকটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া সূর্যকে পরিক্রমণ করে। পরমাণুগুলিও এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌরজগৎ। কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন, ভারী কণিকাগুলি। ইহারা খুবই শক্ত বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে আটকান থাকে। ইহাদের সে বাঁধন ভাঙ্গিয়া ফেলা খুব সহজ ব্যাপার নয়—দুঃসাধ্যই বটে, তবে এখন আর অসম্ভব নয়। এই অংশটা পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস। কেন্দ্রকের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় প্রোটনের সমানসংখ্যক ইলেকট্রনেরা কতকগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে। একজোড়া, দুইজোড়া, তিনজোড়া করিয়া প্রোটন ইলেকট্রন দিয়া একটার পর একটা পদার্থের পরমাণু তৈয়ারী হইয়াছে। হাইড্রোজেন যেমন সব চেয়ে হালকা পদার্থ তেমনি আবার য়ুরেনিয়ম সব চেয়ে ভারী পদার্থ, হাইড্রোজেনের চেয়ে ২৩৮ গুণ ভারী। য়ুরেনিয়মের কেন্দ্রকে আছে, ৯২টি প্রোটন আর তারই সঙ্গে ১৪৬টি নিউট্রন। কেন্দ্রকের বাহিরে ঘূর্ণমান ৯২টি ইলেকট্রন। পদার্থের পরমাণুর নিজস্ব গুণ ও ধর্ম নির্ভর করে পরমাণুতে প্রোটনের (তথা ইলেকট্রনের) সংখ্যার উপরে—কিন্তু পরমাণুর ওজন নির্ণীত হয় কেন্দ্রকের প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যা দ্বারা। পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা পরিবর্তিত হইলেই এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় কিন্তু কেন্দ্রকে নিউট্রনের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইলে পদার্থের মৌলিকত্ব বদলায় না—বদলায় কেবল পরমাণুর ওজন। এই রকম সমধর্মী অথচ বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর নাম 'আইসোটোপ'। 'আইসোটোপ'গুলি বেশ মজার জিনিষ। দুইটি পরমাণু সর্বাংশেই এক—কোন কিছুতেই তাহাদের বিভিন্নতা ধরা পড়িবে না—কিন্তু ওজন করিয়া দেখিতে গেলে উহাদের বৈষম্য ধরা পড়িবে। অনেক মৌলিক পদার্থেরই এমনই একাধিক ওজনের পরমাণু আছে। হাইড্রোজেনের দুই রকম পরমাণু পাওয়া যায়। একটির কেন্দ্রকে মাত্র একটি প্রোটন—অন্যটির কেন্দ্রকে একটি প্রোটনের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে একটি নিউট্রন। এই জন্য পরমাণুর ওজন দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। এই ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রকের নাম 'ডয়েট্রন'। পূর্বোক্ত য়ুরেনিয়মের পরমাণবিক ওজন ২৩৮, কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও এক জাতীয় য়ুরেনিয়ম আছে যাহার কেন্দ্রকে নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৬টির



বিস্ফোরণের সূচনা—মধ্যভাগের তাপমাত্রা সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় (৬০০০ ডিগ্রী)

স্থলে ১৪৩টি। এই জাতীয় য়ুরেনিয়মের পরমাণবিক ওজন ২৩৫—ইহার বিশেষ নাম 'অ্যাকটিনো-য়ুরেনিয়ম' সংক্ষেপে লেখা হয় ইউরেনিয়াম—২৩৫।

বিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জাগে—মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৯২টি কেন? ৯৩ বা ততোধিক প্রোটন দিয়ে পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রক তৈয়ারী হয় নাই কেন? এক, দুই, তিন, করিয়া ৯২টি প্রোটন দিয়া মোট ৯২টি পদার্থ তৈয়ারী করিতে করিতে প্রকৃতি হঠাৎ থামিয়া গেলেন কেন? কী তার রহস্য? ইহার উত্তর খুঁজিতে যাইয়া বিজ্ঞানী দেখিতে পাইলেন যে ঐ পর্যন্ত আসিয়া প্রকৃতি তাঁর নিজের আইনেই আটকাইয়া গিয়াছেন। প্রোটনের পজিটিভ-তড়িৎগ্রস্ত সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তড়িতের ধর্মানুযায়ী সমজাতীয় তড়িৎ কণিকা পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়, একত্রে থাকিতে চায় না। হাইড্রোজেনের পরে দুইটি প্রোটন দিয়া গঠিত হইয়াছে যে পরমাণু তাহার নাম হিলিয়ম। ইহার কেন্দ্রকের গঠন বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, দুইটি প্রোটন ছাড়া সেখানে দুইটি নিউট্রনও আছে। পরস্পর বিকর্ষণকারী

দুইটি প্রোটনকে স্থায়ীভাবে একত্র বসিবার জন্য সেখানে আরও দুইটি নিউট্রন জুড়িয়া দিতে হইয়াছে। এমনি করিয়া পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা যত বাড়িতে থাকে সেখানে সমতা ও স্থায়িত্ব রাখিবার জন্য আরো বেশী করিয়া নিউট্রন জুড়িয়া দিতে হয়; কিন্তু তারপর এমন একটা অবস্থা আসে যখন নিউট্রনের শক্তি দিয়াও প্রোটনদের আর বাঁধিয়া রাখা যায় না, কেন্দ্রক হইতে প্রোটন মাঝে মাঝে স্বতঃই বাহির হইয়া আসে। সবচেয়ে ভারী পরমাণু য়ুরেনিয়মের—৯২টি প্রোটন সেখানে একত্র রহিয়াছে—কিন্তু তার কেন্দ্রকে ভাঙন লাগিয়াই আছে। একটি একটি করিয়া প্রোটন কেন্দ্রক হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়—য়ুরেনিয়ম পরিণত হয় অন্য পদার্থে। য়ুরেনিয়ম থেকে রেডিয়ম—রেডিয়ম থেকে সীসা। সীসায় আসিয়া যখন পৌঁছায় তখন পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮২। তারপর আর ভাঙে না—তখন একটা স্থায়ী অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। রেডিয়ম ও য়ুরেনিয়মের যাহা কিছু গুণাবলী তাহা এই স্বতভঙ্গপ্রবণতা বা প্রোটন ইলেকট্রন মুক্ত



বিস্ফোরণের পরবর্তী অবস্থা, উত্তপ্ত বায়ু রাশি ক্রমে বড় হইতেছে।

করিয়া দিবার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। মোটের উপর বলা যায় যে ৮২টির বেশীসংখ্যক প্রোটন কেন্দ্রকে একত্রিত হইলেই উহারা চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ভঙ্গপ্রবণ হয়, এই জাতীয় পদার্থগুলিই তেজস্ক্রিয় বা 'রেডিও একটিভ'। আংশিক ভঙ্গপ্রবণতা সত্ত্বেও ৯২টি পর্য্যন্ত প্রোটন নিউট্রনের সাহচর্য্যে কোন রকমে একত্রে থাকে, কিন্তু তার চেয়ে বেশীসংখ্যক এক সঙ্গে থাকিতে পারে না বলিয়াই মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বিরানব্বইতে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

ইতালীয় বিজ্ঞানী ফারমী চাইলেন বিশ্বকর্ম্মার উপরে কেরামতী করিতে। তাঁহার খেয়াল চাপিল য়ুরেনিয়মের চেয়েও ভারী পরমাণু নির্মাণ করা চলিবে না কেন? তিনি পরিকল্পনা করিলেন য়ুরেনিয়মের কেন্দ্রকে ১টি নিউট্রন জুড়িয়া দিবেন। নিউট্রনের কোন তড়িৎ সম্পদ নাই, সুতরাং উহাকে স্থান দিতে কেন্দ্রকের প্রোটনের কোন আপত্তি হইবার কারণ নাই এবং য়ুরেনিয়ম কেন্দ্রকে একটি নিউট্রণ স্থান পাইলে উহার ওজন হইবে ২৩৯। ফারমীর যুক্তিতে অবশ্য কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রকে নিউট্রণ লাগিবে কি করিয়া? তৎকালে নিউট্রণ পাওয়া যাইত বেরিলিয়ম থেকে। বেরিলিয়মকে রেডিয়মের সঙ্গে একসঙ্গে রাখিয়া দিলে বেরিলিয়ম পরমাণু কেন্দ্রক হইতে তীব্রবেগে নিউট্রণ বাহির হইয়া আসে। এই রকম বেরিলিয়মকে ফারমী য়ুরেনিয়মের সঙ্গে রাখিয়া দিলেন। যদি দৈবাৎ কোন নিউট্রন আপন গতিপথে য়ুরেনিয়মের পরমাণুকেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায় (সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা কম) এবং তারই কোনটা সেখানে আটক পড়িয়া যায় তবেই নবতম পরমাণু তৈয়ারী হইবে। এমনি পরীক্ষা করিবার পর দেখা গেল, সত্যি নূতন কয়েকটি পদার্থের পরমাণু পাওয়া যাইতেছে। যাহারা য়ুরেনিয়ম নয় অন্য কিছু। ফারমী ভাবিলেন, নূতন পরমাণু তৈয়ারী করিয়াছেন। তারপর আরও পরীক্ষা চলিতে থাকিল। অবশ্য ফারমীর পরিকল্পনা বা স্বপ্ন সে সব পরীক্ষায় সফল হইল না। জার্মানীর হান ও মিটনার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে ফারমীর পরীক্ষায় নূতন মৌলিক পদার্থ তৈয়ারী হয় নাই; তবে যাহা হইয়াছে তাহা আরও বিস্ময়কর, একান্ত অভাবনীয়, এ তাবৎকাল মানুষে যাহা পারে নাই তাহাই সম্ভব হইয়াছে। নিউট্রনের সংঘর্ষে য়ুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিয়া



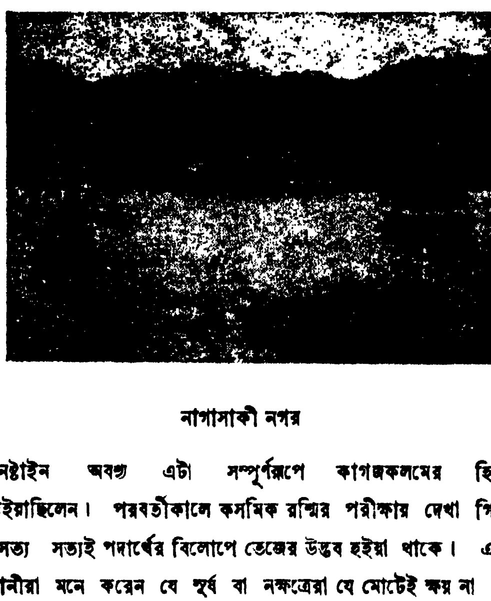
হিরোসিমা নগর

দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে—একভাগে গিয়াছে ৫৬টি প্রোটন ও অপরাংশে রহিয়াছে ৩৬টি প্রোটন, একটি হইয়াছে বেরিয়ম ও অপরটি ক্রিপটন জাতীয় পদার্থের ভঙ্গপ্রবণ পরমাণু।

ব্যাপারটি সত্যিই অসামান্য। এক মৌলিক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ তৈয়ারী করা মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন। লোহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার জন্য ক্ষ্যাপা চিরকাল পরশপাথর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দৈবাৎ সেই পরশপাথরের সন্ধান পাওয়া গেল।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, য়ুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিয়া দুই টুকরা হইল কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে য়ুরেনিয়ম পরমাণুতে প্রোটনেরা সব চঞ্চল অবস্থাতেই থাকে, উহারা চায় বাঁধন ভাঙিতে। বাহিরের দিক হইতে নিউট্রনের আঘাত পাইয়া ভাঙনটা সহজ হইল। য়ুরেনিয়মের পরমাণু শুধু ভাঙিল তাই নহে, যে দুইটি খণ্ড হইল তাহারা প্রচণ্ডবেগে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। যে শক্তির বাঁধনে উহারা একত্রে থাকে উহাদের মুক্ত করিয়া দিলে সে শক্তি আত্মপ্রকাশ করে।

য়ুরেনিয়মের পরমাণু ভাঙিবার পর দেখা গেল যে দুইটি খণ্ড হইল উহাদের একত্রিত ওজনের মূল পরমাণুর চেয়ে সামান্ত কম। যে পদার্থটুকু এইভাবে লোপ পাইল, তাহাই শক্তিরূপে দেখা দিল। ফারমীর পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণিত হইল যে—পদার্থের পরমাণুতে প্রচুর শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে এবং তাহা উদ্ধার করা অসম্ভব। ইতিপূর্বে আইনষ্টাইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে পদার্থের বিলোপ-শক্তি উৎপাদন সম্ভব। কয়লা পোড়াইয়া আমরা যখন তাপ উৎপাদন করি তখন কয়লার পরমাণুকে জুড়িয়া দেই অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে। এই মিলন প্রসঙ্গে কয়লা খানিকটা তাপ ত্যাগ করে—কালিমা থেকে মুক্তি পাইবার দক্ষিণারূপে দেয় সে তাপশক্তি। কয়লার পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়া গ্যাসে পরিণত হয়—এখানে পরমাণুর রূপান্তর হয়, বিলোপ নহে। আইনষ্টাইন বলেন, একগ্রাম কয়লার পদার্থরূপের বিলোপ করিয়া দিতে পারিলে যে তাপ পাওয়া যাইবে তাহা আড়াইলক্ষ মণ কয়লাকে গ্যাস করিয়া যে তাপ উৎপন্ন হইবে তাহার সমান হইবে।



নাগাসাকী নগর

আইনষ্টাইন অবশ্য এটা সম্পূর্ণরূপে কাগজকলমের হিসাবে দেখাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কসমিক রশ্মির পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সত্য সত্যই পদার্থের বিলোপে তেজের উদ্ভব হইয়া থাকে। এক্ষণে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সূর্য বা নক্ষত্রেরা যে মোটেই ক্ষয় না হইয়া কোটি কোটি বৎসর তেজ বিকীরণ করিতেছে তার মূলেও এই রহস্যই। যেমনি পদার্থের সম্পূর্ণ বিলোপে তেজ পাওয়া যায় তেমনি পরমাণুর রূপান্তরেও (এক পদার্থ হইতে অন্তপদার্থে) তেজের উদ্ভব হয়। য়ুরেনিয়ম বা রেডিয়ম ভাঙিয়া যখন সীসা ও হিলিয়ম গ্যাসে পরিণত হয় তখন দেখা যায় মূল য়ুরেনিয়মের যাহা ওজন ছিল উৎপন্ন সীসা ও হিলিয়মের একত্রিত ওজন তাহার চেয়ে সামান্ত কম। রেডিয়ম হইতে যে তাপ ও তেজ নির্গত হয় উহা ঐ সামান্ত পরিমাণ পদার্থের বিলোপের ফল। ফারমীর পরীক্ষায় পরমাণু খণ্ডীভূত হইবার পর খণ্ডদ্বয় যে বেগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাও ঐ প্রকার পদার্থের বিলোপসম্ভূত। বেগপ্রাপ্ত কণিকাকে বাধাপ্রদান করিলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে উৎপন্ন তাপের হিসাব করিলে দেখা যাইবে, প্রতিটি পরমাণুর অন্তরে কি বিরাট শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। অর্ধ পাউণ্ড য়ুরেনিয়মকে দুই টুকরো করিয়া দিলে যে তাপ পাওয়া যাইবে কয়লা পোড়াইয়া সেই পরিমাণ তাপ পাইতে হইলে মোটামুটি হিসাবে পাঁচশত টন কয়লার দরকার হইবে।

কিন্তু য়ুরেনিয়মকে ভাঙা বড় সহজ নয়। নিউট্রণের আঘাতে য়ুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙে বটে, কিন্তু সে নিতান্তই দৈবাধীন। একটিমাত্র য়ুরেনিয়মের পরমাণুতে নিউট্রনে ঢিল ছুড়িতে থাকিলে—একের পরে ২৪টি শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয়—ততটির ভিতরে একটি মাত্র ঢিল পরমাণুকেন্দ্রকে পৌঁছিবার সম্ভাবনা, বাকিগুলি ঐ পরমাণুর অন্তর দিয়া নির্বিবাদে চলিয়া আসিবে বা কেন্দ্রককে আঘাত করিলেও সেখানে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে না। সুতরাং ফারমীর আবিষ্কারের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা থাকিলেও বৈজ্ঞানিক জগতে আশুবিপ্লবের আশা জাগাইল না।

কিছুদিন পরে বোহর জানাইলেন যে ২৩৫ ওজনের য়ুরেনিয়ম পরমাণুকে খুবই কম বেগের নিউট্রণ দ্বারাও ভাঙা যায় এবং এই পরমাণু বেশী ভগ্নপ্রবণ। এই য়ুরেনিয়মের একটি মাত্র পরমাণু দ্বিখণ্ডিত হইলে ৪টি নিউট্রনের জন্ম হয়, এই নবজাত নিউট্রনেরা আবার য়ুরেনিয়ম পরমাণুকে ভাঙিবার কাজে লাগে। এইরূপ ধারাবাহিক নিউট্রনের জন্মের ফলেই য়ুরেনিয়ম বিভাজন সহজ ও নিশ্চিত হইয়া থাকে। গবেষণা কার্যের ফলে ইহাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে নির্দিষ্ট বেগসম্পন্ন নিউট্রনের আঘাতে ভারী য়ুরেনিয়মের রূপান্তরে ৯৩টি প্রোটনবিশিষ্ট একটি নূতন মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। এই নূতন পদার্থের নামকরণ হইয়াছে নেপচুনিয়ম; নেপচুনিয়ম আবার স্বতই নূতন আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তাহার নাম প্লুটোনিয়ম। ইহাতে ৯৪টি প্রোটন থাকে। এই রকম কোন মৌলিক পদার্থের স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই। প্লুটোনিয়ম য়ুরেনিয়মের চেয়ে বেশী ভগ্নপ্রবণ এবং এই জন্ম ইহাকে ভাঙিয়া তেজ বিমোচন অপেক্ষাকৃত সহজ।

য়ুরেনিয়মকে চূর্ণ করিয়া তেজোৎপাদনের সূত্র পাইয়া সকল দেশের বৈজ্ঞানিক মহলে এতদ্বিষয়ে যে কার্য চলিতেছিল ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহা-সমরে তাহা ভয়াবহ রূপ লইয়া দেখা দিল। পরমাণুর তেজকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। ইহাকে ধ্বংস কার্যে ব্যবহার করিবার পন্থা উদ্ভাবনের জন্ম রাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহিত বিজ্ঞানী দল কাজে লাগিলেন। জার্মানীতে নাকি এই বিষয়ে অনেকটা কাজ হইয়াছিল, সে খবর অবশ্য এখন আর জানিবার উপায় নাই। আমেরিকা ও বৃটেনের সম্মিলিত চেষ্টায় কয়েকটি দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানী এতদ্বিষয়ে ব্রতী হইলেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কানাডা অঞ্চল হইতে প্রচুর য়ুরেনিয়ামের খনিজ প্রস্তর সংগৃহীত হইল। আমেরিকায় টেনেসিভ্যালীর ওকরীজে পরমাণু বোমা তৈয়ারী করিবার জন্ম প্রথমে একটি বিরাট কারখানা ও শহর নির্মিত হইল। এখানে লক্ষাধিক লোক কাজ করিত। প্রভূত পরিমাণে কাঁচা মাল পত্রাদি কারখানায় প্রবেশ করিত—কিন্তু খুব কম লোকেই জানিত, শেষ পর্যন্ত কি করিয়া কোথায় কি তৈয়ারী হইতেছে।

য়ুরেনিয়াম অতি দুষ্প্রাপ্য পদার্থ। পিচব্লেণ্ড নামক খনিজ প্রস্তরে খুবই সামান্ত অনুপাতে য়ুরেনিয়ম পাওয়া যায়। বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় দ্বারাই য়ুরেনিয়মের উদ্ধার কার্য সম্ভব। তারপর উহাকে প্লুটোনিয়মে রূপান্তরিত করিতে হইবে, অথবা উহা হইতে য়ুরেনিয়ম—২৩৫কে পৃথক করিতে হইবে। আসল য়ুরেনিয়মের সঙ্গে এই য়ুরেনিয়ম থাকে ১৩৯ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। উহাকে সহজ উপায়ে পৃথক করা যায় না। খুব আয়াসসাধ্য প্রক্রিয়ায় দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া ইহাকে পৃথক করিবার ব্যবস্থা আছে। একগ্রামের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সংগ্রহ করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আমেরিকার কারখানায় পরমাণু বোমা তৈয়ারী করিতে ৫০ কোটি পাউণ্ড খরচ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

যথেষ্ট পরিমাণে য়ুরেনিয়ম-২৩৫ সংগৃহীত হইবার পর তদ্বারা বোমা নির্মিত হইয়াছিল। এই বোমা নির্মাণের পদ্ধতি গোপন রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম অনুমান করিয়াছেন। এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা সম্ভব নহে। পরমাণু বোমার মূল কথা হইবে, সামান্ত পরিমাণ য়ুরেনিয়ম—২৩৫ অথবা প্লুটোনিয়ম কোন একটা শক্ত আবরণের ভিতরে বদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। ইহার কাছেই থাকিবে নিউট্রন উৎপাদন করিবার কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। একটি বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রথমে য়ুরেনিয়মের পরমাণুগুলিকে অল্প পরিমাণে কয়েকটি স্থানে পৃথক ভাবে রাখা হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল যে য়ুরেনিয়মের একটা ন্যূনতম মাত্রা আছে—যাহার কম পরিমাণ য়ুরেনিয়মকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলেও ভাঙে না। এই ন্যূনতম মাত্রারও কম পরিমাণ য়ুরেনিয়মকে পৃথক রাখা হয়। তারপর যথাসময়ে স্বয়ং ব্যবস্থায় সবটুকু য়ুরেনিয়ম একত্রিত হইলে নিউট্রনের সংস্পর্শে তখন বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সঙ্গে প্রচণ্ড তাপ উদ্ভূত হয়—এবং ইহার ফলে বায়ু মণ্ডলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পরীক্ষার্থ প্রথম বোমা নিউ মেক্সিকোর অন্তর্গত আলবুকার্কের ১২০ মাইল দূরবর্তী স্থানে মরু ভূমিতে বিস্ফোরণ করান হয়। ১৬ই জুলাই (১৯৪৫) পূর্বাহ্নে ৫-৩০ মিনিটে এই প্রলয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরিত হয়। ছয় মাইল দূরে থাকিয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা এই বিস্ফোরণের ফোটো গ্রহণ করেন। তাহাদের বিবরণীতে জানা যায় যে প্রথমে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল একটা আগুনের গোলক দেখা গেল। দুই এক সেকেণ্ড পরে ইহার ঔজ্জ্বল্য একটু কমিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে আকারে বড় হইতে লাগিল। তারপর ছত্রাকের আকৃতিতে বিরাট ও ভীষণ উত্তপ্ত বায়ুরাশি প্রচণ্ড শব্দ করিয়া গগন স্পর্শ করিল। এই বায়ু এত গরম হইয়াছিল যে ইহা হইতে আলো বিকীরিত হইতেছিল। সে যেন একটা নূতন সূর্য—তাহার প্রভায় সমস্ত দিক উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ড কম্পন। বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত মেঘজাল ৪০ হাজার ফিট উর্ধ্বে উঠিল। যে লৌহ নির্মিত স্তম্ভ হইতে বোমাটি বিলম্বিত হইয়াছিল বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সেটি গ্যাস হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। বায়ুমণ্ডলে যে বিক্ষোভ উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে দশ হাজার গজ দূরবর্তী লোকেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে নাই। আলোর ঔজ্জ্বল্যে চোখ ঝলসাইয়া গিয়াছিল। বিশ মাইল দূরে বসিয়া কালো কাঁচের চশমা চোখে দিয়াও যে আলো দেখা গিয়াছিল তাহার ঔজ্জ্বল্য খালি চোখে দেখা সূর্যালোকের চেয়েও অনেক বেশী।

এই পরীক্ষার পর ৬ই আগষ্ট (১৯৪৫) জাপানের হিরোসিমা বন্দরের উপর প্রথম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তার তিন দিন পর দ্বিতীয় বোমা পড়ে নাগাসাকীতে। প্রকাশ হিরোসিমাতে ২৮ হাজার ও নাগাসাকীতে ২০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, বেশীর ভাগ লোকই প্রচণ্ড তাপে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তারপর? পরমাণু অন্তরের তেজ-ভাণ্ডার মানুষের কাছে এখন উন্মুক্ত হইয়াছে। য়ুরেনিয়মকে দুই টুকরা করিয়া যে তেজ পাওয়া যাইতেছে উহা প্রচণ্ড বটে, কিন্তু সমগ্র পরমাণুর অন্তর্নিহিত তেজ বিমোচিত হইলে ইহা হইতে সহস্রগুণ তেজ পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ মনে করেন পরমাণুকে সম্পূর্ণরূপে তেজে রূপান্তরিত করা অসম্ভব নহে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সে কৌশলও মানুষের করায়ত্ত হইবে। যদি সত্য হয় তবে সৃষ্টি ও সভ্যতা ধ্বংস করিবার যন্ত্র মানুষের হাতে আসিবে। প্রচণ্ড তেজ-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি হাতে পাইয়া ভবিষ্যতের মানুষ তাহাকে কি ভাবে ব্যবহার করিবে বলা যায় না। কিন্তু শক্তির এই অপব্যবহারে বিশ্বমানবের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একথাও নিশ্চিত যে এই রহস্য চিরকাল জাতিবিশেষ বা ব্যক্তি-বর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। অদূর ভবিষ্যতে এই আবিষ্কারের স্বরূপ সকলের কাছে উন্মুক্ত হইবেই। সুতরাং ধ্বংস কার্যে ইহার ব্যবহার করিবার প্রশ্ন হয়ত আর থাকিবে না। সেদিন মানুষের কল্যাণেই পরমাণুর তেজ ব্যবহৃত হইবে—এই আশা করা যাইতে পারে।

পরমাণু বোমার সাহায্যে ধরাপৃষ্ঠের অদ্ভুত পরিবর্তন সংঘটিত করান যাইতে পারে। বিরাট হ্রদ বা জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়া মরুভূমিকে শস্য-শ্যামলা করিয়া তোলা যাইবে। পৃথিবীর যে সব স্থান একান্ত শীতল (যেমন মেরুমণ্ডল) সেই সব স্থানে তাপের ব্যবস্থা করিয়া শৈত্য দূর করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত জাহাজ বা রেলওয়ে ট্রেণ চালাইতেও পরমাণুর তেজ ব্যবহৃত হইতে পারে।

কিন্তু এত সব শুভ পরিকল্পনার মূলে রহিয়াছে মানুষের শুভবুদ্ধি। শুভবুদ্ধি জাগ্রত না হইলে নিমেষে পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। কৌতুক করিতে গিয়া যদুকুল যে মুষলের সৃষ্টি করিয়াছিল—ভবিষ্যতে সেই মুষলই হইল তাহাদের ধ্বংসের কারণ। কলির বৈজ্ঞানিক মুষলের পরিণতি কি হইবে কে জানে? ইটালীদেশীয় ফারমী ও জার্মান বংশোদ্ভূত অটো হান—ইহাদের আবিষ্কারই পরমাণু বোমার গোড়ার কথা—অক্ষ শক্তির দুই অংশীদারের প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছিল তৃতীয়ের ধ্বংসসাধনে। অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস!

হাসি ও অশ্রু

শ্রীমতী মীরা ঘোষ

১

ইতিহাসের অধ্যাপক, বিনয় কুমার দত্ত মহাশয় হাতে একটী জ্বলন্ত চুরুট ধরিয়া দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় গভীর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

"কিগো আজ কি শুধু খবরের কাগজ পড়লেই হ'বে নাকি? কলেজে যাবে না, সময় ত হয়ে গেল?" অধ্যাপক মহাশয় পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এই যে উঠি। ওঃ, অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখি; ভাগ্যিস্ তুমি ডেকে দিলে, না হ'লে ত আজ কলেজেই যাওয়া হ'ত না।"

পরম তৃপ্তিভরে মাছের ঝোলসহ ভাত খাইতে খাইতে বিনয়বাবু বলিলেন, "এত আয়োজন করতে পার তুমি অল্প সময়ের মধ্যে! চমৎকার হয়েছে মাছের ঝোল!"

"থাক্, আর বেশী বকতে হ'বে না, খাও এখন। ঠাকুরকে বলি মুড়িঘণ্টটা এনে দিতে।" মণিকা চুড়ির গোছা নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া গেলেন।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া বিনয়বাবু তাঁহার বেতন-বৃদ্ধির সংবাদ মণিকাকে হাসিতে হাসিতে দিলেন। শুনিয়া মণিকা বলিল, "তা'হলে বল এবার আমায় সেই নেক্লেস্টা কিনে দেবে?" পত্নীর মুখে প্রেমবিমুগ্ধ দৃষ্টি ফেলিয়া স্নিগ্ধ-স্বরে বিনয়বাবু উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই গো নিশ্চয়ই, ভাবনা কর'না, এবার তোমায় নেক্লেস্ আর একটা বেনারসী শাড়ী কিনে দোবোই।"

"আর দেখ, পরশু কণিকার জন্মদিন, আমাদের ত নেমতন্ন আছে, ওকে কি দেওয়া যায়?"

"যা ইচ্ছে তোমার, আমি কি কোনোদিন তোমার কথার ওপর কথা বলেছি, না কোনো আপত্তি জানিয়েছি? তুমিই ত আমার লক্ষ্মী, তুমিই ত আমার সব।" বিনয়বাবু তিন বছরের কন্যা রেণুকে গভীর স্নেহে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। মণিকা হাসিমুখে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

২

অতুল মার্চ্চেন্ট আপিসের মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণী, ঘড়িতে দশটা বাজিবার শব্দে সচকিত হইয়া উঠিয়া সে কোনোরূপে কাক স্নান করিয়া আহার করিতে বসিল। অঞ্জলি স্বামীর গম্ভীর মুখ দেখিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস পাইল না, নীরবে পরিবেশন করিতে লাগিল।

অতুল আপিসে পৌছিয়াই শুনিল যে বড়বাবু তাহাকে ডাকিতেছেন। বড়বাবুর ঘর; অতুল নতমুখে গিয়া দাঁড়াইল। "আজ পনের মিনিট লেট্। অসম্ভব হয়ে উঠেছে আপনাকে রাখা; একদিনও ঠিক সময় উপস্থিত হ'তে পারেন না, ভবিষ্যতে এরকম হ'লে আপনাকে রাখা সম্ভব হবে না।" অতুল কিছু একটা বলিতে যায়; কিন্তু বড়বাবুর বিকট ধমকে সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল নিজের আসনে। অন্যান্য সহকর্ম্মীরা তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল। পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা, বড়বাবু কি মাইনে বাড়িয়ে দেবার সুখবর দিলেন নাকি?" অতুল পরিমলের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্রাইয়া পড়িতেছে। তাহার প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ করে পৃথিবীতে কি এমন একটীও লোক নাই?

সেদিন রুক্ষ মেজাজে অতুল গৃহে ফিরিল। অঞ্জলি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর জন্য চায়ের বাটী ও খাবারের রেকাবি নিয়া আসিলে অতুল তিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "গরীবের আবার ঘোড়া রোগ কেন? নিয়ে যাও ও সব, লাগবে না আমার। রোজ আপিসে যেতে দেরী হচ্ছে, একদিনও কি তাড়াতাড়ি রেঁধে দিতে পার না? যা না ছাই রাঁধ! চাকরী গেলে পারবে সব না খেয়ে মরতে?"

বীরু একটা কাঠের বলের জন্য পিতার কাছে আব্দার করিতেছিল; হঠাৎ অতুল তাহার গালে চড় বসাইয়া দিল, বীরু কাঁদিয়া উঠিল।—"খেয়ে ফেল আমাদের, মেরে ফেল ছেলেটাকে—"বলিয়া অঞ্জলি চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তুষার-শ্রী

শ্রীদ্বিজেন মল্লিক

য়ুরোপীয় সাহিত্যে—বিশেষ করে ইংরাজী এবং রুশ সাহিত্যে তুষারের বর্ণনা অপরূপ। শীতের উল্লেখে বরফের বর্ণনা সেখানে অপরিহার্য। সুন্দর-পিয়াসী মন আমাদের সে বর্ণনায় হয়ে উঠে স্বপ্নাপ্লুত। সাদা কিছু বোঝাতে গেলে তাই আমরাও বিদেশী ভাষাতেই বলে থাকি—"Snow white"। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে "তুষার-শুভ্র" কথাটার বিশেষ চলন আছে বলে মনে হয় না। এর কারণ অবশ্য এই হ'তে পারে যে ভারতবর্ষের অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই এই অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে থাকে। সাধারণতঃ একমাত্র শীত ঋতুতেই আমাদের দেশের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীগুলির উপরে তুষার পাত হয়ে থাকে। কিন্তু শীতকালে আমরা প্রায় সকলেই ঐ সকল স্থান ত্যাগ করে সমতল ভূমিতে নেমে যাই; সুতরাং তুষার-শ্রী দর্শন আমাদের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে উঠে না।



তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—১

কেন্দ্রীয় এবং পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট উভয়েরই গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শিমলায় কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন থাকার ফলে তুষার পাত সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এখানে তারই একটু আভাষ দেবার চেষ্টা করব।

বারো মাসই শীতের আমেজ থাকায় শিমলাকে শীতপ্রধান দেশ বলা চলে। সাধারণতঃ শীতের সময় এখানকার টেম্পারেচার ২২°।২৩° ডিগ্রীতে নেমে থাকে। সে সময়টা এখানকার অধিবাসীদের পক্ষে খুবই কষ্টকর সময়। বাংলাদেশের শীতের সঙ্গে এখানকার শীত-ঋতুর কোন তুলনাই চলে না। এই ভীষণ শীতের হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্যেই পূর্বে শীতের প্রারম্ভেই দপ্তরাদি দিল্লী ও লাহোরে স্থানান্তরিত হ'ত। শীতের সময় এখানে পাইন, কেলু, চীড় ও রডোডেনড্রন্ জাতীয় বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন গাছের পত্রাদি একটিও থাকে না—প্রথম দৃষ্টিতেই এগুলিকে শুষ্ক বৃক্ষ বলেই প্রতীয়মান হয়। অবশ্য শিমলা পাহাড়ে এই জাতীয় বৃক্ষই বেশী। এরা কিন্তু চির সবুজ—চির নবীন।

প্রাকৃতিক কারণে এখানে বৎসরে দুবার করে হয় মেঘের আবির্ভাব। একবার হয় শীতের সময়, আর একবার হয় বর্ষাকালে। শীতের সময় মেঘ বর্ষণের ফলে শিমলায় তুষার পাত হয়। সেই তুষার পাত সত্যই এক অপূর্ব দৃশ্য! সে যে কতো সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব! সে সময় মনে হয় কোন অদৃশ্য শিল্পী বুঝি আকাশ থেকে তাঁর রঙের পাত্র উজাড় করে অজস্র শুভ্র রঙের হোলী-খেলা সুরু করেছেন।



তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—২

শূন্যে এই তুষার কণিকাগুলি মনে হয় ঠিক যেন পেঁজা তুলোর মত। শেষে সেই পেঁজা তুলো একটু একটু করে জমতে জমতে ক্রমে গাছ পালা, রাস্তাঘাট, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি সব কিছুরই উপরে বিছিয়ে দেয় একটা রজত-শুভ্র আচ্ছাদন। চারিদিক শুধু সাদা আর সাদা—অনন্ত সাদা, বুঝি বা তার শেষ নেই। দূরে ও কাছে যতদূর দৃষ্টি চলে দিগন্ত-প্রসারী শ্বেতাম্বরা পৃথিবী, আর উপরে অনন্ত আকাশ জুড়ে চোখ ঝলসানো শুভ্র চন্দ্রাতপ। সত্যই অতুলনীয়!

তুষার পাতের পরই শীতের তীব্রতা তত বেশী অনুভূত হয় না, যত বেশী হয় তার পর রোদ উঠলে। নরম তুষার-ঢাকা পথে প্রথম পথ চলতে বেশ আনন্দ লাগে, কিন্তু শেষের দিকে বেশী লোক চলা-চলের ফলে হয়ে উঠে ক্রমেই কঠিন ও পিচ্ছল। তখন পথে চলা খুবই কষ্টকর। লোহার পাইক আঁটা লাঠিতে ভর করে অতি সাবধানে

চলতে হয়, নতুবা পা পিছলে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পদক্ষেপে। আছাড় খান নি এমন ব্যক্তি খুবই কম। ক্রীড়ারত বালকদের বরফের গোলা তৈরী করে ছোঁড়াছুঁড়ি খুবই উপভোগ্য।

শিমলার তুষার পাত সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন—"অগ্রহায়ণ মাসের অৰ্দ্ধেক যাইতে না যাইতেই এক প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া উৎফুল্ল নেত্রে দেখি যে, পর্বত তল হইতে শিখর পর্যন্ত বরফে আবৃত হইয়া সকলি শ্বেত। গিরিরাজ শুভ্র রজত বসন পরিধান করিয়াছেন। বরফে শীতল বায়ুর নিঃশ্বাস আমি এই প্রথম উপভোগ করিলাম। দিন যত যাইতে লাগিল, শীত ততই বাড়িতে লাগিল। একদিন দেখি যে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে ধুনিত লঘু তুলার ন্যায় বরফ পড়িতেছে। জমাট বরফ দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে বরফ প্রস্তরের ন্যায় বুঝি ভারি এবং কঠিন, এখন দেখি যে তাহা তুলার ন্যায় পাতলা ও



তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—৩

হালকা। বস্ত্র ঝাড়িয়া ফেলিলেই বরফ পড়িয়া যায় এবং যেমন শুষ্ক তেমন শুষ্কই থাকে। পৌষ মাসের একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, দুই তিন হাত বরফ পড়িয়া সকল পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মজুরেরা আসিয়া সেই বরফ কাটিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিলে তবে লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। আমি কৌতূহলে আবিষ্ট হইয়া সেই বরফের পথেই চলিলাম। প্রাতে আর বেড়ান বন্ধ হইল না। স্ফূর্তি ও আনন্দে আমি এত দূর এত বেগে চলিয়া গেলাম যে, সেই শীত-কালে বরফের মধ্যে আমি গ্রীষ্ম অনুভব করিলাম এবং ভিতরের বস্ত্র ঘর্ম্মে আর্দ্র হইয়া গেল।"...বাস্তবিকই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রাণেই সে সময়ে এক অজানিত আনন্দ রসের উদ্ভব হয়। সকলেই বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতি-রাণীর সে সৌন্দর্য উপভোগ করতে। সাধারণতঃ বছরে প্রায় ৪।৫ বার এইরূপ তুষার পাত হয়ে থাকে।

ইংরাজীর ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসেই হয় সিমলায় সর্বাপেক্ষা বেশী তুষার পাত। সিমলায় এক কালীন ১২।১৩ ফুট বরফ এর আগে আর কোন দিন পড়েছে বলে শুনা যায় না। যতদূর জানা গিয়েছে তাতে বলা চলে যে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সিমলায় আর একবার ভীষণ তুষার পাত হয়েছিল। সে সময়ে সবে এদিকে রেল গাড়ীর চলাচল সুরু হয়েছে। স্থানে স্থানে ৬।৭ ফুট বরফ জমায় সে সময় কদিন ট্রেণ বন্ধ ছিল।

১৯৪৫ সালের তুষার-ঝটিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি কথাই জানাচ্ছি। যা সাধারণত ভাগ্যে ঘটে না।

ইংরাজী নব-বর্ষ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রে ভীষণ মেঘ করে বৃষ্টি এল। গভীর রাত্রে সুরু হ'ল তুষার পাত। সকালবেলা দেখা গেল চতুর্দিক সাদা হয়ে গেছে। নব-বর্ষের সেই নব-প্রভাতে ধরণীর শুভ্র-মূর্তি দেখে মনটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, পৃথিবীময় অশান্তির বুঝিবা এ কোন এক মঙ্গলময় পরিণতির ইঙ্গিত।

মাঝে দুদিন বাদ দিয়ে আবার সুরু হ'ল তুষার পাত। দেখতে দেখতে রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি সব চাপা পড়ে গেল তুষারের মধ্যে। অন্য সময়ে অবশ্য তুষারপাতের পর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক রাস্তা-ঘাটগুলি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এবার আর তা সম্ভবপর হ'ল না।

সিমলার প্রায় অধিকাংশ অধিবাসীই চাকুরী-জীবী। এই অজস্র তুষার পাতের মধ্যে দিয়েই কোন রকমে প্রাণ হাতে করে প্রথম ২।৩ দিন কাজকর্ম যথারীতি চললো। সে যে কী কষ্ট! শীতের দাপটে হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে। ইতিমধ্যেই ৩.৪ ফিট বরফ জমে গেছে সিমলার নাম-করা রাস্তা-ঘাটগুলির উপর। একটা দিন যাচ্ছে, আর ভাবছি কালকের অবস্থা কী হবে। যাক, এমনি সময়ে একদিন চতুর্দিক আলো করে সূর্যদেব উদয় হলেন। সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠল—ভাবলাম যে, বরফ পতন শেষ হয়েছে।

কিন্তু একি? ২।১ দিনের মধ্যেই আবার সুরু হ'ল তুষার পাত। এবার বোধকরি এর আর শেষ নেই—বিরামহীন, ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দেখতে দেখতে ৫।৬ ফিট বরফ জমে গেল। সিমলায় সর্বত্রই ৩।৪ দিন ধরে একবারও সূর্যের দেখা নেই। দুর্দান্ত শীত। শীতের প্রাবল্যে প্রতিটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবশ হ'য়ে পড়ে। আগুন ভিন্ন এক মুহূর্ত'ও থাকবার উপায় নেই। দপ্তরে রীতিমত আগুনের ব্যবস্থা, বাড়ীতেও তাই।

এই ভীষণ অবস্থায় এখান থেকে লোকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু যাবে কোথায়! আগেই তো মোটর চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার ট্রেণও বন্ধ। কাজেই বনের পশু-পক্ষী পর্যন্ত যখন সিমলা পরিত্যাগ করে চলে গেল, তখন আমাদের সকলকে এক রকম বাধ্য হয়েই শীতের অত্যাচার সহ্য করে যেতে হল মুখ বুজে। এই দেখে সিভিল অফিসগুলি ২।১ দিনের জন্য বন্ধ করলেও মিলিটারী অফিসগুলির কাজ চলতে লাগল নিয়ম মাফিক। কত লোক রাস্তা চলতে চলতে আছাড় খেল—পড়ে গিয়ে আহত হ'ল—তার ঠিক নেই। আর যারা ঠিক ভাবে পৌছল—শীতাধিক্যে বুঝিবা মারা যায়। কত লোক যে শীতের জন্য

সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন তার হিসাব কে রাখে? ব্রান্ডি খাইয়ে আর আগুনের সেঁক দিয়ে সুস্থ রাখতে হয়েছে অনেককেই। এর উপর যখন তখন শুনা যেতে লাগল—"একটা লোক চলতে চলতে ঠাণ্ডায় রাস্তায় প'ড়ে মারা গেল।"…"দুজন পাহাড়ী রাস্তা ঠিক করতে না পেরে গভীর খাদের মধ্যে তলিয়ে গেল," ইত্যাদি। এর কতখানি যে সত্য তা ঠিক করে বলা যায় না। তবে সে বিশাল বরফ স্তূপের মধ্যে ২।১০ জনের প্রাণ হারান মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ ২।৪ জন মারা গেছে বলে প্রমাণিতও হয়েছে।

যান-বাহন সব বন্ধ হয়ে গেল, ট্রেণ তো আগেই হয়েছে। অবিশ্রান্ত তুষার বৃষ্টির ফলে ইলেক্ট্রিক লাইনগুলিও হয়ে পড়ল অচল। প্রতি মুহূর্ত্তেই আলো নিভে যায়। শেষে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার গেল খারাপ হয়ে। ট্রেণ বন্ধ থাকায় চিঠি পত্রাদিও বন্ধ। আবার টেলিগ্রাফের এই অবস্থা। এক কথায় বিশ্ব-জগৎ হ'তে শিমলা বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল—প্রায় দু-দিনের জন্যে।

এর উপর আনুষঙ্গিক বিপদ তো আছেই—শীতাধিক্যে কলের জল সব বরফ হয়ে গেছে। ১৮ ডিগ্রী টেম্পারেচারে জলতো দূরের কথা, সরিষার তৈল পর্যন্ত জমে গেছে। পানীয় জল দুর্লভ। আগুনের তাতে বরফ-গলানো জলে সব রকম কাজ চালান হ'ল। মাসের প্রথম ভাগেই এইরূপ হওয়ায় খাদ্যাভাবেও অনেক কষ্ট গেছে। চাল-ডাল, নুন তেল, কাঠ কয়লা, প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ না থাকায় কষ্টের আর সীমা ছিল না। এ-সময়ে যান-বাহন চলাচল যেমন অসম্ভব তেমনি কুলি-মজুর পর্যন্ত পাওয়া ভার। তার উপর দোকান-পত্রও অধিকাংশই বন্ধ। আমদানি না থাকায় শাক-শব্জীর বাজার একেবারেই খালি। কাজেই অনেক গৃহস্থকেই অনেক কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে। এও ঠিক যে, আর ২।৪ দিন এরূপ তুষার-পাত চলতে থাকলে শিমলার অধিকাংশ লোককেই অনশনে মরতে হ'ত। গয়লা আসা বন্ধ—দুধ নেই কারো ঘরে, যুদ্ধের জন্য বিলাতী টিনের দুধতো দুষ্প্রাপ্যই। এ অবস্থায় মাতৃ-দুগ্ধই শিশুদের একমাত্র পানীয়।

অবশেষে ১১ই জানুয়ারীর প্রভাতে শিমলার নূতন রূপ ফুটে উঠল। ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল যে বর্ষণ-ক্লান্ত নির্ম্মল নীল আকাশের বুকে সূর্য্যের সোনালী কিরণ ঝলমল্ করছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায় শুধু সাদা আর সাদা। এ যেন অনাদি অনন্ত দুস্তর শ্বেত-সমুদ্র—সীমাহীন, আর উপরে নির্ম্মল নীল আকাশ। সে এক চোখ ঝলসানো দৃশ্য! অপূর্ব! ভাষায় তার বর্ণনা দুঃসাধ্য! প্রকৃতপক্ষে এই শুভ্র বরফের উপর প্রতিফলিত সূর্য-রশ্মি চক্ষের পীড়াদায়ক। এতে নাকি দৃষ্টি হানিরও সম্ভাবনা আছে। সেই জন্যই এ-সময়ে সকলে রঙীণ চশমা ব্যবহার করে থাকেন।

এবার ঘর-দোর পরিষ্কার করার পালা। বাড়ীর ছাদে এত বেশী



তুষারপাতে শিমলার দৃশ্য—৪

বরফ জমে গেছে যে তার ভারে ছাদ ধ্বসে বাড়ীগুলি প্রায় পড় পড় অবস্থা। শিমলা রেলওয়ে ষ্টেশন এবং আরো ২।৪টে বাড়ী ইতিমধ্যেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

যাই হোক এর দু-দিন পরে কালকা থেকে শিমলাগামী ট্রেণকে অতিকষ্টে তারাদেবী পর্যন্ত আনা সম্ভবপর হ'ল। এই হ'ল শিমলার বহির্জ্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতার অবসান। বাকী পথটুকু বরফ কেটে ট্রেণ চলার উপযুক্ত করতে লাগ্‌লো আরো দু-দিন। তারপর যথারীতি ট্রেণ চলতে লাগল। আত্মীয়-স্বজন আপনার লোকেদের নিরাপত্তা জেনে স্বস্তি লাভ করল।

গান

শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র

রাত-জাগা-পাখী ডেকে গেল' দূরে
বিহগী-বধূর নামে—
শুক্লা-চাঁদিনী বিবশ-আবেশে
দূর গিরিতটে নামে !!
রজনীগন্ধা সারা রাত ধ'রে,
গন্ধ রেখেছে বুকে তার ভ'রে ;

বিরহিনী জাগে—যদি রাজরথ
তা'র দ্বারে এসে থামে !
একে একে শেষ প্রহর ফুরালো,
শুকতারা হায় আকাশে মিলালো,
নয়নের জল শুকায় তুষার
আশাহত অভিমানে।



অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

রঙ্গমঞ্চের উপর যবনিকা ঘন ঘন করতালির মধ্য দিয়ে নেমে এল। সমস্তটা প্রেক্ষাগৃহ উন্মুখ আগ্রহে বহুদিন পরে প্রত্যাগত নায়কের নায়িকার প্রতি প্রণয় নিবেদনের হৃদয়গ্রাহী অভিনয় দেখে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল এতক্ষণ। সেই প্রশংসমান নীরবতার সমুদ্রে বারে বারে কলরবের ঢেউ উঠতে লাগল, আর অন্ধকারের উপর আস্তে আস্তে আলোর লীলা জাগতে লাগল। তার পরই আরম্ভ হল সব কিছু ছাপিয়ে সব অভিনয়ের প্রভাবকে নির্মম-ভাবে নিপীড়ন করে চীৎকার—'চাই সোডা লেমনেট', 'চাই পান বিড়ি', 'চাপ কাটলিস চাই'। 'আশ্ কিরিমের' ফেরীওয়ালাও এই ঐক্যতান ভাষণে সমস্বরে যোগ দিল। রঙ্গজগতের অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে স্বপ্ন রচনা করেছিল, পীঠপ্রদীপের সম্মুখে যে প্রেমের লীলা চলেছিল —সে সব মিথ্যা হয়ে গেল। সত্য যেন শুধু বাংলা রঙ্গমঞ্চের অনাবশ্যক অথচ অপরিহার্য্য এই বিশ্রী আবহাওয়া, এই অভিনয়ের পরিহাস এবং তার চেয়ে সত্য বলে মনে হল, একটা যুবক দর্শকের হাঁটুর উপর একটি সলজ্জ অথচ সক্রিয় চিম্‌টী। প্রদ্যুম্নর হৃদয়মঞ্চের উপরও যবনিকা নেমে এল—কিন্তু বহু বহু আক্ষেপ ও বহু আকুলতা নীরব অন্ধকার ছড়িয়ে দিল তার স্বপ্নজগতের উপর।

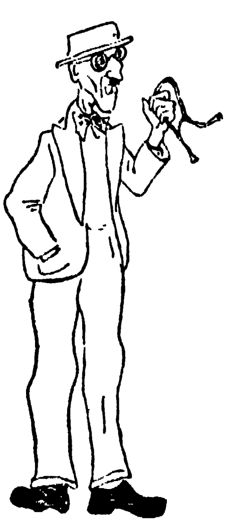
চারদিকের কলরবের সঙ্গে অত্যন্ত অসমঞ্জস একটা কপোতকূজনের মত ফিসফিসে কণ্ঠস্বর তার কানে এল—ওগো চল, আলো জ্বলে উঠেছে; এখনি বাড়ী পালাই চল, দু ঘণ্টা ত হয়ে গেল। সকলে উৎসুক ও সপ্রশ্ন নয়নে দেখল শুধু একটা উড্ডীয়মান অবগুণ্ঠন এবং সেটা ক্রমশ নিম্নাভিমুখী হবার উপক্রম করছে। একটা নববিবাহিত দম্পতীর অন্তর-লোকের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল। রঙ্গভূমি অধিকার করে রইল সংসারের রূঢ় আলোক ও রুক্ষ কোলাহল।

ব্যাপারটা খুবই সামান্য। এমন ত কতই হচ্ছে আখচার ও আসছে শ্রবণগোচরে, পথে, ট্রামে, সিনেমায়, থিয়েটারে। নববধূ তার অনূঢ়া জীবনের বাবা-মা-ভাই-বোনের অন্তরালে গড়া নিভৃত আশ্রয় ছেড়ে নূতন শ্বশুরবাড়ীর আড়ষ্ট আবেষ্টন এড়িয়ে আগ্রহে আকাঙ্ক্ষায় আকুল স্বপ্নে কল্পনায় বিহ্বল স্বামীর সঙ্গে প্রথম বাহিরে এসেছে। সরমে সঙ্কোচে পায়ে পায়ে জড়িত হয়ে পড়েছে চরণ, স্খলিত হয়েছে বচন—আর ক্ষুণ্ণ প্রত্যাহত হয়ে ফিরে গেছে একটি উন্মুখ আশাপূর্ণ মন। অল্প সময়ের জন্য প্রতিবেশী বা পথচারির কৌতূহল জাগিয়ে সে সব ক্ষণিকের দৃশ্য ও খণ্ডিত কথোপকথন নবপ্রণয়-সাগর-তীরের অনুর্ব্বর বালুকাবেলায় মিশে গেছে; নবোদ্ভিন্ন জীবনের একটি দৃশ্যের উপর চকিতে অতর্কিতে যবনিকা নেমে এসেছে —যদিও বাসরসঙ্গিনীদের করতালি ও কৌতুক রহস্য সে সরম ও সঙ্কোচের মুখে জলসিঞ্চন করবার জন্য তাদের কাছাকাছি কোথাও ছিল না।

২

প্রদ্যুম্ন কলকাতার সেই পাড়ার সেই বংশের ছেলে, যেখানকার বহিঃসীমারেখার বাহিরে আধুনিকতার সেনা এসে হানা দিয়েছে, এমন কি অগোচরে ভিতরে আনাগোনাও করছে, কিন্তু যেখানকার প্রাচীন প্রাচীনারা তাদের প্রাচীরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শতাব্দীর গতি প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করচেন। কিন্তু অন্তঃপুরে না হলেও বহির্বাটিকায় শত্রুপক্ষ যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করেছে এমন সন্দেহের প্রমাণ না হলেও অনুমান করবার কারণের অভাব নেই। প্রাচীনাদের মনের আনাচে কানাচেও যে সে সব না ঘোরা-ফেরা করছে তা নয় এবং তাতে তাঁরা নিজেরাই যতটা বিস্মিত ততটা বিচলিত হচ্ছেন বলে মনে হয় না আজকাল। ভিতর বাড়ীতে গুপ্তচরের মত ঢুকে পড়েছে আধুনিক যুগের হাল্কা উপন্যাস—যাতে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বা প্রাচীনতার অস্তিত্বরক্ষা কোনটাই সহজ হচ্ছে না। পাড়ার লাইব্রেরীটা ত শুধু আর এ

বাড়ীর জন্ত তৈরী হয় নি। বাড়ীর অল্পবয়সীরা সবাই নূতন নূতন বই আনছে সেখান থেকে। মোক্ষদাসুন্দরী সে সব চকচকে মলাটের ঝকঝকে ছাপার বই পড়তে বসে অলস দ্বিপ্রহরে বিরক্তিতে উঠে বসেন। বই সরিয়ে দিয়ে দোক্তা-মিশান একখিলি ছাঁচি পান চিবাতে চিবাতে মনে হয়, দেখাই যাক্ না বইটি শেষ পর্য্যন্ত কি রকম লিখেছে, সবটাই ত আর কিছু খারাপ হবে না; মাঝে মাঝে মনে হয় পড়তে বোধ হয় ভালও লাগে—জায়গায় জায়গায়। তাই খানিক পরে মেদবহুল বিপুল দেহটির পাশ ফিরিয়ে গরমের দিনের আরাম শীতল পাটীতে স্নিগ্ধ শান্তি-পুরীর সূক্ষ্ম বাহুল্যবর্জ্জিত আবরণে দেহ রক্ষা করে আবার পড়তে আরম্ভ করেন। হার্ট এবং অম্বল এই দুইয়ের ব্যামো তাঁর বহুকালের। তা বলে দুপুর বেলায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ার সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আজকালকার ডাক্তারগুলিও সে রকম সুবিধার লোক নয়। এই সব বিলিতি ঢংএর বইয়ের মতই ওরা বিলিতি পোষাকে গা ঢেকে চিকিচ্ছে করতে আসে, আর সঙ্গে আনে নতুন নতুন যত আজগুবি কথা, বলে কি না একটু হাঁটাহাঁটি করুন, অন্তত গাড়ী করে বাইরে গিয়ে মাঠের মধ্যে রোজ বেড়িয়ে আসুন। কেন? গাড়ী করে তো রোজ গঙ্গায় যাই নাইতে; সে অবশ্যি তেমন দূরের কথা নয়। উঃ ভারী ত জানে ওরা, আজকালকার ছোকরারা; ওই ত সব পক্কা প্যাকাটির উপর সায়েবী সুট চড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাতে করে নিজের ব্যাগটিও বইবার বোধ হয় ক্ষমতা নেই, তাই বয় না। বলে কিনা, মুচি ছাড়ুন, সারা দুপুর ঘুমোনো ছাড়ুন। আরে বাবা, সেই যদি সাত-পুরুষের লুচি, আর সারাটা দিন ঝি-চাকর খাটিয়ে হায়রাণ হওয়ার পর এই একটুখানি গা গড়িয়ে নেওয়াই ছাড়তে হয় তবে তোমায় ডাক্তার ডাকলুম কেন?



পক্কা প্যাকাটির উপর সুট চড়িয়ে

স্বামী রামপ্রসাদ এখন নেই। আর থাকলেও তার উপস্থিতি এই কাহিনীর পক্ষে অবান্তর হত। বাইরের বৈঠকখানা পর্য্যন্তই তার পারিবারিক জীবনের উপর প্রভাব প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে স্ত্রী জাতির মুক্তি প্রয়োজন বলে যারা গঙ্গাতীরের পত্রিকা থেকে তমসাতীরের টাইমস্ পর্য্যন্ত আলোচনা ও আলোড়ন করে বেড়াচ্ছে, তারা বোধ হয় বিবাহ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করে নি এবং খুব সম্ভব তার কারণ যে তাদের বিবাহে ঈপ্সিতাদের বাপ-মারা মত দিচ্ছে না। অন্তত আমাদের মোক্ষদাসুন্দরীর সংসারের উপর আধিপত্য দেখে এ ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত করার জোটী নেই। সব খবর তিনি রাখেন—বাড়ীর ভিতরের এবং বাহিরের খবরও পৌঁছে দেবার লোকের অভাব নেই। তিনি এই মাত্র বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছেন



কৌশল্যা-মোক্ষদা সংবাদ

যে দিঘীর পাড়ে যেখানে দু পারে দুটো আলাদা কলেজে মেয়েরা আর ছেলেরা পড়ত বলে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই দিঘীর এক পাড়ে ছেলেদের কলেজেও মেয়েরা চড়াও হয়ে পড়তে সুরু করেছে এ বছর থেকে। মাথা নাড়িয়ে নথ ঘুরিয়ে মুখে দোক্তা চড়াতে চড়াতে পাড়ার কৌশল্যা পিসি এসে এই খবরটী সাতঙ্কে এবং সত্য কথা বলতে কি একটু সাগ্রহেই দিলেন। যদিও দত্তরা কারো অনিষ্ট করে নি তবুও ওরা ত প্রতিবেশী, তার উপর বড়লোক। অতএব ওদেরও একটু চিন্তায় ভাবনায় থাকা ভাল সব দিক দিয়েই। কৌশল্যা কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য পড়েন নি, কিন্তু তাঁর মনের বিকাশ কন্টিনেণ্টাল ছাঁচেই হয়েছে। কারণ সব শিক্ষার খবরটুকু পেয়েই তিনি রসের সন্ধান পেয়ে ফেলেছেন। জান না, মুখি দি, বিদ্যে আর সুন্দরকে আর মালিনী মাসির সাহায্য নিতে হবে না। বাগানের মালীকেও

না কি চিঠিটা পত্তরটা এ হাত ও হাত বদল করে দিতে ডাকবে না। কালো যমুনোর জলে শ্যাম রায়রা ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য দিঘীর পাড়ে তৈরী হচ্ছে। সব নাকি দলে দলে সাঁতার শেখার জন্য নাম লেখাচ্ছে। মা গো মা, ক্ষমা ঘেন্না এদের একটুও যদি থাকত! কোথায় পাব্বনে পাব্বনে গোরোণে অম্বুবাচীতে গঙ্গাচ্চান করে পুণ্যি করে নেবে, না সেই হেদোর জলে বেদের দল নৈরাজ্যি পুড়ে খাচ্ছে। কৌশল্যা ত আর কলেজের ছাত্র ছিলেন না; তাই জানেন না কত পড়া ও পরীক্ষার জালা জুড়াবার জন্য ছেলেরা আগে সাঁতার কাটতো ওখানে।

কৌশল্যা ত কুশল সংবাদ নিতে এসে মুখের মুশল চালিয়ে চল্লেন, আর ওদিকে মোক্ষদাসুন্দরীর ভাবনা ততক্ষণে দিঘীর জলে হাবুডুবু খেতে সুরু করেছে। বাড়ীর বাইরে গঙ্গার ঘাটের পথ, আর ইষ্টি কুটুমদের বাড়ীর সবই জানা আছে; তার বাইরে সবটা পৃথিবীই তার কাছে প্রায় অজানা অথবা অচেনা। দোষই বা তার কী? বাহিরে ঘোমটার গণ্ডীরেখার ভিতর থেকে সংসারের কতটাই বা আর দেখা যায়, কেমন করেই বা আর চেনা যায়? অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চেয়ে তার দৃষ্টি শক্তি বেশী নয়। এ যুগের সঞ্জয়রা যেটুকু সংবাদ দিয়ে যায়, সেটুকু থেকেই বাহিরের সংসার-সমরের সঙ্গে তার পরিচয়।

ভাবনা ত সেই জন্যই। আবার এদিকে কর্পূরসেন সেই বালিগঞ্জ ছাড়িয়ে মাঠ কেটে কটা পুকুর বানিয়েছে। তাতে কয়েক জন ছেলে তাদের ভালবাসার মেয়ে নিয়ে ডুবেও মরেছে। অবিশ্যি দীঘিতে এমন অঘটন নিশ্চয়ই কিছু হতে পারবে না। তার ডাইনে বাঁয়ে গেছে রাস্তা টেরাম; সেখানে প্রেম করে এক সঙ্গে ডুব দিতে নিশ্চয়ই লজ্জা করবে। লোকের চোখের সামনে ভর দিনদুপুরে ছোকরারা নিশ্চয়ই কিছু বেহায়াপনা করে বেড়াবে না। সায়েবরা আবার লোক কি-রকম কি-রকম। খেরেস্তানী কাণ্ড কতই না করে ওরা। আবার জোড়া জোড়া হয়ে লোক দেখিয়ে নাচে। তবে সায়েব যখন, মোক্ষদার ভরসা আছে যে তাদের দাপটে ছেলেরা মেয়েরা এক সঙ্গে পড়লেও এক ঘাটে নিশ্চয়ই জল খাবে না।

শেষ পর্য্যন্ত মোক্ষদাকে বিশেষ তেমন চিন্তান্বিত হতে না দেখে কৌশল্যা আর একটা বাণ নিক্ষেপ করলেন। আর শুনেছ, কলেজে যার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী ভাব আমাদের বড়খোকার, তার নাকি নাম নীহারিকা। আমি ত শুনেই ভাবলুম—দরকার নেই এ সব কথা শুনে। পরে আবার ভাবলুম কানে যখন এসেই পড়েছে, এই শুধু একটীবার মুখিদিকে জানিয়ে আসি সময় থাকতে। ছেলে তোমার অবিশ্যি তেমন ছেলেই নয়। আর সবই ত ভগবানের হাতে। তবু ভাবলুম তোমায় না জানিয়ে দিলে অধম্মি হবে আমার। (ক্রমশঃ)

কবি কুমুদরঞ্জনের প্রতি

শ্রীগোপাল ভৌমিক

তোমার আমার মাঝে রয়েছে অমিল :
ব্যবধান বয়স ও যুগের
যেন মহা সমুদ্রের মত—
তোমাকে আমাকে করে বিচ্ছিন্ন বিব্রত।

তোমার চোখের দেখা শ্যামল মাটিতে
সবুজের ছিল সমারোহ :
ধান্য-শীর্ষে আন্দোলিত প্রান্তরে প্রান্তরে
সৌন্দর্যের ছিল যে-প্রবাহ—
তারই ছোঁয়া দিয়ে জানি—
তোমার মানস-সৃষ্টি কাব্য-বিবর্তন—
মুগ্ধ করে মানুষের মন,
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগে সুতীব্র রণন।

তোমার অনেক পরে আমরা এসেছি :
দেখেছি কখন যেন সবুজ প্রান্তর—
হয়ে গেছে ধূসর গম্ভীর,
আকাশের বুক চিরে ফ্যাক্টরীর শির—
মানুষে মানুষে গড়ে তীব্র ব্যবধান,
মানুষের লোভে হল
সুন্দরের ব্যর্থ অবসান।
আমাদের কাব্য তাই—
রুক্ষ তীব্র সৌন্দর্য-বিহীন
এ মাটিতে পেতে চায় সোনাঝরা দিন।

তোমার আমার পথ ভিন্ন জানি—
লক্ষ্য ভিন্ন নয়,
আমাকে পাথেয় দিল তোমারই সঞ্চয়।

নতশিরে হে অগ্রজ,
করি আমি সে ঋণ স্বীকার—
যে ঋণের সেতু বাঁধে সমুদ্রের এপার ওপার
তারই অঙ্গীকারে রাখি ক্ষুদ্র নমস্কার।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের রাসায়নিক শিল্পের তুলনা

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এম্‌-এস্‌সি

সকলেই জানেন রাসায়নিক শিল্পে ভারতবর্ষ অতিশয় অনুন্নত। কোন্ কোন্ কারণে আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি হয় নাই বা হইতেছে না, সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকিলে যাঁহারা এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে চান তাঁহারা যেমন উপকৃত হইতে পারেন জনসাধারণের মনের অস্পষ্ট এবং অনেক স্থলে ভ্রান্ত ধারণারও তেমনি নিরসন হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমি আমার সামান্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত কয়েকটি কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রাসায়নিক শিল্পের অসামান্য উন্নতি দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকি। ইহাদের উন্নতির মূলসূত্রের সন্ধান করিলে তিনটি প্রধান বিষয় চোখে পড়ে; যথা—শিল্প সম্বন্ধে উদার এবং কল্যাণকর রাজনীতি, শিল্পপতিগণের লোকহিতকর দৃষ্টিভঙ্গী এবং ফলিতবিজ্ঞান গবেষকগণের জনসেবাকল্পে একনিষ্ঠ সাধনা।

আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পের, বিশেষভাবে রাসায়নিক শিল্পের গোড়াপত্তন এবং উহার ক্রমোন্নতি কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছু স্বচ্ছল করা এবং তৎসঙ্গে দরিদ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিল্প-সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনার বিষয় তৎকালে এদেশে অনেকেই চিন্তা করেন নাই। গবর্ণমেণ্টও দেশীয় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা ত করেন-ই নাই, বরং অনেক স্থলেই তাহার প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহার ফলে দুই দুইটি পৃথিবী-আলোড়নকারী মহাযুদ্ধের পরেও আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য কোনও রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন পর্য্যন্ত গড়িয়া ওঠে নাই। বিলাত ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির সহিত শিল্পনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং ঐ সম্মিলিত নীতির একমাত্র লক্ষ্য—কিরূপে দেশীয় শিল্পের প্রগতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব-সাধারণের তথা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নততর করিয়া তোলা যায়। ঐ সব দেশের শিল্পবিজ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলিও জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে সতত যত্নবান। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া এমন সব সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিতেছেন যাহাতে তাঁহাদের স্বদেশবাসীর জীবনযাত্রার মানদণ্ড উৎকর্ষ লাভ করে। মানবসেবার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত গবেষকগণের কেহ বা দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক আবিষ্কারে, কেহ বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকর কার্য্যে, কেহ বা জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণায় তন্ময় হইয়া আছেন। তাঁহাদের চরিত্রের একটি অতি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা কখনো তাঁহাদের উপরওয়ালার সন্তোষ বিধানের জন্যই গবেষণা করেন না, তাঁহারা কাজের আনন্দেই কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাই। কি করিয়া কর্তৃপক্ষকে খুসী করা যাইবে—আমাদের গবেষকগণের ইহাই একমাত্র চিন্তা এবং এজন্য তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাদের অনুসন্ধান-লব্ধ তিলকে তাল বলিয়া প্রচার করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সাধকগণের মধ্যেও এইরূপ মনোবৃত্তি প্রায়শঃ অল্পাধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিকগণের মধ্যেও ঐ মনোভাব সংক্রামিত হইয়াছে। সকলেরই এক চিন্তা—কিসে অল্প কাজে অধিকমাত্রায় বাহাদুরি লইয়া প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। বলা বাহুল্য, এইরূপ মনোবৃত্তি দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ঐ সব দেশে গবর্ণমেণ্ট রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধান করেন, রিসার্চ প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেন এবং শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে জন-সাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে পরস্পর নিবিড় এবং আন্তরিক যোগ থাকায়

ফলে প্রত্যেকটি বিভাগই উপযুক্তভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ পাইয়া থাকে।

আমাদের দেশীয় শিল্প যে উন্নত হইতে পারে নাই—শিল্প বিষয়ে গবর্ণমেন্টের উদাসীনতাই তাহার অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে সকলেই অবহিত আছেন। এমন কি, গত যুদ্ধকালীন দুই একটি উদাহরণেও আমার এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বুঝা যাইবে। বিলাত এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত বেনজিনের উপর কোনও শুল্ক ধরা হয় না এবং সেইজন্য ওদেশে বেনজিন যারপরনাই সস্তাদরে পাওয়া যায়; ফলে বেনজিন থেকে তৈরী ক্লোরোবেনজিন ও কার্বলিক অ্যাসিডের দামও খুব সস্তা। অনেকেই জানেন এই পদার্থগুলি ডিডিটি এবং ফিনোল প্লাষ্টিক্‌স্‌এর অন্যতম উপাদান। সুতরাং উঁহারা যে অতি সস্তায় ডিডিটি ইত্যাদি তৈরী করিয়া নিজেদের চাহিদা মিটাইয়া পৃথিবীর, বিশেষতঃ এশিয়ার বাজার একচেটিয়া করিয়া লইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তারপর যুদ্ধের মধ্যে বিলাতে আমদানি গন্ধকের উপর মাশুল খরচা, যুদ্ধকালীন ইন্‌সিওরেন্স প্রভৃতির দরুণ খরচা ধরায় গন্ধকের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়। কিন্তু সে দেশের শিল্প-সংরক্ষণশীল সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত খরচা নিজে বহন করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যুদ্ধপূর্বকালীন দরে গন্ধক সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে যুদ্ধের সময়েও ওদেশের সালফিউরিক অ্যাসিড ও তাহা হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন পদার্থ, বিশেষতঃ দেশে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে অপরিহার্য্য অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রভৃতি সারের দাম আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা বিপরীত ব্যবহারই লাভ করিয়াছি। বিলাতের সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানায় তাঁরা যে দরে গন্ধক পাইতেন আমাদিগকে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দরে গন্ধক কিনিতে হইয়াছে।

আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সমব্যবসায়ীদিগের প্রতি খুব হৃদ্যতাসূচক ব্যবহার প্রায়ই করেন না। দেশের শিল্প বিস্তারে তাঁহাদেরও যে যথেষ্ট হাত এবং দায়িত্ব আছে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকগণও আবার কোন দিনই সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন হন নাই। শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিভাবান্ গবেষকেরা নীরবে তাঁহাদের নির্দিষ্ট কাজ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা কখনও তলাইয়া দেখেন নাই যে দেশকে শিল্পমুখীন এবং শিল্পপ্রধান করিয়া তোলার গুরুকর্তব্য সম্পাদনে কারখানায় হাতে কলমে অর্জিত তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। দেশের ও জাতির চরম দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আজ যাঁহারা ভারতবর্ষের শিল্প সংগঠনে মুখপাত্র হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই শিল্পবিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিলমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। বিলাত ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে করখানার বৈজ্ঞানিকগণের সমিতি হইতেই কার্য্যতঃ দেশের শিল্পসংক্রান্ত নীতির প্রবর্তন, পরিবর্তন ও পরিচালনা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও অগোণে এরূপ সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য্য। এরূপ সমিতি যে কারখানার বৈজ্ঞানিকগণের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের জন্যই প্রয়োজন তাহা নহে; বরং দেশের সত্যকার উন্নতির জন্যও এরূপ সমিতির সার্থকতা বিদ্যমান। আমরা রাসায়নিক শিল্পের প্রতিনিধিরূপে আমেরিকার যেখানেই গিয়াছি সেখানেই আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি। আমেরিকার লোকদের মুখে শুনিলাম—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পরেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকগণকে তাঁহারা সম্মান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই সব বৈজ্ঞানিকও তাঁহাদের চরিত্র এবং কার্য্যাবলীর গুণে ঐরূপ সম্মানের যথার্থ অধিকারী। আমাদের কারখানায় বৈজ্ঞানিকগণকে আরও উচ্চস্তরের কর্মধারা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইহাতে তাঁহারা যে শুধু নিজেরাই লাভবান হইবেন তাহা নহে, পরন্তু তাঁহাদের 'অবনত' মাতৃভূমির মুখও ইহাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। দেশের গুরুভারপ্রাপ্ত নির্দ্দিষ্ট কোন ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ বোর্ড দেশীয় কোনও ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সমিতিকে মানিয়া না লওয়ার মনোভাব শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির পথে প্রভূত অন্তরায় ঘটাইয়াছে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শিল্পজাত সামগ্রীর এবং কাঁচামালের আমদানি রপ্তানির সুবিধার উপর দেশের শিল্পবিস্তার ও তাহার উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। অনেকেই জানেন, বিদেশ হইতে আগত শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের করাচি, বম্বে, কলম্বো, মাদ্রাজ, কলিকাতা বা রেঙ্গুন যে কোন

বন্দরেই আসুক, ভাড়া সর্ব্বত্রই এক। ইহাতে বিদেশী-মালের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ অনেক সুলভ হয়। কারণ, কলিকাতার কোনও কারখানার মাল বিদেশী মালের সঙ্গে সমগুণবিশিষ্ট হইলেও উহা যখন বম্বে বা করাচিতে পাঠান হয়, তখন পথে এত ভাড়া পড়িয়া যায় যে তাহাতে বিদেশী মালের সঙ্গে উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা শক্ত হইয়া পড়ে। উপযুক্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা এই কু-প্রথার নিরসন না হইলে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির এই অসুবিধা দূর হইবে না।

রেলওয়ের ভাড়া সম্বন্ধেও অনেক গলদ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কোনও মালের কলিকাতা হইতে বম্বে পর্য্যন্ত যে ভাড়া, কলিকাতা হইতে বম্বের আগের ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাহার ভাড়া অনেক বেশী। সেইরূপ বম্বে হইতে কলিকাতার যে ভাড়া—বম্বে হইতে হুগলি বা বর্ধমান পর্য্যন্ত ঐ মালের ভাড়া অনেক বেশী। রেলওয়ের এই নীতির মূলে রহিয়াছে বিদেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রদান। উল্লিখিত কারণে দেশের কাঁচামাল চালান দেওয়া বা বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রী এদেশের বড় বড় বাজারে ঢালিয়া দিবার ইহাই মস্ত একটা কৌশল। সুতরাং রেলওয়ের এই নীতির আশু পরিবর্তন সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

রেলওয়ের যে অ-সরল নীতির উল্লেখ করা হইল, একটু অনুধাবন করিলেই তাহার মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সামরিক এবং রাজনীতিক উদ্দেশ্য লইয়াই ভারতবর্ষের রেলপথের প্রবর্তন ও প্রসার আরম্ভ হয় এবং বৃটিশ বাণিজ্যনীতি ইহার পরিচালনে বরাবর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেশীয় বাণিজ্যনীতির সহিত ইহার যে কোনও সম্বন্ধ আছে তাহাও কেহ ভাবে নাই। বিলাত এবং আমেরিকায় রেলপথের প্রবর্তন এবং তাহার ভাড়া প্রভৃতি এমনভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যাহাতে দেশের শিল্পসম্ভার সর্বত্র বিস্তারলাভের প্রকৃষ্ট সুযোগ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হয়। ভাড়া নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য ও মালপত্রের নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছিবার নিমিত্ত দেশের সর্বত্র একই গেজের রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সর্বতোভাবে বিধেয়।

আমাদের অনেক সময় বলা হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা বাজার থেকে ভারতীয় শিল্পের কাঁচামাল বা যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা হউক। এই স্তোক-বাক্য ভারতীয় শিল্পের পক্ষে নিতান্তই নিরর্থক, যতদিন না সস্তায় এই মালগুলি ভারতীয় কারখানায় পৌছানর ব্যবস্থা হয়। সবচেয়ে সস্তায় কেনা মালের উপরেও যখন ইচ্ছামত ভাড়া এবং ইনসিওরেন্সের শুল্ক ধার্য্য হয় এবং এই শুল্কের বা ভাড়ার হারের হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা যতদিন আমাদের হাতের মধ্যে না আসে ততদিন ঐ সস্তার কোনও মানেই হইবে না। এই কারণেই আমাদের নিজেদের নৌবহর সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যথা-সম্ভব রেলওয়ে সাইডিংএর ধারে বা কোনও সামুদ্রিক বন্দরের সান্নিধ্যে স্থাপন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান যুগের রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ঔষধাদির বেলায় আমরা এ যাবৎ কোনও মৌলিকত্ব দেখাইতে পারি নাই বলিয়া অনেকেই আমাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। কথাটি সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আমরা মৌলিকত্বের অধিকারী হইতে পারি না। আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শী যে সকল গবেষক কর্মরত আছেন তাঁহারা উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলে বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির উপযুক্ত প্রতিষেধকের আবিষ্কার করিতে পারেন তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের কেমিষ্টরা কোনও নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিলে প্রাণীর উপর পরীক্ষা ব্যতীত হাসপাতালের রোগীদের উপরে তাহার রীতিমত পরীক্ষা করান আবশ্যক। বিলাত ও আমেরিকায় হাসপাতালের অবারিত সাহায্য ও সুবিধা পাওয়া যায় বলিয়া কোনও নূতন ঔষধ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের শরীরে তাহার কিরূপ ফলাফলের সম্ভাবনা তাহা অবিলম্বে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে হাসপাতালের প্রকৃষ্ট সুযোগ দিবার ব্যবস্থা না হইলে এক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফল আশা করা সুদূরপরাহত। এরূপ সুবিধার অভাব বশতই আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের রাসায়নিকগণ সাধারণতঃ অন্যান্য দেশের প্রচলিত ও পরীক্ষিত ঔষধের যে গুলির পেটেণ্টের বাধা নাই সেগুলির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বা অনেকটা কাছাকাছি নাম দিয়া সাফল্যের সহিত প্রস্তুত

করিয়া বাজারে দিতেছেন। নূতন ঔষধ আবিষ্কারের পথে আর একটি অন্তরায়ও বিদ্যমান। দেশীয় চিকিৎসকগণ সমানগুণসম্পন্ন ঔষধ পাইলেও আজকাল সাধারণতঃ বিদেশী ঔষধের প্রতি সমধিক পক্ষপাত দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং ভারতবর্ষে প্রস্তুত নূতন ঔষধের প্রতি তাঁহাদের কিরূপ মনোভাব হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আশা করি, দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিকিৎসকগণেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইবে। সুদক্ষ রাসায়নিক, জীবদেহে ঔষধের পরীক্ষাকারী বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে সহানুভূতি ও পরস্পর নিবিড় সৌহার্দ্যের সৃষ্টি না হইলে উল্লিখিত বিষয়ে উন্নতির আশা অল্প।

আমেরিকাতে দেখিলাম 'Food & Drug' 'খাদ্য ও ঔষধ বিভাগ' অনুমোদন না করিলে কোনও ঔষধ বা পথ্য বাজারে চালু হইতে পারে না। আর আমাদের দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, জন-স্বাস্থ্য বিভাগ বিখ্যাত ঔষধ-প্রস্তুতকারী কাহাকেও কুইনিন দিতেছেন না—ফলে এই সব কারখানায় কুইনিন দ্বারা প্রস্তুত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বহুদিনের জনপ্রিয় ঔষধ আর তৈরী হইতেছে না। এই সুযোগে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা জনপ্রিয় ঔষধের কাছাকাছি নাম দিয়া ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বিনা বাধায় বাজারে ছাড়িতেছে। ইহাতে জনস্বাস্থ্য কি ভাবে রক্ষা পাইতেছে তাহা জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও জনসাধারণ ভাবিয়া দেখিবেন।

সুপ্রতিষ্ঠিত ঔষধপ্রস্তুতের কারখানাসমূহ বহুদিন যাবৎ ঔষধের গুণ রক্ষণ সম্বন্ধে আইন প্রচলন করার আন্দোলন করিতেছে এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় ইহা ১৯৪০ সালে গ্রহণও করা হইয়াছে। কিন্তু সরকার তাহা কার্য্যকরী করিতে এখনও সমর্থ হন নাই। পক্ষান্তরে, সরকারের বৈদেশিক কর্মচারিগণ কেবলই প্রচার করিয়া বেড়ান—দেশীয় ঔষধ ভাল নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণাগারে এবং এই যুদ্ধের সময় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেশীয় ঔষধ বিদেশাগত ঔষধ হইতে খারাপ ত নয়ই, বরং সদ্যপ্রস্তুত বলিয়া ইহার গুণাবলী অনেকাংশেই ভাল।

আমাদের দেশে বর্তমান কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী লোকের অভাব অত্যন্ত বেশী। রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ইহাতে বড় বেশী বাধা পড়াইতেছে। বিলাত ও আমেরিকার রাসায়নিক কারখানা দেখিলে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা বলিয়া মনে হয়। দেশে কেমিক্যাল কনষ্ট্রাকসন্ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেমিক্যাল কার-খানায় আবশ্যক যন্ত্রাদি তৈরীর সুব্যবস্থা না হইলে রাসায়নিক শিল্পে আশানুরূপ উন্নতিলাভ আমাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। কারণ, বিদেশ হইতে আমদানী যন্ত্রপাতিতে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না। দেশের কাঁচামাল ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুযায়ী যন্ত্রাদির অবয়ব ও গঠন প্রণালী নিরূপিত না হইলে কার্য্যক্ষেত্রে অশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রীর কথাও চিন্তা করা দরকার। যাহারা কলে কাজ করিবে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের সহিত প্রতিষ্ঠানের লাভালাভ সাক্ষাৎভাবে জড়িত। আমাদের দেশের লোকের দারিদ্র্য তাহাদের কর্মক্ষমতা হ্রাসের একটি প্রধান কারণ। আবার কর্মক্ষমতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকেরও অল্পতা-প্রযুক্ত দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় শিল্পপতিগণের সহানুভূতিসম্পন্ন দূরদৃষ্টি দ্বারা জনসাধারণের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির উপায় স্থির করিতে না পারিলে দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা।

আমাদের 'ভিত' রাসায়নিক শিল্পগুলির (basic chemical industries) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা এস্থলে প্রয়োজন মনে করি। দ্বিতীয় মহাসমরের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, পৃথিবীর রসায়নশিল্পের কেন্দ্র আটলাণ্টিক মহাসাগরের এপার হইতে ওপারে গিয়া পড়িয়াছে এবং যে দেশে গিয়া পড়িয়াছে সে দেশের লোকের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যেরও সীমা পরিসীমা নাই। ফলে, সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্পন্ন এবং রাসায়নিক ও রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় অনুন্নত ক্ষুদ্র জাতিগুলির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখাই দায় হইয়া পড়িয়াছে। আজ পৃথিবীতে এমন জাতি প্রায় নাই বলিলেই চলে, যে জাতি আমেরিকার সঙ্গে রাসায়নিক শিল্পে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। এই নিদারুণ সত্য ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তাঁহারা

নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া এই সংকট হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন তাহা নির্ণয় করা একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যে কোনও বৃহদায়তন নূতন শিল্পে ব্রতী হইতে ইতস্ততঃ করা অস্বাভাবিক নয়। রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদম্য উদ্যমে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত বিরাটকায় রাসায়নিক-শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দেশকে শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ করিবার অন্য কোনও পথ নাই। এই পন্থা অবলম্বন করাতেই জাপানে এত দ্রুত শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। ক্যালসিয়ম কারবাইড্ শিল্প, কৃত্রিম রবার, রঞ্জন পদার্থ, পাথুরিয়া কয়লা হইতে পেট্রল প্রস্তুত, কৃত্রিম সার উৎপাদন প্রভৃতি প্রত্যেকটি রাসায়নিক শিল্প স্থাপনেই রাজসূয় যজ্ঞের মত অজস্র অর্থব্যয় প্রয়োজন; তদ্ভিন্ন উপযুক্ত যন্ত্রাদি আমদানি বা প্রস্তুত হইলেও তাহা পরিচালনার জন্য যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ-গণের সাময়িক সাহায্য গ্রহণও অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। এই সকল শিল্প স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকদিগকে উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সুদক্ষ করিয়া তুলিবার পর এবং উপযুক্ত সংরক্ষণনীতি প্রভৃতির সাহায্যে ঐ সব কারখানায় উৎপন্ন সামগ্রী যখন দরে ও গুণে বৈদেশিক দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে তখন গবর্ণমেণ্ট উহার পরিচালনার ভার উপযুক্ত দেশীয় শিল্পপতিগণের হস্তে ন্যস্ত করিবেন। রাসায়নিক শিল্পে পাশ্চাত্য দেশগুলি যেরূপ সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আধুনিক শিল্পে অনুন্নত কোনও দেশের পক্ষে দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এখন দেশের চিন্তাশীল ও জাতীয়তামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ প্রতিপত্তিশালী লোকদের প্রধান কর্ত্তব্য—তাঁহারা পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে অগৌণে বাধ্য করা। নতুবা আমাদের দরিদ্র দেশ বৈদেশিক পণ্যের চাপে ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া ভারত মহাসাগরের অতলে ডুবিয়া যাইবার পর চোখ খুলিলে কোনই লাভ হইবে না।

যতদিন না উল্লিখিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতেছে, ততদিন আমাদের দেশীয় রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান লক্ষ্য হইবে তাহাদের সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারের কেমিষ্টদের সাহায্যে তাঁহাদের চলতি মালগুলির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন করা এবং যে সব রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেই সব শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাদের সাধ্যমত আকারের নূতন নূতন শিল্পের সূত্রপাত ও তাহার বিকাশ সাধন করা। যে সকল উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পদার্থে ভারতবর্ষের একচেটিয়া অধিকার, সেগুলির রপ্তানি প্রায় বন্ধ করিয়া তাহা হইতে যথাসম্ভব বৃহদায়তনে এদেশেই পণ্যসম্ভার তৈরীর প্রবল প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে অবলম্বন করা কর্তব্য। অবশ্য এক্ষেত্রেও গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতিরেকে সাফল্য লাভ দুঃসাধ্য—তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্পোন্নতি তথা জনকল্যাণ-কল্পে গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

মহাসাগর

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ

বার বার তুমি তটের উপরে পড়,
গরজিয়া কভু, কভু বা মিনতি করি
প্রাণপণে বল, "সাড়া দাও, দাও সাড়া"
তীর নির্ব্বাক্, ফিরে যাও মর্ম্মরি।

কিসের আশায় চঞ্চল তব মন?
সে কোন্ অভাব—যাহা কভু মিটিল না?
কাহার লাগিয়া ক্রন্দন কর বৃথা?
কোন্ সুর শুনি দোলাও হাজারো ফণা?

কার তরে তব উত্তরোল উচ্ছ্বাস?
চাহ কাহাকেও—উর্ম্মিমালায় বাঁধো?
কোন্ সুদূরের আহ্বান শুনিয়াছ?
না পাওয়ায় দুঃখে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদো।

হে মহাসাগর! নহ শুধু বারি স্তূপ,
মানুষের হিয়া তোমাতে পেয়েছে রূপ।

চোর

শ্রীসন্তোষকুমার দে

সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগের গুরু দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। নানা প্রতিষ্ঠান হ'তে সময়ে অসময়ে আমরা—সংবাদপত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট লোকেরা, নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকি, তাই নিমন্ত্রণপত্র পাওয়াটা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন অফিসে এসে যে নিমন্ত্রণ পত্রখানি পেলাম তার মুদ্রণ-পারিপাট্য, গঠন-সৌষ্ঠব ও নিমন্ত্রণের আহ্বান মুহূর্তেই বুঝিয়ে দিলে এটি অসাধারণ, এমন নিমন্ত্রণ কালেভদ্রে মিলে। পত্রখানি নিয়ে এসেছিল একজন স্মার্ট স্যুট-পরা নবীন যুবক বললে—মিষ্টার মৈত্র বিশেষ করে বলেছেন—আপনাকে যেতেই হ'বে। পূর্বের সামান্য পরিচয় মনে পড়িল—নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে মিষ্টার মৈত্রের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। যদিও তিনি অন্যান্য সকল অতিথিদের যত্ন আপ্যায়ন করে বেড়াচ্ছিলেন, তবু তারই মধ্যে আমার দিকে যে তাঁর বিশেষ যত্ন প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে আমি স্বতই কুণ্ঠিত বোধ করছিলাম। সাহেবিখানা দু' একবার যে না খেয়েছি তা নয়, কিন্তু অদ্যকার আয়োজনটা এতই আড়ম্বরপূর্ণ ছিল যে আমি অভিভূত না হয়ে পারি নি। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অধিকাংশ সরকারি চাকুরে, শ্বেতচর্মও কয়েকজন আছেন। সুতরাং পার্টি বেশ জমে উঠেছিল।

সভা ভঙ্গের পর বিদায় নিবার সময় মিষ্টার মৈত্র আমাকে তাঁর নিজের গাড়ীতে তুলে নিলেন। যতক্ষণ সাথে সাথে থাকলেন তাঁর আলাপে ব্যবহারে তার আভিজাত্য, শিক্ষা ও সচ্ছলতার সহস্র পরিচয় পেলাম।

এই পরিচয় আমার পক্ষে আনন্দদায়ক হ'লেও কখনই রক্ষা করা চলেও না—যদি না তিনি নিজেই আমাকে আবার নানা উপলক্ষে তার গৃহে আমন্ত্রণ জানাতেন।

বিলাত-ফেরত এনজিনিয়ার, একটা বড় কারখানার মালিক, যুদ্ধের চাহিদা মিটিয়ে মোটা টাকা আয় করেছেন, এসব কথা জানতে বিলম্ব হল না। আমাকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর কারখানাও একদিন দেখিয়ে দিলেন। নিজে সাথে থেকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনলেন। আমি সোৎসাহে বললাম—আপনি কর্মবীর, ভারতকে আপনি মহিমাময় করে তুলবেন।

মিষ্টার মৈত্র হাসতে হাসতে বললেন, কথাটা কেবল মুখে না বলে কাগজের মারফতই বলুন না, দেশের লোকে কথাটা জানুক।

পূর্বেই বলেছি, আমি একটা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী দৈনিকের বিজ্ঞাপনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। সহকারী সম্পাদকদের ধরে একটা চমৎকার 'রাইট-আপ' লিখে মিষ্টার মৈত্রের ব্লক করে ছেপে দিতে বেগ পেতে হল না। যে দিন কাগজে তাঁর কথা বের হল সেই দিন বৈকালিক চা পানের নিমন্ত্রণ পেলাম তাঁর কাছ হতে, টেলিফোনে। যথা সময়ে গেলাম তাঁর বাড়ীতে। খুব আপ্যায়িত করে বসালেন। চা পানের পর বললেন—মিষ্টার দে (ঐটাই অধুনা ভদ্রভাষা, নাম ধরে আহ্বান করা রীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার) খুব তো কর্মবীর, ভারতের শিল্পাধিনায়ক, হেনো তেনো—বড় বড় কথা লিখেছেন আমার নামে। বস্তুত আমি তো ওসব কিছুই নই।

ভাবলাম কথাটা বিনয়ের, তাই বললাম—আপনি কি তা আমরা জানি, জানে দশজনে। সূর্যের পরিচয় নিজেই প্রকাশ পায়।

এবার মিষ্টার মৈত্র অন্তরঙ্গভাবে বললেন, ওটা আপনার স্নেহের কথা। আমি একটা কাজের কথা বলেছিলাম। ভাবছিলাম যুদ্ধতো চিরদিন থাকবে না, এখনি সময় থাকতে কিছু একটা ইনডাসট্রি যদি গড়ে তুলতে না পারি, তবে আর কবে করবো। এখন লোকের হাতে টাকাও প্রচুর, আর ওয়ার-সাপ্লাই দিলে কোম্পানীর দাঁড়াতে দুবৎসরও লাগবে না। কি বলেন, প্রজেক্টটা কেমন মনে হয়?

সম্পূর্ণ সমর্থন করলাম তাঁর পরিকল্পনা। ভারতকে যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'লে স্বাধীন ভারতেরও দৈন্য দশা ঘুচবে না। যন্ত্রপাতির বড় কারখানা মিষ্টার মৈত্রের মত বিশেষজ্ঞের হাতে হওয়া দরকার।

যথাসময়ে কোম্পানী রেজিষ্ট্রি করে তার কাগজপত্র মিষ্টার মৈত্র আমাকে দেখিয়ে বললেন, এবার সব আপনার কাজ। আপনার সহায়তা ভিন্ন কিন্তু এক পা-ও আর এগুবে না।

কী যে বলেন, এবার আমি বিনয় প্রকাশ করলুম। আমার হাত দিয়ে কাগজে মাসে চারবার অর্দ্ধ পৃষ্ঠা করে বিজ্ঞাপন বের হ'ল। তার কমিশনের মোটা টাকাটায় বড় মেয়েটির বিবাহের গহনা হ'তে পারবে হিসাব করে আমিও মনে মনে খুসী হয়ে উঠলাম। আমার ডিরেক্ট বিজিনেস্, এতে আর ছ্যাচড়া বিজ্ঞাপনের দালালদের ভাগ দিতে হবে না।

বিজ্ঞাপনের ফল ফলল, হুড় হুড় করে শেয়ার বিক্রি হতে লাগল। ইতিমধ্যে মিষ্টার মৈত্র দিল্লী যেয়ে যথাসময়ে তৈল সিঞ্চন করে কোম্পানীর মূলধন বিশগুণ বৃদ্ধি করবার অনুমতি নিয়ে এলেন। বিরাট আড়ম্বরের সাথে কোম্পানীর কাজ সুরু হল।

বলা বাহুল্য নূতন কোম্পানীর সাথে আমার দহরম-মহরমটা বেশী মাত্রাতেই ছিল। মিষ্টার মৈত্র আমার দ্বারা বোধ হয় উপকৃত হয়েছিলেন, তাই যখনই যেতাম খুব খাতির করতেন।

কথাটা বাইরের লোকের পক্ষেও জানা কিছু অসম্ভব নয়। একদিন সেই সুবাদেই একজন বৃদ্ধ ও তার বালক পুত্র আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁর কথা প্রথমে আমার অসহ্য মনে হ'ল, তবু পরছিদ্রান্বেসন্ধান বোধ হয় মানুষের স্বভাব, তাই সকল কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তিনি বললেন, মিষ্টার মৈত্র বিলাত-ফেরত এনজিনিয়ার বটে, কিন্তু তিনি কপর্দকশূন্য অবস্থায় কলকাতায় এসেছিলেন। বৃদ্ধ রাধেশবাবু তাঁকে তাঁর কারখানায় চাকরী দেন। অল্পদিন পরেই যুদ্ধ বাধল, তখন মিষ্টার মৈত্র যুদ্ধের কাজে চলে যাওয়ার হুমকি দেখিয়ে রাধেশবাবুর কাছ হ'তে একটা পাকা লেখাপড়া করে কারখানার ভার নেন। রাধেশ বাবু বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হ'লেও বৃদ্ধ হয়েছেন, সকল কাজ পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, পুত্রটিও নাবালক। ফলে অচিরাৎ মিষ্টার মৈত্রই কারখানার মালিক সেজে সরকারি অর্ডার ধরে মোটা টাকা পিটতে লাগলেন। রাধেশবাবুকে প্রথমে মাসে মাসে চার পাঁচ শত টাকা করে দিতেন, শেষ পর্যন্ত তা-ও বন্ধ করেন। লেখাপড়ার সর্ত অনুযায়ী কারখানার ভাড়া বাবদই মাসিক হাজার টাকা হিসাবে চার বছরে আটচল্লিশ হাজার টাকা বাকী, এ বাদে রাধেশবাবুর অনেক কাঁচা মাল গুদামে ছিল তাও মিষ্টার মৈত্র নিয়ে মাল তৈরীতে ব্যবহার করছেন তার দাম দেন নি। তারও দাম পঞ্চাশ হাজারের কম হ'বে না।

বললাম, চার বছর চুপ করে থাকলেন কেন? একদিনে সেতো আপনাকে ঠকায় নি।

বৃদ্ধ ওষ্ঠে তালুতে একটা হতাশা ব্যঞ্জক শব্দ করে বললেন—সে অনেক কথা প্রাণতোষবাবু। আপনি যখন এতটা শুনলেন, আরও না হয় শুনুন। আমি বিপত্নীক। আমার স্ত্রী যখন মারা যান তখন এই ছেলে ছোট, তার উপরে আমার একমাত্র কন্যা। আমিই এদের মানুষ করেছি, সত্যি বলতে কি সংসারের দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে যেয়ে কারখানার কাজে আমার অনেক গাফিলতি হয়েছিল। তাই যখন ও ছেলেটি এসে কারখানার ভার নিলে, আমি রেহাই পেলাম। কাজ কর্মও বেশই চালাচ্ছিল। আমার বাড়ীতেও সে ছেলের মতই ঘোরা-ফেরা করত। বুঝতেই পারেন, মনে অনেক আশা করেছিলাম, আজ বুঝছি সেটা অন্যায় হয়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল, মৃণাল—আপনাদের মিষ্টার মৈত্রের নাম মৃণাল মৈত্র, আমার পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসন সহজেই অধিকার করবে। কিন্তু ভুল বুঝেছিলাম। ওদের চোখে বিলাতি নেশা, বাঙ্গালী মেয়ে বোধ হয় চোখে লাগে নি।

আমি রাধেশবাবুর কি সহায়তা করতে পারি বুঝতে পারলাম না। তবু সান্ত্বনার সুরে বললাম, আপনার ছেলেকে আর আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আপনার কন্যাও নিশ্চয় সুশ্রী হবেন। তবে মিষ্টার মৈত্র এমন করছেন কেন?

রাধেশবাবু দুঃখের হাসি হেসে বললেন—আপনি কেন, শতকরা নিরনব্বই জন বাঙ্গালী আমার মেয়েকে দেখে সুন্দরীই বলবে সে কথা আমি জানি। কিন্তু ওই তো বললাম, ওদের চোখে বিলাতী নেশা। মিস্ ডরোথি নাকে একজন মেয়েকে মৃণাল ভালোবাসে শুনতে পাচ্ছি।

আরও কদর্য কাণ্ড কি করেছে জানেন? এই নূতন

কোম্পানীর কারখানায় নিয়ে এসেছে সব আমারই কারিগর, আমারই মেসিন, লেদ, মোটর—রাতারাতি। এ সর্বনাশের কি প্রতিবিধান করা উচিত তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা। আপনি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেনেই আপনার কাছে এসেছি, যদি দুইকুল রক্ষার কোন উপায় করতে পারেন। নতুবা কেস আমাকে করতেই হবে। এ বৃদ্ধ বয়সে মামলায় হেরে যদি ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে যেয়ে দাঁড়াই, তবু এ মামলা আমাকে করতে হবে। ন্যায়ধর্ম আমার দিকে, দেখি কী হয়।

মিষ্টার মৈত্রকে আমি বলে বুঝিয়ে দেখব আশ্বাস দিয়ে বৃদ্ধকে বিদায় দিতে হ'ল। তিন দিন পরে তিনি সাক্ষাৎ করবেন বলে গেলেন। তিনি চলে গেলে আমি সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম। ক্রমে রাধেশবাবুকে ছেড়ে চিন্তাটা আমার নিজের উপর এসে পড়ল। মিষ্টার মৈত্র কি আমার মাথাতেও কাটাল ভেঙ্গে কোষ খান্ না কি? বিজ্ঞাপনের দরুণ একটি পয়সা আজ পর্য্যন্ত আদায় হয়নি। বিল সরকার যেয়ে বকুনি খেয়ে আসে। পার্সনাল বিজিনেস বলে টাকা আদায়ের ভার আমিই নিয়েছিলাম। টাকা চাইবার আগেই একটা সোনার সিগারেট কেস্ উপহার। দশহাজার টাকার উপরে বিল্, একটি পয়সা পাইনি। একদিন তো হাসতে হাসতে বলেই ফেল্লেন, আরে মশাই লিমিটেড কোম্পানীর টাকা, ও অমন একটু আধটু দেরিতে আদায় হয়েই থাকে। যদি ম্যানেজিং ডিরেক্টার কিছু বলে, আমায় বলবেন এবং একদিন তাকে গুছু ফিরপো-তে ডিনার খাইয়ে দেব।

অবশ্য আমরা মনে মনে একটা বিচার করেছিলাম। ভারতকে স্বাধীন করে তুলতে যে যন্ত্রশিল্প প্রয়োজন তারই মহৎ উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত এই নূতন কোম্পানীকে দাঁড় করবার সহায়তা করতে বিলের টাকাটা দু'দিন না হয় দেরী করেই নেব। তাতে আর আমাদের কাগজ উঠে যাবে না। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম এক নূতন ফ্যাসাদ বাধিয়েছি। একাউন্ট্যান্টকে ধোঁকা দিয়ে এই বিলগুলির জন্য আমার প্রাপ্য কমিশনের টাকাটা পর্যন্ত আমি পকেটস্থ করে ফেলেছি, তার কিছুটা খরচ পর্যন্ত হয়ে গেছে! ব্যাপারটা যতদিন পারি চাপা দিয়ে রাখাই নিরাপদ, জানাজানি হলেই নিন্দুকেরা হাততালি দেবে। আর জানি তো মানুষের নিন্দুক আর শত্রুর অভাব নেই।

রাধেশবাবুকে কিন্তু মিষ্টার মৈত্রের নিন্দুক বলে মনে হ'ল না। তাই অফিস-ফেরতা গেলাম সেদিন মিষ্টার মৈত্রের কাছে। যেয়ে দেখি অফিসে সে এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার। মিষ্টার মৈত্র খুব চোখ রাঙ্গিয়ে একজন শ্রমিককে গালাগালি দিচ্ছেন, তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছেন। আমি যেতেই মিষ্টার মৈত্র শ্রমিকটিকে ছেড়ে আমাকে ধরে বলা সুরু করলেন, দেখুন ছোটলোকের সাহস, বলে বাড়ীতে অসুখ, তাই টাকা দেখে লোভ সামলাতে পারেনি।

মিষ্টার মৈত্রের তিরস্কার গর্জন, আর শ্রমিকটির আনুনাষিক ক্রন্দনের মধ্য হ'তে যে কাহিনী আবিষ্কার করলাম তা হ'ল এই যে, মিষ্টার মৈত্র বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বাথরুমে ঢুকেছিলেন, টেবিলে দশখানা দশটাকার নোট রেখেছিলেন। শ্রমিকটি কারখানার একজন ওস্তাদ ফিটার, কি দরকারী কথা বলতে মিষ্টার মৈত্রের চেম্বারে ঢুকে তাঁকে না পেয়ে দশখানা নোটের চাপা তুলে মাত্র দুইখানা নোট নিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় মিষ্টার মৈত্র এসে ধরে ফেলেছেন। হৈ চৈ শুনে অনেক লোক জড় হয়েছে। শ্রমিকটি কাঁদতে কাঁদতে বলছে—স্যার, রাধেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি পঁচিশ বছর তাঁর কাছে কাটিয়েছি, কোনদিন কিছু ঘটেনি। আজ এসেছিলাম আপনার কাছে কিছু ধার চাইতে। বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র সবাই অসুস্থ, অর্থাভাবে চিকিৎসা হয় না। সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা আমার মা আজ তিনদিন হ'ল সিঁড়ি হ'তে পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছেন। ডাক্তার বলেছে এক্সরে করাতে হ'বে, কিন্তু টাকার অভাবে তাও হয়ে ওঠেনি। তাই আপনার টাকা হ'তে মাত্র দু'খানি নোট নিয়েছিলাম, হপ্তা পেলে আবার এমনি গোপনেই রেখে যেতাম—চুরির মতলব থাকলে তো সব টাকাই নিতে পারতাম।

আমার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর কি!—হুমকি দিয়ে উঠে মিষ্টার মৈত্র ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন—আমি কোন কথা শুনতে চাইনে, ওকে থানায় নিয়ে যান। চোর যে, তার সাজা পাওয়াই উচিত।

অচিরাৎ আদেশ পালিত হ'ল।

আমি বাধা দিতে পর্যন্ত পারলুম না, কেমন কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগল। চোর যে তার সাজা পাওয়াই উচিত। মিষ্টার মৈত্র কি ঠিক কথাই বলেছেন? সমাজ কি সকল চোরকে সাজা দেয়, না দিতে পারে। সাজা পায় যারা গরিব। দু দশ টাকা যারা চুরি করে। যারা হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা চুরি করে—তারা সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তি, তাদের বাড়ী গাড়ী ফোন ফ্যান সব কিছুই হয়—আদর সম্মান প্রতিপত্তি সব কিছুই তো তাদের জন্যে; ওই শ্রমিকটি যদি ফিরে এসে বলে, তুমি মিষ্টার মৈত্র, আমার মনিব রাধেশবাবুর আটচল্লিশ হাজার টাকা ভাড়াবাবদ চুরি করেছ। কাঁচা মাল চুরি করেছ পঞ্চাশ হাজার টাকার, চলো থানায়···কি ফল হবে? মানহানির মামলা করাও তো সম্মানজনক ব্যাপার। মিষ্টার মৈত্র যদি ক্ষণিক উত্তেজনাবশে ওকে খুন করে ফেলেন তাতেও দোষ নেই, সমাজ ধর্ম ও আইন আদালত তাকে ক্ষমা করবে, কেননা যে ভাবেই হ'ক তিনি টাকা করেছেন।

খচ্ করে একটা টার্কিশ সিগারেট ধরিয়ে একগাল কড়া ধোঁয়া ছেড়ে মিষ্টার মৈত্র হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল্ হতে বসেছে। চলুন চলুন, পথেই কথা হবে; শশব্যস্ত হয়ে তিনি কোট পরে নিলেন; টাই টেনে ঠিক করে প্যাণ্টের ভাঁজটায় হাত বুলিয়ে জুতাটা শুদ্ধ পা সজোরে মেঝের কার্পেটে ঘা দিয়ে এক মুহূর্তে তিনি তৈরী হ'য়ে নিলেন। পথেই রাধেশবাবুর কথাটা বলব ভেবে আমিও তার সাথে বেরলাম।

অধুনা অনেক দিনই মিষ্টার মৈত্রের সাথে এমন সময় বেরিয়ে হোটেল যেতাম, সেখানেই চায়ের সাথে অন্য পানীয় অভ্যাস করছিলাম। আজ কিন্তু গাড়ী চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে ক্যালকাটা ক্লাব ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে ছুটল। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় চলেছেন?

মিষ্টার মৈত্র যেন ধ্যানভঙ্গ হয়ে ইহজগতে ফিরে এলেন, বল্লেন ডরোথির কাছে। ও, বলিনি বুঝি তার কথা আপনাকে, চলুন না আলাপ করে দেব। ইহুদি মেয়ে, কলকাতার সেরা সুন্দরী। চান তো আপনার ম্যানেজিং-ডিরেকটারকে একদিন নিয়ে আসবেন। সে আমার একার সম্পত্তি নয়, বিত্তলাভের উপায় মাত্র।

মোটরের চাকার পীচের রাস্তায় কোঁ কোঁ করে আওয়াজ উঠেচে, সোঁ করে গাড়ীটা একটা বাঁক ঘুরল।

আজাদ-হিন্দ-সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ভারতের অতি বড় দুর্ভাগ্য! ভারতবর্ষ যখন ন্যূনাধিক দুইশত বৎসরের অমোঘ-মোক্ষম Tata Steel নির্ম্মিত লৌহ নিগড় ভঙ্গ করিবার জন্য তনুমনঃধন উৎসর্গ করিয়াছে তখন আরও একটি রাজনৈতিক দলের দর্শন মিলিল। অহীরাবণের পুত্র মহীরাবণের মত, এই দল ভূমিষ্ঠ হইয়াই রণ রঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যে বৃটিশ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ফ্রিজিডিয়ার-রেফ্রিজারেটারে বাসি মাছ ও পচা মাংসের সঙ্গে তুলিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছে; যে বৃটিশ, কুরুরাজ দুর্য্যোধনের মত ভারতকে কোনদিন সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িয়া দিবে না শুনাইয়া দিয়াছে; যে বৃটিশ, ভারতবর্ষকে মহা আহবে লিপ্ত করিবার পূর্ব্বে একটি মুখের কথাতেও ভারতের মতামত জানিবার প্রয়োজন দেখে নাই, আইন গড়িয়া, বে-আইন রচনা করিয়া, বো-আইনের নাগপাশ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের জন, ভারতের ধন পরমানন্দে উৎসর্গ করিয়া দিতে বিন্দুমাত্র কালহরণ করে নাই। সদ্যঃভূমিষ্ঠ এই দল বৃটিশের যুদ্ধেরও নামকরণ করিল, জনযুদ্ধ। ভারতের জনগণকে বৃটিশকে সহায়তা দান করিতে আহ্বান দিল। বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ; ততোঽধিক বিচিত্র—বিচিত্রাধিক বিচিত্র এই ভারতের অধিবাসী। সেদিনের কথা মনে করিতেও হাসি আসে; লজ্জা হয়।

ট্রামে কিম্বা বাসে ডাম্ব-ক্যাট্‌লবৎ চলিতেছি—আর মা-কালীকে জোড়া পাঁঠা (যদি পাওয়া যায়, তবেই দিব) মানত করিয়া বলিতেছি হে·মা, মড়ক করো, কলকাতা কিছু হাল্কা হোক, নহিলে আর ত পারি না: অকস্মাৎ রুক্ষ কেশ, শুষ্ক আনন মলিন বসন [illegible]! [illegible] গুঁতাইয়া, কাহাকেও হাতাইয়া, কাহাকেও বা লাথাইয়া, [illegible] মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া, হঠাৎ—বিনামেঘে [illegible] ডাক—"জাপানীদের রুখ্‌তে হবে" তৈলবিরল-

শুষ্ক কেশ মুহূর্ত্তে খাড়া হইয়া উঠিল ; বিরস আননে অনল জ্বলিয়া উঠিল, *অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; নবেন্দ্রিয় যেন এক মুহূর্ত্তে কুইক্ মার্চ্চ* সুরু করিয়া দিল—"জাপানীদের রুখতে হবে।" আচম্বিতে মনে হইত, বুঝি বা জাপানী বোম্বেটেরা উল্টাডিঙ্গির ক্যানাল পার হইয়া টালার পুলে চড়াও হইয়াছে, আর রক্ষা নাই ! একমাত্র উপায়—"জাপানীদের রুখতে হবে।" যখন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে, পৈতৃক প্রাণ করতলে পুরিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছি যে কি উপায়ে রুখিব—কামড়াইব—না, আঁচড়াইব—না হাওয়ায় ঘুঁষি ছুঁড়িয়াই বা মাথা ফাটাইব (মাথা যদি জাপানী খেলনার মত হয়, তাহা হইলে আমার ঘুঁষিতেও ফাটিতে পারে !) যোদ্ধ্বর্গের প্রস্থান। প্রস্থান না বলিয়া অন্তর্দ্ধান বলিলেই ভাল হয়। অবসর নাই, বড় তাড়া, "জাপানীদের রুখতে হবে !" আবার কাহাকেও গুঁতাইয়া, কাহাকেও হাতাইয়া, কাহাকেও কুনাইয়া, কাহাকেও লাথাইয়া টালার পুল কিম্বা শ্যামবাজারের চৌমাথার উদ্দেশে ছুটিতে হইল। আমরা মা-কালীর নিকট অন্ত আরজি পেশ করিলাম, হে মা, রুখতে পারি আর নাই পারি, বাড়ী গিয়ে দরজা বন্ধ করতে পারি যেন !

ভাল হোক মন্দ হোক ভারতের সংস্কার আছে, এখানে গাঁটছড়া একবার বাঁধা পড়িলে আর তাহা ছিন্ন হয় না। বাসা বদল, বসন বদল, পাদুকা বদলের মত পতি বা পত্নী বদলের রীতি বা নীতি আজও প্রতীচীতে জলচল হয় নাই। গুরু ভাল, শিষ্যও মেধাবী, গুরুদত্ত বিদ্যা অর্জ্জনে আগ্রহ দুর্নিবার থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দুইশত বর্ষকাল মধ্যে ভারতবাসী পত্যন্তর বা দারান্তর গ্রহণে গুরু ইয়োরোপের মত নৈপুণ্য আজও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ভারতে বৃটিশের পতিত্বের অবসান ঘটাইতে ভারতবর্ষ বদ্ধপরিকর ; কিন্তু পত্যন্তর গ্রহণের বিন্দুমাত্র বাসনা তাহার নাই। বৈধব্যে বিরুচি তাহার কোনদিনই ছিল না, আজও নাই, একাদশীর উপবাসে তাহার অভ্যাস আছে। ভারতের শিরোভূষণ তুষারকিরীটিনী হিমাচলের ন্যায় ভারত নারীর বৈধব্যও বহু পুরাতন। বৃটিশকে "কুইট-ইণ্ডিয়া" করিতে বলিয়া, বেলফুলের মালা হস্তে পীতবরণ (?) বনমালী জাপানীকে সুস্বাগতম্ করিতে চাহিবে ভারতবর্ষের জীবিত নরনারীদিগের মধ্যে সে স্বৈরাচারেচ্ছা কেহ পোষণ করিত বলিয়া শুনা যায় নাই। তবু যে শূন্যে, বায়ুপৃষ্ঠে কীল চড় ঘুঁষি গাঁট্টা হাঁকড়াইয়া জাপানীদের রুখিবার দরকার হইয়াছিল, ইহাই ত যথেষ্ট বিস্ময় ; তাহার উপরে আবার জনযুদ্ধের রাক্ষা। রুশকি লড়াই হাম্রুকি লড়াই ! রুশকি লড়াই হামকি লড়াই ধুয়ায় কাণমাথা ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল। বিজ্ঞ লোকে বলে, অভিসারিকার প্রেম নিকষিত হেম, যেন এ-সি কারেন্ট—ছোঁয়াচ লাগিবামাত্র মরণং ধ্রুব। সাম্যবাদী রাশিয়ার নবীন প্রেমে ডগমগ তনুমনঃ কমিউনিষ্টগণ দেশকে হেঁচকা টানে খানিকটা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল বৈকি ! কমিউনিষ্ট কি সত্যই ভাবিয়াছিল, মার্জ্জারের মৎসে, শার্দ্দুলের মাংসে, যুবজনের যৌনরসে অরুচি হইয়াছে ? বৃটিশ তাহার সাম্রাজ্যলিপ্সা বিসর্জ্জন দিয়াছে ? মার্জ্জার মেছুয়াবাজারের বাসা ছাড়িয়া দিয়াছে ? ব্যাঘ্র মহোদয় নররক্ত ও নরমাংস উপেক্ষা করতঃ তপোবন পর্ব্বতকন্দরে বৃক্ষ বন্দনায় রত হইয়াছে ? যুবক যুবতীগণ চন্দ্রমাশালিনী মধু যামিনীতে বকুলের তলে বসিয়া (বা শুইয়া) "হরিনাম *বিনে আর কি ধন আছে সংসারে" গাহিতেছে ? সত্য সত্যই কি কমিউনিষ্ট ভায়ারা এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিল ? কে জানে বাপু ; আমি ত বুঝি না !*

সে সময়ে যে পৃথিবীময় ভ্রান্তিবিলাসের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল ইহাই বা অস্বীকার করিবে কে ? আমেরিকার রাষ্ট্রধর রুজভেল্ট (তাঁহার আত্মার সদ্গতি হোক !) জোর গলায় ফোর ফ্রিডাম্—চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার গাহনা গাহিতেছেন ; তাঁহার মামাতো ভ্রাতা (অনেকে বলে, মাসতুতো) চার্চ্চিল অতলান্তিক মহাসাগরবক্ষে জাহাজে বসিয়া অতলান্তিক সনদে সাদা কালিতে স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া পৃথিবীকে অভাব হইতে, পীড়ন হইতে, ভয় হইতে, শোষণের কবল হইতে নির্ব্বিচারে মুক্তি দিবার অভয় বাণী শুনাইতেছেন ; যুদ্ধের অবসানে এই পচা পুরাতন প্রৌঢ় পৃথিবীতে নূতন স্বর্গ, নূতন মর্ত্ত্য রচিবার আশ্বাসে আশ্বাসে ধরিত্রীর রসনা রসসিক্ত করিয়া তুলিতেছেন। লোকের ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু কুলটার পবিত্র পাতিব্রত্যের মত, পরম ধার্ম্মিক বকের ধর্ম্মাচরণের মত, বৃটিশের শোষণ-বিতৃষ্ণার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহাদের ভ্রান্তি হইবার নহে, তাহারাই একদিকে 'কুইট-ইণ্ডিয়া" ও অন্যত্র "দিল্লী-চলো" করিয়াছিল। অহীরাবণের পুত্র মহীরাবণ তাহাতে বড়ই রাগ করিয়াছিল। বিশ্বের মুক্তি প্রদাতা, বিশ্ববাসীর স্বাধীনতা বিধাতা বৃটিশের জীবন-মরণ যুদ্ধের সময়ে যাহারা বৃটিশকে কুইট-ইণ্ডিয়া করিতে বলে, মহীরাবণ গালি দিয়া তাহাদের ভূত ভাগাইয়া দিয়াছিল। আর দিল্লী-অভিযাত্রীগণ তাহাদের নিকট মিরজাফর, কুইসলিং, পঞ্চমবাহিনীর গৌরব অর্জ্জন করিল। বিচিত্র-দেশ আমাদের ভারতবর্ষ ; ততোঽধিক বিচিত্র তাহার সর্ব্বংসহা প্রকৃতি ! পচা পুকুরের পঙ্কও তাতে কিন্তু ভারতের সহিষ্ণুতার অন্ত নাই। আজও তাই মহীরাবণ মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছে।

কিন্তু একটা কথা আমরা ভাবিয়া পাই না। ভারতীয় কমিউনিষ্টরা কি আজও রাশিয়ার প্রেমের স্বপ্নে মশগুলচিত্ত ? উচাটনহিয়া ? ঘুমঘোর—দিবাস্বপ্ন, কি এখনও ভাঙ্গে নাই ? যুদ্ধের সময়ে বিচ্ছিন্ন বোতাম পেন্টালুনের রসি কসিতে কসিতে যে-বৃটিশ ব্রহ্মদেশ পরিহরি বিপদভঞ্জন মধুসূদন যীশুখৃষ্টের শতনাম আবৃত্তি করিতে করিতে সিমলা শৈলে আসিয়া পিতৃদত্ত প্রাণ ও দুইশত বৎসরের দুর্জ্জয় মান রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন এবং দিনে অদিনে, ক্ষণে অক্ষণে, সময়ে অসময়ে স্বাধীনতার স্বর্ণবাণী শুনাইয়া ব্রহ্মবাসীকে ভবিষ্যতের সুখসায়রের সুখ তরঙ্গে নাগর দোলার দোল দিতেছিলেন, আমেরিকার দৌলতে যুদ্ধজয়ের পরে, সেই ব্রহ্মদেশে শুভ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সে কি বীরপণা ! সে শৌর্য্য, সে বীর্য্য দেখিয়া ব্রহ্মবাসী অহরহ তারকব্রহ্মসনাতন নাম স্মরণ না করিয়া পারিতেছে না। শুধু ব্রহ্মদেশই বা কেন, ইন্দোনেশিয়ায় দেখ, জাপানী বোম্বেটে যেদিন হানা দিয়াছিল, বৎস ডচ কোন্ কচু বনে ঢুকিয়া অমূল্য জীবন রক্ষা করিল ; আর যেমন যুদ্ধ শেষ হইল, অমনি কচুরায়ের সিংহাসনারোহণের মত জাভায় আসিয়া সিংহপরাক্রম দেখে কে ? ইন্দোচীনে দেখ, বীরবর ফরাসী 'যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব' করিয়া ফ্রেঞ্চ লীপ্—চম্পট্ পরিপাটি করিতে এক লহমা বিলম্ব করে নাই, যুদ্ধান্তে খাস মহলে ফিরিয়া

আনামাইটের হাতে মাথা কাটিতেছে। আর সকলের মূলে—তলে তলে—জনযুদ্ধওয়ালাদের পরম মিত্র বৃটিশ, বেয়োনেট বাগাইয়া বলিতেছে, ছিঃ ঝগড়াঝাঁটি কি করিতে আছে? পরস্বাপহরণ মহাপাপ। যাহার যাহা ছিল, তাহাই তাহার থাক্! মহাজনের মহাবাক্য শুনিয়াও যাহারা পরস্বাপহরণজনিত মহাপাপে রত বা লিপ্ত হইবে বৃটিশ তাহাকে নিহত বা নিরস্ত করিবে। যেহেতু, গীতা বলেন—

পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

বৃটিশই দুষ্কৃতবিনাশ সাধুজনের পরিত্রাণ ও ধর্ম্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে ও দেশে দেশে সম্ভব হইতেছেন। কিন্তু আমি ভাবি কি, ইহাতেও যদি ভ্রান্তি নিরসন না হয় তাহা হইলে ভ্রান্তিতেও সন্দেহ জাগে না কি? আর যদি ভুল বুঝিয়া থাকে—ভুল কাহার না হয়?—মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। পৃথিবীর পরিত্রাতা পরম-পিতা যীশুপুত্র ইংরাজও বলিয়াছেন, টু আর ইজ হিউম্যান্! অর্থাৎ কি-না ভুল মানুষেরই হয়, গরু ভেড়ার হয় না। মহীরাবণগণ ভ্রম ও ত্রুটী স্বীকার করে না কেন?

'কুইট ইণ্ডিয়া' ব্যর্থ, দিল্লী যাত্রাও বিফল হইয়াছে, জার্ম্মেনী গতাসু—জাপান বিগতপ্রাণ—ভি, ফর ভিক্‌ট্রি (ভ্যানিশ নহে!); তথাপি বৃটিশ ভারতের সহিত বুঝাপড়া করিতে চাহে কেন? গরজ বড় বালাই। গরজে গোয়ালা ঢেলা বহে। বৃটিশ ভারতবাসীকে 'তু' ডাক দিয়া বিলাতে না লইয়া গিয়া নিজেরাই ভারতে আসিয়া বুঝাপড়া করিতে গলদঘর্ম্ম হইতেছে। কেন গা? ভারতবর্ষ সাবালক হইয়াছে; আর তাহাকে বেত্র-অগ্রে দণ্ডায়মান রাখা শোভন ও সঙ্গত হয় না? প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে—তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হয়। ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবির পার্লিয়ামেণ্ট সৌধাভ্যন্তরে, হাউস অফ কমন্সের সভায় মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রধান মন্ত্রী এ্যাট্‌লি যেদিন এই শুভ সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেদিন (বোধ হয়) স্বর্গে দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিয়াছিলেন; অপ্সরী-কিন্নরী পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল; আর আমেরিকা ধন্য ধন্য করিয়াছিল; বৃটিশের বুটলেহীর দল রবি ঠাকুরের কবিতা রিসাইট্‌ করিয়া গগন ফাটাইয়া ফেলিয়াছিল।

"ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী! চরণপদ্মে নমস্কার"

কিন্তু ভারতবাসী জানে, তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভালই জানে, কৃপণের বাড়ীর কলার; না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই। কিন্তু সে কথা যাক্; অথবা সে কথা এখন থাক্। আমি আজাদ-হিন্দ-সরকারের কথা বলিতেছি, সেই কথাই বলি।

একদিনের জন্য হৌক, অথবা এক সপ্তাহের জন্য হৌক, কিম্বা এক মাস বা এক বৎসরের জন্য হৌক, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার যিনি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহার সাধনা বিফল এবং বিফলতার হিমালয়-প্রমাণ হইলেও, ভারতবাসীর আজাদী আকাঙ্খানলে সে যে পূর্ণমাত্রায় ঘৃতাহুতি দিয়া গিয়াছে, বৃটিশ যদ্যপি তাহা না বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে বৃটিশের রাজনৈতিক বুদ্ধির ভাণ্ডারে গোময়াতিরিক্ত পদার্থ আছে বলিয়া মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে।

১৯৪২ সালের আগে পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একটা নিরুপদ্রব আন্দোলনের মধ্যেই পর্য্যবসিত ছিল। বিমুখ ও বিরূপ বৃটিশের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে মান অভিমানের পালা গাহিয়াই আমরা চলিতেছিলাম। বৃটিশের নানা অজুহাত (দুরাত্মার অজুহাতের অভাব হয় না!) নানা অছিলা, নানা বায়নাক্কা—বৃটিশ দিবে না, আমরাও ছাড়িব না। যাহারা আন্দোলন করিয়াছে, তাহাদিগকে কারাগারে পুরিয়াছে, ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, নির্য্যাতন, নিপীড়ন—সম্ভব ও অসম্ভব, সঙ্গত ও অসঙ্গত, সভ্যতাসম্মত ও অসভ্য এবং বর্ব্বরোচিত আচরণও যে করে নাই এমনও নহে, প্রতিবাদে কারাগারে আরও জনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; লাঠি বরণ করিতে আরও লোক, গোলাগুলির মুখে বুক পাতিতে কাতারে কাতারে আরও অনেক নরনারী আগাইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস মূকের মুখে ভাষা, দুর্ব্বলের বুকে বল, ভীরুকে সাহস, কাপুরুষকে নির্ভীক করিয়া ভারতবর্ষকে বহুদূর—বহু দূরপথে লইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ না থাকিলেও ১৯৪২ পরবর্ত্তীকালের 'করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের' তুলনায় সে সমস্তই নিষ্প্রভ ও অনুল্লেখ্য হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া ভারতবাসী অনন্ত দুঃখ, অশেষ কষ্ট বরণ করিয়াছে, গৃহ সংসার অতলে ভাসাইয়াছে, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বন্দুকের গুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, হাসিমুখে, গান গাহিতে গাহিতে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, তবু স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতার রূপ, স্পর্শ, গন্ধ কিরূপ, স্বাধীনতার স্বাদ কেমন, স্বাধীনতার বাতাস মলয়ানিলের মত মিষ্ট মধুর কি-না এ সকলের সহিত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোন পরিচয়ই তাহার ছিল না। এই ভারতবর্ষ তাহার দেশ, তাহার জন্মভূমি, তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি, এই মাটি তাহার মা-টি, ভারতবর্ষ তাহার, সে'ও ভারতবর্ষের—কিন্তু তাহার দেশে তাহার অধিকার নাই, কর্তৃত্ব নাই, তাহার জন্মভূমি-মাতৃভূমিতে সে যেন প্রবাসী, পরদেশবাসী, তাহার মা-টিকে মা বলিয়া ডাকিবার, মাতৃরূপা জননীকে পূজার বেদীতে বসাইয়া পূজা করিবার স্বাধীনতাটুকুও তাহার নাই। মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে অপরাধ হয়, মা'র রূপগুণের স্তব রচনা করিলে রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইতে হয়। তাহার দেশ অন্যে শাসন করে, শোষণ করে। পরের দয়াদত্ত কণামাত্র পাইয়াই তাহাকে তুষ্ট থাকিতে হয়। সে চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক সে নহে। স্বগৃহে তাহার অদৃষ্টে মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা—এ দুঃখ বড় দুঃখ। এ বৈষম্য মর্ম্মান্তিক বৈষম্য। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল কংগ্রেস এই বৈষম্য দূর করিবার বিধিমত চেষ্টা করিলেও ভারতবাসী তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই; স্বাধীনতার নন্দনকাননের পারিজাত সৌরভ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই। নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে; ক্ষণকাল স্বল্পকালের জন্য হইলেও স্বাধীনতার সৌরভ, স্বাধীনতার আস্বাদ অনুভব করিয়া ভারতবাসী ক্ষণকালের তরেও স্বল্পকালের জন্যও ধন্য হইয়াছে।

একি কম গর্ব্বের কথা যে ভারতবর্ষের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ইংলণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিয়াছিল? একি অল্প গৌরবের কথা যে ভারতবাসী বিদেশীর সম্পর্ক

ছেদন করিয়া বিদেশীর সংশ্রব রহিত করিয়া, বিদেশীর ক্ষমতার বিলোপ সাধন ঘটাইয়া বিদেশীর রাজ্যে স্বকীয় শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছি? মণিপুরে তাহার পতাকা, ইম্ফলে তাহার পতাকা, কোহিমায় তাহার পতাকা, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তাহার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পতপত শব্দে উড্ডীন থাকিয়া বিশ্বসভায় ভারতের গৌরব, ভারতের মর্য্যাদা প্রচারিত করিল। আজ মনে পড়ে বিজয়সিংহের পতাকা একদিন ভারতের বাহিরেও উড়িয়াছিল। আজ মনে পড়ে ভারতবর্ষ সুদূর চীনেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সে সকলই কাহিনীমাত্র; অতীতের সুখস্বপ্ন। তবে ভারতের সান্ত্বনা ও বৈশিষ্ট্য যে ভারত তাহার অতীতকে বর্ত্তমানের মতই শ্রদ্ধা করিতে জানে।

জার্ম্মেনী, ইতালী, জাপান প্রভৃতি অক্ষ-শক্তি যেদিন পৃথিবীর ত্রাস ছিল, দুর্জ্জয় ও অপরাজেয় জাতি বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইদিনও, তাহারাও, ভারতের এই অস্থায়ী—আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়াছে, তাহার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, এই স্থূল ও প্রত্যক্ষ সত্য পৃথিবীর ইতিহাস কি অস্বীকার করিতে পারিবে? ইতিহাস মিথ্যার বেসাতী তাহা জানি, কিন্তু জাগ্রত ভারতের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া মিথ্যার প্রচার আজিকার দিনে, তত সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের লাটপ্রাসাদে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িতেই আমরা দেখিয়াছি। ভারতের নগরে নগরে বৃটিশের বেণে মসলার দোকান, এমন কি, শৌণ্ডিকালয়ও ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়াইয়া ভারতবাসীকে তাহার অসহায়তায়, অযোগ্যতায় ব্যঙ্গ করিয়াছে, উপহাস করিয়াছে। আমাদের মন, আমাদের নয়নও এমনই অভ্যস্ত, এমনই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল যে ইউনিয়ন জ্যাককে সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণব প্রণিপাত করিতেও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরে একদিন আসিয়াছে যেদিন, আমাদের দেশে, আমরা কোন কোনদিন আমাদের পতাকা উত্তোলন করিয়াছি; পতাকার তলে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য অঞ্জলি ভরিয়া দিয়াছি। ইংরাজ ইহা দেখিয়াছে। দেখিয়া হাসিয়াছে, খেলাঘরের খেলাবোধে উপহাস করিয়াছে। আবার যেদিন খুসী হইয়াছে, সেদিনই আমাদের সেই পতাকা ছিঁড়িয়াছে, পদতলে দলিত করিয়াছে। রূঢ় আঘাতে, নিষ্ঠুর অভিভাবকের মত আমাদের খেলাঘরের খেলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বস্ত্রখণ্ডের মানরক্ষায় কত নর নারী প্রাণ দিয়াছে। শক্তিমদমত্ত বৃটিশ ফিরিয়াও দেখে নাই। মাথায় বৃটিশের লাঠি পড়িয়াছে, তথাপি পতাকা হস্তচ্যুত করে নাই; বন্দুকের গুলিতে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, শিথিলমুঠি পতাকাখানি পরিত্যাগ করে নাই! ভারতের ঐতিহ্যের ইহাই ছিল চূড়ান্ত নিদর্শন।

তারপর একদিন আসিল যেদিন আমার সেই পতাকাখানি—ভারতের স্বাধীনতা-সাধনার পবিত্র প্রতীক সেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত চরকাঙ্কিত পতাকাখানি—স্বাধীন ভূখণ্ডে, স্বাধীন জনপদে স্বাধীন বায়ুভরে স্বেচ্ছান্দোলিত হইয়াছে শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে চোখে জল আসিয়া পড়িল। গর্ব্বে, আনন্দে, গৌরবে উল্লাসে শ্রাবণের ধারা বহিল। মনে হইল, স্বপ্ন। নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দেখিলাম, স্বপ্ন নহে, সত্য। তখন মনে হইল, মরি না কেন! স্বাধীনতা সূর্য্যের রশ্মিটুকু থাকিতে থাকিতে, স্বাধীনতার সমীরণটুকু বহিতে বহিতে এ ছার নশ্বর জীবন ভার নমিত করি না কেন। আবার চোখের জলে বুক ভাসিল; বুঝি বা উল্লাসের চাপে হৃদয়ের স্পন্দন শুব্ধ হইল। হায় রে! তবু তুমি আমি সে দৃশ্য চোখে দেখি নাই! স্বাধীন আকাশে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন পতাকা স্বাধীন বাতাসে কোলাকুলি করিতে যাহারা দেখিয়াছে, যাহারা সেই পতাকা অভিবাদন করিয়াছে, আজ এতদিন পরে, এতদূর দেশে বসিয়া তাহাদের গৌরবপরিপূরিত স্ফীত বক্ষের পরিপূর্ণ অনুভূতির কণামাত্রও কি আমরা অনুভব করিতে পারি? হয় ত পারি; হয় ত পারি না। তা যদি না'ও পারি, তাহাতেই বা কি আসে যায়? আমার দেশে, আমার ভারতবর্ষ তীর্থপ্রত্যাগতের পাদ বন্দনার যে রীতি ছিল, আজিকার ভারতবর্ষে, অতীতগৌরবে গৌরবান্বিত ভারত তাহারই পদাঙ্কানুসরণে আজাদ হিন্দ্ সরকারের পাইক পদাতিকেরও পাদ বন্দনা করিয়া ধন্য হইতে চাহিতেছে।

বন্দে মাতরম্।

জয় হিন্দ্।

ভুলো না আমায়

ভাস্কর

(জার্মান হইতে)

ফুটেছে সবুজ মাঠের মাঝে
সুন্দর ছোট ফুলটি,
তেমনি নীল তেমনি উজল
আকাশের মত, চোখটি।

বেশি কথা সে বলিতে জানে না,
শুধু সে জানাতে চায়
চিরদিন ধরি একটি কথা
শুধু—ভুলো না আমায়।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

৭

মশালের আলোকে দেখিলাম যে ভূগর্ভস্থ এই প্রশস্ত গুপ্তপথের ভিত্তি, ছাদ ও তলদেশ মর্ম্মরাচ্ছাদিত। মর্ম্মর সাধারণতঃ এ প্রদেশে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহা নর্ম্মদাতীর হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। এই গুপ্তপথে চারিজন পরস্পরের পার্শ্বে একত্রে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। গর্ভগৃহে বায়ুগমনাগমনের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা আছে এই গুপ্তপথেও সেই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। অনেকগুলি নাতিক্ষুদ্র নল এই পথের ভিত্তির তলদেশ ও উপরিভাগ হইতে গর্ভগৃহের দিকে গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এইগুলিরও মুখ সংঘারামের প্রাচীর শিখরে উন্মুক্ত বায়ুতে যুক্ত।

আমরা মশাল হস্তে সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হইলাম। আমাদের মশালের আলোক শ্বেত মর্ম্মরে প্রতিফলিত হইয়া সেই সুড়ঙ্গ পথের বহুদূর অবধি আলোকিত হইয়াছিল। এই শতধারায় বিচ্ছুরিত আলোক পরিমার্জ্জিত মর্ম্মরে বহুবর্ণের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব শোভার সৃজন করিয়াছিল। সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ বাহিয়া আমরা চলিলাম। কতক্ষণ পরে আমরা এই পথের অপর প্রান্তে উপনীত হইলাম। এ প্রান্তেও একটি লৌহকীলক আছে। পূর্ব্বের ন্যায় মহাস্থবির ইহার সাহায্যে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। দেখিলাম যে অপর দিকের ন্যায় এদিকেও একটি গর্ভগৃহ আছে।

এই গর্ভগৃহও দেখিলাম অনেকগুলি রত্নাধারে সুসজ্জিত এবং বায়ু চলাচলের জন্য এখানেও ঠিক সেই একই প্রকার ব্যবস্থা আছে। আমরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া রত্নাধারগুলির দিকে অগ্রসর হইলাম। এ গৃহেও পঞ্চবিংশটি রত্নাধার আছে—সকলগুলিই সুবর্ণ দিনারে পরিপূর্ণ এবং সকলগুলিই অভ্যন্তরস্থ ধনরত্নসহ পঁচিশ জন বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধর্ম্ম, সংঘ ও সাধারণ জনসমাজের কল্যাণকল্পে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত হইয়াছে। মহাস্থবির এই সকল বহুদিনসঞ্চিত ও বহুজনপ্রদত্ত ধনরাশি আমাকে দেখাইলেন এবং বলিলেন—

"এই সকল সঞ্চিত ধনরাশি জাতি, সংঘ, ধর্ম্ম ও জনসাধারণের মঙ্গলকল্পে তোমার অনুজ্ঞামত ব্যয়িত হইবে। আজ আমি এই সকল তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। দেখিও যেন ইহাদের সদ্ব্যয় হয়।"

—আর্য্য, আমি ত শপত করিয়াছি। কিন্তু এই সকল সঞ্চিত ধনরাশির ব্যয়ব্যবস্থাবিধানের জন্য আপনার উপদেশ ব্যতীত আমি অগ্রসর হইতে অক্ষম। আপনি আমাকে পথ দেখাইবেন—আপনি আমাকে শিক্ষা ও উপদেশ দিবেন—আপনার উপদেশ, শিক্ষা ও আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি কর্ত্তব্যপালনে ব্যাপৃত থাকিব।

এই গর্ভগৃহ হইতে একটি সোপান শ্রেণী উপরে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা এই সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরের দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বের ন্যায় কীলক সাহায্যে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। আমরা একটি নাতিক্ষুদ্র চৈত্যগৃহে একটি চৈত্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মহাস্থবির গর্ভগৃহে অবতরণপথের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আমরা চৈত্যগৃহ হইতে বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে দাঁড়াইয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় একবার চারিদিক দেখিয়া স্থানটা ঠিক করিয়া লইলাম। এ স্থানে পূর্ব্বে অনেকবার আসিয়াছি, এই চৈত্যগৃহও অনেকবার দেখিয়াছি। কখনও কখনও পৌর্ণমাসী রজনীতে দুই-একজন শ্রমণ, ভিক্ষু ও স্থবির এই চৈত্যগৃহে দীপ জ্বালাইতেন—ধূপ-ধুনা পোড়াইতেন—তবে এখানে বহু জনসমাগম কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এই দেবায়তন হইতে বাহিরে আসিয়া মহাস্থবির আমাকে সঙ্গে লইয়া অনতিদূরে একটি ঘন নিবিড় বনভূমির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা অপেক্ষাকৃত একটি মুক্ত ও প্রশস্ত স্থানে উপনীত হইলাম। স্থানটি বড় মনোরম বলিয়া মনে হইল। ইহা চতুর্দ্দিকে বনবৃক্ষরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ইহার এক প্রান্তে একটি প্রাচীন সুবৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ কালের ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য দিতেছে। মহাস্থবির দাঁড়াইলেন এবং আমাকেও দাঁড়াইতে বলিলেন। আমি দাঁড়াইলাম।

মহাস্থবির উত্তরীয়ের অভ্যন্তর হইতে একটি ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বংশী বাহির করিয়া তিন বার বাজাইলেন। ঐ বংশীর তীব্র, উচ্চ শব্দ শাণিত ছুরিকার মত বনানীর সেই নিশীথনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বহুদূরে গিয়াছিল। বংশীর শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অরণ্যবেষ্টিত প্রান্তরে জনসমাগম দৃষ্ট হইল। বহুসংখ্যক সশস্ত্র যুবক আসিয়া আমাদিগকে—মহাস্থবিরকে এবং আমাকে—বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। আমরাও প্রত্যভিবাদন করিলাম। এই অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন যাবনিক রীতিতে হইয়াছিল। সম্মুখে চারিজন উন্মুক্ত অসি হস্তে দাঁড়াইলেন এবং পশ্চাতে আর সকলে

বৃত্তাকারে চক্রব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাদের হস্তে শূলও কটিতটে বন্ধনীতে আবদ্ধ কোষবদ্ধ কৃপাণ উরুদেশে বিলম্বিত। মহাস্থবির বলিলেন,—

"এই যে শতসংখ্যক যুবক দেখিতেছ ইঁহারা সকলেই আমাদের অভিনব আর্ত্তত্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত। জনসাধারণকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ করা ইহাদের ব্রত। অত্যাচারী সবলের কবল হইতে নিরীহ দুর্ব্বলকে মুক্ত করাই এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য। এই অভিনব বাহিনীর অন্ত হইতে তুমি অধিনায়ক হইলে; ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই হয়ত তোমার পরিচিত ও বন্ধু। এস আমরা এই নবগঠিত বাহিনী পরীক্ষা করি। সম্মুখে যে এই চারিজন উন্মুক্ত অসি হস্তে দণ্ডায়মান, ইঁহারা এই বাহিনীর নায়ক।"

মহাস্থবির যথার্থই বলিয়াছেন এই বাহিনীর প্রায় সকলেই আমার পরিচিত এবং জনকয়েক আমার বিশিষ্ট বন্ধু। চারিজন নায়কের মধ্যে একজন আমার সোদরোপম প্রজ্ঞাবর্দ্ধন ও অপর একজন ব্রাহ্মণ সৌমিত্র ভট্টের পুত্র, আমার বাল্যবন্ধু, শেখর। প্রজ্ঞা ও শেখর প্রীতিপূর্ণ নেত্রে আমার প্রতি চাহিল, আমিও স্মিতনয়নে তাহাদিগকে প্রত্যভিনন্দিত করিলাম।

মহাস্থবির ও আমি বাহিনী পরীক্ষণ শেষ করিয়া ব্যূহকেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম। মহাস্থবির একবার বংশীধ্বনি করিলেন। নিমেষের মধ্যে সকলেই বনের ঘনান্ধকারে মিলাইয়া গেল।

আমরাও বন হইতে বাহিরে আসিলাম এবং পূর্ব্বের চৈত্যের সম্মুখে উপনীত হইলাম। দেবায়তন হইতে নদীতট অবধি একটি প্রশস্ত পথ আছে। আমরা এই পথ ধরিয়া নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কপিশা আজ জ্যোৎস্নামণ্ডিতা হইয়া সালঙ্কারা অভিসারিকার ন্যায় মৃদুমন্থরগমনে যেন প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। এ অভিসারের শেষ নাই। কোন সুদূর অজ্ঞাত বাসরের দিকে তার এই অনন্ত অভিযান। কোন এক অজ্ঞাত শুভক্ষণে মিলনবাসরে তাহার প্রিয়তমের বক্ষে তাহার চিরঈপ্সিত শয়ন রচনা করিবে, এই আশায় যেন সে কূলে কূলে পূর্ণা হইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। এই অভিসারে—এই অনন্ত অভিযানে—আছে কেবল অসীম আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত লালসা—তাহার বোধ হয় কখনও অবসান নাই—শেষ নাই। এ পিপাসায় বোধ হয় তৃপ্তি নাই।—ইহাই কি *সুখ*?—এই তৃপ্তিহীন পিপাসা—এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—এই মরীচিকার পশ্চাতে অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় চিরদিন ছুটাছুটি করাই যদি সুখ হয়, তবে দুঃখ যে কি তাহা ত বুঝিতে পারি না।—অথবা, তৃপ্তির সহিত সব ফুরাইয়া যায় বলিয়াই লালসাকে আমরা বড় করিয়া দেখি।—কারণ, তাহা আশাপূর্ণ।—তৃপ্তি বর্ত্তমান—লালসা ভবিষ্যৎ। অদূরে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী কপিশাকে চুম্বন করিয়া এক বিশালকায় সুপ্ত দৈত্যের ন্যায় দিগন্ত অবধি দেহ প্রসারিত করিয়া পড়িয়া আছে।

আমরা নদীতীরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির বিমল উৎসব উপভোগ দেখিলাম যেন কে বসিয়া আছে। এই মানবমূর্ত্তি শৈলাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল ও ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটে আসিলে বুঝিলাম যে ইহা স্ত্রীমূর্ত্তি। আরও কাছে আসিলে দেখিলাম যে এই নারীমূর্ত্তির পরিধানে গৈরিকবাস, আলুলায়িত রুক্ষ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে, স্কন্ধে ও বক্ষের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—বায়ুতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে,—উড়িতেছে; দূরসংলগ্ন দৃষ্টি, অসম্ভ্রস্ত, স্থির, শান্ত ও উদার।

মহাস্থবির তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে? মা, বনদেবী? এ সময়ে এখানে কেন মা?"

বনদেবী হাসিলেন, বলিলেন—

"আমার আবার সময়-অসময়, স্থান-অস্থান?"

তাহার পর কিছুক্ষণ নিরবে থাকিয়া বনদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আজ একটা তোমাদের কি উৎসব হইয়া গেল, স্থবির?"

—আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, আমাদের সে উৎসবের কথা ত তুমি জান, মা!

—সে উৎসব নয়—আমি বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবের কথা বলিতেছি না।—আজ তোমাদের রাজার অভিষেক হইল না?

মহাস্থবির একটু চমকিত হইলেন। সে ভাব সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি করিয়া জানিলে, মা?"

—কি করিয়া জানিলাম?—আশ্চর্য্য হইলে?—আমি অনেক কথা জানি।

পরে আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"এই যে রাজা! তুমিই রাজা নও কি? তুমিই পারিবে—গড়িতে না পার, ভাঙ্গিতে তুমি পারিবে।—এমন করিয়া ভাঙ্গিবে যে ধুলা রাশি ভিন্ন যেন তাহার আর কোনও চিহ্ন না থাকে। আর একটা বিষয় মনে রাখিও—সেটা রমণী।—নারীকে সর্ব্বদা দূরে রাখিও। সকল প্রমাদের মূলে নারী। তবে ভাঙ্গিবার জন্য তাহার সহায়তা আবশ্যক। ভাঙ্গিবার জন্য তাহার সাহায্য লইবে; তাহার পর তাহাকে গলিত ও ছিন্ন বিনামার মত দূরে ফেলিয়া দিবে। তারপর গড়িবার চেষ্টা করিবে—মনে রাখিও, দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটি অমৃতপদ গড়িবার সোপান।—কিন্তু গড়িতে তুমি পারিবে না।—তুমি ভাঙ্গিবে—চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, সাম্রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সব ধূলির সহিত মিশাইয়া দিবে, তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না।"

তাহার পর কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন "কিন্তু তোমার আকাশে মেঘ উঠিবে—তোমার সকল আকাশ ছাইয়া ফেলিবে। দিবসে সূর্য্য থাকিবে না—রাত্রে জ্যোৎস্না থাকিবে না—চন্দ্রমা থাকিবে না—গ্রহনক্ষত্র থাকিবে না—থাকিবে কেবল অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার—আর তাহার মধ্যে থাকিবে বিদ্যুৎ, বজ্র ও ঝঞ্ঝা—সব ওলট-পালট হইয়া যাইবে—সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া

আমরা স্তম্ভিত হইয়া বনদেবীর কথা শুনিতেছিলাম। তাঁহার কথায় এবং তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টির মধ্যে আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম,—আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম,—এরূপ অন্তর্দশী দৃষ্টি,—নয়নের এরূপ অলৌকিক জ্যোতি,—এরূপ মুগ্ধ করিবার শক্তি আর কখনও কাহারও দেখি নাই,—আমার সকল বাহ্যজ্ঞান এক শ্রবণে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি নিরব হইলেন, কিন্তু তখনও যেন তাঁহার কথাগুলির প্রতিধ্বনি এক অপূর্ব্বশ্রুত ও অলৌকিক সঙ্গীতের সুরলহরীর মত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছিল—আমার মনের অন্তরতম স্থলে যেন ছুটাছুটি করিতেছিল,—আমার দেহের সকল তন্ত্রীগুলি যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতেছিল। যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন দেখিলাম যে বনদেবী চলিয়া গিয়াছেন। মহাস্থবির যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

"মা চলিয়া গিয়াছেন !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি কে ?"

মহাস্থবির বলিলেন, "উনি সন্ন্যাসিনী। চল সংঘারামে ফিরিয়া যাই !" মহাস্থবির যেন একটা অস্বস্তির স্পর্শে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা নদীতীর অবলম্বন করিয়া বিহারাভিমুখে চলিলাম। অনতিদূরে, চৈত্যগৃহের নিকট হইতে, নারী কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছিল,—

তারে খুঁজে খুঁজে ফিরি
পাইনা দেখিতে,
আছে সে-যে মম অন্তরে,
তার অনিমেষ আঁখি
দেখিছে সতত,—
আমি শুধু ঘুরি আঁধারে।

আমরা দূরে চলিয়া গেলাম। ক্ষীণ রমণীকণ্ঠ নিশীথিনীর নিরবতায় মিশিয়া গেল।

মহাস্থবির বলিলেন "মা গাহিতেছেন"।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে সন্ন্যাসিনীসংবাদ নামক সপ্তম বিবৃতি।

আবার বর্ষশেষে ফাল্গুনের পূর্ণিমা আসিল। বসন্তের আজ পৌর্ণমাসীতে মদনোৎসব। এ উৎসবে যবন, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন, সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে যোগ দিয়া থাকেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ,—অর্হৎ ও শ্রমণগণ—কেবল ইহার বিরুদ্ধবাদী। তাঁহারাই কেবল এই উৎসব হইতে দূরে থাকেন এবং ইহাকে মারোৎসব নামে অভিহিত করেন। তবে গৃহীগণের পক্ষে তাঁহাদের এ সম্বন্ধে বিধি-নির্দ্দেশের তেমন কঠোরতা নাই। বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তনসময়ের কঠোরতা কালে শিথিল হইয়া পড়ে। শুনিয়াছি পূর্ব্বে মহারাজ প্রিয়দর্শী * প্রচার ও অনুশাসনের দ্বারা মিথ্যা ধর্ম্মের † নীতিবিরুদ্ধ ও নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানসমূহ নাকি নির্ম্মূল করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তখন কতটা তাহা সংসাধিত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বর্ত্তমানে সে প্রচেষ্টার সাফল্যের বিশেষ কোনও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন এই "মিথ্যা" ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনেকগুলি আনন্দোৎসব তাহাদের প্রাচীন সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সদ্ধর্ম্মী গৃহীগণের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।—আমরাও এই উৎসব সমূহে কখনও কখনও যোগ দিয়া থাকি—আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি—পরিচিত ও বন্ধু-বান্ধবদিগের সম্মেলনে ও আলাপে তৃপ্তিলাভ করি। স্থবিরগণ কখনও আমাদিগকে এই সকল আনন্দোৎসবে যোগদান হইতে বিরত করিবার জন্য কোনও প্রকার নিষেধ-বিধির প্রবর্ত্তন করেন নাই। আর সাধারণ মানুষ কি কেবল শীল ও চর্য্যা পালন করিয়া, ধর্ম্মনীতির কঠোর বিধি-নিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, ভোগবিলাসহীন নিরস জীবন কাটাইবে? তাহা কি সকল জন-সাধারণের পক্ষে সম্ভব? শুনিয়াছি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কোন পুরাণ-গ্রন্থে নাকি লিখিত আছে যে কে, একজন দেবতা অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষপান করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য তিনি নীলকণ্ঠ হইয়া ওই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা দেবতার কথা, কবির কল্পনার সৃষ্টিও হইতে পারে, তাহাও আবার বহু দেবতার মধ্যে একজন।

এই মদনোৎসবে বাহ্লিক-গন্ধারের যবনগণ সকলেই বিশেষভাবে যোগ দিত। এই সকল উৎসব লইয়াই ইহাদের ধর্ম্ম। জনসাধারণের সম্মেলনে এই সকল ধর্ম্মোৎসব সম্পাদিত হইত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মদনোৎসবে সম্মিলিত হইয়া যবনেরা তাহাদের মদনোৎসবের অনুষ্ঠান করিত।

ডিওনিসিঅস্ যাবনিক পানদেবতা। মদনোৎসবে তাঁহার গুণগান হইয়া থাকে। মদনোৎসবে ডিওনিসিঅসের অর্চ্চনা যবনদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ। তাঁহার মূর্ত্তিকে বেষ্টন ও প্রদক্ষিণ করিয়া আসবোন্মত্ত নরনারীগণ, বিশেষতঃ যবন-যবনীগণ, নৃত্য করে ও বসন্তের আবাহন গান গাহিয়া উৎসবানন্দ মুখরিত করে। সুরার স্রোত বহিয়া যায় নৃত্য, গীত, শোভাযাত্রা, জীবনের সকল ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতাই ডিওনিসিঅস্ উৎসবের অঙ্গীভূত। যবন যুবক-যুবতীগণ পশু ন্যায় সহজ ও স্বাধীনভাবে এই উৎসবের দিনগুলি কাটাইয়া দিয়া থাকে।

প্রজ্ঞাবর্দ্ধন ও আমি, সুশোভন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, উৎসবে শোভাযাত্রা দর্শনমানসে, নগরের প্রধান রাজপথে, সাধারণ জনসংঘের মধ্যে, দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যবনেরা মধুমাসকে "এলাফেবোলিওন্" বলে। এই মাসে বাহ্লিক-গন্ধার সাম্রাজ্যে যবনদিগের মদনোৎসব হইয়া থাকে। আমাদিগের ফাল্গুন পূর্ণিমায় এই উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। ঐ দিবস উৎসবে শেষ হইয়া থাকে। আমরা এই উৎসবান্ত সমারোহ ও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিবার উদ্দেশ্যে ও সেই আনন্দের একটা লহরী আমাদের মান প্রবাহের মধ্যে অনুভব করিতে, পথপ্রান্তে জনতার মধ্যে অপেক্ষা করি

* অশোক।

† বৌদ্ধগণ অপর ধর্ম্মকে "মিথ্যা দৃষ্টি" বা "মিথ্যা ধর্ম্ম" বলিয়া থাকেন।

রহিলাম। পথিপার্শ্বে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্ত মধ্যে মধ্যে বৃক্ষচ্ছায়াতলে যে সকল প্রস্তর বেদিকা আছে তন্মধ্যে একটি প্রজ্ঞাবর্দ্ধন ও আমি অধিকার করিয়া বসিলাম।—অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, যাবনিক বসন্তোৎসবের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্ত।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমবেত জনতার মধ্যে একটা কলকোলাহল উত্থিত হইল। আমরা বুঝিলাম যে শোভাযাত্রার হয়ত কোনও নিদর্শন দর্শকমণ্ডলীর নয়নগোচরীভূত হইয়াছে। আমরা উহা উত্তমরূপে দেখিবার জন্ত বেদিকার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথমে দেখিলাম পীত চীনাংশুক-পতাকাসমূহ বসন্তের ধীর সমীরণে আন্দোলিত হইতে হইতে আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা আমাদিগের নিকট আসিল। পথের দুই ধারে সারি দিয়া পীতকেতনবিশোভিত সুদীর্ঘ দণ্ড বহন করিয়া পতাকীর দল চলিল। ইহাদিগের মধ্যে আসিল একদল বংশীবাদক—তাহারা মৃদঙ্গের সহিত বাঁশীতে উৎসবের তরল মধুর উচ্ছাসকে মুখরিত করিয়া তুলিল। তাহাদের পর আসিল গায়ক-গায়িকার দল—তাহারা গাহিতেছিল বসন্তের আবাহন গীতি। ইহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া বাঁশী ও বীণার সহিত সুর মিলাইয়া এবং মৃদঙ্গের সহিত সঙ্গত কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছাসে উৎসবের আনন্দপ্রবাহকে উচ্ছল ও প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যে গান গাহিতেছিল তাহার সকল কথা আমার মনে নাই, কিন্তু যতটুকু শুনিয়াছিলাম তাহা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল, এবং সেই জন্তই বোধ হয় তাহার কতকটা আজও আমার স্মরণ আছে। তাহারা গাহিতেছিল,—

আজি এসেছে বসন্ত,—নবীন বসন্ত আজি এসেছে !
কুসুমের কলি ফুটায়ে দুলায়ে
আজি মৃদুল সমীর নাচিছে !
ফুলেতে ফুলেতে চুমিয়া চুমিয়া,
ফুলের পরাগ গায়েতে মাখিয়া,
সোহাগে, আদরে, উচ্ছলিত প্রেমে
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িছে !

গায়কের দল চলিয়া গেল—তাহাদের সঙ্গীত ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম হইয়া অবশেষে, তাহার মধুরিমা উৎসবের সাধারণ কলকোলাহলের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। এই গায়ক-গায়িকাগণের পর নর্ত্তক নর্ত্তকীরা আসিল; তাহারা বীণা, মৃদঙ্গ ও মুরলীর সঙ্গীতের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল। নানা ভাবময়ী নৃত্য ও সুসঙ্গত মুরলী ও বীণাধ্বনি আমরা সকলে উপভোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাহা সুন্দর ও মধুর, যাহা উপভোগ্য, তাহা চিরদিনই চঞ্চল ও ক্ষণিক—প্রভাত সূর্য্যের অরুণিমার মত—এই বসন্তেরই সুরভিত মৃদু সমীরণের মত—কিশোরীর যৌবনের পূর্ব্বরাগের মত—কোথায় কখন মিলাইয়া যায়—আর রাখিয়া যায় কেবল অতৃপ্তির আক্ষেপ, তৃষ্ণার জ্বালা ও লালসার তীব্রতা।

নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেলে যাবনিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিভিন্ন দেবতাগণের ন্যায় সুসজ্জিত নরনারীগণ অশ্ববাহিত রথারোহণে চলিল। ইহাদের সর্ব্বশেষের রথখানিতে যাবনিক পানদেবতা ডিওনিসিঅস্ আবির্ভূত হইলেন। আর, দেখা গেল, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পানোন্মত্ত নরনারীগণ নানারূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবভঙ্গী প্রদর্শনপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে।

দেবতাদিগের এই শোভাযাত্রার পর আসিল একদল ব্যায়ামপ্রদর্শক ও কন্দুকক্রীড়ক। ইহাদের মধ্যে নরনারী উভয়ই ছিল। ইহারা বহু প্রকার ব্যায়াম ও কন্দুক ক্রীড়ার কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে চলিল।

ইহাদের পশ্চাতে আসিল একদল মল্ল। তাহারা স্থান বিশেষে দাঁড়াইয়া আপনাদের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল।

সর্ব্বশেষে পুরুষপুরের ক্ষত্রপ মহোদয় সস্ত্রীক রথারোহণে চলিলেন। তাঁহাদের মদিরাপানের যে চরম হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের আরক্তিম মুখমণ্ডলে ও নয়নের অরুণিমায় প্রকাশ পাইতেছিল।

এই শোভাযাত্রার পর জনতা ক্রমে তরল হইতে লাগিল। আমরাও গৃহপ্রত্যাগমনের উত্তোগ করিতেছিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময়ে দেখিলাম যে অদূরে একটা কি কাণ্ড হইতেছে। অনেক লোক একত্র জুটিয়াছে এবং বহুকণ্ঠনিসৃত একটা কলরবও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা কৌতুহলবশতঃ সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম যে একজন পানোন্মত্ত যবনযুবক পথের দুই পার্শ্বে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে তাহাকেই মারিতেছে।

আমি যুবকের নিকট গিয়া তাহাকে সাবধান হইতে এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে বলিলাম। সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। আমি অগ্রসর হইয়া তাহার নাসিকা মূলে সবলে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিলাম। তাহার নাসিকা হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল এবং সে ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে পতিত হইতে দেখিয়া এই জনতায় উপস্থিত যবনগণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে পাঁচ-ছয়জন যুবক প্রজ্ঞাবর্দ্ধনের ও আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার হস্তে যবনের লাঞ্ছনা তাহাদের অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। আমরা তাহাদের সাদর সম্ভাষণের ত্রুটি করিলাম না। আমাদের মুষ্ট্যাঘাতে ও পাদতাড়নায় তাহারা সকলেই ধরাশায়ী হইয়াছিল। যাহারা আমাদের মুষ্ট্যাঘাতের আস্বাদগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সকলেরই মুখমণ্ডল রক্তাপ্লুত হইয়াছিল। কোলাহল বাড়িয়া গেল।—জনতার কেহ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—কেহ পলাইয়া গেল—কেহ বা বৃথা চীৎকারে গণ্ডগোল বাড়াইল। নগরপালের ও চৌরদ্ধরদিগের শান্তিরক্ষক প্রহরীগণ, অধিকতর অশান্তি হইতে নগররক্ষা করিবার জন্ত এবং নিজ নিজ দেহের ও মনের সম্যক্ শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্তে, ঘটনাস্থল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান, এমন কি, তথা হইতে দৃশ্যমান্ সমগ্র রাজপথ হইতে, কোনও এক অজানা শান্তিময় রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছিল। প্রহৃত যুবকগণের ব্যাকুল আহ্বানে তাহাদের অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না; কোলাহল বাড়িল মাত্র।

প্রহৃত যবন যুবকগণ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পরস্পরের মধ্যে কত কি

জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল তাহা শুনিতে পাওয়া গেল না। তবে মাঝে মাঝে তাহারা আমাদিগের দিকে চাহিতেছিল, তাহাতেই বুঝিলাম যে এ ব্যাপার এইখানেই শেষ হইবে না। তাহারা যে আমাদিগের প্রতি বিশেষ প্রীতিনেত্রে চাহে নাই তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। এমন সময় শেখর কোথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নিকট জুটিল। সে বলিল—

"তোমরা গৃহে যাও—এখানে আর বিলম্ব করিও না—বিলম্ব করিলে বিপদের সম্ভাবনা। উহারা কি করিবে তাহার সংবাদ আমার নিকট পাইবে এবং তাহার ব্যবস্থাও পরে করা যাইবে। আমি এখন এখানে রহিলাম।"

প্রজ্ঞাবর্দ্ধন ও আমি জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া ধীরপদে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। বুঝিলাম শেখর এখানে একা নাই, ত্রাণসংঘের সদস্যগণের আবশ্যক হইলে অভাব হইবে না।

আমাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনমুখে অদূরে দেখিলাম ডেমিট্রিঅস্ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গেল। তাহার সেই কুটিল নয়নপ্রান্ত আমার প্রাণের মধ্যে খানিকটা জমাট অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছিল।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে শোভাযাত্রাসন্দর্শন নামক অষ্টম বিবৃতি।

(ক্রমশঃ)

অভিনয়

নাটক

শ্রীকানাই বসু

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহেন্দ্রবাবুর কক্ষ। একপাশে ছোট নিচু খাটে বিছানা পাতা, অপর পাশে দেয়ালের ধারে একটি ছোট টেবল হারমোনিয়ম, দুই তিনটি চেয়ার, দেয়ালে বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ছবি। একটি ছোট বুকশেলফে বই, একটি দেয়াল-আলমারি, একটি ক্লক।

খাটের উপর তাকিয়া-কোলে, গড়গড়ার নল হাতে বৃদ্ধ মহেন্দ্র। তাঁহার সুমুখে একটি লুডো খেলিবার ছক, ডান হাতে লুডোর ঘুঁটি চালিবার কাঠের লম্বা কৌটা। খাটের ধারে তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহার তরুণী কন্যা রাধা উপবিষ্টা।

রাধা। না, না, না, আমি তোমার সঙ্গে খেলব না, কিছুতেই খেলব না। আর যদি কোনদিন খেলি তো কী বলেছি।

মহেন্দ্র। বাঃ, এ বাপু তোমার অন্যায় রাগ। খেলব না বল্লেই খেলব না? তবে খেলতে বসেছিলে কেন? এ কী অন্যায়! খেলার মাঝখানে খেলা ভেঙ্গে দেওয়া—

রাধা। বেশ, অন্যায় রাগ তো অন্যায় রাগ। আমার সবই অন্যায়! তবে আবার খেলতে সাধছ কেন?

মহেন্দ্র। বেশ তো, তুমি যে রকম বলছ, সেই চালই তো দিচ্ছি।

রাধা। সে তো এখন দিচ্ছ। কিন্তু কেন তুমি মিছিমিছি করে ভুল চাল দেবে? খালি ঠকিয়ে আমাকে জিতিয়ে দেবার মতলব। আমি কিছু বুঝতে পারি না, না?

মহেন্দ্র। হুঁ। তোমাকে ঠকাব, আমি? আমার বাবা এলেও পারবে না, আমি তো ছেলেমানুষ।

ঘড়িতে চারিটা বাজিল। শুনিতে পাইয়া রাধা ব্যস্ত হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিল ও খাট হইতে নামিল।

রাধা। ঐ যাঃ, চারটে বেজে গেল? তোমার যে সাড়ে তিনটের ওষুধ খাবার কথা। না, আর খেলা নয়।

বলিতে বলিতে সে পাশের আলমারি হইতে ঔষধের শিশি, গ্লাস, জলের ঘটি বাহির করিল।

মহেন্দ্র। (গম্ভীর মুখে) কে ওষুধ খাবে?

রাধা। কে আবার খাবে? যে রোজ খায়।

মহেন্দ্র। না, সে আর খাবে না। সে ঠকায়, সে জোচ্চোর, সে মিথ্যেবাদী—তাকে আর ওষুধ খাওয়ানো কেন?

তাকিয়া কোল হইতে নামাইয়া তাহাতে ভর দিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

রাধা। (ঔষধ ঢালিয়া কাছে আসিয়া) ও বাবাঃ, ঠকাও বলেছি বলে ছেলের আমার অভিমান হয়েছে। (সাদরে মাথায় হাত বুলাইয়া) না বাবা, লক্ষ্মী বাবা, তুমি ঠকাও না, তুমি খুব লক্ষ্মী ছেলে, ওষুধটুকু খেয়ে ফ্যালো। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

মহেন্দ্র। না।

রাধা। এখনই আবার ব্যথা ধরবে। তখন—

মহেন্দ্র। ধরুকগে। আমি ওষুধ খাব না।

রাধা। হ্যাঁ খাবে। এক্ষুনি যদি ওষুধ খাও, তাহলে সেই নতুন গানটা শোনাব, আর দেরি করলে একদিনও কিন্তু গান শোনাব না, হ্যাঁ।

মহেন্দ্র। তবে আগে শোনা।

রাধা। বাঃ। তার মানে আরও দশ মিনিট ওষুধ না খেয়ে কাটুক,

কেমন? সে হচ্ছে না। ওষুধটি তুমি চুক করে খেয়ে নাও, আর আমিও টুক্ করে গানটা ধরি।

মহেন্দ্র ঔষধ হাতে লইলেন। রাধা অর্গানের সামনে টুলে বসিল। সে একবার বাজাইয়া বাপের দিকে চাহিল, মহেন্দ্র ঔষধের গ্লাস মুখে তুলিলেন। রাধা গান ধরিল—

তোর বুকের মাঝে যে জন আছে বাইরে কেন খুঁজিস তারে?
মিছে গহন বনে মরলি ঘুরে, মনের কোণে চাইলি নারে।

এমন সময় বাহির হইতে বিক্রমজিৎ প্রবেশ করিল। প্রথমে কেহ তাহাকে দেখে নাই, সে-ও দরজার উপর দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রাধা মুখ ফিরাইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া গান থামাইল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া বিক্রমকে দেখিলেন।

বিক্রম। (উভয়কে) নমস্কার। নমস্কার। (ভিতরে আসিল)

রাধা। নমস্কার, আসুন আসুন। (তাহার মুখভাব বিব্রত বোধ হইল)

মহেন্দ্র। নমস্কার। আ—আপনি—

রাধা। (জোর করিয়া প্রফুল্লতা আনিয়া) আপনি কবে এলেন? কেমন আছেন? কোথায় উঠেছেন আপনি?

বিক্রম। এই তো পরশু সন্ধ্যায় এসেছি। উঠেছি একটা হোটেলে। (মহেন্দ্রের প্রতি) আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি ইতিপূর্ব্বে। আমারই নাম বিক্রমজিৎ ঘোষ।

মহেন্দ্র। বিক্রমজিৎ—

বিক্রম। আমি—কী পরিচয় যে দেব, যার পরিচয়ে আমার পরিচয়—

রাধা। চিনতে পারছ না বাবা? এঁর কথা তুমি তো কত শুনেছ আমার কাছে। ইনিই তো ডাক্তার ঘোষ। জলপাইগুড়িতে আমাদের বাসার পাশেই—

মহেন্দ্র। জলপাইগুড়ি? আপনিই ডাক্তার ঘোষ? আপনিই—

কী বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। তারপর চেষ্টার সহিত মুখে হাসি ফুটাইয়া সম্ভাষণ করিলেন।

মহেন্দ্র। আসুন, আসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন। ভারি খুশী হলুম, ডাঃ ঘোষ, ভারি খুশী হলুম।

বিক্রম আসন গ্রহণ করিল।

কী অন্যায় আমার! ছি ছি ছি, আপনার কথা তো আমাদের প্রায়ই হয়, হয় না রাধু? অথচ—এই দেখ রাধু, বুড়ো হওয়ার কুফল দেখ। এ সম্বন্ধে ভালো একটা Essay লিখতে পারা যায়, নাম দেবে—Evils of old Age—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

রাধা। আমি আসছি বাবা, একমিনিট। চায়ের জলটা চড়াতে বলে আসি। রাধা ভিতরে গেল।

রাধার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রের হাসি নিবিয়া গেল। তিনি হাতের ইসারায় বিক্রমকে কাছে ডাকিয়া চুপে চুপে কী যেন বলিলেন। বিক্রম ফিরিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে—

মহেন্দ্র। এখানকার ঠিকানা আপনি পেলেন কী করে?

বিক্রম। আপনার পুরোনো ঠিকানায় গিয়েছিলুম। না পেয়ে ওখানকার পোষ্ট-অফিসে খোঁজ করলুম। বরাতক্রমে পোষ্টমাষ্টার ভদ্রলোক পরিচিত ছিলেন। তাঁরই কাছে—

মহেন্দ্র। হাঁ, উঠে আসবার সময় তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলুম বটে, চিঠিপত্র কিছু এলে—

এমন সময় রাধা প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বলিলেন—

চিঠিপত্র কিছু পেয়েছেন নাকি ওর কাছ থেকে?

বিক্রম। (সবিস্ময়ে) চিঠিপত্র?

মহেন্দ্র। এই অভিলাষের চিঠির কথা বলছি। আপনাকেও কিছু দেয় নি বোধ হয়?

বিক্রম। (বিমূঢ়ের ন্যায়) আজ্ঞে না।

মহেন্দ্র। ঐ তো হয়েছে মুস্কিল। এখানে তো একদম কোন খবর দেয় না। শুনতে পাই ওদের নাকি শপথ করতে হয়—বাড়ীঘর আত্মীয়-পরিজন কিছুর সঙ্গে কোন যোগ রাখতে পারবে না। সর্ব্বস্ব ত্যাগ যাকে বলে। আর কাকেই বা বলছি। ওদের ব্যাপার যেন আপনি আমার চেয়ে কিছু কম জানেন।

বিক্রম। আজ্ঞে না—

মহেন্দ্র। (অল্প হাসিয়া) থাক থাক। কিছু বলতে বলছি না আপনাকে।

বিক্রম। আজ্ঞে, তা নয়—

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। কিন্তু কী কাণ্ডটা করলে বলুন দেখি। অত টাকার চাকরি, অমন প্রস্‌পেক্ট সব গেল। তা যাক, এখন কতদিনে যে ঘরে ফিরবে তা কে জানে। আজকালকার ছেলেদের এই patriotismটা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না। কংগ্রেস বার বার বলছেন ওপথে কিছু হবে না, কিছু হবে না। তবু এই সব বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলেরা যে কেন এই রকম secret society ক'রে এমন করে স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার ত্যাগ করে—

বিক্রম। খুব ঠিক কথা। আমার সঙ্গে এই নিয়ে অভিলাষের ভীষণ তর্ক হতো, এমন কি ঝগড়াই হয়ে গেছে কতবার। কিন্তু বড় গোঁয়ার, কিছু মনে করবেন না, আপনার জামাই বটে, কিন্তু আমার বন্ধু ছিল—ও ছিলই বলি, এখন ওসব ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলায় বিপদ ঘটতে পারে—কী বলেন— (বলিয়া হাসিল)

মহেন্দ্র। সত্যিই তো।

বিক্রম। তাই বলছি—ও বরাবরই বড় head-strong। আর চিঠির কথা বলছেন—এই সেদিন ওদের দলের একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হল। তারই কাছে মধ্যে মধ্যে ওর খবর পাই। বল্লে—ভালই আছে অভিলাষ। কিন্তু কোথায় আছে সেটা কিছুতেই ভাঙলে না। ছেলেটিকে আমি খুব দুকথা শুনিয়ে দিলুম—আপনার লোককে একছত্র চিঠি কি আর কোনও কৌশলে পাঠানো যায় না, না, পাঠালেই স্বাধীনতা যুদ্ধের মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যায়?

মহেন্দ্র। বেশ বলেছেন। খুব ঠিক কথা। এই শোন্ রাধা, আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলি। বলি, ভাল থাকার খবর না হয় এর তার মুখে পেলুম, কিন্তু হাতের লেখা একটা—

বিক্রম। না, ওদেরও বলবার একটা দিক আছে। বলে নিষেধ নিষেধ, তার ভাল মন্দ সুবিধে অসুবিধে বিচারের অধিকার আমাদের নেই। যাই বলুন, ওদের ওই disciplineটা একটা wonderful জিনিস। কিন্তু আমার কথা যদি বলেন, ওই পথটার সঙ্গেই আমার সহানুভূতি নেই মোটেই। (রাধার প্রতি) আপনি আমাকে কাপুরুষই বলুন আর ভীরুই বলুন, ও খুনোখুনীর পথে আমার মন আমি কিছুতেই মেলাতে পারি না। যদিও আমার নাম বিক্রমজিৎ।

(বলিয়া হাসিতে লাগিল)

রাধা। এই কারণে যদি আপনাকে ভীরু কাপুরুষ বলতে হয়, তা হলে তো সবার আগে মহাত্মাজীকেই ভীরু বলতে হয়। তাঁর চেয়ে খুনোখুনির বিরুদ্ধে তো আর কেউ নেই।

মধু ভৃত্যের প্রবেশ, হাতে জ্বলন্ত কলিকা।

মধু। চায়ের জল ফুটছে দিদিমণি।

মধু কলিকা পাল্টাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

রাধা। ওঃ, আমার কী ভুলো মন। (উঠিয়া) চায়ের কথা ভুলে বসে বসে গল্পই করছি।

বিক্রম। না, না, ওর জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন মিসেস্ সেন।

মহেন্দ্র। ব্যস্ত হওয়া আর কী। ঐ হল ওর প্রধান কাজ। এই বুড়ো বাপটাকে তো চা খাইয়েই বাঁচিয়ে রেখেছে। তবে শুধু চা নয় বাধু, ওর সঙ্গে—

রাধা। বাবা যেন কী মনে কর আমাকে। আমার বুঝি ওটুকু আক্কেলও নেই। (দরজার কাছে দাঁড়াইয়া) কিন্তু বাবা, তুমি বেশি কথা কইবে না, বলে দিচ্ছি। ডাঃ ঘোষ গল্প করবেন, তুমি শুনবে। নয়, তুমি শুনবে আর ডাঃ ঘোষ গল্প করবেন।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

মহেন্দ্র। (ক্ষণকাল নীরবতার পর) তোমাকে কী বলে আশীর্বাদ করব তা জানি না। তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনা—

বিক্রম। আমি আর কী করেছি। সামান্য দুটো কথা—

মহেন্দ্র। এই সামান্যতেই তুমি অসামান্য করেছ, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ—তোমাকে তুমিই বললুম বাবা—

বিক্রম। কী আশ্চর্য! তাই তো বলবেন। আপনি আমার পিতৃতুল্য।

মহেন্দ্র। তুমি আমার অভিলাষের বাল্যবন্ধু। সেই অভিলাষ (কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া)—অনেক ছেলে দেখে, অনেক বেছে তবে আমি জামাই করেছিলুম। তারও বাপ মা ছিল না, আমারও ছেলে নেই, জামাই বলে মনে করিনি— (কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল)

বিক্রম। আপনি স্থির হোন, মহেন্দ্রবাবু। এখনি মিসেস্ সেন আসবেন। অমন ব্যাকুল হলে—

মহেন্দ্র। না, না, ব্যাকুল আমি হইনি। ব্যাকুল হব কখন? ব্যাকুল হবার আমার অবকাশ নেই, এক মিনিট অবকাশ নেই বিক্রমবাবু।

বিক্রম। আপনি আমাকে বীরু বলেই ডাকবেন। আমার ডাক নাম বীরু।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, তাই ডাকব।

বিক্রম। আমি খালি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার অসাধারণ সহ্যশক্তি দেখে। আমার এই পাঁচ মিনিট অভিনয় করতেই কী বিব্রত বোধ হচ্ছিল। আর আপনি এই প্রায় এক বৎসর কাল কী করে যে কাটিয়েছেন, তা আমি ভাবতেও পারছি না।

মহেন্দ্র। ভাবতে আমিও পারছি না। কিন্তু তবু এই ছলনা আমি প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট করে চলেছি। বৃদ্ধ বয়সে নারায়ণের নাম দিনে একবার নিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যহ লক্ষ মিথ্যে কথা কয়ে চলেছি, এই মেয়েটার জন্যে। (ক্ষণকাল নীরবে কাটিল।) কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় কী ছিল। আমি যে তাকে জলপাইগুড়ি থেকে নিয়ে আসবার সময় বলে এসেছিলুম—আমি নিজে এসে রেখে যাব। মা আমার সবে সংসার সাজিয়ে বসেছে। সাজানো সংসার। একটা মাস যেতে না যেতে আমি কী করে তাকে বলি যে তার সেই সাজানো সংসার ভগবান পুড়িয়ে দিয়েছেন!

বিক্রম। কিন্তু এই Terrorist দলের গল্পই বা কী করে—

(ব্যথা দিবার ভয়ে কথা শেষ করিল না।)

মহেন্দ্র। কি জানি কেমন করে বললুম। ওই সময়ে পাড়ার একটি ছেলে ঐরকম হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়, আর কিছু ভেবে পেলুম না। জান তো সে কী রকম উগ্র স্বদেশী ছিল। কিন্তু তুমি ভাবছ এই বুড়ো লোকটা এই বয়সে এত বড় জোচ্চুরি কেন করলো।

বিক্রম। আপনি কেন এসব কথা বলে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন, মহেন্দ্রবাবু? আপনি আর কথা বলবেন না। আমি কিছু ভাবিনি।

মহেন্দ্র। এসব কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে এতদিন ধ'রে কাকেও বলতে পারি নি, সে বোঝাতেও যে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

বিক্রম। কিন্তু এখন থাক না। কী দরকার—

মহেন্দ্র। তোমার শোনার দরকার নেই, কিন্তু আমার যে বলার দরকার। তোমার সেই চিঠি যখন পেলুম, তখন ওপরের ঘরে রাধার বন্ধুরা এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে। কেন জান? দুদিন পরে ও চলে যাবে, দিন ঠিক হয়ে গেছে, আমি যাব রাখতে। মায়ের হাসি, গান আমি নিচের ঘর থেকে শুনছি আর ভাবছি—এই মেয়ে চলে গেলে আমি থাকব কী করে। চলে যেতে আর হল না, তোমার চিঠি এল।

বিক্রম। সেই চিঠি যেদিন লিখেছিলুম, সেদিন আমার মনে হয়েছিল—যদি নিরক্ষর হতুম তাহলে এ কর্তব্য আমাকে করতে হত না।

মহেন্দ্র। তখন ওপরে গান গাইছে রাধা। আমি পারলুম না তাকে গিয়ে বলতে যে ওরে হতভাগী, আর গান গাসনে, আর হাসিসনে, বিধবা মেয়েকে অত হাসতে নেই, ওগান গাইতে নেই। (ক্ষণকাল নীরবে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর) বিধবা মেয়ে নিজের দুর্ভাগ্য না জেনে সধবার বেশে গান গাইতে লাগলো, হাসতে লাগলো, বন্ধুদের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করলো,—আমি দরকারী কাজের ছুতো করে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলুম। ফিরলুম অনেক রাতে। তার পরদিনও মন স্থির করতে পারলুম না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালুম। তার পরের দিন আমার মনে হল দুটো রাত যদি এমনি না জেনে ওর কেটে যেতে পারে তাহলে—

বিক্রম। বুঝেছি। অভিলাষ বরাবরই ঐরকম ছিল, তাই এটা অসম্ভব শোনায় নি।

মহেন্দ্র। শুধু সেই জন্যেই নয়। তারপরই আমি পড়লুম রোগে। মাস খানেক কেটে গেল তারই গোলমালে। সেই গোলমাল আজও কাটল না। ঈশ্বরের মনে আরও কী আছে! এককালে বড় দুঃখ ছিল যে অমন লক্ষ্মী হল, রাধার মা দেখে যেতে পারলেন না। আর এখন ভাবি, তিনি বড় বেঁচে গিয়েছেন, এই শেল বুকে পড়েনি তাঁর। বড় বেঁচে গিয়েছেন।

তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

নেপথ্যে রাধার কণ্ঠ :—

রাধা। বাবা, তোমার কিন্তু এখন চা করিনি।

বলিতে বলিতে সে এক হাতে এক কাপ চা ও অপর হাতে এক রেকাব খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

রাধা। এই নিন, বীরুবাবু, একটু চা খেয়ে নিন, তারপর আপনার গল্প শুনব।

বিক্রম। এ কী করেছেন! চায়ের সঙ্গে এতগুলো মিলিয়ে তো আমি পারব না।

রাধা। মিলতে আপনাকে বলছে কে? আপনি চিবিয়ে খান না। কী বল বাবা? ও, রাগ হয়েছে বুঝি? না গো বাবা, তোমার চা এনেছি, বাইরে রেখে এসেছি। আর রাগ করতে হবে না।

বাহিরে গিয়া চা লইয়া আসিল। ইতিমধ্যে মহেন্দ্র চক্ষু মুছিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। (চা লইয়া) রাধা, মা, ভদ্রলোককে শুধু চা'টা খাওয়াবে?

বিক্রম। শুধু কোথা? এই দেখুন না, এক থালা খাবার।

মহেন্দ্র। ও খাবারের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি চায়ের সঙ্গে একটু মিষ্টি দেবে না? হাঁ রাধু?

বিক্রম। না, না, চায়েতো মিষ্টি ঠিকই হয়েছে। চমৎকার চা হয়েছে।

রাধা। ঐ শোনো, তোমার মত সবাই চায়ে ঐ মিষ্টি চায় না। চিনিতেই হয়।

মহেন্দ্র। (ইঙ্গিতে বিক্রমকে অর্গান দেখাইয়া) চায়ের সঙ্গে মিষ্টিটা ---বুঝলেন বীরুবাবু?

বীরু। (চায়ে চুমুক দিয়া) হাঁ, সত্যিই তো। চায়ে মিষ্টি একটু কম কমই লাগছে। কম কি, মিষ্টি একদম পড়েই নি।

মহেন্দ্র। ঐ দেখ রাধু। আমার দোষ নেই।

রাধা। না, তোমার দোষ নেই, তা বইকি! তোমার চালাকি আমি বুঝি না, না? তুমি বড় দুষ্টু হচ্ছ বাবা। কিন্তু এখন আমি গান করতে পারব না। তাহলে সন্ধ্যের সময় তোমাকে শুধু ওষুধ খেতে হবে।

মহেন্দ্র। বারে, এতো আমার জন্যে বলছি না। বীরুবাবু শুনতে চাইছেন। আমার কী? আমি শুনবই না।

বিক্রম। এ কী? আপনাদের কলকাতায় কি আজকাল সন্দেশেও চিনি দেওয়ার রীতি নেই? এযে শুধু ছানা গুলো চটকে দিয়েছে।

রাধা। ও মা! বীরুবাবুকে জানতুম ভালমানুষটি। বাবার কাছে এসেই আপনি মিথ্যে কথা ধরেছেন? কেন, সোজা বল্লেই তো হয় গান শুনিতে।"

মহেন্দ্র। আর কত সোজা ক'রে বলবে মা? সোজা বল্লেই তুমি গাও কি না! জানেন বীরুবাবু, আজ দশ বৎসরের মধ্যে আমাকে একখানা গান শোনায় নি, এমন স্নেহময়ী মেয়ে আমার

রাধা। ও মা গো! কী মিথ্যে কথা বলতে পার তুমি! মিথ্যে ছেলে তুমি! দিনে অন্তত পাঁচটা গান তোমাকে রোজ শোনাই না? এই এখনের মিনিটও হয় নি, তোমায় গান শোনাচ্ছিলুম। বীরুবাবু এসে পড়লেন, বলুন না বীরুবাবু, শোনেন নি? সত্যি কথা বলবেন।

মহেন্দ্র। বীরুবাবুকে বলতে হবে কেন? আমি বলছি, হাঁ, বীরুবাবু আসবার আগে তুমি গান গাইছিলে। কিন্তু সে কি আমাকে শোনাবার জন্যে। বীরুবাবু, শোনো। আমার মাঠাকরুণটি গান করেন—বাবা, ওষুধ খাও, গান গাইছি। বাবা, গান গাইতে গাইতে বুকে মালিশ করে দি, লক্ষ্মী হয়ে শোও তো। বাবা, পরশু দিন সেখানে ভীষণ বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে কাগজে লিখেছে। আজ তোমার চান বন্ধ, তার বদলে একটা গান গাইছি। এর নাম রাধার গান গাওয়া। একদিন বলে না যে, বাবা, তোমাকে শোনাব বলে একটা গান গাইছি। ওষুধ খাওয়ার গান নয়, মালিশ করার গান নয়, চান বন্ধর গান নয়।

বিক্রম ও রাধা হাসিতে লাগিল।

রাধা। (হাসিতে হাসিতে) তা কী করব। তুমি যা অবাধ্য হয়েছ। গানের ঘুষ না দিলে যে একটা কথা শোন না।

রাধা অর্গানের সামনে বসিল। একবার বাজাইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—

রাধা। বাবা, একটা গান শুনবে?

মহেন্দ্র। কেন মা, বুড়োমানুষকে ঠকাচ্ছ? ও গান তো আমার জন্যে নয়, ও আমি শুনব না।

রাধা। হাঁ, শুনবে না। তাই বইকি। কোনটা গাইব বল?

বিক্রম। তবে কিছু মনে না করেন তো বলি, যে গানটা তখন

গাইছিলেন সেইটে যদি গান। ভারি চমৎকার লাগছিল। আমি রসভঙ্গ করলুম।

রাধা গান আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রবাবু শুনিতে শুনিতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া ক্রমে চক্ষু মুদিলেন।

গান

তোর বুকের মাঝে যে জন আছে,
বাইরে কেন খুঁজিস তারে,
মিছে গহন বনে মরিস ঘুরে,
মনের কোনে চাসনি নারে!
রজনী দিন যে তোরে ঘিরে
প্রেমের বাঁশী বাজায়ে ফিরে,
তুই কৃপণ প্রেমে ফিরালি, হায়,
জীবন মূলে কিনবি যারে।
তোর নয়নে রাখ তীর্থ-বারি, হৃদয়ে দেবালয়,
প্রাণের বাণী মন্ত্র নেনা, মিলবে পরিচয়।
আর কতবা দিবি নিজেরে ফাঁকি,
মোহের ধোঁয়া কাটবে নাকি,
এই ভুবন ভরা আলোকে শুধু
তুই কি রবি অন্ধকারে॥

ক্রমশঃ

যুদ্ধকালীন শিল্প-সংরক্ষণ ব্যবস্থা

শ্রীচিন্তামণি কর

মহাযুদ্ধের শেষ হইয়াছে। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ যেন একটা রোমাঞ্চকর মহা দুঃস্বপ্ন। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বাস্তবাশ্রস্ত বিহ্বল মন, স্বপ্নাবলির আর অকে নামিয়া যেমন কৌতূহলী হয়; আজ সন্ধ্যাতে, জগতের হইয়াছে। স্বপ্নে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়া বাস্তবে ফিরিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু মহাযুদ্ধ দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটাইয়া উপলব্ধি করিতেছি, যাহা যাহা স্বপ্নে হারাইয়াছি, জাগিয়া তাহা ফিরিয়া পাইব কিনা সন্দেহ।

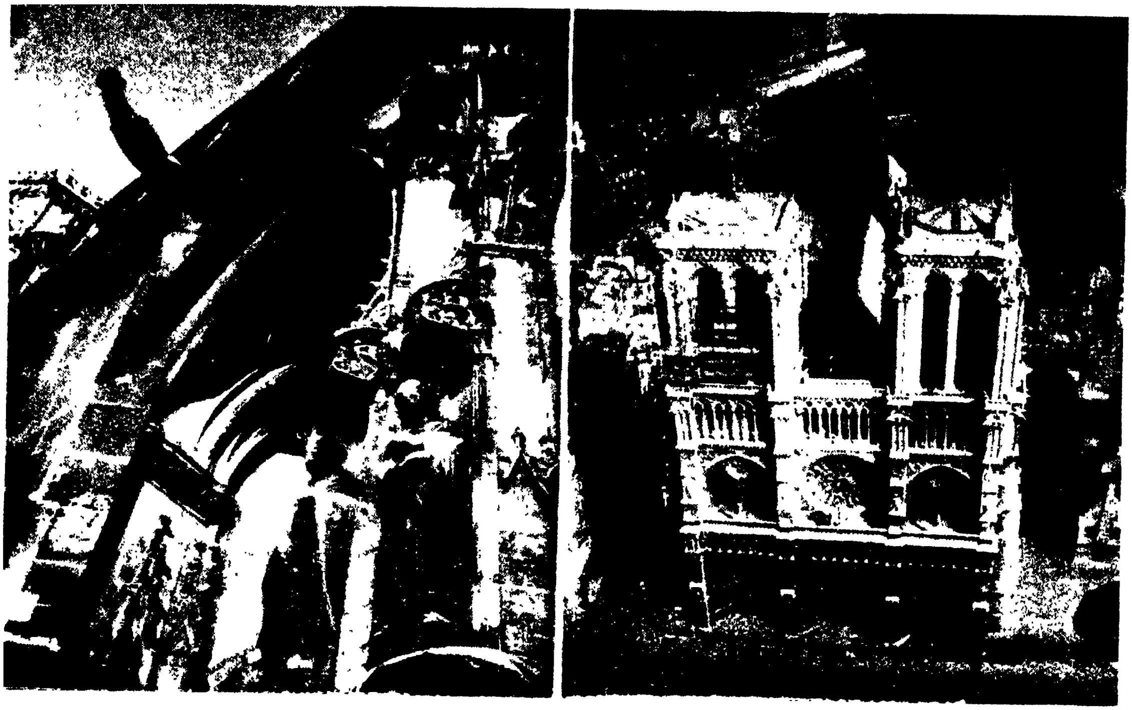


রঙ্গীণ কাচ নির্ম্মিত চিত্র ফলকের পুনরুদ্ধার ও যুদ্ধবিধ্বস্ত রঙ্গীন কাচের ছবির (Staned Glass) ভগ্নাংশ সংশোধন

রণাঙ্গন বহির্ভূত আশ্রয়ে বসিয়া মহারণের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির দৈর্ঘ্য প্রস্থে বৈষম্যের বিচারে, খেয়ালী

১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে সংগ্রামরত পারী যেন এক যাদুকরের দণ্ডাঘাতে, সকল আলোকসজ্জা আভরণ

ও আনন্দ সমেত এক আঁধার কুজ্ঝটিকায় নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ মায়াজালমুক্ত পারী, বাস্তবে পুনরায়



পারীর নোত্র দাম গির্জ্জা ও সাঁ জেয়ারমা লোক্সেরোয়া গীর্জ্জার প্রবেশদ্বার

আত্মপ্রকাশ করিয়া যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ হয়, হয়ত মায়ার ঘোর এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।



লুভরএ রক্ষিত কাষ্ঠনির্ম্মিত যীশুর শয়ান মূর্ত্তি (সপ্তদশ শতাব্দী)

পারীর বুল্ভারের পাশে মাঝে সন্ধিস্থানে, যে সব অপূর্ব্ব পাথর বা ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি শহরের শিল্প গৌরব ঘোষণা করিত, তাহারা যেন হঠাৎ কোথায় উবিয়া গিয়াছে। গীর্জ্জাগুলিতে, গবাক্ষালঙ্কৃত রঙ্গীণ কাচখণ্ডে তৈরী চিত্রফলকগুলির মাঝ দিয়া সূর্য্যালোক যে মোহের সৃষ্টি করিত, তাহার অবর্ত্তমানে এখন মনে হয় যেন গীর্জ্জাগুলি, গলিতমাংস কঙ্কালের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। শিল্প নিদর্শন-শূন্য বিখ্যাত সংগ্রহশালাগুলি নিরাভরণা বিধবার ন্যায় শোকাচ্ছন্না। যুদ্ধনিবন্ধনে শ্রেষ্ঠ শিল্পসংগ্রহগুলির কি দশা হইয়াছে কে বলিতে পারে! জার্ম্মাণ রণদেবতা লালসাপ্লুত রঙ্গালয়ে তাহাদের কতগুলির সমাধিলাভ ঘটিয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ আজিও শেষ হয় নাই।

কিন্তু যুদ্ধের ক্ষত ফ্রান্সের অঙ্গ হইতে মিলাইতে না মিলাইতেই ফরাসী শিল্পপ্রতিনিধিগণ পারীর সংগ্রহ-শালাগুলির দ্বার পুনঃউদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। অলঙ্করণশূন্য গীর্জ্জার গবাক্ষে কাচখণ্ড নির্ম্মিত চিত্রফলকগুলি সাজাইতে তৎপর হইয়াছে। শূন্য পাদপীঠে, যুদ্ধান্তকাল পর্য্যন্ত অন্তর্হিত মূর্ত্তিগুলি পুনরায় স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিতেছে।



লুভরএ রক্ষিত মাতৃমূর্ত্তি এবং প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত "মারলির অশ্ব"



ভূগর্ভস্থ কক্ষে রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহ

রম্যনগরী পারী সদ্যছিন্নসজ্জা নব আবরণ দিয়া, রণক্লিষ্ট আননে হাসি টানিয়া সর্ব্বস্বহৃত রিক্ত পারীবাসীর প্রাণে আশার বাণী আনিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পারীর এই নব আবরণ ও হাসিটুকুর পুনরাবির্ভাবের পশ্চাতে রহিয়াছে শিল্পবিশেষজ্ঞগণের মহা আয়োজন, শিল্প-সংরক্ষকগণের ছয় বৎসরের কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা। ধ্বংশোন্মাদোনায় উন্মত্ত জগতে মানবীয়তা ও সংস্কৃতিকে নিভৃত আশ্রয়ে নিরাপদে রাখিবার জন্য এবং যুদ্ধশেষে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা বহু বিপদ এবং কালের মধ্যেই শিল্প বস্তুগুলি যথাযোগ্য আশ্রয়ে নিরাপদে রাখিবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছিল। স্মৃতিসৌধ ও স্তম্ভবিলম্বিত ভাস্কর্য্য নিদর্শনগুলিকে বালিভরা বস্তার বর্মে আবৃত করা হইয়াছিল। লৌহনির্ম্মিত মঞ্চে সাজান বালুভরা বস্তার রক্ষাবরণ বৈমানিক আক্রমণের আঘাত প্রতিঘাত করিবার পক্ষে যথেষ্ট দৃঢ় ছিল। যাহাতে বস্তাগুলি জীর্ণ হইয়া গুল্মাদি জন্মাইয়া রক্ষাবন্ধন শ্লথ না হয়, তাহার জন্য কয়েকদিন অন্তর বস্তাগুলির উপর ক্লোরেট অব পটাশ ছিটাইয়া তাহার আশঙ্কা দূর করা হইতে।



লুভরের প্রসিদ্ধ ডায়না



লুভর-এ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সামোথ্রাসের বিনয় মূর্ত্তি

এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়াছিলেন, আজ রণক্লান্ত জগত কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের স্মরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই প্রায় বারো বৎসর যাবৎ ফরাসীশিল্প সংরক্ষণ-বিচক্ষণ সর্ব্ববিধ ধ্বংস হইতে শিল্প সম্পদের রক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষাদি করিতেছিলেন। সেই কারণে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই, মূল্যবান শিল্পনিদর্শন সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান ও রক্ষণ কার্য্য নিপুণ কর্ম্মীগণকে একত্রিত করিয়া দুইমাস প্লাস দ্য লা কঁকর্দ এর "ও বেলিস্ক" (প্রস্তর স্তম্ভটী) মাটির স্তূপে আবৃত করা হইয়াছিল। গীর্জ্জা ও বিজয় তোরণ গাত্র সংবলিত ভাস্কর্য্যগুলিকে যথোচিত সুদৃঢ় আবরণ দেওয়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই।

বিখ্যাত নোতর দাম গীর্জ্জার সংরক্ষণকল্পে, কেবল সম্মুখভাগটির জন্যই ষাটহাজার বালিভরা বস্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। ফ্রান্সের বহুখ্যাত, প্রস্তরে গঠিত গীর্জ্জাগুলির ভূগর্ভস্থ খিলানময় কক্ষসমূহ শিল্পরত্নাবলী

রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত আশ্রয়ের কাজ করিয়াছিল। শিল্প সম্ভার গীর্জ্জাগুলির আশ্রয়ে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রত্যেকটিতে কতখানি স্থান সংকুলান ও কতগুলি শিল্প নিদর্শনকে আশ্রয়স্থ করা যাইতে পারে এবং পুনরায় সেগুলিকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিতে যাহাতে কোন বাধা বিপত্তি না ঘটে, তাহার জন্য যথাযথ মাপ জরিপাদি লইয়া প্রায় আটমাসকাল পরিশ্রমের পর বিশদ তালিকা প্রস্তুত কাচনির্ম্মিত চিত্রফলকগুলি নোতরদাম, সাঁ শ্যাপেল, সাঁ তোতিয়েন-দ্যু-ম, সাঁ জেয়ারমা লোক্সেরোয়া সাঁ, জেয়ারভে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গীর্জ্জার ভূগর্ভস্থ নিরাপদ কক্ষে স্থানলাভ করিয়াছিল। বিশ্ববিশ্রুত চিত্রগুলি জার্ম্মান লুণ্ঠনকারীদের কবল হইতে রক্ষা করিতে দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে সেগুলিকে প্রয়োজন বিশেষে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল ডাল দ্য লোয়ার ও ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশের ৪৬টি



সামুলপিসের ভূগর্ভস্থখিলানে রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহ

করা হইয়াছিল। ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় মূর্ত্তি ও জীর্ণ চিত্রের প্রত্যেকটি ফাটল বা দাগ তালিকায় দাখিল করা হইয়াছিল। সেগুলি নাড়াচাড়া করিবার সময় যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় তাহার সাবধান বিজ্ঞাপনী প্রত্যেক মূর্ত্তি বা চিত্রের নামগুলির পাশে লিখিত ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সুদৃঢ় সাঁ সুলপিস গীর্জ্জার ভূগর্ভস্থ খিলানময় আশ্রয়, গোলা ও বোমার আক্রমণ সহনক্ষম বিবেচিত হওয়ায় প্যারীর ভাস্কর্য্যসংগ্রহ তথায় যুদ্ধান্তকাল পর্য্যন্ত রক্ষিত ছিল। দুর্গ এইভাবে ফ্রান্সের চিত্রসম্পদকে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের সংগ্রহালয় ভেয়ারসাইএ ফরাসী শিল্পসংরক্ষণ সমিতি, মূর্ত্তিগুলিকে উন্মুক্ত উদ্যানে দৃষ্টিভ্রম আবরণের অন্তরালে গোপন রাখিয়াছিলেন।

সকল শিল্পনিদর্শনগুলিকে পুনরায় পূর্ব্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ভূগর্ভস্থ প্রায়ান্ধকার খিলানের নীচে অপেক্ষমান মূর্ত্তিগুলি এক অভিনব দৃশ্যের

অবতারণা করিয়াছে। গলিত বালির বস্তা সঙ্কীর্ণ গলিপথের খিলানের কুক্ষিশায়ী মূর্ত্তির মুখ বা অবয়বাংশের উপর পড়া ম্লান আলো পুরাতন পাণ্ডুরতাকে আরো বিকট করিয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির কণ্ঠাবলম্বিত পরিচয়জ্ঞাপক ধাতুফলক দেখিয়া মনে হয় যেন সেগুলি একাকী ভ্রাম্যমান শিশুর পথভ্রষ্ট না হইবার সঙ্কেত। স্খলিত-অঙ্গ মূর্ত্তিগুলির অবয়বাংশ তাহাদের পাশেই উপযুক্ত আধারে রক্ষিত। সেগুলির অধিকারীর নাম ও তাহাদের পুনঃ সংস্থানের উপদেশ প্রভৃতি আধারের উপর লিখিত।

প্রত্যেক মূর্ত্তিই বিষণ্ণভাবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া যেন প্রশ্ন করিতেছে, কবে গবাক্ষপ্রবিষ্ট সূর্য্যালোকধারা তাহাদের অঙ্গ পুনরায় স্নান করাইবে, ধূপ আমোদিত হর্ম্মে ভক্তকণ্ঠনিসৃত প্রার্থনাবাণীর নিনাদ তাহাদের কর্ণ তৃপ্ত করাইবে। আঁধারাবৃত কক্ষে তাহাদের অপেক্ষার বোধহয় আজ শেষ হইয়াছে। ধ্বংসাগ্নির ধূম ফ্রান্স হইতে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবার পূর্ব্বেই শিল্প-সুন্দরেরা ধীরে ধীরে পূর্ব্বাসন পরিগ্রহ করিতেছেন। জগৎ ভাবিতেছে ইঁহাদের আসন পরিত্যাগ ও পুনঃ পরিগ্রহের মধ্যে যে বিরাট প্রলয় ঘটিয়া গেল তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে কিনা!



পারীর অপেরাভবনের প্রসিদ্ধ নৃত্যকারীর মূর্ত্তি (কারপো গঠিত)

নব্য রসায়নী-শিল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

পূর্ব্ববর্ত্তী "রসায়ন শাস্ত্র ও সামগ্রিক স্বাধীনতা" প্রবন্ধে দেশের ও জনগণের সামগ্রিক স্বাধীনতা না থাকিলে ক্রমে ক্রমে যে জাতির সৃষ্টিশক্তি বন্ধ্যা হইয়া যায় তাহা দেখান হইয়াছে। স্বাধীনতা হীনতায় অনুসন্ধিৎসু মনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি যাদবপুর কলেজের সমাবর্ত্তন অভিভাষণে স্বাধীনতার পূজারী জহরলালজী ভারতের পতনের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া যে সমাধানে পৌঁছিয়াছেন তাহা এখানে পাঠকদিগকে উপহার দিই। প্রাচীন ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক ও কারিগরী বিদ্যার উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "আমি যখন এই সকল কথা বলি তখন আমি বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ভারতের তুলনা করি না; তৎকালীন পৃথিবীতে ভারতবর্ষ কারিগরী বিদ্যায় অগ্রসর ছিল, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে রং, লোহা, তাম্র ও ইস্পাত তৈয়ারী হইত। ভারতীয় বিজ্ঞানে "শূন্য" চিহ্নের সূচনা এক বৈপ্লবিক উদ্ভাবন।" তিনি প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রের উল্লেখ এবং অন্যান্য দেশে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, উপনিবেশ স্থাপন ও সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি-প্রচারের কথা করেন। তিনি ভারতের বর্ত্তমান দৈন্যের কারণ দিতে গিয়া বলেন যে স্বাধীনতা হারাইবার সঙ্গে ভারতের দেহে যে একটি কঠিন আবরণ দেখা দিল তাহা ভেদ করিয়া সে (ভারত) আর বাহির হইতে পারিল না; লোকে এমনও মনে করিত "কালাপানি" পার হওয়া অধর্ম্ম, কাহাকে স্পর্শ করা যাইবে বা যাইবে না ইহা লইয়াই সে যেন বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িল।"

কালের প্রভাবে ভারতের ভাগ্যাকাশের চাকাও ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, চারিদিকেই নিজকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যাহার যেমন শক্তি তিনি প্রয়াসী হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও বহু মণীষীর সাধনায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্লেষণ-ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে নব্য

রসায়নী শিল্পের গোড়া পত্তনের কথাই বেশী অভিনব, কতকটা রূপ-কথার কাহিনীর মত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বিক্ষিপ্তভাবে কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীতে ভাগ্যান্বেষী কতিপয় বিদেশী ধনপতি নব্য রসায়নী শিল্পের সূচনা পত্তন করেন। সেই সময় রসায়নী শিল্পের মধ্যে স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য কেবলমাত্র গন্ধক-দ্রাবক ও দুই একটী অন্যবিধ দ্রাবক তৈয়ারী হইত। এই সকল কারখানার মোটামুটি শিক্ষিত দুই একজন দেশীয় মিস্ত্রির সাহায্যে কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহ, মাধবচন্দ্র দত্ত এবং আসগর মণ্ডল প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোক কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গন্ধকদ্রাবক তৈয়ারীর কলকারখানা নির্ম্মাণ করেন। এই কারখানাগুলি হাস্য-জনক ক্ষুদ্র ছিল; কোন কোনটীর দৈনিক উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ১০।১২ হন্দর ছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এইরূপ একটী কারখানা ১০০০৲ টাকায় খরিদ করেন। বলা বাহুল্য এই হাজার টাকাও ক্রেতা নগদ দিতে পারেন নাই; বিক্রেতাও হ্যাণ্ডনোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণ উক্ত কারখানা চালাইতে গিয়া দেখিলেন যে মালিক অনভিজ্ঞ মিস্ত্রিদের সাহায্যে মাত্র দুইখানা সীসার ঘর (১০′ × ১০′ × ৭′) তৈরী করিয়াছেন; কাঁচামালের অপচয় এত বেশী যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহা চালান অসম্ভব। এই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, দশ বৎসর পরে তাহা কাজে আসে। বৃহত্তর ভাবে দেশীয় মূলধনে সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত এসিডের কারখানা হিসাবে বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলা কারখানার পুরাতন 'চেম্বার প্লাণ্ট' ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানেও এই প্রতিষ্ঠানের পাণিহাটী কারখানার চেম্বার প্লাণ্ট 'রিকভারী' ব্যবস্থা হিসাবে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভারতে স্থাপিত কণ্টাক্ট প্লাণ্টের মধ্যে তৃতীয় ও বঙ্গ দেশের সর্ব্বপ্রথম প্লাণ্ট এই কারখানায় চালু আছে। আরও উল্লেখ-যোগ্য এই যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেরণায় ভারতের নানা স্থানে ভারতীয় মূলধনে সংস্থাপিত গন্ধক-দ্রাবক তৈয়ারীর কারখানা আজ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর হিসাবের অনুপাতে ইহাও গোষ্পদে বারিবিন্দুর ন্যায়। ভারতের জনসংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর জন-সংখ্যার ১৯ ভাগ। এই বিপুল জনসংখ্যার অনুপাতে সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ গন্ধক-দ্রাবক তৈয়ারী হয় তাহার মাত্র ০'০০৬%ভাগ ভারতে হয়। বহুবিধ কারণের মধ্যে প্রধান এই যে, গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric Acid) এর কাঁচামাল গন্ধক আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। বেলুচিস্থানের অন্তঃপাতী কো-হি-সুলতানে এবং সান্নিতে পুরাতন আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে কিছু গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পরিমাণ ও উৎকর্ষে অত্যন্ত হীন বলিয়া এতদিন ইহা লইয়া কোনও কাজ হয় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধে গন্ধক পাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই খনিতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। এই কারণে আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বৈদেশিক গন্ধকের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমরা প্রধানতঃ ইতালী-দেশীয় গন্ধক লইয়া কাজ করিতাম; আমেরিকান গন্ধকের আমদানী সম্ভবতঃ ৭।৮ বৎসর হইতে সুরু হইয়াছে। প্রাচ্য দেশে গন্ধক প্রাপ্তির তৃতীয় সম্ভাব্য স্থান জাপান। কিন্তু বিশুদ্ধতায় ইহা হীন ও আর্সেনিক দুষ্ট বলিয়া ব্যবহারে অসুবিধাজনক। এই তিন শ্রেণী গন্ধকের মধ্যে আমেরিকার টেক্সাস উপকূলের গন্ধক বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠ। ১৯২৯-৩৩ এই পাঁচ বছরে বিদেশ হইতে আমদানী গন্ধকের পরিমাণ ১৮০০৩ টন, কিন্তু আমদানী গন্ধক-দ্রাবক ঐ সময়ে ভারতে তৈয়ারী গন্ধক-দ্রাবকের মাত্র ১.৪% অংশ। দ্রাবক আমদানী ও রপ্তানীর অসুবিধার জন্যই আমাদের এই ব্যবসা গড়িয়া উঠিতেছে, নচেৎ উৎপন্ন পণ্যের মূল্য হারাহারি হিসাবে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। বৈদেশিক ধনপতিদের ইহা সবিশেষ জানা আছে বলিয়াই রপ্তানী মূল্য তালিকায় গন্ধকের দাম, গন্ধক-দ্রাবক অপেক্ষা অনুপাতে অনেক অধিক। ১৯২৯-৩৩ এই পাঁচ বছরের হিসাবে প্রতি বৎসরে ভারতে উৎপন্ন দ্রাবকের মোটামুটি পরিমাণ ছিল ৩০৯৮৫ টন। বর্ত্তমানে এই পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে। ভবিষ্যৎ গুরুত্বসম্পন্ন এই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিল্পের কাঁচা মালের বিষয়ে কোন চিন্তাই করা হইতেছে না। পৃথিবীতে যতকাজে গন্ধক ব্যবহৃত হয় তাহার মাত্র ১৭,০% ভাগ বিশুদ্ধ গন্ধক (Brimstone), বাকী গন্ধক প্রকৃতির অপরাপর দান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। যেখানে বিশুদ্ধ গন্ধক নাই সেখানে স্থানীয় গন্ধক-যুক্ত প্রকৃতির দানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহারা শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে জার্ম্মাণীর কথা। সে দেশে গন্ধক নাই, কিন্তু প্রাকৃতিক দান কয়লা ও জিপসাম-প্রস্তর হইতেই সেই দেশ গন্ধক আহরণ করিয়া থাকে এবং কলকারখানা বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে প্রকৃতির দানের অপচয় হইবার সম্ভাবনা সেখানে নাই। ইংলণ্ডেও সকল কারখানা বিশুদ্ধ গন্ধকে চালিত হয় না। ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের কয়লার খনিতে পাইরাটীশ প্রস্তর প্রচুর পাওয়া যায়। সেখানে এই জন্য অনেক কারখানা এমন ভাবে গঠিত হইয়াছে যে পাইরাটীশ পোড়াইয়া গন্ধক দ্রাবক তৈয়ারী হয়। পাইরাটীশ ব্যতীত তৃতীয় প্রাকৃতিক উপাদান দস্তা পূর্ণ খনিজ প্রস্তর (Zinc Blend)। গত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যেখানে কেবলমাত্র দ্রাবক তৈয়ারী করিবার জন্য বিশুদ্ধ গন্ধক খরচ হইয়াছে ১৬০০০০ টন, সেখানে পাইরাটীশ, জিন্‌ক ব্লেণ্ড ও স্পেণ্ট অক্‌সাইড খরচ হইয়াছে ৫৩৭,৫৩৫ টন। ভারতে যে সামান্য পাইরাটীশ আছে তাহার কোনও সদ্ব্যয় হয় না। ঘাটশীলায় তাম্র প্রস্তুতের কারখানায় কপার পাইরাটীশ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। জানা গিয়াছে, তাম্র প্রস্তুত করিবার সময় বৎসরে ৮০০০ টন গন্ধক-দ্রাবক তৈয়ারী হইবার উপযুক্ত গন্ধক-ডায়োক্‌সাইড (SO_2) বাতাসে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জিওলজিক্যাল বিভাগের Survey Report হইতে জানা যায় যে আসাম ও পাঞ্জাবে গন্ধক সমন্বিত কয়লা প্রচুর আছে। বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইহার গন্ধক ডায়োক্‌সাইড (SO_2) হিসাবে আলাদা করিয়া দ্রাবকে পরিণত করা যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহা কার্য্যকরী ও প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ধনপতিদের আগ্রহ ও উদ্যম ব্যতীত কার্য্যে পরিণত হইতেছে না।*

* M. R. Mandlekar, Indian Chemical Society, Industrial edition, Vol III
Science & Culture, P 509 of 1939-40

উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও পাঞ্জাবে জিপ্‌সাম প্রস্তর (Gypsum) প্রচুর পাওয়া যায়। জার্মান দেশে Gypsum হইতে Cement প্রস্তুত করিবার সময় যে Sulphurous gas নির্গত হয়, জার্মান বৈজ্ঞানিকের বায়ুতে তাহা হইতে Sulphuric Acid তৈয়ারী হইতেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীকে একঘরে করিয়া রণসম্ভার তৈয়ারে ব্যাহত করিবার জন্য ব্রিটেন তাহার সোরা (nitric) পাওয়ার পথ বন্ধ করিলে জার্মান বৈজ্ঞানিক বিধাতার দান জল ও বাতাস হইতে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন লইয়া এমোনিয়া তৈয়ার করেন। এই "এমোনিয়া" বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাঙ্গিলে nitric এসিড এ পরিণত হয়। এই nitric এসিড যেমন এক দিকে explosiveএর প্রাণ, তেমনি রং তৈয়ারীর একটা প্রধান উপাদান; অপর দিকে বৈজ্ঞানিক উক্ত এমোনিয়া ও জিপ্‌সাম নূতন পদ্ধতিতে সংযোজিত করিয়া এ্যামনসালফ্ তৈরী করিলেন। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে এই এ্যামনসালফ্ ammon sulph সার হিসাবে আজ সর্বত্র আদৃত হইতেছে। একঘরে জার্মানী বুদ্ধির কৌশলে একঢিলে যুদ্ধের মশলা ও জমির সার তৈয়ার করিয়া যুদ্ধ ও যোদ্ধার খোরাক সরবরাহের পথে সহস্র যোজন আগাইয়া গেলেন। বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশলে নানা নূতন আবিষ্কার করিয়া বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক যেমন নিজ নিজ দেশকে আত্ম নির্ভর ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমনি বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণকে জ্ঞানের খোরাকও প্রচুর যোগাইয়াছেন। জ্বালানী কয়লা তৈরী করিবার জন্য পাথুরে কাঁচা কয়লা আলো বাতাসহীন হাঁড়িতে চোয়াইলে (Destructive distillation) যে বাষ্প পাওয়া যায় তাহা পরিষ্কৃত করিবার সময় গন্ধক-দ্রাবকের ঝরণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হয়। এই সময় চিনির মতন যে শাদা দানা পাওয়া যায় তাহাই Ammon Sulphate। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশে একমাত্র এই উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইত। ভারতে এখনও ২।১টী প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতিতে তৈয়ার হইয়া থাকে। কেবল বায়ু মহীশুরে প্রকৃতির দান জল ও বাতাস হইতে ammonia, nitric acid ও ammon sulphate তৈয়ারী হইতেছে। পৃথিবী এতদূর অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় অধিকাংশ কয়লা-খনির মালিকেরা ইঁট পোড়াইবার ভাটার মত ভাটা করিয়া আগুনে তৈলাক্ত পদার্থ পোড়াইয়া জ্বালানী কয়লা তৈরী করিয়া থাকেন। শেষোক্ত পদ্ধতিতে জ্বালানী কয়লা তৈরী করিতে কোটী কোটী টাকার মূল্যবান তৈলাক্ত পদার্থ শুধু নষ্ট হয় না, প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের দাহিকা শক্তি অতি নিম্নস্তরের হইয়া থাকে। এই জাতীয় অপচয়ের বিষয় বারান্তরে বিবৃত করা হইবে।

জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার অপর উল্লেখযোগ্য সার সুপার ফসফেট-জৈব ও অজৈব দুই ভাবেই তৈয়ারী করা যায়। মৃত জীবজন্তুর হাড়চূর্ণ কিম্বা প্রাকৃতিক ফসফেট প্রস্তর গন্ধক-দ্রাবকের সহিত মিশাইয়া ইহা তৈরী হইতে পারে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে এইরূপ সস্তা দ্রাবক আমাদের দেশে তৈয়ারী হয় না বলিয়া এই প্রয়োজনীয় শিল্পও আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিতেছে না, কেবলমাত্র মাদ্রাজ অঞ্চলের প্যারী কোম্পানী আংশিক বৃহৎভাবে আমদানী অজৈব উপাদান হইতে এই সার তৈয়ারী করিয়া থাকেন, অথচ আমাদের পূর্ণ হাড় আমাদের দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায়। সস্তা বিদ্যুৎ ও সারের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা এইবার বিনা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া বুঝিয়াছি ও শিখিয়াছি।

কাব্যে লিখিত 'ধন্‌ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা' আজ বন্ধ্যা জননী। বহু প্রাণের আহুতির পরে সংখ্যাবিদেরা আজ প্রমাণ সহকারে জানাইতেছেন যে আমাদের দেশ জননী শস্যশ্যামলা, সুজলা, সুফলা; ইহা নিছক কবির কল্পনা, আমাদের দেশে জাতির শতকরা ৮০ জন কৃষি ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অন্নের সংস্থান করিতে অসমর্থ, কিন্তু যুনাইটেড ষ্টেটসে জাতির শতকরা ২০ জন কৃষক পরিমাণে অনেক কম জমি লইয়াও সমস্ত জাতির অন্ন ব্যতীত পৃথিবীর অপর গোলার্দ্ধের অনেক জায়গায় অন্ন সমস্যা মিটাইয়া থাকে। এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে নদীর জলস্রোত মানুষের অধিকারে আনিয়া সস্তা বিদ্যুতে ও যৌথ বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতিতে চাষী করিয়া। মানুষের মতন বাঁচিতে হইলে আমাদের ও নান্য পন্থাঃ।

গন্ধক দ্রাবক সহযোগে অপর বৃহৎ শিল্প ফুঁতে, ফিটকারী ও তৎ-শ্রেণীর এলুমিনিয়াম্ সালফেট। ছোটনাগপুর ও জব্বলপুর অঞ্চলে প্রচুর তাম্রমিশ্রিত প্রস্তর (Copper Pyrites) ও বক্সাইট পাওয়া যায়। রসায়নাগারে উক্ত প্রস্তরচূর্ণ গন্ধক-দ্রাবকের সহিত সিদ্ধ করিলে ফুঁতে ও এলুমিনিয়াম সালফেট তৈয়ারী হয়। এলুমিনিয়াম সালফেট পুনরায় এমোনিয়াম্ কিম্বা পটাসিয়াম্ সালফেটের সহিত যুক্ত হইলে ফিটকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। বক্সাইটের দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক দান এলুমিনিয়াম্ ধাতু। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার এলুমিনিয়াম তৈজসপত্র তৈয়ারীর জন্য আমদানী হইত। এরোপ্লেনের অবয়ব প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও ভারতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারীর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। যুদ্ধের ভয়াবহ বীভৎসতার মধ্যে ও রুদ্রের প্রসন্ন মূর্ত্তির ন্যায় গভর্ণমেণ্টের আগ্রহে এবং আনুকূল্যে সম্প্রতি এই ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের তিন দিকে সমুদ্র, অথচ এখানে লবণ—মনুষ্যের শরীর ধারণের অন্যতম সস্তা ও প্রধান উপাদান-সোজা শাদা-বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে লোকে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। অথচ আমাদের দেশের রাজশক্তি লবণ তৈরীর সাহায্য কখনও করেন নাই। প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এডেন, গুজরাট, সিন্ধু ও মাদ্রাজে যে লবণ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে অপারগ, কিন্তু এই স্বল্প উৎপাদনের তিক্ত ও কষায় জলে (Bitterns) যে পরিমাণ magnesium chloride ও mag sulph নষ্ট হয় তাহার হিসাব শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। জার্মানদেশে Stassfurt deposit হইতে বৎসরে ১২০০০ টন mag. chloride প্রস্তুত হয়; আর ভারত ও এডেনের লবণ কারখানায় Bitterns এর জলে বৎসরে ১২০০০ টন mag. chloride নষ্ট হয়। Mag sulph এর হিসাব আর ভয়ে ভয়ে দিলাম না। অথচ Salem হইতে magnesite আনাইয়া mag sulph তৈয়ারী করিতে

হয়। শেষোক্ত উপায়ে এক বেঙ্গল কেমিক্যালই বৎসরে ১০০০ টন mag sulph তৈয়ারী করিয়া থাকেন। সস্তা লবণ ও সস্তা বিদ্যুৎ না থাকায় আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় অপর দুইটী শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না। প্রথম, তরল ক্লোরীন; দ্বিতীয়, কষ্টিক সোডা। কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে তরল ক্লোরীন চূণের সহিত মিশাইলে ব্লিচিং পাউডার উৎপন্ন হয়। এসিডের মতন ক্লোরীনও তীব্রক্ষারকে (কষ্টিক সোডা) কেন্দ্র করিয়াও বহু শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে সাবান ও প্রয়োজনীয় ব্লিচিং পাউডারের অভাবে সাধারণ লোকে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমদানী বন্ধ হওয়ায় দুইটী প্রয়োজনীয় ভারী রসায়নী শিল্প, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ও সোডিয়াম ডাইক্রোমেট ভারতে প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে এবং স্থায়ী শিল্প হিসাবে দাঁড়াইবার যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

আমাদের দেশে চূণ ও কয়লা প্রচুর আছে, কিন্তু কারিগরী শিল্পের অপ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় রসায়ন। কারবাইড শিল্পের পত্তন এদেশে সম্ভব হইতেছে না কেবলমাত্র সস্তা বিদ্যুতের অভাবে। অথচ সস্তায় কারবাইড তৈয়ারী সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে এসিটিক এসিড, এসিটোন, রঞ্জন জাতীয় দ্রব্য, কিম্বা নকল রবার তৈয়ারীর আশা করিতে পারা যায়। টেনেসী উপত্যকার ন্যায় নদী শাসন হইলে আমাদের এই নদীমাতৃক দেশে বিপুল বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হইতে পারে।

ফিরিস্তি ক্রমেই দীর্ঘ হইতেছে। বস্তুতঃ গন্ধক, কয়লা ও লবণকে কেন্দ্র করিয়া বহু জৈব ও অজৈব রসায়নী দ্রব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক প্রাথমিক পণ্য পুনরায় বহু শিল্পের জননী অথবা ধাত্রী। ইহার মধ্যে গন্ধক-দ্রাবকের বৈশিষ্ট্য অন্যতম। জৈব ও অজৈব বহু শিল্পের প্রাণ এই দ্রাবক। এই জন্য রাসায়নিকের দৃষ্টিতে যে দেশে গন্ধকের খরচ খুব বেশী, সেই দেশ তত বেশী সভ্য। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে পৃথিবীর উৎপন্ন গন্ধকের পরিমাণ ও গন্ধকের উপর একান্ত নির্ভরশীল শিল্পের কিছু হদিস পাওয়া যাইবে। এই তালিকা দৃষ্টে রাসায়নিক জগতে আমাদের দুরবস্থা বুঝিতে পাঠকের অসুবিধা হইবে না। ঘরে বাইরের অসম প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ভারতীয় রাসায়নিককে আত্মরক্ষা করিতে হইতেছে। ব্যাধি এইরূপ গুরুতর যে ইহার পরিবর্তন সহজসাধ্য নহে। কারণ এই যে ভারতীয় অধিকাংশ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র স্থানীয় বাজারে বৈদেশিক মাল আমদানীর অসুবিধার সুবিধা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক মালিকই আপাতঃ মনোহর লভ্যে সন্তুষ্ট এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন। অনেকেই স্থান নির্বাচনের সময় কাঁচামাল, কয়লা, জলের সুবিধা অসুবিধা, রপ্তানী আমদানীর হিসাব খতাইয়া দেখেন নাই। কোন কোনও শিল্পপতি কোনও রকমে শিল্পজগতে সুনাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নিজ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সচেষ্ট না হইয়া অপর নূতন কোনও ব্যবসায়ে বেশী রোজগার হইবার সম্ভাবনায় সময় ও অর্থ ব্যয় করা পছন্দ করেন। ইহাতে তাঁহার পূর্ব্বতন প্রতিষ্ঠার হানি ত করেনই, উপরন্তু নূতন উদ্যমে ও ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত হন। এই সকল নানা কারণে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের জন্য বহু প্রতিষ্ঠানেরই সর্ব্বভারতীয় পরিকল্পনা রচনা করিবার শক্তি ও যোগ্যতা নাই। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা থাকিলে সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা করিয়া রাজ্যের যাবতীয় শক্তিকে তাহা পরিপূরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারিত। কিন্তু এই দেশে বিদেশী শাসকের যুক্তিই অভিনব। তাঁহাদের মতে রপ্তানী ও আমদানীকারক দালালের চেয়ে সাক্ষাৎ পণ্য উৎপাদকের সংখ্যা যেখানে ন্যূন, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দালালদের সহায়তাই কর্ত্তব্য। কিন্তু দিন আসিতেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাশের দৃঢ় মুষ্টি, বজ্র আঁটুনি ঢিল হইয়াছে। সারা দেশ আজ গণজাগরণের বন্যায় প্লাবিত। সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই নিত্য নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনের ঘোষণা জানিতে পারা যায়, কিন্তু অতীতের ন্যায় এই সকলও ব্যর্থ হইবে যদি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ইহার পিছনে না থাকে। নদী-শাসন হইতে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাসায়নিক শিল্প ও কারিগরী বিদ্যা আজ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এই জন্য প্রথমেই জাতীয়তামূলক সামগ্রিক পরিকল্পনা দরকার। ইহার জন্য চাই সতেজ ও নবীন রাষ্ট্রীয় চেতনা, চাই অদম্য সাহস ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা।

পৃথিবীর উৎপন্ন গন্ধকের হিসাব

দেশ	১৯০৯	১৯১০	১৯১৪	১৯১৯	১৯২০	১৯২৩	১৯২৫	১৯৩০
অষ্ট্রিয়া	১২৮৫৬	—	২০৩১৪	১০১৭৩	—	১৫১৩৬	—	—
চিলি	৪৫০৮	৩৭৬৩	১০,০০৮	১৮৯১০	১৩১২৯	১১৩৮০	৮৯২৯	১৮১৮৪
ফ্রান্স	২৯০০	—	—	২২২২	—	২৭২	১৪৭	—
গ্রীস	১০০০	—	—	২২৩৮	—	২২৪৩	১১৮০	—
ইতালী ও সিসিলি	৪৩৫০৬০	৪২৩৫৬০	৩৭৭৮৪৩	২২৬১৬	২৫৮৪৮২	২৫৬৩৪২	২৮৩২৪৯	৩৪৩৮০১
জাপান	৬৬৩১৭	৪৩১৫৫	৭৫৩০৮	১৭৩৮২	১৮৯৭৫	৩৭৪০৮	৮৯৫৮২	৬১৩৭২
স্পেন	২১৭৫০	—	৪৭১৮০	৮৯৫৮৩	—	৬৬৩৭১	৭৭৭১১	—
ইউনাইটেড, ষ্টেটস্	৩০৩,০০০	২৪৭০৬০	৩৪৭৪৯১	৬৮০৮০০	১২৫৫২৪৯	১৩৪৪৯০৪	১৪০৯২৬২	২৫৫৮৯৮১

সাধনা ও সিদ্ধি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারি

আজ সকাল হইতেই হারাধন উপবাসী। তবে উপবাসটা নির্জ্জলা নয়। রাস্তার কল হইতে জলপান তাহাকে করিতে হইয়াছে অনেকবার—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা একসঙ্গে মিটাইবার জন্ত। ফলে ক্ষুধাও মিটে নাই, তৃষ্ণাও যায় নাই। সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাগ্নির সঙ্গে সর্ব্বনাশা তৃষ্ণার শিখাটুকু অনুক্ষণ লাগিয়াই আছে। একমুষ্টি অন্নের জন্ত তাহাকে সারা কলিকাতা সহর একরকম চষিয়াই বেড়াইতে হইয়াছে। এই ভ্রাম্যমান অবস্থায় সে অনেক অযাচিত উপদেশামৃত পান করিয়াছে, অনেক কটূক্তি সহিয়াছে, অনেক লাঞ্ছনাই হাসিমুখে বরণ করিয়াছে, কিন্তু অন্ন জুটে নাই। দগ্ধোদরের জ্বালায় আর এক দফা ভ্রমণ‥করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ক্লান্ত পদযুগল আর চলিতে চাহিল না এবং শেষ পর্য্যন্ত অনন্যোপায় হইয়া হারাধন কর্জন-পার্কের একটা বেঞ্চির কোন ঘেঁষিয়া একেবারে অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল।

শীতের সন্ধ্যা। অগ্রাণ মাসের শেষ দিকেই এবার শীতটা একটু জ াঁকিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কর্জন পার্কের হিমশীতল বাতাস হারাধনের কাছে খুবই সুখসেব্য বলিয়া মনে হইতেছে না, বরঞ্চ ক্রমশঃ অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছে। মানুষের সহিত প্রকৃতির বিরোধ অত্যন্ত পুরাতন, সনাতন বলিলেও চলে। মানুষের কাছে বারংবার পরাভূত হইয়াও প্রকৃতি সুযোগমত প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। অনাহারক্লিষ্ট হারাধনের গায়ে পাতলা সার্টের উপর সুতির কোট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা ও পরণে সুতির প্যাণ্টালুন থাকিলেও, ইহাদের সমবেত চেষ্টা শীতের নির্ম্মম আক্রমণ কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। তাহার হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। খানিকক্ষণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধরিয়া সে শীতের শীতল অনুভূতিটাকেই অস্বীকার করিতে চাহিল, যেমন করিয়া এই অতি সত্য বাস্তব জগতটাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা করে বুদ্ধিমান দার্শনিকেরা, বুদ্ধির প্যাঁচ কষিয়া ও যুক্তির গোলকধাঁধা দিয়া। শেষ পর্য্যন্ত হারাধনকে উঠিতে হইল এবং ঠাণ্ডা হাত দুইটা প্যাণ্টের পকেটে ঢুকাইয়া চারিদিকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মানুষের নাকি অতি দুঃখেও হাসি পায়। সত্যই তাই। প্রমাণ এই হারাধন। হারাধন মনে মনে না হাসিয়া পারিল না। এই বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত জীবন, এই কুৎসিৎ কুশ্রী বিকৃত জীবনযাত্রা, আশা ভরসাহীন অনাগত ভবিষ্যত—ইহারই মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টাই একটা মস্ত কৌতুকের ব্যাপার। একবার এক পাগলের সঙ্গে একটা কুকুরের বিরোধ বাঁধিয়াছিল শালপাতার খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া। দুই পক্ষেই সমান টানাটানি চলিতেছিল। পাগলের কাণ্ড দেখিয়া কয়েকজন দর্শকের দন্তরুচিকৌমুদি ক্ষণে ক্ষণে বিকশিত হইতেছিল। হারাধন অবশ্য হাসে নাই। আজ তাহার মনে হইল হাসাটাই স্বাভাবিক। ইহাইত এই দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনয়। আশ্রয় মানুষের জন্ত, অথচ কত লোক নিরাশ্রয়! আর আহারের প্রাচুর্য্য ও ভোগের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে দুর্ভাগা অনাহারীর অভ্যুদয় একেবারে বেমানান, খাপছাড়া। রাজপথ চলিবার জন্ত, কিন্তু চলিতে চলিতে অকস্মাৎ পা পিছলাইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়া হাস্যকর।

হারাধন সজোরে পা চালাইয়া নির্জ্জন পার্কটা পরিক্রমণ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দেহের ঠাণ্ডা রক্তে একটু উষ্ণতার আমেজ আসিয়াছে, ক্লান্তির ভাবটা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতেছে। একবার দৌড়াইয়া লইলে বোধ হয় শরীরটা আরও একটু গরম হয়। হারাধন চারিদিকে নজর বুলাইয়া লইল। সন্ধ্যার অন্ধকারেও রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নাই। রাস্তা হাঁটিবার জন্ত, দৌড়িয়া চলিবার জন্ত নহে। নিয়মের বিচ্যুতিই অস্বাভাবিক। সুতরাং এই ভিড়ের মধ্যে দৌড়ান খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখিলে হয়ত জনতার সঙ্গে পুলিশই তাড়া করিবে চোর বলিয়া—নয়ত মাতাল মনে করিয়া।

হারাধন চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল।…পুলিশ? জেল? মস্তিষ্ক তাহার অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিল। অবসন্ন মগজে বিদ্যুদ্বেগে চিন্তাশক্তি ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিল…জেল? ঠিক হইয়াছে, হারাধন ভাবিল, আহার ও আশ্রয়ের জন্য আজ জেলই তার কাম্য। জেলে যাওয়া এখন লজ্জার বিষয় নয়। জেলও এখন তীর্থস্থান। যদি কোন উপায়ে আজ রাত্রিতেই জেলে প্রবেশ করিবার পথ সে প্রশস্ত করিতে পারে তাহা হইলে আহার ও আশ্রয় দুই সহজলভ্য হইয়া উঠিবে—শুধু আজিকার রাত্রির জন্য নহে, আগামী কয়েকমাসের জন্য সে নিশ্চিন্ত—কোন কিছুই দাবী করিতে হইবে না, ভিক্ষা ত নহেই। একেবারে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ আশ্রয়, আর নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা। কিন্তু কারাগৃহের লৌহ কপাট সে খুলিবে কেমন করিয়া! হারাধন শিস্ দিতে সুরু করিল, আর ভাবিতে লাগিল—চুরি! ডাকাতি! পকেটকাটা!—

অকস্মাৎ সে লাফাইয়া উঠিল এবং অতি দ্রুতবেগে চৌরঙ্গীর দিকে অগ্রসর হইল। রাস্তাটা পার হইয়াই হারাধন দেখিল একটা হোটেল। উজ্জ্বল দীপালোকিত হলঘরে সাহেব মেমের পানভোজন চলিতেছে। উর্দ্দীপরার দল চরকির মত ফুলস্তবক শোভিত টেবিলে টেবিলে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। ফুটপাতে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে মূল্যবান সান্ধ্য-পরিচ্ছদ-শোভিত পানভোজনকারীদিগকে আর একবার হারাধন ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তারপর সে নিজের পোষাকের দিকে চাহিল। পাৎলুনের উপর সে খুব বেশী ভরসা করিতে পারে না, কারণ পাৎলুনের কৌলিন্য আজ আর নাই। এখন একমাত্র ভরসা ওপেন ব্রেষ্ট কোট। দেখা যাউক এই ওপেন ব্রেষ্ট কোটটা তাহাকে বাঁচাইতে পারে কিনা! ভিতরে প্রবেশ করিয়া কোনমতে একটা টেবিলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে, কোটটাই হইবে প্রকাশমান আভিজাত্যের ধ্বজা—নেপথ্যস্থিত কাপড়জুতার ছুঁচার কীর্ত্তন কেইবা আর শুনিতেছে আর দেখিতেছে। তারপর ইংরাজি খাদ্য তালিকা হইতে ইচ্ছামত—। হারাধন একটু ভাবিল এবং বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল, ইচ্ছামত অর্ডার দিলে খাদ্যের মোট দামের সহিত শেষ পর্য্যন্ত তাহার লুডির ওপেন ব্রেষ্ট কোটের কোনই সঙ্গতি থাকিবে না। ফলে একটা সন্দেহজনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া পুলিশের হাতে ত যাইতে হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দীপরা খানসামাদের কোমল-কর-লাঞ্ছিত কর্ণ বিমর্দ্দন অথবা গলাধাক্কা ফাউ হিসাবে নির্ব্বিবাদে হজম করিতে হইবে! একেবারে পেঁয়াজ ও পয়জার দুই!

হারাধন প্রস্তুত হইল। জুতা জোড়াকে রুমাল দিয়া একবার ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইল, কোট ও পাৎলুনের খোঁচ-খাঁচগুলি টানিয়া টুনিয়া সমতল করিবার বৃথা চেষ্টা করিল এবং অবশেষে সার্টের কলারটা ঘাড়ের উপর উঁচু করিয়া তুলিয়া দিয়া অনাহারক্লিষ্ট মুখে শুষ্ক হাসি টানিবার অভিনয় করিতে করিতে সে একেবারে হোটেলের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এত সূক্ষ্ম চিন্তাপ্রসূত প্ল্যানটা কিন্তু হোটেলের প্রবেশ পথেই ফাঁসিয়া গেল। অর্থাৎ প্রবেশ পথেই নির্দ্দয় দারোয়ানের সশব্দ তাড়া খাইয়া হারাধন ছিট্‌কাইয়া আসিয়া আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল।

পৃথিবীতে যাহাদের আশা করিবার অধিকার আছে হতাশার বেদনা ভোগ করে তাহারাই। অবশ্য হারাধন এই দলের নহে। সংসারের ভাগ্যবান অপর পাঁচজনের জীবনের স্বচ্ছলতার মত দারিদ্র্যই তাহার পরিচিত পরিবেশের মধ্যে অতি সহজ ও স্বাভাবিক। এজন্য তাহার কোন নালিশও কাহারো কাছে নাই। সমুখস্থ ত্রিতল-বাসিনী ধনাগৃহিণীর প্রতি দরিদ্রদীনা কুটীরবাসিনীর দৃষ্টির মতই নিজের দৈন্যে হারাধন নির্ব্বিকার; অবশ্য এই নির্ব্বীর্য্য নির্ব্বেদ তাহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছে ঠেকিয়া ঠেকিয়া। নিয়তির নিয়মে সংসারে যাহারা দরিদ্র তাহাদের বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, দেশ নাই, গৃহ নাই। এই সংসারটাকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহা হইলে নিঃস্বের দল সেই সংসার সমুদ্রে শৈবালের মত—অহরহ অবিরত স্রোতের টানে ভাসিয়া ডুবিয়া চলে। কোথাও ক্ষণেকের জন্য হয়ত আটকাইয়া থাকে কিন্তু শিকড় গাড়িতে পারে না। চোদ্দ বছর বয়সে নিরাশ্রয় হারাধন আজ তাহার চোব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত সময়ের স্রোতে কেবল ভাসিয়াই চলিয়াছে এবং চলার পথে সে অনেক দেখিয়াছে, অনেক শুনিয়াছে। তাই মান অপমান সে বড় একটা গায়ে মাখে না। পরমহংস মহাত্মাদের কাছে

যেমন কাচ ও কাঞ্চন, হারাধনের কাছেও তেমনি মান ও অপমান তুল্য মূল্য। সুতরাং হোটেলের দরোজা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া একান্ত সপ্রতিভভাবেই সোজা উত্তরদিকে চলিতে চলিতে হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া সে ধর্ম্মতলার পথ ধরিল।

খানিক দূর গিয়াই হারাধন দেখিল—একটা পানের দোকান। দোকানের সামনে একজন প্রৌঢ় গোছের সুবেশ ভদ্রলোক পানওয়ালীর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সিগারেট ধরাইতেছেন। দোকানের দরোজার কাছে একটা সুদৃশ্য দামী ছড়ি। রাস্তার ওপারে একটা পাহারাওয়ালা রেলিংএ হেলান দিয়া দণ্ডায়মান—বোধ হয় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার গুরু দায়িত্বের ভারে একেবারে কাৎ হইয়া পড়িতে পড়িতে কোনমতে খাড়া হইয়া আছে! হারাধন সুযোগটা ছাড়িল না। সে ভদ্রলোকটার কাছাকাছি আসিয়া চট্ করিয়া ছড়িটা তুলিয়া লইয়া নিজের গতিবেগ একটু বাড়াইয়া দিল।

বিস্মিত ভদ্রলোকটি চীৎকার করিয়া ডাকিল—অ মশাই, শুনচেন। ছড়িগাছটা আমার। ডাক শুনিয়া হারাধন থামিল এবং বীরপাদক্ষেপে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া গম্ভীর সুরে বলিল—তাই নাকি? তা এক কাজ করুন না? অই ত পাহারওলা দাঁড়িয়ে আছে। দিন না আমাকে ধরিয়ে চুরীর দায়ে।

ভদ্রলোকটী হারাধনের কথায় কেমন যেন একটু বিপন্ন বোধ করিল এবং খানিকটা আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা—না। দেখুন এটা যদি আপনারই হয়, তা আপনিই নিন। এই খানিকক্ষণ আগে একটা চায়ের দোকানে এটা আমি পেয়েচি। আমি ভুল ক'রে—

হারাধন মনে মনে হাসিল, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য্য যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিল—চমৎকার ভুল ত আপনার!

বাদ প্রতিবাদ করিবার জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া ছড়ির ভূতপূর্ব্ব মালিক বুদ্ধিমানের মত সরিয়া পড়িল। হারাধন ছড়ি হাতে আগাইয়া চলিল। জীবনে সফলতা লাভ করিবার সুযোগ খুব বেশী পাওয়া যায় না, অথচ এমন একটা অব্যর্থ চাল কেমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল! কিন্তু হতাশার লক্ষণ তাহার দেখা গেল না। ছেলেবেলাকার একটা ইংরাজি কবিতার কথা মনে পড়িয়া গেল—ট্রাই, ট্রাই, ট্রাই এগেন।

চলিতে চলিতে হারাধন অকস্মাৎ একটা খাবারের দোকানের সামনে থামিয়া গেল। বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাসিত কাঁচ বসানো আলমারীতে নানাবিধ মিষ্টান্ন স্তরে স্তরে সজ্জিত। মিষ্টান্নের মোহন মনোহর মধুর রূপে ও গন্ধে তাহার বিস্মৃতপ্রায় ক্ষুধা-বোধটা আবার অতিশয় উগ্র হইয়া উঠিল এবং সে একান্ত নিঃশঙ্কচিত্তে দোকানে প্রবেশ করিয়া খানদশেক লুচি, গোটা দুই সন্দেশ, দুইটা রাজভোগ ও একগ্লাস পানায় জলের হুকুম করিয়া একটা টেবিলের সামনে চেয়ার টানিয়া বসিয়া শিস্ দিতে সুরু করিয়া দিল। পকেটে একটা পয়সাও নাই। সেই জন্য হারাধন চিন্তিত নহে। বরঞ্চ সে খুসীই। জমার অঙ্ক যাহার শূন্য, হিসাব করিয়া খরচ করিবার ভাবনা তাহার নয়। হারাধন পরম সন্তোষের সহিত পান ও ভোজন শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দোকানদার দাম চাহিয়া বসিল। হারাধনও প্রস্তুত ছিল, বলিল—পয়সা ত আমার কাছে নেই।

বিস্মিত দোকানদার প্রশ্ন করিল—মানে?

মানে? হারাধন হাসিয়া জবাব দিল—এর মানে আর কি বুঝিয়ে বলব বলুন। যদি বলতাম, ব্যাগশুদ্ধ পয়সাগুলো বাড়ীতে ফেলে এসেছি কিংবা গোটা ব্যাগটাই গাঁটকাটার কবলে গেছে, তা'হলে প্রশ্নোত্তরের দরকার হ'ত। বিশ্বাস না হয় পকেটগুলো খুঁজে দেখতে পারেন।

কথা শেষ করিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে হারাধন তাহার দুই হাত উপরে তুলিয়া ধরিল।

এই অদ্ভুত ক্রেতার ধৃষ্টতায় বিক্রেতা অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল—খাবার আগে বল্লেই পারতেন, পয়সা নেই।

অতি প্রশান্ত হাস্যে হারাধন বলিল—তাতে আর কি লাভ হ'ত বলুন। মাঝখান থেকে আমার খাওয়াটাই বন্ধ হ'ত।

দোকানদার এবার বোমার মত ফাটিয়া পড়িল এবং মুখ ভেংচাইয়া বলিল—খাওয়াটাই বন্ধ হ'ত। রসিকতা করবার আর জায়গা পান নি, না? হাস্‌তে লজ্জাও হয় না? জোচ্চোর কোথাকার।

হারাধন বলিল—যদি আমি জুচ্চুরি করেচি মনে

করেন তবে ওইত আপনার কোন রয়েচে। পুলিশ হেড কোয়ার্টাসে বল্লেই ত—

দোকানদার হারাধনের বক্তব্যটা শেষ করিতে দিল না, পুনরায় মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল—বল্লেই ত পুলিশে ধরে নিয়ে যায় না? তোমার মত লোকারকে পুলিশে দিয়ে আমি আদালত আর ঘর করি। কি বল? অত কাঁচা ছেলে আমায় পাও নি। পুলিশের দাওয়াই আমরাও জানি। এই রেমো—বেটাকে ঘাড় ধরে বার করে দেত।

প্রভুভক্ত রামচন্দ্র হুকুম তামিল করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব বা দ্বিধা করিল না এবং স্বীয় শ্রীহস্তদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রের মধ্য দিয়া যে বিপুল গতিবেগ সে হারাধনের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত করিয়া দিল, ভাগ্যে তাহা ফুটপাতের গ্যাসপোস্টে ধাক্কা লাগিয়া প্রতিহত হইয়া থামিয়া গেল, নতুবা ধর্ম্মতলার খণ্ডিত আকাশের নীচে তাহাকে ভূমিশয্যাই গ্রহণ করিতে হইত। হারাধন কোনমতে টালটা সামলাইয়া লইল, কিন্তু আকস্মিক আঘাতের বেদনায় তাহাকে খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। তারপর আর কোনদিকে না চাহিয়া আবার চলা সুরু করিয়া দিল।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া একটা মহাজন বাণী আছে। যে অনামা ভদ্রলোকটী এই নিদারুণ অতি সত্যটী একদা আবিষ্কার করিয়াছিল, হারাধন চলিতে চলিতে সেই মহাজনকে স্মরণ করিয়া মনে মনে নিজের সশ্রদ্ধ প্রণতি না জানাইয়া পারিল না। তাহার মনটা দমিয়া গিয়াছিল, এই মহাজন বাণী যেন তাহাকে নবমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। জীবনের যে নিষ্করুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন একটী পরম সত্যবোধ জাগ্রত হইতে পারে, সে নির্য্যাতনের তুচ্ছতম ভগ্নাংশ কল্পনা করিতে না পারিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। হারাধন ভাবিল, আজিকার এই ব্যর্থতা, এই লাঞ্ছনা সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কাছে কতই অকিঞ্চিৎকর অনন্তপ্রবহমান সীমাহীন মহাকালের কাছে ক্ষণতম মুহূর্ত্তের মত।

হারাধন দ্রুত পা চালাইয়া দিল। কলিকাতার জনবহুল রাজপথে দ্রুত চলিবার বিপদ অনেক। হারাধনও বিপদে পড়িল। তাহারই আগে আগে একটী তরুণী চলিতেছিল। ঘণ্টায় দশ মাইল হিসাবে চলার নেশায় হারাধন তাহার অগ্রবর্ত্তিনীকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সে তরুণীকে যখন দেখিতে পাইল তখন একমাত্র হাত দিয়া ভদ্রমহিলার বরাঙ্গ স্পর্শ করিয়া ঠেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রত্যাসন্ন প্রবল সঙ্ঘর্ষ এড়াইবার আর কোন উপায়ই ছিল না। সে উপস্থিতবুদ্ধিমতই কাজ করিল এবং সম্মুখে দেখিল একজন লালপাগড়ী তাহার দিকে গম্ভীর মুখে চাহিয়া আছে। চকিতে হারাধনের চোখে আবার আশার আলো দেখা দিল। তরুণীর কাছে দস্তুরমাফিক ক্ষমা প্রার্থনার কথাই প্রথমে তাহার মনে আসিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এই দুর্ব্বলতাটাকে সে সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিল এবং তরুণীর দিকে অগ্রসর হইয়া অতি অভদ্রের মত প্রশ্ন করিল—আহা, লাগে নি ত?

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় তরুণীকে কিছুমাত্র রুষ্ট হইতে দেখা গেল না বরঞ্চ সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল—না। তার পরে কণ্ঠস্বরে রসিকতার মধু ঢালিয়া দিয়া তরুণীই আবার প্রশ্ন করিল—আপনার?

হারাধন কেমন যেন হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিবার পর একান্ত স্বাভাবিকভাবেই যে কাণ্ডটা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার জন্ত সে অবশ্য প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু ভূমিকম্পও হইল না। অগ্ন্যুৎপাতেরও কোন লক্ষণ দেখা গেল না, আকাশ ভাঙিয়া চৌচির হইয়া মাথায়ও ভাঙিয়া পড়িল না। বরঞ্চ তাহার দিকে একটা মদির মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তরুণীই বলিল—আপনার?

হারাধন সুমুখে চাহিয়া দেখিল, পাহারাওয়ালা সাহেব চলিতে চলিতে গান ধরিয়াছে—আরে মেরে সেঁইয়া। সাহেবের আর অনর্থক দাঁড়াইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। কারণ অতীত কালের সুরসভাশোভিনী উর্ব্বশী মেনকা রম্ভার উত্তরাধিকারিণী যাহারা অধুনা নিশাচারিণী ও রাজপথ বিহারিণী, ভাগ্যক্রমে তাহাদেরই একজন এক্ষণে তাহার নবলব্ধা সঙ্গিনী। সে মনে মনে হাসিয়া জবাব দিল—লেগেচে বুকে।

তরুণী হাসিয়া বলিল—তা'হলে ত চিকিচ্ছার প্রয়োজন।

—তারই আয়োজনেই ত বেরিয়েচ; হারাধন জবাব দিল। তারপর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর নীচ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল—এইটেরই এখন অভাব। পকেট একেবারে গড়ের মাঠ। ঠিকানাটা দিয়ে দাও, রোগী নিজেই গিয়ে হাজির হবে।

তরুণীর মুখের বর্ণান্তর দেখিবার জন্য হারাধন আর অপেক্ষা করিল না, সরিয়া পড়িল।

একটা প্রায়ান্ধকার গলি দিয়া হারাধন হাঁটিতেছে। ভাবনার তাহার শেষ নাই। মজাও তাহার মন্দ লাগিতেছে না। সে বোধ হয় আজিকার রাত্রির জন্য কলিকাতার পুলিশ কমিশনার বনিয়া গিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অপরাধের সে উর্দ্ধে এবং পিনাল কোর্ডের কোন ধারাই তাহাকে আজ ধরিতে পারিতেছে না। যাহার যাহা ভাবনা, সিদ্ধিও তাহার সেইরূপ হয়—এই ধরণের একটা কথা আছে। কিন্তু কই তাহার বেলায় ত এই অতি প্রাচীন ঋষি বাক্যের অন্তর্নিহিত নীতিটুকু কোন কাজেই লাগিতেছে না? ভাবিতে ভাবিতে হারাধন আবার বড় রাস্তায় আসিয়া উঠিল। রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছে, রাস্তায় লোক চলাচল কমিয়া আসিতেছে। এখন আর কিবা করা যায়।

কিছুই কি আর করিবার নাই? হারাধন উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। আচ্ছা, রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া রাজদ্রোহ প্রচার করিলে কেমন হয়? তারস্বরে চীৎকার করিতে সুরু করিলেই তাহার চারিদিকে ভিড় জমিয়া যাইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ও তৎসঙ্গে রাজপথে যান চলাচল বন্ধের দায়ে ধৃত হওয়া খুবই অসম্ভব নয়। কিন্তু দৃশ্যটা আবার হাস্যাস্পদ না হইয়া উঠে। কি অদ্ভুত ব্যাপারই না আজ ঘটিতেছে!—বিশ্বাস করিবার কথা নয়—একেবারে উপন্যাসের গল্পের মত। যাহা ঘটিবার নয় তাহাই ক্রমাগত ঘটিতেছে—একান্ত স্বাভাবিকভাবে অতি সহজে; যাহা অবিশ্বাস্য তাহাই সম্ভব হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও সে ভাগ্যগুণে আইনের কবল হইতে হয়ত রক্ষা পাইয়া যাইতে পারে। মস্তিষ্কবিকৃতির অজুহাতে নিজেকে অপরের হাস্যাস্পদ করার মধ্যে কোন দণ্ডবিধির স্থান বোধ হয় নাই।

হারাধন চলিতে লাগিল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কোথায় চলিয়াছে, আর কেনই বা সে চলিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেও হয়ত বলিতে পারিবে না। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতেছে, জনবিরল রাজপথে শীতের তীব্রতা অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। মুক্ত স্থানের শীতল বাতাস হইতে শীতার্ত্ত দেহটাকে বাঁচাইবার জন্যই বোধ হয় সে চলিতে চলিতে হঠাৎ বাঁ দিকের গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। গলিটার মুখেই একটা মন্দির; মন্দিরের দ্বার ঈষৎ খোলা—খোলা দ্বারের ফাঁকে মৃদু প্রদীপ শিখার ক্ষীণ আভা। দুয়ারের সামনে একটু রোয়াক। হারাধন ধীরে ধীরে রোয়াকটায় বসিয়া পড়িল। শ্রান্ত দেহে ও উত্তপ্ত মস্তিষ্কে যেন সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দেহের ভিতরের শিরা উপশিরাগুলি শিথিল শ্লথ। এই খানিকক্ষণ আগের উন্মাদনা, উত্তেজনা যেন দপ্ করিয়া নিভিয়া গিয়াছে—উন্মত্ত, উত্তাল রক্তে ক্লান্তির প্রশান্তি। হারাধন যেন একটা সুগভীর শ্রান্তির মধ্যে এলাইয়া পড়িতেছে। সে পিছনের দেওয়ালটায় মাথা রাখিল।

বোধ হয় অনেকক্ষণই সে এই দেওয়ালে মাথা রাখিয়া পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ সে উঠিয়া বসিল—যেন তন্দ্রা হইতে জাগিল। কানে একটা করুণ মধুর সুর ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় মন্দিরের ভিতর হইতে। হারাধন উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। সে এ পর্য্যন্ত জীবনে কখনো শ্রদ্ধা করিয়া কোন গান শোনে নাই। তথাপি হারাধন মুগ্ধ হইল—মোহিত হইল সেই সুর শুনিয়া। সে সুর এই নিশীথ রাত্রে একটি ক্ষীণ প্রদীপ শিখাকে বেড়িয়া বেড়িয়া বাহিরের অন্ধকারের বুকে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। সে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল—হে নিরাশ্রয়, তোমার আশ্রয় ভগবান। হে সর্ব্বহারা পথিক, তোমার দীনতা, কলুষ, হিংসা-দ্বেষ তুমি অতিক্রম কর—তুমি ভগবানের শরণ লও।

গানের মধ্যে বোধ হয় এই কয়টা কথাই আছে এবং এই কয়টি কথাই কেবল সুরের মূর্চ্ছনায় বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, হারাধনের সমস্ত হৃদয়টা যেন গলিয়া গেল; মনে পড়িল মায়ের কথা, নিজ শৈশবের স্মৃতি, বাড়ীর ঠাকুর ঘরের ছবি, ঠাকুরের কাছে মায়ের পূজারিণী মূর্ত্তি। তাহার মা তাহাকে কয়দিন বুকে জড়াইয়া, কাছে বসাইয়া ভগবানের কথা শুনাইয়াছেন, জীবনের সর্ব্বপ্রকার আঘাত অপমানের মধ্যে, সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে, একমাত্র ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে, তিনি উপদেশ দিয়াছেন। একান্ত অকারণেই তাহার চক্ষু দুইটী অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং কেমন যেন একটা অদ্ভুত মোহন মধুর আকর্ষণ সে মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল।

হারাধন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঈষমুক্ত দুয়ারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই—বাহির হইতে গম্ভীর কণ্ঠ শুনিল—কৌন হায় রে!

চমকিত হারাধন পিছনে চাহিয়া অন্ধকারের মধ্যেও দেখিল—পাহারালা।

* * * *

পরের দিন সহরের দৈনিক প্রভাতী কাগজে নিম্নলিখিত একটি সংবাদ বাহির হইল—প্রায় মাসাধিককাল পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের শ্রীশ্রীবৃন্দাবন জীউর মন্দিরস্থিত বিগ্রহের বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত হয়। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত সেই অপহৃত অলঙ্কার উদ্ধার করিতে পারে নাই। কল্য গভীর রাত্রিতে উক্ত মন্দিরের সম্মুখে একজনকে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া বিটের কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অমরাবতী

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

অমরার নিকেতন, চিরকালের চিরন্তুনিয়ার স্বপ্ন—স্বর্গধাম ফানুসের মত কোথায় মিলাইয়া গেছে? মানবের কামনারাজ্যের মহারাণী সেই দেবেন্দ্রাণীকে কোন্ রুক্ষ রসবোধহীন কালরাক্ষস হরণ করিল? অপ্সরার নূপুরমঞ্জরী কেমন করিয়া কোন্ অকাব্য-ক্ষণে স্তব্ধ হইয়া গেল? গন্ধর্ব্বকন্যা আপন কুলগৌরব ভুলিয়া কুলমাঝে জ্যোৎস্নালোককে মধুর করিয়া আর তো কোনও মানব কি দেবকে ভাগ্যবান্ করিতে অভিসার রচনা করে না। রাক্ষসের এত দৌরাত্ম্য—যুগে যুগে স্বর্গ যাকে জয় করিয়াছে, কোন্ মন্ত্রবলে শান্ত হইয়া গেল? স্বর্গ কোথায় গেল?

অতীতের বার্ত্তা গোপনে অলক্ষ্যসঙ্কারে জানাইয়া গেছে—স্বর্গ যায় নাই, স্বর্গ ধ্বংস হয় নাই, হইতে পারে না—স্বর্গকে মানব জয় করিয়া লইয়াছে। বিদেহী পিতৃপুরুষের ভৌতিক স্বর্গধাম নহে, মহাজ্যোতিষ্কের মাঝে কল্পনার অনন্ত সুখধাম নহে, কনকমেরুশিখরে যেখানে ছিল পারিজাত বন, ছিল উর্ব্বশীনূপুরমুখর সুরেন্দ্র-সভা, যে দেশে আনন্দ ছিল শুধু, যে নগরীর তোরণদ্বার মন্দাকিনীজলপূত, সেই পৌরাণিক স্বর্গ মানব অতীতে এক মাহেন্দ্রক্ষণে জয় করিয়া লইয়াছে। মানবের প্রতি জয়সংবাদে প্রতি কীর্ত্তিকলাপে যে দেবতারা স্বর্গবিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেন, প্রতি কাব্যে মহাকাব্যে নাটকে ও পুরাণ কথায় যে দেবাশীষবৃষ্টি সাহিত্যের মধুকুঞ্জ গুঞ্জরিত করিত, পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রশস্ত গগনে যে স্বর্গ বিমানমুক্ত বিহঙ্গগতিতে বিলাস করিত, মানবকন্যার স্বয়ম্বরে যাঁরা মোহন চাতুর্য্যের অভিনয় করিয়া কাব্যধারা উজ্জ্বলিত করিয়াছেন, যাঁরা অরিন্দু মানবের বিজয় অশ্ব হরণ করিয়া ঈর্ষার পরিচয় দিয়াছেন—আবার মানবশ্রেষ্ঠকে ইন্দ্রত্বে বরণ করিয়া গুণগ্রাহিতায় মহিমান্বিত হইয়াছেন, যাঁরা মহর্ষির তপোবল ক্ষুন্ন করিতেন অপ্সরার প্রতজিনায়, ক্রুদ্ধ মহর্ষির অভিশাপ গ্রহণ করিয়াও যাঁরা তপোবনের তপ যজ্ঞীকে কাজসজ্জাবে মুগ্ধ করিতেন, পুরাণ-কথা দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার পথে অকস্মাৎ যে আলাপ কাতমধুর আখ্যানে মুক্ত কাব্যবিন্যাসে অদার্শনিকতার পরিচয় দান করে—স্বর্গকে কেন্দ্র করিয়া সে সব কাহিনী, সেই কনকমেরু-মহিমা মহাকালের কপোলে গৌরব-টীকা অঙ্কিত করিয়া শূন্যে মিলাইতে পারে না। মানব সেই কনকমেরু শিখর জয় করিয়াছে। পৌরাণিক স্বর্গরাজ্য আজ মানবের ইতিহাসে এক স্বর্ণময় অধ্যায়।

কনকমেরুর সর্ব্বোচ্চ শিখরে ছিল দানব রাক্ষসের অগম্যপুরী ব্রহ্মসভা। মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় উপমায় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ যে মধ্যযুগীয় হিমাচল, পৌরাণিক কনকমেরু সেই হিমাচল-বংশীয় এবং সুমেরু সেই হিমাচলশৃঙ্গ। সেই হিমাচলশৃঙ্গেই মনোরম তুষার-তীর্থে মর্ত্ত্যের স্বর্গধামের শেষ সোপান। হিমাচলের পরম্পরাসক্ত শৃঙ্গমালায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি আটজনের জন্য যে বিভিন্ন পুরী, তাহারই সমষ্টি লইয়া অমরাবতী। সেই হিমাচলেই—পশ্চিমে বর্ত্তমান দ্বারকা যেখানে পর্ব্বতশ্রেণী সাগরে মিশিয়াছে, পূর্ব্বে মলয় উপদ্বীপ যেখানেও সাগর পর্ব্বতশ্রেণীকে গ্রাস করিয়াছে, উত্তরে সুমেরু ও ক্রমান্বয়ে কনকমেরু, মন্দ, মন্দর ও শ্রীকণ্ঠ পর্ব্বত ও অসংখ্য শৃঙ্গমালা এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য ও গন্ধমাদন, এই শিলাময় নিকেতনে দেবদানব গন্ধর্ব্বেরা আপন আপন আভিজাত্য রচনা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক মেরুকর্ণিকার পদ্মপত্রবিকাশ শোভা অলঙ্কারহীন করিলে, কনকমেরু ও সুমেরুর স্থান বর্ত্তমান পামীর সহিত সমগ্র হিমালয় অঞ্চল বলিয়াই অনুমান হয়। বর্ত্তমান কাশ্মীর ছিল রাক্ষস, কি গন্ধর্ব্ব পুরী। পাঞ্জাব প্রদেশের বর্ত্তমান জলন্ধর পৌরাণিক জলন্ধর পুরীর নাম বহন করিতেছে। দানব জলন্ধর স্বর্গ জয় করিয়া হিমাচল চূড়া বিজিত করিয়া যখন মহাদেব শঙ্করের নগরীর তোরণদ্বার হুঙ্কারকম্পিত করিল, তখনই শঙ্করবীর্য্যে তাহার হুঙ্কার চিরস্তব্ধ হইয়া গেল। পুরাণশাস্ত্র দক্ষযজ্ঞের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কনখল। আজও আছে সেই হিমাচল, সেই মানস ও বিন্দু সরোবর, নাই পারিজাত বন বৈভ্রাজ কি চৈত্ররথ, নাই নন্দা কি অলকানন্দা। বর্ত্তমানের কেদার, বদরী ও

অমরনাথ লিঙ্গপুরাণের শঙ্করধামগুলির সহিত অপরিচিত বলিয়া মনে হয় না। হিমাচলের প্রতি অনাবিষ্কৃত তুষারতীর্থে স্বর্গ-আভিজাত্যের কত স্মৃতি লুপ্ত রহিয়াছে। স্বর্গনদীর অববাহিকা পর্ব্বতমালার মধ্যপথে কোথাও হয়ত ক্ষীণ পরিচয় এখনও রাখিয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই সংজ্ঞায় অতীত ভারতের সমগ্র মানব জাতিকে ভিন্ন করিয়া আর্য্য সংস্কৃতির বিজয় অভিযানে বর্ত্তমান আমরা যখন গৌরব বোধ করি, তখন মানব-সভ্যতার এক বিশাল অধ্যায় পার্শ্বে রহিয়া যায়, দেবদানবের সংগ্রামকে আরব্যরজনী ও গল্পলহরীর কাহিনীর মত আমরা পাঠ করিয়া যাই বিনা প্রশ্নে ও কৌতূহলে।

এই হিমাচলেই কশ্যপপুত্রেরা স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সারা পৃথিবীকে তাঁহারা বিজয়গর্ব্বে ভোগ করিয়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইলেন। সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিল, সারা সমুদ্রাঞ্চল জয় করিয়া যে মধু সঞ্চয় হইল, সসাগরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য দোহন করিয়া যে শক্তিলাভ হইল, আপনাদেরই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দানবদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া দেবগণ রাজনীতির প্রথম সূত্রে আত্মীয়বিচ্ছেদ রচনা করিলেন। যক্ষেরাও সমুদ্র দোহন করিল। যক্ষেরাও ঐশ্বর্য্যবান্ হইল। দানবও তাই যক্ষদের ঐশ্বর্য্যসম্ভারে ঈর্ষান্বিত হইয়া সমুদ্রাঞ্চলের যক্ষরাজ্য জয় করিয়া লইল। দেবগণ সমস্ত সমুদ্ররাজ্যকে সপ্ত পাতালে ভাগ করিয়া বরুণকে তাহাদের অধিপতি করিলেন। ইন্দ্র হইলেন তাঁহারও উপরে। ইন্দ্র ও বরুণ রাজ উপাধি মাত্র। পাতাল রাজ্য জনশূন্য ছিল না। পাতালবাসীদের নাম হইল নাগ। সেই বিশাল নাগরাজ্য লইয়া চিরকাল দেবদানব, যক্ষ ও রক্ষে বিবাদ ও সংগ্রাম। গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের ইতিহাস এমনই তো সংগ্রামমুখর, অথচ পৌরাণিক ভারতের দেবদানব মারণযজ্ঞে যেখানে পরস্পরের ঐশ্বর্য্য-গরিমা ক্রমঃক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যেখানে দেবদানব বিভেদ ক্রমশঃ রাজনীতি ভুলিয়া জাতি বিদ্বেষই অবলম্বন করিয়াছে, সেখানে যে নব মানবসভ্যতার জন্ম হইয়াছে, সেই পৌরাণিক কথায় আমরা কতটুকু মূল্য দিতেছি।

অমরাবতীর আটটি পুরীতে আটটি পুরসভা। ব্রহ্মসভা, বিষ্ণুসভা ইত্যাদি নামে সভাগুলির পরিচয় এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি ইঁহারাই আপননামে পরিচিত সভাগুলির অধিনায়ক বা সভাপতি। ইন্দ্রসভায় সসাগরা দেবরাজ্যের মানদণ্ড-মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। সেখানে রাজনীতি আলোচিত হইত, কাব্য নাটকও সম্মানিত হইত, বীণাঝঙ্কার অপুরস্কৃত রহিত না। সারা পৃথিবী হইতে করগ্রহণের প্রয়োজন ছিল না—সে চিন্তাও ছিল না, কারণ স্বর্গরাজ্যে ঐশ্বর্য্যসম্ভারের কোনও অভাব তো ছিল না। শুধু যজ্ঞভাগ গ্রহণেই অধিকার স্বীকৃত হইত। প্রতি যজ্ঞে অমরাবতীর আটটি সভাপতির জন্যই যজ্ঞভাগ রাখিতে হইত। এ এক আশ্চর্য্য বিধি।

পৌরাণিক যজ্ঞ শুধু হোমযজ্ঞ নহে—শুধু সামগান নহে, শুধু বৈতালিকী নহে। ঋষিদের শাস্ত্রমীমাংসার জন্যই যজ্ঞ আহ্বান করা হইত সত্য, কিন্তু সে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পাইতেন সারা ভারত—নিখিল মানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও দেবতা। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞভাগ পাইতেন বলিয়া দানবদের চিরকালের আপত্তি, তাই তাহারা কোনও দিন আমন্ত্রণ পায় নাই। তাই প্রতিবাদে ও হিংসায় তাহারা বারে বারে যজ্ঞ হরণ করিয়াছে। তাই দানবদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তও নিখিলজন—আমন্ত্রণ। নৈমিষারণ্যে শুধু শাস্ত্রবিতর্কতরে যজ্ঞ আহরণ হইত না—যজ্ঞকে আহরণ করা এই কথারও সার্থকতা যে তাহা হইলে থাকিত না। প্রতি যজ্ঞে বহু ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইত। নিখিলজনের সেই শ্রদ্ধার দানে তপোবনের শক্তি ও বল রক্ষিত হইত, তপোবনের বহু অধিবাসীকে এইভাবে যথেষ্ট সংখ্যক রক্ষীবাহিনী রাখিতে সাহায্য করা হইত। তপোবন বলের পরিচয় পুরাণ কথায় অভাব নাই। যজ্ঞভাগেই ব্রহ্মসভা, বিষ্ণুসভা প্রভৃতির সংরক্ষণ হইত। সেই যজ্ঞভাগ গ্রহণেই ইন্দ্রের এত বলবীর্য্য প্রকাশ সম্ভব। অশ্বমেধ রাজসূয় যজ্ঞবিধানে রাজরাজের যেমন সর্ব্বাধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত, যেমন শত অশ্বমেধে মানবরাজের দেবরাজবল সঞ্চিত হইত, তেমনি ব্রহ্মযজ্ঞে তপোবন শক্তি সমৃদ্ধ হইত। সমৃদ্ধ তপোবন শক্তি ইন্দ্রসভাকে বড় মানিত না, কিন্তু ব্রহ্মসভা কি বিষ্ণুসভা প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা করিত। তাই শক্তিমান্ ঋষিকে বারে বারে স্বর্গ প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অপূর্ব্ব সেই পৌরাণিক সভ্যতার বিধান, একদিকে রাজনীতির উপরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে ধর্ম্মবলের উপরে সর্ব্বাধিনায়কত্ব। একদিকে ইন্দ্রসভার অধীনে সসাগরা পৃথিবীর শাসন ও গ্রহণ ভার, অপরদিকে ব্রহ্মসভার অধীনে ও উপদেশে চালিত ইন্দ্রসভা। তপোবনময় ভারত সেই ব্রহ্মসভা বিষ্ণুসভা ও মহেশ্বর-সভাকেই অন্তরের শ্রদ্ধা দান করিয়াছিল। ভোগনিকেতন ইন্দ্রধাম মানবের আকাঙ্ক্ষিত নহে। যেমন পুরূরবার রাজধানী ও নৈমিষারণ্যে বিভেদ ও বৈষম্য, তেমনি ইন্দ্রসভা ও ব্রহ্মসভায়। নৈমিষারণ্যের স্বর্গ-গরিমায় পুরূরবা প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার মহারাজ গৌরবকে মহর্ষিমণ্ডিত নৈমিষারণ্য খর্ব্বিত করিয়াছিল। ক্ষত্রশক্তি পৃথিবীর রক্ষণ করিত, কিন্তু ব্রহ্মণ্যশক্তি তাহার ভরণ করিত। তাই ক্ষত্রশক্তি ও ব্রহ্মণ্যশক্তি উভয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। তাই স্বর্গেও ইন্দ্র-সভা ও ব্রহ্মসভা।

অযোধ্যা হইতে ইন্দ্রপুরী পর্য্যন্ত মনুবংশ-তিলক রথ চালনা করিয়াছিলেন। সেদিন ইন্দ্রসভার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন 'মর্ত্ত্যের' মানব। মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গ বেশী দূর নহে, তাই এ রথচালনা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মসভা কি বিষ্ণুসভা? স্বর্গের আটটি সভাতেই মানব গন্ধর্ব্ব যক্ষের সিদ্ধপুরুষেরা সদস্য হইতেন। ইন্দ্রসভায় সিদ্ধ মানব সদস্য হইয়াছেন—ইন্দ্রসভার অধিনায়কত্বও মানব করিয়াছে। ব্রহ্মসভায় সিদ্ধ মানবেরা দেবগন্ধর্ব্বের সহিত সদস্য হইয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্ম-সভার অধিনায়কত্ব? এখনও মীমাংসায় উপনীত হই নাই, কিন্তু জনক-বংশীয় রাজর্ষির নাম ব্রহ্মা শব্দের পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ইহা প্রমাণিত হইলে, ব্রহ্মসভা পর্য্যন্ত 'মর্ত্ত্যে'র আয়ত্তাধীন ইহাই সিদ্ধ হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—ইঁহারা কি সগুণ দেহী ও মানবজাতি? যে শঙ্কর দক্ষকন্যার পতি, তিনি তো মানবেরই জাতি।

প্রথম ব্রহ্মা ও বিষ্ণুও তাহাই। যেমন ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যশক্তির পরিচয়ে ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রত্ব, তেমনই সাধনশক্তিও সিদ্ধত্বের পরিচয়ে ব্যক্তিবিশেষের ব্রহ্মত্ব ও বিষ্ণুত্ব বা শঙ্করত্ব। দক্ষরাজা যজ্ঞ করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীনে একাদশ অবস্থাপ্রাপ্ত বহু রুদ্র পিনাকপাণি রহিয়াছে, শঙ্করকে রুদ্রত্ব পরিচয়ে বিশেষ আমন্ত্রণ পাঠাইবার কারণ তাঁহার নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এই অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে অনেকেরই খুশী হইবার কারণ থাকিবে না, কিন্তু পৌরাণিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব আলোকসম্পাৎ হইবে। কৈলাসে, শ্রীকণ্ঠে ও মন্দরে একই সময়ে শঙ্কর পার্ব্বত্য বিহার করিতেছেন, এই পৌরাণিক উক্তিতে ইহাই কি প্রমাণ হয় না যে পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে শঙ্কর পার্ব্বতীর পাষাণী প্রতিমা ভক্তিতে প্রাণময়ী হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছে। তাই তো লিঙ্গপুরাণের মাহাত্ম্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য সুরসভায় এবং গন্ধর্ব্বপুরেও সেই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা বিষ্ণু কি শঙ্কর অনন্ত পরমায়ু নহেন। প্রথম ব্রহ্মা, প্রথম বিষ্ণু ও প্রথম শঙ্করের নামানুসারে ব্রহ্মসভা বিষ্ণুসভা ও শঙ্করসভার অধিনায়কের পরিচয় হইয়াছে। ইহার আরও সুন্দর প্রমাণ আছে। জলন্ধর দানব বিশ্ব জয় করিয়া স্বর্গের সকল সুরসভা জয় করিয়া শঙ্কর শক্তিকে বীর্য্যে আহ্বান করিলেন, মানবজাতিকে জানাইলেন—'শঙ্করকে জয় করিতে পারিলেই, তোমাদের ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব সকলই দান করিতে সক্ষম হইব।' ইহার অর্থ এই যে শঙ্করকে পরাজিত করিতে পারিলেই স্বর্গকে সম্পূর্ণরূপে বিজিত করা যাইবে এবং ব্রহ্মসভা বিষ্ণুসভা শিবসভা প্রভৃতির অধিনায়কত্ব লাভ সম্ভব হইবে।

…উপরে মহাকাশে জ্যোতির্ম্ময়ী অনন্তবাহিনী অলকানন্দা। সেই স্বর্ণদীর ধারায় সৃষ্টি স্নান করিতেছে কল্পেকল্পান্তে। তাহা হোতে নিয়ত বিশ্বে প্রাণধারা ঝরিতেছে—তাহাই অমৃত, তাহাই সোম। মহাযোগী ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর ও সিদ্ধগণ সেই অনন্ত সোমধারা লাভের জন্য ধ্যানমগ্ন। উপরে অনন্ত বিস্ময়ের রাজ্যে কাহারা মহাযজ্ঞ করিয়া এই মহাসোম বিতরণ করিতেছেন! সেই পৌরাণিক সভ্যতার দিনে মানব সেই বিস্ময়ে কনকমেরু শিখরের স্বর্গরাজ্য তুচ্ছ করিয়া হিমাচলের তুষারতীর্থে মহাস্বর্গ মহাসুখ কামনায় সাধনা করিয়া চলিয়াছিল। তাহাদের সেই সাধনায় মানব ক্রমশঃ নিখিল জ্ঞানশাস্ত্র লাভ করিয়াছে। দেবদানব যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব্ব ও মানবের পরস্পরে ক্রমঃসংমিশ্রণে যে বিশাল সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, তাহাতে কনকমেরুর মহিমা 'স্বর্গ' হইতে 'মর্ত্ত্যে' নামিয়া আসিল, হিমাচল নিষিদ্ধ রহিল না কোনও জাতির নিকট, 'স্বর্গ' আর যজ্ঞভাগ পাইল না পূর্ব্বের ন্যায়। মহাভারতের দিনে ক্ষীণ স্বর্গ মহিমা লুপ্ত হইয়া গেল নব মহামানব জন্মে। একই পুরুষে ভোগ ত্যাগ প্রেম বিলাস ও বিরাগের চরমতাসাধন, একত্র সর্ব্বগুণসমন্বয়, নব ভারতের জন্মলগ্ন সূচনা করিয়া সেই বিরাট মহামানব পরিচয়, ধরার মাটীর মূল্য বাড়াইয়া দিল, তুষারতীর্থের সাধনমার্গ মাটির ধূলিকণার কাছে হারস্বীকার করিল, নূতন স্বর্গ রচনা হইল ধরার ধূলিকণায়।

অমরাবতী ম্লান হইয়া গেছে বহুদিন, কিন্তু মহাকাশের ছায়াপথে যে অম্লান স্বর্গ লুকাইয়া আছে তাহার কামনা চিরমানবের অন্তরসাথী।

লাখো বছরের ইতিহাসে তুমি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নির্ব্বাক ছায়া-চিত্রের যেন প্রেমের নাট্যখানি
আধো ঘুম আর আধো জাগরণে, রচনা করেছ রাখি!
যে স্বর গোপন গুহাতে ঘুমায় তাহারে জাগায়ে শেষে
প্রস্তাবনায় গাহিলে যে গীতি এসে ধীরে ধীরে হেসে।
অভিনয় সুরু তোমাতে আমাতে—বলো—সে কি অভিনয়!
জয় পরাজয়ে পরিচয় আর প্রীতিমাখা বিস্ময়।
সেই কবেকার আলাপন মনে দোলা দিল অন্তরে,—
আলিঙ্গনের লুব্ধ চাহনি নৈশ ভোজের পরে।

দশমীর চাঁদ মধ্য গগনে শুক্লা তিথির মাঝে,
একটি উল্কা উলসিয়া উঠি মিলালো ধরার কাছে।
কবিতার মত হেরিনু তোমারে লীলাচঞ্চল ভরা,
অশ্রুনদীর মোহানা ছাড়ায়ে তুমি মোরে দিলে ধরা।
ঘরের সীমায় পরালে আমারে কণ্ঠে বাহুর মালা,
বাহিরে আকাশ তারকায় ঢাকা, ভিতরে প্রদীপ জ্বালা,
হৃদে রাত্রি-স্মৃতি বিজড়িত তোমার কুটীর দ্বারে,
যবে ফিরেছিনু আবেশে আবেগে মদন অভিসারে।

মনে হয় যেন তোমারে দেখেছি আদিম উষার ক্ষণে,
আনমনা তুমি বেণীতে লতিকা জড়ায়ে সঙ্গোপনে
দূরপানে চেয়ে অরণ্য পথে ছিলে ভাবে বিহ্বল,
প্রথম কাব্য-ছন্দের দোলে চঞ্চল অবিচল।

বহু দূরে কোন্ তমসা নদীর উতলা উদাস কূলে,
পর্ণকুটীরে প্রথম কবির হৃদয় উঠিল দুলে।

লাখো বছরের ইতিহাসে তুমি অশ্রু হাসির রেখা,
যুগে যুগে মোরে নব নব রূপে মায়ালোকে দিলে দেখা।
সভ্যতা চলে প্রগতির পথে, তুমিও প্রগতিময়ী,
আদিম চেতনা কামনা তোমারে তথাপি ক'রেছে জয়ী।

বাসনার বাতি জ্বলিছে তেমনি যৌবন শিখা ধরি
তোমারে পাওয়ার বাসনায় মন গানে ওঠে গুঞ্জরি।
তুমি আছ তাই সব সুন্দর জীবনের উল্লাসে,
চলে গেলে কভু জাগিবে কি চাঁদ অনন্ত নীলাকাশে!

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৭

আহারাদির পরে অমল কি একটা পড়িতে পড়িতে গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। গৌরী মাতার জলযোগের বন্দোবস্ত করিতেছে—

গৌরী ঘরে ফিরিয়া আসিল খোকার দুধ লইয়া। খোকাকে তুলিতে যাইবে এমন সময় অমল বলিল—দাঁড়াও ও উঠ্‌লে খাওয়াবে। সে অঙ্কগুলো হয়েছে তোমার? এবার পরীক্ষা তোমায় দিতেই হবে···

গৌরী জনান্তিকে একটু হাসিয়া কহিল—তাই, এবার দিতেই হবে। কিন্তু অঙ্ক যে সব ভুল—

—ভুল? কখনই না, চেষ্টা করেছিলে।

—হুঁ।

অমল বই বাহির করিয়া নিবিষ্টমনে কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল—এত সোজা ফ্যাক্টর। এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনস বি ফরমুলার—এই ছাখো—

গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অমলের মুখের পানে চাহিয়া আছে—খাতার সাদা পৃষ্ঠায় কি লেখা হইতেছে সেদিকে তাহার মন ও চোখের কোনটাই নাই।

অমল আগ্রহে বুঝাইতেছে—এই ছাখো, টোয়াইস এককে যদি এ ধরি, তবে—

গৌরী অমলের শুষ্ক চুলগুলির ভিতরে আঙুল পুরিয়া দিয়া কহিল—এঃ, তোমার ত চুল পেকে গেছে, এই যে পাকা চুল—

অমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—রাখো এখন পাকা চুল, এ ফ্যাক্টরটা বুঝলে?

গৌরী গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া কহিল—কিছুই বুঝিনি!

—যা বলেছি, শুনেছ—

—কানে ত তুলো দিয়ে নেই যে শুনবো না—

—তবে, বুঝলে না কেন?

—বা রে! তুমি বুঝোতে পারলে না, তার আমি কি ক'রবো—

গৌরী হাসিতেছে দেখিয়া অমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—এত ছেলেকে বুঝোতে পারলুম আর তোমাকে পারলুম না?

—ঐ রকমই বুঝিয়েছ—নিজে না পেরে শেষে কেবল ধমক আর বকুনি—গৌরী এইবার হাসিয়া ফেলিল!

অমল খাতার উপর পেন্সিল রাখিয়া একান্ত হতাশার চুপ করিয়া গেল। গৌরী বুঝিল, অমল সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাই কহিল—ও অঙ্ক এখন হবে না—ইতিহাস পড়ি, কেমন?

অমল উৎসাহিত হইয়া বলিল—পড়, আচ্ছা কাল যা শিখেছ ব'ল ত—বল কলম্বস কে?

গৌরী গম্ভীরভাবে ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিল—মহম্মদ তোগলকের বেয়াই—

অমল রাগে ক্ষোভে বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—যাও, তোমার কিছু হবে না। আমি আর কিছু বলব না, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর—

গৌরী পিছন ফিরিয়া কেবল হাসিতেছে, অমল ক্রোধে গম্ভীর মুখখানা মলিন করিয়া বসিয়া আছে। গৌরী আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া অমলের ক্রোধ উপভোগ করিতেছিল। বইখানা কুড়াইয়া লইয়া কহিল—ইস্ আমার বইখানা ছিঁড়ে দিলে ত? মার কাছে বলে দেব—উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সম্ভবতঃ একটু করুণা বোধ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—আচ্ছা, তুমি রাগ ক'রলে?

—না রাগ ক'রবে না। এতে রাগ হয় না কার?

—আচ্ছা, কলম্বসের মেয়ের সঙ্গে তোগলকের ছেলের বিয়ে কি কিছুতেই হতে পারে না?

অমল চুপ করিয়া রহিল—

গৌরী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখখানা বিরস করিয়া বলিল, —আচ্ছা এমনও ত হতে পারে যে, গোপনে বিয়ে হ'য়েছিল, গন্ধর্ব্ব মতে। ওই ইতিহাস যাঁর লেখা, তিনি জানেন না।

অমলের ক্রোধ উবিয়া গিয়াছিল, সে বলিল—তোমার লেখাপড়া হবে না!

—লেখাপড়া আমার দরকার নেই।

—দরকার নেই? বল কি? এই বিরাট পৃথিবীতে কত কি আছে, সভ্যতার কি উন্নতি হ'ল, এ সমস্ত জানবারও কি ইচ্ছে হয় না তোমার?

—তুমি জানো, ওই ত আমার হ'ল। ধোপার খাতা লিখ্‌তে পারি, চিঠি লিখ্‌তে পারি, বাজার খরচ ও দুধের হিসাব রাখতে পারি, আবার কত পড়বো?

—হ্যাঁ—বিদ্যে একেবারে গজ্‌ গজ্‌ করছে, আর কি জান্‌বে? ছেলেমেয়ে কি ক'রে মানুষ ক'রতে হয়, সে সব না জান্‌লে তারা ত মারা যাবে—

—তুমি ত এত পড়েছ, সে সব জানো?

—জানি বৈ কি?

—তবেই ত আমার জানা হ'ল, তুমি যেমনটি বলে দেবে, আমি ঠিক তেমনটি ক'রবো, তা হ'লেই ত হবে।

—আর আমি ম'রে গেলে—তখন?

গৌরী চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছিঃ, তুমি অমন কথা ব'ললে—যাও তোমার সঙ্গে আর আমার কথা বলার দরকার নেই, খুব হ'য়েছে—হাসি ঠাট্টার মধ্যে—

গৌরী একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছে এমনি অভিমান-স্ফীত মুখ লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। অমল তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—ওটা কথার কথা, আচ্ছা ব'সো, একটা মজার কথা বলি শোনো—খুব মজার কথা—

গৌরী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে চেয়ারটায় বসিলে সে বলিল—আচ্ছা এমন দেশ আছে জানো, মানুষে মানুষ খায়, মানুষের মাংস খেতে ভালবাসে—

—ও সব গাল-গল্প, আমি বিশ্বাস করিনে। তোমার যত সব আজগুবি কথা!

—বিশ্বাস কর আর নাই কর, আছে। এ জান্‌তে তোমার কৌতূহল হয় না।

—খুব।

—তবে না পড়লে জান্‌বে কি ক'রে?

—তুমি গল্প কর, আমি শুনি, তা হলেই হবে। খোকা যে বিরক্ত করে, পড়বো কখন?

অমল পরাজিত হইয়া বিষয়ান্তরে মন-সংযোগ করিল—আচ্ছা এমন দেশ আছে জানো, যেখানে বিয়ে নেই; মেয়ে পুরুষ সব স্বেচ্ছাচারী।

গৌরী তাহার ডাগর চোখ দুইটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল—ও তুমি সেই দেশে যাবে বুঝি? সেই জন্যেই এই সব খুঁজে খুঁজে বের ক'রছো—

অমল হাসিয়া কহিল—সেই তোমার উচিত শাস্তি, আমাকে তুমি অবহেলা কর। হিন্দুর যদি তালাক দেওয়া থাকতো, তবে তোমাকে এমন জব্দ ক'রতুম—

গৌরী হাসিয়া কহিল—আবার বিয়ে করতে?

—ক'রতুম বৈ কি।

—কাকে? অপর্ণাকে না?

অমল চমকাইয়া উঠিল। বিবাহের পরে এই সাত বৎসরের মাঝে এই প্রথম গৌরীর মুখে অপর্ণার নাম সে শুনিল। মনের কোণে অপর্ণা আজ মৃত নয়, তাই গৌরীর মাঝে সে অপর্ণার সম্পূর্ণতাকে চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হয়। অমল জবাব দিল না, অত্যন্ত কাতর দৃষ্টিতে সে গৌরীর পানে চাহিয়া রহিল। গৌরী বুঝিল না তাই বলিল—অপর্ণার মত লেখাপড়া কি আমি শিখতে পারি? শুধু শুধু পরিশ্রম কর কেন?

অমল নিঃশব্দে উঠিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। একটি কথায় সমস্ত আলোচনা সে বন্ধ করিয়া দিল—আমার ভুল হ'য়েছে ক্ষমা ক'রো—

শাশুড়ী, স্বামী, ঠাকুর, গণ্ডাখানেক চাকর, একজোড়া ঝি, দারোয়ান, টেলিফোন, মোটর, রেডিও, লাইব্রেরী, প্রচুর মাসিক পত্রিকা—এই লইয়া অপর্ণার সংসার। একটি সন্তান তাহার হইয়াছিল কিন্তু চারদিন মাত্র জীবিত থাকিয়াই মারা গিয়াছে। কাজ-কর্ম্ম নাই, প্রচুর অর্থ, অলস সময় কখনও গান করিয়া কখনও বই পড়িয়া সে অতিবাহিত করে। কখনও দোতলার ঝুলবারান্দায় বসিয়া বই পড়ে, নীচের ফুল বাগান হইতে মাঝে মাঝে একটা মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসে। বাগানের পার্শ্বেই একটা প্রাচীর, তারপর একটা একতলা ছোটো বস্তী। কয়েক হাত প্রশস্ত একটা বাঁধানো উঠান, টালির চালার রান্নাঘর। এখানে একটা বধূ আর তাহার দরিদ্র স্বামী বাস করে। উহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা এবং উপভোগ করা তাহার একটা কাজ।

বেলা এগারটা। অজিত কোর্টে গিয়াছে। অপর্ণা ইজিচেয়ারে শুইয়া, বুকের উপরে একখানা ইংরাজি

উপন্যাস খুলিয়া, অদূরে ঐ বধূটির কাজ অনিচ্ছাকৃত ভাবেই দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—তাহার জীবন ওই দম্পতির নিবিড়তায় ভরিয়া উঠে না কেন? এই সাত বৎসরে তাহাদের মধ্যে নৈকট্য গড়িয়া না উঠিয়াছে এমন ত নয়, তবুও একটা অবচ্ছ পর্দার মত তাহাদের দুইটি মনের মাঝে কিসের যেন একটা ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে—সবই আছে কিন্তু পরিপূর্ণতা নাই, একটা একাকীত্ব অজ্ঞাত অস্বস্তির গোপন কাঁটার মত অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করিযা দেয। ভাবে—এই পৃথিবীর জনারণ্যের মাঝে সে অমল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বিদায় দিনে অমলের সেই বিষণ্ণ মলিন ছলছল মুখখানি আজ প্রাচুর্য্যের প্রলেপে প্রায় অদৃশ্য, তবুও দেহাতীত একটা বাসনা-শঙ্কিত আঁখি মেলিযা জাগিযা আছে—অদূরে নীচে ওই বধূটি একখানা নীল বাগেরহাটের শাড়ী পরিয়া কলতলায় বসিযা জামা কাপড়ে সাবান দিতেছে। স্বামীর পাঞ্জাবী, গেঞ্জি, বালিশের ওড়, একবার ধুইয়া রৌদ্রে দিল কিন্তু নীল বেশী হইয়াছে মনে করিয়া পাঞ্জাবীটার আবার সাবান দিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে স্নান করিয়া, ভিজাচুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া ঘরে গেল—

একটি শিশু মাঝে মাঝে উঠানে বারান্দায় খেলা করিয়া বেড়ায়—অপর্ণা তাহার সুদৃঢ় পদক্ষেপ ও চলিবার ভঙ্গিটি চিনে। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক টুকরা সাবান পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। এক বাগতি রান্নার জল আলাদা তোলা ছিল, সেই জলে সাবান গুলিয়া সে সমগ্র পেটে মাখিয়াছে, যতই ফেনা হইতেছে ততই সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপন মনে হাসিতেছে—উল্লাসে মাঝে মাঝে কিছু ফেনা মাথাতেও তুলিয়া দিতেছে। একবার তাহার দিকে চাহিয়া হয়ত তাহার এই অভাবনীয় কর্ম্মপটুতা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল—

আনন্দের আতিশয্যে অবশেষে সে বালতীর মধ্যে বসিয়াই সাবান সহ জলক্রীড়া আরম্ভ করিল। জল ছিটাইয়া, মাথায় দিয়া আপন মনেই হাসিতেছিল। যেমন করিয়াই হোক, সাবানের ফেনা বোধ হয় কিছু চোখে গিয়াছে—জ্বালা করায় হঠাৎ তারস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অভিমন্যুর মত বালতি-ব্যূহের প্রবেশ পথ তাহার জানা ছিল, কিন্তু বাহির পথ তাহার জানা ছিল না।—অপর্ণা আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

বধূটি হস্ত-দন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের এই দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপর্ণার দিকেও চাহিয়া দেখিল, সেও হাসিতেছে। সম্ভবতঃ কহিল—যেমন দুষ্টু! ফোকাও হইবার কথা। রান্নার জলটুকু সে নষ্ট করিয়াছে—

পুত্রকে বালতি-মুক্ত করিতে করিতে আর একবার সে দ্বিতলের ঝুলবারান্দার পানে চাহিল। সুন্দর শান্ত তাহার মুখখানি—কপালে সিন্দুর বিন্দু চিক্ চিক্ করিতেছে। এই মুখখানিতে সিঁদুরের ফোঁটা যেমন মানায, তেমন বোধ হয় আর কারও নয়—

নিশীথ গভীর রাত্রি—

কলিকাতার কোলাহল থামিয়া গিযাছে—রাস্তা জনশূন্য। কচিৎ রিক্সার ঠন্ ঠন্ শব্দও নাই। আকাশের গাযে একখানি চাঁদ ম্লান-জ্যোৎস্নায় পৃথিবীকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অমল একাকী টেবিলের সামনে বসিয়া আছে—সম্ভবতঃ একটা কবিতা লিখিবার উদ্যোগ করিযাছে—পাশের খাটেই গৌরী পুত্রকে বুকের মাঝে জড়াইয়া শুইয়া আছে।

কবিতার মাত্র একটি লাইন লেখা হইয়াছে—জগতের জনারণ্যে আজি আমি একান্তই একা—

অমল ভাবে—সত্যই ত সে একা। আজিকার এই উদাস মন নিরাশ্রয়ের মত যেন কাহাকে চাহিতেছে—কিন্তু সে কে, কি তাহা বোঝা যায় না। আজ সে যেমন করিয়া তাহার একাকীত্বকে অনুভব করিতেছে, যেমন ভাবে বেদনা পাইতেছে, গৌরী ত তাহা পাইতেছে না। নিবিড় বাহুবন্ধনের মাঝে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার বেদনাকে দূর করিতেছে না। জীবনে যাহাদের সঙ্গ সে পায়নি, মন বার বার সেই না-পাওয়াকে পাইতে চাহিতেছে। কোথায় অপর্ণা, কোথায় রমলা—তাহাদের অতীত স্মৃতি আজ দূরাগত বীণাধ্বনির মত তাহাকে নিষ্ঠুর আকর্ষণে লইয়া চলিয়াছে—গৌরীর মাঝে সে মানসীকে পাওয়া যাইবে না—মনের এ ব্যভিচারের নিবৃত্তি নাই। গৌরীর বুকে মুখ লুকাইয়া জীবনস্বপ্ন সজল চোখে দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দেয়।

অমল মনে মনে ঠিক করে—গৌরীকে পরীক্ষা দেওয়ায়

ত্যাগিয়া দিয়া লাভ নাই। সে পাশ করিলেও সে তাহাকে যেমন করিয়া চাহিয়াছে গৌরীর মাঝে তাহাকে পাওয়া যাইবে না—বৃথা তাহার এই অত্যাচার। বুকের মাঝে গৌরীকে লইয়া সে বারবার কেবল প্রবঞ্চনাই করিয়াছে—

অমল গৌরীর মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মুখে তাহার একটা অপ্রকাশ্য বেদনার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গৌরী হয়ত আলো দেখিয়াই সহসা জাগিয়া উঠিয়া বসিল। অমল ধীরে ধীরে বলিল—গৌরী, তুমি ঘুমিয়েছিলে—না?

—হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—চারিপাশে এই নিস্তব্ধতা, আজ আমার মন উন্মাদ কল্পনায় তোমাকে নিঃশেষে পান করতে চায়। আকাশের জোছনার মত আমার অন্তর তোমার সমস্ত অঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তোমার কি ইচ্ছে করে না, এমনি ক'রে সমস্ত অন্তর দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখতে?

গৌরী কিছু বুঝিল না, অপ্রাসঙ্গিক জবাব দিল—ঘুমিয়ে পড়েছি বলে রাগ ক'রেছো?

অমল হাসিল, কিন্তু সে হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। তাহার সমস্ত অন্তর সহসা যেন কঠিন বাস্তবের প্রাচীরে প্রহৃত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সে বলিল—না তুমি ঘুমোও—

—তুমি শোবে না?

—হ্যাঁ, শোবো বৈ কি?

গৌরী পুনরায় শয্যাশ্রয় করিল। অমল তেমনি করিয়াই বসিয়া রহিল—সে যেমন করিয়া, যে পথে গৌরীকে চায়, তেমনি করিয়া সে ত তাহাকে পায় না—তাহার অন্তরের সুখ দুঃখের সাথী ত সে নয়। যে রাজ্যে মানুষের মন একা—সেথা গৌরীও যেমন অবান্তর, অপর্ণাও তেমনি। অপর্ণার বধির অন্তরও তাহাকে এমনি করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। মানুষের চাওয়া পাওয়ার রূপ, পরিকল্পনা বিভিন্ন, তাহাদের সুখ দুঃখ বিভিন্ন, এ জগতে কি তাহারা একজনে আর একজনকে পাইতে পারে? তাহা একান্তই অসম্ভব, তাই মানুষ না-পাওয়ার বেদনায় আপন অশ্রু উৎসারিত করিয়া দিয়া আপনাকে অশ্রু সমুদ্রের মাঝে চির একাকী করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা চাহে নাই তাহারা পাইয়াছে, যাহারা চাহিয়াছে তাহারা পায় নাই। ভালবাসা লইয়া এ জগতে সুখী হওয়া চলে না—ভাল না সুখী হওয়া হয়ত সম্ভব হইতে পারে—

অমল ধীরে নিঃশব্দে আসিয়া গৌরীর শয্যা পার্শ্বেই শুইয়া পড়িল, কিন্তু মনে মনে হাসিয়া বলিল—তবুও কত ব্যবধান।

আকাশে থালার মত উজ্জ্বল চাঁদ উঠিয়াছে—

অপর্ণার ঘরের সম্মুখে ঝুলবারান্দায় একরাশ শুভ্র আলো আসিয়া পড়িয়াছে। একখানা ইজিচেয়ার টানিয়া সে বসিয়াছিল। তাহার স্বামী এখনও শুইতে আসে নাই, হয়ত কোনো কাজে বৈঠকখানায় আছে। দূরের শীর্ণ কালো নারিকেল গাছের উপরে, একখানা শুভ্র মেঘের পাশে চাঁদ স্থির হইয়া রহিয়াছে। নারিকেল গাছের হিম-সিক্ত পাতা জোছনায় চিক্ চিক্ করিতেছে—

অপর্ণা ভাবিতেছে কত অবান্তর কথা—এমনি এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে বালীগঞ্জ পার্কে অমল কম্পিত হস্তে তাহার হাতখানিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু সে কোথায়, কত দূরে? সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সুখী করিতে পারিত, কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে মাত্র দুই ফোঁটা চোখের জলে বিদায় করিয়াছে। তাহার মন আজ সেই হারানো মানুষটিকেই অজিতের মাঝে খুঁজে, কিন্তু অজিত অজিতই, তাহার মাঝে অমলের হৃদয় স্পন্দন নাই।

বিবাহিত জীবনের মাঝে অমলও কি এমনি ব্যভিচার করিয়া চলিয়াছে? অজিতের বক্ষস্পন্দনে সে যেমন করিয়া অমলের স্পন্দন অনুভব করিতে চায় সেও কি তেমনি অপর্ণাকে অন্য দেহের মাঝে চাহিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে—মানুষের মন কি এমনি চিরন্তন ব্যভিচার-লিপ্ত?

কে যেন ঐ ঘুমন্ত ছোট বাড়ীখানির উঠানে একাকী পদচারণা করিতেছে। সম্ভবতঃ ঐ বধূটির স্বামী, ঐ ঘুমন্ত ছেলেটির পিতা। কিন্তু আপনার এই আনন্দময় গৃহ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া ও কেন এমন একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?—মানুষ কি সর্ব্বত্রই একা?

অপর্ণা ভাবিয়া পায় না—

অজিত আসিয়া প্রশ্ন করিল—অপর্ণা শোও নি?—এখানে ব'সে কি ক'রছো—

—ব'সো, কেমন সুন্দর জোছ্না উঠেছে, দেখেছ?

—হ্যাঁ, সত্যিই। অজিত আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। প্রশ্ন করিল—তুমি এখানে ব'সে কি এত ছাখো বল তো ?

—কি সুন্দর জোছনা।

—জোছনা ত এখন, অন্য সময় কি ছাখো ?

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—তোমাকে একদিন দেখাবো। ওই বাড়ীর ছোট্ট দুরন্ত একটা ছেলে, একটি ছুট্‌কু বৌ আর তার স্বামী থকে, তাদের জীবনযাত্রা দেখলে তোমারও হাসি পাবে—

অপর্ণা শিশুটির সাবান ও বালতি ব্যূহে প্রবেশের কাহিনীটা বর্ণনা করিলে, অজিত হাসিয়া কহিল—ও তাই নাকি ? আচ্ছা একদিন দেখবো—

অপর্ণা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—ছাখো স্বামীটি এখন কেমন পায়চারি ক'রছে। এত আনন্দের মাঝেও ও যেন একা—না ?

অজিত বিশেষ কিছু বুঝিল না—সংক্ষেপে জবাব দিল, হুঁ।

ক্ষণিক পরে অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আমাকে বিয়ে করে তুমি কি সত্যই সুখী হ'য়েছ ?

—হ্যাঁ, আমার না পাওয়া ত কিছুই নেই। তোমাকে না পেলে এ প্রশ্ন হয়ত উঠ্‌তো—

—তুমিই সুখী।

—কেন ? তুমি সুখী হও নি ?

অপর্ণা জবাব দিল না। অজিত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কহিল—কি জবাব দিলে না যে !

—আমি বল্‌ছিলুম যে কম চায় সেই সুখী হয়, যে বিরাট কিছু চায় সে সুখী হ'তে পারে না। যারা সত্যিকার ভালবাসে, তারা তাই চিরদিনই তাদের মনে একা—

অজিত সম্ভবতঃ কিছু বুঝিল না তাই বলিল—তোমাদের ফিলজফি কিছু বুঝি না, তবে তোমার কথায় সন্দেহ হ'চ্ছে তুমি হয়ত সুখী হও নি।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—বিয়ের সাত বৎসর পরে অকস্মাৎ এই সন্দেহ তোমার হ'য়েছে—যা হোক্‌।

অজিত অপর্ণার হাতখানা নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল—না না, তোমার মনে যদি কোনও দুঃখ থাকে, তাই ঐ কথা ব'ল্লুম।

অপর্ণা কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া অদূরে পাণ্ডুর নিষ্প্রভ চাঁদের পানে চাহিয়া রহিল। অজিত সযত্নে তাহার দেহ নিজের বুকের সন্নিকটে টানিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে নিজের মুখখানি অবনত করিতেছিল। অপর্ণা চক্ষু মুদিয়া সেই স্পর্শটুকুর অপেক্ষা করিতেছিল—এমনি করিয়া পার্কে বসিয়া জ্যোৎস্নাস্নাত অমলের মুখখানিও নামিয়া আসিবার প্রতীক্ষা সে করিয়াছিল। তাহার মাঝে সেই মুখখানিই ভাসিয়া উঠে—সে তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া শিহরিয়া উঠে। এ কি নিষ্ঠুর ব্যভিচারবৃত্তি !

সেদিন রবিবার।

অপরাহ্নে সমস্ত উঠানে ছায়া পড়িয়াছে। অপর্ণা ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় বসিল—একখানা বই তাহার হাতে ছিল, কিন্তু সেটাকে না খুলিয়াই সে ছোট ছেলেটিকে ঐ বাড়ীর উঠানে খুঁজিতেছিল। এমনি সময়ে বারান্দার কোণে বসিয়া সে সাধারণতঃই নানারূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, কখনও দুইপায়ের ভিতরে একখানা লাঠি দিয়া দ্রুতবেগে সমস্ত উঠানে অশ্বারোহণ করে। চুরি করিয়া মাঝে মাঝে কিছু জল লইয়া যাইয়া তাহারা নানারূপ প্রক্রিয়া করে—

অপরাহ্নের ছায়া ওদের বারান্দাটায় যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে বসিয়া স্বামী-স্ত্রী দুইজনে ক্যারম খেলিতেছে এবং খোকাটি অত্যন্ত শান্ত ভাবে তাহা দর্শন করিতেছে—ঘুঁটি পড়িলে উবু হইয়া তাহা কুড়াইয়া কুড়াইয়া জমা করিতেছে, মাঝে মাঝে বোর্ড হইতেও দুই একটা চুরি করিয়া লইতেছে। স্বামীটি পিছন ফিরিয়া বসিয়া—কেবল তাহার দীর্ঘ দেহ ও কোঁকড়া চুলগুলি দেখা যায়।

অজিত অপর্ণার পাশে আসিয়া বসিল। কহিল—কি প'ড়ছো ?

অপর্ণা কোন জবাব দিল না, কেবল ইঙ্গিতে ক্রীড়ানিরত দম্পতীকে দেখাইয়া দিল।

অমল ক্যারম খেলিতেছিল—রবিবার অপরাহ্নে অমনি একটু খেলা করা তাহার অভ্যাস—কারণ এটা অন্যান্য নাগরিক আমোদ-প্রমোদের মত ব্যয়সাপেক্ষ নয়।

বোর্ডের ঘুঁটি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, অমল একটা ঘুঁটিকে দেখাইয়া দিয়া কহিল—এই যে এটা রয়েছে—

গৌরী প্রতিবাদ করিল—কথখ্‌নও না, ওখানে থাকতেই পারে না। ঘুঁটি তুমি তুলেছ—আচ্ছা চোর ত।

—ছিলো, বহুক্ষণ আছে। নেকামি ক'রো না।

খোকা নিবিষ্ট মনে খেলা দেখিতেছিল, সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাবাকে আঙুলে দেখাইয়া কহিল—চোর।

অমল ধমক দিল—ধ্যেৎ, পাজি ছেলে। চুপ কর্—

খোকা ধমক খাইয়া উঠিয়া গেল এবং কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিল। গৌরী কহিল—আর কত খেল্‌বে, র'াধতে হবে না? সব কাজ পড়ে রইল—

অমল তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—থাক্‌গে, রবিবার একটু না হয় রাত্তির হল—

গেম শেষ হইয়া আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গৌরী মাঝে মাঝে ঘুঁটি চুরি করিয়াও অনিবার্য্য পরাজয় হইবে বুঝিয়াছিল। খোকা আবার আসিয়া মায়ের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মায়ের সাহায্যার্থ দুই একটা ঘুঁটি মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে বসাইয়াও দিতেছিল।

ঐরূপ একটি ঘুঁটি সন্নিবেশকালে খোকা ধরা পড়িয়া গেল এবং আর একবার ধমক খাইয়া আসিয়া নিজকর্ম্মে মন দিল। গৌরী কহিল—খোকাকে বক্‌লে কেন?

—ঘুঁটি চোর—তোমার দেখাদেখি—

—তুমি চোর, তুমি ত ঠেঁটামি কচ্ছ।

—তুমি যে ঘুঁটি চুরি ক'রলে—

বেশ তোমার মত ঠেঁটার সঙ্গে খেল্‌বো না। গৌরী সমস্ত ঘুঁটি ভণ্ডুল করিয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইল।

অমল কহিল—দাঁড়াও—সে পিছন পিছন ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে গৌরীকে ধরিয়া ফেলিল। অমলের সবল বাহু বেষ্টনীর মাঝে গৌরী অসহায়ের মত কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া কহিল—ছাড়ো, ছাড়ো, খোকা রয়েছে যে—

অমল শাস্তি দিবার জন্তে ওষ্ঠ আনত করিতেছিল, গৌরী কহিল—ছিঃ ছিঃ ছাড়ো, ওই ছাখো বারান্দায় কারা—

অমল সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে অদূরের বড় বাড়ীর ঝুলবারান্দায় দুইটি লোকের অবস্থিতি বুঝিতে পারিয়া গৌরীকে ছাড়িয়া দিল।

পুত্র উঠানের প্রান্ত হইতে তাহার মায়ের প্রতি এই ঘোর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্যত লাঠি হস্তে পিতাকে শাসন করিবার মানসে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু লাঠির ভারে পড়িয়া গিয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহ হইতে ঠাকুমা সন্ধ্যা আহ্নিক ফেলিয়া আসিয়া কহিলেন—কি হ'ল বৌমা!

অমল হাত দুলাইয়া কহিল—ধরিত্রী তুমি দ্বিধা হও—

এবং নিঃশব্দে সে গৃহে ফিরিয়া গেল, অদূরের ঝুলবারান্দায় বসিয়া কাহারা যেন হাসিতেছে মনে হইল।

গৌরী ছুটিয়া আসিয়া কানে কানে কহিয়া গেল—কেমন জব্দ? (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি এচ্-ডি

(৩)

তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাই সংখ্যায় বেশী। 'আকাশ-প্রদীপে' 'জানা', 'জানা-অজানা' 'পাখির ভোজ' 'যাত্রা', 'সময়-হারা' 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' ও 'সানাই' এ 'স্মৃতির ভূমিকা', 'পরিচয়' 'অপঘাত' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাগুলিতে কল্পনার একটা চেষ্টাবিহীন শিথিলতা, অলস স্বচ্ছন্দ-বিহার, পরিমিতিহীন যদৃচ্ছাগত ছন্দের আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া সহজ-বিসর্পিত, এলায়িত ভঙ্গীতে আপনাকে ছড়াইয়া দিবার প্রবণতা লক্ষ্য-গোচর হয়। কল্পনার অশ্ব যেন উচ্ছৃঙ্খল, সার্থকতর রশ্মি-নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া আপনার খুসী মত কাব্যের রথকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই স্বেচ্ছাবিহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ অনুশীলন ও সাধনার প্রভাবে তাহার মনের সহজ গতি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিরই অভিমুখী। তবে সৌন্দর্য্যের মানদণ্ড সব সময় সমান উন্নত হয় নাই। এই সমস্ত কবিতায় কবি সৌন্দর্য্যের শেষ বিন্দু নিংড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন নাই—তাহার পরিপূর্ণ পাত্র হইতে যেটুকু উপচাইয়া পড়িয়াছে, তাহার স্বপক পরিণতি হইতে যাহা কিছু কিছু ক্ষরিত হইয়াছে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গদ্যের সুকঠিন বন্ধন-রেখায়, লঘু, চটুল প্রায়ত্বের বিপরীতমুখী ইঙ্গিতে, বাস্তব প্রতিবেশের বাঁধ তুলিয়া তিনি কাব্য সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্লাবনকে প্রতিরোধ করিয়াছেন। 'জানা-অজানার' ঘরের পুরাতন আসবাব-পত্র ও বস্তু-সঞ্চয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার ভিতর দিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে মূল্য-নির্দ্ধারণের তারতম্য, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিশদীকৃত হইয়াছে—খড়ের গাদার মধ্যে একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ইঙ্গিত ঝলসিয়া উঠিয়াছে। 'যাত্রা' কবিতাতে ষ্টীমারের জীবন-ব্যবস্থার চটুল চাঞ্চল্য, ও তাহার ক্যাবিনের খাঁধা-লাগানো অভিনব ও অসংখ্যতার উপর অকস্মাৎ একটা স্বপ্ন-বিভ্রমের যবনিকা টানা হইয়াছে—প্রাণধারার বুদ্বুদরাশি, কৃত্রিম জীবনযাত্রার বিপুল আয়োজন ও যন্ত্র-স্পন্দন এক মুহূর্ত্তে ভোজবাজীর ন্যায় বিলীন হইয়াছে। 'সময়-হারা'র বর্ত্তমান কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, ছন্নছাড়া, উদ্দেশ্যভ্রষ্ট শিল্পী জীবনের চরম প্রেতচ্ছায়াগ্রস্ত অবসাদ এক পোড়ো বাড়ী ও উৎসন্ন সংসারযাত্রার অতিপল্লবিত রূপকে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—শেষে এই জীর্ণ, আবর্জ্জনাস্তূপে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস প্রতিবেশে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির চিরন্তন মূল্য সম্বন্ধে মহাকালের আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। ধ্বংসোন্মুখতার চিত্রে কল্পনার অবাধ, অপরিমিত বিস্তার, অসম্পৃক্ত বস্তুপুঞ্জের যদৃচ্ছ সমাবেশ ইহার অনিয়ন্ত্রিত শৈথিল্যের পরিচয়।

'ঢাকীরা ঢাক বাজায়' কবিতায় কবি একটী পুরাতন ছড়ার সুর অবলম্বন করিয়া ইহার কাল-বিধ্বস্ত, অন্তর্নিহিত করুণ আবেদনটী নূতন করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও বর্ত্তমানের একটা অনুরূপ দুর্ঘটনাকে অতীতের এই অদেহী, গৃহহারা সুরের সহিত গাঁথিতে চাহিয়াছেন। 'বধূ' কবিতায় ঠাকুরমার ছড়া যেরূপ ভাবে কবির অনুভূতিকে উদ্দীপিত করিয়াছে, এখানে সেরূপ উদ্দীপনার অভাব। এখানে স্তিমিত সুরটীকে আশ্রয় করিয়া কবি অলস কল্পনার জাল বুনিয়াছেন, আধুনিক যুগে কল্-গিন্নীর তরুণী নাৎনীর অপহরণ পুরাতন গানের দিগন্তবিস্তৃত করুণ মায়ার ভাব-মণ্ডলের মধ্যে ধরা দেয় না। 'পাখির ভোজে' নিম্ন-সঞ্চারী কল্পনা পাখীর হর্ষ-হিল্লোলিত দেহভঙ্গী, সহজ আত্মীয়তা ও অকস্মাৎ উদ্বেলিত, ক্ষণস্থায়ী হিংসার মধ্যে আদিম প্রাণের লীলা ও তাহার ক্ষণিক ব্যতিক্রমের পর পুনরায় স্বাভাবিক ছন্দের অনুবর্ত্তনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বর্ণনা ও তাহার মধ্যে উদ্ঘাটিত সত্য—এই উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'অসময়' আর একটি চমৎকার পাখী—কবিতা। 'সানাই' এ 'স্মৃতির ভূমিকা'তে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের একটি সুন্দর রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির ফ্রেমে অন্তর জগতের আর কোন গূঢ়তর ছবি সন্নিবিষ্ট হয় নাই—স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভূমিকা কোন গল্প কাঁদে নাই। 'অপঘাতে' একখানি অপরাহ্নের শান্তির আভাসমণ্ডিত গ্রাম্য ছবির উপর আসিয়া পড়িয়াছে বৈপরীত্যের তীব্র পরিহাস, আকস্মিক দুর্দ্দৈবের বিপর্য্যয়—তবে সে বোমা ফিন্‌ল্যাণ্ডে পড়ায় বাঙ্গালার জনপদ-জীবনের উপর তাহার অভিঘাত অনেকটা মৃদু চমকের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। 'পরিচয়ে' এক তরুণী যাহার রোমান্টিক আবেগময়তা সাংসারিকতার প্রখর উত্তাপে তখনও উবিয়া যায় নাই, দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দে, অতি-বিস্তৃত বর্ণনা-বাহুল্যের সহিত অপরিচিত কবির প্রতি তাহার প্রেম নিবেদন, পরিচয়ে মোহভঙ্গ, অপরার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়ের গ্লানি ও সমস্ত বিকৃতি ও বেদনার মধ্য দিয়া প্রেমাস্পদের সত্য পরিচয় লাভের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে—এই বর্ণনায় ঘাত-প্রতিঘাতের স্তরগুলি ও চরম পরিণতির বিবর্ত্তন কোনটাই খুব স্পষ্ট ফোটে নাই।

ইহা ছাড়া 'সানাই'এ কতকগুলি গীতধর্মী ক্ষুদ্র কবিতা আছে—যথা 'নতুন রঙ', 'বিদায়', 'যাবার আগে', 'পূর্ণা', 'ছায়াছবি' 'দেওয়া-নেওয়া', 'আধো-জাগা', 'গানের জাল', 'মরিয়া' ইত্যাদি। এই কবিতাগুলিতে মুহূর্ত্তের পলাতক ভাব, কল্পনার ক্ষণিক খেয়াল, মনের রঙীণ বা উদাস মূর্চ্ছনা গানের সুরে ও লঘু ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছে। 'বলাকার' গভীরতর সুরের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ধরণের গীতি-কবিতার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। অনিয়মিত ছন্দের অতি-প্রসার ঠিক ছোট গানের স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনবদ্য ভাব-সংহতির অনুকূল নহে। যে গূঢ় গভীর ঝঙ্কারের উদ্বোধনে ব্রতী তাহা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর মীড়-মূর্চ্ছনা তুলিবার নিপুণতা হারায়। সুদূর প্রসারী দার্শনিক চিন্তা খেয়ালী প্রেমের অর্দ্ধস্ফুট কল-কাকলী ও ভাবের ক্ষণিকতাকে অভিভূত করে। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুরাতন যাদুমন্ত্রের উপর যে অধিকার হারান নাই, এই সমস্ত ছোট কবিতার অনেকগুলিতে তাহার প্রমাণ মিলে। কোন কোন কবিতায় তুলিকার লঘুস্পর্শে, ব্যঞ্জনার সুনিপুণ ইঙ্গিতে, ছন্দের শিথিল মঞ্জীর-ধ্বনিতে এক একটী পলাতক ভাব সার্থক রূপ লইয়াছে। কোন কোনটীতে বা চিন্তার ভার একটু বেশী গুরু বা সচেতন শিল্পপ্রয়াস একটু বেশী মাত্রায় প্রকট হইয়া গানের মাধুর্য্যের হানি করিয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবন পর্য্যন্ত গান গাহিবার কণ্ঠ ও মনোভাব হারান নাই। তাঁহার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন অন্তিম জীবনেও হালকা গানের সুর রহিয়া রহিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যাইতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ছন্দের মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কবি মোটের উপর সর্ব্বত্র সন্তোষজনক ফল পান নাই। কয়েকটী কবিতায় উদাস, শিথিল, অবাধ-প্রসারিত কল্পনা নিজ অন্তর্নিহিত পরিমিতি-বোধের সাহায্যে একটা সুনির্দ্দিষ্টরূপে সংহত হইয়াছে—স্বেচ্ছা-সঞ্চারী বাষ্পরাশি আঁকিয়া বাঁকিয়া এক সম্পূর্ণ ভাবমণ্ডল গঠন করিয়াছে। তথাপি মনে হয় অনেক স্থলে কবি এই ছন্দের প্রভাবে অতিপল্লবিত বিস্তার ও মুখর অতিভাষণের দিকে প্রবণতা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ 'সানাই'এর অনেকগুলি কবিতায় এই প্রবণতার উদাহরণ মিলে। যে স্মরণীয়, অর্থঘন সংক্ষিপ্ত শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রাণ, যাহাতে একটী শব্দেরও পরিবর্ত্তন বা স্থানান্তরকরণ সম্ভব নহে, যাহার সম্বন্ধে Coleridge বলিয়াছেন—"Poetry is the arrangement ot the best words in the best order," যাহার অর্দ্ধব্যক্ত আবেদন পুষ্পসৌরভভিক্ষায় ভ্রমরের ন্যায় মনকে প্রদক্ষিণ করিয়া অবিরাম গুঞ্জনধ্বনি তোলে—ভাবের

সেই উচ্চতম আদর্শ এই শ্রেণীর কবিতায় সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এইবার কবি-জীবনের শেষ বৎসরের রচনাগুলি—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', ও 'শেষ লেখা'র আলোচনা করিব। এই রচনাসমূহ একটি বিশেষ ও অসাধারণ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কবি কাব্যের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা—গুরুতর পীড়ার আক্রমণ ও রোগমুক্তির কাব্য-কাহিনী—অভিব্যক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোন কবির রচনায় আমরা ঠিক এই বিষয়টী পাই না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ হয়ত সাময়িক অনিদ্রার প্রভাবে তাঁহার স্বাভাবিক স্থির প্রশান্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। কোলরিজের কবিতা আগাগোড়া অসুস্থ মনোবিকার ও আফিঙের নেশায় অর্দ্ধ-অসাড় ও অবাস্তব রংএ রঞ্জিত কল্পনার চিহ্নাঙ্কিত। শেলির অতি-উত্তেজিত কল্পনা ও অবাস্তব প্রবণতা অনেকাংশে মানসিক অসুস্থতা হইতে উদ্ভূত। ব্রাউনিং অর্দ্ধ উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ নর-নারীর চিন্তাধারার অসংলগ্নতা ও আচরণবিকৃতি নাটকীয় পদ্ধতিতে ফুটাইয়াছেন। ব্রাউনিং-জায়া মরণের বিলম্বিত আবির্ভাবের প্রতীক্ষাচ্ছায়া-তলে তাঁহার অপরূপ হৃদয়-মাধুর্য্যকে প্রেম-গাথার রন্ধ্রপথে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগের প্রভাব ঠিক প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না—মানসিক অবসাদ, জীবনচ্ছন্দের অনিয়মিতগতিবেগ, আবেগের আতিশয্য ইত্যাদি লক্ষণগুলি শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা মানস সংস্থিতির অসাধারণত্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের এই পর্য্যায়ের কতকগুলি কবিতার মধ্যে ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ-মনের বিক্ষোভ, উত্তপ্ত, জ্বরাতুর স্পর্শ, বিকারের আবিল দৃষ্টি যেমন ভয়াবহভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার অন্য কোথাও তুলনা মিলে না। অবশ্য কবির শিল্পোৎকর্ষ এই রোগগ্রস্ত অবস্থার উপর জয়ী হইয়া ইহার বিকারের খণ্ডদৃশ্যগুলিকে অনবদ্যকাব্যরূপ দিয়াছে, কিন্তু সমস্ত সচেতন শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়া রোগ-যন্ত্রণার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, ব্যাধি-জর্জ্জর কল্পনার ক্ষীণতা ও বিকারগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। এই অভিভূত অবস্থায় কবির দার্শনিকতা,—জীবনের সত্যরূপে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস, চরম দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনার মধ্যে অপরাজিত মানবাত্মার জয়গান, মৃত্যুর স্বরূপের প্রশান্ত উপলব্ধি—অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহজ গৌরবের পরিচয় দিয়াছে। একদিকে ব্যাধির অভিভব ও পীড়নের স্বীকার, অন্যদিকে ইহাকে অতিক্রম করিয়া আত্মার বিজয়-ঘোষণা—এই দুই সুরের সম্মিলন এই কবিতাগুলিকে এক অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য ও মহিমা দিয়াছে। 'আরোগ্যের' কবিতাগুলিতে জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির সহজ রূপটী সদ্যরোগমুক্ত কবির চক্ষুতে আবার প্রথম অনুভবের বিস্ময়মণ্ডিত হইয়া অপরূপ, নবীন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুভূতির এই উত্তেজিত বিস্ময়, সৌন্দর্য্যের এই অভিনব আবিষ্কার, কৌতূহলের এই সতেজ, নবীন উন্মেষ ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে এক হর্ষোদ্বেলতার শিহরণ রাখিয়া গিয়াছে। কবিতাগুলির ক্ষুদ্র আয়তন, উহাদের আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ততা, রোগাভিভব-মুক্ত কল্পনার সীমাবদ্ধ সক্রিয়তায়, ইহার পক্ষবিস্তারের সঙ্কুচিত পরিধির বহিঃনিদর্শন। পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যায়ের অতিভাষণ-প্রবণতা এখানে সমস্ত বাহুল্য পরিহার করিয়া একটী অপরূপ কৃশতা ও স্বচ্ছদীপ্তি অর্জ্জন করিয়াছে; এক একটী কবিতাতে যেন মন্ত্রের স্বল্পাক্ষরত্ব ও নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তি নিহিত হইয়াছে। মহাযাত্রার পূর্ব্বে কবি যে শেষ অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে সহজ অথচ সুগভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি, বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের নূতন উপলব্ধি, জীবনের নিকট বিদায়গ্রহণ ও মৃত্যুকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রশান্ত, মোহাবেশহীন মহিমা সরল, অনাড়ম্বর, অথচ আশ্চর্য্যরূপ দ্যুতিমান্ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

রোগযন্ত্রণার প্রভাব কয়েকটী কবিতায় সুস্পষ্ট ছায়াপাত করিয়াছে। 'রোগশয্যায়'এর ৭ সংখ্যক ও ২৯ সংখ্যক কবিতায় রোগীর সঙ্গিহীন একাকীত্বের আশঙ্কা ভয়াবহ ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। স্নেহ সেবার সুশীতল বেষ্টনীর মধ্যে রোগীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনীশক্তি বিশ্বজগতের প্রাণলীলায় সমর্থন পায়; কিন্তু নিঃসঙ্গতার সম্ভাবনা তাহার কল্পনায় জগতের নির্ম্মম, ঔদাসীন্যমাখা, ক্রূর মুখচ্ছবি অঙ্কিত করে। এই ক্ষুদ্র কবিতা দুইটীতে ব্যাধিজর্জ্জর মনের মাত্রাহীনতা, সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে অতলস্পর্শ শঙ্কা-আশ্বাসের উপলব্ধি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'রোগশয্যায়'এর ৫ সংখ্যক ও আরোগ্যের ৭ সংখ্যক কবিতায় পীড়ার বেদনার তীব্র উপলব্ধির সঙ্গে মানবাত্মার অপরাজেয় সহিষ্ণুতার জয়গানে দুই বিপরীত সুরের সার্থক সমন্বয় হইয়াছে। ৯ সংখ্যক কবিতায় রোগগ্রস্ত মনের রচনাপ্রয়াস আদিম অন্ধকারে প্রথম সৃষ্টির অপূর্ণ, বিকলাঙ্গ পিণ্ডমূর্ত্তির উপমায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে কবির রূপায়ন-শক্তি কল্পনার অস্পষ্টতার উপর জয়ী হইয়াছে; অসুস্থতার ঘোরে অর্দ্ধ-সচেতন মনে এলোমেলো, বিশৃঙ্খল চিন্তা-কল্পনার ঠেলাঠেলি ও প্রকাশ-ব্যাকুলতা অসাধারণ তীব্রতার সহিত অনুভূত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। ১৪ সংখ্যক কবিতায় রোগীর ঘরের বদ্ধ, সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রা স্রোতোবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন, শৈবালদল-গঠিত দ্বীপের সহিত উপমিত হইয়াছে। এই স্তিমিত, মৃদুস্পন্দিত আব-হাওয়ায় ছোট-খাট সেবা শুশ্রূষা-পরিচর্য্যাগুলি অপূর্ব্ব মধুর রসসিঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—"দুঃখের পাত্রে সুধা-ভরা" কয়েকটা দিন সঞ্চিত হইয়াছে। ১৯ সংখ্যক কবিতাতে রোগীর অসহায় অবস্থা করুণ পরিহাসের স্নিগ্ধস্পর্শে জ্বালা ও উত্তাপ হারাইয়াছে। 'শেষ লেখা'র শেষ দুইটী কবিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তিমরশ্মি-বিচ্ছুরণ—মরণের দুর্ভেদ্য জটিলতার মধ্যে বিশ্বাসের পথরচনার দুঃসাধ্য, ক্লেশ-সঙ্কুল প্রচেষ্টার বাণী-রূপ। মৃত্যুর আসন্ন আবির্ভাবের প্রাক্কালে, কল্পনার শ্বাসরুদ্ধতার মধ্যেও, কবি ইহার অবাস্তব ছলনার, ইহার মুখোস-পরা বিভীষিকার স্বরূপটী উদ্ঘাটিত করিয়াছেন; চরম অন্ধকারের নীরন্ধ্র প্রায় ব্যাপ্তির মধ্যে আশ্বাসের আলোক-বর্ত্তিকাটী শিথিল-কম্পিত হস্তে ঊর্দ্ধে ধরিয়াছেন। মৃত্যু-বিভীষিকা ছায়া-বাজির ন্যায় অবাস্তব। ইহা আঁধারের পটভূমিতে উৎকীর্ণ শিল্প রচনা; ইহার মধ্যে আছে সত্যের পরিবর্ত্তে শিল্প-নৈপুণ্য। মৃত্যুর ছলনা, ইহার ছদ্ম-আশ্বাসের প্রতারণা [illegible] বিশ্বাসের সহজ মহিমার নিকট ব্যর্থ হইয়া

যায়—মেঘের অন্তরাল হইতে ইহার মায়া-শর-নিক্ষেপ এই বর্মে ঠেকিয়া প্রতিহত হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ দুইটী কবিতায় টেনিসনের কবিতার (Crossing the Bar) দ্বিধাহীন বিশ্বাসের ভাবা-বেগ বা ব্রাউনিং-এর কবিতার (Prospice) ভায় শত্রুকে বলহীন কল্পনা করিয়া তাহার উপর জয়লাভের সুলভ গৌরব-ঘোষণা নাই। ইহাদের মধ্যে মরণের মায়া-জাল-ভেদ, ইহার ছদ্মবেশের রহস্য উদ্ঘাটনের সত্য গৌরব সহজ, আবেগহীন ভাষায়, তত্ত্ব-আবিষ্কারের নিরাসক্ততায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মরণ-সাহিত্যের মধ্যে ইহাদের মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষয় থাকিবে।

এই মৃত্যু-রাহুগ্রস্ত রচনাগুলির মধ্যে 'প্রান্তিকে'র দার্শনিকতার সুর আবার নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যয়ের সহিত ধ্বনিত হইয়াছে। 'প্রান্তিকে'র উদাত্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর মৃত্যুর সম্মুখীনতায় হয়ত একটু করুণ হইয়াছে, কিন্তু স্থির বিশ্বাসের আলোক পূর্ব্ববৎ অকম্পিত ও অম্লান রহিয়াছে। অপ্রত্যক্ষ সত্য প্রমাণ করিতে ভাষার যে তীব্রতা ও কণ্ঠস্বরের যে অতিরিক্ত জোরের প্রয়োজন হয়, প্রত্যক্ষ সত্যের কথা বলিতে তাহার পরিবর্ত্তে সহজ, আবেগহীন প্রকাশ-ভঙ্গীই যথেষ্ট। শেষ গ্রন্থগুলিতে মৃত্যু-রহস্য ব্যক্ত করিতে গিয়া কবির ভাব ও ভাষায় অনুরূপ পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয়। যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশের মহিমান্বিত গাম্ভীর্য্য, মন্ত্রের গাঢ় সংহতি ও প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার সহায়তা-প্রার্থী ছিল, তাহা এখন সোজা, ঘরোয়া কথায়, চোখে-দেখা বিষয়ের অত্যুক্তিহীন বিবৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশলাভ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রোগশয্যায়'এর ২০ সংখ্যক কবিতাটী উদ্ধারযোগ্য।

রোগ দুঃখ রজনীর নিরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোক বিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি
মনে ভাবি কী তার নির্দ্দেশ।
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মত যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ-পারাবার;
সূর্য্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্য সাগর—তীর্থ পথে।

এখানে কবি উপনিষদের দার্শনিক পরিমণ্ডল ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহজ সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।

'আরোগ্যে'র ৮ সংখ্যক কবিতায় [illegible]-স্বরূপী কি প্রশান্ত প্রতীক্ষা, কি পরিতৃপ্ত সমাপ্তিবোধ, কি পূর্ণতার ব্যঞ্জনা বহন করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে!

পথরেখা লীন হলো অস্তগিরি শিখর আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষ তীর্থ-মন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিনী
যার মূর্চ্ছনায় মেশা এ জন্মের যা কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রা-পথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে,…নহে দূর, নহে বহু দূরে।

'আরোগ্যে'র ৩০ সংখ্যক ও 'জন্মদিনে'র ২৭ সংখ্যক কবিতায় সন্ধ্যার বহিঃরূপের সহিত অধ্যাত্ম গূঢ়ার্থতার কি আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়াছে। দিন যেমন আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতে নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারের অন্তরালে আত্মগোপন করে, সেইরূপ জীবনের সত্যরূপ-উপলব্ধি মৃত্যু-যবনিকার ক্ষণিক অন্তরালে সম্পূর্ণতা লাভ করে। সন্ধ্যার বৈরাগ্য, চরম আত্মোৎসর্গ, নবীন দিনের আবাহনের জন্য বিলুপ্তির অন্তরালে তপঃ-সাধনা—এক কথায় ইহার সমস্ত অধ্যাত্ম প্রতিবেশটী—তাহার ধূসর-ম্লান মুহূর্ত্তটীর কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে চরম কলা-কৌশলের সহিত বাস্তিত হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের—প্রভাতের আলোক, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রাণলীলার-সহিত মানবাত্মার আত্মীয়তা আবার নূতন করিয়া অনুভূত হইয়াছে এবং এই গ্রন্থগুলির প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই সেই অনুভূতির আনন্দময় অভিনন্দন। 'আরোগ্যের' ৯ সংখ্যক কবিতাটী এই দার্শনিক অনুভূতি-পরম্পরার একটা চরম পরিণতি সূচিত করে। ইহাতে আমরা কবির cosmic imagination—বিশ্ববিধানের রহস্যভেদকারী কল্পনার চূড়ান্ত উদাহরণ পাই। "শত শত নির্ব্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য-প্রাঙ্গণে" নটরাজের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা, অপরিমেয়-কল্পব্যাপী সৃষ্টি-উৎসবের অবসানে স্রষ্টার রহস্যাবগুণ্ঠিত, দুরবগাহ মৌনতা, অফুরন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একের মধ্যে সংহরণের ধারণাতীত লীলা—এই পরিকল্পনার বিরাট মহিমা কবি কত সহজে আয়ত্ত করিয়া কিরূপ অবলীলাক্রমে ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়-স্তম্ভিত হইতে হয়। অস্তাচল চূড়ায় দাঁড়াইয়া রবি যে শেষ রশ্মি বিকীরণ করিয়াছেন তাহাতে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সুবর্ণময় সংযোগ-সেতু রচিত হইয়াছে, তাহা মরণোত্তর রহস্যের মর্ম্মভেদ করিয়া এপার-ওপারের পরিচয়-সূত্রটীকে অখণ্ড ও বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছে। রোগের আবিল আচ্ছন্নতার পিছনে কবির দিব্যদৃষ্টি—অসাধারণ স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভেদী শক্তি লাভ করিয়াছে।

এই রোগের মধ্যবর্ত্তিতায় কবি আরও কতকগুলি নূতন শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। সগুরোগমুক্ত পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনাবর্ত্তনকে এক নূতন চোখে দেখে। ইংরেজ কবি গ্রে তাঁহার একটী কবিতায় বলিয়াছেন যে রোগশয্যা হইতে উত্থিত ব্যক্তি নববসন্তের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র দৃশ্য ও সঙ্গীত-ধ্বনির মধ্যে স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পায়। রবীন্দ্র-

মাধ্যের কতকগুলি কবিতায় ইংরেজ কবির এই সাধারণ উক্তি অপরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সহজ, সাধারণ জীবনযাত্রার প্রতি প্রত্যুদ্গমনের যে সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা ইহার সৌন্দর্য্যের নব উপলব্ধি হইতে প্রসূত। 'রোগশয্যায়' এর ৬ সংখ্যক কবিতায় চড়ুই পাখীর আনন্দ-স্ফূর্ত্ত অঙ্গভঙ্গী ও গ্রাম্য ভাষায় গান অভিনন্দিত হইয়াছে—এই অতি তুচ্ছ, জীবনের ধূসর প্রাত্যহিকতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, সম্পূর্ণরূপে রোমান্সের ভাবাসঙ্গ-বর্জ্জিত পাখী যে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার নবলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গী, রোগের সমীকরণ শক্তির প্রভাব। ইহার ১৭ সংখ্যক কবিতায় ও 'আরোগ্যের' ২২ সংখ্যক কবিতায় রোগীর অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল মন কমলালেবুর উপহারের মধ্যে দাতার নাম-অনুমান-তৎপর কল্পনার ক্রীড়াশীল প্রজাপতিবৃত্তির অনুশীলন ও প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌহৃদ্য অনুভব করিয়া রসনা-নিরপেক্ষ এক উচ্চতর তৃপ্তির সন্ধান পাইয়াছে। এই নবোন্মেষিত তীক্ষ্ণ-চেতনা-সম্পন্ন কবি প্রভাতের আলোর প্রসন্ন স্পর্শ প্রতি রক্তধারায় অনুভব করিয়া ইহাকে অস্তিত্বের প্রতি সম্মানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ('রোগশয্যায়' ৩২)। পলাশের রক্তিম সৌন্দর্য্য যেন কবির অবলুপ্ত যৌবনের প্রতি সুন্দরের অকৃপণ অভ্যর্থনা, অজস্র-দানশীল প্রকৃতির পূর্ব্ব-বন্ধন স্বীকার ('আরোগ্য, ১)। জন্মদিনে '৪' সংখ্যক কবিতায় একটু ক্ষুব্ধ অনুযোগের সুর শোনা যায়—তাহা প্রকৃতির কার্পণ্যে নহে, নিজের শক্তিহীনতায়। পলাশের রক্তাক্ষর রচিত বার্ষিক নিমন্ত্রণলিপি কবির নিকট পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কবি তাঁহার রুদ্ধদ্বার কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া এই নিমন্ত্রণ উপভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত। মানুষের পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির ঔদাসীন্যের চিন্তা এই কবিতায় একটু ছায়াপাত করিয়াছে, তথাপি ইহাতে অপরিহার্য্যের ঈষৎ বিষণ্ণ স্বীকৃতি আছে।

'রোগশয্যায়' এর ২৭ সংখ্যক কবিতা সহজের সৌন্দর্য্যানুভূতির শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। এই ক্ষুদ্র কবিতাটির মধ্যে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় ও দীর্ঘ অন্তরঙ্গতার সূক্ষ্মদর্শিতা এক অপরূপ সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। এখানে প্রকৃতির জীবনস্পন্দনের সঙ্গে কবির রোগাভিভব মুক্ত জীবনের নিবিড় একাত্মতা, কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যবর্ত্তিতায় নহে, প্রত্যক্ষ অনুভব-ক্রিয়ার সাহায্যে, কোন অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধের ভিতর দিয়া নহে, চক্ষুকর্ণস্পর্শের সহজ অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গ্রহণ-শক্তির অনুশীলনে উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইয়াছে। নবজাত শিশুর আদিম কৌতূহল যেন জন্মান্তরার্জ্জিত অধ্যাত্মদৃষ্টির রহস্যোদ্ভেদকারী স্বচ্ছতায় মার্জ্জিত হইয়া এই অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যদিয়া জীবনের চরম সত্যকে বিকশিত করিয়াছে।

খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত,
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ,
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্ব্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়,
আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্য অভিষেকে করি আজি স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য এক খানি রত্নহার রূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে।

উপনিষদের ঋষি যে দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টি, আবার বহু শতাব্দীর ব্যবধানে, এক বিংশ শতাব্দীর কবির বিচিত্র, বহুমুখী অভিজ্ঞতার স্বচ্ছধারায় অভিস্নাত হইয়া, মানবজীবনের চরম অভিপ্রায় ও অর্থকে নিখিল-প্রকৃতি-পরিব্যাপ্ত আনন্দ-শতদলের মর্ম্মকোষ হইতে উৎসারিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বহির্বিশ্ব

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

প্যালেষ্টাইন

আরবদের ক্ষেপাইয়া কাজ ভাল হয় নাই। পরন্তু সমস্যার গুরুত্ব বাড়িয়াছে, তাল-গোল পাকাইয়া যে গেরো বাঁধিয়াছে তাহা ছাড়াইতে অনেক তেল নুন খরচ করিতে হইবে। ইহুদী সন্ত্রাসবাদ আজ যতই তীব্র ও প্রখর রূপ পরিগ্রহ করুক না কেন, তাহার কোন ভবিষ্যৎ নাই। উত্তেজনা দিয়া আন্দোলন গড়িয়া তোলা যায় না, সাময়িক বহ্বারম্ভ প্রকাশ করা যায় মাত্র। ইংলণ্ডের সংরক্ষণশীল মন্ত্রিসভা হাসিতে খেলিতে সাম্রাজ্যের গলায় ফাঁস বাঁধাইয়াছেন। তাহারা গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ব্যালফুর সাহেবের মারফৎ এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া ইহুদিদের সস্তা দরের এক সান্ত্বনা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু কে জানিত যে

এই ফাঁকা ঘোষণা এত গোলযোগ বাধাইবে। ফাঁকা ঘোষণা কহিতেছি এই জন্য যে—ঘোষণার মধ্যে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে যদি প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীরা কোন প্রকার ওজর আপত্তি তুলিয়া তথাকথিত 'জাতীয় বাসভূমি' সৃষ্টি করিয়া তোলে, সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার তাহার নীতিতে নিরপেক্ষ হইবেন। সংরক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্রনীতিতে সেই নিরপেক্ষতা রক্ষা হয় নাই। তার কারণ মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসীর আগমন। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী এলাকায় যাহাতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য সংরক্ষণশীলদল কম তৎপরতা দেখায় নাই। গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর জাতিসংঘের দৌলতে যে রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব ব্রিটেন ও ফরাসী মধ্য-প্রাচ্যের আরবদেশগুলির উপর পাইয়াছিল, তাহা লইয়া রীতিমত কূটনৈতিক ঘুঁটি চালাচালি হইয়া গিয়াছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন তাহার কাগজ-কলমে লিখিয়া-দেওয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হয় নাই। যে প্রকারেই হউক ইহুদি-সমস্যা সমাধান প্রথমে আরবদের বিরুদ্ধেই গিয়াছিল। লর্ড পীল কমিশন যাহা রায় দিয়াছিল তাহা আরব জাতি মানিয়া লয় নাই, বরং তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরবরা করিয়াই আসিয়াছে।

মিঃ এন্টনি ইডেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্রসচিব থাকা-কালীন আরবদের সস্তায় বাজীমাৎ করিবার তালে ছিলেন। খণ্ড ছিন্ন রাজনৈতিক প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করিবার আশায় তিনি আরব যুক্তরাষ্ট্রের এক সংহতির ঘোষণা প্রকাশ করেন; মূলতঃ ইহা আর একটি রাজনৈতিক চাল। কেন না আরবজাতির নব্য রাজনৈতিক চেতনাকে বিপথগামী হইতে না দিয়া—অর্থাৎ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যাইতে দিয়া নিজেদের কোলে ঝোল টানা যায় কিনা তাহারই অপচেষ্টা মাত্র। এই অপচেষ্টায় আরবজাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি রীতিমত সাহায্য করিয়াছে। বিবরটি হইতেছে এই যে, আরবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি পরস্পর-বিরোধী ও নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় পঙ্গু। এ অবস্থায় কোন বিশেষ প্রতাপশালী রাষ্ট্র যদি কোন সংহতির জন্য সাহায্য করে তবে সত্যই একথা মনে হইবে যে বড় উপকার করিল। কিন্তু ব্রিটেনের অতি-বড়-মিত্র-ও কোনদিন এই সত্য গোপন করিতে পারিবে না যে, ব্রিটেন নিজ স্বার্থে কোথাও জলে নামিয়াছে। যেখানেই সে জলে নামিয়াছে সেখানেই সে ঘোলাটে জল হইতে কিছু না কিছু তুলিয়াছে। সোজা কথা, ব্রিটেন চায় যে আরববাসীরা ঐক্যবদ্ধ হউক। ইহাতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনও সাহায্য করিবে। কিন্তু কেন সাহায্য করিবে? গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর নবীন আরববাসীরা স্থির বুঝিয়াছিল যে ব্রিটেন যতদিন পর্য্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে বহাল আছে ততদিন পর্য্যন্ত কোন প্রগতিমূলক চিন্তাধারার ঠাঁই আরব রাজ্যে হইবার জো নাই। এখানে কথাপ্রসঙ্গে আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লার কথা বলিতে চাই; দেশের মধ্যে নবীন চেতনা আনিতে গিয়াই ত বেচারা ফ্যাঁসাদে পড়িল। আরবের ক্ষেত্রেও সেইরূপ অনেকটা হইতে চলিয়াছিল। আরবের প্রগতিমূলক চিন্তাধারা মূলতঃ সিরিয়া লেবানন প্রভৃতি দেশ হইতে ছড়াইয়াছে। খুব সম্ভব আরব-ভাষাভাষী রাজ্যখণ্ডের মধ্যে সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশই বেশী পরিমাণে গণতান্ত্রিকভাবাপন্ন। তা ছাড়া ট্রান্সজোর্ডন, ইরাক, মিসির, হেজাজ, সৌদিআরব প্রভৃতি দেশগুলি সামন্ততান্ত্রিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপ্রভুত্বভোগী স্বেচ্ছাচারীর আবাসভূমি। এই সামন্ত রাজ্যগুলি যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণকে শোষণ করিয়া রাজত্ব করিতে পারিবে ততদিনই ব্রিটেন নিশ্চিন্ত থাকিবে। সেই জন্যই ব্রিটেনপ্রভাবক্লিষ্ট গুটিকয়েক প্রতিনিধিকে লইয়া ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যে একটি সংহতির স্বপ্ন দেখিতেছে। ইহা যে জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার অবহেলা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আরবজাতির ধর্ম্মসংস্কার ও সামাজিক সংস্কার ব্রিটেনের প্রভাবের স্থায়িত্বের কারণ হইয়াছে। তাই এই কারণ যত বেশীদিন বজায় থাকে ততই মঙ্গল। সাম্রাজ্যের বিমান পথটি নিরঙ্কুশ রাখিতে হইলে আরব জাতিকে হয় তার ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে, নয়ত রাজনৈতিক প্রভাবের প্যাঁচে ফেলিয়া শৃঙ্খলিত মেষশাবকে পরিণত করিতে হইবে। রক্ষণশীলদল দ্বিতীয় পন্থা চেষ্টা করিয়াছিল আরব যুক্তরাষ্ট্রের নামে। ফল উল্টা হইয়াছে, আরবের রাষ্ট্রগুলি আজ নিজেদের অসহায় অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আরব জাতির রাজনৈতিক মুক্তির প্রয়াস ক্রমশই দৃঢ় হইতেছে, তাহারই প্রমাণ আজ আরব-লীগ।

প্যালেষ্টাইনকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে তাহা ক্রমশই বৃহত্তর আরবজাতির মুক্তির আন্দোলনে পরিণত হইবে এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইবে; অটোমান সাম্রাজ্যের চাপে পড়িয়া যে আরব জাতি এতদিন নিজের সত্তা হারাইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের আত্ম-কলহের মধ্য দিয়া আজ ব্যাপক সংহতির দিকে চলিয়াছে। আরবের সমস্যাকে আজ বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখিবার সময় আসিয়াছে, গোটা আরব জাতি হয়ত একটা বাহ্য ইহুদি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট আন্দোলনের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে; ইহুদিরা আজ যতই বোমা লইয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে, ততই তাহারা আরবদের সহানুভূতি হারাইতেছে। তাহাদের যদি আরব রাজ্যখণ্ড প্যালেষ্টাইনের মধ্যে বাস করিতে হয় তবে আরবদের সহানুভূতিই একমাত্র সহায়। ব্রিটেনের শ্রমিক দল যদি সত্যই বৈপ্লবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় তবে তাহারা আরব জাতির জনগণের মুক্তির কথা ভাবিয়া ব্যাপক ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করিবেন।

দার্দ্দানেলিস

তুর্কীতে নির্ব্বাচন কার্য্য চলিতেছে। তুর্কীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম গণতান্ত্রিক মতে বিরোধী দলকে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দেওয়া হইল; এই পর্য্যন্ত দুই শ্রেণীর বিরোধীদল তুর্কীর রাজনৈতিক জগতে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে একদল গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে জাতীয় নির্ব্বাচনকে গ্রহণ করিতে চায়, আর একদল নির্ব্বাচনকে বয়কট করিয়া তাহাদের মতামত জ্ঞাপন করিতেছে, শেষোক্ত দল অপেক্ষাকৃত বিদেশী প্রভাবের বাহন হইয়া পড়িয়াছে; ইহার কর্ত্তা যিনি তিনি এককালে কোমিনটর্নের একটি শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি তুর্কীর সমাজতান্ত্রিক চাষী ও মজদুর দলের নেতা। যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে। তুর্কী শত চেষ্টা করিয়াও বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্তি পায় নাই। রাহুর মত তুর্কীর সমস্ত আভ্যন্তরীণ রাজনীতি আজ বিদেশী প্রভাব গ্রাস করিতে সুরু করিয়াছে। পটস্ডামে বিশ্বশক্তিবর্গের যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে স্থির হয় যে তুর্কীর দার্দ্দানেলিস্ প্রণালী সম্বন্ধে যদি নূতন করিয়া কোন বিবেচনা প্রয়োজন হয় তবে তাহা স্ব স্ব রাষ্ট্র নিজেরাই করিবেন। বস্তুত তাহাই ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের মুখে তুর্কীর রাষ্ট্রপতি ইনেনু দার্দ্দানেলিস প্রণালীর নিরাপত্তার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে শুধু দার্দ্দানেলিস্ প্রণালীর কথাই এককভাবে বিচার করিবার নহে, কেননা গোটা ইস্তামবুলের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বিষয়টি আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব ধারণ করিয়াছে। তুর্কীর ইস্তামবুল যদি ত্রিয়েস্তীর মত আন্তর্জ্জাতিক এলাকা হইয়া দাঁড়ায় তবে ভয়ের কথা অবশ্যই আছে বলিতে হইবে—এমন কোন ব্যবস্থা তুর্কী মানিয়া লইতে চাহিবে কি? অথচ দার্দানেলিসের সমস্যায় তুর্কী বাদে ব্রিটেন ও রাশিয়ার স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রহিয়াছে। এবারে আবার নূতন সমস্যা মার্কিণদের লইয়া দেখা দিয়াছে। কেননা পটস্ডাম আলোচনায় মার্কিণরা অংশীদার ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মনট্রে কন্‌ভেনশনে মার্কিণরা কেউ ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান দার্দ্দানেলিস্ সমস্যায় মার্কিণরা কেউকেটা হইয়া পড়িয়াছেন; মার্কিণদের জার্ম্মানী বিজয় যে কি পরিমাণ ফল প্রসব করিয়াছে তাহা এখন বেশ বোঝা যাইতেছে। মার্কিণরা নাকি দার্দ্দানেলিস্ সমস্যায় রীতিমত উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য এইরূপ উৎসাহ প্রকাশের নিগূঢ় কারণ কি তাহা অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। আমরা শুধু বলিতে চাই যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ রাজনীতির যে শিশুর চলাচল রাষ্ট্রপতি মনরো এক মহা নীতির বাঁধন দিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—সেই শিশু সাবালক হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি ম্যাককিন্‌লের আমলে প্রথম শিকল ছিঁড়িল, অর্থাৎ পথ চিনিল। ফিলিপাইন অধিকার হইল, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ প্রশান্ত-মহাসাগরে লাইফবয় ভর করিয়া ভাসিতে সুরু করিল। চীনদেশের তীরে তাহা (Open door) মুক্তদ্বার নীতির দাবী জানাইল এবং তাহা কালে পূর্ণ হইল। সেই যে অভিযান সুরু হইয়াছে তাহা আজ পর্য্যন্ত বন্ধ হয় নাই। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিণরা যুদ্ধ করিয়া ঠকিয়াছে কেহ কেহ তাহা মনে করেন, কেননা অনেক টাকা মারা গিয়াছে। লোকসানটা সামলাইয়া লইতে হইবে ত? কাজেই এবার আর ছাড়াছাড়ি নাই। যেখানেই সুবিধা

পাইতেছে—সেইখানেই মার্কিণরা ভদ্রলোকের মত দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছেন, আর সুযোগ পাইলেই বসিয়া পড়িতেছেন। ইহাই হইল এযুগের সম্প্রসারণ নীতি। পটসডাম্ আলোচনার সময় হয়ত ভদ্রলোকের মত সব কথা শুনিয়া রাখিয়াছে এবং কোথায় রন্ধ্র পথ আছে তাহাও অনুসন্ধান করিয়া রাখিয়াছে! আজ যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, অবস্থা অনেকটা শান্ত—তাই এই সুযোগে মার্কিণ স্বরাষ্ট্রসচিব বার্ণেস দার্দ্দানেলিসে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে। মার্কিণরা ইতিমধ্যেই তুর্কীর পররাষ্ট্র সচিবের নিকট এক নোট পাঠাইয়াছেন এবং সেই নোটের সারাংশ মিঃ বার্ণেস যথামত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রিটিশ তরফের খবর হইতেছে যে তুর্কীরা মার্কিণদের লইয়া খুব নাচানাচি করিতেছে—অর্থাৎ মার্কিণরা যাতে দার্দ্দানেলিস্ সমস্যায় যোগদান করে তাহাই তুর্কীর ইচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরিয়া তুর্কী রাষ্ট্রের অধিনায়ক যে পরিমাণ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে যে তিনি তুর্কীর স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষা না করিয়া কোন কাজে হাত দিবেন তাহা আমরা মনে করি না; সোভিয়েট মনোভাব ইতিপূর্ব্বে গত জুন মাসের নোটএ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া অভিজ্ঞ পর্য্যবেক্ষক মনে করেন। কেননা গত জুন মাসে ইস্তামবুলে সোভিয়েটের তরফ হইতে যে নোট প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে তুর্কীর বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে প্রস্তুত। আর দার্দ্দানেলিসের নিরাপত্তা-রক্ষার জন্য সোভিয়েটকে ঘাঁটি দেওয়া হউক, কেননা সোভিয়েট তুর্কীর সঙ্গে একযোগে প্রণালীর নিরাপত্তার রক্ষার দায়িত্ব লইতে রাজি আছে। তুর্কী ইহার উত্তরে এক গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারত সরকারের ঋণসংগ্রহ নীতি

ভারতবর্ষে এখন কাঁপাই টাকার রাজত্ব চলিয়াছে। যুদ্ধের আগের তুলনায় দেশে পণ্য কমিয়াছে, কিন্তু টাকা বাড়িয়াছে প্রায় সাত গুণ। এই প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির ফলে একদিকে যেমন পণ্যাদির মূল্য অসম্ভব রকম চড়িয়াছে, অন্যদিকে তেমনি টাকার ব্যবহারিক মূল্য কমিয়া যাওয়ায় সঞ্চীকৃত টাকা হইতে আয় আগের হিসাবে লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে দেশে আশানুরূপ শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় নাই বলিয়া লোকে পাহাড় প্রমাণ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছে, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলিও টাকা খাটাইবার ভাল ব্যবস্থা করিতে না পারায় আমানতের সুদের হার অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছে। ব্যাঙ্কের সুদের হার এইভাবে কমিয়া যাওয়ার জন্য অনেকে আবার শেয়ার বাজারে ও সরকারী ঋণপত্রের উপর টাকা খাটানো পছন্দ করিতেছে। যুদ্ধবিরতির এক বৎসর পরে এখনো দেশের প্রচণ্ড পণ্যাভাব কমিবার এমন কিছু লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, কাজেই আশা করা যায় যে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির এখনো দীর্ঘদিন মোটা লাভ হইবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ হইলে শেয়ারের ডিভিডেণ্ডের উচ্চহারও দীর্ঘকাল রক্ষিত হইবে। এই জন্যই এখনকার চড়া বাজারেও লোকে শেয়ার কিনিবার আগ্রহ দেখাইতেছে। সরকারি ঋণপত্র সম্বন্ধেও একই কথা। চালু শেয়ারের মত সরকারী ঋণপত্রগুলিও যে কোন সময়ে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায়। ভারত সরকার ঋণপত্রসমূহের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সুদের হার এখানকার মন্দা টাকার বাজারের হিসাবে লোভনীয় সন্দেহ নাই। কাজে কাজেই দেশের অর্থবান ব্যক্তিগণ এবং খুঁকিদারেরা শেয়ার ও ঋণপত্র কিনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতেছে এবং তাহাদের প্রচণ্ড চাহিদার চাপে তেজী বাজার আরও তেজী হইয়া উঠিতেছে।

আগে ভারতে যখন পৌনে দুই শত কোটি বা তাহারও কম টাকার নোট চলিত, তখন বেশী সুদের প্রতিশ্রুতি না দিলে ভারত সরকার প্রয়োজনমত ঋণসংগ্রহ করিতে পারিতেন না। তখন তাঁহারা শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হিসাবেও ঋণপত্রের উপর সুদ দিয়াছেন। স্থায়ীভাবে ঋণসংগ্রহের জন্য তাহারা ২৭২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মেয়াদীহীন ৩।০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি কিস্তিতে বাজারে ছাড়িয়াছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে অবশ্য ভারতে টাকার পরিমাণ হু হু করিয়া বাড়িতে থাকে। নানাভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি সত্বেও যুদ্ধের প্রচণ্ড খরচ চালাইতে ভারত সরকারকে প্রচুর টাকা ধার করিতে হয়। এই সময় লোকের হাতে যথেষ্ট টাকা জমিয়া যায়, অথচ সেই টাকা লাভজনকভাবে নিরাপত্তার ভিত্তিতে খাটাইবার কোন পথ তাহারা খুঁজিয়া পায় না। এই সব লোকের নিকট হইতে ভারত সরকার শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদে বিভিন্ন ঋণপত্রে প্রায় হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেন। শেষদিকে

আরও কম সুদে টাকা পাওয়া সম্ভব হয় এবং শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা সুদের কিছু পরিমাণ ঋণপত্র তাঁহারা বাজারে ছাড়েন। ১৯৪৫ সালে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা সুদের সরকারী ঋণপত্রও বাজারে ছাড়া হয়।

বাজারে এরূপ টাকার প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার অবশেষে ৩॥০ আনা সুদের অমেয়াদী কোম্পানীর-কাগজগুলি শোধ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর কাগজ অল্পতর সুদের ঋণপত্রে রূপান্তরিত করিবার আয়োজন করায় সুদের দরুণ ভারত সরকারের বৎসরে দেড় কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। ভারত সরকার ১৯৪৬ সালের ২৪শে মে এক বিজ্ঞপ্তিতে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাতিলের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মালিকেরা ইচ্ছা করিলে কাগজের উপর লিখিত মূল্যের সমপরিমাণ নগদ টাকা ফিরাইয়া লইতে পারিবেন, অথবা এই লিখিত টাকার হিসাবে তাঁহারা সমমূল্যে ১৯৮৬ সালে পরিশোধিতব্য শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের কনভারসন লোন কিম্বা শতকরা ৯৯ টাকা দরে ১৯৭৬ সালে পরিশোধিতব্য শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা সুদের ঋণপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন। কোম্পানীর কাগজ এই ভাবে পরিবর্ত্তনের সময় ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছে।

গত আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে '৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাতিলের সিদ্ধান্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা সুদের দরুণ খরচ বাঁচাইবার এই সিদ্ধান্তের জন্য ভারত সরকারকে অভিনন্দিত করিয়াছি। বাস্তবিক যেখানে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা সুদে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায়, সেখানে এই গরীব দেশের একরাশ কোটি টাকা বৎসরে বরবাদ করিয়া দেওয়ার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা ভারত সরকারকে ব্রিটেনে অকেজোভাবে সঞ্চিত ভারতের ১৮শত কোটি টাকা ষ্টার্লিং পাওনা হইতে রেলওয়ে সংক্রান্ত ঋণপত্রগুলি পরিশোধ করিয়া বৎসরে সুদের দরুণ ৩০ কোটি টাকা বাঁচাইবার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। তাছাড়া আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, ৩॥০ আনা সুদের ঋণপত্রে হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু জনহিতকর ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান চলে, ঋণপত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের বাজেটে বিপর্য্যয় দেখা দিবে এবং তাহাতে বিরাট জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার এখনও শেষোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দুইটির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, এই অমনোযোগিতার পরে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাতিলের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে অসুবিধাগ্রস্ত দেশবাসীর নিকট ভারত সরকার কিছুতেই প্রশংসার্হ হইতে পারেন না।

যাহা হউক, মোটের উপর সস্তা টাকার যুগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকার যে তাঁহাদের ঋণসংগ্রহ নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, ইহার ফল দেশের অর্থনীতির উপর ভালই হইবে। সরকারী ঋণপত্রের সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় লোকে এখন দেশীয় শিল্পাদিতে টাকা খাটাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক ঔৎসুক্য অনুভব করিবেন। তাছাড়া ঋণপত্রের সুদের হার কমার সঙ্গে সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার কমিবারও আশা করা যায়। বাস্তবিক টাকার বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—ভারত সরকার ঋণপত্রের সুদের হার কমাইবার দিকেই এখন নজর দিবেন। সম্প্রতি তাঁহারা ৩৫ কোটি টাকার যে নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার জন্য সুদ দেওয়া হইয়াছে শতকরা মাত্র ২॥০ আনা। বাজারে টাকার প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে ভারত সরকার এমনি আশান্বিত যে, ১৯৩১ সালে পরিশোধনীয় ৩৫ কোটি টাকার ঋণপত্র বেচিবার জন্য তাঁহারা মাত্র ১দিন (১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট) সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অতঃপর ভারত সরকার যে সকল ঋণপত্র বাজারে ছাড়িবেন, সেগুলির সুদের হার শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকার আশপাশে থাকাই স্বাভাবিক।

ব্রিটেনের নূতন মার্কিণ ঋণলাভ

সুদীর্ঘ সাতমাস কাল অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাটাইয়া অবশেষে ব্রিটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৩৭৫ কোটি ডলার বা প্রায় ১২ শত কোটি টাকা ঋণলাভে সমর্থ হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনকে ঋণ ও ইজারা নীতি অনুযায়ী প্রচুর অর্থ ধার দেয়। যুদ্ধ থামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এই ঋণপ্রদান ব্যবস্থার অবসান ঘটে। কিন্তু সেই সময় সমরবিজয়ী ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা এমনি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, মার্কিণ ঋণ বন্ধ হইবার পর তাহার অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যুদ্ধের হাঙ্গামায় বাণিজ্যজীবী ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্য দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সমরপণ্য উৎপাদন কারখানাগুলিকে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই বহির্বাণিজ্য পুনর্গঠন করা প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ। ব্রিটেনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক ঋণসংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে অন্তর্দ্দেশীয় সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটেনের নব-গঠিত শ্রমিক মন্ত্রিসভা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পরলোকগত লর্ড কিনেসকে, নূতন মার্কিণ ঋণসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় পাঠান। কিনেস মিশন যুক্তরাষ্ট্র সভাপতি ও সিনেটারদের বুঝাইয়া দেন, ব্রিটেনের এই ঋণলাভের উপর পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক প্রভাবের প্রতিষ্ঠা কতখানি নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক, অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ ঋণদানে প্রাথমিক সম্মতি দিয়া এই সম্পর্কে একটি বিল সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে উপস্থাপিত করেন। অধিকাংশ আমেরিকান এই ঋণের সপক্ষে থাকিলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন প্রভাবশীল ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব ব্রিটেনকে নূতন ঋণদানে আপত্তি জানান। তারপর ব্রিটেনের প্যালেষ্টাইন নীতির জটিলতায় বহু মার্কিণ ইহুদিও ইংরেজদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান এবং প্রতিনিধিপরিষদে ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক বিলটি যখন উপস্থাপিত হয় তখন ইহা বাতিল করিয়া দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। মার্কিণ কংগ্রেসের ডেমোক্রেট সদস্য মিঃ

ইমানুয়েল সেলার এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের নেতৃত্ব করেন। যাহা হউক, বিরোধী দলের তীব্র বাধাদান সত্ত্বেও মার্কিণ সেনেটে ৪৬-৩৪ ভোটে ও প্রতিনিধি পরিষদে ২১৯-১৫৫ ভোটে বিলটি গৃহীত হইয়াছে। পরিষদ বিলটি গ্রহণ করিবার পর গত ১৬ই জুলাই মার্কিণ সভাপতি ট্রুম্যান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরপ্রদান করিয়া বিলটিকে আইনে পরিণত করেন।

অবশ্য যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনকে জয়ী করায় আমেরিকার স্বার্থ ছিল বলিয়া ঋণ ইজারা নীতি অনুসারে মার্কিণ সাহায্যের জন্য ব্রিটেনের বিশেষ বাধ্যবাধকতা ছিল না, কিন্তু এবারের এই নূতন ঋণের জন্য ব্রিটেনকে কতকগুলি সর্ত্ত মানিয়া লইতে হইয়াছে। এইসব সর্ত্তের মধ্যে মার্কিণ ঋণ অপেক্ষা সুবিধাজনক হারে নূতন সাম্রাজ্যিক ঋণ লাভের ব্যবস্থা না করা, কোন প্রকার আন্তর্জ্জাতিক শুল্ক রদের প্রস্তাবে উদ্যোক্তা হইবার অধিকারী না থাকা, সাম্রাজ্যিক ডলার পুল তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি প্রধান। ব্রিটেন সাম্রাজ্যিক ডলার পুলের দৌলতে যুদ্ধের মধ্যে সাম্রাজ্যভুক্ত সকল দেশের ডলার উদ্বৃত্ত স্বচ্ছন্দে নিজের কাজে লাগাইয়াছে এবং ফলে ব্রিটেনের পণ্য বাজারে ভারসাম্য রক্ষিত হইলেও ভারতের মত দেশে চূড়ান্ত পণ্যাভাব ও ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে। অটোয়া চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা পাইয়াছে তাহারও মূল্য কম নয়। এই সব সুবিধা আর একবৎসরের মধ্যে বহুলাংশে হারাইতে হইবে বলিয়া এই নূতন ঋণলাভে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল আনন্দিত হন নাই। এই দলের নেতা মিঃ চার্চ্চিল প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ করিয়াছেন যে, শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সামান্য ঋণলাভের বিনিময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ব্রিটিশ সম্ভ্রম বিকাইয়া দিতে চলিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্রিটেনের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া শ্রমিক দল ও অধিকাংশ ব্রিটিশ জনসাধারণ এই ঋণলাভের সংবাদে খুসী হইয়াছেন। এই ঋণের হিসাবে লব্ধ অর্থের দ্বারা ব্রিটেনের শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক অন্যায় সুবিধা না লইয়াও এইবার ব্রিটেন নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। ব্রিটিশ অর্থসচিব ডাঃ হিউ ডালটন এই ঋণলাভকে ব্রিটেনের আর্থিক পুনর্গঠনের পক্ষে মহান সুযোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাঁহাদের এলাকার খনিগুলির বার্ষিক উত্তোলিত ১০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ হইতে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনকে অন্ততঃ ৮ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ বিক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। প্রতি আউন্স মাত্র ৮ পাউণ্ড ১২ শিলিং ৬ পেন্স দরে ব্রিটেন এই স্বর্ণ কিনিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, এইভাবে মার্কিণ ঋণ ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ লাভ করায় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বহির্বাণিজ্য ও মুদ্রাব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ কঠিন হইবে না।

স্থির হইয়াছে, শতকরা ২ টাকা হারে সুদ ধরিয়া ব্রিটেনকে ১৯৫১ সাল হইতে মোট দেনার টাকা ৫০টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং ব্রিটিশ প্রীতি বিবেচনা করিলে ঋণের সর্ত্ত আর একটু সুবিধাজনক হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নিঃস্ব ব্রিটেন উপস্থিত আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে যে সর্ত্তে ঋণলাভ করিয়াছে, তাহাও যথেষ্ট লাভজনক সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এখন যে পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহাতে ব্রিটেনকে যুদ্ধের আগেকার হিসাবে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ অবিলম্বে অন্ততঃ দেড়গুণ করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচ্য ঋণ না দিলে এই বাণিজ্য সম্প্রসারণ, তথা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে হাত দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইত। ঋণদান বিল আইনে পরিণত হইবার মাত্র দুই দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ১৮ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের হিসাবে ঋণের একাংশ (৩০ কোটি ডলার) নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন। ঋণলাভ এইভাবে ত্বরান্বিত হওয়ায় ব্রিটিশ অর্থসচিবের পক্ষে পুনর্গঠন পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্য্যকরী করা অবশ্যই সহজ হইবে।

ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা যে ১৮শত কোটি টাকা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় পচিতেছে, ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল না হইলে তাহা আদায় করা নিঃসন্দেহে কঠিন। ইঙ্গ-মার্কিন ঋণচুক্তিতে ভারতের কথা বিশেষ বিবেচিত হয় নাই, বরং তাহার ফলে পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চক্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষের পক্ষে ভয়েরই কথা। তবু মার্কিন ঋণও দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণে ব্রিটেন অল্পদিনের মধ্যে স্বচ্ছল হইয়া উঠিবে বলিয়া ভারতবাসী ভারতের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমাত্র ভরসা পাওনা ষ্টার্লিংগুলি শীঘ্র ফিরিয়া পাইবার আশা করিতে পারে।

২৩,৭।৪৬

অভিনয়

শ্রীরমোলা দে

মিথ্যা মানুষ করে অভিনয় জীবনমঞ্চ পরে
শ্বেতপাথরের অট্টালিকাতে, ছিটাবেড়া দেওয়া ঘরে,
সেখানে ক'জন স্মরণীয় হয়? ঘূর্ণায়মান পটে
মুখস্থ বুলি ভাল ক'রে ব'লে কারো সুখ্যাতি রটে!

আলোকজ্জ্বল গৃহে পেতে হায় ক্ষণিকের করতালি
দরিদ্র-সাজে সম্রাট্ যেথা প্রমত্ত-বনমালী।
সেথা হ'তে কেন শিক্ষা লভি না? আসল জীবনে এসে
সেরা অভিনয় ক'রে চলে যাই সেরা জনমের শেষে!

সাময়িকী

বাঙ্গালার খাদ্যপরিস্থিতি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসদলের সদস্যগণের পক্ষ হইতে বাঙ্গালার খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রচার করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—"বাঙ্গালা সরকার আজ দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই না করিয়া জনগণের জীবন তুচ্ছ করিয়া মুসলেম লীগকে শক্তিশালী করিবার জন্য যে অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহকারী নিয়োগ করা হইয়াছে, ফলে মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া হিন্দুদিগকে সাহায্য দান করা হয় নাই। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ঘাটতি অঞ্চলে চাউলের মণ ৩০ হইতে ৪০ টাকা—যে স্থানে ঘাটতি কম, সেখানে চাউলের মণ ১৮ হইতে ২৫ টাকা। কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, জনসাধারণ অনশনে দিন কাটাইতেছে, কোন কোন স্থানে লোক অন্নাভাবে কচু সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও চট্টগ্রামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনও চাউল অজ্ঞাতস্থানে রপ্তানী করা হইতেছে। খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থায় দুর্নীতি আছে। নূতন রেশনিং প্রথা আদৌ সন্তোষজনক নহে। চাঁদপুরে হিন্দুগণকে ও ঢাকা জেলার এক স্থানে নমশূদ্রগণকে বাদ দিয়া মুসলমানদিগকে শুধু চাউল দেওয়া হইয়াছে। মৈমনসিংহ-কিশোরগঞ্জে মুসলমানগণকে ছাড়া অপর কাহাকেও খাদ্য শস্য দেওয়া হয় না। মুন্সীগঞ্জে মুসলমানের দোকানগুলি পরীক্ষা করা হয় না। ঐ বিবৃতিতে বিশেষভাবে চোরাবাজার, বর্ত্তমান দুর্নীতি ও অব্যবস্থার নিন্দা করা হইয়াছে।"

বন্যার প্রকোপ—

এবার বাঙ্গালা ও আসামের বহু স্থানেই ভীষণ বন্যায় লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থা সর্ব্বাধিক শোচনীয়। তথায় ৫ দিনে ২১ ইঞ্চি বারিপাতের ফলে সমগ্র উপত্যকাভূমি বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ করিম জানাইয়াছেন—"মোট ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই তবে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, উহা ১৯৪১ সালের মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যার ক্ষতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।" চট্টগ্রামের নেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন জানাইয়াছেন যে, বন্যায় চট্টগ্রামের তিন লক্ষেরও অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর নিজে চট্টগ্রামে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল দেখিতে গিয়াছিলেন। আসামে কামরূপ, নওগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর—৪টি জেলা বন্যার ফলে দারুণ দুর্গতির কবলে পড়িয়াছে। জলে মরা মানুষ ও ধানের গোলা ভাসিতেছে। ইম্ফল ও নাম্বুল নদীতে জলবৃদ্ধির ফলে ইম্ফল সহর জলমগ্ন হইয়াছে। ডিমাপুর-মণিপুরপথে ডাক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নোয়াখালিতে ফেণী ও মুহুরী নদীর বন্যায় ফেণী মহকুমা সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া গিয়াছে। সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর জলবৃদ্ধিতে ১২টি ইউনিয়ন জলমগ্ন হইয়াছে। ঐ স্থানের ১ লক্ষ অধিবাসী বহির্জগত হইতে সম্পর্করহিত হইয়া গিয়াছিল। চট্টগ্রামে ফটিকছড়ি, রাওজান, রাহুনিয়া, হাটহাজারী, পটিয়া, সাতকানিয়া, মিরাসরাই, কুতুবদিয়া ও চাকরিয়া এই ৯টি ইউনিয়নের লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বন্যা সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি করিয়া কলিকাতায় এক কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। শরৎবাবুর নির্দ্দেশমত মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আজাদ-হিন্দ সরকারের মন্ত্রী) চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন ও নিজে সকল সাহায্য কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কলিকাতা ১১৬ লোয়ার সার্কুলার রোডে কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলায় গোমতী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া সোনানল সাহাবাদ—ইউনিয়ন পূর্ণভাবে এবং

বামনপাড়া, বুড়ীচং ও চাঁদনা ইউনিয়ন আংশিকভাবে প্লাবিত হইয়াছে। কাকেরী নদীর জলবৃদ্ধির ফলে ১০ মাইল জমীর আউস ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নদীয়া জেলার মেহেরপুর অঞ্চলেও লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আসাম ও বাঙ্গালার বন্যা সাহায্যে সকলকে অর্থদান করিতে নিবেদন জানাইয়াছেন। আসামের কাছাড় জেলায় বন্যার ফলে ৮ শত গ্রামের দুই লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া শিলচরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রশঙ্কর দত্ত সংবাদ দিয়াছেন।



কলিকাতায় মহিলা সম্মিলনে সমাগত শ্রীযুক্তা হংস মেটা ও রাজকুমারী অমৃত কাউর ফটো—পান্না সেন

রুশিয়ার শ্রীযুত ডাঙ্গে—

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি, খ্যাতনামা শ্রমিক-নেতা শ্রীযুত এম-এ ডাঙ্গে বর্ত্তমানে রুশিয়ায় আছেন। তিনি ৪ঠা জুলাই তথায় এক সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ভারতে ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদিগকেও কারখানায় কাজ করিতে দেওয়া হয়। ভারতে বাসস্থানের অভাবের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি—

ভারতের কাপড়ের কলসমূহের মালিকগণ ১লা আগষ্ট হইতে কাপড়ের দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। মোটা কাপড়ের দাম শতকরা ৮ টাকা বাড়িবে। অথচ এই মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ নাই। সম্প্রতি মিলমালিক সমিতি অতিরিক্ত আয় কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। বস্ত্রের মূল্য এখনই খুব বেশী—ইহার উপর মূল্য বাড়িলে লোকের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এ বিষয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় মিল-মালিকগণ প্রভূত লাভ করিয়াছেন। কাজেই এখন লাভের পরিমাণ কম হইলেও তাঁহাদের তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য।

বিলাতে ভারত-কথা প্রচার—

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ বিলাতে যাইয়াও তথায় ভারতের কথা প্রচার করিতেছেন। ৯ই জুলাই লণ্ডনের 'টাইম্‌স' পত্রে তাঁহার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—ভারতের ৩০ কোটি লোক কংগ্রেসকে মান্য করে—আর মাত্র ৯ কোটি লোক মুসলেম লীগের ভক্ত। এ অবস্থায় কি করিয়া লীগ-নেতা কংগ্রেসের সহিত সমানসংখ্যক প্রতিনিধি দাবী করেন, তাহা বুঝা যায় না। ভারতবাসী মুসলমানগণ সকলেও লীগের ভক্ত নহে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের মুসলমানগণ কংগ্রেসের অধীনে কাজ করিতেছেন।

ফেনীতে বস্ত্র বণ্টন—

নোয়াখালি জেলায় ফেণী হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ৫ জন সরকারী কর্মচারী ৭ মাসে মোট এক হাজার গজ কাপড় নিজেদের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিয়াছে। এ অবস্থায় সাধারণ লোককে যে বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া দিন যাপন করিতে হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এই সকল কর্ম্মচারীকে কি উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? তাহা করা না হইলে চিরকাল এইরূপ দুর্নীতি চলিতে থাকিবে।

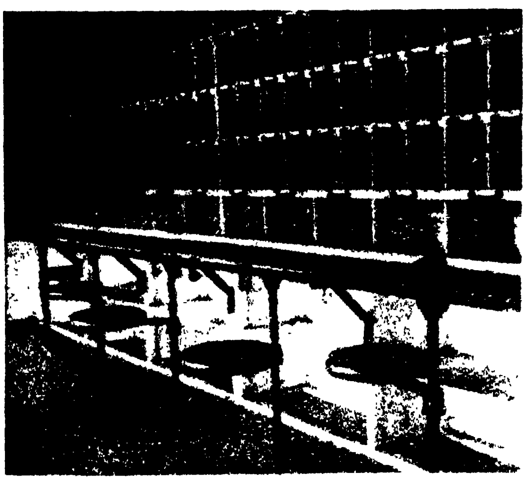
শ্রীযুত রজনীপামী দত্ত—

শ্রীযুক্ত রজনীপামী দত্ত ভারতবাসী, তিনি বিলাতে থাকিয়া বৃটীশ কম্যুনিষ্ট দলের নেতা হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। ৭ই জুলাই লাহোরে এক সভায় তিনি বলিয়াছেন—বৃটীশ মন্ত্রিমিশন যে স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা দ্বারা জনগণ আদৌ উপকৃত হইবে না। বৃটীশ সম্রাজ্যবাদের এজেন্টগণ

উপকৃত হইতে পারেন। দিল্লী ও সিমলার যেমন সকল আপোষ চেষ্টা বিফল হইয়াছে, গণপরিষদেও তাহাই হইবে।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস—

৭ই জুলাই বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যোগদান করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতের কংগ্রেস নেতাদিগকে ধীরভাবে সকল বিষয় বিবেচনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সকলকে গণপরিষদের মধ্য দিয়া স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—যাহারা প্রকৃত সত্যাগ্রহী, তাহাদের কেহ ঠকাইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা জয়লাভ করে। তিনি সভায় পূর্ণ ১ ঘণ্টাকাল এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।



ডাক ধর্ম্মঘটের জন্য বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগত আর-এম-এসএর খালি কামরা ফটো—পান্না সেন

৯ই আগষ্ট পালন—

কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ উভয়েই আগামী ৯ই আগষ্ট 'বিপ্লবের স্মৃতিদিবস' রূপে সকলকে ঐ দিন পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরাধীন ভারতবাসীদের ঐ দিন স্বাধীনতা লাভের উপায়ের কথা আলোচনা করিতে বলা হইয়াছে।

পরলোকে পদ্মরাজ জৈন—

বাঙ্গালায় হিন্দু-মহাসভা আন্দোলনের অন্যতম নেতা পদ্মরাজ জৈন মহাশয় গত ৬ই জুলাই পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি লোকমান্য তিলকের শিষ্য ছিলেন; পরে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছিলেন। মোপলা বিদ্রোহের পর তিনি হিন্দুমহাসভা আন্দোলন আরম্ভ করেন। বহুকাল তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ও নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ-সম্পাদক ছিলেন। ১৫ বৎসর তিনি হিন্দু অবলা আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ, হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার ত্যাগ ও কার্য্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।



ডাক ধর্ম্মঘটের ফলে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা ফটো—পান্না সেন

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ও বিহার গভর্ণমেণ্টের সহযোগে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দামোদর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। দামোদর নদে ২টি, বরাকর নদে ৩টি এবং কোনার ও বোকারো নদে ১টি করিয়া মোট ৭টি বাঁধ দেওয়া হইবে। ফলে প্রচুর ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে ও ৭ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমীতে জল সেচের ব্যবস্থা হইবে। এখনই ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ মাইল একটি পথ প্রস্তুত করা হইতেছে—তাহার পর মইথনে ২ লক্ষ ঘন গজ মাটী সরাইয়া প্রথম বাঁধ প্রস্তুত হইবে। পরিকল্পনা

বিরাট, কার্য্যতঃ ইহা কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া থাকিবে।

রেঙ্গুনে শ্রীশরৎ বসু—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার পুত্র শ্রীমান শিশির বসু ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভিমানীকে সঙ্গে লইয়া ২০শে জুলাই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বিমানে ২১শে জুলাই রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত দীননাথের গৃহ অশোক ভিলায় অতিথি হইয়াছিলেন। কয়দিন অবস্থানের পর ২৭শে জুলাই তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।



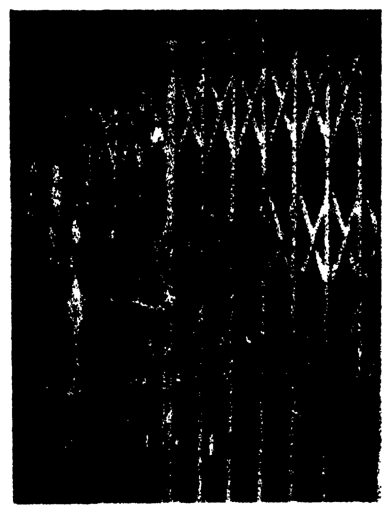
ডাক ধর্ম্মঘটে কর্মীশূন্য জি পি-ওতে কর্ম্মরত ঘড়ী ফটো—পান্না সেন

বিদেশ হইতে নির্ব্বাসিতদের আনয়ন—

খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌয়ে আছেন। তিনি ১৫ বৎসর জার্ম্মানী ও আমেরিকায় ছিলেন। রাজনীতিক কারণে তাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ আবদুল হাফিজ, পাঞ্জাবের সর্দ্দার অজিৎ সিং, অবনী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ সেন, জি-এন-সান্যাল, হরেন্দ্র গুপ্ত, মধ্যপ্রদেশের পেণ্ডুরং খানকোজা প্রভৃতিকে এখনও ভারতে আসিতে দেওয়া হইতেছে না। তাঁহারা যাহাতে সত্বর ভারতে ফিরিয়া আসিতে পারেন, সেজন্য সকলকে আন্দোলন করিতে বলিয়াছেন ও ঐ সম্পর্কে তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

১৯৪২এর অত্যাচারীদের দণ্ড—

বিহার ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী জনগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাদের দণ্ডদান ব্যবস্থার প্রস্তাব গত ১৬ই জুলাই গৃহীত হইয়াছে। প্রথমে অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া অপরাধী স্থির করা হইবে। এই প্রস্তাবের পরই কয়েকজন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাকরীর মেয়াদ শেষ না হওয়া সত্বেও চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের জন্য আবেদন করিয়াছেন।



ডাক ধর্ম্মঘটে তালাবদ্ধ অবস্থায় বেঙ্গল টেলিফোনের বড়বাজার শাখা
ফটো—পান্না সেন

সিন্ধুদেশে মন্ত্রিমণ্ডল সমস্যা—

বর্ত্তমানে সিন্ধু প্রদেশে মুসলেম লীগ নেতা সার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লার নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডল কাজ করিতেছে। সম্প্রতি মুসলেম লীগদলের ২ জন সদস্য লীগের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগদান করায় লীগ ৬০ জন মোট সদস্যের স্থানে মাত্র ২৫ জন সদস্য পাইয়াছেন। কাজেই বিরোধী দল এখন সংখ্যাধিক দলে পরিণত হইয়াছে। বিরোধী দলের নেতা মিঃ জি-এম সৈয়দ সে জন্য মন্ত্রীমণ্ডলের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া নিজে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল রচনা করিবার ইচ্ছা গভর্ণরকে জানাইয়াছেন।

নিজামের রাজ্যে শাসন সংস্কার—

ছত্রীর নবাব হায়দ্রাবাদের নিজামের শাসন পরিষদের সভাপতিরূপে ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী অক্টোবর মাসে ঐ রাজ্যে নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে নূতন ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইবে। ১৯৩৯ সালে যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহাই এতদিনে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। রাজ্যের আয় ১৬ কোটী টাকা বাড়িয়াছে। ঐ বর্দ্ধিত আয় যাহাতে জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয়িত হয় ছত্রীর নবাব সেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যগুলিতেই অধিক কুশাসন দেখা যায়—ক্রমে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহারা সকলেই উপকৃত হইবে।



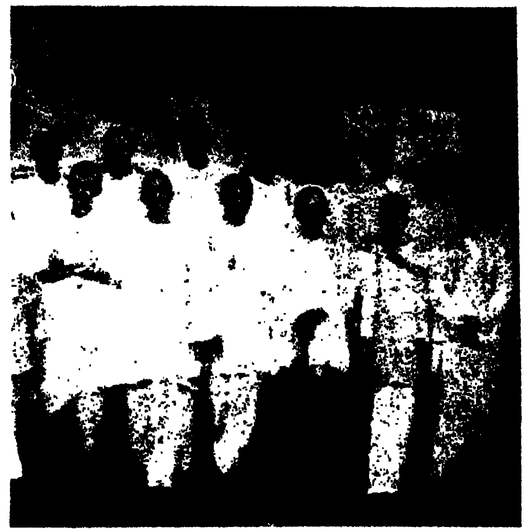
পরিষদ গৃহে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের ভাষণ ফটো—পান্না সেন

কবি নজরুল ইসলাম—

খ্যাতনামা কবি কাজি নজরুল ইসলাম গত কয় বৎসর দারুণ রোগে শয্যাগত আছেন। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা তাঁহার জন্য মাসিক ২ শত টাকা সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করায় তাঁহার অর্থাভাব কিছু কমিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় ৯৩ ধারার শাসনের সময় সহসা সে বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। পরে অনেক চেষ্টায় ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত সরকার কবিকে ঐ বৃত্তি দিতে সম্মত হন। সম্প্রতি সুরাওয়ার্দ্দী-মন্ত্রিসভা কবির বৃত্তিটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নজরুলের মত সর্ব্বজনপ্রিয় কবির সংখ্যা কম—কাজেই তাঁহার এই অর্থাভাব দূর করার সংবাদে সকলে আনন্দিত হইবেন।

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র উৎসব—

গত ৭ই জুলাই রবিবার সকালে ২৪ পরগণা কাঁঠালপাড়া গ্রামে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসগৃহে বঙ্কিমচন্দ্র উৎসব হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী শাখার উদ্যোগে সভা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত



কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম জন্মোৎসবে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নারায়ণ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচরণ দে পুরাণরত্নের উদ্যোগে সভা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

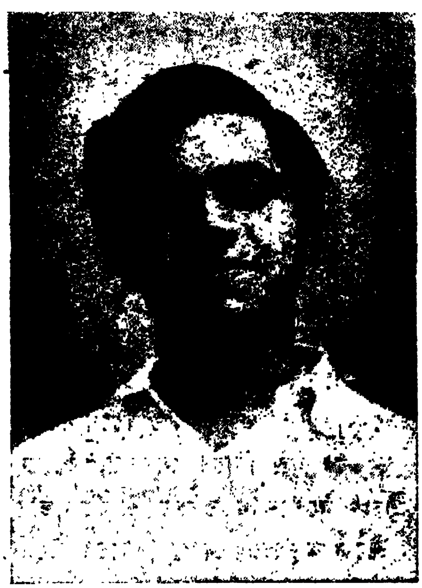
কলিকাতায় ইলেক্‌ট্রিক সরবরাহ—

কলিকাতায় ইলেকট্রীক সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার এখন কলিকাতা ইলেকট্রীক সাপ্লাই কর্পোরেশনের হাতে। উক্ত কর্পোরেশনের লাইসেন্সের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে নোটীশ দিয়া ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় ইলেকট্রিক সরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গালায় ৯৩ ধারায় শাসনের সময় গভর্ণর মিঃ কেসি কর্পোরেশনের সহিত নাকি এমন এক

চুক্তি করিয়াছেন, যাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট যথাসময়ে নোটীশ *দিলেও ১৯৫০ সালে ইলেকট্রিক সরবরাহের ভার হাতে* পাইবেন না, ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য কর্পোরেশন যে হারে ইলেকট্রিকের দাম গ্রহণ করে, তাহা অত্যন্ত বেশী। বিদেশী মূলধনে গঠিত কর্পোরেশন এদেশে ব্যবসা করিয়া অত্যধিক লাভ করে। গভর্ণমেণ্ট ঐ ভার লইলে কলিকাতায় ইলেকট্রিকের দাম কমিয়া যাইত ও তদ্দ্বারা গৃহস্থ, ব্যবসায়ী—সকলেই উপকৃত হইতে পারিত।

পরলোকে প্রতীপচন্দ্র মুখার্জ্জি—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাধ্যক্ষ (চীফ একজিকিউটিভ অফিসার) মিঃ জি, সি, মুখার্জ্জির কনিষ্ঠ



৺প্রতীপচন্দ্র মুখার্জ্জি

পুত্র প্রতীপচন্দ্র অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২২ বৎসরের তরুণ যুবক প্রতীপের অটুট ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য বাঙ্গলাদেশের যুবক সমাজের ঈর্ষার বিষয় ছিল। সরল, অনাড়ম্বর ও বিনয়নম্র মধুর ব্যবহারে প্রতীপ যুবসমাজের আদর্শ ছিল। ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড় হিসাবেও সে সমাজে আদর লাভ করিয়াছিল। গত বৎসর সেণ্ট জেভিয়ার্স হইতে প্রশংসার সহিত বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসামের অন্তর্গত ছাতকে আসাম-বেঙ্গল-সিমেণ্টের কারখানায় সে হাতে-হাতুড়ীতে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল। প্রতীপের জনক-জননীর শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের জানা নাই। এই দুঃসহ পুত্রশোক যাঁহার দান, সান্ত্বনা একমাত্র তিনিই দিতে পারেন।



পা-নগর শ্মশানঘাটে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা

ফটো—পান্না সেন

৫ হাজার বৎসরের পুরাতন সভ্যতা—

রাজপিপলা রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের ফলে গুজরাট ও মধ্যভারতে নর্ম্মদা উপত্যকায় ৫ হাজার বৎসরেরও অধিক পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঐ সভ্যতা নাকি মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীন। ইন্দোর রাজ্যে মহেশ্বর নামক স্থানে প্রাক্‌-ঐতিহাসিক যুগের একটি সমগ্র সহর পাওয়া গিয়াছে। উহা পুরাণে লিখিত মহিষমতী নগর বলিয়া ধরা হইয়াছে। আরও বহু স্থান খনন করা হইতেছে, তাহার ফলে পুরাতন সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

পরলোকে কিরণচাঁদ দরবেশ—

ফরিদপুর জেলার খালিয়া নিবাসী কবি কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীধামে শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ মঠের মোহান্তরূপে বাস করিতেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল—কিরণচাঁদ দরবেশ। গত ১৭ই আষাঢ় ৬১ বৎসর বয়সে তিনি মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দেশ সেবক, সমাজ সংস্কারক ও শিল্পী ছিলেন। তিনি বারাণসীর বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার রচিত ২০ খানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি স্বর্গত অশ্বিনীকুমার দত্ত,

বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির সহিতও একত্র কাজ করিয়াছিলেন ও পরে কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি হইয়াছিলেন।

স্যার মহম্মদ আজিজল হক—

সার মহম্মদ আজিজল হক ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব ছিলেন। বড়লাট পুরাতন শাসনপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। খাঁ-বাহাদুর এম-এ মোমিনের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) যে সদস্যপদ খালি হইয়াছিল, সার আজিজল বিনা বাধায় সেই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে গণপরিষদেরও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে সরকারের মন্ত্রীরূপে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে, বিলাতে হাই কমিশনাররূপে তিনি ইতিপূর্ব্বে কাজ করিয়াছেন।



পরিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী কর্ত্তৃক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আশ্বাস দান

ফটো—পান্না সেন

সিংহলে ভারতবাসী—

মহাত্মা গান্ধী গত ১২ই জুলাই পুনায় প্রার্থনার সময় বলিয়াছেন—সিংহলে সিংহলবাসী ও ভারতবাসীর মধ্যে বিবাদ থাকা উচিত হইবে না। ভারতীয়গণ শ্রমিকরূপে সিংহলে গিয়া নানারূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাজ করিয়াছিল। এখন তাহাদের পক্ষে দেশে ফিরিয়া আসা সহজসাধ্য নহে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী সিংহলে ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আশা হয়, তাঁহাদের মধ্যস্থতায় সিংহলে ভারতবাসীদের অসুবিধার অবসান হইবে।

আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৪ঠা ও ৫ই শ্রাবণ আসামের শিলংয়ে নিখিল আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার সম্মিলনে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। আসামের এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত পরেশলাল সোম প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলুইএর বাণী পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন ও জননেতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভার দুইদিন ব্যাপী অধিবেশনে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল।



টেলিফোন অফিসের সম্মুখে মহিলা ধর্ম্মঘটী ফটো—পান্না সেন

বাঙ্গালার গ্রামাঞ্চলে বিজলী—

বাঙ্গালা দেশে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলের প্রায় ২২ শত বর্গমাইল স্থানে ইলেকট্রিক সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে শিল্পোন্নতির জন্য এই চেষ্টা হইতেছে। গৌরীপুর হইতে কৃষ্ণনগর হইয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বিজলী সরবরাহ করা হইবে। রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, শক্তিগড়, রসুলপুর, মেমারী, বৈচি, পাণ্ডুয়া ও মগরায় বিজলী যাইবে। শান্তিপুর হইতে কালনাতেও

তার যাইবে। প্রায় ১২৭ মাইল তার খাটাইতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

কোগ্রামে কবি-সম্বর্দ্ধনা—

গত ১লা আষাঢ় রবিবার সকালে বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে বাঙ্গালার পল্লীকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের গৃহে তাঁহাকে সাহিত্য বাসরের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। কবি সুদূর পল্লীগ্রামে অজয় ও কুনুর নদীর সংযোগ-স্থলে যে নিভৃত কুঞ্জে বাস করেন, কলিকাতার একদল সাহিত্যিক তথায় গমন করিয়া কালিদাস দিবসে তাঁহাদের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় কবিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য, হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার রায়-চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু লেখক ও কবি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনেকে যাইতে না পারিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবির গৃহে সকলে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তোরণ নির্ম্মাণ, নহবৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা দ্বারা অতিথিদের অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। কবি নিজে, তাঁহার পুত্রগণ ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান ও অতিথিদের দেখাশুনা করিয়াছিলেন। কোগ্রামে চৈতন্য-মঙ্গল প্রণেতা লোচন দাসের শ্রীপাট—সকলে তাহা এবং স্থানীয় মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির ও বিগ্রহদর্শন করিয়াছিলেন।

পাটনায় বর্ষামঙ্গল—

গত ১৫ই আষাঢ় পাটনার কিশোর দলের উদ্যোগে পাটনা লেডী ষ্টিফেনসন হলে প্রভাতী ও বেহার হেরাল্ড সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের সভাপতিত্বে বর্ষামঙ্গল উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রঞ্জিতসিংহ উহার প্রযোজনা ও পাটনা মিউজিক ক্লাব সঙ্গীত সংযোজনা করিয়াছিলেন। বিহারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগলাল চৌধুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় ক্যান্সার হাসপাতাল—

ক্যান্সার (কর্কট) রোগ দুরারোগ্য। কলিকাতায় তাহার চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নাই। সে জন্য কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই এক শত শয্যাসহ একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবেন। ১০০ শয্যার মধ্যে ৭০টিতে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করা হইবে। চিকিৎসার জন্য ৬০ হাজার টাকা মূল্যে এক হাজার মিলিগ্রাম রেডিয়াম সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি ও ডাক্তার সুবোধ মিত্রকে সম্পাদক পরিচালক করিয়া হাসপাতাল কমিটি গঠিত হইয়াছে। হাসপাতালের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।



প্রতিবেশীবৃন্দসহ কবি কুমুদরঞ্জন

মাদ্রাজ গভর্ণরের সুমতি—

মাদ্রাজে ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশনের উপযুক্ত সুপ্রশস্ত হল নাই। সরকারী দপ্তরখানা গৃহের যে হলে পরিষদের অধিবেশন হইত তথায় অফিস, বসিবার ঘর প্রভৃতির স্থান ছিল না। মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত টি-প্রকাশম সে কথা গভর্ণরকে জানাইলে গভর্ণর সহরের মধ্যস্থিত ৩ শত বিঘার উপর যে লাট-প্রাসাদে নিজে বাস করিতেন, তাহা ব্যবস্থা পরিষদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। অতঃপর গভর্ণর

সহরের বাহিরে ছোট একটি প্রাসাদে বাস করিবেন। লাটপ্রাসাদে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনের উপযুক্ত হল ও অন্যান্য গৃহ প্রভৃতি আছে।

ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম দশ জন—

১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ১০ জন পরীক্ষার্থী প্রথম দশটি স্থান অধিকার করিয়াছেন—(১) সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পিরোজপুর গভর্ণমেণ্ট হাই (২) ব্রজমোহন মন্ত্রী—কালিম্পং এস-ইউ-এম ইনিষ্টিটিউসন (৩) প্রবীরকুমার সেনগুপ্ত—পাবনা জি-সি (৪) রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার—বগুড়া ধুপচাচিয়া হাই (৫) অমলকুমার চক্রবর্ত্তী—ঝালকাঠি গভর্ণমেণ্ট হাই (৬) অমলেন্দুজ্যোতি মজুমদার—পাবনা জি-সি (৭) রণজিৎকুমার তালুকদার—বড়পেটা হাই (৮) সদানন্দ দাস—কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা (৯) অমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য—দার্জ্জিলিং গভর্ণমেণ্ট হাই (১০) অনাদিনাথ দাস—স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ স্কুল।



ধর্ম্মঘটকালে দিবাভাগে কর্ম্মীহীন রুদ্ধদ্বার জি-পি-ও　ফটো—পান্না সেন

প্রাথমিক শিক্ষকগণের ধর্ম্মঘট—

বাঙ্গালা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার খুবই কম। তাঁহারা বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য সুখসুবিধা লাভের জন্য বহু দিন হইতে আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। সে জন্য তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের অনাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক সপ্তাহ কাল ধর্ম্মঘট করিবেন স্থির করিয়াছেন। ভোট লইয়া দেখা গিয়াছে, শতকরা ৯০ জন শিক্ষক ধর্ম্মঘট করার পক্ষপাতী।

আলমবাজারে কালিদাস উৎসব—

গত ৭ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় ২৪ পরগণা আলমবাজার ওয়ালডি ষ্ট্রীটে কবি শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে কালিদাস উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে শতাধিক



সাহিত্যবাসরের উদ্যোগে কালিদাস উৎসব
ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কালিদাসের কাব্য আলোচনা করিয়া সভায় বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা হইয়াছিল। হেমন্তকুমার সকলকে আদর অভ্যর্থনা প্রভৃতির দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

খদ্দর ও মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী গত ২৫ বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী সকলকে খদ্দর পরিধান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। খদ্দর পরিধানের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান বস্ত্রাভাবের যুগে অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। বস্ত্রাভাবে বহু লোক এখন খদ্দর ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন। গান্ধীজী গত ১১ই জুলাই পুনায় প্রার্থনা কালে সকলকে আবার চরকায় সুতা কাটিতে ও খদ্দর ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সে কথা কেহ কি শুনিবে?



রাজবন্দীদের মুক্তিদাবীতে কলিকাতায় নারী শোভাযাত্রী

ফটো—পান্না সেন



ধর্ম্মঘটের সময় জি-পি-ওতে পত্রসংগ্রহার্থীর ভীড়

ফটো—পান্না সেন

নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

গত ৬ই ও ৭ই জুলাই বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় একদিকে যেমন মৌলনা আবুল কালাম আজাদের স্থলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু নূতন সভাপতি হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যদিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নূতন ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন। নূতন দলে পুরাতন দলের পণ্ডিত নেহরু ছাড়াও নিম্নলিখিত ৬ জন আছেন—মৌলনা আজাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খান আবদুল গফুর খাঁ, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও শ্রীযুক্ত সি-রাজাগোপালাচারী। নূতন হইয়াছেন—মিঃ রফি আমেদ কিদওয়াই, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীমতী কমলা দেবী (কর্ণাটক), রাও সাহেব পটবর্দ্ধন (মহারাষ্ট্র), মিঃ ফকরুদ্দীন আহমদ (আসাম), সর্দ্দার প্রতাপ সিং (পাঞ্জাব), শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই ও ডাক্তার রামকৃষ্ণ কেসকার। শ্রীমতী মৃদুলা ও ডাক্তার কেসকার সাধারণ সম্পাদক হইবেন ও শ্রীযুক্ত পেটেল কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন। ডাক্তার কেসকার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নহেন, তাঁহাকে সদস্য করিয়া লইতে হইবে।

গণপরিষদ ও কংগ্রেস—

কংগ্রেসের বামপন্থী কর্ম্মীরা গণপরিষদে যাইতে অসম্মত হওয়ায় ও কংগ্রেসের শুধু দক্ষিণপন্থী কর্ম্মীরা পরিষদের সদস্য হওয়ায় এই কার্য্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র প্রশ্ন

হইতেছে। সেজন্ত পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ২১শে জুলাই সন্ধ্যায় দিল্লীতে রামলীলা ময়দানে এক জনসভায় এ বিষয়ে কংগ্রেসের কথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—কংগ্রেস ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার জন্তই গণপরিষদে যোগদান করিবেন। যদি তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা গণপরিষদ হইতে চলিয়া আসিবেন ও সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ ধ্বংস করিয়া দিবেন।

কাশীতে বাঙ্গালী ছাত্র—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৬ সালের পদার্থবিদ্যার এম্-এস্সি পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯৪৪ সালে বি-এস্সি পরীক্ষায় তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিতে অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছিলেন।



শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

মালয়ে চিকিৎসক দল—

ভারতীয় কংগ্রেস হইতে গত এপ্রিল মাসে মালয়ে যে চিকিৎসক-দল প্রেরিত হইয়াছে তাহারা ৮টি কেন্দ্রে কাজ করিতেছে। এ পর্য্যন্ত তাহারা ৪ হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে। সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, কোটাভারু, তাইপিং, তালুক আনসন, সাঙ্গেবাতানি, রাউব ও সেরেমবামে তাহাদের কেন্দ্র রহিয়াছে। ভারতবাসী, মালয়বাসী ও চীনা সকল জাতিকেই চিকিৎসা করা হয়। ভারতীয় কংগ্রেসই সকল ব্যয়ভার বহন করে এবং ভারত হইতে ঔষধ ও যন্ত্রাদি প্রেরিত হয়। সাড়ে তিন বৎসর যুদ্ধের গোলমালে অধিকাংশ লোক অন্নাভাবে থাকায় এখন ঐ অঞ্চলে যক্ষ্মারোগ খুব বেশী। চিকিৎসকগণ এখনও কয়েক মাস তথায় থাকিবেন। তাঁহাদের এই কার্য্য প্রশংসনীয়।



নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে মহিলা সভা ফটো—পান্না সেন

জার্ম্মাণীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী—

১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল জার্ম্মাণীতে ৮৯৫০ জন যুদ্ধবন্দী ছিল। তাহাদের প্রায় সকলকে এখন স্বদেশে

পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ২৫০ জন বন্দীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই—হিসাবে এই সংখ্যা পাওয়া যায়। আরও কত লোক কোথায় আছে বা মারা গিয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

পরলোকে শিল্পী শশিভূষণ পাল—

খুলনা মহেশ্বরপাশা শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিল্পী রায় সাহেব শশিভূষণ পাল গত ১৬ই আষাঢ় ৬৯ বৎসর বয়সে স্বগৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গ্রামে বাস করিয়া শিল্পপ্রীতি ও



রায় সাহেব শশিভূষণ পাল

অসাধারণ উৎসাহের জন্ম জনপ্রিয় হইয়াছিলেন ও ঐ অঞ্চলের তরুণগণকে শিল্প শিক্ষাদানেরব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯২২ সালে গভর্ণর লর্ড লীটন তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

সমগ্র ভারতে ডাক ধর্ম্মঘট—

ভারতের ডাক ও তার বিভাগের নিম্নতম কর্ম্মচারীরা কোন কালেই জীবনধারণের উপযুক্ত বেতন পাইতেন না। অথচ ডাক ও তার বিভাগে কর্ম্মীদের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত দুর্নীতি প্রবেশ করে নাই। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সেই সামান্ত বেতনে কর্ম্মীরা পরিবার প্রতিপালনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া বেতন বৃদ্ধির দাবী করে। সে দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় তাহারা ১১ই জুলাই হইতে ধর্ম্মঘটের নোটীশ দেয়। ফলে ৮ই জুলাই হইতে সমগ্র ভারতে ডাক বিভাগের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। পার্শ্বেল, প্যাকেট, মণিঅর্ডার প্রভৃতি গ্রহণ ও বিলি বন্ধ হইয়া যায়। ১১ই হইতে শুধু নিম্নতম কর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে—ক্রমে ধর্ম্মঘট সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ২১শে জুলাই হইতে ডাক বিভাগের কেরাণীরা পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটে যোগদান করে—ফলে সেভিং ব্যাঙ্কের কাজও বন্ধ হইয়া যায়। তার ও টেলিফোনের কর্ম্মীরাও ঐ সময় ধর্ম্মঘটে যোগদান করে। ফলে ভারতে এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ডাক ও তার বিভাগ ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীন—পূর্ব্বে ঐ বিভাগে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইত বটে, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন



ধর্ম্মঘটকালে জি-পি-ওর সম্মুখে প্রেসিডেন্সী পোষ্ট মাষ্টার
ফটো—পান্না সেন



ডাক ধর্ম্মঘটে জনবিরল জি-পি-ওর সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সম্মুখের দৃশ্য
ফটো—পান্না সেন

ঐ বিভাগে ব্যয় অপেক্ষা আয় যথেষ্ট অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ দরিদ্র কর্ম্মীদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করায় গত ১ মাসকাল ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল। পত্র যাতায়াত বন্ধ বলিয়া লোক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহারও কোন খবর লইতে পারে না। মণিঅর্ডার বন্ধ বলিয়া যাহারা মাসিক মণিঅর্ডারের টাকার উপর নির্ভর করিয়া সংসার প্রতিপালন করে,তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। তার অফিসে কাজ নাই—ফটকে পুলিশ পাহারা বসিয়াছিল। টেলিফোন অফিসগুলি তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। কলিকাতার যে বড় পোষ্টাফিসে সর্ব্বদা লোক-সমাগত হইত, তাহা পশুর আশ্রয়ে পরিণত হইয়াছিল। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকবাসা, নিখিল ভারত পোষ্টম্যান ও নিম্নতম কর্ম্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভি-জি ডালভি—ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদের সহিত আপোষ সম্বন্ধে কয়দিন ধরিয়া আলোচনার পর আপোষ হইয়াছে। ৭ই আগষ্ট ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

ভারতে শিক্ষাপ্রচার—

বোম্বায়ে সম্প্রতি জাতীয় উন্নয়ন কমিটীর সভায় শিক্ষা বিষয়ক সাব কমিটীর রিপোর্ট আলোচিত হইয়াছিল। ভারতের শতকরা মাত্র ১০ জন লোক লেখাপড়া জানে। বাকী ৯০ জনকে অবিলম্বে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। সেজন্য সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষকের কাজ করিতে হইবে। এই বিরাট ব্যাপারে বৎসরে দুই শত কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে—বর্ত্তমানে ভারতে শিক্ষা-বাবদে বৎসরে মাত্র ৩১ কোটি টাকা ব্যয় হয়। কি ভাবে এই কাজ সত্বর সম্পাদন করা যায়, কমিটী তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে সত্বর কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। এই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টি সর্ব্বত্র যাহাতে আলোচিত হয়, সেজন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত।

পাটের লাভে পাটচাষীর অংশ—

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্রিকা কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে বাঙ্গালার পাট সমস্যার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় পাটচাষীর বৎসরে অন্যূন ৪০ কোটি টাকা অযথা ক্ষতি হইতেছে এবং এই বিপুল অর্থ প্রধানতঃ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ইংরেজ বণিকদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। নাজিমুদ্দিন-সুরাবর্দ্দি মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে প্রথম পাট ও চটের দর আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই দর বাঁধার কার্য্য অত্যন্ত অন্যায় ভাবে সাধিত হইয়াছে। ভারতীয় মধ্য জাতি পাটের কলিকাতার দর নিম্নতম ১৫ টাকা ও উচ্চতম ১৭ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়, অথচ ১০০ গজ চটের দাম ২৮ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। ১০০ গজ চট তৈয়ারী করিতে ৩৫ সের পাট লাগে। ১৩ টাকা মূল্যের পাট একবার কলের ভিতর ঘুরিয়া আসিলেই ২৮ টাকার জিনিসে পরিণত হয়। ১০০ গজ চট তৈয়ারী করিতে ২ টাকা ও কলের ন্যায্যলাভ ১ টাকা মোট ৩ টাকা পড়ে। সুতরাং ১৬ টাকা ও ২৮ টাকার মাঝখানে যে ১২ টাকা থাকিয়া যাইতেছে তাহা কলওয়ালারা লইতেছে। পাটকলের শতকরা ৯০টি ইংরেজের। পাটচাষীর শতকরা ৯০ জন মুসলমান। লীগ মন্ত্রিমণ্ডল আইন সভার ৩০টি য়ুরোপীয় ভোটের জন্য স্বধর্ম্মীর রক্ত জল-করা ৪০ কোটি টাকা বৎসরের পর বৎসর ক্লাইভ ষ্ট্রীটকে উপঢৌকন দিতেছেন। ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ জন বঙ্গদেশে বাস করে। অতএব মুসলমান সমাজকে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করিতে হইলে পাটের দর নামাইয়া রাখা ছাড়া উপায় আর নাই, মুসলেম লীগ মন্ত্রিমণ্ডল তাহাই অবলম্বন করিতেছেন। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে পাট ২৫ টাকা মণ বিক্রয় হইয়াছিল। প্রায় এক মাস পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডল যদি আরও কিছু কালক্ষেপ করিতে পারেন তাহা হইলে এ বৎসরের সমস্ত পাট চাষীর হাত হইতে বাহির হইয়া যাইবে। তখন কিছু করার থাকিবে না।



গণ-পরিষদ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

বোম্বাই সহরে গত ৬ই জুলাই কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে ৬ই জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন বসে তাহা একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, মিশন প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী-কালীন গভর্ণমেন্ট গঠন পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদে যোগদানের যে সিদ্ধান্ত করেন, সেই বিষয়ের আলোচনার জন্যই মূলতঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই অধিবেশন। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রামগড় কংগ্রেসের পর হইতে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল ধরিয়া কংগ্রেসের যে গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছিলেন, এই অধিবেশনেই তিনি তাহা নূতন রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর হস্তে সমর্পণ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণও এইখানেই প্রথম মিলিত হইলেন এবং পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদের মধ্য হইতে ওয়ার্কিং কমিটির জন্য নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মোট ৩৭০জন সদস্যের মধ্যে প্রথম দিনের অধিবেশনে ২৫০জন উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও যোগদান করেন।

পরদিন অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত,গণপরিষদে যোগদানের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অনুমোদন করেন। ২০৪জন প্রস্তাবের পক্ষে এবং ৫১জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। বিরোধী দলের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুৎ পটবর্দ্ধন, অরুণা আসফ আলি প্রভৃতি কংগ্রেসকে গণপরিষদ বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করিতে বলেন। তাঁহাদের যুক্তি, ঐরূপ পরিকল্পনা ত্যাগ না করিলে জাতির বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি কমিয়া যাইবে। আগষ্ট প্রস্তাব "কুইট্ ইণ্ডিয়া"—"ভারত ছাড়" দাবীর সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। আপোষ আলোচনার মধ্য দিয়া না গিয়া জাতি তাহার শক্তি ও আন্দোলনের মধ্য দিয়াই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে।

ঐদিন মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতায় বলেন—আমি জানি যে প্রস্তাবিত গণপরিষদ সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। তাহাতে বহু ত্রুটি রহিয়াছে। আমরা এত বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি, গণপরিষদের ঐ সকল ত্রুটিকে ভয় করিব কেন? এই গণপরিষদকে পরীক্ষা-মূলকভাবে গ্রহণ করিয়া দেখিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, ঠিকভাবে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিলে এই গণপরিষদ প্রকৃত স্বদেশী গণপরিষদে পরিণত হইবে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের অভিভাষণে বলেন—আজ আমাদের শক্তি বুঝিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্ট গণপরিষদ গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে গণপরিষদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই গণপরিষদই ভারতের শাসনতন্ত্র স্বাধীনভাবে রচনা করিবেন। আর মণ্ডলী গঠন প্রদেশের ইচ্ছাধীন বলিয়া মানিতে হইবে। অধিবেশনের উপসংহারে পণ্ডিত নেহরু জানাইয়া দেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদে যাইতে সম্মত হইয়াছেন বটে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কংগ্রেস দেখিবেন যে প্রস্তাবিত গণপরিষদে অবস্থানকালে স্বাধীনতা লাভের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই কংগ্রেস উহা ত্যাগ করিয়া আসিয়া উহাকে ধ্বংস করিবেন এবং বাহিরে আসিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক গণপরিষদ পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের আয়োজন করিতে থাকেন। ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ের জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করেন, তাঁহারা ২৭শে জুলাই বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীদের নিকট নির্ব্বাচন সম্পর্কে নির্দ্দেশাবলী পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশ নামার সার মর্ম্ম এই যে, গণপরিষদকে যথাসম্ভব সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমূলক করিতে হইবে। গণপরিষদে যাহাতে নারী, শ্রমজীবী, হরিজন, ভারতীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পার্শী এবং বিশিষ্ট অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ স্থান পান তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি গণপরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে দলগত সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া এইরূপ ঘোষণা করেন। তাঁহারা এই দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হন। ইহার ফলে কংগ্রেসের বাহিরেরও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি গণপরিষদে আসিবার সুযোগ পান।

মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ সেই প্রদেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরা কেবল ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। গণপরিষদের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য বা পরিষদের বাহিরের লোকও প্রার্থী দাঁড়াইতে পারেন। পরিষদের মুসলমান সদস্যরা মুসলমান, শিখ সদস্যরা শিখ এবং অপর সকলে সাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। সিঙ্গেল ট্রান্সফারেব্‌ল ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচন হইবে। কাহারও নাম ব্যবস্থা পরিষদের একজন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং অন্য একজন কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলেই তিনি নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন। তবে প্রার্থী যে প্রদেশ হইতে দাঁড়াইবেন সেই প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবেন এবং অন্য কোন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হন নাই, এইরূপ এক ঘোষণা পত্র মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

গণপরিষদে নির্বাচনের জন্য ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়কে মন্ত্রিমিশন মোট তিনভাগে ভাগ করেন। সাধারণ, মুসলমান ও শিখ। মুসলমান ও শিখ ছাড়া সকলেই সাধারণের অন্তর্ভুক্ত। বৃটিশ পক্ষ এই গণপরিষদে ইউরোপীয় দলকে "সাধারণের' মধ্যে ধরিয়া তাহাদেরও প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা স্বীকার করায় এক সমস্যার সৃষ্টি হইল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্যবস্থা পরিষদসমূহে ইউরোপীয়দিগকে কয়েকটি করিয়া আসন দেওয়া হয়। এক বাঙলা দেশের ব্যবস্থা পরিষদেই তাঁহারা ২৫টি আসন পান এবং আসামে পান ৯টি। তাঁহাদের জনসংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া এক অস্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদিগকে অধিক পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালের সেন্সাস হইতে দেখা যায়, বাঙলা দেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যা শতকরা ·০৬, কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের আসন সংখ্যা ২৫০এর মধ্যে ২৫। আর আসামে তাঁহাদের সংখ্যা মাত্র শতকরা ·০৪। মিশন প্রস্তাবের—প্রতি ১০ লক্ষে একজন—অনুযায়ী যদিও তাঁহারা একটি আসনও পাইতে পারেন না, কিন্তু 'সাধারণের' মধ্যে ধরিয়া যদি তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে বাঙালার ব্যবস্থা পরিষদের ২৫ জনের মধ্য হইতে অন্তত ৫।৬ জন নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে হিন্দু সমাজের যেমন ক্ষতি হইবে, কংগ্রেসেরও তেমনি আসন সংখ্যা কমিয়া যাইবে। কারণ গণপরিষদে ইউরোপীয়গণ যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবেন তাহা সুনিশ্চিত। ইউরোপীয়গণ এতদিন ধরিয়া নিজেদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং সরকার পক্ষ সমর্থন করিয়া, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়াই আসিতেছেন।

গণপরিষদে ইউরোপীয়দের ভোটাধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, মিশন প্রস্তাবে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে ভারতীয়গণই তাঁহাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। আইনতঃ সেইদিক দিয়া নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। আর প্রতি দশ লক্ষে একজন করিয়া সদস্য ধরিলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহারা নির্ব্বাচনে যাইতে অক্ষম। কয়েকজন আইন-বিশেষজ্ঞ মহাত্মা গান্ধীকে এ বিষয়ে জানান যে, আদালতে এ প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ইউরোপীয়দের দাবী মোটেই টিকিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী ইউরোপীয়দিগকে গণ-পরিষদের নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ না করিবার জন্য আবেদন জানান। ইহার পর বাঙলা আসামের ইউরোপীয় দল নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। অন্যান্য প্রদেশের কয়েকজন ইউরোপীয় সদস্য নির্ব্বাচনে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে নির্ব্বাচন কোনরূপ প্রভাবান্বিত হয় নাই।

কংগ্রেস ও লীগ গণপরিষদে যোগদান স্বীকার করায়, সকল প্রদেশেই যথাসময়ে নির্ব্বাচনের সাড়া পড়িয়া গেল। জুলাইএর প্রথম দিকেই প্রদেশে প্রদেশে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিবার শেষ তারিখ ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইল এবং সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হইল। কংগ্রেস, লীগ ও স্বতন্ত্র [illegible] নিজ মনোনীত প্রার্থী পাঠাইবার তোড়জোড় করিতে লাগিলেন। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় কিন্তু এদিকে ঘেঁসিলেন না। তাঁহারা [illegible] পরিকল্পিত 'খ' মণ্ডলীতে মুসলীম লীগের কবলে না যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। শিখেরা প্রথম হইতেই মিশন প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে থাকেন। তাঁহারা সভা সম্মেলন করিয়া, শপথ করিয়া, মিশন প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ সময় ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, তবুও তাঁহারা অটল। শেষে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর অনুরোধে তাঁহারা মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। ৪ জন কংগ্রেস মনোনীত এবং ৪ জন পন্থিক বোর্ড মনোনীত প্রার্থী মোট ৪টি শিখ আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করেন। কিন্তু মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ মুহূর্তেই তাঁহারা ৮ জনই আবার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন। শিখ সম্প্রদায় এই ভাবে গণপরিষদ বর্জ্জন করিবার স্থির করিলেন।

সকল প্রদেশেই বিভিন্ন দল যথাসময়ে নিজ নিজ প্রার্থী প্রেরণ করিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও দাঁড়াইলেন। বাঙলার জন্য মোট ৬০ টি আসন নির্দ্দিষ্ট, তন্মধ্যে ৩৩টি মুসলমান ও ২৭টি সাধারণ। কংগ্রেস ২৭টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২৬টির জন্য প্রার্থী মনোনীত করেন। তন্মধ্যে ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় হইতে ১ জন, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে ১ জন, তপশীলী দল হইতে ৩ জন, হিন্দু মহাসভা হইতে ১ জন, গুর্খা সম্প্রদায়ের ১ জন, জমিদার পক্ষের ১ জন, মাড়োয়ারী ১ জন এবং কংগ্রেসী বর্ণহিন্দু ১৪ জন। বাঙলার কংগ্রেসদল তাঁহাদের মনোনয়নে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই যে গ্রহণ করেন এমন নহে, মনোনয়ন ব্যাপারে কয়েকজন যোগ্যতম ব্যক্তি বাদ পড়িয়া যান। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের মনোনয়নের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা যথাসম্ভব সকল দল ও সম্প্রদায় হইতেই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। এমন কি যে গুর্খা সম্প্রদায় গণপরিষদে স্থানলাভের কল্পনাও করেন নাই, কংগ্রেস তাহাদের মধ্য হইতেও একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সাধারণ আসনের জন্য কংগ্রেস ব্যতীত, স্বতন্ত্র হিসাবে কয়েকজন হিন্দুমহাসভা, কমিউনিষ্ট ও তপশীল প্রার্থীও দাঁড়াইলেন। বাঙলার বাহির হইতে আসিয়া আম্বেদকর স্বতন্ত্র তপশীলপ্রার্থী হিসাবে রহিলেন।

মুসলীম লীগ ৩৩টি মুসলমান আসনের জন্য ৩৩ জনকে মনোনয়ন করেন। এই ৩৩ জনের মধ্যে অবাঙালী মুসলমান লীগনেতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ, মিঃ, এম,এ, এইচ, ইস্পাহানীও রহিলেন। মুসলীমলীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনীত এই সকল প্রার্থী ছাড়া আরও বহু লীগ সদস্য স্বতন্ত্র হিসাবে দাঁড়াইলেন। লীগ সদস্য ছাড়াও কয়েকজন স্বতন্ত্র মুসলমান প্রার্থী রহিলেন।

১৭ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাঙলার [illegible] সমাধা হয়। ভোটে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাঙলা হইতে গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

সাধারণ—শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিরণশঙ্কর রায়,

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী, শ্রীযুক্তা লীলা রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মজুমদার, শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী, শ্রীস্বরূপচন্দ্র গুহ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (কংগ্রেস মনোনীত বর্ণহিন্দু) শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন ঠাকুর, শ্রীরাধানাথ দাস, শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীধনঞ্জয় রায়, শ্রীআশুতোষ মল্লিক, (কংগ্রেস মনোনীত তপশীলী হিন্দু) ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস মনোনীত হিন্দুমহাসভা প্রার্থী) মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহাতাব (কংগ্রেস মনোনীত জমিদার), শ্রীদেবীপ্রসাদ খৈতান (কংগ্রেস মনোনীত মাড়োয়ারী), মিঃ ফ্রাঙ্ক এন্টনী (কংগ্রেস মনোনীত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান), ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস মনোনীত ভারতীয় খৃষ্টান), শ্রীডম্বর সিং গুরুং (কংগ্রেস মনোনীত গুর্খা), ডাঃ আম্বেদকর (স্বতন্ত্র তপশীলী), সোমনাথ লাহিড়ী (কমিউনিষ্ট)।

মুসলমান—নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ, স্যার আজিজুল হক, মিঃ এইচ্. এস, সুরাবর্দ্দী, খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন, মিঃ এম, এ, এইচ্, ইস্পাহানী, মিঃ কে, সাহাবুদ্দীন, মিঃ আবুল হাসেম, মিঃ রাগীব আহসান, খানবাহাদুর এ, এম, আবদুল হামিদ, মিঃ ফজলুল রহমান, মিঃ মজিবর রহমান খাঁ, মিঃ আবুল কাসেম খাঁ, খানবাহাদুর ইব্রাহিম খাঁ, মৌলভী সিরাজুল ইসলাম, মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ, ডাঃ মহম্মদ হাসান, মিঃ মজহরুল হক্, খানবাহাদুর আবদুল্লা আলমামুন, করমুল্ল হক, সাহজাদা ইউসুফ মিরজা, মহম্মদ আবদুল্লাহ আলবাকী, মিঃ এম, এস, আলি, খানবাহাদুর এম, আলতাফ আহম্মদ, খানবাহাদুর ফজলুল করিম, খানবাহাদুর গিয়াসুদ্দীন পাঠান, মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক ইসতিয়াক হুসেন কুরেশী, মিঃ মহম্মদ হাসান, মিঃ মহম্মদ হুসেন মালিক, মিঃ কে নুরুদ্দীন, মৌলানা সাব্বির আহম্মদ উস্মান, বেগম ইক্রামুল্লাহ, (লীগপ্রার্থী) মিঃ এ, কে, ফজলুল হক (স্বতন্ত্র)।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও আগে পরে করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই নির্ব্বাচনের পালা শেষ হইল। নির্ব্বাচন শেষে দেখা গেল, কংগ্রেস অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধুর সকল "সাধারণ" সদস্য পদগুলিই কংগ্রেস অধিকার করেন। গণপরিষদে মোট ২১৩টি সাধারণ আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি কংগ্রেসের অধিকারের বাহিরে যায়। সেগুলি বাঙলায় ২টি, উড়িষ্যায় ১টি, বিহারে ৩টি এবং যুক্তপ্রদেশে ৩টি; অবশ্য এই ৯টি আসনের মধ্যে ৬টির জন্য কংগ্রেস কোন প্রার্থী মনোনীত করেন নাই। কংগ্রেস বাঙলায় ১টি, উড়িষ্যায় ১টি এবং বিহারে ৩টি আসন ছাড়িয়া দেন। বাঙলায় ১টি আসনে কংগ্রেসের পরাজয় হয়। কংগ্রেসপ্রার্থী নিশীথনাথ কুণ্ডুকে পরাজিত করিয়া স্বতন্ত্র তপশীলী প্রার্থী ডাঃ আম্বেদকর নির্ব্বাচিত হন। আর যুক্তপ্রদেশের ৩টি আসনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে। এই ৯টি আসনে রহিলেন, বাঙলা হইতে নির্ব্বাচিত কমিউনিষ্ট প্রার্থী সোমনাথ লাহিড়ী, তপশীলী নেতা ডাঃ আম্বেদকর, যুক্তপ্রদেশের স্যার পদমপৎ সিংহানিয়া, দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ, স্যার জ্বলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব প্রভৃতি।

অপর পক্ষে ৭৮টি মুসলমান আসনের মধ্যে ৫টি আসন মুসলিম লীগের হস্তচ্যুত হয়। এই পাঁচটিতে নির্ব্বাচিত হন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে কংগ্রেস প্রার্থী মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, খাঁন আবদুল গফুর খান, যুক্তপ্রদেশ হইতে কংগ্রেস প্রার্থী রফি আহমদ কিদোয়াই, বাঙলা হইতে কৃষকপ্রজা দলের নেতা মৌলবী এ, কে ফজলুল হক এবং পাঞ্জাব হইতে একজন ইউনিয়নিষ্ট সদস্য।

গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ৩৮৫ তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতের ২৯২ জন এবং দেশীয় রাজ্যের ৯৩। ইহা ছাড়া দিল্লী, আজমীর-মারোয়াড়, কুর্গ ও বেলুচিস্থানের ৪ জন গণপরিষদে যোগ দিবার অনুমতি পান দিল্লী ও আজমীর মারোয়াড়ের সদস্যদ্বয় কংগ্রেস দলের আর কুর্গের প্রতিনিধিও কংগ্রেস সমর্থক, ইহারা "ক" মণ্ডলের এবং বেলুচিস্থানের প্রতিনিধি "খ" মণ্ডলের সদস্যদের দলভুক্ত।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ও লীগ দুইটি প্রধান দলের মধ্যে কংগ্রেস পক্ষের মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত কংগ্রেসের সকল নেতা ও উপনেতা গণপরিষদে প্রবেশ করিলেন। বোম্বাই হইতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মাদ্রাজ হইতে রাজাগোপালাচারী, যুক্তপ্রদেশ হইতে পণ্ডিত নেহরু, মধ্যপ্রদেশ হইতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল, বিহার হইতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাঙলা হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, আসাম হইতে শ্রীগোপীনাথ বরদলুই, উড়িষ্যা হইতে হরেকৃষ্ণ মহাতাব, পাঞ্জাব হইতে দেওয়ান চমনলাল, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ হইতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফুর খান প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা গণপরিষদে আসিলেন। মহাত্মা গান্ধী গণপরিষদে যোগদান না করিলেও বরাবরের মত কংগ্রেসের উপদেষ্টা হিসাবে বাহিরে রহিলেন। খ্যাতনামা আইনজ্ঞ স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু অসুস্থতার জন্য গণপরিষদে যাইতে পারিলেন না। আর মিঃ এম-আর-জয়াকরের মনোনয়ন পত্র যথাসময়ে ইংলণ্ড হইতে আসিয়া না পৌঁছানর প্রথম তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। (পরে জনৈক সদস্য পদত্যাগ করায় তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।)

এদিকে লীগপক্ষেরও সকল লীগ নেতাই গণপরিষদে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। তবে কংগ্রেস গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে অন্যদল নিরপেক্ষ বিপুল ভোটাধিক্য লাভ করেন।

বেশ নির্বিঘ্নেই গণপরিষদের সাধারণ ও মুসলমান আসনের জন্য সদস্য নির্ব্বাচনকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। শিখসম্প্রদায় গণপরিষদ বর্জ্জন করিলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকে গণপরিষদে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, দেশীয় রাজ্যেও নির্ব্বাচনের তোড়জোড় চলিতেছে, ঠিক এমনি সময় মুসলীমলীগ হঠাৎ বাঁকিয়া বসিলেন। ২৯শে জুলাই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল বোম্বাইএ তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের শেষ দিনে ঘোষণা করেন যে—মুসলীমলীগ বৃটিশ মন্ত্রিমিশন ও বড়লাটের প্রস্তাবিত দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও অস্থায়ী সরকার গঠন—এই উভয় প্রকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে বলা হয়—বৃটিশ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে গণপরিষদে যোগদান মুসলমানদের

আত্মঘাতী বলিয়া মনে করেন, তাই তাঁহারা মিশনপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। তাঁহারা আর একপ্রস্তাবে বৃটিশের তীব্র নিন্দা করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত খেতাব বর্জ্জনের জন্ত মুসলমানদিগকে নির্দ্দেশ দেন্। এই নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই সভায় কয়েকজন নবাবজাদা, খান বাহাদুর, স্যার প্রভৃতি খেতাব ত্যাগ করেন।

লীগ ও শিখসম্প্রদায় উভয়ে স্বতন্ত্র কারণে গণপরিষদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের কারণ ভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী। ইঁহারা গণপরিষদ বর্জ্জন করায় যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফলে গণপরিষদ [illegible] আরও জটিল হইয়া উঠিল। অতঃপর কংগ্রেস ও বৃটিশপক্ষের উপর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ভর করিতেছে। ৩১।৭।৪৬

কাশীধামে শঙ্করাচার্য্যের মঠ

অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ প্লাবিত ভারতভূমিতে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ভারতের সীমান্ত প্রদেশগুলিতে প্রিয়দর্শী অশোক যেরূপভাবে 'ধর্ম্ম' প্রচারের জন্ত শিলালেখ খোদিত করাইয়াছিলেন সেইভাবে ভারতের চারি কোণে চারিটি মুখ্য মঠ স্থাপনা করেন ইহা চিরপ্রসিদ্ধ আছে। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, সুদূর দক্ষিণে রামেশ্বরক্ষেত্রে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিম সমুদ্রে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদা মঠ এবং হিমালয়ের মধ্য শিখরে কেদারবদরীক্ষেত্রে যোশী মঠ এখনও হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া উহার গৌরব বিঘোষিত করিতেছে। উক্ত চারি মঠে যথাক্রমে আচার্য্য হস্তামলক, আচার্য্য সুরেশ্বর, আচার্য্য পদ্মপাদ ও আচার্য্য ত্রোটক আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন, ইহাও প্রখ্যাত আছে।

কিন্তু অনেকে ইহা অবগত নহেন যে পুণ্যতীর্থ ৺কাশীধামেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এক মঠ স্থাপন করিয়া উহাতে তাঁহার পাদুকা রক্ষাপূর্ব্বক বৌদ্ধ দলনের জন্ত উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করেন। সম্প্রতি আমি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে কাশীতে গণেশমহল্লা পল্লীতে শাখা সারদা মঠ নামে অভাবধি সেই মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পাদুকাও সেখানে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। অন্তাপি শঙ্কর-পাদুকা তৎশিষ্যগণ কর্ত্তৃক নিত্য অর্চ্চনা ও আষাঢ়ীয় গুরুপূর্ণিমা দিবসে ষোড়শোপচারে পূজা পাইয়া থাকে। কাশীধামে গোদাবরী নদীর দক্ষিণে ও গঙ্গার পশ্চিমকূলে ঐ শাখা সারদা মঠ অবস্থিত ইহাই মঠের পুরাতন কাগজপত্রে পাওয়া যায়। কাশীর মধ্য দিয়া যে এক ক্ষীণকায়া গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইত, ইহা 'ডেড়সী'র পুল যাঁহারা দেখিয়াছেন [illegible] সকল লোকের নিকট শুনা যায়।

এই মঠের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে ইহা বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র শঙ্করাচার্য্যের মঠ। কথিত আছে যে ইহা পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র মহাপুরুষদ্বারা পরিচালিত হইতেছিল এবং কালক্রমে উহা যখন অস্তমিত হইবার উপক্রম হয়, [illegible] বঙ্গদেশীয় সর্ব্ববিস্তায় বংশ সম্ভূত একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আসিয়া এই মঠের চেলা হইয়া ষষ্ঠ মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামী নামে খ্যাতিলাভ করেন। এই [illegible] হইতে বাঙ্গালীর এই প্রাচীন কীর্ত্তি অভাবধি কাশীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং দশনামী সন্ন্যাসী বাঙ্গালী মঠাধীশ মঠের পরিচালনা করেন।

বর্ত্তমানে এই মঠ রাজগুরুমঠনামে প্রসিদ্ধ এবং ইহারও মূলে একটি ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। কিংবদন্তী আছে যে, মহাদেবানন্দ তীর্থের পরে স্বয়ংপ্রকাশানন্দ তীর্থস্বামী গদীপ্রাপ্ত হইয়া মহা উগ্র তপস্তা দ্বারা দেবী অন্নকালীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি কাশী নরেশ মহারাজ চৈত সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের দ্বারা অকারণ আক্রান্ত হইয়া যখন তিনি পলায়ন করেন তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজের আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করেন। সেই সময় উক্ত স্বয়ংপ্রকাশানন্দ তীর্থস্বামী একদিন দেখিতে পান যে, একজন লোককে গোরাসৈন্তগণ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি উহাতে তাহার বন্ধনদশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ ব্যক্তি উত্তর দেয়—সে চৈৎসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র মহিমনারায়ণ সিংহ এই অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি সাধুর চরণে পতিত হয়। সাধু তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, বৎস তোমার কোন ভয় নাই। যদি দেবী অন্নকালী সত্য হন এবং গুরুপদে আমার মতি থাকে তাহা হইলে অবশ্য তোমার প্রাণরক্ষা হইবে এবং এতদ্ব্যতীত তুমিই রাজা হইবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল এবং সেই অবধি রাজা মহিমনারায়ণ সিংহ সস্ত্রীক এই মঠে দীক্ষা লইয়া ইহার শিষ্যরূপে পরিগণিত হইলেন। সেই হইতে এই মঠের নাম রাজগুরু মঠ এবং শিষ্যপরম্পরায় এই মঠ কাশী নরেশ বাহাদুর দিগের সেবা পাইয়া আসিয়াছে এবং রাজপ্রসাদে মঠের সম্পত্তি ও মর্য্যাদার বহু প্রসার হইয়াছিল। ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই পক্ষে গৌরবের বস্তু।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়—এই মঠ এখন নানা কারণে হৃতগৌরব হইয়া দৈন্তদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির কর্ণধার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কাশীধামে চৈতন্তমঠের পুনরুদ্ধারে প্রশংসনীয় ভাবে যত্নবান্ হইয়াছেন। কাশীধামে বাঙ্গালী পরিচালিত এই মঠটির চিরলুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশু উদ্যমও বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

খেলাধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ

ইংলণ্ড ঃ ২৯৪ ও ১৫৩ (উইকেটে ডিক্লেঃ)

ভারতীয় দল ঃ ১৭০ ও ১৫২ (৯ উইকেট)

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র হয়েছে। ২০শে জুলাই ওল্ড ষ্টাফোর্ডে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। খেলার আগের দিনে এবং রাত্রে প্রবল বারিপাত হয়। খেলার দিনও সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে থাকে। উইকেট ঢাকা থাকলেও মাঠের অবস্থা খেলার উপযুক্ত ছিল না। ফলে লাঞ্চের আগে খেলা আরম্ভ হ'ল না। বেলা ১-৫০ মিনিট সময়ে পতৌদি টসে জয়লাভ করেও ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে দিলেন; প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ গ্রহণ না করায় সকলেই আশ্চর্য্য হ'ল। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন খেলার শেষ দিকে পিচ শক্ত হ'লে ভারতীয় দল 'best wicket'এ খেলার সুবিধা পাবে। ভিজে মাঠে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা মোটেই সুবিধা করতে পারলো না। খারাপ আবহাওয়ার দরুণও ২৫,০০০ হাজার লোক মাঠে খেলা দেখতে এসেছিলো। ৮১ রানে ইংলণ্ডের প্রথম উইকেট পড়লো, ওয়াসব্রুক ৫২ রান করে আউট হলেন। চায়ের সময় এক উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ডের ১২৪ রান উঠে। ডেনিস কম্পটন অমরনাথের বলে এল-বি-ডবলউ হ'লেন ৫১ রান ক'রে। দলের রান তখন ১৫৬। দলের ১৮৬ রানে হাটন তিন ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ৬৭ রান ক'রে মানকাদের বলে মুস্তাকের হাতে ধরা পড়লেন। মাত্র সাত রান যোগ হওয়ার পর ইংলণ্ডের ১৯৩ রানে হার্ডষ্টাফ ৪ রান ক'রে অমরনাথের বলে খুব সহজ ক্যাচ তুল্লেন, মার্চ্চেন্টও খুব সহজে তাঁকে ধরে নিলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৪ উইকেটে ২৩৬ রান উঠল। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৯৪ রানে শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করলেন হ্যামণ্ড ৬৯। অমরনাথ ৯৬ রানে ৫ এবং মানকাদ ১০১ রানে ৫টা উইকেট পেলেন।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস সুবিধার হ'ল দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৮ রান করলেন মার্চ্চেন্ট। তারপর মুস্তাকের ৪৬ রান উল্লেখযোগ্য। পতৌদি ১১ রান করলেন; এর পর দু অঙ্কের আর কারও রান উঠলো না। বোলিং মারাত্মক হ'ল বেডসার এবং পোলার্ডের। ২৯ ওভার বলে ৯টা মেডেন নিয়ে এবং ৪১ রান দিয়ে বেডসার পেলেন ৪টা উইকেট; পোলার্ড পেলেন ৫টা, ২৭ ওভার বলে ১৬টা মেডেন নিয়ে এবং ২৪ রান দিয়ে। ভারতীয় দলের শেষ ৯টা উইকেট পড়েছে মাত্র ৪৬ রানে। খেলার শেষের দিকে আধ ঘণ্টা খেলায় ভারতীয় দলের ৩টে উইকেট পড়ে গিয়ে ১০ রান উঠে। ইংলণ্ড ১২৪ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে হ্যাটন এবং ওয়াসব্রুক। চিরপরিচিত 'ইংলিস পলিসি' মত ইংলণ্ড উইকেট হারিয়েও দ্রুত রান তুলে তাড়াতাড়ি ইনিংস ডিক্লেয়ার করার উদ্দেশ্যে খেলতে লাগলো। অমরনাথ আহত হওয়ার ফলে ভারতীয় দল দুর্ব্বল বোধ করতে লাগলো, যদিও তিনি তাঁর সুনাম অনুযায়ী বোল করতে লাগলেন। অমরনাথ ইংলণ্ডের মোট সাত রানে হ্যাটনের উইকেট পেলেন। এরপর ওয়াসব্রুক তাঁর নিজস্ব ২৬ রানে এবং দলের মোট ৪৮ রানে মানকাদের বলে এল বি ডবলউ হলেন। এর পরই ভারতীয় দলের বোলারদের হাত খুলে গেল। দলের ৬৮ রানে হ্যামণ্ড

৮ রান ক'রে ধরা পড়লেন। দলের ঐ রানেই হার্ডষ্টাফ এলেন এবং কোন রান না করেই অমরনাথের বলে বোল্ড হয়ে বিদায় নিলেন। এদিকে ডেনিস কম্পটন দলের এ ভাঙ্গনের মুখে দলকে রক্ষার জন্ম খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলছেন। গিব তাঁর জুটি হয়ে শূন্য রান করে অমরনাথের বলে মোদীর হাতে আটকে গেলেন; দলের রান তখন ৮৪, এদিকে ৫টী উইকেট পড়ে গেছে। লাঞ্চের সময় দেখা গেল ইংলণ্ড ২০৮ রানে অগ্রগামী আছে হাতে তখনও অর্দ্ধেক উইকেট জমা। অমরনাথ আহত অবস্থায় ৩৬ রানে ৩টে উইকেট পেয়েছেন; মানকাদ পেলেন ২টো ২৩ রানে। বিশ্রাম সময়ে দর্শক সংখ্যা ২০,০০০ হাজারে দাঁড়ায়। খেলার অবস্থা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তেজনামূলক তা সকলেই অনুভব করতে লাগলো। অমরনাথ লাঞ্চের সময় ডান হাতের কনুইয়ের আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়ে সেই অবস্থায় বল করতে নামলেন। কম্পটন তাঁর ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটী ইকিনকে নিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে ফেল্লেন। ভারতীয় দল খুবই দুঃশ্চিন্তার মধ্যে পড়লো; ফিল্ডিং খুবই খারাপ হতে লাগলো। যেখানে মাত্র এক রান হবার কথা সেখানে একটা সামান্য ভুলের জন্যে ইংলণ্ড তিন রান করবার সুবিধা পেতে লাগলো। ইংলণ্ডের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটীই ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের শ্রেষ্ঠ জুটী প্রমাণিত হ'ল। ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ১৫৩ রান ক'রে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলো। হাতে সময় তিন ঘণ্টা, খেলায় জিততে হলে ভারতীয় দলের ২৭৮ রানের প্রয়োজন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল। কোন রান হবার আগেই মার্চ্চেণ্ট ধরা পড়লেন; দলের ১ রানে মুস্তাক ১ রান ক'রে এবং দলের ৫ রানে ক্যাপটেন পতৌদি ৪ রান করে আউট হলেন। দলের মোট ৫ রানে ভারতীয় দলের নামকরা তিনটে উইকেট পড়ে গেল। সারা মাঠে কি উদ্দীপনা! ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ জয়লাভের পথ অনেকখানি নিশ্চিত এবং সুগম হয়ে গেল।

দলের এই পতনের মুখে চতুর্থ উইকেটের জুটী হাজারী এবং মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ভারতীয় দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তাঁদের জুটীতে ৭৪ রান উঠে। দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে দলকে রক্ষা করে 'test honours' সম্মান ভাগ ক'রে নেওয়ার সমস্ত কৃতিত্ব মোদী এবং হাজারীর প্রাপ্য। হাজারী ৪৪ এবং মোদী ৩০ রান করেন। এই প্রসঙ্গে হাফিজের ৩৫ এবং সোহনীর ১১ রান ও উল্লেখযোগ্য। বেডসার দু'দলের মধ্যে সব থেকে বেশী ৭টী উইকেট পেলেন ২৫ ওভার বলে ৪টে মেডেন নিয়ে এবং ৫২ রান দিয়ে। পোলার্ড পেলেন ২টো ৬৩ রানে ২৫ ওভার বলে ১০টা মেডেন দিয়ে।

ইংলণ্ড: হাটন, ওয়াসব্রুক, কম্পটন, হামণ্ড (ক্যাপটেন), হার্ডষ্টাফ, গিব, ইকিন বেডসার, পোলার্ড ভোস ও রাইট।

ভারতীয় দল: মার্চ্চেণ্ট, মুস্তাক আলী, হাফিজ, মানকাদ, হাজারী, মোদী পতৌদি (ক্যাপটেন), অমরনাথ, সোহনী, সারভাতে ও হিন্দেলকার।

ভারতীয় দল: ৫৩৩ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

সাসেক্স: ২৫৩ ও ৪২৭।

ভারতীয় দল ৯ উইকেটে সাসেক্স দলকে হারিয়েছে। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে ভি এম মার্চ্চেণ্ট ২০৫, ভি মানকাদ ১০৫, পতৌদি ১১০ (নট আউট) এবং লালা অমরনাথ ১০৬ রান করেন।

সাসেক্সদলের দ্বিতীয় ইনিংসে কক্স ২৩৪ রান নট আউট থেকে ব্যাটিংয়ে সাফল্যলাভ করেন; এ ছাড়া জেমসের ৭৯ রান উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় দল: ৬৪ ও ৪৩১

সোমার সেট: ৫০৬ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

সোমার সেট তিনদিনের খেলায় ভারতীয়দলকে এক ইনিংসে এবং ১১ রানে শোচনীয় ভাবে হারিয়েছে।

ভারতীয় দল প্রথম ব্যাট ক'রে মাত্র ৬৪ রানে ইনিংস শেষ করে। পতৌদি দলের সর্ব্বোচ্চ ২৯ রান করেন।

এণ্ড্রু ৩৬ রানে এবং বাউস ২৭ রানে ৫টা উইকেট পান। সোমার সেট প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫০৬ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেন। গিমব্লেট ১০২, ল্যাংগ্রীজ ৭৪ এবং লী ৭৬ রান করেন। ওয়ালফোর্ড ১৪১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩১ রান করে। মার্চ্চেণ্ট ৮৯, পতৌদি ৭৬, অমরনাথ ৪৮, হাফিজ ৪১, সোহনী ৪২ রান, হিন্দেলকার ৩০ এবং সারভাতে নট

আউট ৬৬ রাণ করেন। হিন্দেলকার সারভাতের সঙ্গে জুটী হয়ে ৫২ রান করেন। ৩১-১ ও ২ আগষ্ট

ল্যাঙ্কাশায়ার : ৪০৬ ও ১৭২

ভারতীয় দল : ৪৫৬ (৮ উইঃ)

খেলা ড্র যায়।

ভারতীয় দলের পক্ষে উল্লেখযোগ্য রাণ মার্চেন্ট নট আউট ২৪২, মুস্তাক ৪০, হাফিজ ৪৩, সোহনী ৪৪, মানকাদ ৪০ ; ইকিন ১২০ রানে ৩ গার্লিক ৬৫ রানে ২ এবং প্রাইস ৬৭ রানে ২টী উইকেট লাভ করেন।

ল্যাঙ্কাশায়ার দলের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান ওয়াসব্রুক ১০৮, ইকিন ১৩৯, হোয়ার্ট ৭৩। সোহনী ৮২ রান দিয়ে ৫ এবং মানকাদ ১৩৪ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন।

ভারতীয় দল : ৩৪০ (৯ উইকেটে ডিক্লে) (পতৌদি ১১৩, মোদী ৯৯, গুলমহম্মদ নট আউট ৬২ রোডেন ১৩৫ রানে ৫ এবং কম্পনস ৬০ রানে ২ উইঃ)

ডার্বিশায়ার : ৩৬৬ (মার্শ ৮৬, ইলিয়ট ৬১ ; সিন্ধে ১০৯ রানে ৪ উইঃ এবং মানকাদ ৬৯ রানে ৬ উইঃ) ও ২০৯ (ইলিয়ট ৪৪, রেভিল ৪০ ; মানকাদ ৪০ রানে ৩ উইঃ, অমরনাথ ৩৩ রানে ৩ উইঃ)

ভারতীয় দল ১১৮ রাণে বিজয়ী হয়েছে।

ইয়র্কশায়ার : ৩০০ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ও ৬৪ (কেহ আউট হয়নি)

ভারতীয় দল : ৪১০ (৫ উইকেটে ডিক্লেঃ)

বৃষ্টির জন্য শেষের দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ না হলে ভারতীয় দলের এ খেলায় জয়লাভের যথেষ্ট আশা ছিল। ইয়র্কশায়ার দলের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান গিব ৭১, ওয়াটসন ৫৫, হালিডে ৫১ ; মানকাদ ৫৬ রানে ৩ এবং হাজারী ৭২ রানে ২ উইকেট পান।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে হাজারী ২৪৪ রান ক'রে নট আউট ৫১ রান উল্লেখযোগ্য। মানকাদ বিলাতের খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী করেন। হাজারীর নট আউট ২৪৪ রান, মার্চেন্টের ২৪২ রানের রেকর্ড ভেঙেছে এবং 'English season'-এ সর্বোচ্চ রান সংখ্যা বলে স্বীকার করা হয়েছে। হাজারী ২৩টী বাউণ্ডারী করেন।

ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২৪টা খেলায় ৪৩ পয়েন্ট ক'রে পর্য্যায়ক্রমে দু'বার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। তারা মাত্র মহমেডান দলের কাছে হেরেছে, ড্র করেছে ৩টি খেলা। মোহনবাগান এক পয়েণ্ট পিছনে থেকে লীগে রাণার্স-আপ্ হয়েছে। মোহনবাগান এবার লীগে একটা খেলাতেও হারেনি, ভারতীয় দলের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবই প্রথম লীগের খেলায় অপরাজেয় রেকর্ড করলো।

দ্বিতীয় বিভাগে লীগ পেয়েছে জর্জ্জটেলিগ্রাফ, রাণার্স আপ পেয়েছে রাজস্থান ক্লাব।

তৃতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে রোণাগুসে হাট ; পোর্টকমিশনার রাণার্স আপ হয়েছে। চতুর্থ বিভাগে লীগ পেয়েছে বেঙ্গল এ সি।

পাওয়ার লীগ ঃ

পাওয়ার মেমোরিয়াল ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের খেলায় ভবানীপুর ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। পাওয়ার লীগ খেলায় ভবানীপুর ক্লাবের এই প্রথম সাফল্য। মোহনবাগান ক্লাব 'এ' গ্রুপ থেকে ১৩টা খেলায় ২৬ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম হয়। অপর দিকে ভবানীপুর ক্লাব ১৩টা খেলায় ২৪ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান পায়। এই লীগের খেলায় উভয় দলই অপরাজেয় ছিল। ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব এ বছরের প্রথম পরাজয় স্বীকার করে। ভবানীপুর ক্লাবের এ কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়।

ইণ্টার অফিস লীগ ঃ

ইণ্টার অফিস ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে বাটা স্পোর্টস ক্লাব এবারও লীগ বিজয়ী হয়েছে। রাণার্স আপ্ হয়েছে বেঙ্গল কেমিক্যাল।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

আই এফ এ এ শীল্ডের খেলা ২৫শে জুলাই থেকে আরম্ভ হয়েছে।

আই এফ এ শীল্ড খেলায় পূর্ব্বের মত আর সে প্রতিযোগিতা এবং উত্তেজনা নেই। এর একমাত্র কারণ

পূর্ব্বের মত দুর্দ্ধর্ষ গোরাদল এই প্রতিযোগিতায় আর যোগদান করছে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব ফুটবল দল খেলতে আসে, তারাও খুব শক্তিশালী নয়—এখানের স্থানীয় দলের কাছে অনায়াসে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধি দলের খেলা এবং খেলার ফলাফল দর্শকদের কাছে মোটেই আনন্দদায়ক নয় এবং পীড়াদায়ক। মফঃস্বলের ফুটবল খেলোয়াড়দের উৎসাহদানের জন্য ইণ্টার জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা নামে পৃথক একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হ'লে খেলায় সত্যিকারের উৎসাহদান করা হবে এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হবে। অবিশ্য মফঃস্বলের শক্তিশালী দলকে আই-এফ-এ প্রতিযোগিতা থেকে একেবারে বাদ দিতে বলছি না তাদের যোগদান করতে আমরা সর্ব্বদাই আহ্বান করছি। কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে এবার স্থানীয় দল যে শীল্ড পাবে তা খেলার ফলাফল থেকে ধারণা করা যায়।

খেলার মাঠের গণ্ডগোল ঃ

ভবানীপুর-মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের লীগের খেলার শেষে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ক'লকাতার ফুটবল মাঠে ঘটেছিল তার শেষ সংবাদের (latest news) উপর ভিত্তি ক'রে গতবার আলোচনা আরম্ভ করা হয়েছিল। তার পর অনেক ঘটনা এবং রটনা হয়ে গেছে। মোহনবাগান ক্লাবের অফিস থেকে আই-এফ-এ অফিসে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের তাঁবুর সীমানা থেকে ইঁট-পাটকেল এবং সোডার বোতল এসে মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবু নষ্ট করেছে, সভ্য এবং দলের সমর্থকদের আহত করেছে। এ ব্যাপারে নাকি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কোন বিশিষ্ট সভ্য জড়িত এবং তাঁরই উৎসাহে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল দর্শক এ কাজ করেছে বলে মোহনবাগান ক্লাবের সম্পাদক অভিযোগ করেছিলেন। এর পর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক মিঃ জে সি গুহ এই শেষের ঘটনা ভিত্তিহীন বলে বিবৃতি দিয়েছেন এবং প্রকৃত দোষীর নাম প্রকাশ করতে "চ্যালেঞ্জ" করেছেন। ১২ই জুলাই ইডেন গার্ডেনে কালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের তাঁবুতে [illegible] এক সভা হয়। সেই সভায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক মিঃ জে সি গুহ যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা ১৩ই জুলাই তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় সে সংবাদ থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল—

"...The usual hour of play had nothing to do with it, he thought,...Mr. Guha also felt, that better result might be arrived at, if the two clubs had formed a joint Enquiry"

মিঃ গুহ শেষের দিকে ভাল প্রস্তাবই দিয়েছেন; কিন্তু 'the usual hour of play had nothing to do with it, he thonght.···That the I. F. A. had no jurisdiction in this matter—এই উক্তির সমর্থন করা যায় না। খেলা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে খেলার মাঠে সমর্থকদের মধ্যে কদাচিৎ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু খেলার সময় রেফারীর ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য অথবা খেলোয়াড়দের ফাউল খেলার ফলেই স্বভাবতই দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। সুতরাং খেলার সময়ের ঘটনা উপলক্ষ করে যে সব গণ্ডগোলের সৃষ্টি সে সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার এবং দায়িত্ব আই-এফ-এর নিশ্চয়ই থাকা উচিত। খেলা পরিচালনা করতে গিয়ে রেফারীরা যদি বারবার অজ্ঞতা হেতু দর্শকদের মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন এবং প্রহৃত হ'ন অথবা খেলোয়াড়রা যদি খেলার আইন ভঙ্গ ক'রে অভদ্রতার পরিচয় দেন তাহলে এসব ব্যাপারে আই-এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীর কি কোন দায়িত্ববোধ থাকে না? খেলার মাঠে যে সব গণ্ডগোলের উৎপত্তি তা যখন খেলার সময়ের ঘটনা এবং ফলাফল উপলক্ষ করে, তখন পুলিশের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আই-এফ-এ যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যায় তাহলে কি তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে অশোভন এবং অযোগ্যতার কারণ তেমনি খেলা পরিচালনা ব্যাপারেও এ কথা বলা চলে। মাঠে উপস্থিত সকলের মনোবৃত্তি এক নয়, সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা আই-এফ-এর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় আমরা তা স্বীকার করি; কিন্তু সকলেই যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করে তাহলে গণ্ডগোলের পরিমাণ

নিশ্চয়ই কম হবে। আই-এফ-এ-র কর্ত্তব্য রেফারী নিয়োগের ভার নিজে গ্রহণ ক'রে রেফারীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া, খেলার আইনের বই প্রকাশ ক'রে দর্শকদের মধ্যে প্রচার করা এবং ফুটবল খেলার প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক (practical) কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা।

সেদিনের মাঠের দর্শকমাত্রেই স্বীকার করবেন মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলার সময়ে কয়েকটি ঘটনার ফলে দর্শকদের মধ্যে প্রথম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খেলার অব্যবহিত পরে ক্যালকাটার সাদা গ্যালারীর সামনে এক খণ্ডযুদ্ধও হয়ে যায়; এর পর মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের সম্মিলিত মাঠে যে ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে 'the usual hour of play had nothing to do with it' এবং the I. F. A. had no jurisdiction in this matter এ উক্তি কি খুবই যুক্তিপূর্ণ হবে?

আই-এফ-এ-র অপর এক সভায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক মহাশয় মোহনবাগান ক্লাবের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য, খেলোয়াড়োচিত ভদ্রব্যবহার এবং 'big brothers' প্রভৃতি কথার উল্লেখ করে মোহনবাগান ক্লাবকে সম্মানিত করেন এবং এ ব্যাপারে মিটমাটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রকাশ, ঐ সভায় মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিনিধি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ ক'রেছিলেন। সাময়িকভাবে এই সব গণ্ডগোল মেটাবার চেষ্টা করা ছাড়া যাতে ভবিষ্যতে খেলার মাঠে এ রকম ব্যাপার না ঘটে তার চেষ্টা প্রত্যেক ক্লাবেরই করা উচিত। খেলার সময় দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মাঠ ছেড়ে ট্রামে বাসে রাস্তায় রাস্তায় নানা রকম অঙ্গভঙ্গি এবং উক্তি দিয়ে যে ভাবে আনন্দ প্রকাশ করা হয় তা আমরা কোন দলেরই পক্ষ হয়ে সমর্থন করি না। আশার কথা আই-এফ-এ-র পরিচালকমণ্ডলী খেলার মাঠের অপ্রিয় ঘটনা দূরীকরণে অগ্রসর হয়েছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

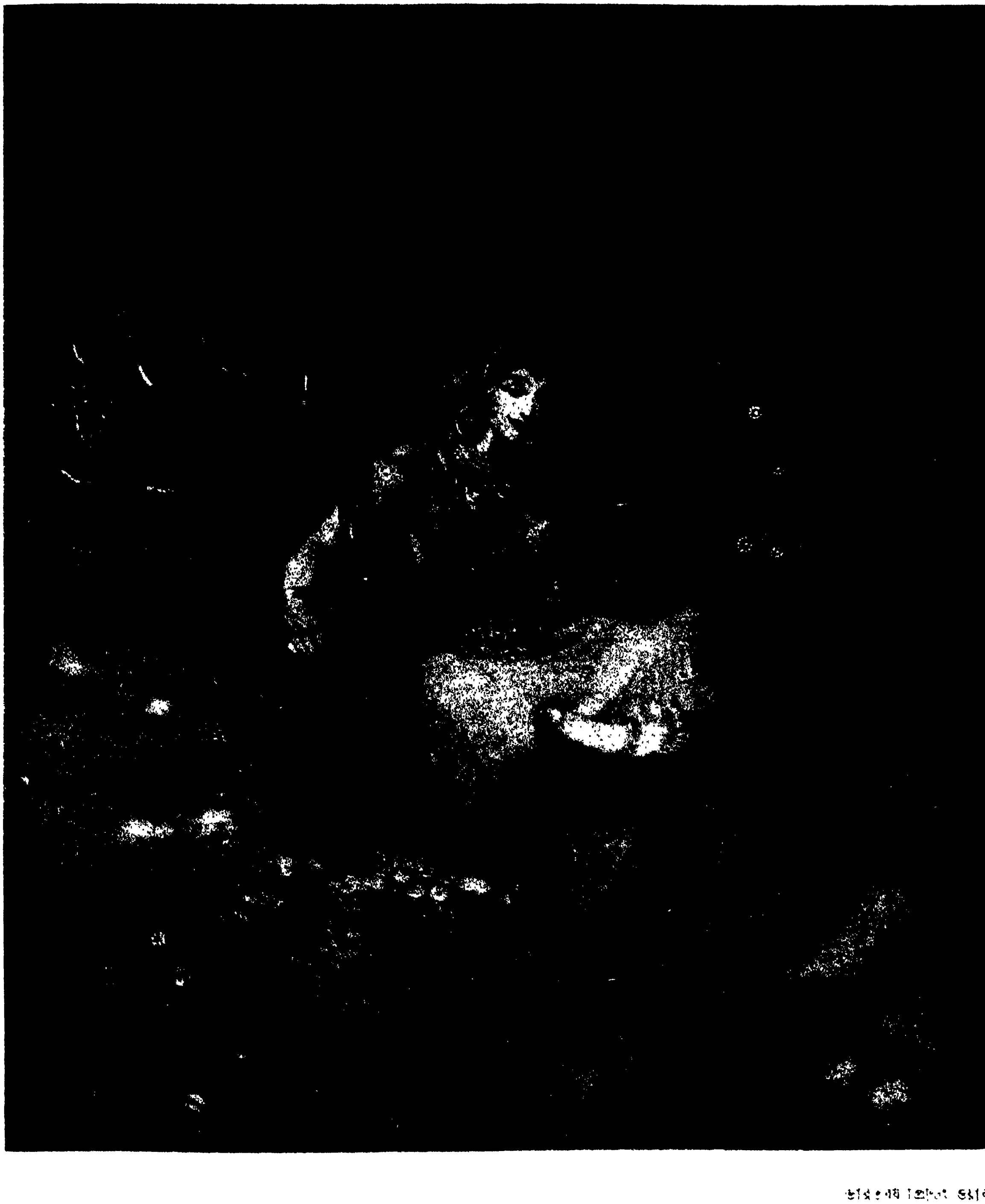
শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল প্রণীত উপন্যাস "জীবন ও যুদ্ধ"—৩৲
শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় প্রণীত "মিস্ লতিকা চৌধুরী"—১।০
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত "মৃত্যুর পরপারে" (১ম খণ্ড)—২৲
শৈলেন মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "তোমার পতাকা যারে দাও"—২৲
রমাপতি বসু প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "আগামীকালের কবিতা"—১॥০
শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্প গ্রন্থ "মায়ের ডাক"—২৲
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সাহু প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বোধন বাঁশী"—১৲
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "প্রাচীক"—৩॥০
৺কারেশ্বরানন্দ প্রণীত "প্রেমানন্দ" (২য় ভাগ)—২৷০
রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ প্রণীত "বৈষ্ণব রসসাহিত্য"—৭৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এবার আশ্বিন মাসের মধ্যভাগেই শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা। সেজন্য মহালয়ার পূর্ব্বেই সকল গ্রাহকদের নিকট কাগজ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমরা আশ্বিনের প্রথমেই কার্ত্তিক সংখ্যা ও ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশ করিব। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথা সময়ে বিজ্ঞাপনের কপি প্রেরণের ব্যবস্থা করুন, ইহাই প্রার্থনা। কলিকাতা-ব্যাপী ছাপাখানা ধর্ম্মঘট আসন্ন—যদি তাহা ঘটে, তাহা হইলে যথাসময়ে কাগজ প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



[illegible]

দিতেছে—এই গোলমালটা যেন তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই কারণে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পুরাতন ও নূতন বিধানের মধ্যে পার্থক্যটা কি ধরণের তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রশ্ন-পত্র বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ভূগোল বা ইতিহাস পূর্ব্বে অবশ্যপাঠ্য ছিল না; কিন্তু এখন এই দুইটি বিষয়কে অবশ্য পাঠ্যের (Compulsory) তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইংরেজিরও একটা প্রশ্নপত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় ইংরেজির ফুলমার্ক (Fullmarks) এখন ২০০ স্থলে ২৫০এ পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে শতকরা ৫০ নম্বর পাইলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া যাইত, এখন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে হইলে শতকরা ৬০ নম্বর পাইতে হয়।

পূর্ব্বে (১৯১০ খৃষ্টাব্দে) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অবশ্য পাঠ্য বিষয়গুলির গুরুত্ব এইরূপ ছিল :—

বিষয়	ফুলমার্ক
ইংরেজি	২০০
বাঙ্গালা	১০০
সংস্কৃত	১০০
গণিত	১০০
মোট	৫০০

ইহা ছাড়া কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় ও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে যে কোন দুইটিকে মনোনীত করিতে হইত। অতিরিক্ত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান ছিল এই কয়টি :—

বিষয়		ফুলমার্ক
গণিত		১০০
মেকানিকস্ (Mechanics)		১০০
সংস্কৃত	—	১০০
ইতিহাস	—	১০০
ভূগোল	—	১০০

সুতরাং অবশ্যপাঠ্য ও অতিরিক্ত বিষয়গুলির ফুলমার্ক ছিল—৭০০। ইহার মধ্যে ৩৫০ নম্বর পাইলেই ছাত্রগণ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে (First Division) উত্তীর্ণ হইত। পূর্ব্বে ইংরেজির সমস্ত প্রশ্নই ছিল ব্যাকরণ ও রচনাদি (Composition) সংক্রান্ত। তখন বাঙ্গালা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদের যে প্রশ্ন থাকিত তাহার ফুলমার্ক ছিল ৭০; [এখন সেই স্থলে ২০ হইয়াছে] ইহার পর ১৯২৩ সাল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরাজির জন্য পাঠ্য পুস্তক হইতে প্রশ্ন থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ১৯২৮ সালে যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয় তাহার ইংরেজি ভাষার প্রশ্ন পত্রের বিভিন্ন-বিভাগে ফুলমার্ক এইরূপ ছিল :—

			ফুলমার্ক
(ক) প্রথম প্রশ্নপত্র (১০০)			
১।	বাঙ্গালা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদ	—	৪০
২।	রচনা (২টি)	...	১৫ × ২ = ৩০
৩।	ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রশ্ন	—	৩০
			১০০
(খ) দ্বিতীয় প্রশ্ন পত্র (১০০)		...	
১।	পাঠ্য পুস্তক হইতে প্রশ্ন	...	৫০
২।	সংক্ষিপ্তসার রচনা	...	৫০
			১০০

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইংরেজির ২০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকিত পাঠ্যপুস্তক হইতে। বাকী ১৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকিত ব্যাকরণ হইতে; অবশিষ্ট ১২০ নম্বরের প্রশ্ন হইত রচনাদি বিষয়ে। সুতরাং পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, রচনা, অনুবাদ প্রভৃতি ভালভাবে শিখিতে হইত।

যে সব ছাত্রের গণিতে একটু পারদর্শিতা দেখা যাইত তাহারা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গণিত ও মেক্যানিকস্ (Mechanics) গ্রহণ করিত। গণিতের এই তিনটি পেপারে ৩০০ শতের কাছাকাছি নম্বর তোলা তখনকার ছাত্রগণের মধ্যে একটা আনন্দজনক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল।

তখন বেশীর ভাগ ছাত্রই গণিত ও সংস্কৃতকে অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করিত। ইহারা গণিত, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভালভাবে শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইত বলিয়া উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইত না।

নূতন বিধান

নূতন বিধানের পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহের গুরুত্ব এইরূপ :—

বিষয়		ফুলমার্ক
ইংরেজি	—	২৫০
বাঙ্গালা	—	২০০
সংস্কৃত	—	১০০
ইতিহাস	—	১০০
ভূগোল	—	৫০
গণিত	—	১০০
মোট....................		৮০০

ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয়কেও পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী বিষয় পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়; কিন্তু গ্রহণ করা বা না করা ছাত্রগণের ইচ্ছাধীন। ইহা অনেকটা ইণ্টারমিডিয়েট (Intermediate) পরীক্ষার চতুর্থ বিষয়ের (Fourth Subject) মত; পড়িবার বা পরীক্ষা দিবার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। অতিরিক্ত বিষয়ে ছাত্রগণ যত নম্বর পাইবে, তাহা হইতে ৩০ নম্বর বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তাহার নম্বর সমষ্টির (Aggregate) সহিত যোগ করা হয়। এই সব স্বেচ্ছাধীন অতিরিক্ত

বিষয়গুলির মধ্যে গণিত, ভারতের শাসনব্যবস্থা (Public Administration) মেকানিক্স্ ও বিজ্ঞান প্রধান।

নূতন বিধানে অতিরিক্ত বিষয়গুলির অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, একটী অতিরিক্ত বিষয় যত্ন করিয়া পড়িবার আগ্রহ খুব কম ছাত্রেরই দেখা যায়। অঙ্ক কষিবার তত তাড়া নাই—কারণ ৩০ পাইবার দিকেই ঝোঁক বেশী। ৩০০ পাইবার জন্ত উৎসাহ প্রদর্শনের আবশুকতা নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষা করে না। তাই ইংরেজি হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ শিক্ষা করার দিকে ছাত্রগণের আর তত অভিনিবেশ দেখি না। অন্যান্য বিষয়ের অবস্থাও তথৈবচ। বিজ্ঞান এখনও অতিরিক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ইহাকেও অবশ্য পাঠ্যতালিকার অঙ্গীভূত করা হইবে বলিয়া মনে হয়। এইবার আমরা ইংরেজি ভাষার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা দেখাইয়াছি যে পূর্ব্বে ইংরেজিতে ফুলমার্ক ২০০ শতের মধ্যে ১৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকিত ব্যাকরণ ও রচনাদি হইতে। তাহারও পূর্ব্বে পাঠ্যপুস্তক হইতে কোন প্রশ্ন থাকিত না। এখন ইংরেজির ২৫০ নম্বরের মধ্যে ৭৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকে ব্যাকরণ ও রচনাদি বিষয়ে। বাকী ১৭৫ মার্কের প্রশ্ন থাকে পাঠ্যপুস্তকসমূহ হইতে। নিম্নে আমরা বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কোন্ বিষয়ে নম্বর কিরূপে ভাগ করা হইয়াছে ও তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব :—

ইংরেজি		দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র	
প্রথম প্রশ্নপত্র		পাঠ্যপুস্তক (পদ্য) —	৫০
পাঠ্যপুস্তক (গদ্য) —	৭৫	বাঙালা ইংরাজি অনুবাদ	২০
ব্যাকরণ —	২৫	চিঠিপত্র রচনা —	১৫
	১০০	সংক্ষিপ্ত রচনা —	১৫
			১০০

তৃতীয় প্রশ্নপত্র	ফুলমার্ক
দ্রুত পঠনের জন্ত	
নির্ব্বাচিত ২খানি পুস্তক হইতে —	৫০

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালা হইতে ইংরেজি অনুবাদের প্রশ্নের নম্বর ৪০ হইতে কমিয়া ২০ হইয়াছে। প্রবন্ধ রচনা (Essays) উঠিয়া গিয়াছে। ব্যাকরণের নম্বর ৩০ হইতে কমাইয়া ২৫ করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত রচনার জন্ত যেখানে ৫০ নম্বর থাকিত, এখন সেখানে মাত্র ১৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকে।

শিক্ষার্থিগণ যাহাতে বই পড়িয়া প্রশ্নোত্তর করিতে পারে তাহার জন্তই পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পাঠ্য বিষয়ও অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার বিষয়বস্তু মনে রাখিতে ছাত্রগণের এত সময় যায় যে তাহাদের Grammar ও Compositionএর জন্ত অতি সামান্ত সময়ই থাকে। ফলে ইংরেজিতে অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত-রচনা, প্রবন্ধ-রচনা, অন্যান্ত ব্যাকরণ সংক্রান্ত অনুশীলনী, পদবিন্যাস প্রভৃতির চর্চা করা ছাত্রগণ আবশুক বোধ করে না। পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত ১৭৫ নম্বরের প্রশ্নোত্তরে ভাল মার্ক তুলিতে হইলেও যে লেখার দিকে অধিক মনোযোগ দান করা উচিত তাহা ছাত্রগণ মনে মনে বুঝিলেও এ বিষয়ে যেন তাহাদের আর তেমন উৎসাহ নাই। ফলে ছাত্রগণের ইংরেজি শিক্ষার বনিয়াদ কাঁচা থাকিয়া যাইতেছে। ইংরেজির প্রশ্নপত্রের উত্তরে তাহারা যাহা লেখে তাহাতে থাকে অজস্র ভুল; বানানের ভুল ত' থাকেই, তাহা ছাড়া বাক্য-গঠনে (Sentence Construction) এত অদ্ভুত ধরণের ভুল দেখা যায় যাহাতে মনে হয় যে ছাত্রগণ ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলিও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইংরেজিতে এইরূপ বিদ্যা লইয়া তাহারা কলেজে যাইয়া আরো মুস্কিলে পড়ে। ইহা ব্যতীত আরো অসুবিধা আছে।

এখন এক বাঙ্গালা ব্যতীত সর্ব্ব বিষয়ের প্রশ্নপত্র রচিত হয় ইংরেজিতে। অথচ ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালায় রচিত। বাঙ্গালা মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্য্য চলে।

অন্যান্ত বিষয় অপেক্ষা গণিতের ব্যাপারে অসুবিধাটা একটু জটিল বলিয়া বোধ হয়। গণিতের বাঙ্গালা পরিভাষার (Terminology and Nomenclature) সহিত ছাত্রগণ পরিচিত; ইংরেজি পরিভাষা অনেকেরই জানা নাই। এরূপ স্থলে ইংরেজিতে রচিত প্রশ্ন সাধারণ ছাত্র ঠিক বুঝিতে পারে না।

তাহা ছাড়া, গণিতের প্রশ্নোত্তর লিখিবার কালে পাটীগণিত ও জ্যামিতির প্রশ্নোত্তর লিখিতে হইবে বাঙ্গালায়; কিন্তু বীজগণিতের উত্তর ইংরেজি বাঙ্গালায় মিশাইয়া লিখিতে হইবে। ইহাতে ছাত্রগণকে কিরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে মেকানিক্স্ শিখিবার কোন উপায় নাই। কারণ একটী মাত্র বিষয় অতিরিক্ত হিসাবে পড়া চলে। অতিরিক্ত গণিত লইলে আর মেকানিক্স্ লইবার উপায় নাই; অথচ অতিরিক্ত গণিত না লইয়াও মেকানিক্স্ গ্রহণ করা চলে। কিন্তু অতিরিক্ত গণিতের অনেক বিষয় জানা না থাকিলে ছাত্রগণকে মেকানিক্সের অনেক বিষয় একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা অনেকটা না বুঝিয়া মুখস্থ করার মত।

গণিতের যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক আছে তাহা পূর্ব্বেকার ইংরেজি পুস্তক হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু এই অনুবাদও এরূপ অদ্ভুত ভাষা-বিভ্রমের সৃষ্টি করে যে শিক্ষকেরই মনে হয় ইংরেজিটাই সোজা ছিল। সুতরাং ইহা ছাত্রগণেরও বিভ্রম উৎপাদন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রতি বৎসরই পাঠ্য-পুস্তকের পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোন একজন গ্রন্থকারের গ্রন্থ কেনই বা মনোনীত হইল—আবার পরবৎসরই সেই লেখকের পুস্তক কেনই বা পরিত্যক্ত হইল—তাহার কারণ খুঁজিতে যাইয়া এই কথাই মনে হয় যে, আমরা গ্রন্থকার নির্ব্বাচন করি, পুস্তক নির্ব্বাচন করি না। এই প্রকার পুস্তক পরিবর্ত্তনের গোলমালের মধ্যে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা (continuity) নষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত এক

একটা শ্রেণীতে কি কি শেখানো হইতেছে, তাহার হয়তো একটা হিসাব থাকে। কিন্তু—কোন কোন বিষয় শিখাইতে বাকী রহিল তাহার কোন হিসাব থাকে না; কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও দুশ্চিন্তা নাই।

পুস্তক বাহুল্যের ঘটা দেখিয়া অনেক ছাত্র পাঠ্য পুস্তকই ক্রয় করে না। বাজারে যে সমস্ত short-cut series কিনিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ ছাত্র তাহার সাহায্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে।

যে সমস্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছেন তাঁহারা এই দুর্মূল্যের বাজারেও বিদ্যালয় হইতে যে সামান্য বেতন পান তাহাতে তাঁহাদের ৫।৬ দিনের বেশী চলে না। ফলে অধিকাংশ শিক্ষককে প্রাইভেট টিউশনী (Private Tuition) করিয়া জীবন চালাইতে হয়। যাঁহারা সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত ৫।৬ স্থানে টিউশনী করিয়া ফিরেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের যথাসময়ে স্নানাহার পর্য্যন্ত হয় না, বিশ্রাম ত' দূরের কথা। ইহার উপর আবার বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগকে সপ্তাহে ৩০।৩৫ ঘণ্টা (periods) পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। তাই, অকালে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইঁহারা বিদ্যালয়েই বা কি পড়াইবেন—প্রাইভেট ছাত্রকেই বা কি শিক্ষা দিবেন তাহা আমরা জানি না। যেখানে একখানি মাত্র পুস্তক পড়াইতে দেড়ঘণ্টার মত সময় লাগে—সেখানে ছাত্র গৃহশিক্ষকের নিকট হইতে কতটুকু সাহায্য পাইতে পারে? অভিভাবকগণ গৃহশিক্ষকের উপর সমস্ত বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ছাত্র কি শিখিতেছে না শিখিতেছে তাহা তাঁহারা মোটেই খোঁজ করেন না; তবে পরীক্ষায় পাশ করিলেই হইল। ছাত্রও পড়িতে চায় না; সে চায় যে মাষ্টার মহাশয় পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহাকে এমন কয়েকটা প্রশ্ন বলিয়া দিবেন, যাহার উত্তর মুখস্থ করিতে পারিলেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। যে শিক্ষককে দিনের মধ্যে ৫।৬ স্থানে পড়াইতে ছুটিতে হয়, তাঁহার পক্ষে টিউশনী বজায় রাখিবার জন্য বাছা বাছা কয়েকটা প্রশ্নোত্তর করানো ছাড়া আর উপায় কি? এ অনেকটা অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার মত। ছাত্র যাহা মুখস্থ করে, তাহা যদি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তেমন অসুবিধা হয় না; কিন্তু, মুখস্থ করার একটা সীমা আছে। ছাত্রের সামর্থ্য যেখানে ব্যর্থ হয়, সেখানে তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত অন্যায় পথে আত্মপ্রকাশ করে। তখন পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে সহ-পরীক্ষার্থীগণের খাতা হইতে, পুস্তক হইতে বা অন্য কোন লিখিত কাগজপত্র (Manuscripts) হইতে নকল করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এরূপ স্থলে, লেখা-পড়া করা অপেক্ষা পরীক্ষায় নকল করার কৌশলটি আয়ত্ত করিতে তাহারা যত্নশীল হয়। এ বিষয়ে তাহাদের যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অভিনব। যেখানে তাহারা বাধা পায় সেখানে পরীক্ষাকেন্দ্রের গার্ডকে দলবদ্ধভাবে মারপিটের ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করে। কত পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থিগণ গার্ডের চক্ষের সম্মুখে বই খুলিয়া নকল করে—তাহার সন্ধান কয়জন রাখেন? পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে দু' চারজন একটু সাহসিকতা দেখাইতে পারিলেই অপরাপর পরীক্ষার্থী তখন নকল করাটাকে একটি অধিকার বলিয়া মনে করে। তখন আর চক্ষুলজ্জাও থাকে না!

শিক্ষা-সমস্যার কথা উল্লেখ করিলে সমাধানের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; এ সম্বন্ধে দু' একটা প্রস্তাব উত্থাপন করাও স্বাভাবিক।

প্রথমতঃ, ইংরেজি ভাষাটা যখন একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই—তখন এই ভাষা শিক্ষাটা যাহাতে ভালভাবে হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি ইংরেজি ভাষার কাঠামোটা শিক্ষার্থীদিগের আয়ত্ত করিবার সুযোগ না ঘটে, তাহা হইলে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভাষার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। আমাদের মনে হয়,—ইংরেজি পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা আরো কমাইয়া দেওয়া সমীচীন। তৃতীয় প্রশ্নপত্রটির (Third paper) বিলোপ সাধন করাই যুক্তিসঙ্গত। রচনাদির নম্বর বর্দ্ধিত করা উচিত। মাতৃভাষা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকে, তাহার নম্বর ২০ হইতে বাড়াইয়া ৫০।৬০ পর্য্যন্ত করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ গণিত বিষয়টি যাহাতে শিক্ষার্থিগণ সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার জন্য কয়েকটি বিষয়কে অবশ্য পাঠ্য করিয়া অবশিষ্ট বিষয়সমূহকে অতিরিক্ত পর্য্যায়ে ফেলিলেই ভাল হয়। যেমন ইংরেজি, বাংলা, গণিত ও সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করিয়া ভূগোল, ইতিহাস, অতিরিক্ত গণিত, মেকানিক্স, বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটিকে মনোনয়নের বিষয় করাই যুক্তিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি বিষয় প্রত্যেক ছাত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ সাধারণভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রশংসনীয়; তবে ইংরেজি শিক্ষার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু গণিত বিষয়টি ইংরেজিতে শেখানোই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যতদিন না গণিত বিষয়টি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে অন্ততঃ ততদিন পর্য্যন্ত উহা ইংরেজিতে শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা থাকাই বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থতঃ, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগকে যাঁহারা শিক্ষাদান করেন—সেই শিক্ষকগণের উপরেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার ও কাগজ-পরীক্ষার (Paper Examination) ভার অর্পিত হওয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে, যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তকের সংস্পর্শেই থাকেন না, এরূপ ব্যক্তিগণের উপর প্রশ্নপত্রাদি রচনার ভার অর্পণ করা হইয়া থাকে। ফলে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখিয়া পরীক্ষার্থীর চক্ষুস্থির হয়। তাহা ছাড়া, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ যে আদর্শে (Standard) শিক্ষাদান করেন, তাহা শিক্ষকগণেরই সুপরিজ্ঞাত।

পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয়ে শিক্ষার সমস্ত ভার—পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন হইতে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্য্যন্ত—শিক্ষকগণের উপরই ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একজন প্রধান শিক্ষক থাকা আবশ্যক সন্দেহ নাই—কিন্তু তিনি শিক্ষকগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হওয়াই ভাল। বিদ্যালয় যখন একটী পবিত্র প্রতিষ্ঠান; তখন এখানে প্রধান শিক্ষক ও সহযোগী শিক্ষকগণের সম্পর্কের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের ভাব থাকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সকলের মধ্যে যাহাতে তিক্ততার সৃষ্টি না হয়—সহযোগী শিক্ষকগণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, শিক্ষকশ্রেণীকে সমাজে তাঁহাদের যথাযোগ্য আসন দান করিতে হইবে। শিক্ষকগণ যাহাতে স্বাধীন আবেষ্টনীর মধ্যে শান্তিতে বাস করিয়া শিক্ষাদান কার্য্য চালাইয়া যাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। শিক্ষককে এমন বেতন দান করিতে হইবে, যাহাতে প্রাইভেট টিউশনী না করিয়াও তাঁহার চলিতে পারে।

অঘটন

শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী

অঘটন ঘটিয়া গেল!

কথাটা গোড়া হইতেই বলি—

আমার বাল্যজীবনের স্কুলের সহপাঠিনী শীলার পত্র পাইলাম, এবার সে গরমের ছুটিতে চারদিন আমার পল্লী কুটীরে আসিয়া কাটাইয়া যাইবে।

উদ্বেগে, আশঙ্কায় আমরা গৃহের সব প্রাণী কয়টিই ঘামিয়া উঠিলাম। মুহুর্মুহুঃ গলা শুকাইয়া যাইতে লাগিল। স্বামীত স্পষ্টই বলিলেন "এ ভারি অন্যায় বাপু! তাঁরা বড়লোক, শহুরে লোক, অনেক বদখেয়াল তাঁদের থাকতে পারে, কিন্তু এ কেমন বদ খেয়াল? আমরা গরীব চাষা-ভূষো মানুষ। দেশের এখন চরম দুঃখ দুর্দ্দিন, এখন তিনি আসছেন কবিকল্পিত পল্লীশ্রী দেখতে। ফিরে গিয়ে তাঁদের সোসাইটিতে, আমাদের মূর্খতা, অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি নিয়ে মস্ত একটা লেকচার ঝাড়বেন, তাঁর ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। বেশ ত আছো বাপু সব শহরে—বায়স্কোপে পল্লীচিত্র দেখ, কেমন পরিচ্ছন্ন বেশে চাষারা ধান কাটতে কাটতে গান গায়। চাষাণীরা জল আনতে যায় কেমন শান্ত মধুর গতিভঙ্গে। পুকুরে শতদলের শোভা—ফুলে, ফলে সুশোভিত পল্লীগ্রাম। এখন আসুক এখানে, বায়স্কোপের ছবির সঙ্গে মিলবে না, কবিতার ছন্দেও মিলবে না। তখন যতদোষ বেটা এই দেশের লোকদেরই হবে। এইসব শহুরে বড়লোকদের এনে দেশের বদনাম করা। তোমার আর কি?"

অপরাধীর ন্যায় বলিলাম "তা আমি কি করব? আমি ত তাকে আসতে লিখিনি—কখনও পাড়াগাঁ দেখেনি, বড়লোকের মেয়ে! যা খেয়াল ধরেছে বাবা তাতেই সায় দিয়েছেন। ওর মা নেই কি না। তা তোমার চাইতে আমারই ত ভাবনা বেশী, গোছান গাছান কর্ত্তে হবে। তাকে ত আর খেজুরের খেটের ঘাটে নামতে দোব না। তার চানের জল তুলতে হবে! কপাল দেখ না—দেশে একটা লোকও কি এখন সুস্থ নেই, সব জ্বর! ঝিটার জ্বর না হলেও বা কিছু আমার সাহায্য হোত। যাকগে তুমি ভেব না, তুমি রোজ একটা করে মাছ শুধু ধরে দিও, ব্যাস্।" দুদিন আপ্রাণ খাটিয়া বাড়ী ঘরের একটু শ্রী ফিরাইলাম।

যথাসময়ে শীলা আসিয়া পড়িল, আদর আপ্যায়ন যথারীতিই হইল। দেবর ডাক্তার, বাইরের ঘরেই ভাঙ্গা দুটো আসবাবপত্র নিয়া তাহার ডাক্তারী, শীলার সঙ্গে তাহারও আলাপ করাইয়া দিলাম, কিন্তু আমার স্বামী অপেক্ষাও দেবরটী বেশী বিরূপ শহরের লোকের উপর। কাজেই খুব ভয়ে ভয়ে সতর্ক হইয়াই রহিলাম। মা দুর্গা, মা কালী, শ্রীমধুসূদন—যে যেথানে আছেন ডাকিলাম "চারটে দিন মান রক্ষে কর ঠাকুর।" শীলা কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে বলিল—"আমি গ্রাম দেখতেই এলাম ভাই! বাড়ী কেন বসে থাকব? একটু ঘুরে আসি।" ঠাকুরপোকে বলিলাম "যাওনা ভাই শীলাকে নিয়ে একটু ঘুরে এসো। আমি যে রান্না করব। তোমার দাদাকেও মস্ত একটা কাজ দিয়েছি, জান?" বিস্মিত শীলা বলিল "কি মস্ত কাজ আবার তাঁকে দিলে? কই সত্যি তাঁর সঙ্গে দেখা হোল না ত?"

হাসিয়া বলিলাম "দেখা পরে করিস। তাকে মস্ত একটা মাছ ধরতে বলেছি তোর জন্যে। সহুরে মানুষ কি দেব তোর পাতে। অন্তত একটা মাছ যদি পাই ত বেশ হয়।" ঠাকুরপো কথা কহে নাই একটিও। শীলা শুধু একটি নমস্কার করিয়াছিল। তাহার স্বভাব অত্যন্ত অস্থির, কিন্তু নীরব ভাব দেখিয়া আমার ভয় করিতেছিল। সে বলিল "চললাম বৌদি, আমার গোটা-কতক রোগী আছে, ওঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় হবেনা, রোগীগুলো হা পিত্যেস্ করে বসে আছে, যা হোক ব্যবস্থা ত' তাদের করতে হবে কিছু একটা।" শীলা বলিল "কেন? যা হোক ব্যবস্থা কেন? ওষুধ দেবেন না?" ঠাকুরপো উত্তর দিল, "ওষুধ? ওষুধ কোথা পাব? তিনশো টাকা পাউণ্ড কুইনাইন কিনে ওরা খেতে পারবে না, আমিও তত বড়লোক নই যে অমনি দেব।

যা অমনি পারি—অর্থাৎ ছাতেম, কালমেঘ, গুলঞ্চ এক্সট্রাক্ট, আর ক্যাষ্টর অয়েল, এস্পিরেন এইসব দিই। কিন্তু তাতে ত ম্যালেরিয়া সারে না। তবু ছাড়ে না সবাই দেখুন না—ঐ সব হতভাগাগুলো আসছে, আচ্ছা চলি তাহলে।" ঠাকুপোর বক্তৃতায় শীলা স্তম্ভিতা! তাকে বলিলাম "ও অমনিই। আচ্ছা তুই খোকার সঙ্গে যা। খোকা মাসীমাকে নিয়ে ষষ্ঠীতলা, মাঠের পুকুরের দিকটা, বড় রাস্তা হ'য়ে সব ঘুরে এসোগে—তাহলেই দূর থেকে নাপ্‌তে পাড়া বাগ্দি পাড়াটা দেখা হবে, যা শীলা একটু ঘুরে সাধ মিটিয়ে আয় গে। জুতোটা খুলে যাস কিন্তু, ভারী কাদা পথে।" খোকার সহিত শীলা গেল, দুর্গা দুর্গা বলিয়া আমি রন্ধনশালে প্রবেশ করিলাম।

২

রান্না প্রায় হইয়া গিয়াছে, বাহিরের ঘরে শীলার প্রবেশের সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। প্রবেশ করিয়াই শীলা বলিল "আচ্ছা সুরথবাবু, আপনারা কি মানুষ?" ঠাকুরপো একজন বুড়ি রোগিণীকে দেখিতেছিল, চমকিয়া শীলার প্রতি চাহিল; স্বামী বেশ ধীরে সুস্থে আপনার নাকে কানে চোখে হাত বুলাইয়া এবং হাত পা গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "হ্যাঁ মানুষ বলেই ত মনে হচ্ছে! কেন আপনার কিছু সন্দেহ আছে নাকি?" উপস্থিত সকলেই আমরা হাসিয়া ফেলিলাম। আরক্তমুখে শীলা বলিল "সেকথা বলছি না, ঠাট্টা করবেন না। সত্যিই গ্রাম বেড়িয়ে এসে মনে জাগল সংশয়—আপনাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে। মনুষ্যত্ব আপনাদের নেই।" গম্ভীরভাবেই স্বামী বলিলেন "আপনার মত কথা প্রথম প্রথম এসে গাঁয়ের লোককে আমিও বলেছিলাম। কিছুদিন পরে কিন্তু সব ঠাণ্ডা, মানুষ কেই বা সংসারে আছে বলুন ত'? আপনার আমার কারোরই মনুষ্যত্ব নেই বুঝলেন?"

স্বামীকে ঠেলিয়া পাঠাইলাম স্নান করিতে। শীলার প্রশ্নের ভঙ্গীতেই ভয়ে আমার রক্ত জল হইয়া গিয়াছিল। তিনি অল্পেতেই চলিয়া যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু সর্ব্বনাশ বাধাইল ঠাকুরপো!

রক্তচক্ষু শীলার দিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ তখন রুগী দেখছিলাম, কলুত ত হঠাৎ আমাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আপনার এত সন্দেহ-জাগল কেন? কিসে—দেখলেন অমনুষ্যত্ব সেটা বলতে হবে।" সতেজে শীলাও বলিল "বলব নিশ্চয়ই! আপনি ডাক্তার, আপনার দাদাও একজন পণ্ডিত লোক। গাঁয়ে যে এমন মহামারী হচ্ছে তার কোন উপায়, প্রতিকার করেন কি আপনারা? আপনারা শিক্ষিত! আপনারাই যদি প্রতিবেশী সম্বন্ধে অতটা 'কেয়ারলেস্' হ'ন, তবে মূর্খ যারা তারা ত হবেই, আপনাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে তাই এ সন্দেহ আমার।" বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হাসিয়া ঠাকুরপো বলিল—"আপনার মনুষ্যত্ব নিশ্চয় আছে? কিন্তু আমার রোগিণী ওই বুড়ী মা আপনার পাশে যখন দাঁড়াল, তখন অমন চম্‌কে সরে গেলেন কেন বলুন ত? বুড়ী ব'লে? রোগী ব'লে? নোংরা ব'লে? কি জন্যে সরলেন? মানুষকে যারা ঘৃণা করে, তারাই যাচাই করে অপরের মনুষ্যত্ব? লম্বা লম্বা বুলি আওড়ালেই মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না। মনুষ্যত্বের পরিচায়ক কি কাজ করেছেন আজ পর্য্যন্ত? অথচ আমার দাদা! তাঁর ছেলে আজ দু'মাস স্কুলের মাইনে পায় নি, তা সত্ত্বেও বুড়ী রাসুর মাকে—প্রত্যেক মাসে পাঁচটি ক'রে টাকা দিচ্ছেন। ওর যুদ্ধে-মৃত একমাত্র ছেলের নাম করে, দাদা নিজেই মণিঅর্ডারে ওকে টাকা দেন—নিজেই চিঠি লিখে ওকে পড়ে শোনান—আর বলেন বুড়ীমা তোমার রাসু চিঠি দিয়েছে। কত বড় মহাপ্রাণতা থাকলে মানুষ একাজ পারে তার ধারণা আছে আপনার? বুড়ী বলে ওকে ঘৃণা কচ্ছেন, মূর্খ বলে আর পাঁচ-জনকে ঘৃণা করবেন, অসভ্য নোংরা বলে আর বাকী কজনকে ঘৃণা করবেন, ঘৃণা করাই ত আপনাদের ব্যবসা। শিক্ষিত সহরবাসী যারা তাদের এটা গৌরব, 'স্মার্ট' বলে নাকে রুমাল দেওয়াটাও একটা ফ্যাসন্। নয়কি? কিন্তু এই মূর্খ চাষাদের রক্ত জল করা ফল, ফুল, অন্নে আপনাদের দেহ পরিপুষ্ট, বৃদ্ধ আপনিও হবেন, রোগ হওয়াও বিচিত্র নয়। এমনটি ঠিক চিরকাল আপনিও থাকবেন না, এত দম্ভও তখন থাকবে না।"

আমি ঠাকুরপোর বক্তৃতার বহর দেখিয়া 'থ' হইয়া গিয়াছিলাম। ঠাকুরপো একটু থামিতেই শীলাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গেলাম, কাতর মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিলাম "কিছু মনে করিস না ভাই শীলা। ঠাকুরপো অমনি, কিন্তু ওর

অন্তর বড় দরাজ, দেশের লোকের জন্য ও সমস্ত সময় কাজ করে, দেশের দুঃখীদের ওপর বড় ওর টান, তোর কথা তাই ওর বড্ড বেজেছে। তুই রাগ করিসনি শীলা ?"

ধীরে ধীরে শীলা বলিল "সবিতা! আমি বড়লোকের মেয়ে, শহরেই আজন্ম মানুষ কখনও পল্লীগ্রাম দেখিনি, কিন্তু সনৎবাবুর কথা শুনে আমি সত্যই পল্লীর অবস্থা বুঝতে পাচ্ছি; সহরে যারা ঘর বেঁধেছে তাদের সকলেরই দেশ আছে, কিন্তু তাদের পদধূলি দেশে পড়ে না, সবিতা! আমি রাগ করিনি, সনৎবাবুর কথা শুনলে কেউ রাগ কর্ত্তে পারে না। অন্তরের খাঁটি কথায় উনি তিরস্কার করেছেন, খাঁটি সত্য কথাগুলিই উনি বলেছেন, আমার মনে একটা কথা আসছে, বলতে দ্বিধা কচ্ছি, পরে জানাব, আমি আজই ফিরতে চাই তুমি ব্যবস্থা করে দাও ভাই।···না না, কোন অনুরোধ কোর না—বিশ্বাস করো রাগ আমি করিনি। আমি আবার আসব। আজই যাচ্ছি কেন জান? আবার আসবার পাশের ব্যবস্থা কর্ত্তে।" শীলা যাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ঠাকুরপোর ওপর রাগ হোল, বললাম "তোমাদের কথার খোঁচায়—অভদ্র ব্যবহারে চলে যাচ্ছে শীলা, তোমাদের অন্তর জলে পুড়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু তাই বলে ভদ্রমহিলার সঙ্গেও অমনি ব্যবহার করবে?"

নির্ব্বিকারচিত্তে স্বামী বসিয়া রহিলেন, ঠাকুরপো কেবল বিদ্রূপ করিয়াই বলিল—"ভারি দুঃখিত বৌদি—তোমার বান্ধবীটি ব্যথা পেয়ে চলে যাচ্ছেন বলে। কিন্তু কি করব? গেঁয়ো লোক আমরা বুঝে চেপে কথা বলতে জানি না। তা ভেবনা তুমি, ওঁর এ দুঃখস্মৃতি দু এক ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হবে না। যেখানে অবাধ আনন্দের আবহাওয়া সেখানে একবার পৌছলেই হয়।" আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না, আবার কতকগুলা কঠোর সত্য বলিবে হয়ত, শীলাকে চক্ষের জলে বিদায় দিলাম, চঞ্চলা শীলার শুব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এইটাই মনে হইতে লাগিল যে গভীর দুঃখ বা ক্রোধে শীলা এত গম্ভীর হইয়াছে। মিষ্ট কথা অনেক বলিলাম, মৃদু হাসিয়া সে শুধু বলিল—"ভুল বুঝো না সবিতা, আমি আবার আসব বলেই আজ চলে যাচ্ছি।"

৩

শীলা সত্যই আসিল, সুন্দর অনাড়ম্বর তাহার বেশ-ভূষা, মধুর হাসিমাখা মুখে সে আমাকে প্রণাম করিল, সবিস্ময়ে তাহার প্রতি চাহিলাম, মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল "আজ আর বন্ধু নই সবিতা, আজ ছোট বোনের মর্য্যাদা নেবার ভিক্ষা চাইতে এসেছি—তোমাদের কাছে থাকবার ভিক্ষা চাইতে এসেছি ভাই।"

বলিলাম "তোর কথা হেঁয়ালীর মত লাগছে ভাই বুঝতে পাচ্ছি না" শীলা বলিল "বাবার মত করিয়ে আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেছি ভাই, আরও কি বলতে হবে দিদি? বেশ বলব তবে—চল একেবারে তোমার দেওরের কাছে, তবে সুরথ-বাবুকে আমি আর মুখ ফুটে বলতে পারব না। বাবা আসছেন সন্ধ্যের ট্রেণে, তিনিই সব বলবেন, তার আগে তোমার একগুঁয়ে দেশ-সেবক দেওয়ের মত করাইগে।"

প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। শীলাকে জড়াইয়া বলিলাম—"সত্যি, শীলা সত্যি? ঠাকুরপোকে বিয়ে করবি? তুই সুখী হবি ভাই! আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, আমি নিশ্চয় বলছি—তুই সুখী হবি, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোর মাথায় ঝরে পড়বে।" আনন্দে আর কথা জোগাইল না, শুধু শীলাকে জড়াইয়াই রহিলাম।

ঠাকুরপো আসিয়া বলিল "কি বৌদি! এত উচ্ছ্বাস কাকে নিয়ে! ব্যাপার কি বল ত?"

শীলা ঠাকুরপোকে প্রণাম করিতেই আমি একটু অন্তরালে গিয়া কান পাতিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। শীলার কণ্ঠ শুনিলাম, সে কহিল "আমি এসেছি, আপনার বকুনি সেদিন মিষ্টি লেগেছিল তাই আবার এসেছি, জানি আমার এ ইচ্ছাকেও আপনি বড়লোকের খেয়াল বলে বিদ্রূপ করবেন তা করুন, আমায় তিরস্কারে তিরস্কারে খাঁটি করে নিন, আপনার সহকর্ম্মিণী করে নিন, শুধু ফিরিয়ে দেবেন না। টাকার লোভ দিয়ে আপনার আসন টলাতেও আসিনি, বিদ্যার দম্ভ নিয়েও আসিনি, এসেছি আমাকে নিবেদন করতে। আপনি গ্রহণ করুন না করুন, নিবেদিত আমি হয়েই গেছি।"

স্নেহমধুর স্বরে ঠাকুরপো উত্তর করিল "শীলা, আমি দেবতা নই! সাধারণ মানুষ! তোমার এ আত্ম-নিবেদন, তোমার এই সত্যকার ভালবাসা, আমার পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব। কিন্তু শীলা, আমি গরীব গ্রামবাসী! আমার জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য—আমার গ্রামবাসীদের

জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনা। পারবে তুমি আমার সহযোগিতা করতে?'

শীলা কহিল—'পারব।'

—'দুঃখে পেছিয়ে গেলে চলবে না। অবশ্য আমি তোমায় প্রথম দেখেই বুঝেছি, তুমি পারবে; সেদিন তোমায় অনেক কড়া কথা বলেছি সেজন্য আমায় ক্ষমা কোরো। কিন্তু তবুও আমার সন্দেহ হচ্ছে। বাপের অতবড় সম্পত্তির মায়া ছেড়ে এই গরীবের সংসারে বাসা বাঁধতে পারবে ত? আমার বৌদির পাশে থাকতে পারবে ত? আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদিও এটা অনধিকার, তবুও জিজ্ঞাসা করছি—তোমার পিতার তুমি একমাত্র মেয়ে, সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হবে?"

শীলা বলিল "সম্পত্তি আমার যৌতুক বলে বাবা তোমাকেই লিখে দিয়েছেন, কিন্তু তুমি ভেবনা সেটা দিয়ে আমি তোমায় বন্দী করবার ফিকির করেছি। এই সর্ত্তে লেখা পড়া হ'য়েছে যে, তার আয় দিয়ে স্কুল হবে, হাঁসপাতাল হবে, আরও যা কর্ত্তে মন চায় তুমি করবে, আমি মেয়ে স্কুলে মাষ্টারী যদি করি, তবে কিছু পাব মাইনে বলে, নইলে তোমার ঘাড়েই থাকব। তোমার বৌদি যা খান, যেমন ভাবে চলেন, তেমনিই আমি খাব—তেমনি চলব। যদি তাও না জোটে, তবে আমি স্কুলের চাকরী নিয়ে তোমার গ্রামেই থাকব, আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে কাজ করব। তুমি বিশ্বাস করো, আমার মোহ চলে গেছে, যদি আবার কখনও কোনও মোহ, দুর্ব্বলতা আসে—তুমি তা দূর করে দিও।"

আমি আস্তে আস্তে তাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার উপস্থিতিটা হয়ত ওরা লক্ষ্য করে নাই। ঠাকুরপো শীলার হাত দুটি ধরিয়া বলিল—"শীলা আমারও মোহ এলে তুমি তা দূর করে দিও। আজই মনে হচ্ছে শীলা, তুমি আর আমি নিরালা নির্জ্জনে শুধু বসে থাকি, কিন্তু আমার কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই আমাকে আমার দুঃখী দেশভাইদের তুমি ভুলতে দিও না শীলা।"

তেজীয়সাং ন দোষায়

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

অমিয়বাবু পাড়ার বড়দা, ছুটীর দিনে তাঁর ঘরে আড্ডাটা খুব ভালরকমই জমে। চা, সিগারেট, পান, গরমের দিনে বরফ দেওয়া সরবৎ এবং তারই আনুসঙ্গিক তাস ও খবরের কাগজ, এককথায় জমাটী একটা ক্লাব, কেবল মাসিক চাঁদা নেই।

সেদিন বিকেলের একটু আগে অর্থাৎ দুপুর শেষ হবার পূর্ব্বেই আড্ডা দেবার সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম, 'বড়দা'—

'এসো', ভেতর থেকে সাড়া এল।

ভেতরে গিয়ে দেখি দাদা একা তাঁর তক্তাপোষে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন. পাখাটা ঘুরছে পুরো জোরে, আর তারই হাওয়ায় খবরের কাগজের পাতাগুলো এধার ওধার উড়ে বেড়াচ্ছে।

যৌজ করে চেয়ারে বসে দাদাকে বল্লুম, 'কি দাদা, একা একা শুয়ে কি ভাবছেন'? কারণ দাদা হচ্চেন সৌখীন চিন্তাবিলাসী, অবসর পেলেই অভিনব চিন্তায় তলিয়ে থাকেন।

দাদা বল্লেন, 'ভাবছি এই যে, সেকালের পণ্ডিতরা কত বুদ্ধি করেই না শেষ-কথা বলে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, তেজীয়সাং ন দোষায়, অর্থাৎ সমাজপরিচালনের ও জীবনধারণের যাবতীয় বিধি-নিষেধ দিয়ে শেষে বল্লেন, এইগুলি সাধারণ লোকের পক্ষে দোষ, কিন্তু তেজী বা শক্তিশালীর পক্ষে কোনটাই দোষের নয়। অর্থাৎ, হাতে ক্ষমতা থাকলে তুমি যা করবে তাই মানিয়ে যাবে।

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, 'দাদা, এই সব পুরাণো শাস্ত্রের কথা আজকেই বা হঠাৎ উঠছে কেন'?

"উঠবে না? দেখছো না পৃথিবীজুড়ে কি সব ব্যাপার চল্‌ছে। এতকাল ধরে আমরা সবাই জানতুম যে, দোষীর বিচারে বিচারক যা সাব্যস্ত করবেন, দোষীকে তাই মেনে নিতে হবে, কিন্তু U. N.O-র আইনে দেখা গেল, দোষীর বিচার হবে পুরোদমে, কিন্তু শাস্তি নেওয়া না-নেওয়া দোষীর খুসি। সমস্ত বিচারটি veto বা নাকচ করার শেষ ক্ষমতা অপরাধীর হাতেই থাকবে। এই অভূতপূর্ব্ব অধিকার দেওয়ার কারণ কি জান? কারণ, এক্ষেত্রে অপরাধী হচ্চে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, তার হাতে আছে ক্ষমতা, সে তেজী'।

U. N. O-র বিধিগুলি ভাল পড়া ছিল না, কাজেই ভাব্‌ছি কি উত্তর দেব, এমন সময় দাদা বল্লেন, 'দেখ, হাতে ক্ষমতা থাক্‌লে পরের

দেশ প্যালেষ্টাইনকে যার টুক্‌রো করে ভাগ করা চলে, যা ইংরেজরা করছে, ২৯ এ জুলাইয়ের দেশব্যাপী সাকস্যকে 'অনুচিত' বলে গম্ভীরভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়, যা কংগ্রেস করলে, ঘরের পয়সায় মাল কিনে প্রিয়জনদের খাওয়াতে গেলে অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনে হাজতবাস করতে হয়, যা বাংলাদেশে রোজ তারিখেই হচ্ছে, কাজেই সবগুলো একসঙ্গে করে এককথায় তেজীয়সাং ন দোষায় ছাড়া আর কি বল্‌বো বল' ?

কিছু বল্‌তে হবে, তাই বল্‌লুম, দাদা, তেজীয়সাং ন দোষায় আইনটা। কিন্তু সেকালের আমোলে যত মানা হতো একালের দিনে তত নয়, তখনকার দিনে রাজা যা-ইচ্ছে তাই করতেন, এখনকার দিনে তা নয়, আইন কানুন মেনে সকলকেই চলতে হয়, এমন কি Constitutional Law পর্য্যন্ত তৈরি হয়ে রয়েছে। রাজশক্তিও বে-আইনী কোন কাজ করতে পারে না।'

উত্তেজিত হয়ে দাদা বল্লেন, 'তার মানে লোক ঠকানো। সেকালের রাজারা দরকার ও খুসি মত কাজ করতেন, একালের রাজারা সেই-গুলোই স্বহস্তে আইন তৈরী করে নিয়ে তার পরে করে থাকেন। অর্থাৎ কি না ঘুরিয়ে নাক দেখানো। Whereas it is expedient বলে আইনের প্রথম অংশে অনেক ভণিতা করে একালের রাজারা প্রথম ধারা এমন করে তৈরী করেন যার মর্ম্মার্থ হয়, 'আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব', পরের ধারায় তিনিই বলেন, 'আমার এইরূপ ইচ্ছা হইতেছে', এবং তৃতীয় ধারায় তিনি তখন বলেন 'অতএব আইনসঙ্গত-ভাবে আমি ইহাই করিতেছি।' এই ত আইনের ব্যবস্থা, আর তার প্রয়োগ। ও কথা আর বলে দরকার নেই।'

তর্কটা যেন ক্রমেই চোথাল হয়ে ওঠবার মত হচ্ছে, অথচ আমি একে প্রাণপণে এড়িয়ে যেতেই যাই। ভয় হয়, কোন কিছু বলতে গেলেই তর্কটা ফের বেড়ে উঠ্‌বে, অতএব চুপ করেই রইলুম।

দাদা একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বল্লেন, 'দেখ, তেজীয়সাং ন দোষায়' এই একটি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন আইন নেই। ধনী, মানী এবং সংঘবদ্ধরা যা করে, ধনী, মানী ও সংঘবদ্ধদের সমাজ তারই তারিফ করে। আবার অনেকে যা করে, বাকীকে সেটাই যাব্‌ড়ে গিয়ে বা চাপে পড়ে গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। সাধারণের মনের স্বাধীন চিন্তাধারা পর্য্যন্ত জনসাধারণের চাপে চাপা পড়ে ঘুলিয়ে যায়। তবে শোন একটা মজার ঘটনা। এই হাওড়ার পুল যখন নতুন তৈরী হয় এবং তখনও ঠিক মত ব্যবহার হতে আরম্ভ হয় নি, সেই সময় একদিন একা একা বেড়াতে গেছি, দেখি পোলের ওপোর গোটাকতক হিন্দুস্থানী বাচ্ছা, কেউ একেবারে উলঙ্গ, কারুর বা একটা ছেঁড়া ময়লা প্যান্ট পরা, সব একসঙ্গে ফুর্ত্তি করে লাফাচ্ছে। দুটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার সামনে সামনে হাঁটছিলেন। তাঁরা ভীষণভাবে ধমক দিয়ে ছেলেগুলোকে পথ থেকে সরালেন, এবং ওরি মধ্যে যিনি একটু প্রাচীন তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন, কি অসভ্য বাঁদর ছেলে সব, শুয়োরের পালের মতন একসঙ্গে একপাড়ি জুটে এমন কাণ্ড করছে যে দেখলে ঘেন্না হয়। কথাগুলো শুনলুম, কোন মন্তব্য না দিয়ে নীরবে তাদের পেছন পেছন খানিক গিয়ে দেখা গেল কতকগুলো সাদা চামড়ার বাচ্ছা, সাহেব বা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ছেলেমেয়ে হবে, তারা একসঙ্গে দল পাকিয়ে যত চেঁচাচ্ছে তত লাফাচ্ছে, দুজন ত লাফাতে লাফাতে আমার সামনের সেই প্রবীণ লোকটির গায়ে এসে পড়লো। ভদ্রলোক খানিক দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন এবং তার পরেই বল্লেন, দেখেছ, ছেলেগুলি কি স্মার্ট, আর কত এদের unity, সব সময় দলবদ্ধ হয়েই এরা খেলাধুলা করে। সত্যি, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেদিন বুঝলুম Smartness আর অসভ্যতায় পার্থক্য। ধনী ও ক্ষমতাশালীর ছেলেরা দল পাকালে হয় unity, গরীব ও অশিক্ষিতের ছেলেরা একত্র হলে হয় শূয়োরের পাল'।

কোন কিছু উত্তর দেবার পূর্ব্বে দাদা বল্লেন, 'এরকম মনোবৃত্তি কত বল্‌বো। এরকম জিনিষের কি সংখ্যা করা যায়। আমাদের দেশীমতে চালাকী বা গোঁজামিলকে আমরা কত ঘেন্না করি। বিবেকানন্দের কথার কোটেশান দিয়ে বলি, চালাকীর দ্বারা কোন মহৎকার্য্য হয় না, অথচ ইংরিজিমতে tactful কথাটা আমরা কত তারিফ করে বলি; অমুক ম্যাজিষ্ট্রেট, অমুক গভর্ণর কত tactfully manage করেছে। অর্থাৎ সামান্য লোক চালাকী কল্লে তার হয় ধাপ্পাবাজি, বড় লোক চালাকী কল্লে সেটা হয় tactfully manage করা।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। বল্লুম দাদা, 'আমাদের পাড়ার ঐ পচা বাড়ীর একতোলায় এক ভাড়াটে বউ তার স্বামীর অসুখের সময় স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিল বলে বাড়ীওয়ালা গিন্নী তাকে অসভ্য নির্লজ্জ আরও কত কি সব বলে নিন্দে কর্‌লে, আর সেই বাড়ী-ওয়ালারই মেয়ে সন্ধ্যের পর তার পুরুষ-বন্ধুর মোটরে সিনেমায় যায়, তাতে সবাই বলে মেয়েটি শিক্ষিত, ফরোয়ার্ড'।

দাদা বল্‌লেন, 'তা ত বটেই, ধনী বাড়ীওয়ালার মেয়ে হয়ে ঐ বউটি যদি জন্মাত তাহলে সেও হোত forward, কারণ ওঁকমের হাঁকুপাকুটা 'তেজীয়সাং' ধারার মধ্যে পড়ে না। আরে অত কথার দরকার কি, আমাদের প্রোফেসার সেন সর্ব্বদা যে সমস্ত খিস্তি করেন, সেগুলো আমরা Humour বলে উপভোগ করি, আর বাড়ীর সামনের পানওয়ালা তার একাংশও উচ্চারণ করলে সেটা হয় অশ্লীল, কানে আঙুল দেওয়ার মত, রেগে গিয়ে সবাই আমরা বলি বেটা ছোটলোক, পাড়া থেকে মেরে তাড়াও ইত্যাদি। একটু থেমে দাদা বল্লেন, ইংরাজী ও বাংলা ভাষাতেই এরকম উল্টোভাব যেন লেগে রয়েছে। জীবন উকীলের কথায় লোকে আড়ালে বলে ঘুঘু, ওর উকিলী বুদ্ধির প্যাঁচে পড়লে আর কি রক্ষে আছে,—অথচ তার সামনে বলে আপনি shrewd man, আপনার legal brain, আপনার সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্য আছে কার?'

একটু ভেবে দাদা বল্লেন এরকম কত বল্‌বো, বাংলায় যাকে বলছি বেটার চাল নেই চুলো নেই হতভাগা উড়নচড়ে লোক, আমার কমিউনিষ্ট, (ভাল বাংলায় সাম্যবাদী) বন্ধুরা তাকেই বল্‌ছেন proletariat। কমিউনিষ্ট কবিরা আবার সেই সর্ব্বহারাদের নিয়ে হাজার হাজার কেতাবও বানিয়ে

ফেলেছেন। এমনি ভাবে বাংলা ভাষায় যাদের ছোটলোক বলে ঘেন্না করা হোত', তারাই ইংরাজী আওতায় হলেন scheduled caste। দলাদলির মধ্যে যারা মুষ্টিমেয় তারা চিরকালই কোণঠাসা হয়ে ভারী দলের তাঁবেদারী করতো, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় মুষ্টিমেয়রা হলেন minority। রাজশক্তির সাহায্যে সেই সব ভাগ্যবান minority-র দাপটে majorityও চুপ্‌সে কেঁচো হয়ে যায়,—কাবুলিদের ঐ কচি মেয়েটা যেমন করে ওর দাড়ী গোঁফওয়ালা সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বাপকে নাকানি চোবানি খাইয়ে দেয়'। একটু থেমে দাদা বল্লেন, 'কত বল্‌বো, বাংলায় যে কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়, এমন ধারা দারুণ অশ্লীল শব্দের ইংরেজীগুলো কিন্তু গুরুজনদের সামনেও অনায়াসে উচ্চারণ করে তারই সম্বন্ধে কত গবেষণা চলে।'

বুঝ্‌লুম আলোচনাটা বেশ হাল্‌কা হয়ে এসেছে। মনে মনে হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলুম। খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করে দাদা বল্লেন, 'এই দেখ না কেন, আর একটা মজা। বাঙালী কেরাণী বিদেশে গিয়ে দেশের জন্য আন্‌চান করলে বড়সাহেব ধমক দেন Homesick বলে, বড়বাবুও সেই সুরে সুর মিলিয়ে ঘরমুখো, কুনো ইত্যাদি অনেক কথাই বলে থাকেন, অথচ প্রবাসী আমেরিকান সৈনিকরা দেশে ফেরবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করলে তারা হোল Home Loving Americans। সেটা হোল তাদের গুণ, তাতে উপহাসের কিছুই নেই। কেন? কারণ তারা হচ্চে তারা, যাদের হাতে আছে ক্ষমতা'।

বললুম, 'দাদা বিলেতে শুনেছি হোটেলে ১৩ নম্বর ঘর না কি থাকে না, ঐ সংখ্যাটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে ওরা নম্বর দেয় ১২, তারপর ১২এ, তার পর ১৪'।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দাদা বল্লেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ও সব অনেক আছে, খাওয়ার টেবিলে বসে নুনদানী থেকে নুন ঢালতে গিয়ে নুন যদি টেবিলে পড়ে যায় তাহলেই সর্ব্বনাশ, প্রেয়ার করতে হবে। একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে তিনজনে কখনই সিগারেট ধরাবে না, ধরালে তৃতীয় ব্যক্তির আয়ুক্ষয় ইত্যাদি। এ সমস্ত তাদের মতে নির্দ্দোষ ব্যবস্থা social custom,—আর আমাদের যা কিছু সমস্তই Prejudice, যার বাংলা পরিভাষা হয়েছে কুসংস্কার, শুধু সংস্কার বলেই আমরা ক্ষান্ত হই নি, জোর গলায় তাকে আমরা কুসংস্কার বল্‌ছি। দেশী লোক গলায় মাদুলী পরলে হয় উপহাসের বস্তু, অথচ সাহেবরা যখন Talisman ধারণ করেন তখন আমরাই তার কত তারিফ করি। সারা লড়াইটায় বাড়ী ঘর থেকে আরম্ভ করে সর্ব্বত্র কত যে v-এর মাদুলী লটকালে তা ত দেখেছ, কিন্তু এ-তে উপহাসের কিছুই নেই। এসবের মূলে হচ্ছে ঐ এক কথা, ক্ষমতাশালী যা করে তাই ভালো। চলিত বাংলায় একটা কথা আছে জানো, 'রাজার ঝি বলে প্যারী যা করে তাই শোভা পায়, তোমার আমার মেয়ের পক্ষে যেটা অমার্জ্জনীয়, রাজকন্যার পক্ষে সেটাই নির্দ্দোষ এবং অত্যন্ত শোভনীয়'।

বল্লুম, দাদা, আমার মনে হয় ক্ষমতাশালীর যেমন জোর, তেমনি অহমিকার জোরও কম নয়। ধরুন খবরের কাগজে দুটো কথা আমরা হরদম পাচ্ছি, Progressive ও Reactionary, বাংলায় প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল। এ দুটোর মানে আমি কিছুতেই খুঁজে পাই না। অভিধান থেকেও এর অর্থ ঠিক মেলে না। কারণ একই কাজ, একদল করলে সেটা হয় প্রগতিশীল, অর্থাৎ কিনা progressive, for the advancement of the country ইত্যাদি। অথচ ঠিক সেই কাজ অন্য দল করলে এরাই তার বিরুদ্ধে বলে Reactionary,—প্রতিক্রিয়াশীল দলের জন্যে দেশ ডুবে গেল ইত্যাদি। এ থেকে আমি মানে করেছি এই যে, আমি বা আমরা যা করি তা progressive বা প্রগতিশীল এবং ও বা ওরা যা করে তা Reactionary বা প্রতিক্রিয়াশীল'।

দাদা বল্লেন, 'এখানে তুমি অহমিকা বল্‌ছো ব্যক্তির দিক দিয়ে, দলের দিক দিয়ে বল্লে, এটাই গণশক্তি। এই যে তেজীয়সাং বা ক্ষমতাশালী যাকে বলা হচ্চে এ ক্ষমতাশালী কে? যে নিজেকে ক্ষমতাশালী বলে ভাবতে শিখেছে এবং ক্ষমতাটাকে সকলের ওপোর প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে সেই। এটা হোল কাল্পনিক অহমিকার বাস্তব প্রকাশ। একটা মজা দেখ, গোঁয়ারতুমির তুচ্ছ রকমফের করলে সেইটাই কালক্রমে বলিষ্ঠ মন বলে পরিচিত হয়। বর্ত্তমান যুগটা এমনই হয়েছে যে, বিনয়ী লোককে সবাই আমরা মুখচোরা বলে ঘেন্না কর্ত্তে শিখেছি, আর মহৎ হচ্চে কে, যে নিজের ঢাক নিজের পিঠে তুলে নিজেই খুব জোরে বাজাতে পারে। ক্রিয়াকর্ম্ম উৎসব বাড়ীতে 'খাটিয়ে' বলে সেই নাম নেয়, যে সব থেকে বেশী ছুটোছুটি করে, খুব চেঁচায়, অকারণে বহু জিনিষ নষ্ট করে, অন্যকে কড়া কড়া কথা বলে এবং দরকারের সময়ে গা'আড়াল দিয়ে সরে পড়ে। Busy with no business যতক্ষণ না হতে পারবে ততক্ষণ খাটিয়ে, কেজো বা indispensable বলে পরিচিত হবার কোন সম্ভাবনাই তোমার নেই।

দাদার এই উত্তেজিত বক্তৃতায় বাধা পড়্‌লো, বাইরে থেকে ডাক এলো, 'দাদা আছেন নাকি'?

দাদা বল্লেন, 'এই যে প্রোফেসার, এসো'। বল্‌তে বল্‌তেই প্রোফেসার সেন এসে ঘরে ঢুকলো। চেয়ার টেনে বসবার আগেই বল্লেন, 'বড়দা, এই যে আমাদের স্মৃতি বা দেশী আইনে বলেছে নারী জাতিকে 'ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে', এটা কি এখনকার দিনেও বলা উচিত'।

আমার দিকে চেয়ে বড়দা বল্লেন, 'ওই শোনো, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে ওটার চলিত বাংলায় অনুবাদ কর দেখি, কি হয়'।

বল্লুম, 'দাদা ওসব সাহিত্য বা ব্যাকরণের আলোচনা থাক। তাসটা নামাই, আসুন তিনজনে কাট্‌ থ্রোটই আরম্ভ করি।

দাদা বল্লেন, 'তা করতে পারো, কিন্তু ইংরাজী কাট্‌ থ্রোটের বাংলা করে বোলো না যেন, কারণ রাস্তা থেকে সেটা কেউ শুন্‌তে পেলে শেষকালে হয়ত বা সি-আই-ডিও লাগতে পারে'।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহেন্দ্রের ঘরের বাহিরে প্রশস্ত বারান্দা। একপাশে একটি হালকা টেব্‌ল্ ও খান দুই বেতের চেয়ার। একটি চেয়ারে জয়ন্ত উপবিষ্ট, অপর চেয়ারের সম্মুখে তাহার মাসতুতো ভগ্নী কনক, এইমাত্র চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নেপথ্য হইতে রাধার গানের শব্দ আসিতেছে।

কনক। (বিরক্ত কণ্ঠে) নাঃ, আমাদের নিজেদের দোষেই আমাদের জাতের বদনাম ঘুচলো না। মিটিঙ্-এ যাবে বই সিনেমাতে যাচ্ছে না তো। তবু এই অনুরাধাটা কী দেরী করছে দেখ দিকি কাপড় ছাড়তে।

জয়ন্ত। তুমিই দেখ। তোমার বন্ধু।

কনক। আর বসে থাকতে পারছি না আমি। ছোড়দা, ভাই, তুমি একটি কাজ করবে?

জয়ন্ত। কী শুনি?

কনক। শুনছি রেবা মিত্তিরের দল ঘোঁট পাকাচ্ছে, মিটিঙ পণ্ড করবার চেষ্টা করতে পারে। আমি একবার রেবার বাড়ি হয়ে যাই। তুমি অনুকে নিয়ে এসে আমাকে তুলে নিও।

জয়ন্ত। আমি কি লেডিস ম্যান নাকি? আমার আর কাজ নেই বুঝি? আমার নিজের স্পীচের ঝঞ্চাট রয়েছে, তার ওপর তোমার বন্ধুকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে? বিপদ মন্দ নয়!

কনক। কী করব? এই সর্তে যে ওর দিদি ওর বাবার অনুমতি দিয়েছে। আমাকে এসে নিয়ে যেতে হবে। তবে আমার প্রক্সিতে তুমি এলেও আপত্তি করবে না। কলেজ ছাড়া আর কোথাও একলা যাওয়া আসা ওর নেই জানো তো? আমি এগোই, তুমি ওকে নিয়ে এস, বাইরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

জয়ন্ত। তা যাও! জ্বালাতন আর কী!

কনক। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) হ্যাঁ, জ্বালাতন বই কি। মনে মনে এত খুশী হয়েছ যে তোমার জ্বালাতন হওয়ার ভাবটা মোটেই ফুটছে না।

জয়ন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। কনক হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে অনুরাধা প্রবেশ করিল। জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

জয়ন্ত। এত দেরী করলে?

অনুরাধা। আপনি একলা বসে আছেন জয়ন্তবাবু? কণি কোথায়?

জয়ন্ত। তোমার দেরি হচ্ছে দেখে ও একটু এগিয়ে গেছে। চল।

অনুরাধা। কী করব। বাবার কাছে একটি ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর জন্যে চা করে দিতে হল।

বলিতে বলিতে জয়ন্তর পশ্চাতে অনুরাধা অগ্রসর হইতেছিল, কয়েক পদ গিয়াই সে থামিয়া গেল।

জয়ন্ত। আবার দাঁড়ালে কেন?

অনুরাধা। আবার মানে? কবার দাঁড়িয়েছি?

জয়ন্ত। যবারই দাঁড়াও। কিন্তু এদিকে পাঁচটা বেজে গেছে, সেটা খেয়াল করেছ?

অনুরাধা। করেছি। কিন্তু এদিকে দিদি গান গাইছে, সেই গানটা। সেটা খেয়াল করেছেন?

জয়ন্ত। বেশ। তবে গানই শোনো। তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে শোনবার দরকার কী? ভেতরে গিয়ে ধীরে সুস্থে বসে পরমানন্দে—

অনুরাধা। আঃ, জয়ন্তবাবু, আপনি এত বকতেও পারেন। বাবা, বাবাঃ! এত বকলে কি গান শোনা যায়?

জয়ন্ত। আমি তো গান শুনছি না।

অনুরাধা। আমি শুনছি তো।

জয়ন্ত। তাই তো বলছি। আমার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাওয়া কেন? তার চেয়ে আমি বিদেয় হই, তুমি নিরাপদে, নিরুপদ্রবে—

অনুরাধা। আবার কথা! উঃ, কী বক্তৃতা দিতেই শিখেছেন। নাঃ, চলুন, গান মাথায় থাক, আপনার বক্তৃতাই শুনিগে চলুন।

জয়ন্ত। থাক। অনিচ্ছায় তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? মিথ্যে কষ্ট দেওয়া।

অনুরাধা। অমনি রাগ হয়ে গেল? আপনাদের রাগের কাছে পারবার জো নেই।

জয়ন্ত। ঠিকই বলেছ। অনুরাগের কাছে পার নেই।

অনুরাধা। ওটা আবার কী রকম কথা হল?

জয়ন্ত। বলছি, সত্যি কথাই বলেছ অনু। রাগের কাছে তুমি পারবে না।

অনুরাধা। কখখনো তা বলেন নি আপনি।

জয়ন্ত। তবে কী বলেছি?

অনুরাধা। আপনি বল্লেন—বল্লেন—সে আমার বয়ে গেছে বলতে।

জয়ন্ত। বল না অনুরাধা?

অনুরাধা। আপনি তাহলে যাবেন না তো?

জয়ন্ত। আর গিয়ে কী হবে? তার চেয়ে গান শোনা ভাল।

অনুরাধা। তা নেহাৎ মন্দ বলেন নি। আমার জামাইবাবু বলতেন

—খড়ের গদা নিয়ে আস্ফালন করে বক রাক্ষসকে মারা যায় না। বাড়ীতে আগুন লাগলে দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলের জোরে আগুন নিবানো যায় না। যায় কি? (হঠাৎ হাসিয়া) ঐ দেখুন, আপনার ছোঁয়াচ লেগে আমি সুদ্ধু বক্তা হয়ে উঠ্‌লুম। ঐ জন্তেই বলে-সঙ্গদোষ। চলুন। আর দেরি করলে আপনাকে 'ভোট্ অফ থ্যাঙ্কস্'এর বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে হবে।

জয়ন্ত। দাঁড়াও অনুরাধা।

অনুরাধা। এই দেখুন। আমার দোষ নেই, এবার আপনি দেরি করে দিচ্ছেন।

জয়ন্ত। হ্যাঁ দিচ্ছি। তুমি বড় ভয়ানক কথা বলেছ। তোমার কথার অর্থ কী তা জান?

অনুরাধা। (কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত) তা বোধ হয় জানি। এমন কিছু ল্যাটিন, সংস্কৃত বা গ্রীক কথা আমি বলিনি যে অর্থ খুঁজতে শব্দ-কল্পদ্রুম ওলটাতে হবে। কিন্তু আপনি আসবেন, না কী?

জয়ন্ত। না, কেন মিথ্যে যাওয়া। তোমার যখন আমাদের সভার ওপর শ্রদ্ধাই নেই, আমাদের আন্দোলনকে তুমি বিশ্বাসই কর না—

অনুরাধা। এই সভা, আন্দোলনের ওপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস কি আপনারই আছে জয়ন্তবাবু? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনাদের বক্তৃতা শুনে ইংরেজরা অনুতপ্ত হয়ে দেশে যাবার টিকিট কাটবে কোনদিন? জামাইবাবু একটি কথা বলতেন—বাড়ীসুদ্ধু লোক প্রাণপণে চীৎকার করলেই গরুর গা থেকে জোঁক ছেড়ে যাবে না। তাকে গলাটিপে টেনে ছাড়াতে হবে। তার মুখে এক খামচা নুন ফেলে দিতে হবে। বলতেন, গরুর জোঁক তবু পেট ভরলে একসময় আপনি ছাড়ে। কিন্তু দেশের জোঁক, যার ভরবার পেট নয়, তাকে ছাড়াবেন কী করে? গালাগালি দিয়ে? না, রক্তশোষণ অন্যায় এই নীতিকথা শুনিয়ে?

জয়ন্ত। জোঁকের উপমা, উপমা হিসেবে শুনতে মন্দ লাগল না। কিন্তু মানুষ জোঁকই নয়, আর উপমাও যুক্তি নয়, বা তুমি জানো। সুতরাং এর উত্তর তোমার জামাইবাবু ফিরে এলেই দেব।

অনুরাধা। কবে যে জামাইবাবু ফিরে আসবেন! দিদির মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনার সঙ্গে তো এত লোকের আলাপ, জামাইবাবুর খবর একটু জোগাড় করতে পারেন না?

জয়ন্ত। চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদিও ওঁদের খবর বার করা সহজ নয়। একটা কথা আজ জেনে নিশ্চিন্ত হলুম অনুরাধা। ভালোই হ'ল বৃথা দুরাশায় আর কষ্ট পেতে হবে না। যে জিনিসের দুরাশা আমি করেছিলুম, মূলে শ্রদ্ধা না থাকলে তা দাঁড়াতে পারে না। (অনুরাধা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল) যাত্রারদলের সেনাপতি বলে যাকে জেনেছ, তুলোর গদা নিয়ে যে আস্ফালন করে, তাকে কখনও শ্রদ্ধা করা যায় না।

অনুরাধা। কেন যে আপনি এমন ভুল বুঝলেন তা [illegible] না। আপনার বাবা একজন দেশমান্য নেতা, আপনিও আমাদের ছাত্র-সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ। আপনাকে যাত্রারদলের সেনাপতি মনে করে অশ্রদ্ধা করব, এমনই কি বোকা আমি?

অভিমানে তাহার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল।

অনুরাধা। আপনাদের মতন বেশি-পড়াশোনাও করেনি, অত চিন্তাশক্তিও আমার নেই। কিন্তু জামাইবাবুর মুখে শুনতাম—

জয়ন্ত। আবার জামাইবাবু? দেখ অনুরাধা, হিরো ওয়ারশিপ ভালো, কিন্তু ঈর্ষাও সুখের ব্যাধি নয়।

অনুরাধা। কার ঈর্ষা?

জয়ন্ত। সে তুমি বুঝবে না। বল, কী তোমার জামাইবাবুর মুখে শুনেছ?

অনুরাধা। তিনি বলতেন—কোন পথে গেলে দেশ স্বাধীন হবে জানি না। কিন্তু হবে একদিন তাতে তো সন্দেহ নেই। সেই স্বাধীন দিনে কি কেবল তাঁদেরই স্মরণ করবে যাঁরা লতাপাতায় সাজানো মঞ্চের ওপর জয়ধ্বনির মধ্যে ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন? আর যাঁরা আর এক নিঃসঙ্গ মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিঃশঙ্কে দড়ির মালা গলায় দিলেন—

জয়ন্ত। দেশ তাঁদের কোনদিন ভোলেনি, স্বাধীন দেশও ভুলবে না। কিন্তু মত আর পথ তো সকলের এক নয় অনুরাধা।

অনুরাধা। তা জানি।

জয়ন্ত। যদি নিশ্চয় করে জানতুম যে তোমার জামাইবাবুদের পথটাই অব্যর্থ—(হঠাৎ আত্মসংবরণ করিয়া চুপ করিয়া গেল)। কে জানে! যাক্। অন্ততঃ তোমার জামাইবাবুর খবরটার জন্যে ওপথের লোকের সঙ্গে এবার ভাব করবার চেষ্টা করব।

অনুরাধা জল-ভরা কৃতজ্ঞচোখে তাহার পানে চাহিল।

নেপথ্যে কয়েক জনের কণ্ঠ শোনা গেল। পরক্ষণে ব্যস্তভাবে কনক প্রবেশ করিল।

সে একবার নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া ইহাদের দুইজনের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। ইহারা অপ্রস্তুত হইয়া জবাব-দিহির সুরে বলিল—

জয়ন্ত। এত দেরি করে এই মেয়েগুলো—

অনুরাধা। কী করব, বাবার জন্যে চা করতে হল যে।

কনক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উভয়ের ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং বিনাবাক্যে অনুরাধার কান ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। নীরবে জয়ন্ত অনুসরণ করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

ছোট ঘর। ভিতরে আসবাবপত্রের অতিশয় অভাব। মাত্র এক খানি ছবি একটি দেয়ালে, ছবিতে একটি ফুলের মালা। এক কোণে দড়ির আলনায় খান দুই তিন কাপড়। মেঝের একধারে একটি জলচৌকির উপর একটি পিতলের পিলসুজ ও তাহার উপর মাটির প্রদীপ। প্রায় সন্ধ্যাকাল। বিক্রম ও তাহার পিছনে রাধা প্রবেশ করিল।

বিক্রম। বাঃ, এ ঘরটিতো বড় চমৎকার। ছোট্ট ঘরটি, যেন ঠাকুর ঘর। ছাদের ওপর নিরালায়, এ ঘরটি কার?

রাধার জবাব না পাইয়া সে পিছনে ফিরিয়া রাধার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

কী? মিসেস সেন, এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে হঠাৎ? কই, ঘরের সুইচটা কোন দিকে বলুন তো?

রাধা। এ ঘরে ইলেক্ট্রিক আলো নেই।

বিক্রম। কেন? ঘরের অপরাধ?

রাধা। এমনি, দরকার হয় না। তবে ইলেক্ট্রিক না থাকলেও আলো আছে। দাঁড়ান, জ্বেলে দিচ্ছি।

সে আগাইয়া গিয়া প্রদীপ জ্বালিল।

বিক্রম। (বিস্মিত হইয়া) মাটির পিদ্দীম? কলকাতার সহরে দোতলার ঘরে মাটির পিদ্দীম! সত্যি সত্যিই ঠাকুরঘর বানিয়েছেন নাকি? আরে বাঃ, ঐ তো ফুলের মালা দেওয়া রাধাকেষ্টর ছবিও রয়েছে, কী আশ্চর্য্য! আপনাদের আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েদের আবার এসবও আছে দেখছি।

হাসিতে হাসিতে বিক্রম গিয়া প্রদীপ তুলিয়া ছবিটি নিরীক্ষণ করিল। নিমেষে তাহার হাসি নিবিয়া গেল। প্রদীপ নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া ম্লানমুখে কুণ্ঠার সহিত বলিল—

বিক্রম। আমি বুঝতে পারি নি, আমার মাপ করবেন।

রাধা। মাপ করবার কিছুই তো নেই। ওটা আমাদের বিয়ের সময়ের তোলা ছবি, তাকে আপনি রাধাকৃষ্ণের ছবি মনে করেছিলেন, সে তো গৌরবেরই কথা, নয় কি?

রাধা মৃদু হাসিল। বিক্রম হাসিমুখ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি ফুটিল না, মুখখানা বিকৃত হইল মাত্র।

রাধা। সে যাক। এখন আসল কথাটা বলি, কেন আপনাকে বাড়ী দেখাবার নাম করে ডেকে এনেছি ওপরে। বাড়ী দেখাবার কিছু নেই, ওটা সত্যি কারণ নয়। (রাধা চুপ করিল, বিক্রম বিস্মিত প্রত্যাশা লইয়া চাহিয়া রহিল।) আসল কথা—(কী বলিতে গিয়া হঠাৎ কথা বদলাইয়া বলিল) আচ্ছা, আমার বাবাকে কী রকম দেখলেন বলতে পারেন?

বিক্রম। চমৎকার লোক। ওয়াণ্ডারফুল ম্যান। অমন লোক আমি জীবনে দেখিনি।

রাধা। না, আমি সেকথা বলছি না। আমি ওঁর শরীরের কথা, স্বাস্থ্যের কথা বলছি। আপনার ডাক্তারী চোখে বাবাকে দেখে কী মনে হল আপনার?

বিক্রম। শরীর ওঁর খুব ভাল বলে অবশ্য মনে হ'ল না। তবে মন্দই বা কী?

রাধা। আপনি হাতে রেখে বলছেন বীরুবাবু। কিন্তু তার দরকার নেই। আমার মনে হয়, বাবা আর বেশিদিন পৃথিবীতে থেকে কষ্ট পাবেন না।

বিক্রম। না, না, মিসেস সেন, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। যদিও আপনার বাবাকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তবু ওঁর শরীরের গঠন দেখলেই বোঝা যায়, আগে ওঁর স্বাস্থ্য কী রকম ছিল। আর এ শরীর যে ওঁর ভাঙ্গা শরীর, তা একবার চোখ পড়লেই ধরা পড়ে। কিন্তু তাই বলে ওঁর জন্যে এত বেশী চিন্তিত হবার কোন কারণই নেই।

রাধা। চিন্তিত ওঁর জন্যে হইনি, চিন্তিত হচ্ছি নিজের জন্যে। কথাটা বড় স্বার্থপরের মত শোনাল, না? বাবার আমি-অন্ত প্রাণ। বরাবরই বাবার স্নেহ আমি বেশি করে পেয়ে এসেছি। এখন আবার আমার এই অবস্থার জন্যে বাবার স্নেহ বলুন, আদর বলুন, বোল আনার ওপর যদি কিছু থাকে, তা আমি ভোগ করে আসছি। কিন্তু সেই আমার জন্যে বাবাকে যে কষ্ট পেতে হচ্ছে দিনের পর দিন, তা সয়ে উনি আর কত দিন বাঁচবেন। (তাহার কণ্ঠ ভারি হইয়া আসিল।) জানি না, বাবা চলে গেলে আমার কী দশা হবে, কিন্তু তবু ওঁর তো দুঃখের শান্তি হবে।

বিক্রম। কী সব পাগলের মত বকছেন মিসেস্ সেন। আমি বলছি আপনার বাবার এমন কিছুই হয়নি, যার জন্যে···আর তাছাড়া আপনার নিজের সম্বন্ধেই বা ভাবনার কী আছে তা তো দেখি না। আপনার স্বামী, মানে অভিলাষের জন্যে অবশ্য—কিন্তু তাই বা কতকাল! চিরদিন কিছু পালিয়ে বেড়াবে না। আমার বিশ্বাস ও যদি একবার—তবে মুস্কিল হচ্ছে ওটা বড় গোঁয়ার—

রাধা। তিনি আপনার বন্ধু ছিলেন।

বিক্রম। বন্ধু তা কী হয়েছে? তা বলে এই সব ননসেন্স রাবিশ—না, না, এ আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। এ রকম ইডিয়সি—

রাধা। আপনারা কত বড় বন্ধু ছিলেন, তা আমি জানি। মিছি-মিছি আমার জন্যে তাঁকে গালাগাল দেবেন না বীরুবাবু। (বিক্রম বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল) আমি জানি আপনি ইচ্ছে করে গাল দিচ্ছেন না, সত্যি করেও দিচ্ছেন না। কিন্তু এই বা কতদিন চালাবেন?

বিক্রম। (সবিস্ময়ে) কতদিন চালাব! কী কত দিন চালাব মিসেস সেন?

রাধা। আপনাদের দুজনের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল তা আমার জানতে বাকী নেই। আমাকে তিনি কতদিন বলেছেন, আপনাদের শুধু দেহটাই আলাদা ছিল। সেই জন্যেই বলছি বীরুবাবু, বাবা যে কষ্ট পাচ্ছেন আপনি আবার সেই কষ্ট ঘাড় পেতে নিচ্ছেন কেন? বাবাকে খুলে বলতে পারি না, কিন্তু আপনাকে বলছি—আমি জানি।

বিক্রম। আ—আপনি জানেন? কী জানেন?

রাধা। (এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া) জানি,—আমি জানি—আমি বিধবা—(দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ক্রন্দনের আবেগ রোধ করিতে চেষ্টা করিল। বিক্রম নীরবে নতমুখে রহিল। ক্ষণকাল পরে—) আপনার চিঠি আসার কদিন পরেই সেটা আমার হাতে পড়ে। অবশ্য বাবা তা জানেন না। তখন তাঁর হার্ট নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে, আশেপাশে চেঁচিয়ে কথা বলা বারণ।

বিক্রম। তাই আমার দুখানা চিঠির জবাব পাইনি।

রাধা। হ্যাঁ, সে চিঠিও আমি দেখেছিলুম, কিন্তু বাবাকে দেখাই নি। কিন্তু এ যাক।...বাবাকে আপনি আগে জানতেন না। আমার বাবার মতো সরল লোক আমি দেখিনি, আবার বাবার মত দুর্বল লোকও পৃথিবীতে অল্পই আছে। তাঁর সরলতার একটা বড় পরিচয় ছিল তাঁর সত্য-নিষ্ঠায়। তিনি নিজে বলতেন ওটা তাঁর দুর্বলতা। কিছুতেই তিনি কথা বানিয়ে বলতে পারতেন না—কিন্তু আপনার বোধ হয় এসব শুনতে ভাল লাগছে না।

বিক্রম। আমার খুব ভাল লাগছে। আপনি বলুন।

রাধা। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

বিক্রম। দাঁড়ানো আমার অভ্যেস আছে মিসেস্ সেন।

রাধা। বাবা বলতেন, যেটা হয়নি সেটা হয়েছে বলতে পারা, যেটা 'হাঁ' সেটা 'না' বলতে পারা, এও তো একরকম ক্ষমতা; এ যে আমি পারি না সেটা অক্ষমতা ছাড়া আর কী? মিথ্যে কথা, অতি নির্দোষ মিথ্যে কথাও তিনি যে মুখ দিয়ে বার করতে পারতেন না; তার জন্যে কী রকম লজ্জিত হতেন, তা আপনি দেখেন নি তাই বিশ্বাস করতে পারবেন না।

বিক্রম। খুব পারব মিসেস সেন, আপনার বাবার যে অসাধারণ মনের পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বিশ্বাস করতে আমার অসুবিধে হবে না।

রাধা। কিন্তু সেই বাবা আমার এই বুড়ো বয়সে আমার জন্যে এই যে অনর্গল মিথ্যে কথা, এই যে অনন্ত ছলনার জীবন যাপন করে চলেছেন,—এই কি চলবে তাঁর জীবন ভোর? এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না বীরুবাবু।

বিক্রম নিরুত্তর রহিল

আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাই বাবার বুকের ভেতর দুটো চিতা হু হু করে জ্বলছে। একটা আমার দুর্ভাগ্যের চিতা, আর একটা তার চেয়ে বড়—অহরহ এই মিথ্যার চিতা। এর ওপর তাঁর সদাই ভয়—কবে বুঝি তাঁর এই মিথ্যার দেয়াল ভেঙ্গে যায়। এ কী নিদারুণ অবস্থা বলুন তো। আমার মত হতভাগী মেয়ে সংসারে অনেক আছে, কিন্তু এই হতভাগী মেয়ের জন্যে বৃদ্ধ বয়সে এমন বেড়া-আগুনের জ্বালা আর কোন বাপকে সইতে হয়েছে শুনেছেন? শুনেছেন বীরুবাবু?

বিক্রম নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে শুনে নাই

রাধা। (অতি ব্যাকুল কণ্ঠে) আপনি তাঁকে রক্ষা করুন বীরুবাবু, আপনি আমাকেও বাঁচান। এমন করে আমি আর পারি না যে—

উদ্গত ক্রন্দন রোধ করিতে রাধা মুখে অঞ্চল পুরিয়া দিল।

বিক্রম। আপনি স্থির হোন মিসেস সেন।

ক্ষণকাল গেল রাধার আত্মসংবরণ করিতে।

রাধা। ঐ বাবা উঠেছেন, চলুন নিচে যাই।

বিক্রম। চলুন। কিন্তু উনি কি আপনাকে ডাকলেন? কই, আমি তো শুনতে পাইনি।

রাধা। না ডাকেন নি এখনও। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেছে ওঁর। আমি বুঝতে পারি। ঘুম ভাঙলেই আমাকে খুঁজবেন ...ঐ ডাকছেন, শুনতে পেয়েছেন? (জানালার কাছে সরিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিল) যাই বাবা।

বিক্রম। হ্যাঁ, মনে হল যেন।

রাধা। যতক্ষণ জেগে থাকেন, আমাকে চোখে চোখে রাখেন। কেন জানেন?

বিক্রম। সে তো আপনি বল্লেন, আপনি-অন্ত প্রাণ, অত্যন্ত ভালবাসেন আপনাকে—

রাধা। না, শুধু সেই জন্যেই নয়। সে তো আগেও বাসতেন। এখন এ ওঁর আমাকে আগলে রাখা।

বিক্রম। হুঁ।

রাধা। আপনি বোঝেন নি। আমার ওপর বাবার বিশ্বাস অনন্ত। সে আগলে রাখা নয়। এ আমাকে আগলে রাখেন সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে। পাছে ওঁর চোখের আড়ালে কোনও ছিদ্র দিয়ে কোন রকমে এই পোড়া-কপালের খবর আমার কানে এসে পৌঁছয়, বুঝেছেন?

বিক্রম। (ঘাড় নাড়িয়া)। পাছে তাঁর তাসের ঘর ভেঙ্গে যায়।

রাধা। তাই আমাকেই বিশ্বসংসারের বাইরে সবার চোখের আড়ালে এইটুকু আশ্রয় গড়ে নিতে হয়েছে। যখন বড্ড অসহ্য হয়, এই সকল সাজ ছাড়তে এইখানে পালিয়ে আসি। এইখানেই আমার নিজের জীবন, আর ওই আমার প্রকৃত বেশ। (আঙুল দিয়া দড়ির উপরকার শাদা থান দেখাইল।)

বিক্রম। ও কাপড় কার?

রাধা। বাবা থান পরেন। তারই দুখানা আমি এনে রেখেছি। বাবার ওপরে ওঠা বারণ। সবাই জানে এখানে আমি পুজোআহ্নিক করি। কিন্তু পুজো আহ্নিক আমার কিছু নেই। খালি ঐটুকু, ঐটুকু মাত্র আমার সম্বল আছে। (ছবিখানি দেখাইল)

বিক্রম কথা কহিতে পারিল না। নিঃশব্দে ছবির পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

রাধা। বীরুবাবু, আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

বিক্রম। কী বলুন?

রাধা। আমাকে কি খুব খুঁজেছিলেন? আমি যে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে এসেছিলুম বীরুবাবু, আমাকে ডেকেছিলেন তিনি?

বিক্রম। (মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিয়া) অন্য কোন কথা ছিল না তার মুখে। দুটোদিন তো মোটে ভুগেছিল—আচ্ছা আমি নিচে যাই। আপনি আসুন।

বিক্রম আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া যেন পলাইয়া গেল। রাধা ধীরে ধীরে প্রদীপটি ছবির নিচে রাখিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া জানু পাতিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। আর তাহার অশ্রু বাধা মানিল না। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে তাহার দুইখানি কাঁধ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষণপরে নেপথ্যে বিক্রমের কণ্ঠ শুনা গেল।

বিক্রম। আপনাকে একটিমাত্র কথা—

বলিতে বলিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দনরতা রাধাকে দেখিয়া বিক্রম নিঃশব্দে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

পূর্ব্বরাগ ও মিলন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন "রতির্ধা সাঙ্গমাৎ পূর্ব্বং"—প্রথম দর্শনে অথবা গুণাদি শ্রবণে যে রতি উৎপন্ন হইয়া নায়ক নায়িকাকে অনুরক্ত করিয়া তুলে, মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই দশা বিশেষের নাম পূর্ব্ব-রাগ। আলঙ্কারিক শ্রীল কবিকর্ণপূর বলেন চিত্তরঞ্জনকারী ধর্ম্মের নাম রতি। এই রতি প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ্দ এবং ভাব নামেও অভিহিতা হয়। এই চিত্তরঞ্জিমাবৃত্তি সংপ্রয়োগ-বিষয়া ও অসংপ্রয়োগ-বিষয়া ভেদে দ্বিবিধা। সংপ্রয়োগ-বিষয়াই প্রধানতঃ রতি নামে পরিচিতা। সংপ্রয়োগ অর্থে স্ত্রীপুরুষ ব্যবহার। সখার পত্নী ও পতির সখীতে যে চিত্তানুরঞ্জন তাহার নাম প্রীতি, সখীর সঙ্গে সখীগণের এবং সখার সঙ্গে সখাগণের অন্তরঙ্গতাই মৈত্রী। এই মৈত্রী অঙ্গ-স্পর্শোচিতা ও প্রীতি মনোবৃত্তিময়ী। চিত্তরঞ্জকতা বিকাররহিত ও নিরবচ্ছিন্ন হইলে সৌহার্দ্দ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। গুরু এবং দেবাদিতে যে রতি তাহাই ভাব। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন —"সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতিগাঢ় হইলে তারে প্রেম-নাম কয়" এই প্রেম ক্রম পরিপাকে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। কবিকর্ণপূর সংপ্রয়োগ-বিষয়া রতির পূর্ব্বরাগ, রাগ, অনুরাগ, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও মহারাগ এইরূপ 'ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন। নির্ব্বিকারচিত্তে প্রথম বিকারের নাম ভাব।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয়ও দর্শন এবং শ্রবণ পূর্ব্বরাগের এই দ্বিবিধ হেতু নিশ্চয় করিয়াছেন! তিনি ইন্দ্রজালে, সাক্ষাতে, স্বপ্নে ও চিত্রপটে দর্শনের কথা বলিয়াছেন। শ্রবণের বিষয়ে বলিতেছেন বন্দী, সখী এবং দূতমুখে শ্রবণ। পদাবলী প্রণেতৃগণের মধ্যে একমাত্র দীন চণ্ডীদাসের পদেই ইন্দ্রজালের উল্লেখ পাওয়া যায়। পদকর্ত্তৃগণের রচনায় শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগে শ্রবণের মধ্যে "বংশীধ্বনি" একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "নাম" শ্রবণ এইরূপ আর একটী বৈশিষ্ট্য। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগে একটী শ্লোকেই শ্রবণ এবং দর্শনের বড় চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

> একস্যশ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
> সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশী কলঃ।
> এষ স্নিগ্ধ ঘন দ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বিক্ষণাৎ
> কষ্টং ধিক পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

এই শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন কবিরাজ গোবিন্দ দাস। কবি লিখিয়াছেন—

> সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
> কুলবতী তিন   পুরুষে ভেল আরতি
> জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥
> পহিলে শুনলুঁ হাম   শ্যাম দুই আখর
> তৈখন মন চুরি কেল।
> না জানিয়ে কো ঐছে   মুরলী আলাপই
> চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
> না জানিয়ে কো ঐছে   পাট দরশায়লি
> নব জলধর জিনি কাঁতি।
> চকিত হইয়া হাম   যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
> তাঁহা তাঁহা রোধিয়ে মাতি॥
> গোবিন্দ দাস কহয়ে   শুন সুন্দরি
> অতএ করহ বিশোয়াস।
> যাকর নাম   মুরলীরব তাকর
> পটে ভেল সো পরকাশা॥

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে গতানুগতিক পথিকের সংখ্যা বড় কম নহে। একই বিষয় লইয়া—পূর্ব্বরাগ, মিলন, রসোদ্গার, মান, আক্ষেপানুরাগ মাথুর একজনের পর আর একজন কবি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় স্বভাবের এই আনন্দ-নন্দনে প্রবেশ করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কত নাম না জানা ফুল, কত নাম না জানা পাখী, কত নামহীন স্বচ্ছন্দ বাহিনী গিরি নির্ঝরিণী, কত সুন্দর তরু তৃণ লতাগুল্ম! গন্ধে গানে রূপে রঙে উৎসবের এক বিচিত্র সমারোহ। আর তাহারই মাঝখানে প্রেম-তন্ময় আনন্দ-চঞ্চল কিশোরী, গোলকের সম্পদ ভূলোকে আসিয়া লীলায় মাতিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির রচিত পদে যেখানে সেখানে মহাকবির উপযুক্ত দুই একটী পংক্তি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। একটী অতি সাধারণ পদ তুলিয়া দিলাম, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়া বলিতেছেন—

> সজনি অপরূপ পেখলু বালা।
> হিমকর মদন   মিলিত মুখমণ্ডল
> তা পর জলধর মালা॥
> চঞ্চল নয়নে   হেরি মুখে সুন্দরী
> মুচকায়ই ফিরি গেল।
> তৈখনে নয়নে   মদনজ্বর উপজল
> নিরখিতে সংশয় ভেল॥

অহনিশি শয়নে স্বপনে আনহি হেরিয়ে

অনুক্ষণ সোই ধেয়ান।

তা কর পিরিতিক রিতি নাহি সমু কিয়ে

আকুল অথির পরান॥

মরমক বেদন তোহে পরকাশল

তুঁহু অতি চতুরি সুজান।

সো পুন মধুর মুরতি দরশায়বি

রাধাবল্লভ গান॥

এই পদের দ্বিতীয় পংক্তিতে একটু হিঁয়ালী আছে,—চান্দ এবং মদন মিলিত মুখমণ্ডল। চান্দের মত মুখ—তাহাতে অধর, গণ্ড, নেত্র, নাসিকা ও দন্ত-পংক্তি মদনের পঞ্চবাণ—বান্ধুলী, মহুয়া, নীলপদ্ম, তিলফুল ও কুন্দ শ্রেণী। জলধরমালা কেশরাশি।

কবিগণ শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগেই সমধিক রস পরিবেশন করিয়াছেন। দেখিবার ও দেখা দিবার সে কত ভঙ্গিমা, রূপের এবং ভাবের সে কি বিচিত্র বর্ণন পারিপাট্য। নাম শুনিবার, বাঁশীর গান শুনিবার সে কি সুন্দর পরিবেশ। বৈষ্ণব কবির দেহ বিলাস,—সেও এক অপরূপ বৈভব। স্তনের সঙ্গে শম্ভুর উপমা বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই দেখিয়াছি। "মাজি ধয়ল জনু মরকত কটোরা" মনে একটা রুচিসম্মত পরিচ্ছন্নতা, একটা পবিত্রতা আনিয়া দেয়। বৈষ্ণব কবিতার সম্ভোগ বর্ণনেও বৈশিষ্ট্য আছে।

পূর্ব্বরাগের প্রচলন সর্ব্বদেশের সমাজে আবহমান কাল হইতেই আছে। বর্ত্তমানেও পূর্ব্বরাগে তেমন বিরাগ দেখা যায় না। কিন্তু কিশোরীর পূর্ব্বরাগ প্রায় কমিয়া গিয়াছে। কি সাহিত্যে কি জীবনে সর্ব্বত্র যুবতীর ছড়াছড়ি। এই কারণেই নবোঢ়া মিলনের মাধুর্য্য উভয়ত্রই প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। বৈষ্ণব কবির সখীশিক্ষা আজকাল বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। নবোঢার প্রথম মিলনের সেই লজ্জা মিশ্রিত ভীতি, সেই সঙ্কোচ মিশ্রিত কৌতূহল, সেই অনাস্বাদিত মাধুর্য্যের আস্বাদন-লালসার ছদ্ম ঔদাসীন্য, আবরিত উন্মুখ হৃদয়াবেগ…সাহিত্য হইতে—তথা জীবন হইতেও হয়তো নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা শ্রীমতীকে বলিতেছেন—

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।

আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ॥

পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।

হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম॥

পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পানি।

মোন করবি কছু পুছইতে বাণী॥

যব হাম সোঁপব করে কর আপি।

সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥

বিদ্যাপতি কহ ইহ রসবাট।

কামগুরু হোই শিখায়ব ঠাট॥

কিন্তু সখী শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। নবোঢ়ার স্বভাবধর্ম্মই তাহাকে রতি বিমুখতা শিক্ষা দিয়াছে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন—

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচঙ্কল।

বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক॥

চলইতে আলি চলই পুন চাহ।

রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥

লুবধল মাধব মুগধিনী নারী।

ও অতি বিদগধ এ অতি গোঁয়ারি॥

পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।

হেরইতে বয়ন নয়ন জল খলই॥

হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।

চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥

শূতলি ভীত পুতলি সম গোরি।

চিত নলিনী অলি রহই আগোরি॥

গোবিন্দ দাস কহই পরিণাম।

রূপাক কূপে মগন ভেল কাম॥

সখী শ্রীরাধাকে কুঞ্জ মধ্যে লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণ করে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধা উচ্চকিতা হইয়া সখীর আঁচল ধরিতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শয়ন পর্য্যাঙ্কে বসিয়াও বসিতেছেন না। সখী কুঞ্জ মধ্য হইতে বাহিরে আসিলে শ্রীরাধাও আসিতে চাহিতেছেন। রসাভিলাষী নায়ক পথরোধ করিলেন। লুব্ধ মাধব, মুগ্ধা রমণী। নায়ক সুরসিক, নায়িকা গোঁয়ারি—গ্রাম্যস্বভাবা। নায়ক স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে ত্রাসে হাত ঠেলিয়া দেয়। বদন দেখিতে গেলে কাঁদিয়া ফেলে। জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলে কাঁপিয়া উঠে। চুম্বন করিতে গেলে আঁচলে মুখ ঢাকে। গৌরী রাধা ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত পুতুলের মত শুইয়া রহিলেন। ভ্রমর চিত্রিত পদ্মিনীকে আগুলিয়া রহিল। গোবিন্দদাস পরিণাম কহিতেছেন। রূপের কূপে কাম ডুবিয়া গেল। সৌন্দর্য্য কামকে বিলুপ্ত করিল। পরিপূর্ণ নিরাবরণ শুদ্ধ সৌন্দর্য্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই কামগন্ধহীন, বৈষ্ণব কবিগণ এই সত্যেরই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা।

নবোঢার হৃদয়-কমল কেমন করিয়া রূপে রসে পরিপূর্ণ শতদলে বিকশিত হইয়া উঠে, অন্তরের পরতে পরতে কেমন করিয়া একটার পর একটা ভাঁজ খুলিয়া যায়—একটী উদ্ভট শ্লোকে তাহার মধুর আলেখ্য দেখিয়াছি।

কৃতান্তঃ কান্তো বা সমজনি ন ভেদঃ প্রথমতঃ

ক্রমাদ্ দ্বিত্রির্মাসৈর্মনুজ ইতি জগ্রাহ হৃদয়ম।

ততোঽসৌ মৎ প্রেয়ান অহম্ অপিচতস্য প্রিয়তমা

ক্রমাদ্ বর্ষে যাতে প্রিয়তমময়ং জাতমখিলম্॥

বালা প্রথমে কান্ত ও কৃতান্তে কোন প্রভেদ দেখিতে পাইত না। দুই তিন মাস যাইতে ক্রমে তাহার কান্তের প্রতি সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল, বুঝিতে পারিল এও একজন মানুষ। ক্রমেই বুঝিল সে আমার প্রিয়, আমি তাহার প্রিয়তমা। বৎসরের মধ্যেই বালিকা অখিল ভুবন প্রিয়তমময় দেখিতে লাগিল।

হইতে হইতে অধিক হইল সহিতে সহিতে মলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জর জর পাগলী হইয়া গেলুঁ॥

শ্রীকৃষ্ণকে পাইলাম, কিন্তু পাওয়ার মত পাইলাম কৈ? মিলন হইল, কিন্তু সে মিলন এত ক্ষণস্থায়ী কেন? যাহাকে চাই, তাহাকে সর্ব্বদা তো দেখিতে পাই না, সাধ মিটাইয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সৌভাগ্য হয় না। নয়নে লজ্জা আছে, নিষেধ আছে, গৃহপাশে প্রতিবাসী আছে, পথে গুরুজন আছে, বন্ধু হৃদয়েও বিমুখতা আছে। কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা। একজন উদ্ভট কবি বলিতেছেন—

কা বা ন যাতি মথুরাং দধি বিক্রয়ায়,
কা বা ন বারি হরণে যমুনামুপৈতি।
কা বা ন পশ্যতি মুরারি মুখারবিন্দম্
হা ধিক্ বিধে মরিজনে কুলটাপবাদঃ।

দধি বিক্রয়ের জন্ত কোন গোপী মথুরায় না যায়, যমুনায় জল আনিতেই বা কে যায় না, ওগো মুরারির মুখপদ্ম তো সকলেই দেখে, হা ধিক বিধি, কেবল আমার কপালেই কুলটাপবাদ!

দেশে দেশে কালে কালে মানুষ এই কলঙ্কই অঙ্গভূষণ করিয়াছে। যুগে যুগে জাতি এই অপবাদ মাথা পাতিয়া লইয়াছে। চিহ্নিত ভক্ত চিহ্নিতা সেবিকারূপে পরিচয়ে গর্ব্ববোধ করিয়াছে। মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছে—

কানুপরিবাদ মনে ছিল সাধ সফল করিল বিধি॥

বলিয়াছে—

প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিদ্ধি
কবে হইবে কানুপরিবাদে॥

এই সুখ এই দুঃখ, এই আনন্দ এই বেদনা লইয়াই রাই কানু সঙ্গে সজ্জতা হইয়াছেন।

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি
কনকলতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলে কোরে আগোরলি
কুঞ্জে ভুজঙ্গম রাজ॥
অবকিয়ে করব উপায়।
কাল ভুজগ কোরে ছোড়ি মুগধি সখী
গমন উচিৎ না যুয়ায়॥
চন্দ্রক চারু ফণাগণ মণ্ডিত
বিষ বিষমারুণ দিঠি।
রাইক অধর সুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মীঠ॥
একু সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহি
পুলকিনী কাঁপয়ে রাই।
গোবিন্দদাস কহ যেসি সবহুঁ সখী
বুঝহ পরশ অবগাই॥

দুঃশাসন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শীতের শিশির ভেজা ধূসর আকাশে
নবারুণ রক্ত-রাগ পূর্ব্বাচলে ভাসে,
শহীদের গাঢ় তাজা রক্তে যেন লাল,
নতঃ গাত্রে তাহাদের মুখচ্ছবি ফুটেছে ভয়াল—
অদৃশ্য হস্তের কোন শিল্পীর ইঙ্গিতে
পুত্রহারা জননীর কান্নার সঙ্গীতে,
যুদ্ধ নাকি হ'য়ে গেছে শেষ!
আজো কিন্তু ফিরে নাই শান্ত পরিবেশ।
আজো জাগে দুঃশাসন রক্ত পান আশে,
বিষাক্ত নিশ্বাস তার বাতাসেতে ভাসে;
অত্যাচারী আজো আছে জাগি—
অসহায় মানবের রক্ত পান লাগি।

* * *

নভস্পর্শী স্পর্দ্ধা লয়ে অত্যাচারী বহু দুঃশাসন
সেও আসে, আসে ওই তোমারে যে করিবে শাসন,
বুকে ব'সে কণ্ঠ ভরি যত রক্ত করিয়াছ পান
আসে ভীম গদা হাতে উরু ভাঙ্গি সেই রক্তে করিবারে স্নান,
তুমি যে বাঁচিয়া আছ এতকাল সে কেবল মোদের ক্ষমায়,
বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে হ'য়ে আছি মোরা ক্ষীণকায়।

যে শৃঙ্খলে বাঁধি তুমি এতকাল করিয়াছ শত অত্যাচার
এইবার হবে জেনো তাহার বিচার।
তব বক্ষ রক্ত মাখি ভীমসেন বেঁধে দেবে বেণী,
আলুলিত কেশে তাই অপেক্ষিয়া আছে যাজ্ঞসেনী।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

ডাক্তার বিনোদ নানা কথা ভাবতে ভাবতে ফিরলেন। সাহেব ইঙ্গিত করেছেন—সব কথা তৃতীয় কাকেও বলবার নয়। দেরীও হয়েছে—মাণিক সব কথা শুনতে চাইবে। কিন্তু মালিকের নিষেধ রক্ষা করাও আমার কর্ত্তব্য—আমি তো নিজের ইচ্ছায় কিছু করছি না—

মাণিক সেই পূর্ব্বপরিচিত দৌলতখানার সামনে, ডাক্তারের জন্ত পথ চেয়ে হান্টান্ করছিল। তাঁকে দেখতে পেয়ে—আঃ বাচালেন মশাই! আপনার অসম্ভব বিলম্ব দেখে কি চিন্তাতেই পড়ে রয়েছি! নন্দবাবু না এলে—আমি আপনার খবর নিতে বেরিয়ে পড়তুম।

ডাঃ। এ আবার কোন নন্দ হে? '৩'য়ের কোটায় যার ছন্দ-পতন হয়?

মাঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ। খবরটা সুবিধের নয়। তাঁর সর্ব্বত্রই যাতায়াত আছে কি না। আমাদের দু'জনকে প্রসিদ্ধ দু'জায়গায় বদলির প্রস্তাব টাইপ্ হচ্ছে দেখে এসেছে। তাতে আবার আমাদের কাজের বিশেষ সুখ্যাত করে বলা হয়েছে—এসব কাজের লোককে এখানে ফেলে রেখে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নষ্ট করা হচ্ছে। আমি যোগ্যতার অসম্মান করতে চাই না, তাদের Chance দিতে চাই। আশা করি O/C আমার প্রস্তাবে একমত হবেন, খুশীই হবেন—ইত্যাদি। আরো আছে—ছ'মাস আমাদের কাজ দেখে আমাদের বেতন বৃদ্ধিও করে দিতে পারেন। সে কথাটা "Provided" বলেও আছে।

ডাক্তার সহাস্তে বললেন—বলো কি মাণিক? এত বড় খুশখবর শুনে তুমি অমন হয়ে রয়েছ কেনো?

মাণিক (সবিস্ময়ে)—আপনি কি বলছেন হুজুর? আপনার মন বোধহয় অন্যত্র ছিল, ভালো করে সব কথা শোনেন নি। দূরে যেতে রাজী আছি, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে অন্য কোথাও নয়। ফলে—চাকরিই ছাড়তে হোল, একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস শেষ বিদায়ের ব্যথা জানিয়ে দিলে! ভগবান আছেন।

ডাঃ। তবে আর কি, তাঁর উপর সব ছেড়ে দাও।

মাঃ। আমি কি আমার জন্তে ভাবছি হুজুর!—বলে' মুখ নত করলে—

কথাটা ডাক্তার বুঝেছিলেন। সত্যটা তাঁর মনে জাগ্রতই ছিল। মাণিকের পিঠে স্নেহ-বিজড়িত হাতটা বুলিয়ে বললেন—ভেবনা মাণিক, আমাদের উভয়েরি এক পথ, তুমি যাবে কোথা?

মাণিক। আমার তাও আর ঠিক নেই, বাড়ীঘরও বোধহয় যেতে বসেছে। নন্দর কাছে শুনলুম—খুড়োমশাই নাকি এসেছিলেন—প্রকাশ্যে নয়। কর্ত্তার ডাক পেয়ে কি স্বইচ্ছায়, তাও জানি না।

শুনে ডাক্তার চমকে গেলেন। "ব্যাপার কি?"

মাঃ। ব্যাপার—"মেয়ে ব্যাপার" ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমরা তো কোন গর্হিত কাজ করিনি। সেই "হার"ই এর মূলে কাজ করছে। মেয়েরা কড়াকড়া দশকথা শুনিয়েছেন, তিনি বড় অপদস্ত হয়ে প্রতিকারের প্রতিজ্ঞা করেছেন। নিজের ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিতে চান।

ডাঃ। তা তোমার উপর কেনো? সে তো আমার করা। তার জন্যে তো আমি দায়ী—

মাঃ। নন্দ সব কথা জানে না। তবে, ষড়যন্ত্র কোথা থেকে সুরু হলে সুফল দেয়, সেটা বড়রাই বোঝেন।

শুনে ডাক্তারের মুখের ভাব মুহূর্ত্তে বদলে গেল, সে রহস্তপ্রিয় জ্যোতি ও গৌরবর্ণ সহসা বিবর্ণ। মাণিককে থামিয়ে দিয়ে নিজে একেবারে নীরব। মাণিক ভীত। দশ মিনিট কারো মুখে কথা নেই।

হঠাৎ বলে উঠলেন—"বললে না—সে বড়রাই বোঝেন! ভুলে গেলে—বড়দের ওপরও একজন আছেন যিনি বড়দের চেয়েও বোঝেন। ভেব না, সত্য হলে—বিপদ সমূহ বলেই বোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই তার মিথ্যার ওপর নির্ভর। মিথ্যা ট্যাঁকে না। চাকরি না হয় নাই রইল, না করাই ভালো—তিনি দয়া করে বদনাম থেকে বাঁচিয়ে দিলেই যথেষ্ট। তা তিনি দেবেন, সে বিশ্বাস আমার দৃঢ়। একটু থেমে বললেন—প্রদীপ নেভবার

আগে একবার হেসে নেয়—দেখে থাকবে। আমাদেরি বা সেটা বাদ যাবে কেনো? দেড় ঘন্টা আগে তা স্বাদ মিটিয়ে সেরে ফেলেছি। তোমাকে এখনও বলা হয়নি—তুমি কেনো ঠকবে!—বলে ডাক্তার সহজ হাসি হাসলেন।

মাণিক কিছু বুঝতে পারছিল না, ডাক্তারের পরিবর্ত্তন দেখে অবাক্! এ আবার কি?

ডাক্তার বললেন—"ভালো করে শোনো, রসময়ের লীলা বৈচিত্র্য লক্ষ্য কোরো।" এই বলে নূতন চাকরি নিয়ে মাস খানেক পরে আসাম অঞ্চলে যাবার কথা, খাওয়া পরা ও বেতনের কথা, ক্রমোন্নতির কথা, প্রভৃতি আশাতীত স্বপ্নসম কথা মেমসাহেবের অসুখের কথা, তাঁকে আনতে যাবার কথা, অর্থাৎ সাহেবের ইঙ্গিত বাঁচিয়ে যতটা বলা সম্ভব, একে একে সব বললেন। দেড় ঘন্টা পূর্ব্বে চাকরির এই ঐশ্বর্য্য উপভোগ চুটিয়ে করেছি মাণিক। এখন তুমি কি বলো শুনি।

—এ গরীবকে ও কথা আর কেনো শোনালেন হুজুর! বাড়ী যদি থাকে মনে মনে হাঁড়ির ব্যবসাই স্থির করলুম। এ অদৃষ্টে ও সব আমিরি সইবে কেনো! বহুভাগ্যে আপনাকে পেয়েছিলুম, আপনার বদলে আমি রাজঐশ্বর্য্যও চাই না। কিন্তু আজ যে আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। যাই করুন—আর যেখানেই থাকুন, আপনার চাকর তো দরকার হবে?

ডাক্তার অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, মাণিককে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—"দুঃখকষ্টই মানুষকে মানুষ করে মাণিক। একটা কথা বুঝতে পারছি না—সত্যই কি এই সামান্য কারণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পদস্থ লোকে, আপনাকে হারিয়ে হিংস্র পশুর অধম হয়ে যেতে পারে? আমার অনুমানে নিশ্চয়ই ভুল আছে। 'হার' একটা তুচ্ছ কারণ হতে পারে। সে নিয়ে চেয়ারম্যান Floormanকে Floored না করে ছাড়বেন না, স্বস্তি পাচ্ছেন না, সে কি একটা কথার মত কথা? নাঃ, আরো কিছু আছে।"

মাণিক আর চুপ করে শুনতে পারলে না, বললে—"আমার মনে হয়, সেটা জেলসি। সে জাগলে—মানুষ অন্ধ হয়। তখন সে সব কিছু করাতে পারে।"

ডাঃ। আমার মত নগণ্যের ওপর তাঁর জেলসি আসবে কিসে? ওটা আমারও একবার মনে হয়েছিল, পরে নিজেকে বড় বানাবার কারণ খুঁজে না পেয়ে হেসে তা ত্যাগ করেছি। এখন তুমি আবার কি বলতে চাও বলো—শুনি।

মাণিক। অত ভুলে যাচ্ছেন কেনো? O/C আমাদের (বিশেষ আপনার) সম্বন্ধে আপিসে কি লিখেছেন, তা আমরা কেউ জানি না, কিন্তু হাঁসপাতালের মজলিসে, সে কথার ইসারা ইঙ্গিত টিকাটিপ্পনিসহ করতে, ছোট বড় কেউই তো বাকি রাখেন নি—একবার নয়—পাঁচবার। সাহেবের সেটা Ordinary Certificateএর মত হলে তাঁরা তার উল্লেখও কেউ করতেন না—চেপে যেতেন। তাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু থাকতে পারে, যা বড়দের বদহজমের জিনিস, প্রত্যেক উদ্গারে তাঁদের স্মরণ করায় ও ক্রমে অসহ্য হয়ে প্রতিকার খোঁজায়। জেলসি অতি ভয়ঙ্কর জিনিস, কাজও করে ভয়ঙ্কর। পরিণাম ভাবতে দেয় না। সেইরূপ কিছু থাকা অসম্ভব নয় বলে মনে হয়। পদস্থদের পদের অভিমান বড় বিপদের বস্তু Sir—

ডাক্তার—আচ্ছা থাক—সকালে আমাকে তুলে দিও। উঠেই আমি একবার সাহেবের কাছে যাবো। তাঁর ঠিক নেই, বেরিয়ে যেতে পারেন। তাঁকে আমি ভাল করেই চিনেছি, প্রখর বুদ্ধি ধরেন। এ বিষয়েরও কিছু না কিছু খবর তাঁর কাছে আছেই, নচেৎ ও ইঙ্গিতটা করতেন না—Boardএ তোমাদেরও চাকরি আর চলবে না—বলতেন না।

"চা খেয়ে যাবেন তো?"

"না—সেখানে গিয়েই খাব। তিনি না খাইয়ে ছাড়বেন না। এই বিশেষ অনুগ্রহটাই বুঝতে পারছি না। অবিশ্বাসীর প্রতি তা কি সম্ভব? যাক্—সব কথা শেষ করে' আসবো, আর বিলম্ব করা নয় মাণিক। কিছু থাকে তো দাও, খেয়ে শুয়ে পড়ি।"

"কাপড়টা ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে নিন, সব প্রস্তুত।"

"তুমিও খেয়ে নাও—এক সঙ্গেই বসবো।" মাণিকের মনের অবস্থা ডাক্তার বুঝতে পারছিলেন। এক সঙ্গেই বসালেন।

"একি? মাছ কোথায় পেলে?"

সঙ্কুচিত স্বরে মাণিক বললে—"কি করে খবর পেয়েছে জানি না—যুধিষ্ঠিরই পাঠিয়েছে।"

"ভালই করেছে, চলুক। সবই মায়ের ব্যবস্থা। যতক্ষণ তাঁর কৃপা আছে—সবই আছে।"

আহারাদির পর, সেই পরিচিত খাটিয়ায় শুয়ে হাসতে হাসতে—"আর কিছু দেবে নাকি ?"

"আজ্ঞে—এই নিন না" বলে 'গোল্ড-ফ্লেকের' কৌটো খুলে এগিয়ে দিলে।

"দাও—যতক্ষণ মেলে, সদ্ব্যবহার করাই উচিত, আজ দরকারও আছে। পরে ঘাসজলের সঙ্গে বিড়ি তো আছেই। তোমার কাছে বাক্যদত্ত আছি—বত্রিশ সিংহাসনে না বসলে—বাঁচবার কথা—I mean বাজে কথা আসবে না।

"আজ থাক মশাই—আপনি শুয়ে পড়ুন।"

"সে কি কথা! আমার যে ঘুম হবে না। আমি ডাক্তার মানুষ তুমি অমন মুষড়ে গেলে—মকরধ্বজ চাই যে।"

মাণিকের মুখে দুঃখের হাসি দেখা দিলে।

"ওসব কিছু নয় মাণিক, ভেব না। বলছিলে না—'মেয়ে ব্যাপার ?' ওঁদের শাস্ত্রীয় নাম 'শক্তি'—জানো তো ?—মনে আছে বোধহয়—অনেকদিন থেকে বলে আসছি—দেশের চিন্তা বড় কেউ করেনি, কখনো করিওনি। দেশ তো চিরদিনই আছে। দেশ যে কি ও কাদের, সে খোঁজে দরকারই ছিল না। লোক একটা দেশে জন্মাবে না তো কোথায় জন্মাবে—তাই জন্মেছি। চারটি খেতেও হয়, তাই খাওয়া। এর দোকানে ওর দোকানে শুক্তুক খেয়ে আর গল্প করে তাঁদের দিন কেটে যেতো, ঘুমুলেই রাত কাবার। মিছে দেশ দেশ করে' মরা কেনো? দেশ তো পড়েই আছে! এই ছিল আমাদের পউনে শতবর্ষ পূর্ব্বের সাধারণ কথা।"

"গ্রামে তাঁকে সকলে "পিন্-গোবিন্দ" বলে ডাকতো, বোধ করি তাঁর pinএর মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল বলে—তাঁর প্রার্থনা ছিল বটে—'মা, আমি কিছুই চাই না, আমার কিছুই কাজ নেই। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে বালিশের নীচে হাত দিলেই যেন একখানি করে দশটাকার নোট পাই—বেশী চাই না, তোমাকে বিরক্ত করতেও চাই না মা।' আকাঙ্ক্ষা তাঁর ওইটুকুই ছিল। তাই ছিল দেশের পুরুষদের পরিচয়। দেশ বলে ঝঞ্ঝাট জোটেনি।

"ছেলেরা ইংরিজি পড়ে এখন 'দেশ দেশ' করছে। সেটা—না টাকা, না পয়সা, কেবল দেশ আর দেশ। পুরুষদের রোজগার করতে হয়, তারা টাকা পয়সাই বোঝে ও চায়, দেশ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? এই ভাব অবলম্বনে তাঁরা গজিয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষিতদের দেশটাই, আর পাঁচটা কাজের মধ্যে একটা হয়ে পড়ে, কিন্তু তাতে অন্তরের সাড়া ছিল না, ছিল ভদ্রতা বজায় রেখে, ভদ্রসেজে ভদ্র বুলিতে (ইংরিজিতে) বাচা বাচা ক্রেজে বক্তৃতা করা—বাহবা পাওয়া। তাতে যে কিছু কাজ হয়নি তা বলছি না—দেশের মানেটা প্রাণে অল্পসল্প পৌঁছুতে থাকে, যেমন জগন্নাথের রথ টানতে অনেকেই দড়িটা কেবল ছুঁয়ে থাকে, ভাবে পুণ্যের share পাবে। ফাঁকিটা কিন্তু জগন্নাথের অগোচর থাকে না। তাতে অনেকে তাঁর চাকার মুখেও যায়। গেছেও।

"তাই আমরা so called (নামে) পুরুষেরা defeated, আমরা অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা কথা কয়েছি, তার চেয়েও পেল্লায় পেল্লায় statement বার করেছি। পরে নানা পণ্ডিতের নানা মনোরথ-একলক্ষ্যে চলবার পথ পায়নি, ওস্তাদের বৈঠকখানাতেই ডন বৈঠকের পর তা মচকে গেছে। আমরা defeated রয়েই গেছি। তখন গাঙ্গুলী মশায়ের পুরাতন অমর বাণী নূতন করে দেখা দিয়েছে—'না জাগিলে আর ভারত ললনা', বুঝলে মাণিক ?"

মাণিক। একটু খুলে বলুন Sir—মেয়েরা রথ চালাবে নাকি ?

ডাক্তার। সুভদ্রার কাজটায় কি অভদ্রা পড়ে গেলো? ঝাঁন্সীর লছমী বাঈ যে এই সেদিনের কথা হে। শক্তির-জাত কি চিরদিন রান্না আর কান্না নিয়ে থাকতে পারেন নাকি? পথে ঘাটে কি চোখ বুজে চলো মাণিক? মায়েদের কপালের রক্ত টিপ্‌গুলোর বাড়বৃদ্ধি লক্ষ্য করছো না ?—একেবারে যে কাপালিক মার্কা—অরুণোদয়। আর আমরা খোল ঘাড়ে করে হরিবোল ধরেছি। কিন্তু খত্তাল বিনা বেতালে কাজ হয় না, হয় কেবল দাসত্ব, O/C আজ তাই সেই পথ প্রশস্ত করবার প্রস্তাবও করেছেন। কছু পূর্ব্বে সে কথা তোমায় বলেছি। ভাবলেই শক্তির-লীলা বুঝতে পারবে। তাঁরা হাসতে হাসতে তাঁদের চিরপ্রথা মত কর্ত্তাকে কি দু-একটা কথা বলে থাকবেন, তার শক্তির প্রভাবটা তাঁকে স্পর্শ করে ও তা কেউটের বিষের মত হাড়ে হাড়ে injected হয়ে তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে, এখন গঙ্গামন্নরার কাছে ছুটতে হবে, বাঁচবার উপায় দেখতে হবে। ঢুল ধরেছে শুয়ে পড়। ভেব না—মা আছেন। বলে ডাক্তার পাশ্ ফিরলেন। (ক্রমশঃ)

আজাদ হিন্দ সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

৫

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠাতা সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির অথবা 'ঈশ্বরের পুত্র' ছিলেন (!) না। ছিলেন, রক্তে মাংসে, মেদে ও মজ্জায় গঠিত নশ্বর জগৎ ও মর্ত্ত্যের মানুষ। বিংশ শতাব্দীতে, এই পৃথিবীতে যে-লক্ষ কোটী মানুষ বসতি করে, তাহাদেরই একজন। দেহের রক্তমাংস যেমন উপকরণ, দোষ গুণও তেমনই দেহের অঙ্গ বা অংশ অথবা উপকরণ। কোন মানুষের দেহে মাংসের আধিক্য, কেহ অতি ক্ষীণকায়;' কাহারও রক্তের চাপে শরীর অসুস্থ, কেহ বা রক্তাল্পতায় কাতর। গুণ কাহারও অধিক, কেহ বা বহুদোষের আকর; নির্গুণ কিম্বা নির্দোষ মানুষ সুদুর্লভ। আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারেন নাই। আর দশজনের মত, তাঁহার শরীরও দোষ এবং গুণের আগার হইতে বাধ্য। আমি তাঁহার গুণের অথবা দোষের তালিকা সঙ্কলন করিতে বসি নাই; তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। সমস্ত পরিহার করিয়া, তাঁহার একটি মহৎ দোষের কথাই আমি বলিব।

সুভাষবাবুর বৃটিশ-বিদ্বেষ ছিল, ওজনাতিরিক্ত। এত অধিকমাত্রাতেই এই 'বস্তুটি' ছিল যে মাপিয়া পাওয়া যাইত না এবং আমার বিশ্বাস তিনি স্বয়ং সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও ইহা গোপন করিতে পারিতেন না। পারার ঘা যেমন গোপন করা যায় না, সুভাষের বৃটিশ-বিদ্বেষও তেমনই চাপা থাকিত না। ঐ দোষ হয়ত আরও অনেকের আছে; হয়ত তিন শত নিরানব্বই কোটী নরনারীরই আছে, আশ্চর্য্য নহে। যে কয়জন লোক এখনও সংক্রমণমুক্ত আছে, ১৯৪৬ সালের বাকী কয় মাস গত হইলে দেখা যাইবে তাহাদের ব্যাপ্টিজম্ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজী পৃথিবীতে একজনই আছেন, দুইজন গান্ধীর সংবাদ ত শুনি নাই। তবে সুভাষচন্দ্রের মত অসঙ্কোচে অকুণ্ঠকণ্ঠে বৃটিশ-বিদ্বেষ ব্যক্ত করিতে আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া আমি অন্ততঃ মনে করিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, তাঁহারা বৃটিশের নীতির বিদ্বেষী, কিন্তু বৃটিশকে বিদ্বেষ করেন না। অনেকে ভদ্রতার আভরণ ফেলিতে ইচ্ছা করেন না, অন্তরে, অথবা ভিতরে যাহাই কেন থাক্ না। বৃটিশ ছিল সুভাষের জাত শত্রু।

বৃটিশ বিনাশ বা বৃটিশের বিলোপ সাধন জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম পবিত্র ব্রত হিসাবে সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রু বিনাশে বল, ছল, কল ও কৌশল সমস্তই প্রযোজ্য, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসমাজে বিধান আছে। সুভাষ সেই বিধানানুযায়ী কাজ করিয়াছেন। যে অন্তর অহিংসামন্ত্র বরণ করিয়াছিল, শত্রু নাশ জন্য সেই অন্তরই জিঘাংসার রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়াছিলেন; যে মণিবন্ধে শান্তিকামী গান্ধীজীর শান্তিমন্ত্রপূত পবিত্র রাখী বাঁধিয়াছিলেন, সেই করে বৃটিশশোণিতলিপ্সু ক্ষুরধার খড়্গ ধারণেও দ্বিধা করেন নাই। দ্রুপদ রাজার সভায় কৃত্রিম মীণাক্ষী বিদ্ধ করাই ভিক্ষুকবেশী ফাল্গুনীর লক্ষ্য ছিল, বৃটিশের দিল্লীর লাল কেল্লাও তেমনই ছিল, সুভাষের লক্ষ্য। বনবাসী, ফলমূলাহারী চীরধারী ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের দুরন্ত ক্ষাত্র-তেজও ক্ষত্রিয় গর্ব্ব যেমন অজ্ঞাতবাসের গোপনীয়তা উপেক্ষা করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পৃথিবীর রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রের মহোচ্চ-শিক্ষা সত্বেও তেমনই সুভাষের বৃটিশ-বিদ্বেষ প্রধূমিত হইয়া হিংস্রকরে কৃপাণ ধারণ করিয়া হিংসাদৃপ্ত চরণে দিল্লী অভিযানে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল।

আমার উক্তির কদর্থ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই আমাকে সতর্ক হইতে হইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে কোন বৃটিশ বা ইংরাজকে সুভাষচন্দ্র বসু বিদ্বেষের চোখে দেখিতেন, আশা করি একথা কেহ মনে করিবেন না। যে বৃটিশের শোষণে ভারত শোণিতশূন্য পাংশুবর্ণ, অন্তঃসারশূন্য অসার; অস্ত্রবলে, শস্ত্র তেজে যে বৃটিশ ভারতকে ক্লৈব্য দান করিয়াছে; যে বৃটিশ বিজিত ভারতবর্ষকে আপন স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে বলে নিরস্ত্র, কৌশলে অসহায় ও অনাহারে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে; ভারতের সহিত যে

বৃটিশের শাসন ও শোষণের সম্পর্ক, খাদ্য ও খাদকের সম্প্রীতি, সেই বৃটিশ তাঁহার বিদ্বেষের বিষয়বস্তু। এই বৃটিশ কোনও মানুষ নহে; এই বৃটিশ আদৌ হয়ত বৃটিশ জাতির কেহ নহে; এই বৃটিশ সেই বৃটিশ, যাহার শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় ভারত কঙ্কালসার, নির্জীব, মুমূর্ষু ও মৃতকল্প। এই বৃটিশ মূর্ত্ত আইনে, অর্ডিন্যান্সে, টেরিফে, এক্সপোর্টে, ডিফেন্স রুলসে। এ বৃটিশ একটা প্রক্রিয়া মাত্র। এ বৃটিশের দেহ বাস্তব না হইতে পারে, বরং ইহার বায়বীয় দেহ হওয়াই সম্ভব। নারীর পতিত্ব যেমন, পুত্রের অন্তরে পিতৃত্ব যেমন, সন্তানের হৃদয়ে মাতৃত্বের আসন যেমন, ইহাও তেমন। পতিত্ব যদি কল্পনাতীত ভাবের স্বর্গরাজ্য না হইত, তাহা হইলে মদ্যপ, দুশ্চরিত্র ভণ্ড ও লম্পট পতিকেও সাধ্বী স্ত্রী কখনও পূজা করিত না, পদাঘাতে বিদূরিত করিত। কিন্তু ভাবরাজ্যের চিন্তাধারার পতিত্ব এমনই এক পূজ্য আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে যে ব্যক্তিবিশেষ যেমনই কেন হোক না, পতিত্ব পূজার্হ। পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, পুত্রত্ব, প্রভুত্ব সব ঐ এক কথা। পুত্র, দুই অক্ষরের ঐ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মধুচক্রবিনির্গত মধুর মত অপত্যস্নেহ ক্ষরিয়া পড়িতে থাকে; স্নেহে উদ্বেলিত মাতার হৃদয় সাগরের উচ্ছ্বসিত বারি বালুবেলায় আছাড় বিছাড় করিতে থাকে। এখানে সুপুত্র কুপুত্র, সুমাতা কুমাতা ভেদ নাই। মা ও সন্তান! সুভাষের বৃটিশও সেই বৃটিশত্ব, যাহা নিঃশেষে শোষণ করে; শোষণ করিবার জন্য শাসন করে; শাসন অবাধ ও অব্যাহত এবং অপ্রতিহত রাখিবার জন্য গোটা জাতিটাকে নিঃসহায়, নিঃস্ব, নিরস্ত্র, ক্লীব ও পঙ্গু করিয়া রাখে; নিরস্ত্র জনতার উপর কামান চালাইয়া শান্তিরক্ষা করে; নির্ব্বিচারে নরহত্যা করিয়া বলে, বিদ্রোহ দমন করিতেছে! সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব, যাহাতে ভারতবাসী তাহার স্বদেশ, তাহার মাতৃভূমি, তাহার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে মা বলিয়া ডাকিলে, রক্তনেত্রে ভ্রূকুটি করে; মাতৃপূজার মন্দিরকে রাজদ্রোহের আগার বোধে ধ্বংসের আদেশ দেয়; দেশসেবককে, মাতৃপূজারীকে আমরণ কারাবাস করিতে হয়। সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব, যাহা পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া মিথ্যার বেসাতি করে; মিথ্যার বেসাতিতে অতীতের গৌরব বিকৃত করে; ক্রীতদাসের কণ্ঠে স্বর্ণপদক ঝুলাইয়া দিয়া ক্রীতদাসের মহত্ব প্রচার করে। সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব—যাহা ভারতবাসীকে ভারতবাসী নামে পরিচিত করিতে শিক্ষা না দিয়া ভারতবাসীকে শত ভাগে, শত স্তরে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিতে উৎসাহিত করে। ধর্ম্মের বিভাগ, সম্প্রদায়ের বিভাগ, জাতির বিভাগ, জাতির ভিতরে খণ্ড জাতির বিভাগ, বেড়ার গায়ে বেড়া, পাচীলের পরে পাচীল তুলিয়া দিয়া বৃটিশত্ব সাধুতার ভাণ করিয়া বলে, হায় হায়, ইহারা মিলিতে পারে না কেন! মেয়েলি কথায় বলা যায়, 'চোরকে বলে চুরী করিতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকিতে।' ভারতবাসীরা ঝগড়া করিষা, মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে, বৃটিশ পরমানন্দে পুডিং ভক্ষণ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে বোধ হয় যে, এই বৃটিশত্ব (মূর্তিহীন বিগ্রহখানি) কোথায় বসতি করে? উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বৃটিশের সওদাগরী আফিসে তাহার বাস, গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে তাহার নিবাস, থানায় তাহার বসতি, আদালতে তাহার আবাস! রেলে যাও, কলে যাও, কারখানায় যাও, ব্যাঙ্কে যাও, জাহাজে উঠ, হোটেলে খানা খাইতে যাও, দেখিবে, জগদীশ্বর যেমন সর্ব্বত্রবিরাজমান, বৃটিশত্বও তেমনই সর্ব্বত্র-পরিদৃশ্যমান। হিমগিরি হিমালয় যেমন ত্রিপথগা ভাগীরথীর উৎস, রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লা তেমনই বৃটিশত্বের উৎস। সুভাষ সেই লালকেল্লার ধ্বংস কামনা করিয়াছিলেন। লালকেল্লার গোরা সৈন্য বা প্রাসাদাভ্যন্তরস্থ বড়লাট তাঁহার লক্ষ্য নহে; লক্ষ্য সেই বৃটিশত্ব।

বৃটিশ-বিদ্বেষ-বিষের সূচনা কবে ও কোথায় এবং কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। বাল্যে ও কৈশোরে ইংরাজী ভাষা, ইংরাজের পোষাক-আষাক, ইংরাজের আচার ব্যবহারের উপর প্রীতির অভাব যে ছিল না, তাহা ত আমরা ভালই জানি। আমার স্নেহশালিনী পাঠিকা ও ধৈর্য্যশীল পাঠক, সাবধান! একটি ছোটখাট ডিম্বাকৃতি এ্যাটম্ বম নিক্ষেপ না করিলেই যে নয়!—ত্রুটী মার্জ্জনীয়। প্রেমময় যীশুর বংশধরগণ কোনরূপ 'ওয়ার্ণিং' না দিয়াই হিরোসিমা ও নাগাশাকিকে আনবিক বম্বয় উপহার দিয়াছেন। আমি কিন্তু ততটা ধর্ম্মপ্রাণতা দাবী করি না, তাই অগ্রিম 'নোটিশ' দিয়া বোমা ছুঁড়িলাম। সুভাষ যখন মাষ্টার সুভাষচন্দ্র বোস, কটক স্কুলের ফার্ষ্ট ও ফোরমোস্ট 'বয়', তখন

হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট জেনেরালের পদ বা চাকুরীটাই ছিল সুভাসের সার্থক-জীবনের 'টার্গেট'—চরম লক্ষ্য। হাই-কোর্টের জন্য নহে, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে যৌবনাগমের পূর্ব্বেই দৃষ্টিভঙ্গী উজান বহিতে সুরু করিয়াছিল। 'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণ রেণু বলি' শিরে ধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা চিত্ত ভরিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত বৃটিশ বিদ্বেষের কোনই সংস্রব নাই। তখন স্বদেশ প্রেমের বাণ ডাকিয়াছে, দুকূল প্লাবিয়া পল্লী নগরী প্রান্তর কান্তার ভাসিয়া গিয়াছে, সে পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া কে না ধন্য হইয়াছে? সে উত্তাল উন্মাদ প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া ইন্দ্রের ঐরাবতও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে! তাহার পর, বন্যার জল, সাগরের বারি সাগরে ফিরিয়া গিয়াছে, পলি পড়িয়া আছে। পলিও স্বাদেশিকতার স্মৃতিপূত, পবিত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু বিদ্বেষমুক্ত—বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নাই। নদীর পলি-মাটির মতই কোমল, মসৃণ, উর্ব্বর ও মৃদু-সুরভিত। প্রেসিডেন্সী কলেজের যে ঘটনাটি 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্রের নাম সংযুক্ত হইয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেই ঘটনার সহিতও বিদ্বেষের সংস্পর্শ নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক-ধর্ষণের সহিত সুভাষের সম্পর্ক কতটুকু বা কতখানি ছিল অথবা আদৌ ছিল কি-না, পরে ও প্রবন্ধান্তরে আমি তাহা সঙ্গী সাথীর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরাকরণ করিবার বাসনা পোষণ করি। ওটেন-নাট্যের নায়ক যিনিই কেন হৌন না, নাটকের একমাত্র 'ময়্যাল' ছিল, অশিষ্টের শাসন। অশিষ্ট ছাত্রের প্রতি শিক্ষক যে ঔষধ প্রয়োগ করেন, অতীব দুর্জ্জন শিক্ষকের উদ্দেশ্যে তাহাই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। তবে ব্যবস্থা যে নীতিশাস্ত্রবিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি : এই পৃথিবী কি কোন নীতিশাস্ত্রের পাতা রেল লাইনের উপর দিয়া হড় হড় গড় গড় শব্দে গড়াইয়া চলে? আমার ত তাহা মনে হয় না। দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার, নীতির ন্যায় ও দুর্নীতির অন্যায়—পৃথিবীময় ইহাই শাশ্বত ও সনাতন! সে যাহাই হৌক, বিদ্বেষের সূচনা তখনও হয় নাই। তবে উই লাগিয়াছিল। আমার ভাঙা ঘরের তালের কড়িখানি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অক্ষুণ্ণ অটুটই ত দেখিতাম। হঠাৎ যেদিন ভাঙিয়া পড়িল দেখিলাম, অলক্ষ্যে উই পোকা সেখানিকে নিঃশব্দে জলপান করিয়াছে।

বৃটিশ-জাতির পুরুষ বা নারী আসিয়া ঘর ঝাড়ু দেয়, জামা কাপড় কাচে, জুতা বুরুষ করে দেখিয়া সুভাষের বড় আনন্দ। অন্তরে অসুখের সূচনা হইয়াছিল—তাহার পরিচয় বিলাত হইতে লিখিত (কোন বন্ধুকে) একখানি পত্রের একটি ছত্রে তাহা অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। "ইংরাজ আমার জুতা সাফ করিতেছে, যখনই দেখি আমার আনন্দ হয়।" আমাদের ভারতবর্ষে আমরা বৃটিশের বুট লেহন করিতে বাধ্য! এ বড় দুঃখ।

বৃটিশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হওয়ার কথা জানা যায় সেইদিন, যেদিন আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, শিক্ষানবিশীর সূচনাতেই—ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জ্জন—বোধনে বিজয়া হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটি এইখানে বলিব। ঘটনা ক্ষুদ্র হইলেও পরিণতি বিরাট। বটের বীজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, কিন্তু বট বিটপীকুলশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ঘটনাটি বলিবার পূর্ব্বে, আমার সুধীরা পাঠিকা ও সুধী পাঠকের 'মুখ বন্ধ' করা আবশ্যক।

আমি শুনিয়াছি (এবং দেখিয়াছি) সুভাষচন্দ্রের জীবন-কথা বহুজন বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। যাঁহারা এই প্রয়োজনীয় কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন, আবার অনভিজ্ঞ ভাগ্যান্বেষীও থাকিতে পারেন, আমি জানি না। এমন একটা "বিষয়" পাইলে কাহার না হাত সুড় সুড় করে? পরাধীন দেশের, পরপদানত জাতির মধ্য হইতে এমন এক শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন বীর পুরুষের উদ্ভব হইতে দেখিলে লেখক-সমাজের হস্ত কণ্ডূয়তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ত বটেই, যাহাদের 'কোন কালে ছিল না চাষ, ধানকে বলে দুর্ব্বোঘাস'-পর্য্যন্ত 'বিদ্যা, তাহারাও যদ্যপি 'কাস্তে ভাঙিয়া' লেখনী গড়াইয়া ফেলে, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। সেক্সপীয়ারের কল্পিত চরিত্রাবলী অবলম্বনে শত ব্যক্তি শত প্রবন্ধ রচনা করিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত নরনারীর কত রকম ব্যাখ্যা কত জন করিল; রবিবাবুর কবিতার কত ভাষ্যই ত বাহির হইতেছে! আর এমন একটা জীবন্ত মানুষের জলন্ত চিত্র অবলোকন করিলে কাহার ভাবসাগরে না আলোড়ন হয়! মানুষটিও আবার দূরের মানুষ নহে। মানুষটি আমার ঘরের পাশে জন্মিয়াছে, আমার পাশের ঘরেই তাহার বসতি ছিল।

তাহাকে সকলেই দেখিয়াছে। যে লোক চাক্ষুষ দেখে নাই, সে'ও তাহার ছবি দেখিয়াছে; অহরহ তাহার কথা শুনিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তা, হাবভাব, চালচলন, আচার ব্যবহার, সমস্তই হয় চোখে দেখা, না হয় কাণে শোনা। আমি যে ভাষায় কথা কহি, সেই তাহার ভাষা; আমার ভাব ও অভাব, তাহার ভাব ও অভাবের সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ; আমার সুখদুঃখে তাহার সুখদুঃখ ওতঃপ্রোত বিজড়িত। সেই প্রিয় পরিচিত লোকটি একদিন আমাকে ভাই, আমার মা'কে মা বলিয়া ডাকিত, আমার ভগ্নীকে ভগ্নী বলিয়া আহ্বান দিত, সেই লোকটি! আমার জন্মভূমি, তাহার জন্মভূমি। আমার ভারত, তাহার ভারত। আমার জন্মভূমির দুঃখে তাহার নয়নে দরবিগলিতধারা। আমার ভারতের বন্ধন মোচনের জন্য সারাজীবন দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে; সারাজীবন কারাবাস করে। দারিদ্র্যকে মাথার মণি করিয়াছে; দৈন্য তাহার চিরসাথী। সম্পদকে হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছে; বিপদ তাহার পথের পথিক। দেশকে ভালবাসিয়াছিল, দেশবাসীকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই না সে সর্ব্বত্যাগী! দেশের দুঃখ, দেশবাসীর দুর্দ্দশা তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়াছিল বলিয়াই না মরণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর পথে গমন করিয়াছিল? এ সেই লোক! ভক্তি গদগদ-কণ্ঠে সে 'মা' বলিয়া ডাকিত, মা, জননী জন্মভূমি আহ্বানে সাড়া দিতেন কিনা জানি না, তাহার দেশের লোক চক্ষুর সম্মুখে তাহার সেই জীর্ণবাসা, জীর্ণদেহা, হৃতসর্ব্বস্বা, মলিনাননা জননী জন্মভূমিকে দেখিতে পাইত। মনে হইত তাহার কণ্ঠের মাতৃনামই মূর্ত্তিধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা। যেদিন তাহার আহ্বান আসিল সমগ্র ভারতবর্ষ অবিচলিত নিষ্ঠাভরে দ্বিধাসঙ্কোচহীন পদ বিক্ষেপে তাহাকে অনুসরণ করিল। একদিকে ভারতবর্ষ, অন্যদিকে বৃটিশ সেদিন যে অভিনব দৃশ্য দেখিল, তাহা শুধু অভাবনীয় নহে, অবিস্মরণীয়ও বটে! এই সেই লোক! সেদিন গান্ধীজীও আচ্ছন্ন, অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। সেদিন শুধু ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়া এই মানুষটির পানে স্তব্ধ ও নির্ব্বাক নির্নিমেষে চাহিয়াছিল। সেই লোক একালে, এই পরাধীন দেশে, বিশ্বের অবজ্ঞাত দাসানুদাস জাতির মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া যেদিন প্রভাতের অরুণরাগরঞ্জিত ভারতের বিস্ময় বিমূঢ় নরনারীর স্তম্ভিতস্তব্ধ নয়ন সমক্ষে বিরাট বিশাল হিমাচলসদৃশ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইল, সেদিন সেই মুহূর্ত্তে শতাব্দীর পর শতাব্দীর স্তূপীকৃত বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা বিমুক্ত হইয়া মেবারের রাণা প্রতাপের বীর্য্য, মারহাট্টা ছত্রপতি শিবাজীর শৌর্য্য মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তেজোদ্দীপ্ত হইয়া নিখিল ভারতবর্ষের জাড্যকে যেন বেত্রাহত সুপ্ত সারমেয়ের মত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। মানুষটি কোথায় কেহ জানে না। জীবিত কিম্বা মৃত, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। তা পারে না সত্য; কিন্তু দিগন্ত হইতে দিগন্ত ব্যাপ্ত ভারতবর্ষের মানবদেহে যেখানে প্রাণের স্পন্দন আছে সেইখানে—সেই বক্ষে কাণ পাতিলে শুনা যাইবে, প্রতি স্পন্দন একই ভাষায় কথা কহিতেছে। ভাষা দুর্ব্বোধ্য নহে, বলিতেছে, নিরাপদ্দীর্ঘজীবেধু। কোটী কোটী নরনারীর শুভেচ্ছা কি বৃথা হইতে পারে? কিন্তু যদি বৃথাই হয়, তাহাতেই বা কি! হোক বৃথা, হোক মিথ্যা। তথাপি এই ভারতবর্ষ উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করিবে। সুদীর্ঘ দিবস ও বিনিদ্র রজনীর মাঝে মর্ম্মর ধ্বনির সঙ্গে হৃদয়ের উত্থানপতন অনুভব করিবে। প্রোষিতভর্ত্তৃকার উপমা আমি দিব না; কিন্তু দিলেও অন্যায় হইত না। এমন অনন্ত আশা লইয়া কি কেহ কোন কালে কাহারও আসা-পথ চাহিয়াছে?

সে যাহাই হোক, বেত্রাঘাতে সুপ্তিভঙ্গে মানুষ দেখিল তাহাদের সেই পরম প্রিয়, পরম আদরের মানুষটি মূর্ত্তিমান গীতার মত বলিতেছে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—

কোথায় ছিল স্কটলণ্ডের পর্ব্বতশিখরনিবাসী রবার্ট ব্রুস! কোথায় ছিল ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি! কোথায় ছিল জর্জ্জ ওয়াশিংটন! কোথায় ছিল রাশিয়ার ট্রট্স্কি লেনিন! কোথায় ছিল বাঙ্গলার বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া—যশোরের প্রতাপাদিত্য, কোথায় ছিল বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন রাজা নবাব সিরাজদ্দৌলা! বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ সেই একটি মানুষের মধ্য দিয়া যেন শত শতবৎসরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রত্যক্ষীভূত হইতে দেখিল। সুষুপ্ত হৃদয়ের তারে তারে ধীর মধুর করুণ গীতিস্বরে যে বাসনা ঝঙ্কৃত হইতেছিল মানুষ অকস্মাৎ দেখিল সেই বাসনা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হইয়া, পৌত্তলিকের আরাধনার প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া মূর্ত্তিমান! বিশ্বাস করা কি সহজ,

না বিশ্বাস করিতে সাহস হয় ? আমরা যখন আয়র্লণ্ডের ডি ভেলেরার কাহিনী পাঠ করি, বুক দশ হাত হয়; ফরাসী বিপ্লব আমাদিগকে একটা অজানা অচেনা রাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়; আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আর কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের মহারণের পার্থক্য আমাদের নিকট অত্যন্ত অল্প বলিয়া অনুভূত হয়; ১৮৫৭ সালের ভারতের ইতিহাসখানিকে আমরা অন্তরের ফুলজল নৈবেদ্য সহযোগে পূজা করি! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! কল্পলোকে বিচরণে চির-অভ্যস্ত ভারতবাসী অকস্মাৎ একদিন দেখিল, স্বপ্ন নহে, ভ্রম নহে, গল্প নহে, গাথা নহে, কাহিনী নহে, অথচ স্বপ্নের মোহমদিরামণ্ডিত, গল্পের মত গঠন-পারিপাট্য, গাথার মত মধুর, কাহিনীর মত চিত্তবিভ্রান্তকর এই প্রত্যক্ষ দর্শন!

বিংশ শতাব্দীতে, অস্ত্রশিক্ষাহীন, শস্ত্রবলহীন দুর্ব্বল ভারতবাসী ভারতেরই সীমাভ্যন্তরে বৃটিশের রাজ্যের ভিতরে, বিতাড়িত বৃটিশের রাজ্যখণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিল! এমন লোকের জীবন বৃত্ত লিখিয়া ধন্য হওয়ার আগ্রহও যেমন স্বাভাবিক,পাঠক-পাঠিকার জনতাহওয়াও তেমনইস্বাভাবিক। যে গল্পে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের বর্ণনা আছে সে গল্প শুনিতে মৃতকল্পদেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়; আর সে গল্প লিখিতেও যেমন, শুনিতেও তেমন। সে গল্প যে গোটা জাতির সম্পৎ; সে গল্প ত কাহারও ইজারা মহল হইতে পারে না। তাই শুনিয়াছি, অনেকেই লিখিয়াছেন, এখনও লিখিতেছেন এবং আশা করিতে পারি যে, পরেও লিখিবেন। তাঁহাদের সহিত আমার বিরোধ নাই—বিরোধ হইতেও পারে না, কিন্তু আমার মুশ্‌কিল এই যে আমি কাহারও কোন লেখাই পড়ি নাই (মায় নিজের লেখা পর্য্যন্ত !) । সেই জন্য মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতেছি না ত? রোমন্থনে আমার জন্মগত ও প্রকৃতিগত অনভ্যাস, অপিচ নিদারুণ অরুচি আছে।

ক্রমশঃ

অচিন্ত্যভেদাভেদ মতবাদ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বিএস-সি

অশ্বত্থতলা ক্লাবের বৈদান্তিক (মায়াবাদী) বন্ধুকে চটাইয়াছিলাম। বেদান্তটা যে আমাদের একটা ফ্যাসান মাত্র তা আমিও বুঝি, তিনিও বুঝেন। শমদম তিতিক্ষাদি গুণসম্পন্ন লোকেরই বেদান্তে অধিকার। আমরা—যাহারা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কমিলে ভাবিত হই, ছেলেমেয়েদের পীড়ায় উদ্বিগ্ন হই, কেহ অপমান করিলে ক্রুদ্ধ হই, রাজনীতির তর্কের সময় উত্তেজিত হই—সে উক্ত শমদমাদি গুণসম্পন্ন এমন বলা যায় না।

তর্কটা এইরূপ হইয়াছিল। "জগৎ মিথ্যা", "হাঁ"; "যাহা কিছু দেখিতেছি সব মিথ্যা", "হাঁ"; "আপনি মিথ্যা", "আমি মিথ্যা" "হাঁ"। "শঙ্কর মিথ্যা—তাহার মায়াবাদ মিথ্যা ?" তিনি চটিলেন, "এ আপনি ফাঁকি ধরিয়াছেন"।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদটা—কতকটা স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism)এর মত। তবে উহা বেশ রসাল—অজ্ঞেয়বাদের মত শুষ্ক নয়। ঈশ্বর অচিন্ত্য-জীবের সহিত ভিন্নও বটেন, আবার অভিন্নও বটেন।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। ঘটিতে তরল জল রহিয়াছে। থালায় শক্ত বরফ রহিয়াছে। শীতের দেশে তুষার (snow) পড়ে—তুলার মত। ফুটন্ত জল উপিয়া যাইবার পূর্ব্বে কুজ্ঝটিকার মত দেখায়। মেঘেরও ঐরূপ মূর্ত্তি। বায়ুমণ্ডলে অজস্র জল রহিয়াছে—উহা অমূর্ত্ত বাষ্পীভূত। উগ্রতাপ বা বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে জলের অন্ত অন্তরও বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিগ্রাহ্য। জলের যে ঐ বিবিধ অবস্থার কথা বলা হইল উহার মধ্যে কোনটি উহার স্বরূপ অবস্থা ?

ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। অব্যক্ত ব্রহ্ম—ব্রহ্মের এক অবস্থা—ব্যক্ত ব্রহ্ম—বা বিশ্বরূপ ব্রহ্মের আর এক অবস্থা। দুইটা অবস্থার কোনটাই অসত্য হইবে কেন।

ভাগবতের গজেন্দ্রমোক্ষণ স্তোত্র—ব্রহ্ম স্তোত্র। উহাতে ব্রহ্মের ঐরূপ বর্ণনা আছে। "অরূপায়োরুরূপায় নমঃ"—তিনি অরূপ এবং উরুরূপ (বহুরূপ) তাঁহাকে নমস্কার। বিশ্বব্রহ্মরূপ অধিকরণে অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে জাত, ব্রহ্মরূপ কর্ত্তা দ্বারা কৃত, এবং ব্রহ্মই এই বিশ্ব হইয়াছেন।

> "যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ং" (ভাগবত)।
>
> "যস্মিন্নধিষ্ঠানে যত উপাদানাৎ যেন কর্ত্রা য স্বয়মেব ইদং—
> বিশ্বং ভবতি" (স্বামীটীকা)।
>
> "সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসং।
> বিশ্বাত্মানমজং-ব্রহ্ম-প্রণতোঽস্মি পরং পদং ॥ (ভা)

যিনি বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা, যিনি বিশ্ব এবং বিশ্বব্যতিরিক্ত যাহা কিছু, বিশ্ব যাহার সম্পত্তি, সেই জন্মহীন (অজ) বিশ্বের আত্মা যিনি, তাহার পরম পদকে নমস্কার করি।

মা ডাকলেন—বিশু চল একটু গঙ্গাস্নান করে আসি।

আমি বল্লাম—বেশ তো তোমার খেয়াল মা। একে সন্ধ্যা হয়ে আসছে তার ওপর দেখো দিকি, বোধ হয় ঝড় উঠবে এখুনি। আমি বাবা এখন স্নানটান করতে পারবো না।

…অগত্যা যেতে হ'ল।

প্রতিদিন আমরা এই ঘাটেই স্নানে আসি। কিন্তু একি! গঙ্গার জল হঠাৎ কমে গেল কেন? এযে কেবল বালি! বাঃ আকাশের রং, জলের রং, মাটির রং সব যে এক হয়ে গেল! হঠাৎ একি হল! এযে এক অপূর্ব্ব, অদ্ভুত দৃশ্য! রংটা ঠিক লালও নয়, অথচ গেরুয়াও নয়। সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন—তারই শেষ রশ্মি চারিধারে বিচ্ছুরিত!……এ যেন অদ্ভুত এক স্বপ্নের রাজ্য! মাকে ডাকলাম—মা…! দেখলাম মা তো পাশে নাই…। তিনি ততক্ষণ আরও এগিয়ে গেছেন—সেখানে একজন লোক পূজার মগ্ন। কিন্তু মার দৃষ্টি ছিল গঙ্গার অপর পারে! মুখে তাঁর এক অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছে। মাকে এমন ভাবে এই প্রথম দেখছি। মা মুখে কিছুই বলতে পারলেন না, কারণ তিনিও কম অভিভূত হয়ে পড়েন নি। কেবল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল!…একি!… যে বাদ্যকে কোন মন্দির হতে নিঃসৃত কোন দেবদেবীর পূজার বাদ্য বলে ভ্রম করেছিলাম সে যে ঐ অপর পারের বিশাল জাতীয় পতাকার তলে একত্রিত ঐ বিশাল বাহিনীর রণবাদ্য!…পূজারই বাদ্য তবে—দেশমায়ের পূজা। ভারতে এ দৃশ্য তো কখনও স্বপ্নেও দেখি নাই!…দেখতে লাগলাম সেই ঝড়ো হাওয়ায় আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা আকাশে উড়ছে; কিন্তু ঝড় না উঠলে এতো বড় পতাকা হয়ত উড়তো না। সময়, স্থান এবং দৃশ্য আমাদের মত মৃতের দেহেও প্রাণের স্পন্দন জাগায়।

…এ পারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওপারের দৃশ্য —কানে ভেসে আসতে লাগলো—পূজারীর উচ্চারিত মন্ত্রের সুমধুর স্বর, আর ওপারের বাদ্যের রেশ।

…মনে হ'ল মা গঙ্গা যেন বলছেন—ও রে অবুঝ। আর সময় আসবে না, এই বেলা পার হয়ে যা!

ওপারের ওরা ছিল রণমদে মত্ত, তাই হয়তো মার স্বর শুনতে পেল না। আর এপারের আমরা মার সে আহ্বান শুনেও গা ঝেড়ে উঠতে পারলাম না—শতাব্দীর আলস্য ছেড়ে। …দৃষ্টি গঙ্গার দিকে পড়তে দেখলাম জল বাড়ছে। পূজারী মার দিকে একবার তাকালেন, আবার আমার দিকে। বল্লেন—যাও আর সময় নেই!—সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এলো রণবাদ্যের গম্ভীর শব্দ। মা পূজারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি? উত্তর—ঐ দেখো ও-পারে তোমার ছেলের মত শত শত ছেলে জাতীয় পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আজ পণ করেছে কি জানো? দেশমাতার বন্দিত্ব মোচন করবে!…আমি একজন পূজারী, জগৎ পিতার কাছে তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি।

পূজারীকে দেখলাম।…যেন চিরপরিচিত, তবু এই পরমাত্মীয়কেও চিনতে পারলাম না!

পূজারী মাকে বল্লেন—দেশ-মায়ের সেবায় তোমার ছেলেকেও-দাও মা। আর কি সময় পাবে! মা, তুমি কি জান না যে মা বলে তোমার ছেলের ওপর তোমার যেমন অধিকার আছে, ঠিক সেই অধিকারই আছে দেশ-মায়ের—তার ছেলেমেয়েদের ওপর! যাও যুবক—জল বাড়ছে।

মাকে বল্লাম—যাই মা।

মা সাধারণ মায়ের মন নিয়ে হাত বাড়ালেন আমায় ধরতে। পূজারী গম্ভীর স্বরে ভৎর্সনা করলেন—স্বার্থপর।

মা তখন মায়ের মত আমায় বল্লেন—বল আসি।

বল্লাম—আসি।

মা বল্লেন—এসো।

পূজারী এক অদ্ভুত হাসি হাসলেন।

গঙ্গার জল তখন বেশ বেড়েছে—এক বুক জল। আমি ঝাঁপ দিলাম।

…কানে এলো ভাই ডাকছে—দাদা? মুখ ফিরিয়ে বললাম—পিছু ডাকলি!

ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাই তখনো বলছে—দেরী হয়ে গেল যে!

বল্লাম—হ্যাঁ সত্যই দেরী হয়ে গেল।…আজ সপ্তমী না? ভাই বল্লে—"হ্যাঁ কাল মহাষ্টমী।"

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবস্থা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

(১)

কয়েকদিন হ'ল কলিকাতায় একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারতীয় ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা দেখা করতে এলেন—ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষ এক লাখ ছিয়াশি হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। সবিস্তৃত বিবরণ শোনার পর কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করেছিলাম—বলতে পারেন ব্যাঙ্কের যত কেস হয় প্রায় সর্ব্বত্রই ভারতীয় ব্যাঙ্ক জড়িত থাকে কেন? বিদেশী ব্যাঙ্কে এ রকম ব্যাপার দেখতে পাই না? ভদ্রলোক প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হলেন, বোধ হয় আশা করেছিলেন দেশী, বিদেশী সর্ব্বত্র একই হাল, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যুক্তি তর্ক চলে না। তিনি তখন বল্লেন—"আমাদের দোষগুলি যদি আপনার নজরে পড়ে থাকে, আমাদের জানালে, আমরা সাবধান হতে পারি।"

উপরের চুরিটী আর একটু তলিয়ে দেখলেই অনেকগুলি ব্যাপার সকলের চোখে পড়বে। আমি সর্ব্বদা বলে থাকি "চুরি যেখানে সেখানেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত অসাবধানতা থাকতেই হবে।" তদন্ত করতে গিয়ে কি পাওয়া গেল—মাস খানেক আগে নূতন লোক রাখা হয়েছে—কোথাকার লোক কি বৃত্তান্ত কোন খোঁজ করা হয় নাই; দুইজন গণ্যমান্য পরিচিত লোকের নাম দরখাস্তে বসানো ছিল, নিয়োগের আগে তাঁদের কাছে কোন খোঁজ নেওয়া হয়নি। চুরির পর দেখা গেল তাঁরা উহাকে মোটেই চেনেন না। দেশের ঠিকানায় সে নামের লোক পাওয়া গেল না; এমন কি কালীতলায় যে ঠিকানা ব্যাঙ্কে দেওয়া ছিল সেখান থেকে চুরির সাত দিন আগেই তিনি সপরিবারে সরে পড়েছেন। বেশ বোঝা গেল ভদ্রলোক চুরি করার মতলব এঁটে বেনামীতে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিলেন। জনসাধারণের টাকা, ব্যাঙ্কের কত বড় দায়িত্ব—অথচ লাখ, লাখ টাকা হাতে দেবার আগে লোকটীর একটু পরিচয় নেওয়া কেহ দরকার মনে করলেন না। টেলিফোন তুলে Referee দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেই মুহূর্ত্তে পরিচয় নেওয়া চল্‌তো, নিদেন পক্ষে তিন আনা খরচ করে চিঠি লেখাও চল্‌তে পারতো। ব্যাঙ্কের নিয়ম ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা জমানত নেওয়া তাও পুরো নেওয়া হয় না। যে লোক দিনান্তে চার পাঁচ লাখ টাকা লেন দেন করবে তার কাছ থেকে ৫০০০৲ হাজার টাকা জমা নেওয়ার ব্যবস্থা খুব সমীচীন মনে হয় না। অন্যান্য অসাবধানতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ নাই করলাম। এই সব দেখে শুনে অনেক সময় মনে হয় ব্যাঙ্ক পরিচালকেরা অনেক চুরিতে ভাগ বসান।

ব্যাঙ্কে চুরি, জুয়াচুরি হয় নানান রকম, কিন্তু দুইটা জিনিষ সর্ব্বত্র দেখা যায়। প্রথমতঃ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা নিজেরা, কোন কোন ক্ষেত্রে, বাহিরের লোকের সাহায্যে চুরি করে; দ্বিতীয়তঃ, বাইরের লোক ব্যাঙ্কের অসাবধানতা এবং লোভের সুযোগ নিয়ে থাকে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

Crossed cheque ডাকে পাঠানো দৈনন্দিন ব্যাপার। সকলে ভাবেন cross করলেই নিরাপদ—ভাঙ্গাতে হলে ব্যাঙ্ক মারফত ভাঙ্গাতে হবে। অথচ Crossed cheque ভাঙ্গানো যে কত সহজ ভুক্তভোগী না হলে অনেকেই উপলব্ধি করেন না। দেশী ব্যাঙ্কগুলি বেঁচে থাকলে বেনামীতে একাউন্ট খোলা অনায়াসসাধ্য। কয়েক বছর ধরে ডাক থেকে চেক চুরি আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছিল। চুরি হত ডাকঘর ও ব্যাঙ্ক থেকে। ডাক-পিয়নরা চিঠি দেখে—ভেতরে কি আছে আন্দাজ করে খুলে দেখে নেয়। কিছু না পেলে বিলি হয়; চেক পেলে চিঠি গায়েব হয়ে যায়। আর চুরি করে ব্যাঙ্কের পিয়ন। ডাকঘর থেকে চিঠি আনার সময়। এ ছাড়া আর একরকমের চুরিও দেখা গেছে। পোষ্ট অফিসে বক্স নাম্বারে চিঠি অনেকের আসে। এই বক্সগুলিতে অল্প দামের তালা লাগানো থাকে, যে কেউ এসে তালাখুলে চিঠি নিয়ে যেতে পারে। কলেজের একটী ছেলেকে চিঠি নিয়ে সরে পড়ার সময় সাদা পোষাক পরা মোতায়নী সিপাই ধরে ফেলে। কতকগুলি পুরানো কেসের সঙ্গে সঙ্গে কিনারা হয়ে গেল। চুরির পর চেক ভাঙ্গানো অতি সহজ। কোন দেশী ব্যাঙ্কে—ছোট হলে কথাই নেই—বিনা পরিচয়ে মিথ্যা নাম ঠিকানা দিয়ে কয়েক টাকা জমা দিয়ে একাউন্ট খোলা; দিন বা পরের দিন crossed চেকখানি জমা দেওয়া এবং চেক ভাঙ্গিয়ে এলে কয়েক টাকা ফেলে রেখে টাকা তুলে নেওয়া। চেক হারিয়েছে খবর পেতে প্রেরকের অনেক সময় লেগে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে দুই তিন মাস লেগেছে।

অল্প কয়েকদিন হল একটী লোকের সাত বৎসর জেল হয়েছে। এর কাজ ছিল ডাক পিওনদের কাছে চেক্ কেনা এবং ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে বিভিন্ন নামে একাউন্ট খুলে চেক্ ভাঙ্গিয়ে নেওয়া। কয়েক মাসের ১৮ খানি চেকে ৫০,০০০৲ হাজার টাকা নিতে পেরেছিল।

Crossing তুলে ফেলেও Bearer চেক করা চলে এবং দু এক ক্ষেত্রে এই চতুর লোকটি তাও করেছিলেন। সমস্ত কেসগুলিতেই ভারতীয় ব্যাঙ্ক জড়িত।

চেক চুরি যখন প্রবলভাবে চলছে—বিনা পরিচয়ে একাউন্ট খুলতে নিষেধ করে নির্দ্দেশ পাঠালাম কিন্তু ফল হল উলটো—কোন আইনে আমি হুকুম জারি করেছি তার জবাব দিহি করতে হল অনেক। হুকুম নির্দ্দেশ মাত্র। আমার নির্দ্দেশ হল অগ্রাহ্য। দু এক জায়গায় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী কিছু পয়সা খেয়ে পরিচয়পত্র সই করে দিলেন; সুন্দর ব্যবস্থা। কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে—কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার কয়েকটী ব্যাঙ্ক উপর্য্যুপরি এই রকম একাউন্ট খুলে চুরির সাহায্য করে চলেছে অথচ এদের আইনের ফাঁদে ফেলতেও পারা গেল না। পরিচালকদের সাধু উদ্দেশ্যে সন্দেহ হওয়া কি অস্বাভাবিক?

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতি করা বা ইহাদের প্রতি সাধারণের আস্থা হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কতরকমের কেস আমরা দেখেছি এবং ব্যাঙ্কের কোথায় দোষ ছিল, সাধারণের বিশেষ করে ব্যাঙ্কারদের জানিয়ে দিয়ে সাবধান করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইতি

শ্রীসমর সরকার এম্-এ, বি-টি, বি-এল্

সমুদ্রের ধারে বালির উপর একটা ডেক্-চেয়ারে শীর্ণ দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছে জয়তী। সামনেই উদার সমুদ্র অসীম নীলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তীরের দিকে বিপুল গর্জনে একের পর এক বিরাট ঢেউ আছ্ড়ে ভেঙ্গে সাদা হয়ে যাচ্ছে, আর কিছুদূর থেকে সমুদ্র যেন শান্ত হয়ে গেছে, শুধু কালো জল কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে উঠ্ছে। জয়তী চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে আছে—করুণ চোখের উপর পড়েছে দিনান্তের রক্তিম আভা। পাশেই একটা ছোট্ট টিপয়ের উপর খান দুই বই, আর প্লেটে ঢাকা জলের গ্লাস। জয়তীর মনের সামনে একের পর এক কতকগুলা স্মৃতির ফিল্ম্ সরে যাচ্ছে।

বি-এ পাস করার পর একদিন চিরঞ্জীতের সঙ্গে দেখা তার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।

'নমস্কার, মিঃ ব্যানার্জী—'

'ওঃ আপনি, মিস্ মিটার! নমস্কার। কেমন আছেন?'

'ভালই। আপনি এবার কি পড়ছেন—এম্-এ পড়্ছেন ত ইংলিশে?'

'তাছাড়া আর কি করি—' স্মিত হাস্যে বল্লে চিরঞ্জীৎ 'আপনিও আসছেন ত?'

'হ্যাঁ, আমাদের কলেজের কারোর খবর জানেন?'

গল্প করতে করতে ওরা ভর্তি হতে গেল এম্-এ ক্লাসে।

* * * * * *

'আসুন না আজ বিকালে ইডেন গার্ডেনে—সেখান থেকে গঙ্গার ঘাটে একটু বেড়াতে যাওয়া যাবে।'

'বেশ ত, আমি নিশ্চয়ই আস্‌ব।'

'আপনি কিন্তু ডক্টর রায়ের শেলীর নোটটা নিয়ে আস্‌বেন। আর সেই সঙ্গে আপনার কাছ থেকে শেলীর Pantheismটা বুঝে নেব। আপনি ত master of Shelley হয়ে বসে আছেন।'

'তাই আমাকে মাষ্টারী করতে ডাকছেন?' হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌ল চিরঞ্জীৎ।

* * * * * *

চলুন মিস্ মিটার, আজ ক্লাশ পালিয়ে মেট্রোতে 'মেরী ওয়ালেস্কা' দেখে আসা যাক্।

অন্ধকার হলে ওরা বসে আছে পাশাপাশি। সামনে নেচে চলেছে একটি মধুর প্রেম-কাহিনী, যার নায়ক ছিলেন বিশ্ববিজয়ী নে পোলিয়ঁ।

জয়তীর ডান হাতখানি চিরঞ্জীৎ আস্তে আস্তে টেনে নিল নিজের বাম হাতের মধ্যে। জয়তী বাধা দিলে না, নিঃসঙ্কোচে তুলে দিলে নিজেকে চিরঞ্জীতের হাতে। চিরঞ্জীৎ হাতের উপর একটু চাপ দিয়ে ডাক্‌লে আবেশময় লঘুকণ্ঠে—'জয়তী!'

'কি বল্‌ছ চিরঞ্জীৎ?'—প্রেম-বিনিময় করলে জয়তী।

* * * * * *

চিরঞ্জীৎ, কেন তুমি আমাদের প্রেমকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছ? আমি তোমাকে ভালবাসি, এবং বাস্‌ব চিরকাল, তুমিও তাই করবে, প্রেমের সার্থকতা কি তাতেই নয়?

'জয়তী, তুমি কাব্য রাখ। সংসারে নেমে এস। Platonic love কাব্যের কথা—বাস্তব জগতে তার স্থান নেই। তুমি আমাকে ভালবাস, কিন্তু তার জন্য তোমার ত্যাগ কই? তোমার বাবা-মার এই বিয়েতে মত নেই—সেইটাই কি আমাদের ইতিহাসের বড় কথা হবে? তোমার এইটুকু সাহস নেই তুমি আমার হাত ধরে পৃথিবীতে বেরিয়ে আসতে পার?'

'চিরঞ্জীৎ, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না; কিন্তু সামাজিক নীতি অস্বীকার করে তাকে আঘাত করা কি উচিত?'

'যাক্, তোমার কাছ থেকে সামাজিক নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনার মত অবকাশ আমার নেই। তুমি তোমার

Platonic love নিয়েই থাক। জেনে রাখ আজ থেকে আমরা পরস্পরের কাছে মৃত।'

জয়তীর উত্তরের কোন অপেক্ষা না করে চিরঞ্জীব ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

* * * * * *

জয়তীর মনটা ডুকরে উঠল, মনের ব্যথা লাঘব কর্‌বার জন্য সে ধীরে ধীরে পাশের টেবিল থেকে একখানা বই নেবার জন্য হাত বাড়ালে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল একটি যুগলের প্রতি—তারই প্রায় হাত চারেক দূরে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না জয়তী। হ্যাঁ, চিরঞ্জীব! তার দীর্ঘ গৌর দেহ যৌবনের শিখরে আরোহণ করে উন্নত হয়ে উঠেছে।

'চিরঞ্জীব—'

চিরঞ্জীব চম্‌কে উঠল—'কে? জয়তী? সে কি বেঁচে উঠেছে তার কবর থেকে?'

শ্রীলতা বল্‌লে—'তোমাকে ডাকৃছেন উনি।'

ওরা এল জয়তীর সামনে। একি সেই জয়তী?

'কেমন আছ চিরঞ্জীব? বছর পাঁচেক তোমার খবর পাইনি কোন।'

ভাল—'কিন্তু তুমি?' ভীরু চিরঞ্জীবের কণ্ঠস্বর।

জয়তী চিরঞ্জীবের প্রশ্নের উত্তর দিলে না। বল্‌লে—'তুমি বেশ লোক ত', এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না? বেশ, আমিই আলাপ করে নিচ্ছি। ইনি তোমার স্ত্রী নিশ্চয়?'

'তোমার নামটি কি ভাই?'—জয়তীর কণ্ঠে পরিচিতার স্বচ্ছন্দ সুর।

'শ্রীলতা—'

আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় তাই তুমি বল্‌ছি, রাগ কর্‌ছো না ত? জয়তীর মিষ্ট কথায় শ্রীলতার ভারী ভাল লাগ্‌ল জয়তীকে।

কিছুক্ষণ আলাপের পর ওরা বিদায় নিলে। কথা দিলে জয়তীদের বাড়ী 'সাগরিকা'তে ওরা আসবে।

ফেরার পথে শ্রীলতা বল্‌লে চিরঞ্জীবকে—'কই, তুমি ত আমাকে কোনদিন বলনি ওঁর কথা?

চিরঞ্জীব জয়তীমনস্ক হয়েছিল। প্রথমটা ভাল করে শোনেনি শ্রীলতার প্রশ্ন, তাই বল্‌লে—'কি বল্‌ছ?'

শ্রীলতা বুঝ্‌লে চিরঞ্জীবের মন কোথায় রয়েছে। সে তার প্রশ্নটা আবার কর্‌লে।

'জয়তী আমার সঙ্গে বি-এ ও এম্‌-এ পড়ত।' সংক্ষিপ্ত উত্তর চিরঞ্জীবের।

'সে ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু ওঁর কথা আমার কাছে হঠাৎ চেপে গিয়েছিলে কেন?'

'হয়ত বাদ পড়ে গিয়েছিল অন্যমনস্কতার জন্য।' চিরঞ্জীব এখনও চেপে গেল জয়তীর সঙ্গে ওর পূর্বসম্পর্ক।

ঠোঁট উল্‌টিয়ে বল্‌লে শ্রীলতা—'কি জানি বাবা, কিছু ব্যাপার ছিল নাকি তোমার ওঁর সঙ্গে?'—স্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর সন্দেহের শৈশব।

পরের দিন বিকালে একটু আগেই শ্রীলতা বেরুল বেড়াতে চিরঞ্জীবের সঙ্গে। প্রথমেই ও গেল জয়তীর বাড়ী। জয়তী ওদের পেয়ে আনন্দে মুখরা হয়ে পড়ল। ও যেন খুশীর আকাশে একটা বলাকা, মুক্তপক্ষ হয়ে উড়ে চল্‌ছে। মাঝে মাঝে খুকখুক্‌ কাশি ওকে বাধা দিতে লাগ্‌ল, আর পরিশ্রান্তি।

শ্রীলতা বল্‌লে—'আপনি অত বেশী কথা কইবেন না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—আমরা এবার উঠি।'

জয়তী বল্‌লে—'আর একটু বস। তোমরা এসেছ, আমার কত আনন্দ? চিরঞ্জীবের দিকে চেয়ে বল্‌লে—হয়ত তোমাদের সঙ্গে আর দেখাই হবে না পরে। খোঁজ ত' আমার নেবে না।'

শ্রীলতা বল্‌লে—'উনি না নিলেও আমি নেব।'

জয়তী চিরঞ্জীবের সঙ্গে তাদের ছাত্রজীবনের গল্প কর্‌তে লাগ্‌ল। শ্রীলতা হল শ্রোতা। হঠাৎ এক সময়ে শ্রীলতার নজর পড়ল জয়তীর বিছানার ধারে তেপায়া টুলের উপর দুখানি বইয়ের প্রতি। ওর মনে পড়ল এই বই দুখানিই সে যেন সমুদ্রের ধারে জয়তীর কাছে দেখেছিল। বুঝ্‌লে বই দুখানি ওর খুব প্রিয়। সামান্য একটু ঔৎসুক্য জাগ্‌ল শ্রীলতার: হাত বাড়িয়ে একখানা বই টেনে নিলে—রবীন্দ্রনাথের মহুয়া। প্রথম পাতা খুল্‌তেই চেনা অক্ষর পড়্‌ল চোখে—'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজনে চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।' সই রয়েছে চিরঞ্জীবের—তারিখ পাঁচ বছর আগেকার।

ওর শরীরের রক্তটা ছলাৎ করে উঠ্‌ল। কম্পিত হাতে এখানা রেখে অপর বইখানা টেনে প্রথমেই উল্টাল অভিজ্ঞানের জন্য—চিরঞ্জীৎ মুক্তা ছড়িয়ে গেছে শেলীর পাতায়—

The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

শেলীর লাইনগুলো শ্রীলতার বুকে হান্‌লে শেল। ভদ্রতা রক্ষার জন্য আর দু একটা পাতা নেড়ে-চেড়ে ও বইখানিকে রেখে দিলে যথাস্থানে। জয়তী আর চিরঞ্জীতের সম্পর্ক বুঝ্‌তে ওর আর বাকী রইল না কিছুই। ওর সামনের পৃথিবী যেন দুলে উঠ্‌ল, দৃষ্টিশক্তি যেন হয়ে গেল ঝাপসা, কি একটা নৈরাশ্যে ও যেন আচ্ছন্ন হল। তবু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখলে শ্রীলতা।

সন্ধ্যার একটু আগে ওরা উঠল। শ্রীলতা বল্‌লে—আপনার আজ আর বাইরে যাওয়া হল না।

জয়তী বল্‌লে—'তার চেয়ে আমার শরীরের অনেক উপকার হল তোমাদের দেখে। আবার আসছ কবে?'

শ্রীলতা অধর দংশন করে মনে মনে বল্‌লে—'হবে না, পাঁচ বছর পরে নাগরের দেখা পেয়েছ।' মুখে বল্‌লে—'আসব আর একদিন।'

ওরা ফির্‌ল বাড়ীর দিকে।

পথে শ্রীলতা কোন কথা বল্‌লে না চিরঞ্জীতের সঙ্গে। ওর সর্বশরীর তখন দহন কর্‌ছে ঈর্ষ্যার অনল। চিরঞ্জীৎকে ও নিজের বলেই জানে, সে যে কোনদিন আর কারও ছিল এ-চিন্তাও সে মনে সইতে পারে না। চিরঞ্জীৎ এতদিন তাকে যে-ভালবাসা দিয়ে এসেছে সেটা আজ তার মনে হল শুধুই অভিনয়ের আবরণে ছলনা। কোনদিন কিন্তু সে ধর্‌তে পারে নি যে চিরঞ্জীতের সোহাগ-আদর-অভিমান সবই মৌখিক। একদিন যে সে অন্যের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করেছিল, কোনদিন শ্রীলতা ত' সে সন্দেহ কর্‌তে পারে নি! জয়তী-চিরঞ্জীতের ব্যাপার তার জানা না থাক্‌লেও, সে যে প্রমাণ দেখেছিল তাতে দুজনের অতীত সম্পর্ক সম্বন্ধে তার এতটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল না। শ্রীলতার যেন মনে হল জয়তীর কাছে সে পরাজিত, অপমানিত হয়েছে। জয়তী যে-ফল একবার আস্বাদ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, শ্রীলতা সেইটাই পথের ধার থেকে কুড়িয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করেছে। ঘৃণায় শ্রীলতার নরম ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হল। পাশে চলমান চিরঞ্জীতের প্রতি একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ্‌লে চিরঞ্জীৎ আত্মসমাহিত হয়ে চলেছে, শ্রীলতা যে পাশে পাশে চলেছে সে হুঁসও বুঝি তার নেই। শ্রীলতা আরও জ্বলে উঠল, তার ইচ্ছা হল দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে শান্ত হয়।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে শ্রীলতার দেখা হল এক পরিচিতার সঙ্গে। সে দাঁড়িয়ে একটু আলাপ কর্‌লে। চিরঞ্জীৎ গতি রোধ করে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের আলাপ শেষ হতে চিরঞ্জীৎ শ্রীলতাকে বল্‌লে—এস লতা, এইখানে একটু বসা যাক্ দুজনে।

শ্রীলতা কোন কথা না বলে এগিয়ে চল্‌ল। চিরঞ্জীৎ কিছু বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ক্রোধে তার মুখ গম্ভীর। চিরঞ্জীৎ বুঝতে পারলে না কি ব্যাপার হয়েছে। সে ওর কাঁধের উপর আল্‌তোভাবে হাত রেখে প্রীতিভরে ডাক্‌লে—লতু……

শ্রীলতা ছিট্‌কে সরে গিয়ে বল্‌লে—'আমাকে ছুঁয়ো না, ভণ্ড কোথাকার—'

চিরঞ্জীৎ এতক্ষণে আঁচ করে নিলে যে শ্রীলতার এই অগ্নিময় ব্যবহার নিশ্চয়ই জয়তীর সঙ্গে তার সম্পর্কের সন্দেহ-প্রসূত। পাছে সমুদ্রের ধারে একটা এমন কিছু ঘটে যা' অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই ভয় করে' চিরঞ্জীৎ আর কিছু বল্‌লে না। আর মিনিট কয়েক গেলেই তারা বাড়ী পৌছাবে, তখন শ্রীলতাকে প্রশমিত করাই সুবিধা। সে ভাবতে লাগল—কি সে করেছে যে জন্যে শ্রীলতা তার উপর রাগ কর্‌বে? শ্রীলতাকে কি সে হৃদয়-ভরা ভালবাসা দেয় নি? কোন কার্পণ্য কি সে করেছে? জয়তীর সঙ্গে অতীতে যা ঘটেছে সে ত' বিস্মৃতির অতলতায় লুপ্ত হয়ে গেছে। জয়তীর জন্য কোনরকম দুর্বলতা পোষণ করে সে ত' শ্রীলতাকে তার প্রাপ্য থেকে একাংশও বঞ্চিত করে নি। তারুণ্যের আকাশে প্রভাত রবির দু' একটা নবরশ্মি যে আলোকপাত করেছিল সে ত' কবে মিলিয়ে গেছে—আকাশের শূন্যতায় কোন দাগ না রেখেই। আজ শ্রীলতা কেন কল্পনায় সেই আলোক দেখে উষ্ণ হয়ে উঠবে? বিয়ের

পরেই সে শ্রীলতাকে জয়তীর কথা বলে নি, কারণ সে চায় নি তাদের দুজনের প্রেমের সম্পর্কের মাঝখানে এমন একজন এসে দাঁড়াক, যে প্রেমকে অবমাননা করেছে, প্রেমের মর্য্যাদা দেয় নি। জয়তীকে সে তাই স্মৃতিগ্রাহ্য মনে করে নি। রাতের স্বপ্ন যেমন দিনের আলোয় আবছা হয়ে শেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনিই বাস্তবজীবনের জয়তীর কোন চিহ্ন রাখতে সে সচেষ্ট হয় নি। শ্রীলতাকে জয়তীর গল্প শোনান কি অবান্তর, গল্পের মতই হত না? এই সব চিন্তার মধ্যে সে বাড়ীতে এসে পৌঁছাল। হাত-পা ধুয়ে অন্যদিনের মত বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে শুয়ে রইল। সন্ধ্যা তখন ধীরে ধীরে বেশ জমে উঠেছে। সমুদ্রকে একটা জমাট কালো দেখাচ্ছে, আর গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যাচ্ছে ফস্ফোরসের চুম্‌কি। অন্যদিন এমনি সময়ে শ্রীলতা একটা মোড়া নিয়ে চিরঞ্জীতের পাশে গিয়ে বসে, কিন্তু সেদিন বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেলেও শ্রীলতা এল না। চিরঞ্জীৎ শ্রীলতার সঙ্গে একটা আপোষে আস্‌বার জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল। শ্রীলতা যে ভেবে রাখবে—চিরঞ্জীৎ আজও জয়তীর প্রেমকে ফুলদানিতে আরক দিয়ে জিইয়ে রেখেছে, সে তা' হতে দেবে না, কারণ কথাটা সত্যি নয়। জয়তীর বর্ত্তমানের শারীরিক অবস্থা দেখে চিরঞ্জীৎ আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সমবেদনা তার অনেক অংশ অধিকার করেছিল।

চিরঞ্জীৎ শ্রীলতার সন্ধানে বারান্দা থেকে ভিতরে এল। শোবার ঘরে দেখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শ্রীলতা শুয়ে। এমন অসময়ে শ্রীলতাকে শুয়ে থাকৃতে দেখে চিরঞ্জীৎ ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'লতু,তোমার শরীর খারাপ লাগছে?'

শ্রীলতা নিরুত্তর। চিরঞ্জীৎ বিছানায় উঠে আদর করে মাথায় হাত বুলাতে গিয়ে টের পেলে শ্রীলতা কাঁদছে। শ্রীলতার মুখখানি জোর করে টেনে এনে চিরঞ্জীৎ স্নেহকণ্ঠে বল্‌লে—'একি, তুমি কাঁদছ লতু? কেন?'

আদরের বাতাসে শ্রীলতার ক্রন্দনের গতিবেগ বেড়ে উঠল ও সেই অনুযায়ী তার শরীর ফুলে ফুলে, দুলে দুলে উঠতে লাগল। এর জন্য চিরঞ্জীৎ প্রস্তুত ছিল না। সে ভেবেছিল শ্রীলতা হয়ত তার সঙ্গে ঝগড়া করে জবাবদিহি চাইবে, কিংবা রাগের বশে তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবে। ও কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লে না যে এই ব্যাপার এতখানি গড়াতে পারে কি করে? কি করে এই অপ্রিয় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে তা সে ভেবে পেলে না। শ্রীলতার আঁচলখানি টেনে নিয়ে সে জোর করে শ্রীলতার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্‌লে—'ছিঃ, কেঁদ না লতু—তুমি কেন মন খারাপ কর্‌ছ বলত?—'

শ্রীলতা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস দমন করে অশ্রুসিক্ত আননে বল্‌লে—'জয়তীকে তুমি ভালবাস্‌তে এ কথা আমাকে বলনি কেন?'

আগামীবারে সমাপ্য

কবিতা-লক্ষ্মী

শ্রীবাণীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়

আসো নাই কতকাল! ছিলে দূরে দূরে!
এতদিন পরে মনে পড়িল বন্ধুরে?
একদা যৌবনে তুমি বাঁশিতে আমার
দিয়েছিলে বৈশাখের ঝড়ের ঝঙ্কার।
সুরে সুরে বিপ্লবের করিনু অর্চ্চনা।
সহসা মিলায়ে গেলে! করেছি কামনা
মনে মনে কতবার! হয়েছি নিরাশ।

আজ যবে সমাচ্ছন্ন মনের আকাশ
মেঘে মেঘে, শূন্য ঘরে কাঁদি একা একা,
সেইক্ষণে পুনরায় তুমি দিলে দেখা।
দেখিলাম—করুণায় ঢল ঢল আঁখি।
সর্ব্ব দুঃখ ভুলে গেনু কোলে মাথা রাখি।
জীবনের সাহারায় তুমি মরূদ্যান।
তুমি আশা, তুমি আলো, তুমি মোর প্রাণ

জার্ম্মানীতে ইঙ্গ-মার্কিন মিতালী

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, কারুর না কারুর উপর জুড়িয়া বসা। ইঁহারা যেখানে আস্তানা গাড়িয়াছে, সেখানকার রস নিঙড়াইয়া তবে ছিবড়ে সবাইকে দিয়াছে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি আজ টিউটন জাতির উপরে জাঁকিয়া বসিয়াছে। আমরা অবশ্য জাতিগত কোন বৈশিষ্ট্য লইয়া গবেষণায় ব্যস্ত নহি। কেন না Julian Huxley সাহেব বলিয়াছেন যে "Racialism is a myth, and a dangrous myth." আমরাও তাহা মনে মনে স্বীকার করি। কাজের মধ্যে তাহা করি-চাই-নাই-করি। কেননা ইংল্যাণ্ডে উইলিয়ম লডের নীতির তাড়া খাইয়া যাহারা গিয়া আমেরিকা মহাদেশের নিউ-ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের ধ্বজা তুলিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আজ নিশ্চিন্ত মনে নিগ্রোদের গুলি করিয়া বহাল তবিয়তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হাক্সলি সাহেবের নিজের দেশে ভারতীয়রা হোটেলে ঢুকিতে পায় নাই। যে গণতন্ত্রের ধ্বজা ইংল্যাণ্ড তুলিয়াছিল, তাহা স্মাটস্ সাহেবও বহন করিয়াছেন। তিনিও গণতান্ত্রিক মতে দক্ষিণ আফ্রিকায় Racialism যে myth তাহা প্রমাণ করিতেছেন। আসলে সবাই শুদ্ধচিন্তবাদী। যাক সে কথা, জার্ম্মানী ইংরেজের গণতন্ত্র ঠিক হজম করিতে পারিতেছে না। ইংরেজ যে প্রকারের গণতন্ত্র পরাজিত জার্ম্মানীর উপর চাপাইয়াছে তাহাতে জার্ম্মান জাতি ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছে। জার্ম্মান জাতির আজ আহার্য্য দ্রব্য কিছুই নাই। তারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, অথবা ইঙ্গ-মার্কিণ বোমা সবই জার্ম্মানীর ধ্বংস করিয়াছে। মার্কিণের বড় বড় সমর-নায়কেরা জাপানকে সায়েস্তা করিবার সময় উদগ্র ভাষায় বলিয়াছেন, যে জাপানের শিল্প ধ্বংস করিয়া দাও। জাপানকে কৃষিদ্রব্য উৎপাদনকারী জাতিতে পরিণত কর। জার্ম্মানী সম্বন্ধে অবশ্য সেই স্পর্দ্ধিত উক্তি বর্ষিত হয় নাই। তার কারণ জার্ম্মান জাতির শিল্পপ্রতিভা নষ্ট হইলে য়ুরোপীয় সভ্যতার পতন হইবে। কিন্তু এশিয়ার কোন জাতির শিল্পপ্রতিভা নষ্ট হইয়া গেলে তেমন কোন ক্ষতি নাই। আণবিক বোমার ছোটখাট পরীক্ষা কার্য্য অনায়াসেই জার্ম্মানীর উপর করা যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, কথা উঠিতে পারে তখন পর্য্যন্ত গবেষণার ফল পুরাপুরি সঠিক ছিল না। আমাদের বক্তব্য হইতেছে, ফল সঠিক হইলেও উহা জার্ম্মানির উপর পড়িত না, পড়িত এশিয়ার হতভাগ্য জাতিগুলির উপর। য়ুরোপ ও আমেরিকা যে সৌভাগ্য আজ সঞ্চয় করিয়াছে তাহা এশিয়ার রক্ত শুষণ করিয়াই। তাহা লইয়া আক্ষেপ করিয়া কি হইবে। তবু ধরিয়া লইতে হইবে যে ইংরেজ জাতির গণতন্ত্র পৃথিবীর সেরা। কিন্তু সেরা জিনিষটি জার্ম্মানীতে গিয়া দানা বাঁধে নাই। কেননা, নিত্যই অভিযোগ আসিতেছে, জার্ম্মানীর খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ। রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংরেজ অধিকৃত এলাকার সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিতেছে না বলিয়া অভিযোগ প্রতিনিয়তই আসিতেছে। কে কাহার সঙ্গে সহযোগিতা করে নাই তাহা লইয়া সবার চাইতে ইংরেজের অভিযোগ বেশী। কিন্তু, কেন এই অভিযোগ? ইংরেজ ও আমেরিকার, উভয়েরই জার্ম্মানীর শিল্প সম্পদের প্রতি লোভ আছে কিন্তু যে লোকগুলি এই অতুল শিল্প-সম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহারা বাঁচিয়া থাকুক চাই না-ই থাকুক তাহাতে আসিয়া যায় না। ধুরন্ধর সাংবাদিকেরা খবর দিতেছেন যে ইংরেজ-অধিকৃত জার্ম্মান এলাকায় খাদ্যপরিস্থিতি দিনে-দিনে চরম অবস্থায় পৌঁছাইতেছে। ইহা বাঙ্গালা দেশ নহে, যে কুকুরে আর মানুষে একই খাদ্য দ্রব্য লইয়া যুদ্ধ করিবে, এবং আর সবাই নিশ্চিন্ত মনে তাই দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিবে। জার্ম্মান জাতির যদি ঐরূপ কোন দৃশ্য দেখিতেই হয় তবে তাহারা তাহাদের মতন করিয়া দেখিবে। একথা গণতন্ত্রবাদী ইংরেজ জানে। তাই মিত্র মার্কিণদের ডাকিয়া কহিতেছে, যে ভাবেই হোক, তোমাদের ও আমাদের অধিকৃত জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক সমস্যাটা একই তক্তাপষে বসাইয়া বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। আমেরিকা তাহাতে আপত্তি করে নাই; না করিবার কারণ রাশিয়া। মার্কিণরা ইংরেজদের অষ্টে-পিষ্টে ললাটে বাঁধিয়াছে ও নিজেরাও খানিকটা পরিমাণে বাঁধা পড়িয়াছে, অবশ্য এমন ছোটখাট বাঁধা পড়ায় মার্কিণরা ঘাবড়ায় না, যদি য়ুরোপের বাজার ঠিক থাকে। কিন্তু এইখানেই রাশিয়া গোল পাকাইয়াছে, বলকানের মধ্যে রাশিয়া যে ভাবে হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, ও বাণিজ্য ব্যবস্থার নোতুন নোতুন সব সম্বন্ধ বলকান শক্তিবর্গের সহিত পাতাইতেছে, তাহাতে মার্কিণদের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।

ইংল্যাণ্ডে অবশ্য শ্রমিক মন্ত্রিসভা আছে, এবং তাহারা রাশিয়ায় Good Will Mission-ও পাঠাইতেছে কিন্তু তাহাতে ঘাবড়াইবার কারণ নাই। কেননা ইংল্যাণ্ডের খাদ্য নাই। যদি জার্ম্মানীর খাদ্য সমস্যা মিটাইতে হয় তবে মার্কিণদের দরজায় ধর্ণা না দিয়া উপায় নাই। যে ভাবেই হোক ঘুরিয়া-ফিরিয়া মার্কিণদের সঙ্গে আঁতাত করিয়া চলিতে হইবে। তাই জার্ম্মানীতে যাহাতে Economic front-এ সেই আঁতাত রক্ষা হয় তার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মত হইতেছে চেষ্টার প্রয়োজন নাই, উহা ত অনিবার্য্য ঘটিবেই। কাজেই জগতবাসীর উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এত যাহার করিয়া যে রাশিয়ার আতঙ্কগ্রস্ত জগতবাসীর সম্মুখে দিন দিন চলিতেছে, সে রাশিয়াই কিনা শেষে টেক্কা মারিল। অর্থাৎ জার্ম্মান জাতির উপর রাশিয়ার সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে ও

জার্ম্মান জাতির নিকট হইতে রাশিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতেছে। ৮ই আগষ্ট (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ) ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, These men come from the shattered idle Ruhr, cross the line at night and have their imagination fired by tales of a modern land of promise, a land where furnaces never go out and machines are never idle." ইহা অবশ্য খাস ও দেশীয় সাংবাদিকদের কথা।.

শান্তিপর্ব্বের বনিয়াদ

য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে তাহাতে মার্কিণেরা তেমন ভাবে জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহারা যে কোন প্রকারেই হউক দঃ আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর (তাহার মধ্যে চীনকে ধরিতে হইবে) লইয়া ব্যস্ত ছিল। গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ অর্থাৎ বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মার্কিণরা প্রশান্ত-মহাসাগর হইতে মুখ ফিরাইয়া একবার য়ুরোপের দিকে তাকাইল। মার্কিণবাসীদের যে মন নিরপেক্ষ অথবা নির্ব্বিকার থাকিয়া অভ্যাস, তাহা একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে বিশ্বরাজনীতিতে নৈর্ব্যক্তিক সাধনার দিন চলিয়া গিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাস্তব দেখা গিয়াছিল যে জার্ম্মানীর ডুবোজাহাজের আক্রমণে মার্কিণদের নিরপেক্ষতানীতি ভাঙ্গিতে হইয়াছে। সবাই একযোগে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে জার্ম্মানী বড় খারাপ লোক। কিন্তু যে সমস্ত জাহাজ বোঝাই করিয়া সমরোপকরণ মিত্র-শক্তির সাহায্যের জন্য আসিত, তাহা ডুবাইয়া যদি বাধা দেওয়া না হইত তবে জার্ম্মানী যে কদিন বাঁচিয়াছিল সে ক'দিনও বাঁচিত কিনা সন্দেহ। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিছক আত্মরক্ষার দায়েই মার্কিণদের জাহাজ জার্ম্মানী আক্রমণ করিয়াছিল। যাই হোক, বিশ্বরাজনীতিতে নৈর্ব্যক্তিক সাধনাবাদী মার্কিণদের সাধনা ভাঙ্গিতে হইল। তাহারা যুদ্ধ শেষ করিতেই যুদ্ধে নামিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে প্রেসিডেণ্ট উইলসন সাহেব শান্তিপর্ব্বে যে সব উদার নীতি লইয়া গবেষণা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যত ঘটিয়া ওঠে নাই। লয়েড জর্জ্জ ও ক্লিমেন্‌সু দুই ধুরন্ধর মিলিয়া উইলসন্ সাহেবের সব উদারনীতি ব্যর্থ করিয়া দিল। মার্কিণরা প্রেসিডেণ্ট উইলসনের জাতিসঙ্ঘের পরিকল্পনা মানিয়া লয় নাই। অর্থাৎ তাহারা জাতি সঙ্ঘের নৈতিক দায়িত্ব, ও প্রত্যক্ষ যোগা-যোগ উভয়ই এড়াইয়া গিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাহার মানস-পুত্র জাতিসঙ্ঘকে লইয়া ফ্যাসাদে পড়িলেন। শেষে ইঙ্গফরাসী কূট-নীতিতে দীক্ষিত হইয়া জাতিসঙ্ঘ রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন, ক্ষুদ্র জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লইয়া যে পরিমাণ শ্রম করিয়াছিলেন তাহা সবই ভেস্তে গেল, ইহা মার্কিণেরা চোখের সামনেই দেখিয়াছে, তারপর ক্ষতিপূরণের টাকাগুলি সব ঘরে আসে নাই। হুভার ময়েটোরিয়াম কাদিয়া যাহা চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে কি ফল হইয়াছে বলা মুস্কিল। তবে মার্কিণরা বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্যিক ঘাট্‌তির স্রোত বহিয়াছিল তাহার 'ভোলার' তাহারাও জড়াইয়া পড়িয়াছিল ইহা দেখা গিয়াছে। ইহা বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিণরা বাধায় নাই। কিন্তু তাহারা উস্কানী দিতেও কসুর করে নাই। রুজভেল্টসাহেব গণতন্ত্রবাদী, একথা তারস্বরে জগতবাসীকে জানাইবার এত প্রয়োজন কি ছিল? গণতন্ত্রের জেহাদ লইয়া তিনিত আর কোন দেশে যাত্রা করেন নাই। অত ঢাক পিটাইয়া—আমি বড় ভাল লোক—তাহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি যে খুব ভাল লোক তাহাত তাহার প্যান-আমেরিকান আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিই প্রমাণ করিতেছে। গোটা আমেরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপর অসীম প্রভুত্ব বজায় রাখিবার যে সব ফিকির বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সম্বন্ধের মারফৎ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মনে হয় প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো বুঝিবা রুজভেল্টের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসলে যে ইহা গোল বস্তুর একপিঠ তাহা পরে বুঝা গিয়াছিল। হিটলার য়ুরোপে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের বিচলিত হইবার কারণ কি আছে? কিন্তু যে ভাবেই হোক বাণিজ্যব্যাপারে 'ক্যাশ-কেরি' নীতি প্রথমে মার্কিণরা অনুসরণ করিয়াছিল। তারপর যুদ্ধে যোগদান হইতে সুরু করিয়া লিজ-এ্যাণ্ড-লেণ্ড বিল পর্য্যন্ত পাশ করিয়াছে। ক্ষুদে জাপানের বিরুদ্ধে না হয় অভিযোগ আছে—কেননা সে পার্লহারবার অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু জাপানের প্রতিনিধি যে মার্কিণদের দরজায় ধর্না দিয়াও দর্শন পায় নাই অথবা ঐরূপ আরও বিচিত্র অন্যায় আছে—যেমন হাউই ও ক্যালিফোর্নিয়া হইতে জাপানী বিতরণ ইত্যাদি ইত্যাদি তাহা রয়টার ও এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা প্রভৃতি সংবাদপ্রতিষ্ঠানের প্রচারের ফলে আজ চাপা পড়িয়াছে। জাপান সম্বন্ধে কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু জার্ম্মানী? মার্কিণদের বিশ্ব রাজনীতিতে নির্ব্বিকারবাদ প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিন্‌লে সাহেব ভঙ্গ করিয়াছেন; আজ প্রায় সাতচল্লিশ বছর পরে এক নব্য নীতি য়ুরোপে মার্কিণদের মারফৎ ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিশ্বরাজনীতিতে বনেদি ব্যবসাদার ইংরেজ বহুদিন হইতেই য়ুরোপীয় সন্ধি বা শান্তিসম্মেলনে মোড়লি করিয়াছে তাহার আগমন বা নিষ্ক্রমণ কিছুই আকস্মিক নহে। মার্কিণেরা এতদিন পরে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের মন বুঝিয়াছে, নীতি ঠাহর পাইয়াছে। তাই আজ শান্তিসম্মেলনের সবটাই জুড়িয়া বসিয়াছে। দল ভাগাভাগি যাহা হইয়াছে তাহা বেশ স্পষ্ট, এদিকে যেমন ইঙ্গ-মার্কিণ আঁতাত দানা বাধিয়াছে, সোভিয়েট তেমন নিজেকে দিয়া তাহার ছয় শিস্ত দাঁড় করাইয়াছে। এখন কথা হইতেছে ফরাসীকে লইয়া, গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ফরাসী মধ্য-য়ুরোপে ছোট ছোট রাষ্ট্র লইয়া যে আঁতাত গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়াছে, শুধু ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া নয়, গড়িবার অতীত তাহা হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ দলে ভিড়িবার পক্ষে ফরাসীর বড় বাধা হইল রাইন। এই রাইন লইয়া ফরাসীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ মনকষাকষি চলিতেছে ও চলিবে। ফরাসীতে প্রগতিমূলক চিন্তাধারার ঠাই পাইয়াছে। তাহার সমাজতন্ত্রীরা বা কম্যুনিষ্টরা তাহাদের নীতির সারবত্তা নির্ব্বাচন দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছে, ইহার পর যদি এমন নীতি ফরাসী গ্রহণ করে যাতে যুযু ও হবু সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলাইতে হয় তবে ফরাসী জনগণ কি ভাবে সাড়া দিবে তাহা বলা মুস্কিল। সন্ধিসর্ত্তে

ইতালীকে যে ভাবে বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা লইয়া ইতালীতে রীতি-মত গোলযোগ সুরু হইয়াছে। ফরাসী যদি ইতালী ও আর চারটি রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত দাবী লইয়া দাঁড়ায় তবে সে তাহার লুপ্ত নেতৃত্ব ফিরিয়া পাইবে। সোভিয়েট তাহার নির্দ্দিষ্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া সব সমস্যা দেখিতে সুরু করিয়াছে। তাহাতে কাহারো সুবিধা হইয়াছে, কাহারো অসুবিধা হইয়াছে, কাজেই নীতিগত পার্থক্যই এখানে ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে। সেই রকম একটা বিশেষ নীতিকে কেন্দ্র করিয়া যদি ফরাসীর বৈদেশিক নীতি গড়িয়া ওঠে তবে ফরাসী নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে নচেৎ তাহাকে ইঙ্গ-মার্কিণ নীতি বাহক হইয়া য়ুরোপে থাকিতে হইবে। তাছাড়া ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভাবিত শান্তির রূপ যে কি হইবে তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারে না। কেননা হোয়াইট হাউস, ডাউনিং ষ্ট্রিট কি ভাবিতেছে তাহা শান্তি সম্মেলনের অধিকাংশই জানে না, আসল শান্তির সর্ত্ত লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে রচিত হইতেছে।

সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রী—বিক্রমপুর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমরা এখানে যে সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রীর বিষয় লিখিতেছি, এই মূর্ত্তিটি আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে বিবন্দী গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্ত-সীমায় একটি বটবৃক্ষতলে একান্ত অযত্নে মাটিতে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তৎকালে ১৩১৭ সালে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চন্দ মহাশয়ের সাহায্যে উহার আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনেকদিনের কথা, এই মূর্ত্তিটির কথা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আমার নিকট যে ফটোগ্রাফখানি ছিল এবং নিগেটিব্‌খানি ছিল তাহারও সন্ধান মিলিল না। কথা-প্রসঙ্গে নগেন্দ্রবাবু একদিন আমাকে বলিলেন যে তাঁহার গ্রামে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হলদিয়া দুর্গা পুস্তকালয়ে ঐ মূর্ত্তির একখানি ফোটোগ্রাফ আছে; সেই ফটোগ্রাফখানি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া দেখিলাম যে উহা হইতে ব্লক প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রীমান মুকুন্দ মজুমদারের সাহায্যে তাহা সম্ভব হইয়াছে। মুকুন্দবাবু বিবর্ণ ও বিলুপ্ত-প্রায় আলোকচিত্রখানা হইতে মূর্ত্তিটির স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে রেখাঙ্কন দ্বারা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখানে মঞ্জুশ্রীদেবের যে চিত্র প্রকাশ করিলাম, তাহা মুকুন্দবাবুর শিল্প নৈপুণ্যগুণে, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

আমরা এইবার মঞ্জুশ্রীদেবের পরিচয় দিতেছি। একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কয়েক বৎসর হইল মূর্ত্তিখানি অপহৃত হইয়াছে, জানি না কোথায় আছে!

মহাযানী বৌদ্ধদের নিকট মঞ্জুশ্রীদেব বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসন পাইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইঁহাকে একজন বরণীয় বোধিসত্ত্বরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট মঞ্জুশ্রীদেব জ্ঞান শ্রুতি-স্মৃতি, বুদ্ধি বিজ্ঞান এবং বাগ্মিতার প্রতীক্; এক সময়ে মহাযানমতাবলম্বীদের মধ্যে মঞ্জুশ্রীদেবের পূজার প্রচলন ছিল অত্যন্ত অধিক—তাঁহারা নানা মন্ত্রে, নানা বিভিন্ন রূপে ও ধ্যানে এই দেবতার অর্চ্চনা করিতেন। মহাযান তন্ত্রমতানুযায়ী মঞ্জুশ্রীদেবের পূজা করিতে যাঁহারা অক্ষম, তাঁহারা যদি শুধু মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা মঞ্জুশ্রীর ধ্যান করেন তাহা হইলেও সুফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন—এ বিশ্বাস সেকালে ছিল। কবে কোন্ সময়ে বৌদ্ধ দেবদেবীগণের মধ্যে মঞ্জুশ্রী আসিয়া আবির্ভূত হইলেন তাহার



মঞ্জুশ্রী

সঠিক কালনির্ণয় করা সুকঠিন। গান্ধার এবং মথুরার মূর্ত্তি শিল্পে ইহার সন্ধান মিলে না। অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন এবং আর্য্যদেব তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থ মধ্যে মঞ্জুশ্রীর নামোল্লেখ করেন নাই। 'সুখাবতী ব্যূহ' বা 'অমিতায়ুস্‌সূত্রে সর্ব্বপ্রথম মঞ্জুশ্রীদেবের নাম উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি ৩৮৪-৪১৭ খৃঃ অঃ মধ্যবর্ত্তীকালে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তীকাল হইতেই বৌদ্ধদের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে এবং ফাহিয়ান্, ইউ-য়ান-চাং, ইৎসিঙ্গ প্রভৃতি চৈনিক পর্য্যটকদের ভ্রমণ বিবরণীতে মঞ্জুশ্রীদেবের উল্লেখ দেখিতে পাই। সারনাথ, মগধ, বঙ্গদেশ ও নেপালে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। অবলোকিতেশ্বর'মূর্ত্তির বহু পরে মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের মধ্যে পূজার আসনখানি লাভ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, আসঙ্গ প্রভৃতি মনীষীরা যেমন চৈনিক পরিব্রাজকদের সমকালে বোধিসত্ত্বরূপে পূজিত হইয়াছেন, তেমনি মঞ্জুশ্রীও ছিলেন একজন মহামানব, পরে নিজ সাধনাবলে দেবতারূপে অর্চ্চিত হইতেছেন এবং "বোধিসত্ত্ব" আখ্যা পাইয়াছেন। মঞ্জুশ্রীদেব ছিলেন একজন বিখ্যাত স্থপতিশিল্পী এবং পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ। কি ভাবে কোন্ সময়ে তিনি চীন হইতে নেপালে আসিয়া, সে দেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি করিলেন তাহা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়, সম্ভবতঃ তাহা হইবে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি। চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে এসিয়া মহাদেশের সর্ব্বত্র যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ও মহাযান পন্থীদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল—সেখানেই মঞ্জুশ্রীদেব আপনার আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। আমাদের একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মঞ্জুশ্রীদেবের পরিকল্পনা ভারতবর্ষের নিজস্ব—অন্য কোন দেশের কোন দেবতার আদর্শানুকরণে তাহার মূর্ত্তি পরিকল্পিত নহে। নেপালের স্বয়ম্ভু ক্ষেত্রের বর্ণনামূলক স্বয়ম্ভু পুরাণে মঞ্জুশ্রীদেবের মাহাত্ম্যসূচক বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

'সাধনমালাতে মঞ্জুশ্রীদেবের চল্লিশটি ধ্যান এবং প্রায় চৌদ্দ প্রকারের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আছে। মূর্ত্তির বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি অনুরূপ, ধ্যানও বিভিন্ন রূপ। তাঁহার নামও অনেক, যেমন—বাগীশ্বর, মঞ্জুবর, মঞ্জুঘোষ, অর্পচন, সিদ্ধৈকবীর, বাক্, মঞ্জুকুমার, বজ্রানলন, নামসঙ্গীত, ধর্ম্মধাতু-বাগীশ্বর, স্থিরচক্র, মঞ্জুনাথ ও মঞ্জুবজ্র। সাধারণতঃ মঞ্জুশ্রীর একহস্তে তরবারি এবং অপর হস্তে পুঁথিধৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তির ধ্যান এইরূপ :

"সিদ্ধৈকবীরো ভগবান্ চন্দ্রমণ্ডলস্থং চন্দ্রোপাশ্রয়া জগদ্দ্যোতকারী দ্বিভুজ একমুখং শুক্লং বজ্রপর্য্যাঙ্কিদিব্যালঙ্কারভূষিতং পঞ্চ-বীরক-শেখরং.........বামে নীলোৎপলধররহং দক্ষিণে বরদং......তাভো ভগবতো মৌলো অক্ষোভ্যং দেবত্যায়ং......পূজাং কুর্বন্তী।...সাধনমালা A. 74. N, 56. C, 57.

সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রী এক মুখ, দ্বিভুজ, বর্ণ শুক্ল, বজ্রপর্য্যাঙ্ক আসনে বিকশিতশতদলোপরি উপবিষ্ট—দিব্যালঙ্কার ভূষিত, পঞ্চ বীরক শেখরং অর্থাৎ জটামুকুটশোভিত শিরোপরি—যথাক্রমে বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য বিরাজিত আছেন। মঞ্জুশ্রী দেবের বাম হস্ত দ্বারা নীলোৎপল ধৃত, দক্ষিণ হস্ত বরদ মুদ্রা শোভিত। সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রীর উভয় পার্শ্বে সূর্য্যপ্রভা এবং উপকেশিনী—ইহাঁদের বাম হস্ত দ্বারা পদ্ম ধৃত এবং দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা, কেশিনী এবং উপকেশিনী দুই পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। ইহাঁরা দুই জনেও চন্দ্রপ্রভা ও সূর্য্যপ্রভার ন্যায় পতি মঞ্জুশ্রীদেবের সমতুল্যা শক্তির অধিকারিণী।

সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রীর সহিত দ্বিভুজ লোকেশ্বর বা লোকনাথের প্রভেদ অতি অল্প, সে জন্য বিভেদ বা বৈষম্য লক্ষ্য করা দুঃকঠিন হইয়া পড়ে—কেননা ইঁহাদের আসন, আকৃতি, শীর্ষোপরি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ, শঙ্খ ধৃত হস্ত ও বরদ মুদ্রা সকলই এক প্রকারের। এই জন্য সাধারণতঃ এই শ্রেণীর মূর্ত্তি লোকনাথ বা লোকেশ্বর নামেই আখ্যাত হইয়া থাকেন।

বিক্রমপুরের নানা পল্লী হইতে দ্বিভুজ লোকনাথ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বহু মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের বিবরণ ও পরিচয় পূর্ব্বেও প্রকাশ করিয়াছি।

বিবন্দী এবং তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী ভাকটর্টভোগ প্রভৃতি স্থানে যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল তাহা এখন বাঙ্গলার নানা জেলায় স্থানান্তরিত হওয়ার দরুণ, সকলের সন্ধানও মিলিতেছে না। বিবন্দী গ্রামের সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুশ্রী বা লোকনাথ মূর্ত্তিখানিও এইভাবে অদৃশ্য হওয়ায় দরুণ বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছে।*

---

* এই প্রবন্ধ লিখিতে আমি শ্রীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত The Indian Buddhist Iconography নামক গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

আগমনী

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এস শাশ্বতী! চির-শান্তিপ্রতিমা ভক্তের চিদানন্দা
এস ধাত্রী দেবতা অন্নদাত্রী ধরণীর প্রাণছন্দা!
আজি অনশনে রহে লক্ষমানব দীর্ঘ-দিবস রজনী,
আজি মৃত্যু-করুণ ক্রন্দনভারে মগ্না-বিপুলা ধরণী।

এস দুর্দম-শত দুঃখ বিপদে আশ্রিতজন-ভরসা
এস সিঞ্চিত প্রেমভক্তি-কুসুমচন্দনে চিরহরষা!
এস শান্তিরূপিণী-'সান্ত্বনা' নহে—সর্বনাশিনী 'শক্তি'
এস দৈত্যদানব পাশব-শক্র, বিঘ্নবিপদ-মুক্তি!



অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

৩

কিন্তু প্রদ্যুম্ন আমার সে রকম ছেলেই নয়। কোন রকম বেলেল্লা বেহায়াপনার মধ্যে সে নেই। এই ত গত অঘ্রাণে তার বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে কই সে ত পর হয়ে যায় নি একটুও। ভাঁড়ার ঘরে আনাজ কোটার সময় পান চাইবার দরকার হলে মার কাছেই এসে চায়। কলেজের শেষ পাশটা এবার দেবে, কিন্তু সন্ধ্যে হতেই বাড়ী ফিরে এসে সোজা একবারে ভেতর বাড়ীতে চলে আসে। মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে খবরাখবর নিয়ে তবে পড়তে বসে, এমন চাঁদের টুকরো ছেলে। আর হবে নাই বা কেন? কেমন চাঁদের মত মেয়ে বৌ এনেছি আমাদের ঘরে।

হ্যাঁ, তা চাঁদের মত বটে। চাঁদের মতই মনে হয় হিম শীতল, কিন্তু জ্বালিয়ে রেখেছে প্রদ্যুম্নর মনকে। চাঁদের মতই অনুভূতিহীন কিন্তু অজস্র অনুভব জাগিয়ে দিয়েছে। চাঁদের মতই পৃথিবীর কাছে জড়পিণ্ড মাত্র, যদিও তার স্নিগ্ধ আবেশময় সুষমামণ্ডিত উপস্থিতি বাড়ীর আত্মীয়স্বজনে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের অতীত ক্ষেত্রে বিরল দুর্লভ অভূতীয় মুহূর্ত্তগুলিকে জ্যোৎস্নার আলোয় ভরে তুলে, কিন্তু অসুবিধাও বহু। এত বড় বাড়ী, এত কুটুম্বপরিজন। তাদের এড়িয়ে বা উপেক্ষা করে সংসারের আর একজনকে দেখতেও যে ছাই সহজে পাওয়া যায় না এ বাড়ীতে। আর সুরধুনীও তেমনি। কেবল মার চারদিকে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরের আনাজের আনাচে কানাচেই তাকে পাওয়া যাবে; তাও পান চাইতে নিজেই যদি বা ঢুকে আসি ভিতর বাড়ীতে, সুরোর আবার লজ্জা হয়। তার চঞ্চল চলমান চরণ দুখানি মাটীর উপর মায়া ছড়াতে ছড়াতে সরে যায়। কবি ঠিকই বলেছেন—

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।"

কিন্তু এই নূতন কনে, এই মায়াবিনী মানবীটী কেমন করে বুঝে ফেলে যে তারই উদ্দেশে আসছে আর একজন; পানটা অভিনয় মাত্র, প্রাণটা অভিমুখে আসছে তারই।

কি লজ্জার কথা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের লজ্জা নেই, সময় অসময় নেই। বাড়ী শুদ্ধ সবাই না জানি কত হাসে মনে মনে, কত ভণিতা করে, আলোচনা করে তার ঠিক নেই। এই সে দিন বিয়ে হল, আর খালি রাত দিন কাছে আসতে চায়। কিছু কথা কওয়া, কিছু পিছু নেওয়া, কিছু পুলকের ছোঁয়া—এ ছাড়া আর তার কিছুতেই চলে না। সেই জন্যই ত মুস্কিল। না হলে ওকে ত খুবই ভাল লাগে। কত ভালবাসে, কত আদর করে; কত কথা কত কবিতা বলে—তার সবটা বোঝাও যায় না। এত কবিতা বলে, সংস্কৃত শোলোক বলে, ইংরিজি পদ্য বলে—সব বুঝতে পারলে কত মজাই না হোত। মহাকালী পাঠশালাতে এত বেশী শেখায় নি যে কলেজের পাশের কথা সব বুঝতে পারব। কিন্তু যদি শেখাত, তাহলে কেমন ভাল হত। অবশ্য না বুঝলেও শুধু শুনেও সুখ আছে। মুস্কিল এই যে বাড়ী ফিরে যখন যাই সে সব কথা সইদের কাছে তেমন গুছিয়ে বলতে পারি না। এই যা দুঃখ। তা তাদের যে এমন সব কথাই খুলে বলতে হবে তেমন কোন বাধ্য-বাধকতাও নেই ত আর।

কিন্তু যাই বল, বড় সাংঘাতিক লোক হচ্ছে সে। কিছুতেই ঠেকান যায় না। বলে কিনা সংস্কৃত কবিরা মুখকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে বড় সেকেলে কাজ করেছেন। আজকালকার কবিরা মুখকে বইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছে না কি। এই বলে জার্মাণীর কি একটা কবিতা আওড়ালে। নামটাও যেন কি রকম—'হাইনে'।

বেচারা নাকি সারা জীবন শুধু হায় হায় করে কাটিয়েছে ভালবেসে। কিন্তু এমন অলুক্ষণে কবির কবিতাই বা তুমি কেন বসে বসে খাতার পাতা ভরিয়ে লিখেছিলে? সে-ই কবির একটা কবিতা আবার প্রায়ই আওড়ায়। সে দিন সে জন্যই ত বললে, "এস আজ আর ছাপার বই পড়তে ভাল লাগছে না, অন্য কিছু পড়া যাক্।" সে আবার কি? বই ছাড়া লোকে আর কি পড়ে? শুনে হেসে একটু কাছে এসে বললে, "কেন? তোমার মুখখানি।" আমিই বা হেরে যাব কেন? বললাম, "তাহলে আর পাশ করেছ; যা বিদ্যে হবে বোঝাই যাচ্ছে।" সে বললে, "এত বিদ্যা হবে যে পণ্ডিতরা যেন আমার সঙ্গে পারবে না।" কি রকম? সেটা কি রকম বিদ্যা? অমনি "হাইনে" বেরিয়ে এল।

"সুদূর আকাশে নিচল হয়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে তারা,
শতেক বছর করে চাওয়াচায়ি হতাশ প্রণয়ে হারা;
কি জানি কি ভাষে মধুর মহান্ কহিছে তাহারা কথা
বড় বড় যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার ব্যথা—
বুঝেছি আমি, প্রতিটী আখর এ হিয়ে গিয়েছে গাঁথি'
পড়েছি আমার পিয়ার মু'খানি করিয়া যে পাতি পাতি।"

এরা দেখছি সবাই এক ভাষায় কথা কয়। আমার বিনু সইয়ের বরও ঠিক এই রকম ধরণের কথা বলেছিল। এক কথাই কি সবাই এরা মুখস্থ করে রেখেছে না কি? না, বিয়ে হলে সবারই মাথায় সরস্বতী চাপে বইয়ের পাতা ছেড়ে? আমি ত কিন্তু—যাই বল—পারতাম না অন্যের ধার করা কথায় নিজের মনের কথা বলতে। আমার লজ্জা দেখে ভণিতা করে বললে, "অয়ি বিম্বাধরোষ্ঠে, আমি জানু পেতে সবিনয়ে ওই রক্তাধরে একটা চুম্বন মুদ্রণ করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।" বিনু কিন্তু এর উত্তরে চমৎকার বলেছিল। বলেছিল সে—"তা, তা তুমি মুদ্রণ করতে পার; কিন্তু দেখো, যেন প্রকাশন করো না।"

আমারও ইচ্ছা হচ্ছিল ওই রকম উত্তর দিতে। তা বলা কি আর হল ছাই? চুপ করে অপ্রস্তুত হয়ে আছি দেখে বলল, বিম্বাধরের অমৃত দিতে কার্পণ্য যদি করো ক্ষতি নেই, হলা পিয়সহি, কম্বুকণ্ঠের হলাহল পিয়েই আমি নীলকণ্ঠ হয়ে থাকতে রাজী আছে। অতএব এই আমি তোমায় কণ্ঠে নিলাম।

কেবল রবি ঠাকুরের কথাই কিছু কিছু বোঝা যায়। তা ও সব না। সেদিন কিনা বলল,

"বধুরে যেদিন পাব
ডাকিব মহুয়া নাম ধরে"

আমার এত লজ্জা হচ্ছিল, আবার ভালও লাগছিল শুনতে। তাই একটু জ্বালাবার জন্য চোখ ঘুরিয়ে মুখ ফিরিয়ে কণ্ঠস্বরে রাগ ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কি মহুয়া ফুল, না মহুয়া মদ? না আমি মানুষ নই এই ঠিক করেছ?" তা-ও কি পার পাবার উপায় আছে? একেবারে সেই কথাসরিৎসাগর। চট করে জবাব দিলে, "অর্দ্ধেক মানবী তুমি।"

৪

সত্যই সে অর্দ্ধেক মানবী। সারাটা দীর্ঘ দিনের দুঃসহ ব্যবধানের পর ক্ষণস্থায়ী রাত্রির নিভৃত প্রণয় গুঞ্জনের সব কওয়া-কথা ও না-কওয়া ব্যথা ছাপিয়ে এই একটা বর্ণনা নানা ব্যঞ্জনায় বর্ণসুষমায় প্রদ্যুম্নর মনের আকাশকে রাঙিয়ে রেখেছে। কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অবশ্য বড়লোকের ছেলে ও এই বংশের ছেলে বলে বয়স একটু বেশীই হয়ত হয়েছে। তবু তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহই এখনি বিয়ের কথা ভাবতেও পারে না। সে বড় সেকেলে ব্যাপার; এককালে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে প্রায় সকলকেই। কিন্তু এখন সামনে রয়েছে বিস্তীর্ণ কল্পনা ও স্বপ্ন রচনা করবার সময়। এমনি কি কেহ উদ্বাহবন্ধনে বাঁধা পড়তে চায়—উদ্বাহু হয়ে জীবন যখন যৌবনকে আহ্বান করছে বিচিত্র বিকাশ ও বহুধা অভিজ্ঞতার জন্য? বন্ধুরা তাই প্রদ্যুম্নর এই উদ্বন্ধনের ব্যাপার আলোচনা করবার জন্য আহ্বান করল এক জরুরী ক্যাবিনেট মিটিং।

প্রস্তাবিত বিবাহ সংবাদ। এর চেয়ে বেশী উত্তেজনামূলক ঘটনা মিত্রমণ্ডলের মন্ত্রণা সভায় আগে কোন দিন আলোচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ, এক বাংলার অধ্যাপকের ক্লাশে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' পাঠের সময় হা হুতাশ ও বুক চাপড়ান উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে বাদানুবাদ ছাড়া। কলেজের বাইরে মাঠের কোণায় গাছের ছায়ায় এই মিত্রমণ্ডলের বিশেষ অধিবেশনগুলি যখন তখন আহ্বান করা হয়। যখন কোন জরুরী কাজ থাকে না, তখন অকাজকেও

কার্য্যসূচীভুক্ত করতে এদের আপত্তি হয় না, বিশেষ করে অধ্যাপকের যদি পাঠ গ্রহণ বা নিদ্রাসাধনের দিকে কোন পক্ষপাত থাকে। ও দুটোই এদের মন্ত্রণামণ্ডলে যাবার প্রয়োজন বোধ লাগিয়ে দেয়। আর আজ ত বিশেষ কারণই ঘটেছে।

শূন্যে ঘুষি পাকিয়ে সমাদ্দার বলল, "দেখ্ দেশোদ্ধারের উদ্দেশ্য নিয়ে সুযোগ পেলেই সাহেব পেটাবার যে সাধনা আমরা করব বলে ঠিক করে রেখেছি, তা থেকে একজন সভ্যও কমে গেলে আমরা দুর্ব্বল হয়ে যাব। তোকে আর ক্যালকাটা মোহনবাগানের খেলায় গোরার নাকের সামনে হাততালি দেবার সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা বালিকা উদ্ধার করে এমন কিছু বীরত্ব তোর হবে না। এতদিন ধরে শেখাচ্ছি সকালে যোগাভ্যাস আর বিকালে জিমনাসিয়াম কর্, তা ত করলিই না; এখন যাচ্ছিস বিয়ে করতে। তা কর্, ভালই। আশা করি, প্রেমাভ্যাসের প্রাণায়ামটা ভাল করেই করবি।"

রাজীবের রাস্তা রাজনীতি। সেও একই সুরে গাইল। তবে বলল যে তাকে কোন দিনই জোয়ানের দলে পাওয়া যাবে না তা সে আগে থাকতেই জানত। কারণ যত উপনেতা হবুনেতা এদের জনসভায় জোয়ালে বেঁধে বেঞ্চি সাজিয়ে, তাদের চেয়ারে চড়িয়ে বেড়ানতে তাকে কখনো রাজীব রাজী করাতে পারে নি। তাই একটু থেমে আবার বলল, "যাক্, ভালই হয়েছে। তোকে ত আমরা ভাল করেই চিনি। গেলবার যখন ভীষণ শীত সুরু হল তুই শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসতিস। তখন জিজ্ঞেস করলাম তোর ঠাণ্ডা লাগছে কি না—তুই বললি যে যখনি মনে হয় ঠাণ্ডা লাগছে অমনি সামনের টেষ্টের কথা ভাবি আর সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করে। তা ভালই হল; এখন আর বোধ হয় শার্টেরও দরকার হবে না। হার্ট এমনিতেই গরম থাকবে। হ্যাঁ, তবে বেশী গরমে যেন ভর্জ্জিত না হও বাবা, সেটুকু বলে রাখি।" রহস্যের ইঙ্গিত পেয়ে সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠল, "সে কি রকম? সে কি রকম?" রাজীব বলল, "বিশেষ কিছু নয়, এই এখন ভার্য্যা অর্জ্জন করে ভর্জ্জিত হবেন, আবার তিনি বাপের বাড়ী ফিরে গেলেই ভার্য্যা দ্বারা বর্জ্জিত হয়ে ভর্জ্জিত হবেন। মোট কথা, প্রদ্যুম্নর কপাল পুড়ল।"

কেশব সব ছেড়ে পরের ভার লাঘব করবার ভার নিয়েছে এবং সেজন্য সবে একটা বিপদ্-বান্ধব সমিতি খুলেছে। প্রদ্যুম্নের কাছ থেকে একটা মোটা অঙ্কের চাঁদা চাইতে পারে নি নেহাৎ নিজের বন্ধু বলেই। শত্রুরা অবশ্য ওর সমিতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে। বলে যে ওটা শুধু তৎপুরুষ সমাস নয়, বহুব্রীহিও বটে। বিপদে যে ওরা বান্ধব তা ঠিক নয়, বরং বিপদ্ই ওর এবং ওর বান্ধবদের বান্ধব; খেলাটা সিনেমাটা চাঁদার পয়সায় তোফা চলে যায়। কিন্তু আমরা জানি সেটা ঠিক কথা নয়। এটা হচ্ছে সেই বয়স—একমাত্র যে বয়সে বাঙ্গালী স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে, সংসারের সঙ্গে স্বর্গের সন্ধি স্থাপন করবার প্রয়াস পায়। কেশব এতক্ষণ মাটীর সঙ্গে পিঠের সন্ধি রক্ষা করে শুয়েছিল। হঠাৎ সে যুদ্ধ ঘোষণা করে উঠে বসল। "বিয়ে তোকে করতেই হবে প্রদ্যুম্ন। আমার বিপদ্ বান্ধব সমিতি সবান্ধবে তোর বিপদে মালকোঁচা মেরে পরিবেশন থেকে আরম্ভ করে বাসর ঘরের শত্রু-ব্যূহ ভেদ ক'রে উত্তরা উদ্ধার করে আনা পর্য্যন্ত সব কিছুই করবে। জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল একটা কোমল হস্তের স্পর্শ না পেয়ে। 'এতটুকু ছোঁয়া লাগে, এতটুকু কথা শুনি'। আরে বাবা, ওই এতটুকু ছোঁয়াই লাগুক আমাদের যে কারো একজনের কপালে, তারপর আমরা কত কথাই শুনব।" উত্তেজনায় ভাবাবেগে ও বিপদ্ বান্ধবদের বন্ধুর শীঘ্র স্ত্রীসম্পদ্ লাভের সম্ভাবনায় তার যুদ্ধ ঘোষণাটা শান্তি স্থাপনেরই সামিল হয়ে দাঁড়াল।



বাঙালীর বার্থরাইট

এবার সবাই নীহারিকাকে ছেঁকে ধরল। সে কেন একা চুপ করে থাকবে? সে হচ্ছে এই বিক্রমাদিত্যহীন নবরত্ন সভার আধুনিক কবি সদস্য। কবি হওয়া বাঙ্গালীর বার্থরাইট অর্থাৎ জন্মসত্ব। নীহারিকা সেই জন্মসত্ব খাটিয়ে চলেছে। তবে লম্বা চুল, ঝোলা পাঞ্জাবী বা খোলা চাদরের সে পক্ষপাতী নয়। চেনা বামুনের পৈতের মত জাত কবিরও বেশভূষার দরকার নেই। শার্টের আস্তিনটা গু'টিয়ে সে যেন কেশবকে এক হাত নেবে এরকম ভাবে বলল, "দেখ, বিয়ে নিয়ে অনেক রসিকতার কথা ইংরিজীতে আছে। ওরা বলে আমার আগে অন্য অনেক লোকই ত বিয়ে করে রেখেছে, তবে আমি আর করি কেন? কিন্তু আমি বলি যে ভায়া, তোমরা সবাই বিয়ে করো। বিয়ে আর বিদ্যা দুই-ই সমান, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে এবং বিয়ে কর বা না কর তোমার হৃদয়টা দাতব্য করে খরচার খাতায় লিখে রাখ। ও এমনই জিনিষ যে দিলে কমে না; বরং একটা দিলে ডবল মুনাফায় দুটি হয়ে ফিরে আসে। এই ধর না প্রদ্যুম্ন যদি আজ বিয়ে করে, ওর মন কি আর ওর একার থাকবে? দুটো হয়ে বাজবে। আমরা বুঝতেই পারব না কোন্‌টা কখন বাজছে। বৈরাগী বাজায় একতারা আর অনুরাগী সাজায় সেতারের ঝঙ্কার।

ক্রমশঃ

অমৃত

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

সমুদ্রমন্থনের জন্য যে বাসুকি আপন জীবন তুচ্ছ করিলেন, তাঁহারই রক্তসম্পর্কিত বিশাল নাগজাতির ভাগ্যে 'দেববেষী' এই কলঙ্কটুকু ভিন্ন, আর কিছু মিলিল না। ইন্দ্রের পরম সুহৃৎ নাগরাজ বাসুকি তাই গরল বমন করিলেন। তখন নীল সমুদ্রবক্ষের অনাবিষ্কৃত দ্বীপরাজ্য একের পর এক নাগজাতির অধীনে আসিতেছিল, কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিতা কনকমেরু-শিখরের অমরাবতী আদিমজাতির সেই সমৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যা গোপন করিতে পারিল না। সমুদ্রবক্ষের নাগরাজ্য দেবগরিমা অস্বীকার করিয়া কাব্যের ভাষায় রসাতলে গমন করিল, তথাপি সেই পাতালরাজ্যের ঐশ্বর্য্যমহিমায় দেবকবি আপন কাব্যোচ্ছ্বাস সংযত করিতে পারেন নাই। তখন হিমালয় রাজ্যের মধ্যেও দুএকটি নাগরাজ্য আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সমৃদ্ধশালী প্রতিবেশী দেবরাজ্যের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমুদ্ররাজ্যের নাগজাতি ভারতের হিমালয় ক্রোড়ে দেব-নাগের এই মৈত্রীতে খুশী হইতে পারে নাই। খুশী হইবেই বা কেমন করিয়া? সেই মৈত্রীর সুযোগ লইয়া, এক নাগজাতির প্রতিষ্ঠায় দ্বারা আর এক নাগজাতিরই সর্ব্বনাশ প্রচেষ্টা চলিল, যখন দেবরাজ্য প্রতিবেশী হিমাচলসন্তান নাগজাতি সুনীল সমুদ্রের বিশাল জ্ঞাতি নাগজাতির সর্ব্বনাশে ও দেবরাজ্য বিস্তারে দেবজাতির সহায়ক হইল, তখন পাতাল হইতে রসাতল পর্য্যন্ত অসংখ্য 'ফণা' গর্জ্জিয়া উঠিল, তখন আপনাদেরও ভ্রম বুঝিয়া ভারতের নাগজাতি বাসুকীর প্রতিনিধিত্বে গরল উদ্‌গার করিল। দেবদানব রাজ্য টলমল করিয়া উঠিল। দেবদানবের সমুদ্র মন্থন বুঝি বা ব্যর্থ হইতে চলিল। শুধু ব্যর্থ নহে, অমরাবতীকে নাগজাতি প্রায় গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

কোথা ছিলেন রুদ্রশঙ্কর, নাগজাতিকে প্রশান্ত করিয়া, নাগগরল আপনি গ্রহণ করিয়া, তাহাদের প্রতি আপনার ও সমগ্র হিমাচল সন্তানদের প্রীতি প্রসারিত করিলেন। রুদ্রশঙ্কর কণ্ঠে ধরিলেন নাগমাল্য, নাগজাতিকে প্রীতির বন্ধনে সম্মানিত করিলেন, তাই অনাবিষ্কৃত সমুদ্র-দেশে দেবদানব যক্ষ রক্ষগন্ধর্ব্ব ও নাগের সম্মিলিত অভিযান আরম্ভ হইল, সেখানে বণ্টনাকারীর চাতুর্য্যে দেব ভিন্ন অপরাপরে সন্তুষ্ট হইল না।

কে মহাকৌতুকপ্রিয় কাণে কাণে রটাইয়া দিল সমুদ্রমন্থনলব্ধ অমৃত দেবতারা গোপন করিয়াছে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে অমৃতের জন্য সন্ধান চলিল। দানব যক্ষরক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নর ও নাগ সমুদ্রমন্থনের ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া অমৃতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিল। দেবতারা হাসিলেন, কিন্তু অমৃতের সন্ধান জানাইলেন না।

কোথা অমৃত? কোথা অমৃত কলস? অমরাবতীর শুদ্ধান্তঃপুর লুণ্ঠিত হইল কিন্তু সন্ধান মিলিল না। ইন্দ্রত্ব অপমানিত হইল তথাপি অমৃত মিলিল না। অত্যন্ত অভিমানী এই দেবজাতি, অসম্মানে তাহাদের অভিমান দ্বিগুণতর হয়, অমৃতের সন্ধান আরও গূঢ় হইয়া উঠে। দানব যেদিন অমরাবতীর প্রভু হইল, যেদিন ইন্দ্রসভায় অলকার মাঝে উর্ব্বশীনূপুর মুখরতায় ইন্দ্রত্বের গরিমায় উল্লসিত হইল, সেদিন দেবরাজ পত্নীকে আপন সিংহাসনে আপনারই পার্শ্বে বসাইল, সেদিন ভাবিল স্বর্গ তো জয় করিয়াছি, ইন্দ্রাণীকেও বিজয়সামগ্রী হিসাবে লভিয়াছি, অমৃতের সন্ধান আর বেশী দূরে নহে। সুরেন্দ্রাণীকে একান্তে আসিয়া যেদিন দানবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'অমৃত কোথায়?' উত্তরে ইন্দ্রাণী হাসিয়া শুধু আকাশের দিকে আপন তর্জ্জনী প্রসারিত করিলেন।

দানবেন্দ্র সুরেন্দ্রের পুষ্পক লইয়া আকাশ বিহার করিলেন, স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল আলোড়ন করিলেন, কিন্তু অমৃত মিলিল না। দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া লইলেন, আবার অমৃতগর্ব্বে ত্রিজগতের সম্মুখে মহিমান্বিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

মানব যেদিন অমরাবতীর সিংহাসনে বসিল, ভাবিল নন্দনকাননে কোথাও গুপ্ত আছে অমৃত কলস। কোনও দেবকন্যা সে অমৃতবার্ত্তা জানাইয়া নূতন ইন্দ্রকে সুখী করিল না, এমন কি কোনও দেবপ্রাণী সে সংবাদ গোপনে বহিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল না। ইন্দ্রসভার অধিবেশনে দেববৈতালিক অমৃতমহিমা কীর্ত্তন করিত, প্রাতে, সায়াহ্নে, দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ। সেই অমৃতমহিমা সারা বিশ্বে ছড়াইত, প্রশ্ন করিলে বৈতালিক দেখাইয়া দিত সন্ধ্যারাগমণ্ডিত আকাশ।

তাইতো ত্রিভুবনের বিস্ময়, দেবতারা আকাশের মাঝে অমৃত লুকাইল কোথায়? দানবরাক্ষসেরা যুগে যুগে স্বর্গলুণ্ঠন করিয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া আপন নগরীকে যখন সমৃদ্ধ করিত, বলাপহৃতা দেবকন্যাকে যখন বিলাসে মায়ায় ভুলাইয়া প্রশ্ন করিত—'দেবকন্যা, অমৃত কোথায়? কোন্ পারিজাত বনে?', তখন দেবকন্যা হাসিয়া বলিত—'হিমাচলে'। স্বর্ণলঙ্কার ত্রিভুবন-বিজয়ী গরিমাকেও দেবকন্যা শ্রদ্ধা করিত না। রাবণরাজা অশোক কাননে স্বর্গ হইতে পারিজাত আনিয়া রোপণ করিলেন, দানবী তাহাতে খুশী হইল, কিন্তু দেবকন্যা বলিল—'এ কি পারিজাত! এ তো বনলতা!' আশ্চর্য্য দেবকন্যার মতি, হিমাচলের পারিজাতবন হইতে ইহার বিভেদ বৈষম্য কোথায়? হিমাচলের পারিজাত বনে কি অমৃত লুকান আছে? কেমন সে অমৃত?

...অমৃত পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছিলেন—তাই কি দেবতার উপর চিরকালের এই ঈর্ষা ও দ্বেষ? পুরাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, অভিমান-হীন অতীত দেবগণ বর্ত্তমান অভিমানী (রাজ্যাধিষ্ঠাতা) দেবগণের সমান হইলেও কল্পিত নামে ও রূপে অতীত বলিয়াই অভিহিত হন। তবু দেবতারা অমর নাম পাইলেন কেমন করিয়া? স্বর্গের মহিমা যে কোনও দিন মৃত্যু কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হয় নাই, অমরাবতী নগরে মৃত্যু যে নিঃশব্দে আসিয়াছে গিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন জরার কালিমা রাখিয়া যায় নাই। চিরবসন্ত মধু সে রাজ্যের নন্দন কাননে, চির-যৌবনের বৈতালিকী সে রাজ্যের পাখীর সঙ্গীতে। মৃত্যু যেখানে বার্ত্তা আনে নববসন্তের, নবীনের গান গাহিয়া যারা চলে যায়, সেখানে সে মৃত্যুযাত্রী চির যৌবন ব্রতী, চিরবসন্তের স্বপ্নমুগ্ধ। এ শক্তি তাহারা পাইল কোথায়? দেবতা যে অমৃত পান করিয়াছে সে অমৃত নন্দন-কাননের বাতাসে ভাসিয়া আসে অলক্ষ্যে শুধু দেবতারই জন্য? দানব ও মানবও তো স্বর্গ জয় করিয়াছে, নন্দনবন মলয় তো তাহাদের জন্য অমৃত সুবাস বহিল না। তাই দানবযক্ষরাক্ষস আপন আপন পরাক্রমে নন্দনকানন নিঃশেষিত করিয়া মর্ত্ত্যে ভূস্বর্গ রচনা করিল, কিন্তু চিরকামনা চিরকালের স্বপ্ন অমৃত মিলিল না। দেবতা অমর না হইয়াও অমর নামে ভুবন জয় করিলেন, আর দেবতার নগরী হইল চিরকামনার স্বর্গ।

যে মন্দার পর্ব্বতকে কেন্দ্র করিয়া সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল, মন্দাকিনীসিক্ত সেই মন্দারে রুদ্রশঙ্কর অমৃতের সন্ধানে ধ্যানমগ্ন। দেবতারাও যে অমৃতের সন্ধানী এ গোপন সংবাদ ত্রিভুবন জানিত না। দেবতারা অমৃতাহারী এই অপরাধে অমরাবতী লুণ্ঠিত হইল বারে বারে, তথাপি দেবতারা চিরকাল অমৃতাধিকারী সাজিয়া অপরূপ কৌতুক করিয়া চলিলেন। তবু ত্রিজগতের বিশ্বাস ঐ স্বর্গে কনকমেরুশিখরে কোথাও নিশ্চয়ই লুকানো আছে অমৃত—কোনও গুহায়, কোনও বৃক্ষমূলে, কোনও শিলাতলে। কোনওদিন সর্ব্বত্যাগী মানব আনন্দমগ্ন হইয়া দেবতাকে প্রশ্ন করিল—'অমৃত কোথায়?' দেবতা বলিলেন—'অন্তরে'।

কৈলাসে শিখরে রম্যে, যেখানে নন্দা ও অলকানন্দা নিরত অমরাঙ্গনাদের সহিত লীলা করিতেছে, যেখানে অসংখ্য নির্ঝরের ঝরঝরে নিরত মিলিতেছে কিন্নরগান, তাহারই দক্ষিণে দেবর্ষিসেব্য ধবলতুষার-শৃঙ্গে রুদ্রশঙ্করের সাথে অপর্ণা উমার মিলন হইয়াছিল। যেখানে রমণী-রত্ন উমা রুদ্রের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, যেখানে শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত কিরাতবেশে বিহার করিয়াছিলেন, যেখানে রুদ্রদেবের বহুবিধ পুষ্পকানন, যেখানে গিরিগুহানিবাসিনী সুলোচনা কিন্নরী যক্ষিণী ও অপ্সরাগণ সুখে বিলাস করে সেখানের উমাবন ত্রিলোকের তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, অর্দ্ধনারীদেহ শঙ্করের বিভূতি সেখানে ত্রিকালকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শঙ্কর ও পার্ব্বতী অতীত হইয়াছেন। নিখিল যক্ষগন্ধর্ব্বেরা মহাকালমন্দিরে তুষারশুভ্র শঙ্করপার্ব্বতীর মৌনী মূর্ত্তিকে শঙ্খে ঘণ্টায় গীতে কণ্ঠে আরাধনা করিতেছে। মহাকালমন্দির হইতে সারা হিমাচল বাহিয়া সমতলে নির্ঝরসঙ্গীতে সে সন্ধ্যারতির মহিমা নামিয়া আসিতেছে। সেই কৈলাসে উমাবনউপকণ্ঠে মহাকাশতলে যেখানে মহাকাল আসিয়া ধরা দিয়াছে, সন্ধ্যারাগসম অন্তর-রঞ্জনে নিখিল নরনারী সিদ্ধচারণগণকে সেখানে কোনও দিন প্রশ্ন করিয়াছিল—'অমৃত কোথায়? কোথা সেই ত্রিলোক-কামনা অমৃতভাণ্ড?'

উত্তর মিলিয়াছিল—'মহাকালকরে'—

—'কোথা মহাকাল?'—

—'ঐ তো সম্মুখে!'—

হিমাচলের তুষারতীর্থে মহাকাশ মহাকালের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাই হিমাচলের প্রতি শিলায় কোমল অমৃতপরশ। সেই হিমাচলের শিলাময় সোপান বাহিয়া দেবগন্ধর্ব্ববালা অলকানন্দা নামিত, সেই শিলারাজ্যের উপর তাহারা লীলাচাঞ্চল্যে ফিরিত, সেই শিলাপথ ধরিয়া তাহারা নন্দনে পারিজাতবনে চিত্ররথ কি বৈভ্রাজে ফুলচয়নে যাইত। অলক্ষ্যে তাহাদের অন্তরে সঞ্চিত হইত অমৃত।

দেবতারা অমৃতের স্বাদ লভিয়াছিলেন। সে অমৃত তাঁহারা নিখিল জনের নিকট হইতে গোপন করেন নাই, বরং বিলাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিভুবন কামনায় অমৃতভাণ্ডটির জন্য ছুটিয়াছে, অমৃত যে বিশ্ব মাখিয়া রহিয়াছে তাহা দেখিবার বুঝিবার ধৈর্য্য তাহাদের নাই। সমুদ্রমন্থনের দিনটি হইতে সকলের সন্দেহ, দেবতারা কোথায় অমৃতভাণ্ড

লুকাইয়া রাখিয়াছে। কৌতুক করিয়া দেবতারা কল্পবৃক্ষমূলে অমৃতহীন অমৃতভাণ্ড সাজাইয়া রাখিলেন। স্বর্গজয়ী দানব বলিল—'অমৃতভাণ্ড শূন্য করিয়া দেবতারা অমৃত পান করিয়াছে'—বিজিত হইয়াও দেবতা কৌতুক ভোলেন নাই, বলিলেন—'অমৃতভাণ্ড শূন্য হইবার নহে'—

দানব দেবতার নিকট দাবী করিল—'অমৃতপূর্ণ সেই ভাণ্ড কোথায় লুকাইয়াছ?'

দেবতা বলিলেন—'জানি না'—

দানব সরোষে মন্তব্য করিল—'শঠ!'

এমনি করিয়া যুগযুগান্তরেও অমৃতভাণ্ডের সন্ধান মিলিল না, দেবতার 'শঠতা' কখনও ধরা পড়িল না।

আকাশে সহস্রকোটী তারার জ্যোতির্মণ্ডিত যে আলোকসাগর রহিয়াছে, তাহা হইতে কোন্ অপূর্ব্বক্ষণে পুণ্য স্বর্ণদী উৎপন্ন হইয়া কোন্ আলোকসেবী ঐরাবতের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বিক্ষিপ্তজলা হইল। বিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণদীধারা সুমেরুশৃঙ্গে পতিত হইল। সুমেরুশৃঙ্গকে চারিধারে বেষ্টন করিয়া, শঙ্করপর্ব্বতকে জটামৌলী করিয়া, তুষার বাহিয়া সেই স্বর্ণদী পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতকে প্লাবিত করিয়া নৃত্যলীলায় নামিল। সেই অম্বরনদী চৈত্ররথ কানন প্রদক্ষিণ করিয়া অরুণোদসরোবরকে নৃত্য-মুখর করিয়া তুলিল। সেথা হইতে বহুনির্ঝরে শীতান্ত পর্ব্বতে পতিত হইল। এমনি করিয়া নব নব ধারায় নব নৃত্যে নব ছন্দে নব নব লহরী তুলিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে সঞ্চালিত হইয়া স্বর্ণদী নামিল মর্ত্ত্যে—সারা ভারতের বক্ষে। হিমালয় গলিয়া অ-ধরার স্রোত বহিল ভারতের আসমুদ্রতট। তথাপি দেবতার অমৃতগোপনকারী বলিয়া যে দুর্ণাম তাহা ঘুচিল না।

মহাসৃষ্টির ছন্দতালে হিমাচল শিখরে শিখরে ঝঙ্কার তুলিয়া নব নব গীত রচনা করিয়া মন্দাকিনী নন্দা অলকানন্দার সাথে বহিয়া চলে, অচ্ছোদ ও সিতোদ সরোবরে লীলা করিয়া, শ্রীকানন ও নন্দনের পথে নাচিয়া দুলিয়া। নীল আকাশ যেখানে মানস ও আনন্দজল সরোবরের সাথে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছে, সেইখানে মন্দাকিনীর রক্তকমল তুলিয়া সরোবরের শ্বেতকমলের সাথে মিলাইয়া এমনি খুশীভরে যাহারা লীলা করিত, যাহারা সে দেশের শিলাময় পথে অমৃতের লাবণ্য বিলাসে চিরযৌবনের স্পর্শ লাভ করিত, যাহারা মানসে ও আনন্দজলে অন্তরের অমৃতসাধনাকে কুসুমিত করিত, কোনও দিন তাহাদের প্রশ্ন করা হইয়াছিল—'এত খুশী এত যৌবন উচ্ছল, কি কারণে?'

তাহার উত্তর দিল—'অমৃতের আস্বাদে—'

প্রশ্ন হইল—'কী সে অমৃত?'

আকাশে বাতাসে শিলাপথে নব ছন্দ আঁকিয়া পরম খুশীর সাথে তাহারা উত্তর দিত—'আনন্দ।'

ছায়ার কায়া

শ্রীমৃণাল সেন

বারটা বাজিয়া গিয়াছে, সহরের এক সিনেমা দেখিয়া ফিরিতেছি। শীতের রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। স্যাণ্ডেলের ক্রমাগত ছরাৎ ছরাৎ শব্দ ও মাঝে মাঝে রিক্সার ঠুন ঠুন আওয়াজ—এই দুইটাও রাত্রির নীরবতার সহিত মিলিয়া একটা ভয়াভয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কবির ভাষায় রাত্রিটা হয়ত ছিল অভিনব, কিন্তু আমার কাছে অন্ততঃ সেই সময়টুকুর জন্য ভয়াবহই হইয়া উঠিয়াছিল বটে। ভাবিলাম, রিক্সা ডাকি, কিন্তু হায়, পকেট ফাঁকা! কি আর করি! পা চলিতে লাগিল। মনকেও ভয়াবহ অন্ধকারের এলোমেলো চিন্তাধারা হইতে রেহাই দিয়া প্রতিষ্ঠা করিলাম প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায়।

সেদিনের ছবিটার নায়িকা ছিল এক ভিখারিণী—নর্ত্তকী, আর নায়ক এক জমিদার পুত্র—বিশেষ পারিবারিক কারণে পলাতক। সহরের চৌমাথার মোড়ে প্রকাণ্ড ভিড়ের মাঝে সুকণ্ঠী নায়িকা তাহার আসর জমাইয়াছিল, আর সেই ভিড়েরই ক্ষুদ্র অংশীদার হইয়া দেখা দিল পলাতক নায়ক। তারপর?—সে অনেক কিছু।...সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম ভিখারী মেয়েটার কথা, নায়কের কথা ও তাহাদের প্রথম প্রণয়ের দিনের কথা।

সত্য, আমি বড় বেশী ভাবি। নায়ক নায়িকার ভিতরে ভুল বোঝাবুঝিতে হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা বা তাহাদের মিলনে দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করা—এইগুলি আমার একেবারে স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বন্ধুরা এই জন্য আমাকে Sentimental আখ্যা দিয়াছে এবং ইহা লইয়া সকাল সন্ধ্যায় ঠাট্টা তামাসা করে। তবে হ্যাঁ, আমার সহিত বন্ধুদের পার্থক্যও যে বিশেষ কিছু আছে

তেমনও বোধ হয় না। যখন আমি নিরালায় বসিয়া নিহত এণ্টোনিওর পাশে দণ্ডায়মানা রাণী ক্রিশ্চিয়ানার বিষাদময়ী রূপ কল্পনা করিতে গিয়া দুই একবার উঃ আঃ করি, অথবা চন্দ্রমুখীর বিভৎস ও অবাঞ্ছিত জীবনের আড়ালে সুন্দরের সন্ধানের চেষ্টা করি—ততক্ষণ হয়ত বন্ধুরা হোটেলে বসিয়া, দাঁড়াইয়া, টেবিল চাপড়াইয়া, গলা বাজাইয়া গ্রেটা-গার্বোর টেকনিকের বৈশিষ্ট্য বা তাঁহার পারিবারিক জীবনের গোপনীয় ঘটনাবলী লইয়া তুমুল তর্কের সৃষ্টি করিয়া তোলে, যেন গার্বো বলিতেই অজ্ঞান। পার্থক্য এইটুকু—আমি Sentimental ও তাহারা Critic—অবশ্য তাহাদের ভাষায়।

ভাবিতেছিলাম নায়ক নায়িকার কথা আর করুণাময় ভগবানের কথা। দুইজনের ভিতর মনের অমিল এমন কুৎসিতভাবে দেখা দিয়াছিল, ভগবান সহায় না হইলে মিলন তো দূরের কথা, শেষ পর্য্যন্ত যে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইত কে জানে! তাই তো ভাবি, ভগবান সত্যই করুণাময়। * * * * বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চিন্তাগুলি আচম্‌কা হোঁচট খাইয়া সঙ্কুচিত হইল। কড়া নাড়িলাম।

* * * * ঘুম আসিতেছে না, এপাশ ওপাশ করিতেছি। চোখ বুজি—দেখি নায়িকাকে—চোখ মেলি—দেখি আর কোন ছবি। লেপ মুড়ি দিয়া, হাত পা গুটাইয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলাম। * * * *

ছোট্ট এক নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া পথ বাহিয়া চলিয়াছে, আর নদীরই গায়ে ছোট্ট পাহাড়ের নিরালা কোণে আমি আমার কুটীর বাঁধিয়াছি। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, পৃথিবীর বুকে সুরভিত জ্যোৎস্না ভাসিতেছে। তাহারই মাঝে কুটীর থেকে অদূরে একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া গাছের গায়ে হেলান দিয়া শুভ্রবসনা এক তন্বী মালা গাঁথিতেছে ও গাহিতেছে। প্রকৃতির সজীব নীরবতা আমাকেও অনেক আগেই কুটীরের বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে। মেয়েটি এবং তাহার গান—দুই-ই প্রকৃতির অংশবিশেষ হইয়া এক অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিক হইতে আনন্দের লহরী উঠিয়াছে, যেন—"অঙ্কুরিছে, মুকুলিছে, মঞ্জরিছে প্রাণ, শতেক সহস্ররূপে গুঞ্জরিছে গান শত লক্ষ সুরে।"—আকাশে চাঁদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মেয়েটি হাসিতেছে, গাহিতেছে দৈবের চঞ্চল অংশীদারটি আর আড়ালে থাকিতে পারিল না—ঝড় উঠিল—তবু চাঁদ হাসিতেছে, বনবালা গাহিতেছে।

একটা দম্‌কা হাওয়ায় আধখানা মালা ছিঁড়িয়া আমার গায়ে আসিয়া পড়িল। ঝড় বাড়িল, চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকাইল, গান থামিল। বাতাস জোরে বহিতে লাগিল। আধখানা মালা মেয়েটির দিকে বাড়াইয়া দিলাম।

একটা ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সূর্য্যের আলো ঘরটাকে জুড়িয়া বসিয়াছে, আর মাথার কাছে চা হাতে রামশরণ দাঁড়াইয়া আছে। মেজাজ চড়িয়া গেল, এত চমৎকার স্বপ্নটা মাটী করিয়া দিল। বেটা একেবারে নীরস কাঠ! কিন্তু মেজাজ দেখাইব কাহারা উপর? রামশরণ চা'র কাপটা টেবিলের উপর রাখিয়া দৌড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল; বলিয়া গেল, রাস্তায় খাসা নাচগান চলিতেছে। তাইত'! একটা উৎকট সুরের ভাঁজ কানে আসিল। উৎসাহিত হইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম রাস্তার ওপারে পানের দোকানের সম্মুখে গৃধিনী-কণ্ঠী, বিকষিতদন্তী, কৃষ্ণকায়া এক বিশালদেহী প্রৌঢ়া কুমারী মাজা দুলাইয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া একযোগে হাত পা চোখ ইত্যাদি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কসরত দেখাইতেছে এবং আনুসঙ্গিক ক্রিয়া চলিতেছে।—"বহুৎ আচ্ছা", "কেয়াবাৎ" প্রভৃতি মুহুর্মুহুঃ জয়োধ্বনিতে নর্ত্তকী দ্বিগুণ উল্লসিত হইয়া আবহাওয়াকে আরও সরগরম করিয়া তুলিতেছে। বুঝিলাম সমঝদারদের কেহ পানওয়ালা, কেহ বা বিড়িওয়ালা, আর কেহ রামশরণ শ্রেণীর রসজ্ঞ নাগরিক।

দুইটি পয়সা লইয়া প্রৌঢ়াকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে দক্ষিণা পাইয়া প্রৌঢ়া একটু মুচকি হাসিয়া জানালার পাশে আসিল এবং হস্তপদ সঞ্চালনের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। আবার ঝড় উঠিল, কিন্তু বাতাস এইবার বিপরিতমুখী। ঝড়ের মুখে জানালা বন্ধ হইয়া গেল। নিজেকে আবার বিছানায় এলাইয়া দিয়া সিলিংএর কড়িকাঠ গুনিতে লাগিলাম। সত্যিই রামশরণের মত রসাল লোক পৃথিবীতে কয়জন মেলে!…হুঁস হইল চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। রামশরণের উদ্দেশ্যে আর একবার

সশ্রদ্ধ প্রণাম ঠেকাইয়া চা'র টেবিলটা কাছে টানিয়া লইলাম।

"Thou hast thy music too"—পাশের বাড়ীর স্কুলে-পড়া মেয়েটি Keatsএর "Ode to autumn" কবিতার রসগ্রহণ করিতেছে।—"Thou hast thy music too; Thou hast মানে তোমার আছে, Thou hast মানে......।"

চা'র কাপটা মুখের কাছে তুলিতেই রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে পড়িয়া গেল—"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী ?"

জাফরনগরের শের

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

গত বছরের মত এবারও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম থেকেই বাঘের উপদ্রব সুরু হয়। সাতখানা গ্রামের লোক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জাফরনগরের বীর আসরে নেমেছেন।

আজ হিজুলী, কাল হালালপুর, তার পরের দিন জাফরনগর, প্রত্যহই গো হত্যার সংবাদ আসতে থাকে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বীরের অভিযান হয় সুরু। প্রত্যহই খোরাকের জন্য চাই একটা আস্ত গরু, আর তাছাড়া জলযোগের জন্য দেশী কুকুর, ছাগল ও ভেড়া প্রায়ই প্রয়োজন হয়।

স্থানীয় শিকারী মহলে সাড়া জাগে। কেউ জানোয়ার চলা পথের উপর মাচা বাঁধলেন, কেউ মরী'র উপর বসে রাত কাটালেন, কেউবা লোক দিয়ে জঙ্গল ঘিরিয়ে বন পেটালেন; কিন্তু সবই বিফল হ'ল। জাফরনগরের বীর যে বিভীষণের পরমায়ু নিয়ে এসেছে, ওকে মারে কে ?

সংবাদটা মহাকুমা হতে সদরে গেল এবং সেখান থেকে গেল কলকাতা সহর পর্য্যন্ত।

এবার কলকাতা হতে মোটর বোঝাই হয়ে শিকারীর আমদানী হতে লাগলো; কিন্তু ফল কিছু হল না। তারা টিফিন কেরিয়ার খালি করে ক্লান্ত দেহে ফিরে যেতে লাগলো।

সংবাদ পেয়ে আমেরিকান সৈনিকের দল এসে তাঁবু গাড়লেন জাফরনগরের বনের কিনারে। উজ্জ্বল তাদের স্বাস্থ্য, লোভনীয় তাদের পরিচ্ছদ, আর সকলের হাতেই একটা করে দামী মানুষ মারা রাইফেল।

গ্রামে গ্রামে সাড়া জাগে। এবার বাঘ মরবে নিশ্চয়ই। আমেরিকান কায়দায় শিকার আরম্ভ হ'ল। জাফরনগরের বীরের উপর একটা গুলিও পড়ল; কিন্তু ফল সেই পূর্ব্বের মতই রয়ে গেল।

তাঁবু উঠলো; কিন্তু গোহত্যা থামলো না। চৈত্র মাসের মধ্যে-ই বীর "সেঞ্চুরী আপ" করলে।

অবশেষে :

২৪শে জ্যৈষ্ঠ। সকাল থেকেই অকাল বাদল নেমেছে। বিকেল বেলা তরুণ শিকারী শঙ্করনাথ কেবল চায়ের পেয়ালাটা শেষ করেছে এমন সময় বন্ধু অপূর্ব্বকুমারের চাপরাশী এসে সংবাদ দিল, জাফরনগরে গত রাতে এক বৃহৎ গরু মেরেছে, ডাক্তারবাবু (অপূর্ব্বকুমার) আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, এখুনি যেতে হবে।

শঙ্করনাথ মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে মনটাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলে; কিন্তু গাজনের সন্ন্যাসী চড়কের বাজনা শুনলে নাকি আর স্থির থাকতে পারে না—তাই তা'কে সেই দুর্য্যোগের মধ্যে দিয়েই যাত্রা করতে হ'ল।

ওরা যখন জাফরনগরে এসে পৌছাল তখন মেঘলা দিনের সন্ধ্যা নামতে আর বেশী দেরী ছিল না।

গত রাতে যার গরু নিহত হয়েছিল সেই পথ দেখিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌছে দিয়ে গেল। নিবিড় জঙ্গলের মাঝে মৃত গরুটা পড়ে আছে। পাশেই নরম কাদার উপর পড়ে রয়েছে জাফরনগরের বীরের পদচিহ্ন।

অপূর্ব্বকুমার শঙ্করনাথকে সেই পদচিহ্ন দেখিয়ে বল্লে, —ধোঁয়া দেখে আগুনের গুরুত্বটা বোঝ্।

শঙ্করনাথ মোটা গলায় শুধু একটা হুঁ দিল।

আকাশ থেকে আবার এক পশলা বৃষ্টি নামলো। এবার ওদের মুস্কিলে পড়তে হ'ল। কাছাকাছি বসবার মত একটাও গাছ নেই। আর এখন এত দেরী হয়ে গেছে যে গ্রামের থেকে লোকও উপকরণ নিয়ে এসে মাচা বাঁধবার সময় পাবে না। এদিকে বনের বুকে সন্ধ্যার ছোঁয়া লেগেছে।

অন্য কোন উপায় না পেয়ে ওরা মৃত গরুটার কাছ হতে হাত কুড়ি দূরে একটা বন তুলসীর ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসে পড়লো।

অন্ধকারে ডুবে গেল সারা বনানী। পাশাপাশি



জাফরনগরের নিহত শের

স্থিরাসনে বসে দুই বন্ধু বাঘের ধ্যানে মগ্ন হ'ল। এদিকে জাফরনগরের বনের বনিয়াদি মশককুল ওদের ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করলে—তাদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ তারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নয়। এর উপর প্রকৃতির অত্যাচার সুরু হ'ল। শরৎকালের মত এক একখানা মেঘ ভেসে আসে, আর ওদের সঙ্গে একটু রসিকতা করে যায়।

বীর সাধকদ্বয়কে মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। হাত পা ও মুখের অনাবৃত অংশে মশক স্পর্শে যে জ্বালা ধরে, বিরহের জ্বালার চেয়ে সে জ্বালা কিছু কম নয়।

রাত মনে হয় তখন আটটা হবে, খস্ খস্ করে একটা শব্দ এলো আর সেই শব্দটা মৃত গরুটার কাছ পর্য্যন্ত এসে থেমে গেল। দুই বন্ধুর স্নায়বিক কেন্দ্রে জেগে উঠল চেতনা।

অপূর্ব্বকুমার বন্দুক তুলে ধরে টর্চ্চের বোতাম টিপলে। অন্ধকারের কাল পর্দ্দা ভেদ করে ছুটলো আলোর তীর। আর সেই আলোতে বন্ধুদ্বয় দেখতে পেলো, মৃত গরুটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বৃহৎ শেয়াল।

চোখে আলোর ধাঁধা কাটতেই শেয়ালটা খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ করে ছুটলো বনের মধ্যে, আর শঙ্করনাথ মোটা গলায় উচ্চারণ করলো—"হোপলেস্"।

আলো নিভে গেল। আবার সুরু হ'ল সাধনা। রাত প্রায় তখন ৯'টা হবে সেই সময় ওদের কানে ভেসে এলো আবার জানোয়ারের পদশব্দ।

অপূর্ব্বকুমার ফিস্ ফিস্ করে বল্লে—শালার শেয়ালটা জালালে। শঙ্করনাথ অপূর্ব্বকুমারের গায়ে একটা চাপ দিয়ে আলো জ্বালাবার সঙ্কেত করে। নিতান্ত অনিচ্ছা ভরে অপূর্ব্বকুমার টর্চ্চএর বোতাম টিপলে। সাদা আলোর মধ্যে দিয়ে সে দেখতে পেলো মাত্র কুড়ি হাত দূরে মৃত গরুটার উপর দীপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে জাফরনগরের বীর। অপূর্ব্বকুমারের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল।

সময়ের সমুদ্র হ'তে মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড ঝরে পড়ে! শঙ্করনাথের বন্দুকের দক্ষিণ নল হতে অগ্নি বর্ষণ হ'ল—নিস্তব্ধ বনানীর মাঝখানে জেগে ওঠে বেমানান শব্দ।

অপূর্ব্বকুমারের হাতের আলো নিভে গেল। উত্তেজনায় ওদের স্নায়ুমণ্ডলীতে আক্ষেপ জেগেছে—তাই ওদের নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত তালে। গভীর অন্ধকারের মাঝে, বুকে এক অজানা আশঙ্কা নিয়ে বসে আছে দু'জনে, কারও মুখ দিয়ে কথা সরে না।

দু'টো মিনিট চলে গেল। এবার নিস্তব্ধতা ভেঙে অপূর্ব্বকুমার বল্লে, এমন সুযোগ জীবনে কম আসে, এত বড় জানোয়ারটা ফস্কে ফেললি।

হতাশা মিশ্রিত সুরে শঙ্করনাথ জবাব দিল—আমি আর

এর চেয়ে বেশী কি করতে পারি, ঠিক ত মাথা তেগেই মেরেছিলাম।

অপূর্ব্বকুমার আলো জ্বেলে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—দেখি গুলিটা কোথায় গিয়ে বিধলো। হয় মাটিতে, নয় মৃত গরু-টার গায়ে ঠিক বিঁধেছে।

গরুটার চার পাঁচ হাত কাছে গিয়েই অপূর্ব্বকুমার চীৎকার করে উঠলো—ওরে বাঘ পড়েছে, বাঘ পড়েছে।

শঙ্করনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—পালিয়ে আয় শীগ্‌গীর পালিয়ে আয়, লেপার্ডকে বিশ্বাস নেই।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দুই বন্ধুতে বন্দুক বাগিয়ে ধরে এগিয়ে চল্‌ল। কাছে এসে দেখলে জাফর-নগরের বীর একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। ব্রহ্মতালুর মধ্যে দিয়ে গুলিটা প্রবেশ করেছে, আর সেখান দিয়ে সধবার সিঁথীর সিঁদুর রেখার মত মোটা ধারায় টুক্‌টুকে লাল রক্ত ধারা বইছে। মৃত গরুটাকে আলিঙ্গন করে পড়ে আছে জাফরনগরের বীর।

মাতব্বরী মুখে শঙ্করনাথ বল্লে—বল্লাম মাথা তেগে মেরেছি। দেখেছিস এক ইঞ্চি নড়ে নি, একেবারে ঘুঘুর মত পড়েছে।

জঙ্গল থেকে বীরের মৃতদেহ নিয়ে আসা হ'ল জাফর-নগর পল্লীতে। এবার সুরু হ'ল জনসমাগম। সেই দুর্য্যোগপূর্ণ রাতে দাবানলের মত সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে। দলে দলে লোক আসছে নিহত বীরকে দেখতে।

এতদিন বীরের উপর যার যত সঞ্চিত ক্রোধ ছিল, পদাঘাতের মধ্য দিয়ে তা বর্ষিত হতে লাগলো নিহত বীরের মুখের উপর।

অপূর্ব্বকুমার শঙ্করনাথকে বল্লে—আমাদের দেশের লোকগুলো মানুষ হ'ল না, কি ভাবে বীরের সম্মান দিচ্ছে দেখ্।

মোটা গলায় শঙ্করনাথ বল্লে—সর্বকালে সর্ব দেশে নিহত বীরকে ঐ ভাবেই সম্মান দেয়। মুসোলিনীর কথাটা একবার ভেবে দেখ্ না।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় নিহত বীরকে ঘোড়ার গাড়ীর মাথায় তুলে জীবিত বীরদ্বয় গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে সহর অভিমুখে যাত্রা করলে।

বীরশূন্য জাফরনগরের বনানী আজ শোকাচ্ছন্ন। গভীর রাত্রিতে গ্রামবাসীরা শুনতে পায় বিধবা বাঘিনীর বিলাপ ধ্বনি।

সাতখানা গ্রামের লোক বিধবা বাঘিনীর বৈধব্য যন্ত্রণা ঘোচাবার ভার দিয়েছে শঙ্করনাথকে।

দেখা যাক্ শঙ্করনাথ কি করে।

১৬ই আগষ্ট

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

আমার আকাশে নাহি চাঁদ, নাহি আলো,
নিশীথ-শয়নে জীবনের খাতা খুলি—
হিসাব-নিকাশ মিলাইতে গিয়া ভুলি,
মাথার উপর ডেকে যায় দেয়া কালো।

আমার প্রাণের শত আশা ভাষা গান,
ব্যর্থ হইয়া মনের দেউলে কাঁদে ;
মেঘেরা মাদল বাজায়—ঘিরিয়া চাঁদে,
নিশীথিনী তাই ভাষাহীন ম্রিয়মান্।

আমার হিয়ার দ্রুত কম্পন ধ্বনি।
প্রকৃতির সাথে সাড়া দিয়ে দিয়ে চলে—
মানুষ ও পশু ; পশু-মানবের বলে,
ঘরে ও বাহিরে আজিকে প্রমাদ গণি !

আমার তোমার দুর্য্যোগ রাতে শত
সঞ্চিত হোল অভিশাপ, হাহাকার !
গুণিতে হইবে ভুলের মাশুল তার—
১৬ই আগষ্ট ঋণ চাপায়েছে যত।

তোমার আমার কৃত-কর্ম্মের ফলে—
আগামী দিনের কলঙ্ক হোল জমা,
ইতিহাস কভু এরে করিবে না ক্ষমা।
ধুয়ে যাবে নাকো দু'ফোঁটা চোখের জলে !

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৮

সেদিনও তেমনি জোছনা উঠিয়াছিল—

অপর্ণা জোছনায় বসিয়া কি যেন সব ভাবিয়া যাইতেছিল, অজিত আসিয়া পাশে বসিয়া প্রশ্ন করিল, কি দেখছো—

—আজ ওদের কেমন দেখলে ?

—সুন্দর, বেশ আছে। কিন্তু ছেলেটাই সব চেয়ে বেশী দুষ্ট—লাঠি নিয়ে যে ছুটে এসেছে !

অপর্ণা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিল—ওরা খুব সুখী বলে মনে হয় না ?

—নিশ্চয়ই, এমন সুন্দর গৃহ যার, তার অভাব কি ?

অপর্ণা কহিল—এর মাঝে ও নেহাতই হয়ত একা, তাই প্রসুপ্ত পরিবারকে ফেলে একাকী ও বসে আছে—আপনার দুঃখকে স্মরণ ক'রতে—

অজিত কহিল—তুমিও কি এমনি একা একা বসে থাকো ঐ জন্যেই ?

—তুমি থাকো না ?

—কদাচিৎ, কিন্তু আমার প্রশ্নের ত উত্তর হ'ল না ওটা। তুমি কেন এমনি একা বসে থাকো—

অপর্ণা বলিল—বল্‌লে বুঝবে না, কারণ বোঝানা শক্ত, আর যা ব'ল্‌বো তা হয়ত বিশ্বাস ক'রবে না—

—বুঝতে হয়ত পারবো না, কিন্তু বিশ্বাস অবশ্যই ক'রবো—

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল—আমার মনে হয় মানুষের বাসনা এই দেহেই শেষ নয়, এর উর্দ্ধে দেহাতীত একটা বাসনা আছে, চাওয়া আছে। সেই বাসনা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই পৃথিবীতে অতৃপ্ত—তাই মানুষ পরম পরিতৃপ্তি, পূর্ণ আনন্দ থেকেও নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আপনাকে একান্ত একাকী পেতে চায়। এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে মানুষের মুক্তি নাই, তাই সে চির-ব্যভিচারী।

অজিত ক্ষণিক কি চিন্তা করিয়া কহিল—তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পারো নি ?

—এই রকম প্রশ্ন করবার ভয়েই তোমাকে এ কথা ব'ল্‌তে চাই নি। ভাল না বাস্‌তে পারলে তোমাকে বিয়ে ক'রতে পারতুম না, কিন্তু তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো কেন ?

—অবিশ্বাস ? না, তবে আমাকে ঠিক ভালবাসো না বলে সংশয় জেগে ওঠে—

—আমারও যদি তাই মনে হয় তবে তুমি কি উত্তর দেবে ?

—তার উত্তর নেই।

অপর্ণা একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলিল—তবে এ সব কথা তুলে অকারণ অসচ্ছন্দতা ডেকে এনে লাভ নেই। আমি যা ব'লতে চেয়েছি তা হয়ত ব'ল্‌তে পারিনি নয়, তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি।

—তোমার মত একাকী বসে থাক্‌তে তো আমার ইচ্ছা হয় না—কেন ?

—তুমিই সুখী। আপনার মনকে যদি ভাল ক'রে দেখতে একদিন তবে হয়ত বুঝতে—তুমিও ঠিক আর সকলের মত একা, কারণ তোমার অফুরন্ত চাওয়ায় পরিতৃপ্তি যেমন আমার দেওয়ার ক্ষমতা নেই তেমনি—অন্য কোনো মেয়েরই নেই। পক্ষান্তরে কোনো পুরুষেরও নেই।

অজিত সম্ভবতঃ কিছু বুঝিল না, দেহের উর্দ্ধে মনের অস্তিত্বকে সে হয়ত জীবনে উপলব্ধি করে নাই, তাই অপর্ণাকে অত্যন্ত রহস্যময়ী বলিয়া সে মনে মনে আপনার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিল মাত্র। অপর্ণা চাহিয়া দেখে ওই দুঃস্থ পরিবারের কর্ত্তাটি তখনও একান্ত একাকী উঠানেই বসিয়া আছে—

অপর্ণা কহিল—চল ঘরে যাই। কথায় কথা বাড়ে।

খোকা মায়ের কোলের মধ্যে চোখ বুজিয়াই শুইয়া ছিল, মা একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেই মিটমিট করিয়া তাকাইতে আরম্ভ করিল—

গৌরী আবার শুইয়া পড়িল—দুষ্টু এখনও ঘুমোস্ নি, তোর বাবার ফিরবার সময় হ'ল যে! তাকে ভাত জল দিতে হবে না ?

খোকা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তার পর কি মা ?

গৌরী বলিতে আরম্ভ করিল—রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে চ'ল্লেন। কত দেশ, কত নদী, কত পর্ব্বত পার হ'য়ে, মেঘের রাজ্য পার হ'য়ে শেষে একদেশে উপস্থিত হলেন। পক্ষীরাজ ঘোড়াকে এক গাছে বেঁধে রেখে তিনি একটু এগিয়ে দেখেন এক প্রকাণ্ড রাজপুরী। বাইরের সিংদরজায় সেপাই পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু সে ঘুমন্ত। আশে পাশে আরও কত সেপাই-সান্ত্রী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। রাজপুত্তুর ভিতরে গিয়ে দেখেন, গরু বিচালি খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে, মুখে বিচালি ঝুলছে, ময়ূর নাচতে নাচতে ঘুমিয়ে পড়েছে……এই ঘুমন্ত রাজপুরীর সব জায়গা রাজপুত্তুর তন্ন তন্ন ক'রে দেখলেন। এরা কেন ঘুমিয়েছে, কখন জাগবে কিছুই জান্লেন না। শেষে দেখেন এক ঘরে এক রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে। চুলগুলো ঝুলে পড়েছে মেঝেয়—

—পালঙ্ক কি মা ?

—এই খাটের মতই, কিন্তু নক্সা করা, খুব দামী। এ রকম করলে ঘুমোবি কখন ?

পাশের বাড়ীর পেটা ঘড়ীতে নয়টা বাজিয়া গেল।

খোকা প্রশ্ন করিল—ও কিমা ?

—ঘড়িতে ন'টা বাজলো, রাজবাড়ীতে। কখন ঘুমুবি ?

—তার পর কিমা ?

গৌরী পুনরায় আরম্ভ করিল—রাজকন্যার মেঘবরণ চুল, কুঁচবরণ রূপ। সমস্ত ঘর তার রূপে আলো হ'য়ে আছে, রাজকন্যার চুল পালঙ্ক ছাড়িয়ে মেঝেয় এসে পড়েছে—

—সে তো, তোমারও পড়ে মা, তুমি রাজকন্যা ?

—না, শোন তার পর, মাথার শিয়রে একটা সোনার কাঠি, একটা রূপার কাঠি। রাজপুত্তুর তাই নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে সোনার কাঠিটা হাত থেকে রাজকন্যার কপালের উপর প ড়লো—দেখতে দেখতে সব জেগে উঠলো। হাতীশালে হাতী ড াকলো, ঘোড়াশালে ঘোড়া…রাজপুত্তুর শেষে একদিন রাজ কন্যাকে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উঠে ফিরে এলেন—

—রাজকন্যাকে আ নলে কেন ?

—খেলা ক'রবে ব'লে। এখনও ঘুমোলি নে ?

খোকা ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—ওই রাজবাড়ীতে পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে ?

সদর দরজায় কড়ার শব্দ হইল, গৌরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিরক্তির সঙ্গে কহিল—জানিনে, তোর বাবা এসেছে, যেমন ছেলে, এখন একা একা থাকো—

খোকা চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল—সে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছে। বৈকালে আকাশের গায়ে যে সোনালী আর কালো মেঘগুলি দেখিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া সে চলিয়াছে। সোনালী মেঘের প্রাচীর সে তরোয়াল দিয়া কাটিয়া রাস্তা করিয়া চলিয়াছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়াছে। বহুদূরে কালো মেঘের ও-পারে গিয়া দেখে সেই ঘুমন্ত রাজপুরীর চূড়া। রাক্ষসী আসিয়া পথ আটকাইল। বাবা যেন কি বলিতেছেন—

খোকা ঘুমের ঘোরে জড়িত চোখ মেলিয়া আবার চোখ বুজিল। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না।

পরদিন সকালে খোকা বারান্দায় সূতা ও ঘুড়ির একটা অকিঞ্চিৎকর সংস্করণ লইয়া খেলা করিতেছিল। ঘুড়ির কাগজের অবশিষ্ট কিছুই নাই, কিন্তু খোকা নিবিষ্ট মনে তাহাই উড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

গৌরী আসিয়া কহিল—কোথাও যাস্ নে খোকা।

—না। এই ত ঘুড়ি ওড়াচ্ছি।

কর্ম্মব্যস্ত মা চলিয়া গেলে, খোকা আকাশের পানে চাহিয়া দেখে তেমনি মেঘ। কালো কালো, তাহার পাশে পেঁজা তুলার মত শাদা মেঘ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। খোকা রেলিং ধরিয়া ভাবিল, ওই মেঘরাজ্যের পরেই সেই ঘুমন্ত রাজপুরী, সেখানে চুল এলাইয়া কতকাল ধরিয়া ঘুমাইয়া আছে রাজকন্যা, দাসী চামর হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া যেদিন রাজকন্যাকে সে লইয়া আসিবে, মা সেদিন বলিবেন—কোথায় ছিলি খোকা ?

সে রাজকন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া বলিবে—বল ত কোথায় ?

মা আশ্চর্য্য হইবেন, সে রাজকন্যাকে পকেট হইতে বাহির করিয়া দিয়া কেবল হাসিবে—রাক্ষসী হত্যার গল্পটী সে সবিস্তারে বলিবে।

হাতের ঘুড়িখানা বাতাসে কাৎ কাৎ করিয়া উঠিল।

খোকা চাহিয়া চাহিয়া আবার ভাবিল, রাজকন্যা যদি আজই সে আনিতে পারিত তবে দুইজনে মিলিয়া ঘুড়ি উড়াইত—রাজকন্যা ঘুড়ি উড়াইয়া দিত, সে সূতা ধরিয়া দৌড়াইত।

দুপুরে গৌরী ক্লান্তদেহে ঘরে আসিয়া দেখে খোকা পাঞ্জি খুলিয়া নিবিষ্টমনে ছবি দেখিতেছে। রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া অনেকক্ষণ আগেই সে তাহাকে আফিসে পাঠাইয়াছে। তাহার পর একরাশ কাপড় ওয়াড় কাচিতে সে সত্যই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গৌরী কহিল—খোকা এদিকে আয় শুয়ে থাকবি—

—না মা, আমি ছবি দেখছি।

—না, যে রোদ পড়েছে, এদিকে আয়।

খোকা মিনতি করিয়া কহিল—কোথাও যাবো না মা, ছবি দেখে পরে শোবো।

গৌরী ক্লান্তদেহে শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

খোকা ছবি দেখিতে দেখিতে মাথা তুলিয়া দেখে মা ঘুমাইতেছে। ভিজাচুল মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে রাজকন্যার মত।

নিস্তব্ধ দুপুর। চারিপাশে কোন সাড়া শব্দ নাই—গাছের পাতাও নড়িতেছে না। খোকা এদিকে ওদিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুদূর আসিয়া দেখে সদর দরজাটাও খোলা আছে—অসাবধানতাবশতঃ দেওয়া হয় নাই। খোকা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সম্মুখেই বিস্তীর্ণ রাস্তা, কদাচিৎ দুই একখানা গাড়ী চলিতেছে—খোকা অজ্ঞাত, অনির্দিষ্ট, অপ্রাপ্য রাজকন্যাকে আনিতে রওনা দিল—

রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া আছে, তাহার কান ধরিয়া টানিবার দুর্দমনীয় প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সে আর একটু অগ্রসর হইল।

মনে মনে একবার ভাবিল, তাহার হাতে ত তরোয়াল নাই, যদি রাক্ষসী আসিয়া পড়ে সে কি করিবে। বাড়ীর সামনে দেবদারু গাছের তলায় সে ভীত হইয়া ঘুমন্ত কুকুরটির পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সামনে চাহিয়া দেখে আকাশে তেমন মেঘ নাই, রাস্তাটা যথাসম্ভব পরিষ্কার আছে। মা তাহার রাণী নয়, তাই পক্ষীরাজ ঘোড়া দিতে পারে নাই। যাহা হউক, আজ তাহার মা ঘুমাইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সে সেই স্বপ্নপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে আনিয়া হাজির করিবে।

এক বৃদ্ধা ভিখারিণী, ভিক্ষা করিয়া উত্তপ্ত রাস্তা দিয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চলিয়াছে। খোকা চুপ করিয়া ভীত দৃষ্টিতে দেখিতেছিল—এই সেই রাক্ষসী কিন্তু তাহার হাতে ত কিছু নাই, একেবারে নিরস্ত্র। সে গাছটির আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। বুড়ী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল; খোকাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।

খোকা তাকাইয়া দেখে—ওইত সেই রাজপুরী। মা বলিয়াছে, রাজবাড়ীতে পেটা ঘড়ি বাজে। খোকা হৃষ্টমনে চলিতে লাগিল।

সিংদরজায় সেপাই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া একখানা টুলের উপর বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে। চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল সে সত্যই ঘুমাইতেছে—মেঘের রাজ্য পার না হইয়াই সে তাহা হইলে ঘুমন্ত রাজপুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পাশের খাঁচায় ময়ূর ঘুমাইতেছে, সামনের জলটুকুতে পাতিহাঁস এক পায়ে ভর দিয়া, পৃষ্ঠের পালকে মুখ লুকাইয়া ঘুমাইতেছে। সেই ঘুমন্তপুরী, খোকা সামনের চত্বর পার হইয়া দালানের সিঁড়িতে উপস্থিত হইল।

ইজেরটা খুলিয়া যাইতেছিল, সেটাকে তুলিয়া দিয়া দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে যাইবে—কিন্তু একটা কুকুর চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে—ঘুমন্ত রাজপুরীর সেই জীবন্ত কুকুরটির অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি খোকার ছিল না—সে উপরে উঠিয়া গেল আর একবার চাহিল, কুকুরটি চোখ বুজিয়াছে—

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া খোকা দেখে—তেমনি ঘর, শ্বেত পাথরে বাঁধানো, ইহাই হয়ত পালঙ্ক। ঘরে ঢুকিয়া দেখে সত্যই এক রাজকন্যা ঘুমাইতেছে। মেঝে পর্য্যন্ত এলাইয়া পড়িয়াছে তাহার মেঘবরণ চুল, বালিশে মাথা রাখিয়া কুঁচবরণ কন্যা ঘুমাইতেছে। বুকের উপর একখানা খোলা বই নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিতেছে।

খোকন সমস্ত ঘর খুঁজিতে আরম্ভ করিল—সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, কোথায় থাকিতে পারে? পালঙ্কের নীচে খুঁজিল, তাহার মা সাধারণতঃ এইরূপ স্থানেই মিছরির কৌটা লুকাইয়া রাখেন। কোথাও সোনার কাঠি রূপার কাঠি নাই। বাহির হইয়া আসিবে, হঠাৎ দেখে মেঘবরণ চুলে তাহার পথ বন্ধ। তাহাকে সরাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল—

আশ্চর্য্য—রাজকন্যা জাগিয়াছে। খোকা তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিল—তুমি রাজকন্যা?

রাজকন্যা কহিল—হ্যাঁ। তুমি কে?

—আমি খোকা।

রাজকন্যা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। খোকা আবার শুধাইল—তোমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে?

রাজকন্যা হাসিয়া বলিল—হুঁ, তুমি নেবে?

—হুঁ।

—কি করবে?

—দেশ জয় ক'রতে যাবো।

—তারপর?

—রাজকন্যাকে নিয়ে মাকে দেব।

—রাজকন্যাকে নিয়ে কি ক'রবে?

খোকা চিন্তা করিয়া কহিল—খেলব।

—কি খেলবে?

—ঘুড়ি ওড়াবো।

—তোমাদের বাড়ী কোনদিকে?

খোকা অনেকটা উদাসভাবে যা হয় একটা দিক দেখাইয়া দিয়া বলিল—এই দিকে?

—কেমন ক'রে এলে?

—হেঁটে হেঁটে—

—কেন?

খোকা ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল—মা'র ত পক্ষীরাজ ঘোড়া নাই।

রাজকন্যা আবার একটু হাসিয়া উঠিল।

অপর্ণা দাসীকে ডাকিয়া কহিল—এ পাশের ওই বাড়ীর খোকা। কেমন ক'রে এখানে এল? একে দিয়ে এসো, ওর মা হয়ত ব্যস্ত হয়েছে।

দাসী খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া কহিল—বাড়ী যাবে?

খোকা ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, যাইবে। কিন্তু রাজকন্যাত তাহার সহিত গেল না। সে কহিল—তুমি যাবে না?

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—আমাকে নিয়ে কি ক'রবে?

খেলবো। তুমি ঘুড়ি উড়িয়ে দেবে।

আর?

মা'র কাছে নিয়ে যাবো।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আর একদিন যাবো। এসো, কেমন?

খোকার ডাগর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল—কই রাজকন্যা ত আসিল না! অত্যন্ত ব্যথিতভাবে সে দাসীর কাঁধের উপর অত্যন্ত ক্লান্তের মত মাথাটা ন্যস্ত করিয়া দিল। দাসী চলিয়া গেল—

খোকার জলে-ভরা চোখ দুইটির অপ্রকাশ্য বেদনা অপর্ণার মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে আপনমনে ভাবিল, এই খোকার জীবনে প্রথম সে রাজকন্যার সন্ধানে বাহির হইয়াছে, সারা জীবন উন্মুক্ত বিশ্বের বুকে সে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে কিন্তু আজকার মত রাজকন্যা আসিবে না। বার বার দেখা দিয়া ইন্দ্রধনুর মত মিলাইয়া যাইবে। আশা নাই, তবুও খোঁজার অভ্যাস সে ছাড়িতে পারিবে না……এমনি করিয়া অমন একদিন রাজকন্যা খুঁজিতে তাহারই দ্বারে আসিয়াছিল, এই খোকার মত অশ্রু-ভারাক্রান্ত নেত্রে আপনার হৃদয়ের উন্মত্ত বেদনায় কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া গিয়াছে।……তাহার দ্বারের সম্মুখ দিয়া বিপুল গৌরবে রাজপুত্রও চলিয়া গিয়াছে, জীবনের স্বপ্ন-সঞ্চিত মালাটিকে ছিঁড়িয়া পাশের ধূলায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে—খোকার জল-ভরা ডাগর চোখ দুইটি কানের কাছে যেন ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে—আসিল না, আর আসিবে না।

ক্রমশঃ



প্রাচীন জ্যোতিষ ও আধুনিক বিজ্ঞানে পৃথিবী

শ্রীনিমর্চাঁদ সাহা

প্রাচীন জ্যোতিষ আপনার প্রাচীনত্বে ও মৌলিকতায় জগতের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। কালের কুটীল আবর্ত্তন বা যুগধর্ম্ম সাময়িক তন্মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি পরীক্ষায় তাহা অদ্যাপি অটুট অক্ষয় থাকিয়া উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সত্যের নির্দ্দেশ দিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান যান্ত্রিক জটীলতায় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদের শুভ্র দর্শনকে ঝাপ্‌সা করিয়া এক দুর্জ্ঞের জটীল হইতে জটীলতর পথে ধাবমান্ হইয়াছে। সহজ সরল জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যগতি তাহার বাঞ্ছিত নয়, সংসার সমরাঙ্গনে যোদ্ধার ন্যায় নিত্য নূতন দুর্গম, দুস্তর পথে তাহার অভিযান, কণ্টক তাহার শয্যা, ঘোলা পানীয় তাহার রুচির বৈশিষ্ট্য। রহস্য উদ্ভেদ করিতে গিয়া বিজ্ঞান বহু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পথের নূতনত্ব বিজয়-বৈজয়ন্তী শুধু শ্রমকে ভুলাইয়া পূর্ণ এককের দিকে অগ্রসর হইতে তা'র সহায়ক মাত্র। প্রাচীনকালের মূল গবেষণা-গৌরবে বৈজ্ঞানিকের বক্ষ তখন এক অভূতপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদে আন্দোলিত হইয়া উঠিবে।

> "ভচক্রং ধ্রুবয়োর্বদ্ধ মাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ
> পর্য্যেত্যজস্রং তন্নদ্ধা গ্রহকক্ষা যথাক্রমং"
> সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২শ অধ্যায়, ৭৩ শ্লোক (ভূগোলাধ্যায়)

অর্থাৎ "ধ্রুবদ্বয়ে বদ্ধ ভচক্র প্রবহ-বায়ু দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া পর্য্যটন করে, ইহা ক্রমানুসারে তাহাতে বদ্ধ গ্রহকক্ষা ভচক্রের সহিত চলিতে থাকে'।

পৃথিবী দুইটি ধ্রুব দ্বারা আবদ্ধ ও স্থির, সূর্য্য ভ্রাম্যমান থাকিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী কখনও স্থানচ্যুত হইতে পারে না। কাজেই সূর্য্য বার্ষিক গতি দ্বারা পৃথিবীকে ঘুরিয়া এক বৎসর তিনশত ষাইট দিনে—যাত্রাস্থানে আসে। নিজ অক্ষদেশে ঘুরিয়া পৃথিবীর শুধু আহ্নিক গতিই হয় এবং পৃথিবী আকাশের মধ্যস্থানে অবস্থিত থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞান সূর্য্যকে স্থির রাখিয়া পৃথিবীকে ভ্রাম্যমান বলিতেছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি দিবারাত্র করে এবং বার্ষিক গতি সূর্য্যকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় যাত্রাস্থানে আসিতেছে। বিজ্ঞানের অন্য একটী প্রমাণে, 'পৃথিবীর মেরু-রেখ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাড়াইয়া আকাশের দুই প্রান্তে ঠেকিতে দিলে যে দুই স্থান পাওয়া যায় তাহাই আকাশের সুমেরু বা কুমেরু। সুমেরু তারকার নাম ধ্রুব, আর কুমেরুর তারকার নাম "হ্যাড্‌লির অকট্যাণ্ট্‌" (শ্রীস্নেহময় দত্তের সরল বিজ্ঞানের ১৪৩নং পাতার তৃতীয় পংক্তিতে) উক্ত প্রমাণ পৃথিবীকে প্রাচীন সূর্য্য সিদ্ধান্তের ন্যায় স্থির প্রতিপন্ন করিতেছে। পৃথিবীকে প্রথম 'ভ্রাম্যমান্' বলিয়া পুনঃ 'স্থির' প্রমাণ করিলে মত দুইটী আত্মবিরোধী হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ সূর্য্যস্থির, দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী স্থির এবং তারকা-রাশি যেখানে সর্ব্বসময়ের জন্য স্থির সেখানে চন্দ্র আকাশমার্গে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি ২৭টী নক্ষত্র ঘুরিলেই তা'র আকাশ ঘুরা শেষ হয় ও পূর্ব্ব নক্ষত্রে পৌঁছে। সূর্য্য যদি স্থির হয় তবে ২৮ দিনে অমাবস্যা হইত কিন্তু তাহা ভুল। ইহা কখনও হয় না।

সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতের মৌলিকত্ব সপ্রমাণে আমার নিজ গবেষণায় তাহার সপক্ষে যে যে প্রমাণ ও খগোল উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবী যে নিজ অক্ষরেখায় দুইটী ধ্রুব দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া বৈদ্যুতিক পাখার ন্যায় অবিরত পরিক্রম করিতেছে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বর্ত্তমান জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের ভ্রান্তগতি হ্যাড্‌লির অকট্যাণ্টে আসিয়া ধাক্কা খাইয়াছে, না ফিরিয়া উপায় নাই। এ প্রত্যাবর্ত্তন নয়, বিপর্য্যয়।

—পরিহাস—

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

দৈনিক-দীনতা-দুষ্ট বাঁচিবার কেন এ উল্লাস?
দুর্জ্ঞের তীর্থের পথে বিধাতার একি পরিহাস!
সাহারার ধু ধু চরে রিক্ত আর তৃষার্থ পরাণ,
নিবিড় তমসা ঘেরা জীবনের মিছে জয় গান।

আমাদের যাত্রাপথে সংক্রমিত মড়কের কীট,
অপ্রতিষ্ঠিত পৌরুষের ম্লান-করা এ কি পাদপীঠ?
শতাব্দীর জীর্ণতায় শীর্ণ আজ দেহের বিকাশ,—
অশ্বের খুরের ঘায়ে পথে ওড়ে ধূলির নিঃশ্বাস!

অমৃতের পুত্র যারা, এ কি তার সত্য পরিচয়?
সূর্য্যের সাধনা দিয়ে আঁধারের হ'বে না কি ক্ষয়?
ধ্বংসের জোয়ার স্রোতে সৃষ্টি নব করে কানাকানি,
বিস্মৃতির গর্ভ হ'তে শোনো নাকি সে আশার বাণী!

কবিতীর্থে এক রাত্রি

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, আই-এ-এ-এস্

ধূমায়িত চায়ের আসরেই ঝড় ওঠে ভারী এটাই জনশ্রুতি, নিস্তরঙ্গ হিমশীতল কাফির পেয়ালাতেও তার রেশ এসে থামে—তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিনকার নিদাঘতপ্ত ভাদ্রের ভরা মধ্যাহ্নে। বন্ধুবর্গের আহ্বানে বেশ আরাম করে ঠাণ্ডা কফি খাওয়া হচ্ছিল, কথা উঠল—কলকাতা বড় একঘেয়ে লাগছে, সবাই মিলে একদিন কোথাও ঘুরে এলে মন্দ হয় না—স্থান কাল পাত্র অনুকূল, ফিরে আসা গেল বিশবছরেরও আগেকার হারিয়ে যাওয়া ছাত্রদিনের মাঝে, ভুলে যাওয়া গেল—কর্ম্মের কলরবে ক্লান্ত আনন্দহীন, বৈচিত্র্যহীন, জীবন সঙ্কীর্ণ—যার গণ্ডী, কূপমণ্ডুকতায় ভরা, হাজারী মনসবদারের খবরদারী ওজনকরা কথা, পালিশকরা ভদ্রতা, এটিকেট্ কায়দাকানুন, ছোট্ট একটি পরিধি—বাইরে থেকে দেখতে বেশ নিরেট্ ও ভরাট্, ভিতরে একেবারেই ফাঁপা, গণ্ডীর ভিতর গণ্ডী, চাকার ভিতর চাকা—এককথায় যা কর্ত্তার ভূতের মত নাড়েও না, ছাড়েও না। কে জ্বালাবে সেই সৃষ্টিকরা দৃষ্টি-প্রদীপ, কে জানাবে যে আমাদের এই স্বার্থক্ষুব্ধ পরিবেশের বাইরে আছে একটা বিপুলা পৃথ্বী, রূপে রসে রঙে রঙীণ, শ্যামকান্তিময়ী ধাত্রী ধরিত্রী তন্বী শ্যামা যার শাশ্বত আবেদন মনকে করে চঞ্চল, পথভোলাকে করে পাগল, ঘর ছাড়াকে উন্মনা। কে বলবে আছে দুঃখ, কষ্ট, অনশন অনটন, মন্বন্তর, রোগশোক তাপ, আছে মানুষ, আছে সমাজ; আছে মন। শুধু কি আত্মপ্রসাদের আত্মপ্রবঞ্চনা তার লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করে চলবে?

যাক্ সে কথা—যাওয়া যায় কোথায়। ডাক্তার বন্ধু ছিলেন—প্রাণখোলা আত্মভোলা খাঁটি মানুষ, বল্লেন—চলুন, যাওয়া যাক্ শান্তি-নিকেতনে—সামনেই পূর্ণিমাপক্ষ কবিসদনে যাওয়ার পক্ষে প্রশস্ত। আমরা সবাই বল্লুম তথাস্তু—কতকটা অন্তরের আগ্রহে, কতকটা ভদ্রতার খাতিরে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালীর একটা দুর্ব্বলতা কোথায় আছে যেন? রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটুকু জানি—শুধু কি তিনি গানের ভাণ্ডারী, কথার কাণ্ডারী। কাব্যতীর্থে যেতে গেলে তীর্থযাত্রীরই মন চাই—যেখানে গেলে শ্রদ্ধাবনত মন বলবে—যা দেখতে চাই তা দেখলুম চোখ মেলে—"পাপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপংক্তি রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্"

যথারীতি কথাটা আমরা সবাই ভুলেই বসে আছি। কিন্তু ডাক্তার আমাদের মত সহজ লোক নন্ কারিতকর্ম্মা, তখনই রথীবাবুকে চিঠি লিখে ঠিক্ করে ফেলেছেন। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় তাঁর আমন্ত্রণ-লিপি সমেত হাজির। বন্ধুবররা উঠে পড়ে লেগে গেলেন দস্তুরমত বন্দোবস্ত করতে। ঘন্টায় ঘন্টায় তাড়া দেন—টেলিফোনের ঘন্টা ওঠে বেজে—নিশ্চয়ই যেতে হবে মশাই, কোন কথা শোনা হবে না কিন্তু। যাত্রার ও রথের ব্যবস্থা হোল, এ দশরথ নয় যে যত না চড়ব, তার চেয়ে বেশী ঠেলতে হবে। নানান্ দিকে নানান্ বাধা, ঝঞ্ঝাট্ কাজ আছে, কাজের তাড়া আছে, শরীর আছে, মন আছে, আবার মনের হাল ধরে বসে আছেন গৃহিণী সচিব সখি মিথঃ যাঁদের unlimited veto power, 'দুর্গাগুরতু ভদ্রাণি' বলে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। শনিবার সায়াহ্নে শনৈশ্চরকে স্মরণ করে পাড়ি জমানো হলো হাওড়া ষ্টেশনে। জুটলাম নয়জন মাতুল সমেত নবরত্ন, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা যেন নতুন করে বসল। কালিদাসের কালে, রেবানদীর ধারে তবু নিপুণিকা চতুরিকার দেখা মিলত, হয়ত বা রাজার চিত্রশালে, উদ্যান বীথিকায়, আলবালের অন্তরালে, আমরা কিন্তু পথে নারী বিবর্জ্জিতা।

ক্ষণকালের জন্য পথচারী হলেও আমরা খাঁটি মেটিরিয়ালিষ্ট বাস্তববাদী, শুধু কাব্যকথায় পেট ভরে না জেনেই বন্ধুবর সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর খাবার উপকরণ—চৈনিক্ 'থাওহুয়ে' হইতে বাঙ্গালীর দৈনিক ভজ্জিত মৎস্য, পর্য্যাপ্ত পোলাও কালিয়া সন্দেশ রসগোল্লা দই রাবড়ী। দুঃখ হোল কলিকালে উদরাগ্নির তেজ ও বীর্য্য নেই। মুহুরেরে মরাজমল, উদার আতিথ্য, কথার ভিতর রস আছে, হুল নেই, সদালাপী মিঠে লোক—A violet by a mosty stone কিন্তু half hidden from the eye নন্। পথের বন্ধুদের সবাইকেই নমস্কার জানাই, এ হচ্ছে আনন্দের ঋণ।

পথের সাথী নমি বারম্বার
পথিকজনের লহ নমস্কার।

হাওড়া থেকে বোলপুর মোট ৯৯ মাইল। পশ্চিম বাংলার ঝোপ জঙ্গল পচা ডোবা ম্যালেরিয়া ছাড়া বর্ণনাযোগ্য কিছুই নেই। ব্যাণ্ডেলে এক কাপ করে চা চলল—একটু সরস হয়ে তাসের আসর গরম হয়ে উঠল। বর্দ্ধমানে ভুরিভোজন। রায়গুণাকরের বর্দ্ধমানে এখনও সীতাভোগ মিহিদানা পাওয়া যায়, কিন্তু সে বিদ্যাও নেই, সুন্দরও নেই, মনের ভিতর সুড়ঙ্গ কাটা হয় না।

বীরভূম, চণ্ডীদাস, রজকিনী, জয়দেব, পদ্মাবতী, অজয় ময়ূরাক্ষীর দেশ আবার শক্তি-সাধনার আগমনিগম তন্ত্রবাদেরও পীঠস্থান 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে'। শুধু চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণব মহাজনরা 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর' আনিয়াছিলেন তা নয়, তন্ত্রসাধনার বহু রোমাঞ্চকর ইতিহাসও শোনা যায়।

রাত সাড়ে বারোটায় বোলপুর—শুক্ল রাত্রে শরতের শুভ্র আকাশে নবমল্লিকার মালার মত ফুটে উঠেছিল—সারদার আবাহন। কয়েকটা Cycle rickshaw নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের পথ দিয়ে, ভুবনডাঙার মাঠ

খেয়ে, রাত্রির স্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাত্রা, পূর্ণিমা পেরিয়েছে, কাকজ্যোৎস্নার প্লাবনে একটা মৃদু রহস্যঘেরা অপূর্ব্ব অনুভূতি। দূরে বনফুলের মধুগন্ধ, বৃক্ষবনস্পতির দীর্ঘছায়া। আবছাআলোর অন্ধকারে, বাংলোগুলিকে মনে হচ্ছিল মরুপ্রান্তরের ওয়েসিস্—প্রেয়ারির মাঝে ক্যাম্পাস্। মনে পড়ল সাত বছর আগের কথা। সুদূর সাগরপার থেকে ছুটীর অবকাশে ফিরেছি দেশে। কবিগুরু তখন সবে বিসর্প রোগ থেকে উঠেছেন। কবিপ্রণাম করবার জন্ত সপরিবারে শান্তি-নিকেতনে উঠলাম। কবিকে দেখলাম যেন বাজপড়া বনস্পতি—তবু স্তব্ধ শান্ত, আত্মসমাহিত। একটু হেসে বল্লেন—আমার আর কি আছে—কি দেখতে এসেছ? আমার শিশুকন্তাকে আদর করে বল্লেন—আমাকে দেখে ভয় করছে? সেই শেষ দেখা।

অতিথি আবাসে পৌঁছান গেল সরবে ও সদলে। শেষপ্রহরের ঘণ্টা বাজার মাত্র দু'একঘণ্টা বাকী। অপরাপর অভ্যাগতেরা হয়ত আমাদের আগমনীর সাড়া পেয়ে সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। কেউ কেউ বেরিয়েই পড়লেন—চাঁদের আলোয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আলাপ হলো। তারপর সতরঞ্চি বিছায়ে শয়ন। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁদের নাসিকাধ্বনির দ্রুতমৃদুমধ্যমস্বর তালে বিচিত্র তান রাগিণীর সৃষ্টি করতে লাগল। তারই মধ্যে ঘুমের একটু মিঠে আমেজ। রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত প্রহেলিকাময়, একটা রহস্যময় ঘন শীতলতায় দেহের উত্তাপ ক্ষরিত হয়ে আচ্ছন্নতা নেমে আসে। আকাশের জ্যোতিলোকে দিকভ্রান্তকে পথ দেখাবার জন্ত জ্বলছে শুকতারা। সপ্তর্ষি বিদায় নিয়েছেন। তার কিছু পরেই সোনার তির্য্যকরেখা মুখের উপর পড়ে ঘুম দিল ভাঙিয়ে—জাগো জাগো! প্রত্যেক দিন যদি এমনি করেই জাগি। 'অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ'।

প্রাতঃকৃত্য সমাধার পরই এলো উত্তরায়ণে চা খাবার নিমন্ত্রণ। রথীবাবু ও তাঁর নন্দিনী আমাদের আদর আপ্যায়ন্ করলেন প্রচুর। কবির গান মনে পড়ল—

> তুমি উপর সোনার বিন্দু, প্রাণের সিন্ধু কূলে
>
> কবির খেয়ান ছবি পূর্ব্বজনম স্মৃতি…।

প্রথমেই যাওয়া গেল রবীন্দ্রভবনে—সযত্ন সংরক্ষিত পৃথিবীর মনীষিদের অভিনন্দন, নানা ভাষায় অনূদিত কবির গ্রন্থগুলি, কবির সহস্তে আঁকা ছবি, রংএর বিচিত্র মেলা। উদয়ন, কোনারক্, পুনশ্চ, উদীচি দেখে দাঁড়াতে গেলো শ্যামলীর কাছে—ছোট্ট মাটির ঘর

> আমি পাকা করে গাঁথিনি ভিত—
>
> আমার মিনতি কাঁদিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজায়
>
> বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে
>
> যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে
>
> যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়

দেবতাপাড়ায় তিনি বেদের মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, 'পথের ধারে গাছ তলাতে তোমার বাসা শ্যামলী'।

শ্রীযুক্ত কৃপালনী আমাদের নিয়ে এলেন শ্রীনিকেতনে। এলমহার্ষ্ট দম্পতীর অর্থসাহায্যপুষ্ট শ্রীনিকেতন দেশের কাছ থেকে বেশী কিছু পায়নি এটা আমাদের শ্লাঘার বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথকে লোকে জানত—বড়ঘরের ঘরোয়ানা ছেলে, আঙুর বেদানা খেয়ে পরিপুষ্ট নিটোল কান্তিমান্ পুরুষ—তাঁর পক্ষেই চাঁদের আলো, দখিন্ হাওয়া নিয়ে সৌখীন কাব্য করা শোভা পায়, দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ তাঁর নেই। তিনি নিজেই বলতেন আমার দুর্নাম ছিল ধনীর সন্তান্ তার চেয়েও বড় দুর্নাম কবি। যাঁরা একথা বলতেন বা এখনও বলেন, তাঁদের দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর পুরুষকে তাঁরা চেনেন নি। দেশের জন্ত কি মমত্ববোধ তাঁর ছিল, সব দিক দিয়ে তাকে গড়ে তোলবার, মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে রসায়িত করবার চেষ্টা ছিল, তার ইতিকথা আজ স্তব্ধই থাকুক্। কোথাও কোন parochial outlook নেই, শ্লোগান্ নিয়ে মারামারি নেই, দেশহিতৈষিতার নামে সংক্ষুব্ধ আত্মবিক্ষোভের সংঘাত নেই, নীরবে নিভৃতে নিজের মত ও পথ বেছে নিয়ে কাজের আরম্ভ—যেখানে কর্ম্মনাশা ভেদবুদ্ধির সর্ব্বনাশা বিস্তার নেই। কবির 'স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনার কথা কে না জানেন? এই দুর্গত শ্রীহীন্ হ্রীহীন্ নিরানন্দ ব্যর্থ দেশে মহালক্ষ্মীর পাদপীঠ পরিকল্পনা প্রথম এই কবি মানসেই এসেছিল

> অন্ন চাই প্রাণ চাই, আলো চাই
>
> চাই মুক্ত বায়ু, চাই স্বাস্থ্য চাই বল
>
> আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু সাহসবিস্তৃত বক্ষপট

আত্মবিস্মৃত আত্মঘাতী বাংলাদেশে এই বিশ্বাসের ছবি কবিই প্রথমে এনেছেন এবং তাই নিয়ে নিজেই experiment করেছেন। সামান্ত এ চেষ্টা কিন্তু একজনের আপ্রাণ চেষ্টা—অন্ধকারে মাটির প্রদীপে ছোট্ট দীপশিখা—আদর্শের বর্ত্তিকা। তিনি বলতেন, শুধু কিছু বিলিতি বেগুন আলু ফলিয়ে, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে শতরঞ্চি কাপড় বুনোনই বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষ আনবে বিজ্ঞানের শক্তি গ্রামে গ্রামে। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।' বড় দুঃখেই তিনি বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্ম্মমন্দির রচনা করেছি, আমার জীবিতকালের সঙ্গেই যদি তার অবসান হয় তাতে আমার অগৌরব, না তোমাদের।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নূতন ও পুরাতনের একটি dynamic integration সহজ চলমান মিলন তিনি আনতে চেয়েছিলেন আমাদের জীবনে। যেখানে সব সত্যকেই সরলভাবে গ্রহণ করতে পারা যাবে প্রাণের প্রাচুর্য্য দিয়ে। প্রাণশক্তি অর্জ্জন করবে, নিজের পায়ের।

শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে এসে যাওয়া গেল গ্রন্থাগারে। সিংহ সদন্, শিক্ষা ভবন, বিদ্যা ভবন, শিশু ভবন দেখে চীনা ভবনে যাওয়া গেল। ভারতবর্ষ যুগে যুগে দান করেছে তার গুরুকে

> পদ্মাসন্ আছে স্থির
>
> ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন.

চিরদিন
মৌন যার শান্তি অন্তঃহারা
বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা

কালবেলা কলাভবনের অবগুণ্ঠন খোলে না, আমাদের মত অরসিক ও ব্যাপারীদের জন্য। সঙ্গীত ভবনের গানের ক্ষীণরেশ দূর থেকেই শোনা গেল। অজন্তার অনুকরণে মাটির ঘরের উপর ফ্রেসকোগুলি জীবন্ত ও ভাস্বর। প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জদড়র সিলগুলির অনুলিপি বড় সুন্দর লাগলো। বাইরের কংক্রিট ষ্ট্যাচুর একটি ও অতিথি আবাসের সামনের Plaquoটি এপষ্টাইনের বিখ্যাত 'নিশিথিনী'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। ফিরে এসে ছাতিমতলায় কিছুক্ষণ দাঁড়ানো গেল। জানি না মহর্ষি কি পেয়েছিলেন এখানে। অবনীন্দ্রনাথের চমৎকার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় "দুই সন্ধানী"র গল্প যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছে—শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী, "দারুণ দ্বিপ্রহরের রোদ শিবিকা-বাহকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, হঠাৎ মহর্ষিদেব দেখলেন সামনে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ আর তারই মাঝখানে একটি ছায়াতরু। কী তাঁর মনে হয়েছিল জানি না—হয়ত তিনি দেখেছিলেন যিনি 'বৃক্ষোইব দিব তিষ্ঠত্যেক' আনন্দরূপং অমৃতম্ যদ্বিভাতি। প্রথম সন্ধানী উদাত্ত কণ্ঠে বল্লেন 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' দ্বিতীয় সন্ধানীও সেই কথাই কত সুরে কত গানে কত কাজের মধ্যে বলে গেলেন—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' যেখানে বিশ্ব হবে একটি নীড়। দুই সন্ধানীর পিতাপুত্রের মিলিত ইচ্ছা নিয়েই এই আনন্দ লোকের সৃষ্টি। আর একজন মুক্তচিত্ত পুরুষের সাধনাও এখানকার সপ্তপর্ণার প্রতি পত্রে লেগে রয়েছে। একদিনের উপাসনার কথা—বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ আচার্য্য। উপাসনা করতে গিয়ে তিনি নির্ব্বাক্ স্তব্ধ হয়ে মনের গভীরে হারিয়ে গেলেন। মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ হলো না, শুধু অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল—অন্তরের আন্তরিক যোগ প্রকাশ পেলো মুখের এক অনির্ব্বচনীয় দ্যুতিতে।

দুপুরবেলা আবার উত্তরায়ণে মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ। চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় বহুভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম আরাম করে ফিরে এলেম অতিথি আবাসে। বাস দাঁড়িয়েছিল আমাদের ষ্টেশনে নিয়ে যাবে বলে। সবাইকে প্রীতি নমস্কার ধন্যবাদ দিয়ে ও মনে মনে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' ও তার অধিদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। বিশ্বভারতীর কি ভবিষ্যৎ, এখানকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা, শ্রীনিকেতনের আয়োজন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবার অধিকার হয়ত আমাদের নেই—তবে কবির আশা, আকাঙ্ক্ষা আদর্শ তাঁর স্বপ্ন মূর্ত্তি নিতে চেয়েছিল এমন এক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে—সে কথা কবি মানসের উত্তরাধিকারী আমরা ও ভবিষ্যদ্বিদের ছেলেমেয়েরা যেন না ভুলি

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

ফেরবার পালা সংক্ষিপ্ত। দুর্গোৎসবের পরে বিজয়া দশমীর দিনে নিরঞ্জনের পর যেমন মনের অবস্থা হয় তেমনি একটা ক্লান্ত করুণ উদাসী ভাব। বর্দ্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানার সঙ্গে চা পর্ব্ব—মাতুলের বিদায়। রাস্তায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—মাইলের পর মাইল জুড়ে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর শুভ্র প্রলেপ কাশফুলের বনে। চোখের অঞ্জনে রঞ্জনার ধারা—শ্বেত চন্দনের ছাপ। ট্রেণ পৌঁছল হাওড়া ষ্টেশনে—বর্ষণমুখর তিমির নিবিড় সন্ধ্যা—আষাঢ় নেমেছেন আশ্বিনে শ্রাবণের উতল ধারা বেয়ে। ভিজতে হোল বেশ—

তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল জগতে
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেইখানে মোর প্রণতি দিলাম আনি।

কল্পনা ও বাস্তব

শ্রীহৃষিকেশ দেব বি-এ

স্মিতা ট্রেণে বাড়ী থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। আগামী কাল কলেজ খুলছে পূজার দীর্ঘ ছুটীর পর।...ট্রেণ জার্নি... সাথে কয়েকটা বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক আছে সঙ্গী হিসাবে। বাঁশী বাজিয়ে ট্রেণ যাত্রা সুরু করতেই সে-ও খুলে বসল একটা পত্রিকার গল্পের পাতা।...

গল্পটা অবশ্য লেখক লিখেছেন চমৎকার এবং খুব দরদ দিয়েও বটে। গ্রামের কোলে ছিল একটি সুখী পরিবার, তারপর সারা বাংলা দেশের উপর পড়ল এক ছায়া-মূর্তির কালো হাতের বিভীষিকাময় পরশ...এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। শক্তির ও সামর্থ্যের চরম অসাম্যের ফল নিয়ে এলো দুর্ভিক্ষ...সরকারী ও বেসরকারী বহু উপায়ে বাংলার সরল গ্রাম্য জীবনের সুখী পরিবারগুলিকে রাজপথে টেনে নামানো গেল ভিখারী তৈরী করবার জন্য...সারা দেশের সমাজ ব্যবস্থায় এলো তীব্র আলোড়ন।...

তারপর, লেখক তার নিপুণ লেখনীর সাহায্যে বর্ণনা করেছেন কি ভাবে কলকাতার রাজপথে দুঃস্থরা মৃত্যুবরণ করল…কি করুণ ও শোচনীয় ভাবে—তা'রা মানুষ ও ভাগ্য কাউকেই দোষী না করে নীরবে চলে গেল মৃত্যুর পরপারে।…

পড়্‌তে পড়্‌তে নমিতার চোখের কোণে জল জমে এলো।…লেখক বল্‌ছেন, একদিন যাদের দু'য়ার থেকে অতিথি কখনো ফিরে যায় নি, তাদেরই ছোট্ট মেয়েটি পথে পথে একমুঠো ভাতের জন্য কেঁদে বেড়াতে লাগলো।—…যা'রা তা'কে বঞ্চিত করেছে…তা'র মুখের অন্ন যারা গ্রাস করে নিজেদের অধিকতর ধনী করে তুলেছে…তা'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবারও তা'র ভাষা নেই।…

দুইদিন শুধু কলের জল খেয়ে শরীর অবসন্ন;…নির্জীব ভাবে মেয়েটি পথ দিয়ে চল্‌ছে। সন্ধ্যার সাথে চারদিকে আলো জলে উঠেছে…পূজা আসন্ন…তারই আলোকোজ্জল আবাহনী।…মেয়েটি যা'র কাছে হাত পাতে…তিনিই তীব্রভাবে মুখ বিকৃত করেন। কটুক্তিও করেন কেউ। ফুটপাতে বসেছিল একটি লোক…ঝাঁকা ভর্তি ফল নিয়ে।…মেয়েটি বার কয়েক তার পাশে ঘুর ঘুর করে কি যেন বল্‌তে চায়, কিন্তু সাহস পায় না। অবশেষে, অনেক সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বলে, "দু'দিন কিছুই খাই নি।" লোকটি খিঁচিয়ে ওঠে, "তবে তো রাজা ক'রেচিস্; যা, ভাগ্।" বলে আবার খদ্দেরের সাথে একটা পাকা পেঁপের দাম নিয়ে দর ক্যাকষি সুরু করে।…মেয়েটির মাথার ভিতর অনশনের আগুন জল্‌ছে, …হঠাৎ কি ভাব্‌লো,…নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে দুটো কলা তুলে নিয়েই দিলে ছুট্। সোর গোল উঠল, "চোর চোর।"—ক্ষুধা-কাতর…অনশন ক্লান্ত, দুর্বল দেহ নিয়ে মেয়েটি বেশী দূর ছুটতে পারল না…বীর-বিক্রমে ধাবমান্ দোকানী তাকে ধরে ফেল্ল…তারপর, উপস্থিত সকলেই ন্যায়ের প্রতীক্ হয়ে তাকে শাস্তি দিতে ক্রটি করলে না। দুর্বল শরীরে শাস্তির প্রাবল্য সহ্য হয় না…বসে পড়ল সে ফুটপাথে অজ্ঞানের মতো।…অতঃপর লাল পাগ্‌ড়ী—শান্তি ও শৃংখলার রক্ষক… টেনে হেঁচ্‌ড়িয়ে, তা'র প্রতাপ দেখিয়ে নিয়ে গেল থানায়।…

লেখক এখানেই গল্পটি শেষ করেছেন।…তাঁর লেখনীর মুন্সিয়ানা আছে কিন্তু! গল্পটি শেষ কর্বার পরও অনেকক্ষণ মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখে দেয় এবং গল্পটির মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে তিনি যে সব সাম্যবাদী কথা বসিয়ে দিয়েছেন, তা' যেন মনে আগুন ধরিয়ে দেয়—আমাদের এই অন্যায় ও অসাম্যের মূর্ত প্রতীক্ সমাজকে ভেঙে ফেল্‌বার জন্য…"সত্যি, কি করুণ", আপন মনেই নমিতা বল্ল গল্পটা শেষ করে।…

হাঁ, পড়ে নমিতা মুগ্ধ হয়ে গেছে; চোখেও জল ভরে এসেছে সমাজের অন্যায়ের কথা ভেবে…ও' একটু ভাবপ্রবণ সত্যি, অস্বীকার করা যায় না এ' কথা। কিন্তু… ওর ভিতরে আছে আগুন,…যা একদিন প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সব অসাম্যকে পুড়িয়ে উজ্জল করে তুল্‌বে ওর কানের হীরের দুলেরই মতো; সেই প্রেরণায়ই-তো ও সাম্যবাদী দলের একজন নেত্রী।

গাড়ী এসে থাম্‌লো একটা ছোট ষ্টেশনে;—বই-এর পাতা থেকে মুখ তুলে, জান্‌লা দিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে চেয়ে, নমিতা সিল্কের রুমাল দিয়ে চোখ মুছ্‌ল…ও'র "পার্টির" বন্ধুরা যে বলে, ও' ভারী ভাবপ্রবণ, দেশের কাজের উপযুক্ত নয়—তা' একেবারে মিথ্যে নয়। ও'র মনটা সত্যি বড়ো কোমল।…

কাম্‌রার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো একটা ভিখারিণী…শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়ে জীর্ণ দেহের লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেছে…রুক্ষ চেহারা…কোলে বছর খানেকের একটি নির্জীব শিশু।…করুণ সুরে নমিতার দিকে চেয়ে বল্লে—দুটো পয়সা দাও না মা, দু'দিন নিজে কিছুই খাই নি, কোলের ছেলেটাও উপোস…একে বাঁচাও মা!…আমারও একদিন ঘর-বাড়ী ছিল মা, কিন্তু—

আঃ জ্বালাতন, নমিতা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো—কি একটা বক্তৃতার কথাগুলো মনে হচ্ছিল, এই ভিখারিণীটার প্যান্‌-প্যানানিতে তা' হারিয়ে গেলো। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বল্লে,…এখানে কিছু হবে না, যাও যাও।…এ'সব ভিক্ষে করা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। রেল কোম্পানীও যে কি হয়েছে—প্ল্যাট্‌ফর্মে ভিক্ষে করা—

ট্রেণ ছেড়ে দিতেই হাওয়ার জন্যে বাকী কথাটা আর শোনা গেল না। ভিখারী মেয়েটি জলভরা চোখে যেন কি প্রশ্ন নিয়ে চলন্ত ট্রেণের দিকে চেয়ে রইলো।…গাড়ীর ভিতর নমিতা তখন বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করে, সোনার রিষ্টওয়াচে সময় দেখ্‌ছিল, কলকাতা পৌঁছ্‌বার আর কত দেরী…বিকেলে আবার "পার্টি"র মিটিং আছে কিনা!

প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয় ও রসনিষ্পত্তি

অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ এম-এ, সাহিত্যশাস্ত্রী

হামুনি ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয়ের বস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবতা, মনুষ্য এবং মনুষ্য-ভিন্ন নিকৃষ্ট জাতি —এই তিন জাতির রঙ্গালয়ের কথা ভরত বলিয়াছেন। সাধারণতঃ ঙ্গালয় তিন প্রকার—(১) বিকৃষ্ট (Rectangular) (২) চতুরস্র quadrangular) এবং (৩) ত্র্যস্র (triangular). এই তিন ঙ্গালয় হস্তের প্রমাণ (measurement) অনুসারে পুনরায় তিন প্রকার—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ। দণ্ডের প্রমাণ লইয়াও পুনরায় তন প্রকার। সবশুদ্ধ—১৮ প্রকার। রঙ্গালয় ১০৮ হাত (সম্ভবতঃ দর্ঘ্যে) হইলে তাহা জ্যৈষ্ঠ, ৬৪ হাত হইলে মধ্যম এবং ৩২ হাত হইলে নিষ্ঠ। ইহার মধ্যে বিকৃষ্ট জ্যেষ্ঠ, চতুরস্র মধ্যম এবং ত্র্যস্র কনিষ্ঠ। নুনরায় ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয় দেবতাদিগের জন্য, মধ্যম মনুষ্যদিগের জন্য এবং শেষ প্রকৃতির জন্য কনিষ্ঠ। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার ী অভিনব গুপ্ত বলেন যে এইস্থলে দেবতাদিগের রঙ্গালয় বলিতে দেবতাগণ র্শক এইরূপ অর্থ নহে, কিন্তু যে নাটকে দেব এবং অসুর পরস্পর নায়ক তিনায়ক সেই সকল স্থলে ১০৮ হাত রঙ্গালয়ের প্রয়োজন। কারণ ই সকল নাটক ভাণ্ডবাদ্যপ্রধান এবং দীর্ঘ দীর্ঘতর তালাদি থাকার ন্য বিস্তৃত রঙ্গালয়ের আবশ্যকতা আছে। কেহ কেহ বলেন এইস্থলে বগণ দর্শকরূপেই অভিপ্রেত।

এই তিন প্রকার রঙ্গালয়ের মধ্যে মধ্যম রঙ্গালয় প্রশস্ত। কারণ ইখানে উচ্চারিত বাক্য এবং সঙ্গীত সুখশ্রাব্য হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের এই মধ্যম রঙ্গালয় দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত এবং প্রস্থে ৩২ হাত হওয়া চিত। রঙ্গালয় দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ইহার অধিক হওয়া উচিত নহে, রণ মণ্ডপ দূরদেশবর্ত্তী হইলে পাঠ্য বিস্বর হইয়া যায় এবং নাট্যের ভাব ব্যক্ত থাকিয়া যায়। সেইরূপে রঙ্গালয় কনিষ্ঠ অর্থাৎ ছোট হইলে র্গত স্বর শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। কারণ স্বর উচ্চারিত হইবার পর হা যদি কাণে না লাগিয়া থাকে তাহাকে বিস্বর বলে। স্বরের প্রকৃত প অনুরণন (Resounding)। এই সকল কারণে মধ্যম রঙ্গালয়ই শস্ততম। এই রঙ্গালয় নির্মাণ করিবার পদ্ধতি নাট্যশাস্ত্রে উক্ত ইয়াছে। সাধারণতঃ রঙ্গালয় দুই ভাগে বিভক্ত—একটি রঙ্গমঞ্চ এবং পরটি দর্শকবৃন্দের আসন। রঙ্গমঞ্চের সম্মুখ এবং পার্শ্বদ্বয় খোলা কিত। পশ্চাতে একটিমাত্র যবনিকা। এই যবনিকার গাত্রে সাদ, উদ্যান, তপোবন, নদী, পর্বত প্রভৃতির নানা দৃশ্য অঙ্কিত কিত। নট রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত দৃশ্যের সম্মুখে আসিয়া ড়াইত। তাহার পর অভিনয় চলিত। এই জন্য সংস্কৃত নাটক-লতে আমরা "ইতি পরিক্রামতি" এইরূপ প্রয়োগ সূচনা (Stage-rection) দেখিতে পাই। যবনিকার দুই প্রান্তে দুইটি দ্বার। তদ্দ্বারা পাত্রের প্রবেশ এবং নিষ্ক্রম হইত। যবনিকার অপর নামগুলিরও ব্যবহার দেখা যায়, যেমন—পটী, অপটী, তিরস্করিণী, প্রতিসীরা। কোন নটের পক্ষেই অসূচিত হইয়া হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করা কিংবা অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ ছিল। তাহার কারণ ইহাতে রসভঙ্গ হয়। যে সকল স্থলে নটের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ সূচনা করিবার সুযোগ থাকিত না সেই সকল স্থলে নট যবনিকা-সঞ্চালন করিয়া প্রবেশ করিত। এতদ্ব্যতীতও সঞ্চালন করিয়া প্রবেশ করা ত্বরার নিদর্শন ছিল। যেমন 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র ষষ্ঠাঙ্কে কঞ্চুকীর প্রবেশ। যবনিকার পশ্চাতে বাদকগণের স্থান (orchestra)। ইহার পশ্চাতে নেপথ্য গৃহ (Green Room)। রঙ্গমঞ্চে যাহার প্রয়োগ সুবিধাজনক হইত না যেমন অশরীরিণী বাণী, গোলমাল, বিকট শব্দ ইত্যাদি—তাহার অনুষ্ঠান নেপথ্য গৃহে হইত। রঙ্গমঞ্চের উপর সম্মুখস্থ প্রান্তভাগের নাম "রঙ্গশীর্ষ"। ইহা কারুকার্য্য-খচিত থাকিত এবং এইখানেই জর্জরোৎসব প্রভৃতি হইত। এইবার দর্শকগণের বসিবার স্থান। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখেই একটি বারান্দা থাকিত এবং খুব সম্ভবতঃ ইহাতে সম্রান্ত ব্যক্তিগণ বসিতেন। ইহার ঠিক পশ্চাতেই একটি শ্বেত স্তম্ভ এবং তাহার পশ্চাতে ব্রাহ্মণগণের বসিবার স্থান। তাহারও ঠিক পশ্চাতে একটি রক্তবর্ণ স্তম্ভ এবং ইহার পশ্চাতে ক্ষত্রিয়গণের আসন। রঙ্গমঞ্চের উত্তরপশ্চিম দিকে একটি পীত স্তম্ভ থাকিত এবং ইহার পর বৈশ্যগণের আসন। উত্তর পূর্বভাগে কৃষ্ণনীল স্তম্ভ এবং তাহার পর শূদ্রদিগের আসন। আসনগুলি সাধারণতঃ কাষ্ঠ কিংবা ইষ্টক নির্মিত হইত এবং শ্রেণ্যাকারে সজ্জিত থাকিত। রঙ্গম দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে আট হাত হইত। উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গালয়ের একটি নক্সা পরিকল্পনা করা যাইতে পারে মোটের উপর দেখা গেল যে তৎকালীন রঙ্গালয়ের বিশেষ কো জাঁকজমক বা সাজসজ্জা ছিল না। একটিমাত্র যবনিকা থাকার জন্য নাটকের একাধিক দৃশ্যাবলী দর্শকগণকে কল্পনা করিয়া লইতে হইত ইউরোপে সেক্সপীয়রের সময় যেরূপ রঙ্গালয় ছিল ইহা তাহারই অনুরূপ।

রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমরা কখন হাসি, কখনও আনন্দ বা গর্ব অনুভব করি, কখনও বা কাঁদি। কি কাহার দুঃখে কাঁদি? আমাদের নিশ্চয় নয়। আমরা দুঃখ পাইবা জন্য রঙ্গালয় যাই না, তাহাতেও আবার পয়সা খরচ করিয়া। তবে দুঃখ কাহার? কে কাঁদে এবং কেন কাঁদে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় কণ্ব, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, শকুন্তলা—ইহারা সকলে কাঁদিতেছে, তাই বলিয়া আমরা কাঁদিব কেন? তাহা ছাড়াও রঙ্গমঞ্চে যে সকল নট নটী কাঁদিতেছে তাহারা সকলেই কৃত্রিম উপায়ে কাঁদিতেছে তাহারা ঐ কান্না নাট্যাচার্য্যের নিকট অনবরত অভ্যাস করিয়া

আসিয়াছে। সুতরাং তাহাদের দুঃখও কৃত্রিম। কিন্তু আমরা সত্যই কাঁদি অথচ আমাদের নিজস্ব কোনও দুঃখ নাই। পরের দুঃখাভিনয় দেখিয়া কাঁদি। বাস্তবিকপক্ষে ইহা আমাদের দুঃখ নহে, ইহা আমাদের আনন্দ। সেই আনন্দ অনুভব করিয়া আমরা কাঁদি। জগতেও দেখা যায় ভক্তগণ অতিশয় আনন্দে অশ্রুপাত করিতেছে। কিন্তু এই আনন্দ জগতের সাধারণ সুখ হইতে বিলক্ষণ। ইহার নাম রস; তাহা অলৌকিক এবং অখণ্ড। আমাদের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত যে অসংখ্য বৃত্তি (মনোভাব) আছে তাহাদিগকে আটভাগে বিভক্ত করা যায়। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, (কাম)। এইগুলির নাম স্থায়িভাব। ইহারাই আস্বাদ্যমান হইলে রসরূপে পরিণত হয়। যেমন স্থায়িভাব রতি শৃঙ্গার রসরূপে পরিণত হয়। কী করিয়া ইহা সংঘটিত হয় তাহা উদাহরণ দিয়া দেখান যাউক। এ বিষয়ে ভরতের মূলসূত্র হইতেছে—"বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"—অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব ইহাদের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়।

এই সূত্রের উপর ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত, জগন্নাথ প্রভৃতি মনীষিবর্গ স্ব স্ব মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, এবং ভট্টনায়কের গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত। অভিনবগুপ্ত ইঁহাদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রসনিষ্পত্তি বিষয়ে শ্রীভট্টনায়কের মতটি আমি বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ভট্টনায়ক বলেন—যে রঙ্গালয়ে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হইতেছে সেখানে শকুন্তলার প্রতি রতি (Love) কাহার? দর্শকের? না, নাটকের চরিত্র দুষ্মন্তের? না, দুষ্মন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার? শকুন্তলার প্রতি যদি কেবল দুষ্মন্তই রতিমান অর্থাৎ আসক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের রসাস্বাদ হইবে কি করিয়া? দুষ্মন্তের হইতে পারে। সেইরূপ অভিনেতার হইতে পারে না। কারণ আমরা (দর্শকরা) অনবরত বলিয়া থাকি যে দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমদৃশ্যের রসবোধ আমাদের হইতেছে। তাহা হইলে শকুন্তলার প্রতি যে রতি সে কী আমাদের? অর্থাৎ আমরাই কী শকুন্তলার প্রতি আসক্ত? ইহাও হইতে পারে না। কারণ শকুন্তলা আমাদের প্রেয়সী নহে। সে দুষ্মন্তের প্রেয়সী। সুতরাং তাহার প্রতি আমাদের রতি থাকিতেই পারে না। কেহ যদি এইখানে বলে যে পরকীয়া প্রীতে রতি বিরল নহে। তাহার উত্তর এই যে আমাদের মতে রতি সত্ত্বগুণের বিকার; তমোগুণের কিংবা রজোগুণের নহে। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলেই যথার্থ রসাস্বাদ হয়। যাহা পঙ্কিল, ঘৃণ্য তাহার স্থান রসাস্বাদের ভিতর নাই। Art is moral, যদি কেহ বলেন—অসুন্দরের স্থান রসাস্বাদের ভিতর আছে—তাহা হইলে আমরা তাহার রসাস্বাদকে রসাভাব বলিব। এই স্থলে যদি কেহ এইরূপ বলেন যে শকুন্তলাকে নিজপ্রেয়সী ভাবিয়া লইতে বাধা কী? তাহার উত্তর এই যে বাধা অনেক। কারণ যে নারীকে কোনদিন পত্নী বলিয়া জানি নাই, তাহাকেই মাত্র নিজ-প্রেয়সী ভাবিয়া লইতে পারি। কিন্তু শকুন্তলার স্থলে তাহা হয় না। সে রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে দুষ্মন্তের কান্তারূপে উপস্থিত। অপর কেহ যদি বলেন যে, দর্শক যদি দুষ্মন্তের সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে শকুন্তলাকে নিজ কান্তারূপে জ্ঞান করা সহজ। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর বীর ইন্দ্রসখা রাজা দুষ্মন্তের সহিত আমাদের অভেদবুদ্ধি কী করিয়া হইবে? আমরা দর্শকের আসনে বসিয়া দুষ্মন্তের সহিত অভিন্ন হইতে পারি না। যদি কেহ হাল ছাড়িয়া তখন বলেন যে, শকুন্তলার প্রতি যদি আমাদের রতিই না হইল তাহা হইলে আমাদের রসস্বাদ হয় কী করিয়া? ইহার উত্তরে ভট্টনায়ক বলিয়াছেন যে কাব্যের বিভাব (অর্থাৎ দুষ্মন্ত, শকুন্তলা ইত্যাদি) অনুভাব প্রভৃতির এমন একটা অনির্বচনীয় শক্তি আছে যাহার বলে শকুন্তলা আমাদের সম্মুখে দুষ্মন্তের কান্তারূপে উপস্থিত হয় না, কিন্তু সাধারণ রমণীরূপে (Universal woman), যে রমণীকে দর্শক এবং দুষ্মন্ত উভয়েই ভালবাসিতে পারে। বিভাবাদির এই ব্যাপারের (function) নাম "ভাবকত্বব্যাপার" কিংবা "সাধারণীকৃতি"। এই শক্তির প্রভাবে শকুন্তলা দর্শকের এবং দুষ্মন্তের নিকট সাধারণ কান্তারূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। দর্শকের নিকট তখন "এই শকুন্তলা দুষ্মন্তেরই কান্তা" এইরূপ জ্ঞান আর থাকে না। তখন তাহার জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ভালোবাসা এই শকুন্তলার প্রতি ধাবিত হয়। সেইরূপে দুষ্মন্ত সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় না, কিন্তু সাধারণ মানুষরূপে, যাহার সহিত আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। এইজন্য দুষ্মন্তের ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসা বলিয়া মনে হয়। রামের হরধনুভঙ্গ, রাবণবধ, সমুদ্রবন্ধন এ সকল যেন আমাদের। তাই বনবাসে সীতার ক্রন্দন আমাদের মর্মস্থল বিদীর্ণ করে। এইরূপে কেবল নায়ক নায়িকা নহে—দেশ, কাল সব সাধারণীকৃত হইয়া যায়। অর্থাৎ কণ্বের তপোবন কেবল কণ্বের তপোবনরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু সাধারণরূপে প্রতিভাত হয়, এইজন্য শীতকালে আমরা যদি রঙ্গালয়ে কোন বর্ষাকালের দৃশ্য দেখি তাহাতে রসোপলব্ধির বাধা ঘটে না। কারণ কাল সেখানে সাধারণীকৃত। কাব্য পড়িতে পড়িতেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে, কোন লুপ্তস্মৃতি আষাঢ়ের প্রথম দিবস চিরনূতন হইয়া উপস্থিত হয়। কাব্যের এই ভাবকত্ব ব্যাপার অলৌকিক। এইরূপে ভাবকত্ব ব্যাপার দ্বারা বিভাবাদি সাধারণীকৃত হইলে "ভোজকত্ব ব্যাপার" দ্বারা রসাস্বাদ হইয়া থাকে। ইহা দ্বিতীয় অলৌকিক ব্যাপার। এই ব্যাপারের প্রভাবে আমাদের চিত্তের যাহা কিছু রজোগুণ এবং তমোগুণ তাহা দূরীভূত হইয়া আবরণ ভগ্ন হইয়া যায়। আমাদের চিত্ত সত্ত্বপ্রধান হইয়া উঠে এবং বিশ্বকে আলিঙ্গন করে। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের মত 'ভাবকত্ব' নামে শব্দের পৃথক্ ব্যাপার স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে কাব্যের সুখদুঃখকে আমরা হৃদয়সংবাদের দ্বারা পাইয়া থাকি। যেমন মহাকবি বাল্মীকি হৃদয়সংবাদ (Agreement of the heart) দ্বারা ক্রৌঞ্চের শোককে পাইয়াছিলেন। শোক বাস্তবিকপক্ষে বাল্মীকির নয়। কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত শোক হইলে

তিনি রামায়ণ রচনা করিতে পারিতেন না। শোকে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়ে। কিন্তু অপরের শোককে (অর্থাৎ ক্রৌঞ্চ পাখীর) তিনি নিজের মধ্যে পাইয়াছিলেন তন্ময়ীভাব এবং হৃদয়-সংবাদ দ্বারা। অর্থাৎ তিনি বিলাপরত ক্রৌঞ্চের নিকট তাঁহার হৃদয় প্রসারিত করিয়া তাহার শোকে শোকবান্ হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার শোক শ্লোকাকারে পরিণত হইয়াছিল। তখন সেই শোক কেবলমাত্র ক্রৌঞ্চের কিংবা বাল্মীকির নহে তাহা সর্বকালের সর্বজনের। এইখানে কেহ যদি এইরূপ প্রশ্ন করে যে বাল্মীকি ক্রৌঞ্চের শোক পাইয়াছিলেন বুঝিলাম, কিন্তু তিনি রামায়ণ রচনা করিলেন কী জন্য। ইহার উত্তরে অভিনবগুপ্ত একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন—জলপূর্ণ ঘট আমরা যখন মাথায় করিয়া লইয়া যাই তখন একটু জল উছলাইয়া পড়ে; সেইরূপ শোকপরিপূর্ণ বাল্মীকি-হৃদয়ের দুর্বার আবেগ রামায়ণ-রূপ কাব্য রচনা করিয়া নির্গত হইয়াছিল। সেই আবেগকে প্রশ্ন করা চলে না—কেন তুমি নির্গত হইয়াছিলে? তাহা স্বেচ্ছায় ঘট হইতে জলের ন্যায় বাল্মীকির হৃদয় হইতে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। এই-রূপে সহৃদয় ব্যক্তিই কেবল প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারে। 'সহৃদয়' আমরা তাহাকেই বলিব যাহার হৃদয় অপরের সুখ দুঃখকে তন্ময় হইয়া অনুভব করিতে পারে এবং অনবরত সৎকাব্য অভ্যাস করিয়া যাহাদের নির্মল মনোদর্পণে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় তাহাদের প্রতিবিম্ব ফেলিতে পারে। এককথায় যাহাদের হৃদয় জন্ম জন্মান্তরের সুখদুঃখের স্মৃতি বহন করিয়া থাকে এবং যখন তাহারা রঙ্গমঞ্চে এই জগতের সুখদুঃখের অভিনয় দেখে, তখন তাহাদের সেই গভীর অসীম সাগরোপম হৃদয় হঠাৎ উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতের আমদানী বাণিজ্য ও জাতীয় স্বার্থ

এবারকার মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রপথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠায় এবার বিদেশ হইতে ভারতে পণ্য আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই পণ্য আমদানী বন্ধের ফলে অসংখ্য প্রকার ভোগ্যপণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষের অসুবিধার শেষ ছিল না। যুদ্ধের মধ্যে সামান্য সামান্য পণ্য যাও আমদানী হইতেছিল, সামরিক প্রয়োজনের নামে ভারত সরকার সেগুলি সর্বাগ্রে গ্রাস করায় অসামরিক দেশবাসীর ভাগ্যে বলিতে গেলে কিছুই জুটে নাই। এই প্রচণ্ড পণ্যাভাবের দিনে ভারতসরকার উৎসাহ দিলে এ দেশে বহু নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতে পারিত, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কতকটা যুদ্ধোত্তর বিলাতী পণ্যের বাজার রক্ষা করিতে এবং কতকটা সামরিক পণ্যাদির কারখানায় মজুরের অভাব আশঙ্কা করিয়া এদেশের শিল্প প্রয়াসে পারত-পক্ষে বাধা দিয়া ভারতের আত্মনির্ভরশীল হইবার এই সুবর্ণসুযোগ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। নিজেদের একান্ত প্রয়োজনে তাঁহারা এদেশে অল্প কয়েকটি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, তবে এই সব নূতন বা সম্প্রসারিত শিল্পজাত পণ্যাদির শতকরা প্রায় একশত ভাগই সামরিক প্রয়োজনের নামে গ্রাস করিয়া ইঁহাদের সহিত দেশের লোকের পরিচয় ঘটিতে দেন নাই। ইঁহার ফলে এখন যুদ্ধ থামিবার পর এই সব পণ্য উৎপাদনের কারখানার বয়স কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসর হইলেও এখন ইহারা একেবারে আনকোরা কারখানারূপে দেশবাসীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং ইহাদের পণ্যাদির যে ত্রুটি যুদ্ধের সময় ব্যবহারকারীদের সমালোচনায় সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা সংশোধিত না হওয়ায় ইহাদের পণ্যাদি বাজারে মোটেই আদৃত হইতেছে না। পরিচিত বিদেশী পণ্য এখনই কিছু কিছু আসিতে শুরু করিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও আসিবে; কাজেই দেশের লোকের যথেষ্ট অভাব থাকিলেও তাহারা ভাল জিনিষের জন্য এখন অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে করিতেছে।

যুদ্ধ শেষ হইলেও ভারতের বাজারে বিবিধ ভোগ্যপণ্যের প্রচণ্ড চাহিদার জন্য এখানে অনেক নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতে পারে। ভারতসরকার কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন, যুদ্ধোত্তর

কালেও তাহাই পুরোমাত্রায় বজায় আছে। তাছাড়া ষ্টার্লিং পাওনা সমস্যার কোন সমাধান এখনো হয় নাই বলিয়া বিদেশ হইতে প্রয়োজনানুরূপ কলকারখানার যন্ত্রপাতি আমদানীও সম্ভব হইতেছে না। ইতিমধ্যে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু হইয়া গিয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, যত দিন যাইবে, ভারতে বিদেশীদের বাণিজ্য ততই প্রসারিত হইবে।

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ১৯৪৫ সালের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টেই বুঝা যায় যুদ্ধের মধ্যে ভারতের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ ভারত সরকারের উদাসীন্যে নষ্ট হওয়ার ফল এই দুর্ভাগ্য দেশের পক্ষে কিরূপ মারাত্মক হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের হিসাবে যুদ্ধ শেষ হইবার পর মাত্র ৫ মাসের হিসাব আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের আমদানী বাণিজ্য লক্ষণীয়-ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪৫ সালে ভারতে মোট ২৩৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার বিদেশী পণ্য আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ১৮০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। আমদানী বাণিজ্য এইভাবে বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য বাড়িলে আমরা ততটা আশঙ্কিত হইতাম না, কারণ ১৯৪৫ সালে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী উভয় বাণিজ্যই পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অনুপাতে সমানহারে বৃদ্ধি পাইলে ১৯৪৪ সালের অনুকূল বাণিজ্যিক গতির ধারা এ বৎসরও পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। ১৯৪৪ সালে ভারতে আমদানা হয় ১৮০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার মাল এবং রপ্তানী হয় ২৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মাল, অর্থাৎ এ বৎসর ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৯৪৫ সালে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছে ২৪০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার মাল, কিন্তু এবার আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য গত বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৫৭ কোটি টাকা বেশী হওয়ায় বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস বিদেশী মুদ্রার হিসাবে ভারতের আর্থিক স্বাচ্ছল্য অবশ্যই বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করিবে। ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংগুলি কবে আদায় হইবে কিছুই ঠিক নাই, আদায় হইলেও তাহার বিপরীত দিকে ভারতসরকারের ঋণপত্রে, প্রচলিত নোটে এবং ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিণী দেনার প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার আর্থিক দায়িত্ব আছে। সে হিসাবে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের প্রয়োজন এখন অসামান্য। ভারতে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আশা করা যায় এবার অন্ততঃ ভারতের কৃষি-শিল্প সংস্কার সম্বন্ধে ভারত সরকারের চিরাচরিত ঔদাসীন্যের অবসান ঘটিবে। কাজেই ভারতে জাতীয় সরকারের অধীনে এখন যদি কলকারখানার সম্প্রসারণ হয়, বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি আমদানী করিবার জন্য বাণিজ্য উদ্বৃত্ত একান্ত আবশ্যক। যুদ্ধোত্তর প্রথম বৎসরেই ভারতের বাজারে বিদেশী ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে তাহা ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে নিঃসন্দেহে বিপদের কারণ হইবে। আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের আমলাতান্ত্রিক বিদেশী সরকার ভারতে বিলাতী মালের বাজার রক্ষার উদ্দেশ্যেই এদেশে শিল্প-সংস্কারের যুদ্ধকালীন সুবর্ণসুযোগ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাবে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইতেছে, এজন্য ইহাদের পুলকিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতের সত্যকার যাঁহারা কল্যাণকামী তাঁহারা ভারতবাসীর পণ্যাভাবের নাম করিয়া এদেশের বাজার বিলাতী মালে ভর্ত্তি করিয়া দিতে কখনই চাহিবেন না। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ উপলব্ধি করিয়া ভারতবাসীরও সহস্র অভাব সত্ত্বেও এদেশের বাজারে বিলাতী মালের ব্যাপক প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত। তাহাদের বুঝা উচিত, যুদ্ধের প্রচণ্ড ওলটপালটের মধ্যে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিবার যে সুযোগ বর্ত্তমানে আসিয়াছে, বিদেশী পণ্য আমদানীর পথে প্রবল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিলে সেই সুযোগ ব্যর্থ হইবে। নিজেদের বিরাট ভবিষ্যত সৃষ্টির জন্য বিদেশী পণ্য সাধ্যমত বর্জ্জনের দ্বারা ভারতবাসীর এই সময় ত্যাগ স্বীকারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরিউক্ত কর্ত্তব্যবোধ ভারতীয় ব্যবসাদার ও জনসাধারণ সকলেরই থাকা দরকার। জনসাধারণ প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, জাতীয় স্বার্থ-রক্ষার জন্য অভাব সহিয়া ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার তাহাদের

পক্ষে কঠিন। কাজেই এ বিষয়ে ভারতীয় ব্যবসাদারদের দায়িত্ব অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। যাঁহারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী করেন, সমগ্র দেশের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই পণ্য আমদানীর ব্যাপারে তাঁহাদের নিজেদের লাভক্ষতি বিবেচনা করা উচিত। এই শ্রেণীর আমদানীকারকেরা অর্থবান ব্যক্তি, বিভিন্ন পণ্য সম্বন্ধে এবং পণ্যের বাজার সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রায় ক্ষেত্রেই প্রচুর। কাজেই বিদেশ হইতে মাল আনাইবার চেষ্টার পূর্ব্বে এ দেশের শিল্প-সংস্কারের প্রয়াসে তাঁহাদের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে এখনি হয়তো তাঁহাদের তেমন লাভ হইবে না, কিন্তু এইভাবে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট লাভবান হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবার গৌরবও তাঁহারা লাভ করিবেন।

দুঃখের বিষয়, অনেক ভারতীয় আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান এদিক হইতে সমস্যাটিকে দেখিতেছেন না। 'আর্থিক জগৎ' পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বৃহত্তম সাইকেল আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের জনৈক অংশীদার নাকি লণ্ডনে গিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাইকেল ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার কোম্পানী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ শিল্পপতিরা এমন কি ব্রিটিশ সরকারও ভারতের বাজারে এখন বিলাতী মাল যত বেশী পারেন কাটাইতে চান, কাজেই একটি বড় ভারতীয় আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির এই কথায় তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। দেশে যুদ্ধোত্তর সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটিশ বোর্ড অফ ট্রেড ব্রিটেনের রপ্তানী বাণিজ্য যুদ্ধের আগের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়াইবার এক বিরাট পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে এখন কাজও চলিতেছে। ভারতের বাজারের উপর ব্রিটিশ বণিকদের চিরকালের ভরসা। কাজেই ভারতবর্ষের লোকেরা যদি ব্রিটিশ মাল সাগ্রহে কিনিতে থাকে, ব্রিটিশ রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এমনিই বাড়িয়া যায়। মোট কথা, দেশের বর্ত্তমান দুঃসময়ে বিদেশী পণ্য আমদানী বা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে দেশবাসীর বিশেষভাবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

'ফুড ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ অফ ইণ্ডিয়া'

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৪০ কোটি আন্দাজ লোক বাস করে। বৎসরে এদেশে গড়ে ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বাড়িতেছে। ভারতে উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রসার হয় নাই বলিয়া এদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে জীবিকানির্ব্বাহ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মোটের উপর ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা অন্ততঃ ৮০ ভাগকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষি-ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়।

বর্ত্তমানে অবশ্য ভারতে শিল্পপ্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। তবে একথা ঠিক যে, এই বিরাটায়তন দেশের অসংখ্য অধিবাসীর জীবিকা-সংস্থানের উপযোগী শিল্পপ্রসার বহু সময়সাপেক্ষ। এ হিসাবে এখনও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোককে কৃষির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

সম্পূর্ণ কৃষিজীবী দেশ হইলেও ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে ভারত সরকার এতকাল বিস্ময়কর উদাসীনতা দেখাইয়াছেন। অবশ্য যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতে শিল্পপ্রসার হইতে দেন নাই, কৃষির প্রতি এই উদাসীনতার তাহাই মূল কারণ। আসলে ভারতের এই আমলাতান্ত্রিক সরকার ভারতবাসীকে দরিদ্র ও অশিক্ষিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের কোটি কোটি অধিবাসী শিক্ষায় ও অর্থস্বাচ্ছল্যে বড় হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ জাতির পক্ষে তাহাদিগকে বেশীদিন বশে রাখা সম্ভব হইবে না।

যাহা হউক, মহাযুদ্ধের অবসানে ভারত সরকারের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন যে দেখা যাইতেছে, ইহাত সত্যই আশার কথা। মুমুক্ষু ভারতবাসীর সহিত ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ একটা আপোষজনক মীমাংসা করিয়া ফেলিতেই এখন ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। এই জন্যই তাঁহারা কংগ্রেসকে অন্তর্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের ভার দিয়াছেন।

ভারতবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষি সম্বন্ধে তাঁহারা যে এতকাল পরে একটু আগ্রহশীল হইয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রমাণ, তাঁহারা শীঘ্রই ভারতবর্ষের কৃষি ও খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যসম্বলিত একখানি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রয়োজনীয় পুস্তিকাখানির নাম হইবে

'ফুড ষ্ট্যাটিসটিকস্ অফ ইণ্ডিয়া'. (ভারতের খাদ্যসংক্রান্ত তথ্য সংকলন)। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও এই পুস্তিকাখানির সম্পাদনা করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, কৃষি ও খাদ্যসংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে ভারতীয় কৃষির প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিবে। জমি, সার, সেচ, ফসল, বাজার, যোগাযোগ, যানবাহন প্রভৃতির সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব এতকাল পাওয়া যাইত না বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধন সম্ভব ছিল না। উল্লিখিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে কৃষি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার যথেষ্ট সুবিধা হইবে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় কৃষিরও উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক।

'ফুড ষ্ট্যাটিসটিকস্ অফ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক ডাঃ রাও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আশা করা যায় তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থ তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য হইয়া খাদ্যের দিক হইতে ঘাটতি ও কৃষিকর্ম্মের দিক হইতে পশ্চাৎপদ এদেশের সত্যকার কল্যাণসাধন করিবে।

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম'

অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম-এ

শ্রুতির সিদ্ধান্ত অনুসারে মনুষ্যকৃত পাপপুণ্যের ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতদুষ্কৃতের ফল সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া ক্ষয় না করিতে পারিলে মুক্তি নাই ইহাই প্রাচীন ধর্ম্মসিদ্ধান্ত। সেই ফলভোগের কাল অতিদীর্ঘও হইতে পারে আবার অতিস্বল্পও হইতে পারে। পরজন্মেও হইতে পারে, ইহজন্মেও হইতে বাধা নাই।

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈঃ ত্রিভিঃপক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও গোপিকাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে না পারিয়া জনৈক গোপীর দশান্তরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা আছে—

তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষ পাতকা।
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা॥
চিন্তয়ন্তী পরাং সৃতিং পরব্রহ্ম স্বরূপিণং।
নিরুচ্ছ্বাস তয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা॥

সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্ম যে ভোগমাত্রের দ্বারাই নাশ হইতে পারে এই শ্রুতিসিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিতও সমর্থিত আছে।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" (তৃতীয় স্কন্ধ, ৩৩শ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক) দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ণনা করেন যে ভগবদ্ভক্তিও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনাশ করে ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'তে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে—

দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতং।

অর্থাৎ শ্বাদ (চণ্ডাল) প্রভৃতির নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণই তাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের বাধক। ভগবদ্ভক্তি দ্বারা উক্ত অযোগ্যতা দূর হইয়া তাহাদের যাগানুষ্ঠানে অধিকার হয়।

কিন্তু এই মত স্বীকার করিলে শাস্ত্রবিরোধ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে আছে—

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড ২৬।৭১

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন যে ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য আর্ত্ত ভক্তের জ্ঞাতিগণের মধ্যে যাঁহারা সুহৃৎ তাঁহারা তাঁহার পুণ্যরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করেন এবং যাঁহারা শত্রু তাঁহারা পাপরূপ প্রারব্ধ ফলভোগ করেন। তাঁহার মতে প্রারব্ধকর্ম্ম অন্ততঃ অন্যের দ্বারাও ভোগ হইয়া নাশ হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে না।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর টীকাকার শ্রীধর স্বামী এবং তাঁহার টীকার টীকাকার রাধারমণ দাস গোস্বামীর উক্ত "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে"র ব্যাখ্যায় উক্ত বাক্যে চণ্ডালাদির হরিভক্তি প্রভাবে ইহজন্মেই ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার হয় ইহাই শ্রীরূপ গোস্বামীর মত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীধর স্বামীর মতে "অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে"। রাধারমণ দাস গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে যেমন অনুপনীত দ্বিজাতির কোন পাপ না থাকিলেও যাগানুষ্ঠান করিতে হইলে উপনয়ন অত্যাবশ্যক, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত শ্বপচাদিরও যাগানুষ্ঠানে জন্মান্তরের অপেক্ষা আছে। শ্রীজীব গোস্বামীও বলিয়াছেন—"সদ্যঃ সবনায় কল্পত" ইতি—

'সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥'
ইতিবৎ তত্র যোগ্যতায়াং লব্ধারম্ভো ভবতীত্যর্থ।
তদনন্তরজন্মন্যেব দ্বিজত্বং প্রাপ্য তত্রাধিকারী স্যাৎ। ক্রমসন্দর্ভ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে চণ্ডালাদিরও সবন অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ্যতা জন্মায় কিন্তু তাঁহারা পরজন্মেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সবনাদিতে অধিকারী হন।

প্রত্যুত, হরিভক্তিবিলাসের সপ্তদশ বিলাসে পুরশ্চরণ প্রকরণে পুরশ্চরণে বর্ণভেদের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদীক্ষা দ্বারা মানব মাত্রেরই ব্রাহ্মণত্ব লাভের সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মত হইলে ঐরূপ বর্ণভেদের ব্যবস্থা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ইহা সুধীগণের বিভাব্য।

ক্ষমতা

(একাঙ্কিকা)

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

বড় হাকিম শ্রীনাথবাবুর বাড়ীর আপিসঘর। ঘরটি বেশ বড়—টেবিল, চেয়ার, বইয়ের তাক, দেওয়াল-পঞ্জী, ছবি প্রভৃতি দিয়া সাজানো। ইলেক্‌ট্রিক বাতি, পাখা। টেবিলের উপর দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড, কাগজের ফাইল। টেবিলের দুপাশে ড্রয়ার। কক্ষের দক্ষিণে ও বামে ষ্টেজের দুইপ্রান্তে দুইটি দরোজা, বাহির হইতে এঘরে যাতায়াত করিবার জন্য। বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য প্রেক্ষাগারের বিপরীত দিকে একটি দরোজা, দরোজায় পরদা টাঙানো।

যবনিকা উঠিতেই পরদার অন্তরালস্থিত ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল

একজন ফেরিওয়ালা কাঁধে সুবৃহৎ মোট লইয়া ঘরে ঢুকিল। এদিক ওদিক তাকাইয়া মেঝের উপর মোট রাখিল, কাঁধের গামছা দিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া গামছা নাড়িয়া বাতাস খাইল। তাহার পর ডাক দিল—

ফেরিওয়ালা। মাঠা'ন্ কই গো, মাঠা'ন্? ও মাঠা'ন্-মেমসায়েব? মাঠা'ন্-মেমসায়েব! ছিটের কাপড় আর 'নেস্' যা নেস্‌তে বলেছিলেন, তা এনিচি। একবার এসে দেখবেন নি কো, ও মাঠা'ন্-মেমসায়েব?

পোঁটলা খুলিয়া নানা আকারের কাগজের বাক্স মেঝেয় সাজাইয়া রাখিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীনাথবাবুর স্ত্রী সুনয়নী বাড়ীর ভিতর হইতে আসিলেন। তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। তিনি বাঙালী-গৃহিণী বলিয়া 'মাঠান' এবং বড় হাকিমের স্ত্রী সুতরাং মেমসাহেব। ফেরিওয়ালা সমাস করিয়া ডাকে 'মাঠান-মেমসায়েব'। ফেরিওয়ালার আগমনে সুনয়নীর দৃষ্টি ভয়-চকিত, কারণ হাকিম অদ্য বাড়ী আছেন।

সুনয়নী। চুপ চুপ। (বাড়ীর ভিতরের দিকে আঙুল দেখাইয়া) আজ উনি বাড়ী আছেন, আপিস যান নি। তোমায় দেখলে আর রক্ষে রাখবেন না, আজ তুমি যাও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাঠির অভাবে মস্তবড় একটা খাটের ডাণ্ডা হাতে করিয়া বড় হাকিম শ্রীনাথবাবু ফেরিওয়ালাকে তাড়া করিয়া আসিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর, আঁট-সাট চেহারা, কিন্তু মুখে বলিরেখা, মাথায় সুবিন্যস্ত টেরি—সেই আগের কালের কন্‌সার্টপার্টিজাতীয় ঢেউখেলানো লতাকাটা টেরি। দৃষ্টিভঙ্গী নিছক গোঁয়ারতুমির পরিচায়ক, সুনয়নী ভয়ে বাড়ীর ভিতর পলায়ন করিলেন।

শ্রীনাথ। দূর হও, বেরিয়ে যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও—

ডাণ্ডা আস্ফালন

ফেরিওয়ালা। যাচ্ছি, যাচ্ছি বাবু, মারবেন নি, মারবেন নি!

তাড়াতাড়ি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে লাগিল

শ্রীনাথ। আপিস গেলে বেটা চুপি চুপি আসে, যত সব ন্যাকড়ার টুকরো আর ছেঁড়া কাপড়ের ফালি বেচে আমার রক্ত-জল-করা টাকার সদ্গতি ক'রে যায়! সিকি পয়সার জিনিষ দশটাকায় বিক্রী করে! আমারি ঘরে বসে! আর ওদিকে আমি ততক্ষণ মুনাফাখোর তাড়িয়ে বেড়াই! প্রদীপের তলাতেই সব থেকে অন্ধকার।

ফেরিওয়ালা। (মোট বাঁধিতে বাঁধিতে) গরীব লোক বাবু, তাকে দু'এক পয়সা লাভ দেবেন নি কো? মেলা কাচ্চাবাচ্চা, তার ওপর এই দুর্ভিক্ষ। আপনাদের তো টাকার অভাব নেই বাবু।

শ্রীনাথ। আবার বক্তৃতা সুরু করলি! বক্তৃতাব্যাধির ওষুধ হল লাঠি। ভারি ঝাঁজালো ওষুধ। দেবো নাকি দু'ঘা?

ফেরিওয়ালা। না বাবু, তার আর দরকার হবেনি কো। (স্বর উচ্চে তুলিয়া) মাঠা'ন্-মেম, আমি এই গেনু গো। আর এক সময় আসব টাঁক বুঝে।

প্রস্থান

শ্রীনাথ। পাজী বেটা, জোচ্চোর বেটা—

শ্রীনাথবাবুর একমাত্র কন্যা জয়ন্তীর প্রবেশ। সুশ্রী চেহারা, চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি, বাক্য শাণিত, বয়স একুশ-বাইশ, অবিবাহিতা

জয়ন্তী। বারোটা বেজে গেছে, খাবে চলো বাবা।

শ্রীনাথ। উত্তর গোলার্দ্ধের পঞ্চাশ কোটি লোক না খেতে পেয়ে মরছে!

জয়ন্তী। তার জন্যে তোমার আপাততঃ উপোষ না করলেও চলে, বিশেষতঃ খাবারের থালা যখন উপস্থিত।

শ্রীনাথ। আমি সে-কথা বলছি নাকি! এই ভীষণ

দুর্ভিক্ষ, অথচ ফেরিওলার পাল্লায় পড়ে পয়সা ওড়ানো হচ্ছে। এর নাম ক্রিমিন্যাল্ ওয়েষ্ট্ অব্ মণি!

জয়ন্তী। তোমার উত্তর-গোলার্দ্ধের পঞ্চাশ কোটির মধ্যে ঐ ফেরিওলাও তো একজন। ওর ব্যবসা কেড়ে নিলে তোমাদের হোগ্‌লা-ছাওয়া রিলিফ্ হাসপাতালের তক্তপোষের ওপর একজন কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে দিব্যি শুয়ে থাকবে, তাতে টেক্স-দাতার টেক্সর ভার বাড়বে বই কমবে না। অথচ ওর আত্মনির্ভরতা কেড়ে নিয়ে ভিকিরির পঙ্গপাল বাড়াও যদি, তাতেই কি জাতির মস্ত লাভ?

শ্রীনাথ। আত্মনির্ভরতার একটা সীমা থাকা চাই। একটাকায় দশটাকা মুনাফা নেওয়াটা আত্মনির্ভরতা নয়, প্রফিটিয়ারিং। জেল হওয়া উচিত।

জয়ন্তী। জেল তাহলে আমাদের সকলের হওয়া উচিত। কারণ, আমরা যা দিই তার চেয়ে ঢের বেশী দাম আদায় করি। জেল তোমারো হওয়া উচিত, তুমিও প্রফিটিয়ারিং করো।

শ্রীনাথ। অ্যাঁ মেয়ে হয়ে বাপকে বলে কি! বেশী লেখাপড়া শেখার এই ফল। আমি করি প্রফিটিয়ারিং! হাকিমির মধ্যে তুমি প্রফিটিয়ারিং দেখলে!

জয়ন্তী। দেখলুম বৈকি। মান, সম্ভ্রম, প্রভাব, প্রতিপত্তি। চাপরাশিতে ধাক্কা মেরে লোক সরিয়ে দিচ্ছে—কি খবর? না হাকিম আসছেন। "ক্ষুদ্ররাজা আসে যবে, ভৃত্য উচ্চরবে হাঁকি কহে, দূরে যাও, স'রে যাও সবে।" ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে তুমি গেলে রুগ্ন মানুষকেও চেয়ার থেকে উঠে যেতে হবে। এ সমস্তই তো ন্যায্য পাওনার চেয়ে ঢের বেশী আদায়—তাকেই বলে প্রফিটিয়ারিং। বলে না?

শ্রীনাথ। আরে সর্বনাশ! এসব কথা বাপের জন্মেও শুনি নি, নিজের মেয়ের মুখে যা শুনলুম! হাকিমের কর্ত্তব্য কত কঠোর, কত তার দায়িত্ব, কত অবিচলিত তার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখবার জন্যে কী অতন্দ্রিত তার দৃষ্টি—এ সমস্ত বুঝি তোমার চোখে পড়ে না?

জয়ন্তী। পড়বে না কেন, খুব পড়ে। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী ক'রে চোখে পড়ে হাকিমের মোটা মাইনেটা।

শ্রীনাথ। মোটা মাইনে! এমন আর কি মোটা! আর একথা বোঝো না, এসব দায়িত্বপূর্ণ কাজে মাইনে একটু বেশী না হলে মানুষ ঘুষ খাবে যে!

জয়ন্তী। তবে আবার 'অবিচলিত কর্তব্য-নিষ্ঠা' 'অতন্দ্রিত-দৃষ্টি'—এসবের বড়াই কেন? সোজা বললেই হয়, মাইনেটাই প্রফিটিয়ারিং হারে, তাতেই পুষিয়ে যায়, তাই আর ঘুষ খাবার দরকার করে না। কারো কারো 'অতন্দ্রিত দৃষ্টি' আবার একটু বেশী প্রখর, তাই ঘুষ খাইয়ে সেই প্রখর দৃষ্টি এড়াতে হয়।

শ্রীনাথ। এমনধারা কথা তো এই পঞ্চাশ বছর কোনোদিন শুনি নি! এসব চিন্তাধারা বোধ করি রাশিয়া থেকে আসছে আজকাল?

জয়ন্তী। যে-সব সত্য সহ্য করতে পারো না, মনে করো সে-সবই আসে রাশিয়া থেকে? না, রাশিয়া থেকে এ চিন্তা আসে নি, আর আসবেই বা কেমন করে? ডাকে যে ধর্মঘট। এ চিন্তা আসে নিজের মস্তিষ্ক থেকেই।

শ্রীনাথ। তাহলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে বুঝতে হবে।

জয়ন্তী। কার?

শ্রীনাথ। (ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কিছুক্ষণ কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন) নেহাৎ বড় হয়েছ তাই, নইলে—

জয়ন্তী। নইলে মারতে? চুলের ঝুঁটি ধরে পিঠে সপাসপ্ বেত মেরেছিলে যেমন একদিন, তেম্‌নি?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ, তেম্‌নি। কিছু দোষ হ'ত না তাতে। বিকৃত-মস্তিষ্কের উপার্জিত মুনাফার প্রতি যদি এতই বিদ্বেষ, তাহ'লে সে টাকাটা বড়মানষী করে উড়িয়ে দেবার বেলা তোমাদের মা-মেয়ের কোনো সঙ্কোচ দেখি না কেন? গোরুটা বজ্জাত, কিন্তু দুধটা মিষ্টি, না?

জয়ন্তী। টাকা ওড়ানো তুমি যদি পছন্দ করতে, তাহলে ওড়াতাম না। পছন্দ করো না বলেই তো ওড়াই। কিন্তু তাও আর ভাল লাগে না।

শ্রীনাথ। এম-এ পাশ করে শুধু বুঝি এই রকম উল্টো-উল্টো কথা বলতেই শিখেছ?

ভৃত্য ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। মা বল্‌লেন, খাবার নিয়ে বসে আছেন। বেলা একটা হয়েছেন, হুজুর।

শ্রীনাথ। (গর্জন করিয়া) চুলোয় যা—

ভজুয়া। আজ্ঞে আচ্ছা—

প্রস্থান

শ্রীনাথ। জয়ন্তী, তোমার লেখাপড়া শেখা একদম ব্যর্থ হয়েছে।

জয়ন্তী। ব্যর্থ বই কি, তোমার দিক থেকে একদম ব্যর্থ। তুমি পারলে আমায় মূর্খ ক'রে রাখতে, পারো নি লোকনিন্দার ভয়ে।

শ্রীনাথ। কি রকম ?

জয়ন্তী। বড় হাকিমের একমাত্র মেয়ে মূর্খ হলে তোমার হাকিম-মহলে বদ্‌নাম, তাই।

শ্রীনাথ। অসহ্য! অসহ্য স্পর্দ্ধা!

জয়ন্তী। তোমার ব্যবহারও আমার অসহ্য হয়েছে।

শ্রীনাথ। তাই নাকি! খাচ্ছ দাচ্ছ, দিব্যি আরামে আছো, কি অসহ্য ব্যবহারটা দেখলে ?

জয়ন্তী। কাঠগড়ার আসামীর প্রতি ব্যবহার।

শ্রীনাথ। ওসব হেঁয়ালী রেখে স্পষ্ট ক'রে বল। আমি সরল সোজা মানুষ, সোজা কথা বুঝি। তোমার ওসব বাঁকাচোরা কথা বুঝি না।

জয়ন্তী। তোমার কেরাণী আমলারা, তোমার উকিল-মোক্তারেরা, কাঠগড়ার আসামীরা 'হুজুর হুজুর' ক'রে তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, তাই তুমি মনে করো তোমার আপিসে যেমন তোমার হুকুমে সবাই ওঠে বসে, তোমার বাড়ীতেও আমরা সবাই তেমনি কলের পুতুলের মতো উঠব বসব। আমাদের যে একটা মান-সম্মান জ্ঞান থাকতে পারে, একটা স্বাধীন মতামত্ থাকতে পারে, সে-কথা তোমার ধারণাতেই আসে না।

শ্রীনাথ। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতে আমার কথায় চললে তোমাদেরই ভালো। এতে আমার চেয়ে তোমাদেরই ভালো। আমার বয়েস, আমার অভিজ্ঞতা, এসব ভুলে যেও না।

জয়ন্তী। তুমিও একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতে, হাজার নিঃস্বার্থ হলেও জোর খাটাবার যুগ এ নয়। এ-যুগে জোর ক'রে যেমন তুমি কারো মন্দ করতে পারবে না, জোর ক'রে তেমনি কারো ভাল করবার অধিকারও তোমার নেই।

শ্রীনাথ। বলো কি! নিজের স্ত্রী, নিজের ছেলেমেয়ের ভাল করবার অধিকার আমার নেই!

জয়ন্তী। তবে তুমি তোমার অধিকারের জোর খাটাতেই থাকো, ভালবাসা পাবে না। বুঝতে পারো না?—যা ভাল, তাতেও আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—তোমার হুকুমে ভাল হতে হয়েছে ব'লে, নিজের ইচ্ছায় নয়। কেন তুমি আমাদের বিশ্বাস করো নি কোনোদিন ? আমরা কি আসলে এতই খারাপ ? আর একমাত্র তুমিই এত ভাল ? কেন তোমার এত ভয়, যে একটু ছেড়ে দিলেই অম্‌নি আমরা বিপথে যাবো ? আমরা কি চোর ? তোমার কাঠগড়ার আসামী ?

শ্রীনাথ। কী আশ্চর্য্য! আমি কি তাই ভেবেছি নাকি ?

জয়ন্তী। হয়তো তুমি স্পষ্ট ক'রে তা ভাবো নি, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমাদের তাই ভাবিয়েছে। সেইজন্যে যা তুমি করতে মানা করেছ, আমি তাই করেছি। তোমার মুখের সাম্‌নে সিগারেট না টেনে লুকিয়ে খেয়েছি, তুমি পছন্দ করো না পাউডার-লিপষ্টিক্-এনামেল-মাখা মুখ, তাই তোমার সামনে ওগুলা বেশী ক'রে মেখে আসি, আড়ালে যেয়ে ওগুলো অবিশ্যি ধুয়ে ফেলি, কেননা বেশীক্ষণ মেখে থাকলে মুখে ব্রণ আর ফুস্কুড়ি বেরোয়। তুমি ফেরিওলার কাছে জিনিষ কেনা পছন্দ করোনা বলেই আমরা বেশী করে কিনি। নইলে হয়তো অত কিনতুম না।

শ্রীনাথ। বটে! আমার চোখ ক্রমশঃ খুলছে। আমারি ঘরে বসে আমারি বিরুদ্ধে এম্‌নি ক'রে বিদ্রোহ করছ!

জয়ন্তী। প্রভুত্ব যেখানে, বিদ্রোহও সেখানে—নইলে প্রভুত্বের বিষাক্ত বাষ্প পৃথিবীকে ঠেসে ধরে তার শ্বাসরোধ করত। কিন্তু তুমি হাকিম কিনা, তাই বুঝবে না এ কথা। হাকিমদের চোখে যেমন ঠুলিপরানো এমন আর কারো নয়। তোমার শাসন-সংরক্ষণের দায়িত্ব থেকে তোমায় এবার মুক্তি দেব। কথায় কথায় আর বলতে পারবে না, 'আমারি খাচ্ছ, আর আমারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ!' স্বাধীন হবার বয়েস আমার হয়েছে।

শ্রীনাথ। কী মৎলব করেছ, শুনি ?

জয়ন্তী। নিজে উপার্জ্জন করব। তোমার অন্ন আর খাব না।

শ্রীনাথ। (ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া) জয়ন্তী!

জয়ন্তী। জানি তুমি এতে ভীষণ চটবে, কেননা এতে তোমার অধিকার খর্ব হবে। কিন্তু বলতে বাধা নেই, তাই ভেবেই আমার উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গেছে।

শ্রীনাথ। (খাটের ডাণ্ডা আস্ফালন করিয়া যেরূপ-ভাবে ফেরিওয়ালাকে তাড়াইয়াছিলেন সেইরূপভাবে) *বেরিয়ে যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে—*

গোলমাল শুনিয়া শ্রীনাথবাবুর বৃদ্ধামাতা প্রবেশ করিলেন, তাঁহার কেশবেশ শুভ্র, বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি

বৃদ্ধা। আঃ, কি করো ছীনাথ, পাগল হ'লে নাকি! আচ্ছা জয়ন্তী, তোরই বা কি আক্কেল! বাপের সঙ্গে সমানে তর্ক করছিস! তোকে কতবার বলেছি, ছীনাথের রাগ দেখলেই চুপি চুপি সরে পড়বি, তা শুনিস না কেন?

জয়ন্তী। শুনি না আবার! খুব শুনি। তাই তো সরে পড়বার ব্যবস্থাই করছি ঠাকু'মা। কিন্তু চুপি চুপি আর হল না, ঢাক ঢোল বাজিয়েই হল।

বৃদ্ধা। যা, যা, পাগলামি করিস নি। যেমন বাপ, তেমনি বেটী। ঢাক ঢোল বাজবে লো বাজবে। তোর যে আর তর্ সইছে না নাত্‌জামায়ের জন্যে। আপাততঃ নাত্‌জামায়ের চিন্তা ছেড়ে খেতে যা। বৌমা তখন থেকে ভাত বেড়ে বসে আছে। যাও ছীনাথ, তুমিও যাও, কী তখন থেকে সমান হয়ে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছ! তুমি বাপু বাড়ী থাকলেই ঝগড়া করো। আজ জ্বরভাব হয়েছে বলে আপিস গেলে না, আমি তখুনি ভেবেছি, এই রেঃ মজালে! আজ ঝগড়ার চোটে হেঁসেলে না হাঁড়ী ফাটে!

শ্রীনাথ। অসহ্য, অসহ্য! তোমাদের কাছে আমার না আছে মান, না আছে সম্ভ্রম!

বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন

বৃদ্ধা। ছীনু আমার ভালই ছিল, কাল হ'ল ওর ম্যাজেষ্টর হয়ে। শুনেছি ইস্কুলমাষ্টার ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ছাত্তরের কান মলে। ছীনু এখন দিনরাত ম্যাজেষ্টরি করছে, ঘরে ম্যাজেষ্টরি, বাইরে ম্যাজেষ্টরি।

জয়ন্তী। আশ্চর্য্য তোমার চোখ তো ঠাকু'মা! এত দেখতেও তুমি পাও!

বৃদ্ধা। বাড়ীতে কে হাঁচল, কে কাশল, তাও ছীনাথের জানা চাই। আমাদের কালে কত্তারা বাড়ীর কোনো খবরই রাখতেন না, দিনের বেলা অন্দরেই আসতেন না। কেবল এক খাবার সময়টিতে আসতেন। আমরা বউঝিরা তখন দুর্গানাম জপ করতাম।

জয়ন্তী। কেন, এত ভয় কিসের?

বৃদ্ধা। ভীষণ রাশভারি লোক ছিলেন, কোথাও কিছু বেগড়ালে আর রক্ষে ছিল! একবার হয়েছে কি—কত্তারা দুভায়ে খেতে বসেছেন, বড় রুই মাছের মুড়ো আমি আমার কত্তা—মানে বড়কত্তার পাতে দিয়েছি। প্রত্যেকবার মুড়ো যায় ছোট ভায়ের পাতে, সে ছোট কিনা, তাই মুড়ো খাবার তারই অধিকার। ভাবলুম, আহা বড়কত্তা অনেকদিন মুড়ো খান নি, আজ না হয় খেলেনই বা!

জয়ন্তী। তোমার নিজের কত্তাটির প্রতি তোমার একটু পক্ষপাত ছিল বলে মনে হচ্ছে ঠাকুমা! তা, কি পুরস্কার পেলে?

বৃদ্ধা। পুরস্কার? চোখ কটমটিয়ে বড়কত্তা ভাতের থালা ফেলে উঠে চলে গেলেন, যাবার সময় আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছোট ভাইকে বলে গেলেন, 'বুঝলে জগৎ, ছোট ঘরের মেয়ে!' তারপর ছোটকত্তা, আমি, আর সবাই মিলে কত্তার পায়ে ধরি তবে তাঁর রাগ পড়ে।

জয়ন্তী। বাবারে, কী তেজ!

বৃদ্ধা। ঠিকই বলেছিস, তেজ। এমন তেজ তুই দেখেছিস আজকাল? ছোটভাই তার ন্যায্য পাওনা পায় নি বলে বড়ভাই ক্ষুধার অন্ন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে গেল—এমন কি আর হয় রে আজকাল? তাদের ছিল তেজ। আর আজকালকার পুরুষদের আছে শুধু জ্বালা। আজকালকার বাড়ীগুলোও হয়েছে তেমনি। সদরটা একেবারে অন্দরের মাঝমধ্যিখানে ঢুকে বসে আছে! এতে পুরুষ মানুষের আবরু গেল!

জয়ন্তী। পুরুষমানুষের আবরু! ঠাকুমা তোমার মৌলিকত্ব আছে!

বৃদ্ধা। মেয়েমানুষের যেমন আবরু রাখতে জানতে হয়, পুরুষমানুষেরও তেমনি। যে-পুরুষমানুষ সব সময় মেয়েদের টিক্‌টিক্ করছে সে মেয়েমানুষের অধম। আমাদের কালে বাপু এমন ছিল না। বাড়ীর ভেতর আমরা ছিলুম গিন্নী, সর্বেসর্বা। সদরে তাঁরা ততক্ষণ তাঁদের নেশাপত্তর নিয়ে মসগুল থাকতেন।

জয়ন্তী। বাড়ার ভেতর ম্যাজেষ্টারি করার চেয়ে বাড়ীর বাইরে নেশাপত্তর করা ঢের ভালো। তা' ঠাকু'মা, নেশাটি তো বোঝা গেল, কিন্তু 'পত্তর'টি কি?

বৃদ্ধা। তুই আর জ্বালাস্‌নে বাপু!

জয়ন্তী। আচ্ছা ঠাকু'মা, তোমার কত্তাটি যখন নেশাপত্তর ক'রে বাড়ী আসতেন, তুমি তাঁর আদর-আপ্যায়ন করতে কি রকম?

বৃদ্ধা। শোন্‌ তবে বলি। টলতে টলতে বাড়ী এসে চুপি চুপি যে দাসীকে সাম্‌নে পেতেন তাকে জিগেস করতেন, হ্যাঁ রে তোদের মাঠাকরুণ কোন দিকে?—ঠিক তার উল্টা দিকটি দিয়ে গিয়ে গুড় গুড় করে বিছানায় শুয়ে পড়তেন। আমি কেঁদে কেটে চোখ লাল ক'রে মাথার শিওরে গিয়ে দাঁড়ালে এমন হতাশ অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকাতেন আমার পানে, এমন করুণ কণ্ঠস্বরে ডাকতেন 'বড় বৌ'—যে আমার বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত বেদনায় টনটনিয়ে উঠত।

চোখে আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন

জয়ন্তী। ছি ছি, ওল্ড্‌ উয়োম্যান, তুমি এইসব অসচ্চরিত্রতা আর পানদোষের প্রশ্রয় দিতে!

বৃদ্ধা। তোরা আজকালকার মেয়ে সে সব ঠিক বুঝবি না রে জয়ন্তী। দামাল পুরুষমানুষের সে ছিল একটা প্রচণ্ড দুষ্টামি, আজকালকার পুরুষ-মানুষের অসভ্য ইতরামি নয়।

জয়ন্তী। সব দোষই সমান, শুধু ভালবাসার চোখ বিভিন্ন রকম দেখে। তুমি বুড়ি নেলসন সাহেবের মতন তোমার কানা চোখটি টেলিস্কোপে রাখতে।

বৃদ্ধা। তোদের সায়েব-সুবোর ব্যাপার আমি বুড়ো মানুষ কি বুঝি?—ওমা, ও মিন্‌ষে আবার কে গো? আজ আর কারো খাওয়া-দাওয়া হবে না, দেখছি!

জনৈক আগন্তুকের প্রবেশ। পোষাক-পরিচ্ছদে তাঁহাকে সঙ্গতিপন্ন ব্যবসাদার বলিয়া বোধ হয়। নাদুস-নুদুস চেহারা, গলায় কণ্ঠীর মালা, পরিধানে ঢিলা পাঞ্জাবি, অত্যন্ত মোটা ধরা গলায় কথা কহেন

আগন্তুক। আজ্ঞে আজ্ঞে মাঠাকরুণরা, প্রাতঃপ্রণাম হই। ইয়ে বাড়ীতে আছেন, বড় হাকিমবাবু? অধীনের নাম ছিষ্টিধর—ছিষ্টিধর সামন্ত। আমার একটু বিশেষ জরুরি ইয়ে ছিল।

বৃদ্ধা। আচ্ছা, ডেকে দিচ্ছি।

বৃদ্ধা ও জয়ন্তী ভিতরে চলিয়া গেলেন

আগন্তুক। আজ্ঞে, আচ্ছা।

চুল উস্কোখুস্কো, বেশবেশ অবিন্যস্ত শ্রীনাথবাবুর প্রবেশ

আগন্তুক। আজ্ঞে প্রাতঃপ্রণাম হই হুজুর। এ কি, এত বেলাতেও হুজুরের নাওয়া-খাওয়া হয় নি!

শ্রীনাথ। না। তুমি কে? কি জন্যে এসেছ?

আগন্তুক। আজ্ঞে অধীনের নাম ছিষ্টিধর। আমার সোনারূপার কারবার (পকেট হইতে অতিসন্তর্পণে একটি পাতলা কাগজে জড়ানো সোনার হার বাহির করিয়া শ্রীনাথবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন) এরি জন্যে আসা। এই হার আমার গদিতে বন্ধক দিয়ে গেছে। হুজুরের নাম যেমনি শোনা, অমনি নিজে ছুটে এনু। হুজুরের কেচেরিতে গিয়ে শুনি হুজুর আজ যাননি। তাই এখানেই চলে এনু। হুজুর হাকিম, ইচ্ছে করলেই ফস্‌ ক'রে মানুষের ইয়ে করতে পারেন, তাই নিজেই ছুটে এনু।

শ্রীনাথ। এ কার হার?

আগন্তুক। হুজুরের কন্যের।

শ্রীনাথ। জয়ন্তীর? জয়ন্তীর হার তোমার কাছে গেল কি ক'রে?

আগন্তুক। আজ্ঞে সেটি বলতে নিষেধ। নইলে আপনার কাছে আর ইয়ে করতে আমার ইয়েটা কি?

শ্রীনাথ। ধুত্তোর ইয়ের নিকুচি করেছে! বেটা Beaded humbug কোথাকার—

আগন্তুক। আজ্ঞে তেরি-মেরি করবেন নি কো! ভালো হবে নি, বলে দিচ্ছি। একমুঠো টাকা ইনকমের টেস্‌কো দিই, আমায় তেরি-মেরি করবেন নি কো!

শ্রীনাথ। কী আপদেই পড়া গেল! এ হার তোমার কাছে গেল কেমন ক'রে—এই সোজা কথাটা তুমি বলবে না?

আগন্তুক। তাহলে খুলেই বলি, না বললে যখন আমারি ইয়ে হতে পারে, তখন আর নিষেধ ইয়ে করলে চলবে না। আপনার কন্যের কাছ থেকে নিয়ে অনিলবাবু আমার গদীতে বন্ধক দিয়ে গেছে।

শ্রীনাথ। অনিলবাবু? অনিলবাবুটা আবার কে? কার ছেলে?

আগন্তুক। আজ্ঞে কন্‌সার্টপার্টির ছেলে, তবে তার বাপের নাম জানি না। শুনির্চি ছায়ামূর্ত্তিতে আবার আক্টোও করে।

শ্রীনাথ। চুলোয় যাক ছায়ামূর্ত্তি! অনিলবাবুর সঙ্গে আমার মেয়ের সম্পর্ক কি?

আগন্তুক। আজ্ঞে, সে কথা বাপ হ'য়ে আপনি জানবেন নি কো, আর সম্পূর্ণ বাইরের লোক হয়ে আমি জানব? আমাকে জানিয়ে কি আর আপনার কন্থে অনিলবাবুর সঙ্গে ইয়ে করবেন?

শ্রীনাথ (উদ্যত ক্রোধে আগন্তুকের ঘাড় ধরিয়া) কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! চোর কাঁহাকা! বেটাকে পুলিসে দেব! চাপরাশি! এই চাপরাশি!

বেগে জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। বাবা, বাবা, ও লোকটির কোনো দোষ নেই, ওকে ছেড়ে দাও। আমিই অনিলবাবুকে ও হার বাঁধা দিতে দিয়েছিলুম।

শ্রীনাথবাবু আগন্তুককে ছাড়িয়া দিয়া উগ্রদৃষ্টিতে জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন

আগন্তুক। (শ্রীনাথবাবুর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) ন্যাও, এবার হ'ল তো! আমার নাম ছিষ্টিধর সাঁতরা, আমার কাছে উনি এসেছেন হেকিমি ফলাতে! কি গো মশাই! এখন যে কথা কইচেন নি কো! পুলুস ডাকবেন নি? আমায় পুলুসে দেবেন নি? (শ্রীনাথবাবু নিরুত্তর) চললুম বাবা। ঝকমারি ক'রে ইয়ে করেছিনু। হেকিম বাবুদের ক্ষুরে ক্ষুরে পেন্নাম। আর তেনাদের কন্থেদেরও!

বিদ্রূপাত্মক নমস্কার করিয়া আগন্তুকের প্রস্থান

ঠিক এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে সুনয়নী আসিয়া পরদার পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে পিতাপুত্রী কেহই লক্ষ্য করিলেন না

শ্রীনাথ। (জলন্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া) অনিলবাবু কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

জয়ন্তী। অনিলবাবু সিনেমা-কোম্পানীর লোক। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

শ্রীনাথ। আর কিছু নয়?

জয়ন্তী। না!

শ্রীনাথ। হার বন্ধক রাখতে দিয়েছিলে কেন?

জয়ন্তী। উপার্জনের পথ খুঁজছি। টাকা চাই। আর কিছু না জোটে, সিনেমাতেই ঢুকব।

শ্রীনাথ। সিনেমায় ঢুকবে? অনিলবাবু? আমায় একবার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করো নি, অথচ আমি তোমার বাপ। (রাগে প্রায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন) আজ থেকে আমি নিঃসন্তান। (দরোজার দিকে আঙুল দেখাইয়া) বেরিয়ে যাও।

জয়ন্তী। তাই যাচ্ছি।

টেবিলের উপর হইতে হার উঠাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন

চিঠি হস্তে একজন দরোয়ানের প্রবেশ

দরোয়ান। (সেলাম করিয়া) মাইজী চিঠি দিয়েসেন।

দরোয়ানকে দেখিয়া শ্রীনাথবাবুর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিবার যোগ্য। কারণ ক্রোধে হাঁপাইতে ছিলেন। সে-ভাব কাটিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে বিস্ময় এবং অবশেষে লোভ আসিয়া মনকে অধিকার করিল।

শ্রীনাথ। তুমি মৃত সতীশবাবুর দরোয়ান?

দরোয়ান। হুজুর, হাঁ।

শ্রীনাথ। (চিঠি খুলিয়া পড়িয়া) আচ্ছা তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো, জবাব লিখে দিচ্ছি। (দরোয়ান বাহিরে গেল। শ্রীনাথবাবু চিঠিখানি আবার একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলেন) আজ সন্ধ্যায় যেতে লিখেছে। নিমন্ত্রণ করেছে। নিশ্চয় যাবো। এতদিন নিজেকে সামলে রেখেছিলুম—কী ফল হয়েছে তাতে? আমার বাড়ীর কেউ কি আমার মুখ চায়, যে আমি তাদের মুখ চাইব! চুলোয় যাক ঘর-সংসার! (চিঠির জবাব লিখিয়া ডাকিলেন) দরোয়ান!

দরোয়ান। (প্রবেশ করিয়া জবাব দিল) জী হুজুর।

শ্রীনাথ। এই নিয়ে যাও জবাব।

দরোয়ান জবাব লইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

নিঃশব্দে পরদা সরাইয়া সুনয়নী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীনাথবাবু চিঠিখানা তাড়াতাড়ি পকেটে লুকাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু ইহা সুনয়নীর দৃষ্টি এড়াইল না

শ্রীনাথ। খাবার জন্য ডাকছ?

সুনয়নী। না, আজ খাবার পাট তুলে দিয়েছি। সকাল থেকে যা হচ্ছে, তাতেই আমার পেট ভরা। আমার কিছু বলবার ছিল।

শ্রীনাথ। জান না জয়ন্তীর কাণ্ড!

স্থনয়নী। জানি। তুমি তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। নেহাৎ বড় হয়েছে, নইলে হয়তো গায়ে হাতও তুলতে। নিজের চোখেই সব দেখেছি।

শ্রীনাথ। সে কি! তুমি এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ছিলে নাকি! তা-তা জয়ন্তীকে নিষেধ করলে না, তুমি কেমন ধারা মা?

স্থনয়নী। জয়ন্তীকে নিষেধ করব কেন? সে ঠিকই করেছে। তোমার হাত থেকে বেঁচেছে।

শ্রীনাথ। ঠিকই করেছে! বটে! তোমাদের ধারণা আমি ভীষণ স্বার্থপর, একটা পশু, এই না! কেবলি তোমাদের ওপর জুলুম ক'রে বেড়াই, এই না? বেশ, এইবার থেকে নিজের খেয়াল খুশিতে চলব।

স্থনয়নী। তাও নিজের কানেই এর আগে শুনেছি, যখন বুকপকেটে লুকানো ঐ চিঠিখানা পেলে।

শ্রীনাথ। (চমকাইয়া) চর দেওয়া হচ্ছে আমার ওপর।

স্থনয়নী। তোমার কাছেই শেখা। গত বছর আমার খুড়তুতো ভাই অনেককাল পরে বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমায় দেখতে এল, তুমি তখন সে-অঞ্চলের দারোগাকে দিয়ে তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নাও নি?

শ্রীনাথ। সর্বনাশ, তাও জানো!

স্থনয়নী। আরো কিছু জানি—সতীশবাবুর বিধবার কাছে তোমার ঘন ঘন যাতায়াত কেন?

শ্রীনাথ। ছি, ছি, কি নীচ তোমার মন! মৃত সতীশবাবুর ষ্টেট্ কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে, তাই সরকারি কাজে আমাকে সেখানে যেতে হয়।

স্থনয়নী। ও, তাই নাকি! আমার নীচ মন অত বুঝতে পারে না। ভদ্রমহিলা তোমায় যে সোয়েটার বুনে দিয়েছেন, সেটা ট্রেজারিতে জমা দাও নি কেন? সে তো সরকারি সোয়েটার! ভদ্রমহিলার ফোটোখানা তোমার ঐ টানার মধ্যে কাগজের নিচে লুকিয়ে রেখেছ কেন? ওটা কি সরকারি দলিল-দস্তাবেজ?

শ্রীনাথ। সর্বনাশ, তাও জানো!

স্থনয়নী। কিছু কিছু জানতে হয় বৈকি। কাল সন্ধ্যায় ভদ্রমহিলাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলে, সেটা অবিশ্যি সরকারি কাজে। কিন্তু ফেরবার পথে গাড়ীর মধ্যে বসে তুমি তাঁকে যে প্রীতি নিবেদন করলে, সেটাও কি সরকার-প্রীতি?

শ্রীনাথ। কে বললে তোমায় এ কথা?

স্থনয়নী। তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ ড্রাইভারের উপস্থিতি তখন তোমরা দুজনেই ভুলে গিয়েছিলে। প্রণয়ের রীতিই এমনি—'জগতে কেহ যেন নাহি আর'।

শ্রীনাথ। (গোপনতার সমস্ত মুখোস ফেলিয়া দিয়া হিংস্র পশুর মতো দাঁত খিঁচাইয়া) হাতে-নাতে ধরে ফেলে বাহাদুরি নিতে এসেছ! আমার চরম অধঃপতন ঘ'টে গিয়েছে কল্পনা ক'রে খুব একচোট বিজয়োৎসব করে নিচ্ছ মনে মনে, না?

স্থনয়নী। না। চরম অধঃপতন তোমার আজও ঘটে নি, আমি তা জানি। কিন্তু তুমি কি চাও আমি সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকব?

স্থনয়নীর কথার মধ্যেই যে সত্যের দীপ্তি ছিল তাহার প্রখর আলোকে অবনত পশুর মতো শ্রীনাথবাবু মাথা নিচু করিলেন

শ্রীনাথ। স্থনয়নী—

স্থনয়নী। তোমাকে তাই বলতেই এসেছিলাম। আমি আর তোমার চরম অবনতি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব না।

শ্রীনাথ। কি করবে?

স্থনয়নী। চলে যাব।

শ্রীনাথ। চলে যাবে? সে কি! কোথায়?

স্থনয়নী। তা জানি না। যেখানে হোক্, তাতে কিছু যায় আসে না।

শ্রীনাথ। (শরীরের ও মনের অবসন্নতায় টানিয়া টানিয়া কথাগুলি বলিতে লাগিলেন) স্থনয়নী, তুমি জানো, সত্যি আমি অত ইতর নই। স্বীকার করছি লোভ আমাকে বিপথে টানছিল, কিন্তু সামলে ছিলুম লোভ! কিসের জোরে? সে কি জানো না তুমি? শুনেচি ভালবাসার চোখ কখনো মিথ্যে দেখে না। তুমি আজও কি আমাকে চিনলে না স্থনয়নী? আমি—আমি সামলাতে পারি না নিজেকে। ক্ষমতার লোভ আমাকে দুর্বল করেছে। মুখে যতই হাঁক-ডাক করি, আমি অত্যন্ত অসহায়।

স্থনয়নী। তাই জেনেই এতদিন টেঁকে ছিলুম। কিন্তু এমন কিছু আছে যেটা ভেঙে গেলে মন একেবারে অচল হয়ে যায়।

শ্রীনাথ। না, না, কিছু ভাঙে নি। সব ঠিক আছে। আমি এখ্খুনি গিয়ে জয়ন্তীকে ফিরিয়ে আনছি।

সুনয়নী। জয়ন্তী আর ফিরবে না, যদি তুমি তোমার স্বভাব না বদলাও। কিন্তু কই, তোমার স্বভাব তো বদলায় না। সংসারে আজ কতদিন ধ'রে এমনি অশান্তি চলেছে, তবু তুমি তো কিছু শিখলে না। একটুও তো বদলালে না। আমি অনেকদিন ধরে আশঙ্কা করেছি, জয়ন্তী তেজস্বিনী মেয়ে, সে বিদ্রোহ করবে। শেষে তাই করল। এক কথায় সে তোমার আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে চলে গেল—যে-তোমাকে সে পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালবাসে। যখন সে কেবল হামাগুড়ি দিতে শিখেছে, তখন থেকে সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। তুমি আপিসে যেতে, আর সে তার কচি হাত দুটি দিয়ে কেবলি আমার আঁচল টানত আর জিগেস করত—মা, বাবা কখন আসরে? ' বাবার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? পায়ের তলার মাটি আজ সরে গেল। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মান আজ আমার বৃথা। আমি কি তোমাকে বাঁচাতে পারলুম? আমাদের একটিমাত্র স্নেহপুত্তলীকে আমি কি বাঁচাতে পারলুম? সংসারে আগুন লেগে গেল, আমি তো কিছু করতে পারলুম না। কারো কাছে আমার আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করছে না। কান্না আর চেপে রাখতে পারি না। বুক যে ফেটে যায়!—(চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া) যাচ্ছি।

দরোজার দিকে অগ্রসর হইলেন

শ্রীনাথ। (ভগ্নকণ্ঠে) সুনয়নী, আমার মাথার ঠিক ছিল না। আজ সমস্তদিন মাথার ওপর দিয়ে কী ঝড় বইছে একবার ভেবে দ্যাখো তুমি। কোথায় যাবে সুনয়নী! (হাত দুটি ধরিয়া) তোমার দুটি হাত ধরে মাফ্ চাইছি। অত নিষ্ঠুর হয়ো না। আমাদের পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন—সেই প্রথম দিনটি—সব কি তুমি ভুলে গেলে! ভুলতে পারলে! কত স্মৃতি—

সুনয়নী। ওই তো আমাকে চাবুক মারছে, বলছে, কালামুখী, সংসারকে তুই শ্মশান করে দিলি!

দরোজার দিকে অগ্রসর হইলেন

শ্রীনাথ। করো কি! কোথায় যাও! তুমি তো আজকালকার মেয়েদের মতো নও। বাইরের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, কোনোদিন তো একলা কোথাও যাও নি! কেমন ক'রে তুমি পথ চলবে! ওগো, লক্ষ্মীটি যেও না, কথা শোনো। (সুনয়নীর কানে এ কথা প্রবেশ করিল কিনা সন্দেহ। তিনি দরোজার চৌকাঠ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন)—নিজের দিকে যদি না'ই তাকাও, অন্ততঃ একটিবার আমার মান-সম্ভ্রম, আমার সুনাম, আমার অবস্থার কথা ভাবো। তুমি চলে গেলে লোকে যখন আমায় জিগেস করবে, আমি কি জবাব দেব?

সুনয়নী। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) যা তোমার মনে আসে তাই জবাব দিও। বোলো আমার চরিত্রহানি ঘটেছিল, কারো সঙ্গে পালিয়ে গেছি।

বেগে বাহির হইয়া গেলেন

শ্রীনাথ। (স্তম্ভিতভাবে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া) অ্যাঁ! একটুও বাধল না, চলে গেল! আমি তো এমন ক'রে ওদের ছেড়ে চলে যেতে পারতুম না! ভগবান, আমার সব আলো যে আজ নিভে গেল!

খানিক পরে ভৃত্য ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। মা ঠাকরুণ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে যাচ্ছিলুম, ফিরিয়ে দিলেন। এঃ-হে-হে, ওখানটায় শোবেন না বাবু, ও বাবু, বাবু! (ভজুয়া শ্রীনাথকে টানিয়া তুলিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল)—ইঃ, বাবু ভিরমি গিয়েছেন, যাই কত্তা মা'কে খবর দিই।

প্রস্থান

একটু পরে ড্রাইভারের প্রবেশ

ড্রাইভার। হুজুর, মোটর নিয়ে মাকে ফিরিয়ে আনতে গেলুম, কিন্তু এরি মধ্যে মা যে কোনদিকে চলে গেছেন কিছু বুঝতে পারলুম না। শেষে কি কোনো পুকুরে টুকুরে—পুলিশে একবার খবর দেবেন না হুজুর?

শ্রীনাথবাবু অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। ড্রাইভার একটু অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল

শ্রীনাথবাবুর বৃদ্ধামাতা প্রবেশ করিলেন

বৃদ্ধা। ছীনাথ, কী বলেছিস তুই আমার বউমাকে? কোথায় গেল আমার ঘরের লক্ষ্মী? আজ তোকে কি শনিতে ধরেছে নাকি? হাকিমি ফলাস ঘরের বউঝির ওপর? ঝাঁটা মারি তোর হাকিমির মাথায়। যা ওঠ, খুঁজে নিয়ে আয়। যাবি নি! গোঁ ধরে বসে থাকবি!

তবে আমিই যাচ্ছি। হতভাগা, তোকে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মারি নি কেন!

প্রস্থান

শ্রীনাথবাবু তেমনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন

খানিক পরে হ্যাট্‌কোট বুট-ধারী দারোগার প্রবেশ

দারোগা। (সেলাম করিয়া) সার, আপনার ড্রাইভারের মুখে খবর পেয়েই আমি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু কোন খোঁজ-খবর নেই।…কি হয়েছিল সার? আপনি কি একটা ষ্টেট্‌মেন্ট্ করবেন? (শ্রীনাথবাবু নিরুত্তর)—রাস্তার ধারের পুকুরটায় কি জাল দেওয়াবো?…আপনার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল?…শুনলাম আপনার মেয়েকেও আজ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?…আপনি কি আপনার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছিলেন? এরা তো সবাই তাই বলাবলি করছে।…মাফ করবেন, আপনার মাথায় কি কোনো—মানে পাগলামির কিছু…ইস্, কোনো কথাই যে বলেন না!

শ্রীনাথবাবুর মাতার প্রবেশ

বৃদ্ধা মাতা। ও ছীনাথ, তুই এখনো তেম্‌নি করে বসে আছিস? নে, ওঠ, লক্ষ্মী বাবা, যা একটু খোঁজ কর। আজ সারাদিন কিচ্ছু খাস নি। চা টা কিছু খাবি? লক্ষ্মী বাবা, মুখে কিছু দিয়ে যা বৌমাকে খুঁজে নিয়ে আয়। জয়ন্তীর জন্যে ভাবি না, সে কলেজে-পড়া মেয়ে, কিন্তু আমার বৌমা—

শ্রীনাথবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন

দারোগা। নমস্কার, আপনি বুঝি সারের মা?

বৃদ্ধা। আমরণ! আমি ষাঁড়ের মা হ'তে যাবো কেন রে মুখপোড়া, আমি ছীনাথের মা।

দারোগা। আমিও সেই কথাই জিগেস করছিলুম। তা আপনি না বুঝে আমায় গালাগালি করছেন। অমন করবেন না বলে দিচ্ছি, আমি পুলিস। আপনি কি কিছু জানেন এ ঘটনার? ইনি কি মারধোর করেছিলেন? হঠাৎ এঁর স্ত্রীকন্যা প্রায় একসঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

বৃদ্ধা। মুখ্যে আগুন, পুলুসের মুখ্যে আগুন। মরছি নিজের জ্বালায়, আর মুখপোড়া পুলুস এসেছেন ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করতে।

দারোগা। (আপন মনে) এখানে কোনো খবর পাবার আশা নেই।

প্রস্থান

বৃদ্ধা। আমি একা কোনদিক সামলাই! বড়ো কত্তা, তুমি আজ বেঁচে নেই কেন!

কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চলিয়া গেলেন

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শ্রীনাথবাবুর ঘরে আলো জ্বলিল না, তিনি তেমনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ঝড়ের মতো জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন

জয়ন্তী। মাকে তুমি কী বলেছ? সাধু সেজে ওখানে চুপ ক'রে বসে বসে মজা দেখা হচ্ছে? দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি তোমায়!

বাঘিনীর মতো শ্রীনাথবাবুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, টানাটানিতে, আঁচড়ে, শ্রীনাথবাবুর মুখে কপালে ঘাড়ে, শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইল, গায়ের জামা নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল। শ্রীনাথবাবু তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বসিয়া জয়ন্তীর হাতের শাস্তি নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভজুয়া আসিল

ভজুয়া। হেই মা দুগ্‌গা, দোহাই তোমার! যাক, দিদিমণি ফিরেছ। (সুইচ্ টিপিয়া বাতি জ্বালিতেই শ্রীনাথবাবুর ক্ষতবিক্ষত চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখা গেল) আহা-হা করেছ কি দিদিমণি, বাবুকে মেরেছ! বাবু যে আর ওনাতে নেই। বাবু ভিরমি গিয়েছে। মাঠাকরুণ যেই চলে গেলেন, বাবু ঐখানে—ঐ মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। আমিই তো ওনাকে উঠিয়ে এই চেয়ারে বসিয়ে রাখলুম। দিদিমণি, তুমি মেয়ে হয়ে বাপকে মারলে! ছিঃ দিদিমণি, ছিঃ!

জয়ন্তী বামহাতে নিজের চোখ ও কপাল টিপিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন

বেগে ড্রাইভারের প্রবেশ

ড্রাইভার। এই যে দিদিমণি ফিরেছেন! পুকুরে জাল দেওয়া হচ্ছে। কত্তামা সেখানে আছেন। ভজুয়া, তোমায় ডাকছেন, আপনিও চলুন দিদিমণি। শীগ্‌গির!

জয়ন্তী। অ্যাঁ! কিছু পাওয়া গেল নাকি! হা ভগবান!

জয়ন্তী, ভজুয়া ও ড্রাইভারের প্রস্থান

শ্রীনাথবাবু এতক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসিয়াছিলেন। ড্রাইভারের কথায় তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। জয়ন্তী প্রভৃতি চলিয়া যাইবার পর তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীনাথ। সুনয়নী মরে গেছে।…প্রভুত্বই সর্বনাশ করে। ক্ষমতাই সর্বনাশের মূল। ভাল মানুষও ক্ষমতার লোভে নষ্ট হয়ে যায়।…এই সোজা কথাটা সুনয়নী আমায় কতদিন কতভাবে বোঝাতে চেয়েছিল। আমি গোঁয়ার, বুঝি নি। আজ যখন বুঝতে পারলুম, সে-ই তখন নেই। ভগবান, এই চরম দণ্ডে, এই কঠিন মূল্যে তুমি আমায় আজ এই শিক্ষা শেখালে!

বুকপকেট হইতে সতীশবাবুর বিধবার চিঠি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিলেন। টানা হইতে তাঁহার ফটোখানি বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া খস্ খস্ করিয়া তাহাতে কি লিখিয়া শ্রীনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। আজ আমি আর কারো প্রভু রইলাম না, আজ থেকে আমার আর কোনো ক্ষমতা রইল না। আমিও চলে যাবো।

ঘরের ভিতর প্রস্থান

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। একি! বাবা কোথায় গেলেন! (টেবিলের উপর স্থাপিত শ্রীনাথবাবুর পদত্যাগ পত্রখানির উপর দৃষ্টি পড়ায় সেখানি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন) এও সম্ভব হ'তে পারল! বাবার মতন লোকও একমুহূর্তে সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত প্রভুত্ব বিসর্জন দিলেন! ক্ষমতা যাঁর এত প্রিয় ছিল, সেই তিনি এক কলমের আঁচড়ে তা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারলেন! আমি তাঁকে কত যে ভুল বুঝেচি—কত যে ভুল বুঝেচি! বাবা, বাবা, আমার বেচারী বাবা! আমি আজ তাঁকে মেরেচি পর্য্যন্ত!

একহাতে একটি ছোট সুটকেস, আর একহাতে একটি ছোট বেডিং লইয়া শ্রীনাথবাবু ঘরে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে তখনো সেই ছেঁড়া জামা, মুখে তখনো সেই শান্তির চিহ্ন।

শ্রীনাথ। জয়ন্তী, মাইয়া! মা!

জয়ন্তী। বাবা! বাবা!

শ্রীনাথবাবুর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন

শ্রীনাথ। চুপ করো মাইয়া! আর আমাকে ভয় কোরো না। আবার সেই তোর ছেলেবেলার মতো, আমি শুধু তোর 'বাবা'।

জয়ন্তী। তোমার ক্ষমতা-দৃপ্ত দুর্বলতার মধ্যে এতখানি মৌন তেজ কেমন ক'রে লুকিয়ে রেখেছিলে বাবা? আমি তোমায় মেরেছি। আহা, বড্ড লেগেছে বাবা?

শ্রীনাথ। না মাইয়া, লাগে নি।

জয়ন্তী। বাবা, কে একজন নাকি মা'কে আমাদের গলির মোড়ে ট্রামে চড়তে দেখেছে। পুকুরটাতে জাল দিয়ে কিছু পাওয়া গেল না। মা বেঁচে আছে, না বাবা? মা'কে খুঁজে পাওয়া যাবে, না বাবা?

শ্রীনাথ। ভগবানকে ডাকো জয়ন্তী, যা করবার তিনিই করবেন।

জয়ন্তী। তোমার ওপর রাগ ক'রে বলেছিলুম সিনেমায় ঢুকব। আর আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না বাবা।

শ্রীনাথ। কিন্তু আমি যে চলে যাচ্ছি মাইয়া। কাল ভোরেই চলে যাবো।

জয়ন্তী। সে কি! তুমি কোথায় যাবে? কেন যাবে? (শ্রীনাথবাবু নিরুত্তর) কেন চলে যাবে বাবা? আজ মা নেই ব'লে? (শ্রীনাথবাবু ঘাড় নাড়িলেন)। মা'র ওপর অভিমান ক'রে? (শ্রীনাথবাবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—'না')। আমি একলা কি ক'রে থাকব বাবা? মা নেই, তুমিও ছেড়ে যাবে!

শ্রীনাথ। উপায় নেই মা। চাকরি ছেড়েচি বলেই ক্ষমতার ভূত যে ঘাড় থেকে নেমেছে তার বিশ্বাস কি? আরাম আবার পাছে পথ ভোলায়, তাই কষ্ট সইবার তপস্যা করব।

জয়ন্তী। আমি যে সইতে পারছি না বাবা। তোমার কি দূরে চলে যাওয়ার খুবই দরকার? আমি কার কাছে থাকব বাবা?

শ্রীনাথ। আমার যাওয়ার খুবই দরকার। প্রতি মানুষের বোঝাপড়া তার নিজের সঙ্গে। দুদিন আগেই হোক, দুদিন পরেই হোক, এ বোঝাপড়া তাকে করতেই হবে। দুঃখু কোরো না মা। আমার যা রইল তা তোমারি সব। যতদিন না ফিরে আসি, আমি তোমায় তোমারি হাতে রেখে যাবো। মনে রেখো, নিজের শাসন সব থেকে বড় শাসন।

জয়ন্তী। মা তোমাকে এমন কিছু কি বলে গেছেন, যার জন্যে তোমার চলে যাবার দরকার?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ। আমার স্বভাব বদলানো চাই। হয় তো বদলাবে না আমার এই ক্ষমতা-কলুষিত স্বভাব। তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি মা ?

জয়ন্তী। না বাবা, না বাবা, মা তোমায় চিনতে পারেন নি, মা তোমার এ অপূর্বরূপ কোনোদিন দেখেন নি! আজ তুমি সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর! কী সুন্দর এই মূর্তি তোমার! আরাম তোমায় পথ ভোলাবে! কী যে তুমি বলো! তুমিই তো বললে, নিজের শাসন সব থেকে বড় শাসন।

শ্রীনাথ। না-মা, আমার আর বিশ্বাস নেই। তোমার মা যদি থাকতেন আজ, বিশ্বাস যদি দিতেন, তাহলে সে ছিল অন্য কথা। তোমার ঠাকু'মা কোথায় ?

জয়ন্তী। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন।

শ্রীনাথ। তুমিও শুতে যাও মাইয়া। রাত অনেক হল। বিদায় দাও মা।

জয়ন্তী। বিদায়! (কাঁদিয়া উঠিলেন) তুমি কি আজ খাবেও না, শোবেও না ? আজ সারাদিন যে জল পর্য্যন্ত খাও নি বাবা!

শ্রীনাথবাবু এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। জয়ন্তী বুঝিলেন তাঁহাকে অনুরোধ করা বৃথা। ক্লান্তিতে জয়ন্তীর শরীর-মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, ভিতরে চলিয়া গেলেন।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে শ্রীনাথবাবু বুকশেল্ফ্ হইতে টাইমটেব্‌লখানি আনিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। একস্থানে একটি চিহ্ন দিয়া টাইমটেব্‌লখানি বেডিংএর উপর রাখিলেন। তারপর বাতির সুইচ্ টিপিয়া আলো নিভাইয়া টেবিলসংলগ্ন চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। ক্লান্তিতে তাঁহার মাথা সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সময় অতিক্রম জ্ঞাপনার্থ মুহূর্ত্তকালের জন্য যবনিকা পড়িয়া আবার উঠিল।

যবনিকা উঠিলে দেখা গেল, ভোর হইয়া আসিয়াছে, কক্ষের অন্ধকার কাটিতেছে। শ্রীনাথবাবু তেমনি ঘুমাইতেছেন। অদৃশ্য ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুনয়নী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নিদ্রিত শ্রীনাথবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি যেন সেখানেই আটকাইয়া গেল। এ-মুখে কি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। অনেকক্ষণ পরে সুনয়নীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মেঝের উপর ছেঁড়া ফোটো, ছেঁড়া চিঠি, সুটকেস, বেডিং, টাইমটেব্‌ল সমস্তই দেখিলেন! টেবিলের উপর শ্রীনাথবাবুর পদত্যাগ পত্রখানি দেখিতে পাইলেন। ঝুঁকিয়া সেটি পড়িলেন। পড়িয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। আবার শ্রীনাথবাবুর মুখের-দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সুনয়নীর দৃষ্টিতে করুণা ও প্রেম যেন উচ্ছসিয়া উঠিল।...পদত্যাগ পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

তারপর অত্যন্ত স্নেহে, সুগভীর মমতায় নিজের হাতখানি স্বামীর স্কন্ধে রাখিলেন। শ্রীনাথবাবু জাগিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভাবিলেন ইহা বুঝি স্বপ্ন। তাঁহার মুখে বিহ্বল বিস্মিত দৃষ্টি। ক্রমে বুঝিলেন, ইহা স্বপ্ন নয়। তাঁহার দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিল।

সুনয়নীর হাতখানি লইয়া নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। পরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুনয়নীর বাহুর উপর মুখ রাখিলেন।

কেহ কোনো কথা কহিলেন না।

যবনিকা

জয়ধন্যা বকুল

শ্রীপান্নালাল ভড়

ঝরেছে বকুল বন বীথিকায়
বুঝি হলো রাতি ভোর,
সুরভিত পথে কিরণ বিছাও
কোথা আছো সাথী মোর।
ঝরা বকুলের রিক্ত হৃদয়
সহসা চমকি মৃদু হেসে কয়—
এই তো রচেছি আসন হেথায়
যেমনি উদয় তোর।

উদয় রাগেতে কি মধু আবেশে
বকুল কহিল তারে ভালবেসে
এসো এসো হেথা পেতেছি আসন ?
করিব সোহাগে হৃদয়ে বরণ!
হে মানস প্রিয়া কহিল অরুণ
গাঁথ গাঁথ প্রেম ডোর,
বকুল তোমার জয়ের ঘোষণা
খুলে দাও হৃদি দোর।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

৮

যখন গৃহে ফিরিলাম তখন সন্ধ্যার রক্তাভা পশ্চিমাকাশ হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত গগনে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যার সময় পিতা ডাকিলেন। প্রত্যহের ন্যায় আজও সন্ধ্যায় পিতার নিকট গিয়া বসিলাম। কথা পরম্পরায় শোভাযাত্রার কথা উঠিল। তাঁহার নিকট আমি সকল বিষয় বর্ণনা করিলাম এবং শেষে যে সুরাপানোন্মত্ত যবনের সহিত আমার কলহ ও দ্বন্দ্ব হইয়াছিল তাহাও বলিতে ভুলিলাম না।

অন্য দিনের ন্যায় আজও শ্রমণ বুদ্ধপালিত আরত্রিক মাঙ্গল্য লইয়া আসিলেন ; আমরা সকলে মাতার হস্ত হইতে মাঙ্গল্য গ্রহণ করিলাম। শ্রমণ যাইবার সময় পিতাকে বলিয়া গেলেন যে অদ্য রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যভাগে আর্য অর্হৎপাদ মহাস্থবির পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।

যথাসময়ে মহাস্থবির আসিলেন ; আমরা সকলে তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম ; তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—

"আর্য্য ধবভদত্ত, বৎস দেবদত্ত, অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত আমি আজ এখানে আসিয়াছি। দেবদত্ত আজ মারোৎসবের শোভাযাত্রা দেখিতে গিয়া একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া আসিয়াছে। মনে করিও না, দেবদত্ত, এই ব্যাপারের অবসান ঐখানেই হইয়া গিয়াছে। আমি শুনিলাম উহারা তোমাকে চিনিয়াছে এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তবে উহারা গোপনে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে, কারণ উহারা জানে যে ক্ষত্রপ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং এই বিষয় তাঁহার গোচরে আসিলে উহাদের বড় সুবিধা হইবে না। বিষয় সামান্য বটে, কিন্তু যবনেরা ইহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, নগরের সকল যবন অধিবাসীগণ আপনাদিগকে অপমানিত, অসম্মানিত ও অপদস্থ মনে করিতেছে। তাহার পর যে মত্তপ-যবন যুবক তোমার হস্তে প্রহৃত ও নির্য্যাতিত হইয়াছে সে ক্ষত্রপ শ্যালক।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু, অন্য উপায় ছিল না। আর আমিও তাহার নিতান্ত অর্ব্বাচীন ও নীচের মত ব্যবহারে—নিরীহ পথচারীকে অকারণে প্রহার ও নির্য্যাতন করিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

—আমি বলিতেছি না যে তুমি কিছু অন্যায় করিয়াছ। আমার আসিবার উদ্দেশ্য তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। অদ্য রাত্রেই একটা কিছু অঘটন ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তাহার জন্য আমি শুনিলাম, উহারা সকলে প্রস্তুত হইতেছে। শেখর এ সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এবং যাহাতে উহারা ব্যর্থকাম হয় এবং কিঞ্চিৎ শাস্তিও পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রে তোমার সহিত মিলিত হইবে। রাত্রি একটু অধিক হইতে পারে তজ্জন্য চিন্তা করিও না। কিন্তু তোমরা অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে। আমি পালক ও প্রজ্ঞার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকেও সতর্ক থাকিতে বলিয়া যাইতেছি।"

পিতা বলিলেন, "আর্য্য, আপনি যে আমাদিগকে অশেষ স্নেহ করেন তাহা আমরা জানি। আপনার উপদেশ মত আমরা সকলেই আজ রাত্রে সজাগ ও সতর্ক থাকিব। আপনার এই সতর্ক বাণীর জন্য আপনি আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।"

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "আরও একটা কথা, দেবদত্ত, তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে তোমার কার্য্যক্ষেত্র ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল সামান্য ব্যাপারে আমাদের ত্রাণসংঘ সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক আছে। তুমি যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে তাহা হইলে সংঘের কার্য্য দেখিতে পাইতে। আমি স্বয়ং ছদ্মবেশে ঘটনাস্থলের অদূরে দাঁড়াইয়াছিলাম। শেখর তাহার বাহিনীর কয়েকজনকে লইয়া আমার নিকটেই ছিল। আরও জনকয়েক পানোন্মত্ত যবন যুবক ঐরূপ উপদ্রব এবং রমণীগণের প্রতি অসম্মান প্রকাশ ও শালীনতা বিরুদ্ধ ব্যবহারের জন্য ঐ বাহিনীর সদস্যগণের দ্বারা যথেষ্টরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছে। দুইজন যবন মার খাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পথের ধারে পয়োনালীর মধ্যে হয়ত এখনও পড়িয়া আছে।"

আমি বলিলাম, "ক্ষমা করিবেন—অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুনিয়া আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল।"

—বুঝিলাম ; কিন্তু এখন হইতে এই সকল ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে তুমি আর আপনাকে অপব্যবহার করিও না। সংযতচিত্তে চিন্তা করিয়া সকল কার্য্য করিবে। যে মহৎ দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করিয়াছ—যে কার্য্যের ভার তোমার উপর অর্পিত হইয়াছে—তাহা কখনও বিস্মৃত হইও না।

—বিস্মৃত হই নাই, আর্য্য—এবং কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। কিন্তু নিরীহ পথচারীর প্রতি এইরূপ উৎপীড়নের তৎক্ষণাৎ প্রতিকারের আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল।

—তজ্জন্য ত্রাণসংঘের সদস্যগণ অলক্ষিতভাবে নিকটেই ছিল।

তোমার ও প্রজ্ঞার হস্তে উহাকে ও উহার বন্ধুগণকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া তাহারা আর এ বিষয়ে তখন হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। সাধারণ দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া তাহারা সব লক্ষ্য করিতেছিল এবং প্রস্তুতও ছিল। দেখিলে না, অতি অল্পক্ষণ পরেই শেখর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেল ?

—আমি তখন তাহাদিগকে অতটা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই।

—আমার কি ভয় হয় জান দেবদত্ত ?—পাছে এই সকল ক্ষুদ্র আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আমরা সব হারাইয়া ফেলি। ক্ষত্রপের গুপ্তচর পুরুষপুরের অধিবাসীগণের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে। আমাদিগের সংঘের বিষয় এবং বাহ্লিক-গন্ধার অত্যাচারী যবনের গ্রাস হইতে উদ্ধারের সংকল্প সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ এখনও উহারা কিছু সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে যেন কোনও সংবাদ বাহির হইয়া না পড়ে তাহার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

—কিন্তু এই সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য ত কিছু করা উচিত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দেখা সত্বেও ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে অত্যাচার ও অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—পরোক্ষে অত্যাচারীর সহায়তা করা হয়।

—তজ্জন্য অপর লোক ছিল এবং থাকিবে। তোমার উপর যে কার্য্যভার ন্যস্ত আছে তাহা গুরুতর। এই সকল ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে তুমি আপনার অপব্যবহার করিও না। যে দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করিয়াছ—যে কার্য্যের ভার তোমার উপর অর্পিত হইয়াছে তাহাই সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলিবে।

আমি নীরব রহিলাম। মহাস্থবিরও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পরে বলিলেন—

বৃহৎ অত্যাচার-উৎপীড়নের মূলে কুঠারাঘাত করিলে—তাহাদের মূলে উচ্ছেদ করিতে পারিলে, এই সকল সামান্য ও ক্ষুদ্র অন্যায় সহজেই ও আপনা হইতেই নির্ম্মূল হইবে।

আমি মৌন হইয়া রহিলাম। মহাস্থবির বলিলেন—

অদ্যকার ঘটনা হয়ত এই দ্বন্দ্ব কলহের সহিত শেষ হয় নাই। উহারা ইহাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে—এইরূপ আমি শুনিলাম। এ সম্বন্ধে সকল সংবাদ শেখরের নিকট পাইবে। যে যবন যুবককে তুমি প্রহার করিয়াছ, সেই মল্লপ যে ক্ষত্রপ শ্যালক, তাহাও ভুলিও না। অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে—বিশেষতঃ অদ্য রাত্রে; উহারা সদ্য প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অত্যন্ত সাবধানে থাকিবে। আমি এখন চলিলাম।

মহাস্থবির বিদায়গ্রহণ করিয়া উঠিলেন। আমরা তাঁহার পাদ বন্দনা করিলাম; তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পিতা একটু চিন্তিত হইলেন এবং অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

মহাস্থবিরের যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই শেখর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে প্রজ্ঞাত আসিয়াছিল এবং আমরা উভয়ে অদ্যকার ঘটনা ও মহাস্থবিরের সংবাদ ও উপদেশ লইয়া তখন আলোচনা করিতেছিলাম। শেখর আসিয়া আমাদের আলোচনায় যোগ দিল। সে বলিল, যে অদ্য রাত্রে যবনগণ নগরপাল ও চৌরদ্ধরনিকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে আমাদিগের গৃহ আক্রমণ করিবে এবং স্থির করিয়াছে যে আমাকে ও চিত্রলেখাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমাদের প্রাক্তন গৃহ-শিক্ষক ডেমিট্রিঅস্ আছেন এবং চিত্রলেখাকে লইয়া যাওয়ার পরামর্শ তাঁহারই প্রদত্ত। এই ব্যাপারটি তাহারা গোপনে সম্পাদন করিবে, কারণ ক্ষত্রপ ন্যায়পরায়ণ এবং বৌদ্ধ; প্রজার উপর এরূপ অন্যায় অত্যাচার তিনি সহ্য করিবেন না, এইরূপ উহারা মনে করে এবং তজ্জন্য ভীত ও সন্ত্রস্ত। উহারা কয়েকটা সুদীর্ঘ রজ্জু সোপান সংগ্রহ করিয়াছে, গৃহের ছাদে উঠিতে উহাদের সুবিধা হইবে এবং কোনও রূপ গোলযোগ না করিয়া সেখান হইতে অনায়াসে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহারা তাহাদের কার্য্যোদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে, এইরূপ উহারা কল্পনা করিয়াছে।

আমি বুঝিলাম যে আমাদের প্রাণসংঘ কিরূপ নিপুণতার সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। আমি শেখরকে বলিলাম, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিব। তুমি বিশ্রাম কর গিয়া; এ বিষয় লইয়া তোমার আর কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না।"

শেখর জিজ্ঞাসা করিল—বাহিনীর জনকয়েককে সন্নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গেলে ভাল হয় না ?

—তা' রাখিয়া যাইতে পার, তবে তাহারা যেন বংশী ধ্বনির আহ্বান-সঙ্কেত না শুনিলে বাহিরে না আসে। আততায়ীদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা আমরাই করিব।

—তবে আমি চলিলাম—বাহিনীর পঞ্চদশ সশস্ত্র সদস্যকে অতি সন্নিকটে রাখিয়া গেলাম—একজন নায়কও তাহাদের সহিত আছে—আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ডাকিবে।

শেখর বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার সুনিশ্চিত কার্য্যনিপুণতা ও বিচারকুশলতা দেখিয়া আমার প্রাণে আনন্দ এবং আমাদের অনুষ্ঠিত ব্রতের সাফল্য সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

শেখর যাইবার সময় বলিয়া গেল যে দ্বিতীয় যামের * শেষে এবং তৃতীয় যামভেরী † শব্দিত হইবার পূর্ব্বে দস্যুগণ তাহাদের কার্য্যোদ্ধার করিবার কল্পনা করিয়াছে।

পিতাকে এবং আর্য্যপালকে সকল কথা জানাইলাম। তাঁহারা ভৃত্যদিগকে সশস্ত্র হইয়া সজাগ থাকিতে আদেশ দিলেন এবং আমাদের গৃহদ্বয়ের বহির্গমনের দ্বার অতি সতর্কতার সহিত ভিতর হইতে রুদ্ধ হইল। আমরা সকলেই ভৃত্যদিগের সহিত সজাগ ও সতর্ক রহিলাম।

রাত্রি প্রথম যামের শেষে আমাদের নৈশ আহারাদি সমাপন করিয়া

---

* প্রহরের।

† প্রহরে প্রহরে সময় জানাইবার জন্য নগরপালের আদেশানুযায়ী নগরপ্রাকারের তোরণ হইতে ভেরী বা ঘণ্টা বাজাইবার প্রথা বাহ্লিক গান্ধার সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল।

পুনর্ব্বার প্রজ্ঞা ও আমি একত্রিত হইলাম এবং ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রসমূহ নির্ব্বাচিত করিয়া যেখান হইতে অবিলম্বে গ্রহণ করা যায় এরূপ স্থানে রাখিয়া দিলাম। আমরা সকলেই সতর্ক ও জাগ্রত রহিলাম এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের গৃহের বহিপ্রাঙ্গণে ও সংলগ্ন উদ্যানে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় যাম নগরপ্রাকার হইতে বিঘোষিত হইল। আমরা আমাদিগের নৈশ অতিথিদের সম্বর্দ্ধনার জন্য তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। প্রায় ছয় দণ্ডকাল এইরূপে অতীত হইবার পর মনে হইল যেন আমাদের বহির্দ্বারের নিকট একাধিক অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে উত্তেজিতভাবে কিসের আলোচনা হইতেছে। আমরা বুঝিলাম যে, বন্ধুগণ আসিয়াছেন এবং সময় আসন্ন। আমরা সশস্ত্র হইয়া ছাদে উঠিলাম।

ফাল্গুনের পৌর্ণমাসী। তখনও শৈত্য সম্পূর্ণ যায় নাই। জ্যোৎস্না-তরল কুহেলিকার স্বল্প আবিল। নিশীথিনী যেন তাহার স্মিতোৎফুল্ল মুখখানি স্বচ্ছ চীনাংশুকের অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়াছে। সংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষেরও লতা পল্লবের ছায়ায় নৈশ কুহেলিকার আবিলতা যেন একটু নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা, ছাদ হইতে প্রচ্ছন্নভাবে এই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে, লক্ষ্য করিলাম যে অনেকগুলি লোক আমাদের গৃহের প্রবেশ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। আমরা ছাদে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদিগের কার্য্যাদি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং মনোযোগের সহিত তাহাদের কথাবার্ত্তা, যতদূর সম্ভব, শুনিবার ও বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হইলাম।

একজন বলিল, "না, দরজা ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই। প্রতিবেশীরা সজাগ হইয়া উঠিবে এবং ইহাদের সাহায্য করিতে আসিবে। তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবেই না—হয় ত আমাদের ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব হইবে।"

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশের কি ব্যবস্থা করিবে?"

অপর একজন বলিল, "এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিলেই পার্শ্বের বাড়ীতে প্রবেশ করা সহজ হইবে। দেখিতেছিস, এ পল্লীর গৃহগুলি পরস্পর সংলগ্ন—এক ছাদে উঠিলে অন্য গৃহের ছাদে অনায়াসে যাওয়া যায়।"

অন্য একজন বলিল, "বেশ, বেশ, উত্তম কথা! এখন কি করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা কর!"

অন্য এক কণ্ঠ বলিল "তবে আর বিলম্বের আবশ্যক নাই। একজন ছাদে উঠিয়া বাটীর মধ্যে নামিয়া যাও ও সম্মুখের দ্বার খুলিয়া দাও!"

—তবে তাহাই হউক!—কে ছাদে উঠিবে?

—কে ছাদে উঠিবে?

—যে হয় একজন উঠ!

—তুমিই কেন উঠ না!

—বেশ, তাহাই হইবে—আমিই উঠিব।

—সশস্ত্র আছ ত?

—হাঁ, সঙ্গে শাণিত তরবারি আছে…বাটীর মধ্যে অন্য কোনও অস্ত্রের আবশ্যক হইবে না।

প্রজ্ঞা ও আমি, ছাদের প্রাচীরের ধারে, প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া, আগন্তুকদিগের কার্য্যাবলী নীরবে লক্ষ্য করিতেছিলাম এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা, যতদূর সম্ভব, শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

দস্যুদিগের মধ্যে একজন বলিল, নীচে হইতে রজ্জু সোপান এই সু-উচ্চ গৃহ ছাদে ছুড়িয়া ফেলা বড় সহজ নহে—একপ্রকার অসম্ভব।—অনেক শক্তির আবশ্যক।—এত শক্তিশালী আমাদের মধ্যে, বোধ হয়, কেহই নাই।

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিল—বোধ হয়, কখন কি করিবে, তাহাই তাহারা ভাবিতেছিল। একজন এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, হাঁ, একটা উপায় আমি স্থির করিয়াছি। গৃহ সন্নিকটস্থ এই নিম্ব বৃক্ষের উপরে উঠিয়া রজ্জু সোপানের প্রান্তভাগ ছাদে ফেলিতে এবং উহার শলাকা ছাদের প্রাচীরে আবদ্ধ করিতে সহজেই পারা যাইবে।

এই প্রস্তাব সকলেই প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে করিল এবং একজন রজ্জু সোপান লইয়া বৃক্ষে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার পরিধানের বসন ভাল করিয়া গুছাইয়া লইয়া সে মল্লবেশ ধারণ করিল; উত্তরীয় খুলিয়া একজনের নিকট রাখিয়া দিতেছিল। যাহাকে তাহার উত্তরীয় দিতে গেল সে বলিল, উত্তরীয় লইয়া গাছের উপর উঠ; রজ্জু সোপান ছাদে ফেলিবার সময় উহার আবশ্যক হইবে। একহস্তে বৃক্ষের শাখা ধরিয়া থাকিয়া অপর হস্তে সোপানের প্রান্তভাগ ছাদে ছুড়িয়া ফেলিতে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। উত্তরীয় দ্বারা আপনাকে একটা পরিপুষ্ট শাখার কাণ্ডের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিবে এবং মুক্ত দুই হস্তে তুমি স্বল্পায়াসে কার্য্য-করিতে পারিবে।

—ঠিক বলিয়াছ—উত্তরীয়ের আবশ্যক হইবে।

লোকটা, উত্তরীয়খণ্ড দেহে কোনওরূপে জড়াইয়া লইয়া এবং রজ্জু-সোপানের একপ্রান্ত কটিদেশের বসনের সহিত সংলগ্ন করিয়া, বানরের ন্যায় সত্বর বৃক্ষকাণ্ড ও শাখা বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বৃক্ষের একটি উচ্চ শাখা আমাদের ছাদের অতি সন্নিকটে প্রসারিত হইয়া আছে এবং উহার কাণ্ডও বেশ পরিপুষ্ট ও দৃঢ় বলিয়া অনুমান হয়। ঐ ব্যক্তি এই শাখায় আসিয়া আপনাকে উহার কাণ্ডের সহিত আপনার উত্তরীয় দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিল। আমরা ছাদের প্রাচীরের অন্তরালে ছায়ার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া, তাহার কার্য্যকলাপ, এই অপরিস্ফুট চন্দ্রালোকে ও শাখাপল্লবাশ্রিত তরল ও স্বচ্ছ অন্ধকারে, যতটা সম্ভব, লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে তাহার কটিদেশ হইতে রজ্জু-সোপানের প্রান্তভাগ মুক্ত করিয়া ছাদে ফেলিবার চেষ্টা করিল, দুই তিনবার চেষ্টার পর উহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিল এবং প্রাচীরের এক স্থানে সংলগ্ন হইয়া গেল। আমরা বুঝিলাম যে সোপানের এই প্রান্ত প্রাচীরে সংলগ্ন হইবার জন্য তারযুক্ত কোনও দ্রব্য আবদ্ধ আছে। ঐ আবদ্ধ দ্রব্যটা যে কি তাহা

দেখিবার জন্য, আমরা, ধীরে-ধীরে, গোপনে, প্রাচীরের রজ্জু-সোপান-সংলগ্ন অংশের নিকট অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম রজ্জু-সোপানের এই প্রান্তে একটি ভারী এক লৌহশলাকা বদ্ধ এবং উহা প্রাচীরমূলের রেখায় দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি রজ্জু ধরিয়া দুই চারিবার টানিয়া দেখিল যে ঠিক লাগিয়া গিয়াছে—খুলিয়া যাইবার বা ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই—তখন সে সোপান নিম্নে ফেলিয়া দিল, বলিল, —"লও, ঠিক হইয়াছে, এখন কে উঠিবে উঠ! আর আমি এখানে থাকিতে পারিতেছি না, পিপীলিকা দংশনে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভীষণ জ্বলিতেছে—উহু—উহু—গেলাম-গেলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গে ধরিয়াছে—মরিয়া গেলাম—চক্ষুর মধ্যে পিপীলিকা দংশন করিয়াছে—চাহিতে পারিতেছি না—অন্ধ করিয়া দিল।"

একজন নিম্ন হইতে বলিল, "চুপ কর।—চেঁচাইও না!—পিপীলিকা দংশন সহ্য করিতে পার না?"

উপর হইতে বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি বলিল, না!—একবার উঠিয়া আসিয়া দেখ না কত সুখ! উহু—উহু—উহু—বাবারে—

বৃক্ষ হইতে সশব্দে সে নীচে পড়িয়া গেল। বোধ হয়, সে তাহার উত্তরীয়বদ্ধ দেহকে মুক্ত করিয়া, ত্রস্তভাবে সত্বর বৃক্ষ হইতে নামিতে গিয়া, তাহার হস্ত ও পদ স্খলন হইয়াছিল। সে নীচে পড়িয়া গোঙ্গাইতে লাগিল। অত উচ্চ হইতে পড়িয়া তাহার আঘাত অত্যন্ত গুরুতরই হইয়াছিল।

দলের একজন জিজ্ঞাসা করিল "বাঁচিয়া আছে ত?"

—এখনও ত আছে।

—একজন ইহাকে নগরপালের বাটীতে লইয়া যাও, সেখানে ইহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইবে।

—কিন্তু লইয়া যাওয়া যায় কিরূপে? ইহার সর্ব্বাঙ্গ যে পিপীলিকায় ছাইয়া ফেলিয়াছে!

—যে কোনও প্রকারে ইহাকে এখান হইতে সরাইতে হইবে। যেমন করিয়া পার ইহাকে লইয়া যাও!

একজন কোন উপায়ে আহত ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। সে যে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আমরা উপর হইতে অস্পষ্ট আলোকে ভাল দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয় সে আহতের সংজ্ঞাহীন দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া গিয়া থাকিবে।

এক ব্যক্তি তখন বলিল "তুমি এখন উপরে উঠ! তুমিই উপরে যাইবে বলিয়াছিলে না?"

রজ্জু সোপান ধরিয়া সকলে টানাটানি করিয়া দেখিল যে ছিঁড়িয়া বা খুলিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

এক ব্যক্তি বলিল "একজন করিয়া উঠ! একজন ছাদে পঁহুছিলে তবে আর একজন উঠিবে! দুইজনের ভার রজ্জুতে না সহিতে পারে।"

অপর একজন বলিল "খুব সহিবে। দুইজন একত্রে পাশাপাশি উঠিয়া যাও। একজন করিয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। ছাদে কেহ থাকিতে পারে কিংবা আসিতেও পারে।"

—বেশ, তবে তাহাই হউক—দুইজন একত্রে উঠ!

—আমি এরূপ করিয়া উঠিতে পারিব না।

—কেন পারিবে না!

—না, আমার সাহস হয় না।—রজ্জু ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

—না, ছিঁড়িবে না। উঠ!

—না, আমি উঠিব না—তুমি ত নিজে উঠিতে পার! তুমি নিজে উঠিয়া তোমার সাহসটা দেখাইয়া দাও না!

—বেশ, আমিই উঠিতেছি—কিন্তু আমার সহিত আর কে আসিবে? —দুইজন একসঙ্গে যাওয়া আবশ্যক।

অন্য এক কণ্ঠে শুনিলাম "আচ্ছা, চল! উঠ! আমি তোমারসঙ্গী হইব।"

আমরা, উপর হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে যতটা দেখা যায়, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম যে, এই রজ্জু সোপানের দুই দিকে সোপান আছে এবং দুইজন একত্রে দুই দিকের সোপান দিয়া উঠিতেছে। আমরা উভয়ে প্রাচীর-সংলগ্ন সোপানের শলাকার নিকট বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যখন আমরা দেখিলাম যে তাহারা ছাদের প্রাচীর ধারণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারিত করিবার উপক্রম করিতেছে তখন আমি শাণিত ছুরিকা দ্বারা লৌহশলাকা হইতে সোপানের মূল রজ্জু কর্ত্তন করিয়া দিলাম। শলাকা বিচ্ছিন্ন রজ্জু সোপান আরোহীদ্বয়ের সহিত সশব্দে নিম্নে পতিত হইল। ভূপতিত দস্যুদ্বয়ের অপরিস্ফুট কাতরোক্তিতে বুঝিলাম যে, তাহারা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে।

একজন অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "একি? একি হইল?—দেখ! দেখ! যা! মারা গেল বুঝি!—আর নড়ে না যে!—দুইজনেই যে একেবারে অসাড় হইয়া গেল!"

—তাইত!—দুইজনেই বোধ হয় মারা গেল!—নিশ্বাস পড়ে না যে!—মাথায় ও ঘাড়ে ভীষণ আঘাত পাইয়াছে। বোধ হয় দুইজনেই শেষ হইয়া গিয়াছে!

—বাঁচিয়া থাকুক বা মরিয়াই যাউক্ ইহাদিগকে এখন সত্বর নগর-পালের নিকট লইয়া চল? দুইজন দুইজনকে স্কন্ধে তুলিয়া লও! আর তোমরা এখান হইতে আমাদের সকল দ্রব্যসামগ্রী ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া চল! সাবধান—যেন কিছু পড়িয়া না থাকে।—এখন চল!—আর বিলম্ব করিও না।

—আচ্ছা—তাহাই হইতেছে; কেবল ত হুকুম চালাইতেছ। কোনও কাজে ত এ পর্য্যন্ত হাত দাও নাই!—এখন কথা ছাড়িয়া একটু কাজ কর দেখি!—লও! তুমিই একজনকে কাঁধে তুলিয়া লও!

—বেশ—তাহা লইতেছি—কিন্তু দড়ীটা ছিঁড়িয়া গেল—না, কেহ কাটিয়া দিয়াছে?

অপর এক ব্যক্তি রজ্জুটা তুলিয়া বেশ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "দড়ীটা কাটা বলিয়াই মনে হইতেছে।—বোধ হয় ছাদে কেহ আছে।"

—ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না।—কেহ কাটিয়া দিয়াছে বলিয়াই ত মনে হয়!

—কৈ দেখি?—না!—বোধ হয় ছিঁড়িয়াই গিয়াছে।—কেহ কাটিয়া দিলে ধারটা সমান হইত।

—কতকটা ত বেশ সমানই আছে।

—না,—না,—কোথায় সমান?—ছিঁড়িয়াই গিয়াছে বলিয়া ত মনে হইতেছে।

—এখন সে তর্ক থাক্!—আর কেহ এখন উঠিতে যাইতেছে না। এখনি ইহাদের লইয়া চল নগরপালের বাটী!

—কিন্তু কাজ ত কিছুই হইল না!

—তবে, তুমি কর! সব পুরস্কার তুমিই পাইবে। আমাদের দ্বারা আর কিছু হইবে না। পুরস্কারে আমাদের আবশ্যক নাই।

—লও!—চল!—বিলম্বে আরও বিপদ ঘটিতে পারে।

উহাদের কথায় আমরা বুঝিলাম যে রজ্জু কতকটা কাটিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট অংশটুকু লোক দুইটার ভারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। উহারা কিন্তু অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া অবশেষে রজ্জুটাকে কেহ কাটিয়া দেয় নাই—ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইল। যাহা হউক উহারা আর বিলম্ব করিল না; সহকর্মীদের সংজ্ঞাহীন দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল!

আমরা ছাদ হইতে নামিলাম এবং পিতাকে জাগরিত করিয়া রাত্রের ঘটনা জানাইলাম। তিনি সকল কথা স্থির ভাবে শুনিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন।—পালক কি জাগিয়া আছে? তাঁহাকে কি সব কথা বলিয়াছ?

—না, বলি নাই।

—তাঁহাকে সংবাদ দাও—আজ আমাদিগের সকলকেই জাগিয়া থাকিতে হইবে।—সশস্ত্র হইয়া থাক—আমাদিগকে আজ পালা করিয়া জাগিয়া কাটাইতে হইবে।—কিন্তু তোমাদের চিনিল কেমন করিয়া বাটীর সন্ধানই বা কে দিল?

আমি পিতাকে বলিলাম "যখন শোভাযাত্রার পথে গোলযোগ হইতেছিল তখন দেখিয়াছিলাম শিক্ষক ডেমিট্রিঅস্ আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। অদ্য রাত্রে এখন এই পলাতক দস্যুগণের মধ্যে মনে হইতেছিল যেন ডেমিট্রিঅসের কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছিলাম।"

পিতা আর কিছু বলিলেন না। বাটীর দ্বারপাল ও ভৃত্যগণকে তিনি সশস্ত্র হইয়া পালাক্রমে জাগিয়া থাকিতে আদেশ দিয়া ছাদে উঠিলেন এবং প্রাচীর আবদ্ধ লৌহশলাকাটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

আমি বলিলাম, "দস্যুরা বোধ হয় অদ্য আর ফিরিবে না।"

পিতা বলিলেন, "যদি অধিকতর পুরস্কারের লোভে পুনরায় আক্রমণ করে ত আজই আসিবে। বিলম্বে গৃহস্থ সতর্ক হইবার সময় পাইবে ও তাহাতে তাহাদের বিপদ বাড়িবার সম্ভাবনা তাহা তাহারা জানে।"

প্রজ্ঞাবর্দ্ধন আর্য্যপালককে সংবাদ দিতে গেল।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে দস্যুসমাগম
নামক নবম বিবৃতি।

ক্রমশঃ

কোথায় ঈশ্বর

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

হিংসার উন্মত্তরণে রক্তাক্ত পৃথিবী,
নরঘাতী, আত্মঘাতী, ভ্রাতৃ-হত্যা পাপ;
সুন্দর ধরণী এবে শবের কঙ্কাল,
ছড়ায় বিষাক্ত বায়ু কলুষ জঞ্জাল।

হে সুন্দর! যুগে যুগে যে মহামানব
আত্মাহুতি দিয়ে গেল মানবতা লাগি,
আনিল তপস্যালব্ধ ঐক্যের মিলন,
অশান্ত ধরণী দিল তারে নির্বাসন?

হায় ভ্রান্ত মানুষের সম্প্রদায় নীতি
নিজেরে বিভেদ করে আত্ম-হত্যা রণে;
সভ্যতা কাঁদিয়া মরে আদিম বর্বরে
দেবতা, দানব আজ মেশে এক স্তরে।

হিংস্র জনতা মাঝে কোথায় ঈশ্বর?
কোথায় মানব শিশু মহা জাতিস্মর।

কোন এক আধুনিক কবির প্রতি

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার কবিতা পড়িলাম:
লিখিয়াছ এ যুগের মানুষের কথা।
লিখেছ কেমন করে মানুষের কদর্য্য কামনা
সুন্দরের মৃত্যু এনে দিল।
তোমরা যেখানে থাক সেথা নাকি সবুজ প্রান্তর
ধূসর গম্ভীর হয়ে গেছে! বঞ্চিত জীবন,
রুক্ষম্লান মাটি কাঁদে যন্ত্রের পীড়নে।
তোমার কবিতা পড়ি রজনীর স্তিমিত প্রহরে।
এখনো কি জেগে আছ তুমি? প্রান্তর কি এখনো ধূসর?
জলভরা চোখে তোমা স্মরিলাম কবিবন্ধু মোর।
অপরাধ নিও নাক ভাই:
—তুমিও নূতন নও, আদিম পৃথিবী মরে নাই।
অসুন্দর বাঁচে শুধু সুন্দরের রূপসজ্জা তরে;
মিছেই নূতন কথা বলো। ধৈর্য্যহীন বিবর্ণ নয়ন
দেখোনা মাটির নীচে মুক্তি লাগি কাঞ্চন কাঁদিছে।
অবনীতে বয়ে যায় জীবনের অমৃত পাথেয়,
বিকৃত চোখেতে শুধু রাজপথে স্বেদবিন্দু ঝরে।

হইতে কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছিল এই অধিবেশনে সে সকলের উত্তর দেওয়া হয়। লীগের আপত্তি ছিল—কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা সর্ত্তাধীনে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাদেশিক পরিকল্পনা পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। ইহা ছাড়া গণ-পরিষদের সার্ব্বভৌম অধিকারে ও লীগের আপত্তি থাকে। লীগের এই সকল অভিযোগ খণ্ডন করিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করেন যে, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের আপত্তি থাকিলেও তাঁহারা উক্ত পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে বলেন, মিশন-প্রস্তাবেই প্রদেশসমূহের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রদেশগুলি মণ্ডলীভুক্ত হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার অধিকার তাহাদের নিজেদের রহিয়াছে। এ সম্পর্কে ১৬ই মে তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইবে। গণ-পরিষদের সার্ব্বভৌম অধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেস বলেন—ইহার অর্থ এই নয় যে, কোন দল বিশেষের বিশেষ কর্ত্তৃত্বের কথা বলা হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে বাহিরের কোনও শক্তি গণ-পরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় গণ-পরিষদের স্বাধীন অধিকার থাকিবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি লীগের এই সকল সন্দেহের নিরসন করিয়া উদারতার সহিত লীগকে সহযোগিতার আহ্বান জানান। শিখ সম্প্রদায়ের অভিযোগ সম্বন্ধে কংগ্রেস যে প্রস্তাব করেন তাহাতে বলা হয়, তাঁহাদের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, শাসনতন্ত্র রচনাকালে কংগ্রেস তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

কংগ্রেসের আহ্বানে শিখ সম্প্রদায় গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু লীগ কোনও সাড়া দিলেন না। তাঁহারা মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার সময় যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করেন, পাকিস্থান অর্জ্জনার্থ সেই ১৬ই আগষ্টের সংগ্রাম দিবসের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

বড়লাট ভবন হইতে ১২ই আগষ্ট তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল যে—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে বড়লাট কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রপতিও এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত নেহরু বড়লাটের নিকট হইতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের

এদিকে লীগ-নির্ধারিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস কিভাবে পালন করা হইবে পূর্ব্ব হইতেই লীগ নেতারা নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন—কেহ বলিলেন এই সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম হইবে না। কেহ প্রস্তাব করিলেন—আইন অমান্য। কেহ কেহ বলিলেন—এই সংগ্রাম কংগ্রেস বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে হইবে না—সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের বিরুদ্ধেই হইবে। লীগের উর্দ্ধতন মহল হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল, ঐ দিন সম্পূর্ণ হরতাল পালন করা হইবে, হরতালের জন্য কাহারও উপর কোনরূপ বলপ্রয়োগ করা হইবে না, তবে অনুরোধ করা হইবে মাত্র। লীগ নেতারা আশ্বাস দিলেন—শান্তিপূর্ণ ভাবে বিক্ষোভ দিবস পালন করা হইবে।



পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

১৬ই আগষ্ট আসিয়া পড়িল, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দিবস পালন করা হইবে এই ভাঁওতার আড়ালে যে বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করিতেছিল, ঐদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার বুকের উপর তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। লীগ গুণ্ডারা লাঠি, ছোরা, বল্লম, তরবারি, লৌহদণ্ড, কুঠার, সোডার বোতল প্রভৃতি হাতে লইয়া "লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্থান" ধ্বনি করিতে করিতে দলে দলে কলিকাতার পথে পথে বাহির হইয়া পড়িল এবং পাকিস্থানবিরোধী হিন্দু মুসলমান প্রত্যেককেই বলপূর্ব্বক দোকানপাট বন্ধ করিয়া হরতাল পালন করিতে বাধ্য করিতে

লাগিল, এই লইয়া লীগ গুণ্ডারা নানা স্থানে লুঠতরাজ এমন কি ছুরি-মারা পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়া দিল। দুপুরের পর অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। সঙ্ঘবদ্ধ লীগগুণ্ডাদের দ্বারা হিন্দুদের কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, নানা স্থানে অবাধে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যা চলিতে থাকিল। পুলিশ নিষ্ক্রিয় হইয়া দাঙ্গা দেখিতে লাগিল। আত্মরক্ষার্থ কোথাও কোথাও প্রতি আক্রমণ চলিলেও ঐ দিনে হিন্দুরা ঠিক দলবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিল না। শনিবার সকাল হইতে এই আগুন আরও ছড়াইয়া পড়িল এবং দাঙ্গার রূপ অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিল। হিন্দু অঞ্চলে মুসলমান এবং মুসলমান অঞ্চলে হিন্দুগণ নির্বিচারে হতাহত হইতে লাগিল। লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ ও নরহত্যার সে এক পৈশাচিকরূপ। রাজপথ শুধু মৃতদেহে সমাকীর্ণ ও নররক্তে প্লাবিত। পথে যানবাহনের নামগন্ধ নাই, বাজার ও রেশনের দোকান বন্ধ, কোথাও কোথাও লুণ্ঠিত। চারিদিকে হত্যা, আতঙ্ক ও অনাহারের এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।


সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

দাঙ্গার অবস্থা চরমে উঠিলে পর বাঙ্গালার গভর্ণর ও নেতৃবৃন্দ এদিকে দৃষ্টি দিলেন। সহরে নৈশ আইন ও ১৪৪ ধারা জারী করা হইল। বড় বড় রাস্তার উপর সৈন্যদল বসান হইল এবং দাঙ্গার স্থানে সৈন্যদের গুলি চলিতে লাগিল, হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ মিলিতভাবে দেশবাসীর নিকট পরস্পর ভ্রাতৃহত্যা হইতে বিরত থাকিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। এ সকল সত্ত্বেও কয়দিন ধরিয়া অলিগলিতে এমন কি বড় রাস্তাতেও হত্যা চলিতে লাগিল। ক্রমে অবস্থা আয়ত্ত্বে আসিতে থাকে। দাঙ্গায় প্রায় ৫ হাজার নরনারী নিহত, ১০ হাজার আহত এবং প্রায় ১০ কোটী টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। কলিকাতা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানেও লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস লইয়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়, তবে কোথাও কলিকাতার ন্যায় বীভৎসরূপ ধারণ করে নাই।

লীগের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন আটকাইয়া রাখিতে পারিল না, ২৪শে আগষ্ট তদারকী সরকারের সদস্যগণ পদত্যাগ করিলে তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া বড়লাট অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ অনুমোদন করেন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার বলদেব সিং, ডাঃ জন মাথাই, মিঃ আসফ আলি, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীজগজীবন রাম, স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁ, মিঃ আলি জাহির, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, মিঃ সি, এইচ, ভাবা।

অপর দুইজন মুসলমান সদস্যের নাম পরে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া জানান এবং ২রা সেপ্টেম্বর এই সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

ঐ দিন যে সময়ে বড়লাট নয়াদিল্লী হইতে বেতার যোগে অন্তর্বর্তী সরকারের নবনিযুক্ত সদস্যদের নাম ঘোষণা করিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সরকারের অন্যতম মুসলমান সদস্য স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁ আততায়ীদের হস্তে ছুরিকাহত হন। ইহার পর হইতে বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রতি নির্দ্দেশ দেন।

১লা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের মধ্যে দপ্তরগুলি নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা হয়।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—পররাষ্ট্র ও কমনওয়েল্থ রিলেসন্স।
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল—স্বরাষ্ট্র, বেতার, প্রচার
সর্দার বলদেব সিং—দেশরক্ষা
ডাঃ জন মাথাই—অর্থ
মিঃ আসফ আলি—যানবাহন
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ—কৃষি ও খাদ্য
শ্রীজগজীবন রাম—শ্রম
স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁ—স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চারুকলা
মিঃ আলি জাহির—আইন, ডাক ও বিমান
শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী—শিল্প ও সরবরাহ
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—খনি, কারখানা, বিদ্যুৎ
মিঃ সি, এইচ, ভাবা—বাণিজ্য

২রা সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময় বড়লাট প্রাসাদে অন্তর্বর্তী সরকারের উপস্থিত সদস্যগণ শপথ করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সর্দার বলদেব সিং, ডাঃ জন মাথাই, স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁ, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এবং মিঃ সি, এইচ, ভাবা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া স্ব স্ব দপ্তরের ভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দপ্তরের ভার না লওয়া পর্য্যন্ত পণ্ডিত নেহরু ঐ দপ্তর সমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ঐদিন কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারের কার্য্যভার গ্রহণ করায় ভারতের সর্ব্বত্রই এক আনন্দোল্লাস প্রবাহিত হয়। হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা গৃহে গৃহে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে। অপর দিকে কংগ্রেসের কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে লীগপন্থী মুসলমানেরা কৃষ্ণপতাকা উত্তোলন করিয়া লীগ সেক্রেটারী মিঃ লিয়াকৎ আলির নির্দ্দেশ পালন করেন।

কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করায় এশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার নানা স্থান হইতে অনেকেই পণ্ডিত নেহরুকে শুভেচ্ছার বাণী প্রেরণ করেন।

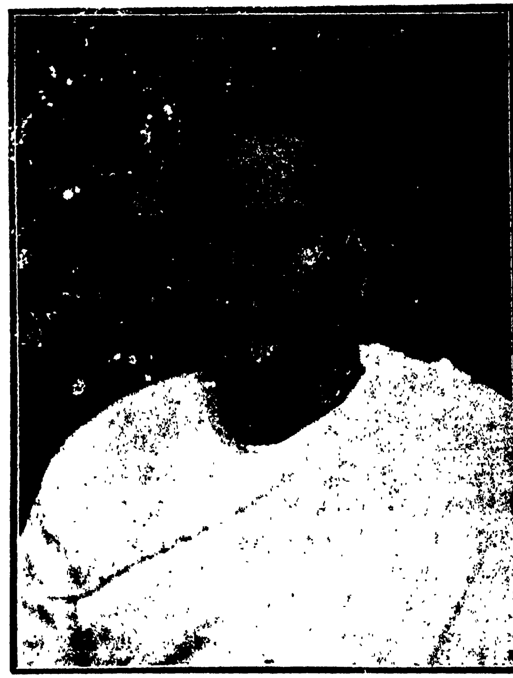
নূতন গভর্ণমেণ্টের নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কার্য্যভার

গ্রহণ করিবার পর, সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে জানান—যে, নূতন সরকারের সদস্যগণ স্ব স্ব দপ্তরের কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলেও আমরা সমস্ত গুরুতর ব্যাপারই যৌথভাবে আলোচনা করিব। আমাদের লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ইহার ৪০ কোটী নরনারীর জীবন যাত্রার মান উচ্চতর করা। আমরা আমাদের কাজে প্রত্যেক ভারতবাসীর সহযোগিতা কামনা করি। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্র ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষকে খেতাব ভূষিত করার যে প্রথা আছে সেই উপাধি বিতরণ প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইবে।

মহাত্মা গান্ধী ঐদিন তাঁহার সান্ধ্য প্রার্থনার পর বক্তৃতায় বলেন যে, সমগ্র ভারত বহুবৎসর ধরিয়া আজিকার এই শুভ দিনটির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই দিনটির জন্যই তাহারা অশেষ দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্র অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ায় এখন বলিতে পারা যায় এতদিনে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের পথ উন্মুক্ত হইল। আজিকার দিন ভারতের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন। তারপর নূতন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ডাণ্ডী অভিযানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—লবণকর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করাই হইল নূতন সরকারের প্রথম কাজ। ইহার ফলে দূরতম পল্লীর দরিদ্রতম অধিবাসী পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবে যে স্বাধীনতা সমাগত। ইহা ছাড়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও খাদি প্রচারকেও আশু তাঁহাদের কার্য্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩রা সেপ্টেম্বর বড়লাট ভবনে এই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম অধিবেশন বসে। প্রথম দিনের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুযায়ী লবণ-শুল্ক রদ, খাদি প্রচলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন আলোচনা হয়। পাঁচজন অনুপস্থিত সদস্য কাজে যোগ না দেওয়া পর্য্যন্ত কোনও গুরুতর বিষয়ে নূতন গবর্ণমেণ্ট কিছু স্থির না করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও জনগণের অনুরোধকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর এই নূতন সরকার আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর উপর হইতে সকল বাধানিষেধ প্রত্যাহার করেন। এই ৭ই তারিখেই পণ্ডিত নেহরু নবগঠিত সরকারের ভাইস-প্রেসিডেণ্টরূপে নয়াদিল্লী হইতে প্রথম বেতার বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সোপান হিসাবে আমরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিয়াছি। ভারত আজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা আমাদের অভীষ্ট অনুযায়ী দেশের ইতিহাস গড়িয়া তুলিব। আসুন আমরা সকলের সহযোগিতায় আমাদের গর্ব্বের ভারতকে জগতের শান্তি ও প্রগতির অগ্রদূত হিসাবে পৃথিবীর মহান জাতিসমূহের অন্যতম করিয়া তুলি।

যে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরাজের বিরুদ্ধে অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই আজ নয়াদিল্লীর নবগঠিত সরকারের আসনে সমাসীন, ইহা আজ কেমন করিয়া



শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু

সম্ভব হইল! ইংরাজ আজ কোন মোহে পড়িয়া স্বেচ্ছায় কংগ্রেসকে এই আহ্বান জানাইলেন। তাঁহারা এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়া কংগ্রেস যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাকে আর দাবাইয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই স্বেচ্ছায় আহ্বান করিয়া আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই আয়োজন। কংগ্রেস সেই ক্ষমতা গ্রহণ করায় 'স্বাধীনতা আগত ঐ' বলিয়া মনে হইতেছে। উদয়গগনে তাহারই নবালোক যেন আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ৯-৯-৪৬



শিল্পের জয়যাত্রা

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমদ্দার

যুদ্ধের হিড়িকে দেশে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হয়েছে। তার কারণ চাহিদা। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ থেকে আমদানীর অসুবিধা। সময় সংক্ষেপ করবার জন্যও অনেক সময় দূর থেকে জিনিষ না আনিয়ে কাছেই শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই রকম নানান কারণ এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সামরিক. কর্তৃপক্ষ অনেক সময় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করেছেন। অনিচ্ছুক সরকারের সাহায্যও পাওয়া গেছে। সরকারী সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা দ্রুততর হয়েছে।



ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ্ সায়েন্স গবেষণাগারের এক অংশ

এই শিল্পোন্নতির অনেক দিক; সবকটিই টিক্‌বে কিনা বলা শক্ত। যেগুলি শুধু যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করেছে সেগুলি এই পর্য্যায়ে পড়বে। তাছাড়া যারা পর্য্যাপ্ত লাভ পেয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাখেনি, বা ভাবে নি তাদের কথাও সন্দেহজনক। এখন অন্যান্য অনেক অসুবিধাও হবে। যেমন বিদেশী প্রতিযোগিতা। তাছাড়া লোকের স্বদেশীর উপর আগ্রহও যথেষ্ট কমে গেছে। সে যে জনসাধারণেরই দোষ তা নয়। ধন-তান্ত্রিকতার বুলি ছেড়ে দিলেও দেখা যাবে যে এইসব দেশী শিল্পের মালিক বা প্রতিষ্ঠাতারা তাঁদের ক্রেতাদের দিকে নজর দেন নি, অনেক সময় জিনিষ ভাল করবার দিকে মন দেন নি, নিজেদের লাভের বখরা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন,চোরা কারবার তাঁরা নিজেরা না করলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন; বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিতালীও দেশের লোক বরদাস্ত করবে না। আজ তাঁরা যতই স্বদেশী বুলি আওড়ান না কেন—দেশের লোক ভাবতে শিখেছে।



ভারতবর্ষে ম্যাথামেটিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরীর একটি পুরাতন কারখানা

এই শিল্পীকরণের অন্যান্য দিকও আছে। নানা প্রশ্ন। যেমন কোনটা

ভাল কোনটা মন্দ, কোনটি কোথায় চলবে, শিল্প কেন্দ্রের কথা। শ্রমিকদের অবস্থাও সমস্যা। শুধু শ্রমিক নয়—কেরাণীকুলের সমস্যাও আছে—আর আছে বেকার সমস্যার কথা—কাচা মালের দিকটা। ছোট ছোট অনেকগুলো না চালিয়ে একটা বড় করা ভাল কিনা—কিংবা বড় যেগুলো আছে সেগুলো রইল, অন্ত কতকগুলো ছোট ছোট ব্যবসায়ের সৃষ্টি করা সমস্যা। আরও বড় কথা জাতীয়করণের সমস্যা। সেই সঙ্গে আসবে রাজনৈতিক প্রশ্ন।

এত সব প্রশ্নের আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। সেগুলো এক এক করে করা দরকার।

মোট কথা যুদ্ধের কল্যাণে আমাদের দেশে অনেক নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অনেক পুরাতন শিল্প পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে বেঁচে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি আরও প্রতিষ্ঠাবান হয়েছে। এসবের তথ্য ও তত্ত্ব এখনও পাওয়া যায় না। কারণ এতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে, For secuirty reasons, এসব খবর সাধারণতঃ বাহিরে বেরোতে দেওয়া হত না। অবশ্য এখন হয়ত খবর সব পাওয়া যাবে বা যাচ্ছে। তাহলেও সব পাওয়া কোনদিনই যাবে না—তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারী সুব্যবস্থা এত যে অর্দ্ধেক খবর পাওয়াই যায় না, পেলেও তা এত পরে আসে যে তখন তা প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। Statistics বিভাগ নেই তা নয়—কিন্তু সবই আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার।

যুদ্ধের পরও নানান কলকারখানা গড়ে উঠছে। হয়ত এদের গোড়াপত্তন যুদ্ধের সময় হয়েছিল। না হলেও এখন আরও শিল্প-প্রতিষ্ঠা চলবে। কারণ লোকের হাতে কাঁচা টাকা জমেছে—এদিকে যতই দুর্ভিক্ষ হোক না কেন?—চাহিদাও আছে—অন্যান্য অনেক সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে—দেশের লোকের না হোক কিছু লোকের মাথা এদিকে খুলেছে—আমাদের দেশের জমিদারশ্রেণীও তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিল্প ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছেন—ব্যাঙ্কিংএর প্রসারের জন্ত ছোটখাট ব্যবসাবাণিজ্যের কিছুটা সুবিধা হচ্ছে—ইত্যাদি নানা কারণ আছে।

অবশ্য বড় একটা Slump আসতে পারে। তারই জন্ত দরকার planning—তবে সে যোজনা ধনতান্ত্রিক হবে কি সমাজতান্ত্রিক হবে, এই নিয়ে আলোচনা চলবে। শিল্পপতিরা যাই বলুন না কেন, জনসাধারণ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাই চাইবে। ধনতন্ত্রের অনেকগুণ থাকতে পারে—কিন্তু দোষ যে অনেক বেশী। আর সমাজতন্ত্র নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক রাশিয়ার পদ্ধতিই যে আমাদের অবলম্বন করতে হবে একথা কে বলছে? পরিকল্পনার প্রয়োজন আরও অনেক দিক থেকে।

শিল্পোন্নতির এই প্রচেষ্টার ফলে দেশে গবেষণার সুযোগও অনেক বেড়ে গিয়েছে। যেমন এক নম্বর ছবিতে কাপড়ের উপর রবার লাগাবার যে পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে তা একজন ভারতীয়েরই আবিষ্কার। ভারতবর্ষেও রবারের চাষ হচ্ছে। দু নম্বর ছবি ও একটি রবার ফ্যাক্টরীর ছবি।

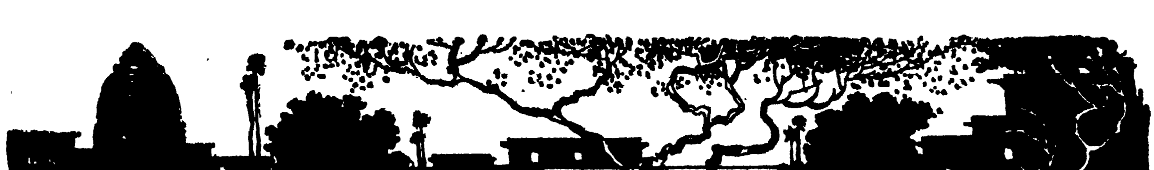
তৃতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে পেনিসিলিন প্রস্তুতের প্রচেষ্টা। বোম্বাইতে এই গবেষণা চলছে।



দক্ষিণ ভারতে রাসায়নিক কারখানার অন্ত অংশ
—ব্লিচিং পাউডার তৈরী করার যন্ত্র

দক্ষিণ ভারতের রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান দুটি ম্যাথেম্যাটিকাল যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা প্রভৃতি ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিল্পের এই জয়যাত্রা সফল হোক, সার্থক হোক। ইহা ভারতের অগণিত মূক জনসাধারণের প্রকৃত কাজে আসুক। এই-ই আমাদের কামনা।



সাময়িকী

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা—

গত ১৬ই আগষ্ট হইতে কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহার কথা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া হতাশ হইতে হয়। মানুষ যে কেমন করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া পশুপ্রকৃতি হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যুধ্যমান জাতিগুলিকে বেতার মারফত আমরা বড়াই করিতে শুনিয়া হাস্য করিতাম—এক জাতি আজ



দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের একটি অংশ ফটো—পান্না সেন

যখন বলিল, কাল শত্রু দেশে বোমা ফেলিয়া ১০ সহস্র লোক মারিয়াছি, পরদিন অপর জাতি তেমনই দম্ভ করিয়া প্রকাশ করিত—শত্রুদেশের একটি বড় সহরে বোমা ফেলিয়া একদিনে আমরা তাহাদের ২০ সহস্র লোক হত্যা করিয়াছি। এই পৈশাচিক কাণ্ড বহু বৎসর ধরিয়া সংঘটিত হইয়াছিল। জাপানের টোকিও এবং হিরোসিমা সহরে আণবিক বোমা ফেলিয়া লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে হত্যা করিতে—পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য জাতি বলিয়া যাহারা গর্ব্ব করে, তাহারা কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

গত কয়দিনে আমরা কলিকাতায় সেই তাণ্ডবলীলা দেখিয়াছি। ভ্রাতা যে ভ্রাতাকে এই ভাবে হত্যা করিতে পারে, তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিলেও যাহারা কখনও ইহা দেখে নাই, তাহাদের পক্ষে মনে করা সহজসাধ্য ছিল না। গঙ্গার উপর মুসলমান খালাসী রাত্রির অন্ধকারে ষ্টীমার চালাইয়া ছোট ছোট ডিঙ্গীতে যে সকল হিন্দু মৎস্যজীবী মাছ ধরিতেছিল তাহাদের নৌকায় ধাক্কা মারিয়া নৌকা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে—ইহা কলিকাতা সহরের সম্মুখস্থ গঙ্গাতেই ঘটিয়াছে। কলিকাতার কিছু দক্ষিণে আখড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ইটখোলাগুলির নিকটস্থ গঙ্গায় এক এক স্থানে কয়েকখানি করিয়া ইটবহনের বড় বড় নৌকা বাঁধা ছিল—প্রতি স্থানে হয়ত ৫০।৬০ জন করিয়া হিন্দু মাঝি ছিল। ৫।৭ শত উন্মত্ত মুসলমান তথায় যাইয়া প্রতি স্থান আক্রমণ করিয়া সকল মাঝিকে হত্যা করিয়াছে—১০।১২ স্থানে ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথা লিখিতে হস্ত কম্পিত হয়।

রামায়ণে, মহাভারতে, ইতিহাসে, পুরাণে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে রাজনীতিক কারণেই এইরূপ হত্যাকাণ্ড সম্ভব হয়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। বৃটীশ মন্ত্রীমিশন ভারতে আসিয়া হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে লইয়া নূতন শাসনপরিষদ ও গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কংগ্রেস সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন—মুসলেমলীগ তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। যে কংগ্রেস গত ৬০ বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী প্রত্যেকের জাতি ধর্ম্ম বর্ণনির্ব্বিশেষে মঙ্গলের চেষ্টা করিয়াছেন, একদল মুসলমান সেই কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করিল। কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিল এবং মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে

ভারতের একদল মুসলমান গত ১৬ই আগষ্ট নূতন শাসন-পরিষদ গঠনের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা করিল। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ বর্ত্তমানে কংগ্রেসের শাসনাধীন —একমাত্র সিন্ধু ও বাঙ্গালায় লীগের শাসন চলিতেছে। সিন্ধুতেও হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান এবং সেখানকার হিন্দুরা যোদ্ধা—কাজেই বাঙ্গালার লোক সাধারণত নিরীহ, এখানেই কংগ্রেস তথা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নানা ভাবে অশিক্ষিত জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলা হইল। যে



দাঙ্গার ফলে একটি ত্রিতল গৃহের অবস্থা ফটো—পান্না সেন

বৃটীশ এই ব্যবস্থার জন্য দায়ী, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে যাইলে তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা, কাজেই বাঙ্গালা দেশে সংখ্যাল্প হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজকে উত্তেজিত করা হইয়াছিল। শুনা যায়, এইজন্য বাহির হইতে গুণ্ডা ও অস্ত্রাদি আমদানী করা হইয়াছে। আলিগড় হইতে প্রেরিত অস্ত্রপূর্ণ বহু বাক্স বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ধরা পড়িয়াছে। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কলিকাতায় ৩।৪ মাস পূর্ব্ব হইতে এই জেহাদের জন্য আয়োজন চলিতেছিল—সেজন্য ছোরা, লাঠি, বন্দুক, পেট্রল প্রভৃতি সকল জিনিষই পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। জেহাদের পূর্ব্বদিনে সহরতলী হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে লরীযোগে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল।

বৃটীশ মন্ত্রীমিশনের নির্দ্দেশ ও লীগবর্জ্জিত বড়লাটের শাসনপরিষদ গঠনের প্রতিবাদে লীগ মুসলমানগণ যে হরতাল ঘোষণা করিলেন, হিন্দুরা এবং কংগ্রেসী মুসলমানরা তাহাতে যোগদান করে নাই—করিবার কোন কারণও ছিল না।

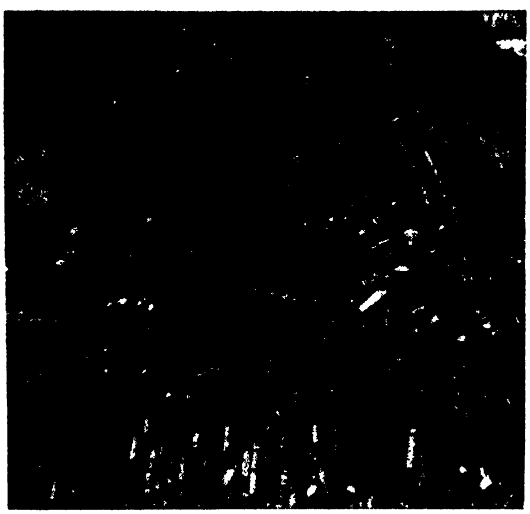


একটি ভস্মীভূত বস্তীর দৃশ্য ফটো—পান্না সেন

বাঙ্গালার লীগ সচিবসংঘ বে-আইনীভাবে ঐ দিন সরকারী ছুটী ঘোষণা করিলেন।

তাহার পর ঐ দিন সকাল হইতেই কলিকাতায় হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ প্রভৃতি আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথম কে কোথায় উহা আরম্ভ করিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। হিন্দুরা ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ঐ দিন তাহাদের দোকান খুলিয়া রাখিয়াছিল, মুসলমানগণ জোর করিয়া দোকান বন্ধ করিতে যায়, তাহার ফলে গণ্ডগোলের সূত্রপাত ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ। প্রথমেই চৌরঙ্গীতে বন্দুকের দোকান লুণ্ঠিত হয় ও সেই সকল

বন্দুক হত্যাকাণ্ডে নাকি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ৩ দিন ধরিয়া লালবাজার পুলিস অফিসে উপস্থিত ছিলেন—তিনি পুলিসকে ঠিকমত চালাইবার জন্য তথায় ছিলেন বলিয়া ঘোষণা করিলেও দেখা গিয়াছে যে পুলিস সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ ছিল, তাহারা দাঁড়াইয়া হত্যাকাণ্ড ও লুঠ দেখিয়াছে—তাহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে নাই। শুক্রবার সমস্তদিন কলিকাতায় মুসলমানপ্রধান পল্লীগুলিতে যখন নিরীহ হিন্দুঅধিবাসীদিগকে সপরিবারে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের গৃহধ্বংস করা হইতেছিল, তখন হিন্দুরা আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই, তাহারাও সংঘবদ্ধ হইয়া দলে দলে লাঠি লইয়া বাহির হইয়া হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়। এই ব্যাপারে এবার কলিকাতার হিন্দু



একটি বিখ্যাত বস্তীর ভস্মীভূত অবস্থা ফটো—পান্না সেন

যুবকগণ যে বীরত্ব ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাসে অভিনব। যে বাঙ্গালী হিন্দুকে আমরা ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা উপহাস করি, সেই বাঙ্গালী হিন্দু যুবকগণ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া অসাধারণ সাহস ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে। ১৬ই শুক্রবার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয় এবং রবিবার পর্য্যন্ত সমভাবেই তাহা চলিতে থাকে। গভর্ণরের নির্দ্দেশে সৈন্যবাহিনী পাহারা দিতে আসার পর হইতে ক্রমশ দাঙ্গা কমিতে থাকে। শনিবার সকাল হইতে হিন্দুরা আত্মরক্ষায় অবহিত হয় ও তাহার পর হিন্দুপল্লীতে যে মুসলমান নিহত হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শত্রুকে হত্যা করা পাপ নহে—ইহা হিন্দু শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। কাজেই শনিবার ও রবিবার কলিকাতার হিন্দু পল্লীগুলীতেও বহু মুসলমান নিহত হইয়াছিল। তবে নৃশংস মুসলমান গুণ্ডারা যে ভাবে নিরীহ হিন্দুপরিবারগুলিকে সপরিবারে ধ্বংস করিয়াছে ও হিন্দু রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, হিন্দুদের পক্ষে সেরূপভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা সম্ভব বা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কাজেই হিন্দুরাই অধিক সংখ্যায় নিহত হইয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের



একটি অগ্নিদগ্ধ বস্তী ফটো—পান্না সেন

শব কলিকাতার পথে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত পড়িয়া পচিয়াছে, তাহাদের সরাইবার লোক ছিল না। কলিকাতার রাজপথের উপর এবার শকুনির দলকে শব ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে। গলির মধ্যে, ময়লার গাদার মধ্যে, মাটীর নীচে ড্রেণের মধ্যে, গঙ্গা, খাল ও আদি গঙ্গার জলে এবার হাজার হাজার শব ভাসিতে দেখা গিয়াছিল। এরূপ বীভৎস দৃশ্য কলিকাতাবাসী কখনও দেখে নাই।

শুক্রবার হইতে ৫।৬ দিন দোকান-পাট, হাট-বাজার প্রভৃতি বন্ধ ছিল—কাজেই সহরবাসী বহু লোককে অনাহারে দিন কাটাইতে হইয়াছে। বহু বাড়ীর লোক সপরিবারে

শুধু নুন-ভাত খাইয়া বাঁচিয়াছিল। বুধবার হইতে ক্রমে ক্রমে ২।৪টা দোকান খুলিতে থাকে ও যুবকগণ কলিকাতার বাহির হইতে নিজেরা লরীযোগে তরিতরকারী আনিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে জোগান দিতে থাকেন। রেশনের দোকান বন্ধ থাকায় চাউলও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল।

মোট কত লোক মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব করা এখনও সম্ভব হয় নাই—কোনদিন হইবে কিনা জানি না। কারণ বহু নিরীহ দরিদ্র ভিখারী, মুটে, মজুর প্রভৃতিও নিহত হইয়াছে। সংবাদপত্রের হিসাব হইতে জানা যায়,



দাঙ্গার কয়দিন পরে একটি বাজারে খাদ্যান্বেষী জনতার ভীড়

ফটো—পান্না সেন

কমপক্ষে অন্ততঃ ১৫ হাজার লোক কলিকাতার দাঙ্গায় হতাহত হইয়াছে। খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান স্থানে হাজার হাজার হিন্দু মরিয়াছে—এখনও ভয়ে ঐ সকল অঞ্চলে হিন্দুরা যাইতে সাহস করে না।

অবশ্য সকল হিন্দু মুসলমানই যে দাঙ্গার সময় পশু-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। বহু মুসলমান পরিবারকে হিন্দুরা আশ্রয় দান করিয়াছিল ও বহু মুসলমান পরিবারে হিন্দুরা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। বীডন স্কোয়ারের নিকট যেমন হিন্দুদের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া মুসলমান পরিবারগুলি রক্ষা পাইয়াছে, ছকুখানসামা লেনে তেমনই এক মহাপ্রাণ মুসলমানের চেষ্টায় বহু হিন্দু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

কলুটোলা, ক্যানিং ষ্ট্রীট, বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কড়েয়া, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, মৌলালি প্রভৃতি স্থানে বহু ধনী হিন্দুর গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ হয় ত কয়েক কোটি টাকা হইবে। কলেজ ষ্ট্রীটের বাজারের মত স্থানে যে ভাবে দোকানগুলি পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ হইতে হিন্দুরা হিন্দুদিগকে ও



কলেজ ষ্ট্রীটে অগ্নিদগ্ধ ডালিয়া ফটো—পান্না সেন

মুসলমানেরা মুসলমানদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে রক্ষার ব্যবস্থা করে। সেজন্য কলিকাতার প্রায় সকল স্কুল ও কলেজ বাড়ীগুলি ব্যবহার করা হয়। এখনও লোকজন ভয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই—কাজেই কলিকাতার সকল স্কুল কলেজ পূজার ছুটী পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হইয়াছে, ১৪ই অক্টোবর স্কুল কলেজ খুলিবে। সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দুস্থগণকে অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি দানের বিপুল ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এখনও সে সকল সমিতির কাজ চলিতেছে। ২৫শে আগষ্ট বড়লাট কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতার অবস্থা নিজে



কলিকাতার রাজপথে
দাঙ্গাজনিত
মৃত্যুলীলা
ফটো—পান্না সে



একটি দগ্ধপ্রায়
মোটর লরী
ফটো—পান্না সেন



হত্যালীলার অপর
মর্মন্তুদ এক দৃশ্য
ফটো—পান্না সেন



কলিকাতার রাজপথে
শবের দৃশ্য
ফটো—পান্না সেন



'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিনে
কলিকাতার পথে
পথে অগ্নিলীলা
ফটো—পান্না সেন



কলিকাতার পথ
মিলিটারী পাহারাধীন
ফটো—পান্না সেন

দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি দমদম বিমানঘাঁটি হইতে মোটরে বাহির হইয়া দুই ঘণ্টা কাল সহর ঘুরিয়া তবে লাটপ্রাসাদে গিয়াছিলেন এবং সোমবার সকল দলের নেতাদের সহিত



ঢাকা বাড্ডা-নগর নট্র পাড়ার লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত অবস্থা

ফটো—মডার্ণ ইলেক্ট্রো ষ্টুডিও

এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। দাঙ্গা সম্বন্ধে তদন্তের জন্ম শীঘ্রই এক কমিটী নিয়োগ করা হইবে। কমিটীতে একজন শ্বেতাঙ্গ, একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান



সোনারটুলির (নবাবগঞ্জ, ঢাকা) শীতলা মন্দিরের ধ্বংসাবস্থা

ফটো—মডার্ণ ইলেক্ট্রো ষ্টুডিও

হাইকোর্ট জজ সদস্য থাকিবেন। দাঙ্গার পর ২৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও এখন পর্য্যন্ত সান্ধ্য আইন জারি আছে—কলিকাতা সহরের রাজপথে সন্ধ্যার পর লোক চলাচল করে না। সহরের পথ হইতে আবর্জ্জনা সরানো হয় নাই—রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থাও হয় নাই। সহরের অধিকাংশ দোকান এখনও বন্ধ—বড়বাজারে যাইতে লোক সাহস করে না—মুর্গীহাটার বাজার খুলে নাই। এখন এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঙ্গালার মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঢাকায় ভীষণ দাঙ্গা চলিতেছে। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, পাবনা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান জেলাগুলিতে হিন্দুর গৃহ ও বাজার লুঠ হইতেছে এবং হিন্দু অধিবাসীরা নিহত হইতেছে। দুর্গা পূজার আর অধিক বিলম্ব নাই—পূজা বাড়ীগুলি কি ভাবে রক্ষা করা হইবে, তাহা ভাবিয়া হিন্দুরা শঙ্কিত হইতেছেন।



নবাবগঞ্জের একটি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত মুদীর দোকান

ফটো—মডার্ণ ইলেক্ট্রো ষ্টুডিও

এমন কথাও প্রকাশ পাইয়াছে, যে মিঃ চার্চ্চিলের সহিত মিঃ জিন্নার পত্রালাপের ফলে মিঃ জিন্না-শাসিত মুসলেম লীগ এইভাবে বৃটীশ মন্ত্রীমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে সাহসী হইয়াছে। অথচ একদিকে মিঃ চার্চ্চিল মিঃ জিন্নাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিলেও প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলীর নির্দ্দেশে ভারতে লীগকে বাদ দিয়াই বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদ গঠন করিয়াছেন। কাজেই বৃটীশ রাজনীতিকদের অধিকাংশই যে এখন কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিয়া ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে উৎসুক তাহা নূতন শাসন-পরিষদ গঠনের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য বাঙ্গালার লীগ সচিবসংঘ, বিশেষ করিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী যে দায়ী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অথচ কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়

দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও সচিবসংঘের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-পরিষদে কিছু করিবেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন ২রা সেপ্টেম্বরের স্থলে ১২ই সেপ্টেম্বর হইবে—সেদিন বর্ত্তমান লীগ সচীবসংঘের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র উপর্য্যুপরি ৩দিন ধরিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে বড়লাটকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—বাঙ্গালায় তিনি যেন লীগ-সচিবসংঘ ভাঙ্গিয়া দিয়া ৯৩ ধারা প্রয়োগের দ্বারা স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন—কিন্তু এখনও সে বিষয়ে কিছু হয় নাই।

লীগ সচিবসংঘ বাঙ্গালার শাসন কার্য্যে সর্ব্বত্র হিন্দুদের প্রভুত্ব খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা



নবাবগঞ্জের অপর একখানি মুদীর দোকানের লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত অবস্থা ফটো—মডার্ণ ইলেক্ট্রো ষ্টুডিও

পুলিসে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিভাগেই দুইজন মুসলমান ডেপুটী কমিশনার কাজ করিতেছেন। মফঃস্বলেও যেখানে হিন্দু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা নির্ব্বিবাদে লীগের নির্দ্দেশ না মানিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছেন, সেখানে তাঁহাদের সরাইয়া মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইতেছে।

গভর্ণরের এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকিলেও তিনি তাহা না করায় তাঁহার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতায় ১৬ই আগষ্ট দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর যদি কড়া ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে এত অধিক ও ব্যাপকভাবে দাঙ্গা বাড়িতে পারিত না। কিন্তু গভর্ণর তাহা না করায় সর্ব্বত্র তিনি নিন্দিত হইয়াছেন। ষ্টেটসম্যানের মত শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রও গভর্ণরকে এজন্য যথেষ্টভাবেই দোষী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

দাঙ্গার পর ২০।২৫ দিন অতিবাহিত হইলেও কলিকাতার পথে গোপনে ছুরি মারা চলিতেছে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার একদিনে সহসা ৩জন নিহত ও ২৫জন আহত হওয়ায় সহরের চাঞ্চল্য ও ভীতি দূর হয় নাই। ২।৪টা ছোরা মারার সংবাদ প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশে হিন্দুকে বাদ দিয়া মুসলমানের বা মুসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুর বাস করা সম্ভব নহে। যতদিন না প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক মুসলমান একথা বুঝিতে পারে, ততদিন হাঙ্গামা বন্ধ হইবে না। সেজন্য এখন প্রবলভাবে আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালার একদল মুসলমান সাধারণতঃ বেপরোয়া ও হঠকারী—সেজন্য অতি সহজে হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। তাহার ফলে মুসলমানই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

হিন্দু এবার সংঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে ও আক্রমণের পর প্রতি-আক্রমণ করিতে অগ্রসর হওয়ায় কলিকাতার দাঙ্গা অধিক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তিচর্চ্চায় মনোযোগী হইতে শিক্ষা করা উচিত। শুধু সহরগুলিতে নহে, গ্রামগুলিতেও যুবকগণকে এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। না খাইয়া বাঙ্গালী স্বভাবতঃ হীনবল হইয়া যায়। যদি তাহা সত্ত্বেও তাহারা শক্তিচর্চ্চায় মনোযোগী হয়, তবেই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। নচেৎ মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তাহাদের উপায়ান্তর নাই।

আলিপুর জেলে বন্দীদের মুক্তি—

প্রাক্‌শাসন সংস্কার যুগের নিম্নলিখিত ৭জন রাজবন্দী গত ১৪ই ভাদ্র মুক্তিলাভ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, ওয়াটসন্ গুলী-করা মামলার সুনীল চট্টোপাধ্যায়, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুলী-করা মামলার নলিনী দাস, টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার প্রফুল্ল সেন, চরমুগরিয়া ডাক লুঠ মামলার সুরেন কর, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট ডাকাতি মামলার সুরেশ দাস ও রাজপুর ষড়যন্ত্র মামলার রামচন্দ্র বক্সী।

কলিকাতায় অভূতপূর্ব্ব হরতাল—

গত ২৯শে জুলাই সোমবার ডাক, তার, টেলিফোন ও আর-এম-এস কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটের প্রতি সমগ্র জাতির সহানুভূতি প্রকাশের জন্য কলিকাতা ও নিকটস্থ শিল্পাঞ্চলে যে ব্যাপক ধর্ম্মঘট ও সাধারণের স্বতস্ফূর্ত্ত ও শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয় কলিকাতা ও বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার আর তুলনা মিলে না। ঐদিন কলিকাতায় ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা, গরু মহিষাদির গাড়ী—কোনরূপ যানবাহনই রাজপথে দেখা যায় নাই। হিন্দু, মুসলমান, এংলো-ইণ্ডিয়ান, জৈন, শিখ, খৃষ্টান বা এসিয়াবাসী অগণিত দোকানের মালিকও হাটবাজার সব বন্ধ রাখেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বঙ্গীয় কমিটীর নির্দ্দেশ মত সকল কারখানার শ্রমিক কাজ বন্ধ করিয়াছিলেন। সকল দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ ছিল এবং রাত্রিতে কোথাও আলো জলে নাই। এমন শান্তিপূর্ণ হরতাল পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।



ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাক, তার ও আর-এম-এস ধর্ম্মঘটী কর্ম্মচারীদের সম্মিলিত আলোচনা ফটো—পান্না সেন

মুক্ত রাজবন্দী দল—

১৮ জন রাজবন্দী বহু বৎসর যাবৎ ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আটক থাকার পর গত ৩১শে আগষ্ট মুক্তিলাভ করিয়া ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাহাদের নাম—শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, সুখেন্দু দস্তিদার, লালমোহন সেন, সীতানাথ দে, বিরাজ দেব, অমূল্য রায়, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, সুকুমার সেন, সহায়রাম দাস, কামাখ্যা ঘোষ, জিতেন গুপ্ত, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, প্রভাত চক্রবর্ত্তী, মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী, সুবোধ চৌধুরী, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী। শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও—

মুর্শিদাবাদ লালগোলার মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও গত ১৮ই আগষ্ট ১০৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এক মাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন



মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও

করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স ১০০ বৎসর পূর্ণ হইলে দেশবাসী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পৌত্র রাজা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রাও বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বজনপরিচিত। তিনি শুধু দানশীলতার দ্বারা নহে, তাঁহার অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু নাটক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রথম জীবন হইতেই সাহিত্যপ্রীতি ও দানশীলতার জন্য সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। বহরমপুর হাসপাতালে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহার প্রদত্ত অর্থে অসংখ্য পুষ্করিণী, কূপ ও ইন্দারা খনিত হইয়াছে ও বহু পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে। কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির মহারাজার দানে নির্ম্মিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার এই সুদান কল্যমগ সুন্দ জীবা তাঁহার পুণ্যের পরিচায়ক। তিনি জীবনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এ দেশে ক্রমে তাহা দুর্লভ হইতেছে।

কুমারী লীলা রায়—

স্কটিস চার্চ কলেজের ছাত্রী বিভাগের ব্যায়াম পরিচালিকা কুমারী লীলা রায় বি-এ, বি-টি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের



কুমারী লীলা রায়

বৈদেশিক বৃত্তি পাইয়া মেয়েদের ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যচর্চা সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষার্থ দুই বৎসরের জন্য বিদেশে যাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি উইমেনস ইণ্টার কলেজিয়েট এথলেটিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হইয়াছেন। কুমারী লীলা নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী।

পরলোকে ভবানীচরণ লাহা—

বাংলার স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী, সুকুমার শিল্পকলার একনিষ্ঠ সাধক ও রসবেত্তা, দানে মুক্তহস্ত ভবানীচরণ লাহা গত ১৭ই ভাদ্র ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা



ভবানীচরণ লাহা

ঠনঠনিয়াস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। "ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব ফাইন আর্টস", "আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি-একজিবিশন" প্রভৃতি বহু শিল্পকলা ও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের চারুকলা বিভাগের তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং "গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট" ও "ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের" তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। "সোসাইটী অব অরিয়েণ্ট্যাল আর্টসের" তিনি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, "কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির" সহঃ সভাপতি, সিংহলের রিলিফ সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট এবং "রূপযানি" নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটীর "ফেলো" ও

"রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের" সভ্য ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় তাঁহার অঙ্কিত 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' ও পরে তাঁহার আরও বহু ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা ললিত কুমারী চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী তাঁহার অর্থানুকূল্যে সুপরিচালিত হইতেছে। তাঁহার বিশাল জমিদারীতে আমিরাবাদ ভবানীচরণ লাহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেশে জ্ঞান বিস্তারের সুবিধা করিয়া গিয়াছেন। ধনকুবের হইয়াও তিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত মিশিতেন ও তাহাদের অভাব দুঃখ রোগ শোকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতেন।

পরলোকে খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—

হাওড়ার খ্যাতনামা এডভোকেট ও কংগ্রেসকর্ম্মী খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার সালকিয়া



খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন, একবার ভাইসচেয়ারম্যানও হইয়াছিলেন ও খুব দক্ষতার সহিত মিউনিসিপ্যালিটীর কাজকর্ম্ম চালাইতেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের একজন সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে গাঙ্গুলী মহাশয় হাওড়া বার-এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত খুব ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পরলোকে প্রমথ চৌধুরী—

বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় গত ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯টায় কলিকাতা বালীগঞ্জে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পাবনা জেলার হরিপুর তাঁহাদের পৈতৃক বাসভূমি—তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং এম-এ, বার-এট্-ল হইয়া ১৮৯৭ সালে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতারাও সকলেই খ্যাতিমান লোক।



প্রমথ চৌধুরী

সার আশুতোষ চৌধুরী, কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ব্যারিষ্টার ও শিকারী কুমুদ নাথ চৌধুরী, মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল মন্মথনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ চৌধুরী প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রমথনাথ ১০ বৎসর সবুজপত্রের সম্পাদক ও কয়েক বৎসর বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন ও ১৯৩৮ সালে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে

'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক মাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইন্দিরা দেবীও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা।

প্রমথনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে নূতনধারা প্রবর্ত্তন করেন—সেজন্য তাহার নাম হয় 'বীরবল'। প্রমথবাবু আইন ব্যবসায় মন না দিয়া প্রবন্ধ রচনায় মন দেন ও সেজন্য অল্পকাল মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। সবুজপত্র প্রকাশ করিয়া তিনি এক নূতন সাহিত্যিক দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সে দলের সদস্যগণ অনেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্য খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। কয়বৎসর পূর্ব্বে দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ব্যারিষ্টার মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত দাঙ্গার সময় ১৭ই আগষ্ট পথে একটি বালককে রক্ষা করিতে যাইয়া গুণ্ডার দ্বারা নিহত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর ছিল—কয়বৎসর ব্যারিষ্টারী করার পর তিনি সম্প্রতি অতিরিক্ত জেলা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

রাজগীর রামকৃষ্ণ-সারদানন্দ সেবাশ্রম—

বিহার প্রদেশে যে রাজগৃহে এক সময়ে মহারাজা জরাসন্ধ ও বিম্বিসারের রাজধানী ছিল, এখন তাহা এক স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত হইয়াছে। রাজগীরের উষ্ণ প্রস্রবণের জল স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের বিশেষ উপযোগী। ঐ স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য স্বামী কৃপানন্দ তথায় রামকৃষ্ণ-সারদানন্দ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মশালা, মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। দুই বিঘা জমীর উপর আশ্রম গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানটি পাটনা জেলার মধ্যে, প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েক মাইল দূরে। যাতায়াতের বেশ সুবিধা আছে। স্বামীজী তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য দেশবাসী সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য কামনা করেন।

এসো স্বাধীনতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এসো স্বাধীনতা—হয়েছে আসার ক্ষণ,
বিলম্ব আর কেন কর অকারণ ?
　লোকে বলে শুনি ভালবাস নাকি তুমি ?
　নরের রক্তে সদ্য ধৌত ভূমি,
রক্তেতে চাই ডোবা তব শ্রীচরণ।

২

ধ্বংসের লীলা চলেছে নগরী ব্যেপে,
শত নর-নারী মুণ্ড পদক্ষেপে,
　যাহা চাও তুমি তাহার অধিক পাবে,
　ছিন্ন শিশুর অঙ্গ যে দিকে চাবে,
কঠিন কঠোর পথে তব আগমন।

৩

সময় হয়েছে দেরী করিয়োনা আর,
শোণিত পিপাসা মিটেছে চামুণ্ডার।
　মরেছে হিন্দু মরেছে মুসলমান,
　মারণ যজ্ঞে কম নয় কারো দান,
দেছে ঘৃণা, ভয়, লজ্জা বিসর্জ্জন।

৪

তুমি লয়ে এসো পুণ্য অরুণ রাগ—
ধুয়ে মুছে দাও সব রক্তের দাগ,
　কর বিশুদ্ধ, নবীন জীবন দাও,
　দাও দেবত্ব—পশুত্ব ফিরে নাও,
মনুষ্যত্বে কর সমৃদ্ধ মন।

৫

পুনঃ কুৎসিত বীভৎসে কর সৎ,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শান্ত-রসাস্পদ।
　সুপথে তাদের ফিরাইয়া দাও মতি,
　কর উন্নত জগৎহিত ব্রতী,
এ দেশ হউক তোমার পদ্মাসন।

খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট ঃ

ভারতীয় দল ঃ ৩৩১

ইংলণ্ড ঃ ৯৫ (৩ উইকেট)

বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং ড্র ব'লে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় বনাম ইংলণ্ডের তৃতীয় টেষ্টম্যাচ ১৭ই আগষ্ট শনিবার কেনিংটন ওভাল উদ্যানে আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড দলে ফিসলক এবং এডরিচ মনোনীত হওয়ায় ইংলণ্ডের ব্যাটিং দিকটা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হ'ল। ভারতীয় দলের ক্যাপটেন টসে জয়লাভ ক'রে দলকে ব্যাট করতে পাঠালেন। খেলা আরম্ভ হ'ল অনেক দেরীতে—নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। কোন উইকেট না হারিয়ে ভারতীয় দলের ৭৯ রান উঠলে পর প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় দলের মোট ৯৪ রানে মুস্তাক আলী ৫৯ রান ক'রে রান আউট হলেন। মুস্তাক আলীর খেলার বিশেষত্ব দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। এর পর খেলার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই—পতৌদি, অমরনাথ এবং হাজারী যথাক্রমে ৯, ৮ ও ১১ রান ক'রে হতাশ করলেন। লাঞ্চের সময় চার উইকেট পড়ে গিয়ে ভারতীয় দলের ২০১ রান উঠেছে। মার্চ্চেণ্ট চার ঘণ্টা ধরে ব্যাট করেছেন কিন্তু এডরিচ ও বেডসার তাঁকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছেন। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রানে শেষ হ'ল। ভি এম মার্চ্চেণ্ট ১২৮ রান ক'রে রান আউট হন। মানকাদ ৪২ রান করেন; সোহনী ২৯ রানে নট আউট থাকেন। এডরিচ ১৯·২ ওভার বল দিয়ে ৪টা মেডেন নিয়ে ৬৮ রানে ৩টে উইকেট পান। বেডসার ৩২ ওভার বলে ৬০ রানে ২টো উইকেট পেলেন।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল। ৬৬ রানে তিনটে উইকেট পড়ে গেল। হাটন, ওয়াসব্রুক এবং ফিসলক যথাক্রমে ২৫, ১৭ ও ৮ রান ক'রে আউট হ'লেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের তিন উইকেটে ৯৫ রান উঠলে পর খেলা সেদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

তৃতীয় দিনে আর খেলা হ'ল না খেলার উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে এবং বৃষ্টির জন্য। আবহাওয়া এরকম খারাপ না হ'লে ভারতীয় দলের এ খেলায় জয়লাভের যথেষ্ট কারণ এবং আশা ছিল বলে অনেক বিচক্ষণ ক্রীড়ামোদী মনে করেন। তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের এই মোটা রান সংখ্যার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব মার্চ্চেণ্টের এবং সমস্ত সম্মানই তাঁর প্রাপ্য। তাঁর ১২৮ রান ইঙ্গ-ভারতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের পূর্ব্ব রেকর্ড ১০ রানে ভেঙ্গেছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে জার্ডিন দলের সঙ্গে খেলায় অমরনাথ ১১৮ রান ক'রে ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম রেকর্ড করেন। মার্চ্চেণ্টের ১২৮ রানের মধ্যে বাউণ্ডারী ছিল পনেরটা এবং তিনি পাঁচ ঘণ্টাকাল উইকেটে খেলেছিলেন। মার্চ্চেণ্টকে ১২৮ রানে বিখ্যাত ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফুটবল খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন রান আউট করেন। এ 'রান-আউটে' বেশ অভিনবত্ব আছে। প্রকৃতপক্ষে ডেনিস কম্পটন বাঁ-পায়ে বলটি সট ক'রে গোল করেন, যার ফলে মার্চ্চেণ্ট আউট হ'ন। এ ঘটনা হয় ভারতীয় দলের ২৭২ রানের মাথায়। মানকাদ একটা বল মেরেছেন মিড-অনের ফাঁকা জায়গায়। মার্চ্চেণ্ট একটা রান নেবার জন্যে দৌড়ান আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন কিন্তু মানকাদ তাঁকে পিছিয়ে যেতে বলেন; এদিকে হাত দিয়ে বলটি তুলে ছুঁড়ে মেরে রান আউট করার সম্ভাবনা কম দেখে ডেনিস কম্পটন বলটি বাঁ পা

দিয়ে 'first time shot' করলেন; বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়ের এ লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল না, বলটি উইকেটে গিয়ে মার্চ্চেণ্টকে আউট করলো। ক্রিকেট খেলায় এই ভাবের রান আউট সত্যিই অভিনব! মার্চ্চেণ্ট এই টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে রেকর্ড রান স্থাপন করলেও তাঁর খেলায় মাঝে মাঝে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল এবং কোন কোন সময়ে তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন হ'তে হয়েছিল। এবারের এই 'টুরে' মার্চ্চেণ্ট ইতিমধ্যেই নিজস্ব ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন এবং মোদী তাঁর ১০০০ রান করেছেন। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং খুবই উঁচুদরের হয়েছে। এডরিচ নতুন টেষ্টে নেমে ভালই খেলেছেন।

এবারের অভিযানে ভারতীয় বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র হওয়ায় এবং তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ বৃষ্টির জন্য বন্ধ হওয়ায় ইংলণ্ড প্রথম টেষ্টের জয়লাভের উপর 'রবার' লাভ করলো।

ওয়ারউইকসায়ার: ৩৭৫ (৯ উইকেটে ডিক্লে:)
ভারতীয় দল: ১৯৭ (মার্চ্চেণ্ট ৯৩ নট আউট) ও ২১ (১ উইকেট)। খেলা ড্র যায়।

গ্রিফিথ শীল্ড ঃ

গত বছরের গ্রিফিথ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান দলকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছর শীল্ড বিজয়ী হয়েছে।

মহিলার সন্তরণ রেকর্ড ঃ

নেল ভ্যান ভ্লায়েট নামক ডাচ মহিলা ১০০ মিটার ব্রেক ষ্ট্রোক সন্তরণে উক্ত দূরত্ব ৭৯.৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর মহিলাদের মধ্যে নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ৭৯.৮ সেকেণ্ড, গিসিয়া গ্রাস নামক জার্মান মহিলার, ১৯৩৩ সালে।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

আই এফ এ শীল্ডের খেলা গত ২৫শে জুলাই থেকে আরম্ভ হয়েছে। মোট ৪৭টি ফুটবল টীম প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। বর্ত্তমানে শীল্ডের চতুর্থ রাউণ্ডে খেলা হবে ইষ্টবেঙ্গল বনাম জর্জ্জটেলিগ্রাফ; ভবানীপুর বনাম মোগল-ট্রেডস ইণ্ডিয়া (বোম্বাই) দলের বিজয়ী দল; মহমেডান স্পোর্টিং বনাম বি-এ-রেলওয়ে; মোহনবাগান বনাম ত্রিপুরা পুলিশ। গত ১৬ই আগষ্ট থেকে ক'লকাতায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য ফুটবল খেলা স্থগিত আছে এবং পুনরায় এ বছর ফুটবল খেলা হবে কিনা এখনও আই এফ এ কিছু স্থির করে উঠতে পারেনি। এদিকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা ক'রে মোগল এ সি, ট্রেডস ইণ্ডিয়া (বোম্বাই) এবং ত্রিপুরা পুলিস নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেছে। এই তিনটি দল যদি আর খেলায় যোগদান না করে এবং আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষ যদি শীল্ডের খেলা পুনরায় আরম্ভ করেন তাহলে ভবানীপুর এবং মোহনবাগানদল 'ওয়াকওভার' পেয়ে সেমিফাইনালে উঠবে। খেলা আরম্ভ হলেও শীল্ড খেলার উপর জনসাধারণের আগ্রহ অনেক কমে গেছে। শীল্ডে বাইরের দলের মধ্যে খাজানা ক্লাবই এরিয়ান্সকে খেলার দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২-০ গোলে হারিয়ে ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দলটি তৃতীয় রাউণ্ডে ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে মাত্র ১-০ গোলে পরাজিত হয়। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় খাজানা ক্লাব খেলার প্রথম দিকে যে পরিমাণ গোল করবার সুযোগ পায় তার কয়েকটি কাজে লাগলে খেলার অবস্থা অন্য রকম হয়ে যেত। ইষ্টবেঙ্গল দলও কয়েকটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করে। বাইরের দলের মধ্যে ২৪পরগণা জেলা এসোসিয়েশনের টীম শীল্ডে ভাল খেলেছে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ট্রেডস ইণ্ডিয়া দলের সঙ্গে তারা ২-০ গোলে পরাজিত হলেও তাদের অগৌরবের কিছু নেই। ট্রেডস ইণ্ডিয়া নামকরা টীম। ২৪পরগণা দলের সকলেই তরুণ খেলোয়াড়; নামকরা দলের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলে তারা আরও ভাল খেলতে পারতো এবং খেলার ফলাফল বিপরীত হ'লে আশ্চর্য্যের কিছু হ'ত না। ২৪পরগণা দল যে দুর্ভাগ্যের জন্য হেরেছে একথা সেদিনের মাঠের দর্শকমাত্রেই স্বীকার করবেন। বিপক্ষের গোলে বল নিয়ে গিয়ে গোল করবার বহু সুযোগ তাদের ফরওয়ার্ডের খেলোয়াড়রা নষ্ট করেছে। ট্রেডস ইণ্ডিয়া দলের খেলা দর্শকদের হতাশ করেছিল।

ঢাকার ওয়ারী ক্লাব অনেক দিনের; শীল্ড না পেলেও শীল্ডের খেলায় পূর্ব্বাপর বছর এই দলটি বেশ ভালই খেলে গেছে। কিন্তু এবছর এই দলটি মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। তৃতীয় রাউণ্ডে ক'লকাতার দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দলের কাছে ৪-০ গোলে

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এক কথায় ওয়ারী ক্লাব দাঁড়াতেই পারেনি।

সি-এম-পি (মিলিটারী পুলিশ) তৃতীয় রাউণ্ডে ভবানীপুরের কাছে রেফারীর ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। স্থানীয় ইউরোপীয় কোন দলই এবার শীল্ডের দ্বিতীয় রাউণ্ড পর্য্যন্ত পৌছতে পারেনি।

দীর্ঘতম টেনিস খেলা ঃ

বিলি টালবার্ট ও গার্ডনার মুলোয় ৩-৬, ৬-৪, ২-৬ ৬-৩ ২০-১৮ সেটে ডোনাণ্ড ও'নীল ও ফ্রাঙ্ক গির্ণসেকে পরাজিত ক'রে আমেরিকান লন টেনিস ডবলস চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন।

এই খেলাটি আমেরিকায় ডবলস খেলার ইতিহাসে সব থেকে দীর্ঘ সময় নিয়ে ছিল বলে প্রকাশ।

সাঁতারে পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

ডাচ মহিলা সাঁতারু নেল ভ্যান ভ্লায়েট ২০০ গজ ব্রেষ্ট ষ্ট্রোকে উক্ত দূরত্ব ২ মিঃ ৩৫·৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে মহিলাদের মধ্যে পৃথিবীর নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল হলাণ্ডের, ১৯৩৯ স্থানে স্থাপিত ২ মিঃ ৪০·৩ সেকেণ্ড।

সুইডিশ এ্যাথলেটদের কৃতিত্ব ঃ

ইউরোপীয়ান ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিণ্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার দশটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টিতে সুইডেন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং ১৭৪ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ৯৬ পয়েণ্ট পেয়ে ; তৃতীয় হয়েছে ফ্রান্স ৮০ পয়েণ্ট নিয়ে ; ফিনল্যাণ্ড ৭০, গ্রেট বৃটেন ৬৮, নেদারল্যাণ্ড ৭৮, নরওয়ে ৩৯, ডেনমার্ক ৩৬, ইটালী ২৮, চেকোস্লোভাকিয়া ২২, সুইজারল্যাণ্ড ১৯ এবং পোলাণ্ড ১১ পয়েণ্ট পেয়েছে।

ইংলণ্ডের ক্যাপটেন বিল রবার্টস এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত খ্যাতি লাভ করেছেন। এ্যাথলেট হিসাবে ফিনিসদের যে সম্মান ছিল তা আজ হারাতে বসেছে, সে স্থানে সুইডিস এ্যাথলেটরা অগ্রগামী হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাটির ষ্ট্যাণ্ডার্ড পৃথিবীর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সমান সুতরাং ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিলাতে ফুটবল খেলোয়াড়গণ ঃ

বিলাতের ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে। সেখানের ফুটবল খেলোয়াড়রা ইউনিয়ন মারফৎ দাবী জানিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিকের হার তাদের দাবী মত বৃদ্ধি না হ'লে ফুটবল খেলা থেকে বিরত থাকবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ বিজ্ঞান" (২য় খণ্ড)—৩৲
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত "আনন্দ মঠ"—১৷০,
"কপালকুণ্ডলা"—১৷০
ভারতী মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চিরন্তনী"—১৷০,
"ঘটনা প্রবাহ"—৩৲
শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "গল্প, গল্প নয়"—২৷৷০
সমরেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "নিয়তির শাসন"—৷৷৵০
ইনডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট-প্রকাশিত "বঙ্গীয় মহাকোষ" (৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা)—১৲
শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "কবি কামিনীকুমারের সঙ্গীত"—৷৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযজ্ঞেশ্বর সাহা

দুর্গম পথের যাত্রী

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



কার্ত্তিক—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

সুলতানা

নরেন্দ্র দেব

আমি ছিনু দিল্লীর সুলতানা,
নারীর দুর্ভাগ্য সে যে কতবড়—নাহি ছিল জানা।
সসাগরা ভারতের একছত্র শাসনাধিকার
করতলগত ছিল একদা আমার !
বিজয়িনী সাম্রাজ্ঞীর বেশে বসিতাম গর্ব্বোদ্ধত মনে
দিল্লীর দুর্লভ সিংহাসনে।

দিল্লী যার ইতিহাসে লেখা কত সভ্যতার উত্থান পতন,
পুরাণের চেয়ে যার প্রাচীন কাহিনী পুরাতন ;
বিগত হস্তিনাপুরে, অতীতের ইন্দ্রপ্রস্থে, কে খুঁজিছে আজ—
কত রাজা—মহারাজা—রাজ-অধিরাজ—
চক্রবর্ত্তী নৃপতির দিগ্বিজয় হয়েছিল গৌরবে অঙ্কিত ?
প্রতি ধূলিকণা যার বারে বারে হয়েছে শঙ্কিত
বৈদেশিক আক্রমণে-শাসনে—লুণ্ঠনে !
রাজেন্দ্রনন্দিনী কত, কত রাজমহিষীর রহস্য গুণ্ঠনে
নৈশ-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, প্রেম, হত্যা আর হরণের রোমাঞ্চ-কাহিনী !
পাঞ্চাল—কোশল—কাঞ্চি—শূরসেনা—বিদেহ-বাহিনী
আর্য্য অনার্য্যের রক্তে আরক্ত করেছে এর পথ ;
রেখে গেছে অস্ত্র-লেখা, বক্ষে তার চক্ররেখা
বিজয়ীর রথ।
আসিয়াছে শক, হুন, আসিয়াছে বীর্য্যবান গ্রীক,
এসেছিল শৌর্য্যমত্ত শা'-নামাই শের-ই পারসিক।
উত্তর-পশ্চিম চীন হ'তে
এসেছিল সোনার ভারতে
ইউচি কুষাণ,
কণিষ্ক একদা যেথা হয়েছিল মহাকীর্ত্তিমান ?

ইরাকের বীন কাশেম, মদগর্ব্বী গজনীর মামুদ,
ভারত সাগরে তুলি ক্ষণিকের অস্থায়ী বুদ্বুদ
কালের বিস্মৃতি গর্ভে মিলায়েছে আজ ;
দেশভক্ত মহাবীর কোথা সে নির্ভীক পৃথ্বীরাজ ?
কোথা সেই জয়চন্দ্র—উচ্চ-অভিলাষী স্বার্থপর ?
মানুষের কীর্ত্তি তার জীবনেরই অনুরূপ
ক্ষণস্থায়ী একান্ত নশ্বর !
বিস্মৃত মহম্মদ ঘোরী, কুতবের স্মৃতি শুধু
বহিতেছে কুতব-মিনার ;
খতম খল্‌জিবংশ, সৈয়দ, তুঘলুক, লোদী—
গল্প কথা সার !
দুর্দ্দান্ত মোগল দস্যু চেঙ্গিজের শুব্ধ অভিযান,
কোথায় তৈমুরলঙ্ ? কোথা সব দুরন্ত পাঠান ?

আমি সেথা দিল্লীর সুলতানা !
ক্রীতদাসপুত্রী আমি দাসবংশে আমার ঠিকানা !
নহি কোনো বাদশজাদী—নবাবনন্দিনী,
দৈবচক্র—দিল্লীসাথে ভাগ্যসূত্রে করেছে বন্দিনী ;
আগে পাছে ফুকারে নকীব—আমি আজ দিল্লীর সুলতানা
হারেমের দ্বার হ'তে দরবারে আমারে
সুবর্ণ তাঞ্জামে তুলে আনা !
নারী হয়ে পুরুষের বেশে বসি হেসে তক্ত্‌তাউসে
আমার কুন্তলগন্ধ,অঙ্গের সুরভি খেলে নিয়ে বেহায়া বায়ু সে !
সারি সারি চারি ধারে নত হয় শত শির পরশি উষ্ণীষ,
দাঁড়াইয়া উঠি একসাথে, বারে বারে দুই হাতে
জানায় কুর্নিশ !
সারা নিশি শয্যাপার্শ্বে নিদ্রাহীন শত ক্রীতদাসী,
আমি যাহা নিতে চাই, আমি যাহা খেতে ভালোবাসি—
না সরিতে শ্রীমুখের বাণী
তখনি যোগায় তারা আনি।
মোর মনোরঞ্জনের তরে
অবিচ্ছিন্ন নৃত্যগীত চলিয়াছে অন্দর-আসরে।
নানা বাদ্য, নানা নাট্য, নব নব কৌতুকাভিনয়,
যাদুবিদ্যা, ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল অনুষ্ঠিত হয়।
মুক্তাভস্মে সেজে দেয় পান,
গোলাপ নির্যাসে আমি নিত্য করি স্নান,
মুকুর-মণ্ডিত সেই সুশীতল মর্ম্মর হামাম,—
ডুবাইয়া নগ্নতনু সুরভিত সলিলের বুকে
পাই সেথা পরম আরাম !

তারপরে চলে মোর দীর্ঘ দণ্ড প্রসাধন নানা।
আমি আজ দিল্লীর সুলতানা,
রূপদক্ষ শত সহচরী
চাঁচর চিকুরে মোর রচি দেয় চিকণ কবরী,
কি করিব বেশবাস, কি পরিব রত্ন অলঙ্কার ?
পেটিকা খুলিয়া তারা তুলিয়া শুধায় বার বার—
ফিরোজা, আশমানি কিংবা কিংখাবের সাজ,
কি চাও সুলতানা তুমি আজ ?
শেরওয়ানী—সালওয়ার চাই ? চাই কি গো
মিহি পেশোয়াজ ?
জহরৎ কি কি নেবে ? জড়োয়া না মোতি ?
জিন্দেগী দুনিয়া ভোর পুরুষের ঘটাতে দুর্গতি
কী সাজে সাজিবে আজ দিল্লীর সুলতানা ?
কত না খলিফা যারে ভালবেসে হয়েছে দেওয়ানা !
নিজামৎ পায়ে এসে পড়ে ;
অঙ্গুলী হেলনে যার রাজ্য ভাঙে গড়ে,
কত বীর সর্দ্দারের দম্ভভরা স্পর্ধার বুলিতে—
আঁখির ইঙ্গিত মাত্র ছিন্ন-শির লুটায় ধূলিতে !
কঠোর নির্মম শাস্তি কারো কারো দীর্ঘকাল চলে,
বন্দী রহে আজীবন মৃত্তিকার অন্ধকার তলে।
জীবন্ত সমাধি কারো নৃশংস শাসনে ঘটে লাভ !
জানি এর সবটাই অভিশপ্ত দিল্লীর প্রভাব।

উচ্ছল-যৌবনা আমি, অসামান্যা রূপসী তরুণী,
আমারে ঘিরিয়া আছে সাম্রাজ্যের সেরা যত গুণী।
রণবিশারদ কত মহাভুজ পরাক্রান্ত বলী,
চিত্রকর, নৃত্যশিল্পী, সুরস্রষ্টা, ভাস্কর্য্যকুশলী,
যন্ত্রবিশারদ কত, স্থপতি, সঙ্গীতবিদ, কবি,
আছে কত তত্ত্বদর্শী জ্ঞানবান দার্শনিক নবী ;
আমার করুণাপ্রার্থী, অনুগত তাহারা সবাই
চতুঃষষ্ঠী কলা আর সর্ব্ববিদ্যা শিখিয়াছি তাই।

অভাগা সে যার প্রতি জেগে ওঠে আমার বিরাগ,
ধরণীর পৃষ্ঠ হতে মুছে দিই তার জীবনের যত কিছু দাগ!
সমগ্র সাম্রাজ্যে নেই দুঃসাহসী হেন কোনো জন—
আমার আদেশ যার সাধ্য আছে করিতে লঙ্ঘন!
আজ্ঞাবহ ভৃত্যসম ছুটে আসে ওমরাহ, আমীর,
কোষমুক্ত অসি নিয়ে ছুটে আসে দিগ্বিজয়ী বীর,
নতশিরে মেনে নেয় নির্ব্বিবাদে আমার নির্দ্দেশ;
নতুবা সবাই জানে মুহূর্ত্তেই হবে তার শেষ!
আমি হাসি। গোলামের কন্যা আমি জানি—
এই স্বর্ণ সিংহাসনখানি
যে সম্মান দেয় মোরে আনি, সে নয় আমার;
নামে আমি দিল্লীশ্বরী, দিল্লী এই সিংহাসন যার।
আমার মুখের তাই একটি আদেশে—
ছুটে যায় লোকে দেশে দেশে,
সংগ্রহ করিয়া আনে যেখানে যা খুঁজে পায় দুর্লভ জিনিস
আমি শুধু হেথা অহর্নিশ
আনন্দে কাটাই কাল সুরা আর সঙ্গীতের সুরে,
দিল্লীর রহস্যময় শাহাজাদী বেগমের পুরে
বিচিত্র এ রঙমহল রমণীর রমনীয় দেশ
সুকঠিন চিরদিন পুরুষের এখানে প্রবেশ!
'পাঞ্জা' পায় শুধু যারা রূপের ঐশ্বর্য্যে ভাগ্যবান
সুলতানা পাঠায় যারে সানুগ্রহে গোপন আহ্বান!

পতঙ্গের মতো তারা বহ্নিশিখা পাশে আসে ছুটে,
কৃতার্থ হইয়া পড়ে পদতলে লুটে;
হীরক-মুকুতা-রত্ন খচিত এ পাদুকা চুম্বনে
ধন্য মানে আপন জীবনে!
আনে কত মূল্যবান মণি আভরণ,
কত দেশ, কত রাজ্য করিয়া লুণ্ঠন
এনে দেয় শ্রেষ্ঠ উপহার।
মোর প্রসন্নতা লাগি অসাধ্য বলিয়া যেন নাহি কিছু আর!

আমি জানি নারী আমি, জানি মনে আমি শুধু মেয়ে,
আমার খেয়াল খুশী চলে তবু ইচ্ছা মতো ধেয়ে।
সাধ্য কার বাধা দেয়, স্পর্দ্ধা কার কে করিবে মানা?
আমি আজ দিল্লীর সুলতানা!

আমার রূপের আকর্ষণে
আসে যারা কাছে ছুটে—জানি মনে মনে
নহে তারা মোর অনুরাগী,
আমার প্রেমের কণা লাগি
লক্ষ্য নয় তাহাদের দিল্লীর হারেম,
তারা চায়, তারা খোঁজে—সুলতানার প্রেম!
যে কোনও কঠিন মূল্যে জিনিতে উদ্যত তারা সুলতানার মন,
যাহার পশ্চাতে পাতা দিল্লীর দুর্লভ সিংহাসন!

আমীর—ওমরাহ যত—প্রধানেরা, নবাব, নিজাম,
সবার প্রেমের মূলে রাজদণ্ড বাঞ্ছিত ইনাম:
সুলতানার তুষ্টি আশে তারা
দুঃসাধ্য সাধনে হয় সারা!
দুঃসাহসী কাজে কারো নাহি ভয় লেশ;
যতই দুরূহ হোক আমার আদেশ
পালন করিতে কারো বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাহি জাগে!
সুলতানার কাজে যদি লাগে—
অমূল্য হলেও প্রাণ
অবহেলে দিতে পারে দান!

আমি আজ মহামান্যা দিল্লীর সুলতানা,
বাদশাহী এ অন্দরের একমাত্র স্বাধীন জেনানা!
আশে পাশে ঘোরে ফেরে শতাধিক বাঁদি,
আমার ইচ্ছায় আজ সোনা হয়ে ওঠে সীসা,
সোনা হয়ে ওঠে তামা চাঁদি।
সুলতানার কাজ শুধু অলস বিলাসে ডুবে থাকা।
হেলায় ময়ূরপঙ্খী পাখা
শতদাসী সুলতানার শ্রান্তি নিরসনে;
ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে—
আমি আজ দিল্লীর সুলতানা,
দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য কিছু আমারও যে হতে পারে
ছিলনা তা জানা!

দুর্দ্ধর্ষ হাবশী খোজা, মুরমল্ল, আফ্রিদি—মিশরী—
দুয়ারে জাগিয়া যার সারানিশি সশস্ত্র প্রহরী,
তারও যে হারাতে পারে কিছু, হতে পারে তারও সর্ব্বনাশ,
স্বপ্নে কিংবা কল্পনায়ও কোনোদিন করিনি বিশ্বাস!

যাহারে চেয়েছি আমি—হাসিমুখে দিয়েছে সে ধরা !
আমারে উপেক্ষা করা
ছিল মোর চিন্তার অতীত ;
ক্রোধে-ক্ষোভে-অপমানে-লাজে-হারায়েছি
সেদিন সম্বিত
যেদিন কাফের যুবা মোর প্রেম করি প্রত্যাখান
চলে গেল অনায়াসে চূর্ণ করি জীবনের আকাঙ্ক্ষিত ধ্যান,
নির্ভীক সুদৃঢ় কণ্ঠ, স্পষ্ট তার ভাষা—
আমারে বলিয়া গেল—সুলতানা কি জানে ভালবাসা ?

তবু তারে যেতে দিতে করিনি নিষেধ ;
নির্ব্বিচারে নিত্য যেথা চলিয়াছে হত্যা নরমেধ—
চলে গেছে সেথা হতে নিরাপদে লইয়া জীবন
হস্তীপদতলে দলি, ব্যাঘ্র মুখে করিনি অর্পণ,
পুরস্কার—তিরস্কার—ভাগ্য নিয়ে যেথা জুয়াখেলা—
বিদায় কে নেয় কবে অকস্মাৎ না-ফুরাতে বেলা,
সেই বধ্যভূমি হ'তে সে গিয়েছে অনাহত চলি !
মনে মনে আজ তাই বার বার বলি—
ওরে ক্রীতদাস পুত্রী ! কোথা পাবি সুলতানার মন ?
কালকূট ভুজঙ্গ-দংশন
যোগ্য শাস্তি প্রাপ্য ছিল যার,
কেমনে করিলি ক্ষমা অপরাধ তার ?
সুলতানার একি পরাজয় !
প্রেম কি গো মানুষেরে নিঃস্ব করি সব কেড়ে লয় ?
জ্বলে যায় মর্ম্মদাহে বুক, শিরে যেন বজ্র দেয় হানা ।
তবু মোর কাণে আজও বাজে তার ব্যঙ্গ জয়ধ্বনি
আকাশ বাতাস রণরণি—
'জিন্দাবাদ দিল্লীর সুলতানা !'

মনের প্রকৃতি ও ধর্ম্মভাব

রায়বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ইংরাজ কবি রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি একদা জগৎময় বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহার সারমর্ম্ম এই যে, প্রাচী ও প্রতীচের মধ্যে মস্ত ব্যবধানটির উপর সেতুবন্ধন অসম্ভব। কাব্যের রসাল উচ্ছ্বাসকে বাদ দিয়া জনৈক ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ্ এই মতবাদকে ব্যক্ত করিয়াছেন এমন ভাষায় যে, ঢাকাঢাকি নাই বলিয়া উহা বুঝিতেও কোন গোল নাই। এসিয়াবাসীর বর্ণনা দিয়াছেন তিনি এইরূপ : পীতবর্ণ, কৃষ্ণ কেশ, পিঙ্গল চক্ষু, চরিত্র ক্রুর ও অর্থগৃধ্নু, জাঁকজমক প্রিয়, লম্বা ঢালাও পোষাক পরিহিত ও প্রচলিত মতের অনুসরণকারী। পক্ষান্তরে ইউরোপিয়ানকে নানা গুণের অধিকারী ও সৌম্য প্রকৃতি বলা হইয়াছে। স্বজাতির রূপগুণের মনোরম চিত্র অঙ্কনে স্বাভাবিক দক্ষতা শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে দেশ-প্রেমের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু উহা যখন জাতি-বিদ্বেষের ঠুলি চোখে বাঁধিয়া অন্যজাতির গর্হিত নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, প্রচুর অনর্থের সূত্রপাত হয় তখনই—আর মানবতার উদার মঞ্চে বিশ্বমানবের মিলনের পথও তখন বন্ধ হইয়া যায়।

বস্তুত, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধার কুশলতা, সভ্যতার গঠন ও উৎকর্ষের উপকরণগুলি বর্ণ বা জাতিকে আশ্রয় করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নাই ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়। যে-সব প্রাচ্য জাতি আজ একটি হীন নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, একদিনে তাঁহারা ছিলেন জগত-সভ্যতার পুরোধা—কালের বৈচিত্র্য, অবস্থা ও আবেষ্টনের যোগাযোগ তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মগুলিকে সার্থকতার পথে ঠেলিয়া দিয়া মানুষের ব্যবহারিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হয় সত্য যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনোবৃত্তির মধ্যে কোন প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। অপর্য্যাপ্ত কৌতূহল উদ্যম উৎসাহ ইউরোপীয়দের মেরুমণ্ডল বা গৌরীশৃঙ্গ অভিমুখে অভিযান করিতে শিক্ষা দিয়াছে, বিজ্ঞানকে বিস্ময়ের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচ্য জাতির মন ধর্ম্মপ্রাণ—অলস মন্থর জীবনের কুল-কুণ্ডলিনীর পাকে স্বভাবত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। এই দুইটি বিভিন্ন মনোবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ অধ্যাপক জেমস্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত একটি পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। জনৈক তথ্যান্বেষী ইংরাজ কোন উচ্চপদস্থ তুর্কী রাজকর্ম্মচারীর নিকট তত্রত্য গৃহের ও নরনারীর সংখ্যা, আমদানি রপ্তানি, স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরে তুর্কী রাজপুরুষ লিখিলেন—এ-সব সংখ্যা নির্ণয় পণ্ডশ্রম মাত্র। হে আমার আত্মা, যে বস্তুর সঙ্গে তোমার কোন সংশ্রব নাই, তুমি তাহা কখনও অন্বেষণ করিও না। তুমি আসিয়াছ—স্বাগত। শান্তিতে আবার ফিরিয়া যাও। শোন বন্ধু, ঈশ্বরে বিশ্বাসই একমাত্র জ্ঞান। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি-তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার সমকক্ষ হইবার ব্যর্থ চেষ্টা

কেন? নক্ষত্রলোকের কোনটি কাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কোন ধূমকেতুর কত বছর পরে আবির্ভাব ও তিরোধান, এই তথ্যগুলি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তাঁহারই অদৃষ্ট হস্ত উহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবে।

তুর্কী ভদ্রলোকের উপরোক্ত চিঠিতে যে নিশ্চেষ্ট নির্ভরশীলতা, বিশ্বাসীর আত্মসমর্পণ, নিরুদ্যম নিরুৎসাহ প্রকাশ পায়, তাহাই প্রাচ্য জাতি-প্রকৃতির যথার্থ পরিচয়, ইহা মনে করা অত্যন্ত ভ্রম। যদি উহাই হইত, তাহা হইলে জাপান ও নব্য তুর্কীর অভ্যুদয় কখনও ঘটিতে পারিত কি? সোভিয়েট রাশিয়ার অধিকাংশ জাতি পূর্ব্বদেশীয়, ষ্টালিন নিজেও একজন জর্জিয়ান—এ প্রাচ্যজাতিগুলিও আজ বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে চলিয়াছে। পক্ষান্তরে, ইউরোপের সামন্তযুগে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সন্ধানের পথে, বিজ্ঞান-বাহিনীর সহিত সম-পাদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে, এমন নয়—বরঞ্চ ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের নির্যাতন, স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধের বর্ণনায় মসীকৃষ্ণ হইয়া আছে। ফল কথা, প্রতীচ্য জগতে এখন বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে, কিন্তু প্রাচ্যে অন্ধকার মধ্যযুগের অবসান আজও ঘটে নাই—অরুণোদয় সবে দেখা দিয়াছে মাত্র। এই অবসরে প্রতীচি জাতীয়তার পাত্রে বিজ্ঞানের উগ্র মদিরা পান করিয়া মত্ত হইয়া পড়িয়াছে—বিজ্ঞানকে আপন প্রকৃতিগত মনে করিয়া বিহ্বল কণ্ঠে মূঢ়দর্পে প্রচার করিতেছে, প্রাচ্য জাতির মন-প্রকৃতি এমনই অন্ধকার উপাদানে গঠিত যে বিজ্ঞানের রবি-রশ্মি সেখানে সন্তর্পণে চলিতেও পথ হারাইয়া বসে।

আজ এ-কথা বোধ করি গোপন নাই, বিজ্ঞান আমাদের দেশের চিন্তায় কর্ম্মে ধ্যানধারণায় বিপর্য্যয় বাধাইয়া দিয়াছে। ইউরোপেও তেমনি একদিন নব বিজ্ঞানের আবির্ভাব মন-প্রকৃতির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাই তখন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সুগঠিত সমাজের সংস্কারগুলিকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া পিছু হঠাইয়া দিতেছিল। ইউরোপে ধর্ম্মবিশ্বাস দিন দিন কিরূপ শিথিল হইয়া আসিয়াছে, অধ্যাপক জোড় কর্ত্তৃক গৃহীত লণ্ডনের কোন গীর্জ্জায় প্রার্থনার জন্য সমবেত জনমণ্ডলীর সংখ্যা হইতে সহজে অনুমান করা যায়। ১৮৮৭ সনে ঐ গীর্জ্জায় ২৯৫ জন প্রার্থনা করিতেন, ১৯০৩ সনে ১৮৪ জন এবং ১৯২৭ সনে ঐ সংখ্যা কমিয়া মাত্র ৬৩টিতে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বকার প্রগাঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমাজের বাঁধা-ধরা লৌহবর্ম্মের উপর দিয়া চালাইয়া লইয়া যাইত। বিজ্ঞানের বিজয়-অভিযান ঐ সব সংস্কারমূলক গঠনপ্রণালীর মূলোচ্ছেদ করিল বটে, কিন্তু সেখানে কোন লুপ্ত সংস্কারের পুনরুদ্ধার বা নূতন সংস্কারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা এখনো করিতে পারে নাই। তাই আজ সমাজনীতির ও অর্থনীতির পোতাশ্রয়ে ঝড়ঝাপটায় বিপর্য্যস্ত জীবন-তরী আসিয়া ভিড়িয়াছে। ব্যক্তি জীবনের চরম বিকাশ ও পরম সার্থকতা ঘটিবে—খাদ্য সংস্থান, সমাজ ব্যবস্থা ও স্বচ্ছন্দ আরাম-কল্পনায় যাদুঘরে, এই আশায় মানুষ এত মুগ্ধ যে সমাজ বা অর্থনীতির বাহিরে আপন মানস-লোকে যে চিরসুন্দর মহাশান্তি বিরাজমান তাহার উপলব্ধিটুকুও যেন আর নাই—যেন ঐ সত্যের অনুভূতিকে আফিমের খিয়ালি বলিয়া উপেক্ষা করাই বাস্তবতার পরিচয়।

কল্পনা বা বাস্তব—সত্যাসত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সবই মনের সংযোগে চেতনার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উপনিষদে আছে, অরা ইব রথনাভৌ সর্ব্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং—তেমনই এক হিসাবে ইহাও বলা চলে, জগতের যাবতীয় বস্তুসত্তার প্রতিষ্ঠা মানুষের মন-মন্দিরে, মনই বস্তুগুলিকে নাম-রূপের সম্বন্ধে বাঁধিয়া সার্থক করিয়া তুলে। বৌদ্ধগণের গ্রন্থ 'ধম্মপদে' বলা হইয়াছে, দৃশ্যমান সকল বস্তুকে একমাত্র মনই জাগরিত করে—মনই প্রধান, সকল বস্তুর উপাদান। ইংরাজ দার্শনিক বার্কলে Subjective Idealism নামক যে তত্ত্বের প্রবর্ত্তন করেন তাহাও বৌদ্ধদর্শনের ঐ উপলব্ধির পুনরাবৃত্তি—অর্থাৎ, বস্তুসত্তার উদ্ভব মন হইতে, মনই উহার উপকরণ এবং মনের বাহিরে কোন সত্তা নাই, মোটামুটি ইহাই তাহার বক্তব্য। চরমপন্থী দার্শনিকগণের এই উগ্র মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিলেও ইহা বোধ করি সহজে প্রতীয়মান হইবে যে, বস্তুর রূপ ও আকার মন-নিরপেক্ষ নহে এবং উহার অর্থ ও মূল্য মনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্তুগুলির পরস্পর সম্বন্ধ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে মনের ক্ষেত্রে, আবার উহাদের আপেক্ষিক মূল্যও মনই নির্দ্ধারণ করে। বিজ্ঞান প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয় বটে যে বৈজ্ঞানিকের মন নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র—প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া তাহাকে জ্ঞানের সাধনা করিতে হয়। আসলে, উচ্ছ্বাস বা সংস্কার—বিচারের বিঘ্ন উৎপাদনকারী ভাবপ্রবণ চিত্তবৃত্তিগুলিকে তিনি নিরুদ্ধ করেন মাত্র, কিন্তু মনকে কখনো বাদ দিতে পারেন না, কেন না সত্য প্রতিফলিত হয় মনের স্ফটিক-খণ্ডে এবং বুদ্ধির কষ্টিপাথরে মনই তথ্যগুলির সত্য-মিথ্যা যাচাই করে। এইরূপে বস্তুর সহিত মনের সংযোগে যে একীভূত পরিণত পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাকেই আমরা বাস্তব বলিয়া জানি—আর এই অর্থে সমাজ-নীতি ও অর্থনীতির কার্য্যকরী ব্যবস্থাগুলিও বাস্তব সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে ব্যবহারিক জীবনের ঊর্দ্ধে অনুভূতির যে রম্য জগত মানুষের অন্তরে ছায়াপথের মত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, উহা আকাশ-কুসুমের সমষ্টিমাত্র নয়, উহার প্রত্যেকটি ভাস্বর সূর্য্যের মতই দীপ্যমান সত্য। মনের যে নিবিড় রহস্যলোক হইতে শিল্প ও ধর্ম্মচেতনার উদ্ভব, রসবোধের সঞ্চার, প্রেম-করুণা মৈত্রীর ভোগবতী ধারা প্রবাহিত, মুক্ত আনন্দের সন্ধান মিলিয়াছে সেইখানে—তাই মানুষ মাটিতে চলিবার ফাঁকে আকাশের পানে চায়, নক্ষত্রলোকের ক্ষরিত সুধা অবাস্তব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না।

সাংখ্যদর্শন বলেন, মন প্রকৃতি-সম্ভূত, আর প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব রজ তম এই তিনটি গুণধর্ম্ম লইয়া প্রকৃতি গঠিত। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল লঘু, সুখ ও জ্ঞানের প্রকাশক। রজ রাগাত্মক, তৃষ্ণা-সম্ভূত সুতরাং দুঃখদায়ক। তম অন্ধকার—অজ্ঞানজ মোহ প্রমাদ ও আলস্যের কারণ। এই গুণত্রয় প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করে—জ্যোতি চঞ্চলতা

ও অন্ধকার রূপে। ইহাও বলা চলে যে রজগুণের চঞ্চলতা (activity) হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে, সত্ত্বগুণের প্রভাবে স্থিতি ও তমগুণ ধ্বংসের কারণ। এই গুণত্রয় মন-প্রকৃতির মধ্যে কিরূপ আকারে বিদ্যমান গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তাহার বর্ণনা আছে।

রজস্তম পরাভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত

রজ: সত্ত্বং তমশ্চৈব তম: সত্ত্বং রজস্তথা।

রজ ও তমগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়, সত্ত্ব ও তমগুণকে অভিভূত করিয়া রজগুণ এবং সত্ত্ব ও রজগুণকে পরাভূত করিয়া তমগুণ আবির্ভূত হয়।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ

প্রমাদোঽজ্ঞান-মোহৌ চ তমস এব পাণ্ডব।

এই তিন গুণ ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকিলেও উহাদের ভার-সাম্যের অভাব প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়; তাই যে-গুণের প্রভাব অধিকতর, গুণ বিভাগে তাহারই প্রাধান্য দেওয়া হয়। মন-প্রকৃতিকে বিভক্ত করিয়া শ্রেণী নির্ণয় করিবার চেষ্টা, কি প্রাচী কি প্রতীচি উভয় দেশেই আদি যুগ হইতে চলিয়াছে—কিন্তু ঐরূপ বিভাগ গ্রহ-নক্ষত্রের অথবা দৈহিক উপাদানের কোন কল্পিত গুণকে আশ্রয় করিয়া করা হইত, যেমন mercurial, saturnine, phlegmatic, colerio, পিত্তপ্রধান শ্লেষ্মাপ্রধান প্রভৃতি। এই প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ দেহ-যন্ত্র বা উপাদানের ভিত্তির উপর মানব প্রকৃতিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—যথা, somato-tonic, viscero-tonic এবং cerebro-tonic। প্রথম শ্রেণীর somato-tonic ব্যক্তিগণ দেহবলে গর্ব্বিত, পেশীবহুল, অঙ্গের চালনে তৃপ্ত, মানসিক উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য নাই, ব্যায়াম প্রভৃতি দেহ-চর্চ্চায় মগ্ন হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণী viscero-tonic ব্যক্তিগণের প্রকৃতি আহারবিহার খোসগল্প—বিলাসী ও ভোগী মানুষ—উচ্চ চিন্তার বালাই নাই। আর যাহারা ধীর স্থির পরিশ্রমী ও চিন্তাশীল, জ্ঞানের সাধক, তাহাদের cerebro-tonic শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মন-প্রকৃতির উপরোক্ত শ্রেণীগুলির বিচার আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে এ-বিষয়ে সাংখ্যের গুণ-বিভাগ দর্শন-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রজ্ঞার প্রভায় অধিকতর সমুজ্জ্বল—সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতে সুরু করিয়া মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য পর্য্যন্ত সব-কিছুর সহিত গুণত্রয়ের একটি সূক্ষ্ম অনৈসর্গিক সম্বন্ধের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দার্শনিক উপলব্ধি শুধু কূটতর্কের পথ মুক্ত করিয়া দেয়—আপ্তবাক্যের মত উহা গ্রহণ করা চলে বটে, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না। তাই, দর্শনের পথ ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক মনস্তত্ত্ব ব্যক্তির পরিবেশ, বংশক্রম ও অবস্থা, শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার ও আদিম প্রবৃত্তির (instinct) গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঘোড়-দৌড়ের বাজি ধরিতে আমরা ঘোড়ার বংশক্রম বিচার করিয়া থাকি—ব্যক্তির দেহ-মনের গুণ বিচার সম্বন্ধে বংশক্রমকে সচ্ছন্দে বাদ দেওয়া চলে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। মানুষের চিন্তায় কর্ম্মে আচার-ব্যবহারে শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার, এমন কি আদিম প্রবৃত্তিগুলিকেও আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। চিত্তবৃত্তির উপর পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাত আধুনিক মনস্তত্ত্বের অন্যতম আলোচনার বিষয়। এই সব আলোচনায় মনস্তত্ত্ব অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, এমন কি জীবনতত্ত্বের (biology) সমান উৎকর্ষতা এখনও লাভ করে নাই। ইহার কারণ—বিজ্ঞান-প্রগতির ধারা প্রথমে ব্যোমচারী গ্রহ নক্ষত্র, তারপর প্রাকৃতিক নিয়ম, তারপর উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন, একে একে সকল ক্ষেত্রকেই প্রোজ্জ্বল করিয়া উহার দূরপ্রসারী জ্যোতি-প্রপাত মানবচিত্তের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়া জ্ঞানের যে বিরাট সৌধটি গড়িয়া উঠিয়াছে, মনস্তত্ত্ব তাহারই সর্ব্বোচ্চ স্তর এবং উহার প্রভাবে মন প্রকৃতির যেটুকু পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা সত্যই বিস্ময়কর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—প্রেম করুণা সৌহার্দ্য ভক্তি শ্রদ্ধা অনুকম্পা, মানব চরিত্রের মহান ভাবগুলি এমন কি ধর্ম্মের অনুভূতি পর্য্যন্ত কতিপয় আদিম বৃত্তির মিশ্রণে সমুদ্ভূত, তাহার পরিচয় ধৈর্য্যের সহিত পরীক্ষা করিলে সহজে পাওয়া যায়। জীবন-তত্ত্বের প্রয়োজনে যে-সব পশু সুলভ বৃত্তি—যেমন বিস্ময় ভীতি বশ্যতা শক্তিপ্রসারণের ইচ্ছা—মানুষের মনে নিহিত রহিয়াছে উহাদের সংমিশ্রণে উন্নত (sublimated) ভাবের আবির্ভাব হয় কিরূপে, মনোবিজ্ঞানের ইহাই একটি প্রধান শিক্ষা। প্রশস্তি বা প্রশংসার মূলে আছে কৌতূহলী চিত্তের বিস্ময় ও বশ্যতা—বৃহতের কাছে নতি স্বীকারের প্রবৃত্তি বিস্ময়ের সহিত মিলিয়া মানুষের মনে প্রশংসা জাগাইয়া তোলে। তেমনই ভক্তিরসের উৎপত্তি বিস্ময় ভীতি কৃতজ্ঞতা ও বশ্যতা হইতে—এই বৃত্তি চতুষ্টয়ের মিশ্রণ ধর্ম্মপ্রবণ মনে যে ভক্তির সঞ্চার করে তাহাই ভাবোচ্ছ্বাসকে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ। ঐশী শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তিরসের একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু উহা গঠিত দ্বিবিধ প্রবৃত্তি লইয়া—বশ্যতা ও কোমল উচ্ছ্বাস, প্রেম যাহার রূপান্তর। ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া ভক্তের মনে ভগবানের একটু করুণাও হয়ত উঁকিঝুঁকি মারিয়া যায়।

অনেকের ধারণা হইতে পারে যে বিরাট রহস্যজাল (mysterious tremendum) মনকে ঘেরিয়া ভক্তিমূলক ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে, মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ তাহারই নিরাকরণ করিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে উহার গৌরবও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞানের ভিত্তির উপর যে গৌরব প্রতিষ্ঠিত তাহার মূল্য অল্প, সুতরাং উহা কাটিতেও অধিকক্ষণ লাগিবার কথা নয়। কিন্তু উহা ছাড়াও বলা চলে,—ভক্তি বিশ্বাসের প্রকৃত রূপ ভক্তের অন্তরেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা উহার মৌলিক বৃত্তিগুলির বিচার করিতে পারি বটে, কিন্তু ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি কখনো সম্ভব হয় না। লোহার টুকরা লইয়া ইঞ্জিন প্রস্তুত হইলেও উহা ঐ লৌহখণ্ডগুলির সমষ্টি মাত্র নহে—ওগুলি কোন ভিন্নজাতীয় লামার সম্মুখে ধরিলে তিনি ইঞ্জিন প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। কার্য্যকে কারণের রূপান্তর মনে করা একটি মস্ত ভ্রম—ভাবের

মূলগত কারণকে বিশ্লেষণ করিলেই ভাবের উপলব্ধি ও অধিকার জন্মে না। বহিঃপ্রকৃতির মত মনেরও বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ আছে। বিবর্ত্তনের পথে নানা উপাদানের সংমিশ্রণে প্রকৃতি যেমন জগত গড়িয়া তুলিয়াছে—যাহার গুণধর্ম্ম মূল উপাদান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তেমনই মানসিক বৃত্তিগুলির মিশ্রণে যে নূতন ভাবের সৃষ্টি হয়, উপাদানের মধ্যে তাহার প্রকৃত পরিচয় মিলে না। এই কারণে ভক্তের মনে ভক্তির রসরূপ যেমন সমগ্রভাবে আসিয়া দেখা দেয় বিজ্ঞানের যন্ত্রে তাহা কখনো ধরা পড়িবার নহে।

পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ গোলকে আমেরিকার আবিষ্কার একদিন ভৌগলিক জ্ঞানের বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, আধুনিক মনোবিজ্ঞানও তেমনই অন্তস্তলের গহনে যে সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের সন্ধান দিয়াছে, তাহা মগ্নচেতনা (sub-conscious) ও অচেতনার (unconscious) রাজ্য—সেখানকার সূক্ষ্ম চিন্ময় প্রভাব মানুষের মনে নিয়ত বিরাজ করে, এবং 'লষ্ট আটলানটিসের' কল্পজগৎ অতলান্ত মহাসাগরের গর্ভে যেমন গুপ্তই রহিয়া গেছে, লুপ্ত হয় নাই, আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতিকে মগ্নচেতনাও ঠিক সেই মত অলক্ষ্যে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। এই মগ্ন চেতনার একটি সহজ উদাহরণ আমরা হিপ্‌নটিজমের মধ্যে দেখিতে পাই—বিশেষত যাদুনিদ্রার অবসানে পাত্র যখন জাগ্রত অবস্থায়ও অনুদিষ্ট বিধানমত কাজ করিয়া যায় (post-hypnotic state)। হিপ্‌নটিজমের নিদ্রা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্মচেতনাকে আবিষ্ট করিয়া মনের এমন একটি পরস্মৈপদীয় অবস্থার সৃষ্টি করে যে পাত্র তখন যে কোন অনুদেশ (suggestion) বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়া বসে, তাই তাহার জিহ্বায় লবণের স্বাদও চিনির মত মিষ্ট হইয়া উঠে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুপ্তাবস্থায় তাহাকে যে অনুদেশ দেওয়া গেল, নিদ্রাভঙ্গে সে-কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেও, সজ্ঞানে ঐ মত কার্য্য সে আশ্চর্য্যরূপে করিয়া যায়। যেমন—পাত্রকে ঘুমন্ত অবস্থায় বলা হইল, ঘুম ভাঙিবার পনের মিনিট বা আধ ঘণ্টা পর বৈঠকখানা ঘরে দক্ষিণের চেয়ারটি সরাইয়া সে যেন পূর্ব্বদিকে রাখিয়া দেয়, কিন্তু এই অনুজ্ঞার কথা তাহার যেন মনেও না জাগে। যাদুনিদ্রা ভাঙিবার পর সে উঠিয়া বসিল, উপস্থিত ব্যক্তিগণের সংলাপে সচ্ছন্দে যোগদান করিল, নির্দ্ধারিত সময়ের ঈষৎ পূর্ব্বে কেমন যেন একটু অধৈর্য্যভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল—তারপর হঠাৎ উঠিয়া বলিল, এই ঘরে আসবাবপত্র সাজাইবার ব্যবস্থা ভাল নয়; দক্ষিণের চেয়ারটি পূর্ব্বে রাখিলে বেশ মানায়, কি বলেন? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে দক্ষিণ হইতে চেয়ারটি তুলিয়া ঘরের পূর্ব্বভাগে বসাইয়া দিল! এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—নিদ্রাকালে অনুদেশের কথা তাহার মনে নাই, কিন্তু সেইমত কাজটি করিতে গিয়া সে বেশ একটি মন-গড়া যুক্তির অবতারণা করিয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে মানুষের যুক্তির অভাব হয় না—অন্য কথায়, যুক্তির সিদ্ধান্ত ধরিয়া আমরা সব সময় কাজ করিয়া থাকি, এমন নয়; বরঞ্চ কাজটিকে সমর্থনযোগ্য করিবার জন্য যুক্তি আসিয়া দেখা দেয়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

ডাক্তার বিনোদ প্রত্যুষে উঠে দেখেন—মাণিক তাঁর আগে উঠে তাঁর যা যা আবশ্যক হতে পারে, গুছিয়ে রেখেছে।

তিনি কথা না কয়ে—মুখ হাত ধুয়ে, কোট প্যান্ট পরতে পরতে হাসিমুখে কেবল বললেন—"ষ্টেথিসকোপের আর দরকার হবে কি?"

মাণিক। আর কিছুর জন্য না হলেও ওটা ডাক্তারদের "প্রত্যঙ্গ" বলেও দরকার আছে।

"তবে দাও।"

মাণিক হ্যাটটাও এগিয়ে দিলে।—

"ওটা আর মাথায় দিতে ইচ্ছা করছে না মাণিক।"

"কেবল অনুমানের ওপর অতটা"…

ডাক্তার আর দাঁড়ালেন না, একটু হাসি টেনেই—"দুর্গা" বললেন। মাণিক বাইরে দাঁড়িয়ে কেবল একটা মর্ম্মচ্যুত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

* * * *

সাহেবের বাংলোর বাইরেই কামিজপরা কিশোরীর সঙ্গে দেখা।—"এ কি! এতো সকালে? ডেকেছিলেন নাকি? তা ভালই করেছেন। সাহেব বেরুবার জন্যে প্রস্তুত, কেবল চায়ের অপেক্ষা।"

"তবে আর বিলম্ব নয় ভাই, আমার সেলামটা তাঁকে জানিয়ে দাও।" সুরটা তাঁর দয়া ভিক্ষার মত ঠ্যাকায়—কিশোরী আর দাঁড়ালো না, একটু চিন্তিতও হোলো।

মিনিট দু'য়ের মধ্যে O/C স্বয়ং বেরিয়ে এলেন—Good Morning Doctor, very kind of you—আমি ভাবছিলুম যাবার আগে দেখাটা হোল না, ডাক্তার কি ভাববেন।

ডাক্তার হাতজোড় করে—Excuse me, my kind Boss, I believe, am under deep delusion and dreadful conspiracy, May be my mind is playing false to me—I am awfully disturbed —I sure you know it সামান্য বিষয় নিয়ে আমার বিপক্ষে অসামান্য ও অনিষ্টকর বা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলেছে, আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন।

সাহেব বুঝলেন—কথা বাড়িয়ে ফল নেই, সরাসরি অবিচলিত ভাবেই বললেন—Yes I know Doctor—আমি সব জানি, তাতে হয়েছে কি ?

"বিশ্বাস হারালে সে মানুষের আর রইল কি Sir"—

"কার কাছে ?"

"জগতের কাছে।"

"মিথ্যা সত্য হয় নাকি ?"

"নিত্যই হচ্ছে হুজুর।"

যেখানে স্বার্থ থাকে—কিন্তু দু'দিন বাদে ব্যর্থ হয়ে যায়।

সেই দু'দিনেই যে বদনামটা রটে, দশের কাছে পাকা হয়ে যায়, হুজুর। ওটা যে অন্ধের কাছে ভারী মিঠে জিনিষ মালিক! আবার তাদের নিয়েই যে গরীবকে দুঃখের দিন কাটাতে হবে sir—

কিশোরী চায়ের সরঞ্জাম আনলে। তার সঙ্গে মাখন-মিছরি মাখানো রুটির স্লাইস, জ্যাম, আর কিছু ফল। সাহেব নিজে serve করতে করতে বললেন—এখন ভালো করে খেয়ে নেওয়া যাক্, আমার লম্বা পাড়ি, সময়ও কম। খেতে খেতে কথা হোক্—তুমি কি বলতে চাও বলো—

ডাক্তার। আমি সামান্য লোক, আপনার মত আমার শুভাকাঙ্ক্ষী জীবনে কোনদিন পাইনি, পাবার আশাও করিনি, কথাটা বড় অকৃতজ্ঞের মত, এ ছোট মুখে আসছে না, আসা উচিতও নয়। কিন্তু আমি নিরুপায়।

O/C—তবে আমার মুখেই আসুক—চাকরিটা করবে না, এই বলতে চাও। তাহলে আমি এই তোমার ভুল পেলুম, পূর্ব্বে পাইনি। তোমার অপরাধ নেই—তোমাদের দেশের ওটা চিরন্তন ধর্ম্ম—অর্থাৎ ত্যাগেই মুক্তি। অমন easy going সমাধানও আর নেই। কিন্তু তোমাদের দেশ যে অধুনা, আমাদের অনুকরণে মেতেছে—তোমরা স্বরাজ স্বরাজ করছো, তার তো মিথ্যাই সম্বল, প্রধান অস্ত্র। পরের লুটে পুটে খাওয়া, সেটা সত্য ধরে হয় না—"আমি"-কে বড় ভাবতে হয়। যাক্, ওকথার আজ সময় নেই, তোমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছি, পরে বলবো। এখন শোন—তুমি যেটাকে ভয় করছো—এড়াতে চাচ্ছো—চাকরী ছাড়লে তার যে বিপরীত ফল হবে। সেটা তাদের প্রমাণের কাজই করবে। তাদের মুখ বন্ধ করবার জন্যেই আমি বড় ব্যস্ত, ও কাজ কোর্টে না দিলে মিটবে না, তাই ডাক্তারকে বন্ধ করে হাতে রাখলুম। একমাস পরে ফিরে এসে—ব্যবস্থা কোরব। এখন তাদের চুপচাপ থাকতে বলেছি। একটী কথাও যেন বাইরে না যায়। এসে তাদেরি সাজার ব্যবস্থা কোরব। তোমরা সম্পূর্ণ safe আছো। নিশ্চিন্ত হয়ে, তোমাদের যা কাজ আছে, সেরে এসে আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত থেকো। কেমন ? আমার উপর বিশ্বাস আছে তো ?

"আর আমাকে লজ্জা দেবেন না sir—আমি মস্ত ভুল করছিলুম—আমাদের বাঁচালেন। আর কথা বাড়াব না, কিন্তু ম্যাডামকে আনা চাই।"

সাহেব একটু হাসি টেনে—ইচ্ছা তো আছে। আচ্ছা আর নয়—সময় নেই—Good bye and good wishes—

ডাক্তার—"God be with you."

* * *

উঃ কি করে এত ভুল করছিলুম—কালই না O/C আমাকে তাঁর গোপন হতে গোপনীয় কথা বিশ্বাস করে খুলে বলেছেন—ছি-ছি সে কথা একবার মনেও আসেনি। তিনিও সে কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করলেন না, পাছে লজ্জা পাই। উঃ কি করছিলুম! অন্য কেউ হলে তখনি Regimental cellএ পুরতেন। কি দেবপ্রকৃতির মানুষ! মা-ই রক্ষা করে যাচ্ছেন। অধম সন্তানে ক্ষমা কোরো, চরণে রেখো জননী। সুমতি সুবুদ্ধি যেন থাকে মা।—ওঁর সেবায় যদি প্রাণ দিতে পারি, সেই আমাকে সান্ত্বনা দেবে। বাসার সন্নিকটে এসে পড়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছলেন।—নিশ্চয়ই সয়তানেরা কোনো অসম্ভব মিথ্যার সাহায্য খুঁজে থাকবে—নচেৎ সাজার কথা ওঁর মুখে আসতো না—মাণিককে দেখে—তুমি বাসা ছেড়ে এতদূরে এসে পড়েছ, আমার দেরি হয়েছে কি ? চা খেয়েছ ?

মাণিকের মুখে ম্লান হাসি দেখো দিলে—"সব ঘুচিয়ে এসেছেন তো?—এখন আর তাড়া কি—এক সঙ্গেই খাবো।"

"আমি যে খেয়ে আসবো বলেছিলুম।"

"তা বলেছিলেন—কিন্তু……"

'কিন্তু কি—আমি বুঝতে পারলুম না।"

"অনেক সময় মানুষ না ভেবে ঝেঁাকের মাথায় মুখে যা আসে বলে ফেলে, অন্তরে তার প্রাণ তা বলে না। তার মনটা বা মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলে, পরে তার কাছে সেটা ধরা দেয়। সকালে আপনি বেরিয়ে যাবার পর কেমন একটা অস্বস্তি আরম্ভ হোল। করলুম কি? আপনাকে ফেরাতে ইচ্ছা হোল। পিছু ডাকতেও পারলুম না। অগত্যা ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজছি, কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না।"

"কেনো বল দিকি?"

"আপনার কাছে বড় অপরাধ করেছি—স্বেচ্ছায় না হলেও তখনকার অবস্থা অজ্ঞানে করিয়েছে। আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি, যা কখনও বলিনি। O/C'র দেওয়া দান, যা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আশাতীত ছিল, গ্রহে তা অগ্রাহ্য করিয়েছে, লোভ যে অন্তরে গোপনে ছিল, সেটা বুঝতে দেয়নি……"

"তার পর এখন?"

"সব ফুরিয়ে ফেলে, এখন আর বুঝে ফল কি? এখন কেবল আপনার কাছে সত্যটা প্রকাশ করে, অপরাধটা স্বীকার করা, শাস্তি পাওয়া। তারপর আপনার মা আছেন। কোন্ কুগ্রহ যে অলক্ষ্যে ঘুরছিল"—বলে মাণিক চুপ করলে।—পরে "O/C বোধহয়, বোধহয়ই বা কেনো—নিশ্চয়ই—"

"O/C নয় O/C নয়—দেবতা। তিনি আমাদের একমাসের ছুটী দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এখন আমাদের যার যা কাজ আছে সেরে নূতন orderএর জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। কালই বেরিয়ে পড়ি চলো।"

মাণিক সবিস্ময়ে—"কি বলছেন sir?"

ডাক্তার। যা সত্য, তাই বলছি। হাঁড়ি বেচতে হবে না, চাকরীই করতে হবে। ভেবনা, পরে শুনো—মাণিক একেবারে রাস্তাতেই শুয়ে পড়ে ডাক্তারের পায়ে মাথা দিলে।

"ওঠো ওঠো, কাজ রয়েছে।"

মাণিক উঠলো, তার দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে—"ধন্য ভগবান, ধন্য তোমার কৃপা। কি যে করবো, ভেবে পাচ্ছি না হুজুর।"

"কি আবার করবে? চা খেতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। ও দৌলতখানাকে তাচ্ছিল্য কর না—চলো।"

উভয়েরি হাসি দেখা দিলে।

রঘুনাথদাস গোস্বামী

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বর্ত্তমানে একটী সামান্য স্থান হইলেও প্রাচীনকালে ইহা একটী তীর্থস্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রধান নগর ও প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। পুণ্যতোয়া বিশালকায়া সরস্বতী নদী এই নগরের নিম্ন দিয়া কুলু কুলু স্বরে প্রবাহিত হইত এবং বিদেশীয় বাণিজ্যপোতগুলি পৃথিবীর রত্নরাজি এই দেশে বহন করিয়া আনিত। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি-বারো (De Barros) লিখিয়াছেন "বাণিজ্য তরীর প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণ সম্বন্ধে যদিও চট্টগ্রামে অধিকতর সুবিধাজনক, তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ এবং সপ্তগ্রাম একটী শ্রেষ্ঠ সহর।"

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল রাজস্ব নির্দ্ধারণ কল্পে বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। উক্ত সময়ে সপ্তগ্রাম সরকার সাতগাঁও' নামে অভিহিত হইত এবং ইহার মধ্যে ৫৩ পরগণা ছিল; কলিকাতা, শালকিয়া, ব্যারাকপুর, নদীয়া, ২৪ পরগনা প্রভৃতি স্থানগুলি সপ্তগ্রামের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ১শত ১৮ টাকা 'সরকার সাতগাঁও' হইতে সম্রাটকে রাজস্ব ও যুদ্ধের সময় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয় হাজার পদাতিক সৈন্য শাসন কর্ত্তাকে দিতে হইত। Gladwin's 'Ayeen Akbari,' Page 208.

সপ্তগ্রামের বৈভব গৌরব সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন যে প্লিনীর সময় হইতে পর্ত্তুগীজদের আগমনকাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম রাজকীয় বন্দর ছিল।

বাঙ্গলাদেশের প্রথম সাময়িকপত্র "দিগদর্শন" নামক সাময়িক পত্রের পঞ্চম ভাগে 'বাঙ্গলার প্রধাননগর বিষয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে

"সাতগাঁ হুগলির উত্তর পশ্চিম দুই ক্রোশ দূরে। আড়াই শত বৎসর হইল সে বাণিজ্যের এক প্রধান স্থান ছিল এবং ইউরোপ হইতে যত বাণিজ্যের কারণ গতায়াত ছিল সে এই শহরে এবং সেই সময়ে সরস্বতী নদী এমত আয়ত্তা ছিল যে অন্ন বোঝাই জাহাজে চলিত।" দিগদর্শন আগষ্ট ১৮১৮ ভ্রমণকারী ফ্রেডরিক ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন "সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র, বাণিজ্যার্থ বণিকগণ বহু দূর দেশ হইতে এই স্থানে সমাগত ও সমবেত হয়। প্রতিবৎসর সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ খানি বাণিজ্যতরী চাউল, কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, কাগজ, তৈল (Oil of Zerzeline) এবং আরো বহুবিধ বাণিজ্যদ্রব্য দেশান্তরে রপ্তানি হইত।"

কাল প্রবাহে ভারতের এই প্রচীনতম সহর বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াছে।



মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ সপ্তগ্রামে রাজবংশের রাধাকৃষ্ণের মন্দির ধ্বংস করিলে বিগ্রহকে এই স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এইস্থানে ঘাট নির্ম্মাণ করা হয়

ফটো—বিষ্ণুপদ কর

বহু প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান হিন্দুদিগের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। কোন সময়ে কোন রাজা এই স্থানের অধিপতি ছিলেন তাহার পূর্ব্বাপর ইতিহাস না পাওয়া যাইলেও শত্রুজিৎ নামক এক রাজা যে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন তাহা কবি কৃষ্ণরাম কৃত "ষষ্টিমঙ্গল" গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়।

পাঠান রাজত্বকালে দিল্লীর বাদসার অধীন এক শাসনকর্ত্তার দ্বারা এই স্থান শাসিত হইত, পরে রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও তদীয় ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার একত্রে সপ্তগ্রামের শাসন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং 'মজুমদার' নবাব প্রদত্ত উপাধি ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, তাঁহারা এই স্থান শাসন করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই 'মজুমদার' বংশ ধনে মানে তৎকালে যে প্রধান ছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে। রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই সদাচারী, ধার্ম্মিক ও বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট হইতে বৃত্তি পাইতেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত নিস্কর ভূমি দানের বহু নিদর্শন পুরাতন কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের সপ্তগ্রাম হইতে বার্ষিক আয় বিশ লক্ষ টাকা ছিল এবং তাঁহারা গৌড়েশ্বরকে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন। এই সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' যাহা লিখিত আছে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি—

"হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥"

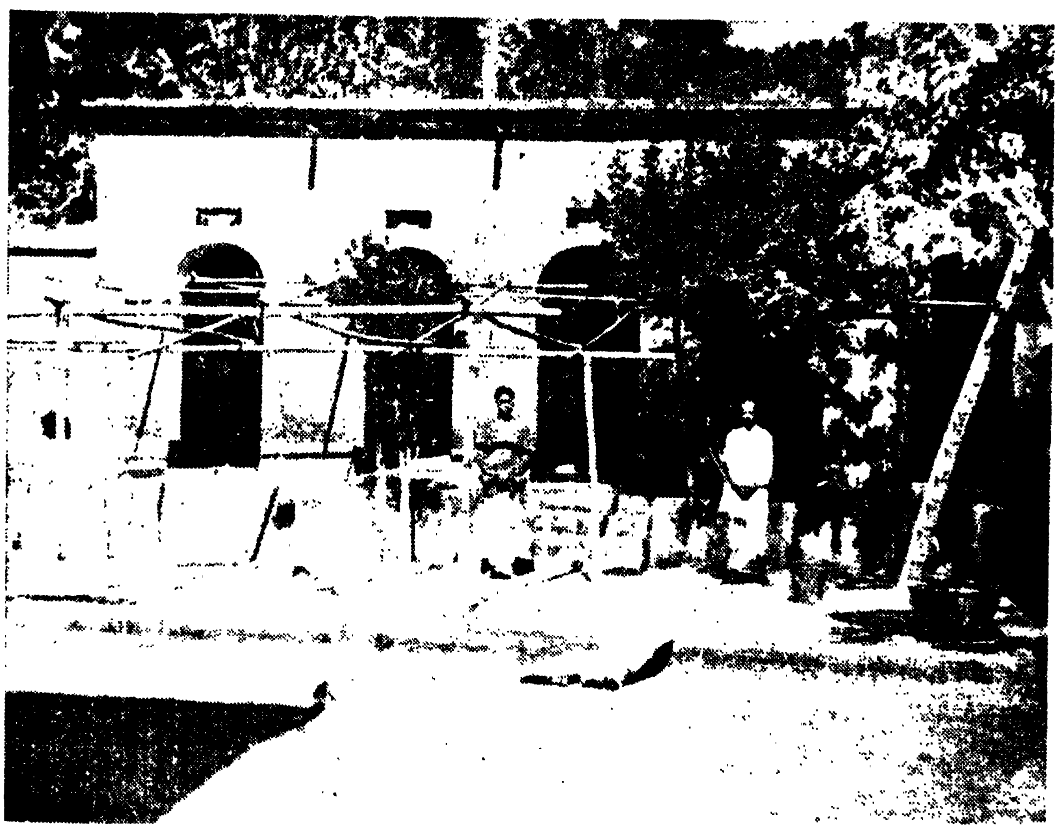
রাজা হিরণ্যদাস নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাসের ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল তাহার নাম রঘুনাথ। রাজবংশের একমাত্র পুত্র বলিয়া উভয় ভ্রাতারই এই শিশু বিশেষ আদরের ছিল। 'রাধাকৃষ্ণ' রাজ বংশের কুলদেবতা ছিল এবং গোবর্দ্ধন মহাসমারোহের সহিত নবজাত পুত্র হওয়ায় বিগ্রহের একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ইঁহাদের শাসনকালে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য বঙ্গদেশে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম আগমন করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে 'সাজাহান' নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যখন হুগলী হিন্দুরাজার শাসনাধীনে ছিল তখন ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের জন্য জমি খরিদ করিবার অনুমতি একদল বণিক পাইয়াছিলেন। "While Bengal was governed by its own :princes a number of merchants resorted to Hugli and obtained a piece of ground and permission to build houses in order to carry on commerce to advantage" হাণ্টার সাহেব হুগলীতে যে হিন্দু রাজার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ঐতিহাসিকগণ উক্ত রাজাকে গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; কারণ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ প্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং উক্ত সময়ে গোবর্দ্ধন মজুমদার ব্যতীত আর কেহ হুগলীতে রাজত্ব করিতেন না। রঘুনাথ ঐশ্বর্য্যের ও বিলাসের ক্রোড়ে শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাজা হিরণ্য দাস রঘুনাথের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমদ্ বলদেব আচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। বালক অতিশয় মেধাবী ছিলেন ; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বিশেষ আনন্দ

লাভ করিতেন এবং তাহার শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্ বলদেব আচার্য্যও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন।

শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুর ঠিক এই সময়ে ঘটনাচক্রে বলদেব আচার্য্যের গৃহে অতিথি হন। রঘুনাথ-হরিদাস ঠাকুরের অসাধারণ ভগবদ্ প্রেম দেখিয়া তন্ময় হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন।

কিছু দিন পরে যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন সেই সংবাদ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল, তখন রঘুনাথ নারায়ণের অবতারকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব হইতেই



সপ্তগ্রাম-অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে শ্রীমদ রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাট　　　ফটো—বিষ্ণুপদ কর

হরিদাস ঠাকুরের নিকট মহাপ্রভুর নাম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার শ্রীচরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে যখন মহাপ্রভু পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার বাটীতে যাইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম তাহার প্রেমময় মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। এই স্থানে সাত দিন অতিবাহিত করিবার পর তাঁহার আর ঘর সংসার ভাল লাগিল না। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "রঘুনাথ এখনও তোমার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া গৃহে যাও, যখন সময় হইবে, যখন চঞ্চল হৃদয় যথার্থ স্থির বৈরাগ্যের উপযোগী হইবে তখন স্বয়ং ভগবানই তোমার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন এবং তোমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন।"

মহাপ্রভুর আদেশে রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি 'রাধাকৃষ্ণের' মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এরূপ আত্মহারা হইতেন যে তাহার জনক ও জ্যেষ্ঠতাত তাহা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে একবৎসর কাটিল, তাঁহার পিতামাতা রঘুনাথের সহিত এক সুন্দরী কন্যার বিবাহের স্থির করিলেন। রঘুনাথ তাহা জানিতে পারিয়া একদিন রাত্রে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

"এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে মন পলাইতে কৈল॥
রাত্রে উঠি একলা চলিল পালাইয়া।
দূরে হইতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বদাই বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাঁহার

তীব্র অনুরাগ কিছুতেই বাধা মানিতে চাহিল না। জ্যেষ্ঠতাত, পিতামাতা প্রত্যেকেই রঘুনাথের জন্ত বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গৃহাশ্রয়ী করিবার জন্ত তাঁহারা যুক্তি করিয়া এক রূপলাবণ্যবতী কন্তার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন।

পার্থিব ভোগবিলাসে রঘুনাথকে আকৃষ্ট করা গেল না; বরং তাঁহার হৃদয়ে দারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তাঁহার স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী পত্নী কাঁদিতে লাগিলেন; সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিবার প্রস্তাব তাঁহার পিতার নিকট করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে রাজ ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসম স্ত্রী যাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই, দড়ির বন্ধন তাঁহাকে কি করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে?

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥" চৈঃ চঃ

রঘুনাথ পানিহাটী গ্রামে শ্রীমদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। তিনি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তি উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন যে রঘুনাথ আমি আজ তোমাকে দণ্ডিত করিব; তুমি আমার শিষ্যগণকে চিঁড়া-দধি ভোজন করাও। রঘুনাথ প্রেমে গদ্‌গদ্‌ হইয়া পরমানন্দে মহাপ্রভু, এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে চিঁড়া-দধি ভোজন করাইয়াছিলেন। আজও পানিহাটী গ্রামে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী তীরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত চিঁড়া-দধি মহোৎসবের স্মৃতি স্মরণার্থে বৈষ্ণবগণ 'দণ্ডমহোৎসব লীলা'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

"পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইশ মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছো, দণ্ডিমু তোমারে॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে॥"—চৈঃ চঃ

অতপর রঘুনাথ প্রতিদিন ষোল ক্রোশ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ দিনে পদব্রজে নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন। নীলাচলে যাইতে তাঁহাকে হিংস্র জন্তুসমাকুল নিবিড় বন ও প্রান্তর এবং মকর ও নক্র বিশিষ্ঠ নদী সকল সন্তরণ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া তিনি কয়েক বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বাস করেন। মহাপ্রভু তাঁহার অসাধারণ প্রেমের একাগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী রঘুনাথকে ভক্তির উপযুক্ত আধার বিবেচনা করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন এবং সাধ্য সাধনতত্ত্ব প্রণালী শিক্ষা দেন। রঘুনাথ যে অনন্ত-সাধারণ কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া ভক্তির সকল অঙ্গ যাজন এবং ভজন মার্গের শীর্ষস্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। তিনি স্নান, আহার ও নিদ্রার জন্ত মাত্র তিন ঘণ্টা সময় রাখিয়া, প্রতিদিন একুশ ঘণ্টা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঘুনাথের পিতা তাঁহার জন্ত অর্থাদি পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে অর্থ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ছত্রে ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন।

"তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥"—চৈঃ চঃ

এই সময় রঘুনাথের শোকে তাঁহার মাতা ও পত্নী লোকান্তরিতা হন। নীলাচল হইতে তিনি কয়েক বৎসর পুরীধামে অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু প্রদত্ত এক সাক্ষাৎ মোহনমুরলীধারী শিলারূপী মদনমোহনের বিগ্রহ লইয়া একবার সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। সপ্তগ্রামে তাঁহাদের 'রাধা কৃষ্ণের' মন্দিরে তিনি উক্ত মদনমোহনকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রঘুনাথ আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বৈষ্ণবগণ আসিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে সপ্তগ্রামকে মাতাইয়া তুলিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুও সপ্তগ্রামে আসিয়া রঘুনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন; সপ্তগ্রামের দেবালয় বৈকুণ্ঠালয়ে পরিণত হইল। শ্রীমদ্‌ বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্ত-ভাগবতে' এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে নিম্নে তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রয়ে।
গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত কৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নহে বলিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥
এই মতে সপ্তগ্রাম আম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বদর্প কৌতুকে॥

মহাপ্রভুর পার্ষদগণ যখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যান রঘুনাথও সেই সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এই সময় তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড বিদ্যমান আছে; কিন্তু সাড়ে-চার শত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের চিহ্ন মাত্র ছিল না। যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে কয়েকটী জলাভূমিকে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন। রঘুনাথ সেই স্থানটীকে ভগবৎ আরাধনার উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার মানসিক বলে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন রঘুনাথের ইচ্ছা হইল যে কি উপায়ে এই পুণ্য জলাশয় দুইটাকে পূর্ব্বের ন্যায় বিশালাকার করিতে পারা যায়। এইরূপ চিন্তায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় বহু ধনরাশি লইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া রঘুনাথকে

বলিলেন যে বদরিকাশ্রমের শ্রীশ্রীনারায়ণ জীউর আদেশে তিনি এই ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন যে শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট যাইয়া এই ধন রত্ন অর্পণ করিয়া বলিও যে তিনি যেন রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া দেন। রঘুনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ পুলকে কাঁদিতে লাগিলেন এবং অচিরে কুণ্ড দুইটী স্বচ্ছ জলাশয়ে পরিণত হইল। এই স্থানে রঘুনাথ এরূপ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন যে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার লোপ পাইল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানগণ পুনরায় সপ্তগ্রাম কাড়িয়া লন এবং এই স্থান মুসলমান শাসনকর্তার দ্বারা শাসিত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে এই প্রাচীন স্থানের যাবতীয় হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আকবরের সময় এই স্থানের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে তৎকালীন লেখকগণ এই স্থানকে "দস্যু-স্থান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "In Akbars time, Satgaon was known as 'Balghak-Khnna' the house of Revolt" (Bengal Past & Present, Vol III, 1909) রঘুনাথের বাড়ী ধ্বংস হইল এবং মন্দির অপবিত্র হইবার পূর্ব্বেই মন্দিরের পূজারী-ব্রাহ্মণ 'রাধাকৃষ্ণ' এবং 'মদনমোহনের' বিগ্রহগুলি মন্দিরের পার্শ্বে সরস্বতী নদীর তীরে প্রোথিত করিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন; রাজবাড়ীর কুল-দেবতার মন্দির ধ্বংস হইল।

সপ্তগ্রামের ভগ্ন মসজিদ সম্বন্ধে ব্লাকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে রচিত এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্য্যসমলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীরে একটী 'কুলুঙ্গি' আছে, উহা হিন্দু মন্দিরের খিলানের ন্যায়—দেখিতে অতি সুদৃশ্য। বোধ হয় পাঠান রাজত্বের অবসানে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। (Journmal of the Asiatic Society of Bengal, Part I, Vol-39, 1870).

বৃন্দাবনে রঘুনাথ তাঁহার আরাধ্য দেবতার দুর্দ্দশার বিষয় ধ্যানে অবগত হইলেন এবং তাঁহার অন্যতম প্রিয়শিষ্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণকিঙ্কর গোস্বামীকে সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে সপ্তগ্রামে যাইলেই তিনি যাবতীয় বিষয় অবগত হইবেন এবং বিগ্রহগুলিকে পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি যেন যথাস্থানে তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথের কথানুযায়ী তদীয় শিষ্য সপ্তগ্রামে আসিয়া বিগ্রহগুলিকে নদীর তীর হইতে উদ্ধার করিলেন এবং নবাবের নিকট হইতে কিছু জমি লইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানেই খড়ের ঘরে তাঁহাদিগকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বর্গীয় দানবীর মতিলাল শীলের পিতামহী বর্ত্তমান গৃহ এবং যে স্থানে বিগ্রহগুলি প্রোথিত ছিল, সেই স্থান ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া তথায় একটী ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

রঘুনাথ বৃন্দাবনে এরূপ কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন যে আহার নিদ্রা তাঁহার একপ্রকার লোপ পাইল। অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া তিনি সাধনার চরম সীমায় উপনীত হইলেন এবং ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের (১৫০০ শকাব্দ) আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন রঘুনাথের অমর আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত পুরুষে লীন হইয়া গেলেন। শ্রীমদ রঘুনাথ গোস্বামী মুক্তির যে পথ দেখাইয়া গেলেন, তাঁহার শিষ্যগণও সেই অবলম্বন করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার পরম পবিত্র রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনকাহিনী বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনের বস্তু। মহাপ্রভুর পরিকরের মধ্যে ছয়জন গোস্বামী ছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র কায়স্থ রঘুনাথ ব্যতীত সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কায়স্থ হইয়াও মহাপ্রভুর কৃপায় এবং নিজ চরিত্রবলে তিনি ব্রাহ্মণসদৃশ সর্ব্ববর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন।

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোস্বামী যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ প্রভুর জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইয়াই প্রধানতঃ হিন্দুদিগের অমূল্য গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচনা করেন। এই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন...

"রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥"

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রতি পরিচ্ছেদের অন্তে নিম্নোক্ত ভনিতাটী দেখিতে পাওয়া যায়—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় উক্ত গ্রন্থের 'অন্ত্যলীলা' মধ্যে অতি মধুর ও লোকপাবনী ভাষায় বর্ণিত আছে। রঘুনাথ যে সমস্ত অমূল্য ভক্তিমূলক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতিপয় মুদ্রিত হইলেও, এখনও বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি কীটদষ্ট হইতেছে। উক্ত অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি প্রকাশ করিলে কেবল যে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ হইবে তাহা নহে, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া দেশবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত্ত প্রতীক কায়স্থ কুলোজ্জ্বলকারী রঘুনাথেরও কীর্ত্তিস্তম্ভ সংরক্ষিত হইবে।

সপ্তগ্রামের এই প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের দেবালয় ও রঘুনাথের সাধনক্ষেত্র দেখিয়া আজও ভক্তগণের হৃদয়ে রঘুনাথের দিব্য জ্ঞান ও ভক্তির স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে; যে মহাত্মা এই জাতিকে প্রেমময় নামের দ্বারা সমাজের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত স্থানের দেবালয়টী দর্শন করিলে লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া যায়। আমাদের উদাসীনতায় ও অবহেলায় বিগ্রহের সেবা পর্য্যন্ত প্রতিদিন হয় না এবং দেবালয়টীও বর্ত্তমানে যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে ইহা ধূলিসাৎ হইতে আর বোধ হয় বিশেষ বিলম্ব নাই।

বর্ত্তমান মন্দিরটী "রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট" বলিয়া খ্যাত এবং ইহার

মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহগুলি ব্যতীত রঘুনাথের অন্যতম শিষ্য কমললোচন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের" বিগ্রহ আছে। এতদ্ভিন্ন যে প্রস্তরময় বেদীর উপর বসিয়া রঘুনাথ সাধনা করিতেন এবং তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠ-পাদুকা (খড়ম)-দ্বয়ও যত্নের সহিত মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত আছে। ভগবদ্‌ভক্ত স্বর্গীয় মতিলাল শীলের পিতামহী কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর ১৩১৬ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় এবং রাজর্ষি বনমালী রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের অর্থ সাহায্যে মন্দিরের সামান্য কিছু সংস্কার হইয়াছিল। পরে ১৩৩০ সালে চুঁচুড়ার সদগোপবংশীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ নামক জনৈক ভক্ত পুনরায় মন্দিরের কিছু সংস্কার করিয়া দেন। বর্ত্তমান মোহান্তের নাম শ্রীগৌরগোপাল দাস অধিকারী, অর্থাভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঠাকুরের সেবা করা অসম্ভব হইলে, তিনি শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজীর নিকট এই বিষয় জ্ঞাপন করেন এবং ১৩৫০ সাল হইতে তাঁহারই যৎকিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যে আজও বিগ্রহের সেবা হইতেছে।

এই অনাদৃত ও অজ্ঞাত রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাটের অনতিদূরে সুবর্ণ-বণিকদিগের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট বিদ্যমান আছে। ভক্তজাতি সুবর্ণ বণিক বহু অর্থ ব্যয়ে দত্তঠাকুরের শ্রীপাট সুন্দরভাবে সুসংস্কৃত করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর উক্ত স্থানে দত্ত-ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি-আরাধনা মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক সমাজ তাঁহাদের এই জাতীয় মহাপুরুষের কীর্ত্তি স্মরণ করতঃ প্রতি বৎসর উক্ত স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীপাটের যাবতীয় সংস্কারাদির ভারও তাঁহাদের "সমাজ" গ্রহণ করিয়াছেন।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি বাঙ্গলার জাতীয় গৌরব শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ন্যায় কয়জন মহাপুরুষ বাঙ্গলা দেশকে পবিত্র করিয়াছেন? রঘুনাথ প্রবর্ত্তিত পুণ্যসলিলা সরস্বতীর উপকূলে প্রতি বৎসর যে উত্তরায়ণ-মেলার (১লা মাঘ) অনুষ্ঠান আজ সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার সংবাদ কয়জন জানে?

জাতীয় মহাপুরুষদিগের মহিমা বিস্মৃত হওয়া যে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শ্রীভগবানের অংশসম্ভূত রঘুনাথ জীবের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য নরাকারে যে স্থানে এবং যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থানের রক্ষাকল্পে যদি আমরা সচেষ্ট না হই—আমাদের অবহেলায় ও উদাসীনতায় যদি কায়স্থকুল উদ্ধারকারী প্রেমময় মহাত্মার নাম এবং কায়স্থ জাতি ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির মূর্ত্ত প্রতীক চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর যে কোন আশা নাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। *

* যে সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তকের সাহায্যে এই মহাত্মার জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি। যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তাহা আমারই দোষে হইয়াছে কারণ বৈষ্ণব শাস্ত্রে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রবন্ধের মধ্যে চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর কর্ত্তৃক গৃহীত।

জনতা

শ্রীসুবোধ বসু

দার্জ্জিলিংএ চেঞ্জে আসিয়াছি। কিন্তু এই কি চেঞ্জ! উঁচু-নিচু রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইতেছি, যেখানেই ফগ্ পাইতেছি গিলিয়া ফেলিতেছি। ফগ্ মনে করিয়া একদিন পাশের বাড়ির চিমনীর ধোঁয়াও গিলিয়া ফেলিয়াছিলাম। সুদূর পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে দৃষ্টিকে দুর্গম অভিসারে পাঠাইতেছি এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা দয়া করিয়া দেখা দিলে আদেখ্‌লার মতো তারিফ করিয়া মরিতেছি। এ সকলই চেঞ্জ, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যে কলিকাতার রাস্তার মতোই গায়ে ধাক্কা দিয়া মানব সন্তানগণ কিল্‌বিল্ করিয়া বেড়াইতেছে, পাহাড়ী ও সমতলস্থানী, ইংরেজ-বাঙালি, পাঞ্জাবী-মার্কিণী, ভুটানী-নেপালী, চীনা প্রভৃতি জগতের প্রায় সকল জাতিনিচয়ের প্রতিনিধিগণ চৌরাস্তাভিমুখী রাস্তাগুলি দিয়া স্রোতের মতো আগাইয়া আসিতেছে, ইহা কি চেঞ্জের লক্ষণ? দার্জ্জিলিং পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতিস্ফীত জনতা গিস্‌গিস্ করিতেছে; যেন মরিয়া হইয়া সকলে একটিমাত্র জায়গা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই অবিশ্বাস্য জনতা সকল কিছু অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু জনতার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য দার্জ্জিলিং আসি নাই, জনতা এড়াইবার জন্যই আসিয়াছিলাম। যুদ্ধকালীন কলিকাতায় বাস করিবার পর জনতার প্রতি সকল আকর্ষণ হারাইয়াছি। ট্রামে বাসে, বাজারে-হাটে, বাড়ি সংগ্রহ ও

রসদ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায়, পথে ঘাটে, মাঠে মন্দিরে, সিনেমায় থিয়েটারে লোকের ভিড় ভোগ করিয়া জনতার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছি। মানুষ দেখিলেই মনে হয় এরা আসিয়া নিশ্চয়ই আমার আহার্য্য, বাসস্থান, বিচরণস্থান এবং সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবে। পঙ্গপালের মতো জনতা শহর ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথা হইতে ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছে, কতকাল ইহারা থাকিবে, কবেই বা ইহারা দূর হইবে, কিছুরই নিশ্চয়তা নাই, অথচ ইহাদের যুদ্ধকালীন আবির্ভাবে জীবনক্ষেত্র ফর্শা হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি জনতার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া প্রীতিরক্ষা করিতে না পারি, তবে কি তাহা খুবই দূষণীয় ?

আমি কবি-প্রকৃতির লোক। সুতরাং মানুষ অপেক্ষা আমার নিকট নিসর্গবস্তুসমূহ অধিকতর মনোহর মনে হয়। নির্জ্জনতাকে আমি সম্পদ বলিয়া বিবেচনা করি। এ অবস্থায় দার্জ্জিলিঙের পূজার ভিড় যে আমাকে তিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিবে ইহাই কি স্বাভাবিক নয় ? বুঝিলাম ভুল করিয়াছি। এ সময়ে এখানে চেঞ্জে আসা আমার পক্ষে খুবই মূর্খতার কাজ হইয়াছে। যাহারা পরস্পরের সাজ-পোষাক দেখিতে এবং দেখাইতে আসে, যাহারা পুত্রের চাকরি এবং কন্যার বর সংগ্রহের চেষ্টায় দার্জ্জিলিং অভিযান করে আমি তো তাহাদের দলের নই। তবে দার্জ্জিলিঙে না আসিলে আমার কি ক্ষতি হইত ? হিমালয় ও শীত যদি এতই কাম্য তবে তো কার্শিয়ঙে গেলেই চলিত। দার্জ্জিলিঙের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের লোভে কেন এখানে আসিলাম ? ভিড় হইতে কিছু কালের জন্য দূরে থাকিতে পারাই যখন আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন, তখন এমন ভুলও লোকে করে ?

সত্য সত্যই দার্জ্জিলিঙের ভিড় আমাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। যত নির্জ্জন রাস্তা দিয়াই বেড়াইতে বাহির হই না, দু'পাঁচটি করিয়া পরিচিত ব্যক্তি বাহির হইয়া দন্তবিকাশপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিবে—কোথায় আছি, কতদিন থাকিব, কখন বাড়ি গেলে আমাকে পাওয়া যাইবে ইত্যাদি নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে। পথপ্রান্তে নিজেকে একা মনে করিয়া যখনই কুয়াশা-অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়াছি, অমনি হয়তো পায়ের কাছ হইতে একটি সমগ্র পরিবার উত্থিত হইয়া পারিবারিক কোলাহল সুরু করিয়া দিবে। ভীত হইয়া যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি, তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। পশ্চাৎ হইতে ঘোড়-সওয়ারেরা ছুটিয়া আসিয়া অবশিষ্ট শান্তি এবং পাহাড়ী-নৈঃশব্দটুকু ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ছুটিয়া পালাইবে। বস্তুত অশ্বারোহণ-অপটু ব্যক্তিদের দার্জ্জিলিঙে ঘোড়া-রোগ বড়ই সংক্রামক। সস্তায় ঘোড়ায় চড়িবার সুযোগ পাইয়া এমন সব ব্যক্তির এবং ব্যক্তিনীর মনে জন্তু-ধাবন স্পৃহা জাগ্রত হয় যে, দেখিয়া বিরক্তির সহিত করুণা বোধ না করিয়া উপায় থাকে না।

আরও মুস্কিল এই যে, এই জনতার কোনও বৈচিত্র্য নাই। কতকগুলি মুখ এই জনতার মধ্যেও এমন অখণ্ড অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, বাহির হইলে ইহাদের না দেখিয়া আর উপায় নাই। দার্জ্জিলিঙের কমার্শ্যাল রো-টিকে একমাত্র বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে—এমনই কতগুলি নির্দ্দিষ্ট মুখ অসহ্য একঘেয়েমির সঙ্গে বারবার আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত, এইরূপ কতগুলি মুখকে আমি ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাদের অনেকেই আমার অপরিচিত ব্যক্তি, অথচ ইহাদের মুখ এতই পরিচিত এবং মুখ-দর্শন এতই অবশ্যম্ভাবী যে, ইহাদের কাছাকাছি উপস্থিত হইলে উল্টা দিকে ফিরিয়া ছুট দিতে ইচ্ছা হয়।

দার্জ্জিলিংয়ের জনতা চৌবাচ্চার জলের মতো ; ইহাতে স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, বৈচিত্র্য নাই। একই শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ অসহ্য পৌনপুনিকতার সহিত দৃষ্টিপথে এবং শ্রবণপথে পতিত হয়। ইহার চলাফেরা এবং আলাপ আলোচনার রীতি এমনই অভিন্ন যে, মানুষে মানুষে তফাৎ চোখে পড়ে না ; অখণ্ড জনতা বলিয়াই ইহাদের প্রতীয়মান হয়। আমার নিকট ইহা যে বিরক্তির কারণ হইবে, আমার কবি-প্রকৃতির সম্বন্ধে জানা থাকিলে ইহাও সহজে বুঝিতে পারিবেন। বস্তুত, দার্জ্জিলিঙের মানুষের ভিড়কে আমি ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রধান প্রধান শড়কগুলি দিয়া যেমন মানুষ-কীট কিলবিল করিয়া চলে তাহাতে ইহাদিগকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া আমি জনতা-অবজ্ঞাত পথগুলিই অবলম্বন করিয়াছি।

কিন্তু ইহাতেও রেহাই পাইলাম না। আজ ভোর আটটা হইতে সওয়া নয়টা এই কিঞ্চিতোর্দ্ধ একঘণ্টা

কালের মধ্যে এক অলাবুবাবুর সহিতই ছয়বার দেখা হইয়াছে। ভদ্রলোক আমার পরিচিত ব্যক্তি নহেন, তাই তাহার পিতৃদত্ত নামটি এমন অহরহ দেখিতে হয় যে, অন্তত নিজের কাছে বিরক্তি জানাইবার জন্ম তাহার একটি নাম স্থির না করিয়া পারি নাই এবং তাহার উদরের পরিধি ও মস্তিষ্কের ইন্দ্রলুপ্তটি লক্ষ্য করিয়া অলাবু অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নাম আর খুঁজিয়া পাই নাই।

ভদ্রলোক যেন আমার সহিত রসিকতা সুরু করিয়াছেন। তাহাকে এবং অন্যান্যকে এড়াইবার জন্ম যতই আমি নির্জ্জন ও সুবিধাজনক রাস্তা খুঁজিয়া মরিতেছি, ততই যেন তিনি আমার শান্তি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ঠিক সেই সকল স্থানেই ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া উদিত হইতেছেন।

জনশূন্য ক্যালক্যাটা রোডে অলাবু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আমি উর্দ্ধশ্বাসে চৌরাস্তার দিকেই ছুটিয়া আসিলাম। কিন্তু এ যেন তপ্ত কড়া হইতে লাফাইয়া চুলার আগুনে পড়া। দেখিলাম, দার্জ্জিলিঙের যাবতীয় স্ত্রী-পুরুষ চৌরাস্তার বেঞ্চগুলি অবলম্বন করিয়া আমারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। জনতা সহস্র বাহু মেলিয়া আমাকে আহ্বান জানাইবার জন্ম প্রস্তুত। শিহরিয়া উঠিলাম। শিহরিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলাম। চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক দিয়া প্রায় সুড়ঙ্গের মতো পূর্ব্ব বার্চ্চহিল্ রোড; জনতাকে হতাশ করিয়া এই পথ দিয়া সট্‌কাইয়া পড়িলাম। উৎরাইয়ের পথে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম।

নির্জ্জন ও মনোরম এই পথটি। কিন্তু একেবারে জনবিরল নহে। আশে-পাশে বোধ হয় সৈন্যদের কিছু বাসস্থান আছে, তাহাদেরই দুচার জন দার্জ্জিলিঙের কেন্দ্রায় জনতার সহিত মিশিবার জন্ম চৌরাস্তার দিকে চলিয়াছে। চতুর্দ্দিক ফগে অস্পষ্ট; সুদূর পাহাড়শ্রেণী অবলুপ্ত হইয়াছে, শুধু শাদা পটভূমিতে আকাশচুম্বী পাইনগাছগুলি জাপানী শিল্পরীতিতে আঁকা মনে হইতেছে। এ অস্পষ্টতা আমার ভালো লাগে। ইহা একটা নিবিড় একাকীত্বের আস্বাদ বহন করিয়া আনে। কাছের বস্তু বা ব্যক্তি ইহার প্রসাদে সুদূরতম হইয়া উঠিয়া প্রত্যেকেই নিজস্ব জগতে বিচরণ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করে। এ জন্যই দূরের কুজ্‌ঝটিকাকে আমি আন্তরিকভাবে আহ্বান করিতে লাগিলাম; কহিলাম, হে শুভ্রতা, হে ঐন্দ্রজালিক, তুমি আরও গভীর হইয়া অগ্রসর হইয়া এস। পূর্ব্ব বার্চ্চহিল রোডে বিচরণশীল আমার চারিদিকে তুমি একাকীত্বের বৃত্ত টানিয়া দাও। জনতার কাছ হইতে আমি মুক্তি পাই।

ম্যালের ঠিক নিচে বলিয়াই বোধ হয় প্রদীপের নীচের জায়গার মতো এ রাস্তাটা দার্জ্জিলিঙের চেঞ্জে-আসা ভিড়ের নিকট এক রকম অন্ধকার। অনেকক্ষণ চলিলাম, কিন্তু পরিচিত কোনও মুখই নজরে পড়িল না। মহা-আনন্দে নিরালম্ব মেঘের মতো কুয়াশায় আব্‌ছা পথটি দিয়া নিরুদ্দেশে চলিতে লাগিলাম।

দক্ষিণে গভীর কুহেলিকার রাজ্য কোমল শুভ্রতায় রহস্যপূর্ণ। নিশ্চিত জানি, আমার চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তাহার সমস্তটাই ঘন অরণ্য, পর্ব্বততরঙ্গ ও উপত্যকায় পূর্ণ, তবু মন যেন তাহা স্বীকার করিতে চাহে না; এই কুয়াশাকে অবলম্বন করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর স্বপ্ন দেখিতেছি; ভাবিতেছি, কি রহস্য আছে এই শুভ্রতার আড়ালে! আকাশের নীলিমার আড়ালে যে রহস্যের কল্পনা করি, এখানেও কি তাহাই আত্মগোপন করিয়া আছে?

সামনে চাহিয়া দেখিলাম, বড় শড়ক হইতে পায়ে-হাঁটা একটা পাগড়ী পথ খাড়া নিচের দিকে চলিয়া গিয়াছে। চলিয়া গিয়াছে একেবারে শুভ্রতার রহস্যের মধ্যে। এই পথেই যাইব কি? গাঢ় অস্পষ্টতার মধ্যে যাইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিব কি? কিন্তু এ পথ আমার পরিচিত নহে। কোথায়, কত নিচে নামিয়া গিয়াছে, কিছুই জানি না। ম্যুনিসিপ্যালিটির শড়ক নয় যে, ইহাকে অবলম্বন করিয়া কোনও পরিচিত স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিব। কোথায় কোন্ গহ্বরে ইহা চলিয়া গিয়াছে কে জানে?

সহসা সম্মুখে অশ্বখুরধ্বনি শুনিলাম। দেখিলাম, তাহার চেয়ে কিছু রোগা একটি ঘোড়ার উপর বসিয়া অলাবু-বাবু উল্টা দিক হইতে প্রসন্নবদনে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। যেন ভূত দেখিলাম; বার্চ্চহিল রোডের নির্জ্জনতা যেন উপহাস করিয়া উঠিল। কুয়াশা যেন রগড় করিয়া পাঁচ হাত দূরে সরিয়া গেল। আমি মরিয়া হইয়া দক্ষিণদিকের খাড়া ঢালু পাহাড়ী রাস্তাটা দিয়া পলায়ন করিলাম।

ভালোই হইয়াছে; সভ্যতার পথের বাহিরে পা

দিয়াছি। এইবার জনতা আর আমার নাগাল পাইবে না। ঢালু অপরিসর পথ দিয়া চলিয়াছি তো চলিয়াছি। ডাহিনে বামে ঘন শুভ্রতা; কোথাও কোথাও কাছাকাছির পাহাড়ী অরণ্যে অস্পষ্ট পাইন, পপ্লার গাছের রেখা চোখে পড়ে; পথপাশের পাহাড়ের দেওয়ালে বন্য লতার গুল্ম আস্তর কুয়াশায় বিবর্ণ। নাকের ডগা হইতে দু-তিন হাতের পর আর কিছুই নজরে পড়ে না। এক নির্জ্জন, দিকচিহ্নহীন, দৃশ্যবৈচিত্র্যহীন অপরিসর উৎরাইয়ের পথ দিয়া গভীরতর শুভ্রতা-সমুদ্রের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিতেছি।

সহসা একবার পিছনে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, নিরঞ্জন শুভ্রতায় পিছনের জগৎ অবলুপ্ত। পার্শ্বে চাহিলাম, দেখিলাম যতদূর দৃষ্টি যায়, সকলই কুয়াশাশুভ্র। সমুখে পিছনে, কাছে দূরে, উপরে নিচে সকলই শাদা, সকলই ধূম্র। এতক্ষণে কি পাহাড়ী, কি চেঞ্জের বাবু, একটি মানব-সন্তানও চোখে পড়ে নাই। ভালই লাগিতেছিল, কিন্তু যতই পরিশ্রম বাড়িতে লাগিল, নির্জ্জনতা দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—কোথায় চলিয়াছি? কেন চলিয়াছি? কোন্ পথে ফিরিব?

এইবার পথটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুদিকে গিয়াছে। কোন্‌টি বাছিয়া লইব? ডাহিনে যাইব, না বাঁয়ে যাইব? কোনটি লোকালয়ে গিয়াছে? যে পথে আসিয়াছি, সে পথেই ফিরিব কি? এমন চড়াইয়ের পথে ফিরিয়া যাওয়ার মতো শক্তি কি আমার অবশিষ্ট আছে? ইতিমধ্যে চার পাঁচটি বাঁক ঘুরিয়াছি; পথ গোলক-ধাঁধা হইয়া গিয়াছে। কোন্ পথ দিয়া কোন্ দুর্গমতর পথে যাইব, তাহারই বা ঠিক কি? এই ঘন কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট অরণ্যভূমিতে পূর্ব্বের পথটি ঠিক মতো চিনিয়া লওয়া সহজ কথা নয়। অবশ্য এ পথে চলিতে আমার ভালই লাগিতেছে, কিন্তু একেবারে হারাইয়া না যাই, সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

দক্ষিণের পথটিই বাছিয়া লইলাম। এটি ক্রমে উঁচু হইয়া আগাইয়া গিয়াছে। আমার অতিক্রান্ত পথের মতো ইহা খাড়া নহে; অথচ উর্দ্ধদিকেই যখন ইহার গতি তখন চলিতে থাকিলে ক্রমে অবশ্যই দার্জ্জিলিঙের স্তরে গিয়া পৌঁছিতে পারিব, ইহা খুবই সম্ভাব্য। বড় আনন্দ হইল। নিচের পাইনগাছগুলির চূড়ায় উপর দিয়াই যেন হাঁটিয়া চলিলাম। অরণ্যের গন্ধ, ফগের গন্ধ, বন্য উদ্ভিজ্জের গন্ধ নাকে আসিল। নির্জ্জনতা অখণ্ড হইল। মনে হইল, সারা জগতে একমাত্র জীব আমি, বিশ্ব-চরাচরে মনুষ্য-নামধারী আর কেহ নাই। আমার নিজস্ব সসাগরা পৃথিবী আমি পূর্ণমাত্রায়ই ভোগ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এ কি? পথ হঠাৎ নিচে নামিয়া যাইতেছে? এতক্ষণ উপরে লইয়া যাইবার সকল আশ্বাস দিয়া সহসা ইহা কি আমার সহিত প্রতারণা সুরু করিল? পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে পথে দাঁড়াইয়া দম সংগ্রহ করিতেছি। কিন্তু ইহা সাময়িকভাবে সঞ্জীবিত করিলেও এতক্ষণ ধরিয়া পথচলার অবসাদ গোপন করা যাইতেছে না। পথ নির্জ্জন; বৈচিত্র্যহীন পার্ব্বত্যবৃক্ষ ও নিশ্চল গাঢ় শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। দূরের অস্পষ্ট রেখাগুলিকে একটা ভুটিয়া বস্তি মনে করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি শ্যাওলা-শ্যাম বৃহৎ প্রস্তর পাহাড়ের গা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে। এতক্ষণে টের পাইলাম, আমার পা দু'টা আর পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভুল পদক্ষেপ করিতে পারিতেছে না; দৃশ্যের একঘেয়েমি পথের আকর্ষণ ম্লান করিয়াছে। দেখিলাম, কোথায় চলিয়াছি, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। অরণ্য গভীরতর হইতেছে। একটা জীবিত প্রাণীও চোখে পড়িতেছে না। কুয়াশা-অবগুণ্ঠিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দিক্‌চিহ্নহীন এই অর্দ্ধবাস্তব জগতে আমি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি!

পথ হারাইয়াছি! সহসা এই কথাটা মনের ভিতর পর্য্যন্ত চমকাইয়া দিল! এই নিবিড় অরণ্যভূমির মধ্যে আমি কোথায় চলিয়াছি? কি করিয়া গৃহে ফিরিব? কে আমাকে পথ বলিয়া দিবে? পথ অনুসন্ধানের মতো দৈহিক এবং মানসিক শক্তি কি আমার অবশিষ্ট আছে? এতক্ষণে নজরে পড়িল, পাহাড়ী পায়ে-চলা পথের খদের দিকে রেলিং বা কোনও প্রকার বেড়া নাই। অকস্মাৎ আমার পা টলিতে লাগিল। মনে হইল, কাৎ হইয়া গভীর অজানা গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া যাইব। মৃত্যু অটবী-দন্ত বিকাশ করিয়া এই অতল গহ্বরে আমারই মাংসের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি ডাহিন পাশের পাহাড়ের তৃণলতা আঁকড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু তাহাতেও ভরসা

হইল না। মনে হইল, চতুর্দ্দিকের পাহাড় এবং অরণ্য এবং অশরীরী পাহাড়ী প্রেত আমার বিরুদ্ধে এতক্ষণ ষড়যন্ত্র ফাঁদিতেছিল; বহু কলা-কৌশলে তাহারা আমাকে জনমানবহীন এই নির্জ্জন পর্ব্বতগহনে ভুলাইয়া আনিয়াছে। এইবার সকলে মিলিয়া অকস্মাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে; গর্ব্বিত এক মানব-সন্তানের উপর তাহাদের আক্রোশ চরিতার্থ করিবে।

শঙ্কিত হইয়া হাঁক দিলাম। 'কে আছ?' 'কে আছ এদিকে? সাহায্য কর, আমাকে বাঁচাও।' পাহাড়ের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিয়া সে চিৎকার আমাকে যেন বারবার ভেংচাইয়া গেল। মনে হইল, পাহাড়ের উপদেবতারা যেন ক্রুদ্ধ হইয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিতে লাগিল; 'দাঁড়া, তোকে মজা দেখাইতেছি।' পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল; মনে হইল, দেহ ধরিয়া কে ঝাঁকুনি দিতেছে। পথের উপর উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িলাম, তবু কে যেন আমাকে খদের দিকে টানিয়া লইতে লাগিল। প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলাম, 'কে আছ, বাঁচাও, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।'

'সাহাব!'

'কে?' চম্‌কাইয়া উপর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম মাথায় গোল টুপি-পরা এক বেঁটে পাহাড়ী পুলিসম্যান সমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তার দুই গোল গোল চোখে অসীম বিস্ময়, দুই ঠোট পোয়া ইঞ্চি ফাঁক হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, আমার দেহভঙ্গিটি ইহার কেন, যে কাহারও বিস্ময় উদ্রেক করিবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। পায়ে যেন জোর পাইলাম। শরীরের ঝাঁকুনি দূর হইয়াছে। ভদ্রতা বাঁচাইবার জন্য কহিলাম; 'পায়ে চোট পাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। তুমি কোথায় যাইতেছ? আমাকে চৌরাস্তায় পৌছাইয়া দিতে পারিবে?'

'আমি লেবং-ও দিদির গ্রামে বিজয়ার চালের ফোঁটা লইতে চলিয়াছি।' সে বিনীত ভাবে কহিল। 'দার্জ্জিলিং ফিরিতে দুপুর হইবে। আপনি একটু সামনে আগাইলেই উপর দিকে যাওয়ার রাস্তা পাইবেন। উহাই আপনাকে চৌরাস্তার কাছাকাছি পৌছাইয়া দিবে।"

তবু ভরসা পাইলাম না। কহিলাম 'তুমি আমাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিলে বকশিস পাইবে।'

'তার কোনও দরকার নেই, সাহাব।' সে লজ্জিত ভাবে কহিল। 'চলুন, আপনাকে সামনের রাস্তাটা দেখাইয়া দিয়া আসি। ওটা দিয়া বরাবর উপর দিকে হাঁটিয়া গেলেই হইবে; কোনও বাঁক চোর নাই।'

পথ ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছে। বুক আশায় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই উর্দ্ধযাত্রা যতই আয়াস-সাধ্য হউক, ইহা যে নিশ্চিত আমাকে লোকালয়ে মানুষের নিশ্চিন্ত নিরাপদ সান্নিধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ক্রমে কুয়াশা পাতলা হইয়া আসিতে লাগিল। উপরের স্তরের রাস্তা, কাছের এবং দূরের দুইচারটি বাড়ি চোখে পড়িল। পরম নির্ভরতায় পুলকিত হইয়া উৎরাইয়ের পথ লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিলাম। আবার পাহাড় ভালো লাগিল, পাইন গাছ অপূর্ব্ব মনে হইল, শুভ্র কুয়াশার সৌন্দর্য্য মধুর বলিয়া বোধ হইল। তবু পথে অপেক্ষা করিলাম না; দার্জ্জিলিঙ হিমালয়ান রেলের ইঞ্জিনের মতো হুস হুস করিতে করিতেই উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম।

ঐ তো উপরেই রেলিং-ঘেরা দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির শড়ক! কোন্ রাস্তা ওটা? ক্যালকাটা রোড কি?

হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরে উঠিয়া আসিলাম। পিচের রাস্তায় পরম নির্ভরতার সঙ্গে প্রথম পা দিয়া তবে চারদিক চাহিয়া দেখিবার শক্তি ও ফুরসৎ হইল। দেখিলাম, পায়ে-হাঁটা পথ ও ক্যালকাটা রোডের সংযোগস্থলে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দাড়াইয়া আছেন আমারই অলাবুবাবু। আমি সহর্ষে ছুটিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া পরম আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া কহিলাম, 'আপনাকে সর্ব্বদাই দেখতে পাই, কিন্তু পরিচয় না থাকাতে আলাপ করতে পারি না। আসুন, সেই পরিচয়টা সেরে নেই···'

ভদ্রলোক হাঁ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মহারাষ্ট্র ভ্রমণ—আলান্দি

শ্রীঅবনী নাথ রায়

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি (১৯৪৫) আমরা সপরিবারে আলান্দি যাই। মিঃ কুলকার্ণি এবং মিঃ আল্‌গুড়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, পরের বাসে মিঃ নিকাম, তাঁহার স্ত্রী, শাশুড়ী এবং ৩ মাসের শিশুপুত্র লইয়া হাজির হইলেন। ইঁহারা সকলেই আমাদের আপিসের লোক-সুতরাং সুপরিচিত। আপিসের চাপরাশি গণপৎ তার সঙ্গে ছিল—মোটের উপর আমাদের দলটি মন্দ হয় নাই।

আলান্দি পুণা হইতে কার্কীর অভিমুখে—কিছুদূর যাইয়া বাঁ দিকে যাইতে হয়। মাত্র ১৪ মাইল পথ—বাসে আমাদের ৮০ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। আমরা ওখানে পৌঁছিয়া রান্না করিয়া খাইব এবং সমস্ত



আলান্দির দৃশ্য—দূর হইতে

দিন কাটাইব, এই মনে করিয়া চাল ডাল সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। কেননা ইহার পূর্বে ডিসেম্বর মাসে কার্লগুহা দেখিতে যাইয়া বড় ঠকিয়াছিলাম। আজকাল র‍্যাসানের দিনে চাউল কোথাও পাওয়া যায় না—পয়সা দিলেও নয়, ইহা দেখিয়াছিলাম। বেলা এগারোটার পর আমরা আলান্দি পৌঁছিলাম।

বাস্ ষ্ট্যাণ্ডের ঠিক সামনেই আলান্দির সরকারী ডাক্তারখানা—তাহার প্রাঙ্গণ সূর্যমুখী ফুলে একেবারে ভর্ত্তি হইয়া আছে। ডাঃ ফাটক তখন ডাক্তারখানাতেই ছিলেন। ইনি আমার সহযাত্রী মিঃ কুলকার্ণির পরিচিত—আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া ডাক্তারখানায় বসাইলেন এবং চা খাওয়াইলেন। পরে ওখানকার এক পাণ্ডাকে খবর পাঠাইলেন। পাণ্ডার নাম আত্মাপ্রসাদ—বুড়া লোক। মুখে নানা সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে আসিলেন। তাঁর বাসা বেশি দূরে নয়—জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরের সামনেই। আমাদের সঙ্গে করিয়া তাঁর বাসায় লইয়া গেলেন।

পাণ্ডা তাঁর সব চেয়ে ভাল ঘরটিতে লইয়া গিয়া মৃগচর্মের উপর আমাদের বসাইলেন। ঘরের দেওয়ালে বীর সাভারকারের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে দেখা গেল। হিন্দুমহাসভার মন্ত্র এমন অখ্যাত ছোট পল্লীতেও আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে দেখিয়া আনন্দ হইল।

জিনিষপত্র রাখিয়া আমরা ইন্দ্রায়নী নদীতে স্নান করিতে গেলাম। বহুদিন নদীতে নামিয়া অবগাহন-স্নান করা হয় নাই। খুব ভাল লাগিল। নদীতে জল অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু আমাদের আনন্দের পক্ষে উহাই যথেষ্ট।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সারিয়া পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া আমরা জ্ঞানেশ্বরের সমাধি দেখিতে বাহির হইলাম। সকল তীর্থ স্থানের মত এখানেও ফুল, ধূপ, প্রসাদ প্রভৃতি বিক্রয়ের দোকান আছে—অন্য তীর্থস্থানের মত ভিক্ষুকের উপদ্রবও বেশ, পয়সা না পাইলে কাপড় ধরিয়া টানে। এককালে জ্ঞানেশ্বরের এই সমাধি নিতান্ত ছোট ছিল—এখন অবশ্য ভক্তদের আনুকূল্যে চারিপাশে দোতালা বাড়ী, নাটমন্দির, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ



জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরের একাংশ—আলান্দি

প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। বিঠল বা বিষ্ণুর মন্দিরও পাশেই—গণপতি, মারুতি প্রভৃতি দেবতাদেরও অসদ্ভাব নাই। আসল সমাধিস্থান অবশ্য নীচেয়—উপরে জ্ঞানেশ্বরের মূর্তি রাখা হইয়াছে। সমাধি পিরামিডের ধরণ—অর্থাৎ হিন্দু স্থপতিশিল্পের (architecture) নিদর্শন।

কালক্রমে আলান্দিতে অন্যান্য সন্ত এবং সাধকদের স্মৃতিকল্পে মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে নৃসিংহ সরস্বতীর মন্দির সব চেয়ে বড়। জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরের একটু দূরে—ইন্দ্রায়নী নদীর ধারে। এই সাধু বেশী বয়সে দেহত্যাগ করেন—তাঁহার একখানি তৈলচিত্র

বিলম্বিত দেখিলাম। আর একটি মন্দিরে "গোরা কুম্ভারের" মূর্তি দেখিলাম। "কুম্ভার" অর্থাৎ "কুম্ভকার"—ইনি জাতিতে কুম্ভকার



নৃসিংহ সরস্বতীর সমাধি মন্দির—আলান্দি

ছিলেন। কথিত আছে ইনি যখন ভগবানের নাম জপ করিতেন তখন বাহিরের জ্ঞান একরকম থাকিত না। অভ্যস্ত হাত পা কাজ করিয়া



গোরা কুম্ভকারের মন্দির—আলান্দি

যাইত মাত্র। একদিন ঐ ভাবে কাজ করার সময় নিজের শিশু সন্তান কুম্ভকারের চাকার নীচে পড়িয়া গিয়াছে জানিতে পারেন নাই। ফলে শিশুটি ঐ ভাবে পিষ্ট হইয়া মারা যায়।

আলান্দিতে দেড়শত ধর্মশালা আছে শুনিলাম। কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর মেলার সময় সবগুলি ধর্মশালা নাকি তীর্থযাত্রীর ভীড়ে পূর্ণ হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহাতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় ইন্দ্রায়নী নদীর উভয় তীরে বড় বড় বটগাছের নীচে অসংখ্য যাত্রী রান্নাবাড়া করিয়া খায় এবং সেখানেই রাত কাটায়। উত্তর ভারতে যেমন হিমালয়ের অন্তরদেশে কালী কম্‌লিওয়ালীর চটি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যেও সেই রকম গাড়্‌গে মহারাজ বা এই রকম আরো দুই চারিজন সাধু মহাত্মার উদ্যমে সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে অনেক ধর্মশালা নির্মিত হইয়াছে। আলান্দি গ্রামখানি ছোট—লোকসংখ্যা আড়াই হাজার। তবে কয়েক ক্রোশ পরিধির মধ্যে আরো কয়েকখানি গ্রাম আছে। আলান্দিতে মিউনিসিপ্যালিটি আছে—তাহারই পরিচালিত ঐ ডাক্তারখানার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। আলান্দিতে জলের কল আছে, কিন্তু বিজ্‌লী বাতি নাই। সেখানে ডাঃ সা নামক আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল—তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করেন। সরকারী ডাক্তারখানার ডাঃ ফাটক পূর্বে মিলিটারি ডাক্তার ছিলেন—পেন্‌সান নেওয়ার পর পুনরায় এই চাকরি নিয়াছেন; তাঁহার একছেলে এই যুদ্ধে কমিশন পাইয়া এখন ক্যাপ্টেন হইয়াছেন। ডাঃ ফাটকের প্রাণখোলা হা হা করিয়া উচ্চহাস্য সকলের ভাল লাগিয়াছিল।

* * * * * *

এইবার আলান্দির বিশেষত্ব কোথায় জানাইব। আলান্দিতে যে জ্ঞানেশ্বরের সমাধি-মন্দির তার থেকেই মহারাষ্ট্র সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সূত্রপাত। সেই কারণে জ্ঞানেশ্বরের জীবন-কথা প্রণিধানযোগ্য।

জ্ঞানেশ্বরের প্রধান কীর্তি গীতার টীকা মারাঠী ভাষায়—যার নাম "জ্ঞানেশ্বরী"। ইহার পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় অব্রাহ্মণদের অধিকার ছিল না, সুতরাং গীতা অব্রাহ্মণেরা পড়িতে পাইত না। জ্ঞানেশ্বর মারাঠী ভাষায় এই টীকা লিখিবার পর আপামর সাধারণ সকলে গীতার মহতী বাণীর সন্ধান পায়।

জ্ঞানেশ্বর একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন কিন্তু তবু তাঁর জীবন-কথা বড় করুণ। ইহা মুসলমান রাজত্বেরও পূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। তাঁহার পিতার নাম বিঠল পন্থ, মায়ের নাম রুক্মিণী। বিঠল পন্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে গুরুর আদেশে তাঁহাকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সেই সময়ে তাঁহার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। সন্ন্যাসীর পুত্রকন্যা বলিয়া এই তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়ে আজীবন অনেক কষ্ট পায়। তদানীন্তন বিচারবিহীন গোঁড়া সমাজ তাঁহাদের একঘরে করিয়া রাখে। তাহারা সহর হইতে দূরে কুমার কুমারীর জীবনযাপন করেন—এমন কি কুম্ভকার, কলু যাহাতে তাহাদের কাছে হাঁড়িকুড়ি কিংবা তেল বিক্রয় না করে তজ্জন্য তাহাদের প্ররোচিত করা হইত।

বিঠল পন্থের প্রথম পুত্র নিবৃত্তিনাথ ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেশ্বর ১২৭১ খৃষ্টাব্দে, তৃতীয় পুত্র সোপানদেব ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে এবং

কন্যা মুক্তাবাঈ ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানেশ্বর তাঁহার বড় ভাই নিবৃত্তিনাথের কাছে দীক্ষা লইয়াছিলেন।

১২৯০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৯ বৎসর বয়সে জ্ঞানেশ্বর গীতার টীকা লেখেন। জ্ঞানেশ্বরীর রচনাস্থান আমেদনগর জেলায় নেওয়াসা (Newasa) নামক গ্রাম। তাঁহার অন্যান্য বইয়ের নাম :--(১) হরি-পথ (গানের সংগ্রহ)। (২) সাংদেওপাষষ্ঠী—ইহা ৬৫টি কবিতার সংগ্রহ (৩) অমৃতানুভব—এই বইখানি বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে ধ্যানযোগে একত্ব অনুভব করিবার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ। মারাঠী ভাষার ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

দ্বিতীয় বইখানি বা "সাংদেওপাষষ্ঠী" সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। সাংদেও একজন সাধক ছিলেন—তিনি বনের বাঘকে বশীভূত



জ্ঞানেশ্বরের আজ্ঞাচালিত দেওয়াল—আলান্দি

করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বেড়াইতেন। নিজের ক্ষমতায় গর্বিত হইয়া তিনি একদিন বাঘে চড়িয়া জ্ঞানেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন প্রাতঃকাল—জ্ঞানেশ্বর একটা চাতালের উপর বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। সাংদেও নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য বলিলেন, দেখুন, আমি যোগ-শক্তিতে এই বনের পশুকে বশ করিয়াছি, ইহার পিঠে চড়িয়া বেড়াইতেছি। আপনি ইহা পারেন? জ্ঞানেশ্বর বলিলেন, বনের পশুর প্রাণ আছে, তাহাকে বশ করা কঠিন কথা নয়। আমি আজ্ঞা করিলে এই প্রাণহীন দেওয়াল আমাকে লইয়া চলিতে সুরু করিবে। সাংদেও বিশ্বাস করিলেন না—তখন জ্ঞানেশ্বরের কথামত সেই দেওয়াল চলিতে আরম্ভ করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া সাংদেও পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং জ্ঞানেশ্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তখন গুরু শিষ্যে যে কথোপকথন হইল তাহাই ৬৫টি কবিতায় "সাংদেওপাষষ্ঠী" নাম দিয়া গ্রথিত হইয়াছে।

আলান্দিতে এই দেওয়ালটি এখনো দেখান হয়—ইহার উপরে জ্ঞানেশ্বরের সকল ভাইয়ের এবং বোনের মর্মরমূর্তি রক্ষিত আছে।

মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিকী কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর দিন জ্ঞানেশ্বর দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে তিনি যোগাসনে উপবেশন করেন এবং সেই উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

ইহার প্রায় তিনশত বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে একনাথের অভ্যুদয় হয়। ইনিও একজন উগ্র তপস্বী ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে জ্ঞানেশ্বরের গলায় একটি গাছের শিকড় জড়াইয়া আছে এবং তাঁর শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি জ্ঞানেশ্বরের সমাধি পুনরায় খনন করান এবং দেখেন যে তাঁহার স্বপ্ন সত্য। তখন সেই গাছের শিকড় কাটিয়া দেওয়া হয়। জ্ঞানেশ্বর একনাথের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া সশরীরে তাহাকে দর্শন দেন এবং নিজের প্রণীত "জ্ঞানেশ্বরী" তাহার হস্তে প্রদান করেন। আদেশ দেন যে এই "জ্ঞানেশ্বরী" তখনকার সময়ের ভাষায় পরিমার্জিত করিয়া আপামর সাধারণ সকলের গোচর করা হউক। বর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রে যে জ্ঞানেশ্বরী প্রচলিত তাহা একনাথের কৃত।

হাঁড়িকুড়ির অভাবে মুক্তাবাঈকে কি রকম অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও গল্প আছে। একদিন পাত্রের অভাবে রুটি সেঁকা



ইন্দ্রায়নী নদী ও তাহার পুল—আলান্দি

অসম্ভব হইলে মুক্তাবাঈ খেদ করিতে থাকেন। ইহাতে জ্ঞানেশ্বর বলিলেন, কোন ভাবনা নাই, আমি ব্যবস্থা করিতেছি। এই বলিয়া তিনি নিজের পিঠ যোগশক্তিবলে এমন উত্তপ্ত করেন যে তাহাতে রুটি সেঁকার কাজ চলিয়া যায়। আলান্দিতে একটি মন্দিরে এই রুটি সেঁকার মর্মরমূর্তি রক্ষিত আছে।

উপরের বর্ণিত গল্পগুলি অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সেগুলি উল্লেখ করার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে মহারাষ্ট্রে এগুলি সকলেই—এমন কি ডিগ্রিধারী উকীল, ব্যারিষ্টারেরা পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

'আলান্দি' নামটি 'অলকাবতী' হইতে আসিয়াছে। ইন্দ্রায়নী নদী ইন্দ্রের কমণ্ডলু হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া কথিত। বর্তমান ভূগোলে দেখা যায় যে সে নদী কিছু দূরে গিয়া ভীমা এবং পরে কৃষ্ণা নদীর সঙ্গে মিশিয়া সাগরে পড়িয়াছে।

মহারাষ্ট্রে ওয়ারকারি সম্প্রদায় বলিয়া একটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে। ইহারা বাংলা দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বগোত্র। বৈষ্ণবদের মত ইহারাও কীর্তন করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে দুইটি স্থান এই সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থক্ষেত্র—একটি আলান্দি, অপরটি পান্ধারপুর (Pandharpur)। এই দুইটি স্থানের মধ্যে একশত মাইলের বেশি ব্যবধান। কৃষ্ণা একাদশীতে আলান্দি এবং শুক্লা একাদশীতে পান্ধারপুরে মেলা বসিয়া থাকে। এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা পায়ে হাঁটিয়া এক একাদশীতে আলান্দি এবং অপর একাদশীতে পান্ধারপুরে দেবদর্শন করিয়া থাকেন। জ্ঞানেশ্বরের পাদুকা শোভাযাত্রা করিয়া আলান্দি হইতে পান্ধারপুরে লইয়া যাওয়া হয়—পথিমধ্যে পুণা পড়ে। একদিন পুণার এক ধর্মশালায় এই পাদুকা রাখা হয়। গৈরিক রঙের পতাকা এই ওয়ারকারি সম্প্রদায়ের ধ্বজা—মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা বীর শিবাজীরও ঐ পতাকা ছিল। একাদশীর পূর্বে প্রায় দেখা যায় ছিন্নবসন বৃদ্ধ ও পীড়িত নরনারী গৈরিক ধ্বজা হাতে করিয়া আলান্দির মেলায় চলিয়াছে।

ইতি

শ্রীসমর সরকার এম-এ, বি-টি, বি-এল্

২

চিরঞ্জীৎ জয়তীর প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। কারণ যে-অতীত অলীক হয়ে গেছে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সে চায় না এবং জয়তীর সঙ্গে তার ব্যাপার শ্রীলতাকে বল্‌লে শ্রীলতা যে সব বুঝে তাকে রেহাই দেবে এ-ভরসাও তার ছিল না। বরং তার ভয় ছিল জয়তীর কথা শ্রীলতার মনের গতি রুদ্ধ ব্যাহত না করে তাকে সেইদিকেই আরও অগ্রসর করে দেবে। সুতরাং চিরঞ্জীৎ স্থির করে ফেল্‌লে যে, তার প্রথম জীবনের ইতিহাস শ্রীলতাকে বিশদভাবে না শোনানই উচিত। সেই জন্তই জবাব দিলে শ্রীলতাকে ধরাছোঁয়ানা দিয়ে।

'জয়তী আমার ক্লাসে পড়্‌ত, সে-কথা তোমাকে ত সেদিন বলেছি লতু···'

'সে ত শুনেছি···তার বেশী কিছু ত আমাকে বলনি?'

'বেশী বলার কি ছিল?'

'তুমি আমার কাছে এখনও লুকাচ্ছো? পাঁচ বছর আগে তোমার উপহার দেওয়া 'মহুয়া' আর 'শেলী'তে কি লিখেছিল মনে আছে?'

চিরঞ্জীতের এখন স্মরণ হল ওদের কথার মাঝে শ্রীলতা জয়তীর টেবিলের উপর ঐ বই দুখানা নাড়ছিল বটে। ওর কাছে এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতে পারলে—কেন শ্রীলতার সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। সব দিক বাঁচনার জন্ত সে বল্‌লে—'ক্লাশের সহপাঠিনীকে কবে কি লিখে দিয়েছিলুম, তাই দেখে তুমি আমাকে ভুল বুঝলে লতু?'

'তুমি যা লিখেছিলে তা' মিথ্যা মনে কর্‌ব কেন?'

'লতা, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর্‌ছ? আমার দুর্ভাগ্য যে আজ আমার ভালবাসায় তোমার সন্দেহ হচ্ছে।' চিরঞ্জীতের কণ্ঠস্বর দুঃখবিকৃত শোনাল।

শ্রীলতা এতক্ষণে একটু নরম হয়েছিল। সে চিরঞ্জীতের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে এনে রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—আমার ভয় হয় তোমাকে যদি আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নেয়।

'ভারী ভীতু তুমি···'

'নাঃ, তোমাকে আমি যেতে দেব না—' চিরঞ্জীতের হাতখানা নিজের মুঠার মধ্যে শক্ত করে শ্রীলতা বল্‌লে—'বল, তুমি যাবে না আমাকে ছেড়ে—'

চিরঞ্জীৎ শ্রীলতার কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লে—'কি যে বল তুমি···'

'সত্যি সে আমি সইতে পার্‌ব না—'

চিরঞ্জীৎ আদর করে হেসে বল্‌লে—'তুমি একটি পাগলী—'

সাময়িকভাবে বাইরে থেকে শ্রীলতা জয়তীর উপর ঈর্ষা দমন কর্‌তে পার্‌লেও তার মন তাকে সহজে রেহাই দিলে না। তুঁষে চাপা আগুনের মত সেটা গুমরাতে

লাগল। তার মুহূর্তগুলি এখন আর আগের মত সহজ, সরল, মুক্ত রইল না। পূর্বস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে চলাফেরা কর্‌তে চাইলেও মন যেন অজ্ঞাতসারেই স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। সে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল জয়তীর সঙ্গে চিরঞ্জীতের সম্পর্কটা সাধারণভাবে নিতে। যদি কোনদিন জয়তীর প্রতি চিরঞ্জীতের দুর্বলতা থেকে থাকে, তাতে আজ তার ক্ষতি কি?

চিরঞ্জীৎ এদিকে শ্রীলতার কাছে ভয়ে ভয়ে রইল। শ্রীলতা কখন ফেটে উঠ্‌বে কে জানে? শ্রীলতা নিজেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করলেও ঈর্ষ্যা তার মধ্যে কি-ভাবে কাজ কর্‌ছে তা' সে টের পেয়েছিল। শ্রীলতাকে সে এতদিন ভালবেসে এসেছে এবং শ্রীলতাও তাকে ভালবেসেছে, কিন্তু শ্রীলতার মনের এই বৃত্তিটির কোন পরিচয় পাবার অবকাশ তার কোনদিন ঘটে নি। এখন সে-পরিচয় পেয়ে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কারণ এই জিনিষটি তাদের দীর্ঘ পাঁচ বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তি ক্ষুণ্ণ করতে অগ্রসর হয়েছে। শ্রীলতার ঈর্ষা যদি তার নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, চিরঞ্জীৎকে স্পর্শ না কর্‌তো তাহলে চিরঞ্জীৎ এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। শ্রীলতা এখন যেন চোখে সন্দেহের অঞ্জন লাগিয়ে তার দিকে চাইতে আরম্ভ করেছিল। চিরঞ্জীৎ ভারী শান্তিপ্রিয় মানুষ। সামান্য জিনিষ নিয়ে তাদের শান্তি নষ্ট হয় সে তা চায় নি। সে স্থির করেছিল শ্রীলতার কাছে সে এখন কোন কিছু বল্‌বে না যাতে জয়তীর কথা উঠ্‌তে পারে। কিন্তু শ্রীলতার মনে জয়তীর একটা রেখা খোদাই হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে অতি সাধারণ যে-কোন কথার সঙ্গেই জয়তীর নামটাকে টেনে আন্‌তে প্রলুব্ধ হত। চিরঞ্জীৎ যে তার কাছে জয়তীর নাম করে না, সে তা লক্ষ্য করেছিল এবং লক্ষ্য করে মনে মনে কিছু যে চাপা আনন্দ উপভোগ করে নি তা' নয়। অবশ্য চিরঞ্জীৎকে ও সে-কথা বল্‌তে ছাড়ে নি।

'তুমি আজকাল খুব চাপা হয়ে যাচ্ছ দেখ্‌ছি।'

'তার মানে?'—বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু নেত্রে বল্‌লে চিরঞ্জীৎ। বুক তার টিপটিপ কর্‌তে লাগ্‌ল—কি বল্‌বে এখনই শ্রীলতা।

'মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? জয়তী কেমন আছে সে-কথা ত' আমাকে বল নি।'

'ওঃ, এই কথা!' হাঁফ ছেড়ে বল্‌লে চিরঞ্জীৎ—'একটু ভাল।'

'খোঁজ খবর ঠিক তাহলে রাখা হচ্ছে—' ব্যঙ্গভরা শ্রীলতার ভাষা। চিরঞ্জীৎ আন্দাজ করে নিলে বাতাস কোন্ দিকে বইবে। কিছু বলার চেয়ে না বলাই ভাল ভেবে সে রইল নিরুত্তর। ফল হল বিপরীত। চিরঞ্জীতের মৌনতা শ্রীলতাকে মৌন রাখতে পারলে না, উপরন্তু মুখর করে তুল্‌লে। সন্দেহের সাপ তার ফণা বিস্তার কর্‌লে—ঈর্ষ্যার বিষে তার লালা বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

'মুখে কথা নেই যে। তুমি যে ওখানে যাও আমাকে বল নি ত?'

'বল্‌বার কি আছে এতে। তুমি না গেলেও ভদ্রতার খাতিরেও অন্ততঃ আমার যাওয়া কর্তব্য।'

'আমাকে সঙ্গে নিলে দুজনের জম্‌বে কেন, তাই চুপি চুপি যাওয়া, বুঝেছি। পুরাণ প্রেম আবার ঝালিয়ে নিচ্ছ? বেশ ত আমাকে বিদেয় করে দাও না।'

'ছিঃ, কি যা তা' বল্‌ছ লতু?'

'যা তা কিছুই বলিনি, সত্যি যা তাই বল্‌ছি।...তুমি জয়তীকে ভুল্‌তে পার নি এ-কথা তোমার মুখের উপর স্পষ্ট লেখা রয়েছে—আর্শিটা এনে দেব, মুখখানা দেখবে?'

'নাঃ, জয়তীর উপর তোমার আক্রোশটা দেখ্‌ছি বেড়ে চলেছে। এ যেন বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।'

শ্রীলতা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল—'জয়তীর উপর তোমার দরদ দেখছি বড্ড বেশী। যাও না তার কাছে—থাক গে। এখানে এসেছ কেন? তোমাদের পথ ত বেঁধে দিয়েছে বন্ধনহীন গ্রন্থি, চল্‌তি হাওয়ার পন্থী হয়ে দুজনে চল্‌লেই পার।'

'লতু, তুমি বড্ড ভুল বোঝ। আমি যে শুধু তোমাকেই ভালবাসি এ-কথা কি আমাকে ঢাক পিটিয়ে প্রচার কর্‌তে হবে? তোমাকে সঙ্গে নিয়েই আমি যে জীবন পথে নেমেছি তা কি তুমি জান না?'

শ্রীলতা কেন উত্তর দিলে না। একটু জোর পেয়ে চিরঞ্জীৎ বলে চল্‌ল—'সত্যি, আমি বুঝ্‌তে পারি না কেন তোমার এই সব মনে হয়। তোমার আমার দীর্ঘদিনের সম্বন্ধের মধ্যে আজ হঠাৎ তুমি কেন যে ফাঁকি আবিষ্কার কর্‌লে তা আমি ভেবে উঠ্‌তে পারি না। মাঝে মাঝে

ভাবি আমি কি এতই ঘৃণ্য যে তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না ?'

চিরঞ্জীতের এই কথায় শ্রীলতার মনটা কেমন করে উঠ্‌ল। চিরঞ্জীৎকে সে প্রাণভরে ভালবেসেছে, তাই চিরঞ্জীতের অভিযোগে সে আহত হল। নিজেকে সে নিয়ত চেষ্টা করে সংযত করে' রাখ্‌তে, কিন্তু যখনই তার মনে হয় তাদের দুজনের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি বুঝি এসে দাঁড়াল তখনই সে উদ্ধত হয়ে উঠে। চিরঞ্জীৎকে কেমন করে' বোঝাবে সে নিজের আশঙ্কা। চিরঞ্জীতের কথার উত্তরে বাষ্পভরা নয়নে বল্‌লে সে—'তোমাকে ভালবাসি বলেই ত' আমার এত কষ্ট। কেন আমাদের মাঝখানে আর একজন এসে দাঁড়াবে ? তোমাকে যদি ভাল না বাস্‌তুম তা হলে তুমি কোথায় কি কর্‌ছ না কর্‌ছ সে-বিষয়ে কিছুই বল্‌তুম না। আমার মনের এ-কথাটি কি তুমি বোঝ না ?'

এর পর শ্রীলতা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। একদিন মাঝে জয়তীকে দেখেও এসেছিল। জয়তীর শরীর ভাল যাচ্ছে না দেখে চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ অতর্কিত-ভাবে এমন একটা ব্যাপারঘট্‌ল যাতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল।

চিরঞ্জীতের একটা পুরাণ সুটকেশ ছিল। ছাত্রজীবনে এটি সে দাদুর কাছে উপহার পেয়েছিল। বিদেশ ভ্রমণের সময়ে সেটা তার একটা অপরিহার্য উপকরণ ছিল। এরই সামনের দিকে একটা পকেট ছিল। পকেটটা এমন ভাবে তৈরী যে লাইনিংএর সঙ্গে মিশে গেছে—চট্‌ করে বোঝা যায় না। এইজন্য এই পকেটটা কখনও ব্যবহৃত হত না। সুটকেশ গুছাতে গিয়ে হঠাৎ শ্রীলতা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই পকেটটির ইলাষ্টিক্‌টা খুলে দেখ্‌লে—ভিতর থেকে একটা সাদা কাগজ উঁকি দিলে। এতদিন এটা তার নজরে পড়ে নি, তাই উৎসুক হয়ে তাড়াতাড়ি সেখানি টেনে বার করে সে পড়তে লাগ্‌ল : জয়তী লিখ্‌ছে চিরঞ্জীৎকে পাঁচ বছর আগে।—চিরঞ্জীৎ কেন তাকে ভুল বুঝে সেদিন চলে গেল—তাদের প্রেমের পূর্ণচ্ছেদ টেনে ?···অসবর্ণ বিয়েতে জয়তী রাজী হয় নি বটে, কিন্তু তাতে প্রেমের মর্যাদা কেন ক্ষুণ্ণ হবে···ইত্যাদি। শেষে অনেক মিনতি করে চিরঞ্জীৎকে অনুরোধ জানিয়েছে একটিবার সে যেন তার সঙ্গে দেখা করে।

চিঠিখানা পড়ে শ্রীলতার রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ল। ইচ্ছা হল চিঠিখানা সে কুচিকুচি করে' ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু চিরঞ্জীৎকে এমন একটা অভাবনীয় সাক্ষ্য দেখাবার জন্য সে সেখানা বার করে রেখে দিলে। সে এখন নিঃসন্দেহ হল চিরঞ্জীৎ যতই তার সঙ্গে জয়তীর প্রেমের কথা গোপন রাখার চেষ্টা করুক্ না কেন, তার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু চিরঞ্জীৎ কেন তাকে এ-কথা গোপন করেছিল ? সে ত কোনদিন চিরঞ্জীতের কাছে কিছু গোপন রাখে নি, অকপটে সবই বলেছে। সত্য কথা বলার সৎসাহস তার নেই ? এখনও পর্যন্ত সে অস্বীকার কর্‌ছে যে তাদের দুজনের মধ্যে ভালবাসা ছিল না।

এই সময়ে ঘরে ঢুক্‌ল চিরঞ্জীৎ। জয়তীর চিঠিখানা তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—'পড়ে দেখ।' শ্রীলতার মূর্তি দেখে চিরঞ্জীৎ ভয় পেয়ে গেল। চিঠিখানিতে দৃষ্টি পড়তেই সে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। আসন্ন দুর্যোগে সে কেমন করে' আত্মরক্ষা কর্‌বে মনে মনে চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌ল।

শ্রীলতা তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্‌লে—'এখনও বল্‌বে জয়তীর সঙ্গে তোমার কিছু ছিল না—সহপাঠিনী মাত্র ?' চোখে তার বাঘিনীর দৃষ্টি, সুগৌর মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক রক্তের তেজে রক্তিম হয়ে উঠেছে, নাসিকা ঘন ঘন স্ফুরিত হচ্ছে।

চিরঞ্জীৎ এর কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। সে জড়িতস্বরে বল্‌লে—'এ-চিঠি তুমি কোথায় পেলে ?

'তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দেবার জন্য এই চিঠি সুটকেশ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে।···আচ্ছা, তুমি কি একটু সত্য বল্‌তে শেখনি—মিথ্যা দিয়েই কি নিজেকে আবৃত করে' রেখেছ ?'

কণ্ঠস্বর নরম রেখেই চিরঞ্জীৎ বল্‌লে—'কি লাভ ছিল বল জয়তীর কথা তোমাকে জানিয়ে। সে ত আমার কাছে মৃত হয়ে গেছে বহুকাল। আমরা প্রেম দিয়ে যে-সংসার রচনা কর্‌ছিলুম জয়তীর উল্লেখ ত তাকে কোন রকমে সাহায্য কর্‌ত না—হয় ত আমার প্রতি তোমার বিরূপতা আস্‌তে পার্‌ত। সেটা ত কাম্য ছিল না লতু।'

'তাই বলে তুমি সত্য গোপন করে যাবে এবং

এখনও ? আমি যখন সমস্তই জেনে ফেলেছি তখন তোমার অস্বীকারোক্তির কি উত্তর দেবে ?'

'উত্তর আমার ঐ একই লতু। আমি ত বলেছি যে-অতীত স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে তাকে কেন আমি বর্ত্তমানের রঙীণ নিমেষটুকু ধ্বংস করতে দেব ? তা'ছাড়া তুমি জয়তীর নামে এমন চটে উঠেছ যে তোমাকে জয়তীর সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহস করিনি।'

'তুমি কি ভেবেছিলে আমার মন এতই হীন যে তোমাদের সম্পর্কটাকে ভালভাবে দেখবার মত উদারতা আমার নেই ?'

অপ্রস্তুত হয়ে চিরঞ্জীৎ বল্‌লে—'না না, আমি তা বলিনি—'

'আর কথা ব'ল না কাপুরুষ—তোমাকে চিন্‌তে আমার আর বাকী নেই। আমার জীবনটাকে তুমি একেবারে ব্যর্থ করে দিলে।'

'তুমি এ-কথা বলছ কেন লতু ? আমি কি তোমাকে ভালবাসা দিতে কার্পণ্য করেছি ?'

'তুমি যে প্রবঞ্চনায় পটু তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ দিয়েছ। নিজে ভালবাসার নিখুঁত অভিনয় করে আমার কাছ থেকে ভালবাসা নিয়েছ প্রবঞ্চনা করে। কোন অজুহাত দেখিয়ে নিজের কপটতাকে ঢাকতে যেও না।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে শ্রীলতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সতেজ পদক্ষেপে।

দিনকয়েক বাদে একদিন বেড়িয়ে ফিরে এসে শ্রীলতা চিরঞ্জীৎকেবল্‌লে—'জয়তীরা চলে গেছে আমাকে বলনি ত' ?'

শরীর ভাল না থাকায় সেদিন চিরঞ্জীৎ বেড়াতে যায় নি। জয়তী তার এক পরিচিতার সঙ্গে বেরিয়েছিল। চিরঞ্জীৎ বারান্দায় তার সেই প্রিয় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে উদাস নয়নে সামনের দিকে চেয়েছিল। শ্রীলতার কথায় তার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল না। আগ্রহহীন স্বরে বল্‌লে—'তোমার জেনে কিছু লাভ নেই তাই।'

শ্রীলতা তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বল্‌লে—'এবার কল্‌কাতায় ফিরবে না ? জয়তী চলে গেছে, এখানে আর মন টিঁকবে কেন ? কল্‌কাতায় গিয়ে এবারে ওদের বাড়ীতেই থেক—জামাই আদরে থাকবে।'

ক্লান্ত ভর্ৎসনার স্বরে চিরঞ্জীৎ বল্‌লে—'ছিঃ লতু, অমন করে বল না—'

ফেটে পড়ল শ্রীলতা--'কেন গায়ে লাগছে ? যদি লেগে থাকে, যাও না জয়তীর কাছে—'

'জয়তী আমাদের নাগালের বাইরে লতা।'

'তোমার জয়তী তোমার নাগালের বাইরে কি রকম ?'

'জয়তী আর পৃথিবীতে নেই, কাল সকালে সে চলে গেছে—তুমি কি বল আমাকেও সেখানে যেতে ?'

হাত দিয়ে চিরঞ্জীতের মুখ চাপা দিয়ে অনুতপ্তকণ্ঠে বলল শ্রীলতা—'আমাকে ক্ষমা কর তুমি—আমি না জেনে তোমায় ও-কথা বলেছি।...বল, আমাকে ক্ষমা করলে ?' শ্রীলতার বড় বড় জলভরা চোখ দুটি হতে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

চিরঞ্জীৎ শ্রীলতাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

আজাদ-হিন্দ-সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

এখন যে গল্পটি আমি বলিব, আমি জানি না অপর কেহ স্থানান্তরে—ক্ষেত্রান্তরে—অথবা পত্রান্তরে বলিয়াছেন কি-না! আমার সূত্র নিঃসন্দেহে যদি না নির্ভরযোগ্য হইত, তাহা হইলে তাহার উপরে সৌধ নির্ম্মাণের উদ্যোগ আমি করিতাম না। আর যদি এমনও হয় যে এই কাহিনী অন্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই বা দোষ কি! কত অসত্য, অমূলক, অলীক কাহিনী লোকের মুখে মুখে—যুগে—যুগে—শতাব্দীতে শতাব্দীতে সত্য বলিয়া বাজারে চলিয়া গেল, আর একটি সত্য ঘটনা—গৌরবময় কাহিনী ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত হইবে, সেই বা কেমন কথা গা ?

পরম বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ, সর্ব্বকৃৎ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান বিরোধী ছিলেন। বিধিমত উপায়ে বিরোধ নিরোধের জন্য

প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। আত্মীয়নিগ্রহ নিবারণকল্পে নিজ মান, মর্য্যাদা, জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াও যখন দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল, তখন কোন পক্ষাবলম্বন না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া পৃথিবীতে যে মহদাদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন, কথকঠাকুর ও ঠাকরুণদিদিগণের কল্যাণে সে কথা পৃথিবীর বড় কেহ জানে না। জানা উচিত ছিল, জানিলে উপকার হইত; কিন্তু দুঃখ এই যে, জানে না। বরং জানে, তিনিই যত নষ্টের গুরু ঠাকুর; জাতিবিরোধ ও মহাযুদ্ধ তাঁহার প্ররোচনাতেই ঘটিয়াছিল। আরও জানে, তিনি বাল্যে মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; যৌবনে যুবতী গোপাঙ্গনাগণের বসন চুরি করিয়া মানসে কাম চরিতার্থ করিতেন; পরনারী—তাহাও আবার একটি দু'টি নহে, আমেরিকান শাস্ত্রিদিগের মত পাইকারী দরে—পরনারী সম্ভোগলালসায় 'লেকের ধারে' চন্দ্রমাশালিনী নিশীথে, কদম্বের মূলে রাসলীলার আসর জমাইতেন। প্রচারের কি বিচিত্র মহামহিমা! ক্লেরিওনেট্ অথবা পিকলুজাতীয় কোনও বংশীতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সেই বাঁশী হস্তে তিনি গৃহস্থ বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং কোকিল যেমন কুহুরবে প্রেমিক-প্রেমিকা চিত্ত আনচান করিয়া দেয়, বংশীধ্বনি করিয়া এই ভদ্রলোকটিও তাহাই করিতেন। তাহাতেও উদ্দেশ্য সফল না হইলে মার্কিণ মহাবীরগণের ন্যায় কণ্ট্রাক্টর বা সাপ্লায়ার নিয়োজিত করিতেন। কণ্ট্রাক্টরদিগের মধ্যে কুব্জা প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে সিদ্ধবাক্ কথক ঠাকুর ও ঠাকরুণদিদিগণ বংশীধ্বনির প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনেও বিরত নহেন। 'মধুর মধুর বংশী বাজে, সেই ত বৃন্দাবন'—যেমন বংশী বাজিল—বনমাঝে কি মনোমাঝে কে-জানে, অমনি শ্রীকৃষ্ণের নদীরূপা মহিষী (বাপ্!) কালিন্দী যমুনা উজান বহিল; গোপাঙ্গনাগণ গৃহ-সংসার, পতি-পুত্র, শাশুড়ী-ননদ, মায় জটিলা-কুটীলা পর্য্যন্ত, ফেলিয়া-ঝেলিয়া কাহারও বা চোখে ধূলি বালি দিয়া, তনুমনঃধন, জীবন-যৌবন অর্থাৎ সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে ছুটিল। বংশীবাদকও তাহাই চাহেন; তাহাই অভিলাষ।

"কাচিদঙ্গুলিনাগৃহাৎ তন্বী তাম্বুল-চর্চ্চিতম্
একাতদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ।"

আমার দুঃখ এই যে ইহার সুষ্ঠু বঙ্গানুবাদ আমার সাধ্যাতীত। আহা, কি অপরূপ চরিত্র চিত্রণ! ধন্য কথক ঠাকুর, তুমিই ধন্য, কি ছবিই গাঁথিয়া দিয়াছ।

তা থাক্ সে কথা। সুভাষ আই-সি-এস-স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন (ভালই করিয়াছিলেন) সকলেই জানেন; কিন্তু কেন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ কারণ ছিল কি-না, থাকিলেও তাহা কি, অনেকে তাহা না জানিতেও পারেন এবং প্রচারের কল্যাণে বা কৌশলে ভগবান ভূত হইতেও পারেন। তাই সে কথাটি আমাকে এখন বলিতেই হইবে। সেই কথাটি "প্রত্যক্ষ কারণও" বটে, বিদ্বেষ-বিষ-বৃক্ষের বীজ বপনও বটে! ইচ্ছা ছিল, চিঠিখানি প্রতিলিপি করিয়া মুদ্রিত করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রসম্বলিত কাগজখণ্ড বর্ত্তমানে লজ্জাবতী লতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কাগজের মত নির্জীব পদার্থেরও এমন স্পর্শকাতরতা দেখিতেছি যে তাহার অঙ্গস্পর্শে সঙ্কোচ অনতিক্রম্য হইয়া পড়িতেছে। এই চিঠিখানি সেই দিন লেখা—যেদিন একজন ভারতীয় বৃটিশ মহাসাম্রাজ্যের কৌস্তভরত্নসমাদৃত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে হাসিমুখে ইস্তফা দিয়া আসিয়াছিল। পত্রখানি, কেমব্রিজ, ফিট্জ উইলিয়াম হল্ হইতে লিখিত হইয়াছিল।

"আজ কর্ত্তব্যের আহ্বানে I. C. S. চাকরী ইস্তফা দিয়াছি। আমাদের একটা বই পড়তে হোতো তাতে আছে "Indian Syce is dishonest." আমি ঐ sentence সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করি, কারণ ঐ sentence পড়ে পাঠকের মনে ধারণা হবে যেন ভারতবাসীরা dishonest। কর্ত্তৃপক্ষ next editionএ কথাটা তুলে দেবেন বলেন। আমি বলি যে যখন জিনিষটা অন্যায়, আমি ঐ লাইন পড়িব না। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, না তোমায় পড়তে হবে। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম "আমি তাহলে চাকুরী ছাড়িয়া দিলাম।"*

* চিঠিখানি সুভাষের সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনারম্ভের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যে কয় ব্যক্তির সহিত সুভাষ অবিমিশ্রভাবে বিজড়িত ছিলেন, মদীয় সুহৃত্তম চারুচন্দ্র তন্মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। কটকে পাশাপাশি বাড়ী, এক স্কুলে, এক সঙ্গে, এক ক্লাসে অধ্যয়ন, পরীক্ষায় পাশাপাশি স্থান অধিকার

পত্রের ভাব ও ভাষা এতই স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও স্বতোস্বচ্ছ যে আমার "মল্লিনাথস্থ টীকা" করিবার প্রয়োজনাভাব; কিন্তু ব্যাপারটা যখন হুঁকার জল নহে, তখন একটু বিশদ করিয়া বলিতে দোষই বা কি! ধূমপায়িদের অজানা থাকিতে পারে না যে হুঁকার জল মাত্র দু' দশ ফোটা বেশী হইলেও মুশ্‌কিল, ফস্ ফস্ শব্দ করিয়া মুখে জল উঠিতে থাকে। ধূমপানের আনন্দ ব্যাহত হয়।

আই-সি-এস্ পরীক্ষা পাশের পরে হাতে কলমে শিক্ষার (প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিঙের ব্যবস্থা আর কি!) ব্যবস্থা আছে; তাহাতে কিছু কিছু পড়াশুনাও করিতে হয়। সেই ব্যবস্থার মধ্যে একখানি অবশ্যপাঠ্য 'প্রাইমার' গ্রন্থ আছে—গ্রন্থ না বলিয়া গীতা—সিভিল সার্ভিশ গীতা বলিলেই বোধ হয় প্রাইমারখানির সম্যক পরিচয় প্রকাশ ও মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। প্রাইমারের একাংশে ঐ ছত্রটি ছিল —Indian Syce is dishonest. ভারতীয় সহিস অসৎ। সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া যাহারা বৃটিশের সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে, সাম্রাজ্যের স্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইবে, আকাশে ঈশ্বর, মর্ত্ত্যে সিভিল সার্ভাণ্ট—কে অধিক শক্তিমান অনন্তকাল ধরিয়া যে তর্কের মীমাংসা কেহ করিতে পারিবে না, সেই অমিতপ্রতাপশালী, অসীম শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে তুচ্ছ, নগণ্য, ঘৃণ্য সহিসের কথাটা শুনাইতে হইল কেন? যে সিভিল সার্ভাণ্ট জেলার দণ্ডমুণ্ডের একছত্রাধিপতি হইবেন, বিভাগের অবিসম্বাদিত অধীশ্বর হইবেন, চাই কি লাটের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া কোটী কোটী মানব-শিশুর রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা হইবেন, তাঁহাকে দশ টাকা বেতনের অধম সহিসের গুণপনা হৃদয়ঙ্গম করাইবার কি কারণ থাকিতে পারে?

কারণ আছে বৈ কি! গুরুতর কারণ আছে। অকারণে কেহ কিছু করে না। কূটনীতিবিশারদ বৃটিশ অকারণে সহিসকে এতখানি প্রাধান্য দেয় নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যদেবতা যদি ভারতবাসীর প্রধান গুণটিই না জানিল, ভারত শাসন সে কিরূপে করিবে? ভাগ্য-নিয়ন্তা ভারতবর্ষে গিয়া দেখিবে, কি সহিস, কি বেহারা, কি বাবুর্চ্চি, কি বা কেরাণীবাবু সকলেই পরম অনুগত, অতীব বিনীত; দেখিবে, সদাই তটস্থ, হুকুম তামিলে তৎপর; 'না' বলিতে জানে না; ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে; প্রভু বলিতে 'প্রাণ করে আন্‌চান'! দেখিয়া শুনিয়া পরম কারুণিক দয়াল যীশুপুত্র যদি বা 'প্রেম করিয়া বসে', তাই এই সতর্কবাণী! সাবধান, অসাধুদের সম্বন্ধে সাবধান। বিশ্বাস করিও না, আস্কারা দিও না; হে সাধু, সাবধান।

কথাটা পাঠকের মনে করাইয়া দেওয়া ভাল। সিভিল সার্ভিশের সৃষ্টিকালে শ্বেতাতিরিক্ত কোন জাতির প্রবেশাধিকার কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। কৃষ্ণকায় রেয়োভাটগণ যে এখানেও ভিড় জমাইতে আসিবে সার্ভিশের সৃষ্টিকর্ত্তারা ইহা ভাবিতেও পারিতেন না।

স্লো-পয়জন ইহাকেই বলে। কত সহজে, কেমন নির্দ্দোষ-নিরপরাধ উপায়ে বিষাইয়া দেওয়া হইল। কোথায়ও একটু খিচ্ রহিল না; কোনস্থানে একটু দাগ পড়িল না; সুচারুভাবে কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সুভাষচন্দ্র বসু আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ভারতবাসীর চরিত্রের প্রতি এই কটু কটাক্ষ মানিয়া লইতে পারিলেন না। তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। পরীক্ষকগণ তর্কে পরাস্ত হইয়া স্বীকার করিলেন যে ঐ ছত্রটি অসঙ্গত এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে বাদ দেওয়া হইবে; কিন্তু সুভাষ বসু ধারে কারবারে রাজী নহেন। তিনি যুক্তি দিলেন, যাহা অসঙ্গত তাহা এখনই বিলুপ্ত হইবার যোগ্য। আজ নগদ, কাল ধার!

তা' কি করিয়া হয়? আবার তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল

ইহাই ছিল বাল্যে ও কৈশোরে একদুজয়ের বিশেষত্ব। পরে সুভাষ I. C. S. ও চারু B. C. S। তাহার পরে? চারু আজও জেলা জজের আসনে বসিয়া কাহাকেও জেল, কাহাকেও বা ফাঁসী দিতেছেন; ঘর সংসার করিয়া আমাদেরই মত—অথবা (কিম্বা না-হয়) একটু উঁচুতে উঠিয়া দশের এক হইয়া আছেন; আর সুভাষ? ভারতাকাশে শত সূর্য্যের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া সুভাষ-ভাস্কর কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে কে জানে! কিন্তু আকাশ এখনও আজও প্রভাময়; বাতাস অত্যুত্তপ্ত; জনগণমন উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত। সুভাষের সুবাসে ভরা। সুভাষের প্রথম জীবনে চারু ছাড়া আরও দুইজনের সান্নিধ্যের সংবাদ পাওয়া যায়। জগন্নাথ দাশ চৌধুরী ও হেমন্তকুমার সরকার। জগন্নাথ উড়িষ্যাপ্রদেশের এক জমীদারবংশসম্ভূত উড়িয়া বালক; আর নদীয়ার চাঁদ হেমন্ত কংগ্রেসে আসিয়া সারাজীবন কারাবাস করিতেছে। "চালচিত্র" অধ্যায়ে আমি তাহাদের কথা বিশদভাবে বলিব।—লেখক।

এবং তর্কের অবসানে সুভাষচন্দ্রকে সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়া আসিয়া ঐ চিঠি লিখিতে হইল। আই-সি-এস্ নাট্যের উজ্জ্বল দৃশ্যের যবনিকা উঠিতে না উঠিতে সীনের দড়ি ছিঁড়িল। যবনিকা পতন হইল। বোধনে বিসর্জ্জন।

তা হোক। কিন্তু বৃটিশের দুরভিসন্ধিমুলক প্রচার-কার্য্যের বিরুদ্ধে যে কঠোর মনোভাব দৃঢ়ীভূত হইল, তাহা হ্রাস না পাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। তাহারও কারণ স্পষ্ট এবং বহু।

ইতিহাস সত্যকথা কদাচিৎ বলে। সত্য গোপন ও সত্য বিকৃত করিবার অসামান্য নৈপুণ্য ইতিহাসের আছে। শুধু কি তাহাই? ক্রীতদাসী যেমন প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বস্ব—নারীত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়, বিজয়ীর পক্ষে নির্লজ্জ স্তাবকতা করিতে নির্লজ্জ ইতিহাসের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। ভারতে বৃটিশের দান অশেষ ও অসংখ্য, ইহাই আমরা শুনি; পৃথিবীতে এই ঢক্কাই নিনাদিত। কিন্তু বৃটিশের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূচনা যে ভারত বিজয়ের পরবর্ত্তী কালেই ঘটিয়াছে, এই সত্য যতই অরুচিকর হোক, গোপন করিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সালসার বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখা যায় "কি ছিলাম" আর "কি হয়েছি"। ভারত অধিকারের পূর্ব্বে বৃটিশের অবস্থা ও ভারত অধিকারের পরে গ্রেট বৃটেনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সেই আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের উপমা সুপ্রয়োগের বাসনাই প্রবল হইবে। নদীর এক কূল ভাঙ্গে, অপর কূল গড়িয়া উঠে—এই উপমাও সর্ব্বজনবিদিত। ভারতের যেদিন হইতে অবনতি, সেইদিন—সেইক্ষণ হইতে বৃটিশের উন্নতি। ভারত যত জীর্ণ, যত শীর্ণ, বৃটেন ততই শোভায় সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ। বিয়ের জল বলিয়া একটা মেয়েলি কথা চলিত আছে। কথাটার গূঢ়ার্থ যাহাই হোক, বঙ্গগৃহে বিনা সঙ্কোচে ও অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃটিশের সৌভাগ্যবশে ভারতের সঙ্গে যে শুভদিনে সুতহিবুকযোগে গাঁটছড়া বাঁধিতে পারিয়াছিল, তাহার পরমুহূর্ত্ত হইতেই "বিয়ের জলে" তাহার রূপ, তাহার শ্রী, তাহার বুদ্ধি, তাহার বিদ্যা, ধন, মান, মর্য্যাদা ভারে ভারে, শতধারে বরষার বারিবৎ হইয়াছিল। পাঠিকারাণীর বিম্বাধরে হাস্যস্ফুরিত বিজুরী খেলিতেছে দেখিতেছি; প্রশ্নগুলি এই—কে বা বর, কে বা ক'নে! বিবাহ হইল কোন্ মতে? দৈব? অসুর? পৈশাচ? হায় রে, সেই ইতিহাস কেহ সহজ ও সরল ভাষায় লিখে না কেন? বৃটিশের ধনৈশ্বর্য্য, অভ্রভেদী দণ্ডদর্প, অতুল্য রাজনীতিজ্ঞান, পৃথিবীর খবরদারীর মূলে যে এই ভারতবর্ষ নামক পরশ পাথরখণ্ড—এই অখণ্ডনীয় সত্য পৃথিবীময় সুপ্রচারিত হয় না কেন! অবশ্য জানে সবাই, শুনে সবাই, দেখেও সবাই; তথাপি সুপ্রচারের প্রয়োজন আছে। আর্কফলায় গাঁদাফুলবদ্ধ কথকঠাকুর হইতে থিয়েটারে সিনেমায় বৃটেনের "সেইদিন" আর "এইদিন" কথিত, অঙ্কিত, চিত্রিত ও প্রতিফলিত করিতে উদ্যোগী হইতে বিরত কেন, অনেক সময়ে আমি তাই ভাবি!

১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষে আবহাওয়া যখন অত্যুষ্ণ, নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর অনুকরণে তরুণ ভারত যখন কদমে কদমে অগ্রসর হইতেছে, তখন বৃটিশের নৌ-বাহিনী, সৈন্য-বাহিনী, অস্ত্রশালায় বিদ্রোহ ঘটে। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ—এক সঙ্গে বৃটিশ বিনষ্ট হোক রবে নিনাদিত। সহরের রাজপথে রক্তের নদী বহিয়া যাইতেছে; তরুণ ভারত রক্তস্নান করিয়া উল্লাসে মাতিয়াছে; মরণকে আমন্ত্রণ দিয়া আনিতে চাহিতেছে; খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়াছে, বায়ু অনুকূল, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত অগ্নি বিসর্পিত হইবার উপক্রম। নাড়ীজ্ঞানে বৃটিশ আনাড়ী নহে। ভারতের চির অচঞ্চল মানুষ চঞ্চল; বায়ু চঞ্চল, বুঝিবা জড় প্রকৃতিও চঞ্চল; ভারতে পুলিস চঞ্চল; কারখানায় কর্ম্মী চঞ্চল; চির অনুগত পদানত গুর্খাও চঞ্চল। ১৮৫৭র স্মৃতি চিরজাগ্রত। দম্ভভরে, হাস্য সহকারে অবহেলা করিবার সাহস বৃটিশের আর হইল না। বিক্ষোভের তদন্ত স্বীকার করিল।

কালের কি বিচিত্র গতি। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ বৃটিশকে কুইট ইণ্ডিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছিল। মহাপাপ করিয়াছিল। ভারতবর্ষকে মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। পঙ্গপালের অভিযানে শস্যক্ষেত্রের যে দশা ঘটে, বৃটিশের পাশবপ্রবৃত্তির অভিযানে ভারতের সেই দশাই ঘটিয়াছিল। বিহারের আইন সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রবীণ সদস্য রামবিনোদ যেদিন সে কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, আইন সভার যদি চক্ষু থাকিত, চক্ষুর জলে সে'ও ভাসিয়া

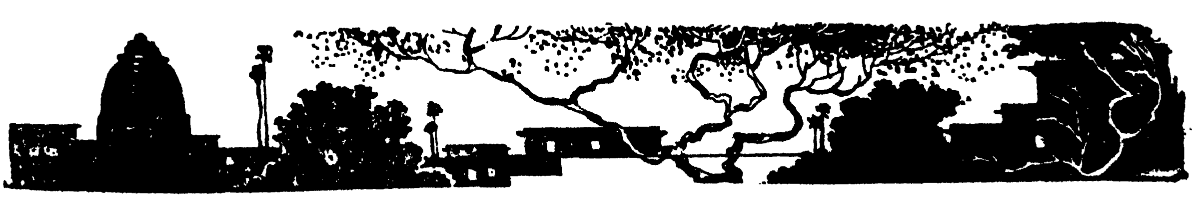
যাইত। গুলী করিয়া মনে হইয়াছে যথেষ্ট হয় নাই; বিদ্রোহীর গৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়া মনে হইয়াছে, এমন বেশী কি হইল? ডিনামাইট দিয়া বস্তীর মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ পশু ও বৃটিশ মনুষ্যের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। বৃটিশ পশু নভেম্বর মাসের একুশে কলিকাতার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে রক্তের নদী প্রবাহিত করিল; ২২এ নভেম্বর বৃটিশ-মনুষ্য লালদীঘির পথ মুক্ত করিয়া দিল। নেতাজীর আই-এন্-এদের কোর্ট মার্স্যালে ক্ষমা নাই বিঘোষিত করিয়াও মামলা প্রত্যাহার করিল। বৃটিশ-পশু লাহোরে ও দিল্লীতে নাৎসী অনুকরণে বেল্সেন ক্যাম্প বসাইয়াছিল, বিদ্রোহীদের কামানের মুখে স্থাপিত করিয়া অনুপরমাণুতে পরিণত করিতেও পারিত, তাহা না করিয়া বৃটিশ-মনুষ্য বিদ্রোহের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। সাময়িক ইতিহাস অন্বেষণ করিলে বৃটিশের অন্তর্দ্বন্দ্বের বহু পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যাইবে।

বোম্বাইয়ের নাবিক বিদ্রোহের পরে একটা তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। বসিয়াছিল না বলিয়া, বসাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল বলাই বোধ হয় সঙ্গত হইবে। তদন্তের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে না দেওয়াই বোধ করি ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেইচ্ছাও পূর্ণ হইল না। তদন্তে প্রকাশ পাইল, নোঙরের একই দড়ি ভারতের কালা আদমী কালা হাতেও টানে, শ্বেতদ্বীপের শ্বেত হস্তও টানে। দড়ী এক, কাজ এক, উদ্দেশ্য এক—কিন্তু ন্যায়ের এমনই বিধান যে কালো যে বেতন পায়, শ্বেত পায় আটগুণ, কখনও দশ গুণ অধিক। জাহাজের একই চাকা, কৃষ্ণ হস্তে ঘুরিলে যে মর্য্যাদা, শ্বেত হস্তধৃত হইলে মর্য্যাদায় আশমান জমিন ফারাক। আরও কথা আছে। কালারা আসলে কম পাইলে কি হয়, ফাউ যাহা পায় তাহার যে তুলনা হয় না। পল্লীগ্রামে একটা কথা আছে, জরে কি করে—পীলেয় মেরে দেয়, ইহাও তাহাই। ফাউ যাহা প্রাপ্তব্য ঘটে, তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি ত হয়ই, গর-হজম, অপচার, অতিসার, এ সকলও নিত্য-নৈমিত্তিকের অন্তর্ভুক্ত। রাশনাম, পিতৃমাতৃনাম, জুতা, লাথি—অঙ্গের ভূষণ; "উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী" সম উঠিতে গোরু, বসিতে শূকর! এই গূঢ় বৃত্তান্ত ১৯৪৫-৪৬এ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইবার পরে সকলে জানিতে পারিল বটে; কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালেই ব্যাভিচারের সুরু, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই! ঝকঝকে তাঁবু, বিরাট বিশাল জাহাজ, তক্তকে পোষাক, চক্চকে বোতাম, গালভরা পদ-পদবীর অন্তরালে পৈশাচিক বীভৎসতা ততদিন চলিয়াছে যতদিন ভারতবর্ষ বৃটিশের দাসত্ব-শৃঙ্খল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছে। জালিওয়ানওলাবাগে মানুষ কামানের মুখে গো-সাপের মত বুকে হাঁটিয়াছে; কুইট ইণ্ডিয়ার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ধনপ্রাণ দিয়াছে; নারীর মান ইজ্জত লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াছে, শ্মশানোপরি পিশাচের অট্টহাস্য শ্রবণ করিয়াছে। ধমণীর শীতল শোণিত উষ্ণ হইয়াছে, শিরায় শিরায় খরস্রোত বহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষ অবিচলিত হিমালয়ের মত অচল অটল গাম্ভীর্য্যভরে সাগরের পথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অহিংসকণ্ঠে আজও বলিতেছে, কুইট ইণ্ডিয়া! ভারত ছাড়।

সুভাষ এই অচল অটল অতিবৃদ্ধ হিমালয়ের উপর দিয়া প্রভঞ্জন বহাইয়া দিয়াছে। তাহার হিংসাতপ্ত উত্তেজনা-প্রবাহ ভারতবর্ষকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃটিশ-বিদ্বেষভরে সুভাষচন্দ্র বৃটিশের শক্তিমত্তার পীঠস্থান দিল্লীর লালকেল্লা অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই পাঁচশত বৎসরের পুরাতন জীর্ণ কেল্লাই আজ ভারতবর্ষের মানস-নেত্রের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। সেই লালকেল্লার অভ্যন্তরে বিরাজিত বৃটিশত্বের ভিত্তি কাঁপিয়া গিয়াছে। আজিকার জয়হিন্দ ধ্বনিতে লালকেল্লার পাথর কাঁপে; পাথরের সঙ্গে বৃটিশত্ব কাঁপে।

বন্দেমাতরম্

জয়হিন্দ



কঃ পন্থা

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

রসিক এবং রসজ্ঞ পাঠকের নিকট মানুষের ইতিহাস বিচিত্র পুষ্পে গ্রথিত মাল্যের মতই মনোমুগ্ধকর। যুগে যুগে কি করিয়া, কত না দ্বন্দ্ব, কত না উত্থান পতনের মধ্য দিয়া মানব সভ্যতা নব হইতে নবতররূপ লাভ করিয়াছে। কি করিয়া, কি কি কারণের সমাবেশে সভ্যতার নব নব পরিণতি ঘটিয়াছে, আর তাহারই ফলে যে বার বার সঙ্ঘটিত হইয়াছে ইতিহাসের অভিনব রূপায়ন, তাহার বিচিত্র কাহিনী ইতিহাস-রসিকের মনে গভীর রেখাপাত না করিয়া পারে না।

বহু বিবর্ত্তনের এবং পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বিংশ শতাব্দীতে মানব সমাজ এবং সংস্কৃতি এক নূতন যুগ-সন্ধিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে—ইতিহাসের ধারা কোন্ খাতে বহিবে? সে কি পুরাতন এবং পরীক্ষিত পুঁজিবাদের গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিবে, না কার্ল মার্কসের নির্দ্দিষ্ট সাম্যবাদের পথে চলিবে? তাহার পক্ষে কোন্ পথ শ্রেয়ঃ?

সমস্যাটি বড়ই জটিল। সমাধান সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদ সম্বন্ধে গোড়াতেই দুই একটি কথা বলিয়া নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে কৃষিযুগের (আরম্ভ ১০০০০ বৎসর পূর্ব্বে) সর্ব্বপ্রথম পুঁজিবাদের গোড়া পত্তন হয়। তাহার পর ক্রমশঃ রূপ বদলাইতে বদলাইতে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে অগণন শ্রমজীবীর প্রাণপাত পরিশ্রমে উৎপন্ন উপকরণ মুখ্যতঃ মুষ্টিমেয় পরিশ্রমজীবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নিয়োজিত হয়। পুঁজিবাদী নীতি অনুসারে উৎপাদনের উপায় (means of production) ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। উৎপাদন ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ও ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদন পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থা মানুষকে মানুষের পর করিয়া দিয়াছে। আর ইহারই ফলে আসিয়াছে শ্রেণী এবং সমাজ বৈরিতা, শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিক বাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ—আর তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্গতি। বলিবার অনেক কথাই ছিল কিন্তু রহিয়া গেল।

এই পুঁজিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ। কার্ল মার্কস (Kurl-Marx—১৮১৮-৮০) ইহার প্রবর্ত্তক। মার্কসের মতে বিপরীতধর্ম্মাবলম্বী পদার্থের সঙ্ঘাতের ফলে এক অভিনব সমন্বয়ের অভ্যুদয় হয়। প্রকৃতির মত সমাজের বুকেও আছে চিরন্তনদ্বন্দ্ব! বিরোধের নব নব সূত্র মানুষের সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনুস্যূত হইয়া আছে। তাহা আছে বলিয়াই তাহার সভ্যতা সংস্কৃতি সংঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, নূতন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়—আর এই উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হইল সঙ্কট এবং বিপ্লবের পথ। ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্য (সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার)। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মানুষের ইতিহাসই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে" (শেষের কবিতা)।

ইতিহাসের এই অভিনব ব্যাখ্যা অনুসারে বাস্তব অবস্থা আর আর্থিক ব্যবস্থাই মানব সভ্যতার গতি এবং প্রকৃতির একমাত্র নিয়ামক। সমাজ কিরূপ ধারণ করিবে, তাহার অগ্রগতির ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে প্রধানতঃ নির্ভর করে তাহার আর্থিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। এই ব্যবস্থাই মুখ্যতঃ মানুষের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মীয় সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে। (তুলনীয়—"The mode of production in material life determines the general character of the social, political and spiritual processes of life."—Critique of Political Economy—Marx)।

আর্থিক উৎপাদন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব যাহাদের হাতে থাকে, জনসাধারণ একান্তভাবেই তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। ফলে সমাজ বিত্তবান এবং বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই দুইয়ের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বিরোধের ফলে ঘটে শ্রেণীসংগ্রাম। এই শ্রেণী সংগ্রামের ফলেই অভিনব সামাজিক পরিণতি সঙ্ঘটিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া এই পরিণতি ঘটাইতে হইবে।

দাসত্ব, সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিবাদ যে কোন যুগেই হউক্ না কেন, বিত্তবান সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবে না। কাজেই বিত্তহীন সর্ব্বহারার দলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হস্তগত করিতে হইবে। তাহার পর কিছুকালের জন্য অর্থাৎ পুঁজিবাদ হইতে সাম্যবাদে উৎক্রান্তির যুগ-সন্ধিতে চলিবে সর্ব্বহারাদের এক নায়কত্ব (Dictatorship of the proletariat)। একমাত্র এই উপায়েই সমাজ পুঁজিবাদ হইতে সাম্যবাদে উত্তীর্ণ হইবে।

মার্কস আরও বলেন যে উৎপাদনের মূলে আছে শ্রম। অথচ শ্রমিক যাহা উৎপন্ন করে, তাহার অতি নগণ্য একটা অংশ মাত্র সে পায়। পুঁজিদার তাহাকে বঞ্চিত করে।

মার্কসবাদীরা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া এমন এক যুগ প্রবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখেন, যে যুগে শ্রেণী-বৈষম্য অতীতের অপ্রীতিকর স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইবে। পরশ্রমজীবী সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে এবং স্বশ্রমজীবী সম্প্রদায় সর্ব্বময় সামাজিক কর্তৃত্ব পরিচালনা করিবে। উপকরণ উৎপাদন, বণ্টন এবং বিনিময় ব্যবস্থার উপর সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষের পূর্ণবিকাশের পথের সমস্ত কৃত্রিম বাধা অপসারিত হইবে। কেহ কাহারও দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতার সুযোগ নিবে না। প্রত্যেক কার্য্যক্ষম নর এবং নারীকে সামাজিক কল্যাণের জন্য নিজের যোগ্যতানুযায়ী পরিশ্রম করিতে হইবে এবং সমাজ তাহার প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে (তুলনীয়—From everyone according to his abilities to everyone according to his needs.)।

এখন প্রশ্ন—মার্কসীয় মতবাদ যুক্তিসহ কিনা এবং মার্কসীয় আদর্শকে কোনদিন বাস্তবে পরিণত করা যাইবে কিনা? অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও খুব কম লোকেই বিশ্বাস করিতেন যে মার্কসীয় আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব। অনেকেই মার্কসীয় মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করিতেন (তুলনীয়—"It is a creed in which there is much intellectual error, much blindness, social perversity"—Communism by Laski)। কিন্তু উপহাসকারীদের মধ্যেও অনেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে সাম্যবাদী ভাবধারা বিস্তার লাভ করিতেছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের ফলে রুশিয়াতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের একটি প্রধানতম ঘটনা। বহু বৎসর পূর্ব্বে মানব-মৈত্রীর যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কনফুসিয়াস, ভগবান তথাগত, প্লেটো এবং খৃষ্ট—জীবনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এই তাহার প্রথম প্রয়োগ।

তাহার পর কিঞ্চিদধিক পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই অল্পকালের ভিতর সোভিয়েট রাষ্ট্র মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং চিন্তাধারাতে বিপুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে রুশিয়াতে আজিও সাম্যবাদের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহার প্রতিবেশীরা সকলেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সমর্থক। কিন্তু রুশ রাষ্ট্র এবং সমাজ যে সাম্যবাদের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। একথা সত্য যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুনাফা আজিও একেবারে লোপ পায় নাই। "From every one according to his abilities, to every one according to his needs." আদর্শ এখনও পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তথাপি এ সত্য অনস্বীকার্য্য যে সোভিয়েট ভূমিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র সাম্যবাদী আদর্শের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

রুশিয়াতে বর্ত্তমানে যে রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাকে বলশেভিকবাদ বা লেনিনবাদ—কাহারও কাহারও মতে ষ্ট্যালিনবাদ—নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত নহে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বলা হইয়াছে।

সোভিয়েট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ এই

যে ইহার ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে গণতন্ত্র বা সর্ব্বহারাদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংখ্যালঘু একটা দলের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব (Dictatorship of the determined minority) স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বহারাদের বেনামীতে মুষ্টিমেয় লোক যাবতীয় শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অপঘাত ঘটাইয়াছে। একনায়ক শাসনের প্রধান দোষ এই যে ইহা কোন প্রকার মতানৈক্য সহ্য করে না। অথচ মতানৈক্যের প্রয়োজনীয়তাকে—বিশেষ করিয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রে, কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। ওয়েণ্ডেল উইল্কির (Wendell Wilkie) কথায় "The human mind requires contrary expressions on which to test itself" (One World)। শাসক এবং শাসিত উভয়ের পক্ষেই একনায়ক শাসন ব্যবস্থা অমঙ্গলের কারণ। তাহার প্রমাণ নেপোলিয়নের ইতিহাস। কোন এক-নায়ককেই আজ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে দেখা যায় নাই। সোভিয়েট ভূমিতেও কোন দিন এক নায়কত্বের অবসান ত ঘটিবেই না, পক্ষান্তরে ইহা দিনের পর দিন অধিকতর অত্যাচারমূলক হইয়া উঠিবে।

নাগরিকদিগের জীবনকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। শিল্প, সম্পদ, সমবায় নীতিতে পরিচালিত কৃষিকার্য্য, যাবতীয় প্রতিষ্ঠান শ্রমজীবী-সঙ্ঘ ইত্যাদি—কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃত্বের বহির্ভূত নয়। রাষ্ট্র জনগণকে—বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায়কে নূতন ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে চায়। কাজেই রুশীয় শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্র-পরিকল্পিত এবং রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং শিক্ষার নামে সে দেশে চলিতেছে প্রচার (তুলনীয়— "people believe what they are told. And we propose to tell them")।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপর একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহার নায়কগণের দৃঢ় বিশ্বাস, বিবর্ত্তনের পথে সামাজিক অবিচার দূরীভূত হইবে না। তাহার জন্য হিংসাত্মক বিপ্লব এবং শ্রেণী-সংগ্রাম অপরিহার্য্য।

অভিযোগগুলির সত্যতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও স্বীকার করিতেই হইবে যে সোভিয়েট রুশিয়া রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থ-নীতিক ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি অসাধ্যসাধন করিয়াছে যাহা অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

মার্কস বলিতেন, "The philosophers have only interpreted the world. It is our business to change it" অর্থাৎ দার্শনিকগণ জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু সাম্যবাদীর কাজ হইল ইহার পরিবর্ত্তন সাধন। মার্কসের গ্রন্থাবলী সাম্যবাদীর জীবন-বেদ। লেনিনের গ্রন্থাবলী ইহার সায়নভাষ্য। আর আজ ষ্টালিন তাঁহার নীতি এবং কর্ম্ম দ্বারা এই অভিনব জীবন-বেদের টিকা রচনা করিতেছেন।

বিগত অষ্টবিংশতি বৎসরে রুশিয়াতে এক সম্পূর্ণ অভিনব সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংস্কৃতির নাম দেওয়া যাইতে পারে সাম্যবাদী অথবা সোভিয়েট সংস্কৃতি। সাম্যবাদী সংস্কৃতি কি? ১৯১৮ সালে All Russian Congress of Sovietsএ লেনিন ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলেন যে, "Formerly all human knowledge, all human talents, laboured only in order to provide some with the benefits of technique and culture and on the other hand, to deprive the others of those things which were most essential-education and self-development. But now all the marvels of technique, all the achievements of culture, will become the general property of the whole people, and from now on, human intelligence and human talent will never again be converted into a means of oppression, a means of exploitation." সোভিয়েট সংস্কৃতি খাঁটি গণ-সংস্কৃতি, গণদেবতা ইহার স্রষ্টা এবং ভোক্তা। প্রাক্-বিপ্লব রুশিয়াতে সংস্কৃতি ছিল কেবল-মাত্র অবসরভোগীসম্প্রদায়ের মানসিক বিলাসের উপকরণ। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সংস্কৃতির মহা-মহোৎসব-ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেণীর অবাধ প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সংস্কৃতির গোড়ার কথা শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে রুশিয়া কি অসাধ্য সাধন করিয়াছে দেখা যাউক। বহু বৎসর

পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে গিয়েছে। যারা মূক ছিল, তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল, তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত হয়েছে" (রুশিয়ার চিঠি)। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র নাগরিকগণের শিক্ষালাভের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ১৯১৭ হইতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে রাষ্ট্র ৫ লক্ষ নাগরিককে শিক্ষাব্রতী হইবার উপযোগী শিক্ষা দিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ৪ কোটিরও অধিক নিরক্ষর লোক অক্ষর-জ্ঞানলাভ করিয়াছে। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শিক্ষার জন্য বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে (১৯৩৬-৪০) সমগ্রদেশে ১০০০০ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধকালেও শিক্ষার অবাধ বিস্তার ব্যাহত হয় নাই। (তুলনীয়—"In the years of the war, when the country is struggling to expedite the final defeat of the Hitlerites, public education in the U. S. S. R is continuing its uninterrupted development and approaching the solution of the task of general compulsory education." Vladimir Potemkin)। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াতে যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার ছিল শতকরা ২১·২—১৯২৬ সালে এই হার বাড়িয়া ৪৪ এবং ১৯৩৯এ দাঁড়ায় ৭০। ১৯৪৪ সালের হিসাবে দেখা যায় যে রুশিয়া হইতে নিরক্ষরতা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। স্বীকার করিতেই হইবে যে সোভিয়েট ব্যবস্থার এমন একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যাহাতে ইহা সম্ভব হইয়াছে।

আধুনিক রুশিয়া সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে যে সত্য সবচেয়ে বড় হইয়া চোখে পড়ে তাহা এই যে, অক্টোবর-বিপ্লব মানুষের মনে যে দীপশিখা জ্বালিয়াছে, বিপ্লব নায়কগণের ভুল ভ্রান্তি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই দিক হইতে দেখিলে একমাত্র ফরাসী-বিপ্লবের সহিতই অক্টোবর-বিপ্লবের তুলনা চলিতে পারে। বলশেভিক বিপ্লবের ন্যায় ফরাসী বিপ্লবও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের নেতাগণ বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছিলেন স্বাধীনতার উপর। পক্ষান্তরে রুশীয় বিপ্লবনায়কগণ বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র এবং সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা না হইলে মৈত্রী এবং স্বাধীনতা কেবল কথার কথাই থাকিয়া যাইবে।

মানব সভ্যতার উষাকাল হইতেই গণ-স্বার্থ মুষ্টিমেয় বিত্তবানের দ্বারা পদদলিত হইয়া আসিতেছে। রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্ব চিরদিনই বিত্তবানের কবলিত রহিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট-ভূমিতে সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবস্থার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীনদের উপর সংখ্যালঘু বিত্তবান সম্প্রদায়ের অত্যাচার দূর করিবার একটা যথার্থ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

বাস্তবক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার সাম্য স্থাপনের প্রয়াস সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম মহৎ কীর্ত্তি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সমাজ কোন দিনই এই সাম্যকে স্বীকার করে নাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক অধিকার-সাম্যের নীতি গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অন্য সকল ক্ষেত্রেই সাম্য কেবল কথার কথা থাকিয়া যাইবে। তবে একথা সত্য যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি জীবনের বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েটতন্ত্র সাময়িকভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিলেও অধিকার সাম্যের আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই এবং করিতেছে না।

রুশ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট নেতাদের মত ত্যাগব্রতী নহেন। রাষ্ট্রপরিচালকগণের অধিকাংশেরই সততা, শ্রমশীলতা, স্বার্থবিমুখতা এবং কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ষ্টালিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের অতি বড় শত্রুও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে তাঁহাদের সাহস এবং কর্ম্মদক্ষতা অনন্যসাধারণ।

অভিযোগ করা হয় যে রুশ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে স্ব-শ্রমজীবী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইয়া মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। তর্কের খাতিরে একথা মানিয়া লইলেও সোভিয়েট রাষ্ট্র যে বৈশ্য এবং ভূস্বামীপ্রভাবমুক্ত এ সত্য অস্বীকার করা চলে না।

সমস্ত দেশেই যে রাজনৈতিক দল শাসন ক্ষমতা পরিচালিত করে, সেই দলের সদস্য এবং সমর্থকগণ নানাপ্রকার বৈধ এবং অবৈধ সুবিধা ভোগ করেন। একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়াতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

রাষ্ট্রে উৎপন্ন সকল উপকরণ এখনই সকলে প্রয়োজনানুরূপ পাইবে একথা বলশেভিকগণ বলেন না। তাঁহারা এই কথাটার উপরই জোর দেন যে, রাষ্ট্রে যে উপকরণ উৎপন্ন হইবে তাহাতে সকলেরই অধিকার আছে। তবে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে প্রাপ্য অংশের তারতম্য ঘটিতে বাধ্য। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে জগতের অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা সোভিয়েট ভূমিতে অধিকার-সাম্য বহুগুণ বেশী।

এই আপেক্ষিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ফলে রুশিয়া শ্রেণী-বিহীন সমাজ স্থাপনের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। বর্ণ-বৈষম্য, স্ত্রীপুরুষ ভেদ ইত্যাদি সোভিয়েট-ভূমিতে অজ্ঞাত। একই প্রকার পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিকের হার সমান। যোগ্যতানুসারে সকল নাগরিকের কর্ম্ম-লাভের অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রায় ২০০ ন্যাশনালিটির (Nationality) বাস। সাম্রাজ্যবাদশাসিত বহুজাতি-অধ্যুষিত দেশে সকলের অধিকার সমান হয় না। সংখ্যালঘু ন্যাশনালিটীগুলির উন্নতির পথে বহু প্রতিবন্ধক সে সমস্ত দেশে রহিয়াছে। সংখ্যাল্পতাজনিত যে দুর্ব্বলতা, সংখ্যাধিক ন্যাশনালিটিগুলি তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু কি শিক্ষা, কি রাজনীতি, কি সংস্কৃতি, এক কথায় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সোভিয়েটতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়-গুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে, নিপীড়িত এবং শোষিত জাতিসমূহ যে কালে এই অধিকার সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে রুশিয়া একটা সমস্যা এবং বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সোভিয়েট প্রচেষ্টা ইতিহাসের একটি প্রধানতম ঘটনা। সম্পূর্ণ অভিনব আদর্শ এবং উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি রুশিয়াতে স্থাপিত হইয়াছে। পরীক্ষা চলিতেছে নূতন নূতন ব্যবস্থার। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে সোভিয়েট রুশিয়া একটা বিরাট "Laboratory of Life"। এই ল্যাবরেটারি হইতে ত্যাগ এবং শৃঙ্খলার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছে অসাধ্যসাধনকারী অভিনব দুর্ব্বার মানুষের দল।

বিশ্ব-সভ্যতার সঙ্কটময় যুগ-সন্ধিকালে আজ বিশ্বের নিপীড়িত গণ-আত্মার আর্ত্ত প্রশ্ন—শান্তি কোন্ পথে, সুখ কোন্ পথে? পুঁজিবাদ বর্ত্তমান সভ্যতার জনক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অন্তরে বিরোধের যে বীজ, যে ক্লেদ রহিয়াছে, তাহারই ফলে সম্পদ-সৌধের ঠিক নীচেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট। ফলে আসিয়াছে শ্রেণী এবং জাতি বিদ্বেষ, ঘটিয়াছে যুদ্ধের পর যুদ্ধ।

সোভিয়েটবাদ মানুষকে শুনাইয়াছে আশার কথা। "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই আদর্শকে সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। J. G. Narany-এর কথায় "U. S. S. R. stands for a new civilization with new ideals, new values, and new principles building up a new man—a man resurrected and rejuvenated"। কাজেই আজ বিশ্বের নিপীড়িত এবং শোষিত সম্প্রদায় ও জাতিগুলি যদি সোভিয়েট রাষ্ট্রকে নবযুগের বার্ত্তাবাহী, অভিনব পথের প্রথম যাত্রী মনে করিয়া তাহারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া চলে না।

সোভিয়েট ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে। ইহা-দ্বারা প্রকৃতই মানব কল্যাণ সাধিত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইহার সমর্থকগণ অবশ্য বিশ্বাস করেন যে ইহার ফলে মানবের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মুক্তি ঘটিবে, আর স্বর্গ কল্পলোক হইতে ভূতলে নামিয়া আসিবে। পক্ষান্তরে ইহার বিরুদ্ধবাদীগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে সোভিয়েট ব্যবস্থা আংশিকভাবে সুফলপ্রসূ হইলেও ইহা দ্বারা পরিপূর্ণ মানব-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না (তুলনীয়—"I hope that Russia will produce something wonderful. But I must confess that I am doubtful about its being able to bring forth anything really useful. I shall consider it a great success, if, through it, really all wealth goes into the hands of the poor and mental and physical freedom of every person is at the sametime secured; and in that case I will have to revise my concept of 'Ahinsa'."—"গ্রাম উদ্যোগ পত্রিকায়" মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধ)।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৯

অজিত ফিরিয়া আসিলে অপর্ণা তাহাকে এই ক্ষুদ্র রাজপুত্রের কাহিনী বলিয়া হাসিতেছিল। অজিতও উপভোগ করিয়াছিল, তাই প্রশ্ন করিল—কোন ছেলেটি?

—ওই বাড়ীর সেই খোকা। ভেবেছিলুম—কিছুক্ষণ রেখে দেব—কিন্তু বৌটা ভেবে সারা হবে তাই।

অজিত কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যা হোক্, রাজকন্যা যে রাজপুত্তুরের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় নি সেই আমার ভাগ্য। রাজপুত্তুর দেশজয় ক'রতেন সত্য, তবে আরএকজনের বিবাহিতা পত্নী হরণ করা হ'ত?

অপর্ণা কহিল—আমি যাবো না শুনে তার বড় বড় চোখ দুটো দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলে ভরে উঠ্‌লো, তা দেখ্‌লে সত্যিই মায়া হয়!

—যাক্, বুঝেছি, রাজপুত্তুরের সঙ্গেই যাওয়ার ইচ্ছে, তা যেও। আমার ভাগ্যে যা আছে হবে।

—সত্যিই ওদের বাড়ী গেলে তুমি কিছু মনে ক'রবে না?

—না, মনে ক'রবো কেন?

—আবার রাজকন্যা খুঁজতে এলে, রাজকন্যা রাজপুত্তুরকে ছাড়বে না। কিন্তু রাজার সঙ্গে দেখা হ'লে—

—ও, রাজপুত্তুরের বাবা! আলাপ করে আসবে—কিন্তু রাজপুত্তুর কি আর দরজা খোলা পাবে?

হাস্য-পরিহাসের মাঝে খোকার প্রসঙ্গটা ক্রমেই গুরুত্ব লাভ করিল। খোকাটির ছোট হাত দুইখানি অপর্ণাকে যে এত প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে পারে তাহা সে কখনও ভাবিতে পারে নাই।

ঝুল বারান্দায় বসিয়া খাইতে খাইতে দুইজনেই খোকাকে অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু খোকাও তাহার পরিচিত বারান্দার কোনটিতে নাই! কোথায় সে? অপর্ণার একটু ভয় হইল—কি জানি ঝি তাহাকে ঠিক ঠিক পৌছাইয়া দিতে পারিয়াছে কিনা!

কিছুক্ষণ বাদেই খোকা আসিল, কিন্তু অত্যন্ত বিরস বদনে, হয়ত মা তাহাকে খুব বকিয়াছে—না হয় কিছু উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থাও হইয়াছে। বারান্দায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া উদাস নয়নে কি যেন দেখিতেছে, ওই আকাশের নীল বুকে। মাতা রান্নার জোগাড় করিতেছেন—

কয়েক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু রাজপুত্র আসিল না। অপর্ণা কয়েক দিন অপেক্ষা করিতেছিল কিন্তু এখন সে বিশ্বাস করিয়াছে যে খোকার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য সদর দরজা ভেদ করা সোজা নয়; কিন্তু তবুও সে প্রতীক্ষা করে, ওই খোকা হয়ত একদিন আসিবে—

সেদিন সকালে বসিয়া অপর্ণা ওই খোকাটির বিচিত্র কার্য্যাবলী দেখিতেছিল। দরিদ্র স্বামী বাজার করিয়া নিয়া আসিয়াছে, আফিসের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বধূটি তাড়াতাড়ি মাছ কুটিয়া রান্নার জোগাড় করিতেছে; খোকা সম্ভবতঃ একটি ধাবমান মৎস্যের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে এবং তারস্বরে চিৎকার করিয়া মাতার উদ্দেশ্যে পলায়নপর মৎস্যের গতিবিধি নির্দ্দেশ করিতেছে—কিন্তু ধরিতে সাহস হইতেছে না।

খোকার কার্য্যাবলী একদিন তাহাকে আনন্দ দিয়াছে, কিন্তু আজ ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাহার সন্তানটি বাঁচিয়া থাকিলে এত বড়ই হইত—হয়ত জীবনের মাঝে যে একাকীত্বটা আজ এমন প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা করিত না। অজিতের কোন দোষ নাই, তথাপি তাহার হৃদয়োত্তাপে তাহার হৃদয় উত্তপ্ত হয় না—অস্বস্তিকর একটা শীতলতা মনটাকে যেন ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতেছে—

সেদিন দ্বিপ্রহরেও অপর্ণা শুইয়াছিল কিন্তু কেন যেন ঘুমায় নাই। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর, কোথাও এতটুকু শব্দ নাই, —পাশের বাড়ীটাও নিঝুম। শান্ত দীর্ঘ গাছগুলির মাথা নীল আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত নিষ্প্রাণ। অপর্ণার হাতের বইখানা অত্যন্ত নীরস বোধ হইতেছিল—পড়ার অযোগ্য।

খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। অপর্ণা ফিরিয়া দেখে, খোকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রেলিংএ রজ্জুবদ্ধ কুকুরটির দিকে ভীতভাবে চাহিয়া আছে। ডাকিবার একটা অদম্য ইচ্ছাকে চাপিয়া অপর্ণা খোকাকে দেখিতে লাগিল—কেমন করিয়া সে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় করে।

খোকা ফিরিয়া চাহিয়া জাগরিত রাজকন্যাকে বিছানার উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল—ঘুমন্ত রাজপুরীতে একা রাজকন্যা কেন জাগিয়া থাকিবে? আস্তে আস্তে সে আগাইয়া আসিয়া কহিল—তুমি রাজকন্যা?

—হ্যাঁ, পক্ষীরাজ ঘোড়া নিতে এসেছ? এস—

খোকা অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে আর একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল—দেবে? যেন অপর্ণার প্রতিশ্রুতিকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই।

—তুমি কেমন ক'রে এলে?

খোকা অত্যন্ত উদাসীন ভাবে জবাব দিল—হেঁটে হেঁটে? ঘোড়া কোথায়?

—আছে, ঐ দিকে।

খোকার অঙ্গ আজ যথেষ্ট পরিষ্কার নয়, ইজের ও দেহ সবই ধূলাবলুপ্ত—পথে যে একবার অন্ততঃ পতন হইয়াছে এ বিষয়ে সংশয় নাই। অপর্ণা তাহার ইজেরটা এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া বিছানার উপর তুলিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল—কি নেবে?

—পাখী দেবে?

ঘোড়ার প্রতি আকর্ষণ কমিয়া অকস্মাৎ পক্ষীপ্রীতি বাড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অপর্ণা হাসিল। কহিল—কোনটা। খোকা পক্ষীর উচ্চতা দেখাইয়া কহিল—এত বড়।

নীচের পোষা ময়ূরটি যে আজ খোকাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে তাহা অপর্ণা বুঝিয়াছিল তাই বলিল—ময়ূর নেবে?

—হে।

—কি ক'রবে?

—চড়বো।

অপর্ণা আবার হাসিল, কহিল—আর কি নেবে?

—রাজকন্যে।

—কি ক'রবে?

—মা'কে দেব।

—আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

—হুঁ—তুমি রাজকন্যে? জাগরিত এই রাজকন্যাই যে তাহার বাঞ্ছিত ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা একথা যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছে না, তাই বারবার সংশয় প্রকাশ করিতেছে। অপর্ণা মনে মনে কহিল—রাজকন্যা যখন জাগে তখন এমনি করিয়াই সে রাজপুত্রের জীবনে একান্তই অবান্তর হইয়া যায়। রাজপুত্র যেদিন আসে, সেদিন রাজপুত্র হয় সাধারণ মানুষমাত্র। অপর্ণা তাই কহিল—আমাকে নিয়ে যাবে না তা হ'লে?

খোকা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—হুঁ। তুমি রাজকন্যে?

—হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে যাবে?

—হুঁ চল। খোকা পালঙ্ক হইতে নামিতে নামিতে কহিল—এসো।

অপর্ণা ঝিকে ডাকিয়া কহিল—এই ছ্যাখ্ সেই খোকাটি আবার এসেছে। সেদিন ওর মাকে কি বলে ছিলি?—ও যে আবার এসেছে।

ঝি কহিল—সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে খুঁজছিল, খোকাকে দেখেই ব'ললে, কোথায় ছিল?

আমি সব তাকে ব'ললুম। আমাকে কত আদর যত্ন ক'রলে—বুড়ীশাশুড়ী বৌকে ত এই গালাগাল—

অপর্ণা কহিল—চল, ওর মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি, খোকা কেমন ক'রে আসে এখানে?

ঝি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আপনি যাবেন বৌরাণী?

—হ্যাঁ, যাবো। চল্—

দরজা খোলা ছিল—

ঢুকিতে ঢুকিতে অপর্ণা শুনিল, বধূ অত্যন্ত অপরাধিণীর মত শাশুড়ীকে বলিতেছে—মা খোকাকে ত পাচ্ছি না।

শাশুড়ী কহিলেন—না, দস্যি ছেলের সঙ্গে আর পারা যায় না, দেখো ত সদর খোলা না কি?

বধূটি আসিতেছিল—খোকা তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামিয়া তারস্বরে কহিল—মা, মা, রাজকন্যা এনেছি—

তিনজনকে এমনিভাবে আসিতে দেখিয়া গৌরী হতবুদ্ধি

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অপর্ণা হাসিয়া কহিল—আপনার খোকা ত রাজকন্যাকে না এনে ছাড়বে না। কিন্তু খোকা রোজ রোজ পালিয়ে যায় কি ক'রে?

গৌরী একটু হাসিয়া কহিল—আসুন।

অপর্ণা ঝিকে কহিল—তুই যা, গোটা চারেকের সময় এসে আমায় নিয়ে যাস্। চলুন—খোকা, খোকা, রাজকন্যাকে দিয়ে কি ক'রবে বলেছিলে?

—মাকে দেব।

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া কহিল—নিন, ছেলে পাঠিয়ে রাজকন্যাকে ঘরে আন্‌লেন, এখন কি ক'রবেন তাই বলুন।

গৌরী অপর্ণাকে নিজ-কক্ষে বিছানার উপর বসাইয়া কহিল—আপনাকে বস্‌তে দেওয়ার মতও ত কিছু নেই—যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন তবে—

অপর্ণা কহিল—আমি কে, জানেন?

—জানি, আপনি ঐ রাজবাড়ীর ঝুলবারান্দায় ব'সে বই পড়েন, না?

—হ্যাঁ, আমি সেই।

গৌরীর মুখখানি সহসা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। অপর্ণা তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল—হঠাৎ এত লজ্জিত হচ্ছেন কেন?

গৌরী অবনতমুখেই কহিল—না।

—কিন্তু, অমনি ক'রে ক্যারমের ঘুঁটি চুরি করা কি ভালো?

গৌরী হাসিয়া উঠিয়া কহিল—আপনি বুঝি ওই দেখেন?

—হ্যাঁ, খোকাও ত আপনাকেই সাহায্য করে।

গৌরী আবার হাসিল। কহিল—কি ক'রবো, খেলে যে কেবলই হেরে যাই।

—আমি ত দেখি, আপনি কেবলই জিতে যান, আর সে বেচারী অন্যায়ভাবে হেরে যায়।

গৌরী একটু হাসিয়া অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল—কতকটা গর্ব্বে কতকটা ঐ বড়লোকের বাড়ীর বধূটির অকুণ্ঠ সহৃদয়তায়।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আপনার নামটি কি?

—গৌরী। আপনার নাম?

—অপর্ণা। উনি কি করেন?

গৌরী একটু ব্যথিতভাবে জবাব দিল—কেরাণী। আপনার—

—ব্যারিষ্টার, তবে সে নামমাত্র।

আলাপ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল—অপর্ণা এম-এ পাশ এবং গৌরী কোন পাশই নয়—তাহাও দুইজনে জানিয়া লইল। অমলের মা আসিয়াও কিছু কিছু প্রশ্ন করিলেন এবং খোকার নানা দৌরাত্ম্যের কথা বিবৃত করিয়া কহিলেন—আপনাকে যেয়ে হয়ত কত জ্বালা দিয়েছে—ও ছেলের সঙ্গে পারবার যো নেই। এতদিন ত সদর দরজা খুলতে পারতো না, আজ একটা চৌকি নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে হুড়কো খুলেছে। রাস্তায় কবে গাড়ী চাপা পড়বে, ও ছেলে—

—না না, ভয় ক'রবেন না অত। ছেলেরা ত একটু দুরন্ত হয়ই। প্রথমদিন ও কি ক'রলে জানেন? ঘুমিয়ে ছিলুম, হঠাৎ দেখি কে যেন চুল ধ'রে টান্‌ছে খাটের নীচে থেকে—কিছুক্ষণ পরে খোকা উঠে এসে বল্‌লে—তুমি রাজকন্যা? আমি হেসে বল্‌লুম—হুঁ।

গৌরী কহিল—ওই রাজকন্যার গল্প শোনে, তাই ভেবেছে বুঝি আপনি সেই—সেত মিথ্যে নয়।

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, প্রায়ই রাজকন্যা, তবে বরণটা মেঘের মত, চুলটা কুঁচের মত—

মাতা কহিলেন—না না, সে কি কথা। আপনার মত রূপ ত রাজার ঘরেও মেলে না—

অপর্ণা এই অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাদ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল—কি যে বলেন। আমাকে আর আপনি বলেন কেন?

মাতা প্রতিবাদ করিলেন—না না, আপনাদের মত লোককে কি তুমি বলা যায়?

অপর্ণা প্রসঙ্গান্তরে প্রশ্ন করিল—কি কচ্ছিলেন?

বিছানার উপর একটা হাত ছেঁড়া সিল্কের পাঞ্জাবী, আর তার উপরে একটা ব্লাউজ পড়িয়াছিল। গৌরী তাহাই দেখাইয়া কহিল—ওঁর পাঞ্জাবী ছিঁড়ে গেছে তাই দেখছিলাম ব্লাউজ হয় কি না! সেই ফাঁকে খোকা পালিয়ে গেছে—

খোকা একমুঠা চাল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, মাতা কহিলেন—রাখ, রাখ, অত চাল দিয়ে কি ক'রবি—

খোকা পালাইতে চেষ্টা করিয়া কহিল—পাখী—পাখী খাবে—

মাতা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন—কম ক'রে নিয়ে যা।

—না, না—নিও না। খোকা জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া পালাইয়া গেল—

বাহিরে কয়েকটি চড়ুই আসিয়াছে—খোকা চাল ছিটাইয়া দিয়া ডাকিতেছে—আয় আয়—

মাতা কহিলেন—দিবারাত্র এমনি এত অশান্ত! সব জিনিষ ওর লাগবে—

অদূরে ছোট একটি সুসজ্জিত টেবিলের উপর ছোট একটা টাইমপিস্ অনিয়মিত সময় জ্ঞাপন করিত। গৌরী সেদিকে চাহিয়া দেখে চারটা বাজে। সে কহিল—যদি কিছু মনে না করেন, একটু চা তৈরী ক'রে দি।

—জলখাবার তৈরী ক'রবেন ত? সে আমি জানি—

গৌরী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—তাও বটে; কিন্তু তার আগে আপনাকে একটু চা ক'রে দি, তাই ভাবছিলুম। আমাদের মত লোকের বাড়ীতে যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেনই তবে—

—না, চা এখন আমি খাই না, আপনি খাবার তৈরী করুন, আমি বরং সাহায্য করি।

গৌরী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—আপনি আবার কি সাহায্য ক'রবেন?

—যা ভাবছেন তা নয়, কিছু তৈরী ক'রতে আমরাও পারি। অন্ততঃ মাংসটা ওর চেয়ে ভালই পারি—

গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিল। অপর্ণা পুনরায় কহিল—অবশ্য খোকা যদি সাহায্য না করে—

গৌরী এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—ও রকম সাহায্য ফাঁক পেলেই সে করে।

—ঝি আসিয়া জানাইল—চারিটা বাজিয়াছে। অপর্ণা কহিল—আচ্ছা আজ তবে আসি, কাল আস্‌বো—

গৌরী বিনয় প্রকাশ করিয়া কহিল—আস্‌তে বলার সাহস নেই, তবে যদি আসেন অনুগ্রহ করে, তবে মনে মনে আপনার প্রশংসা ক'রবো—

—অত বিনয়ে কি হবে—ভাই? আস্‌বো—

অপর্ণা চলিয়া গেল।

অমল বৈকালে ফিরিলে জলখাবার ও চা দিয়া গৌরী কহিল—আজ খুব মজা হ'য়েছে, জানো?

অমল হাসিয়া কহিল—দুপুরবেলা তোমরা বসে বসে মজা ক'রলে আমি জানবো কি ক'রে? বলো—

—ওই যে রাজবাড়ী, ওর ঝুলবারান্দায় বসে একটি বউ প্রায়ই বই পড়ে দেখেছ?

—না, পরস্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকা আমার স্বভাব নয়! তার পর?

—সাধু পুরুষ কিনা? খোকা একদিন পালিয়ে··· গৌরী খোকার রাজকন্যা আনিবার কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কহিল—বউটির কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই। তবে চা খেতে ব'ললাম, খেলে না—

অমল কাহিনীর মাঝে কোথাও 'মজা' খুঁজিয়া পাইল না বলিয়াই মনে হয় এবং বড়লোকের বাড়ীর সহিত ঘনিষ্ঠতাটা খুব শুভ মনে না করিয়া জবাব দিল—ওরা তোমার মত লোকের বাড়ীতে সাধারণতই খায় না—

—না খায় না। ও তরকারী কুটে দিতে চাইল পর্য্যন্ত।

—হাঁ, তরকারী কুটতে হাত কাটুক, আর শেষে ফৌজদারী এক নম্বর হোক আমার নামে। যাই কর, তুমি কিন্তু ওখানে বেড়াতে যেও না, অপমানের একশেষ হ'য়ে ফিরবে—

—বড়লোক হ'লে তারা বুঝি কেবল মানুষকে অপমানই করে?

আভিজাত্যের প্রতি একটা ক্রোধ ও ঈর্ষা অমলের মনে লক্ষিত হইয়াছিল, কারণ তাহার দারিদ্র্য কেবল তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতই করিয়াছে, সে তাই বলিল—অপমান করে না তবে হ'য়ে যায়! যে আজ খুব বীরত্বের সঙ্গে এখানে এসেছে, কাল তাদের সগোত্র দু'চার জনের বিদ্রূপ শুনে কাল সে আপনার কৃতকর্ম্মের জন্যে অনুশোচনা ক'রবে—

গৌরী কথাটা পছন্দ করিল না। কহিল—বউটী এম-এ পাশ তা জানো? অথচ আমাদের সঙ্গে কেমন ঘর-কন্নার কথা ব'লে গেল। খোকাকে খুব ভালবাসে—কাল আবার আসবে।

অমল মুখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—ভাল! মহানুভবতার তুলনা নেই। কাজ আছে এখনি বেরুতে হবে।

গৌরী অভিমানের স্বরে কহিল—বাড়ীর উপর যে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, এত সকালে কোথায় যাবে? ছেলে পড়াতে যাওয়ার ত দেরী আছে।

—একটা কাগজের আফিসে টাকা আন্‌তে যাবো; সেখানে আর একটু কথাও আছে।

গৌরী তাড়াতাড়ি কহিল—কাল যদি উনি আসেনই তবে কিছু ফল আর একটু ছানা নিয়ে এসো, শুধু চা ত দেওয়া যায় না।

অমল জামা গায় দিতে দিতে কহিল—আন্‌বো যা পারি, কিন্তু এটা মাসের ২৫শে— ক্রমশঃ

রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডের অর্থ

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড ছাড়া অন্যান্য কাণ্ডে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে সেই সেই কাণ্ডের নামের কোনরূপ একটা সম্বন্ধ আছে—যেমন বালকাণ্ডে পাওয়া যায় রামচন্দ্রের বাল্যজীবনের কাহিনী এবং অযোধ্যাকাণ্ডে আছে অযোধ্যার রাজপরিবারের বিচিত্র কথা। কিন্তু সুন্দরকাণ্ডে এই নামকরণের তাৎপর্য সহজে ধরা যায় না। বিষয়টি লইয়া পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন এবং নানাজনে নানারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

গত বৎসর (১৩৫১ সাল) কার্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'সুন্দরকাণ্ডের অর্থ কি?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমতের উল্লেখ করিয়াছেন।

Das Ramayana প্রণেতা জার্মাণ পণ্ডিত য়্যাকবির মতে (১২৪ পৃঃ) "সুন্দরকাণ্ডে অনেক কবিত্বময় মধুর বর্ণনা আছে বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে"। Gesohiohte dar indisohen Litterateur নামক গ্রন্থে (৪১৭ পৃঃ) বিন্টার্‌নিত্জ্‌ সাহেব লিখিয়াছেন—"রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ড অপেক্ষা সুন্দরকাণ্ডে অনেক বেশী পরিমাণে কাহিনী, আখ্যান ও আশ্চর্য ঘটনা আছে। ভারতীয় রুচি চিরকাল এই সমুদয়কেই সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্যই রামায়ণের এই খণ্ডের নাম হইয়াছে সুন্দরকাণ্ড।"

মজুমদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সুন্দরকাণ্ডের আলোচনায় যোগ দিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমার এই ধারণা হইয়াছে যে এখানে সুন্দর শব্দে দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর তীর বুঝাইতেছে। অযোধ্যা হইতে দক্ষিণে লঙ্কা পর্যন্ত যে ভূ-বিভাগ ছিল, তদনুসারেই অযোধ্যাদি পঞ্চকাণ্ডের নামকরণ হইয়াছে। সুন্দরকাণ্ড তাহাদেরই একটি।...... সুন্দর শব্দটি বৃক্ষবিশেষ অর্থে সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায়। লবণাম্বু-প্রদেশে—বেলাবনে—এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে, তাহার নামানুসারে বেলাবনের সুন্দরবন নাম হওয়া খুবই সম্ভব...এবং ইহাও সম্ভব যে রামায়ণোক্ত বেলাবন বিভাগ কোনকালে 'সুন্দরবন' নামে অভিহিত হইত এবং তাহারই নামানুসারে 'সুন্দরকাণ্ড' এই নাম হইয়াছে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন—"সুন্দর শব্দ এখানে স্থানবাচক এবং উহা লঙ্কার এক পুরাণ নাম—যেমন উজ্জয়িনীর 'বিশালা', অযোধ্যার 'সাকেত' ইত্যাদি।...'চুল্লবংশে' লঙ্কাদ্বীপে এক ছোট পাহাড়ের নাম আছে সুন্দর পর্বত এবং সুন্দরনামক এক নগরে বুদ্ধ কস্‌সপ ও বুদ্ধ কোনাগমন সাধনা করিয়াছিলেন এই সংবাদ 'বুদ্ধ বংশে'র 'অট্‌ঠ কথা'য় পাওয়া যায়।"

মজুমদার মহাশয়ের নিজের অভিমত এই যে সুন্দরনামক স্থান হইতে সুন্দরকাণ্ড নাম হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু রামায়ণে এইরূপ স্থানবাচক নামের কোনই উল্লেখ না থাকায় সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

শ্রীযুক্ত সি-এন-মেটা মহাশয় Sundarakandam or Flight of Hanuman to Lanka via Sunda Islands by the Air Route নামক গ্রন্থে অষ্ট্রেলিয়ায় লঙ্কা দ্বীপের অবস্থিতি প্রমাণ করিতে যাইয়া সুন্দরকাণ্ডের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অভিনব হইলেও বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আলোচনায় (১৮৭ পৃঃ) মর্ম এই যে "রামায়ণের কবি তত্তৎকাণ্ডে বর্ণিত ঘটনার প্রতি কিংবা ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট স্থান বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন কাণ্ডের নাম দিয়াছেন। সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত ঘটনাগুলি সুন্দদ্বীপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া বাল্মীকি কাণ্ডটির নাম দিয়াছিলেন 'সুন্দ'। কিন্তু পরবর্তীকালে লেখকগণের অজ্ঞতা বা অনবধানতা হেতু সুন্দ শব্দটি সুন্দরে পরিণত হইয়াছে।" মেটা মহাশয়ের মতে সুমাত্রা, জাভা ও তৎসন্নিহিত ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি সুন্দদ্বীপের অন্তর্গত। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়াই নাকি হনুমান অষ্ট্রেলিয়ায় বা বাল্মীকির লঙ্কায় সীতার নিকট গমন করিয়াছিলেন।

এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যায় যে পণ্ডিতগণের মধ্যে

অনেকেই সুন্দর শব্দটি দেশবাচক মনে করেন। কেহ অনুমান করিয়াছেন—এই দেশটি দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর কূলে অবস্থিত ছিল। কেহ বলিয়াছেন—উহা লঙ্কারই পুরাতন নাম। আবার কাহারও মতে সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপ সমুদয় এখানে সুন্দর শব্দের লক্ষ্য।

সম্প্রতি আমি যেরূপ পৌরাণিক প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এক সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রদেশে সুন্দরপুর ও সুন্দরারণ্য নামে নগর ও অরণ্য বর্তমান ছিল। 'সুন্দরপুর-মাহাত্ম্য' ও 'সুন্দরারণ্য মাহাত্ম্য' নামক দুইখানি সংস্কৃত মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থ দুইখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। উইলসন সাহেব যে ম্যাকেঞ্জি-সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (Mackenzie Collection, ২য় সংস্করণ, ১৪৫ ও ১৪৬ পৃঃ), তাহা হইতে জানা যায় যে ভবিষ্যোত্তর, ব্রহ্মাণ্ড এবং গরুড় পুরাণ হইতে 'সুন্দরপুর মাহাত্ম্য' সঙ্কলিত হইয়াছে। উহাতে সুন্দরপুর নামে এক নগরের বিবরণ আছে। এই নগর কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। সেখানে সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। নগরটির চলিত নাম সুন্নর। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সুন্দরারণ্যমাহাত্ম্য' ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে গৃহীত। উহাতে আছে কাবেরী তীরবর্তী এক পবিত্র কাননের বিবরণ। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রসিদ্ধ 'আদিয়ার গ্রন্থাগারে'ও 'সুন্দরপুর মাহাত্ম্যে'র একখণ্ড পুঁথি রক্ষিত আছে। উহা আলোচনা করিয়া দেখিলে হয়ত বিস্মৃত সুন্দরপুরের যথার্থ অবস্থিতি-স্থান এবং অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হইবে।

স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৭৮৪ পৃঃ) সুন্দরনামক এক গন্ধর্বের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই সুন্দর ভারতবর্ষের দক্ষিণে কাবেরী তীর্থে বশিষ্ঠ মুনির সম্মুখে নির্লজ্জ আচরণের ফলে শাপগ্রস্ত হইয়া রাক্ষসরূপে ষোল বৎসর নগরে ও অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিল। পরে সে বেঙ্কটাচলের চক্রতীর্থে শাপমুক্ত হয়। সুন্দরপুর ও সুন্দরারণ্য কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, তাহা মাহাত্ম্য গ্রন্থের বিবরণে পূর্বে দেখিয়াছি। সুতরাং এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে অভিশপ্ত সুন্দরের বিচরণ স্থানই কালক্রমে সুন্দরপুর ও সুন্দরারণ্য নাম লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক—পুরাণোক্ত সুন্দরের জন্য পুর ও অরণ্যের তাদৃশ নামকরণ হইয়া থাকুক কিংবা তাদৃশ নাম ব্যাখ্যা করিবার জন্য পুরাণে সুন্দরাখ্যানের সৃষ্টি হইয়া থাকুক, এক সময়ে কাবেরী নদীর নিকটবর্তী কোন স্থানে সুন্দরপুর ও সুন্দরারণ্য বর্তমান ছিল, ইহা এখন প্রমাণসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চল হইতে হনুমান লঙ্কা যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণ পাঠে জানা যায়। অতএব এই স্থানের নাম হইতেই 'সুন্দরকাণ্ড' নামের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হইল।

রুষ-মার্কিন কূটনৈতিক দাবার চাল

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

চীনকে কেন্দ্র করিয়া মার্কিন ও রুষের দাবার ঘুঁটি বেশ চালচালি চলিতেছে, মাঝে পড়িয়া বেচারী চীন হা অন্ন, হা অর্থ করিয়া চেঁচাইতেছে। চীনকে আজ বাঁচিতে হইলে তার দুটি বিষয়ের প্রয়োজন—এক খাদ্য, দুই ঋণ। ভাবে মনে হইতেছে যে মার্কিনরা এই দুটোরই ভার লইতে রাজি আছে যদি—। 'যদি'র ব্যাপারটি পাঠক বুঝিয়া লইবেন। প্যারীতে শান্তি সম্মেলনে চীনকে আমন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে রাশিয়ার আপত্তির কারণ জগৎ সমক্ষে খুব প্রকট নহে। পর্দ্দার অন্তরালে যে সব খেলা চলিতেছে, তাহা বুঝিবার শক্তি খুব অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দ্রষ্টাদেরও নাই বলিয়া মনে হইতেছে—তবে লক্ষণ দেখিয়া রোগ ধরা রাজনৈতিক জগতে যদি স্বীকৃত হয় তবে বলা যাইতে পারে যে, যে বন্ধুত্ব রাশিয়া এতদিন জাতীয়তাবাদী চীনের জন্য জমা রাখিয়াছিল তাহা আজ আবার নতুন বন্ধুর পাতে দিবার আশায় আছে। চীনের গৃহযুদ্ধ কাদের কারসাজি তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। সোভিয়েট রাশিয়া নিজেও জানে যে তাহাকেও একদিন এই পরীক্ষাই দিতে হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে রাশিয়া যেমন ভুক্তভোগী ছিল, এক্ষেত্রে তেমন হইতেছে চীন। মার্কিনরা কূটনৈতিক বুদ্ধি ও সামর্থ্য যে পরিমাণে চীনের পিছনে খরচ করিতেছে তাহাতে সোনা না তুলিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছাড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। রাশিয়ার ধর্ম্মভাই কম্যুনিষ্টদের নিয়া খানিকটা পরিমাণে সন্ত্রস্তও বটে। মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া যত সব অপরিহার্য্য শিল্পসম্ভার তা সবই গুটাইয়া লইয়া বাকিটা ধর্ম্মভাই-এর জন্য রাখিয়া গিয়াছে অথবা তাহাদের ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছে। তাহার ফল আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে অশুভ হইয়াছে। রাশিয়া পূর্ব্বাংশে চীনের সহিত যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে,

তাহা ধর্ম্মভাই কম্যুনিষ্ট চীন নহে, তাহা হইতেছে জাতীয়তা-বাদী চীন—মনের দিক দিয়া রাশিয়া এই জাতীয়তাবাদী চীনকে গ্রহণ করে নাই। কেননা ধর্ম্মভাই কম্যুনিষ্টদের প্রতি চিয়াং-কাই-শেক যে ব্যবহার ইতিপূর্ব্বে করিয়াছে তাহা রাশিয়া ভুলে নাই। তবে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন অনেক দায়-ঠেকা প্রেম দেখা যায়, যেমন রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর সঙ্গে করিয়াছিল। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার যে আঁতাত তাহা অনেকটা ঐ জাতীয়ই বলা যাইতে পারে, তবে জার্ম্মানী সম্পর্কে যেরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, চীন সম্পর্কে ঠিক ততটা নয়। যে কোন কারণে হউক সোভিয়েট রাশিয়া জাতীয়তাবাদী চীনের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ। ইহা মৌখিক কারবার নহে, একেবারে লেখাপড়া করিয়া স্থির করিয়াছে যে, চীন ও রাশিয়া উভয়ে উভয়ের বন্ধু। মজা হইতেছে, এই বন্ধুত্বের শিকল গলায় লইয়া চীন দৌড়াইতেছে মার্কিনদের নিকট, আর রাশিয়া সেই দৌড় সামলাইবার নিমিত্ত চীনের ঘরের মধ্যে প্রহরী বসাইতেছে ধর্ম্মভাই কম্যুনিষ্টদের মারফৎ।

চীন রাশিয়াকে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলিয়া দোষী করিতেছে। কেননা রুশ-চীন সখ্য সম্বন্ধের একটা বিশেষ বিধান ছিল, যে মাঞ্চুরিয়ার ডেইরিন বন্দর চীনের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। আর পোর্ট আর্থার বন্দর যৌথভাবে এক কমিশন দ্বারা পরিচালিত হইবে, সেই কমিশনে সোভিয়েট রাশিয়ার থাকিবে তিনজন, আর চীনের থাকিবে দুইজন। কিন্তু রাশিয়া এই সব মানিয়া চলিবার বালাই কিছু রাখে নাই। কেননা সে তাহার সৈন্যসামন্ত যাহা জাপানকে সায়েস্তা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিল—তাহা এমনই এক শুভমুহূর্ত্তে পাঠাইয়াছে—যে তাহারা আসিয়া যুদ্ধে নামিবার একরকম পূর্ব্বেই বলা যাইতে পারে, জাপান আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অতএব রাশিয়া তাহার সৈন্য সদ্ব্যবহারের সুযোগ পোর্ট আর্থার ও পোর্ট ডেইরিনের উপর দিয়া লইয়াছে। ইহার পর রুশ-চীন মিতালী থাকিবার কথা নহে, তাছাড়া ধর্ম্মভাই কম্যুনিষ্টদের প্রতি রাশিয়া যে পরিমাণ দরদ ইদানিং দেখাইতেছে তাহাতে ব্যাপারটা অবশ্যই সন্দেহজনক?

এদিকে চীনের কম্যুনিষ্ট নেতারাও বসিয়া নাই। তাহারা পষ্ট বলিতেছেন যে, যদি মার্কিনরা জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য না করে তবে চীনের গৃহযুদ্ধ খুব সত্বরই সমাধান হইতে পারে। জেনারেল চৌউ-এন-লাই এই কথা পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, চীনের গৃহযুদ্ধে মার্কিন কূটনীতি একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছে। কথাটা অসত্য বা ভিত্তিহীন নহে, এখানে একটি বিষয় ভাবিবার আছে। গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশে পাইকিরি বা খুচরা ভাবে যে সমস্ত গৃহযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ছোট বড় শক্তিগুলি সামর্থ্য ও সুবিধা বুঝিয়া যোগ দিয়াছে। একথা মার্কিনরাও যেমন জানে, রুষরাও তেমনিই জানে, বস্তুতঃ বর্ত্তমান বিশ্ব-রাজনীতিতে ইহা একটি অনিবার্য্য পর্য্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাকে জোরজবরদস্তি করিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা নিছক বাতুলতা। কেননা, বিজ্ঞান যখন মতবাদ প্রচার করিবার জন্য বিচিত্র রকম পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে তখন আর কোন একটি বিশেষ দেশই সেই বিশেষ দেশটির জন্য নয়। মতবাদ ও মতবাদ সার্থক করিবার পন্থা লইয়া যে সমস্ত বাকবিতণ্ডা পৃথিবী ভরিয়া চলিতেছে তাহার ঢেউ কোন বিশেষ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; দেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া আজ তাহা ক্রমশই সুদূরপ্রসারী হইয়া পড়িতেছে। অতএব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন-না-কোন দেশ জড়াইয়া পড়িবেই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চীনকে কেন্দ্র করিয়া যে রুশ ও মার্কিন শক্তির খেলা চলিতেছে তাহার কারণ হইল উভয় শক্তির প্রাচ্যে আস্তানা গাড়িবার প্রয়াস। ইহার মধ্যে মতবাদ প্রসারের চেষ্টাও রহিয়াছে। কথা উঠিতে পারে যে মার্কিনরা বহু পূর্ব্বেই ও কর্ম্মটি সুরু করিয়াছে, বক্সার বিদ্রোহের সময় মার্কিনরা যেমন ব্রিটিশদের রক্ষা করিয়াছে, তেমন চীনে ভবিষ্যত ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা একপ্রকার তখন হইতে সুরু করিয়াছে। তাহা হইলেও পুরো-পুরি সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার কারণ মাঞ্চু সাম্রাজ্য পতনের পর চীনে যে সব শক্তির খেলা চলিয়াছিল তাহা মূলত তিন প্রধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—যথা ব্রিটিশ, ফরাসী ও জাপান। ফরাসী ও ব্রিটিশ ঘুঘু সাম্রাজ্যবাদী, তাহার সঙ্গে হবু সাম্রাজ্যবাদী জাপানও জুটিয়াছিল, এই তিন-এ মিলিয়া চীনের পিণ্ডি চটকাইয়াছে। বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়-এ যে শক্তি অন্তরালে থাকিয়া

চীনের গৃহযুদ্ধকে উস্কানী দিয়াছে তাহার মধ্যে ছিল জাপান, করাসী ও ব্রিটিশ। ইহারা শুধু টাকা পয়সাই দেয় নাই, অস্ত্রশস্ত্রও দিয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান নাই, ফরাসীও নাই। কিন্তু ব্রিটিশ ত রহিয়াছে? কিন্তু তাহার নড়িবার শক্তি নাই। বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া সে যে পরিমাণ সাম্রাজ্যের সুধা পান করিয়াছে তাহাতে তাহার নেশা গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেশ জমাট ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ব্রিটিশের সাম্রাজ্যভোগের নেশায় খানিকটা টান পড়ে, তখনও ঠিক পুরোপুরি নেশা টুটে নাই। এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে নেশা একেবারে টুটিয়াছে এবং ব্রিটিশ জাত আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে ও সাম্রাজ্যের নব্যপ্রবর্ত্তনের জন্য সময় ও বুদ্ধি খরচ করিতেছে। ফল কি হইবে তাহা বলা মুস্কিল। তবে লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে, যে সাম্রাজ্যের নব্য-বিধানকে মানিয়া ও নব্যবিজ্ঞানের দানকে পকেটস্থ করিয়া ব্রিটিশ জাতি আগামী পঞ্চাশ বছর অন্তত পাড়ি জমাইতে পারিবে। সম্ভবত, ব্রিটিশের শ্রমিকদলের চিন্তানায়কেরা এই পরিবর্ত্তনগুলি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন। নচেৎ সাম্রাজ্য-বাদী নীতির এইরূপ পরিবর্ত্তনের কোন কারণ নাই। চীন—তাহাদের সাধের চীন,যেখানে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অহিফেন যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ জাতি তাহার প্রভুত্বের ও মহত্বের পরিচয় দিয়াছে সেখানে একেবারে চুপচাপ। অবশ্য এই মৌন-নীতি অবলম্বনের আর একটি বিশেষ কারণ আছে। কারণটি হইতেছে হতভাগ্য ভারত। ভারত ব্রিটিশ জাতির একদিন অঙ্গের আভরণ ছিল। সে আভরণ দেখিয়া ফরাসী ঈর্ষা করিয়াছে, যুদ্ধও করিয়াছে। জার্ম্মানীর কাইজার ও রাশিয়ার জার উভয়েই ব্রিটিশ জাতির অঙ্গাভরণ ভারত ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিট্‌লারও চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র হইতে ধ্বংস করা যায় কিনা। প্রথমবারে কাইজার যতটা সফলকাম হন নাই, তার চাইতে বেশী সফলকাম হইয়াছেন হিট্‌লার। হিট্‌লার যাহা চাহিয়াছিল তাহা ঘটিয়াছে, তবে তাহাতে হিট্‌লারের কোন সুবিধা হয় নাই, আর তাহার কোন দিন সুবিধা হইবার সম্ভাবনাও নাই। সাম্রাজ্যের বিশেষ স্তম্ভ কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া—তাহারা এই যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতিকে অবশ্য সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু তাহারা বুঝিয়াও লইয়াছে যে, বিপৎকালে Mother Country কতটা সাহায্য-এ আসে। সাম্রাজ্যিক সম্মেলনের সব সলাপরামর্শই আজ ভাসিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ জাতি বার বার সাম্রাজিক সম্মেলন করিয়া স্বায়ত্তশাসিত দেশগুলিকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে তাহারা সবাই আপন এবং বৃহত্তর বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্র। তাহাদের নীতি একইনির্দ্ধারিত পথ বাহিয়া চলিবে ও দেশরক্ষা ব্যাপারে ব্রিটিশ জাতি দায়ী থাকিবে। রণ-কৌশলে নব্য বিজ্ঞানের দান যে ব্রিটিশ জাতির সাম্রাজিক নীতির অন্তরায় হইবে তাহা কে ভাবিয়াছে? শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকালে দেখা গেল চাচা আপন বাঁচা। চাচা আপনাকে বাঁচাইতে গিয়া অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা বৈদেশিক নীতিতে স্বাধীন হইয়াছে, ব্রিটিশ জাতির নৈতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের পরাজয়ের পর আজ কতগুলি নোতুন শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে। এই নব্য শক্তিপুঞ্জকে পিছন হইতে আঘাত করিবার ক্ষমতা কি ব্রিটিশ কি মার্কিন কাহারও নাই। ব্রিটিশ জাতি এই নব অভ্যুত্থানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহারই প্রমাণ স্বরূপ ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, ব্রহ্ম, মালয় ইত্যাদিতে নব্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা—ইহা কতটা সফল হইবে আজ তাহা বলা মুস্কিল। যদি কোন দিন ইহার কিছুটাও সফল হয় তবে ভারত, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, শ্যাম, চীন, তিব্বত, জাভা ও সুমাত্রা সবাই মিলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে এক সঙ্ঘরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই গ্রথিতশক্তি মার্কিন বা রুশ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কাজ করিবে। জাপানের ক্ষত-বিক্ষত শক্তিও ইহাতে যত সত্বর পারে সাড়া দিবে। কেননা, তাহার সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। ব্রিটিশ জাতির শ্রমিকদলের নীতি এই সমস্ত রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করিতে বাধ্য হইবে, নচেৎ ব্রিটেনে যে নব্য অর্থনৈতিক কাঠামো শ্রমিকদল গড়িবার চেষ্টায় আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইবে। শ্রমিকদল কতকগুলি মৌলিক শিল্পের জাতীয়করণ-নীতি গ্রহণ করিয়া ব্রিটেনে এক জাতীয় শত্রুর সৃষ্টি করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহার ফলস্বরূপ যে নবীন সামাজিক ধারা জন্ম লইবে তাহারাই পরবর্ত্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল

শত্রুকে ধ্বংস করিবে। অতএব রক্ষণশীলদলের পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিয়া মসনদে বসার স্বপ্ন অনেকটা অবাস্তব। ইতিহাস কখনও উল্টো রথে চলে না, তার গতি সব সময়ই নোতুন ভবিষ্যতের পানে। যাক সে কথা। এখন কথা উঠিতে পারে, এই বিভিন্ন রাজনৈতিক স্রোতের ওঠা-নামার মধ্যে রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্বের অবকাশ কোথায়? বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে রুশদের জাপানের নিকট পরাজয় একটা ক্ষোভের কারণ। সেই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের (গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিনদের রাষ্ট্রপতি থিয়োডর বিনি ছিলেন তিনি নহেন) হস্তক্ষেপের ফলে রুশ-জাপান দ্বন্দ্বের একটা নিষ্পত্তি ঘটে। নচেৎ রাশিয়াকে আরও অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হইত। এই যুদ্ধে রুশ তাহাদের নৌ-শক্তির দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা বুঝিয়াছিল, তাছাড়া উত্তরসাগর তীরবর্ত্তী কোন নৌ-ঘাঁটি না থাকার জন্য তাহারা যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা রুশরা ভোলে নাই। পক্ষান্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে রুশদের কোন নৌ-ঘাঁটি না থাকায় মার্কিনরা মনে-মনে বেশ আশ্বস্ত ছিল। কেননা চীনে মার্কিন বাণিজ্য সবেমাত্র দানা বাঁধিতেছিল এই অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরে রুশদের দখলে কোন নৌ-ঘাঁটি থাকিলে ঠিক নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কাজেই মার্কিনদের বৃহত্তর আন্তর্জ্জাতিক কূটনৈতিক পরিধির মধ্যে রুশদের সম্প্রসারণ খুবই লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল। রাশিয়ায় জারের উৎখাত ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠায় ইহার কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাজেই সমস্যা জারের আমলে যেখানে ছিল এখনও সেইখানেই আছে। তাছাড়া রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতে রাশিয়ার শত্রু বৃদ্ধি হইয়াছে বই কমে নাই। কাজেই প্রাচ্যে ভেইরিণ বন্দর, পোর্ট আর্থার, ভ্লাডিভষ্টক বন্দর ইত্যাদি রাশিয়ার সুদূরপ্রসারী আত্মরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপাদানস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক দিনের জন্য লড়াই করিয়া যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে তাহা জার বহুবর্ষব্যাপী অশেষ চেষ্টা করিয়াও পারে নাই। এতদিন পরে রাশিয়া উষ্ণসাগর তীরবর্ত্তী দেশে ঘাঁটি তৈরী করিতে সমর্থ হইল। ইহা মার্কিনদের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ এবং রাশিয়া যাহা পীত সাগর ও জাপান সাগরের মুখে পাইয়াছে তাহাতে তাহার প্রশান্ত মহাসাগর পাহারা দেওয়া চলিবে। তাছাড়া বেরিং প্রণালী ও এ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া আর একখানি দুর্য্যোগের মেঘ রুশ-মার্কিনদের মাঝে আস্তে আস্তে ভাসিয়া উঠিতেছে। রাশিয়ার জার তাঁর আলাস্কা প্রদেশটি মার্কিনদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। মার্কিনরাও ইহা লইয়া কম ঝামেলা পোহায় নাই, কানাডার সঙ্গে সীমান্ত নীতি লইয়া কম বিরোধ করে নাই। মার্কিনরা এযাবৎ আলাস্কাকে তাদের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়াই বিবেচনা করিত। কিন্তু গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আলাস্কার গুরুত্ব রীতিমত বাড়িয়া গিয়াছে। রাশিয়াকে এইবার আলাস্কার পথে প্রচুর রণসম্ভার পাঠানো হইয়াছে। রাশিয়া অবশ্য তাহা দায় পড়িয়া গ্রহণ করিয়াছে, সম্ভবত মনে মনে স্বস্তিবোধ করে নাই। কেননা, আসলে শিয়ালকে ভাঙ্গা বেড়া দেখানো হইল মাত্র। এ-পথে এ রণসম্ভার গ্রহণ করার অর্থ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ভয়াবহ করিয়া তোলা। তাই বেরিং প্রণালীর পাড়ে কম্স্টকা লইয়া দুশ্চিন্তা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমানে বিমান যুদ্ধের যেমন দ্রুত উন্নতি হইতেছে তাহাতে বিপৎকালে আলাস্কা যে কতটা সর্ব্বনাশ করিবে তাহা হয়ত রাশিয়া এখনই ভাবিতে সুরু করিয়াছে। আসলে এই সবই হইল প্রাচ্যে রুশ-মার্কিন কূটনৈতিক দাবার খেলা।

স্মৃতি

শ্রীবামাচরণ কর্ম্মকার

আমি থাকি অতীতের অতল আঁধারে
ছায়া কায়া মায়াহীন অলখ আকারে।
কারো কাছে ছুটে যাই, কারো কাছে ধীরে
কেহ ভালবাসে কেহ চাহে নাকো ফিরে।

যার মুখে মিলনের মধু প্রেম হাসি
বিরহে কাঁদাই তার শান্তি বিনাশি।
বঞ্চিত ব্যথাতুর শূন্য জীবনে
ক্ষণিকের সুখ আমি অভাব পূরণে।

কন্যা কুমারী

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে যে পরমরমণীয় কন্যা-কুমারী তীর্থ আছে তাহা দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ মেলে রওনা হইলাম। রাত্রে কখন খুর্দারোড পার হইলাম জানিতে পারি নাই। ভোরের আলোকে রম্ভা হ্রদের দৃশ্য অতিশয় মনোহর বোধ হইল। নারিকেল-বৃক্ষাবৃত ছোটছোট পাহাড়গুলি হ্রদের জল হইতে মাথা তুলিয়া যেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। ক্রমে রৌদ্র উঠিল। পূর্বঘাটের পর্বতশ্রেণী কোথাও নিকটে কোথাও দূরে দেখা যাইতেছিল। বেলা দ্বিপ্রহরের পরে ওয়ালটেয়ার পৌঁছিলাম। অপরাহ্নে রাজামান্দ্রী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাজামান্দ্রীর নিকটেই গোদাবরী ষ্টেশন, ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে অনেক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে ট্রেণ গোদাবরীর পুলের উপর উঠিল। ইহা দুই মাইলের অধিক দীর্ঘ, দৈর্ঘ্যে ভারতের দ্বিতীয় সেতু, শোণ ইষ্ট ব্যাঙ্কের (Sone East Bank) সেতু অপেক্ষা মাত্র কয়েক ফুট কম। বর্ষাস্ফীত বিশাল রক্তিম বারিরাশি বহু আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে করিতে তীব্রবেগে অদূরবর্ত্তী সমুদ্র অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। নাসিকে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থলে দেখিয়াছিলাম ক্ষীণ স্রোত মাত্র—এখানে কি বিশাল নদী। নদীতটে নগরের গৃহ এবং ঘাটগুলি দেখা যাইতেছিল। না জানি কোন্ ঘাটে শ্রীচৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের মিলন হইয়াছিল, এবং বৈষ্ণব ধর্ম তত্ত্ব সকল আলোচিত হইয়াছিল। আর এক রাত্রি ট্রেণে কাটিল। যখন সকাল হইল তখন আমরা মান্দ্রাজ নগরীর নিকটেই উপস্থিত হইয়াছি। মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের সীমাহীন বারিরাশি দেখা যাইতেছিল। বেলা ৯টার সময় আমরা মান্দ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামায়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বাটিতে স্নানাহার করিয়া বৈকালে এগ্‌মোর ষ্টেশনে ত্রিবান্দ্রাম এক্‌সপ্রেস্ (Trivandrum Express) ধরিলাম। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরের মধ্য দিয়া সারারাত্রি গাড়ী ছুটিল। সকালে কোডাই কানাল রোড ষ্টেশন পার হইলাম। অদূরে উচ্চ পাহাড় দেখা যাইতেছিল, ইহার উপরে কোডাই কানাল নামক বিখ্যাত স্বাস্থ্য নিবাস। কিছু পরে মাদুরা পৌঁছিলাম। এখানে মীনাক্ষী দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। মাদুরা হইতে একটি লাইন রামেশ্বর অভিমুখে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে, অপর লাইন ত্রিবান্দ্রাম অভিমুখে পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। তেনকাশী পার হইয়া শেনকোডা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে পার্বত্য রেলপথ (ghat section) আরম্ভ হইল। চারিদিকে নিবিড় অরণ্যাবৃত পশ্চিম ঘাটের পর্ব্বতশ্রেণী। কোথাও গাড়ী পুলের উপর দিয়া চলিতেছে—শতাধিক ফুট নীচে জলধারা—কোথাও গাড়ী পর্বত গাত্র বেষ্টন করিয়া উপরে উঠিতেছে,—কোথাও সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই সকল বনে বাঘ ভালুক ও অনেক হাতী থাকে। এখান হইতে বহু মূল্যবান কাঠ রপ্তানি হয়। একটি রবারের আবাদ দেখিলাম "উদয় গিরি রবার কোম্পানী" লেখা রহিয়াছে, এখানে চারিদিকে বনের মধ্যে কয়েকটি বাড়ী। অপরাহ্নে কুইলন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ইহা আরব সাগরের উপর একটি বন্দর প্রাচীনকালে এই বন্দরের সহিত গ্রীস, আরব ও চীনের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। এখান



কন্যাকুমারীর পথে

হইতে পথ দক্ষিণ অভিমুখে চলিল। সারাদিন ট্রেণে রৌদ্রতপ্ত হইয়া অপরাহ্নের স্নিগ্ধবায়ু বড় মধুর লাগিতেছিল। পথটিও মনোহর। পথের ধারেই বড় বড় হ্রদ, কোথাও বা সুবিস্তৃত নদী, হ্রদ ও নদীর উপর ছোট ছোট নৌকা, তীরে নারিকেলকুঞ্জ, মধ্যে মধ্যে দূরে সমুদ্রের জল দেখা যাইতেছিল। সন্ধ্যার কিছু পরে আমরা ত্রিবান্দ্রাম ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে ট্যাক্সি করিয়া রেষ্ট হাউসে (Rest House) গেলাম।

ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের সমুদ্র উপকূল মালাবার নামে পরিচিত। ইহা তিনভাগে বিভক্ত। দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, মধ্যে কোচিন রাজ্য, উত্তরে ব্রিটিশ মালাবার। পূর্বে পশ্চিমঘাট পাহাড়, পশ্চিমে আরব সাগর, মধ্যবর্ত্তী উপকূলে মালাবার অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম কেরল। ত্রিবাঙ্কুরের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। এখানে অনেক খৃষ্টানের বাস। সমগ্র ভারতে যত খৃষ্টান থাকে তাহাদের

অর্দ্ধেকের বেশী ত্রিবাঙ্কুরে থাকে। কিছুদিন পূর্বে মাসিকপত্রে একটি ভ্রমণ কাহিনী পড়িয়াছিলাম, লেখক লিখিয়াছিলেন অস্পৃশ্যতা প্রথার ফলে ত্রিবাঙ্কুরে এত বেশী লোক হিন্দু ধর্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইয়াছে। এই অনুমান যথার্থ নহে। ত্রিবাঙ্কুরে প্রথমে যাহারা খৃষ্টান হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটিও অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি ছিল না—সকলেই উচ্চ বর্ণের। যাহারা খৃষ্টান হইয়াছিল তাহারাও জাতিভেদ মানিয়া চলিত। দক্ষিণ ভারতের খৃষ্টান সম্বন্ধে মণীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের "জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি" নামক প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"একদিন পণ্ডিচেরি হইতে তাঞ্জোর যাইবার পথে একটি খৃষ্টানের সহিত রেলের গাড়ীতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ, উষ্ণীষ খুলিলে দেখা গেল মাথায় কিয়দ্ভাগ ক্ষৌরকর্ম দ্বারা পরিষ্কৃত—মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ। নাম বলিলেন—সুব্রহ্মণ্য। জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি ব্রাহ্মণ?" তিনি বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ বংশজাত কিন্তু খৃষ্টানধর্মাবলম্বী। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ কিন্তু ধর্মে খৃষ্টান।"

প্রবাদ এই যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেন্ট টমাস মালাবারে আসিয়া খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেখানকার হিন্দু রাজা খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদিগকে তাঁহাদের ধর্মপ্রচারে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন, এমন কি ভূসম্পত্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। বড়ই অদ্ভুত উদারতা সন্দেহ নাই। ধর্ম প্রচার দ্বারা বোধহয় বুঝিয়াছিলেন যে জাতি ত্যাগ করিতে হইবে না জানিলে বেশী লোক খৃষ্টান হইবে।

কালক্রমে অস্পৃশ্যজাতীয় লোকও খৃষ্টান হইয়াছিল, কিন্তু উচ্চবর্ণের খৃষ্টানগণ তাহাদিগকে অস্পৃশ্যই মনে করিতেন। আধুনিককালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরুদ্ধে ভারতের অন্যত্র যেরূপ, ত্রিবাঙ্কুরেও সেইরূপ মত প্রচার হইয়াছে। সে যাহা হউক অস্পৃশ্যতাপ্রথার ফলে ত্রিবাঙ্কুরে খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক হইয়াছে ইহা যথার্থ নহে। কারণ অস্পৃশ্যতা ত্রিবাঙ্কুরে যেরূপ প্রচলিত ছিল, মাদ্রাজের অন্যান্য অঞ্চলেও সেইরূপ।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানীর নাম ত্রিবান্দ্রাম। ত্রিবান্দ্রাম শব্দটি তিরু-অনন্তপুরের অপভ্রংশ। তিরু অর্থাৎ শ্রী। এই নগরকে অনন্তপুর বলা হয় কারণ অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুর মন্দির এখানে বিদ্যমান। বিগ্রহের নাম পদ্মনাভস্বামী। এই পদ্মনাভস্বামীই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মালিক—ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তাঁহার কর্মচারীরূপে রাজ্য পরিচালন করেন। প্রতিদিন প্রাতে রাজা মন্দিরে গিয়া পদ্মনাভ স্বামীর পূজা করেন এবং তাঁহার আদেশ আনিয়া রাজ্য পরিচালনা করেন। যেদিন মন্দিরে যাইতে না পারেন সেদিন একটা সুবর্ণ মুদ্রা জরিমানা দিতে হয়।

আমরা বেলা প্রায় নয়টার সময় মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দির প্রবেশ পথের উপরে গোপুরম। মন্দির মধ্যে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মন্দিরের ধ্বজা সুবর্ণমণ্ডিত বলিয়া শুনিলাম। রাজা আসিয়া পূজা না করিলে যাত্রীগণ কেহ দর্শন করিতে পারেন না। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে। শুনিলাম, প্রত্যহ দুই সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। কিছুক্ষণ পরে রাজা আসিলেন। প্রথমে দুইজন বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছে, তাহার পর কয়েকজন ব্রাহ্মণ, তাহার পর মখমলমণ্ডিত তরবারি হস্তে কয়েকজন রক্ষী, তাহার পর রাজা, তাহার পর কয়েকজন ব্রাহ্মণ গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে আসিতেছে। রাজার নগ্নপদ, অনাবৃত দেহ। বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর। সৌম্য দর্শন। অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্দির মধ্যে পূজা করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাহার পর গোপালজির মন্দিরে গিয়া পূজা করিলেন। তাহার পর রাজা চলিয়া যাইবার পরে আমরা প্রবেশ করিলাম।

পদ্মনাভ স্বামীর মূর্ত্তি বিশালকায়। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত। বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান। যে গৃহে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, যাত্রীরা সে গৃহে যাইতে পারে না। গৃহের বাহিরে চত্বর, চত্বরের উপর কিছুদূরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিলাম। মন্দির প্রকোষ্ঠে তিনটি ক্ষুদ্রাকার দ্বার। একটি দ্বার দিয়া পদ্মনাভ স্বামীর মুখারবিন্দ, একটি দ্বার দিয়া নাভিপদ্ম ও একটি দ্বার দিয়া চরণারবিন্দ দেখা যায়। একসঙ্গে সমগ্র বিগ্রহ দেখা যায় না। মূল মন্দিরের বাহিরে ভোগমূর্ত্তি, নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি, এবং সীতারাম ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তিও দর্শন করিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্বে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ঘোষণা করেন যে মহারাজের যে সকল খাস মন্দির আছে সে সকল মন্দিরে সকল জাতির লোক প্রবেশ করিতে পারিবে। সেই ঘোষণা অনুসারে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরেও অস্পৃশ্যজাতির লোক প্রবেশ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, মন্দিরপ্রকোষ্ঠে

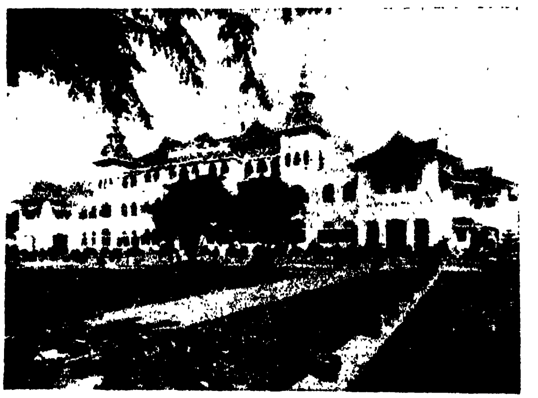


শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর মন্দির

তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না। ত্রিবাঙ্কুরের যে সকল মন্দির মহারাজার সম্পত্তি নহে, সে সকল মন্দিরে পূর্বের ন্যায় অস্পৃশ্যজাতির প্রবেশ নিষেধ।

ত্রিবান্দ্রাম নগরটি সুদৃশ্য। লোকসংখ্যা ১,৩০,০০০। সমুদ্র হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত। প্রশস্ত রাজপথ। বড় বড় অট্টালিকা। হাইকোর্ট, য়ুনিভার্সিটি, টাউনহল, যাদুঘর, চিত্রালয়, ওয়াটার ওয়ার্কস্,

ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্ স্নানমন্দির প্রভৃতি বিদ্যমান। এখানকার দেওয়ান স্যর সি-পি-রামস্বামী আয়ার। আমি তাঁহাকে পূর্ব হইতে লিখিয়াছিলাম যে আমি ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনিষদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা করি। দেওয়ান মহাশয় টাউনহলে বক্তৃতার ব্যবস্থা



রাজপ্রাসাদ—ত্রিবান্দ্রাম

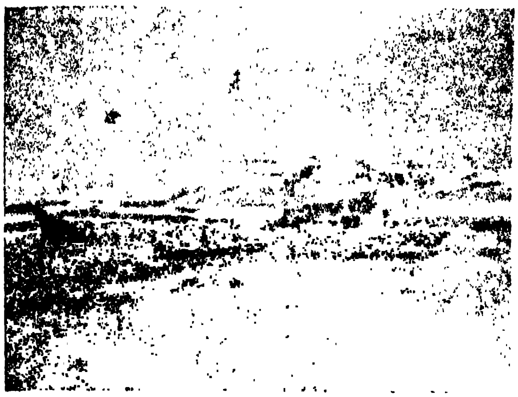
করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত টি-এম্ কৃষ্ণস্বামী আয়ার সভাপতি ছিলেন। সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ছাত্র আসিয়াছিলেন। মহিলাছাত্রীও অনেকগুলি আসিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরে যত বেশী ভাগ লোক স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছে ভারতের অন্যত্র কুত্রাপি তত বেশী লোক শিক্ষালাভ করে নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা এখানে বহুব্যাপক।

ত্রিবাঙ্কুর শব্দ তিরু-বিদাম্—কুর শব্দের অপভ্রংশ। বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য পূর্বে বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখনকার ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ছিল পদ্মনাভপুরম্—ইহা ত্রিবান্দ্রাম হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং কন্যাকুমারী যাইবার পথ হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মহারাজা মার্তণ্ড বর্মা অন্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করিয়া বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য স্থাপন করেন এবং সমগ্র রাজ্য শ্রীপদ্মনাভস্বামীকে (বিষ্ণুকে) দান করেন। তদবধি রাজারা নিজদিগকে পদ্মনাভদাস নামে পরিচয় প্রদান করেন। এই সময় রাজধানী পদ্মনাভপুর হইতে ত্রিবান্দ্রামে আনীত হয়। পদ্মনাভপুরের পরিত্যক্ত রাজপ্রসাদে বহু উৎকৃষ্ট চিত্র এবং ভাস্কর্য্য বিদ্যমান আছে, সাধারণে ইহা দেখিতে পারে। এই সকল শিল্পদ্রব্য হেতু ইহা দক্ষিণের অজন্তা নামে পরিচিত।

কন্যাকুমারী তীর্থ ত্রিবান্দ্রাম হইতে ৫০ মাইল। মোটরবাসে যাইতে হয়। ত্রিবান্দ্রাম হইতে নাগরকোয়েল ৪০ মাইল পর্য্যন্ত একটি বাস। আবার সেখান হইতে কন্যাকুমারী তীর্থ ১০।১১ মাইল অন্য বাস যায়। নাগরকোয়েল বড় সহর। ইহার নিকট শুচীন্দ্রম্ নামক তীর্থস্থান। এখানে ইন্দ্র গৌতম-শাপ হইতে মুক্ত হন। নগর—গ্রাম—ক্ষুদ্র স্রোত—ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পথ। মধ্যে মধ্যে দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছিল। অপরাহ্নে আমরা কন্যাকুমারী পৌঁছিলাম। উচ্চতটভূমি হইতে নিম্নে সমুদ্রের দৃশ্য অতি সুন্দর। পূর্বে দক্ষিণে পশ্চিমে অনন্ত বিস্তার সমুদ্র। দক্ষিণে তটভূমির নিকট স্থানে স্থানে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সমুদ্র হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শোনা যায়, এইস্থান স্বামী বিবেকানন্দের খুব প্রিয় ছিল। তিনি সাঁতার দিয়া ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডের উপরে উঠিয়াছিলেন। এখান হইতে দক্ষিণ মেরু (South Pole) পর্য্যন্ত কোনও দ্বীপ নাই, প্রায় ছয় হাজার মাইল কেবল সমুদ্র। স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণার্থ এখানে একটি স্বামী বিবেকানন্দ পাবলিক লাইব্রেরী আছে। এখানে একটি ছত্রম বা ধর্মশালা আছে। Rest House এবং Cape Hotel নামক আধুনিকভাবে সজ্জিত দুইটি বাটিও আছে। এখানে ভাড়া দিয়া থাকিতে পারা যায়। কুমারী এই শব্দটি পরিবর্তন করিয়া ইংরাজেরা নাম দিয়াছেন Comorin।

কন্যাকুমারী ক্ষুদ্র স্থান। এখানে কয়েকটি দোকান ঘরও আছে। নগরের দক্ষিণতম প্রান্তে কুমারী দেবীর বৃহৎ মন্দির। কুমারী দেবীর মনুষ্যপ্রমাণ মূর্ত্তি—হাতে প্রস্তরময় পুষ্পমালা। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে কৈলাস পর্বতে মহাদেব ও পার্বতী দেবীর নিকট মায়াসুরের স্ত্রী আসিয়া তিন যুগ ধরিয়া পূজা করিয়াছিলেন। পার্বতী দেবী ঐ রমণীর নাম পুষ্পকালী রাখিয়াছিলেন। পুষ্পকালীর পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বর চাহিতে বলিলেন। পুষ্পকালী বলিলেন, তিনি যেন প্রলয়ের সময় মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে পারেন। মহাদেব বলিলেন—তথাস্তু, কিন্তু প্রলয় হইতে অনেক দেরী; কারণ ৪২,৫৬,০০০ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার একদিন, এইরূপ ৩৬৫ দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর; এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু; তাহার পর প্রলয়। যতদিন না প্রলয় হয় ততদিন মহাদেব পুষ্পকালীকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে তপস্যা করিতে বলিলেন। পুষ্পকালী পৃথিবীতে জন্ম লইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে বাণাসুর পুষ্পকালীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পুষ্পকালীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পাণ্ডা-ঠাকুর যে বিবরণ বলিলেন তাহা কিছু ভিন্ন। তাহা স্থানীয় স্থল-পুরাণানুযায়ী। সে বিবরণ এই যে, বাণাসুর বর চাহিয়াছিলেন—কোনও পুরুষ বা রমণী যেন তাঁহাকে বধ করিতে না পারে। কুমারীর নিকট হইতে অবধ্যতা তিনি চাহেন নাই। মহাদেব পার্বতীকে বলিলেন, "তুমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর এবং কুমারী অবস্থায় বাণাসুরকে বধ কর, তাহার পর আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" পার্বতী কন্যা-কুমারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বাণাসুরকে বধ করিলেন। তাহার পর বিবাহের জন্য কুঙ্কুম, হরিদ্রা, তণ্ডুল প্রভৃতি সকল আয়োজন করিয়া পুষ্পমাল্য হস্তে মহাদেবের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। এদিকে কলিযুগ আরম্ভ হইল। মহাদেব আসিয়া বলিলেন "কলিযুগে দেবতারা বিবাহ করেন না, সত্যযুগ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে"। দেবী তাই অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার দেহ, হাতের মালা এবং কুঙ্কুম, হরিদ্রা, চাউল প্রভৃতি সব উপকরণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বিবাহ

করিবেন দেবী সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। সমুদ্রতীরে কতকগুলি রক্ত ও হরিদ্রাবর্ণের বালুকা পড়িয়া আছে, পাণ্ডাগণ তাহাই প্রস্তরীভূত কুঙ্কুম ও হরিদ্রা বলিয়া থাকেন।



কেপ-কুমারী

কন্যাকুমারী দেবীর মন্দিরের পশ্চাতেই সমুদ্র। সমুদ্রে স্নান করিবার জন্য পাথরে বাঁধান ঘাট, আর জলাশয় আছে। এখানে চক্রতীর্থ এবং পাপনাশ, গায়ত্রী, সাবিত্রী প্রভৃতি এগারটি তীর্থ আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে কন্যাকুমারী গিয়াছিলেন, সেখান হইতে মালাবার উপকূল দিয়া উত্তর ও পূর্ব মুখে পুরী ফিরিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কন্যাকুমারীর পর আমলকীতলা, বাতাপানী ও পয়স্বিনীর উল্লেখ আছে, তাহার পর অনন্ত পদ্মনাভের নাম পাওয়া যায়। এই অনন্ত পদ্মনাভই ত্রিবান্দ্রামের পদ্মনাভস্বামী। পয়স্বিনী তীরে চৈতন্যদেব আদিকেশবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা বর্ত্তমান তিরুবত্তর নামক স্থানে অবস্থিত। এইখানে তিনি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংহিত'-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পুঁথি পাইয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু-স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমাজ্ঞানের পরম কারণ॥

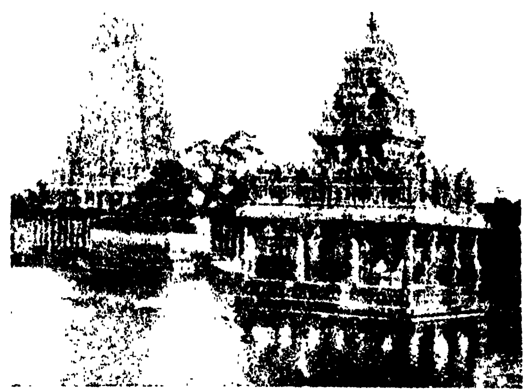
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই অঞ্চলকে "মল্লার দেশ" বলা হইয়াছে। মল্লার শব্দ বোধ হয় মালাবার শব্দেরই রূপান্তর। এই দেশের লোককে "ভট্টমারি" কেন বলা হইয়াছে বোঝা গেল না। চৈতন্যদেবের সহিত কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ ছিল, কোনও ভট্টমারি "স্ত্রীধন দেখাইয়া তাহার লোভ জন্মাইয়াছিল,"। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবকে পরিত্যাগ করিয়া ভট্টমারির গৃহে গিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন, ভট্টমারিগণ চৈতন্যদেবকে নানা অস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, চৈতন্যদেব নিজ বিভূতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মালাবার দেশে রমণীরাই ধনের অধিকারী, এই প্রথা লক্ষ্য করিয়া বোধহয় স্ত্রীধন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পদ্মনাভ স্বামীকে দর্শন করিয়া চৈতন্যদেব শ্রীজনার্দ্দন দর্শন করিয়াছিলেন। ত্রিবান্দ্রাম ও কুইলন ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী বরকলা (Varkala) নামক ষ্টেশনের নিকট জনার্দ্দনের মন্দির এখনও বিদ্যমান।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য মালাবার দেশে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান 'কালটি' ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যেই অবস্থিত। নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট বেদের চর্চ্চা আছে।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা মুসলমান বা ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই। পুরাণে ইহা পরশুরামক্ষেত্র নামে পরিচিত। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন এবং কশ্যপের নির্দেশ অনুসারে পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে মহেন্দ্র পর্বতে বাস করিয়াছিলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মালাবার প্রদেশে রমণীরাই ধনের অধিকারী। এখানে প্রত্যেক রমণী তাহার পুত্রকন্যা লইয়া একটি গোষ্ঠী বা পরিবার গঠন করে, স্বামী ভিন্ন পরিবারের অন্তর্গত। রাজবংশেও এই নিয়ম। রাজার পুত্র রাজা হয় না, রাজার ভাগিনেয় রাজা হয়। রাজার পত্নীকে



শচীন্দ্রামের মন্দির

রাণী বলা হয় না, রাজার মাতা এবং ভগ্নীই রাণী হয়। কোচিন রাজবংশেও এই নিয়ম।

ত্রিবান্দ্রামে শ্রীযুক্ত পি শেষাদ্রি আয়ার নামে একটি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হয়। ইনি উত্তম বাঙ্গলা জানেন। বিশ্ববাণী নামক মাসিকপত্রে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার একখানি আমাকে দিলেন। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছেন তাহার আধুনিক নাম কি তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে সেই তালিকা দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত আয়ার ভারতবর্ষের এবং য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষাই জানেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের অধ্যক্ষ (Superintendent, University Publications)।

চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লিখিত নাম	আধুনিক নাম	চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লিখিত নাম	আধুনিক নাম
ত্রিপদী	তিরুপতি	দক্ষিণ মথুরা	মাদুরা
ত্রিমল্ল	তিরুমালাই	কৃতমালা	বৈগাই নদী
শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী—কাঞ্জিভরম		দুর্বেসন	দর্ভশয়নম্
ত্রিকাল হস্তী	কালহস্তী	মহেন্দ্র শৈল	গন্ধমাদন পর্বত
পক্ষতীর্থ	তিরুকালুকুণ্ডরম	ধনুতীর্থ	ধনুষ্কোটি
শ্বেতবরাহ	তিরুবিদাবেন্তাই	নয়ত্রিপদী	নবতিরুপতি
	(মহাবল্লীপুরের নিকটে)	চিয়ড়তালা	চেরমাদেবী
পীতাম্বর শিব	চিদম্বরম	তিলকাঞ্চী	তেনকাশী
শিয়ালি	শ্রীকালী	মলয় পর্বত	অগস্ত্যকূটম্
গোসমাজ	অবদুতুরা	মল্লার	মালাবার
বেদাবন	বেদারণ্যম্	পয়স্বিনী	তিরুবত্তর
কুম্ভকর্ণ	কুম্ভকোণম্	অনন্ত পদ্মনাভ	ত্রিবান্দ্রাম
ঋষভপর্বত	আশাকরমালা	জনার্দন	বরকালা
শ্রীশৈল	তিরুপ্পুরুম্কুণ্ডম্	পয়োষ্ণী	নবাইকুলম্

বঙ্কিম-বন্দনা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মাতৃ-বন্দনার গানে মূক-কণ্ঠ করিয়া মুখর,
সঞ্জীবনী-মন্ত্রদানে সঞ্চারিয়া প্রাণ শুভঙ্কর,
জাতির জীবনে দিয়া অভিনব স্পন্দনের দোল,
বঙ্গজলে বিরচিলে জ্যোতির্ময় তরঙ্গ-হিল্লোল।
তন্দ্রাতুরে শুনাইয়া মেঘমন্দ্রে জাগরণী গান,
করে তার সমর্পিয়া সৌন্দর্যের দিব্য অবদান
শিখালে ভারতবর্ষে ভারতীর নব উপাসনা।
তাই গুরু, বঙ্গভূমি করে আজি তোমারে বন্দনা।

ভাবের বিলাস লয়ে মিথ্যা মালা গাঁথি কল্পনার
প্রবেশ করনি তুমি মঞ্জু কুঞ্জে বাণী-দেবতার।
বাজায়ে মঙ্গলশঙ্খ সর্বা শুভ করিবারে দূর
বরদার বীণা তন্ত্রে পরাইলে কল্যাণের সুর।
সত্যশিবসুন্দরের সিংহাসন সাহিত্য-মন্দিরে
প্রতিষ্ঠা করিলে তুমি মানবের সুখ দুঃখ ঘিরে।
পঙ্কিলতা-লেশহীন শুভ্র তব শুভদ রচনা
তাই শিল্পী, ভক্তিনত বঙ্গ করে তোমারে বন্দনা।

শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার ভব্যতার তুঙ্গ শৃঙ্গে বসি
দাও নাই উপদেশ অশিক্ষিতে নিত্য উপহাস'।
লয়েছ আপন বক্ষে তাহাদের সুখদুঃখরাশি,
মেনেছ আপন করি তাহাদের অশ্রু আর হাসি।
ঘষিয়া ঘষিয়া নিজ হৃদয়েরে রচিলে চন্দন,
তুলিলে অমৃতভাণ্ড আপনারে করিয়া মন্থন,
স্নেহাশ্রিত ভাই বলি বাঙালীরে দিলে আলিঙ্গন।
হে আত্মীয়, বঙ্গ তাই করে আজি তোমারে বন্দন।

এঁকেছিলে একদিন দুর্ভিক্ষের চিত্র ভয়ঙ্কর,
রাষ্ট্রবিপ্লবের দুঃখ দুর্ভাগ্যের রাত্রি ঘোরতর
দেখাইলে যে দুর্যোগে বীর্যবান দুর্মদ সন্তান
মায়েরে পূজিল যারা আত্ম উষ্ণরক্তে করি স্নান:
স্বচক্ষে দেখেছি মোরা পঞ্চাশের মহামন্বন্তর,
আজিও সম্মুখে দেখি অন্নহীন লক্ষ নারী নর,
দেখেছি বঙ্গের প্রান্তে প্রাণবন্ত বাঙালী সন্তান
করিতেছে অকাতরে জীবনের সব কিছু দান।

উদ্ধারিলে জননীর নিমজ্জিত রত্নসিংহাসন
শোণিত অক্ষর দিয়া লিখিবারে জাগ্রত জীবন।
এ আনন্দমঠ-ছবি সত্যদ্রষ্টা, দেখেছিলে তুমি।
তাই ঋষি, তব পদে পূজা দেয় সারা বঙ্গভূমি।

আত্মদ্বন্দ্বে অবসন্ন স্বার্থপর এ জাতির ভালে
বিপুল কালিমাপুঞ্জ জমিয়া উঠেছে কালে কালে।
এ পরাধীনতা-জাত দুঃখভার হোক অবসান,
তোমারে স্মরিয়া মোরা ফিরে যেন পাই পুন প্রাণ,
সর্বরিক্তা জননীরে দেখি যেন রাজরাজেশ্বরী;
সগৌরবে বাঁচি, আর সগৌরবে যেন মোরা মরি।

ক্ষণ ও চিরন্তন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

আমার ঘরখানা সত্যি বড়ো উঁচুতে। বাড়ীটার চারতলায়! দক্ষিণ ও পশ্চিম খোলা। জানালা দু'টো দক্ষিণমুখো। পশ্চিমমুখো আরো দু'টো জানালা। ঘরে হাওয়া আসে প্রচুর। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে শহরের কোনো জায়গায় বাতাস না থাকলেও আমার ঘরখানায় থাকে।

পৃথিবীর বুক থেকে যেনো পৃথক হয়ে আমি শূন্যে বাস করি।

ঘরখানা ছোটো ; কিন্তু এর দূর-দৃষ্টি আছে, এ কথা না বলে থাকা যায় না। জানালার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে কতদূর পর্য্যন্তই না দেখা যায়! আশে-পাশে আর সুমুখের বাড়ীগুলির অন্তঃপুরের নিরালা কোণেও আমার চোখের বাধাহীন চাহনি গিয়ে পড়ে।

এই বাড়ীটা যেন বনিয়াদী বটগাছ। এর সামনের বাড়ীগুলি আগাছা।

বাড়ীটার তিন-তলায় থাকেন, মিত্র পরিবার। সংসার খুব ছোটো। স্বামী আর স্ত্রী। ছেলে-পুলের কোনো বালাই নেই। এঁদের দু'জনেরই বয়েস হয়েছে। কর্ত্তা শ্যামসুন্দর, গিন্নী শৈলজা।

এঁদের সঙ্গেই শুধু আমার অন্তরঙ্গতা।

সুদীর্ঘ বছর ধরে স্বামীস্ত্রীতে এঁরা, মানে শ্যামসুন্দর আর শৈলজা, সংসার করে আসছেন। সংসার ধর্ম্মের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এই দু'টি নর-নারী পরস্পরকে অবিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। এমনভাবে বসবাস করছেন যে, দু-জনকে ভিন্ন আত্মা ভাবা যেনো একটা মহা অন্যায় এবং ভ্রমের ব্যাপার।

শ্যামসুন্দর আর শৈলজার মুখের চেহারা পর্য্যন্ত এক হয়ে এসেছে।

শৈলজা ঠিক করলেন—বাপের বাড়ী যাবেন। একঘেয়ে সংসারের ঘানি-টানা আর তাঁর ভালোলাগে না। জীবনটা শুধু হাঁড়ি ঠেলেই যাবে কেটে? সংসার-ধর্ম্ম তাঁর কাছে আজ বিস্বাদ, অসম্ভব রকম বিস্বাদ বলেই মনে হতে লাগলো।

উনি বাক্স-পাঁট্‌রা গোছাতে সুরু করেন।

শ্যামসুন্দর ভাত না খেয়েই রাগে, ভয়ানক রাগে—বাড়ী থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কী মনে করে ফিরে আসেন। দোতালায় এসে ভাড়াটে ধরিত্রীদের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকেন।

ধরিত্রীর এখনো বিয়ে হয় নি। বিয়ের বয়েস হয়েছে। কলেজে পড়ে।

শৈলজা খাবার ঘরে আসেন। এসে দেখেন—স্বামী ভাত ফেলে গেছেন উঠে। মুখের গ্রাস পড়ে রয়েছে।

ওঁর মন অন্তর্যাতনায় টন্‌-টন্‌ করে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

তিনিও ভাত খান না। নিজের ওপর তাঁর সত্যি রাগ হয়।

শৈলজা উঠে আসেন আমার ঘরে।

বল্লুম: রাঙাদি যে! হঠাৎ এ-সময়ে?

আমি জানি, ওঁদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটলেই উনি আমার ঘরে না এসে থাকতে পারেন না।

বল্লেন: দুত্তর সংসার! সংসারে আমার বিতৃষ্ণে জন্মে গেলো। ভালো লাগে না বাপু! এতোকাল কেবল বাঁদির মতো গেলুম খেটে!

এই বলে শৈলজা একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে উপবেশন করলেন।

হাসি গোপন ক'রে বল্লুম: কী হলো আবার? দাদু বুঝি বোকেছেন?

শৈলজা জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে তেমনি-ভাবেই চেয়ে অন্যমনস্কে বল্লেন: হুঁ, বকেছে!

কিন্তু তখুনি দৃষ্টি নিলেন ফিরিয়ে। আমার মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন। বল্লেন: বকেছে মানে? আমায়

বকবে তোমার দাদু? ইঃ—ভারী সাহস? কামড়ে খাঁড়ার মতো নাকটা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে দেবো না? আমায় বকবেন, উনি?

হেসে ফেল্‌লুম। হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না। সহাস্যেই বল্লুম: দাদুর নাকটার ওপর আপনার অতো আক্রোশ কেন বলুন তো, রাঙাদি?

উনি হাত নেড়ে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গি সহকারে বল্লেন: হবে না? আক্রোশ হবে না তো কী? ঐ নাকটাই তো আমার সতীন। খাঁড়ার মতো নাকওলা লোকগুলোই এ-সংসারে বজ্জাতের শিরোমণি। যতো রাজ্যের ঝগড়া আর কু-মতলব ঐ নাকটার ভেতরে আছে—তা জানিস্?

কথাটা রাগের। কেন না, রাঙাদি নিজেই বহুবার আমার কাছে দাদুর প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করেছেন।

বুঝ্‌লুম, ওঁদের মধ্যে কলহ আশ্রয় করেছে। আজ সকালের দিকটায়, নাচে থেকে ওঁদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আমার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

বল্লুম: রাগারাগি হয়েছে আপনাদের—ভাত খান্‌নি তো? রাগলে তো আপনার অনশন করবার জিদ্ বেড়ে যায়। কিন্তু কী বিশ্রী কথা দেখুন তো! অন্নের অভাবে বাংলার বুক থেকে প্রায় আধ কোটি লোক চোখের জল ফেলতে ফেলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে, আর আপনার নিজের 'মুখের বাড়াভাত রাগ করে' খান্ না।

শৈলজা আমার কথার তাৎপর্য্য বোধকরি উপলব্ধি করতে পারলেন না। বল্লেন: ভাত? ভাত খাবো কী ক'রে শুনি? কত্তা তো যাচ্ছে তাই করে' আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে! আবার তেজ করে' ভাত না খেয়ে উঠে যাওয়া হলো! যাক্ না। না খেয়ে থাকুক না সারাদিন। আমার কী?

কিন্তু আমার উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না ক'রে পুনশ্চ বল্লেন: এতোদিন একসঙ্গে ঘর করে এলুম। মায়া বলেও তো একটা জিনিষ আছে? এই মায়াই তো আমায় খেয়ে বসে আছে। একজন না খেয়ে চলে গেলো, আর আমি বসে বসে খাবো ভাত? তাও কখনো হয়?

স্বরটা নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে' বল্লেন: কিন্তু তোর দাদু গেলো কোথায় বলতো? টিপ্-টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়ছে। একটা ছাতাও তো নিতে হয়। ঐ তো শরীর! জলে ভিজে আসবে। দেখতে না দেখতেই সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, গলায় ব্যথা! তখন তো বাপু আমারই জ্বালা!

বল্লুম: কোথায় আর যাবেন তিনি! আপনার রাগ হলে যেমন আমার কাছে আসেন, তেমনি দাদুও রাগ হলে গিয়ে বসেন—দোতলায় ধরিত্রীদের ঘরে। ঐ দেখুন না! দাদু হাত মুখ নেড়ে, আর নাকে ঘন-ঘন হাত বুলিয়ে ধরিত্রীকে কতো কথাই না বলে যাচ্ছেন। সুতরাং রাঙাদি, আপনার আশঙ্কার কোনো কারণই দেখছি নে।

আমি স্মিতহাস্যে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ওদের ঘরখানা দেখিয়ে দিলুম। শৈলজা উঠে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলেন। একটু পরে ঐ দিকেই চেয়ে আমাকে বল্লেন: নিন্দে করছে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমার নিন্দে করছে। কিন্তু দেখ্ সুধাংশু—ধরিত্রীটা কী রকম বেহায়া দেখ্। দাঁত বার করে হাসছে, কেবলি হাসছে! দিতে হয় ঐ দাঁতগুলো নোড়া দিয়ে গুঁড়িয়ে।

শৈলজার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হল না। বোধ করি ওঁদের মান-অভিমানের পালা শেষ হয়েছে। :—রাত্রে সেল্‌ফ থেকে মিঃ বসুর "ইতালীর সেরা গল্প" বইখানা খুঁজতে গিয়ে সহসা চোখ গিয়ে পড়লো—তেতলার ঘরে। রাঙাদি দাদুকে খাইয়ে দিচ্ছেন। দাদু হাসছেন। সামনে ভাতের থালা নিয়ে বসেছেন রাঙাদি। দাদু অকৃতজ্ঞ নন্। উনিও রাঙাদিকে দিচ্ছেন খাইয়ে। ওঁদের মুখের চেহারা দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই—আজ সকালে ওঁরা পরস্পরে কলহে উঠেছিলেন মেতে।

রাঙাদির সোনা দিয়ে বাঁধানো গুটিকয়েক দাঁত হাসির ঝলকে ঠিক্ সোনার মতোই মনোরম দেখাচ্ছে।

দিন কয়েক পরে, একদিন দুপুরের দিকে এসে বসলুম রাঙাদিদির ঘরে। ঘর খোলাই ছিল। কিন্তু ঘরের লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখা গেলো না। চাকরটা শুয়েছিল চাতালটায়। প্রশ্ন করতেই বল্লে: বাবু আর মা —দু'-জনেই রাগারাগি করে' বেরিয়ে গেছেন।

আজো এঁদের কী একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে সকালের দিকটায় বচসা হয়েছিল। এটা আমিও জানি। ধরিত্রীরও অজানা নয়।

সিঁড়িতে কার যেনো পদশব্দ! শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসে।

গুণ গুণ করে' গান গাইতে গাইতে ধরিত্রী ঘরে প্রবেশ করে।

কিন্তু আমার দিকে চোখ পড়তেই একটা অপ্রস্তুতের ভাব ওর সমগ্র মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হতে দেরি লাগলো না। ও আমাকে এই সময়ে এখানে আশা করতে পারে নি। নিজের সহজ চপলগতিতে এই ঘরখানায় প্রবেশ করাতে মনে হলো—ও আপনাকেই মনে-মনে সহস্রবার ধিক্কার দিয়ে উঠলো। আমার সুমুখে হঠাৎ এমনিভাবে এসে পড়াটা ওর দিক দিয়ে যেনো অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে।

ধরিত্রী ঘর ছেড়ে বাইরেও এলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে লাগলো।

বল্লুম: বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বলে আমি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

ধরিত্রী কথা কইলে। বল্লে: না না, আপনি উঠবেন না। বসুন আপনি। এঁরা বুঝি কেউ নেই। কিন্তু আমার দরকার ছিল। আচ্ছা, এখন আমি যাই। পরে আসবো অখন।

ধরিত্রীকে ছাড়তে আমার মন চাইলো না। ওকে আমি জানি। জানি বেশ কিছুদিন থেকেই। সেও আমায় জানে। পরস্পরে আমরা অপরিচিত নয়। আমার জানালার নীচে ওদের ঘর। এই ঘরে ওকে দেখেছি অসংখ্য বার। দেখেছি লুকিয়ে, চোরের মতো। সে দেখাতে আনন্দ ছিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি ছিল না।

ওর গায়ের রং যেন দুধে-আল্‌তা মিশ্রিত। দেহের কমনীয়তা এমনি যে, নারীর মনেও লালসার উদ্রেক হয়। মাথার কেশ কুচ্‌কুচে কালো এবং কুঞ্চিত। সরল নাক। ঠোঁট দুটির ভেতর চমৎকার শাদা ধব্‌ধবে ছোটো ছোটো দাঁতের সারি। চোখ দু'টি মেঘশূন্য নীলাকাশের মতোই! ওর যৌবনশ্রী, অনন্যসাধারণ রূপরাশি এবং সীমাহীন মাদকতা পুরুষের মাথা খারাপ করে দেয়।

মুগ্ধ হয়ে বলে ফেললুম: কাজ আছে বলছিলেন না? বসুন না একটু। ওঁরা যেখানেই যান, এসে পড়বেন এখুনি।

ধরিত্রী আমার কথা শুনে একটুখানি নিঃশব্দে হাসলো। আমার পরিত্যক্ত আসনটায় উপবেশন করে বেশ সহজ কণ্ঠেই বল্লে: আপনার কথাই রাখলুম। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে-ই রইলেন যে! বসুন, বসুন আপনি!

একটা কাঠের টুল টেনে নিয়ে উপবিষ্ট হলুম।

কিছুক্ষণ ঘরখানায় একটা বিশ্রী রকম নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকলো। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা দূর করলে—ধরিত্রী। বল্লে: কী দুর্ভাগ্য দেখুন। এতোকাল ধরে' ওঁরা দু-জনে এক সঙ্গে ঘর-সংসার করছেন, তবু পরস্পরকে চেনেন না!

শুনে ক্ষণকাল মৌন হয়ে রইলুম।

বল্লুম: ওঁদের স্বামীস্ত্রীর বিবাদটা মনে হয়, বিপরীত দিক থেকে আসা দু'টি দক্ষিণা বাতাসের মতো। এই বিপরীত বাতাস সমুদ্রে তরঙ্গের 'পর তরঙ্গ তোলে। তরঙ্গ এতো উঁচুতেও ওঠে যে, বুঝি আকাশটাকেই ফেলে ছুঁয়ে। কিন্তু সেই ক্ষিপ্ত বাতাসের যখন সমাপ্তি ঘটে, তখন সমুদ্র হয়ে যায় শান্ত। তখন সমুদ্রের উপরিভাগ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

ধরিত্রীর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া গেলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও সহসা প্রশ্ন করলে: কটা বাজলো বলতে পারেন?

: চারটে হবে।

ধরিত্রী যেনো চমকে উঠলো: বলেন কি? না—না, আর নয়। বড্ডো দেরি হয়ে গেলো। আবার আসবো অখন।

এই বলে ও উঠে দাঁড়ালো।

হাতের ঘড়িটা দেখে বল্লুম: চারটে এখনো বাজে নি তো! সতেরো মিনিট দেরি।

শুনে ধরিত্রী হেসে ফেল্লে। পরিষ্কার, স্বচ্ছ হাসি।

আমার সর্ব্বশরীর অন্তরের সীমাহীন উল্লাসে শিউরে উঠলো। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কানে এলো পদ-শব্দ এবং ক্ষণকালের মধ্যেই রাঙাদি আর দাদু প্রসন্নচিত্তেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

দাদুকে উদ্দেশ করে ধরিত্রী বল্লে: রাঙাদিকে ধরে নিয়ে এলেন বুঝি?

দাদু একগাল হেসে জবাব দিলেন: আর বলিস্ কেন? বুড়ো বয়েসে ভালো ঝঞ্ঝাট্ হয়েছে যা' হোক! উনি-ই করলেন ঝগড়া, আবার উনিই রাগ করে' বেরিয়ে গেলেন গঙ্গায় ডুবে মরতে! দেখ্ না, হাতের সোনার চুড়িগুলো পর্য্যন্ত খুলে রেখে দিয়েছে!

রাঙাদির হাতের দিকে নজর পড়লো! দাদু মিছে কথা বলেন্ নি। ধরিত্রী নিজেই জোর করে আলমারি খোলালে রাঙাদিকে দিয়ে। পরিত্যক্ত সোনার চুড়িগুলো দিলে পরিয়ে। সহাস্তে বল্লে: আপনার রাগ তো বড়ো কম নয়, রাঙাদি! তারপর বল্লে: আমি চল্লুম। অনেকক্ষণ এসেছি। আর নয়।

রাঙাদি এ-কথায় আমার দিকে ফিরে চাইলেন। বল্লেন: তুমি কতোক্ষণ এসেছো, সুধাংশু?

: আমি? তা' ঘণ্টা খানেক হয়ে গেছে। ওঁর আসবার আগে।

এই বলে আমি আঙুল দিয়ে ধরিত্রীকে দেখিয়ে দিলুম।

রাঙাদি স্মিত হাস্তে ধরিত্রীকে লক্ষ্য করে' বল্লেন: তা' হলে তোর সময়টা বৃথা যায় নি বল, ধরিত্রী?

এই মন্তব্যে যে-ইঙ্গিতটা প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটা ধরিত্রী বুঝতে পারলে। ওঁর মুখখানা রক্তাভ হয়ে উঠলো। এবং সেটা নিরীক্ষণ করে আমার নিজের বুকটা একটা অজানা সৌভাগ্যে দুরু-দুরু করে উঠলো।

* * *

সমস্ত রাত্রিটা সেদিন ধরিত্রীকে স্বপ্নে দেখলুম। পরদিন প্রভাতের প্রথম আলোয় শয্যা ত্যাগ করে গিয়ে দাঁড়ালুম—জানালাটার সুমুখে। তখনো ওর ঘরের জানালা খোলে নি।

ফিরে এলুম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা দুর্নিবার আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাকে অস্থির করে তুল্লে।

আবার জানালাটায় গিয়ে দাঁড়ালুম। তখন সূর্য্য পূবদিকে অনেকটা আকাশের গায়ে উঠে গেছে।

দেখলুম, ধরিত্রী উঠেছে।

দু-জনের দু-জোড়া চোখ সহসা এক হয়ে গেল। ফিক্ করে হেসে ফেলে ধরিত্রী। কিন্তু আর ওকে দেখা গেল না।

* * * * *

এই মিত্র-দম্পতির সান্নিধ্যকে কেন্দ্র করে আমার ও ধরিত্রীর মধ্যে আকর্ষণ এবং ভালোবাসার একটা বন্ধন একটু-একটু করেই সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে গেলো। একে আমরা কেউ-ই উপেক্ষা করতে পারলুম না।

তাই ভগবান একদিন আমাদের দু-জনের হাত এক করে' দিলেন।

বিয়ে করলে মানুষের সুখ-স্বচ্ছন্দের দিকে আগ্রহটা বেড়ে ওঠে। ধরিত্রীকে পূর্ব্বরূপের মধ্য দিয়ে পেয়েছি। ওকে সুখী করতে আমি এই বাসাটা পরিত্যাগ করলুম। শহরের গোলমাল থেকে অব্যাহতি পেতে একটা নিরিবিলি স্থানে বাড়ী ভাড়া করা গেলো। এখানের নীচে থেকে আকাশ দেখা যায় চোখ ভরে'। সবুজ গাছ-পালা দেখে, মনে আসে অনাবিল আনন্দ। ধরিত্রী আর আমি। আর কেউ নেই। এই আমাদের ভালো।

ধরিত্রীর স্ফূর্ত্তি আর ধরে না। হাসে, কেবল-ই সে হাসে, ওর গতির মধ্যে একটা অপূর্ব্ব ছন্দ-লালিত্য আমাকে মুগ্ধ করে। ওর চোখের চাহনি, চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারার মতো মনোহর। ওর কথার বাণীগুলি যেনো মধু দিয়ে তৈরি।

সত্যি ধরিত্রীকে আমার এতো ভালো লাগে!

কিন্তু আমার একটা দোষ আছে। সেটা লেখার দোষ। লেখবার সময় আমি ধ্যানস্থ—বাইরের জগতের সঙ্গে যেনো কোনো সম্পর্ক নেই, এমনি ভাব!

অন্য সময়ে, না লিখলেও—গল্পের গতি এবং পরিণতির সম্বন্ধে একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করি। এই জন্যে প্রায়-ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। ধরিত্রী যখন আমার সান্নিধ্য চায় পেতে, তখন হয়তো আমি কল্পনা জগতে বিচরণ করি।

* * * * *

রাত্রে একটা গল্প শেষ করতে বসেছি। লিখতে বেশ ভালো লাগছে।

আজ-ই পরিসমাপ্তি ঘটাতে না পারলে, দ্বিতীয় দিন পেরে উঠবো না।

ধরিত্রী মশারীর ভেতর থেকে এলো বেরিয়ে। বল্লে: কটা বাজলো, খেয়াল আছে? একটা যে বেজে গেলো। শোবে এসো। একলা ঘুম আসছে না।

কোনো জবাব দিলুম না। লিখেই যেতে লাগলুম।

: শুনতে পাচ্ছো না? তাতো পাবেই না! আমি তোমার কে যে, আমার জন্যে তোমার দরদ্ হবে?

ধরিত্রীর কণ্ঠস্বর অভিমানে আর্দ্র।

কিন্তু আমি তথাপি নিরুত্তর।

: এ রকম করলে, ভালো হবে না বলছি। আমি একলা বিছানায় থাকবো শুয়ে, আর উনি লিখে রাত্রি কাটিয়ে দেবেন! ভারী ই-য়ে হয়েছে!

রাগ হলো। বল্লুম: বিরক্ত করো না। কানের কাছে এসে বক্-বক্ করার চেয়ে শোওগে যাও না তুমি। তোমার তো ঘুম্ হাত-ধরা। পড়লেই ঘুম। পাশে একটা লোক থাকে, হুঁস থাকে না তোমার!

ধরিত্রী তৎক্ষণাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে বল্লে: ঘুমবো না তো কী? জেগে থাকবো তোমার জন্যে সারা রাত্রি? বয়ে গেছে আমার। সংসারের খাটুনিটা তুমি খাটবে—না?

বলেই ও উত্তরের প্রত্যাশা না করে' সক্রোধে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

পরদিন।

বল্লুম: গল্পটা শুনবে? লেখা শেষ হয়েছে।

ধরিত্রী নিজের জন্যে সায়া শেলাই করছিল। বল্লে: না। শোনবার সময় নেই আমার।

: মানে? বসে-বসে তো শেলাই করছো। শোনবার সময় হয় না?

: না। ও ছাই আমার ভালো লাগে না।

: ভালো লাগে না?

: না—না—না। কতোবার বলবো? তোমার লেখা আমার ভালো লাগে না। হলো তো?

আর একদিন।

ধরিত্রী কোথায় ছিল জানি না। আমার জুতোর শব্দে কাছে এলো। বল্লে: তোমার বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছে বল্‌লে না? পড় না গা?

বল্লুম: কাগজ তো সামনেই রয়েছে। পড়লেই পারো।

: কেন, তুমি একটু শোনাতে পারো না পড়ে?

: না। আমার সময় নেই।

অপর একদিন।

খেতে বসেছি।

ধরিত্রী বল্লে: কপির দাল্‌নাটা কেমন হয়েছে গা?

বল্লুম: ভালো নয়। নুন্ আর হলুদ হয়েছে বেশি!

শুনে ওর মুখ ভার হয়ে ওঠে। বলে: আমার রান্না তোমার ভালো লাগবে কেন? তুমি আমায় দেখতে পারো না। আমার ছায়া দেখলে তোমার গা' ঘিন্-ঘিন্ করে।

ধরিত্রীর গলার স্বর অনুসরণ করে' মুখ তুলে চাইলুম। দেখলুম—ওর সুন্দর মুখখানার ওপর অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে—সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর শীতের শিশির বিন্দুর মতোই।

*

* *

আজ রবিবার। বায়স্কোপের টিকিট কিনে আন্‌লুম দু'খানা।

ধরিত্রীকে বল্লুম: শিগগির তৈরি হয়ে নাও। ম্যাটিনীতে যাবো সিনেমায়। চমৎকার ছবি।

ওর কোনোই উৎসাহ দেখা গেলো না। বল্লে: তুমি দেখোগে যাও। আমার দরকার নেই।

: তার মানে? তুমি বলতে চাও টিকিটখানা নষ্ট হবে? ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট। দু'-টাকা ছ'-আনা দাম—জানো?

: নষ্ট হবে কেন? গিয়ে বিক্রি করে দাও না! বাড়তি কিছু আসবে!

রাগ হলো। বল্লুম: বাজে বকো না। অনাবশ্যক ঝগড়া করা তোমার আজকাল একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম করলে, আমি তো আর পেরে উঠবো না। জীবনটা দেখছি এরই মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠলো!

ধরিত্রী জানালার দিকে মুখ করে বলে: আমারও ঠিক্ তাই মনে হচ্ছে। সত্যি, আমার আর ভালো লাগছে না।

ওর দিকে এগিয়ে আসি। সিক্ত চোখের পাতা মুছিয়ে দিতে হাত দিলাম প্রসারিত করে'। কিন্তু ধরিত্রী আমার হাতখানা জোর করে' সরিয়ে দিয়ে, পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল।

ক্রোধাধিক্যে হাতের টিকিট দু'খানাই ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলুম। দলা পাকিয়ে দিলুম বাইরে নিক্ষেপ করে'। তারপর রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

বাড়ীর সম্মুখেই একটা পার্ক। পার্কেই ঢুকে পড়লাম। পার্ক প্রদক্ষিণকালে নানা প্রকার চিন্তা আমার মনে ভিড় করতে সুরু লাগলো। :—তাইতো! কেন এমন হচ্ছে? বিয়ের প্রথম আটমাস কী সুখেই না কেটেছিল! কিন্তু এখন? এখন যেনো বিপরীত দিক থেকে আসা দু'-টি প্রবল বাতাসে লেগেছে দারুণ সংঘর্ষ! হায় রে! এই সময় যদি শ্যামসুন্দর আর শৈলজা থাকতেন! আমরা তাঁদের দাম্পত্য-কলহে মধ্যস্থতা করে' তাঁদের কলহ দূর করতুম। তাঁদের মনে আবার দিতুম শান্তির ধারা বহিয়ে। আমাদের এই কলহে নিশ্চয়ই তাঁরা মাঝে থেকে আমাদের কলহ দূর করতেন। আমাদের মনে আবার শান্তির ধারা দিতেন বহিয়ে!

সেতার অনভিজ্ঞ লোকের টোকায় সেতার ব্যথা পায়। সুর বিকৃত হয়। যিনি ওস্তাদ লোক, তাঁর হাতে সেতারের হয় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

সেতার কথা বলে। ওস্তাদ তাকে চালান। সে জানে, সেতার আনন্দে ছন্দ-মাধুরীতে তার কথা শোনে। এতে সেতারের পরম তৃপ্তি। ওস্তাদেরও শান্তির অন্ত থাকে না।

বাড়ী ফেরবার পথে এই কথাই আমার বারংবার মনে হতে লাগলো। তাই তো, আমি তো অনভিজ্ঞ সেতারা!

* * * * *

ধরিত্রী আমার একখানা বাষ্ট্-ফটোর সামনে মুখ করে' দাঁড়িয়ে বোধ করি আমার চেহারাটাই একদৃষ্টে দেখছিল। আমি ঘরে আসতেই জুতোর শব্দে সে ফিরে চাইলে।

ধরিত্রীর দু-চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরে' পড়ছে। যেনো মুক্ত। মুক্তো গড়িয়ে পড়ছে নিটোল দুটি রক্তাভ কপোলের ওপর দিয়ে।

তাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করলুম। কোনো বাধা দিলে না সে! অশান্তির মাঝে শান্তির আলোক দেখলে মানুষ যেমন তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তেমনি ধরিত্রী পরম অনুরাগ ভরে নিজের মাথাটা আমার কাঁধের ওপরই ন্যস্ত করলে।

আদর করে ধরিত্রীকে শান্ত করলুম।

বল্লুম: ওসব ভুলে যাও ধরিত্রী! মানুষ ভুল করে। ভুল করা মানুষের ধর্ম্ম।

ধরিত্রী এবার আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। ক্ষণকাল পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে: তিনি আর নেই!

একখানা চেয়ারে উপবেশন করলুম। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলুম: কে—কে তিনি?

: রাঙাদি। আমাদের সেই রাঙাদি।

শুনে আমারও মনটা মর্ম্মান্তিক যাতনায় পরিপ্লুত হয়ে উঠলো। বেশ উপলব্ধি করলুম, আমার চোখ দু-টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে।

ধরিত্রী চোখ মোছবার কোনো চেষ্টা না করে' ধরা গলায় বল্লে: ভগবান এবার সত্যি ওঁদের দু-জনকে আলাদা করে দিলেন।

: কিন্তু তুমি জানলে কী করে'?

: এই দেখো টেলিগ্রাম। তুমি বেরিয়ে যাবার পর পিওন দিয়ে গেছে।

এই বলে ধরিত্রী ব্লাউজের ভেতর থেকে টেলিগ্রামখানা বের করে' আমার হাতে দিলে।

পড়লুম। বল্লুম: আমি যাই একবার।

ধরিত্রী আমার হাত ধরে' প্রেমপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করলে: আমি যাবো তোমার সঙ্গে? তুমি কী বলো?

: তুমি যাবে? কিন্তু আমি বলছিলুম কি, যে আমিই যাই এখন। তোমাকে বিকেলের দিকে নিয়ে যাবো—কেমন?

ধরিত্রী কোনো আপত্তি করলে না। বল্লে: আচ্ছা। কিন্তু তুমি আর দেরি করো না।

: না। এখুনি বেরিয়ে পড়ছি।

*
* *

কিন্তু গিয়ে যা' দেখলুম, তাতে আমি শুধু বিস্মিত হলুম না—মুগ্ধও হলুম। ওঁদের স্বামী স্ত্রীর অখণ্ড ভালোবাসা যে ওপারেও অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেলো, এর প্রমাণ আমি চাক্ষুষ পেলুম। তখনো রাঙাদির স্পন্দনহীন শীতল দেহটার

পার্শ্বে দাদুর প্রাণহীন দেহটাও নিঃসাড়ে শুয়ে আছে। সকলে বল্লে : দাদু স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছেন। জীবনের সাথীকে তিনি ছেড়ে থাকবেন কী করে' ?

দাদুর মুখে সেই শিশুসুলভ হাসি! সেই হাসি-হাসি মুখখানার পানে চেয়ে আমার যেনো মনে হলো উনি বলতে চাইছেন—মৃত্যুও আমাদের পৃথক করতে পারলে না।

তাঁর মুখে এ যে জয়ের হাসি, পরম তৃপ্তির হাসি!

শবদাহ করে' রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরলুম।

ধরিত্রী জানালায় দাঁড়িয়ে বোধ করি আমার-ই জন্যে উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করছিল।

আমার রুক্ষকেশ আর সিক্ত বসন দেখে ও ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে' রইলো চেয়ে।

হাত ধরে' ওকে এ-ঘরে নিয়ে এলুম। সিক্ত বসন পরিবর্ত্তন করে' কোঁচে বসলুম। ধরিত্রীকে বসালুম পাশে। তারপর সব বললুম।

শুনে ধরিত্রী, ঠিক্ নিথর পাষাণের মতোই বহুক্ষণ আমার মুখপানে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো। তারপর এক সময়ে সহসা আমার কণ্ঠদেশ, তার মৃণাল ভুজ দু'টির সাহায্যে বেষ্টন করে' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুটে বারংবার বলতে লাগলো : হ্যাঁ গা, আমরাও এরকমভাবে মরতে পারবো তো ?

খাদ্য সমস্যা সমাধানে গোলআলুর স্থান

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক মহম্মদ আফজল হোসেন, এম-এ, এম-এসসি, মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে ভারতের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাঙলার জনসাধারণের পক্ষে তাঁহার এই অভিভাষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

অধ্যাপক হোসেন দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে তাহাতে ১৯৭০ সালে ভারতের লোক সংখ্যা ৭০ কোটি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং বর্ত্তমান জনসংখ্যার জন্যই যখন পর্য্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান নাই তখন ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান্ লোক সংখ্যার জন্য যে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের লোকের আয়ুষ্কাল অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম। তারপর আমাদের অধিকাংশ লোকই উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ও অল্পতায় নিতান্তই ক্ষীণজীবী। জীবনীশক্তির অল্পতাপ্রযুক্ত আমরা সহজেই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে পতিত হইয়া থাকি। বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান লোকসংখ্যার উপযুক্ত খাদ্য সংস্থান করিতে হইলে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইবে। ধান যব গম প্রভৃতি শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যসামগ্রী শত করা ১০ অংশ, মটর কলাই প্রভৃতি ডাল জাতীয় শস্য শতকরা ২০ অংশ, তৈল জাতীয় পদার্থ শতকরা ২৫০ অংশ, ফল শতকরা ৫০ অংশ, শাকসব্জি শতকরা ১০০ অংশ, দুধ শতকরা ৩০০ অংশ এবং ডিম, মাছ-মাংস শতকরা ৩০০ অংশ। বলা বাহুল্য, লোকসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে উল্লিখিত খাদ্যসামগ্রীগুলিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে।

কর্ণেল ম্যাকে, ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ প্রভৃতি খাদ্যবিদ্ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীর সাধারণ খাদ্যে আমিষ পদার্থের শোচনীয় অল্পতাপ্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তিহীনতা ক্রমশঃ ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। লেখকের খাদ্যবিজ্ঞান গ্রন্থেও ইহার সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে। জন রাসেল বলিয়াছেন—ভারতবাসীর বর্ত্তমান খাদ্যে শ্বেতসার উপাদান (চাউল আটা প্রভৃতি) খুব অল্প বলা যায় না ; তবে রক্ষীখাদ্য—আমিষ, তৈল ও লবণ জাতীয় পদার্থ এবং ভিটামিনের তরফ হইতে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাংলা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর লোকের খাদ্য নিরতিশয় অপ্রতুল। খাদ্যের শেষোক্ত উপাদানগুলি মাছ মাংস ডিম দুধ শাকসব্‌জি ও ফল হইতে পাওয়া যায়। আর ইহাদের অল্পতায় মানুষ মেষ পদবাচ্য হইয়া পড়ে। তাই অধ্যাপক হোসেন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"How else can one explain the curious phenomenon that lakhs died in Bengal without attempting to obtain food by fighting for it." অর্থাৎ ইহা নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয় যে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল অথচ তাহারা খাদ্য লাভের জন্য কোনওরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বন করিল না! ফলতঃ বহুকাল যাবৎ অত্যাবশ্যক খাদ্যোপাদান হইতে তিলে তিলে বঞ্চিত, নির্বীর্য্য ও অন্তঃসারশূন্য না হইলে দলে দলে নিরীহভাবে মৃত্যুবরণ করা কোনও দেশের সজীব মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।

বাংলাদেশে রক্ষীখাদ্যের ত কথাই নাই, সাধারণ শক্তিপ্রদ খাদ্যোপাদান চাউল আটা প্রভৃতির অভাব ও অল্পতাও সর্বথা স্বীকার্য্য। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান বর্ষে বাংলার অধিকাংশ জিলাতেই ধান জন্মে নাই বলিলেও চলে। লেখক মধ্য বাংলার যে সব গ্রামের সহিত সুপরিচিত সেখানে এবার এমন একজন গৃহস্থও নাই যিনি সংবৎসর ক্ষেতের ধানে সংসার চালাইবেন। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে সেই সব স্থানে রবিখন্দও শীতকালীন বৃষ্টির অভাবে নষ্ট হইতে চলিয়াছে। দেবমাতৃক বাংলাদেশ গত কয়েক বৎসর যাবৎ নিষ্ঠুরভাবে দৈবকৃপা বঞ্চিত হইয়াছে। সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় আউশ ধান বোনা দেরী হইয়া যায়—এদিকে দেরীতে বুনা ধান পাকিবার আগেই বানের জলে ডুবিয়া যাওয়ায় গৃহস্থের দুর্দশা চরমে ওঠে। আবার আষাঢ়ে ধান ফুলিবার সময় বৃষ্টির অভাবে আউশ ধান নষ্ট হইয়া যায়—রোপা ধানও ঐ সময় বৃষ্টি না হওয়ায় রোপন করাই ঘটিয়া ওঠে না। এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার গত কয়েক বৎসর হইতে সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। সুতরাং বাংলাদেশের অনেক স্থলেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় জলসেচের ব্যবস্থা না করিলে হতভাগ্য বাঙালী জাতি দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস হইতে নিস্তার পাইবে না। পদ্মার হালিচরে যে সব জায়গায় পলি পড়ে সেখানে উৎকৃষ্ট জলিধান প্রচুর ফলে। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় চৈত্র বৈশাখে ধান ফুলিবার সময় বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ঐ জলি ধানের জমির হয়ত ৫০০ হাতের মধ্যেই পদ্মার অফুরন্ত জল, কিন্তু সেচের ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক চাতকের মত আকাশের পানে চাহিয়া থাকে এবং দেবতার দয়া না হইলে তাহার সমুদয় আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হয়। জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিয়া লোকের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা ও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া এই শোচনীয় অবস্থার অবসানকল্পে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করা দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

ধান যব গম প্রভৃতির পরেই শ্বেতসারসংযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে গোল আলু উল্লেখযোগ্য। এই গোল আলুর জন্য প্রধান আবশ্যক উৎকৃষ্ট সস্তা বীজ, সস্তাসার ও স্থানবিশেষে জলসেচের ব্যবস্থা। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে গোল আলুর চাষ হইতে পারে; ফলে দেশবাসীর খাদ্য সমস্যারও অনেকটা সমাধান সম্ভবপর।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধান যব গম ও গোল আলু কি পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন হয় এবং প্রথমোক্ত ফসলের অনুপাতে গোল আলুর চাষ কি পরিমাণ তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় লিখিত হইল :—

দেশ	গোল আলু	গম ধান যব ওট প্রভৃতি শস্য	উভয়ের শতকরা অনুপাত
ভারতবর্ষে	৪৪০০০০একর	১৭৯২৭৬০০০একর	০'৩
জার্মানি	৭০৫৪০০০ "	২৮১৭৬০০০ "	২৫'০
ফ্রান্স	৩৫১১০০০ "	২৫৮৬৪০০০ "	১৪'০
বিলাত	৭৩৩০০০ "	৪১২৪০০০ "	১৭'৮
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৩২৭৬০০০ "	২১৫০৬৬০০০ "	১'৫
রুশিয়া	১৭৬০১০০০ "	২৪৪২২২০০০ "	৭'২

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, জার্মানিতে যবগম ওট যত চাষ হয়, তাহার শতকরা ২৫ অংশ গোলআলুর আবাদ হইয়া থাকে। ফলতঃ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অপর্য্যাপ্ত গোলআলুর চাষ প্রবর্ত্তিত না হইলে জার্মানি গত যুদ্ধে নামিতেই পারিত না বলিয়া অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আটা ময়দা ও গোলআলু লোকের দৈনন্দিন খাদ্যে কি অনুপাতে ব্যবহৃত হয় নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

দেশ	আটা ময়দা প্রভৃতি	গোলআলু
জার্মানি	১৩৮'৫	২৪৭'৮
বেলজিয়ম	২২৫'৫	২৩০'২
পোল্যাণ্ড	১৯৮'৬	১৭৫'১
জেকোস্লোভেকিয়া	১৯৭'৯	১১৮'০
সুইডেন	১১২'৯	১০১'১
ফিনল্যাণ্ড	১২৯'৯	১১০'৪
বিলাত	৯৭'৩	৭৮'১
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৭৯'৮	৬৪'৪

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, জার্মানি ও বেলজিয়মের লোকে আটা ময়দার চেয়ে গোলআলুই বেশী খাইয়া থাকে। ফলতঃ ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই লোকের দৈনন্দিন আহার্য্যে রুটিবিস্কুট এবং আলু প্রায় সমপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

খাদ্য হিসাবে গোলআলু বা রাঙাআলু যে চাউল বা আটা হইতে নিকৃষ্ট নয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

টাটকা গোলআলুতে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জল থাকে এস্থলে শুকাইয়া জলের ভাগ শতকরা ১২'২ করা দেখান হইয়াছে—

শতকরা	ঢেঁকিছাটা চাল	আটা	গোলআলু	রাঙা বা সাদা দেশী আলু (মৌ আলু)
জলীয় অংশ	১২'২	১২'৮		
আমিষ পদার্থ	৮'৫	১১'৮	৫'৬	৩''১
তৈল পদার্থ	০'৬	১'৫	০'৩৫	০'৭৮
লবণ পদার্থ	০'৭	১'৫	২'১	২'৬
শ্বেতসার ও শর্করা (কার্বোহাই ড্রেট)	৭৮'০	৭১'২	৭৯'৫	৮১'২
চুণ জাতীয় পদার্থ	০'০১	০'০৫	০'০৩	০'০৫
ফসফরাস	০'১৭	০'৩২	০'১	০'১৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে—শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য হিসাবে গোলআলু বা রাঙাআলু ভাত বা রুটির অপেক্ষা আদৌ নিকৃষ্ট নয়। আমাদের দেশের অনেক অকেজো জমিতেও অনায়াসে রাঙাআলুর আবাদ চলিতে পারে। উঁচু দোয়াঁশ মাটিতে বৎসরে দুইবার রাঙাআলুর চাষ করা যায়। ইহার ফলনও মন্দ নয়। জমির উর্বরতা অনুসারে বিঘাপ্রতি ৩০ মণ হইতে ১০০ মণ পর্য্যন্ত রাঙাআলু ফলিয়া থাকে। গোলআলুও বাংলাদেশে ভালভাবে চাষ করিলে উৎকৃষ্ট ফসল দিয়া থাকে। বাংলাদেশেও অধিকাংশ পুরাতন গ্রামেই অনেক পতিত জঙ্গলযুক্ত ভিটা আছে। ঐ সব জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবা

করিলে গোলআলু অসম্ভব ভাল ফলিয়া থাকে। পাবনা জেলার অনেক গ্রামে এরূপ ভিটামাটিতে উৎকৃষ্ট প্রকারের গোলআলুর প্রচুর ফলন লেখক নিজেই দেখিয়াছেন। এরূপ জমিতে আবাদের আর একটি সুবিধা এই যে, কয়েকবৎসর ক্ষেত্রে কোনও সার দিবার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য যত্ন করিয়া সার দিয়া ও সময়ে সেচের ব্যবস্থা করিয়া বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানেই গোলআলুর চাষ করা যাইতে পারে। লেখক অবগত আছেন যে, ডায়মণ্ডহারবারের নিকট তাঁহার এক বন্ধুর বসতবাটি সংলগ্ন জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে খৈলের সার দিয়া গোলআলুর চাষ করাতে তিনি গত বৎসর ৬ কাঠা জমিতে ২৬ মণ উৎকৃষ্ট বড় সাইজের গোলআলু উৎপন্ন করিয়াছেন। গোলআলুর ক্ষেত্রে রেড়ীর খৈল বিঘাপ্রতি ৩০ মণ পরিমাণ দিলে উৎকৃষ্ট ফলন হইয়া থাকে।

শ্বেতসারযুক্ত প্রধান তিনটি শস্য সমগ্র পৃথিবীতে বর্ত্তমানে কি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা জানান হইল—

ফসল	পৃথিবীর উৎপন্নের পরিমাণ
গোলআলু	৬০১ কোটি মণ
গম	৩৫৯·৪ কোটি মণ
চাউল	২৪১·১ কোটি মণ

১৯৩১ সালে আমেরিকার প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তি নিক্সন বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে প্রায়শঃ দুর্ভিক্ষ লাগিয়া থাকিত, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে ঐ সব দেশে গোলআলুর আবাদ প্রচলন হওয়াতে আর দুর্ভিক্ষ দেখা যায় না।" তিনি বলিয়াছেন—"চীনদেশে প্রভূত পরিমাণে গোলআলুর চাষ আরম্ভ হইলে ঐ দেশের অন্নকষ্ট লাঘব হইবে।" চীনের সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য ভারতবর্ষের পক্ষেও যে উহা সমভাবেই প্রযোজ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর ও গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগের সমবেত একনিষ্ঠ চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশে অচিরে যত বেশী পরিমাণে গোলআলুর চাষ প্রবর্ত্তিত হয় ততই মঙ্গল—এ বিষয়ে কালবিলম্বের আর অবসর নাই।

নর ও নারী

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বিচিত্র নন্দন কাননে বিধাতা আর একটি নূতন জীব পাঠাইয়া দিলেন। সেই প্রথমদিন প্রথম মানব আপনাতেই মগ্ন হইয়া থাকে। নন্দনের বৈচিত্র্য তাহার অন্তরস্পর্শ করে না। কত দিন তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কোনও গতির ছন্দ তাহার অঙ্গে ফুটিল না। সারা নন্দন তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে—এত সুন্দর! তবু ছন্দহীন!

বিধাতা একদিন কৌতুক করিয়া সেই আপন-ভোলার পাশে আসিয়া বসিয়া রহিলেন। দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি নিঃশব্দে সকৌতুকে পাশ দিয়া দেখিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। শেষে বিধাতা এক সময় হাসিয়া অন্তর্ধান করিলেন। কতক্ষণ পরে মানবের মনে হইল, বিধাতা পাশে বসিয়াছিলেন তো বেশ! নন্দন দেখিল, সুন্দরে চেতনা ফুটিতেছে!

মানব বলিল—কোথায়? বিধাতা বলিলেন—এখানে। মানব বিধাতার কণ্ঠ অনুসরণ করিয়া সেখানে আসিয়া দেখিল—নাই, সে তো নাই। বিধাতা সকৌতুকে আর এক দিক হইতে বলিলেন—এই তো এখানে। মানব এদিক হইতে ওদিক ছুটিয়া বেড়াইল, কিন্তু বিধাতার সন্ধান মিলিল না। নাই মিলুক, তবু এই সন্ধান তরে চঞ্চল চরণ-নিক্ষেপও বেশ মধুর! হরিণ ছুটিয়া গেল পাশে, গ্রীবা উচ্চে তুলিয়া মুগ্ধ নয়নে নীরব ভাষায় মানবকে আহ্বান করিল—এসো লীলা করি। চঞ্চলতম চরণ ফেলিয়া মানব-সঙ্গীটিকে গতিতে হারাইয়া হরিণ কোথায় চলিয়া গেল। মানব দেখিল—ওই বহুদূরে হরিণ কেমন আর একটি হরিণের সাথে মিতালী করিতেছে। সারা নন্দনে এখানে দুটি হরিণ, ওখানে দুটি পাখী, শুধু দুয়ে দুয়ে ছন্দ!

মানব বিধাতাকে বলিল—তোমাকে আমার খেলার সঙ্গী হইতে হইবে। আমরাও দুয়ে মিলিয়া ওদের সম্মুখে বেড়াইব। বিধাতা কৌতুক করিলেন—আমার সময় নাই, তোমার সঙ্গী হইবার মতো অতো অবসর নাই। মানব চাহিয়া দেখিল, তখন একে অপরের সম্মুখে করিতেছে কূজন গুঞ্জন, আর একটি এক সঙ্গিনীকে ডাকিতেছে কেকা! মানব তাও বুঝিল না, কিন্তু তাহার ভাল লাগিল। বিধাতার প্রত্যাখ্যানে মনে আসিল কেমন যেন বিষণ্ণতা, কেমন যেন একত্ব বোধ। মানব বিধাতাকে

অনুরোধ করিল—তুমি না সঙ্গী হও, আমার মতো আর এক জন সঙ্গী এনে দাও। বিধাতা হাসিলেন থানিক।

সেদিন মানবের পাশে মানবকাব্যের প্রথম ছন্দে যে আসিয়া দাঁড়াইল, মানব তাহার পানে চাহিয়া বিস্ময়ে বলিল—সুন্দর! তুমি হবে তো আমার সাথী? সে বলিল—সন্দেহ কেন? সেদিন সারা নন্দন সে চরণে লুটাইয়া অভিনন্দন পাঠ করিল। হে অনুপমা! কুসুমে কুসুমে লও উপহার, শাখে শাখে শোন গান, দেখ ছুয়ে ছুয়ে মিলে রঙ্গ! কোন এক ক্ষণে বিধাতাকে মানব বলিল—এ সাথী আমাকে তো একেবারে দিলে?

বিধাতা হাসেন।

—ওকে পেলে হে মানব, সুখী হবে তো?

—খুউব সুখী হবো।

বিধাতা বলিলেন—হে মানব, ও তোমারই। তোমারই জন্য এনেছি ওকে। কখনও ফিরায়ে নোব না।

মানব বড় খুশীভরে বলিল—আজ—হে আমার সাথী, আমি ধন্য।

যেখানে ঝরণা নামে হরিণী গতিতে, যেখানে ঝরণার জল ছুটে চলে ওই দূরে পাহাড় হইতে পাহাড়ে, যেখানে ঝরণার জল লাস্যচপল, সেখানে মানবী ছুটিয়া আসে। মানবকে ডাকে—এসো, ছুটে এসো, দেখো ঝরণাধারা কেমন গতিছন্দে চলে!

যেখানে হরিণী সঙ্গীকে করে আদর, যেখানে ময়ূর বিছায় পুচ্ছলীলা, মুহূর্তমধ্যে মানবী ছুটিয়া আসে সেখানে। মানবকে বলে—এসো, দেখো ছুয়ে কেমন কাব্য রচনা করে।

সে সঙ্গিনীকে স্নেহ করে, আপনি না খেয়ে মুখে ফল তুলে দেয়, গান করে, কথা কয়—কত মধুর কথা! ফুলের শয্যা রচনা করে। মাঝে মাঝে দূরে যায় তার অন্বেষণে, সেই সাথী তার জন্য বৃথা ফেরে বনে—বনান্তরে।

বিধাতা কৌতুক করেন।

—হে মানব! আজ কেমন সুখী?

মানব উত্তর দেয়—হে বিধাতা, সব ভালো তার, সব তার মধু। শুধু মাঝে মাঝে মিথ্যালীলা ছলে বড় ভোগায় আমাকে। হে বিধাতা, সব ভালো তার। শুধু সে বড় চপলমতি।

নন্দন কাননে যেখানে ঝরণা ঝরে ঝরঝর ধারে—দিন নাই রাত নাই, শুধু তার ঝরা! সেখানে মানবী কয় কথা, কথা শুধু কথা—! অর্থ কী যে, কী যে তার ভাষা! কী বলে সে?

বিস্মিত মানব শুধু শোনে, শুধু শোনাই তার কাজ। মানব যদি সেখানে কথা কয়,মানবীর কথা থেমে যায়—ছন্দ কেটে যায়। তাই এ ধারে ঝরণার ভাষা উচ্ছল বারবার, আর ও ধারে মানবীভাষা চঞ্চল কলকথা—দুই কথাসৃষ্টিতে মানব ভাবিয়া চলে—কোথা এর শেষ সোম্?

বিধাতা প্রশ্ন করেন—

হে মানব! সুখে আছো তো!

হাসিয়া মানব বলে—হে বিধাতা! সুখী আমি, শুধু দিবরাত্রি বসে নব ছন্দে কথা শুনি। আমাকে যে সাথী দিলে, সব ভালো তার, শুধু আমারে সে করেছে নির্ব্বাক্। বোঝে নাকো আমারো যে আছে কথা তারই জন্য, তারই মধু ভরা। হে বিধাতা! সব ভালো তার, শুধু বড় বেশী কথা কয়।

হয় কথা—নয় লীলা—এই নিয়ে মানবী মহিমা। মানবী শুধু চাহে তার খুশী মতো মানব কহিবে কথা, তাহারই খুশীর জন্য আনিবে ঝরণার জল, পেড়ে দেবে ফুল। প্রথম দিনের সেই আপন-ভোলা মানব ভাবিতে থাকে—তাহারও তো কিছু আছে চাওয়া, কেন মানবী নয়নে চাহি' দীর্ঘ দিন তার এসে ফিরে যাবে। যে বিধাতা মানবের তরে রচিল নন্দন শোভা, শুধু মানবেরই দাবী শুনে দিলো তার সাথা, যে বিধাতা মানবের তরে রচিল মানবী তার নিঃসঙ্গতার সাঙ্গীরূপে, সে বিধাতারও মানবের কাছে কিছু আছে চাওয়া—এত যে দিয়েছে তার প্রতিদানে।

তার বিধাতাকে স্মরণের অবসরটুকুও মানবী রাখে না। এই সে সঙ্গিনী হাসিতে কথায় উছলা পাহাড়ী নদী, মুহূর্ত্তেক পরে নয়ন কোণে কোথা হোতে আসে জল, মধু কাব্য ভরা! মানবকে করে বিচলিত এমনি লীলায়। কি যে করিবে সে? কি দিলে, কি কথা কহিলে, সে নয়ন কোণের জল আশ্বাসে বিশ্বাসে ক্ষণে টলমল্ কোরে পুন মিশে যাবে লুকাবে নয়নে?

এই অধরেতে হাসি, এই নয়ন কোণে জল—

অপূর্ব্ব এ মিলন। তবু মানব তার সঙ্গিনীকে অনুরোধ করে, প্রার্থনা করে সামান্য অবসর শুধু তার বিধাতাকে স্মরণ করিতে—দিনমানে মাত্র একবার! সে অবসর মানবী দিবে না। মানবী বলে—দুজনার এই যে জীবন এই তো মধুর, এই ভরা গাঢ় দিন মাঝে বিধাতার কিবা প্রয়োজন? দুজনার এইটুকু দিনে বিধাতাকে ভাগ দিতে হোলে তাহাদের কি রহিবে? সত্যই যদি বিধাতা এ দিনের ভাগ দাবী করে, তবে কেন ফিরায়ে নিক না তার দেওয়া দিন, কেড়ে নিক এককে অপরের কাছ হোতে!

মানব বলে—হে সঙ্গিনী, হে নিরুপমা! এই দেখ পারিজাত, পারিজাতে তোমাকে সুন্দর মানায়! কেন এমন পারিজাত ফুল তুলে কবরী রচনা কর না, কর্ণমূলে কণ্ঠহারে কেন পারিজাতমণি শোভিত করো না। এই প্রশংসায় এই অলঙ্কার লোভে যদি মানবী ক্ষণেকও একা যায় পারিজাত বনে, মানবের বড় আশা সেইক্ষণে আপনার বিধাতাকে করিবে স্মরণ, সেই প্রথমদিনের মতো একটুকু আপনাতে রহিবে তন্ময়।

মানবী মানবকে বলে—সত্যি, ভালবাসি পারিজাত। কিন্তু তুমি না তুলিয়া দিলে, তুমি না পরায়ে দিলে, পারিজাত চাহি নাকো আমি, চাহি নাকো কিছু।

হায় বিধাতা, এমনই সাথী দিলে—যাকে নিয়ে অবসর মেলা ভার, যাকে নিয়ে মানবের এতটুকু নাহি স্বাধীনতা!

মানব কাঁদিয়া বলে—হে বিধাতা! বলে দাও মানবীরে যেন সে আমাকে দেয় সারাদিনে কিছু ছুটি, কিছু অবসর, নয়তো ফিরায়ে নাও দান। সেই সাথীহারা দিন—শুধু বসে থাকা, শুধু নিজ মনে ভাবা—সেও ছিল ভাল।

হে বিধাতা! বলো দেখি, যে আমাকে গ্রাস করে নিল, যাকে আমি না পারি বোঝাতে, না পারি নিজের মতে সুখী করে নিতে, তাকে নিয়ে থাকা শুধু আপনার সর্ব্বনাশ নয়? যে সঙ্গিনী আমার বিধাতাকেও এতটুকু অবসর নাহি দিতে চায়, শুধু চায় তার মুখে চেয়ে তাকে আমি খুশী করি আর হাসি গাই—সে অপরূপ সৃষ্টি তোমার হে বিধাতা, ফিরায়ে নাও। বনে কান্তারে শুধু ফেরা নিঃসঙ্গ একাকী, নাহি কারো হাসি অভিমান, নাহি গতি, নাহি ছন্দ, নাহি কোনও মিল—সেও ভালো তবু।

মানব মিনতি করে—বলে দাও তারে, হে বিধাতা, তারও পূর্ব্বে আমি জগতে এসেছি, আমারও যে মন আছে, চিন্তা আছে, আমারও যে আছে স্বপ্নদেশ। মানবী ভাবে যে শুধু তারই তরে নন্দনকানন শোভা, শুধু তারই তরে নীলাকাশ, এমন কি তারই তরে কাব্যসুধা করিতে রচনা সৃষ্ট আমি। এ অসহ্য! ফিরায়ে নাও মানবীরে। তবুও মনে হয়ত বাজিবে বেদনা, ছন্দ আমার ফিরায়ে নেবে যখন। হে বিধাতা! এই ক্ষণেই কেড়ে নাও তারে। তার তরে পারো যদি নূতন নন্দন কোনো রচনা করিয়া দিও।

বিধাতা হাসিয়া বলেন—কেড়ে নিতে পারি, তবে একেবারে। মানবীর এই তবে হবে শেষ দিন। সহিতে পারিবে?

মানব কাঁদিয়া ওঠে—হে বিধাতা! এত নিষ্ঠুরতা সহিব কেমনে? যে আমাকে মধু দিল, সেবা দিল, আমাকে চাহিয়া যার এত কলকথা, এত উচ্ছলতা, তাহাকে রাখিয়া দাও দূরে কিছু ব্যবধানে। হে বিধাতা! কেড়ে নাও তারে, কিন্তু জীবনের পরপারে নহে।

সে যে আরও জ্বালা—

বিধাতা হাসিয়া বলেন—মনে আছে, একদিন কথা দিয়েছিলাম যে সাথাটিকে চিরতরে তোমাকে দিলাম। আজ তাই ফিরাতে পারি না সেই কথা, সেই মোর দান। ভাল হোক মন্দ হোক, হোক সে চপল, যত খুশী কথা কয়ে যাক, তবু তাকে নিয়েই তোমার জীবন।

চিরকাল ধ'রে মানব মিনতি করে—তবু শাসন করিয়া দাও তাকে, মানবীর কথা কিছু বন্ধ হোক, কিছু চপলতা।

মানবী শুনিয়া বলে—আমি বেশী কথা কই! কোথা তার প্রমাণ? কাব্য মহাকাব্য এত কে লিখেছে? সে কি আমি, না তুমি মহাশয়?

বিধাতা হাসিয়া বলেন—এই ভালো দুজনারই দ্বন্দ্ব নিয়ে দুজনায় থাকো। তবু যুগে যুগে একান্তে গোপনে মানব নিশ্বাস ফেলে। কোথা সেই সাথীহীন দিন, সেই মুক্ত খোলা নীলাকাশ! সেই আপনাতে আপনি মগ্ন থাকা, সেই শুধু একা!

বাধা দিল নারী—ওগো মহাজ্ঞানী! কোনও ঋণ স্মরণ কি হয়?

পুরুষ বলিল—সত্য, বহু ঋণ, বহু তব সেবা যত্ন স্নেহ—

নারী দাবী করিল—সেই ঋণ শোধ কিছু দেবে?

বিস্মিত হইল পুরুষ—কী রত্নে হইবে শোধ?

মহাসুখে উত্তর জানাল নারী—সে রত্ন যে তুমি মহাশয়! আজি হোতে হাহুতাশ বন্ধ করো তবে। আমারই যে রত্ন হবে—আজ হোতে আমিই তব অধিকারিণী ঋণশোধ তরে। সে রত্ন আমিই বুঝিয়া লব, আমিই তা ভোগ করিব খুশী মতো।

পুরুষ হাসিয়া বলে—তোমারও আমার কাছে আছে কিছু ঋণ!

নারী বলে—কেন ঋণ? কিসের ঋণ? চিরকাল বলিয়া এসেছ একা হোলে ভালো থাকো। অন্য কোনও কথা শুনি নাই, কোনও ক্ষণে কোনও কালে কিছু পাই নাই।

উত্তর মিলিল শুধু—হে সরলে! ধন্যা তুমি! আর কিছু বলিবার নাই। বিধাতা হাসেন আর যুগ বহে' চলে। প্রথম মানব ও মানবীর অন্তরের ভাষা সারা কালের চির দেশের দ্বন্দ্বকাব্য গড়ে।

পুরুষ নারীর জন্য সাধনা করিল। নারী সেও ভজনা করিল আপনার দেবতাকে।

পুরুষ বলিল—দেবী! ধন্য আমি তোমাকে পাইয়া—

নারী বলিল—দেবতা! আমি ধন্য, তুমি কেন হবে? তবু ইতিহাসে লেখে, যুগে যুগে বলেছে মানব, নারীজাতি তরলা চপলা, মূর্ত্তিমতী বাধা নারী সাধনার পথে।

প্রতিক্ষণে দিনে দিনে সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে নারী যা লিখিল কাব্য, তা' রহিল বিনা খাতায় বিনা লেখায় বিনা ধরাবাঁধায়।

পৃথিবীতে যত জাতি সকলেরই পুরাণকথায় আছে বিধাতা, আছে নন্দনকানন, আছে প্রথমদিনের সেই মানবমানবী।

পশ্চিম আকাশতলে বিধাতা প্রথম যে মানব গড়িলেন তারই ইতিহাস হোলেও, এ অপূর্ব্ব কথা আমাদেরও বহু পরিচিত। পশ্চিমের ইতিহাসে সাধনা আরাধনার এত মূল্য নাই, বিধাতার জন্য এত দরদ, এত কামনা নাই। তাই মানবমানবীর সেই প্রথম মিলনে ভারতের অন্তরকথা মিশ্রিত!

* * * *

পূর্ব্ব গগনতলেও যেদিন বিধাতা প্রথম মানব সৃষ্টি করিলেন, জাত হওয়া মাত্রই সেও বিধাতার পদধূলি লইয়া হিমাচলের অশোকতীর্থে সাধনা করিতে চলিয়া গেল। সনৎকুমারাদি আদিসন্তানেরা এমনই ভাবে বিধার কৌতুক বুঝিয়া নিঃসঙ্গ জীবনই সার করিয়া লইলেন। বহুদিন পরে মহাসৃষ্টির কল্পদ্রুমমূলে বসিয়া মহামুনি কশ্যপ বিধাতার ইচ্ছায় দুই দুইটি জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ করিলেন ও সত্যই প্রীত হইলেন। কিন্তু একদিন মহামুনি সান্ধ্য উপাসনায় প্রস্তুত হইতেছেন, এমন ক্ষণে তাঁহার অন্যতমা জীবনসঙ্গিনী আসিয়া আনতবদনে দাঁড়াইল। মুনি বলিলেন—দেবী! বলো কি তোমার মনোভিলাষ? মৌন কেন?

আনতবদনা কহিলেন—দেবতা, বড় সাধ এইক্ষণে জীবনের সুধা পান করি। হে দেবতা! ফিরায়ে দিও না—

মুনি বলিলেন—দেবী! কিন্তু এখন আমি যে উপাসনার্থ প্রস্তুত। এ উত্তরে মানবী প্রসন্না হইলেন না। অগত্যা মহামুনিকে চলিতে হইল কাব্য-ভজনে। সেদিনও বিধাতার কাছে মিনতি নিবেদন—হে বিধাতা! একি করিলে! সাথীহীন দিন—সেই তো ছিল ভালো।

আর একদিন অমরাবতীতে দেবরাজ সভায়—যেখানে ত্রিকালজ্ঞ দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর ও মানব সদস্যগণ কোনও জটিল সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া স্থির করিলেন, ধ্যান বলে বিষ্ণুলোকের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, সেইখানে সেই ধ্যানমগ্নতার মাঝে ইন্দ্রাণীর অকস্মাৎ মনে হইল তাঁহার ললাট হইতে চন্দ্রকলা টিপটি খসিয়া গিয়াছে! অমনি যেই ললাটদেশে করখানি তুলিলেন, মহামূল্য করাভরণ ধ্যানস্তব্ধ সুরসভাকে চমকিত করিল মিষ্ট ধ্বনিতে।

সদস্যেরা কি-ই বা বলিবেন—তিনি যে ইন্দ্রাণী!

ক্ষণপরে উর্ব্বশীর বোধ হইল—শিথিল তার কবরী। অমনি কবরী রক্ষণে যেই বাহু তোলা, অলঙ্কার বাজিল রিণিঝিণি। সদস্যেরা বিরক্তি লুকাইয়া বলিলেন—কেন এত চাপল্য উর্ব্বশী?

উর্ব্বশী উত্তর দিল—কি করিব? কবরী যে আপনি শিথিল হইল—! কিছু পরে তিলোত্তমাকে নাসিকাগ্রে হাত তুলিতে হইল। অমরাবতী মর্ত্ত্য নহে, সেখানে

নাসিকাগ্রে বসিবে মর্ত্ত্যের জীব মশা মাছি ! তবু এ চপলতা চিরকালের ধারা ।

দেবরাজ বলিলেন—রে চপলে ! কেন এ আচার ?

গ্রীবাভঙ্গে সভাভঙ্গ করিয়া সে বলিল—কি করিব ? হাত যে আপনি উঠিল, আপনি যে আভরণ তুলিল ঝঙ্কার !

বড় দুঃখে সেদিন মহাজ্ঞানী সদস্য বলিয়াছিলেন—হে বিধাতা ! এ অপরূপা সৃষ্টি তোমার ফিরায়ে নাও, আমাদের কোনও দুঃখ নাই ।

উর্ব্বশী হাসিয়া বলিল—স্বর্গে তবে কি হইবে ? কি করিবে পারিজাত নিয়া । নারী যদি না রহিল, তবে ব্যর্থ হবে নন্দন রচনা ।

বড় কৌতুকে বিধাতা হাসিয়াছিলেন ।

সেদিন কোনও নারী, দুই করে ভরা আভরণ, আপনি মগ্না ছিল আপনার কাজে । কি জানি সে নারীও ভাবিল—বড় গোল করে এই শাঁখা চুড়িগুলি । অবিরত ঠুং ঠাং, বিশ্রামবিহীন । কত কাজে বাধা দেয়, চিন্তাকে করে সূত্রহীন !

নারী উভয় করহোতে এক একটি আভরণ লইল খুলিয়া । তবু শব্দ করে, তবু বাজে কথা কয়, বাকী আভরণ !

একে একে, শুধু শাঁখারে সম্বল করি, নারী খুলিয়া লইল আভরণ । বড় তৃপ্তি হইল মনে । কেমন এ শাঁখাখানি তন্ময়া নির্ব্বাক্ !

অমনি ভাবিল নারী—তাই কি পুরুষে চাহে রহিতে একাকী ! পরক্ষণেই একে একে পুনরায় পরিয়া লইল আভরণ । মহাখুশীভরে নারী শুনিতে লাগিল সেই আভরণ-ধ্বনি, সেই অবিরাম কলকথা ।

আপনি বলিয়া উঠিল নারী—এই ভালো, এই অবিরাম ছন্দ, এই চিরকালের রঙ্গ !

হাসিয়া উঠিল নারী—এই ভালো, এই জীবনে যা করি রচনা আপনার সাথাটিকে লয়ে—তাহাকে বিব্রত করি' এই চিরকৌতুকলীলা—অভিমান হাসি কান্না মিল, এই মোর কাব্য গাঁথা দিনে রাতে—অন্তরেতে মধুসন্নিবেশে !

পুরুষ বলিল-ভালো, সব ভালো দেবী ! শুধু যদি দয়া কোরে কোনও ক্ষণে মুক্তি দিতে দীনে !

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

চতুর্থ দৃশ্য

অবনী বাবুর বাটীর দ্বিতলের বৈঠকখানা। আধুনিক ধনী-জনোচিত আসবাবে সজ্জিত । একটি টেবিলে কয়েকটী ফুলের তোড়া, ফুলের মালা রহিয়াছে । টেব্‌লের পাশে প্রবীণ এটর্ণি ও রাজনৈতিক নেতা অবনীভূষণ যুক্তকরে নমস্কারের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান । তাঁহার কণ্ঠে গোটা দুই ফুলের মালা । ঘরে আট দশ জন বিভিন্ন বয়সের ভদ্রলোক । অধিকাংশের পরিধানে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, কাহারও কোট প্যাণ্টালুন টাই । একজন পায়জামা ও চাপকান পরিহিত । ইহারা নমস্কার কর-মর্দন ইত্যাদির যোগে অবনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিল । সিঁড়ির মুখে কয়েকটি কণ্ঠের সমবায়ে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিত হইল । সকলে প্রস্থান করিল । এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে কহিতে অবনী নামিয়া গেল ।

ঘরে রহিল মিষ্টার মজুমদার নামক অবনীর এক বন্ধু । মজুমদারের শ্রীহীন চেহারা, অবিন্যস্ত কাঁচা পাকা কেশ ও গোঁফ দাড়ি, অপরিচ্ছন্ন প্যাণ্ট ও সার্ট, দীর্ঘ দেহ । সে চলিয়া যাইতে যাইতে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া একটি জ্বলন্ত সিগারেটের অবশিষ্ট অংশ হইতে নূতন সিগারেট ধরাইতেছিল । বাটীর ভিতর হইতে একটি পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে জয়ন্ত প্রবেশ করিল, মজুমদারকে দেখিয়া দাঁড়াইল ।

জয়ন্ত । মিষ্টার মজুমদার, আপনার নামে অভিযোগ আছে ।

মজুমদার । আই প্লিড্ গিল্‌টি । (বলিয়া হাতকড়ি পরিবার ভঙ্গীতে দুইটি হাত বাড়াইয়া দিল ।)

জয়ন্ত । কিন্তু চার্জটা কী তা জানতেও চান না ?

মজুমদার । না । অনাবশ্যক । ফর ইয়োর সেক্, সব চার্জ স্বীকার করে নেব ।

জয়ন্ত । আপনি তো কই আজ বাবাকে অভিনন্দন করলেন না ?

মজুমদার । অভিনন্দন ? করিনি বুঝি ? কেন করিনি বলতো ? তাহলে ভুল হয়ে গেছে ।

জয়ন্ত । কক্‌খনো ভুল নয়, আপনি ইচ্ছে ক'রে করেন নি । অথচ আপনি বাবার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ।

মজুমদার। ভাট্ এক্সপেন্স্। অভিনন্দনের যখন, তখন আর কী ক'রে অভিনন্দন করি বল? ওটা কেমন আত্মশ্লাঘার মতো শোনাতো না? সভাপতি তো ওকে হতেই হবে। ও যে বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে। না হয়ে উপায় কী? জীবনেরে কে রোধিতে পারে?

জয়ন্ত। আমার কী মনে হয় বলব? আমার মনে হয় এই বেঙ্গল কনফারেন্সকে আপনি খুব বড় করে দেখেন না। কোনও কনফারেন্স, কনভেন্সন, আবেদন নিবেদনের প্রতিই আপনার মনোভাব বিশেষ সশ্রদ্ধ নয়।

মজুমদার। না, কনফারেন্স তো মন্দ জিনিস নয়, আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাকে। (প্রস্থানোদ্যত)

জয়ন্ত। কনফারেন্স কংগ্রেস সম্বন্ধে একদিন আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব আমি। ওদের সার্থকতা কতদূর—এ বিষয়ে একটা গুরুতর আলোচনা করা দরকার।

মজুমদার। আমার সঙ্গে পরামর্শ? গড হেল্প ইউ, মাই বয়!

উভয়ের প্রস্থান

ক্ষণকাল পরে অবনী প্রবেশ করিল। সে একটা ছোট সুটকেসে কাগজপত্র গুছাইয়া তুলিতেছে, অন্দর হইতে অবনীর স্ত্রী সুমিত্রা প্রবেশ করিল।

সুমিত্রা। (উদ্বিগ্ন স্বরে) হাঁগা এ কী কথা? বজু বলছে, তুমি নাকি এখুনি রওনা হবে?

অবনী। এখনি নয়। (হাতঘড়ি দেখিয়া) আরও একাত্তর মিনিট পরে।

সুমিত্রা। তা হলে সত্যি? কিন্তু তোমার যে বিকেলের গাড়ীতে রওনা হবার কথা?

অবনী। ছিল, কথা তাই ছিল। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির টেলিগ্রাম এসেছে। অনুরোধ করেছেন, যদি সম্ভব হয় সকালের গাড়ীতে যেন যাই। কারণ তাহলে বিকেলেই ওখানে পৌঁছাতে পারব। তাঁরা কী সব প্রোসেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন।

সুমিত্রা। না না, সে কী করে হবে? সে হতে পারে না। আজকের দিনে তুমি আর খোকা পাশাপাশি বসে খাবে না? জন্মদিনেও একলাটি ভাত খাবে? সে হয় না।

অবনী। তা, সে জন্যে ভাবনা কী? জয়কে ডেকে পাঠাচ্ছি, তুমি ঠাকুরকে বলে দাও দু থালা—

সুমিত্রা। কী বল তার ঠিক নেই। তুমি কি সব ভুলে গেলে? ঠাকুর দুথালা ভাত দিয়ে গেলেই হল? আমার বাড়ীর পুজোই এখনও সারা হয়নি, তারপর খোকাকে নিয়ে কালীঘাট—, না বাপু, এ সব কি ৭১ মিনিটের কাজ? আজকের দিনটিতে তোমার পাশে বসে তোমার পেসাদ মুখে দিয়ে খাবে না?

অবনী। তাই হবে অখন। পুজো টুজো ওসব তোমার ডিপার্টমেন্ট তুমি সারো। আর পাশে বসে খাওয়া? বেশ তো, জয় আমার সঙ্গে বসেই খাবে আজ।

সুমিত্রা। তবে? তবে এক্ষুণি বেরুবে না তো?

অবনী। এখনই বেরোবও বটে, জয়ের সঙ্গে বসে খাবও বটে। তুমি ভেব না। রিফ্রেশমেন্ট কার-এ ওতে আমাতে এক টেবিলে বসেই খাব। (সুমিত্রার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া) জয়ও যে আমার সঙ্গে যাচ্ছে গো।

সুমিত্রা। তোমার সঙ্গে যাচ্ছে? খোকা?

অবনী। (ঈষৎ হাসিয়া) ও যে একজন মস্ত বড় ডেলিগেট গো, খোকা হয়ে তার মায়ের কোলের কাছে বসে পায়েস খাবার সময় কি ওর আছে? সামান্য প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স-এর প্রেসিডেন্ট হয়েছি আমি, ওকে একদিন হতে হবে অল্ ইণ্ডিয়া কনফারেন্স এর প্রেসিডেন্ট। সেই আদর্শেই ওকে তৈরী করেছি আমি। একদিন লোকে আমাকে দেখিয়ে বলবে—ঐ জয়ন্ত বোসের বাবা যাচ্ছে, বুঝলে, জয়ন্ত বোসের বাবা। ওর বক্তৃতা তুমি শোন নি? কী গো চুপ করে রইলে যে?

সুমিত্রা। না, আর চুপ করে থাকব না। চিরকাল চুপ করে আছি বলে তোমরা এই অত্যাচার করে আসছ। আমি আর চুপ করে থাকব না।

অবনী। (হাসিয়া) তবে? খুব কথা কইবে? বেশ তো। চল আমাদের সঙ্গে। সভাপতির অভিভাষণ হয়ে গেলে, সভাপত্নীর—কথাটা ভাল ভাবেই নিও, সভাপত্নীর অভিভাষণ হবে। তাহলে জয়কে বলে দি বার্থ আর এক খানা রিজার্ভ করতে ফোন করে দিক। কী বল?

সুমিত্রা। ঠাট্টা করো না। খোকা আজ যাবে না।

অবনী। পাগল না কি!

সুমিত্রা। না, পাগল নই। কিন্তু খোকার যাওয়া হবে না। আজকের দিনে আমি খোকাকে যেতে দেব না, তাই শুধু বলে গেলুম।

(প্রস্থানোদ্যত)

অবনী। কী আশ্চর্য্য! এইটুকুতে তোমার চোখ ছলছল করে এল? বসো, বসো। জয়ের জন্মদিন তাতে তোমার কী? মানে, আমি যখন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

সুমিত্রা। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিয়া) খোকার জন্মদিনে আমার কী, তা এতদিন পরে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা আমি করব না। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, তোমাদের বাড়ীতে আমার প্রথম পরিচয় যার সঙ্গে সে তুমি নয়, সে আমার খোকা।

অবনী। মনে আছে বই কি। আর না থাকলেও তোমার কাছে সে কথা এতবার শুনেছি যে—

সুমিত্রা। হ্যাঁ, অনেকবার শুনিয়েছি, যদি বেঁচে থাকি আরও কতবার শোনাব তার ঠিক নেই। ঐ কথাই যে আমার সবার বড় কথা আর আজ পর্য্যন্ত ঐ কথাই আমার শেষ কথা। বাসি বিয়ের দিনে তোমাদের উঠোনে যখন এসে দাঁড়ালুম, কে একজন খোকাকে এনে আমায় দেখিয়ে দিলেন।

অবনী। মনে আছে, পিসিমা।

সুমিত্রা। বললেন—ঐ তোর মা এসেছে, যা মার কাছে যা।

খোকা এল না। কাছে টানতে গেলুম, পারলুম না। মাখনের দেহ নিয়ে খোকা পাথরের মূর্ত্তির মতন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুখ ফিরিয়ে। তারপর জোর করে কোলে নেবামাত্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ছেলে। খালি বলে—কেন তুই আমায় ফেলে চলে গিয়েছিলি? কেন গেলি? আমায় মেরে ধরে আদর করে খোকা আমার কোলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ল যখন, তখনও তার দুটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে আমার আঁচল ধরা, পাছে আবার আমি পালিয়ে যাই। (চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল)

অবনী। সে তো আমি জানি সুমি, কিন্তু কাঁদছ কেন, ছি, আজকের দিনে কাঁদতে নেই।

সুমিত্রা। কাঁদিনি। ও আমার চোখের ব্যামো। সেদিনের কথা মনে পড়লেই চোখের ব্যামো বাড়ে। (চোখ মুছিল) ঘুমের মধ্যেও খোকা ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল। না হ'ল কড়ি খেলা, না হ'ল আচার অনুষ্ঠান, খোকার মা হয়ে, খোকাকে বুকে নিয়ে সারা রাত কাটল। জ্বরে তার গা ফাটছে তবু পাশ ফিরতে দেয়নি খোকা, সেকথা কি ভুলতে পারা যায়।

অবনী। ভুলিনি তো সুমি। কেউ ভোলেনি। খোকা তো গিয়েইছিল। তাকে তুমিই নতুন করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনলে। কেউ সেকথা ভোলেনি। মা যতদিন বেঁচেছিলেন,—শুধু মা কেন, পাড়া-সুদ্ধ লোক তোমার প্রশংসা করেছে।

সুমিত্রা। প্রশংসার কথা বলছি না, খোকার কথা বলছি। মা তো আমার নিজের মা-ই ছিলেন। কিন্তু সবাই তো মা নয়। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গল—তোমাদের কাঁসারী-পাড়ার মাসীমার গলা শুনে। কথা শুনে শিউরে উঠলুম। যাক, সে কথায় দরকার নেই। নারায়ণ আমার প্রার্থনা শুনেছেন, আমার পেটে সন্তান দিয়ে খোকাকে আমার সতীনপো করে দেননি। (এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) সেই মাসীমাই আবার বলেছিলেন—আহা, বৌটার হাতের জল শুদ্ধ হল না গা।

অবনী। ফুল্‌স্‌, রটন্ ফুল্‌স্‌।

সুমিত্রা। রাগ করলে কী হবে, বন্ধ্যা মেয়েকে লোকে তো বলবেই।

অবনী। বন্ধ্যা? লোকে কী জানে? খোকার জন্যে তোমার আত্মবিসর্জ্জনের খবর নারায়ণ জানেন, কিন্তু মানুষে কী করে জানবে?

জয়ন্তর প্রবেশ, তাহার হাতে সংবাদপত্র

জয়ন্ত। জান মা, বারো ঘোড়ার গাড়ী করে বাবাকে নিয়ে যাবে। এই দেখ অমৃতবাজারে লিখেছে, এই যে বাবার ছবির নীচে এইখানটায়, প্রেসিডেন্‌শ্যাল প্রোসেশন কী রকম হবে তার একটা প্রোগ্রাম দিয়েছে। আমার ক্যামেরা নিচ্ছি, তোমায় দেখাব—আমি অবশ্য প্রেসিডেন্টের গাড়ীতে থাকব না, তাহলেও—

সুমিত্রা। খোকা, তুই ওঁর সঙ্গে নাই গেলি বাবা।

জয়ন্ত। নাই গেলি? তার মানে?

সুমিত্রা। আজ যে তোর জন্মদিন।

জয়ন্ত। জন্মদিন? তা কী হয়েছে? ও, তুমি সেই নতুন কাপড়-টাপড় পরা, পায়েসটায়েস খাওয়া, সেই পুজো-টুজো—সেই কথা বলছ? (মাথা নাড়িয়া) না মা, যে দেশের অর্দ্ধেক লোক একবেলা একমুঠো খেতে পায় না, সে দেশের ছেলের জন্মদিনে ঘটা করে পায়েস খাবার দিন আর নেই মা।

সুমিত্রা। খোকা—

জয়ন্ত। (হাসিয়া) তুমি ভাবছ খোকা তোমার খোকাই আছে বুঝি! আমি যে আমাদের পার্টির ডেলিগেট মা'। আমার নামে দুটো রেজোলিউশন আছে। তোমার ও জন্মতিথিটিথি হবে'খন এর পর তখন ফিরে এসে।

অবনী। জয়ন্ত, তুমি তো আজ না গিয়ে কাল যাত্রা করতে পার। ওপ্‌নিং ডে'তে তোমার কিছু তো করবার নেই। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আর সাবজেক্টস্ কমিটির মিটিংএ থাক্‌লেই তোমার চলবে।

জয়ন্ত। কিন্তু আমাদের ইয়ুথ কনফারেন্সও যে রয়েছে বাবা। না, না, সে হয় না, লক্ষ্মীটি মা, আমি ফিরে এসে তোমার পুজো-আচ্চা নিয়ম-কর্ম্ম সব করব, সেই জামবাটীর একবাটি পায়েস খাব—

ভৃত্যের প্রবেশ

অবনী। কী রে?

ভৃত্য। একটা সায়েব বসে আছেন নিচে। আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলছেন।

জয়ন্ত। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই কথা বলতেই এসেছিলাম, এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্ আপনার সঙ্গে ইণ্টারভিউ চায়।

অবনী। তুমি নিচে যাও জয়, সায়েবকে বসতে বল, আমি আসছি।

জয়ন্ত ও ভৃত্যের প্রস্থান

অবনী। তুমি মন খারাপ কোরো না সুমি। খোকা তো তোমারই খোকা, কিন্তু ওর সামনে যে কাজ এসে পড়েছে, ওকে যে ডাকছে। জান ত, সম্রাট অশোক একমাত্র ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন সুদূর সিংহলে। তাকে রাজভোগের মধ্যে রাজপুত্র করে ঘরে রেখে দেননি। অশোকের ইতিহাস অবশ্য পুরাণের মত পুরোনো। কিন্তু আমিও ছেলেকে ঘরের কোণে রাখবার জন্য মানুষ করি নি তা তো তুমি জান। জয় আমাকে ছাড়িয়ে যাবে, আমাকে ছাপিয়ে উঠবে, আমি যার স্বপ্ন দেখেছি মাত্র, জয় তার সমাধা করবে একদিন। সেই গর্ব্বের দিনের অপেক্ষা কি আমার মত তুমিও কর না?

সুমিত্রা। কী জানি। হয়ত' তোমাদের মত অমন করে ছেলেকে খালি গর্ব্বের জিনিস বলে ভাবতে পারি না। ভাগ্যের জিনিস বলেই মনে করি। এমনি আমাদের দুর্ব্বল মন। খোকন আমার তোমারই উপযুক্ত হোক, সব বিষয়ে সবার বড় হয়ে উঠুক, এর চেয়ে বেশী কামনা আর কিছু নেই। কিন্তু যত বড়ই হোক, আমার কোলের চেয়ে বড় হবে সে, আমার কোল ছাড়িয়ে যাবে, এ আমি ভাবতে পারিনি।

অবনী। তা যাবে না গো, যাবে না। তোমার পুজো শেষ করে এস, আমি ইতিমধ্যে রিপোর্টার সাহেবকে বিদেয় করে আসি।

প্রস্থানোদ্যত

সুমিত্রা। আমি বুঝিতে পারছি আমারই ভুল। তোমার ছেলে ও—

অবনী। ও কথা বল না সুমি'। তোমার ছেলে নয়? আমার আর কতটুকু? তোমারই তো ছেলে।

সুমিত্রা। না, আমি ওর সাজা মা। থিয়েটারে যেমন মা সাজে। ও তোমারই ছেলে। তোমারই মত শক্ত বুক, দৃঢ় মন। আমার মত দুর্ব্বলতা ওর থাকবে কী ক'রে? আমার কিছুই ওকে দিতে পারিনি। মানুষ-করা ঝিয়ের মত খালি চান করিয়েছি, ঘুম পাড়িয়েছি। খাইয়ে দিয়েছি, তাও হাতে করে, বুকে করে খাওয়াতে পারিনি।

অবনী। কী পাগলের মত বলছ সুমি? তুমি না খাওয়ালে ওকে খাওয়ালে কে?

সুমিত্রা। (এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) দেখ, বুড়ো হয়েছি, আর তোমার কাছে বলতে লজ্জাই বা কী, মাঝে মাঝে মনে হয় পেটে যদি একটা ধরতুম, তা হ'লে—

অবনী। তা হ'লে কী হত? (টেবিলের উপর রাখা স্ত্রীর হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে) তাহলে?

সুমিত্রা। তাহ'লে অন্তত তার ভাগ থেকেও এক ফোঁটা বুকের দুধ আমার খোকাকে খাওয়াতে পারতুম।

অবনী। পাগল, পাগল তুমি। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) লোকটা বসে আছে, আমি আসছি। প্রস্থান

সুমিত্রা নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় একদিক হইতে জয়ন্ত ও অন্যদিক হইতে ভৃত্য প্রবেশ করিল।

ভৃত্য। মা, বামুনঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, পায়েসের চাল কি এখন বার করে দেবেন?

সুমিত্রা। না।

ভৃত্য। উনুন আড়াড় হয়েছে কিনা, তাই বলছিল এই বেলা—

সুমিত্রা। অন্য কিছু চড়াতে বল, পায়েস হবে না।

ভৃত্যের প্রস্থান

ড্রাইভারের প্রবেশ

ড্রাইভার। কালিঘাটে তবে পরেই যাব মা, আগে বাবুকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুমিত্রা। কালিঘাটে যাবার দরকার নেই বরজু।

ড্রাইভার। গাড়ী ধোলাই করতে দেরি করে দিলে মা। (হাতঘড়ি দেখিয়া) আচ্ছা চলুন, আগে কালিঘাটই ঘুরে আসি, সে আমি ম্যানেজ করিয়ে নেব—

সুমিত্রা। কালিঘাট আজ যাব না। তুমি ষ্টেশনেই যাও।

ড্রাইভার। (হাতজোড় করিয়া) কসুর হয়েছে মা, সব হামারই কসুর। আভি কালীঘাট—

সুমিত্রা। না বরজু, আমি রাগ করিনি। বাবুলোক ফিরে আসুন, কালীঘাট আর একদিন যাব বাবা। ষ্টেশন থেকে এসে তোমার ছুটি, তুমি গাড়ী তুলে দিও।

জয়ন্ত। (আগাইয়া আসিয়া) এখনই তোমার ছুটি বরজু। কিন্তু গাড়ী তুলো না। আমি বেরোব। আচ্ছা তুমি যাও।

ড্রাইভারের প্রস্থান

সুমিত্রা। তুই এখন বেরুবি? তুই তো ওঁর সঙ্গে—

জয়ন্ত। (ঘাড় নাড়িয়া) তোমার সঙ্গে।

সুমিত্রা। ষ্টেশনে যাবি—

জয়ন্ত। কালিঘাটে যাব মা।

সুমিত্রা। (সবিস্ময় আনন্দে) সত্যি যাবি? কিন্তু উনি যে বল্লেন এখুনি ট্রেণ—

জয়ন্ত। হ্যাঁ, বাবাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসব আগে। তারপর নিশ্চিন্তে কালীঘাট, তারপর নতুন কাপড়, তারপর ঘিয়ের পিদ্দীম, তারপর শাঁখের বাজনা, তারপর কলার বড়া, তারপর একবাটি—কিন্তু তোমার ঐ বামুন ঠাকুরের হাতের পায়েস—(মাথা নাড়িয়া) নৈব নৈব চ, এই বলে দিলুম। প্রস্থান

সুমিত্রা। তুই যাবি না ওঁর সঙ্গে? ওরে, ও রাখাল, বামুন-ঠাকুরকে বল—

সুমিত্রা দ্রুত বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। একটু পরে অবনী ও মজুমদার বাহির হইতে প্রবেশ করিল।

মজুমদার। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথা। জন্মান্তর রহস্য আর কি। কিন্তু এ জন্মেই। এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর। ম্যান্ লিভ্‌স্ এগেন ইন্ হিজ চাইল্ড। জীবনের রথ এমনি করেই ছুটে চলেছে।

অবনী। কথাটা একটু বদলাতে হবে, ম্যান্ নয়, ফাদার। ফাদার লিভ্‌স্ ইন, বাট মাদার লিভস্ ফর দি চাইল্ড। বাপ ছেলেকে বেশি ভালবাসে, কি ছেলের মধ্যে নিজেরই ইগোকে বেশি ভালবাসে, সেটা ভাববার কথা। কিন্তু মায়ের স্নেহের রূপ অন্য রকম মজুমদার।

মজুমদার সিগারেটের কেস খুলিয়া দেখিল সিগারেট নাই।

মজুমদার। অবনী, পাঁচসিকে পয়সা দেখি।

অবনী পার্স খুলিয়া একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিল।

মজুমদার। পাঁচ টাকা নয়, পাঁচ সিকে চেয়েছি।

অবনী। সরি। খুচরো ছাড়তে পারি না, পথে দরকার হবে।

মজুমদার। তবে দাও। (নোট লইল) থ্যাঙ্কস্। (নোটবুক বাহির করিল)

অবনী। (হাসিয়া) তোমার পাগলামি এখনও গেল না মজুমদার?

মজুমদার। পাগলামি আবার কোথায় দেখলে? একাউন্ট ইজ একাউণ্ট। টাকাকড়ির লেন দেন লেখাপড়ার মধ্যে থাকবে না তো থাকবে কী?

অবনী। আচ্ছা, আচ্ছা, লেখ লেখ।

অবনী বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করিল।

মজুমদার একটা কৌচে বসিয়া নোটবুকের পাতায় লিখিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের শিল্প-সমস্যা

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় ভারতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ রাজনীতির দিক হইতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হইলেও ইহাদের অর্থনীতি সপরিষদ দেশীয় রাজন্যবর্গই পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষকে যে আজও কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়—তাহা অবশ্যই দেশীয় রাজ্যসমূহের অর্থনীতির কথা বিবেচনা করিয়া।

বাস্তবিক ব্রিটিশ ভারতে তবু কিছু কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি এখনও একরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষিজীবনে পড়িয়া আছে। ভারতের মোট আয়তন ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গমাইল, ইহার মধ্যে শতকরা ৪৬ ভাগ দেশীয় রাজ্য। লোকসংখ্যা অবশ্য দেশীয় রাজ্যে কম এবং সর্ব্বসাকুল্যে ইহা ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজন্যবর্গের ধনৈশ্বর্য্যের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। ব্রিটিশ ভারতের ধনবণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্য অত্যন্ত স্পষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের অসম ধনবণ্টন যে কোন অনবধানী ব্যক্তিকেও ব্যথিত করিবে। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকিলে এই সব রাজ্যে বহু শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি করিতে পারিত; কিন্তু তাহা না হইয়া এই সকল রাজ্য ব্রিটেনাদি শিল্পপ্রধান দেশকে কাঁচা মাল জোগাইয়া নিজেদের বিপুল সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ব্রিটিশ ভারতে বর্ত্তমানে যে সব কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অনেকখানিও দেশীয় রাজ্যসমূহ জোগাইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনমত উৎসাহ লইয়া চেষ্টা হইলে শিল্পের দিক হইতে ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা দেশীয় রাজ্যসমূহের সাফল্যলাভের আশা কম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমসম্ভার প্রভৃতি শিল্পপ্রসারের যে সব অত্যাবশ্যক উপাদান, দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাহা প্রচুর ও সুলভ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেশীয় রাজন্যবর্গ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উৎসাহের অভাবে ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় ভারতের দেশীয় রাজ্যে নগণ্য শিল্পপ্রসার হইয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হয় সমগ্রভাবে। একে ব্রিটিশ ভারতে এ পর্য্যন্ত লক্ষণীয় শিল্পপ্রসার হয় নাই, তাহার উপর দেশীয় রাজ্যসমূহ এখনো প্রায় পুরোপুরীভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল; কাজেই ভারতবর্ষ দরিদ্র কৃষিজীবী দেশ হিসাবেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

অবশ্য দেশীয় রাজ্যের এই পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা বলার অর্থ—নির্ব্বিচারে সমস্ত দেশীয় রাজ্যসম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করা নয়। প্রকৃতপক্ষে ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে যে পরিমাণ শিক্ষা বা শিল্পপ্রসার হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় নিন্দনীয় নহে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতিশীল কয়েকটি মাত্র দেশীয় রাজ্য লইয়াই দেশীয় ভারত নয়, প্রকৃতপক্ষে ভারতে ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য আছে। দেশীয় রাজ্যের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা নয় কোটী নরনারী অধ্যুষিত এই ৫৬২টি রাজ্যের সামগ্রিক বিবেচনাতেই বলা হইতেছে।

বস্ত্র মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক বস্তু। ভারতবর্ষ মোটামুটি বস্ত্রের দিক হইতে স্বাবলম্বীও হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি এ হিসাবেও শোচনীয়ভাবে পশ্চাৎপদ। ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, বৃটিশ ভারতে এই বৎসর মোট কাপড়ের কল ছিল ৩৮৯টি। দেশীয় ভারতের আয়তন ব্রিটিশ ভারতের $\frac{৪}{৫}$ ভাগ হওয়ায় এবং ইহার লোকসংখ্যা ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ হওয়ায় দেশীয় রাজ্যসমূহে অন্ততঃ ১২৫টি কাপড়ের কল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু সে তুলনায় ১৯৩৮

সালে দেশীয় ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪। হস্তচালিত তাঁতের দিক হইতে আবার দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা ছিল আরও খারাপ এবং ব্রিটিশ ভারতের তাঁতের সংখ্যার হিসাবে দেশীয় রাজ্যসমূহে এই সময় শতকরা ১ ভাগও হস্তচালিত তাঁত চালু ছিল না। একমাত্র রেশমের কারখানা, সিমেণ্ট ও দেশলাইয়ের কারখানার হিসাবেই ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের অবস্থাকে তবু আশাপ্রদ বলা যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতে মোট রেশমের কারখানা ছিল ১২০টি, তন্মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহে ২৫টি কারখানা ছিল। ভারতে মোট ১১৩টি দেশলাইয়ের কারখানার মধ্যে এই সময় দেশীয় রাজ্যসমূহে ছিল ২৮টি কারখানা। মোট ১৯টি ভারতীয় সিমেণ্টের কারখানার ভিতর দেশীয় ভারতে ৬টি কারখানা থাকা অবশ্যই অগৌরবের কথা নয়।

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারখানা, কাগজের কল, কাঁচের কারখানা, চিনির কল প্রভৃতি মোটেই প্রসারিত হয় নাই। অন্যান্য নানাবিধ ভোগ্যপণ্যের জন্যও দেশীয় ভারত পরমুখাপেক্ষী। আগেই বলা হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যসমূহের সুযোগ সম্ভাবনা যেরূপ, তাহাতে এই শিল্পগত দুরবস্থা সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে মোট ২টি কাগজের কল ও ১৩টি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাগজের কলের প্রধান উপাদান বাঁশ ও সাবাই ঘাস এবং চিনির কলের উপাদান আখ ভারতের দেশীয় রাজ্যে কিছু কম উৎপন্ন হয় না। এই সব উপাদানের উৎপাদন কর্তৃপক্ষ একটু চেষ্টা করিলে অবশ্যই বাড়াইতে পারেন। দেশীয় ভারতে এই সব শিল্প গড়িয়া উঠা শুধু মাত্র কর্তৃপক্ষ ও শিল্পোৎসাহীদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছে। স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারত বলিয়া দুই পৃথক দেশের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। তখন ভারতীয় অর্থনীতির বিচার করা হইবে সমগ্র ভারতের আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া। সে হিসাবে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য-পরিকল্পনা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রচনা করিতে হইলে দেশীয় রাজ্যগুলির কথা ভুলিলে চলিবে না। দেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারিত হইলে অর্থের অন্তর্দ্দেশীয় প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি হয়, ইহা ব্রিটিশ ভারতের পক্ষেও যেমন সত্য, ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের পক্ষেও ইহা ঠিক একইভাবে প্রযোজ্য।

ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তি

ভারতশাসনে ইংরেজকে কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, তথাপি ব্রিটিশ সরকার যে ভারত সাম্রাজ্য আঁকড়াইয়া আছেন, তাহার রাজনৈতিক কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ শিল্পের দিক হইতে একান্ত পশ্চাৎপদ, অথচ এদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। শিল্পজীবী ব্রিটেন ভারতের এই কাঁচা মাল কিছুতেই হাতছাড়া করিতে ইচ্ছুক নয়। তাছাড়া ভোগ্যপণ্যের দিক হইতে ভারতবর্ষ পরনির্ভরশীল বলিয়া এখানকার বিরাট বাজারে প্রচুর বিলাতী মাল বিক্রীত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ সরকার পণ্য বিক্রয়ের এই প্রকাণ্ড বাজারটিও হারাইতে প্রস্তুত নন। এইজন্য রাজনৈতিক গণ্ডগোলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যদিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে হতাশ হইয়া পড়েন, অর্থনৈতিক স্বার্থই তাঁহাদের শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়হস্তে ভারতশাসনের রাশ টানিয়া ধরিবার প্রেরণা দেয়।

ভারত হইতে শুধু ব্রিটেনে কাঁচা মাল চালান দেওয়া বা তৈয়ারী বিলাতী শিল্পপণ্য ভারতবর্ষে বিক্রয় করাই হয় না, সেই সঙ্গে এদেশে প্রভূত পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থও নানাভাবে লগ্নী হইয়া পড়িয়াছে। খনির ইজারায়, কলকারখানায় ও অফিসাদিতেই এই টাকার অধিকাংশ খাটিতেছে। ভারতে এইরূপ ব্রিটিশ সম্পত্তির পরিমাণ বিশেষজ্ঞদের মতে একশত কোটি পাউণ্ড বা প্রায় ১৪ শত কোটি টাকার কাছাকাছি। খনি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্পের মালিকানা এবং বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালনার (ম্যানেজিং এজেন্সী) অধিকারে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর এদেশ হইতে পারিশ্রমিক বা লভ্যাংশ প্রভৃতির হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া যান। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত তাহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পাদন অপরিহার্য্য এবং সেক্ষেত্রে এদেশকে শোচনীয় বিদেশী শোষণের লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য।

ভারতে যে ব্রিটিশ সম্পত্তি জমিয়া উঠিয়াছে, সেগুলির

ভারতীয়করণ করিতে হইলে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারতসরকারকেই লইতে হইবে। অবশ্য যে বিদেশী আমলাতন্ত্র এতকাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে ভারতবাসীর এই স্বার্থসংরক্ষণ আশা করা বৃথা; তবে এখন কেন্দ্রে কংগ্রেসী অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আমরা অনতিবিলম্বেই আশা করিতেছি।

ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হইয়া এদেশের শাসনাধিকার পরিত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু এই সময় তাঁহারা বন্ধুত্ব দেখাইয়া নূতন জাতীয় সরকারের নিকট হইতে এদেশে কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা কায়েমী করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেনই। বলা বাহুল্য, যে ক্ষেত্রে তাঁহারা ভারতে নূতন আর্থিক স্বার্থ সৃষ্টি করিতে উৎসুক, সেক্ষেত্রে ভারতস্থিত লাভজনক ব্রিটিশ সম্পত্তি নষ্ট করিতে তাঁহারা একটুও আগ্রহশীল হইতে পারেন না। বাস্তবিক সম্প্রতি কমন্স সভার এক প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে ব্রিটিশ অর্থসচিব ডাঃ হিউ ডালটন পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, ভারতস্থিত কোন ব্রিটিশ সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরকরণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ব্রিটিশ সরকারের নীতি নয়।

অথচ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপূরক হিসাবে এই দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বিদেশী শোষণ হইতে ভারতবর্ষকে অবশ্যই মুক্ত করিতে হইবে। ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তি রক্ষায় ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ আছে, কাজেই উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়েও এই সম্পত্তি ভারতীয়করণের প্রশ্নে তাঁহারা মোটেই উৎসাহিত নন। বলা বাহুল্য, ভারতের জাতীয় সরকারের কিন্তু দেশের অর্থ-নীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এই সমস্যা উপেক্ষা করা চলিবে না। কংগ্রেস এখন কেন্দ্রে যে অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন, ইহার পরিণতিতে ভারতে পূর্ণ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। আমরা এই জাতীয় সরকারের নিকট হইতেই 'ভারতে বৈদেশিক মূলধন' সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আশা করিতেছি।

মিটিবে কি এ ক্ষুধা আমার

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ

বিশ্বভরা এতো শোভা—বিশ্বভরা অনন্ত বৈভব,
অমৃতের পুত্র আমি রিক্ত তবু থাকি চিরকাল,
অর্থহীন আনন্দের তারা শুধু তোলে কলরব,
ঐশ্বর্য্যের নগ্ন রূপ সম্মুখেতে নাচিছে ভয়াল।

যুগে যুগে ভ্রমি' আমি চিরন্তন ক্ষুধিত পথিক,
বুভুক্ষার কথা মোর চিরদিন লেখে ইতিহাস,—
আত্মার পরম তৃপ্তি তবু আজও মিলিল না ঠিক,
বিশ্বের সম্পদ রাশি শুধু মোরে করে পরিহাস।

বাহিরে পড়িয়া আছে প্রাণহীন নির্জ্জীব প্রকৃতি,
অন্তরে নাহিক তার জীবনের মধুর স্পন্দন,—
অচেতন বস্তুরাশি—চেতনার কুৎসিত বিকৃতি,
তাহাদের মাঝখানে আত্মা মোর করিছে ক্রন্দন।

সকলে ঘুমায়ে আছে—আত্মা মোর শুধু রহে জাগি,
যুগ-যুগান্তর ধরি' সাঙ্গ নয় তাহার সাধনা,

চেতনা সজাগ তার চির-ক্ষুধা সমাপ্তির লাগি',
জন্ম-জন্মান্তর ধরি' চলিয়াছে তারই আরাধনা।

ক্লান্ত আমি, রিক্ত আমি,—মনে মনে ভাবি শতবার—
সম্পদের মাঝখানে মিটিবে কি এ ক্ষুধা আমার?

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

নীহারিকা যখন আরম্ভ করে, যবনিকা আর সহজে পড়তে দেয় না। এ সভায় শুধু সে কবি নয়, বিদূষকও বটে। 'এনকোরের' আখরে ওর কাহিনী কীর্ত্তন সরস ভাবে আপনা থেকে এগিয়ে চলে। বন্ধুর বিবাহ তার মনে গল্প প্রবাহ জাগিয়ে দিল। সে বলে চলল, "আমাদের গাঁয়ের গোবর্দ্ধনদা দুবার বইয়ের বি-এতে 'ফেল' হবার পর বউয়ের বিয়েতে পাশ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। অথচ বাড়ী পাড়াগাঁয়ে হলেও বাড়ীর সবাই এম-এর আগে মেয়ে ঘরে আনবে না সেইরকমই ঠিক করে রেখেছিল। তবে বেচারার দোষই বা কি? দাদা হারাধন কলকাতায় চাকরী করে আর সস্ত্রীক থাকে। একে কলকাতার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া প্রেমে পড়তে চাওয়ার পক্ষে দিন দিনই অনুকূল হয়ে উঠছে, তায় ছোট্ট বাড়ীখানা আপাততঃ অবিরাম কপোতকূজনে ও নব প্রণয়োচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে আছে। তার তরঙ্গ যে আর একজনের বালুবেলায় সফেন হয়ে আঘাত করে যাচ্ছে তার খবর ওরা কেন রাখছে না। কিন্তু সে ত জল নয়, শুধুই ফেনা, তাতে ত মনে হেনা বা চামেলী ফুটাতে পারবে না। যাই হোক্‌, প্রেমে না পড়ুক প্রেমে পড়ার সঙ্গে প্রেমে সে বহুদিন থেকেই পড়ে আছে। পড়ায় আর অনুরাগ হচ্ছে না দেখে গোবর্দ্ধন বৈরাগ্যে মন দিল—অর্থাৎ নিজের খাওয়া দাওয়ার দিকে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলল।

দুষ্ট লোকে বলতে লাগল যে, ও এককালে ভেবেছিল যে একালে বিয়ে না করলেও প্রেম করা চলে এবং সেটাই উৎকৃষ্টতর, কারণ সে আগুনে তাপ আছে, দাহ নেই; সে ফুলে সৌরভ আছে, কণ্টক নেই। কিন্তু তার এক বন্ধু এ বিষয়ে বিশেষ একটা ধাক্কা মারাতে গোবর্দ্ধন আর সাহস করে এগিয়ে যেতে পারে নি। দুই তরুণ তরুণীতে ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম—একটা ফাল্গুন সন্ধ্যায় বিজনতার মধ্যে বন্ধু বাণী খুজে পেল। কণ্ঠে গদগদ ভাব এনে, প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে মধ্যযুগের নাইট আধুনিক যুগের নায়িকার কাছে প্রেম নিবেদন করল।

নাইট। তোমার, তোমার পদতলে আমি সারা পৃথিবী পেতে দিব আমার হৃদয়ের সঙ্গে। আমায় তুমি গ্রহণ কর।

নায়িকা। (মৃদুহাস্যে) আহা কি কথাই বললে। আমার পায়ের তলায় পৃথিবী ত এমনিই পাতা রয়েছে। তোমার যা যোগাড় করা দরকার, তা হচ্ছে মাথার উপর একখানি বাড়ী।

বাড়ী ও গাড়ী না সংগ্রহ হলে নারী জীবনে পদার্পণ করবেন না। সংসারের আত্মীয়পরিজনদের ভীড়ে তিনি নীড় রচনা করতে অনিচ্ছুক এবং অপারগ। বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে ঐ রূঢ় পরিচয়ে বন্ধুর আকাশকুসুম নাকি শুকিয়ে গেল এমন করে—যে সে আর ওপথ মাড়ায়নি। বড় বোনের ননদের স্বামীর শ্যালিকার কাছে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছিল যে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারবে তেমন মডার্ণ ছেলেই সে নয়।

যাই হোক্‌ ব্যাপার কিছু না বুঝতে পেরে—আর হারাধনের হারামণি ফিরে পাওয়ার মত অবস্থায় বুঝতে পারার কথাও নয় এবং বৌদি বাড়ীতে নূতন লোক, সে বুঝতে পারলেও বলতে পারে না—মাকে খবর দেওয়া হল। মা কলকাতায় এসেই তারস্বরে নানাবিধ প্রশ্নের পর ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চালসে-পড়া দৃষ্টি ও পান্‌সে-পড়া মনে তাঁর সহরপ্রবাসী সন্তানের মনের রং সহজে ধরা পড়বার কথা নয়। তাই অনেক কথাবার্ত্তার পর রাত্রে নির্জনে তিনি ছেলের শোবার ঘরে ঢুকে তাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন। বেসামরিক বাঙ্গালীর জীবনে যাকে বলে একেবারে "ফ্রন্টাল য়্যাটাক"।

যুদ্ধের যুগ তখনো আরম্ভ হয় নি। একজন কলকাতার কবি লিখেছিলেন "পথ চলতে ঘাসের ফুল"। কিন্তু কলকাতার লোক তখনো পথ চলতে সর্ষে ফুল দেখতে সুরু করে নি। পথে বিপথে—এবং বিপথেই বোধ হয় বেশী—বিজলী—দুষ্ট লোকে টিপ্পনী কাটে যে রণক্ষেত্রে ও হৃদয়ক্ষেত্রে

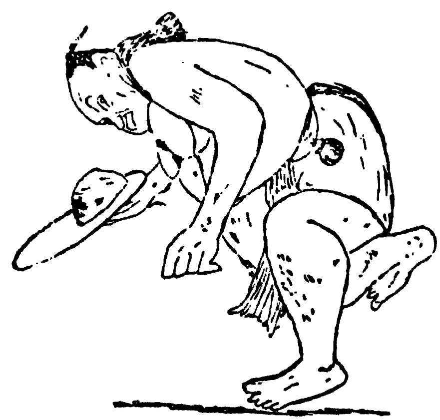
উভয়তই—মহারথীদের comrades in arms সঙ্গে নিয়ে —তাদেরই সঙ্গের প্রেরণায় হয়ত—উদ্দাম বেগে বিপুল রথ চালনা ক্ষুদ্র পদাতিকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তুলবে, একথা তখন কেউ ভাবতেও পারত না। অবশ্য হতভাগ্য পদাতিকের রথ—নিম্নেই যদি গতি হয় সেটাই তার উপযুক্ত স্থান—কারণ পদাতিকের স্বাভাবিক পরিণতি নির্ভর করছে পাদদেশের উপর, রথ বা রথীর তাতে কোন হাত নেই।

যদি যুদ্ধের যুগ আরম্ভ হওয়ার পর এ কাহিনী হত, তাহলে গোবর্দ্ধনের এত দুরবস্থা হত না। পথিকের ভীরু হৃদয় যুদ্ধের কল্যাণে বিজয়রথের প্রচণ্ড গর্জ্জনে বেপথুমান হতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রথ থেকে উৎসারিত বিবিধ কলধ্বনি—দুষ্ট লোকে বলে কেলি ধ্বনি—হৃদয়কে যুগপৎ উচ্চকিত ও পুলকিত করে চলে যায়, আর সঙ্গরটা রণভূমি বা রঙ্গভূমি সে বিষয়ে পরম ভ্রম হবার উপক্রম হয়েছে। রসিকজন বলেন "দুনিয়া রঙ্গ রঙ্গিলে বাবা"; কাজেই কলকাতার যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর রঙ্গভূমি দেখে থাকলে গোবর্দ্ধনও মার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারত— "মোর প্রেম নয়ত ভীরু, নয়ত হীনবল"।

নীহারিকার বন্ধুপুঞ্জ উৎসুক হয়ে ওর চারদিকে একটু ঘেষাঘেষি করে বসল। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল তারস্বরে, "তারপর? তারপর?" হেসে নীহারিকা বলতে আরম্ভ করল। এ হেন বিপদের মূলে মেয়েরা থাকলেও বিপদে নাকি আত্মনেপদী বুদ্ধিতে কুলোয় না; মেয়েদের স্মরণ করার ফলে যে বিদ্রোহ হয়, তা থেকে উদ্ধারের জন্য পুরুষদেরই শরণাপন্ন হতে হয় সেটুকু বুদ্ধিও গোবর্দ্ধনের ছিল। অনেক ভেবে চিন্তে সে এসে আমার পরামর্শ চাইল, বলল যে—তাকে কিরকম ভাবে মা কলকাতায় এলে কথাবার্তা চালাতে হবে তার—একটা মহলা দিয়ে দিতেহবে। গুরুজনরা নাটকের উপর চিরকালই খড়্গহস্ত; কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁরা তা দেখতে ভালবাসেন, কিন্তু নাটক আমাদের বেলাতেও যে শুধু না-টক নয়, বরং বিশিষ্ট ভাবে মিষ্ট, সেটা তাঁরা যৌবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যান। যা হোক, আমার অভিনয়টা শোন।

মা যখন আদর করে ছেলেকে ডাকেন 'ধন'—তা সে হারাই হোক, আর গোবরই হোক্—ছেলে তখনি তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। দুজন থাকলে দুজনই ছুটে আসে—কে আগে এসে আদরটা পাবে। কিন্তু গোবর্দ্ধন বলল যে, দেখ, মা যখন 'ধন' বলে ডাকবে এবার দাদা আমার সত্যি সত্যিই হারাধন হয়ে যাবে; আমাকেই যে ডাকা হচ্ছে সেটা বুঝতে কোন ভুল হবে না এবং এই মিঠে ডাকের পিছনের শক্ত ইঙ্গিতটাও বুঝতে ভুল হবে না। কিন্তু এই একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, মাকে আমার মনের ব্যথাটা একটু দরদ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। স্কুলের সামনে বিক্রী হয় যে আলুকাবলী তার খাট্টার মত আর কি। মানে একটু টক থাকবে, একটু ঝাল, একটু নুন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আলজিবটা যেন রসে সিক্ত হয়ে যায়। মানে এই একটু—এই যাকে বলে দরদ আর কি আমার উপর, বুঝলে নীহারিকা?

আমি ত খুবই বুঝলাম। কি ছেলেরে বাবা!



গুরুদেব বুট জুতো খেলা

আধুনিকদের বাবা একেবারে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে ওই ধন নামটাই চালিয়েছে। কারণ সে জানে যে একটা ছোট্ট মিষ্টি ডাক-নাম আধুনিকাদের মনে ঢোকার একটা পাশপোর্ট। ঠোঁটের সিন্দুর আর কপোলের আপেলী রং ফোটাবার গোলাপভস্মের সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদের মনে ঘুরতে থাকবে, ভ্যানিটী ব্যাগেই যেন ঘুরছে।

গোবর্দ্ধন। তুমি ত সবই জান নীহারিকা, ধর তুমি আমার মা আর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে—হ্যারে ধন, তোর কি হয়েছে বল ত?

নীহারিকা। দেখ সে সুবিধের হবে না। তোমার মা কি রকম বলবেন তা আমি কি করে জানব? তার

চেয়ে তুমি হও তোমার মা, আর আমি হই তুমি। আচ্ছা এস সুরু করা যাক্।

মা। হ্যারে ধন, তোর কি হয়েছে বল ত?

ধন। কেন মা? কিছুই হয় নি ত। এবারে পাশটা নির্ঘাতই করব দেখে নিয়ো।

মা। তোকে কি পাশের কথা শুধোচ্ছি ধন? সে পাশ ত আকাশের চাঁদ, একদিন পুর্ণিমে হবেই। আমি বলছি তোর নিজের কথা। এই ধর-না তোর বালিশটার কি ছিরি হয়েছে, বিছানাটার কি অবস্থা। আজকাল কি ঘুমানো ছেড়ে দিয়েছিস না কি?

ধন। কেন, আমার ঘুমের কসুর হল কোথায়? বিছানা ত পাতাই আছে সারা বছর ধরে। যদি আবার



নটরাজ নৃত্য

নতুন পাতা হয়, সে হয়ত হবে হালখাতার সময়। আমার কি আর শাদা ধবধবে নূতন চাদরে তোয়ালেতে বালিশ-ঢাকা বিছানার দরকার আছে? না, পানের বাটাটা রোজ পরিষ্কার করে মাজানোর দরকার আছে? কি-ই বা হবে তাতে? ভাগ্যিস ঘরে ফ্যান আছে। তাই হাত-পাখার দরকার নেই। আর দরকার হলেই বা কি করতাম? এক হাতে কতক্ষণ বাতাস করা যায়। নিজে হাতে নিজেকে বাতাস করলে ঘুমাবই বা কখন? তবে এটা ঠিক যে আমি ঘুমাই, কি আমার বালিশ ঘুমায় সে বোঝাই যায় না! শালগ্রামশিলার আবার শোয়া আর বসা। আমার ঘুম? সে ত হচ্ছে মাথার উপর বালিশ চড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

মা। আচ্ছা, ঘুম হচ্ছে না তবে একটু জবাকুসুম মালিশ করিস না কেন মাথায় দাদার মত। তাতে মাথাও ঠাণ্ডা থাকবে। তা ছাড়া ভাল করে চান করবি রোজ।

ধন। হ্যা, চান ত করতে হবেই। রোজই করছি। তা বাড়ীর চৌবাচ্ছায় জল আমার জন্য বাকী আছে কি না, তা আমার নিজেকে দেখে নেবার সময় হয় না। আর তোমার ওই জবাকুসুম—তা এ হাতে আর এ মাথায় মাখতে গেলে জগাখিচুড়ী পাকিয়ে যায় চুলে। দেরী হয়ে গেলে আবার রাস্তায় মুন্সিপালের কলের জন্য 'কিউ' করতে হতে পারে। তাই কোন রকমে সেই সাত সক্কালের শীতে কলতলায় দৌড়ে গিয়ে এই একটু নটরাজ নৃত্য করে আসি আর কি।

মা। হ্যাঁরে, নটরাজ নেত্যটা কি জিনিষ?

ধন। কেন? সেই যে যাকে বলে ওরিয়েণ্ট্যাল ডান্স। তার চান্স ত আমার মত লোক ছাড়া সকলের কপালে মেলে না। তা ছাড়া সেটা করাও খুব শক্ত। কারণ এ হচ্ছে চতুষ্পদী। আগে লোকে জানত দ্বিপদী নৃত্য, আর সপ্তপদী বিবাহ। কিন্তু নৃত্যটা একালে চতুষ্পদী, হাত পা দুই-ই চালাতে হয় কি না। আর বিবাহটা শুধু পরস্মৈপদীই দেখলাম এ পর্য্যন্ত।

মা। আচ্ছা, তা না হয় হল রসিক ছেলে কোথাকার। তারপর ভাল করে খাওয়া দাওয়া করিস না কেন? বৌমা বলছিল পাতের ভাত থাকে পাতে পড়ে, মুখের মধ্যে আর সরে না।

ধন। বৌদি ত বলবেই। আমায় কত ভাত দিল, কে পাত্ত পেড়ে দিল সে খবর ত সবাই রাখছে। আমার আবার খাওয়া! সে ত ঠাকুরের ফুটবল খেলা।

মা। সে কি আবার? ঠাকুর এর মধ্যে কি করল?

ধন। কেন, সেই ত সব করে। হঠাৎ যখন দেখি যে কলেজের সময় হয়ে যাচ্ছে—এক দৌড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে চলে আসি, ঠাকুর ভাত দাও। ঠাকুর তাড়াতাড়ি থালায় গোল করে ভাতের ফুটবল সাজিয়ে ফেলে, আর তার গায়ে মাথায় একটু ছিটেফোঁটা ডালের কাদা—মানে, বৃষ্টির দিন কি না। তার পরই থালাটা এক পেনালটী

কিকে ছিটকে ছুঁড়ে গোল করে দেয়। থ্রি চিয়ার্স ফর কটকবাগান।

*　　*　　*　　*

মাতা পুত্র সংবাদের এই বিবরণের পর মন্ত্রণামণ্ডলী ঐক্যমত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করল যে প্রদ্যুম্নের বিয়েটা করা একান্তই উচিত। তবে বিপদবান্ধব সমিতির পক্ষ থেকে কেশব একটা সংশোধন প্রস্তাব করিয়ে নিল যে, বাকী সভ্যরা কেহ ত্রিশের আগে বিয়ে করবে না। এ প্রস্তাবেরও একটী সংশোধনী করিয়ে নিল রাজীব যে, বিয়ে না হওয়া পর্যান্ত তার বয়সই ত্রিশ হয়ে উঠবে না।

(ক্রমশঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী একটি স্মরণীয় যুগ। এই শতাব্দীতেই আমরা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, রস নাটক এবং বহু হাস্যোজ্জ্বল প্রহসন সম্পদ্ লাভ করেছিলাম। প্রাণের যে প্রচুর স্পন্দনের পরিচয় এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়, অন্য যুগে তা'র তুলনা বিরল।

এ যুগে অনেক প্রতিভাবান্ কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক জন্মেছিলেন—যাঁদের ভাবসমৃদ্ধ রচনায় বাংলা সাহিত্য একটি চমৎকার রসরূপ লাভ করেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের এই যুগ্ম জ্যোতিষ্কের কৃতিত্বের উল্লেখ এখানে করবো না। কারণ তার আলোচনায় একখানি সমগ্র গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অন্য যে সব সাহিত্যরথী এই গৌরবময় যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁদের হাস্যরসের সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য সরস হয়ে রয়েছে এই প্রবন্ধে তাঁদের কথাই আজ সংক্ষেপে আলোচনা করবো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, রজনী কান্ত সেন প্রমুখ কবি ও নাট্যকারের কথা সকলেরই মনে পড়বে। তা ছাড়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বিখ্যাত পুত্রগণও এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। এঁরা সকলেই অল্পবিস্তর রসসৃষ্টি করে বাঙালীর জীবনকে সজীব ও সরস করে' তুলেছিলেন। এই শতাব্দীরই শেষ ভাগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র মারফৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়েও হাস্য রস পরিবেশনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য সমালোচনার রসশিল্প এখনও অপরাজেয় রয়েচে। 'সাহিত্য' যখন প্রতিদ্বন্দীরহিত মাসিকপত্রিকা ছিল, তখন সুরেশবাবুর সাহিত্য সমালোচনা পড়বার জন্তে লোক মাসের পর মাস উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো।

এই সকল কবি ও লেখকের রচনায় হাস্যরসের বেশ একটি ক্রম-পরিণতি দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে কবিওয়ালার গানে বা যাত্রার দলের সঙ্গে যে পরিহাস-রসিকতার চেষ্টা আমরা দেখি, তা তত মার্জ্জিত নয়। হয়ত একটু আদিম বা primitive, হয়ত কিছু অশ্লীল বা Coarse, কিন্তু লোকের মধ্যে হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা হিসাবে এদেরও অগ্রাহ্য করা চলে না। কবির গানের যে ধারা সে যুগে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, আমাদের বাল্যকালেও তার কিছু নিদর্শন আমরা পেয়েছিলাম। "কবির গুরু হরু ঠাকুর, ময়রা ভোলা, পাট্‌নী কাশীনাথ"—তার পরে এণ্টুনী ফিরিঙ্গি, রামবসু প্রভৃতিও ছিলেন। এঁদেরই আদর্শে যে কবির গান তাঁদের সাগরেদের সাগরেদেরা করেছেন, তা শোনবার সুযোগ আমার কিছু হয়েছিল। একটি দল হয়ত পুরুষের, অন্য দল স্ত্রীলোকের—একদল হিন্দুর আর এক দল মুসলমানের—এঁদের মধ্যে উৎকট অশ্রাব্য গালাগালিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় লোকে আনন্দই পেতো এবং প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে কখনও অসদ্ভাব হতেও দেখিনি। কিন্তু সে দিন চলে গেছে। এখন হাসির স্রোত আর অবাধে বইতে পারে না। সে সাদাপ্রাণের খোলা-হাসির যুগ আর নেই।

অশ্লীল হলেই যে অসুন্দর হবে, এমন কোনও কথা নেই। রসসৃষ্টির মধ্যে শিল্প যদি দানা বেঁধে ওঠে, তবে আর্ট হিসাবে তাকে রসোত্তীর্ণ বলে গণ্য করতে বাধা নেই, তা অশ্লীল হলেও। যাক্, আমরা সে স্তর বোধ হয় পিছনে ফেলে এসেছি—অর্থাৎ হাস্য রসকে উপভোগ্য করে' তুলতে হলেই যে তাকে অশ্লীলতার রসুন গন্ধে বাসিত করতে হবে এমন ধারণা সাহিত্য থেকে বিদায় নিয়েছে—এ কথা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—দুইয়ের সাহিত্য সম্বন্ধেই খাটে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে—অলঙ্কার-শাস্ত্র যেমন বলেছেন—হাসিরও তারতম্য আছে। রুচি ও সংস্কৃতি ভেদে হাসি উত্তম, মধ্যম ও অধম :এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। উত্তমের 'স্মিত হাস্য' মৃদু ও মধুর। অধমের উচ্চ হাস্যকে বলে 'অপহাসিত'—সেখানে সূক্ষ্ম রসবোধ নেই। মধ্যমের হাসিকে 'বিহাসিত' বলা যায়—অর্থাৎ উত্তম ও অধম হাসির মাঝামাঝি। সাহিত্যে হাস্যরসের পরিবেশনে এই ত্রিবিধ রূপেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

হাস্যরসের থেকে যে শুধু আনন্দের খোরাক পাওয়া যায়, তা নয় ;

এর দ্বারা সময়ে সময়ে যথেষ্ট উপকারও পাওয়া যায়। জীবনে যেখানে অসঙ্গতি বা গলদ আছে—এমন কি সমাজ জীবনে যে সব অন্ধকার গলি ঘুঁচি আছে, হাস্যরসের বুব ভাক্স (Bulls eye)—লণ্ঠনের আলো তার উপর ফেলে সংস্কারের পথ বাহির করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সব হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা অধিকাংশস্থলেই রূপ গ্রহণ করেছে এই বিদ্রূপ বা Satireএ। এই বিদ্রূপ অনেক সময়ে দুমুখো ছুরির মতো ছিল—একদিকে নিছক আনন্দ পরিবেশন; অন্যদিকে বাঙ্গালীর জীবনের গলদ নির্মূল করা। নবাগত সভ্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল জীবনে যে সব অসঙ্গতি, যা কিছু কুৎসিৎ বা বিসদৃশ রয়েছে। এক দিকে এই সভ্যতার ধাক্কায় যারা টাল সামলাতে পারেনি তাদের উচ্ছৃঙ্খল অনাচার, এবং প্রাচীন সংস্কারের দোহাই দিয়ে যারা ধর্মের নামে কদাচারের প্রশ্রয় দিত তাদের ভণ্ডামি দেখানো—এই যুগের রঙ্গরসের প্রচুর উপাদান যুগিয়েছিল।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাস, নববিবি বিলাস দূতীবিলাস লেখা হয়েছিল নব্য সভ্যতাকে বিদ্রূপ করে। এ শুধু দুদণ্ডের জন্য রঙ্গরস জোগাতে নয়, চঞ্চল সমাজ জীবনকে ভারকেন্দ্র স্থির করবার জন্যও এই। পাদ্রী লঙ্‌ বলেছিলেন নববাবুবিলাস সম্বন্ধে—One of the ablest satires on the Calcutta Babu. মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর "একেই কি বলে সভ্যতা" এই উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন। মাইকেলের অপর প্রহসনখানিও ঐ একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" কপট ভণ্ড বৈষ্ণববেশী পাষণ্ডের প্রতি বিদ্রূপ। মাইকেলের 'তুলসী বনের বাঘ' প্রবাদের মত হয়ে রয়েছে। মাইকেলের শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটকে যে 'বিদূষকের সন্নিবেশ, তাও হাস্যরসের উপকরণ যোগাবার জন্যে সন্দেহ নেই। কিন্তু সংস্কৃতের বড় বেশী অনুকরণ বলে' সার্থক হতে পারেনি। নির্বোধ পেটুক ব্রাহ্মণকে নিয়ে একালে আর রহস্য করা চলে না। তবে মাইকেল যে মৌলিকতা হারান নি, তা' পদ্মাবতীর বিদূষকচরিত্র থেকে কিছু বোঝা যায়! সেখানে রাজা এক গহন বনে স্বভাবতঃ ভীতু বিদূষককে "প্রতিধ্বনি" সেজে ভয় দেখাচ্ছেন।

মাইকেলের ন্যায় দীনবন্ধু মিত্রও সমাজের গলদ্‌ নিয়ে ব্যঙ্গরসের সৃষ্টিতে যথেষ্ট পটুতা দেখিয়েছেন। তাঁর বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক, সধবার একাদশী প্রভৃতি তথাকথিত হিন্দুসমাজের উপর satire বা বিদ্রূপে ভরা। বঙ্কিমবাবু সত্যই বলেছেন যে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা যে সব প্রহসন বা নাটক, আর্ট হিসাবে তার তেমন মূল্য দেওয়া যায় না। বাস্তবিক এসব সময়ের সহচর। কোনও একটি সময়ের বা যুগের জন্য যে রঙ্গরসের সৃষ্টি হয়, তা সেই যুগের সঙ্গেই অচল হয়ে পড়ে। তা' নইলে দীনবন্ধু হাস্যরসে যে ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, তা বঙ্গসাহিত্যের চিরদিনকার সম্পদ্‌ বলা যেতে পারে। নীলদর্পণের করুণ আর্ত্তনাদপূর্ণ কাহিনীতে তিনি আদুরীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাতেই তাঁর রসসৃষ্টিকুশলতা সপ্রমাণ হয়। বঙ্কিমবাবু নীলদর্পণকে রসোত্তীর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমার মনে হয় সধবার একাদশীতে নিমেদত্তের চরিত্রসৃষ্টি একজন প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের পরিচয় প্রদান করে। নবীনতপস্বিনীর হোঁদল কুৎকতে, কমলে কামিনীর বকেশ্বর, সধবার একাদশীর ঘটিরাম ডেপুটি দীনবন্ধুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দীনবন্ধু মাইকেলের ন্যায় দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। উপরন্তু মাইকেল যে সুযোগ পাননি দীনবন্ধুর তা ঘটেছিল। অর্থাৎ নানাপ্রকৃতির মানুষের সঙ্গে মিশে দীনবন্ধু লোকচরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার তুলনা নেই। সেই জন্য তাঁর চরিত্রগুলি বেশ realistic হতে পেরেছিল—মনে হয় সেগুলি যেন আমাদের চিরপরিচিত লোকের ফটোগ্রাফ। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যিক শিষ্য হিসাবে দীনবন্ধুর মধ্যে কিছু কিছু শ্লীলতার অভাব ঘটেছিল, কিন্তু একটি গুণ ছিল এই যে নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে বেমানান হয়নি একটু। হাস্যরসের একটি উপাদান অবশ্য অতিরঞ্জন, কিন্তু দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে সে অতিরঞ্জন অনেক সময় বাস্তব চরিত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজের উপর একপ্রস্থ বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। তাঁর 'বাজিমাৎ' কবিতায়' যে রসস্ফূর্ত্তি হয়েছিল, কি ভাষার দিক্‌ দিয়ে, কি ছন্দের দিক্‌ দিয়ে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই।

> বেঁচে থাকো মুখুজ্জের পো খেল্‌লে ভাল চোটে।
> তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবরে শালুক ফোটে

সাময়িক রঙ্গরস হলেও প্রয়োজনায় অতুলনীয়। মুখুজ্জের পোকে আমরা কবে ভুলে গেছি, কিন্তু হেমচন্দ্রের কবিতা ভুলতে পারি নি। এখানে ইতিহাস কবির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য।

সে কালে নব্য সমাজ বা ইয়ং বেঙ্গলকে ব্যঙ্গকরা কবি ও লেখকদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর আলালের ঘরের দুলালে যে সামাজিক নক্‌শা আঁকলেন, তা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। টেকচাঁদ দীনবন্ধুর মত একজন সত্যিকার পরিহাসপ্রিয় লোক ছিলেন। নিমচাঁদের চরিত্র যেমন দীনবন্ধুর হাতে ফুটেছে, ঠক চাচার চরিত্র তেমনি টেকচাঁদের অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি ভাষায় যেমন হাসিয়েছেন, তেমনি হাসিয়েছেন ঠকামিতে। টেকচাঁদের সামাজিক নক্‌শা কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে পূর্ণবিকাশ লাভ করেছিল। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রঙ্গরসে ভরপুর। স্থানে স্থানে একটু অশ্লীলতা দোষ থাক্‌লেও আর্ট হিসাবে চমৎকার। তাঁর বিদ্রূপের পিছনে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ভাবে থাক্‌লেও রসসৃষ্টি হিসাবে সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করেছে। তাঁর মহাপুরুষ, মরাফেরা', ভূতনামানো প্রভৃতি সত্যিকার রসসৃষ্টি হিসাবে অনবদ্য।

রসরাজ অমৃতলাল বসু কথায়, গল্পে ও প্রহসনে বাঙালীকে অনেক হাসির খোরাক দিয়ে গিয়েছেন। এমন মজলিসী লোক প্রায় দেখা যায় না। তাঁর বিবাহবিভ্রাট, তাজ্জব ব্যাপার প্রভৃতির রঙ্গরস সেকালে বাঙালীর মনোরঞ্জন করেছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষও হাস্যরসের পরিবেশনে অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর আবুহোসেন, বেল্লিক বাজার,

ব্যায়না কি ত্যায়সা প্রভৃতি বাংলার বিশেষ উপভোগের সামগ্রী হয়েছিল। তবে গিরিশবাবু ছিলেন কিছু গম্ভীর প্রকৃতির, আর অমৃতলাল ছিলেন হাল্কা সেই জন্তই বোধ হয় অমৃতলালই সেকালে মাৎ করে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে আর একজন নাট্যকারের অভ্যুদয় হলো—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সরকারী হাকিম, বিলাতে শিক্ষিত—তাঁর হাসি শুভ্র যুঁইফুলের মত ফুটেছিল গানে। কথা ও সুরের বিচিত্র সমাবেশ তিনি আধুনিক রুচির সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করে' যে সব হাসির গান রচনা করলেন, তাতে সে সময়ে দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। হাস্তরসে যে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ প্রাণ খুলে যোগদান করতে পারে, তা দ্বিজেন্দ্রলালই বোধ হয় প্রথম দেখালেন। তাঁর রস রচনা—পুনর্জন্ম, কল্কি অবতারও সার্থক হয়েছিল। কিন্তু প্রথম তাঁর নাম পড়ে গেল হাসির গানে। একজন কবি হাসির গানে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তিনি হচ্চেন কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন। এই দুইজন কবির হাসির গান তাদের নিজের মুখে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, গানে গানে তাঁরা বাঙ্গালার প্রাণে যে পুলক জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। উভয়ই ছিলেন অত্যন্ত পরিহাসরসিক, উভয়ই ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। রজনীকান্ত অক্লান্ত গায়ক, একটির পর একটি হাসির গান তিনি গেয়েই যেতেন; তাতে কারও ক্লান্তি বোধ হতো না। তাঁর 'বয়ের দর, বেহায়া বেহাই, কেরাণী জীবন প্রভৃতি হাসরসের খনি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই যুগে যথেষ্ট হাস্তরসের যোগান দিয়েছিলেন, তাঁর ভারত উদ্ধার প্রভৃতি সে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এখন থেকে হাস্তরস সত্যিকার মুক্তিলাভ করলো। লোককে, সমাজকে বা আচারকে বিদ্রূপ করে যে হাসি, সে হাসি সাময়িক প্রয়োজনের বশীভূত। অলঙ্কারশাস্ত্র বলেন, হাস্ত রসের বর্ণ শুভ্র। বস্তুতঃ কোনও প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের দাসত্বে যদি ছোপ ধরে, তবে তাকে উৎকৃষ্ট বলা যেতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ যুগের ইতিহাস এই দাসত্ব থেকে হাস্তরসের মুক্তির ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে। রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা প্রভৃতি হাস্তরসের পরিবেশনে একটা মুক্ত হাওয়ার সন্ধান এনে দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রের অলীক বাবু, স্বর্ণকুমারীর কৌতুক নাট্য প্রভৃতিতে এই স্বাধীন রঙ্গরসের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন দার্শনিক, কিন্তু রঙ্গরসের দিকে তিনিও যথেষ্ট মন দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে' শেষ করি:

ইচ্ছা সম্যক্ জগ দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু একি দৈবের শাস্তি॥
টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা না রহে দুঃখ জ্বালা।
বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(২)

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ২৬শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে যে বিবৃতি দেন, তাহাতে সত্যই এক নবভারতের আগমনীর বার্ত্তা শুনা গিয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারত এতাবৎকাল তাহার কোনও সম্পর্কের কথাই চিন্তা করিতে পারিত না। জগতের যুদ্ধ, শান্তি, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। ভারতের যাহা কিছু বক্তব্য ও কর্ত্তব্য তাহার সমস্তই নির্দ্ধারিত হইত লণ্ডন হইতে; এবং বৃটেন নিজের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ায় এখন হইতে সাত-সমুদ্র পারের লণ্ডন নগরীর পরিবর্ত্তে নয়াদিল্লী হইতে ভারতের মর্ম্মবাণী জগতের মাঝে প্রচারিত হইবে।

বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারতের কি ভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হইবে সে সম্বন্ধে পররাষ্ট্র বিভাগের সদস্য হিসাবে পণ্ডিত নেহরু জানান—মধ্যপ্রাচ্যে শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণের এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সহিত ভারতের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে! মিশর, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে শুভেচ্ছা মিশনের প্রতিনিধি হিসাবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে এবং ইউরোপের জন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননকে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ককে একজন ভারতীয় কনসাল এবং সাইগনে একজন ভাইস-কনসাল নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সহিত ভারতের পূর্ব্ব হইতেই একটি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত রহিয়াছে। এই সম্পর্ক শীঘ্রই নিজস্ব কূটনৈতিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আরও দৃঢ়তর করা হইবে। তাহা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় হাই-কমিশনার, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয় প্রভৃতি দেশে ট্রেড কমিশনার রহিয়াছেন। এই সকল পদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহে এবং অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহে কূটনৈতিক ও বাণিজ্য

সম্পর্কীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি ভারতীয় বৈদেশিক সার্ভিস সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। রাশিয়া ও ইউরোপের অপর দেশগুলির সহিতও ভারত সরকারের সম্পর্ক স্থাপন করা হইবে।

পণ্ডিত নেহরুর এই ঘোষণার পর ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া লীগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন, প্যারীর শান্তি সম্মেলনে রুশ দূতাবাসে রাশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মলোটভের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভবিষ্যতে ভারতের সহিত রাশিয়ার দূত বিনিময় এবং রাশিয়ার নিকট হইতে ভারতের জন্য খাদ্যসংগ্রহ বিষয় লইয়া শ্রীযুক্ত মেনন মিঃ মলোটভের সহিত আলোচনা করেন।

কংগ্রেস অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের দমন করিবার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের উপর বোমা বর্ষণ করেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু অন্তর্বর্তী সরকারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই আদেশ দিয়া উপজাতিদের উপর বোমা বর্ষণ বন্ধ করিয়া দেন। তিনি জানান, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া আমরা এই সীমান্তনীতি বিবেচনা করিব। ইহাদের সম্বন্ধে নীতি স্থির করিবার জন্য পণ্ডিত নেহরু শীঘ্রই উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিবার কথাও ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে তিনি আফগান সরকারের সহিত পরামর্শ করিবার কথা বলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের এই সকল উপজাতি ইংরাজদের এক সমাধানহীন সমস্যা। কোনরূপেই ইহারা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, অথচ ইহাদের বশে আনিবার জন্যও ইংরাজ সরকারের কোনও চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। পূর্ব্বে কংগ্রেস এই অঞ্চলে শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ করিতে চাহিলে ভারত সরকার তাহাতে বাধা প্রদান করেন। বর্ত্তমানে আবার এই সকল উপজাতিদিগকে কয়েকজন লীগপন্থী মিথ্যাভাষণের দ্বারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাতাইতে চেষ্টা করিলেও উপজাতিদের নেতা ইপির ফকির কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিই তাঁহার পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইংরাজ সরকার এতদিনের চেষ্টায় যাহাদের বশে আনিতে পারেন নাই, সেই সকল দুর্দ্ধর্ষ উপজাতিরা অন্তর্বর্তী সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সহজেই সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

৮ই সেপ্টেম্বর বেতার বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন—আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্বাধীন জাতিরূপেই আমরা যোগদান করিব এবং আমরাই আমাদের নীতি রচনা করিব। এই উক্তির সফল পরিচয় পাই, ১৭ই সেপ্টেম্বর প্যারিতে অনুষ্ঠিত জাতিপুঞ্জের স্বস্তি পরিষদে ভারতবর্ষ যখন তাহার স্বাধীন নীতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রথম বৃটেনের বিরুদ্ধে ভোট দেন। এই সঙ্গে ভারতের পক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ১৮ই সেপ্টেম্বর সরকারী ভাবে ভারতবর্ষে প্রথম বৃটিশ হাই-কমিশনারের নাম ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার দ্বারা ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে এতদিন যে সম্পর্ক ছিল তাহার পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যায়। স্বাধীন ভারতের প্রতি বৃটেনের নূতন সম্পর্কের প্রথম ধাপ বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মিঃ টোরেন্স সোন বৃটিশ হাই-কমিশনারের পদগ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই সকল ঘটনা হইতেই অন্তর্বর্তী সরকারের মর্য্যাদা ও ক্ষমতার অনেকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন মর্য্যাদা লাভ করিতে এই গবর্ণমেণ্টকে এখনও বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। তবে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা যদি সত্যই আন্তরিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বাধা সহজেই দূরীভূত হইবে।

এদিকে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ভারতের নানা স্থানে বিশেষ করিয়া কলিকাতার বুকে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে তাহার পর লীগ নায়কবৃন্দ বুঝিতে পারেন যে, এক শ্রেণীর লোক ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন ইহাতে মোটেই মিলে নাই। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে সরকারী খেতাব বর্জনের আবেদন কি ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। অনেক গোঁড়া লীগভক্তই খেতাবের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। এবার দিল্লীতে বসিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংক্রান্ত কার্য্যক্রমের নূতন করিয়া খসড়া প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। একজন লীগ নেতা জানান—এই সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ অথচ বে-আইনী হইবে। মোটামুটিভাবে সংগ্রামের তালিকা ঠিক হয়—(১) গণপরিষদ এবং আবশ্যক বোধে প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে পিকেটিং (২) খাজনা বন্ধ (৩) আয়কর বন্ধ (৪) ১৪৪ ধারা অমান্য। তবে এই তালিকা জিন্না-ওয়াভেল আলোচনার ফলাফলের অপেক্ষায় থাকে।

মিঃ জিন্না নয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া ভারত সরকারের নিয়মতান্ত্রিক পরামর্শদাতা স্যার বি. এন. রাওএর নিকটে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা পুনরায় পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে থাকেন এবং বড়লাটের নিকট হইতে আমন্ত্রণ পাইয়া ধৈর্য্যসহকারে বড়লাটের সহিত বার বার সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। আবার ভূপালের নবাবের প্রচেষ্টাতেও কয়েকবার নেহরু-জিন্না সাক্ষাৎকার ঘটে। মিঃ জিন্নার এই সকল সাক্ষাতের ফলে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদানের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। লীগ এবার যদি সত্যই মিলন মৈত্রীর আন্তরিক কামনা লইয়া কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস একা যে লক্ষ্যে চলিয়াছেন তাহা সহজেই আরও নিকটতর হইয়া পড়িবে। ১১।১০।৪৬



সাময়িকী

বিজয়াভিনন্দন—

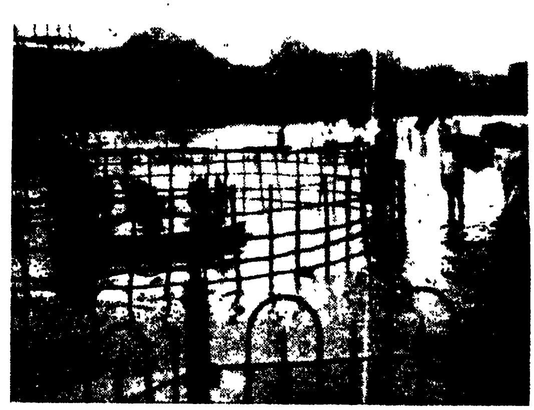
বৎসরান্তে মহাপূজার পর আমরা আমাদের স্বজনগণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। বাংলা ১৩৫৩ সাল একদিকে যেমন ডাক ধর্ম্মঘট,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির মত নানা দুর্য্যোগপূর্ণ—অন্য দিকে তেমনই বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উপর ভারতের শাসনভার অর্পণের মত আশার বাণী লইয়া সমাগত। এই মহা পরীক্ষার দিনে শক্তিময়ী মা যেন আমাদিগকে সকল সুখ ও দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিবার শক্তিদান করেন—সেই শক্তি যেন আমাদিগকে জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করে—সকলকে আজ সমবেত ভাবে আমরা সেই প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি।

সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ—

গত ১৬ই আগষ্ট মুসলেম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে যে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, আজ দুই মাস ধরিয়া তাহা চলিতেছে, বিরতির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। শক্তিহীন শাসক সম্প্রদায় দাঙ্গাকারীদের দমনে অসমর্থ হইয়া সংবাদ-পত্রসমূহের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সরকার অনুমোদিত সংবাদ ছাড়া অন্য সংবাদ প্রকাশ বন্ধের আদেশ করায় গত ১লা অক্টোবর হইতে সাত দিন কলিকাতার ২১ খানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ ছিল। জনগণের অনুরোধে ৮ই অক্টোবর হইতে সংবাদ-পত্রগুলি পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে। সাত দিন সংবাদ প্রকাশ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কলিকাতায় হাঙ্গামা কমে নাই—যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস—

গত ২রা অক্টোবর ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর ৭৮তম জন্ম-দিবস ভারতের সর্ব্বত্র উৎসবের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। গত ২৫ বৎসরেরও অধিককাল গান্ধীজি ভারতের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত করিয়া আজ ভারতকে মুক্তির দ্বারদেশে পৌছাইয়া দিয়াছেন। সে জন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ—তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা সম্মান করিয়া থাকে। আজও অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের কংগ্রেস দলীয় সদস্যগণের অনুরোধে গান্ধীজি দিল্লীতে বাস করিয়া শাসন কার্য্য পরিচালনে সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। এই পরিণত বয়সেও তাঁহার কর্ম্মশক্তি যে অসাধারণ, তাহার প্রমাণ সর্ব্বদা ভারতবাসী পাইয়া থাকে। সেজন্য সকল ভারতবাসীর সহিত এক সুরে আমরাও আজ প্রার্থনা করি, গান্ধীজি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে সর্ব্ব প্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করুন।



গত দারুণ বারিপাতের ফলে জলপ্লাবিত কলিকাতার হেদুয়া

ফটো—শ্রীপান্না সেন

কংগ্রেসে বামপন্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি—

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সদস্যগণকে কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকিবার অনুমতি দানের প্রস্তাবের পক্ষে ১৩৫ জন ও বিপক্ষে ৮০ জন সদস্য ভোট দিয়াছেন। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ নিজে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হইয়াও প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন। কংগ্রেসে যে বামপন্থীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা এই ভোট গণনার সংখ্যা দেখিয়াই বুঝা যায়।

হিন্দু মহাসভা—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হইয়া কিছু দিনের জন্য সভাপতির কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করায় ডাঃ বি-এস মুঞ্জে তাঁহার স্থানে সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একটি সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, প্রত্যেক হিন্দুর সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।



কলিকাতার পথ ঘাট জলমগ্ন—চিৎপুর এবং বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল। ফটো—শ্রীপান্না সেন

ব্ল্যাকপুলে মিঃ চার্চ্চিলের মায়াকান্না—

ব্ল্যাকপুলে অনুষ্ঠিত বৃটিশ রক্ষণশীলদলের সম্মেলনে মিঃ চার্চ্চিল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন···শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যেভাবে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, তাহাতে যে বৃটিশরাজ ভারতকে আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহাকে সেই বৃটিশের হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ভারতের শাসন ভার এরূপ লোকের উপরে চাপান হইয়াছে যাহারা বৃটিশের সহিত সম্পর্ক রাখার তীব্র বিরোধী। তাহারা ৪০ কোটী ভারতবাসীর প্রতিনিধিও নহেন। আশঙ্কা হয়, ইউরোপের ন্যায় আয়তনে বড় অথচ জনবহুল ভারতের বিপদ আসন্ন। মিঃ চার্চ্চিল আরও বলেন যে, ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে যে দুঃখকষ্ট ও রক্তপাত দেখা দিবে তাহার পরিমাপ করা যাইবে না। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এক কড়া জবাবে সংবাদপত্র মারফৎ জানাইয়া দিয়াছেন যে, উক্ত বক্তৃতা ঈর্ষাপ্রণোদিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। ইহাদ্বারা ভারতে অশান্তি এবং স্থায়ী সরকারগঠন ও একতার বিঘ্ন সৃষ্টির প্ররোচনা করা হইয়াছে। আমরা বৃটিশের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু যাহারা ভারতের স্বাধীনতায় বাধা প্রদান করিবে, তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহি না।

ব্রহ্মে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন—

গত সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ব্রহ্মদেশের গবর্ণর স্যার হুবার্ট র‍্যান্স ব্রহ্মের জাতীয় নেতাদের লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করিয়াছেন। দেশে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের ফলেই এই সরকার গঠনে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। মোট ১১ জন সদস্য লইয়া শাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ফ্যাসীবিরোধী-গণস্বাধীনতা সঙ্ঘের ৬ জন সদস্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ৫ জন সদস্য ইহাতে রহিয়াছেন। গরিলাযুদ্ধের নেতা ও বর্ত্তমান ব্রহ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব ইউ আউঙ্গ সান অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সহ সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই নূতন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের ন্যায় হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি ভারতীয় নেতারা মিঃ ইউ, আউঙ্গ সানকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ব্রহ্মের নূতন গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াই মিঃ আউঙ্গ

সান ভারতকে এক লক্ষ টন উদ্বৃত্ত চাউল প্রেরণের কথা বলিয়াছেন। ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষেরই একটি প্রদেশ ছিল। ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইলেও যাহাতে ব্রহ্মদেশের খনিজ ও কাষ্ঠ সম্পদ হাতে থাকে তাহার জন্যই রক্ষণশীল ইংরাজদল ইহাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন। ব্রহ্ম ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ে যে সকল বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে শীঘ্রই তাহা দূরীভূত হইবে এবং উভয়েরই মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক আদান প্রদান চলিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়।

গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিক অর্থদান ও সরক অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মিঃ কার্ভের জী ব্যাপী সাধনার ফলে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

মিঃ মির্জ্জা আমেদ বেগ—

মিঃ মির্জ্জা আমেদ বেগ জার্ম্মানীর বৃটীশ অধিকৃত অঞ্চ আটক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছে নেতাজী বসুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে তিনি ইউরো মুসলমানদের মধ্যে সংগঠন কার্য্য করিতেন। পরে তি আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন। তি



কলিকাতার পথে নৌকা—ল্যান্সডাউন রোড ও রাসবিহারী এভেনিউ সংযোগস্থল ফটো—বালিগঞ্জ ইউনাইটেড আর্টিষ্ট

ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয়—

ডাঃ ডি-কে কার্ভে ১৮৯৬ সালে পুণায় বিধবা আশ্রম ও সেই সঙ্গে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ক্রমে তাহা ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া সর্ব্বজনপরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বোম্বায়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি-জি খেরের সভাপতিত্বে এক উৎসব হইয়া গিয়াছে। অশীতিপর বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কার্ভে গত ৫০ বৎসরের ইতিহাস বিবৃত করেন। বোম্বাই

বলিয়াছিলেন—বৃটীশ অধিকৃত জার্ম্মান অঞ্চলে এখনও ২ জন ভারতীয় আটক আছেন, তাঁহাদের মুক্তির জন্য সকলে চেষ্টা করা উচিত।

ব্যবস্থা পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব—

গত ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষ কলিকাতার দাঙ্গার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে অনা প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার পক্ষে ৮৭ ও বিপ ১৩১ জন সদস্য ভোট দেওয়ায় তাহা গৃহীত হয় নাই।

সম্পর্কে পরিষদে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। পরিষদের শ্বেতাঙ্গ দল ও ৩ জন কম্যুনিষ্ট সদস্য কোন পক্ষে ভোট দেয় নাই। এংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যগণ মন্ত্রী পক্ষে ও একজন ভারতীয়-খৃষ্টান কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। মুসলমানগণ সকলেই মন্ত্রীপক্ষে ভোট দেন। মন্ত্রী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং তপশীলভুক্ত জাতির শ্রীদ্বারকানাথ বারুরী, শ্রীভোলানাথ বিশ্বাস ও শ্রীহারাণচন্দ্র বর্ম্মণও মন্ত্রীপক্ষে ভোট দিয়াছেন। মুসলমানগণের এরূপ একতা পরিষদে আর কখনও দেখা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটীর এক সভায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন ও উপযুক্ত সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আরও নানা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—একটিতে বলা হইয়াছে যে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতার গৃহে বাস করিতেছেন। অপরটিতে বলা হইয়াছে, সুভাষচন্দ্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইপির ফকীরের অতিথিরূপে তথায় বাস করিতেছেন।



জলস্রোতে কলিকাতার পথ—সাদার্ণ এভেনিউ ও ল্যান্সডাউন এক্সটেনসনের সংযোগস্থল ফটো—বালিগঞ্জ ইউনাইটেড

মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন—

আগামী নভেম্বর মাসে যুক্তপ্রদেশের মীরাট সহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। মীরাটে সেজন্য উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। যে বিরাট মণ্ডপ প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে দেড় লক্ষ লোকের স্থান হইবে! অভ্যর্থনা সমিতি ২০ হাজার সদস্য ও ৩ হাজার প্রতিনিধির বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘটের অবসান

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভারতের সকল শাখার কর্ম্মীরা তাঁহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য দেড় মাস কাল কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা পুনরায় কাজে যোগদান করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহাদের অভিযোগ দূর করার ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।



র্বত্ত সরকা র সা বৃন্দ

অন্তর্বর্ত্তী সরকার ও সুভাষচন্দ্র—

কংগ্রেস নেতারা অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্য পদ গ্রহণ করিয়া গত ৬ই সেপ্টেম্বর যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী তাঁহাদের অসাধারণ সাহসিকতায় বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। জনগণের অনুরোধে স্বরাষ্ট্র সদস্য সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল নেতাজী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই এখন সুভাষচন্দ্রের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনে বা আত্মপ্রকাশে কোন বাধাই থাকিল না। ভারতের সকল লোক তাঁহার আগমনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

প্রকাশ করিয়া থাকেন। খ্যাতনামা থাকসার নেতা আল্লামা মাসরিকী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা ঋষিকল্প খান আবদুল গফুর খাঁ, সীমান্তের উপজাতি নেতা ইপির ফকির প্রভৃতি সকলেই বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দেশবাসাকে জানাইয়া দিয়াছেন—কেহ যেন মিঃ জিন্নার আন্দোলনে প্রতারিত না হন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের হিন্দু মুসলমান জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র—তাঁহার ত্যাগ, তীক্ষবুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা প্রভৃতির জন্য দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করেন—সেজন্য ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মিঃ জিন্না তাঁহার সহিত কথা বলা বা তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করা অন্যায় বলিয়া মনে করেন। তথাপি একদল মুসলমান



গড়ীয়াহাটা রোডস্থ ম্যাণ্ডেভেলী গার্ডেনএর সম্মুখভাগে জলস্রোত ফটো—বালিগঞ্জ ইউনাইটেড আর্টিষ্টস্

বৃটীশ সরকার ও মিঃ জিন্না—

নিখিল ভারত মুসলেম লীগের সভাপতি ও নেতা মিঃ এম-এ-জিন্না যে বৃটীশ রক্ষণশীল দলের হাতে খেলার পুতুল হইয়া ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্ট করিতেছেন, সে কথা শুধু হিন্দুরা বলেন না, চিন্তাশীল মুসলমান নেতারাও

কেন যে মিঃ জিন্নার প্রতি এত দরদী, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন নহে।

ভারতের ব্যাণিজ্য নীতি—

অন্তর্বর্ত্তী সরকারের বাণিজ্য সচিব মিঃ সি-এচ-ভাবা গত ১৯শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নূতন সরকারের বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। যদি সে নীতি

অনুসরণ করিয়া কাজ চলে, তাহা হইলে কি বহির্বাণিজ্য, বা অন্তর্বাণিজ্য উভয়দিক দিয়াই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সকল অভাবই দূরীভূত হইবে।

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ—

বাঙ্গালা দেশের বহু জেলায় চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পাবনা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় গত



কলিকাতা লেকের নিকটে সাদার্ণ এভেনিউর প্লাবন দৃশ্য ফটো—বালিগঞ্জ ইউনাইটেড আর্টিষ্টস্

অতি বৃষ্টি ও ঝড়—

এ বৎসর বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে অতিবৃষ্টি ও ঝড়ের ফলে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আউস ধান্য কাটিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই—মাঠ জলে ভাসিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিতে আমন ধান্যেরও বেশ ক্ষতি হইয়াছে। আলু বাঙ্গালীর একটি প্রধান খাদ্য—আশ্বিনের প্রথম হইতেই আলুর চাষের আয়োজন করা প্রয়োজন—তাহাও বৃষ্টির জন্য সম্ভব হয় নাই। মাঠ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় তরি-তরকারীও অগ্নিমূল্য হইয়াছে। সাধারণ লোক যে কত দিক দিয়া বিপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভার লইয়া অনেক বড় বড় কথা শুনাইয়াছেন। কিন্তু সে কথা কি কোনদিন কার্য্যে পরিণত করা হইবে?

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতেই চাউলের মণ ৩০, ৪০ বা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এ অবস্থায় বহু লোক যে না খাইয়া মারা যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যে লীগ-মন্ত্রি-সভা দুই মাসেও কলিকাতার দাঙ্গা থামাইতে পারিল না, তাহা যে দেশবাসীর অন্নকষ্টের জন্য চিন্তিত হইবে, এমন মনে হয় না। নবগঠিত কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারও এখন পর্য্যন্ত এদিকে মন দেন নাই—কাজেই বাঙ্গালার দরিদ্র জনগণের পক্ষে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

এবারের দুর্গোৎসব—

১৬ই আগষ্ট বাঙ্গালা দেশে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে তাহা শেষ না হওয়ায় এবারের দুর্গোৎসবে বাঙ্গালা আনন্দ উপভোগ করিতে পারে নাই। পূজার পূর্ব্বেই যশোহর, বরিশাল প্রভৃতি

জেলায় বহু স্থানে দুর্বৃত্তগণ দেবী প্রতিমা নষ্ট করিয়া দিয়া দুর্গোৎসবে বাধা প্রদান করিয়াছে। কলিকাতার মত সহরেও মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে লোক দুর্গোৎসব করিতে সাহসী হয় নাই। সকল স্থানেই বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া লোককে ভয়ে ভয়ে প্রতিমা পূজা করিতে হইয়াছে। দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই—কাজেই পূজায় দীয়তাম্‌, ভুজ্যতাম্‌-এর কোন ব্যবস্থা করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। মা যে আসিয়াছিলেন, লোক তাহা অনুভব করিতেও পারে নাই।

শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত

খ্যাতনামা কাগজ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত সম্প্রতি ভারত



শ্রীমাণিকলাল দত্ত

গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা বিভাগ হইতে নির্বাচিত হইয়া জার্মানীতে কাগজ শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯৩৮ সালে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কাগজ প্রস্তুত ও মুদ্রণ শিল্প সম্বন্ধে উপাধি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় বহু বড় বড় কারখানা ও শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্সের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে কাগজ শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পর তিনি নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের কারখানাগুলিও দেখিয়া আসিবেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

রাণাঘাটে মেজর-জেনারেল—

গত ১৩ই জুলাই রাণাঘাটে স্পোর্টিং এসোসিয়েসনের সাধারণ বার্ষিক সভায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন। তাঁহার সহিত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারাও ছিলেন! শ্রীযুক্ত হেমন্ত বসু ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার স্থানীয় এসোসিয়েসনের সভ্যদের স্বাস্থ্য ও পীড়াকৌতুক দেখিয়া



রাণাঘাট স্পোর্টিং এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক মেজর জেনারেল এ-সি চ্যাটার্জ্জীকে সম্বর্দ্ধনা

মুগ্ধ হন। মেজর-জেনারেল দেশের প্রত্যেক নর-নারীকে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন কাজে অগ্রসর হইতে বলেন ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার নিয়ম বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য শ্রীযুক্ত পি-এচ্‌ পটবর্দ্ধন মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া পদত্যাগ করায় কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেতন নির্ণয়—

বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদের সদস্যগণ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা মোটর গাড়ী ও গৃহ ভাড়া সমেত

মাসিক ১৫ শত টাকা বেতন লইবেন। পূর্ব্বে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ বার্ষিক ৬৬ হাজার টাকা বেতন পাইতেন।

অন্ধ ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কলিকাতা কালীঘাট ২৯ রসারোডের নিখিল ভারত অন্ধ আলোক নিকেতনের ছাত্রী শ্রীমতী প্রতিভা বাগচী এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতে আর একজন মাত্র অন্ধ ছাত্রী ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল। তিনি কলেজে প্রবেশ করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করিবেন।



শ্রীমতী প্রতিভা বাগচী

সিংহরায় সভাপতিরূপে, মিঃ আজিজল হক, রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্র মৈত্র, সি-মর্গান, সতীশ সেন প্রভৃতি নির্ব্বাচনের পর তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ—

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ দীর্ঘ ৩১ বৎসরকাল ভারতের বাহিরে থাকিয়া গত ৯ই আগষ্ট জাপান হইতে মাদ্রাজে আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপে যাইয়া শত্রুদলে যোগদান করায় এতদিন তাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আসার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ১৯১৫ সালে তিনি কাবুলে এক অস্থায়ী ভারত সরকারও গঠন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া বৃন্দাবনে প্রেম মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে নারী শিক্ষাশ্রম—

ভারতীয়দের প্রতি চীন জাতির সহানুভূতির নিদর্শন-স্বরূপ চুংকিএর চীনভারত সংস্কৃতি সমিতি শান্তিনিকেতনে একটি নারী শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। অল্পবয়স্কা নিঃস্ব নারীদিগকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঐ আশ্রমে প্রদত্ত হইবে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মাসিক তিন হাজার টাকা দান করিবেন।



রাজবন্দীদের মুক্তি প্রার্থনায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরাট জনতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

উচ্চতর সভার ডেপুটি সভাপতি—

গত ১৩ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক (উচ্চতর সভা) সভায় মিঃ আবদুল হামিদ চৌধুরী সভার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সার বিজয়প্রসাদ

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-সাহিত্য—

দিল্লীবাসী শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস মহাশয়ের চেষ্টায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তথায় বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক আলোচনার জন্য অর্থব্যয় ও ব্যবস্থা করিতে সম্মত

হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় নভেম্বর মাসে সেজন্য দিল্লীতে গমন করিবেন।

সাহিত্যিকের দান—

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ৮৪তম জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য এবার পূর্ণিয়া হইতে জন্মভূমি দক্ষিণেশ্বরে (২৪ পরগণা) আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের অনুরোধে



ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক বিশাল জনসভায় ডাক তার টেলিফোন ও আর-এম-এসের ধর্ম্মঘটীদের মিলন ফটো—শ্রীপান্না সেন

গণপরিষদে ডাক্তার জয়াকর—

গণপরিষদের নির্ব্বাচনের সময় বোম্বায়ে খ্যাতনামা ডক্টর মুকুন্দরাম রাও জয়াকর বিলাতে ছিলেন। সম্প্রতি বোম্বায়ে পরিষদের একটি সদস্য পদ খালি হওয়ায় ডাক্তার জয়াকর বিনা বাধায় গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নিজ বসতবাটী, তৎসংলগ্ন জমী, পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থানীয় 'রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী'কে দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণও তাঁহাদের অংশ দান করিয়াছেন। কেদারবাবু পূর্ণিয়ায় তাঁহার দৌহিত্রগণের নিকট থাকেন। তাঁহার মত দরিদ্র সাহিত্যিকের এই দানের তুলনা নাই।



কলিকাতা রেডিও অফিসে ধর্ম্মঘটে পুলিস
ফটো—শ্রীপান্না সেন

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের

কার্য্যালয়ের সম্মুখে ছাত্রী পিকেটার্সদের প্রতি পুলিসের অনাচার

ফটো—শ্রীপান্না সেন





নূতন দিল্লীর নিখিল ভারত চিত্র ও শিল্প সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাপনায় এক চিত্র প্রদর্শনীতে বড়লাট ও সার উষানাথ সেন

ধর্ম্মঘটী টেলিফোন মহিলা কর্মীবৃন্দ

ফটো—শ্রীপান্না সেন





মুক্ত রাজবন্দীগণ

উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে) নলিনী দাস (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুলি চালান মামলা) গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা) নিরঞ্জন সেন (রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটির সম্পাদক) অনন্ত সিং (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা)। দণ্ডায়মান (বাম হইতে দক্ষিণ) বিরাজ দেব (ইলা খোলা ডাকাতি মামলা), সুখেন্দু দস্তিদার (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা), সুনীল চট্টোপাধ্যায় (ওয়াটসন গুলি মারার মামলা) হেম বক্সী (রংপুর ষড়যন্ত্র) প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী (বাথুয়া ডাকাতি মামলা) আশুতোষ ভরদ্বাজ (কোটালীপাড়া গুপ্তচর হত্যা মামলা) মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী (বাপুয়া ডাকাতি মামলা) কামাখ্যা ঘোষ (বার্জ্জ হত্যা মামলা) সহায়রাম দাস ও অন্নদা গুপ্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা। ফটো—শ্রীপান্না সেন

শোক-সংবাদ

পরলোকে ভাওয়াল সন্ন্যাসী—

ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় গত ৪ঠা আগষ্ট শনিবার ৬৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলের মামলায় তিনি জয়লাভ করিয়াছেন—কিন্তু তজ্জন্য আনন্দপ্রকাশের সময় পান নাই। বহু বৎসর সন্ন্যাসী থাকার পর তিনি গৃহে ফিরিলে যে মামলা হইয়াছিল, তাহা আইনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মাত্র কয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি আবার বিবাহ করিয়াছিলেন।

পরলোকে এচ্-জি-ওয়েলস্—

খ্যাতনামা বিলাতী লেখক মিঃ এচ্-জি ওয়েল্স গত ১৩ই আগষ্ট লণ্ডনে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্কুলের শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন ও পরবর্ত্তীকালে গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

পরলোকে শশিভূষণ ঘোষ—

রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক আচার্য্য শশিভূষণ ঘোষ সম্প্রতি ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এম-এ পাশ করিয়া তিনি ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধর্ম্মিণীর শিষ্য ছিলেন। রাঁচীর বিদ্যালয় সর্ব্বজনবিদিত।

পরলোকে সার জেম্স জীন্স—

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদ সার জেম্স জীন্স ৬৯ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে পরলোকগমন

করিয়াছেন। তিনি স্বাধীন ও নির্ভীক চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জুবিলী উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'রহস্যময় জগত' গ্রন্থ সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ।

পরলোকে জ্যোতিষচন্দ্র গুহ—

খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী ও ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা জ্যোতিষচন্দ্র গুহ ৬ই জুলাই শনিবার কলিকাতা ১১৮



জ্যোতিষচন্দ্র গুহ

বিবেকানন্দ রোডে ৪০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকায় শিক্ষালাভের পর কলিকাতায় আসিয়া ১৯৩০ সালে এম-এ ও ১৯৩১ সালে বি-এল পাশ করেন। তিনি ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন। ১৯৪২ সালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী দুর্গে লইয়া গিয়া তাঁহার শরীরের উপর অত্যাচারের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

পরলোকে কিশোরীমোহন চৌধুরী—

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকিল ও রাজনীতিক নেতা কিশোরীমোহন চৌধুরী গত ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ৯০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। রাজসাহী সহরের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল এবং এক সময়ে ৮০জন ছাত্র



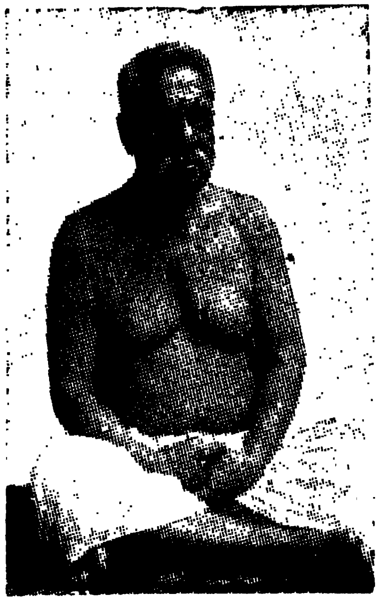
কিশোরীমোহন চৌধুরী

তাঁহার রাজসাহীর গৃহে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিত। তিনি বহু বৎসর রাজসাহী উকিল সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান।

পরলোকে গোষ্ঠবিহারী দে—

ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী ও ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের পরিচালক গোষ্ঠবিহারী দে গত ১১ই শ্রাবণ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ, ভগবদ্ভক্ত ও ত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, সৌজন্য, বদান্যতা, ক্ষমশীলতা এবং ধীরতার জন্য, যাঁহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আন্তরিক ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে "প্রিণ্টার্স গাইড" বইখানি সুধী-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। অল্পদিন হইল যুবকবৃন্দকে সহজে ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুদ্রণ-কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায়

ইষ্টার্ণ স্কুল অফ প্রিন্টিং নামে যে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি তাহার প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন।



গোষ্ঠবিহারী দে

পরলোকে কালিদাস চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতা সিটি কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক কালিদাস চক্রবর্ত্তী তাঁহার যাদবপুর কলোনীস্থ বাটিতে গত ৮ই ভাদ্র রবিবার টাইফয়েড্ রোগে ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২৯৬ বঙ্গাব্দে ৩রা ফাল্গুন রাজসাহী জেলান্তর্গত নাটোর মহকুমার অধীন মাঝগ্রাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপনা নৈপুণ্যে তিনি তাঁহার ছাত্রমহলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পরলোকে সার হাসান সুরাবর্দ্দী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার সার হাসান সুরাবর্দ্দী গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পরিণত বয়সে কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিকেল স্কুলে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ই-বি-রেলের চিফ মেডিকেল অফিসার রূপে কাজ করিয়াছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তাঁহাদের বংশ বিদ্যা ও আভিজাত্য-গৌরবে খ্যাত। তাঁহার ভ্রাতা পরলোকগত অধ্যাপক সার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী ও ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার জাহিদ সুরাবর্দ্দীর নাম সুপরিচিত। বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী সার হাসানের ভ্রাতুষ্পুত্র।

পরলোকে কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

বিগত ২৬শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পিতা গৈপুর নিবাসী পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাঁচদিন সর্দ্দি জ্বরে ভুগিয়া ৯৫ বৎসর বয়সে নিজ বসত বাটীতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।



পণ্ডিত কান্তিচরণ ভট্টাচার্য্য

বাংলার ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পল্লী অঞ্চলে মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত দৈহিক শক্তি না হারাইয়া ইঁহার ন্যায় প্রায় শত বৎসর সুস্থ চিত্তে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সাধারণ বাঙালী-সমাজের মধ্যে দৃষ্টান্ত বিরল। ইনি পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তত্ত্বদর্শী এবং তন্ত্র সাধক ছিলেন।

রুমী ও রামানুজ

ডক্টর রমা চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন্) এফ্-আর-এ-এস্-বি

বিখ্যাত পারসিক সূফী মরমী-কবি রুমীর নাম সর্ব্বজনবিদিত। তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধরাধাম ধন্য করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জালাউদ্দীন্ মুহাম্মদ্। কিন্তু তিনি রুম্ অথবা এশিয়া-মাইনরনিবাসী ছিলেন বলিয়া 'রুমী' নামেই সমধিক পরিচিত। রুমী রচিত "মসনবী" ও "দিওয়ান্" জগৎপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। রুমীর কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান্ প্রবন্ধে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধেই কেবল কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রুমীর মতে, ঈশ্বর নির্গুণ নহেন, সগুণ ও সর্ব্বগুণোপেত। প্রাণ, বল, জ্ঞান, প্রেম ও করুণা তাঁহার প্রধান গুণাবলী। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে তাঁহার স্বরূপ ও অসংখ্য গুণাবলীর পূর্ণ ধারণা অসম্ভব। বস্তুতঃ, বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরজ্ঞানের আশা বৃথা। কারণ, প্রথমতঃ সাধারণ বিচারবুদ্ধি কেবল দেশকালগত পার্থিব বস্তু বিষয়েই ধারণা ও জ্ঞানলাভে সমর্থ; কিন্তু যাহা দেশাতীত, কালাতীত ও অপার্থিব, তাহা বুদ্ধিরও অতীত। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিজনিত জ্ঞান সাপেক্ষ জ্ঞান মাত্র; অর্থাৎ, একটী বস্তুকে জানিতে হইলে তাহাকে অপরাপর বস্তুর সহিত তুলনা করিতে হয়, যথা অন্ধকারের সহিত তুলনা না করিলে আলোক সম্বন্ধে জানা যায় না। কিন্তু সর্বব্যাপী, একমেবাদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বাহিরে এমন কিছুই নাই যাহার সহিত তাঁহার তুলনা করা চলে। তৃতীয়তঃ, বুদ্ধি স্বয়ংসৃষ্ট পদার্থ মাত্র, কিরূপে ইহা স্রষ্টাকে জানিবে? চতুর্থতঃ, বুদ্ধির চক্ষুর বক্রতা তাহাকে কেবল দ্বৈত দর্শনেই বাধ্য করে—অদ্বৈত জ্ঞান তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। অতএব, বুদ্ধিবিচারশক্তি পারমার্থিক তত্ত্বোপলব্ধিতে কেবল যে অপারগ তাহাই নহে, বাধাস্বরূপও বটে। বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলয় হইলে, হৃদয় পরমেশ্বরের আলোক দ্বারা আলোকিত হয় এবং সেই আলোকেই তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। অতএব রুমীর মতে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ হৃদয়প্রসূত, মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি-প্রসূত নহে।

সনাতন ইস্লাম ও অন্যান্য বহু সূফী সম্প্রদায়ের মতে জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ মাত্র। কিন্তু রুমীর মতে, আত্মা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, অজ। আত্মা কেবল নিত্যই নহে, ভেদশূন্যও। আত্মায় আত্মায় পরস্পর ভেদ ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র—প্রকৃতপক্ষে আত্মা স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। ভেদের অস্তিত্ব পার্থিব জগতেই কেবল সম্ভব, কিন্তু অপার্থিব নিত্য আত্মায় ভেদের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। রুমী বলিয়াছেন যে যেরূপ বিভিন্ন গবাক্ষাভ্যন্তরবর্তী সূর্য্যরশ্মি, বিভিন্ন দীপাভ্যন্তরবর্তী আলোকশিখা, এবং বায়ুতাড়িত বিভিন্ন তরঙ্গাবলী আকারতঃ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, স্বরূপতঃ অভিন্ন—সেইরূপ বিভিন্ন দেহধারী মানবসমূহ আকারতঃ ভিন্ন মাত্র, স্বরূপতঃ নহে—যেরূপ গবাক্ষ দ্বারা এক সূর্য্য সদৃশ এক ও অভিন্ন আত্মা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। আত্মা পৃথিবীভুক্ত হইলেও পার্থিব জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; দেহ সংশ্লিষ্ট হইলেও শুদ্ধ ও মুক্ত। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক দুঃখ প্রভৃতি দেহ মনেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। কিন্তু আত্মা ভ্রমক্রমে সেই সকল গুণ আত্মায় আরোপ করিয়া অশেষ দুঃখভাগী হয়। অতএব দেহমনের সহিত আত্মার ঈদৃশ ভ্রান্ত অভেদকরণই সকল দুঃখের মূল কারণ। রাত্রিকালে নিদ্রামগ্ন জীবের আত্মা ক্ষণকালের জন্য দেহমন শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া শুদ্ধস্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্ত কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতেও পার্থিব অবস্থা ও দেহমনের ধর্ম্ম দ্বারা ক্লিষ্ট হন না।

বর্ত্তমান অবস্থায় আত্মা জড় জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও জগৎ আত্মারই নিম্নতম অবস্থা মাত্র। রুমী জগৎকে বিশ্বচরাচররূপ দর্পণের পশ্চাদ্ভাগ ও আত্মাকে তাহার সম্মুখভাগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, জড়জগৎ সম্পূর্ণরূপে প্রাণ ও জ্ঞানহীন নহে, প্রাণ ও জ্ঞানের নিকৃষ্ট, নিম্নতম, অনভিব্যক্ত অবস্থা মাত্র। রুমী জাগতিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদের প্রবক্তা করেন। তাঁহার মতে, আত্মা ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রারম্ভে আত্মা জড়রূপ ধারণ করে, এবং অগ্নি, জল, বায়ু ও মেঘরূপে বিরাজমান থাকে। তৎপরে সে ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদ্, জীবজন্তু ও মানবরূপ পরিগ্রহ করে। এইরূপে, রুমীর মতে জগতে ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছে—জড়বস্তু, উদ্ভিদ্, পশুপক্ষী ও মানব। প্রতি ক্ষেত্রে নিম্নস্তরটী উচ্চতর স্তর দ্বারা উপভুক্ত হইয়া সেই উচ্চস্তরে উন্নীত হইতেছে। যথা, জড়বস্তু উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া উদ্ভিদরূপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিলে সেই রস মৃত্তিকাস্বরূপ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের অংশরূপে পরিণত হয়। এইরূপে উদ্ভিদ্ জীবজন্তু কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া জীবরূপ ধারণ করে। অর্থাৎ, অশ্বোপভুক্ত তৃণাদি অশ্বের শরীরের অংশরূপে পরিণত হয়। পরিশেষে, মানবোপভুক্ত জীবজন্তু মানবরূপ ধারণ করে। এইরূপে, জড়বস্তু হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ হইতে জীবজন্তুতে, জীবজন্তু হইতে মানবে প্রাণ ও জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হইতেছে। কিন্তু ইহাই বিবর্ত্তনের পরিসমাপ্তি নহে। মানবও পুনরায় দেবদূতত্ব এবং পরিশেষে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট। মানব স্বীয় সাধনা বলে দেবদূতসদৃশ গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়া দেবদূতরূপ ধারণ করে এবং সেই অবস্থা হইতে অবশেষে ঈশ্বরস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব জড়বস্তু, উদ্ভিদ্, জীবজন্তু, মানব, দেবদূত ও ঈশ্বর—ইহাই ক্রমবিবর্ত্তনের ক্রমোচ্চ ছয়টী স্তর। সুতরাং রুমীর মতে, জগৎ অপারমার্থিক হইলেও মিথ্যা নহে—জগতের ভিতর দিয়াই জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলিত হয়।

রুমীর মতে, ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলনই মানবের চরম লক্ষ্য। এই

মিলনের দুইটী দিক্—ধ্বংস (ফানা) ও স্থিতি (বাকা)। "ধ্বংস" অর্থ মানবের স্বরূপ ধ্বংস নহে, মানবোচিত গুণের বিলয় মাত্র। "স্থিতি" অর্থ ঈশ্বরোচিত গুণমণ্ডিতরূপে ঈশ্বরেই স্থিতি। সুতরাং, মুক্তিকালে জীবাত্মা গুণতঃ পরমাত্মার সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ ভিন্নই থাকে। রূমী এস্থলে বহু উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। যথা—অঙ্গ ও অঙ্গী, দীপ বা তারকা ও সূর্য্যালোক, লৌহ ও অগ্নি। অঙ্গ অঙ্গী হইতে গুণতঃ অভিন্ন—কারণ অঙ্গের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া অঙ্গীর গুণই অঙ্গের গুণ—কিন্তু স্বরূপতঃ ভিন্ন। পুনরায় প্রভাত সূর্য্যালোকে দীপ ও তারকা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাদের ভাস্বরতা গুণ সূর্য্যের ভাস্বরতা গুণে বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদের স্বরূপ বা অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কারণ যদি কেহ দীপোপরি বস্ত্রখণ্ড নিক্ষেপ করে, তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়,—ইহা দীপের স্বতন্ত্র অস্তিত্বসূচক। এইরূপে, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত লৌহ অগ্নির উষ্ণতা, রক্তবর্ণ প্রভৃতি গুণপ্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অগ্নি স্বরূপত্ব লাভ করে না। সমভাবে মুক্ত, ঈশ্বরসম্মিলিত জীব ঈশ্বরের গুণাবলী প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীবস্বরূপ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরস্বরূপ লাভ করে না। অতএব, মুক্ত জীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, গুণতঃ অভিন্ন। এই মতানুসারে, মুক্ত জীবগণও গুণতঃ পরস্পর অভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ ভিন্ন। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রূমীর মতে জীবগণ আপাততঃ আকারতঃ ভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং এই বিষয়ে রূমীর মত স্ববিরুদ্ধ। মুক্তজীবের অবস্থা সম্বন্ধেও রূমীর রচনায় মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। তাঁহার কোনও কোনও উদাহরণ ও কবিতা পাঠে ইহাও মনে হয় যে, তাঁহার মতে, মুক্তজীবের স্বরূপও কেবল গুণই নহে, ঈশ্বরস্বরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যথা, তিনি বলিয়াছেন যে, একবিন্দু জল যেরূপ সীমাহীন সমুদ্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ মুক্তজীবও ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যায়। যাহা হউক, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভিন্নত্ব ও গুণতঃ অভিন্নত্বই সাধারণভাবে রূমীর মত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

রূমীর মতে একমাত্র প্রেমই ঈশ্বর ও মানবের মিলন সেতু। ঈশ্বর বুদ্ধিলভ্য নহেন, কারণ দ্বৈতদর্শী বুদ্ধি ঈশ্বর ও জীবের একত্ব উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। কিন্তু একমাত্র প্রেমই ঈদৃশ উপলব্ধির সাক্ষাৎ কারণ। প্রেম হৃদয়জ প্রত্যক্ষ অনুভব, মস্তিষ্কজ পরোক্ষ জ্ঞান নহে।

রূমীর সহিত বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের প্রধান প্রবর্ত্তক রামানুজের কিয়দংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রামানুজের মতেও ব্রহ্ম সগুণ—সর্ব্বকল্যাণগুণমণ্ডিত ও সর্ব্বহেয়গুণশূন্য। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের গুণ, অংশ, কার্য্য ও শক্তিরূপে ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য ও সত্য, কিন্তু ব্রহ্মের অধীন ও অন্তর্গত। অতএব রামানুজ ত্রিতত্ত্ববাদী। তাঁহার মতে—ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ, এই তিন তত্ত্ব। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের কার্য্যরূপে ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু গুণতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। জীব ও জগৎ পরস্পর চিরভিন্ন। প্রাণ ও জ্ঞান জীবেরই ধর্ম্ম, জগতের নহে। কিন্তু রূমীর মতে জীব জড়জগৎ হইতেই ক্রমবিবর্দ্ধিত, এবং জগতেও প্রাণ ও জ্ঞান নিহিত আছে। রামানুজে ক্রমবিবর্ত্তনবাদের প্রপঞ্চনা নাই এবং তিনি জগতের সজীবত্বও স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জীব ও জগৎ যথাক্রমে ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ শক্তির বিকাশ, এবং উভয়েই ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও ভিন্নস্বরূপ। এই বিষয়ে রূমী ও রামানুজ ভিন্নমত।

মুক্তি সম্বন্ধে কিন্তু উভয়ের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। রূমীর মতে মুক্তজীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ ভিন্ন, গুণতঃ অভিন্ন; রামানুজের মতে, মুক্তজীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, গুণতঃ ভিন্ন। কিন্তু এই পার্থক্য বস্তুতঃ শব্দগত মাত্র, অর্থগত নহে। প্রথমতঃ, রূমীর মতে, মুক্তজীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে না, কারণ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুর গুণতঃ অভিন্নতা ও মিলন সম্ভবপর নহে। অতএব, মুক্তজীব ঈশ্বরস্বরূপরূপে ঈশ্বর হইতে অভিন্নস্বরূপও নিশ্চয়। পুনরায়, রামানুজের মতে, মুক্তজীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন হইতেই পারে না, কারণ মুক্তজীবও পৃথক্ সত্তাবান্ এবং ঈশ্বরের সহিত এক নহে। অতএব মুক্তজীবও ঈশ্বর হইতে ভিন্নস্বরূপ। সুতরাং রূমীর 'স্বরূপতঃ ভিন্নতা' এবং রামানুজের 'স্বরূপতঃ অভিন্নতা'র অর্থ একই, অর্থাৎ 'স্বরূপতঃ ভিন্নাভিন্নতা'। দ্বিতীয়তঃ, রূমীর মতে মুক্তজীব গুণতঃ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে, কারণ সে ঈশ্বরের সকল গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পুনরায়, রামানুজের মতেও, মুক্তজীব ঈশ্বর হইতে গুণতঃ ভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, কারণ অণুত্ব ও সৃষ্টি-শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মের অপর সকল গুণই সে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এস্থলেও রূমীর 'গুণতঃ অভিন্নতা' ও রামানুজের 'গুণতঃ ভিন্নতা'র অর্থও একই, অর্থাৎ 'গুণতঃ ভিন্নাভিন্নতা'। অতএব রূমী ও রামানুজ উভয়ের মতেই মুক্তজীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ ও গুণতঃ উভয়তঃই ভিন্নাভিন্ন।

রূমীর ন্যায় রামানুজের মতেও ঈশ্বর সাধারণ বিচারবুদ্ধিলভ্য নহে,—শুষ্ক জ্ঞানে মুক্তি নাই, ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু রামানুজের 'ভক্তি' ও রূমীর 'প্রেমে'তফাৎ অনেক। রামানুজীয় ভক্তি জ্ঞান না হইলেও জ্ঞানমূলক, জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। রামানুজ ইহাকে তৈলধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্রুবানুস্মৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা অনবরত চিন্তা, ধ্যান, স্মরণ, প্রেম, প্রীতি, আবেগ, বা উচ্ছ্বাস নহে। শঙ্করবিরোধী হইলেও শঙ্করের শুষ্ক জ্ঞানবাদের প্রভাব রামানুজের মতবাদে বহুলাংশে দৃষ্ট হয়। নিম্বার্ক, বল্লভ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদে যে ক্রম-পরিবর্দ্ধিত আবেগসমাকুল প্রেমবাদের প্রপঞ্চনা পরিলক্ষিত হয়, রামানুজে তাহার বিন্দুমাত্রও নাই। কিন্তু রূমীর মতবাদ পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদেরই ন্যায় মধুররসাবেগময়। রূমী ও রামানুজ উভয়ের মতেই জীব মিথ্যাও নহে, ঈশ্বরের সহিত অভিন্নও নহে, কিন্তু ঈশ্বরের নিত্যসেবক ও উপাসক। কিন্তু রামানুজের ভক্তি ঐশ্বর্য্যপ্রধানা—ভাবনা, ভাব নহে; রূমীর ভক্তি মাধুর্য্যপ্রধানা—ভাব, ভাবনা নহে। রামানুজের মতে ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ রাজা-প্রজা, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ, রূমীর মতে ইহা প্রেমিক প্রেমিকার সম্বন্ধ। এইরূপে, রামানুজ জ্ঞান ও ধ্যানের দিকে, কিন্তু রূমী প্রেম ও প্রীতির দিকেই জোর দিয়াছেন।

উঠানছত্র ভ্রমণ

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী এম-এ

চট্টগ্রাম হইতে কর্ণফুলা নদীর উজান বাহিয়া ৬০ মাইল গেলে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম আরম্ভ। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।—প্রকৃতির স্বহস্তরচিত নন্দন কানন—পাহাড়ে, নদীতে, ঝরণায়, শ্যাম বৃক্ষদলে, নির্ভয় করীযুথে, আরণ্য কুক্কুটে, মৃগমৃগীতে পরিপূর্ণ। প্রধান নগরী রাঙ্গামাটি—ছোট্ট কিন্তু সুন্দর। রাঙ্গামাটিতে নৌকা চাপিলাম—বেগবতী নদীর উজান বাহিয়া যাইতে হইবে। দুই দিকে পাহাড়, পাহাড়ের উপর গাছ—কতরকমের লতা। বন্য কলা গাছ, হাতীর দলও তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারে নাই। কলস্রোত বিশিষ্টা নদী মাঝ দিয়া চলিয়াছে। কিছু-দূরে চেঙ্গী নদীর জল বিপুল বেগে কর্ণফুলীতে পড়িয়াছে। আরও কিছু-দূরে নদীগর্ভে দুইটি পাহাড়—স্থানীয় লোকেরা ইহাদের নাম দিয়াছে—হাতী হাতিনীর পাহাড়; মনে হয় যেন পাহাড় কুঁদিয়া প্রকৃতি দুইটি হাতীর মাথা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন। হাতী হাতিনীর পাহাড় ছাড়াইয়া দেখিলাম—বাম দিকে ঘন ঘাস বনে একটি হরিণ ঘাস খাইতেছে। বন্দুকে টোটা ভরিয়া তৈরী হইলাম—হরিণ হঠাৎ চোখ মেলিয়া দেখিয়া বনে অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আরও কিছুদূরে সুবলং নদী কর্ণফুলীতে পড়িয়াছে, দুই নদীর সংযোগ স্থানে একটি ডাক বাংলা আছে। সুবলং ছাড়াইয়া আরও কিছু গেলে কাসালং নদী কর্ণফুলীতে পড়িয়াছে। কাসালং বামে রাখিয়া আমরা আরও উজাইয়া চলিলাম। দুধারেই পাহাড়। মাঝে মাঝে পাহাড়ে 'জুমে' চাষ করিয়া পাহাড়ীরা অনেক রকম শস্য করিয়াছে। এক জায়গায় দেখা গেল একদল বানর পরম সুখে একটি 'জুমের' সব শস্য খাইতেছে। একটা পাহাড়ী মেয়ে হনুমানের অনুচরগণকে তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মর্কট দল নারীকে মোটেই ভয় করিতেছে না। আরও দূরে গাছের ডালে একদল উল্লুক "হুকু" "হুকু" শব্দ করিতেছে। এক ঝাঁক টিয়া শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। নৌকা চলিল, প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকার গতি অতি মন্দ। সঙ্গীরা পাহাড়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। অনেক দেখিয়া আমার তাহাতে আর নূতনত্ব কিছুই মনে হইল না।

অবশেষে বরকল পৌঁছিলাম। নদীর দুই দিকে পাহাড় খুব উচ্চ। নদী গর্ভেও পাহাড়—একটি প্রপাতের (Rapid) সৃষ্টি করিয়াছে। নৌকা আর চলিবে না। এখানে একটি ট্রলি লাইন আছে। ট্রলি চাপিয়া বরকল ডাক বাংলায় আসিলাম। ঠিক নীচেই নদীর প্রপাত। ইহার বিবরণ অনেক পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। হাজার হাজার রেলওয়ে ইঞ্জিনের মত শব্দ হইতেছে। জলরাশি প্রচণ্ডবেগে নীচের দিকে চলিতেছে। এখন শীতকাল; জল খুব বেশী নয়, অতি সাবধানে এক খণ্ড পাথরের উপর দাঁড়াইলাম। দুই দিকে পাহাড় এত উঁচু যে জলে কখনও রৌদ্র পড়িতে পায় না। ফেনিল জল ভীমবেগে মহাশব্দে পাথরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এইখানে প্রকাণ্ড মহাশোল (mahseer) মাছ পাওয়া যায়। অনেকে সময়ে সময়ে ছিপে ধরিয়া থাকেন।

বরকল বাজারে মগ ও চাকমা, পুরুষ ও মেয়েরা নানা জিনিষ লইয়া আসিয়াছে। তুলা, কমলালেবু, জুমের নানা তরকারী, ডিম ইত্যাদি প্রধান। 'নাপ্পি'র গন্ধে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা গেল না। ডাকবাংলায় চলিলাম। বাংলাটি একটি উঁচু টিলার উপর অবস্থিত। তাহার পাশে একটা মগ পল্লী। সেখান হইতে আমার পূর্ব্বপরিচিত নীলাসং মগ আসিয়া বলিল—কয়েকটা টোটা পাইলে সে হরিণ মারিয়া আনিতে পারে। তাহাকে কয়েকটা টোটা দিলাম এবং বলিলাম যে আমরা পরদিন 'ভূষণ-ছড়া' যাইব। সেও আমাদের সঙ্গে যাইবে বলিল। নীলাসং সে রাত্রে ফিরিল না। হরিণের মাংস না পাওয়া গেলেও ছাগ মাংস মিলিয়াছিল। আমার আর্দ্দালি উপেন পাককার্য্যে অতি নিপুণ, অল্পক্ষণেই নানারকম ব্যঞ্জনাদি রান্না করিল। সুতরাং ভোজনের ত্রুটি হইল না। প্রপাতের গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে শুইতে গেলাম। বাংলার নীচেই barking deer এর ডাকও অনেকবার শোনা গেল।

পরদিন ভোরে প্রপাতের ওদিকে নৌকা চাপিলাম—নদীর দৃশ্য খুব সুন্দর, মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপের মত পাহাড়, কার্পণ্য শ্যামল গুল্মে ভরা। নদীর জল সেখানে ব্যাহত হইয়া প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। নৌকা চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে আহারাদি নৌকার মধ্যেই সারিলাম। অপরাহ্নে ভূষণছড়া পৌঁছিলাম। এখানকার হেডম্যান বাবু চন্দ্র মোহন দেওয়ান চাকমা সমাজে খুব প্রতিপত্তিশালী। তাঁহার একটি ছেলে গ্রাজুয়েট। নদীর ধারেই পাহাড়ের নীচে অনেকখানি জমিতে তিনি নানারকম তরকারীর চাষ করিয়াছেন—এদেশে সে সবই নূতন। তাহার বাগান দেখিলাম, বেগুন, কপি, কড়াইশুটি, আলু, টমেটো, প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। এই উর্ব্বরা জমিতে যাহা দেওয়া যায় তাহাই হয়। বাগানের ভিতর দিয়াও কয়েকটি ঝরণা পাহাড় হইতে বাহির হইয়া কুলু কুলু শব্দে নদীতে পড়িতেছে। এক জায়গায় অনেকখানি জল জমা হইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহা একটি উৎস। পানীয় জল এখান হইতে সংগৃহীত হয়। চারিদিকে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তাহার উপর গাছ। পাহাড়ের গায়ে Terrace করিয়া চন্দ্রমোহনবাবু কমলা-লেবুর চাষ করিতেছেন। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতেই একটি ঘরে আমাদের থাকিবার জায়গা হইল। সন্ধ্যার সময় নীলাসং মগ দুইটি হরিণ মারিয়া আনিল। মাছ ও ধরা হইয়াছিল অনেক। বাগানের তরকারী দিতে চন্দ্রমোহনবাবু কার্পণ্য করেন নাই। আমার ভৃত্য উপেন ও পদ্ম-কুমারের খাটুনি অনেক বাড়িয়া গেল। এইখানে অনেক চুকোর

(Rosalie) দিলে। আমার সঙ্গে ঘরে তৈরী একশিশি উহার জেলী ছিল। স্থানীয় মহিলারা সাগ্রহে সেটি চাখিয়া দেখিলেন এবং আমার ভৃত্যগণের নিকট প্রস্তুত প্রণালী জানিয়া লইলেন। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে আসামের লাট ও লাটপত্নী আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের গল্প বলিলেন। লাটপত্নীকে চন্দ্রমোহনবাবু নিজেদের প্রস্তুত বস্ত্রাদি দিয়াছিলেন। লাট মহিষীও তাঁহাদিগকে কিছু উপহার দিয়াছেন। রাত্রের আহার হইল রীতিমত ভোজ। সেন মহাশয়ের আনন্দের সীমা নাই। আমার মত ডিস্পেপটিক লোকের বেশীর ভাগই কেবল দর্শন হইল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখিলাম, নদীর ওপারে ঘন সবুজ বন তারপর নীল পাহাড়,—পাহাড়ের চূড়ায় সাদা মেঘ, সেই মেঘের ফাঁক দিয়া জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য্যদেব উঁকি দিতেছেন। মন আপনিই সৃষ্টিকর্তার চরণে লুটাইয়া পড়িল।

সঙ্গীদের ডাকিয়া তুলিয়া আবার নৌকায় উঠিলাম। কিছু দূরে 'ছোট হরিণা' বাজার। ইহার পর ঐদিকে বাংলাদেশে আর বাজার নাই। খানিকক্ষণ বাজার পরিদর্শন করিয়া আবার নদীর উজানে চলিলাম।

উঠানছত্র পৌঁছিলাম, দুইদিকে শ্লেটের পাহাড়—নদীগর্ভেও পাহাড়। জলস্রোতে সে পাহাড় মসৃণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ পাথরের অনেক মাইলব্যাপী প্রকাণ্ড আসনের মত। বালুকা বা কর্দ্দমের লেশমাত্র নাই। এইখানে আহারাদির আয়োজন করিতে বলিয়া আমরা আরও অগ্রসর হইলাম।

নদীর দৃশ্য কি সুন্দর! নদীর বুকে কৃষ্ণপ্রস্তরে জল ব্যাহত হইয়া অনেকগুলি প্রপাত ও অনেকগুলি ছোট ছোট শ্যামকুঞ্জভরা দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। নদীকে আর নদী বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন একটি সাজান সুন্দর বাগান। দুইকূলে পাহাড় দেওয়ালের মত, তাহাতেও ফুল। এই প্রকৃতিরচিত উদ্যানের শোভার কাছে মানুষের বাগানের তুলনাই হয় না। দৃশ্যটি অনুপম, সামনে কর্ণফুলীর সাদা জলরাশি প্রবলবেগে আসিতেছে, তাহার উপর দিয়া দূরে লুসাইহিলের পর্ব্বতশ্রেণী নীল আকাশের গায়ে কালো চিত্রের ন্যায় দেখাইতেছে—দুইধারে পাহাড়ে নানা লতাগুল্মে ফুল। পিছনেও সাদাজল। মাঝখানে কি এক সুন্দর উদ্যান, জলপ্রপাতে, শ্যামলদ্বীপে অসংখ্য নানাপ্রকার চিরসবুজ ফার্ণে, ছোট উপলখণ্ডবিশিষ্ট শৈলে সজ্জিত। কিছুক্ষণ এই শোভা দেখিয়া আরও অগ্রসর হইলাম—বড়হরিণা নদীতে পড়িলাম, নদীটি একটি খালের মত। একদিকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, অন্যদিকে লুসাইহিল। বাংলা ও আসামের সীমার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। প্রায় একটায় দুখাভালাং মৌজায় পৌঁছিলাম। গ্রামের প্রধানব্যক্তি ডেবেয়া কার্ব্বারী অপেক্ষা করিতেছিল। বন্দুকে শব্দ করিয়া অভ্যর্থনা জানাইল। নীচ নদীগর্ভ হইতে উপরে উঠিতেই দেখিলাম—অসংখ্য কমলালেবুর গাছ—সুপক্ক সুদৃশ্য ফলে পরিপূর্ণ। তাহার শোভাও বাগানের শোভার চেয়ে কম নয়। আমি ফলাস্বাদন করিয়া তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সঙ্গী সেনমহাশয় মাটির গুণাগুণ পরীক্ষায় ব্যস্ত রহিলেন।

কার্ব্বারী অত্যন্ত অনুনয় করিয়া তাহার বাড়ীতে উঠিতে বলিল। গাছের সিঁড়ির উপর দিয়া তাহার মাচানের উপর উঠিলাম। কার্ব্বারী কিছু দুধ ও ফল খাইতে দিয়া সে বোটা তাহার ওখানে থাকিতে অনুরোধ করিল। তাহা করা সম্ভব হইল না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফিরিয়া চলিলাম। সঙ্গে দুই ঝুড়ি কমলালেবু। একঝুড়ি ১০৲ হাজার হিসাবে কিনিয়াছিলাম। অন্যঝুড়ি উপহার। এইবার অনুকূল নদীস্রোতে আধঘণ্টার মধ্যেই উঠানছত্রে পৌঁছিলাম। আমাদের আহার্য্য সেখানে প্রস্তুত। রৌদ্রে প্রস্তর উত্তপ্ত হইয়াছে। গাছের পাতা দিয়া একটা আশ্রয়ের মত করা হইয়াছে। নদীজলে স্নানে সে কি আনন্দ। পাথরের উপর বসিয়া পরমতৃপ্তিতে সকলে মিলিয়া ভোজন করা গেল। যাঁহারা পাহাড়ে ভ্রমণের জন্য স্কটল্যাণ্ড বা জার্ম্মানীতে চারণিক হইয়া বেড়ান, তাঁহারা বাংলার প্রান্তস্থিত পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ করিয়া আসুন।

দুর্গাপ্রতিমার রূপ-কল্পনা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

অভিনব এ রূপ-কল্পনা…অপরূপ এ রূপপূজা!—ইহা স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির পূজা।

এখানে স্রষ্টা কে? বেদ-পুরাণে জড়িত হইয়া গিয়াছে ভাবটি। দেখা যায় এ রূপ-কল্পনা চলিয়াছে বহুদিন ধরিয়া। তাহা পরে বলিতেছি। আগের কথা আছে। এই শারদীয় পূজা কিন্তু রামচন্দ্র করেন নাই। এই 'অকাল বোধন' করিয়া পূজার কথা বাল্মীকি বলেন নাই। ইহা পুরাণের কথা। সুতরাং বিশেষ প্রাচীন নয়। আবার এই যে সাত পুঁতুলের দুর্গা প্রতিমা—ইহা অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু এই আধুনিক মূর্ত্তিতে পূর্ব্বের কল্পনাগুলির অপেক্ষা ভাবনৈপুণ্য সবচেয়ে বেশি।

বাল্মীকি বলিয়াছেন—"ততো যুদ্ধ পরিশ্রান্তং সমরে চিন্তয়াস্থিতম্…।" অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্র যখন পরিশ্রান্ত ও চিন্তিত, তখন অগস্ত্য সেখানে আসিলেন এবং রামকে 'আদিত্যহৃদয়' শ্লোক শুনাইলেন। ইহা নিশ্চয় রাত্রের ঘটনা। কারণ তৎপরে রাম সূর্য্যস্তব করিয়া সূর্য্যদেবকে দর্শন করেন ও পরে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া রাবণবধে কৃতকার্য্য হন।

কিন্তু কালিকাপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—'অকালে ব্রহ্মণা-বোধঃ'। অর্থাৎ রামের প্রতি অনুগ্রহ ও রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মা নিজে অকালে দেবীর বোধন করেন। অকাল অর্থে রাত্রিকাল। অকালে দেবীপূজা করিলে 'বোধন' করিতে হয়। শরৎকাল দেবতাদের

রাত্রিকাল—অকাল। পুরাণযুগে দেবতাদের 'দিন' ছিল উত্তরায়ণ কালে—মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত। আর বর্ষা ও শীতকাল, শ্রাবণ হইতে পৌষ—দক্ষিণায়ন, দেবতাদের 'রাত্রি' বা অকাল ছিল। রাত্রি-কালে লোকে নিদ্রা যায়। সুতরাং (পুরাণমতে) শরৎ বা রাত্রিকালে যখন দেবীর পূজা হইল, তখন দেবীকে 'বোধন' দিতে হইল। অর্থাৎ দেবীকে জাগরিত করিয়া পূজা দিতে হইল। বোধন অর্থে জাগান।

আমরা দেখিতেছি পুরাণযুগে শুধু দুর্গাপূজার সময়টাই বদলাইয়া দিবার চেষ্টা হয় নাই, বাল্মীকির 'আদিত্যহৃদয়' স্তবটাকেও উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে এই স্তোত্র শোনান। ভবিষ্যপুরাণে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ইহা শুনাইতেছেন। সুমন্ত-শতানীক-সম্বাদরূপে ইহা উক্ত পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। ঠিক যেন গীতার পরিশিষ্ট। বাল্মীকি রামায়ণের এবং ভবিষ্যপুরাণের আদিত্যহৃদয় স্তোত্রে যেমন অর্থের মিল আছে, তেমনি বহুস্থানেই শব্দের মিল আছে। তবে পুরাণে বেশির ভাগ আছে—উক্ত স্তোত্রের ধ্যান, ন্যাস ও যন্ত্রাদির উল্লেখ।

নিজেদের বক্তব্য বিশেষ উজ্জ্বল করিবার জন্য পরবর্ত্তীগণ পূর্ব্ববর্ত্তীগণের বর্ণিত ঘটনার এইভাবে রূপ-পরিবর্ত্তন করেন—ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যদি মনে করা যায় যে, ঋকের প্রধান উৎসব ছিল বৃত্রাসুরবধ এবং তাহা বর্ত্তমানে 'নেড়াপোড়া'য় পর্য্যবসিত হইয়াছে—তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তী উৎসব দোলযাত্রা দ্বারা ইন্দ্রের বৃত্রাসুরবধ উৎসবকে গৌরবচ্যুত করা হইয়াছে। ইন্দ্র তাঁহার বজ্র দ্বারা বৃত্রাকারে উত্থিত মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি অভিবর্ষণ করেন (১।৩২।৫ ঋক)—ইহাই বৃত্রাসুরবধ কল্পনা। সূর্য্যদেব অয়ন পরিবর্ত্তন কালে যেন আকাশে দুলিতেছেন—ইহাকে দোলের অন্যতম কল্পনা বলা হইয়া থাকে। নেড়াপোড়া করিয়া এই দোল উৎসব আরম্ভ করা এখনকার প্রথা। অবশ্য এই নেড়াপোড়ার ভিন্ন প্রকারের ইতিহাসও আমরা পাইয়া থাকি।

যাহা হোক বাঙালী হিন্দু কিন্তু দুইমতে দেবী পূজা প্রতিপালন করে। রামায়ণমতে বাসন্তীপূজা যাহা এখন একপ্রকার অন্নপূর্ণা পূজাতে পরিণত হইয়াছে। তবে পুরাণমতে শারদীয়া পূজারই আড়ম্বর বেশি। ঠিক এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণের দুইটি রাসের দিনের একটি—বসন্তের রাস, এখন বলরামের রাস অথবা হোলি উৎসবে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং শরতের রাসেরই আড়ম্বর অধিক। এইসব হইতে আমরা যদি মনে করি যে বৎসর আরম্ভের কাল পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ—তবে তাহা ভুল হইবে কি-না তাহা ভাবিবার বিষয়। আমরা মোটামুটি তিনবার বৎসর আরম্ভের কাল পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়াছি। চারবার বলিলেও বলা যায়। তাহা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মত। কিন্তু এইসব একই রকমের উৎসব বৎসরের কোন সময়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কখন বা স্বল্পাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, কোন কারণে তাহা ঠিক করিয়া বলা বড়ই শক্ত।

এক্ষণে কালিকাপুরাণের ধ্যান দ্বারা দুর্গাপূজা হয়। প্রত্যেক দেবতারই ধ্যানের মধ্যে তাঁহার রূপবর্ণনা থাকে। কালিকাপুরাণের ধ্যানে দেবীর যে রূপ বর্ণনা আছে, তাহা কিন্তু এখনকার সাতপুতুলযুক্ত দুর্গামূর্ত্তি নয়। কালিকাপুরাণের দেবী (চামুণ্ডা, চণ্ডিকা প্রভৃতি) অষ্টশক্তি বেষ্টিতা। তাঁদের সঙ্গে সিংহ এবং অসুরও আছে। কিন্তু কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নবপত্রিকার কোন উল্লেখ কালিকা-পুরাণে নাই। বরং এই সকলের উল্লেখ আছে কালীবিলাস তন্ত্রে (১৮শ ও ২১শ পটলে)। কিন্তু কালীবিলাস তন্ত্রে ইঁহাদের সঙ্গে জয়া ও বিজয়ার মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। কাজেই অধুনা প্রচলিত মূর্ত্তি অভিনব।

শরতের পূজা মণ্ডপে এই অভিনব মূর্ত্তি দর্শনে আমরা ভুলিয়া যাই ইহা রামচন্দ্র পূজা করিয়াছিলেন কি করেন নাই। আমরা নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া-চাহিয়া দেখি এই অপরূপ মূর্ত্তির দিকে। যত দেখি ততোই আনন্দ বাড়ে। মনে হয় এ যেন বাঙালীর নিজের গড়ানো… তার নিজের ভাব মূর্ত্তি।…শাক্ত বাঙালী একদিন তার নিজের ইষ্টমূর্ত্তির রূপটি গড়িয়াছিল নিজের কল্পনামতো। ইহা যেন সেই সূর্য্যদেবের ত্রিপাদ গমনেরই রূপ (যাস্ক নিরুক্ত)। রূপকভাবে ইহা কথিত হইয়াছে। ত্রিপাদ অর্থে—১। প্রাতঃকাল, ২। মধ্যাহ্ন ও ৩। অপরাহ্নকাল বোঝায়। দুর্গামূর্ত্তি দ্বারা বাঙালী সূর্য্য দেবের এই তিন স্থানে অবস্থানের মূর্ত্তি গড়িয়াছে। অর্থাৎ ত্রিকালের বা ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি গড়িয়াছে। মনে করুন দক্ষিণমুখী করিয়া আমি মূর্ত্তিগুলি গড়িতেছি। তাহা হইলে সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিতে হয়। যে বেদীর উপর মূর্ত্তিগুলি গড়িতেছি তাহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে লম্বা। প্রতিমাগুলির নীচের এই বেদীদ্বারা আমি দিনমানকে ব্যক্ত করিতেছি। পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ। পূর্ব্ব অর্থে প্রাতঃকালে অরুণোদয়ে দিবারম্ভ হয়। বেদোক্ত অরুণ বা উষার মূর্ত্তিই সরস্বতীমূর্ত্তি। তিনি জ্ঞানদাত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। উষা উদয়ের সঙ্গে জীবের জ্ঞান আসে। এই জ্ঞানদাত্রীকে বা উষাকালকে লোকলোচন হইতে আবৃত করে মেঘ বা মেঘরূপী অসুর। কল্পনা করা হইল এই অসুর নাশের জন্য একেবারে দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে সরস্বতীর পাশে বসাইয়া এই ভাবটিকে পরিস্ফুট করিতে। তাই কার্ত্তিক বসিলেন সরস্বতীর পাশে। উভয়েই প্রাতঃকালের মূর্ত্তি, সুতরাং প্রাতঃকালে বেড়ায় যে সব পক্ষী, যথা—ময়ূর ও রাজহংস, তাহারা যথাক্রমে কার্ত্তিক ও সরস্বতীর বাহন হইল। তাঁহারা যাহা হাতে ধারণ করিলেন তদ্দ্বারাও তাঁহাদের পরিচয় পরিস্ফুট হইতেছে। এইবার আমরা পশ্চিম প্রান্তে যাইতেছি। মধ্যস্থলে পরে আসিব। পশ্চিমপ্রান্ত সন্ধ্যা বা প্রদোষকালের দ্যোতক। বেদাদিতে অর্থকে অনর্থকারী বলা হইয়াছে। এই অর্থকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেওয়া হইল। তিনি আমাদের যতই তমসান্ধকারে লইয়া যান, আমরা অর্থাৎ জনগণ তাঁর আরাধনায় সর্ব্বদা ধাবিত হইতেছি। তাই বাঙালী শিল্পী লক্ষ্মীর কাছে গণনাথ অর্থাৎ গণেশকে বসাইলেন। উভয়েই সন্ধ্যাকালের প্রতীক। সুতরাং সন্ধ্যাকালে বাহির হয় যেসব ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জীবাদি—যথা, মূষিক ও পেচক, গণেশ ও লক্ষ্মীর বাহনরূপে পরিকল্পিত হইল। লক্ষ্মী ও গণেশের হাতেও যাহা দেওয়া হইল তাহার দ্বারা কে কি কারণে কল্পিত সে ভাবটিও পরিস্ফুট করে। এইবার আসুন মধ্যস্থলে। মধ্যাহ্নে সূর্য্যদেব পূর্ণগৌরবে বিরাজ করেন। পৃথিবীর সর্ব্বদিকে তাঁর বাহু বিস্তৃত, জীবের শত্রুকুল সূর্য্যের উত্তাপে নির্ম্মূল হইতেছে। এই গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিই দুর্গামূর্ত্তি। যেন সূর্য্যের শক্তিমূর্ত্তি। দশদিকে দশহস্ত। মানুষের পরিজ্ঞাত সব অস্ত্রই তাঁর হাতে। সিংহ ও মানবের শত্রু দানবরাজ পদতলে পর্যুদস্ত, সেকাজে হিংস্র নাগরাজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। তাঁর পশ্চাতে সূর্য্যের ছটারূপে 'চাল'টি প্রতিভাত। চালের 'কল্কা'গুলি সূর্য্যতেজচ্ছটার দ্যোতক। ভর্গদেব শিবরূপে এই চালে দুর্গামূর্ত্তির পশ্চাতেই অঙ্কিত থাকেন।

ইহা যেন ভর্গপরিবারের—শিবপরিবারের ছবি। তার সঙ্গে আছেন পটে অঙ্কিত সূর্য্যমধ্যস্থ দেবগণ। আরও আছে পশুরাজ, নাগরাজ, পেচক, মূষিক, দানব প্রভৃতি। দুর্গাপূজার নামে মানুষ এই বিশ্বসংসারকে পূজা করিতেছে। প্রকৃতই ইহা বিশ্বসংসারের ছবি। সূর্য্যপূজা মানেই পূর্ণ প্রকৃতির পূজা—স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির পূজা। ইহা মানব কল্পনার শ্রেষ্ঠ কল্পনা—বাঙালীরই কল্পনা।

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলায় ১৯৪৬ সালের ভারতীয় ক্রিকেট দল বিশেষ সাফল্যলাভ ক'রেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেট দল অধিকতর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম হবে বলে বিলাতের ক্রীড়ামহল বিশেষ অভিমত প্রকাশ করেছে। ভারতীয় ক্রিকেট দল ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনায় ১৯৩২ সালে প্রথম ইংলণ্ডে খেলে আসে। সেই দলটি প্রথম শ্রেণীর ২৭টি ম্যাচ খেলে ৯টিতে জয়লাভ করে, ৮টি খেলায় পরাজিত হয় এবং ৯টি খেলা ড্র যায়। এ ছাড়াও ভারতীয় দল ১২টি ম্যাচ খেলেছিলো। শেষে সব মিলিয়ে ফলাফল এই দাঁড়ায়—জয়-১৩, হার-৯, ড্র-১৪। ২টি খেলা শেষ পর্য্যন্ত হয় নি। ১৯৩৬ সালের ভারতীয় দল ইংলণ্ডের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলেছিলো। প্রথম ও তৃতীয় টেষ্টম্যাচে ইংলণ্ড ৯ উইকেটে জয়লাভ করে এবং দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র যায়—ইংলণ্ড সেবার 'রবার' পায়। ১৯৪৬ সালের অভিযানেও ইংলণ্ড 'রবার' পেয়েছে। দৈব দুর্ব্বিপাক, বারিপাতের দরুণ তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের জয়লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র হয়েছিলো। প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলায় ইংলণ্ড জয়লাভ করায় ইংলণ্ডই শেষ পর্য্যন্ত 'রবার' পেল। ভারতীয় দল এবার বিশেষ সাফল্যলাভ করলেও টেষ্ট খেলায় 'রবার' না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের কৃতিত্ব সমর্থিত হবে না। এবারের ক্রিকেট অভিযানে ভারতীয় দলকে বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে খেলতে হয়েছিল; অনভ্যস্ত আবহাওয়া এবং ব্যক্তিগত অসুস্থতা ভারতীয় দলকে বিব্রত করেছিল। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা ভারতীয় ক্রিকেট খেলাকে নিষ্প্রভ করতে পারেনি, এবারের অভিযানের ফলাফলই তার সাক্ষ্য দেয়। এই সাফল্যের মধ্যে ভারতীয় দলের খেলায় সব থেকে বড় ত্রুটি খারাপ ফিল্ডিং তার জন্য অনেকক্ষেত্রে বিপক্ষ দল লাভবান হয়েছে এবং খেলার ফলাফলও ভারতীয় দলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এবারের অভিযানে ভারতীয় দলের মধ্যে ভি এম মার্চ্চেন্টের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ভারতীয় দলের এবারের সাফল্যের জন্য অধিক সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। দলের পতনের মুখে তাঁর খেলায় দৃঢ়তা, উইকেটের চারিপাশে দর্শনীয় ব্যাট চালনা এবং বিপক্ষের সর্ব্বপ্রকার আক্রমণকে বাধা দানের প্রচেষ্টা ইংলণ্ডের দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছে। খেলার কোন অবস্থায় দলকে পরাস্ত হতে দিতে তিনি যেন রাজী ছিলেন না। অমরনাথ এবার সাধারণ শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় দর্শকদের হতাশ করলেও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিনি হতাশ করেন নি, ব্যাটিংয়ের থেকে তাঁর বোলিং খুবই কাজ দিয়েছে। মানকাদ, হাজারী দলের জন্য যথেষ্ট করেছেন। ক্যাপটেন নবাব পতৌদি ইংলণ্ডের ক্রীড়ামহলে উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং রয়টার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিযুক্ত ক্রিকেট সমালোচক Learie Constantine ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "I am convinced that the time is not far distant when India will notonly beat England on English soil, but will challenge and beat Australia, New Zealand and all comers."

অমরনাথ, মানকাদ এবং সারভাতে পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে ল্যাঙ্কেশায়ার লীগ দলে যোগদান করেছেন এবং হাফিজ ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য ইংলণ্ডে রয়ে গেছেন! বাকি সবাই স্বদেশে ফিরছেন।

১৯৪৬ সালের খেলার ফলাফল : খেলা-৩৩ ; জয়-১৩ ; পরাজয়-৪ ; ড্র-১৬।

ভারতীয় দলের পক্ষে 'সেঞ্চুরী' হয়েছে মোট সেঞ্চুরী-২৩।

ভি এম মার্চেন্ট (৮ সেঞ্চুরী)

১৪৮ এম সি সির বিপক্ষে
১১১ ল্যাঙ্কাশায়ারের „
১১০ নর্থ হাম্পসায়ারের „
* ২৪২ ল্যাঙ্কাসায়ারের „
* ১৪১ ক্লাব ক্রিকেট কন্ „
২০৫ সাসেক্সের „
১৮১ „ „
১২৮ ইংলণ্ডের (তৃতীয় টেষ্ট) „

নবাব পতৌদি (৪) বিপক্ষে
১২১ কেম্ব্রিজের „
১০১ নটিং হাম্পসায়ারের „
১১৩ ডার্বিসায়ারের „
* ১১০ সাসেক্সের „

ভি এস হাজারী (৩)
১৩২ ইয়র্কসায়ারের বিপক্ষে
১০৫ সাসেক্সের „
* ১০৯ মিডলসেক্সের „

লালা অমরনাথ (২)
* ১০৪ গ্লামোর্গানসায়ারের বিপক্ষে
১০৬ সাসেক্সের „

আর এস মোদী (১)
১০৩ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে

সি টি সারভাতে (১)
* ১২৪ সারের বিপক্ষে ,

এস ব্যানার্জ্জী (১)
১২২ সারের বিপক্ষে।

সমস্ত খেলায় গড়পড়তা

ব্যাটিং

খেলোয়াড়ের নাম	ইনিংস	কতবার নট-আউট	সর্ব্বাপেক্ষা রান	মোট রান	এভারেজ
ভি এম মার্চেন্ট	৪৫	১০	*২৪২	২৬৩০	৭৫.১৪
ভি এস হাজারী	৩৫	৭	*২৪৪	১৪৮৫	৫৩.০৩
নবাব পতৌদি	২৬	৫	১২২	৯৭৭	৪৬.৫২
আর এস মোদী	৩৯	৩	১০৩	১২৮০	৩৫.৫৫
ভিনু মানকদ	৪৩	১	১৩২	১১২২	২৬.৭১
সি টি সারভাতে	২৬	৯	*১২৪	৪২৫	২৫.০০

বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	এভারেজ
ভিনু মানকদ	১১৮৭.১	৩১৭	২৭৫১	১৩৪	২০.৫২
সি টি সারভাতে	৩৮৩.৩	৫৮	১০৪৮	৫০	২০.৯৬
ভি এস হাজারী	৬৬৬.৪	১৬৩	১৪৯৫	৬৪	২৩.৩৫
এল অমরনাথ	৮০২	২৭৮	১৫৪০	৫৬	২৬.৮৫

টেষ্ট খেলায় উভয় দলের গড়পড়তা

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড

(প্রথম তিনজন)

নাম	খেলা	ইনিংস সংখ্যা	কতবার নট-আউট	সর্ব্বাপেক্ষা রান	মোট রান	এভারেজ
ভারতবর্ষ						
ভি এস মার্চ্চেণ্ট	৩	৫	০	১২৮	২৪৫	৪৯·০০
এস সোহনী	২	৩	২	*২৯	৪৩	৪৯·০০
মুস্তাক আলী	২	৩	০	৫৯	১০৬	৩৫·৩৩
ইংলণ্ড						
জি হার্ডষ্টাফ	২	৩	১	*২০৫	২১০	১০৫
ডি কম্পটন	৩	৪	২	*৭১	১৪৫	৭৩·০০
ডবলউ হ্যামণ্ড	৩	৪	১	৬৯	১১৯	৩৯·৩৬

বোলিং
ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড

(প্রথম তিনজন)

নাম	ইনিংস সংখ্যা	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	এভারেজ
ভারতবর্ষ						
লালা অমরনাথ	৫	১৫৭	৫০	৩৩০	১৩	২৫·৩৮
ভি মানকদ	৫	১৩৯·৫	৪৪	২৯২	১১	২৬·৫৪
সি এস নাইডু	৩	১৮	৩	৪৭	১	৪৭·০
ইংলণ্ড						
বেডসার	৫	১৪৭·২	৩৩	২৯৮	২৪	১২·৪১
পোলার্ড	২	৫২	২৬	৮৭	৭	১২·৪২
এডরিচ	১	১৯·২	৪	৪৮	৪	১৭·০০

* তারকা চিহ্নিত নট-আউট।

ভারতীয় টেনিস :

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা অল্ ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস এসোসিয়েশন নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করেছে।

(১) ঘস্ মহম্মদ (বরোদা), (২) ম্যান মোহন (আগ্রা) (৩) নরেন্দ্রনাথ (লাহোর), (৪) দিলীপ বসু (ক্যালকাটা) (৫) বি আর কপিনিপাথী (বাঙ্গালোর), (৬) জে-এম মেটা (বোম্বাই), (৭) ইরসাদ হোসেন (ক্যালকাটা), (৮) প্রেম পান্ধী (পেশোয়ার), (৯) জে-কে-কাযুল এবং খয়ু সেন (ইন্দোর ও পাটনা), (১০) সুমন্ত মিশ্র (ক্যালকাটা)।

পৃথিবীর রেকর্ড :

রীলে রেসে সুইডিস টীম ৪,৮০০ গজ দূরত্ব ৭ মিঃ ২৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে ১৯৪৩ সালে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৭ মিঃ ৩২·৬ সেকেণ্ডের পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পকাই ডাক্তার"—২৷৹

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "সতী"—১৷৹

মনসা চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাত্রির ভিখারী"—১৷৷৹

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন প্রণীত "সাহিত্য-প্রসঙ্গ"—৫৲

পণ্ডিত ৺রমানাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত "সানুবাদ, সচিত্র, ষড়ঙ্গ চণ্ডী"—১৷৹

সুজিতকুমারনাগ-সম্পাদিত "আগমনী"—২৲

শান্তিরঞ্জন গুহ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "কাব্যমালিকা"—২৷৷৹

ব্যারিষ্টার কবি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "তুলসী ও চন্দন"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীমণি গাঙ্গুলী | ধ্যানভঙ্গ | ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



অগ্রহায়ণ—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

পৃথিবীদোহন

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

আকাশ মাটি ও জল, যাহা লইয়া এই পৃথিবী তাহারা তো তেমনই রহিয়াছে সনাতন মহিমায়। আকাশ তেমনই উদার, মাটি তেমনই অকৃপণা, আর জলও অপার চির-সুনীল। আকাশ মাটি ও জল এই তিনের সমন্বয়ে ধাত্রী পৃথিবীর কোলে মানবের ইতিহাসগঠন। তবু কেন ধরিত্রীমাতার সন্তানের মুখে দিকেদিকে এত-ক্ষুধার বেদনা? মহাকুরুক্ষেত্রই যদি ঘটিয়া থাকে পৃথিবীতে, তবে সে আর কি নূতন কথা? পাঞ্চজন্য শঙ্খ যেদিন কুরুক্ষেত্র আহ্বান করিল, সেদিন কি শ্মশান রচনা হয় নাই মহাযুদ্ধভূমিতে? কিন্তু সেই পাঞ্চজন্যই যে মুহূর্ত্তে ঘোষণা করিল যুদ্ধবিরতি, তারপরে শ্মশানস্মৃতি আর বেশী দূরে যাইতে পারে নাই। কুরুক্ষেত্রের বাহিরে ছিল যা বিরাট পৃথিবী—তাহাতে বাজিল শান্তি, ফুটিল অমৃত। অন্নপূর্ণার পৃথিবী [illegible] হাসিয়া উঠিল।

বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় মহাকুরুক্ষেত্রে যে শ্মশান জ্বলিয়াছিল তাহা যেন নিভিতেই চাহে না। আগুন এতটুকুও কমিল না, মাটিতে অমৃত ফুটিবে কোথায়? তাই তো অন্নপূর্ণার সন্তানেরা বুভুক্ষু শ্মশানচারীসম ঘুরিয়া মরিতেছে।

আণবাস্ত্রে রচিত মহাযুদ্ধের শান্তিপর্ব্বে যথারীতি জয়শব্দ ঘোষিত হইয়াছে। ন্যায় ও ধর্ম্মের বিজয়কীর্ত্তি ভেরীমন্দ্রিত এখনও। তবু ন্যায় ও ধর্ম্মেরই যদি জয় হইল, তবে কি কারণে কোন্ ফাঁকে নিখিলমানবসন্তান আজ অন্নকাতর? ধর্ম্মের জয়ে পৃথিবী তো রিক্তা হইতে পারেন নাই কখনও। ন্যায় ও ধর্ম্মের বলে শ্মশানে তো ফুটিয়া ওঠা উচিত শস্যশ্যামল।

আজ নিখিলমানব বসুধার স্তন্যপান করিতে একান্ত উন্মুখ ও কাতর। আজ তাহারা বৎসসম লালায়িত। কিন্তু কে বসুধার স্তন্যসুধা বৎসতরে দোহন করিবে? অন্নহীনা

বসুন্ধরায় এতটুকু অন্নের জন্য অন্নপূর্ণার সন্তানেরা কাতর, আর্ত্ত ক্ষুধিত সন্তানের সম্মুখে জননীর স্তন্য শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কে শস্যশ্যামলে ধরার মুখ উজ্জ্বল করিবে? কে অমৃতমন্থন করিবে?

হিংসামত্ত পৃথিবীতে মানবেরই কবি স্মরণ করাইয়া দিলেন—

হে মানব, মনে রেখো 'মোরা অমৃতের পুত্র'।

কিন্তু একথা কে শুনিবে? আজিকার মানব মহাজ্ঞানী হইয়াছে, সে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছে, তাহার কাছে মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা বিধাতা, মিথ্যা অমৃতকল্পনা—আর সত্য শুধু ক্ষুধিতের জন্য আণবিক মহাস্ত্রনির্ম্মাণ। জ্ঞানদর্পীমানব তাই অস্ত্র হানিয়াছে ও হানিবে—পৃথিবীবক্ষে অকুণ্ঠায় নির্ম্মমে—তাই ক্ষুধিত নিখিলমানবের সম্মুখে পৃথিবী দিনে দিনে হইতেছেন রিক্তা। জল মাটি ও বাতাসে যদি কোথাও এতটুকু আজও থাকে মধু, মানুষই মানুষকে বঞ্চিত করিতেছে সেইটুকু হইতে।

মানুষেরই কোন্ পাপে ম্লান হইল সুদর্শন, তাই না আণবাস্ত্রে আবার ফুটিল ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভা। আবার কি মানুষেরই অন্তরশক্তিতে জাগিবে না সুদর্শন, নিখিল মানবকে আশ্বাসিয়া বাজিবে না পাঞ্চজন্য?

আজ যখন আর্ত্তা পীড়িতা বসুধা মারণাস্ত্রের জ্বালামুখে কহিতেছেন—

রে মানুষ, কেন পীড়ন কর মাতৃবক্ষ!

তখন দৃপ্তকণ্ঠে মানুষ বলিতেছে শুনি—

হে বসুমতী, আরও কত রত্ন রেখেছ লুকায়ে? সব রত্ন সব ঐশ্বর্য্য, সম্ভব হোলে তোমার বক্ষমণিটিও হরণ কোরে আমি একা বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হোতে চাই। আমি শুধু একাই শ্রেষ্ঠ হোতে চাই।

এমনই সর্ব্বগ্রাসী লোভ বর্ত্তমানের। সেই রাক্ষসীবৃত্তিই পৃথিবীকে পীড়ন করিতেছে। অথচ এই মানবেরই এক পৌরাণিক বিজয় ইতিহাস দেখি, বসুধাবক্ষ মানবের শরশাসনে পীড়িত হইলে, বসুধা যখন কাঁদিয়া বলিলেন—

রে মানুষ, কেন মাতৃবক্ষ পীড়ন? কেন এক সন্তান আর এক সন্তানের রক্তে মাতৃবক্ষ কর কলঙ্কিত? শরজাল সংহরণ কর। দেখ, মাটিতে ফুটায়েছি অমৃত। পান কর তাহা, শক্তিমান হও। মাতৃবক্ষে লীলা কর, কিন্তু শক্তির আস্ফালনে নহে, শক্তির আনন্দে।

সেদিনের মানব তখন শরজাল প্রত্যাহার করিয়া মুগ্ধকণ্ঠে স্তব করিয়াছিল—

হে ধরিত্রী মাতা, ধন্য আমি! অকৃতজ্ঞ সন্তানকেও এত ভালবেসে অমৃত এনে দিলে!

সেদিন সার্ব্বজনীন ঐকান্তিকতায় ধরিত্রী শ্যামলা সুনীলা হইয়া প্রতি ফুলে ফলে প্রতি শস্যকণায় সঞ্চিত করিলেন মধু, সেই মধু বিনা হিংসা দ্বেষে সকলেই করিল পান, ধরিত্রীর বক্ষসুধায় সকলেই মিটাইল ক্ষুধা।

আজ মানবের সে অমৃতে নাই লোভ—নাই ভালবাসিয়া সকলেই একসাথে ধরিত্রীর বক্ষসুধাপান। শুধু আছে ঐশ্বর্য্য বিলাসবাসনায় পৃথ্বীবক্ষ শুষ্ক করিবার মহাউন্মত্ততা। আজিকার মহামানী মানুষের কাছে অমৃত শুধু পুরাণকারের কাব্যবিলাস, সুতরাং অলীক কল্পনা।

আজিকার মদদর্পী মানবতাই—সব মধু সব রত্ন সবআলো-বাতাস একা ভোগ করিতে চায়। সেই ইচ্ছার প্রতিরোধী যাহারা তাহাদের অস্থিমাংসে দধিকর্দ্দমনৃত্য করিতে পারিলে খুসী হয়। আরও চায় পৃথিবী হইতে যত বাজে লোকের বাস উঠাইয়া দিতে।

পৃথিবীদোহন শব্দে আজ স্বতঃই মনে হইবে পৃথিবীপীড়ন। অথচ বৎসকল্যাণেই দোহন শব্দের মাহাত্ম্য। মানবেরই কল্যাণে চিরযুগে পৃথিবীদোহন কল্পিত, কিন্তু বর্ত্তমানের বলদর্পীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন—রে ভাববিলাসী, ইতিহাসমুখাপেক্ষী, আমারই কল্যাণে তোমার কল্যাণ, আমারই শক্তি সঞ্চয়ে তোমার শক্তি।

আজ সারা জগৎ জুড়িয়া সেই অপরূপ পাঠ প্রচারিত হইতেছে। গুরুমশাইগিরি শুধু পাঠপ্রচারেই ক্ষান্ত নহে, সঙ্গে বেত্রদণ্ডটিও সবল রহিয়াছে।

আজ তাই যত ক্ষুধিত-নিখিল-মানব-সন্তানকে মিলিয়া জুড়িয়া গুরুমশাইয়ের তন্দ্রার অবসরে অন্নের সন্ধান করিতে হইবে। পারিলে, নিখিল-ক্ষুধিতদের বৎস কল্পনা করিয়া অন্নদুগ্ধ দোহন করিতে হইবে। পারা না পারার কথাই বা কেন? ক্ষুধিতদের সম্মিলিত শক্তিই হইবে পৃথিবীদোহন-কারী। আর যদি ছুটিয়া আসে দৈত্য সেই অন্নহরণ করিতে, তবে নিখিল সন্তানের সে নব আনন্দমঠে নিখিল

ক্ষুধাতুর তাহাদের ক্ষুধায় কখনই লুণ্ঠকের করে তুলিয়া দিবে না।

সন্তানের তরে জননী কখনও কৃপণা নহেন। পৃথিবী কখনও শুষ্কবক্ষ ধরিতে পারেন না ক্ষুধিত সন্তানের সম্মুখে। মানুষ কামনা করিলেই, সত্য করিয়া ইচ্ছা করিলেই এই মাটিতেই ফুটিবে অমৃত।

আছে জলন্ত ইতিহাস, আছে বিংশ শতাব্দীর সম্মুখে তাহারই গৌরবময় পরিচয়, রক্তলোলুপতা ভুলিয়া হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া শুধু অমৃতের জন্য পৃথিবীদোহন।

গল্প নহে। সে একদিন হিমাচলের রঙ্গগুহায় বসন্তকালের মধু আধিক্য হইলে দেবদানবে উৎসবমত্ত হইলেন। দেবদানবে বলিলে পারস্পরিক বিবাদই বুঝায়, কিন্তু সেদিন দেবদানবে মধু সম্মেলন! বাসন্তিক গন্ধবিলাসে দানবেরা বিস্মিত হইলেন—শুধু ফুলেরই এত মাধুর্য্য, না জানি ফলের কতদূর।

দানবেরা মন্ত্রণা করিলেন—সারা হিমাচলদেশে এইরূপ যত বৃক্ষ আছে—ফুলে ফলে মধুতে অপূর্ব্ব, তাহাদের সমূলে তুলিয়া পৃথিবীতে নবরাজ্য নবনন্দন প্রতিষ্ঠা করিব।

হিমাচলের দেশে দানবেরা দেবতাদের অতিথি মাত্র। সেখানে দেবরাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। তাই দেবরাজ্য হইতে হরণ করিয়া পৃথিবীতে নন্দনশোভা রচনার স্বপ্ন! কিন্তু মধুবিলাসে দেবতাদের সহিত উৎসবমুখর হইয়া দানব হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া গেল, দেবরাজ্য হরণ করিবার কথাতেও লজ্জিত হইল—অনাবিষ্কৃত বিশাল সমুদ্ররাজ্যসকল 'মন্থন' করিয়া এমনই দেবতরু সকল অপহরণ করিতে হইবে, এমনই অপূর্ব্ব তরুদের ফলে ও ফুলে অমৃত রচিয়া অমরত্বলাভে দেবতুল্য হইতে হইবে!

দানবদের সেই সমুদ্রমন্থন কামনায় নিখিলজাতি মিলিত হইল। অমৃত আহরণের জন্য দেব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর মহানন্দে সম্মত হইল।

সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রথমেই যে অমৃত উঠিল দানবেরা তাহা লোভবশে হরণ করিল। সমুদ্রমন্থনে উঠিল কৌস্তুভমণি, দানবেরা তাহা চাহিল না। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠিল, দানবেরা তাহাতেও লোভও করিল না। আশ্চর্য্য যে দানবেরা মণিরত্নও চাহিল না, চাহিল শুধু অমৃত। পুনরায় সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠিল দেবতারা তাহা দখল করিলেন। অমৃতপানে যখন দেবতারা মত্ত হইলেন, কখন কোন্ মত্ততার ক্ষণে, কি বিস্মৃতির মুহূর্ত্তে পৃথিবী ইন্দ্রহস্ত হইতে সেই অমৃত হরণ করিলেন।

সমুদ্ররাজ্য মন্থন করিয়া যে মধুবৃক্ষসকল অপহরণ করা হইল, দেবদানবের অসতর্কতায় তাহারা হিমাচলদেশে ও হিমাচলকোলে বীজে বীজান্তরে বিস্তারলাভ করিল। বহুদিন ধরিয়া সেই সকল মধুবৃক্ষ হইতে দেবদানব ও মানবে যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরের সাথে মধুপান করিল। মাটির বক্ষসুধা সকলেই পান করিয়া যখন মাটির উৎসধারাকে শুকাইয়া দিল যুগশেষে, যখন মাটি হইল অনুর্ব্বরা ও রিক্তা, যখন মধুবৃক্ষ আর মধু পাইল না মাটির বক্ষশিরা হইতে, তখন একদিন আবার অমৃতমন্থনের প্রয়োজন হইল। এবার সমুদ্রদেশ মন্থন হইল না, এবার দেবদানবে মাথা ঘামাইল না, আপন প্রতিভায় মানব স্থির করিল পৃথিবীদোহন করিতে হইবে।

পাহাড় ভাঙিয়া মাটি কাটিয়া নদীপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া মানুষই মাটীর শিরায় শিরায় নব উৎসের রচনা করিল। মাটির বক্ষে ফুটিয়া উঠিল আবার নবমধু বৃক্ষ, ফুলে ফলে মধুভরা—অমৃতের খনি।

ভারতের ইতিহাস বলে—আগেকার মানুষ পৃথিবীকে ভালবাসিত, শিশু যেমন ভালবাসে স্তন্যদাত্রীকে। মাতার স্তন্য লইয়া সন্তানে হানাহানি করিত হয়ত, কিন্তু মাতা বসুন্ধরা যখন স্তন্য ধারা উচ্ছসিত করিতেন, তখন মাতৃসুধা-গর্ব্বে সকলেই সমভাবে খুশী হইত। তাই পৃথিবী যত বার যুগে যুগে শ্যামলাঞ্চল বিছাইয়াছেন, শ্যামলে সুনীলে যত বার অমৃত বিলাইয়াছেন ততবারই পৌরাণিক ইতিহাসে হইয়াছে মধুমিলন, জাতিতে জাতিতে প্রীতি জাগিয়াছে, প্রতি অন্তরেতে ফুটিয়াছে মানবিকতার নীতি। তাই সে দিনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেবযক্ষরক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও মানবে মিলিয়া আন্তর্জ্জাতিক প্রীতিপত্র।

আর আজ কিন্তু পৃথিবী যদি এতই দাক্ষিণ্যভরে স্তন্যধারা উচ্ছসিত করেন, তবে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইতিহাস গঠিত হইবে, মানুষে মানুষের হানাহানি রক্ত তাণ্ডব লইয়া। মাটির কাণায় যে প্রীতি ছিল আণবিক মারণাস্ত্রে তাহা দগ্ধ হইয়া গেছে, আছে শুধু ইট কাঠ পাথর আর ধ্বংসাবশেষ, আর আকাশ বাতাসময় মহারিক্ততা।

আগেকার মানুষ, দেবদানব ভালবাসিত ধরিত্রীর স্তন্য সুধা। আর আজ ভালবাসে মাতা ধরিত্রীর বক্ষ ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে—কোথা হইতে কোন রন্ধ্রমূল হইতে ওঠে এত উৎস এত সরসতা। আজ ভালবাসে ব্যবচ্ছিন্ন ধরিত্রীর হৃদয় হইতে সেই আনাবিষ্কৃত বক্ষমণি করিতে হরণ। পূর্ব্বে পৃথিবীদোহন অর্থে ছিল ধরাবক্ষে মধু ও অন্নের উচ্ছলতা বহানো, আর আজ পৃথিবীদোহনে বুঝি—ধরার উৎস হরণ করিয়া রিক্ত করা—শূন্য করা তাহাকে, শুষ্ক করিয়া সম্ভব হইলে প্রাণশক্তিটুকু হইতেও বঞ্চিত করা।

আর তাই পৃথিবীর দুগ্ধটুকু অধিকার করা লইয়া মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্ব। তাই আজ পৃথিবীদোহনে মেলে শুধু রক্তধারা—মানুষের পরস্পর হানাহানি ও দাপাদাপিতে বসুন্ধরা বক্ষশিরা ছিন্ন হইয়া ওঠে শুধু রক্তধারা। পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া যেদিন মানুষ মহোল্লাস করিবে, সেইদিনই তাহার এবারের শেষ ইতিহাস। পুরাকালে পিশাচেরা পৃথিবীদোহন করিয়াছিল। পিশাচেরা মানুষেরই একজাতি, তাহারা মরুদেশনিবাসী। তাহাদের সেই পৃথিবীদোহনে কি দুগ্ধ উঠিয়াছিল? রুধির উঠিয়াছিল। সেই রুধির পানেই তাহারা শক্তিমান। আজও সেই পিশাচেরই দৃষ্টান্তে দিকে দিকে রুধির লাভের জন্য পৃথিবীদোহন। আজ পৃথ্বীমাতার স্তন্য হইতে শক্তিমান মানুষ রুধির পান করিতে চায়।

মানুষের আর এক জাতি নাগেরাও একদিন পৃথিবীদোহন করিয়াছিল। তাহারা পাইল বিষ। সেই বিষপানেই তাহারা উগ্র ও দর্পী হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কত শক্তিশালী জাতি বিষদুগ্ধ পান করিয়া মত্ত ও দর্পী হইয়া উঠিয়াছিল। আজও মানুষ মনুষ্যপ্রীতি ভুলিয়া ধরণীর রুধির দুগ্ধে বিলাস করিতে চায়।

ঋষিগণও পৃথিবীকে স্তব করিলে পৃথিবী দুগ্ধদান করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি ছিলেন দোহনকারী, চন্দ্র হইয়াছিলেন বৎস, আর বেদসকল কল্পিত হইয়াছিল পাত্ররূপে। সেই বেদরূপ আধারে বৎস চন্দ্রমুখে পৃথিবী তপোরূপ ব্রহ্মদুগ্ধ নিখিল মানবেরই পুষ্টির জন্য উচ্ছলিত করিলেন।

আর একদিন গোপালকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বৎস কল্পনা করিয়া নিখিল মানবের জন্য পৃথিবীর জ্ঞানস্তন্য দোহন করিয়াছিলেন। তাই পৃথিবীদোহন করিলে বিষই উঠে না, শুধু রুধিরই বহে না, নিখিল মানবের পুষ্টিকর সুধাও উৎপন্ন হয়। সেইখানে দোহনকারীর ইচ্ছা ও মাহাত্ম্য থাকা চাই।

আজ সারা পৃথিবীর সন্তানেরা যখন বিশ্বময় অন্নবিনা হাহাকার করিতেছে, তখন অন্নের জন্য পৃথিবীদোহন তো কেহ চাহিতেছে না। বিষ ও রুধিরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ভারতেরই ইতিহাসের এক গৌরবময় দিনে এমনই অন্নবিনা হাহাকার উঠিলে নিখিল মানবকে বৎস কল্পনা করিয়া অন্নদুগ্ধ দোহন করা হইয়াছিল। সেই অতীত দিনের কথা স্মরণ করা আজ এই জন্য প্রয়োজন—যে সময় আসিয়াছে আবার অন্নের জন্য পৃথিবীদোহন করিবার, নিখিল মানবের জীবন রক্ষার কথা ভাবিবার।

পৌরাণিক যুগে একদিন পৃথিবী শস্যহীনা অন্নহীনা হইলে, মহারাজ পৃথুর সকাশে নিখিল মানব আবেদন জানাইল—আমাদের অন্নের বিধান করুন। সেই মহারাজ অমনিই অস্ত্রকরে পৃথিবীকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বসুধা আর্ত্তা হইয়া বলিলেন—রাজন্! কেন আমায় পীড়ন করিতেছ? আমি ভিন্ন কে প্রজা রক্ষা করিবে? আমাকে পীড়ন করিলে আপনার সমস্ত প্রজারই বিনাশ হইবে। প্রজাগণের মঙ্গলে আমাকে বধ করা উচিত নহে।

আজ যখন চারিদিকে মানবেরই ধরিত্রীমাতাকে বধ করিবার অভিযান চলিতেছে, তখনও সেই আর্ত্তা বসুধা কহিতেছেন শুনি—

হেমানুষ! তোমাদেরই মঙ্গল আমার মঙ্গল। কেন নিখিল মানুষের সর্ব্বনাশ করিতেছ আমাকে হনন করিয়া? আর সেই পৌরাণিক দিনে পৃথিবী কাঁদিয়া কহিয়াছিলেন—হে রাজন্! আমাকে বিনাশ করিলে প্রজাগণের প্রাণরক্ষণ অসম্ভব! আমি প্রজাগণের অন্নস্বরূপ হইব।

আজও বসুধা কাঁদিতেছেন—অন্নের জন্য দোহন কর আমায়। কেন পীড়ন কর আমাকে, কেন কর মানুষেরই সর্ব্বনাশসাধন? সন্তান চাহিলে মাতৃবক্ষ আপনি যে উচ্ছল হইবে। মাতা তো সন্তানের তরে কখনও কৃপণা নহে। তবে কেন অস্ত্র হানাহানি, কেন রুধিরলোভ? মাতা তো সন্তানকে রুধির দান করিতে পারেন না তাহার অন্নের জন্য।

—হে নিখিল মানব! শস্যের জন্য, মানবেরই জীবন-

পুষ্টির জন্য কেন আমার দোহন কর না! কেন শস্য দুগ্ধে শক্তিমান হও না? কেন সকলে মিলিয়া জননীর দান সেই ওষধি ও শস্যদুগ্ধ আনন্দে পান কর না।

সেই পৌরাণিক ইতিহাসে দেখি পৃথিবী মহারাজ পৃথুকে সম্বোধন করিয়াছিলেন—

হে ধার্ম্মিকপ্রবর! আপনি আমাকে বৎস প্রদান করুন, আমি তাহার প্রতি স্নেহবতী হইয়া ক্ষীর স্মরণ করিব। আর আমার অঙ্গ সকল সমতল করিয়া দিন, আমি সকল স্থানে সমানভাবে ক্ষীর সঞ্চালন করিতে পারিব।

তখন মহারাজ পৃথু অস্ত্র হানিয়া সকল শিলা সরাইয়া দিলেন। পাহাড় ভাঙিয়া পৃথ্বীঅঙ্গ সমতল করিয়া দিলেন। শস্যশ্যামলে হাসিয়া উঠিল বসুন্ধরা, মানুষ শস্য-দুগ্ধ পানে যৌবন ফিরিয়া পাইল।

মহারাজ পৃথু নিখিল মানবের পুষ্টির জন্য মানবকেই বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী হইতে শস্য দোহন করিলেন। দেবতা ও দানবে মিলিয়া একদিন যে অমৃতলোভে সমুদ্ররাজ্যের ওষধি ও শস্য রাশি লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন, মানবের প্রচেষ্টায় সেই অমৃত ফুটিল শ্যামলে।

মহারাজ পৃথুর অস্ত্রসম্মুখে যখন পৃথ্বী-অঙ্গ সমতল হইয়া শস্যভূমিতে ও নদীপ্রবাহে অপরূপ রূপে ঝলমল করিয়া উঠিল, তখন সেই মহারাজ মুগ্ধ হইয়া আপন অস্ত্রকে ধন্য মনে করিলেন। অস্ত্র মানুষে মানুষে হানাহানি করিয়া ধন্য হয় ইহাই বর্ত্তমানের ধারণা। আজ মানুষ সেই অস্ত্রকেই ধন্য মনে করে যাহাতে পৃথিবীর ও মানুষের সর্ব্বাধিক ধ্বংস-সাধন হইয়াছে। আজ আণবিক মারণাস্ত্রের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসালাভ শুধু শ্রেষ্ঠ ধ্বংসকারী বলিয়াই, আজ তাই এত আণবিক চরিতামৃত পৃথিবীর কর্ণভেদ করিয়া দিতেছে।

মহারাজ পৃথুর আদর্শে অস্ত্রকে মানব কল্যাণে কে ধন্য করিতে চাহে? কে ক্ষুধিত মানুষের মুখে শস্যদুগ্ধ আনয়ন করিবে? পৃথিবীকে আর না পীড়ন করিয়া, আর না লুণ্ঠন করিয়া, মহা-অস্ত্র হানিয়া পৃথিবী অঙ্গ সমতলে নবনদীপ্রবাহে নবীন করিয়া, নিখিল মানবকে বৎস কল্পনায় নবশস্যদুগ্ধ কি আর কেহ পান করাইবে না?

আবার কি শস্যশ্যামলে মানব কল্যাণে হিংসা দ্বেষ হানা-হানি ডুবাইয়া অমৃত ফুটিবে না?

স্তন্যপানতরে শুধু সন্তানই কাতর হয় না, সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য মাতাও কম কাতরা নহেন। তাই আজ দিকে দিকে যখন মর্ম্মভেদী হাহাকার, ব্যথিতা বসুধা ডাকিতেছেন—

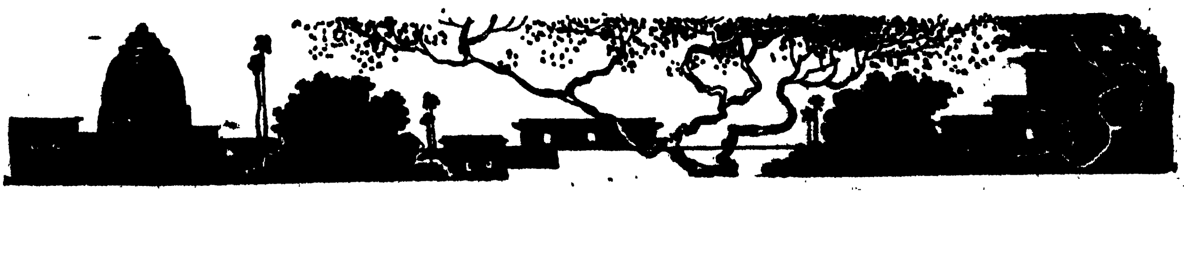
হে মানুষ, হে ক্ষুধার্ত্ত, আমি যুগযুগের প্রসিদ্ধ সুরভি, আমাকে দোহন কর, আমি প্রতি ক্ষুধিত মুখে ক্ষীরধারা সিঞ্চন করিব।

ধাত্রী ও বিধাত্রী এই বসুধাই প্রতি যুগশেষে মানুষের স্তিমিত শক্তিতে তরঙ্গ আনিয়াছেন। প্রতি যুগশেষে আবার নবযৌবন প্লাবনে মানুষ ভাসিয়াছে। আবার সুরভি মানুষের সর্ব্বকামনাই পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতি যুগশেষে এই নবযৌবনসুধা যিনি বহাইলেন, তিনিই তো দোগ্ধা, তিনিই তো পালক। মানুষের ইতিহাসে প্রতি যুগশেষে একএকটি অপরূপ প্রতিভা আসিয়াছে—মানবেরই কল্যাণে নবজীবনরচনায় পৃথিবীদোহন করিতে।

আজ এক কণা শস্যের জন্য মানুষে মানুষে হলাহল পান করিতেছে, ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে পরস্পরের ধ্বংসের জন্য। আজ তাই তো একান্ত প্রয়োজন ক্ষুধিতের তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য হিংসাহলাহলকে পাতালে ডুবাইয়া পৃথিবীদোহন।

মানুষ সেই পৃথিবীদোহনে বিষদুগ্ধ পান করিতে চাহে নাকো আর, চাহে না রুধির দুগ্ধ। আজ হিংসা নয়, রক্তপাত নয়, মানুষ চাহিতেছে শুধু ধরিত্রীর বক্ষসুধা গলাইয়া কিছু শস্যদুগ্ধ।

পৃথিবীদোহন করিয়া মানুষ বাঁচিতে চাহে। আজ মানুষ আবার ফিরিয়া পাইতে চাহে সেই শস্যশ্যামলে ভরা অমৃত।



দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

অপর্ণা গৌরীর নিকট হইতে ফিরিয়া দেখে অজিত কোর্ট হইতে সকালেই ফিরিয়াছে। অজিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই অপর্ণা কহিল—ও বাড়ীতে গেছলুম, আলাপ ক'রে এলাম।

—ভাল, রাজার দেখা মিল্‌লো?

—না, রাজা আফিসে। রাজার দর্শনে ত যাইনি, রাজমাতা ও রাণীর সঙ্গে আলাপ হ'ল?

—কেমন জম্‌লো?

—তা কি একদিনেই জমে? বড়লোক বলে একটু আড়ষ্ট হ'য়ে ত থাক্‌বেই, তারপর তাড়াতাড়িতে একটু ভুল ক'রলাম—

—কি?

—চা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু না খেয়ে এসে ভাল হয় নি। আভিজাত্য তথা গর্ব্ব মনে ক'রতে পারে।

—পারে। তা রাজপুত্র?

—রাজকন্যাকেনিয়ে গিয়েই একেবারে ডিস্‌ইন্‌টারেষ্টেড, তখন চড়ুই পাখীকে চাল খাওয়ানো হ'ল। সত্যিই অমন দস্যি ছেলে নিয়ে পারাও দায়। আজ নিজে দরজা খুলে পালিয়েছে।

—কেমন ক'রে গেলে?

—পেছনের দরজা দিয়ে ঝিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কেন? তোমার আপত্তি থাক্‌লে স্পষ্ট ক'রে বলো—

অজিত বলিল—না, তুমি ত আর এমন অসূর্য্যম্পশ্যা নও; একা একা ত ক'লকাতা ঘুরে বেড়িয়েছো। তবে আমি ঠিক আমার এ মন নিয়ে হয়ত ওদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশ্‌তে পারতুম না। তোমার মনটা একটু ডিমোক্রেটিক।

অপর্ণা কহিল—জানি না কেন, ওই ছেলেটা আর ওর মাকে জানবার একটা অদম্য কৌতূহল আমার মনে আছে। ওদের এই শান্তিময় জীবনযাত্রার মাঝে ওরা কতখানি সুখী।

—কি দেখ্‌লে?

—একদিনেই কি দেখা হয়? ছেঁড়া পাঞ্জাবী দিয়ে রুমাল কি ব্লাউজ ক'রবে তাই ভাবছিল। এই যে অনটন, এর মাঝে একটা ত্যাগের প্রতিযোগিতা চলেছে হয়ত—

অজিত হাসিয়া কহিল—তবে প্রাচুর্য্যই কি ভালবাসার অন্তরায়! যাক্‌, আজ একটু ড্রাইভ ক'রতে যাবো, তুমি যাবে সঙ্গে?

—যাবো। আমাকে ড্রাইভ ক'রতে দিতে হবে কিন্তু।

—হ্যাঁ। তোমার যখন লাইসেন্স রয়েছে তখন বারণ ক'রলেই বা শুনবে কেন? তবে বেচারা দু'চারজনকে চাপা দিও না।

অপর্ণা ব্রীড়াভঙ্গি করিয়া কহিল—তোমার মত র‍্যাস্ ত আমি নয়।

—গরুর গাড়ী চালালে বিপদ কম।

মাসের ২৫শে হইলেও অমল কিছু ফল ও ছানা লইয়া ফিরিয়াছিল—

পরদিন দুপুরে গৌরী অমলেরই একটা গল্প পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। খোকা সদর দরজার অলিন্দে বসিয়া নানারূপ ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিল এমনি সময়ে কড়ার মৃদু শব্দ হইল। খোকা নানারূপ চেষ্টা করিয়াও দরজা খুলিতে পারিল না, তাই মা'কে আসিয়া ডাকিল।

কে আসিবে তাহা জানা ছিল, অতএব গৌরী উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—আসুন।

অপর্ণা নমস্কার করিয়া একটু অগ্রসর হইতে হইতে দেখিল, মায়ের পিছন দিকে দাঁড়াইয়া খোকা কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়া তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। অপর্ণা কহিল—খোকা, আমি কে?

খোকা একটু থতমত খাইয়া কোন জবাব দিল না। পুনরায় প্রশ্ন করিলে স্মিতহাস্যে বলিল—রাজকন্যা।

অপর্ণা হাসিয়া উঠিল, গৌরীও হাসিল। অপর্ণা ঝিকে বলিল—তুই যা, ঘণ্টা দু'য়েক পরে এসে আমাকে নিয়ে যাবি। আর বাবু যদি বাড়ীতে আগেই আসে ত খবর দিস্।

ঝি চলিয়া গেল।

গৌরীর গৃহে একটি শয্যা, একটি টেবিল ও চেয়ার এবং একটি আলমারী ছাড়া কোন আসবাবপত্র নাই। বসিতে হইলে হয় শয্যায়, না হয় চেয়ারে। অপর্ণা বিছানায় বসিয়া খোলা মাসিকখানা টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—কি পড়ছিলেন ?

গৌরী লজ্জিতভাবে বলিল—পড়া নয়, ছবি দেখছিলাম। অপর্ণা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিল, জনৈক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্প। কতদিন এই লেখকের গল্প পড়িয়া সে ভাবিয়াছে এই কি সেই অমল ? সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়া সে হয়ত কোন স্কুলে, না হয় সওদাগরী আফিসে চাকুরী করে; তাহার মাঝে আজও কি কাব্যপ্রতিভা বাঁচিয়া আছে ? তাহার লেখার মাঝে আপনাকে খুঁজিয়াছে কিন্তু পায় নাই—

অপর্ণা ক্ষণিক পরে প্রশ্ন করিল—গল্পটা কেমন পড়লেন ?

—ছাই।

গল্পটা অপর্ণার পড়া ছিল, সে কহিল—আপনি ত ছাই বলবেনই—আপনাদের ত আর এমন নয়। এ লেখকের যেন স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই, না ? আপনার কাছে তাই ভাল লাগেনি—

—কেন ?

—দূর থেকে যা দেখেছি তাতেই ব'লতে পারি। যে রকম ক্যারম খেলা, আর তার পরে উঠানের মাঝে—অপর্ণা অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল।

গৌরী লজ্জারক্তিম মুখখানি নীচু করিয়া কহিল—ওই ত ওর দোষ। আমি লেখাপড়া জানি না বলে ওর কি রাগ—দিবারাত্রি তাই ঝগড়া করে—

অপর্ণা তাহাকে বিশ্বাস করে নাই এমনিভাবে হাসিয়া উঠিল—এ যেন অভিমান।

গৌরী তাই বলিল—সত্যিই, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে পড়াতে সুরু ক'রলে কিন্তু কি করি—ওই দুরন্ত ছেলে নিয়ে কি পড়া হয়। তার পরে রান্না করা—সংসারের কাজ—

অপর্ণা ঠাট্টা করিয়া কহিল—পড়তে পড়তে ঝগড়া হয়নি ? ধরুন কলম্বস মহম্মদ তোগলকের বেয়াই কিনা—এই নিয়ে যেমন এই গল্প হ'য়েছে—

গৌরী হাসিয়া মুখ নীচু করিল, কোন জবাব দিল না। অপর্ণা ভাবিল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এই সংঘাত চলিয়াছে চিরদিন। একের পাওয়ার সহিত আর একজনের দেওয়ার বিভেদ কত দূরপ্রসারী। অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আপনি তাহ'লে তাকে ভালবাসেন না ?

গৌরী প্রতিবাদ করিল—তা কেন ? ওই ত অমনি। একা একা রাত্রে কি করে, কিন্তু আমি কি জেগে থাকতে পারি ওর সঙ্গে ?

—কি করেন ?

—ছাইভস্ম লেখে, আর মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা বলে—শুনলে হাসি পায়, কিন্তু হাসলে বিপদ ?

—কেন ?

—সে সব কি কাব্য-কথা, অত শত আমি ত বুঝি না। চাঁদ উঠলে একরকম হবে, বৃষ্টি হ'লে হয়ত কাঁদতে হবে—রোদ উঠলে হয়ত গান ক'রতে হবে। গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিল, অপর্ণা বুঝিল এই ব্যঙ্গের মাঝে গৌরীর গর্ব্ব ও আনন্দ প্রস্রবণের বাইরে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপর্ণা তাই কহিল—সেজন্যে মনে মনে ত বেশ খুসী, আর কেবল দুষ্টুমী করা হয় না ? আপনার ওঁর নাম কি ?

গৌরী জবাব দিল—নাম সে করে না; সহসা সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। খোকা টবের মধ্যে নামিয়া জলকেলি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিজদেহ দিয়া খোকাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়া প্রসঙ্গান্তরে কহিল—দেখেছেন, দু'দণ্ড কি সুস্থভাবে কথা বলারই উপায় আছে ?

খোকা মাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে—যাবো, আমি যাবো—

অপর্ণা কহিল—খোকন, এস, আর যায় না।

খোকা সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার রুচিমত চীৎকার করিতেছিল, অপর্ণা কহিল—না, একখানা ঘুড়ি দেব, কেমন উড়বে।

খোকা একটু চিন্তা করিয়া কহিল—দাও।

—কাল দেব। কেমন ?

খোকা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—কাল ?

কড়ায় শব্দ হইল। খোকা কহিল—দরজা খুলি মা ?

গৌরী জিহবায় একটু কামড় দিয়া কহিল—ইস্, আজ ত শনিবার, তাই সকালেই ফিরেছে—

—কি করে বুঝলেন ?

—ওই কড়ার শব্দে, আচ্ছা ওকে মার ঘরে পাঠিয়ে দেব, কেমন ?

অপর্ণা কহিল—দরকার কি ? আমি না হয় আলাপই ক'রলাম। অসূর্য্যম্পশ্যা ত নয়—

অকস্মাৎ অমল আসিয়া একেবারে ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে অপর্ণার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—অপর্ণা !

অপর্ণাও সঙ্গে সঙ্গে কহিল—অমল ? কি ভাগ্যচক্র, শেষে তোমার বৌ'এর সঙ্গে আলাপ ক'রতেই ছুটে এসেছি এখানে ?

গৌরীর মুখখানা দেখিতে দেখিতে শাদা হইয়া গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া সে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। অমল চেয়ারটার উপর বিবশ দেহটাকে কোনমতে বসাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অকস্মাৎ কহিল—হ্যাঁ, ভাগ্যচক্রেই বলতে হবে, নইলে খোকা রাজকন্যা খুঁজতে তোমার ওখানেই যাবে কেন ? এসেছ ভালই হ'য়েছে, একটু চা খেয়ে নাও। তোমাকে আজ আপনি বলাই হয়ত সঙ্গত ছিল কিন্তু সম্ভব নয়। গৌরী একটু চা' ক'রে দাও।

গৌরীর খাবার প্রস্তুত ছিল, সে ষ্টোভ জ্বালিবার জন্য স্পিরিটও ঢালিয়াছিল। অমল আফিসের জুতা খুলিতে খুলিতে কহিল—রাজকন্যা খোকাও পায় নি—খোকার বাবাও খুঁজে খুঁজে পরশ পাথরের সন্ন্যাসীর মত ঘুরছে—পুরাতন দীর্ঘপথ মৃতবৎ পড়ে আছে সাম্নে দিগন্ত বিস্তৃত। অমলের মা আসিয়া কহিলেন—অমল এলি রে ?

অমল কহিল—হ্যাঁ মা। ইনি কে চিনেছ ? কলেজে পড়বার সময় তোমার অসুখ হ'লে একজন তোমার কুশল সংবাদ পাওয়ার জন্যে পত্র দিয়েছিলেন মনে আছে ?

মা বলিলেন—হ্যাঁ।

—এই সেই অপর্ণা।

অপর্ণা মায়ের উদ্দেশ্যে কহিল—সেই সামান্য ঘটনাটা এতদিনও মনে ক'রে রেখেছেন ?

জবাব দিল অমল—কারণ, ওঁর কুশল প্রশ্ন এক আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ করেনি কোনদিন। আমরা একসঙ্গে এম-এ পড়েছি মা, আমি সেকেণ্ড ক্লাস—উনি ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলেন।

অপর্ণা লজ্জিত হইয়াছিল, কহিল—সেকথা তুলে কি হবে ? তোমার নোট পড়েই আমি ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছি।

মাতা কহিলেন—বহুদিন পরে ত তোমাদের দেখা না ? ভালই হ'ল পাশাপাশি বাড়ী।

অমল অপর্ণাকে কটাক্ষ করিয়া কহিল—কিন্তু ব্যবধান অনেক।

—কিন্তু এটা তোমার বাড়ী তা ঠিক না পেয়েই এসেছিলাম।

মাতা বাহির হইয়া ধাবমান খোকার অনর্থ নিবারণে মনোযোগ দিলেন। অমল অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পাইয়া কহিল—কেন ? তোমাদের মত বড়লোকের বাড়ীর বৌ'রা সাধারণতঃই আসে না। তাদের অন্য সমাজ, অন্য ব্যবস্থা।

অপর্ণা একটু থামিয়া কহিল—অসাধারণ কিছুকিছুও মাঝে মাঝে ঘটে, তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভাল। তোমার বৌএর সঙ্গে আলাপ ক'রবার একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছে ছিল—তোমাদের ক্যারম খেলা, মাংস রাঁধা ব্যাপার দেখে। সুযোগ ছিল না, খোকার ভুল সে সুযোগ এনে দিল।

—ইচ্ছেটা দুর্দ্দমনীয় হ'ল কেন ?

—মনে হ'ল তোমরা খুব সুখী দম্পতি তাই।

—কেন, তোমরা ?

—আলোচনা ক'রে লাভ নেই, অন্ততঃ আজ।

অমল হাসিয়া বলিল—ও আলোচনা না হয় থাক্, কিন্তু আমরা খুব সুখী এ ধারণার মূলেও ত কোন হেতু নেই। তবে অকারণ কাউকে কোন দিন দুঃখ আমি দেই নি—

গৌরীর চা হইয়া গিয়াছিল। অমল বলিল—আমাদের দু'জনকেই দাও, এক সঙ্গে আমরা খেয়েছি বহুদিন। গৌরী খাবার ও চা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল—সম্ভবতঃ অভিমানে, না হয় অশুভের আশঙ্কা করিয়া। অপর্ণা ও অমলের এই সাক্ষাৎকে মনে মনে সে কিছুতেই সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

অমল ডাকিল—গৌরী। অপর্ণা তোমার কাছেই এসেছে সেকথা ভুলো না—

গৌরী 'আস্‌ছি' বলিয়া চলিয়া গেল।

অমল কহিল—আমার এ অস্বচ্ছল গৃহের মাঝে তুমি অতিথি হ'য়ে আসবে একথা ছিল স্বপ্নাতীত—আজ ভাগ্য-চক্রে যদি তাই ঘটেছে তবে আমাদের সামান্য সৌজন্যকে গ্রহণ ক'রে ধন্য ক'রো।

অপর্ণা অত্যন্ত কাতরদৃষ্টিতে অমলের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া কহিল—এতদিন পরেও কি আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে, আঘাত ক'রে তুমি আনন্দ পেতে চাও? আমাকে বেদনা দিয়ে তোমার লাভ?

—লাভ নেই। তুমি আজ আমার আঘাতের অনেক উপরে, তাই কেবলমাত্র সৌজন্যই প্রকাশ ক'রতে চেয়েছি।

অপর্ণা চা'য়ে চুমুক দিয়া সজল চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—ভাল। ভুল ক'রেছি জানি, কিন্তু আজ ত সে ভুল শোধরাবার কোন উপায় নেই—তা কি ক্ষমার বাইরে।

—ক্ষমা! তুমি হাসালে, তুমি কোন ভুল ক'রনি। আমার অন্যায় স্পর্দ্ধাকে আজ আমি তিরস্কার করি।

—সেকেণ্ড ক্লাস না হ'লে হয়ত আজ—অপর্ণা বলিতে পারিল না, সহসা থামিয়া গেল।

অমল সমবেদনার কণ্ঠে কহিল—সেজন্যে আর যাই হৌক্, তোমাকে দায়ী ক'রবো না। আমার মনটাই তখন বাঁধনের বাইরে চলে গিয়েছিল তাই, নইলে হয় ত হ'তে পারত—

দুইজনই অকস্মাৎ চুপ করিয়া গেল। অপর্ণা তাড়াতাড়ি আঙুর কয়েকটা মুখে ফেলিয়া দিয়া কি যেন ভাবিল। অমল বাইরের পানে চাহিয়াছিল। অপর্ণা কহিল—অমল, তুমি যে একান্ত একাকী নিশীথ রাত্রে উঠানে ঘুরে বেড়াও সেকথা আমি জানি—আমিও একান্ত একা ঝুলবারাণ্ডায় বসে দেখি। আমার কাছে তোমার কিছুই গোপন নেই, সম্ভবতঃ এই জন্যই তোমার ছেলে তার কচি হাতে এমনি-ভাবে উঁচু থেকে টেনে নামিয়ে এনেছে, কিন্তু আজ কেমন ক'রে তোমায় আমি সমস্ত বল্‌বো?

অমল কাতরকণ্ঠে কহিল—লাভ নেই, অপর্ণা। আমাদের চাওয়ার ত কোন শেষ নেই, আজ বিবাহিত জীবনে বুঝেছি যে মানুষ একা, একান্তই একা। নইলে গৌরীর কোন ত্রুটি নেই, তবুও আমি কেন তৃপ্তিহীন জীবন-যাপন করি? আমার দেহাতীত মনের ব্যসন তুমি, তোমাকে আপনার ক'রে পেলেও মনের সে ব্যসনবৃত্তি যেতো না।

—জানি, তবুও তোমার সে বিদায়ের দিনটি নিরন্তর আমাকে যেন সাপের মত দংশন করে—

গৌরী আসিয়া পড়িল—যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা আর চলিতে পারে না। অপর্ণা একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—কবিতা ছেড়ে, গল্প লিখতে সুরু ক'রেছ কতদিন? তোমার লেখাই যে পড়ি, তা'ত এতদিন জানতুম না।

—আজ জান্‌লে, এখন মনোযোগ দিয়ে প'ড়ো।

গৌরীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া অপর্ণা কহিল—ওর সমস্ত গোপন কথা লিখে ফেলেছ যে?

গৌরী হাসিয়া কহিল—আমার কেন?

অমল একটু ব্যঙ্গের সুরে কহিল—গোপনটা আমার—

গৌরী গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিল—ইস্— (ক্রমশঃ)

মধ্যযুগ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট্ (লণ্ডন)

মহম্মদ গোরীর আগমন হইতে অরঙ্গজীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ বা মুসলমান যুগ ধরা হয়। আমরাও এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় এই ধারণা লইয়া অগ্রসর হইব। এই যুগের প্রারম্ভে তুর্কীকতর্ক মুসলমান, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও কিছুদিন পরে বিহার এবং বঙ্গদেশ জয় করিয়া সমস্ত উত্তর ভারত নিজেদের করায়ত্তে আনয়ন করে এবং প্রায় পাঁচ শত বৎসরের উপর নিজেদের অপ্রতিহত প্রভুত্ব বজায় রাখে।

বারশত খৃষ্টাব্দের পরিশেষে হিন্দুসমাজের যে গঠনপ্রণালী চলিত ছিল তাহাতে ভারতবাসীরা যুদ্ধে বড় একটা যোগ দিত না। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অথবা শূদ্রের যুদ্ধের সহিত কোনও সম্পর্ক ছিল না। দেশ রক্ষা কেবল ক্ষত্রিয়ের কর্ম এরূপ একটা ধারণা সমাজের সকল স্তরের মধ্যেই বদ্ধমূল ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধে ক্ষয় হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা সংখ্যাতেও আর অধিক ছিল না। আবার ক্ষত্রিয়বর্গের মধ্যেও সর্ব্বদাই কলহ লাগিয়া থাকিত। শৌর্যে, বীর্য্যে রাজপুতেরা নিজেদের

শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া উত্তর ভারতের অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া লয়। মুহম্মদ গোরীর আগমনকালে দিল্লী, কনৌজ, আজমীর, বুন্দেলখণ্ড ও গুজরাত ইত্যাদি প্রদেশ রাজপুতবর্গের কবলে ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব আদৌ ছিল না। গুজরাতী বা বুন্দেলারা সাধারণতঃ দিল্লীর বা কনৌজের রাজাদের অনুরাগী ছিলেন না, বরং যখন সুবিধা পাইতেন তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। আর দিল্লী ও কনৌজের রাজাদের ত কথাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ এরূপ ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল যে মুহম্মদ গোরী লাহোর হস্তগত করিয়া আরও পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছেন ইহা জানিয়াও তাঁহারা নিজেদের বিবাদ হইতে বিরত হন নাই। ফলে যখন মুহম্মদ দিল্লী সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন, কেবলমাত্র রাজপুতবর্গের চৌহান শাখাই যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, কাজেই দিল্লী মুসলমানদ্বারা সহজেই অধিকৃত হয় এবং ইহার মাসকয়েক পরে আজমীর এবং কনৌজও সহজেই বিজিত হয়। ইহা হইতে আপনারা ভারতবাসীর পরাজয়ের প্রধান কারণ কি ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। মুষ্টিমেয় রাজপুত ছাড়া অন্ত শ্রেণী বা জাতির মধ্যে দেশপ্রেম আদৌ ছিল না।

এই যে অরাজপুতবর্গের মধ্যে নির্লিপ্ততার ভাব দেখিতে পাই ইহাই আমাদের অবনতির এবং তৎসঙ্গে আজ পর্য্যন্ত স্থায়ীত্বেরও কারণ। সেকালে নাগরিকেরা যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিমগ্ন থাকিত মফস্বলবাসীরা তেমনি নিজেদের গ্রামের কাজে ব্যস্ত থাকিয়া দিন কাটাইত। হয় তাহারা একজোট হইয়া গ্রাম সম্বন্ধীয় কার্য্য সকলের ব্যবস্থা করিত, না হয় নিজেদের চাষবাসে নিযুক্ত থাকিত। তাহার ফলে যখন পাঁচশত বৎসর পরে মুসলমান শাসনের অবসান হইল তখনও পল্লীবাসীরা নিজেদের গ্রামের সাধারণ কাজেই এত লিপ্ত যে, অন্য কোনও দিকে দৃকপাত করিবার অবসর তাহাদের ছিল না। পল্লীবাসীদের এই চিরন্তন ভাবই বিশেষ লক্ষনীয়।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে মুসলমান রাজকর্ম্মচারীরা গ্রামবাসীদের কার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিত না। গ্রামবাসীর সহিত কর্ম্মচারীদের খাজনা লওয়া পর্য্যন্ত সম্পর্ক ছিল। ইহা আদায় হইয়া গেলে তাহারাও গ্রাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। কতকটা এই কারণেও আমরা আজও দেখিতে পাই যে সেই পুরাতন গ্রামের পটওয়ারী, চৌকিদার, মুখিয়া বা মুকদ্দম ও গ্রামের পঞ্চায়ত গ্রামের সংরক্ষণ করিতেছে।

যখন মুসলমানেরা প্রথম ভারতবর্ষে আসে তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় থাকায় জন্য বাধ্য হইয়া হিন্দুপ্রজাবর্গের প্রতি উদার পন্থার প্রবর্ত্তন করে। হিন্দুদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা, ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাসকলের শ্রীবৃদ্ধি করা, এমন কি তাহাদের ধর্ম্মে সকল সময়ে হস্তক্ষেপ না করা এই সকল নীতির প্রতি মুসলমানদের লক্ষ্য ছিল। তবে মুসলমানরা সাধারণতঃ বেশ গোঁড়া, সেজন্য মধ্যযুগেও তাহাদের গোঁড়ামির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা নিকটস্থ হিন্দু রাজাদিগের নিধন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লওয়া, কিম্বা হিন্দু প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা বা তাহাদের মন্দিরাদি ধ্বংস করা ইত্যাদি।

মুসলমানেরা যে উদারপ্রকৃতির ছিল তাহার দুএকটা দৃষ্টান্ত এই স্থলে দিতেছি। কুতুবমিনারের নির্ম্মাণ কার্য্য দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের শেষে আরম্ভ হয়। তাহার প্রথম তলের শিলালিপিতে কুরাণ হইতে উদ্ধৃত আয়াতের মধ্যে "লা ইক্রাহা ফিদ্ দিনে" এই বাক্যটী আছে। ইহার অনুবাদ এইরূপ "ধর্ম্মে কোনও প্রকারের জোর জুলুম বা জবরদস্তি নাই।" তাই যখন পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর মুহম্মদ গোরী দিল্লী অধিকার করেন তখন হিন্দুদিগকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। আবার জৌনপুরে ও বিজাপুরে যখন স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয় সেখানেও প্রথম হইতে কোনও একটা বড় মসজিদে ঐ বাক্যটী ক্ষোদিত করিয়া মুসলমানবর্গকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা যেন হিন্দু প্রজার প্রতি কোনও প্রকার গোঁড়ামি না দেখায়।

এ সম্বন্ধে আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। মুঘল বাদসাহেরা বেশ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বাবর ও হুমায়ুঁর সুন্নি ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তবুও তাঁহারা অন্য ধর্ম্মের প্রতি বা ইশলাম ধর্ম্মের অন্য শাখার প্রতি কোনও প্রকারের বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করেন নাই। বাবর নিজ জীবনচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোয়ালিয়রে হিন্দুমন্দিরাদি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ বোধ করেন (enjoyed); আবার বিহার অভিযান পথে একস্থানে ইহা দেখেন যে মুসলমানেরা হিন্দু যোগীর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতেছে; তাহাতেও কোনওরূপ নিষেধাত্মক বিধান প্রচার করেন নাই।

মুঘল বাদশাহদিগের মধ্যে প্রথম তিন জনের রাজত্বকালে ইরাণের শাহ সুন্নিবর্গের উপরে অতিমাত্রায় অত্যাচার করিতেন এবং প্রতিফল-স্বরূপ সুন্নি সাম্রাজ্যগুলিও (যথা তুরস্ক প্রদেশের ও মধ্য এসিয়ার সুলতানেরাও) শিয়া বর্গের উপরে নানাভাবে অত্যাচার করিতেন। ফলে এই সকল প্রদেশের ন্যূনসংখ্যক শিয়া সুন্নিরা (minority) নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে বসবাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল।

এই উদারনীতির ক্রমোন্নতি যদি আকবরের সময়ে ইলাহি ধর্ম্মে দৃষ্ট হয় তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? যদিও আকবরের মৃত্যুর পরে ইলাহি ধর্ম্মের কথা বড় একটা শোনা যায় নাই, তথাপি জাহাঙ্গীর অনেকটা এবং সাহজহাঁ কতকটা আকবরের পদানুসরণ করিয়াছিলেন। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আলমগীর বাদশাহ এত পণ্ডিত ও বিচক্ষণ হইয়াও হিন্দু বিদ্বেষনীতি অবলম্বন করেন এবং মারাঠা, রাজপুত, বুন্দেলা, জাঠ ও শিখদের অসন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের বিদ্রোহী হইবার সুযোগ দেন। ইহারই পরে মুঘল রাজ্যের অবসান হয়।

আরও দু একটী কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি। প্রথমতঃ যে যুক্ত প্রদেশে ভারতের মুসলমান বাদশাহদের রাজধানী স্থাপিত ছিল সেই প্রদেশে আজও মুসলমানেরা সংখ্যায় হিন্দুর তুলনায় অতি অল্প। কেবল মাত্র শতকরা চৌদ্দ বা পনের। যদি মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিত তাহা হইলে কি তাহারা সংখ্যায় এত অল্প থাকিত? *

আর একটী কথা। ইতিহাস আমাদের ইহাই বলে যে দ্বাপর যুগের বৃন্দাবনের ধ্বংস শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যে সাধিত হয়। আজিকার সমৃদ্ধিশালী বৃন্দাবনের সংস্থাপনও মুঘল যুগেই হইয়াছে। যত বড় বড় পুরাতন মন্দিরাদি আজ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় কোনটাই তাহার ষোল খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের নয়। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে দিল্লীর মুসলমান বাদশাহেরা সকল সময়ে গোঁড়ামির পক্ষপাতি ছিলেন না বরং উদার নীতিই অবলম্বন করিতেন।

এইবার মধ্যযুগের আইন সকল ও বিচারকার্য্য বিবরণী লওয়া যাউক। পুরাতন বা চলিত আইনের সংশোধন ও নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের কথা সেকালে উঠিতই না। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই পূর্ব্ব প্রচলিত সনাতন রীতিই অচিরাৎ মানিয়া লইতেন। হিন্দুরা শাস্ত্রের ও মুসলমানেরা কুরান শরিয়তের দোহাই পাড়িতেন। যতক্ষণ কোনও মামলার দুই পক্ষই এক সমাজভুক্ত থাকিত ততক্ষণ কোন গোল বাধিত না। হিন্দুরা আপনাদের পঞ্চায়েত দ্বারা অথবা সুলতান নির্দ্ধারিত পণ্ডিতের দ্বারা সুবিচার পাইবার চেষ্টা করিতেন ও মুসলমানদের বিচার কাজি বা মুফ্তিও কখনও কখনও সুলতান নিজে করিতেন। গোল বাধিত যখন বাদী ও প্রতিবাদী ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন। আপনারা অনেকেই জানেন যে মুসলমানেরাও কয়েকটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা সুন্নি, শিয়া, ইস্মাইলিয়া, মুতজলা, মহদবী, বহরা বা খোজা ইত্যাদি এবং বিধির দিক দিয়াও তাহাদের মধ্যে কয়েকটী বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। যথা—হনফি, শাফিই, হবলি ও মালিকি। দিল্লীর সুলতানেরা বিভিন্ন দলের জন্ত পৃথক পৃথক কাজির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে যখন এক দলের সঙ্গে অন্য দলের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ঘটিত তখন সুন্নি সুলতানেরা কখনও কখনও অন্যায় করিয়া বসিতেন। হিন্দু প্রজার প্রতিও কখনও কখনও অন্যায় করা হইত। তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মুসলমান মজলিসে যদি হিন্দুরা গিয়া বসে তাহাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মসভায় মুসলমান গেলেই উহা মহা দুষণীয় ভাবা হইত। ফিরোজ তগলুক কতকটা এই কারণে একজন ব্রাহ্মণকে পোড়াইয়া মারেন। কাশ্মীরে সাহজহাঁ বাদশাহের পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের মধ্যে বিবাহাদির প্রচলন ছিল ও সেই সঙ্গে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে স্বামী ও স্ত্রী কতকটা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া চলিবেন। এমন কি স্ত্রী যদি হিন্দু পরিবার হইতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার শবকে দাহ করা হইত, যদি মুসলমান পরিবার হইতে আসিয়া থাকে তবে তাহাকে গোর দেওয়া হইত। পুরুষদের প্রতিও ওই নিয়মটী খাটিত। সাহজহাঁ বাদশাহের ইহা মনঃপুত হইল না। সেজন্ত তিনি নূতন করিয়া আজ্ঞা প্রচার করেন যে এই সকল বিবাহ সরিয়ত অনুযায়ী নয় বলিয়া মুসলমান সমাজ এইগুলিকে মানিয়া লইবে না। কেবল সেই বিবাহগুলি বিধিসিদ্ধ স্বীকার করা হইবে—যে স্থলে স্ত্রী হিন্দু ও পতি মুসলমান। কিন্তু যেখানে হিন্দু পুরুষ কোনও মুসলিম রমণীকে বিবাহ করিয়াছে সেখানে হয় পুরুষ ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করুক, আর না হয় সে নিজ মুস্লিম স্ত্রীকে ত্যাগ করুক।

মধ্য যুগের ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বেশ একটু নূতনত্ব পাওয়া যায়। যথা মুসলমান সমাজে নরহত্যা করাকে এরূপ গুরুতর অপরাধ মনে করা হইত না যে, তজ্জন্য সমাজ বা রাজকর্ম্মচারীবর্গ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। ইহা সেই মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান বা উত্তরাধিকারীবর্গের লক্ষ্যের বিষয় ছিল যে, তাহারা আততায়ীর বিপক্ষে বিচারালয়ে মামলা খাড়া করিবে অর্থাৎ এই নালিশ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরাই কেবল করিতে পারিত অন্য কাহারও এই অধিকার ছিল না। ফলে যেখানে মৃত ব্যক্তির কেবল মাত্র নাবালক পুত্রাদি থাকিত সেখানে অনেক সময় নালিশ করাই হইত না। আবার এমনও হইত যে সাবালক উত্তরাধিকারীরাও হত্যাকারীর নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহার বিপক্ষে মামলা চালাইতে চাহিত না। আবার মামলা বিচারালয়ে দাখিল হইলে এমন চারিটি সাক্ষীর প্রয়োজন হইত যাহারা স্বচক্ষে হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছে; মুসলমান আততায়ীর বিপক্ষে কেবল হিন্দু ফরিয়াদি থাকিলে মামলা খারিজ হইয়া যাইত। দুইটী হিন্দুর সাক্ষ্য একটী মুসলমান পুরুষের তুল্য ধরা হইত। পিতা মাতার বিপক্ষে সন্তান হত্যার অভিযোগ আদৌ গৃহীত হইত না। আবার কি ভাবে খুন করা হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরের উপর শাস্তির গুরুত্ব নির্ভর করিত। যদি লোহার যন্ত্রের আঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তবে শাস্তির পরিমাণ অধিক হইত; কিন্তু যদি লাঠি বা অন্য কোনও লঘু প্রস্তর আঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তবে শাস্তিও লঘু হইত। একবার কোনও দুই ব্যক্তি একটী শিশুকে বাল্তির জলে ডুবাইয়া মারে, মৌলভির বিচারে তাহার অতি অল্প সাজা হইয়াছিল।

কারু শিল্প বা কলা (art) সম্বন্ধে মুসলমান বাদশাহদিগের মোটের উপর সুখ্যাতিই করিতে হয়। যদিও ইসলামে প্রথম প্রথম কলার বিশেষ আদর ছিল না ও মুল্লারাও ইহার পোষকতা করিতে চাহিতেন না তবুও ভারতবাসীরা মধ্য যুগে ঐ বিদ্যার কয়েকটী শাখাতে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রথমে স্থপতি বিজ্ঞান বা Architectureই ধরা যাউক। মুসলমানদের ভারত আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসীরা এই শাখায় প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিল। মুসলমান পরিব্রাজক অল্ বরুণি মহমুদ গজনীর মথুরা আক্রমণ কালে সেখানকার বড় বড় প্রাসাদ মন্দিরাদি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যান ও নিজ বিবরণে উল্লেখ করেন যে এরূপ ভবনাদি নির্ম্মাণ করা ত দূরের কথা, মুসলমানেরা কল্পনাও করিতে পারে না। তাই মুহম্মদ ঘোরী যখন বারশ খৃষ্টাব্দের শেষে দিল্লী অধিকার করেন তখন হিন্দু শিল্পীগণের সাহায্যে তাঁহার কর্ম্মচারী কুতুবউদ্দীন ও পরবর্ত্তী লোকেরা সুবিশাল ভবন প্রাসাদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করান। যাঁহারা দিল্লী গিয়াছেন তাঁহারা কুওয়ত-উল্-ইসলাম মসজিদ, কুতুবমিনার, ইলতুতমিসের সমাধি হৌজ-ই-সমশি ইত্যাদি দেখিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে প্রত্যেকটী কিরূপ কারুকার্য্যখচিত। এইগুলি মুসলমানের, না হিন্দুর দ্বারা

নির্মিত [illegible] যে ভারতবাসীর দ্বারা নির্মিত ইহাই [illegible] হইবে। মুসলমানেরা এইরূপ কারুকার্য্য ভারতবাসীর নিকটেই শিখিয়াছে। এই শিক্ষার ফলেই [illegible] পরে আমরা সুবৃহৎ মুগল হর্ম্যাবলী ও সমাধির পরিকল্পনা দেখিতে পাই। আগ্রা ও দিল্লীর মোতিমসজিদ্‌দ্বয়, সেরশাহ, হুমায়ুঁ, আকবর ও ইতিমাদ্ উদ্দৌলার সমাধিগুলি, তাজমহল, আগ্রা এবং দিল্লীর প্রাসাদগুলি জগতে অতুলনীয় ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

যেমন স্থপতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হইল তেমনি অন্যান্য শাখার বিষয়ে বলা যাইতে পারে। সঙ্গীতশাস্ত্র, চিত্রকলা, মিনা করা বাসনের উপর কারুকার্য্য (enamel painting), চিত্রোপল শিল্প (mosaic work) অস্ত্রের বাঁট, সূক্ষ্ম স্বর্ণ বা রৌপ্য তারের কারুকার্য্য (filigree work), পুস্তকাধারের কারুকার্য্য (artistic book cases), জরীর বুটাদার রেশমী কাপড় (brocade), সূক্ষ্ম মল মল ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভারত তখন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আজ আমাদের এই দুর্দ্দিনে এ সকল স্বপ্নবৎ মনে হয় ও হৃদয়ে একটা অনুশোচনা জাগে যে সেদিন কি আবার ফিরিয়া আসিবে!

এইবার সেকালের সমাজের দু একটা দোষ দেখাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। প্রথমতঃ স্ত্রীলোকেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বড় একটা হস্তক্ষেপ করাটা আদৌ সুনজরে দেখিত না। রাজিয়া ইলতুৎ মিসের উপযুক্তা কন্যা হইয়াও চারি বৎসরও শাসন করিতে সক্ষম হন নাই। সংযুক্তার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহের পর হইতেই রাজা রাজ্যশাসনে শিথিলতা দেখান। আলাউদ্দীনের স্ত্রী ও শাশুড়ী সুলতানের মহা অশান্তির কারণ ছিলেন। নূরজাহাঁকেই জাহাঙ্গীরের রাজ্যের অবনতির কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য দু চারিটী দেবীপ্রতিম নারীও এই সঙ্গে দেখিতে পাই—যথা মুহম্মদ তুগলকের মাতা মখদুমা-ই-জহাঁ, সন্ন্যাসিনী-মীরাবাই, মুম্‌তাজ বেগম ও জাহানারা। তবে ইহারা কেহই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বড় একটা যোগ দেন নাই, কেবলমাত্র ধর্ম্মালোচনায় বা নানা-প্রকার পুণ্য কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন।

মুসলমানেরা পঞ্চ শতাব্দী যাবৎ রাজ্যশাসন করিয়াও পরিশেষে ওই পদদলিত হিন্দুপ্রজার নিকটেই পরাজিত হয়। ইহার একটা কারণ এই যে তাহারা সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে মন দেয় নাই। যদিও তাহারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের আবাসভূমি বলিয়া স্বীকার করে তবুও আকবর [illegible] অন্য সুলতানেরা হিন্দু প্রজার সহিত কোনওরূপ সৌহার্দ্দ্য-পূর্ণ [illegible] সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলমান [illegible] হিন্দুদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তাহাদের [illegible] ও [illegible] বধ করিয়া, তাহাদের নরকে পাঠাইয়া নিজেরা ধর্ম্মশালী হইতে পারিয়াছেন ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। কেবল আবুল ফজলেতে এই দোষ দেখা যায় না এবং তিনিই কতকটা আকবর বাদশাহকে উদার নীতির দ্বারা চালাইতে উৎসাহিত করেন এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সকল প্রকারের ভেদগুলি মুছিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেন। এই নীতি যদি মুসলমানেরা সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে মুঘল সাম্রাজ্য এত শীঘ্র অস্তমিত হইত না।

অন্যদিকে হিন্দু প্রজারাও এমন নিশ্চেষ্ট ভাবে জীবন যাপন করিত যে, রাজধানীর কোনও সংবাদ তাহারা রাখিত না। নূর জহাঁ, খসরু কারাগারে বাঁচিয়া আছে না মরিয়া গিয়াছে, দারা সিকোহ অরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী না পরাজিত হইল এরূপ কোনও রাষ্ট্রীয় ঘটনা লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিল না। অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে সুদূর দক্ষিণ প্রদেশে যখন শিবাজী তাঁহার মারাঠা দল লইয়া বাদশাহের হিন্দু বিদ্বেষপূর্ণ নীতি সকলের প্রতিবাদস্বরূপ মস্তক উত্তোলন করেন তখনও উত্তর ভারতীয়েরা তাঁহার সহিত বড় একটা যোগ দেয় নাই। মারাঠারাও অরঙ্গজেবের সময়ে বা বাদশাহের মৃত্যুর পরে নিজেদের কর্ত্তব্য কেবল এইটুকু মনে করিতেন যে, মহারাষ্ট্র দেশবাসীরা যেন সুখে দিন যাপন করে। ভারতের সকল হিন্দু নেতা একযোট হইয়া কোনও দেশহিতকর কার্য্যপদ্ধতির অবতারণা করেন নাই। মারাঠারা যদিও নিজেদের হিন্দু সমাজের মুক্তিদাতা বলিয়া প্রচার করে তবুও উত্তর ভারতের নিরীহ কৃষকবর্গের বিলুণ্ঠিত অর্থধারা মহারাষ্ট্র প্রদেশের উন্নতিতে ব্যস্ত থাকিত। বলাবাহুল্য ইহার ফল বিষময় হয়। মারাঠারা মুঘল সাম্রাজ্যের বিনাশ করিতে অবশ্য সক্ষম হয় কিন্তু তৎস্থলে নিজেদের কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে সক্ষম হয় নাই। দেশে হিংসা ও বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব এত অধিক পরিমাণ ছিল যে, ঐতিহাসিকেরা বলেন, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে যত না মারাঠা সমর-ক্ষেত্রে হত হইয়াছিল তাহা হইতে বহু অধিক সংখ্যক পরাজিত ও পলায়িত মারাঠা হিন্দু কৃষকদের হস্তে প্রাণদান করে। মারাঠা বা অন্য কোন হিন্দু ইহা উপলব্ধি করে নাই, এই পরস্পর [illegible] ফল ইহাই হইবে যে, শীঘ্রই কোন বিদেশীয় শক্তি আসিয়া তাহাদের সকলেরই উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। রাষ্ট্রীয় নির্লিপ্ততাই হিন্দুদিগকে অতিসহজেই এই দুইয়ের যার্থপর বিদেশীর শাসন মানিয়া লইতে সম্মত করায়।

যাত্রী

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এম-এ

রক্তমাখা [illegible]
নেমে আসে [illegible] কাল যবনিকা—
পূরবের পাণ্ডুর [illegible]
ভেসে ওঠে প্রান্ত শীর্ণ ম্লান শশীলেখা।

[illegible] পথিক—
পথ চলে [illegible] উন্মনা নির্ভীক।
যাত্রা তার [illegible] যে শেষ—
একটী প্রদীপ [illegible] শুধু তারি লাগি জ্বলে নির্নিমেষ।

সার্বজাতিকতা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

লক্ষ্মণ সেনের বুদ্ধি প্রখর, মেধা সক্রিয়, এ কথা তার শত্রু-পক্ষকেও স্বীকার করতে হয়। ঐ প্রখরতা এবং ক্রিয়া-শীলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার তারুণ্যে নাম-পরিবর্ত্তনের প্রক্রিয়ায়। লক্ষ্মণ ত্রেতার নাম, সেন সহযোগেও খৃষ্টীয় একাদশ শতকের। এ দিনে ও নাম বিশেষত্ববিহীন। তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রাক্কালে, অবশ্য পিতার অনুমতি নিয়ে, যে নিজের নামকরণ করেছিল—অমিয় সেন। অমিয় সৃষ্টির চিরসাথী! অমিয়র অপভ্রংশ অমি শব্দটা মোটেই শ্রুতি-কঠোর বা বাজারে নয়। কিন্তু লক্ষ্মণের ডাকনাম লকা—ওঃ সর্ব্বনাশ।

তার মেধার অগ্রগতির পথ ছিল প্রতি পদে মৌলিক। বঙ্গ আমার—বল্‌তে তার বাক্যে বাণীর আশীষ মূর্ত্ত হ'ত। কিন্তু তার রুচি প্রকটিত হত কাবুলী মেওয়ায়, বোম্বাই ছিটে, মাদুরা সাড়িতে, পাঞ্জাবী পিরাণে এবং পাট্‌নাই মুগুর ডালে। নারীর রূপ সম্বন্ধে তার বচন বাঙ্গালিনা-কোমলতার প্রশংসা-মুখর ছিল। কিন্তু অন্তরাত্মা পশ্চিম-ভারতের বলিষ্ঠা সুন্দরীর চঞ্চল-চল-চরণ-ভঙ্গে মুগ্ধ হ'ত। এমন কি নেপালিনী লেপ্‌চানী এবং ভুটিয়ানীর স্বাধীন নির্ভয় চলন ও চাহনী তার প্রাণে ব্যাকুলতার লহর তুল্‌তো। সাহস ও স্পষ্টবাদিতার উপর প্রবন্ধ লিখে শ্রীমান অমিয় সেন এক প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক লাভ ক'রেছিল। কিন্তু সংসারের নিত্য-চলার-পথে সে ঐ সদ্‌গুণ দুটিকে ব্যবহার করত না। যা উত্তম তা প্রত্যহ ব্যবহার্য্য নয়। কাঁসার থালায় দৈনন্দিন ভোজন চলে—কিন্তু সোনার থাল বিশেষ দিনের সামগ্রী। সূর্য্য চব্বিশ ঘণ্টা দেখা দেন না কারণ তিনি সৃষ্টির আদি কারণ। সাহস সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত অমিয় সেনের ঐ প্রকার ধারণা। নিত্য সাহস দেখিয়ে অপ্রিয় কলহের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করা গুণ্ডামী। স্পষ্ট কথায় কষ্ট নাই, কারণ সোজা কথা বলতে মেধার উদ্ভাবনী শক্তির অপচয় অনাবশ্যক।

এই সব ভিন্ন মুখ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে নিজের সুকুমার যৌন বুদ্ধি প্রতিহত হত কাম্য জীবনসঙ্গিনী অনুসন্ধানের ব্যাপারে। সে বুঝেছিল পশ্চিমের সুন্দরী কর্ত্রী কন্যা-পাণি-গ্রহণের প্রস্তাবের অনিবার্য্য ফল হবে অবমান ও প্রত্যাখ্যান। নেপালীগুলা খুকরী নিয়ে ঘোরে। তাদের সমাজে সাথী নির্বাচনের অভিযান রক্তারক্তি কাণ্ডে পর্য্যবসিত হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। অথচ বাঙ্গালী কুমারীর চিত্তকুঞ্জে প্রেম ভিক্ষায় রোমাঞ্চ নাই। একদিন এ সব আলোচনার পর তার অন্তরঙ্গ সুধীরকুমার বল্লে—তুমি নিরেট ইডিয়ট, রাগ কর না অমিয়। ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ—

অমিয় বাধা দিয়ে বল্লে—গালাগালিতে আর্ট নেই। চীন ভাষায় তর্জ্জমা করলে এ গান চীন জাতির পক্ষে সত্য। ফিজী দ্বীপের জঙ্গলীদের মাতৃস্নেহ পবিত্র। বিস্তারের রহস্য নূতন শক্তির অর্জন। বাপ পিতামহ সবাই তো বাঙালীর ঘরে বিবাহ করেছে যার ফলে—যাক্।

সুধীর ছাড়বার পাত্র নয়। সে বল্লে—মোগোজের প্রপিতামহী কি বৃদ্ধ-প্রপিতামহী কবে কোন যুগে পর্ত্তুগীজ বিয়ে করেছিল, যার ফলে—যাক্।

তর্ক মতিগতি ফেরাতে পারে না। সেক্ষেত্রে অমিয়কুমার মুষ্টি-যুদ্ধে পরিণত করলে না বাক্‌যুদ্ধকে। মুচকী হেসে সে আলোচনা বন্ধ করলে। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তিত হ'ল। তর্ক উঠ্‌লো ল্যাজ কেটে দেশী কুকুরকে আশৈশব মাংস খাওয়ালে তার সাহস বাড়ে কিনা।

(২)

যিনি খান্ চিনি, তাঁকে জোগান চিন্তামণি। গ্রীষ্মের অবকাশে অধ্যাপক অমিয় সেন খাসিয়া পাহাড়ে বাস করবার সময় জীবনের অনেকগুলা সমস্যা সমাধানের সঙ্কেত সহজ দৃষ্টিতে দেখলে। বাঙলার মত দেশ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু শিলঙের বায়ু শীতল, চারিদিকে স্রষ্টার আপন তুলিতে আঁকা ছবি। এমন চিত্র অন্য কোথাও নয়নপথে পড়ে না। দার্জিলিঙ সুদৃশ্য। কিন্তু স্যানিটেরিয়াম হতে জলাপাহাড়ে উঠ্‌তে বুকের ধকধকানির

বল। খাসিয়া পাহাড়ে কদম কদম বাড়ায়ে যেতে হৃদ্‌পিণ্ড পদে পদে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রোপাগাণ্ডা করে না। আর সুন্দরের কথাই যদি উঠ্‌লো—দক্ষিণে বামে ইত্যাদি ইত্যাদি দশ দিকে সুন্দরী খাসিয়া যুবতী অবলীলাক্রমে বিচরণ করছে।

খাসিয়া মহিলার রূপে, হাবে বা ভাবে উগ্রতা নাই। শিল্প গোপনই শিল্পের সার্থকতা। সে নিজের প্রকৃতি-লব্ধ সৌন্দর্য্য এবং বস্ত্র-শিল্পীর নিপুণতা ঢেকে রাখে নিজের দেহলতাকে চাদর ঘিরে। ঘেরাটোপের অন্তর হ'তে মেখলা উঁকি মারে। মেখলা সুশ্রী পুষ্ট দেহের আবরণ।

যোগাযোগ অনাগত কালের সঙ্কেত। যখন বড়-বাজারে পণ্য-দ্রব্য এবং পসারিণী দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রফেসার অমিয় সেন হঠাৎ মিঃ জেকবের সাক্ষাৎ পেলে, ভাবী-কালের অঙ্কে যেন ঝলক দিয়ে বিজলী লিখলে—সুলক্ষণ। জেকব তার সহপাঠী। কলিকাতার কলেজে উভয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র ছিল। মাত্র মুখ-চেনা সহপাঠী—জেকবের ঘর বাড়ি বা জাতীয়তা সম্বন্ধে অমিয়র কোনো ধারণা ছিল না। মোটামুটি জানা ছিল, জেকব খৃষ্টান। তার রক্ত-পরীক্ষায় কোন জাতির রক্ত পাওয়া যাবে সে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে অমিয় বা তার দলের ছাত্রদের মস্তিষ্কে কোনোদিন লহর ওঠেনি। জাপান হ'তে বোম্বাই অবধি সকল প্রদেশে নাসিকার বহু বিভিন্নতা প্রতিভাত হয় পরীক্ষার ফলে। আজ অমিয় সেনের আত্ম-গ্লানি হ'ল—জেকবের জাতীয়তার অজ্ঞতায় অভিযোগে। যা কাঁচের মত স্বচ্ছ, তার অনুপলব্ধি মারাত্মক। সত্যই তো এর নাসিকা অনার্য্য।

"হ্যালো মিঃ জেকব।"

"আহা! মিঃ সেন।"

প্রথম উচ্ছ্বাসের অবসানে সেন বল্লে—তুমি শিলঙের লোক, এ কথা আমি পূর্বে জানতাম না।

জেকব মাত্র হাসলে। তার অনতিদূরে আর একজন গোপনে হাসলে। সে জেকবের ভগ্নী এল্‌সী। কিন্তু অগ্রজের সহপাঠীর সহজ দৃষ্টি এড়িয়ে শ্রীমতী এলসী আত্ম-গোপন করতে পারলে না। তাদের চারি চক্ষুর মিলন হ'ল। এলসি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে পাশের কাটা শূকরের মুণ্ড। জেকব দেখলে দুজন লজ্জিতকে।

সে তাড়াতাড়ি তাদের পরিচয় ক'রে দিলে। এলসি লেডী কীন কলেজ হ'তে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার চেষ্টা করছে।

সে তো সোজা কথা। অমিয়র পিতার বন্ধু প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার পঞ্চানন চাটুজ্যে মশায়ের অন্তরঙ্গের আত্মীয়। তাঁর সহায়তা মেডিক্যাল কলেজের রুদ্ধ দ্বারের চিচিঙ্‌ ফাঁক মন্ত্র।

এল্‌সি কৃতজ্ঞতা জানালো অমায়িক সরল হাসি হেসে। তার পর তারা তিন জনে হাটের ভিড়ে ঘুরে বেড়ালে। অমিয় সেন লক্ষ্য করলে শ্রীমতী এলসী এবং আদিম খাসিয়া পসারিণীর পার্থক্য। পোষাকের আকার প্রকারে বিভিন্নতা। এলসীর পায়ে মোজা-জুতা, অন্যরা নগ্নপদ। তাদের বর্ণ রৌদ্রদগ্ধ, শ্রীমতী জেকবের যত্নে সংরক্ষিত দেহের বর্ণ গৌর, ত্বক মসৃণ। ওদের মুখ তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত, সেনের বন্ধু-ভগ্নীর অধর এবং ওষ্ঠ স্বাভাবিক সুস্থতার রঙে রাঙা। তাই শিক্ষিত অমিয়র চিত্ত প্রসন্ন হ'ল। প্রসাধন ভালো, যদি তা শিল্প-বিমুখ না হয়।

(৩)

ক্রমশঃ অমিয়র সকাল সন্ধ্যার গন্তব্য স্থল হ'ল মোখারে জেকব-কটেজ। এরা শিক্ষিতা। গৃহ-সজ্জায় উগ্রতা নাই। বিলাতী ভাব ঢুকেছে—যে ভাবের অভাব নাই শিক্ষিত বাঙ্গালী গৃহে। শিলঙে যা কিছু দ্রষ্টব্য, তা দেখলে অমিয় শ্রীমতী এল্‌সী জেকবের এবং শ্রীমান জন জেকবের সাহচর্য্যে। একদিন মিস জেকব বল্লে—মিষ্টার সেন লেডী কীন কলেজ দেখবেন না? ওখানে অনেক বাঙ্গালী ছাত্রী আছে, অধ্যাপিকা আছেন।

ঐ কারণগুলাই ছিল অধ্যাপক সেনের প্রতিবন্ধক। পথের মাঝে বাঙ্গালী দেখলে তার গা ছম্‌ ছম্‌ করত। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তায় একটু অনবধানতা বা অপ্রিয়তার চিহ্ন তার মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত। পাছে তার খাসিয়া সঙ্গিনী বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে মন্দ কথা ভাবে। বাঙ্গালী চরিত্রের অন্য একটা দিক তাকে শঙ্কিত কর্ত্ত। স্বজাতি সাহিত্যে এবং গানে নিজের বিদ্যা বুদ্ধির বিজয়-ডঙ্কা বাজায় বটে, কিন্তু তাঁর বাহিরের

বাহিরের লোককে সমুচিত শ্রদ্ধা করে না। জেকবেরা বাঙালী প্রতিভার প্রশংসক। কিন্তু তাদের দৃষ্টি গভীর হ'লে প্রকাশ পাবে বঙ্গবাসীর আসল রূপ। অবশ্য নিজের কাছে ধরা পড়তো না অমিয় সেনের এ হীনতার শঙ্কা। অন্যে এমন কথা কহিলে সে বল্‌তো, সেটা ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। কিন্তু অধুনা তার আশঙ্কা, পাছে কেহ খাসিয়ার আচার ব্যবহার উপলক্ষ ক'রে নিজের রসপ্রিয়তার পরিচয় দিতে যত্নবান হয়।

তাই একটু ইতস্তত করে সে বল্লে—ওদের অসুবিধা হতে পারে।

—অসুবিধা কিসের ? হোষ্টেলে ওঁরা একেলা থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের জগত হতে বিচ্ছিন্ন। আপনার মত কৃতবিদ্য—

বাধা দিয়ে সেন বললে—ধন্যবাদ। তার পর সাহস করে বল্লে—কৃতবিদ্য কিনা জানি না, তবে গর্বিত কারণ সঙ্গে যাবে শিক্ষিতা সুন্দরী।

এলসীর ঈষৎ হরিদ্রাভ গৌর মুখে সিঁদুর শোণিতের স্রোত পৌঁছে তথায় কমলালেবুর রঙ সঞ্চার করলে ! সে অন্যদিকে তাকিয়ে বল্লে—ধন্যবাদ। কিন্তু হোষ্টেলে প্রকৃত সুন্দরী বাঙালী আছে শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীদের মাঝে।

অমিয় বল্লে—সৌন্দর্য্যের বিচারক দর্শক। আপাততঃ,

কুমারী বাধা দিয়ে বল্লে—বাঙ্গালী মহিলারা সুন্দরী। ওদের পোষাক ভালো।

অমিয় উত্তর দিল—বাঙ্গালী মহিলার সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। তার পোষাকে আর্ট আছে। কিন্তু শিলঙে এসে আমার এ গর্ব নাই যে সুরূপার অভাব আছে অন্যত্র। কিম্বা বাঙ্গালীর প্রতিবেশিনী খাসিয়ার দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের অভাব।

জেকব-দুহিতা একটু অস্বোয়াস্তি ভোগের লক্ষণ দেখাচ্ছিল। অমিয় আত্ম-গোপন করতে পারলে না। সে বল্লে—এল্‌সী তুমি সুন্দরী, তোমার সুষমা অপরিমেয়, তোমার কণ্ঠস্বর মধুর—

অতি ক্ষীণ স্বরে লজ্জাশীলা বল্লে—এদিকে আসুন একখানা মিলিটারী লরী আসছে।

অমিয় পথের ধারে সরে গেল। একখানা জিপ তাদের মুণ্ডপাত করলে, কারণ সেই অবকাশে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো। শ্রীমতী বল্লে—যুদ্ধের পূর্বে আমাদের শিলঙ ছিল শান্তিময়। এই সৈনিক গাড়িগুলা পথের নিরাপত্তার অন্ত করেছে।

অমিয় বল্লে—হুঁ।

কুমারী বল্লে—শুনেছি কলকাতা এদের জন্য বিপদসঙ্কুল।

সেই বিপদের কথা হল আপদ। যে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করেছিল মিঃ সেন, গাওনা সে সুরে আর জমাতে পারলে না। আর সব কথা হল অবান্তর। প্রসঙ্গ ঘোরপাক খেয়ে ফৌজী গাড়ির নির্বিচার বেগের মাঝে পড়লো।

(৪)

যেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনতি-উচ্চ শৈলের গা বহে উঠে অমিয় নূতন সহচরী এলসী সমভিব্যাহারে লেডী কীন্ কলেজে ছাত্রী নিবাসে গেল, তার অভ্যর্থনা হল প্রচুর। কলিকাতার কলেজের নবীন অধ্যাপক অমায়িক বাক্‌-পটু হাস্য-মুখ অতিথি, মহিলাদের আতিথ্যে তুষ্ট হল। সে কলিকাতার বহু গল্প করলে। জহরলাল শিলঙে গিয়েছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় সুভাষ দিনে তাঁর সম্বর্দ্ধনার কথা শুনে অধ্যাপিকা মিস সেন আকুল হলেন। সে সময় তিনি ছিলেন ঢাকায়। যখন শ্রীযুক্ত অমিয় সেন বুঝলেন সমবেত মহিলামণ্ডলীর কেহই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অভ্যর্থনার দিনে কলিকাতায় ছিলেন না, তার ফেনিল উচ্ছাস বহুরূপ সৃষ্টি করলে। ইতিহাস রচনা হিসাবে গল্প ছিল উপাদেয়। কিন্তু সত্যের পরিমাপে তার মধ্যে অত্যুক্তি ছিল না একথা বলা যায় না।

একতো নেতাজীর নামের উল্লেখমাত্রে গল্প জমে। তার পরে আবার কুমারী এল্‌সী জেকব নিশ্বাস বন্ধ ক'রে মিঃ সেনের গল্প শুনছিল। এক্ষেত্রে প্রগলভতা হয় অনবরুদ্ধ। একবার দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে এলসী বল্লে—আমি অভাগিনী। জীবনে নেতাজিকে দেখিনি।

মিস বড়ুয়া বল্লেন—সত্যই তুমি অভাগিনী !

তার পর গল্প হ'ল সার্ব্বজনীন। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীমান জানতেন পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে। সুতরাং সে বল্লে—নেতাজির ঐ দৈব-দ্যুতি হাসি কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের বিধি

গাড়ীর ভিড়, আমি লাইন ভেঙে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধূলা নিয়েছিলাম। নেতাজী এমন কঠোর ভাবে আমার দিকে তাকালেন যে আমি বিজলীর বেগে স্বস্থানে ফিরে গিয়ে মোমের পুতুলের মত দাঁড়ালাম।

এলসী অভিভূত হ'ল। একে নেতাজী—তার উপর কবি। দুজনের এত কাছে যার গতিবিধি ছিল, সে ধন্ত। অন্ত মহিলাদেরও প্রসাদ লাভ করলে অমিয় সেন। সুতরাং সভার শেষে কুমারী শর্মা বল্লেন—মিঃ সেন আবার আসবেন।

কুমারী গুপ্তর প্রচ্ছন্ন দুষ্টামী সকলে বুঝলে না, যখন সে বল্লে—এলসী তোমার উপর ভার দিলাম। প্রফেসার সেনকে শনিবারে এখানে এনো।

([illegible])

এলসীর জননী সেকালের খাসিয়া মহিলার আচার ব্যবহারের অনুবর্তিনী। তিনি নিজের হাতে গৃহ কার্য্য করেন, স্বয়ং বাজার ঘুরে সস্তায় জিনিসপত্র খরিদ করেন, আবশুক হ'লে পিঠে চোঙা-চুবড়ি বেঁধে শাক সব্‌জি, আলু কপি নিয়ে আসেন।

একদিন বড়বাজারে ঘোরবার সময় অমিয় দেখলে মিসেস জেকবকে, পিঠে চুবড়ি বাঁধা। তার উপর হ'তে উঁকি মারছে পায়ে দড়ি বাঁধা একজোড়া পাতি হাঁস। চুবড়ির মধ্যে নিশ্চয় ছিল মূলা, চিচিঙে, কপি এবং লাউ। মিঃ অমিয় সেনের দক্ষিণে ছিল এলসি জেকব, বামে ছিল তার এক বন্ধু মিনী লঙ্‌। অমিয়র দরদী প্রাণে লজ্জা উপর্জিল, তার সাথে সহানুভূতি। শিক্ষিতা নবীনার জননীর পিঠে ঝুলছে ধুচুনী। কাপড় ময়লা হবার ভয়ে তার নিচে এক টুকরা চ্যাটাই। আধারে খাদ্যদ্রব্য—যা দিয়ে দেহ পুষ্ট করবে তার সুন্দরী সহচরী। অকস্মাৎ বিদেশী বন্ধুর দৃষ্টি পড়েছে এ কথা ভাবলে লজ্জাশীলা শ্রীমতীর মুখ-মণ্ডল কমলা-বর্ণ ধারণ করবে, তার নিজের লজ্জা করছিল, এলসী সে লজ্জায় নুইয়ে পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? মায়েরা কু-সংস্কারের বশে নানা রকম গর্হিত কাজ করে। শিলঙ আসবার প্রাক্কালে তার নিজের মা, মা কালীর নাম ক'রে তার শিরে স্পর্শ করিয়ে ছিলেন একটি চকচকে আধুনিক খাদি রূপার টাকা। কিন্তু পিঠে বাঁশের ধুচুনী যার অন্তর

এলসীর এ দীন দর্শনের দুর্দশা এড়াবার জন্ত, অধ্যাপক সেন অন্তদিকে তাকিয়ে বল্লে—আচ্ছা এলসী ঐ উঁচু পাথর কতকগুলা ওখানে পোঁতা রয়েছে কেন?

কিন্তু এ দুঃখ-ত্রাণ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেবার পূর্বেই তার দৃষ্টি পড়েছিল জননীর উপর। শ্রীমতী মিনীও দর্শন লাভ করেছিল এলসী জননীর। সে খাসিয়া ভাষায় কিছু বললে বান্ধবীকে। তার পর দুটি সুহাসিনী বিস্মিত বাঙ্গালী নবীনকে উপেক্ষা ক'রে ছুটে গেল বর্ষীয়সীর দুদিকে। তারা চুবড়ির গভীরে অনুসন্ধানরতা। তিনজনের দারুণ স্ফূর্ত্তি।

খাসিয়া চরিত্রের এ বিকাশ শ্রীমানকে লজ্জিত করলে। লজ্জা নিজের দীন মনোবৃত্তির জন্য। সত্যইতো জননীর দীন শ্রমিকার আচরণে তরুণীরা উৎফুল্ল। এ কাজের মধ্যে তারা দীনতা বা হীনতার নির্দেশ উপলব্ধি করলে না। ডিগ্‌নিটি অফ্‌ লেবার প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ইংরাজি যেন তার চিত্তের গভীরে গজিয়ে উঠলো। আর একটা ইংরাজি প্রবচন সে স্মরণ করলে—লাভ এট ফার্ষ্ট সাইট। সে চিত্ত-পরীক্ষার ফলে বুঝলে—যে প্রথম দর্শনেই সে এলসীর প্রেমে পড়েছে। হ্যাঁ সত্যই সে সরলা খাসিয়াকে ভালবাসে, আজ তার সিদ্ধান্তকে গরীয়ান করলে তরুণীর সৎসাহস এবং মাতৃ-ভক্তি।

যখন মহিলাদের মিলন-সুখের উচ্ছ্বাস সুরু হ'ল, তাদের স্মরণ হ'ল বিদেশীর অস্তিত্ব। হাস্য-মুখী এলসী তাকে ডাকলে। তার মা অমিয়কে অভ্যর্থনা করলে। খাসিয়া-সুলভ সৌজন্তে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার ভাগনে ভালো আছে?

প্রশ্নে মিঃ সেন একটু থতমত খেলে। তার একরাশি আত্মীয়-কুটুম্ব থাকতে হঠাৎ মহিলা কেন তার আপিসের কুশল অনুসন্ধান করলে, এ রহস্য তাকে বিস্মিত করলে।

তরুণী মহিলারা বুঝলে তার অপ্রতিভ অবস্থা।

শ্রীমতী মিনী একটু কম দরদী। তার সহায়তা না ক'রে, অমিয়কে বল্লে—মিসেস জেকব জানতে চাইছেন তোমার বোনের ছেলে কেমন আছে?

শ্রীমতী জেকব-ঘরণী বুঝেছেন একটা কি কাণ্ড হয়েছে। তার ইংরাজি জ্ঞান অতি অল্প। বাঙলা কিছু বুঝেন।

কিন্তু অমিয় যে অনড়।

এবার এলসীর প্রাণে নিষ্ঠুরতা জাগলো। সে বল্লে—মার কথার জবাব দাও, মিঃ সেন।

তার হাসি দেখে এতক্ষণে অমিয়র বুদ্ধি খুললো। প্রত্যুৎপন্নমতি অমিয়। এক্ষেত্রে স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। সে বল্লে—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। আমার বোন ছোট, তার এখনও বিবাহ হয়নি। অতএব ভাগনের কুশলের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এবার বর্ষীয়সী বুঝলেন ব্যাপারটা। তিনি বল্লেন—ওটা আমাদের কথার ধারা।

মিনি বল্লে—যেহেতু জন্ জেকবের বিষয় তার ছেলে পাবে না। পাবে এলসীর ছেলে। সুতরাং ভাগনের স্থান পুত্র হতে আত্মীয়তা হিসাবে নিকটতর।

আর মিনীর মার বিষয় মিনীর ভাই পাবে না, ওর স্বামী।

মিনী ছাড়বার পাত্রী নয়। সে বল্লে—মিসেস্ জেকব খুব ধনী। মাইলিয়মে ওঁর অনেক বিষয় আছে, চেরায় দু'খানা বাড়ি আছে। সত্বর হন মিঃ সেন। সেগুলো আপনার লাভের আশা আছে।

এলসীর মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়লো। সে মিনীর নাক ধরে টান্‌লে।

মিসেস্ জেকব ব্যাপারটা বুঝলেন না। তিনি টুকরীর হাঁস, কমলালেবু, বাঁধা কপি এবং চেতল মাছ দেখিয়ে অমিয়কে সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

জৈন কর্মবাদ

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

গত শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, মহাশয়ের 'জৈন কর্মবাদ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর লাহার ন্যায় সুপণ্ডিত ও মণীষী ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে কর্মবাদ সম্বন্ধে জৈন-দর্শনের মত সুচিন্তিত ও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে কিন্তু প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সত্যই মর্মাহত হইয়াছি। মনে হয় ডক্টর লাহা বিশেষ মনন না করিয়াই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। যাহা হউক যে কয়েকটি স্থলে জৈন কর্মবাদের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করা হয় নাই আমরা তাহা নির্দেশ করিতেছি।

প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিত আছে যে, "জৈনদিগের মতে ব্রত পালন, সাধু এবং দরিদ্র সেবা, নিরন্নকে অন্নদান এবং দীন দরিদ্রদিগকে খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু দানের দ্বারা কর্মকে বিনষ্ট করা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্ত দয়ামূলক কার্যের দ্বারা কর্ম বিনষ্ট না হইয়া বরং পুণ্য কর্মের বন্ধন হয় এবং এই পুণ্য কর্মের ফল-স্বরূপ পরবর্তী জীবনে নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতে পারা যায়।

তাহার একটু পরেই লিখিত আছে যে, "মানবের দেহ, মন এবং বাক্য পার্থিব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্মের সৃষ্টি হয়।" এই বাক্যের দ্বারা লেখক কি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন। পার্থিব বস্তু কি? তাহার সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্মের সৃষ্টি হয় ইহারই বা অর্থ কি? এই স্থলে কর্ম শব্দ দ্বারা পরমাণু বুঝাইতেছে কি? তাহা যদি হয় তবে কি কর্ম পরমাণুর নূতন সৃষ্টি হইল এইরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু পরমাণু যে অনাদি তাহার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। তাহার পরই আবার লিখিত আছে "রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, ও মানকে প্রশ্রয় দিলে কর্ম বিপন্ন হয়" এই স্থলে "কর্ম বিপন্ন হয়" ইহারই বা অর্থ কি? রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভকে প্রশ্রয় দিলে বা এই সমস্ত কষায়ের দ্বারা অভিভূত হইলে কর্মের বন্ধন হয় কিন্তু 'কর্ম বিপন্ন' হইবার কোন অর্থই বোধগম্য হয় না।

আট প্রকার কর্মের বিবরণ যে স্থলে দেওয়া হইয়াছে সে স্থলে সপ্তম 'গোত্র' কর্মের বিবরণের মধ্যে "জাতি, মানবের জীবন, পেশা, বাসস্থান, বিবাহ, খাদ্য এবং ধর্ম পালন প্রভৃতি বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করে" লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা ঠিক নহে, গোত্র কর্মের দ্বারা উচ্চ ও নীচ বংশে জন্ম-গ্রহণ করা স্থিরীকৃত হয় কিন্তু বিবাহ, খাদ্য, ধর্মপালন প্রভৃতি কার্যগুলিতে এই কর্মের কোন প্রভাব নাই।

ইহার পরবর্তী প্যারাগ্রাফের প্রথমে লিখিত আছে যে "জৈনদিগের মতে আত্মা সর্ব প্রথমে কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে এবং সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না" এই স্থলে 'সর্ব প্রথমে কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে, ইহার অর্থ কি? জৈন মতে আত্মা অনাদিকাল হইতে কর্মের সহিত লিপ্ত আছে; এমন কোন সর্ব প্রথম অবস্থা ধারণা করিতে

সম্পূর্ণ [illegible] কি ? আত্মা সব সময়েই উদয়ে আগত কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাবই অনুভব করে। এই বাক্যের পরই লিখিত আছে যে "আত্মা পূর্বজন্মের দ্বারা পক্বতা লাভ করে ;" এই পক্বতা লাভ শব্দের দ্বারা যে কি বুঝান হইয়াছে তাহা মোটেই বোধগম্য নয়।

ইহার পরবর্তী প্যারাগ্রাফে কার্যবাদ, অকার্যবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদের কথা যে স্থলে উল্লিখিত আছে তথায় লেখা আছে যে "...এবং জৈনদিগের সথায়দৃষ্টি এক নহে। অকার্য, নাস্তিকতা, এবং শীলব্রত পরামর্শ (অর্থাৎ আকার বলি) জৈন সথায় দৃষ্টির অন্তর্গত।" পরিতাপের বিষয় 'সথায়দৃষ্টি' ও 'শীলব্রত পরামর্শ' এই দুইটি শব্দ জৈন দর্শনের কোন শব্দ নয়। হয়ত বৌদ্ধ দর্শনের এই শব্দগুলি কোন প্রকার ভ্রম ক্রমে জৈন বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ইহার দুই প্যারাগ্রাফের পরের প্যারাগ্রাফটিতে যে স্থলে মহাবীরের মত ব্যক্ত করিয়াছেন সেই স্থলে "ইহাই জৈন দিগের 'নবতত্ত্ব' বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেই স্থলে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নব-তত্ত্বের কোন একটি তত্ত্বেরও নাম বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আমরা এই স্থলে নব-তত্ত্বের নাম দিতেছি যথা :— জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে এই নয়টা তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা বিবরণ উক্ত স্থলে দেওয়া আছে কিনা।

ইহার পরবর্তী প্যারাগ্রাফে লিখিত আছে যে "কর্মই আত্মাকে নিজের উৎপত্তি স্থলে কিংবা পূর্ণজ্ঞান এবং চির-শান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠানে নিবদ্ধ করে" পূর্ণজ্ঞান ও চির-শান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠান বলিলে মুক্তিকে বুঝায় ; কিন্তু সেই পূর্ণজ্ঞান ও চির-শান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠানে কোন্ কর্মের প্রভাবে আত্মা নিবদ্ধ হয় ? কর্মই কি আত্মাকে মুক্তি দেয় ? এই স্থলে কর্ম শব্দের অর্থ কি ? জৈন দর্শনে 'কর্ম' শব্দটী এক বিশেষ অর্থে কর্মের সেই বিশেষ অর্থের কথা লিখিয়াছেন, এবং আটটি কর্ম বিভাগের বিবরণও দিয়াছেন কিন্তু এই আট প্রকার কার্যের মধ্যে কোন্ প্রকার কর্মের দ্বারা আত্মা পূর্ণজ্ঞান ও চির-শান্তির স্বাভাবিক অধিষ্ঠানে নিবদ্ধ হয় ? প্রকৃত কথা এই যে যতক্ষণ কর্ম আত্মার সহিত যুক্ত থাকিবে ততক্ষণ পূর্ণজ্ঞান ও চির-শান্তির স্থানে আত্মা যাইতে পারে না কিন্তু সর্ব প্রকার কর্মের আত্যন্তিক ক্ষয় হইলেই মুক্তি লাভ করিতে পারে।

জৈন কর্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে সমস্ত পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে 'কল্প সূত্রের'ও নাম আছে ; 'কল্প সূত্রের' তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমটিতে তীর্থঙ্করগণের বিবরণ যাহাকে 'জিনাবলী' বলা হয় ; দ্বিতীয়টিতে স্থবির অর্থাৎ আচার্যগণের বিবরণ যাহাকে 'স্থবিরাবলী' বলা হয় ; এবং তৃতীয়টিতে সাধুগণের আচার যাহাকে 'সাধু সমাচারী' বলা হয়। এই তিন বিভাগের মধ্যে কর্মবাদ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু জৈন কর্মবাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থে বিশেষ এবং বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে সেই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করা হয় নাই যথা :—১। 'কর্মবিপাক', 'কর্মস্তব', 'বন্ধস্বামিত্ব', 'ষড়শীতি' ; 'শতক' ও 'সপ্ততিকা' নামক ছয়টি কর্মগ্রন্থ ; ২। কর্মপ্রকৃতি ; ৩। পঞ্চ সংগ্রহ ; ৪। ভাব প্রকরণ ; ৫। গোম্মটসার প্রভৃতি।

অকার্যবাদ বা অক্রিয়াবাদ জৈন দর্শনের বিষয় নহে বলিয়া তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা হইল না।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত মনে এই প্রতিবাদ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাঃ লাহার ন্যায় প্রসিদ্ধ ও বিদ্বান ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ দেখিয়া পাঠকগণের ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইতে পারে এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিবাদটি লিখিত হইল।

রাতের মায়া

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চাকরীর চাকায় ঘুরতে ঘুরতে রজত রায় একদিন [illegible]দেরই আফিসে বড় সাহেবদের একজন হয়ে গেল।

[illegible] দেখা বাসবীর সঙ্গে—ছিপছিপে, ছিমছাম [illegible] ঋজু উজ্জ্বল চেহারা, পরণে একটা সাদাসিদে শাড়ী, সাদাসিধা প্রসাধন দুরস্ত, এক হাতে একগাছা সরু চুড়ি, অন্য হাতে ছোট্ট রিষ্ট ওয়াচ, এলায়িত খোঁপা। সেদিন দুপুর থেকেই সারা কলকাতার দিকে দিকে হাঙ্গামা। তার উপর বিকাল থেকে ক্লান্তিহীন [illegible] মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে পথঘাট ভাসিয়ে দিয়ে। ট্রাম বাস যানবাহনের সব ব্যবস্থা অচল।

রিক্সা ঘোড়ারগাড়ীর পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট। একটা অস্বাভাবিক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। আফিসে কর্ম্মব্যস্ততার ছাপ, কিন্তু সবাই উদ্বিগ্ন—কি করে সকাল সকাল বাড়ী ফেরা যায়। কারুর মন নেই কাজে।

হ্যাঁ, আমি 'পি' সেক্সনে কাজ করছি।

যাবেন কি করে?

দেখা যাক্ কতদূর কি হয়, হেঁটেই চলে যাব ভেবেছিলাম।

সে কি? রাস্তায় এক কোমর জল দাঁড়িয়েছে, তার উপর ট্রাম বাস বন্ধ।

তা আর কি করা যাবে, অত ভাবতে গেলে মেয়েদের চাকরী করা চলে না?

না, না, চলুন আমিই পৌঁছে দেব, কোথায় থাকেন?

রসার শেষে, আপনি?

বালীগঞ্জ সার্কুলারে।

কেন এতদূর ডিটুর করবেন শুধু শুধু, বৃষ্টি কমে এসেছে, হেঁটেই বেরিয়ে পড়ি।

সে কি হয়, বিশেষ করে আজকের দিনে।

কলকাতার রাস্তায় বৃষ্টির দিনে যে রকম জল দাঁড়ায়, তার উন্মুক্ত ছবি ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে জলের তোড় এত বেশী যে গণ্ডোলা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। বহু গাড়ীর গতি হয়েছে স্থগিত, পথে আটক আফিসচারী পথিকের দল। সেদিন হাঙ্গামা ও বর্ষায় মিলে অন্ধকারের আঁচল টেনে দিয়েছে রাস্তায়। কালোর পটভূমিকায় আলোহীন দিনের শেষক্ষণ মেঘমেদুর বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় স্তিমিত।

একটা পূর্ব্বের ইতিকথা আছে। কলেজে রজত ও বাসবী ছিল সহাধ্যায়ী। বাসবী ছিল পরীক্ষায় নামকরা মেয়ে, টক্ টক্ করে পাশ করে গেছে। গরীব স্কুল মাষ্টার বাবা অতি কষ্টে মেয়ের পড়ার খরচ জোগাড় করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন সযতনে। সে ছিল তৃতীয়া। বড়টি পার করতে প্রৌঢ়ের যা কিছু সম্বল গিয়াছে, গিন্নীর গয়না, কো-অপারেটিভে দেনা, প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টান। দ্বিতীয়া স্বামীরত্ন সংগ্রহ করেছেন পৈতৃক ভিটের বদলে। তৃতীয়ার জন্য ভদ্রলোকের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না—তাই তাকে পড়তে দিয়েছিলেন—যদি নিজের দিকে নিজেই কিছু করতে পারে। পড়াশুনার দিকে ঝোঁকও ছিল বাসবীর, দেখতেও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের চেয়ে ভাল, মুখের চোদ্দ বছরে পার করেছ—একে নিজের খরচে বেরোতে দাও—আর তা ছাড়া দেশের রীতিনীতিও বদলাচ্ছে দিন দিন; সেটাও ত দেখতে হবে। বাসবীর সহপাঠিনীরা ছিল ব্যারিষ্টার সুশোভন রায়ের মেয়ে রেবা রায়, জষ্টিস্ মিত্রের মেয়ে ডলি, বড়চাকুরে অভিনব সেনের অভিনবা দুহিতা সুনন্দা ইত্যাদি। আর রজত রায়ের কথা কে না জানে। যেমন স্মার্ট্ তেমনি আপটু ডেট্। সম্ভ্রান্ত সমাজের ছেলে, শ্রীমান ঘরের দুলাল, কাঞ্চন কৌলীন্যের ছাপমারা তার সঙ্গ ও সুপারিশ অভিজাত সোসাইটিতে ঢোকবার ছাড়পত্র। লেখাপড়ায় সে হুঁসিয়ার চৌকস, রসবোধে মার্জ্জিত। কলেজ ইউনিয়ানে বক্তৃতা দিতে সে যেমন পেছপাও নয়, রেষ্টুরাণ্টে বসে চপ কাটলেটের সঙ্গে দল বাঁধতে ও দল ভাঙাতেও সে ওস্তাদ। হকি ফুটবলের মাঠে সে পাণ্ডা, পিকনিক্ পিকচারে সে অগ্রণী। লেডিসম্যান্ বলে তার একটা সুনাম বা দুর্নাম ছিল। মেয়েরা তার প্রতি একটু বেশী রকমের সপ্রতিভ ও সচেতন। রীতিনীতির দোহাই সে কখন দিত না। মেয়েদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুবিধাবাদীর ব্যবহারই সে করত। নিন্দুকরা বলত—এক নম্বরের ফ্লার্ট ও স্কাউণ্ড্রেল। সে হেসে উঠ্ত, ধরাত সিগারেটের পর সিগারেট। বলত—যত সব কাউয়ার্ড ইম্পোটেণ্টের দল, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, উঠতি বয়সে কি হরিনামের মালা নিয়ে জপ করতে বসব। তা সত্ত্বেও সবাই তার নাম করতে অজ্ঞান। রেবা রায়কে সে নিয়ে যেত ফার্পোর ব্যায় ট্রুসিটারে, সুনন্দার সঙ্গে দেখতে যেত 'দাভলেটার' ডলি মিত্রের পার্টি জমতইনা তাকে না জোটালে। কিন্তু বাসবীর কাছেই সে আমল পেত না মোটেই, আর সেইজন্যই তাকে টানবার আগ্রহ ছিল তার বেশী। বাসবী যে গোমড়ামুখী হয়ে কলেজে যেত আসত তা নয়, হাসিমুখে সবার সঙ্গে মিশত, মিটিংএ বক্তৃতা আবৃত্তি করত, অভিনয় ট্যাবলোয় যোগদান করত। অথচ তার সঙ্গে হাল্কা ভাবে চটুল রকম ব্যবহার করবে এমন প্রশ্রয় সে কখন কাউকে দেয়নি, কোমল মোলায়েম বাইরের নীচে একটা সজীব [illegible] মনের বাঁধন শুচিতার বর্ম্ম এমনই শক্ত ছিল যে অনুরাগীর দল কোন সুযোগ নিতে সাহস করা দূরের [illegible] কল্পনাই করত না।

এক রাত্রির কথা মনে আছে। ইন্সটিটিউটে 'রাজা-রাণী' অভিনয় হোল দুর্গতদের রিলিফের জন্য। রজত সেজেছিল 'রাজা' বাসবী 'রাণী'। এক বাক্যে সবাই স্বীকার করলে এমন নিখুঁত অভিনয় তারা অনেক দিন দেখেন নি। রাজার উন্মত্ত প্রেমের এমন একটা অপরূপ রূপ রজত সেদিন ফুটিয়ে তুলেছিল যা অভিনয় নৈপুণ্যে সত্যই হয়েছিল অপূর্ব্ব, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতে ভিতরকার এক অস্থির প্রেরণা রূপ নিয়েছিল রজতের মধ্যে। আর তারই পাশে দাঁড়িয়েছিল বাসবী স্থির, শান্ত, সংযত। সুমিত্রার পার্ট—রাজার দুর্দ্দাম সম্ভোগবাসনা, অধীর উন্মত্ততাকে বৃহত্তর মঙ্গলের পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য এক কল্যাণীর ভূমিকায়। শিক্ষিত অডিয়েন্স পুলক চঞ্চল হয়ে দেখতে লাগল কবিধর্ম্মী দুইটি বিচিত্র মনের অন্তঃশীলার আবরণ উন্মোচন। দুজনে অভিনয় করছিল কি নিজেদের মর্ম্মকথাকে উদ্ঘাটিত করছিল তা বলা শক্ত। অভিনয় শেষে রজত বল্লে—চলুন আপনাকে পৌছে দি। তার ভিতরের উত্তেজনা তখনও শান্ত নয়, রক্ত চঞ্চল, গলার স্বরে জড়তা মাখানো আবেগ। আবছা আলোর অন্ধকারে কলকাতার সর্পিল পথ মুহ্যমান। গড়ের মাঠের জনবিরল প্রশস্ত রাজপথে মৃদু কাকজ্যোৎস্নার একটু ক্ষীণছায়া। দুএকটা সাঁজোয়া গাড়ী হেডলাইট্ জ্বালিয়ে অতিকায় জন্তুর জলন্ত দুচোখের মত চোখ বার করে দ্রুত পেরিয়ে গেল। দূরে গঙ্গায় জোয়ার এসেছে, তারই ছল্‌ছল শব্দ, জাহাজগুলির কালো মাস্তুল অস্পষ্ট আলোয় অস্ফুট। এমন পরিবেশের মধ্যে ইডেন গার্ডেনের কাছে রসভঙ্গের মতই রজত গাড়ী ফেল্লে থামিয়ে। বাসবী চুপ করেছিল, কঠিন হয়ে উঠল, বল্লে—গাড়ী থামালেন কেন?

রজত হেসে উত্তর দিলে—এই এমনি!

মানে?

মানে আর কি—এমন চাঁদিনী রাতে—বলে তার ফুলের মত নরম হাতদুটো জড়িয়ে ধরলে। রজতের সমস্ত দেহটা একটা ব্যাকুল আকুতি নিয়ে আপনি এগিয়ে এল বাসবীর দিকে। বাসবী থর থর করে কাঁপছিল, মুখ উত্তেজনার রংএ রাঙা কিন্তু হাতদুটো বরফ শীতল, অত্যন্ত পরুষ ও নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে—ছেড়ে দিন, ছেলেমানষী করবেন না, বহু মেয়ের সঙ্গে বহুদিন ফ্লার্ট করেছেন শুনেছি; হয়ত অন্যায় সুযোগও নিয়েছেন, আমাকেও কি সেই টাইপ ভেবেছেন নাকি? লজ্জা করে না, পুরুষজাতগুলোর হ্যাংলামী ও নোংরামীর কি শেষ নেই। রজত কাঠ হয়ে গেল। একটিও কথা বল্লে না, সোজা এক্সিলেটারে পা দিয়ে স্টার্ট দিলে—৬০ মাইল স্পীড কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাসবীদের বাড়ীর সামনে এসে তাকে নামিয়ে দিয়ে বল্লে—নমস্কার, পারেন ত মাফ্ করবেন। উত্তরের অপেক্ষা না করেই গাড়ী ফেল্লে ঘুরিয়ে। পরের দিন কলেজে দেখা হোল না। কিছুদিন পরে শোনা গেল, সে যাচ্ছে বিলেত, আই-সি-এস্ হবার জন্য। তার পর আজ সাত বছর পরে দেখা।

এই ক বছরে বাসবীকেও নানা ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। মা গেলেন মারা, এম-এ পরীক্ষায় সে পেলে সেকেণ্ড ক্লাশ যুদ্ধের বাজার, বোমা, ব্ল্যাকমার্কেট, ফাঁপতি টাকার চলতি। কোথায় চাল, কোথায় কাপড়, কোথায় কয়লা, তাকে নিয়ে এল দূরের মধুস্বপ্ন থেকে মাটির তীব্রতায়। পাশ করে একটা ইণ্টারমিডিয়েট ছোট কলেজে কাজ জুটেছিল, মাইনে কিছু মোটা নয়। অথচ বাড়ীতে অভাব লেগেই আছে, বাপ পেন্সন নিয়ে বসে আছেন। ভেবে-চিন্তে নতুন নতুন ডিপার্টমেণ্টের একটায় চাকরীর জন্য দরখাস্ত করে দিলে। বাপ সেকেলে লোক—মেয়ে চাকরী করবে, মনটা খচ্‌খচ্ করে, কলেজে পড়া পর্য্যন্ত সহ্য হয় কিন্তু গট্ গট্ করে গিয়ে সারাদিন অপরিচিত পুরুষদের মাঝে হাস্যালাপের মধ্যে চাকরী করে আসবে তা যেন তার মনে খাপ খায় না। কিন্তু যা টানাটানির দিন। যা হয় কিছু টাকা আসছে ঘরে, ভাই বোনদের পড়ার সাহায্য হচ্ছে, সংসারের চাকা একটু বেশী তেল পাচ্ছে, আজকের দিনে সেটা কম আশ্বাসের কথা নয়। তবু মন হয় বিরস, ভিতরে ভিতরে বন্ধু অধরবাবুর সঙ্গে হতে থাকে সলাপরামর্শ, ঘটকের আনাগোনা। বৃদ্ধ সেদিন পেন্সন নিতে গিয়েছিলেন—ফিরতে দেরী হল—দেখেন একটার সময় এসপ্লানেডের মোড়ে বাসবী চলেছে হাসতে হাসতে, সঙ্গে দুজন সুবেশ যুবক, তারা ঢুকলো এক রেষ্টুরাণ্টে। একে বেলা হয়ে গেছে, তার খাওয়া হয় নি, বৃদ্ধের নিঝুম রক্ত হ'ল তপ্ত। সন্ধ্যায় যখন বাসবী বাড়ী ফিরল তখন বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে তামাক টানছিলেন, বল্লেন—

কাপড়-চোপড় ছেড়ে এস মা, তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে। বাসবী বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে জবাব দিলে—কি হয়েছে বাবা।

কিচ্ছু না।

তারপর যখন সে ফিরে এসে তাঁর কাছে বসল তখন তিনি ভণিতা না করেই বল্লেন—দেখো বাসু, তোমার বয়স হয়েছে, লেখাপড়াও শিখেছ ঢের, টাকাও রোজগার করছ নিজের জোরে, আমার সাহায্যও হচ্চে কিছু, তবু তোমার মা নেই, স্পষ্ট করেই বলতে হচ্চে যে আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি আর চাকরী কর। চাকরী বা টাকার চেয়ে মেয়েদের মর্য্যাদা সুনাম বড়ো। কাল থেকে তুমি রিজাইন দাও। আর একটা কথা, আমার মত হচ্চে এইবারে শীঘ্রই তোমার বিয়ে করা উচিত—একটি পাত্রের খবর পেয়েছি, মেদিনীপুরে মোক্তারী করে, জমিজমা খেতখামার—

বাধা দিয়ে বাসবী বলে—এ সব কি বলছো বাবা—

বৃদ্ধ স্পষ্টভাষী, ছেলেমেয়েরা ও তাদের মা চিরকাল ভয় আর সেই সঙ্গে ভক্তি করে এসেছে, একটু কঠিন হয়েই উত্তর দিলেন—বিয়ে কর না কর, চাকরী তোমায় ছাড়তে হবে।

বাসবী সতেজে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে বল্লে—কেন ?

বাপ রেগে বল্লে—বেশ আমার কথা যদি না শোন তোমার দায়িত্ব তুমি নিজেই বুঝে নাও, এমন অবাধ্য মেয়ের আমার ঘরে স্থান নেই।

আচ্ছা বাবা—বলে পায়ের ধুলো নিয়ে বাসবী সেই যে বেরুল আর ফিরল না। উঠলো গিয়ে এক বান্ধবীর ফ্ল্যাটে। বাপও খোঁজ খবর করলেন না, ক্ষোভে, অভিমানে, লজ্জায় ও দুঃখে। শুধু ছোট ভাই অমল কলেজ ফেরতা এক আধদিন লুকিয়ে সেজদির সঙ্গে দেখা করতে আসত, আর জোগাড় করে নিয়ে যেত দু-এক টাকা, মোহনবাগানের ম্যাচ, সিনেমা, পিকনিক ইত্যাদির জন্যে। বাসবী চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করত—হ্যারা বাবা কিছু বলেন। কিচ্ছু না, 'চল না' সেজদি বাড়ীতে ফিরে, আমার বন্ধুরা এলে কেই বা পাঁপরভাজা চা করে দেয় আর কেই বা কপি করে দেয় লজিকের নোট্, চলনা বাড়ী, বাবা আজকাল কাউকে বকে না, শুধু চুপচাপ বসে থাকে। বাসবীর চোখ দুটো জলে ভরে যায়, দেয় দু'টাকা তার হাতে গুঁজে, বলে ল্যাংড়া আম কিনে নিয়ে যাস্। বৃদ্ধ ঘন দুধের সঙ্গে ল্যাংড়া আমের ভক্ত।

অনেক ঘুরে অনেক দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বড় ক্যাডিলাকটা সার্কুলার রোডের কাছে গেল বন্ধ হয়ে, জল ঢুকেছে কার্বুরেটারে। নিজেই ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে দেখল রজত।—হোল ভাল, আজ এখান থেকেই না সটান্ হণ্টন দিতে হয়, সহরে গোলমালেরও শেষ নেই।

বাসবী তার স্বেদসিক্ত ভিজে মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে গেল। মনে হল তাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে।

রজত বল্লে—চলুন কাছেই আমার বাড়ী ড্রাইভার কোন রকমে ঠেলে গাড়ী নিয়ে আসুক তারপর আপনাকে পৌছে দেবে। ভিজে কাপড়ে বসে থেকে কি লাভ, কর্ম্মভোগ ত' যথেষ্টই হয়েছে।

আমি এখান থেকেই পাড়ি দিই—বাসবী উত্তর দেয়—সবে রাত ৮টা। না, না তা হয় না বলে রজত তার হাত ধরলে, বাসবী একটু কেঁপে উঠল, আর একদিনের পাণিগ্রহণের ম্লান স্মৃতি ফুটে উঠল মনে, বুকের শোণিত প্রবাহ কিছু দ্রুত হ'য়ে উঠল।

আচ্ছা চলুন—একটু অপেক্ষা করে দেখি।

অন্ধকার রাস্তার মাঝ দিয়ে রজতের নির্দ্দেশানুযায়ী তার হাত ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে ঢুকল একটী চওড়া বাগানের ফটকওয়ালা বাড়ীর গেটের মধ্যে।

কাপড় চোপড় ছেড়ে দুজনে বসল কাঁচে ঘেরা গোল বারান্দায়, বয় এনে দিলে সদ্যধূমায়িত কফির পেয়ালা। বাসবী স্বপ্নোত্থিতার মত জিজ্ঞাসা করে—বারে? মিসেস্ কোথায়, আলাপ করিয়ে দিন।

রজত একটু অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়—সে সৌভাগ্য এখনও হয়নি মিস্ দে।

ওঃ, বলে বাসবী একেবারে চুপ হয়ে যায়। কথা আর আসে না। সত্যই কি দুর্য্যোগের রাত। দরোয়ান ও ড্রাইভার এসে জানায় যে গাড়ী ঠেলে গ্যারেজে নিয়ে আসা সম্ভব হলেও আজ রাত্রে গাড়ী চালান অসম্ভব। বাইরে জলের শাণিত শব্দ—প্রখর। রেডিয়োতে জানিয়ে দিলে রাত ৯টার পর কার্ফিউ অর্ডার। বাসবী একটু অস্থির

হয়ে পড়ল, এরকম আটকে যাবে জানলে রজতের সঙ্গে কিছুতেই আসত না। রজত লম্বা পাইপ ধরিয়ে ইজিচেয়ারে বসে আরাম করে টানছে, হেসে বল্লে—ভেবে আর কি করবেন এ হচ্চে নিয়তির পরিহাস—আপনি আজকের রাতে আমার ক্ষণিকের অনাহূত অতিথি, আধ ঘন্টার মধ্যেই ডিনারের ঘণ্টা পড়বে, তার পরে···।

তার পরে কি—বাসবীর গলা চেপে যায়।

এমন রোমান্টিক কিছু নয়—ধরুন একটু কাব্য-চর্চ্চা।

মেঘৈর্মেদুরম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ

নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়

এর রসবোধ করতে পারেন নিশ্চয়ই, খাস পদ্মাবতীর চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী ইনি, কতরকমের রসোদ্ঘাটন করে গেছেন। বাসবী পদটির মানে বোঝে, গাল লাল হয়ে ওঠে। রজতের আবৃত্তি যেন কাব্যফ ফেনিল মদ। যদিও তার মনের জোর কিছু কম নয়, কারুর কাছে জবাবদিহীর দাবী নেই এবং নিজের বিচার বিবেচনার উপর গভীরতম বিশ্বাস; তবু অতি অদ্বিতীয়া বাড়ীতে রজতের সঙ্গে একত্রে রাত্ত কাটাবার আভাষ তাকে বিচলিত করে সব দিক থেকে। অথচ কতদিন তার কল্পনা হয়েছে উদ্দাম বল্গাহীন ঘোড়ার মত যা তা ভেবেছে যার কোন মানে নেই, যা শুধু অবচেতন মনের গোপন অভিসার। এমন কি মনে মনে ভেবেছে সেদিন যদি রজত অত সহজে তাকে মুক্তি না দিত তাহলে সে কি করত? বাসবী রজতের দিকে মৃদু তাকিয়ে আস্তে বলে—সত্যি পুরাণো দিনের কত কথা মনে পড়ছে।

সে কাসুন্দী ঘেঁটে কিছু লাভ নেই, বাসবী দেবী, প্রতিক্ষণেই আমরা নতুন হচ্চি, মাভৈঃ—জবাব দেয় হেসে রজত।

বয় এসে জানিয়ে যায়, ডিনার তৈয়ারী, নীচে গং বাজে টুং টাং।

গভীর নিশুতি রাত, চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। বৃষ্টির বেগ থেমেছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা ম্লান তারার আভাস, নিস্তব্ধ, দৃষ্টিহীন। রজত পার হয়ে যাচ্চে, বাসবী শুনছে মন্ত্রমুগ্ধার মত—কত কবির কত ভাব, কত অনির্বাণ গোপন বেদনার ইতিহাস, যা ছড়িয়ে রয়েছে ছন্দে, গানে, গাঁথায়, কত অশরীরির প্রেমের ব্যাকুল আকুতি ধরা পড়ল ঘুরে ঘুরে সেই নিস্তব্ধ ধারাকুল মধ্য রাত্রের গভীরে। শুচিস্মিতা তপস্যারতা উমার মত সে চেয়ে রইল রজতের দিকে, অপরূপ এক রহস্যমধুর রসঘন অনুভূতি নিয়ে। বাসবী আর পারছে না নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে, নিজের ভারে সে নিজে নুইয়ে পড়েছে, সে আজ সব কিছু পারে, অসাধ্য সাধন, নিজেকে নিঃসঙ্কোচে নির্ম্মমভাবে বিলিয়ে দিতে পারে, মান ইজ্জত, দেহ। শুধু নেবার অপেক্ষা, সে জানে সে সব দিয়ে দিলেও ফতুর হবে না, ফুরিয়ে যাবে না, বরং ফুটে উঠবে, শত বিকশিত ফুলের মত। নিজের উপর আজ তার ভরসা নেই, কিন্তু ভয়ও নেই। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টার মত সে এগিয়ে যেতে চাইল রজতের দিকে, কিন্তু পারল না, শুধু ধরা গলায় বল্লে—রাত শেষ হয়ে এল যে, শুবে না। তার কথা আজ মধুক্ষরা, নিবেদিত যৌবনের গুরুভারে সে আজ অলস মন্থর। রজত স্থির নিষ্পলক নিষ্কলুষ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। চোখের ভাষা যে এত উদাস হতে পারে তার প্রথম পরিচয় বাসবী পেলে।

দাঁড়িয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে রজত বল্লে—সত্যই ত, বড্ড রাত হয়েছে। ওই পাশের ঘরটা আমার গেষ্ট রুম—বিছানাপত্র ঠিকই আছে—একটা রাত্রি কষ্ট করে কাটিয়ে দিন। গুড নাইট।

বাসবি চুপ করে থমথমে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সে নিরালম্বন নিরাশ্রয়। তার সর্ব্ব গৃধ্নু চেতনা পরীক্ষা করে দেখতে চায় তার মনের গতির সঙ্গে প্রকৃতির এই বিপর্যয় খাপ খায় কিনা। দিক প্রান্তে দিগভ্রান্তের জন্য সুন্দরী শুকতারা পড়েছে হেলে।

বাসবি বিছানে শুয়ে পড়ল পর্দা টেনে দিয়ে। কনভেনশনের বালাই নেই, বাইরের হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ। ছুটো, তিনটে, চারটে, পেটা ঘড়ির ঘণ্টা জানিয়ে দিয়ে যায়—রাত্রি শেষের অদ্ভুত দ্রুত গতি। বাসবির পোড়া চোখে ঘুম এল না মোটেই। কখন যে ঢুকে পড়েছে রজতের ঘরে নিজের অজ্ঞাতসারে তা নিজেই জানে না। তার সুপ্ত শুভ্র দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে অনন্ত-কাল বুঝি সে চেয়ে থাকতে পারে ঐ নিমীলিত একজোড়া আঁখির দিকে। আর ওদিকে স্তব্ধ নিবিড় ঘুমের মধ্যে রজত স্বপ্ন দেখছে

…কে একটি মহিমময়ী মেয়ে তার দিকে চেয়ে আছে উদাসীর মত, ছুটি পেলব কোমল ঠোঁটের মৃদু ভিজে পরশ, কপালে দুফোঁটা চোখের জল। ভোরের স্বপ্ন হয়ত সত্য।

সকালবেলা ঘুমভাঙার পর খোঁজ করাতে মাদ্রাজী বয় বল্লে—আম্মা সাহেবকে বহুৎ সেলাম জানিয়ে ভোরবেলাই হেঁটে চলে গেছেন।

রজত একটু হাসল।

আবার আফিসে দেখা, বাসবী জরুরী ফাইল সই করাবার জন্ত দাঁড়িয়ে আছে, ভাবলেশহীন। রজত গম্ভীর-ভাবে কাগজ ওল্টায় বলে—রাবিশ, কিচ্ছু হয়নি, গোটা কেসটার একটা প্রেসি চাই একঘণ্টা পরে নিয়ে আসবেন।

বাইরে ট্রামের ঘড়ঘড় শব্দ, ফেরিওয়ালার চীৎকার, মটরের হর্ণ কর্ম্মমুখর অতি বাস্তব কলকাতা জল জল করছে দুপুরের মেঘহীন দীপ্ত মধ্যাহ্নে।

যোনিপীঠের কথা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি একাম্রপীঠের উৎপত্তিবিষয়ক কিংবদন্তীর ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পীঠস্থানের সহিত দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষের সম্পর্ক কল্পনার মূল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পণ্ডিতসমাজের বিবেচনার নিমিত্ত যে চারিটি বিষয় উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা করা যাইতে পারে।

১। দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের কাহিনী মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব এবং মৎস্যাদি কতিপয় প্রাচীনতর পুরাণ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে পরবর্ত্তীকালে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণে (৬।২।৭৪) বলা হইয়াছে, যজ্ঞরূপী প্রজাপতির স্খলিত রেতঃ দেখিয়া ভগের নেত্র দগ্ধ হইয়াছিল এবং পূষা উহা ভক্ষণ করায় তাঁহার দন্ত ভগ্ন হয়। গোপথব্রাহ্মণে (১।২) আখ্যায়িকাটি অপেক্ষাকৃত বিকাশ লাভ করিয়াছে। এস্থলে দেখা যায়, যজ্ঞকর্ত্তা প্রজাপতি রুদ্রকে অস্বীকার করেন। ফলে রুদ্র যজ্ঞাঙ্গ ছেদন করেন। সেই ছিন্ন যজ্ঞাঙ্গ দেখিয়া ভগের চক্ষু দৃষ্টিহীন হয় এবং পূষা দন্তহীন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৫) এবং বায়ু ও কালিকাপুরাণে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের বিবরণে বীরভদ্র কর্ত্তৃক ভগের চক্ষু উৎপাটন এবং পূষার দন্ত ভগ্ন করার উল্লেখ আছে। যাহা হউক, প্রাচীন বিবরণে সতীর অবয়ব পতন ফলে পীঠস্থানের উৎপত্তির কাহিনী দেখা যায় না। কেবল দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থসমূহে ইহার উল্লেখ আছে।

২। মৎস্যপুরাণে জগন্মাতা সতীকে ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পূজিত তথাকথিত অষ্টোত্তরশত দেবতার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রেবাখণ্ডে অম্রকর্ণিকার (অর্থাৎ জগন্মাতা শঙ্করীর) বিভিন্ন প্রকাশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঠিক একই সমন্বয়মূলক তালিকা উদ্ধৃত দেখিতে পাই। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে সাবিত্রী দেবীর যে অষ্টোত্তরশত বিকাশের তালিকা পাওয়া যায়, তাহা মৎস্য ও স্কন্দপুরাণের তালিকা হইতে অভিন্ন। দেবীভাগবতে ঐ একই তালিকা উদ্ধৃত করিয়া স্থানগুলিকে জগদম্বার পীঠস্থলরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেবাদিদেব মহাদেবেরও বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রস্থিত রূপের অনুরূপ তালিকা পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডান্তর্গত কেদার খণ্ড এবং শিবপুরাণের সনৎকুমার সংহিতা খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩। পীঠস্থানের সংখ্যা সম্বন্ধে ঐকমত্য দেখা যায় না। দেবীভাগবত অনুসারে পীঠের সংখ্যা ১০৮; তবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে দেবীর অঙ্গসম্ভূত পীঠস্থান ব্যতীত অপর কতকগুলি পীঠও আছে। কালিকাপুরাণের একস্থলে দেখা যায় পীঠ সাতটি, তন্মধ্যে তিনটি কামরূপ দেশে অবস্থিত, অন্যত্র পীঠের সংখ্যা চারিটি মাত্র। কুব্জিকাতন্ত্র মতে পীঠ ৪২টি; কিন্তু জ্ঞানার্ণবতন্ত্রানুসারে ৫০টি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত তন্ত্রসার গ্রন্থে জ্ঞানার্ণবতন্ত্র হইতে পীঠস্থানের তালিকা ও সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু মেরুগিরি সংজ্ঞক একটি পীঠকে মেরুপীঠ ও গিরিপীঠ নামক দুইটি স্বতন্ত্র পীঠ গণনা করায় মোট পীঠের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫১। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে পীঠের সংখ্যা ৫১ স্বীকার করিয়া পীঠস্থান, দেবী ও ভৈরবের নামের স্বতন্ত্র তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তন্ত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার তৎকৃত প্রাণতোষণী তন্ত্রে এই তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানেও এই তালিকাটি গৃহীত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ) "একান্ন" পীঠের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "একমত না হয় পুরাণমত যত। আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রমত।" সম্ভবতঃ "মন্ত্রচূড়ামণি" স্থলে "তন্ত্রচূড়ামণি" পাঠ হইবে। অন্নদামঙ্গলের বঙ্গবাসী সংস্করণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল,

উহাতে সংস্কৃত শ্লোকগুলির সংখ্যাক্রমের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই এবং নয়টি পীঠস্থানের বিবরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তন্ত্রচূড়ামণি সংজ্ঞক একখানি পুথি আছে। উহাতে জ্ঞানার্ণবের তালিকার অনুরূপ একটি পীঠতালিকা দেখা যায়; কিন্তু পীঠস্থান, দেবী ও ভৈরবের একান্নটি ভিন্ন ভিন্ন নামসম্বলিত কোন বৃহৎ তালিকা উহাতে পাওয়া যায় না। সোসাইটীর সংগ্রহে পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠ নিরূপণ সংজ্ঞক কতিপয় ক্ষুদ্র পুথিতে উল্লিখিত আছে এবং উহা তন্ত্রচূড়ামণির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি এই পীঠতালিকাটির শুদ্ধপাঠনির্দ্ধারণে সচেষ্ট আছি। যত অধিকসংখ্যক পুঁথি পরীক্ষা করিতে পাইব, মৌলিক পাঠনির্ণয় ততই সহজসাধ্য হইবে। "ভারতবর্ষের" পাঠকগনের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহাদের কাহারও সংগ্রহে যদি তন্ত্রচূড়ামণির কোন সমগ্র পুঁথি কিংবা তদুদ্ধৃত পীঠস্থান বিষয়ক কোন ক্ষুদ্র পুঁথি থাকে, তবে আমাকে উহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৪। পীঠের সংখ্যায় যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, উহার স্থাননির্দ্ধারণ ব্যাপারেও তদনুরূপ অনৈক্য দেখিতে পাই। কতকগুলি পীঠের মর্য্যাদা অধিকাংশ তালিকাতে স্বীকৃত হইলেও, বিভিন্ন তালিকায় একই নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহকে পীঠস্থানরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। বিভিন্ন গ্রন্থকার সাধারণতঃ স্বকীয় বিবেচনা অনুসারে পীঠতালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রাচীন তালিকার অনুসরণ করেন নাই; কারণ এইরূপ সর্ব্বজনস্বীকৃত কোন প্রাচীন তালিকা ছিল না। পীঠস্থানের নাম তালিকা সম্পর্কিত বৈষম্যের অনেকগুলি উদাহরণ আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে কতিপয় দৃষ্টান্তের আলোচনা করিতে হইবে অতিরিক্ত কতকগুলি উদাহরণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের ৫ম পটলে আটটি পীঠের নাম করা হইয়াছে;—কামরূপ, মলয়, কৌলগিরি, কুলান্তক, চৌহার, জলন্ধর, উড্ডীয়ান এবং দেবকূট। তন্ত্রসারের একান্নপীঠন্যাস প্রসঙ্গে দশটি প্রধান পীঠের উল্লেখ আছে;—মূলাধারে কামরূপ, হৃদয়ে জালন্ধর, ললাটে পূর্ণগিরি, ললাটোর্দ্ধে ওড্ডীয়ান, ভ্রূমধ্যে বারাণসী, লোচনত্রয়ে জলন্তী (জয়ন্তী?) মুখবৃত্তে মায়াবতী, কণ্ঠে মধুপুরী (মথুরা), নাভিদেশে অযোধ্যা এবং কটিতে কাঞ্চী। মধ্যযুগে পীঠের তালিকা উল্লেখব্যাপারে যে কতটা স্বাধীনতা অবলম্বন করা সম্ভব হইত, ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কোন কোন পুথিতে দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক বর্ণনার পর সতীর অঙ্গাংশ পতনের ফলে উদ্ভূত পীঠস্থান সমূহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে নয়টি পীঠের নাম দেখিতেছি; —ঘাটশিলায় দেবীর বামচরণ পতিত হয়, সেখানে দেবীর নাম রুক্মিণী; যাজপুরে দক্ষিণচরণ, দেবী বিরজা; রাজবোলহাটে বামহস্ত, দেবী বিশাল লোচনী; বালিন্ডাঙ্গায় দক্ষিণ হস্ত, দেবী রাজেশ্বরী; ক্ষীরগ্রামে পৃষ্ঠদেশ, দেবী যোগাদ্যা; নগরকোটে মস্তক, দেবী জ্বালামুখী; হিংলাজে নাভিস্থল; পাঠপ্রমাদ হেতু এই তীর্থের দেবীনাম উদ্ধার করা যায় না; কামাখ্যায় মধ্য অঙ্গ, দেবী কামরূপ কামাখ্যা; এবং বারাণসীতে বক্ষঃস্থল, দেবী বিশালাক্ষী। বলা বাহুল্য, রাজবোলহাট, বালিন্ডাঙ্গা প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলের অখ্যাত দেবস্থানগুলিকে ঐ দেশের কবি ব্যতীত অপর কেহ পীঠের মর্য্যাদায় ভূষিত করেন নাই।

এখন প্রশ্ন এই যে, জগন্মাতার নির্দ্দিষ্ট অবয়বের সহিত কতকগুলি তীর্থ স্থানের সম্পর্ককল্পনার কারণ কি? আত্যাশক্তি জগদম্বাকে বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রস্থিত দেবীগণের সহিত অভিন্ন কল্পনা করার মধ্যে আমরা একটা সমন্বয়ের আদর্শ দেখিতে পাই। উহা দ্বারা সর্ব্বতীর্থে আত্যাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু দেবীর অঙ্গবিশেষের সহিত তীর্থস্থানগুলির সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইবে কেন? প্রশ্নটির উত্তর দুরূহ নহে।

শিবলিঙ্গ পূজার মূল কারণ লিঙ্গের সহিত প্রজা সৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু সৃজন ব্যাপারে লিঙ্গ অপেক্ষা যোনির মর্য্যাদা কম নহে। "ভগবান্" এবং "ভগবতী" এই দুইটি নামের মধ্যে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও জগৎ পিতা ও জগজ্জননীর সৃজন লীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন নির্দ্দিষ্ট আকারের পাহাড় বা শৃঙ্গকে জগৎ পিতার লিঙ্গ (পরবর্ত্তীকালের স্বয়ম্ভু লিঙ্গ) কল্পনা করা সহজ ছিল, বাপীবিশেষকে জগন্মাতার যোনিকুণ্ড কল্পনা করা তদপেক্ষা কঠিন ছিল না। যোনিকুণ্ডে স্নানের অনুকরণেই পরে হিরণ্যগর্ভ মহাদানের অনুষ্ঠানটি কল্পিত হইয়াছিল। ১২ অঙ্গুলি উচ্চ একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত গর্ভাকার কুণ্ডে যজমান প্রবেশ করিতেন এবং ভ্রূণরূপে জানু মধ্যে মস্তক রাখিয়া পঞ্চ নিঃশ্বাস পতন কাল যাবৎ তথায় অবস্থান করিতেন। অতঃপর ব্রাহ্মণেরা ঐ হিরণ্য নির্ম্মিত গর্ভের গর্ভাধান, পুং সবন ও সীমন্তোন্নয়ন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন এবং যজমানকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ষোড়শ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। হিরণ্যগর্ভ হইতে নব জন্মলাভ করিয়া যজমান বলিতেন, "আমি পূর্ব্বে মাতৃগর্ভ হইতে জন্মিয়া মর্ত্তধর্ম্মা ছিলাম; এইবার তোমার গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিলাম।" প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে বোধহয় যে, লিঙ্গ ও যোনির মাহাত্ম্য মূলক ধারণা সমূহ আর্য্য-ধর্ম্মের উপর অনার্য্য প্রভাবের ফল। যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে অপর একটি উল্লেখনীয় বিষয় আছে। প্রাচীন ভারতীয়গণ অনুরূপ ভাবে বিশিষ্ট আকারের যুগল পর্ব্বত বা শৃঙ্গকে জগন্মাতার স্তন কল্পনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। মাতা কেবলমাত্র সন্তানের প্রসবকারিণী নহেন, তিনি তাহাকে স্তনের সুধাদানে বাঁচাইয়া রাখেন। সে জন্য সন্তানের কাছে মাতৃস্তনের মূল্য ও মর্য্যাদা অসীম। সুতরাং ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে জগজ্জননীর কাল্পনিক স্তনী দুগ্ধ (অর্থাৎ তদীয় স্তনরূপে কল্পিত পর্ব্বতে অবস্থিত কুণ্ডবিশেষের জল) স্নান বা পানার্থ ব্যবহারে আগ্রহশীল হওয়া অসম্ভব নহে। আবার কল্পনাটিতে বাস্তবতারও ইঙ্গিত আছে। কালিদাসকৃত রঘুবংশে দক্ষিণ দিগ্বধূর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, "তস্যাধির্ শিলজ্ঞাঃ শৈলৌ স্তনাবর্দ্ধ্রৌ।"

উক্ত আলোচনা হইতে কুণ্ড ও যুগল পর্ব্বত বিশেষকে জগদম্বার রূপে কল্পনা করার কারণ বুঝা কঠিন হইবে না। এই দুইটি কল্পনা (অর্থাৎ যোনিকুণ্ড এবং স্তন কুণ্ডের কল্পনা) দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত তীর্থস্থানের সম্পর্ক বিষয়ক কল্পনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরবর্ত্তীকালে এই কল্পনাটি বিকাশ লাভ করে এবং দেবীর অন্যান্য অঙ্গাবয়বের সহিত কতকগুলি তীর্থের (প্রধানতঃ শাক্ত ও শৈব তীর্থের) সম্পর্ক কল্পিত হয়।

মহাভারতের বন পর্ব্বান্তর্গত তীর্থ যাত্রাপর্ব্ব গুপ্ত যুগের পূর্ব্বে রচিত এবং সতীর অঙ্গপাত-জনিত তীর্থাদির পৌরাণিক বিবরণ অপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই তীর্থযাত্রাপর্ব্বে পঞ্চনদের নিকটবর্ত্তী ভীমাস্থানে অবস্থিত যোনিদ্বার এবং গৌরীশিখর সংজ্ঞক পর্ব্বত শিখরস্থিত স্তনকুণ্ডের উল্লেখ আছে। ভীমাস্থান সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্। তত্র স্নাত্বা তু যোন্যাং বৈ পরো ভারতসত্তম॥ দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্ রাজন্ তপ্তকুণ্ডলবিগ্রহঃ। গবাং শতসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥" উজ্জ্বৎ পর্ব্বত বিষয়ে বলা হইয়াছে, "উজ্জানঞ্চ ততো গচ্ছেৎ পর্ব্বতং গীতনাদিতম্। সাবিত্র্যাস্তু পদং তত্র দৃশ্যতে ভরতর্ষভ॥......যোনিদ্বারঞ্চ তত্রৈব বিশ্রুতং ভরতর্ষভ। তত্রাভিগম্য মুচ্যেত পুরুষো যোনিসঙ্কটাৎ॥" গৌরী শিখর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থ সেচনতৎপরঃ। শিখরং বৈ মহাদেব্যা গৌর্য্যাস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্॥ সমারুহ্য নরশ্রেষ্ঠ স্তনকুণ্ডেষু সংবিশেৎ। স্তনকুণ্ডমুপস্পৃশ্য বাজপেয়ফলং লভেৎ॥ তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণঃ পিতৃদেবার্চ্চনরতঃ। হয় মেধমবাপ্নোতি শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" তীর্থত্রয়ের মধ্যে গৌরীশিখর হিমালয়ে; কিন্তু ইহা তন্ত্রচূড়মণিবর্ণিত কামরূপের অন্তর্গত গৌরীশিখর কিনা, তাহা বলিতে পারি না। উজ্জ্বৎ পর্ব্বত পূর্ব্ব ভারতে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয়; তবে ইহা কামরূপের অন্তর্গত ছিল কিনা, তাহা বলা যায় না। ভীমাস্থান আধুনিক পেশোয়ার জেলায় শাহবাজগঢ়ী নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী কারামার পর্ব্বত শৃঙ্গে অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন-সং প্রাচীন গন্ধাররাষ্ট্রের অন্তর্গত এই ভীমাস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গাঢ় নীলবর্ণ পর্ব্বতগাত্রে মহেশ্বরপত্নী ভীমাদেবীর স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। এই দেবীমূর্ত্তিতে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ আরোপিত হইত, ভারতের সর্ব্বাঞ্চল হইতে বহু তীর্থযাত্রী ভীমাস্থান দর্শন করিতে যাইত। ভক্তগণ সাতদিন উপবাস করিয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইলে অনেক সময়ে তিনি স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। ভীমাপর্ব্বতের পাদমূলে মহেশ্বরের মন্দির ছিল। সেখানে ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর তীর্থিকেরা (অর্থাৎ পাশুপতসন্ন্যাসীরা) পূজার্চ্চনা করিতেন। বৈদেশিক পরিব্রাজকের উদ্ধৃত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভীমাতীর্থের মাহাত্ম্য ও জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। ভীমাপর্ব্বতের পাদমূলে মহেশ্বর মন্দিরের অবস্থান দেবীর পীঠস্থানে ভৈরবের অস্তিত্ব কল্পনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিভিন্ন তীর্থস্থানের দেবীগণের সহিত আদ্যা-শক্তির অভিন্নত্ব কল্পনা পীঠস্থানের সংখ্যানির্দ্ধারণ প্রয়াসীদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু অন্য দিকে আবার প্রাচীনকালেই ভারতের উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলস্থিত চারিটি শক্তিতীর্থকে দেবীর পীঠ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইত। অবশ্য এই গুলির সহিত দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হেবজ্র তন্ত্রে চারি পীঠের নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, এই তন্ত্রখানি ৬৯৩ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে হেবজ্রতন্ত্র রচয়িতা পদ্মবজ্রের জনৈক শিষ্য ছিলেন পাল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র অনঙ্গবজ্র। গোপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তদীয় পুত্রের গুরু সম্ভবতঃ ঐ সময়েই হেবজ্রতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থে যে চারিটি পীঠস্থানের উল্লেখ আছে, তাহা জালন্ধর, ওড্ডিয়ান (উড্ডিয়ান), পূর্ণগিরি এবং কামরূপ। কালিকাপুরাণের একস্থলে এই কিংবদন্তী অনুসৃত হইয়াছে। এখানে দেখা যায়, পশ্চিমদিকে ওড্রপীঠ, দেবী ওড্রেশ্বরী কাত্যায়নী; উত্তরদিকে জালশৈল, দেবী জালেশ্বরী চণ্ডী; দক্ষিণ দিকে পূর্ণশৈল, দেবী পূর্ণেশ্বরী শিবা; পূর্ব্ব দিকে সুপ্রসিদ্ধ কামরূপ পীঠ। এই বিবরণে জালশৈল জালন্ধরের সহিত অভিন্ন এবং ওড্রদেশ "উড্ডিয়ান" নামটির ভ্রান্ত পাঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ কালিকাপুরাণেরই অন্যত্র সাতটি পীঠস্থানের উল্লেখ আছে; উহাতে বলা হইয়াছে যে, জালন্ধরে দেবীর স্তনযুগল পতিত হয়, দেবী চণ্ডী এবং উড্ডিয়ানে উরুযুগল, দেবী কাত্যায়নী। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, পীঠের এই সংখ্যাটি ঠিক আছে, কিন্তু চারিটির মধ্যে একটি নাম স্বতন্ত্র। মধ্যযুগে রচিত বজ্রযানমতের বৌদ্ধগ্রন্থ সাধনমালাতে চারিপীঠের নাম বলা হইয়াছে, ওড্ডিয়ান (উড্ডিয়ান), পূর্ণগিরি, কামাখ্যা এবং সিরিহট্ট, (শ্রীহট্ট)। এখানে জালন্ধরের পরিবর্ত্তে শ্রীহট্টের উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থে উড্ডিয়ানকে একস্থলে বজ্রপীঠ বলা হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, নামোল্লেখে বৈষম্য থাকিলেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনেকে পীঠের সংখ্যা চারিটি স্বীকার করিতেন। নগরকোটের বর্ণনা প্রসঙ্গে আবুলফজল বলিয়াছেন, "নগরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত; ইহার দুর্গের নাম কাঙ্গড়া। নগরের সন্নিকটে মহামায়ার মন্দির। ইনি প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। দূরদূরান্তর হইতে তীর্থযাত্রীরা এই স্থানে সমাগত হয়। দেবী তাহাদের প্রার্থনা সফল করেন। দেবীর প্রসন্নতা কামনা করিয়া ভক্তগণ জিহ্বা কাটিয়া ফেলে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাহাদের কর্ত্তিত জিহ্বা সঙ্গে সঙ্গে অথবা দুই একদিনের মধ্যে পুনরায় গজাইয়া উঠে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে কর্ত্তিত জিহ্বা বর্দ্ধিত হইতে পারে বলিয়া স্বীকৃত হয়; কিন্তু এত অল্প সময় মধ্যে তাহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। হিন্দু-

শাস্ত্র অনুসারে মহামায়া মহাদেবের পত্নী। শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, তিনি শিবের শক্তি। কথিত আছে, কোন এক সময়ে অশ্রদ্ধা (অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞে পতির প্রতি অশ্রদ্ধা) লক্ষ্য করিয়া মহামায়া স্বীয় অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। এই খণ্ডগুলি চারিটি স্থানে পতিত হয়। দেবীর মস্তক এবং আর কয়েকটি অবয়ব কাশ্মীরের উত্তর দিগ্বর্ত্তী কামরাজের নিকটস্থ পর্ব্বতে পতিত হয়; ঐ অঙ্গাংশের নাম হয় শারদা। অন্যান্য কতক অংশ দক্ষিণভারতের অন্তর্গত বিজাপুরের সন্নিকটে পতিত হয়; উহার নাম তুলজা বা তুরজা ভবানী। পূর্ব্বদেশে কামরূপের নিকটে দেবীর যে দেহাংশ পড়িয়াছিল, তাহার নাম কামাখ্যা। অবশিষ্ট যে অঙ্গাংশ স্বস্থানে পড়িয়াছিল, তাহার নাম হয় জালেশ্বরী; উহাই এই স্থান। এই নগরের নিকটে অনেক স্থলে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে মশালের এবং প্রদীপালোকের ন্যায় অগ্নিশিখা বহির্গত হয়। সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী ভীড় করিয়া থাকে। তাহারা ফললাভের প্রত্যাশায় নানা বস্তু অগ্নিশিখায় নিক্ষেপ করে। উপরে শিখরশোভিত যে মন্দির আছে, সেখানেও অগণিত তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, উক্ত অগ্নিশিখা অলৌকিক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে গন্ধকের খনি আছে বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে।" আবুল ফজলের বিবরণ অনুসারে, পীঠদেবতা চারিটি—কাশ্মীরের অন্তর্গত আধুনিক সরদিতে অবস্থিত শারদাদেবী, দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের সন্নিকটস্থ তুলজা ভবানী, কামরূপে কামাখ্যা এবং জালন্ধরে জালন্ধরী। অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত, পূর্ণগিরি সম্ভবতঃ বিজাপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। আবুলফজল উড্ডিয়ানের পরিবর্ত্তে কাশ্মীরের নাম করিয়াছেন।

চারিপীঠের বিবরণ হইতে দুইটি বিষয় প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ চারিটি পীঠের সকল তালিকাতেই কামরূপের নাম আছে। ইহাতে মনে হয়, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালেই ভারতের অন্যান্য যোনিকুণ্ড সমূহের তীর্থ মর্য্যাদা অনেকাংশে আত্মসাৎ করিয়া কামরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ কামাখ্যাদেবী এই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। কারণ ঐ সময়ে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন-সং কিয়ৎকাল কামরূপ রাজসভায় অবস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কামাখ্যাদেবীর উল্লেখ করেন নাই। কামাখ্যাদেবীর প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ কামা। এই নামের সহিত দেশের কামরূপ নামের সম্পর্ক আছে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের কামরূপ সংজ্ঞা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে কামরূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রাচীনকালে উত্তর পশ্চিম ভারতের গন্ধার, উড্ডিয়ান, কাশ্মীর ও জালান্ধর শক্তিসাধনার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। সুবাস্তু অর্থাৎ সোয়াৎ নদীর তীরবর্ত্তী উড্ডিয়ান দেশ শক্তি উপাসনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বলা যাইতে পারে। গন্ধার দেশের অন্তর্গত ভীমাস্থান এবং কাশ্মীরের সন্নিহিত শারদামন্দির উড্ডিয়ান দেশের সীমান্ত হইতে সুদূরবর্ত্তী ছিল না। সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন-সং উড্ডিয়ান দেশ পরিভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন, "এই দেশের অধিবাসীগণ ভীরু ও প্রবঞ্চক। তাহারা বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহশীল, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত শাস্ত্রাধ্যয়ন করে না। যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা-লাভকেই তাহারা একমাত্র পেশারূপে অবলম্বন করিয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়, সপ্তমশতাব্দীতেই উড্ডিয়ানবাসীদিগের তান্ত্রিক বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই দেশের নাম অনুসারে তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের অনৈকা দেবীর নাম হয় উড্ডিয়ান-মারীচী। উড্ডিয়ানরাজ ইন্দ্রভূতি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী অনেক সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য ছিলেন। জ্ঞানসিদ্ধি প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ তাঁহারই রচনা। ইন্দ্রভূতির পুত্র স্বনামখ্যাত সিদ্ধাচার্য্য যোগাচারপন্থী পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বৌদ্ধতর্কাচার্য্য শান্ত রক্ষিতের সহযোগিতায় তিনি ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে সম্-যস্ নামক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা ইন্দ্রভূতির ভগ্নী লক্ষীঙ্করা অদ্বয়সিদ্ধি সংজ্ঞক বৌদ্ধতন্ত্র রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দশমশতাব্দী হইতে উত্তর পশ্চিম ভারতে তুর্কীজাতীয় মুসলমানদিগের অধিকার বিস্তৃত হইতে থাকে। উহার ফলে ধীরে ধীরে গন্ধার ও উড্ডিয়ান দেশের তান্ত্রিক সাধনা বিলুপ্ত হয়।

ভালো

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

সতীশের চাকরী গেল আর তার স্ত্রীর হ'ল চাকরী।

সুরমা হাসতে হাসতে বললো—মজা হ'ল বেশ! এবার তুমি রেঁধে ভাত দেবে আর আমি যাব আফিস, কি বল'।

সতীশ তাড়াতাড়ি বলে উঠে—নিশ্চয় নিশ্চয়, এ আমি খুব পারবো।

সুরমা হাসিতে যেন ফেটে পড়ে, বলে—কিন্তু লোকে বলবে কি! গৌরী, হেনা জানলা দিয়ে উঁকি মারবে, ছি, ছি।

সতীশ নির্বিকারচিত্তে বলে যায়—উঁকি মারুক্ না, আমি বরং তাদের ডেকে বলবো—এই ভাই রান্না এতক্ষণে হ'ল, উনি খেয়ে-দেয়ে এই মাত্তর আফিস গেলেন।

হাসির দমকে সুরমার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে—অতিকষ্টে দম নিয়ে সে বলে—থামো, খুব হয়েছে! কোন কথা তোমাকে বলবার যো নেই। সবতাতেই ঠাট্টা!

স্নিগ্ধ সকাল সুখী দম্পতীর কলকণ্ঠে মুখর হ'য়ে ওঠে। কথা তাদের যেন আর থামে না!

পাশের বাড়ীর একটা জানলা সশব্দে খুলে যায়। হেনা মুখ বাড়িয়ে বলে—কি হ'ল ভাই তোদের? সক্কালবেলায় —মাগো মা, পাড়া যে একেবারে মাতিয়ে তুলেছিস্!

সতীশ তাড়াতাড়ি অমৃতবাজারখানা টেনে নেয়। সুরমা চাপা কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলে—সর্বনাশ হ'য়েছে ভাই আমাদের! ওঁর চাকরীটি গেছে।

হেনা বলে—তাতে এত হাসি কিসের শুনি?

সুরমা আবার হাসে, বলে—আমার কিন্তু ভাই চাকরী হ'য়েছে। এই মাত্র চিঠি এল। দীনবন্ধু গার্লস্ স্কুলে হেডমিষ্ট্রেসগিরি। একশো টাকা মাইনে।

—ওমা, তাই নাকি, দাঁড়া যাচ্ছি আমি। জানলা বন্ধ হ'য়ে যায়—হেনা আসে।

রান্না কিন্তু সুরমাই করে।

দুজনে একসঙ্গে খায়, তারপর একসঙ্গে বের হয় ঘরে তালা দিয়ে।

সুরমা যায় স্কুলে আর সতীশ যায় চাকরীর উমেদারী করতে।

খবরের কাগজের ওয়াণ্টেড্ কলম থেকে চাকরীর সন্ধান ক'রে দরখাস্ত নিয়ে নিজেই হাজির হয় যথাস্থানে।

পথে সেদিন বাল্যবন্ধু ভবেশের সঙ্গে দেখা। চাকরী গেছে শুনে দুঃখ করে সে তাকে সান্ত্বনা দেয়, বলে—দাঁড়া আমাদের অফিসে তোকে ঢুকিয়ে দেব শিগ্গির। শুনছি একটা নতুন ব্র্যাঞ্চ ওপেন করবে।

একথা সেকথার পর সতীশ বলে—সুরমার চাকরী হ'য়েছে।

ভবেশ যেন লাফিয়ে ওঠে—তাই নাকি, কোথায়?

—দীনবন্ধু গার্লস্ স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ। সতীশ বলে।

ভবেশ আশান্বিতের মত বলে যায়—ভাল ভাল, খুব ভাল। তবু কতকটা তোর রক্ষে।

একটু আহত হয়েই সতীশ প্রশ্ন করে—তার মানে?

ভবেশ বলে—তার মানে উপোষ দিতে হবে না আর কি। ধীরে সুস্থে যা-হোক একটা কাজ তুমিও দেখে নিতে পারবে।

—আচ্ছা যাই তবে, আর একদিন দেখা করবো—কথাটা বলেই অকস্মাৎ সতীশ চলে যায় অন্য একটা রাস্তায়।

ভবেশ আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়—তাকিয়ে থাকে সতীশের গমন পথের দিকে।

—ওগো শুনছো!

শুনছি, কাণ আমার খাড়াই আছে—সতীশ উত্তর দেয়। আজ আর সে কথায় রসিকতা নেই, আছে উগ্রতার সুর।

অধীর আগ্রহে আর আনন্দে কি যেন বলতে চেয়েছিল সুরমা! বলা তার হ'ল না—থেমে গেল।

থামলে যে—সতীশ বলে।

সুরমা আহতকণ্ঠে উত্তর দেয়—থামবো না! যা তোমার কথার ছিরি! কিছু বলবার যো আছে!

সতীশ ব্যঙ্গ ক'রে বলে—কেন, খারাপ শোনালো বুঝি!

—খারাপ শোনাবে না—কথাটা বলেই সুরমা থেমে যায়। চেয়ে দেখে সতীশের অস্বাভাবিক কঠিন দৃষ্টি তার দিকে জ্বল জ্বল ক'রে তাকিয়ে আছে।

সতীশের গলাটা দুহাতে জড়িয়ে সুরমা বলে—মিনতিভরা কণ্ঠে—আমি কি করেছি বলতো? কেন রাগ করো আমার ওপর। বল, বল শিগ্গির।

সতীশের মন ভিজে যায়, তবু দৃঢ়কণ্ঠে বলে—দুঃখ নয়, রাগ নয় সুরমা। কেমন যেন একটা অস্বস্তিভাব। কিছু ভাল লাগছে না। তুমি চাকরী ক'রে আমায় খাওয়াচ্ছ।

গলা থেকে হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় সুরমা। রাগে তার সমস্ত মুখ লাল হ'য়ে যায়। বলে—বটে, আমি চাকরী করি—এ তুমি সহ্য করতে পারো না! কেন পারো না জিগ্যেস করি?

সতীশ দমবার পাত্র নয়, সমান তেজে বলে যায়—আমি পুরুষ, তাই স্ত্রীলোকের রোজগারের পয়সায় খাওয়া অপমানকর বলে মনে করি। তুমি এনে দেবে তবে খাব'?

সুরমাও বলে যায় তার উত্তরে—আমিও মনে করি পুরুষের উপার্জনে নির্ভর করা আজকালকার মেয়ের উপযুক্ত কাজ নয়। আজকের মেয়েরা অক্ষম নয় জেনো। রাগের বশে অনেক অন্যায় কথাও সুরমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সতীশ শুম্ খেয়ে চুপ করে থাকে। তারপর বেরিয়ে যায়।

সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়ায় কাজের সন্ধানে। বহু লোকের কাছেই যায়। কেউ নিরাশ করে, আর কেউ বা একটু আশা দেয়, বলে—আচ্ছা চেষ্টা করবো।

সতীশের মাথায় অপমানের আগুন, তাই সে-কথায় তার মন ভরে না। কাজ যেন তার আজ্‌ই চাই।

শেষকালে বিকেলের দিকে যায় ভবেশের বাড়ী। হাজার হোক্ পুরানো বন্ধু, হয় তো বুঝবে তার ব্যথা।

সব কথাই ভবেশ শুনলো।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বললো—ভাল কথা মনে পড়েছে! করবি একটা কাজ? তবে সম্মানে একটু বাধবে—।

আরে রেখে দাও তোমার সম্মান—সতীশের কথাটা গর্জ্জনের মত শোনায়।

তারপর সে বলে—যে কাজই হোক্ না কেন, আমি নিশ্চয় তা করবো।

ভবেশ বলে—কাজটা কি জানিস—ফাইল সরকারের পোষ্ট—মাইনে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। কাজটা আমারই আণ্ডারে অবশ্য।

তাই দে তুই, তাই দে—ভিক্ষুকের মত সতীশ অনুনয় জানায়।

ভবেশের একটু চেষ্টাতেই কাজটা সতীশের হয়ে গেল।

হোক্ ফাইল সরকারী তবু চাকরী তো! স্ত্রীর রোজগারে থাকার চেয়ে ঢের ভালো—ঢের বেশী সম্মান এতে।

খুব মন দিয়েই সতীশ কাজ ক'রে যায়।

অফিসের বড়বাবু শুনলেন—সতীশ রায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট—ফাইল সরকারের কাজ করছে।

ভবেশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—How funy! কিন্তু কদিন থাকবে ও?

ভবেশ বললো—যে কদিন থাকে থাকুক না। উপোষ করার চেয়ে তো ঢের ভালো।

বড়বাবু লোক ভালো। শিক্ষিতের সম্মান বোঝেন, তাই তাঁর চেষ্টার ফলে সতীশ চলে যায় অন্য ডিপার্টমেণ্টে, মাহিনা একশ টাকা।

ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হ'লেন সতীশের ওপর। তাই দু'মাস বাদেই সতীশের আবার পদোন্নতি।

এখন সে একটা ডিপোর এ্যাসিষ্টেণ্ট্ ম্যানেজার, মাইনে আড়াইশো টাকা।

চাকরী হবার পর থেকেই সুরমার সঙ্গে বিবাদ তার মিটে যায়। এখন তো প্রতিদিনই মধুচন্দ্রিমা।

মাসের শেষে আড়াই শ' টাকা মাইনে নিয়ে সতীশ এল বাড়ী।

সুরমারও মাইনে হয়েছে দেড়শো টাকা।

টাকাগুলো একত্র করে সুরমা গোণে। ভাবে—ওঃ কত টাকা—চারশো টাকা! দুটা মানুষ, কি করবে এত টাকা। জমাবে খুব বড় ব্যাঙ্কে। তারপর ব্যবসা··· তারপর বড় বাড়ী বালিগঞ্জের লেকের ধারে—ঝক্‌ঝকে মোটর।

সতীশের উচ্চ হাস্যে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়।

সতীশ বলে—এইবার চাকরী তুমি ছেড়ে দাও। এত টাকা কি হবে আমাদের।

সুরমা বলে—না—না, চাকরী আমি ছাড়বো না। দুজনের জমানো টাকায় কি কি হবে জানো?

কী? সতীশ প্রশ্ন করে।

সুরমার মুখ খুশীর হাসিতে ভরে যায়। বলে—খুব বড় বাড়ী···ঝক্‌ঝকে মোটর।

সতীশ কিছুক্ষণ ভেবে নেয়। তারপর বলে—না না তা নয়। আমাদের দুজনের টাকা জমিয়ে ব্যবসা করবো, তারপর সেই ব্যবসার টাকায় বড় বাড়ী নয়—ঝক্‌ঝকে মোটর নয়।

জানলার কাছে সুরমাকে টেনে নিয়ে পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে সতীশ ব্যথাতুর কণ্ঠে বলে—যদি পারি, ওদের ভালো করবো।

সুরমা জানলা দিয়ে দেখলো—কঙ্কালসার ভিক্ষুকের দল মহানগরীর মহাপথ ধরে চলে যাচ্ছে।

সংকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনা

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম-এ

গয়াধামে যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আর্ত্তকণ্ঠে নিমাই চন্দ্রশেখরাদি সঙ্গিগণকে কহিলেন—"তোমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি আর সংসারে যাইব না ; আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুরায় চলিলাম, আমার বৃদ্ধা জননীকে তোমরা সান্ত্বনা দিও", তখন তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন। পরে অনেক প্রবোধ দিয়া ও একরূপ জোর করিয়াই তাঁহারা এই প্রেমের প্রতিমাটীকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন সেই উদ্ধত শিরোমণির পূর্ব্বভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে ও তাঁহার স্থানে প্রেমোন্মাদের লক্ষণসমূহ আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দিব্য প্রেমোন্মাদের মধ্যে যখন বাহ্য জগত তিনি একরূপ বিস্মৃতপ্রায়, তখন একদিন তাঁহার অসংখ্য ছাত্র, তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ পাঠ-গ্রহণ করিতে আসিল। তিনিও সকলকে পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অধ্যাপনা আর তিনি করিতে পারিলেন না। সে সময়ে তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, সমস্তই হরিপক্ষে হইতে লাগিল। ছাত্রগণকে স্পষ্টই তিনি বলিয়া দিলেন—"যেখানে তোমাদের ইচ্ছা, তোমরা সেইখানে গিয়া অধ্যয়ন কর,। আমি আর তোমাদিগকে পড়াইতে পারিব না। পড়াইতে গেলে সকল শাস্ত্রের মূল স্বরূপ কৃষ্ণনাম আমার মনে পড়ে, আমি আর স্থির থাকিতে পারি না।" মহাপ্রভু ইহা বলিয়া গ্রন্থে ডোর দিলেন। ছাত্রগণও উপযুক্ত। তাহারা বলিল—"আমরাও আর পড়িব না। তোমার যে সঙ্কল্প প্রভু, আমাদেও সেই সঙ্কল্প। আমরাও হরিনাম করিব।"

তখন প্রভু করতালি দিয়া নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

> "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
> গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

পড়ুয়ারাও অধ্যাপকের অনুসরণ করিলেন, আর মহাপ্রভু সেই সঙ্গীতক্ষেত্রের ধূলিতলে গড়াগড়ি দিয়া কলিহত জীবের উদ্ধার প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিলেন।

ইহাই কীর্ত্তনের আরম্ভ এবং ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবের জ্বালা জুড়াইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—

> "কলিযুগের যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন।
> এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥"

চৈতন্য-লীলার গূঢ় রহস্য যাহাই হোক না কেন, নাম-যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা কলিহত জীবের উদ্ধারের পথ দেখানই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—"চৈতন্যাবতারের নিগূঢ় রহস্য বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতে শ্রীরাধার প্রেমাস্বাদন হইতে পারে, কিন্তু বৃন্দাবন এবং গৌড়ের সকল ভক্তগণের মতেই অবতারের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইতেছে সঙ্কীর্ত্তন প্রচার।"

কাজেই সঙ্কীর্ত্তন-বহুল পূজা সম্ভার দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনানুষ্ঠান বিধেয়। যিনি যেরূপ দেবতা, তাঁহার সেইরূপ উপহার দ্বারাই পূজা করিতে হয়। যে দ্রব্যে যাঁহার বিশেষ প্রীতি, তাঁহাকে সেই দ্রব্য সম্ভারে পূজা করিতে পারিলেই, তবে তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিতে পারা যায়। প্রীত্যানুকুল ব্যাপারকেই পূজা বলে। যিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ বিশেষকে জগতে প্রকাশ করিলেন, একমাত্র সংকীর্ত্তনেই যাঁহার বিশেষ প্রীতি, সংকীর্ত্তন ভিন্ন তাঁহার প্রীত্যানুকুল সামগ্রী আর কি হইতে পারে ? শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

> কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
> সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজ্ঞৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

ইহার কারিকায় শ্রীপাদ্ জীব গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

> "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরং, দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং।
> কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈস্মঃ, কৃষ্ণঃচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

> ব্যক্ত করি ভগবতে কহে আর বার।
> কলিযুগে ধর্ম্ম নামসংকীর্তন সার॥—চৈঃ-চঃ।

আবার যুগ-সন্ধির শেষ বৈরাগী—আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণও সারার্থদর্শিনীতে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের ব্যাখ্যায় "অথ কৃষ্ণাবির্ভাবস্য যদাকাংকৃত পাদাম্বুজস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য বিজয়ব্যঞ্জনং মঙ্গলং" বলিয়াছেন এবং "অঙ্গেতি নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ উপাঙ্গেতি শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ্ মদনগোপাল গোস্বামী ইহার অনুবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যিনি সাধারণ দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে বিভাত, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁহার উপাঙ্গ, হরিনাম যাঁহার অস্ত্র, এবং গদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতি যাঁহার পার্ষদ, স্থিরবুদ্ধি সাধুগণ সংকীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।"

শ্রীপাদ্ নীলমণি গোস্বামীও তদ্রচিত শ্রীমদ্ভাগবত-পদ্যে মহাপ্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া এই সুরই ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন—

> কান্তাকান্তি যারা গৌর, হইলেও চিত্তচোর
> কৃষ্ণবর্ণপ্রেমির প্রত্যয়।

অদ্বয় পরমানন্দ, অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ,
সুবিখ্যাত যাঁর অঙ্গ হয়।
উপাঙ্গ শ্রীগদাধর, আদি যত শক্তি বর,
হরিনাম অস্ত্র গ্রাম যাঁর।
শ্রীবাসাদি ভক্তচয়, পারিষদ সমাশ্রয়,
সবা সঙ্গে যাঁর অবতার॥
কলিতে সুমেধাগণ, তাঁহারি করে যজন,
সংকীর্ত্তন প্রায় যজ্ঞদ্বারে।
জীবেরে করুণা করি, সেই প্রভু গৌরহরি,
নিজমত জানান সবারে॥"

চৈতন্যাবতারের অস্ত্র হইতেছে সাঙ্গোপাঙ্গ এবং যজ্ঞ হইতেছে সংকীর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তি—শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।

অভীষ্ট বিষয়ে চৈত্তৈকাগ্রতা সম্পাদক ক্রিয়া বিশেষকেই উপাসনা কহে। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অবশ্য পৃথক পৃথক উপাসনার উপযোগিতা আছে, কিন্তু কলিকালে একমাত্র সংকীর্ত্তনময়ী উপাসনাই সর্ব্বনিরপেক্ষরূপে সর্ব্বার্থ সাধিকা হইয়াছে। সংকীর্ত্তনের ন্যায় পরম সুখজনক সুগম উপাসনা আর দ্বিতীয় নাই। বেদাদি শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বিদ্বানেরা বহুকাল ধরিয়া ধ্যান-ধারণা সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া যাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপায় অত্যন্ত নীচজনেরাও একমাত্র সংকীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়া, অত্যল্পকাল মধ্যে অনায়াসে সর্ব্বদুঃখ নিবারক পরম-তত্ত্বকে অপরোক্ষরূপে অনুভব করিতেছে। কাজেই সংকীর্ত্তনের প্রভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নয়। প্রাচীন মহাজনেরা ইহার অলৌকিক শক্তি অনুভব করিয়া যথার্থ-ই বলিয়াছেন,—

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং,
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যা বধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং।"

যিনি চিত্তরূপ দর্পণের মলাপনোদক, সংসাররূপ মহা দাবানলের নির্ব্বাপক, মঙ্গলরূপ কুমুদকুলের জ্যোৎস্না বিস্তারক, বিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ, সকলের আত্মশোধক, আনন্দ জলধিবর্দ্ধক, পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন-কারক, সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চিত্তরূপ দর্পণ সুমার্জ্জিত হইলেই উহা সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়। শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে ঐ আনন্দ-জলধি উচ্ছলিত হইয়া গিরি-পর্ব্বত, কানন-প্রান্তরকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, আর ঐ সংকীর্ত্তননীরে সর্ব্বত্রই সুমঙ্গলরূপ কুমুদকুল বিকশিত হইয়া চক্রবাকগণকে আহ্লাদিত করিয়াছিল। মৃতপ্রায় বিদ্যাবধূ সংকীর্ত্তন নিষেচনে পুনরুজ্জীবিতা হইয়া অবিদ্যাশায়ী জীবগণকে প্রবোধিত করিয়া আত্ম-ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুশীতল সংকীর্ত্তনজলে মুহুর্মুহুঃ স্নাত হওয়ায়, জীবের মন বুদ্ধি প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়কুল আত্মবিশুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক ভগবৎ পূজার অধিকার লাভ করিয়াছিল। অলৌকিক সংকীর্ত্তনামৃত নিষেচনে প্রাণী মাত্রের দুঃখ, শোক, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুভয় নিবারিত হয়। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, আশু প্রাণনাশক বিসূচিকা ব্যাধিভয়ে ভীত ব্যক্তিগণও সংকীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়া অবলীলাক্রমে ঐ ভয়কে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আবার আসন্ন মৃত্যুভয়ে পতিত ব্যক্তি, যাহার কিছুতেই আনন্দ নাই, সেও সংকীর্ত্তনে প্রবেশমাত্র পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন করিয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং তদনুগত ভক্ত-প্রবরেরা একমাত্র সংকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহাকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিয়াছেন। সেই সকল মহাজনের বিরচিত পদ-ক্রমই তদ্বিষয়ের মুখ্য প্রমাণ। প্রাচীন মহাজনেরা সংকীর্ত্তন-যজ্ঞকে চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ যে চতুঃষষ্টিভেদ, উহাই পূজোপচার। পূজা-সম্ভার শব্দ পূজোপচারেরই বাচক।

সংকীর্ত্তনে শ্রীমহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ, লীলাময় যে গান শ্রবণ করা যায়, উহাকে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন বলে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাময় কীর্ত্তনকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বলা হইয়া থাকে। প্রথমে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রীতি মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে। গৌর-কৃষ্ণের অভেদ ভাব ঐ কীর্ত্তনে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। যাহারা বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চায় না, তাহারা ঐ সংকীর্ত্তনের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে অপারক হইয়া উভয়ের অনাদি ভেদ কল্পনা করে; কিন্তু রসিকগণ বিষয় ও আশ্রয়রূপ আলম্বন বিভাবের প্ররোচনায় রস-স্বরূপ একমাত্র তত্ত্বকেই আস্বাদন করিয়া থাকেন। একমাত্র অখণ্ড রস-স্বরূপ পর-ব্রহ্ম, বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দ্বিধা বিভাবিত হন। সাধকের চিত্তে বিভাব প্রবেশ করিলে ক্রমে ক্রমে অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-কদম্ব উক্তি দ্বারাই হৌক, আর আক্ষেপ দ্বারাই হৌক, একত্র সম্মিলিত হইয়া একটি অলৌকিক আস্বাদনরূপ রস নিষ্পন্ন হয়। যে রসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধিকা, ঐ বিষয় ও আশ্রয়ের, তদাত্ম্য ভাবাপন্ন তত্ত্বই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পূর্ণরস-স্বরূপ তত্ত্বই রসাস্বাদক হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে দীপ্তি পাইতেছেন। সাধকেরা ঐ রসাস্বাদক তত্ত্বকে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা রসাশ্রয়রূপে উপাসনা করেন। ঐ উপাসনা দ্বারা চিত্ত, রসের বিষয়ে উন্মুখ হয়, পরে বিষয়কে আস্বাদন করিতে সক্ষম হয়। এই নিমিত্তই গৌর-কীর্ত্তনের পর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদ্ধতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভক্তগণ "স্বয়ং ভগবান" বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে "ভগবান" ও "স্বয়ং ভগবানের" মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। স্বরূপ দর্শনেই "স্বয়ং ভগবানকে" পাওয়া যায়। "ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যাঁহার অংশবিভব, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্—আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু "স্বয়ং ভগবান্।" "ভগবান" ও "স্বয়ং ভগবানের" মধ্যে ভেদাভেদ উপলব্ধি করিতে না পারিলে শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব ও তাহার উপসংহার শ্রীচৈতন্যলীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

এই জন্যই বঙ্গদেশীয় কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর চরিত্রঘটিত নাটক রচনা করিয়া তাহা নীলাচলে যাইয়া স্বরূপ গোস্বামীকে শ্রবণ করাইলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়াই ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন—

আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ
দুই ত ঈশ্বর তোর নাহিক বিশ্বাস।
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তারে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তারে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তা'র এই গতি॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

উক্ত পণ্ডিত প্রবরের ধারণা ছিল শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ অচেতন এবং তাহাতে চৈতন্যের যোগ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। অন্তর্দৃষ্টিশূন্য ব্রাহ্মণের এরূপ ব্যাখ্যায় পণ্ডিত হইলেও তাঁহার মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। পণ্ডিত কতকগুলি বই পড়িয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কেন না, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে প্রকৃত জড় বলিয়া বর্ণনা করায় এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে "জীবচৈতন্যের" ন্যায় বর্ণনা করায় তাহার যে মহাপরাধ জাত হইয়াছে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই। জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের দেহ ও আত্মার কোন ভেদ নাই। সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিসকলকে জড় দেহাভিমানী অজ্ঞ জীবেরাই জড়ের ন্যায় প্রতিতী করে। ভক্তিদেবীর কৃপায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণদেহের অভিমান বিদূরিত হইলে ভগবদ্ভক্তের নিকট শ্রীমূর্ত্তিসকল সচ্চিদানন্দঘনরূপে প্রতীত হয়।

কাজেই শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব ও তাহার উপসংহার শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝিতে হইলে শ্রীভগবানকে তাহার রসের স্বরূপে দেখিতে হইবে।

এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণকীর্ত্তনান্তর চিত্তকে রসের বিষয়ে উন্মুখ করিয়া পরে বিষয়কে আস্বাদননিমিত্ত কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপযোগিতা।

ভগবানের দিক হইতে জগৎকে দেখিয়া হৃদয়াবেগ প্রকাশের যে বাহন, তাহাই হইতেছে কীর্ত্তন। প্রেমের ঠাকুরের মধুর রসাস্পদ চরিত-কথা স্মরণ করিয়া মন প্রেম-ভক্তিতে অভিষিক্ত করিয়া লইতে পারিলেই জীবের ভাবধারা মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীভগবচ্চরণে নিবেদিত হইয়া পড়ে। তখন তাহার স্নেহ-প্রেমার্দ্র বৃত্তিসমূহ আত্মপ্রকাশের সার্থকতা লাভ করিয়া তদীয় চিত্তকে সরস, সুন্দর, উন্নত, ধর্ম্মানুগত করিয়া তুলে।

এই জন্যই সংকীর্ত্তনবহুল পূজাসম্ভারে শ্রীনন্দনন্দন হইতে অভিন্ন, অথচ তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনানুষ্ঠান শাস্ত্রানুমোদিতরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ভজনে একান্ত অভিলাষী, তাঁহাদিগের জন্য ঐরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ভস্মে হবি

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়া যা করতে পারেন নি সেই অসাধ্য সাধন করেছিল খোকা। জীবন যৌবনে প্রথম আবির্ভূতা সদ্যপরিণীতা প্রিয়তমা ফুলশয্যার মধুযামিনীতে যদি একটা অনুরোধ করেন, তা পালন করবার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন না এমন কোনো পাষাণপুরুষ কি ভূবিশ্বে আছে? আমার বিয়ের ফুলশয্যার মায়া-নিশীথে প্রিয়তমা মোহন-সংকোচে মধুকণ্ঠে আমাকে ধূমপানের বদ-অভ্যাসটা ছাড়বার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন।

আমি কি করলাম? সেই অনুরোধ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করামাত্রই আমি হাতের সিকি দগ্ধ সিগারেটটা সজোরে সুদূরে নিক্ষেপ করলাম। প্রেম-গদগদ ভাবে নিবেদন করলাম—তিনি যেন আমার সকল পাপ এমনি করেই মোচন করেন।

তারপর এক দুই তিন করে আট-চল্লিশটা ঘণ্টা—পুরোপুরি দুটো দিন আর দুটো রাত আমি সত্যি-সত্যি আর ধূমপান করলাম না। তারপর? তারপর বৈরাগ্যের উনপঞ্চাশত্তম ঘণ্টায় অফিসে নৈশ কর্ত্তব্যের কালে ধূম-পিপাসায় আমার মাথায় একেবারে উনপঞ্চাশী চেপে গেল। আমি আবার সিগারেট ধরালাম, ঠোঁটে নিয়ে তা টানলাম এবং মুখে নিয়ে তার ধূম পান করলাম। তখন থেকে

আবার যথাপূর্ব অপরাধটির নিয়মিত অনুষ্ঠান চলল—অবশ্য অত্যন্ত গোপনে।

কিন্তু মাসখানেক পরেই ধরা পড়ে গেলাম। প্রিয়া অভিমান করলেন। আমি আবার ধূমপান ছাড়ার অভিনয় করে আবার সংগোপনে অপরাধ করতে লাগলাম। মাস কয়েক পরে পুনরায় যখন ধরা পড়ে গেলাম, তখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। প্রিয়া ক্রুদ্ধা হলেন, মুখরা হলেন, গর্জন করলেন, বর্ষণ করলেন, এমন কি আমাকে শয্যাবঞ্চিত পর্যন্ত করলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই—কিছুতেই ধূমপান ছাড়তে পারলাম না। অগত্যা প্রিয়তমা কপালে করাঘাত হেনে নিবৃত্ত হলেন। আমার নেশা পূর্ণ গতিতে চলতে লাগল এবং তার পেছনে সহধর্মিনীর দুঃসহ বাক্যবাণ অবিশ্রাম বর্ষিত হতে লাগল।

বছরকয়েক পরে হল একটি খোকা।

দেড় বছর বয়সে খোকা যখন সারা উঠোনময় হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে বেড়াচ্ছে, যখন সে সকলের সকল কথার অনুসরণ করতে গিয়ে অবোধ্য কতকগুলো কথা উচ্চারণ করে সকলের হাস্যোদ্রেক করছে এবং সকলের সকল কাজের অনুকরণ করতে গিয়ে সকলকে পুলকিত করছে, সেইসময় একদিন দেখলাম, খোকা কোথা থেকে আমারই পানাবশিষ্ট এক টুকরা দগ্ধ সিগারেট কুড়িয়ে নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে গম্ভীরভাবে ধূমপানের অনুকরণ করছে।

আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম : খোকার যে তামাকের নেশায় হাতে খড়ি হচ্ছে! গৃহিণীকে সক্ষোভে কথাটা জানাতে তিনি সতেজে জানালেন যে, খোকা নাকি বেশ করছে, সে নাকি ব্যাপ-কা ব্যাটা হচ্ছে। নিজেকে একান্ত নিরুপায় বোধ করলাম।

নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি বলেই তামাকের অভ্যাস আমি ছাড়তে পারছিলাম না, কিন্তু ছাড়তে পারলে বাঁচতাম সে-কথা প্রিয়াকে বোঝালেও তিনি যে কিছুতেই বুঝতেন না—বুঝতে চাইতেনই না। আত্মবঞ্চনার জন্যে বিদেশী ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের সুরে সুর মিলিয়ে যতই কেন-না গুণ গান করি, নিজের অন্তরে ভালো করেই জানি যে, ধূমপানের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই ; যদিও বা সামান্য কিছু থাকে অপকারের স্তূপের তলায় তা চাপাও পড়ে যায়। ধূমপানের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, আমার মতো লোকের পক্ষে তা একান্তই বিপুল এবং নিতান্তই বেদনাদায়ক। ধূমপান এদেশে দুর্নীতির মধ্যে গণ্য। কোনো দিক দিয়েই নেশাটাকে সমর্থন করার কোনো উপায় নেই। নিজে মজেছি—মজেছি, খোকাও এ নেশায় মজবে একথা ভাবতেই মনটা কেমন টন্‌টন্‌ করে উঠল, নিজেকে অপরাধী বোধ করতে লাগলাম।

খোকার ভবিষ্যৎ-অকল্যাণের আশংকা আমাকে দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল করে তুলল। নিজের গায়ে চাবুক মারতে ইচ্ছা হল : খোকাকে আমিই নষ্ট করছি, তার জীবনে মন্দ আদর্শ আমার থেকেই সংক্রামিত হচ্ছে।

হিমালয়িক দৃঢ়তায় মনের মধ্যে সংকল্প অটল হয়ে উঠল। আমি ধূমপান ছেড়ে দিলাম—ছেড়ে দিতে পারলাম এবং আর ধরলাম না। ছেড়ে কষ্ট হতে লাগল। সে যে কী কষ্ট ভুক্তভোগীজন তা অনুমান করলেই শিউরে উঠবেন ; আর, অভুক্তভোগীকে তা বোঝাতে যাওয়া বৃথা। পরম-সহিষ্ণুতায় সে-কষ্ট আমি বরণ করে নিলাম ; ধূম আমি আর কিছুতেই পান করলাম না, ধূমপান আমি ছেড়ে দিলাম, দিতে পারলাম।

একমাস দুমাস তিনমাস—মাসের পর মাস পরীক্ষা করে খোকার মা যখন দেখলেন যে, নেশাটা আমি সত্যি ছেড়েছি, তখন একদিন যে দীর্ঘশ্বাসটি তিনি ছাড়লেন এবং খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে যে-চুমোটি তিনি খেলেন, আমার বুকে চিরদিনের তরে তা মুদ্রিত হয়ে রইল।

খোকা আমার নেশা ছাড়াল। তার মা যা পারেন নি সেই অসাধ্য সাধন করল খোকা।

তারপরে বহুদিন চলে গেছে। এখন আমি প্রৌঢ় হয়েছি, চাকরি থেকে অবসর নেবার দিন গুনছি। মাথার সবখানা সমুখ জুড়ে প্রকাণ্ড টাক পড়েছে, এবং টাক দিয়ে যেটুকু বাকিস্থান, পাকা চুলে তা একেবারে পাকিস্থান হয়ে উঠছে।

এক কালে যে ধূমপান করতাম তা এখন ভুলেই গেছি। এখনকার যুবকরা যখন কে কত বেশি দামের কত ভালো সিগারেট পান করে—তাই নিয়ে হামবড়াইএর পাল্লা লাগায়, তা শুনে আমি বিন্দুমাত্র উত্তেজনা বোধ করিনে।

বার্ধক্য বোধ করছি। জমা খরচ লেখার অভ্যাস আমার কোনো দিনই নেই, তার জন্যে এতকাল হিসাবে

কোনো গরমিলও বোধ করি নি; কিন্তু আজকাল যেন প্রায়ই মনে হয়—পকেটে যত রেখেছিলাম তত নেই, যেন কিছু কম রয়েছে! মনে মনে হাসি—মাথা বুঝি বেঠিক হতে শুরু কর্‌ল, দীর্ঘশ্বাস ফেলি: দিন ফুরিয়ে এল আর কি!

আর ভাবনাই বা কী? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে খোকা আমার আঠারো বছরে পা দিয়েছে; ম্যাট্রিক পাশ করে খোকা এখন কলেজে 'সেকেণ্ড-ইয়ার'এ পড়ছে······

সেদিন অফিস থেকে ফিরছি। মাঝপথে এক বাগানের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সেটা পার হতে গিয়ে তার মধ্যখানেই আমায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সামরিক গাড়ির নিচে চাপা পড়বার আতঙ্ক পর্যন্ত ভুলে আমার নিশ্চল নিষ্প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। একটা যেন ধাক্কা খেলাম, সেটা মাথায় কি বুকে কি দেহে কি মনে—কিছুই নির্ণয় করতে পারলাম না। সে ধাক্কায় আমার সর্বসত্তা একেবারে রি-রি করে কেঁপে উঠল। যে দৃশ্যে আমার দৃষ্টি অনড় স্তম্ভিত হয়ে রইল, তা হচ্ছে—আমার খোকা, আমারই সেই খোকা—সামনের বাগানের অনুচ্চ রেলিংএর ওপর অবলীলাক্রমে এক পা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার সামনে দণ্ডায়মান বন্ধুর মুখে ধৃত সিগারেটটা জ্বলন্ত দেশলাইএর কাঠিতে সে ধরিয়েদিল, এবং নিজের অধরে ধৃত সিগারেটটিতেও স্বচ্ছন্দে খোকা অগ্নিসংযোগ করছে।

অনয়া রাধিতো নূনং

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার্-এট-ল

বৃন্দাবন তরুলতা   জান যদি কৃষ্ণ কথা
কহ তবে কোথা সে লুকালো?
খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে,   দেখে আঁকা বনদেশে
পদচিহ্ন পথ করি' আলো।
করে সবে বলাবলি,   সখি দেখ এ সকলি
নন্দ-নন্দনের চিহ্ন সব,
পথে তাঁর পদচিহ্ন   পদে কার তিনি ভিন্ন
ধ্বজ পদ্ম অঙ্কুশ ও যব?
কৃষ্ণ পদচিহ্নধরি'   বনপথে অগ্রসরি'
অবলা ব্রজের বালা যত,
দেখে কৃষ্ণ রেখাসহ   পদচিহ্ন, দুর্বিবহ
দুঃখে তারা অন্তরে আহত।
কে বধূ অনুগামিনী   চলেছে কেএ কামিনী,
করি সহ করিণী কি যায়?
স্কন্ধে করপদ্ম আনি'   চলিয়াছে পথখানি,
কে প্রেয়সী, তাহারা সুধায়।
এরি আরাধনাবলে   ভগবান লীলাচ্ছলে
সঙ্গে এরে এনেছে নির্জনে,
ত্যক্ত মোরা বন মাঝে   অন্তরে ক্রন্দন বাজে,
কৃষ্ণহারা ঘুরি বনে বনে।

সখি, কৃষ্ণ পদরেণু   আমরা দেখিতে পেনু
ধন্য এই পদরেণুগুলি,
ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মীদেবী,   সতত চরণ সেবি'
এই ধূলি শিরে লয় তুলি'।
বড় দুঃখ জাগে মনে   কে ভুঞ্জিল এ নির্জনে
অচ্যুত অধর সুধা একা,
এনেছে সে অপহরি'   এ প্রাণ কেমনে ধরি'
এই বধূপদ-চিহ্ন রেখা।
হেথা পদচিহ্ন কই?   নিশ্চয় জানিনু সই,
সুকোমল চরণ কমলে—
তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হবে   প্রিয় তাই ভেবে তবে
প্রেয়সীরে লইয়াছে কোলে।
বধূ বহনের ভার   হের আঁকা চিহ্ন তার,
অধিক প্রোথিত ধূলি মাঝে,
হেথা সেই নটবর   নামায়ে মৃত্তিকা পর
কান্তারে সাজাল ফুল সাজে।
কুসুম চয়ন করি'   দিল ফুলসাজে ভরি'
প্রেয়সীরে প্রিয় নিজ হাতে,
পদাগ্রে করিয়া ভর,   ফুলেতে ভরিল কর,
ছিল যাহা সুউচ্চ শাখাতে।

অর্দ্ধমগ্ন পদচিহ্ন,   বল সখি কৃষ্ণ ভিন্ন
কে করিবে কেশ প্রসাধন?
হেথা বসি' তরুমূলে   যত বনফুল তুলে,
চুলে তার পরালি ভূষণ।

মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্র-দেবের নূতন তাম্রশাসন

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ, পিএচ্‌-ডি

আজ প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যরূপে তদানীন্তন যুবক এই লেখক ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রামপাল নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভূমিতে বৌদ্ধ বঙ্গাধিপ শ্রীচন্দ্র-দেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি সেই তাম্রশাসন সম্বন্ধে ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রের ১৩২০ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯১৩ সালের) শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় দুইটি প্রবন্ধও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি সরকারী Epigraphia Indica নামক ইংরেজী পত্রিকায় যথারীতি সেই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা সহকারে এক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কে জানিত যে, সেই বৌদ্ধ বঙ্গাধিপ শ্রীচন্দ্রের পঞ্চম তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া, ইদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত সেই লেখকের হস্তেই পতিত হইবে, এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে পুনরায় লেখনী ধারণপূর্ব্বক তদুদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া মাসিক পত্রমুখে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে হইবে? সে যাহা হউক, আলোচ্য শাসনখানিকে কেন শ্রীচন্দ্রের পঞ্চম তাম্রশাসন বলা হইল, সে বিষয়ে একটু পরিষ্কার পরিচয় দিতে হইতেছে। এই রাজার প্রথম আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সংবাদ আমরা পাইয়াছিলাম ইংরেজী ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে। শাসনখানি এযাবৎ অপ্রকাশিত ও একরূপ অপঠিত অবস্থায় ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর নিবাসী জনৈক জমিদারের গৃহে নিধিরূপে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক গবেষণার ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া জমিদার মহাশয়দিগের মনে স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাবিষ্কারে অভিরুচি আজ পর্য্যন্ত কেন যে হইতেছে না, তাহা জানি না। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর এম্‌-এ মহোদয় অতিকষ্টে সেই তাম্রপট্টখানি কেবলমাত্র পরিদর্শন করিবার অনুমতি পাইয়া দ্রুতপাঠের ফলে তাহা হইতে জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (ইং ১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায়) Dacca Review নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্র দেবের দ্বিতীয় তাম্রশাসন হইল উপরি উল্লিখিত আমাদের আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত রামপালে প্রাপ্ত তাম্রশাসন। তার পরে ইং ১৯১৯ সালে ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী কেদারপুর নামক গ্রামে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় শ্রীচন্দ্র দেবের যে তাম্রশাসনখানি আবিষ্কার করিয়া Epigraphia Indica পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, সেইখানিকে এই রাজার তাম্রশাসনপঞ্চকের তৃতীয় শাসন বলা যায়। উক্ত তিনখানি শাসনে রাজ্যাদীয় সংবতের কোন সংখ্যা বা তারিখ নাই। এই রাজার চতুর্থ তাম্রশাসনখানিও ডাঃ ভট্টশালীর আবিষ্কৃত একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ। ইহা ইং ১৯২৫ সালে আবিষ্কৃত হইলেও এখন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই ডাঃ ভট্টশালী ইহা প্রকাশ করিবেন। ঢাকা জেলার উত্তর-পশ্চিম ভাগে প্রসিদ্ধ জমিদার বসতি ধানকোড়াগ্রামের অদূরবর্ত্তী ধুল্লা নামক গ্রামে ইহা পাওয়া গিয়াছিল। সেই শাসনখানি রাজার ৩৫ বর্ষ রাজ্য সংবৎ-সংবলিত। এই প্রবন্ধে আলোচ্য পঞ্চম তাম্রশাসনখানি পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী সাভার গ্রামের প্রাচীনকালের রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের রাজবাড়ীর নিকটস্থ মদনপুর নামক একটি মৌজাতে। ইহার আবিষ্কার কাহিনী এইরূপ,—বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসের প্রথম ভাগে সাভারের উত্তর পূর্ব্ব দিকে প্রায় ২ মাইল দূরে অবস্থিত মদনপুর মৌজায় শেখ নেওয়াজ উদ্দীনের জমিতে একটি ভিত্তি খনন করার সময়ে এই তাম্রফলকখানি পাওয়া যায়। ফলকের ধাতু সোনা হইতে পারে, সম্ভবতঃ ইহা মনে করিয়াই, আবিষ্কারকদিগের কেহ ফলকের নিম্ন দক্ষিণের নীচের খানিক অংশ কাটিয়া ফেলিয়াছেন। এই দুষ্কার্য্যের ফলে তাম্রপট্টের সম্মুখের পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ২৩ পংক্তির প্রথম ভাগের ৪-৫টি করিয়া অক্ষর লোপ পাইয়াছে এবং পশ্চাতের পৃষ্ঠায়ও ২৯ হইতে ৪২ পংক্তির শেষ ভাগের ৪-৫টি করিয়া অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এই রাজার অন্যান্য শাসনস্থ পাঠের সাহায্যে যে-সব অক্ষর অধিকাংশই পুনরুদ্ধৃত হইতে পারিয়াছে। উক্ত নেওয়াজ-উদ্দীন সাভারের খ্যাতনামা বর্ত্তমান হেড মাষ্টার, আমার প্রাক্তন প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি মহাশয়ের নিজ ছাত্র শ্রীমান শান্তিরঞ্জন রায়ের পিতাকে তাম্রফলকখানি দেন। পরে শান্তিরঞ্জন তাহার প্রধান শিক্ষক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ইহা উপস্থাপিত করে। গত ১৪ই জুন তারিখে গুরুপ্রসাদবাবু সাভার হইতে ঢাকায় আসিয়া আমার নিকট এই তাম্রশাসনের আবিষ্কার বার্ত্তা বলেন এবং ১৭ই জুন তারিখে তিনি লোক মারফত তাম্রশাসনখানি আমার কাছে ইহার পাঠোদ্ধারফল ও ব্যাখ্যা প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিয়া ঐতিহাসিকগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। পাঠাদি কার্য্য সমাধানান্তে তাম্রশাসনখানি Dacca Museum এ রক্ষণার্থ উপহৃত হইবে, ইহাও স্থির করা হইয়াছে।

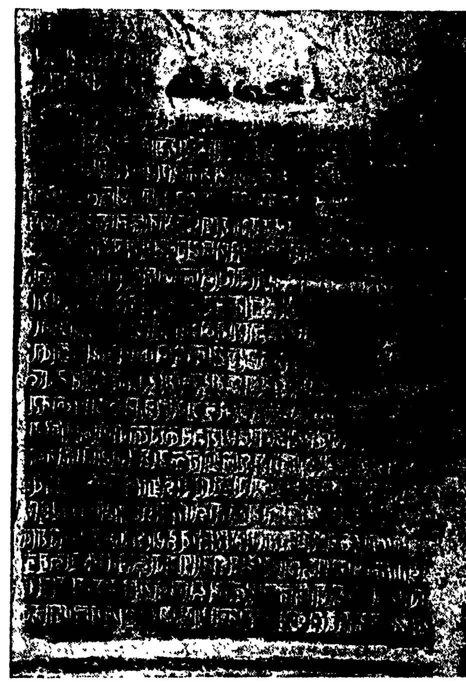
মূল তাম্রশাসনের সাহায্যে ইহাতে ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধার হইতে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক বিষয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিবুধসমাজের আলোচনা ও বিচারার্থ অত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতেছি।

মৃত্তিকা নীচে প্রোথিত থাকায়, তাম্রপট্টখানির কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে এবং এই কারণে স্থানে স্থানে অক্ষরের সম্পূর্ণ বিলোপ না হইলেও, শিল্পীর অনবধানতায় যে সকল অক্ষর তাম্রপট্টে ক্ষোদিত হয় নাই, বা অশুদ্ধ ভাবে ক্ষোদিত হইয়াছে তাহা যথাস্থানে সংশোধিত করিয়া দেখান হইয়াছে। আলোচ্য তাম্রশাসনখানির আয়তন প্রায় ৮½ × ৬½ ইঞ্চ।

ইহার শীর্ষদেশে (মধ্যস্থলে) যে রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে তাহার আয়তন প্রায় ৪½ × ৩¼ ইঞ্চ এবং ইহার মাঝখানের ব্যাস প্রায় ২ ইঞ্চ পরিমিত আছে। রাজমুদ্রায় "শ্রী-শ্রীচন্দ্রদেবঃ" এই নামটি উচ্চভাবে উৎকীর্ণ দেখা যায়। রাজার নামের উপর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মচক্রের লাঞ্ছন। ধর্ম্মচক্রটির উভয় পার্শ্বে বুদ্ধ সমসাময়িক সারনাথের মৃগদাব বা মৃগবনের স্মৃতিরূপে দুইটি সমাসীন মৃগমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। দেখা যায় যে, এই রাজ-মুদ্রাতে একটির ভিতর অন্যটি করিয়া চারিটি বৃত্ত আছে। ক্ষুদ্রতম চতুর্থ বৃত্তটির মধ্যে রাজার নামটি ও তদুপরি ধর্ম্মচক্র ও মৃগদ্বয় একটি পুষ্পময় বেদির উপর উৎকীর্ণ। মুদ্রার চতুষ্পার্শ্বেও ফুলপাতার সাজ আছে। রাজারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া রামপাল লিপির মুদ্রাতে রাজার নামের নীচে যে অর্দ্ধচন্দ্রের লাঞ্ছন দেখা যায়, এই লিপির মুদ্রাতে তাহা লক্ষিত হয় না। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ অনেকেই বলেন যে, বাঙ্গালায় পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও মগধের সৌগত পালরাজগণের তাম্রশাসনগুলিতেও এই প্রকার মৃগমূর্ত্তিমণ্ডিত ধর্ম্মচক্রমুদ্রা সংযোজিত আছে।

তাম্রশাসনখানির সম্মুখের পৃষ্ঠাতে ২৩ পংক্তি ও পশ্চাতের পৃষ্ঠাতে ১৯ পংক্তি, একুনে ৪২ পংক্তি, লেখা বিদ্যমান। দানলিপি পদ্যগদ্যময় সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সম্মুখের পৃষ্ঠায় ১৭ পংক্তি পর্য্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজকবি নিজ প্রভুর বংশের অবদান বর্ণনা করিয়াছেন ; তার পরে ২৯ পংক্তি পর্য্যন্ত লিপির গদ্যাংশ। তৎপর ৩৬ পংক্তি পর্য্যন্ত দানপ্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণের বংশকীর্ত্তি ছয়টি শ্লোকে লিপিবদ্ধ আছে। তদনন্তর ৩৭ পংক্তি পর্য্যন্ত পুনরায় খানিকটা গদ্যাংশ আছে। তাহার পর ৪১ পংক্তি পর্য্যন্ত লিপিতে ধর্ম্মানুশংসী তিনটি শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ৪১ ও ৪২ পংক্তিতে রাজার রাজ্যসংবৎ ও তারিখ ও দুইজন উপরিতন রাজ-পাদোপজীবী অধ্যক্ষের সাংকেতিক স্বাক্ষরচিহ্নরূপে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি অক্ষর লক্ষিত হয়। ইহাতে রাজার রাজ্যের ৪৪ সংবতের মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের ২৮ তারিখ শাসনসম্পাদনের কাল বলিয়া উল্লিখিত পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের অদ্য পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত শাসনপট্টপঞ্চকের মধ্যে কেবল ধুল্লাতে প্রাপ্ত লিপিতেই ৩৫ সংবতের উল্লেখ আছে এবং ইদিলপুর, রামপাল ও কেদারপুর লিপিগুলিতে কোন সন-তারিখ পাওয়া যায় নাই। শাসনে রাজকবি, লিপিকর ও শিল্পীর নামোল্লেখ নাই।

তাম্রপট্টে ক্ষোদিত অক্ষরগুলি দেখিতে সুন্দর ও সর্ব্বত্র সমানাকার। প্রত্যেক অক্ষরের মাঝে প্রায় ⅛ ইঞ্চ হইবে। যে অক্ষরে শাসনলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে দশম-একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর বলিয়া পরিচিত করা যায়। পালরাজ নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল ও নয়পালের সময়ের লিপির অক্ষরের আকার ও সংযুক্ত বর্ণাদির রকম বা ঢঙ, পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীচন্দ্রের লিপিগুলিতে উৎকীর্ণ অক্ষরের কালনিরূপণ অনেকটা সম্ভবপর হইতে পারে। মনে হয় যে, আমরা তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রামপাল তাম্রশাসনের অক্ষরের কাল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা সমীচীন হয় নাই। লিপিকাল আরও প্রায় এক শতাব্দী পিছাইয়া যাইবে। লিপির অক্ষরের পরিচয়ের সঙ্গে ইহাতে লক্ষিত কয়েকটি বর্ণবৈশিষ্ট্যের কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। বাঙ্গালীরা যে উচ্চারণে বর্গীয় (ব) ও অন্তস্থ (ব)-এর প্রভেদ করেন না, ইহা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে ; কারণ, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় রচিত, লিখিত ও উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিতেও এই দুই প্রকার ব-কারের জন্য পৃথক অক্ষরকে ব্যবহার করেন নাই। বর্ত্তমান তাম্রশাসনেও আমারা ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাইতে পারি। আর একটি বৈশিষ্ট্য—'শ'-সংযোগে অনুস্বার 'ঙ'-তে পরিণত হয়, যথা 'বঙ্শে' (৪ পংক্তি) ও 'করাঙ্শুঃ' (৭ পংক্তি)। এই লিপিতে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ বা লুপ্ত-অকারের চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে (যথা, ৫, ৮ ও ২৯ পংক্তিতে), আবার কোনও কোনও স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই (যথা, ২, ৩২ ও ৩৪ পংক্তিতে)। রেফ-সংযোগে



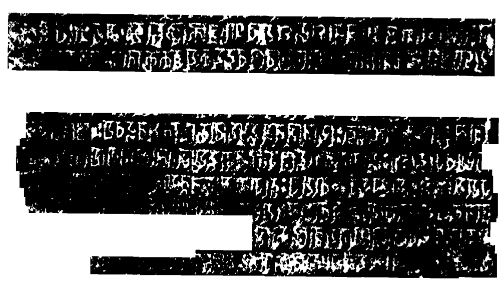
মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রদেবের নূতন তাম্রশাসন—সম্মুখের পৃষ্ঠা

চ, ণ, ত, দ, ম, য ও ব—এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলির দ্বিত্ব-সাধনও এই কালের লিপির একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ এই অবস্থায় 'ণ'-কারের দ্বিত্বলাভটা।

বিশিষ্ট বন্ধুর অনুরোধেও আমার লিপিটিকে 'সাভার তাম্রশাসনলিপি' বলিতে ইচ্ছা করি না। ঐতিহাসিকের বিবেচনায় ইহার প্রাপ্তিস্থান মদনপুর মৌজার নামানুসারে ইহাকে মদনপুর-লিপি বলিয়া আখ্যাত করা বিধেয়। সর্ব্বত্রই আমরা প্রাপ্তিস্থানের নাম অবলম্বন করিয়াই তাম্রশাসন ও প্রস্তরপ্রশস্তি প্রভৃতির নামকরণ বিধান করিয়া থাকি।

(ঢাকা জেলার অন্তর্গত) বিক্রমপুরে সমবাসিত জয়স্কন্ধাবার (রাজ-ধানী বা রাজসেনানিবাস স্থল) হইতে, ধর্ম্মচক্রমুদ্রাসংবলিত এই তাম্র

শাসন সম্পাদন করাইয়া, চন্দ্রবংশীয় (অতএব, ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত), মহারাজাধিরাজ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবপাদানুধ্যাত, পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব,—বেদবিদ্যাপরায়ণ সোমপ এক ব্রাহ্মণকুলের মহাদেবনামা দ্বিজের প্রপৌত্র, বরাহ নামধের দ্বিজের পৌত্র ও হরনামধারী দ্বিজের পুত্র, বিনয়াম্বিত ত্রয়ীবিৎ, আর্য্য, সজ্জনশ্রেষ্ঠ ও হাস্যমুখে অভিভাষণশীল ব্রাহ্মণ শুক্রদেবকে—তদীয় বিজয়রাজ্যের ৫৪ সংবতে (সম্ভবতঃ তাম্রমাসের) অপত্তি তৃতীয়া তিথিতে স্নানপূর্ব্বক ভগবান বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া, মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত, সমস্ত রাজপাদোপজীবী ও ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যথাবিধি উদক-স্পর্শসহকারে—শ্রীপৌণ্ড্র ভুক্তির অন্তঃপাতী মোলামাউল-



মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রদেবের নূতন তাম্রশাসন—পশ্চাতের পৃষ্ঠা

স্থিত (জলসাগর-সংভাণ্ডারিয়ক-নামক ?) এক গ্রামে (বা বিষয়ে ?) আটদ্রোণ পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন। কত আচকাদিমান পরিমিত ভূমিসহ আটদ্রোণ ভূমি রাজার দানের বিষয়ীভূত ছিল, তাম্রপট্টখানির কতক অংশ খণ্ডিত বলিয়া তৎস্থিত অক্ষরসমূহ বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না।

এখন এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। শ্রীচন্দ্রদেবের রামপালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে রাজবংশের বিবৃতিসূচক যে শ্লোকাষ্টক আছে, এই মদনপুর শাসনেও সেই আট শ্লোকই আছে। সেদিন ঢাকা মিউজিয়ামে দেখিলাম যে, ডাঃ ভট্টশালীর আবিষ্কৃত ধুল্লাগ্রামের শাসনেও ঐ আট শ্লোক আছে, ফরিদপুর জেলার কেদারপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় শাসনের নূতন নূতন শ্লোকাবলীর মধ্যে "স্পষ্টঃ পার্থিবপাংশু— "ইত্যাদি প্রতীকের শ্লোকটিও আছে। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত ফরিদপুরের ইদিলপুরে প্রাপ্ত প্রথম শাসনে কেদারপুরলিপির শ্লোকাবলীর কয়েকটি ব্যতীত, রামপাল ধুল্লা ও আলোচ্য মদনপুর শাসনের কোন কোন শ্লোকও নিবদ্ধ আছে। সে যাহা হউক, রাজবংশের পরিচয় বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলি যেন দুইপ্রকার মুসাবিদা অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। ফরিদপুরের লিপিগুলিতে অনেকাংশে একপ্রকার ও ঢাকার লিপিগুলিতে একটু অন্যপ্রকার। উপরি উল্লিখিত শ্লোকাষ্টকের লিপিপ্রারম্ভসূচক প্রথম শ্লোকে রাজকবি—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ—এই 'ত্রিরত্নের' উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া স্বপ্রভুর বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগের বিষয় ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিপুল সম্পদের অধিকারী চন্দ্রেরা রোহিতাগিরি নামক স্থানে বিষয়ভোগ করিতেন এবং সেই বংশেই পূর্ণচন্দ্র নামক অত্যন্ত প্রভাবশালী এক ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তিনি সেই রোহিতাগিরি বা অন্য কোন স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া ইহাতে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি তিনি যে স্বপ্রভাবে রাজতুল্য ব্যক্তি ছিলেন, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার নিজের (বা তাঁহার প্রজাদের) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাসমূহের পাদপীঠে তদীয় নাম অঙ্কিত হইত, এবং তিনি সৎসন্ততির বংশধর বলিয়া অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নাম নিজের উত্থাপিত অনেক জয়স্তম্ভ ও তাম্রশাসনের প্রশস্তিতেও পঠিত হইত। সুতরাং শ্রীচন্দ্র রাজার প্রপিতামহ পূর্ণচন্দ্রকে আমরা রাজতুল্য প্রভাববিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিচিতি পাইতেছি। চন্দ্রদিগের আদি স্থান বলিয়া বর্ণিত এই রোহিতাগিরির অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। আমিও এক সময়ে রোহিতাগিরিকে বিহার প্রদেশের সাহাবাদ জেলার রোহিতাশ্বগিরি বা রোটাসগড় বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু, এখন মনে হয়, ডাঃ ভট্টশালী যে এই রোহিতাগিরিকে পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা সহরের অল্প পশ্চিমস্থ লালমাই-পাহাড় বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ চন্দ্রেরা আদিতে বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের লোক ছিলেন এবং তাঁহারা রোহিতাগিরি হইতেই ক্রমশঃ প্রাচীন বঙ্গের অন্যান্য স্থানে অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচন্দ্রের পিতামহ সুবর্ণচন্দ্রের জন্ম ও নামকরণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণচন্দ্র চন্দ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রের সহিত প্রাক্তন কোনও জন্মে চন্দ্রস্থিত-শশক জাতক স্বরূপ বুদ্ধদেবের সম্বন্ধ আছে—এই জন্যই লোকেরা সুবর্ণচন্দ্রকে "বৌদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিত। পঞ্চম শ্লোকে বেশ একটু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র (অর্থাৎ তাম্রশাসনদাতা শ্রীচন্দ্রের পিতা) ত্রৈলোক্যচন্দ্রের গুণাবলীর কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া, তিনি ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র বলিয়া বিদিত ছিলেন। এই ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি হইয়াছিলেন এবং রাজকবি তাঁহাকে—

"আধারো হরিকেল রাজককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং"—

এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়া প্রায় হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের ব্যাখ্যা সমস্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই বিশেষণটির সরল অর্থ এই যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র সেই রাজলক্ষ্মীরই আধার বা অধিকরণরূপ ছিলেন, রাজলক্ষ্মী'র 'স্মিত' বা হাসিরূপে উদ্ভাসিত ছিল হরিকেলরাজ্যের রাজচিহ্নরূপী (শ্বেত) ছত্রটি। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজছত্রকে রাজলক্ষ্মীর হাস্যরূপে বর্ণনা একটি সাধারণ আলঙ্কারিক রচনা কৌশল। হরিকেলরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর 'আধার' ছিলেন ত্রৈলোক্যচন্দ্র। এই বচনটি হইতে নানারূপ ব্যাখ্যার উদ্ভব হইতে পারে। ত্রৈলোক্যচন্দ্র কি নিজেই কোন সময়ে হরিকেলের রাজা হইয়াছিলেন? অথবা, তিনি অন্য কোন হরিকেল রাজের কোন বিশিষ্ট সামন্ত বা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন? কিংবা, পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র উপযুক্ত পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের বঙ্গ বা হরিকেল রাজ্যের রাজশ্রীর আধার স্বরূপ ছিলেন? কেহ মনে করেন তিনি পূর্ব্বে হরিকেলের রাজা থাকিয়াই চন্দ্র দ্বীপের দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া লইয়া চন্দ্রদ্বীপের "নৃপতি" হইয়াছিলেন। আবার কেহ মনে করেন যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপেরই রাজা ছিলেন, পরে তিনি হরিকেলেও স্বরাজ্য বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমাদের আলোচ্য শাসনখানি দশম-একাদশ শতাব্দীর লিপি। একাদশ শতাব্দীর শব্দকোষরচয়িতা হেমচন্দ্র (জন্ম ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে) "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া অঙ্গাশ্চম্পোপলক্ষিতাঃ" এইরূপ অভিধান করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গদেশ ও চম্পা অভিন্ন বলিয়া সকলেই গ্রহণ করেন, তবে এই অভিধান মতে বঙ্গদেশই যে হরিকেলদেশ তাহা বুঝিয়া লইতে ইতস্ততঃ করার কারণ দেখা যায় না। আমার বিশ্বাস যে, যে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল বিক্রমপুর, সে দেশের নাম একাদশশতাব্দীতে হরিকেল বলিয়াও আখ্যাত হইত। তাহা হইলে, শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রথমতঃ চন্দ্রদ্বীপের "নৃপতি" ছিলেন এবং পরে তিনি উত্তরদিকস্থিত বঙ্গ বা হরিকেল দেশে নিজ আধিপত্য ক্রমশঃ বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবের সব শাসনেই তিনি নিজ পিতা ত্রৈলোক্য-চন্দ্রকে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া নিজেকে তৎপুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তাই মনে হয়—চন্দ্র-নরপতিদিগের মধ্যে প্রথমতঃ ত্রৈলোক্যচন্দ্রই মহারাজাধিরাজরূপে রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন। শাসনে উল্লিখিত চন্দ্রদ্বীপ প্রদেশ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার অংশবিশেষ লইয়াই দক্ষিণ দিকে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগল সাম্রাজ্য সময়ে ইহাই বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ নামে কথিত হইত। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনানাম্নী প্রিয়া বা তাহার গর্ভে 'রাজযোগের' শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীচন্দ্রদেব যে ভবিষ্যতে রাজা হইবেন জ্যোতিষীরা এই কথা তদীয় জন্ম সময়ে তাঁহার দেহে রাজচিহ্ন সকল দেখিয়া সূচনা করিয়াছিলেন। অষ্টম শ্লোকেও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। তথায় বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্র মূর্খ জনের বিধেয় ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি সতত প্রাজ্ঞজনের সঙ্গ করিয়া, রাজ্যলক্ষ্মীকে 'একাতপত্রাভরণা' করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বঙ্গদেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যের বশীভূত করিয়াছিলেন, এবং এই কার্য্য-সাধনে তিনি অনেক শত্রুকে কারানিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে, তিনি দিঙ্‌মণ্ডলে বিশেষভাবে যশস্বী হইতে পারিয়াছিলেন। তারপর স্বাধীন বঙ্গাধিপ হইয়া তিনি অন্ততঃ ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন,—এই তাম্রশাসন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কোন্ শত্রুদিগকে বঙ্গদেশ হইয়া তাড়াইয়া ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তদীয় পুত্র শ্রীচন্দ্র ইহাতে একচ্ছত্রাধিপত্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন। দশম শতাব্দীতে গৌড়-মগধের পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রধান ভুক্তির নাম ছিল পৌণ্ড্রভুক্তি বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি। শ্রীচন্দ্রের শাসন পঞ্চকে দেখা যায় যে, তিনি বঙ্গের যে-সব বিষয় বা জেলায় ও যে-সব মণ্ডলে অবস্থিত গ্রামাদিতে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সে-সব বিষয় ও মণ্ডল পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাই মনে হয়, পাল সাম্রাজ্যের প্রথম গৌরবের দিনে অর্থাৎ প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে পাল রাজাদিগেরই আধিপত্য ছিল। কোন্ বিপ্লবের অবস্থায় যে পালরাজগণের কাহারও হস্ত হইতে বঙ্গদেশ বৌদ্ধ রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র পুত্র শ্রীচন্দ্রের হস্তগত হইয়াছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত একটি ঐতিহাসিক সমস্যা বিশেষ। তবে দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজনৈতিক দুরবস্থার সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়া থাকিবেক।

পঞ্চম-ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন বঙ্গ ও সমতট প্রদেশ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্বন্ধ লইয়া গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজ্যান্তর্গত ছিল। ৫০৭-৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত (প্রাচীন সমতটের) ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর লিপির আবিষ্কারের পর দেখা যায় যে, সেই লিপির মহারাজ বৈন্যগুপ্ত একরূপ স্বাধীনভাবেই সমতটে শাসন পরিচালনা করিতেন। তৎপর সম্ভবতঃ বঙ্গ ও সমতটেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন গোপচন্দ্র, ধর্ম্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামক রাজত্রয়। তাঁহারা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। এই কথা ফরিদপুর জেলায় ও বর্দ্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহাদের তাম্রশাসন নিচয় হইতে অনুমিত হয়। ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় আবিষ্কৃত লিপি হইতে তৎপরবর্ত্তী কালের অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ রাজা দেবখড়্গাদির রাজত্বের কথা জানা গিয়াছে এবং তাঁহারাও যে সমতটের স্বাধীন রাজা ছিলেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা। প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলের দেশ বিশেষে নাথবংশীয় লোকনাথ নামক এক সামন্ত নরপতির (ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত) একখানি তাম্রশাসন হইতে আমরা বঙ্গ সমতটের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলাম (১৩২১ বঙ্গাব্দের "সাহিত্যের" জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই লিপিতে জীবধারণ নামক এক নরপতির উল্লেখ ছিল। তিনি যে কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন তাহা তখন আমরা কেহই নির্ণয় করিতে পারি নাই। কিন্তু, ঐতিহাসিকগণের সৌভাগ্য-ক্রমে সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত কইলান নামক এক স্থানে আবিষ্কৃত শ্রীধারণ নামক এক "সমতটেশ্বরের" একখানি তাম্রশাসন

আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত বৈশাখ মাসের "ভারতবর্ষে" বন্ধুবর ডক্টর শ্রীদিনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাহা হইতে সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে, আমাদের লোকনাথ শাসনের জীবধারণ নৃপতিই ছিলেন এই কইলাম তাম্রশাসনের সম্পাদয়িতা শ্রীধারণরাতের পিতা। পিতা ও পুত্র উভয়েই সেই শাসনে "সমতটেশ্বর" বলিয়া আখ্যাত। প্রাচীন সমতট যে পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলা লইয়া অবস্থিত ছিল—এই বিষয়টি এখন একরূপ নিঃসন্দেহ ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গৃহীত হওয়ার যোগ্য। তার পর চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ কান্তিদেবের অসম্পূর্ণ তাম্রপট্টলিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি বর্দ্ধমানপুর নামক রাজধানী হইতে সেই শাসন সম্পাদন করিয়াছিলেন। কান্তিদেব হরিকেল মণ্ডলের ভবিষ্যৎ রাজাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিপিতে আদেশ নির্দ্দেশ করায় মনে করা যাইতে পারে যে, তিনি হরিকেল মণ্ডলের উপর স্বকীয় রাজপ্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। কোন কোনও ঐতিহাসিক এই শাসনোক্ত বর্দ্ধমানপুর ও বিক্রমপুরকে অভিন্ন বিবেচনা করেন। এই চট্টগ্রাম লিপির অক্ষর পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাকে সুধীগণ অষ্টম-নবম শতাব্দীর অক্ষর বলিয়া স্থির করেন। প্রাচীন বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলের উপরে নিবিষ্ট সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, আমরা দেখিতেছি যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গাধিপেরা স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্ব্বক বাঙ্গালার দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তৎপর গৌড়-মগধে অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, সম্ভবতঃ দশম-একাদশ শতাব্দীর কোন সময় পর্য্যন্ত 'বঙ্গ' অর্থাৎ পূর্ব্ব দক্ষিণ বাঙ্গালাপ্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী থাকিয়া পাল নরপালদিগের শাসনাধীন ছিল। তবে কোন্ সুযোগে যে চন্দ্র নৃপতিরা পালরাজগণের আধিপত্য হইতে বঙ্গকে মুক্ত করিয়া সেই দেশ পুনরায় স্বশাসনতন্ত্রের মধ্যে আনিয়াছিলেন, তাহা যে একটি সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা এখন একরূপ নির্ণীত সত্য যে, বিক্রমপুর রাজধানীক বর্ম্মরাজগণের বঙ্গরাজ্য চন্দ্ররাজগণের রাজ্যশাসনের পরবর্ত্তী যুগের রাজ্য বলিয়াই গণনীয়। ডক্টর ভট্টশালী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ কুমিল্লা সহরের কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ভারেল্লা গ্রামে আবিষ্কৃত নর্ত্তে(র্ত্তে ?)শ্বর মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপিতে উল্লিখিত রাজা লডহচন্দ্রকেও আলোচ্য শাসনের চন্দ্ররাজদিগের বংশেরই লোক মনে করেন। সে যাহা হউক, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা গোবিন্দচন্দ্র নামক এক রাজার যে দুইখানি প্রস্তর লিপির সংবাদ ডক্টর ভট্টশালীর আবিষ্কার হইতে অবগত হইয়াছি, প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাসে তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। ফরিদপুর জেলার কুলকুড়ি গ্রামে আবিষ্কৃত প্রস্তরময় সূর্য্য মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপির কাল গোবিন্দচন্দ্রের ১২ সংবৎ এবং ঢাকা জেলার বেত্‌কা (টঙ্গিবাড়ী) গ্রামে আবিষ্কৃত প্রস্তরময় বাসুদেব মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপির কাল সেই রাজারই ২৩ সংবৎ বলিয়া উল্লেখিত পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র এবং একদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত লিপিতে তদ্দারা ১০২৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র একই ব্যক্তি হইবেন। বর্ত্তমান ফরিদপুর ও ঢাকা জেলাদ্বয় যে প্রাচীন বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা মনে করা একবারেই অসঙ্গত নহে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, বঙ্গাধিপ এই গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্র রাজারই বংশধর তাহাও একবারে উড়াইয়া দেওয়ার বিষয় নহে। শ্রীচন্দ্রকে আমরা এখন আলোচ্য লিপির বলে অন্ততঃ ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে দেখিতে পাইতেছি। আর যদি গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্রেরই বংশধর ও উত্তরাধিকার সূত্রে বঙ্গাল দেশে রাজত্ব করিয়া থাকেন তাহা হইলে তদীয় অন্যূন ২৩ বৎসর রাজত্বের কাল ইহাতে যোগ করিলে, আমরা এই দুই রাজার রাজত্বকালের পরিমাণ অন্ততঃ ৬৭ বৎসর পাইতে পারি। তবে ভবিষ্যতে ইহার অনুকূল প্রমাণরূপে আরও তাম্রলিপি বা প্রস্তর প্রশস্ত্যাদি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই বিষয়ে নিঃসংশয়ে কোন কথা বলিতে পারি না। সর্ব্বশেষে বলিতে হয় যে, আমরা বৌদ্ধ পালরাজদিগকে যেমন ব্রাহ্মণবংশীয় প্রধান প্রধান মন্ত্রীদিগের সাহায্যে রাজ্য শাসন কার্য্য চালাইতে দেখিতে পাই এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে দেখিতে পাই, তেমন বঙ্গের বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্রকেও বেদবিৎ আর্য্য সজ্জন ব্রাহ্মণ শুক্রদেবকে ভূমিদান করিতে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন যুগে ধর্ম্ম বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাতিশয় সৌহার্দ্দ স্থাপিত ছিল—পরস্পরের ধর্ম্মে অসহন ভাব লক্ষিত হইত না। সে-কালে ও একালে এই বিষয়ে কত প্রভেদ!

পরের সংখ্যায় মদনপুর লিপির উদ্ধৃত পাঠ ও ইহার টীকা সহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবে।



স্যালভেজ

শ্রীসন্তোষকুমার দে

যুদ্ধের ঠিকাদারিতে কিছু টাকা পেয়েছিল অবিনাশ, এখন সেটাকে কোন লাভজনক কারবারে খাটিয়ে দশগুণ বাড়িয়ে তুলবার সন্ধানে ঘুরছিল। সন্ধান পাওয়া গেল পূর্ববঙ্গের একটি সহরে অনেকগুলি মোটর গাড়ী, চাকা আর অন্যান্য সরঞ্জাম জলের দরে বিকোচ্ছে, পাঁচ হাজারে কিনলে পঞ্চাশ হাজার মিলবে তাতে সন্দেহ নেই। শুভাস্য শীঘ্রম্, বিলম্ব করলে প্রকাশ্যে নিলাম হবে, দাম উঠবে চড় চড় করে, তার আগে কিছু গোপন বন্দোবস্তের চেষ্টা করাই অবিনাশের অভীপ্সা।

অপরাহ্নের একটা গাড়ীতে সে এসে সেই সহরে পৌঁছুল। সহরটা তার জানা নয়, তবে তার একজন পূর্বপরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধু আছেন এখানে। বাক্স বিছানা হোটেলে ফেলে সে গেল সেই বন্ধুর সন্ধানে। বন্ধুর দোকানটি মনোরম, যুদ্ধের দৌলতে ভরে গেছে যেটুকু গর্ত যেখানে ছিল এমনি একটা পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের ছাপ। মফঃস্বলে এমন দোকান দেখতে পাবে অবিনাশের ভরসা ছিল না।

কিন্তু বন্ধু খগেনবাবুর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল না। ছিল তার ভাই নগেন, বল্লে—দাদা শিলং গেছেন, কিন্তু আপনি তাই বলে যেন কিছু অসুবিধা বোধ করবেন না, আমি তো আছি। আমি আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন?

অবিনাশের ইচ্ছা ছিল না সবার সামনে কথাটা বলে, তাই নগেনকে ভিতরে ডেকে নিয়ে সংক্ষেপে তার আগমনের উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বল্লে। নগেন বল্লে—তার জন্য কি, আমাদের গাড়ী নিয়ে আপনি ঘুরে আসুন না, এখনও বেলা আছে। স্যালভেজ ডিপো বেশী দূরে নয়, ময়নামতী পাহাড়ের কোলে কয়েকটি ডিপো। সোফার সব চেনে, সেই আপনাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনবে।

দোকানের অদূরে একটি সিডান বডির ঝকঝকে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। সামনেই একটা বড় ব্যাঙ্ক, গাড়ীখানা ব্যাঙ্কের কোন পদস্থ কর্মচারীর হবে এটা ধারণা করাই সহজ। কিন্তু কথা বলতে বলতে নগেন অবিনাশকে সেই গাড়ীর কাছেই নিয়ে এলো এবং ময়নামতী পাহাড়ের পথের নির্দেশ সোফারকে বুঝিয়ে দিয়ে অবিনাশের জন্য সে দোকানে প্রতীক্ষা করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেল। গাড়ীতে বসে গদির মোলায়েম মখমলে হাত বুলাতে বুলাতে অবিনাশ ভাবলে—যুদ্ধে সবাইকে পূর্ণ করে দিয়ে গেছে, আশাতীত লাভবরণ করে দিয়ে গেছে।

সেই তো খগেনবাবু, পটলডাঙ্গার মেসে পুঁই ডাটা চচ্চড়ি আর চিংড়ি মাছের ঝোল খেতে খেতে যিনি অবিনাশের সাথে রাজনীতি ও সমাজনীতির জগাখিচুড়ি আলোচনা করতেন, মাসান্তে মসীজীবির বেতন—মেস খরচা বাঁচিয়ে বাড়ী পাঠাতে কুলাতো না, মাসের ভিতর পঁচিশ দিন অমৃতবাজার আর ষ্টেটস্‌ম্যানের ওয়াণ্টেড্ কলম পড়ে ভালো চাকুরীর সন্ধান করতেন আর সুবিধা বুঝলেই দরখাস্ত ঝাড়তেন। তারপর কোথা দিয়ে কি হ'ল, খগেনবাবু সত্যিই চাকরি ছাড়লেন, লাগলেন ঠিকাদারি কারবারের অংশীদাররূপে। মাস ঘুরে বছর, বছরের পর বছর ঘুরে তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়েছে, অংশীদার হ'তে পৃথক হ'য়ে এসে তিনি নিজের কারবার গড়ে তুলেছেন। যুদ্ধ খগেনবাবুকে সত্যি অজস্র দিয়ে গেছে। বাড়ী গাড়ী কী তার না হয়েছে। বন্ধুর উন্নতির পরিমাণ দেখে অবিনাশের মনটা যেন জ্বলতে লাগল।

ময়নামতী পাহাড়—দূর বেশী নয়। উঁচু টিলা, কিছু গাছপালা, তারই নাম পাহাড়। এক সময়ে নির্জন ছিল, লোক চলাচল না থাকায় পথচারী ভয় পেত। হিংস্র বন্য জন্তুর অবস্থানের কথাও শোনা যেত, যুদ্ধের প্রয়োজনে উঁচুনীচু মাটিতে রচিত হয়েছে পথ, প্রয়োজনের কুঠারে কেটে বনস্থলীর বুকে গড়ে উঠেছে লস্করী দপ্তরখানা, মালখানা, তাবু, ঘর, গাড়ী রাখবার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। পথ কালো পীচে প্রখর। পথের মোড়ে আর প্রবেশদ্বারের দুপাশে পীচের ড্রাম খাড়া করা, খুঁটি মাথান, গাছের গায়ে ক্যাম্পের নাম লেখা নোটিশবোর্ড।

যুদ্ধের সময় এই এলাকায় সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ

ছিল। দ্বারপথে সশস্ত্র শান্ত্রী প্রহরা থাকৃত। এখন সে ব্যবস্থা নেই। সোফার গাড়ী বড় রাস্তা হ'তে ভিতরে নিয়ে এলো। পথের দুপাশে স্যালভেজ, অগুণতি মাল জমা করা। পথটা যেখানে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে তারই কাছে একটা ছোট বটগাছতলায় গাড়ী থামিয়ে অবিনাশকে সোফার ক্যাম্পের কাছে নিয়ে এলো।

ক্যাম্পের লোকজন সোফারের পরিচিত, সেই সুবাদে অবিনাশকে সে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। অবিনাশকে দিয়ে তাদের সকলেরই যে সুবিধা আছে, সে কথা তারাও বুঝলে, যখন অবিনাশ ছোট বড় সবাইকে কার্লটন স্পেশাল সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করলে। ক্যান্‌ভাস আঁটা চেয়ার বেরুল, ওরই মধ্যে যিনি একটু মাতব্বর ধরণের তিনি হুকুম করলেন চায়ের জন্য। একজন নেপালী গেল চায়ের যোগাড়ে।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল অবিনাশ, সত্যি যেন চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। বোধ হয় আলিবাবা এমনি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিল পাহাড়ের গুহায় লুক্কায়িত ধনরত্ন। মোটর, মোটরের মেসিন, মোটর বাইক, টায়ার, টিউব, ষ্টিরাপ পাম্প, ছোট বড় নানা আকৃতির ডায়নামো, কয়েকটি এরোপ্লেনের এঞ্জিন পর্যন্ত চেনা যায়। তা ছাড়া আরো যে কত কিছু স্তূপীকৃত হয়ে আছে তার সবটা এক দৃষ্টিতে দেখাও যায় না, চেনাও যায় না। কতগুলি প্যাকিং বাক্স খোলা হয়নি পর্যন্ত। পেট্রোলের টিন দিয়ে যেন ইটের পাঁজা সাজানো হয়েছে। ব্যারেল, এনামেলের পাত্র, কিট ব্যাগ—কি যে নেই তাই খুঁজতে হয়। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে পায়ে চলা ছোট পথ। উপরে উঠে গেলে অনেকদূর দেখা যায়। সবটা এই স্যালভেজ ডিপোর অন্তর্গত। অধিকাংশ মেসিন ও গাড়ী ভেঙ্গে চুরে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু কিছু খরচ করলেই আবার চালু করা যায় এমন যন্ত্রপাতির সংখ্যাও অনেক।

দেখতে দেখতে অবিনাশের চোখ ভারি হয়ে ওঠে। কত মানুষের হাতের স্পর্শ পাওয়া ওই জিনিষগুলি, কত দেশ দেশান্তর সাগর মরু পেরিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে এসে এই পাহাড়তলীতে বিশ্রাম করছে। রোদ লাগছে, ঘাস গজিয়ে উঠেছে ফাঁকে ফাঁকে। একটা কলমীলতা লতিয়ে উঠেছে একগাদা মোটর সাইকেলের উপর, ফুটিয়ে দিয়েছে ফুলের মুখে প্রাণের আনন্দ। গতিমান যখন স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে, প্রকৃতি সুরু করেছে নিঃশব্দ সংস্কার সাধন।

সমস্তটা জুড়ে একটা এলোমেলো ব্যস্ততা যেন আকস্মিক ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এর পশ্চাতের সংগ্রামশীল ইতিহাসের স্পষ্ট স্বাক্ষরগুলি অনায়াসেই চেনা যায়, কিন্তু সে যেন কত যুগ যুগান্তের কথা, এখন এই নিরীহ নিষ্প্রাণ যন্ত্রগুলির দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে একদা এরা গর্জন করে ছুটে গিয়েছিল বন পাহাড় নদী অতিক্রম করে, সৈন্যদের মালপত্র ও রসদ বহন করে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে যুদ্ধক্ষেত্রে। ডিমাপুর, ইম্ফাল, কোহিমার মাটি এখনও লেগে আছে এর অনেকগুলির চাকায় চাকায়—এ কথা যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। এরোপ্লেনের একটা বিশাল সার্চলাইট ভেঙ্গে পড়ে আছে একপাশে, দেখে কি মনে হয় অল্পদিন আগেও সেটি উঠেছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধে, ধেয়ে গিয়েছিল চারশো মাইল ঘণ্টায় শত্রুর শিবির হানা দিতে? অতীতের কিছু কি তার গায়ে লেখা আছে? জড়াজড়ি করে পড়ে আছে একটা চার হাজার ভোল্টের ডায়নামো—বিদ্যুৎগর্ভ সেই যন্ত্রটাও আজ স্তব্ধ।

অবিনাশ গেল এই মৃত বস্তুস্তূপের কাছে। দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে, জল জমে আছে ব্যারেলের মুখে, পেট্রোলের টিনের উপর গোলকরা চাকতিতে। লস্করেরা যে এলুমিনিয়মের পাত্রে খাবার খেত তার কয়েক হাজার এক জায়গায় জড়ো করা, তারো কতকগুলিতে জল জমে আছে, একটার মধ্যে ছোট একটি ব্যাঙ ভাসছে। যুদ্ধগত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলেই এখন এগুলির এত অনাদর, পড়ে আছে খেলামাঠে রোদ বৃষ্টির কৃপায়। কিছু বা বসে গেছে বালিতে কাদায়, ঘাসে চাপা পড়েছে কিছু, দুমাসপরে কাঁটালতায় ঢেকে যাবে আরো অনেকগুলি।

পরিত্যক্ত মালগুলির দিকে তাকিয়ে অবিনাশ যেন পিছন ফিরে তাকাতে পারল একবার। জীবনের দুপাশে এমন কত কিছু আমরাও কি প্রত্যহ রচনা করি না? যে পথ ধরে চলে যাই, ফিরে কি তাকাই তার দিকে প্রয়োজন ফুরাবার সাথে সাথে ফেলে চলে আসি। বাল্যের বন্ধুত্ব কৈশোরে ঝরে যায়, যৌবনের প্রিয়বস্তু প্রৌঢ়ত্বে নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কিন্তু ভাবালুতা করতে অবিনাশ আসে নি। সে এসেছে এ মরা পাথর কেটে সৌভাগ্যের মণি জহরত আবিষ্কার করতে। স্যালভেজ সে কিনতে চায়। সে জানে, এই ভাঙ্গা মেসিন জোড়া দিয়ে চালিয়ে তুলতে পারলে তাতে প্রচুর টাকা মুনাফা পাওয়া যাবে—যুদ্ধের শেষ দান, মরা হাতীও লাখ টাকা।

তার ক্যাম্প চেয়ারে সে ফিরে এলো।

নেপালীর দেওয়া চা খেতে খেতে অবিনাশ কথাটা পাড়লে। ইন্‌-চার্জ যিনি তাঁর এ সব বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বল্লেন, আপনি চা খেয়ে নিন, আপনাকে আমি আমাদের অফিসারের কাছে নিয়ে যাবো। বিলাতি সাহেব, ভদ্রলোকের মান রাখতে জানে। কিন্তু বুঝছেন তো, খালি হাতে যাওয়া চলবে না। সাহেব আবার বিলাতি ছাড়া খায় না।

অবিনাশ তার পরদিন সন্ধ্যায় সময় স্থির করে ফিরে এলো। এসে নগেনকে ধরলে কিছু বিলাতি বোতলের জন্য। ওসবের সাথে বোতলের যে সম্বন্ধ থাকা কঠিন নয়, নগেন সে কথা অস্বীকার করলে না।

নগেন নিয়ে গেল তাকে দোকানের পিছনে—অফিস ঘরে। সেখানে অবিনাশের জন্য চা ও খাবার আনতে পাঠিয়ে সে গেলো বোতলের সন্ধানে।

বসে বসে অবিনাশ খবরের কাগজ পড়ছিল। খগেন যে স্থানীয় দুর্গতদের চিকিৎসার জন্য তার মায়ের নামে হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড করে দিতে দশ হাজার টাকা দান করেছে সেই সংবাদটার পাশে লাল পেনসিলের দাগ দেওয়া। সেই যায়গাটা অবিনাশের নজরে পড়ল। কাউকে ডেকে বিষয়টার সমস্ত তথ্য সে শুনবে বলে উঠে গেল।

পাশে আর একটা ছোট ঘর, সেখানেও আলো জ্বলছে। কৌতূহলের বশে উঁকি মেরে অবিনাশ অবাক হয়ে গেল। এখানেও একটা স্যালভেজ নাকি? নানা আকারের নানা ধরণের দিশি ও বিলিতি মদের বোতল ইতস্ততঃ ছড়ানো। স্বচ্ছন্দে এগুলোকে দোকানের জিনিষ বলে স্বীকার করে নেওয়া যেত, কিন্তু অবিনাশের মনই যেন বল্লে—তা নয়। বোতলগুলি এই ঘরেই খালি হয়েছে, উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, গড়িয়ে গেছে, তেমনি একটা অত্যাচারের চিহ্ন যেন সর্বত্র ফুটে আছে।

এ ঘরটা খগেনের খাস কামরা, প্রাইভেট লেখা আছে দরজার উপর। স্যালভেজ লেখা থাকলেও ক্ষতি ছিল না—মনে হ'ল অবিনাশের।

পরের সন্ধ্যায় গাড়ী নিয়েই অবিনাশ প্রথম গেল স্যালভেজ ডিপোয়, তারপর সেই গাড়ীতেই আরো কিছু দূরে অফিসারের ক্যাম্পে। ক্যাম্প না বলে তাকে বাংলো বলাও চলে। ভদ্রলোকটি যে সৌখিন সেটি বিজ্ঞাপিত হয়ে আছে খড়ের ঘরে, ক্যাম্পে, প্রাঙ্গনের দুপাশে ফুল বাগানে, বারান্দায় ঝোলা অর্কিডে, জানালায় ঝোলানো নীল রঙের পর্দায়। বেতের চেয়ার আর টিপয় পাতা। মিলিটারি পোষাক পরা ভৃত্য শ্রেণীর একজন লোক ডাকাডাকিতে বাইরে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে জানালে—সাহেব বাইরে গেছে, ফিরবে এখুনি।

অগত্যা অবিনাশদের বসতে হ'ল।

দু'টা বোতল সাথে এনেছিল অবিনাশ, কিন্তু তা বাদে নগদ কি পরিমাণ দিতে হতে পারে তারই আলোচনা চলছিল ইন-চার্জ ভদ্রলোকের সাথে। এমন সময় একটি কুকুর আগে নিয়ে সাহেব সান্ধ্য-ভ্রমণ থেকে ফিরলেন। পশ্চাতে একজন সঙ্গিনী, খাকি শাড়ী পরা থাকলেও বাঙ্গালী বলে তাকে চেনা দুষ্কর নয়।

'থাম্‌-ইন-মিস্‌ সানিয়াল'—মৃদু হেসে সাহেব বল্লে মেয়েটিকে।

'এখন নয়'—জবাবে মেয়েটি বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বল্লে—আটটায় গাড়ী পাঠিও।

থ্যাটস্‌ গুড্‌। গুডবাই ডার্লিং—শিস্‌ দিতে দিতে সাহেব ভিতরে গেল, আগে আগে কুকুর আর পিছে পিছে ইনচার্জ ভদ্রলোকটিকে নিয়ে।

মেয়েটি বারান্দা অতিক্রান্ত হয়ে প্রাঙ্গণে নেমেছে, এবার অবিনাশ নিঃসংশয়ে চিনুকে চিনতে পারলে। কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত বদলায়নি, শুধু শাড়ী বদলে সে অবিনাশকে ফাঁকি দেবে কেমন করে? নিজের অজ্ঞাতেই অবিনাশ ডেকে ফেল্লে—চিনু!

চমকে ফিরে তাকালে মেয়েটি, ভ্রূ কুচকে দেখতে চাইলে বারান্দায় উপবিষ্ট কাউকে সে চেনে কিনা। তার পর আবার সে চলতে লাগল।

কিন্তু ততক্ষণে অবিনাশের সংশয় কেটে গেছে। সেও

নেমে এলো বারান্দা হ'তে এবং পথের বাঁকে মেয়েটির কাছাকাছি পৌছে আবার ডাকলে—চিনু!

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে অবিনাশের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বল্লে—তুমি? তুমি এখানে কি করে এলে, কবে এলে?

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে অবিনাশ বল্লে, শুনেছিলাম, তুমি ইস্কুলে চাকরি নিয়ে রমনা ছেড়ে চলে এসেছিলে, কিন্তু এ কী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি?

'সে অনেক কথা'—মাথা নীচু করে বল্লে চিনু—আর এক দিন শুনো, আজ আমি ব্যস্ত আছি।

অবিনাশ বল্লে—আমার সাথে গাড়ী আছে, এসো তোমায় পৌছে দিয়ে আসি। কোথায় থাকো তুমি?

সে অনেক দূরে, সেখানে তোমার যাওয়া চলতে পারে না, তোমায় আমি নিয়ে যেতে পারব না সেখানে, অধীর ভাবে বল্লে চিনু, যেন পাশের কোন ঘরে আশ্রয় নিতে ছুটে যেতে পারলে সে বাঁচত। সে কাঁপছিল থরথর করে, অবিনাশ তার হাতের মুঠো নিজের হাতে তুলে নিয়ে বল্লে—ওই যে গাড়ী, এসো গাড়ীতে উঠে কথা হ'বে।

* * * *

কিছু বিবরণ শুনে অবিনাশ বল্লে—বুঝেছি, কাগজেও আমি কিছু কিছু পড়েছিলাম, কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি তোমরা, মানে তুমিও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ। ভাগ্য অন্বেষণে যখন আমি ব্যস্ত, জীবন বিপন্ন করেও অর্থার্জনের আশায় উন্মত্ত, তখন তুমি যে এমন বিপন্ন হয়ে পড়েছিলে তাতো জানতে পারিনি। আমাদের এরোড্রমের কাজ সেরে যখন প্রথম রমনায় গেলাম, শুনলাম কোন্ ইস্কুলে চাক্‌রি নিয়ে ঢাকা হ'তে তুমি চলে গেছ। যাক্, যা হয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। তোমার অতসীদি, রেবাদি প্রভৃতি যারা সব একসাথে মাষ্টারি ছেড়ে অফিসার হওয়ার লোভে, টেকনিসিয়ান হওয়ার লোভে এই চাকরি নিয়েছিলে তাদের সব খবর ভালো?

ভালো? রিক্ততার হাসি হাসলে চিন্ময়ী, বল্লে—অতসীদির একটি মেয়ে হ'তে মারা গেছেন, অত বয়সে প্রথম প্রসবে সাধারণত এমনটাই ঘটে থাকে। রেবাদির অবস্থাও এখন তখন। আমরা একসাথে অনেকেই ছিলাম।

অবিনাশ বল্লে—তোমার আর সেখানে যেয়ে কাজ নেই, আজকের ট্রেনেই কলকাতায় চলো।

চিন্ময়ী দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বল্লে—কিন্তু সব তো এখনো শোননি তুমি। সব শুনলে তোমার মতি পরিবর্ত্তিত হ'বে।

অবিনাশ বল্লে—সব আর কি শোনাতে চাও? তোমার অতসীদি রেবাদির চেয়েও কিছু খারাপ অবস্থা যদি তোমার হয়ে থাকে তবু আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

চিন্ময়ী ম্লান কণ্ঠে বল্লে—ধরো তাই যদি সত্য হয় সেটা কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে?

ক্ষমা? অবিনাশ চিন্ময়ীর হাত চেপে ধরে বল্লে—ক্ষমা আমারই চাওয়া উচিত—সমগ্র সমাজ ও দেশের হ'য়ে যারা তোমাদের রক্ষা করতে যায় নি, রক্ষা করতে পারে নি। তুমি চাইবে ক্ষমা!

* * * *

ট্রেনে বসে এতক্ষণে হাসতে পারলে চিন্ময়ী, বল্লে—কিন্তু শুধু আমাকে নিয়েই ফিরে চল্লে, তোমার স্যালভেজ কিনবার কি হ'ল, যার জন্য এতদূর ছুটে আসা?

অবিনাশ বল্লে—স্যালভেজই তো কিনে নিয়ে যাচ্ছি নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে। ইচ্ছা ছিল ভাঙা মেসিন জোড়া লাগিয়ে লাভবান হ'ব, দেখি ভাঙা মন জোড়া লাগানোতে কি ফল হয়।

ব্যর্থ অভিযান

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

কহিল আকাঙ্ক্ষা মোরে "ছুটে আয় পাছে,
ভাল ভাল খেলনার সন্ধান আছে।
অত ঊর্দ্ধে যেতে মোর শঙ্কা জাগে প্রাণে,
"কিবা ভয়?" আশা কয় ধীরে কানে কানে।
সেথা মোহ লাগাইছে রঙ খেলনায়
সে সব দেখিয়া আঁখি ঝলসিয়া যায়।

হাতে আসি কাঁচা রঙ যাইল উঠিয়া,
ত্যজিলাম ক্রীড়নকে কুৎসিত বলিয়া।
আশা ও আকাঙ্ক্ষা হেসে ব্যঙ্গ করি শেষে,
ফেলে রেখে গেল মোরে অজানার দেশে।
অসহায় পড়ি যবে উচ্চ হ'তে নীচে
বুঝি তবে অভিযান কতখানি মিছে।

আবুলকালাম আজাদ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

"মাত্র ছ'মাস ?"

রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী হাকিমের মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। বিচারক বিপুল বিস্ময়ে আসামীর পানে চাহিলেন। আসামীর বিস্ময় বিস্ময়কর বটে !

আসামীর প্রতিভাপ্রদীপ্ত সুকুমার আনন, অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণ যেন বসোরার গোলাপ-বাগে সদ্য ফোটা গোলাপ, বুদ্ধি দৃপ্ত আয়ত লোচন, খড়্গ নাসা, কুঞ্চিত কেশদাম, দীর্ঘ ঋজু দেহ, যৌবনালোলিত অঙ্গে বিচ্ছুরিত আভিজাত্যের দিব্য আভা, সুরুচি সঙ্গত বেশবাস, কলিকাতার চোর ডাকাত খুনে পকেটমার অধ্যুষিত ফৌজদারী আদালতের কালিমা ও মালিন্য বিদূরিত করিয়া আজ এক অপূর্ব্ব ও অভিনব শ্রী দান করিয়াছে। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। এই আদালতে ভিড় রোজই হয় ; কিন্তু আজ সে ভিড় নহে। চোর, পকেটমার, বঞ্চক, লম্পট, বেশ্যা, দালাল ও প্রতারকের পীঠস্থানে আজ রাজধানীর শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত সমাজের বিচিত্র ও বিরাট সমাবেশ। যে কাঠগড়ার পানে চাহিতেও ঘৃণাবিমিশ্র করুণায় মানুষের মন বিমুখ হইয়া পড়ে, আজ সেই নগরী প্রধানা কলিকাতা তাহারই পানে শ্রদ্ধাবনত সম্ভ্রমে নিবদ্ধ দৃষ্টি দণ্ডায়মান। আসামীর রূপজ্যোতিঃতে আদালত আলোকিত। আসামীর অধরে মৃদুমধুর হাসি, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফরাজিনিম্নে বিদ্যুল্লতার মত থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া খেলা করিয়া ফিরিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত গম্ভীর ; মনে হইতেও পারে, যেন বিষণ্ণ অথবা অনুতপ্ত।

"মাত্র ছ'মাস ? কিন্তু আমি দীর্ঘকালের জন্য ও গুরুতর দণ্ড প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট নিমেষের জন্য সস্মিত মুখে চাহিলেন। বলিবার কিছু ছিল কিনা কে জানে, বলিলেন না এবং ত্রস্তে বিচারাসন ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্রপদে এজলাস হইতে নামিয়া পাশের দরজা ঠেলিয়া খাস্ কামরায় প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু একি, যাইবার সময় আনমিতশিরে অস্ফুট স্বরে আসামীর উদ্দেশে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া গেলেন। আসামীও সৌজন্যবশে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। আদালত গৃহ সামাজিক শিষ্টাচার বিনিময়ের স্থান নহে ; তাই এই বিশেষত্বটুকু বেশী করিয়াই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহারা উভয় পক্ষকে জানিত, তাহারা বলাবলি করিল, তাহলে সার্ভিসে ভদ্রলোকও আছে ! ততক্ষণে আদালত ভবন বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে পরিপূরিত হইয়া গিয়াছে। ধ্বনি এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে ছুটিল, সেখানেও ধ্বনিত হইল, বন্দে মাতরম্। নিকটের ও দূরের, পার্শ্বের ও সম্মুখের রাজপথ হইতে প্রতিধ্বনি ধ্বনি ফিরাইয়া দিল, বন্দে মাতরম্ ! দেখিতে দেখিতে সমগ্র কলিকাতা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, বন্দে মাতরম্ !

সেদিনের সেই আসামী, আজিকার জনগণবন্দিত, স্মিতপ্রাজ্ঞ, সংযতবাক্, রাজনীতিজ্ঞ সাধু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। সেদিনের সেই কারাদণ্ড রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ। তারপর দুই যুগ অতিক্রান্ত।

মর্ত্ত্যে, মুসলমানের বেহেস্ত মক্কায় (১৭ই নভেম্বর, ১৮৮৮) জন্মগ্রহণ। বাল্যে পিতা ভ্রাতা ভগ্নী সমভিব্যাহারে একদা এই সুদূর হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন ; তদবধি ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষই মাতৃভূমি এবং স্বর্গাদপি গরীয়সী। পরাধীন ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঞ্ছনা বেদনাও যেমন ভারতবাসীর সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছেন, নির্য্যাতন, নিপীড়নও তেমনই



ভূতপূর্ব কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও লেখক

সমান ভাগে ভোগ করিয়া ভারতবর্ষীয়গণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য দীর্ঘকাল যাবত যে কুরুক্ষেত্র মহাসমর পরিচালিত হইতেছে, সেই মহাযুদ্ধের সময় নায়কদিগের মধ্যেও তাঁহার স্থান সর্ব্বাগ্রে। কংগ্রেস-রূপকে গান্ধীজীকে যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করিতে হইয়া থাকে, মনস্বী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উপর নিঃসংশয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা অভিনয়ার্থ ন্যস্ত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন পৃথিবীর লোকের নিকট দুর্য্যোধন হইলেও যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সুযোধন আখ্যায় অভিহিত করিতেন। যুধিষ্ঠিরের চিত্তের শুচিতা ছিল

এমনই শুভ্র, এমনই পবিত্র। আবুল কালাম আজাদের সহিত এই উপমার সঙ্গতি যে কতদূর অভ্রান্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাহা সুলিখিত হইয়া আছে।

সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে নায়কদিগের রূপ ও গুণের আদর্শ বিধিবদ্ধ ছিল। নায়ক সর্ব্বদা সুপুরুষ, বীর ও ধার্ম্মিক হইতে বাধ্য। না বলিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে নায়িকার ষ্ট্যাণ্ডার্ডও বাঁধা ছিল। নায়কগণ যেমন প্রায়শঃই এক ছাঁচে ঢালা, নায়িকারাও তদ্রূপ। একমাত্র সন্ত্রমজনক ও অতুলনীয় ব্যতিক্রম দেখি, দ্রৌপদী। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অভ্যুত্থানের পর হইতে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের নায়কগণের গুণের (রূপের নহে। রূপের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাঁধিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে গান্ধীজীই ফেল্ হইতেন।) আদর্শ অলিখিত আইন বলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের কৃষ্টি, ভারতের সংহতি ও সংস্কৃতি, ভারতের অতীতের ভিত্তির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই আদর্শ গঠিত। ভারতের প্রতি যাহার ভক্তি অবিচলিত নহে গান্ধী-অনুষ্ঠিত যজ্ঞভূমিতে তাহার স্থান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠ" মহাকাব্যের প্রস্তাবনা দৃশ্যের প্রতি আমি আমার পাঠিকা ও পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। সত্যানন্দ সাধনায় সিদ্ধিলাভার্থ সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত থাকিলেও অদৃশ্য মহাপুরুষকে বরদানে বিরত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আর কি আছে যে দিব? উত্তর হইয়াছিল, ভক্তি। সত্যানন্দ সম্মত হইয়াছিলেন। গান্ধীজীও চাহিয়াছিলেন, ভক্তি। ভক্তি—কোন মানুষকে নহে, জন্মভূমি, মাতৃভূমি, ভারতবর্ষের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও অকপট ভক্তি।

বৃত্তির সেরা বৃত্তি, ভক্তি; ভক্তির সেরা ভক্তি, দেশভক্তি। ভক্তিতে যাহার চিত্ত ভরিয়াছে, তাহার নিকট পার্থিব সুখ সম্পদ ধন মান যশঃ দুঃখ কষ্ট অপমান নির্য্যাতন নিপীড়ন সকলই তুচ্ছ ও নগণ্য। ভক্তি যাহার অবিচল, নশ্বর জগতে সে অবিনশ্বর; অমৃত পান করিয়া অমৃতস্য পুত্রাঃ সে অমৃত হইয়াছে। তাহার নিকট দুঃখ আর দুঃখ নহে; কষ্ট আর কষ্ট নহে; লাঞ্ছনা লাঞ্ছনা নহে; নির্য্যাতনও নির্য্যাতন নহে। ধনে সে স্পৃহাহীন, মানে নির্ব্বিকার। তাহার আপনার নাই, পর নাই; উচ্চ নীচ ভেদাভেদ তাহার ত্রিসীমানায় যাইতে পারে না। আপ্যায়নেও পরিতোষ, আঘাতেও উদাসীন। হায়, এ পৃথিবীতে কি এমন মানুষ আছে? আছে বলিয়া জানি; আছে, দেখিয়াছি। তাই যদি নাই হইবে তাহা হইলে ইসলামীয় জগতের এই মহাজ্ঞানী, পরম দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিটির সারাজীবন দারিদ্র্যে বসবাস কেন? ইঙ্গিত মাত্রে দুনিয়ার দৌলত যাঁহার নর্ম্ম সহচরী হইয়া ধন্য জ্ঞান করিত, ইচ্ছা মাত্রে যাহার চরণ তলে বৃটিশ-মহা-সাম্রাজ্যের মহার্ঘ্য উপঢৌকন দিতে বৃটিশ কণা মাত্র দ্বিধা করিত না, যাঁহাকে মিত্ররূপে পাইলে জ্ঞান জগতে বৃটিশ দিগ্বিজয়ের গৌরব অনুভব করিত, সারা জীবন কারাবাস আর লাঞ্ছনা নিপীড়ন বরণ করিয়াও মুখের হাসি, হৃদয়ের কোমলতা, অন্তরের উদারতা অম্লান, অমলিন রহিল কি করিয়া? সেই সুদূর কৈশোরে ভারতভূমিকে যেদিন মাতৃসমা ধাত্রীভূমিরূপে বন্দনা করিয়াছিলেন, নির্য্যাতনের সূচনা সেইদিন; যেদিন জীবনাবসান ঘটিবে, মাটির দেহ মাটিতে আশ্রয় লভিবে, নিপীড়নের অবসান হয়ত সেই দিন হইবে।

ভারতবর্ষে একই সময়ে দুইজন মনস্বী মুসলমান জননায়কের উদ্ভব হইয়াছে। পাণ্ডিত্যে, প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে উভয়েই তুল্য মূল্য। তুলনা রহিত। ভারতের মুসলমান সমাজ যে বহু অংশে হিন্দুর পশ্চাদ্বর্ত্তী তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। শিক্ষায়, সমাজ-ব্যবহারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অনেকখানি পতিত। এমতাবস্থায় জননেতার উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। হিন্দুর অবতারবাদে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারাও রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, প্রভৃতির উদ্ভব বা আবির্ভাবের সহিত হিন্দু সমাজের উন্নতির ইঙ্গিত অস্বীকার করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। অবতার আকাশ হইতে অবতরণ করেন না। গীতা-প্রণেতাও মানুষের দেহ ধারণ করিয়া মানুষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের মতই এই জন্মমরণের জগতে বিচরণ করিয়াছিলেন এবং দুষ্কৃত দমন, সাধুর পরিত্রাণ ও ধর্ম্ম স্থাপনার্থ যুগে যুগে মানুষের গৃহেই অতি মানুষের উদ্ভব হয় তাহাও তিনিই বলিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস তাঁহার সেই উক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। অবনত মুসলমান সমাজে যে একই সময়ে মহম্মদালী জিন্না ও আবুল কালাম আজাদের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে কি মুসলমানের সৌভাগ্যই সূচিত করিতেছে না। আজাদের পাণ্ডিত্য, আজাদের রাজনৈতিক দিব্য জ্ঞান, আজাদের মানবিকতা কি আজ সসাগরা পৃথিবীর ঈর্ষ্যার বস্তু নহে? সভারত বহির্বিশ্ব কি আবুল কালাম আজাদকেই ইসলামের শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার সর্ব্বোচ্চ আসনেই প্রতিষ্ঠিত করে নাই? পবিত্র ও অভ্যুদার মহম্মদীয় ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্ম্মোদ্ভেদ জন্য ইসলামীয় জগত কি একমাত্র আজাদের পানেই নয়ন নিবদ্ধ করিয়া নাই? আর জিন্না? ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুসলমানকে আজ কে এক সূত্রে, একতা পাশে বদ্ধ করিয়াছে? শতধা বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত ও উদাসীন মুসলমানকে সামাজিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে কে? কে তাহাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে? আশা তরুর মূলে বারি সিঞ্চিয়া কে তাহাকে বিটপীর রূপ দিয়াছে? কে তাহাদের অন্তরে উৎসাহের অনল প্রজ্বলিত করিয়াছে? সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলেখ্য কে আঁকিয়াছে? জিন্না—জিন্না—জিন্না! কিন্তু মুসলমানের দুর্ভাগ্য, তাহার প্রতিবাসী হিন্দুর দুর্ভাগ্য, ততোহধিক দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, যে এই দুই মনীষার—প্রতিভার বরপুত্রদ্বয়ের—গঙ্গার পবিত্রতা, যমুনার যশঃ ঐশ্বর্য্য—মিলন না ঘটিয়া বিপরীত পথ—বিভিন্ন গতি অবলম্বন করিল। ভারতভাগ্যবিধাতার বিচিত্র বিধান! এমন না হইলে সৌভাগ্যবতী ভারতের এমন দুর্ভাগ্য হইবে কেন?

পরাধীন ও শৃঙ্খলিতাঙ্গ ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনায় একজন দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর নিপীড়ন, নির্য্যাতন বরণ করিয়া ত্যাগের আদর্শে, চারিত্রিক মাধুর্য্যে, তিতিক্ষায় সৌকার্য্য মানুষকে উন্নতির

শিখরাজ্য দেখিবার আশায় স্বেচ্ছাফকিরী লইয়া জগৎগুরু মহম্মদের অনুশাসনে স্নেহে, প্রেমে, সৌভ্রাত্রে ও সৌহার্দ্যে মানব সমাজকে আত্মীয়তা বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিলেন; প্রসারিত বাহুর প্রেমালিঙ্গনে হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টান পার্শী অচ্ছুৎ ধরা দিল, আর এ কি কম দুঃখ কম দুর্ভাগ্য মহম্মদালি জিন্না তাহার সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না। আকাশের মত উদার, সাগর বারির মত স্বচ্ছ, একেশ্বর প্রেমে পবিত্র ইসলাম অনুশাসন ব্যর্থ হইল, এই দুই দিগ্বিজয়ী প্রতিভার মিলনের সেতু রচিত হইল না। ভাবি, সাগর কি সাগরে মিলিত হয় না? অগ্নি কি অগ্নিতে সংযুক্ত হয় না? কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের একটি ঘটনা আজ বারবার মনে পড়ে। কুন্তীপুত্র কর্ণ ও কুন্তীতনয় অর্জ্জুনের মিলন সাধনের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কিন্তু হায়! যদি দুই ভ্রাতা, দুই মহারথী, দুই বীরবরেন্দ্র মিলিত হইতে পারিতেন! বিধাতার বিধান—ভারত দ্বিখণ্ডিত হইবে, কাহার সাধ্য গতি রোধ করে?

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের মহাযজ্ঞের হোতা—সর্ব্বাধিনায়ক গান্ধীজীর, সৈন্যাধ্যক্ষ—যজ্ঞরক্ষক নির্ব্বাচন দক্ষতা অনন্যসাধারণ বলিলেও বেশী বলা হয় না। মতিলাল নেহেরু, মহম্মদালি, সৌকতালি, লজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, আজমলখান, আবুল কালাম আজাদ, সর্দ্দার বল্লবভাই, পণ্ডিত জওহর লাল, সরোজিনী নায়ডু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ জনে জনে দিকপাল: এই গান্ধী মণ্ডল ভারতবর্ষের ইতিহাস পৃষ্ঠায় চিরোজ্জ্বল। গান্ধী মণ্ডল তথা গান্ধী দর্শন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতেও বিপ্লব সাধন করিয়াছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে আমরা সকলেই সর্ব্বপ্রথম মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের দীপ্তিতে প্রতিভাত হইতে দেখি, তখনকার গান্ধী-মণ্ডল বিচ্যুত চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্যদলের পুরোভাগে। আজাদ ও সুভাষ চিত্তরঞ্জনের শক্তির দুই উৎস—দুই বাহু—গোমুখী ও জ্বালামুখী উত্তরকালে উভয়েই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসকে সুসমৃদ্ধ করিয়াছেন।

বলিয়াছি, অতি অল্প বয়সে মৌলানা পিতা-ভ্রাতা-ভগিনী সমভি-ব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পিতা স্কুল কলেজের শিক্ষায় আস্থাযুক্ত ছিলেন না; গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থাই হইল। প্রতিভা যাহার ললাটে রাজটীকা দিবে, কিশোর বয়সেই তাহার অসাধারণত্ব পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইসলামীয় উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা ভারতবর্ষে প্রাপ্তব্য ছিল না বলিয়া উত্তরকালে তাঁহাকে কাইরোর অল্-অজর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হয়। ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষ যে কবে, কোন্ সময়ে ভাবুকেরও অজ্ঞাতসারে মাতৃভূমির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আগে তাহা জানা ছিল না, এই প্রবাস-কালেই তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। প্রবাসে স্বদেশের কথা, প্রিয়জনের কথা যত মনে পড়ে, যত বেদনা অনুভূত হয়, এমন আর কখনও নহে। মধুসূদন দত্ত প্রবাসগমন কালে বঙ্গমাতার নিকট যে কাতর নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা অমরত্বলাভ করিয়াছে। কাইরো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম পদ লাভাশাতেও ভারতের প্রতি চিত্তব্যাকুলতা দমিত হইল না। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতভূমির সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিতে হইল। ধনদৌলত সৌভাগ্যশালিনী ভারতের ধনরত্নের অভাব কোনকালেই ছিল না।

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গীকৃত আজাদের "অল্ হিলাল্" নামক সাপ্তাহিক পত্রের বিলোপ সাধনে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কাল বিলম্ব করিলেন না। অগ্নি বিসর্পিত হইবার পূর্ব্বেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু অগ্নি রাশিতে যাহার জন্ম, অগ্নি যুগে যাহার বাস, তাহার গতি নিবারণ কে করিতে পারে? অবিলম্বে "অল্ বলগ্" জন্ম লাভ করিল। বাঙ্গলার অগ্নি যুগের "বন্দে মাতরম্", "সন্ধ্যা" ও "যুগান্তর"-এর মত মৌলানা আজাদের উর্দ্দু পত্রও রাবণ রাজার প্রাসাদশিখায় অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। সে আগুন নিবাইতে কত সময় যে লাগিয়াছিল তাহা আমরা সকলেই জানি। "অল্ বলগ্" তাহার অগ্রজের মত অকালেই



মৌলানা আবুলকালাম আজাদ

রাজরোষে কালগ্রাসে পতিত হইল এবং তাহাদের দুর্বিনীত জনক বাঙ্গলা দেশের বাহিরে, রাঁচীতে অন্তরীণে আবদ্ধ রহিলেন।

কারাদণ্ডের ব্যবস্থা যখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তখন রাষ্ট্রশাসকগণ কারাগারকে চরিত্রসংশোধনের সহায়ক হইবে ভাবিয়াছিলেন; অন্তরীণ ব্যবস্থার লক্ষ্যও নিঃসন্দেহে তদ্রূপ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কয়জন দস্যু তস্কর কারাগারের বাহিরে আসিয়া সাধু সজ্জন বনিয়াছে তাহা আমরা জানি না। অন্তরীণমুক্ত যুবক আজাদের 'চারিত্রিক উন্নতি' ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হইল না। অশিষ্ট বালকের অভিভাবক যেমন হাল ছাড়িতে পারেন না, গভর্ণমেণ্টও আজাদের চরিত্রের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর না হইয়া পারিলেন না। অল্প কয়েকদিন পরেই পুনরায় রাজ-আতিথ্যে আহ্বান আসিল। ১৯১৯ হইতে জীবন মধ্যে এই জোয়ার ভাঁটার খেলাই

চলিয়াছে। কয়েকখানি গ্রন্থ—অধিকাংশ দার্শনিক ও ধর্ম্মমূলক—রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, জীবন ধারণে তাহারাই ছিল সহায় ও সম্বল, পুনঃ পুনঃ কারাবাসের ফলে গ্রন্থমালাও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। সুতরাং সংসারের অবস্থাও তথৈবচঃ।

জীবন-তরুতে পুষ্পকোরকসম দুটি সন্তান আগমন করিয়াছিল। অভাবে অনটনে, অযতনে মুকুলেই তাহারা ঝরিয়া পড়িল। এই বিশাল ও বিচিত্র বিশ্ব যিনি সৃজন করিয়াছেন, নিতান্ত অন্ধ ও বোধবিবেকহীন ব্যতিরেকে সকলেই স্রষ্টার অসীম অনুকম্পা অনন্ত করুণার অসংখ্য পরিচয় প্রতিনিয়তই দেখিতে পায়। আবুল কালাম আজাদের সংসার মরুস্থানে দয়াময় একটি পান্থ-পাদপ দান করিয়াছিলেন। অনন্তকাল ধরিয়া এক-খানি মূর্ত্তিমতী প্রতীক্ষা অলিন্দে বসিয়া নয়নের অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। সারাজীবন আশা-পথ চাহিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। কালে ভদ্রে কোনদিন কারামুক্তি ঘটিলে স্বামী স্ত্রীর মিলন ঘটিত। মিলনের গীতির ঝঙ্কার উঠিতে না উঠিতে, বাসনার পান পাত্র অধরস্পৃষ্ট হইতে না হইতে আবার চির বিরহের গান ধ্বনিয়া উঠিত। সারা জীবনের ইতিহাসে এই এক কথাই লিখিত। তবু সেই ক্ষণস্থায়ী মিলনের আশায় দূর দূরান্তে অবস্থিত দুইটি অতৃপ্ত হৃদয় আশায় আনন্দে অপেক্ষায় নিতুই নব ইন্দ্রধনু রচনা করিত। একজন দেশের চিন্তায় তন্ময়, বিভোর, আত্মহারা, আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য; আর একজন চিরকারাবাসী দয়িতকে দেশ-মাতৃকার করে নিবেদন করিয়া আত্মসমাহিত। কারাগারে একটি করিয়া দিন কাটিত আর মিলনের দিন নিকট হইয়া আসিত। সে দিন গণনার কি অন্ত ছিল? তারপর সত্যই যেদিন মিলন ঘটিত, সেদিন অন্তরের ফুলবনে—যূথীজাতিমল্লিকাবেলাগোলাপকামিনীবকুলরজনীগন্ধা ফুটিত; মনোতরুশাখে পাপিয়া দোয়েল কোয়েল পঞ্চমে গাহিত, আকাশে চাঁদ হাসিত। কিন্তু দীর্ঘ বিচ্ছেদাবসানে এই ক্ষণিকের সুখও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। ১৯৩৫ সালে, তিন বৎসরের পর গৃহে আসিতে দেখা গেল সেই যে অশ্রুপ্রতিমাখানি অন্তরের নীরব ভাষায় রচিত কল্পাসনে প্রেমাস্পদকে প্রেম রাজ্যে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত, সে প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। দ্বার পার্শ্বের বকুল গাছটি তেমনই দাঁড়াইয়া আছে, মৃদু বায়ুহিল্লোলে আরও অজস্র বকুল উপহার দিতেছে; কিন্তু সেই ফুলদল আহরণ করিয়া বকুলের মালা যে গাঁথিত; সে আর নাই। আজও রজনীতে অলিন্দের পার্শ্বের কামিনী ফুটে—সুরভি বিলায়, হায়, সেই সুরভিতে সুরভি মিশাইয়া এই মলিন গৃহে নিবেদের নন্দন রচনা করিত যে, সে নাই! সে নাই!

জনক নন্দিনী সীতার ন্যায় আজাদ-মহিষীর কাহিনী কি কম করুণ? অশ্রু মধুর? বেগম-সাহেবার বিশ্ববন্দিত স্বামী তখন আহ্‌মদনগরের দুর্গে বন্দী। গান্ধীজী পুণায় এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আহ্‌মদনগরে। পুণার আগাখান প্রাসাদাভ্যন্তরে গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্ত মহাদেব ভাই বন্দ দশাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। গান্ধীজীর আবাল্যের সহচরী সরলা পল্লীবালা কস্তুরবা নারীর স্বর্গ পতির ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। একদিনের একখানা 'আখবর' (সংবাদপত্র) বেগমের বিয়োগ বার্ত্তা আহ্‌মদনগরের দুর্গে পৌঁছাইয়া দিল। হিমালয়ে কি ভূকম্প হইয়াছিল? চির উচ্ছ্বসিত সাগরবক্ষে কি আর একটি উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছিল? জানি না; বলিতে পারি না।

তবে ঘটনাপ্রবাহ আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম; এদিকের দু'টি কথা বলিতেও পারি। বেগমের অসুস্থতার সংবাদ বেগম প্রাণপণ যত্নে গোপন করিতেই চাহিয়াছিলেন। তুচ্ছ শরীরের সংবাদ সুদূর আহ্‌মদনগর পর্য্যন্ত যাহাতে না যায় তাহার জন্য সর্ব্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরপারের নিশ্চিত আহ্বান যখন কর্ণে পশিল, তখন সাধ্বী সতী জরাকম্পিত শীর্ণ হস্তে একখানি অশ্রুসজল ক্ষুদ্র লিপি রচনা করিয়া দিল্লীর দরবারে প্রেরণ করিলেন—জীবনের সাধ একবার, শেষবার, জনমের মত একটিবার জীবন সর্ব্বস্বকে দেখিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু হায় রাজ্য ভয়, হায় সাম্রাজ্য মমতা! আর হায়, বড়লাট লর্ড লিংলিথগো! পরপারের যাত্রীটির অন্তিম শয্যার পার্শ্বে বিদ্রোহীর অবস্থিতিটুকুও হিজ এক্সেলেন্সি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং আহমদনগরের পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিতে থাকিতে দৃষ্টি দৃষ্টিহীন হইয়া গেল; অনন্তের একটি নিঃশ্বাস অনন্তে—বায়ুতে বিলীন হইল। ফকিরের এত সৌভাগ্য ধরিত্রী কতদিন সহে?

১৯৪০ সালে, রামগড়ে মৌলানা আজাদ দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তখন ইয়োরোপে সমরানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে। ভারতবর্ষের আবহাওয়াও অত্যুত্তপ্ত। সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। রামগড়ের সন্নিকটে কংগ্রেস-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করতঃ কংগ্রেসের সংগ্রামহীন মনোভাবের তীক্ষ্ণ সমালোচনায় কংগ্রেসকে জর্জ্জরিত করিতেও তাঁহার অধীর উন্মত্ত হৃদয়ের ক্লান্তি নাই। আজ বলিতে বাধা নাই, স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অনমনীয় কঠোরতা উদগ্র অধীরতার ভাব প্রবাহ অক্লান্ত যোদ্ধা গান্ধীজীকেও সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতে চাহিয়াছিল। গান্ধী সমর-ক্লান্ত; গান্ধী যুদ্ধে পরিশ্রান্ত! এই অস্বাভাবিক ও অত্যুষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই মৌলানা সাহেবকে আর একবার কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইল। শুধু কি তাহাই? কংগ্রেসের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সোদরোপম স্নেহভাজন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধেও রূঢ় শাস্তি মূলক ব্যবস্থা করিতে হইল। অথচ একদিন ছিল যখন চিত্তরঞ্জন দাশের মত আজাদও সুভাষকে দেশের আশা ভরসা জ্ঞানে অপত্য স্নেহে সহোদরাধিক আদরে বক্ষে ধারণ করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণ বর্জ্জনের উপর কত করুণ বিয়োগান্ত কাব্য নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে, যুগে যুগে মানুষ কাহিনীর উপরে প্রেমাশ্রু ঢালিয়া দিতেছে, মৌলানা আবুলকালাম আজাদের সুভাষ বর্জ্জনের কাহিনী যেদিন রচিত হইবে সেদিনও অশ্রুরোধ করিতে কেহ পারিবে না।

কংগ্রেস একদিন ভারতবর্ষের সাত আটটি প্রদেশের শাসন পরিচালিত করিয়াছিল। বৃটিশের যুদ্ধনীতির সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় একদিনে এক সঙ্গে সমস্ত প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব পরিহার করিয়া, বাহির হইয়া আসিল। অক্ষ শক্তির পাশব-পাশ হইতে অত্যাচারিত ধরিত্রীকে মুক্ত করিবার জন্যই

বৃটিশ বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ। এমন সময়ে কংগ্রেস যদি প্রশ্ন করে যে, যে পৃথিবীকে বৃটিশ মুক্ত ও স্বাধীন করিতেছে এই ভারত কি সেই পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত? না, পুণ্য বারাণসীর মত পৃথিবীর সীমাবহির্ভূত শিবের ত্রিশূলে অবস্থিত—ভারতও কি বিশ্বের বাহিরে, বৃটিশের বেয়োনেটে রক্ষিত ও অস্পৃশ্য? এই প্রশ্নের উত্তর বৃটিশ চার্চ্চিলের মুখ দিয়া দিল। একদিন একজন বৃটিশ দম্ভভরে বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষ তরবারীর অগ্রে অধিকৃত হইয়াছে, তরবারী মুখে শাসিত হইবে। তাঁহারই বংশধর দম্ভাবতার চার্চ্চিল ভাষান্তরে সেই কথাই আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল। ইহার পরে কংগ্রেসের মত আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বৃটিশের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। কংগ্রেস শাসন ভার পরিত্যাগ করিল। মৌলানা আজাদই কংগ্রেসের সভাপতি।

১৯৪২ সালে, জাপানী যখন ভারতের পূর্ব্বদ্বারে সমাগত, বৃটিশ বিমুখ ও বিরক্ত ভারতের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। ক্রীপস্ সাহেব নিরামিশাসী পণ্ডিত জওহরলালের সহিত প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ; ইংলণ্ডে তাঁহার ভারী পসার। ধূর্ত্ত, কূটবুদ্ধি চার্চ্চিল তাঁহার মারফৎ "Post-dated cheque on a crushing Bank" পাঠাইয়াছিলেন। টলটলায়মান ব্যাঙ্কের উপর অনির্দ্দিষ্ট তারিখ সম্বলিত চেক্‌খানি ভারতবর্ষ গ্রহণ না করিয়া ফেরৎ দিল। ক্রীপস্ ধূলাপায়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেন।

মৌলানা আজাদই রাষ্ট্রপতি। গান্ধীজী ত চেক্ খানিকে "ভূয়া" বলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব তাহাতে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। "চেক" খানি ভাঙ্গানো যায় কি-না কিম্বা তদ্দারা দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব হইতে পারে কি-না সে সম্বন্ধে 'শেষ কথা' বলিতে কংগ্রেসের কর্ম্মপরিষদ ও রাষ্ট্রপতিই সমর্থ। কাজেই ভূয়া চেক্ লইয়া গবেষণা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রবন্ধ-রচয়িতা তখন দিল্লীতে এবং কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ পরিষদের সহিত ছিটে ফোঁটা সংযোগও তাঁহার ছিল। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও লেখক নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন যে, একদিন এমন কথাও হইয়াছিল—ঐ চেক্‌খানি গ্রহণ করা হোক। চেকের মর্য্যাদা রক্ষার ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের, তাঁহারা তাহাতে বিরত হইবেন না। আমাদের মনে আছে, সেদিন সমগ্র ভারতে উল্লাস প্রকাশ পাইয়াছিল। ঠিক পরমুহূর্ত্তে, কে-জানে-কেন ক্রীপস্ সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া "না না ও কি! একি! কৈ, ও কথা ত হয় নাই! আমি বলিয়াছি, কৈ না!" করিতে করিতে শশব্যস্তে পাততাড়ি গুটাইয়া চম্পট্ পরিপাটী। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ বুঝিল, চার্চ্চিলের "মোহ ভঙ্গ" হইয়াছে। সাম্রাজ্যের নীলাম-সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমি রাজার প্রধান মন্ত্রী হই নাই।" "যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহার যে সম্পত্তি ছিল, যুদ্ধের পরেও তাহার তাহাই থাকিবে।" চার্চ্চিল তখন প্রধান মন্ত্রী এবং যুদ্ধাধিপতি ও সর্ব্বনিয়ন্তা! ক্রীপস্ অপ্রতিভ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে আবোল্ তাবোল্ বকিয়া প্রস্থান করিলেন। আবোল্ তাবোলে সত্য আদৌ থাকে না এমন নহে, তবে অসত্য অর্দ্ধ সত্য প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইতে বাধ্য: তা যদি না হইবে তবে আবোল্ তাবোল্ নামই বা হইবে কেন?

স্বভাবতঃ ধীর স্থির শান্ত সংযত বাক্ মৌলানা সাহেবের ধৈর্য্য ভঙ্গ হইল; মৌলানা সিংহনাদে ক্রীপসের অসংলগ্ন উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; ক্রীপস্ তাঁহার দলপতি ও প্রভু চার্চ্চিলের মুখ ও মান রক্ষা করিতে বাধ্য; আবার আবোল্ তাবোলের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু পৃথিবীর লোক ততদিনে বুঝিয়া ফেলিয়াছে, চেক্ সত্যই ভূয়া! বিস্তর বাক বিতণ্ডা, বাদ প্রতিবাদ, সওয়াল জবাবের অন্ত নাই; মৌলানাকেও লিপ্ত হইতে হয়; কিন্তু একটি শব্দ, একটি অক্ষর অনবধান অসাবধান অসঙ্গত প্রযুক্ত কোনদিন হয় নাই।

এই সময়কার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। সম্ভবতঃ ক্রীপস পক্ষীয় কোন লোক সংবাদপত্রের মারফত বলিয়া বসিল, রাষ্ট্রপতি ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ; ইংরাজের সহিত আলাপে তাঁহাকে দো-ভাষীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। হয়ত দোভাষী ক্রীপসের বক্তব্য ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারে নাই, তাহার ফলেই মৌলানা ও ক্রীপসের মধ্যে এই বৈষম্য ও মালিন্য ঘটিয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু এই অসংলগ্ন উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, মৌলানা সাহেবের ইংরাজী-জ্ঞান আমাদের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন বা হীন নহে।' মৌলানা আজাদ কখনও কাহারও সহিত বিদেশীয় ভাষায় বাক্যালাপ করেন না, শিক্ষিত সমাজে ইহা সকলেরই জানা আছে। সমাজের একাংশ সম্ভবতঃ তাহা হইতেই স্বতঃসিদ্ধ করিয়া লইলেন যে মৌলানা ইংরাজী অনভিজ্ঞ। পণ্ডিতজীর তীব্র উক্তি ভ্রান্তি নিরসন করিলেও এখনও এমন লোক অনেক আছেন যাঁহাদিগকে সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান দেখা যায়। কিন্তু কেন এই সন্দেহ, তাহা বুঝি না। ভারতবর্ষীয় সমাজ জীবনের সর্ব্ব স্তরের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা কি মৌনী-সন্ন্যাসী, ফকির বা গৃহী দেখেন নাই? আহার্য্য গ্রহণ কালে বাক্যালাপ করেন না এমন লোকের অস্তিত্ব কি অজ্ঞাত? সারাজীবন বামহস্তে আহার্য্য গ্রহণ করেন এমন ব্রতধারীর কথা কি শুনেন নাই? একাধিক ফল বা মিষ্টান্ন বর্জ্জনের কথাও কি তাঁহারা শুনেন নাই? গান্ধীজী সপ্তাহে একদিন মৌনাবলম্বন করেন, ইহাও কি তাঁহাদের অজানা আছে? রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সহিত কখনও ইংরাজীতে বাক্য বা পত্রব্যবহার করিতেন না ইহাও কি তাঁহারা শুনেন নাই? তা যদি শুনিয়া থাকেন, তবে আর একজন অনন্যসাধারণ দৃঢ়চিত্ত পুরুষ প্রধানের মাত্র ইংরাজী বাক্যালাপ বর্জ্জনের সূক্ষ্মতত্ত্ব কেন যে অবোধ্য হয় তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস, দিগ্বিজয়ী দিকপালগণের মিলন ক্ষেত্র, প্রতিভার পুণ্য বারাণসী; বিশ্বজনের উচ্ছয়িনী, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। সেই কংগ্রেসেও মৌলানার মত সুপণ্ডিত, সুবিবেচক, নৈয়ায়িক ও বাস্তব দার্শনিক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আমি বঙ্গভাষার কড়িয়া, আমার দুঃখ এই যে, এই বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার নিকট আমার সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা বঙ্গভাষা প্রাপ্য মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত রহিল কেন? ইংরাজী (পাঠক ক্ষমা

করিবেন, ইংরাজীর নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারণ করিতেছি) উর্দ্দু, পারসিক, আরবিক, হিন্দী, হিন্দুস্থানী, জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, সবাই স্ব স্ব স্থান করিয়া লইল, আমার লজ্জাবনতমুখী বঙ্গ সিংহদ্বারের বাহিরে পড়িয়া রহিল কেন!

তবে এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা দরকার। গান্ধী কংগ্রেস বিধানের বারাণসী, আগেই বলিয়াছি; কংগ্রেসে যে প্রতিভা নাই, দেশেও সে প্রতিভা নাই। কিন্তু সেই কংগ্রেসেই আবুলকালাম আজাদই সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যক্তি যাঁহার অঙ্গে বৃটিশ, কি-বৃটিশ কি-ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জা মুদ্রাঙ্কিত করিতে পারে নাই। এই সঙ্গে আর এক বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে যিনি স্বকীয় মনীষার দীপ্তিতে বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ।

অনাবৃত অঙ্গ, মাত্র কটীবাস, নগ্নপদ, জীর্ণ শীর্ণ দেহ—দীন ভারতের নিঃস্বরূপ যাঁহাতে প্রতিফলিত, ভারতের নিঃসহায় চাষী, অসহায় তাঁতী, নিঃসম্বল শ্রমিক যাহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করে, সেই গান্ধীজীকে বৃটিশের বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাগ্রে দাবী করিতে পারে এবং করিলেও অসঙ্গত নহে।

কড়া নাড়িয়া গৃহস্থের মন বুঝা বলিয়া একটা চলিত কথা আছে। চার্চ্চিলও ক্রীপ্‌সকে পাঠাইয়া কংগ্রেসের মন বুঝিতে চাহিয়াছিল। যখন দেখিল সন্দর্ভ অনুযায়ী কংগ্রেস মীমাংসায় উদ্‌গ্রীব তখন বুঝিল, কংগ্রেস শক্তিহীন, শ্রান্ত ও ক্লান্ত। চার্চ্চিল গান্ধী ও কংগ্রেসের ধ্বংস সাধনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। 'যে খায় চিনি, চিনি যোগায় চিন্তামণি', দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। ক্রীপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবার মাস তিনেক পরে বোম্বাইয়ে 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবের কালী শুকাইবার পূর্ব্বেই দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা লর্ড লিংলিথগো কংগ্রেসকে কারারুদ্ধ করেন। অহিংস কংগ্রেস নিরুপদ্রবে কারাপ্রবেশ করিল বটে কিন্তু ভারতবর্ষ বিদ্রোহ করিল। বৃটিশের শাসনাধিকারে এত বড় বিপ্লব বা বিদ্রোহ আর কখনও হয় নাই। বৃটিশ বিমানে বমার উড়াইয়া পথে ঘাটে মেসিনগান বসাইয়া, রাইফেল, ব্রেণ গান ও বেয়োনেটের দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। স্থানে স্থানে শোণিত প্রবাহ ছুটিল; স্থানে স্থানে শব স্তূপাকার ধারণ করিল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন উভয় পক্ষেই শ্রান্তি আসিল, 'শান্তি' স্থাপিত হইল।

ইত্যবসরে ১৯৫০এর মন্বন্তর। গভর্ণমেণ্ট বলে, ১৫ লক্ষ, দেশের লোক গণনা করে, পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী যমরাজার রাজ্যে গিয়া বাসা বাঁধিল। বিলাতে ভারত সচিব চার্চ্চিল-দোসর আমেরী ভগবানের ঘাড়ে (যীশুর ঘাড়ে নয়!) সব দোষ চাপাইয়া দিয়া বিবেকের গলা টিপিয়া ধরিল; ভারতে বড় লাট লিংলিথগো নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ! ভারতবর্ষের বাহিরের লোক হয়ত বিশ্বাস করিতে পারিবে না, তবুও কথাটা ছাপার অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে চাহি যে, যে বাঙ্গলা দেশের রাজধানী মহানগরী (বৃটিশের প্রাসাদ-নগরী!) কলিকাতার রাস্তাতেও যখন শব স্তূপ জমিয়া উঠিতেছে, লিংলিথগো মহোদয় সেই বাঙ্গলায় বারেকমাত্র পদধূলি দেওয়া ত দূরের কথা, বাঙ্গলার দুঃখে একটি রা কাড়েন নাই। কতকটা ভাগ্যের কথা এই যে লর্ড মহোদয়ের বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়াছিল এবং তাঁহার স্থানে মানুষের অন্তঃকরণ বিশিষ্ট লর্ড ওয়েভেল বড় লাট হইয়া আসিলেন। লর্ড ওয়েভেল দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে, সর্ব্বকর্ম্মপরিহরি বাঙ্গলায় আসিলেন। মূলতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল।

লর্ড ওয়াভেলের দ্বিতীয় কীর্ত্তি, পুণা ও আহমদনগরের কারাগার-দ্বার উন্মোচন। গান্ধীজী মহাদেবভাই ও কস্তুরবাকে আগাখান প্রাসাদের মৃত্তিকাতলে রাখিয়া বাহিরে আসিলেন (তিনি কিছুদিন পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন); আমাদের রাষ্ট্রপতি ভগ্ন দেহে শূন্য মনে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চিরপ্রতীক্ষমানা লক্ষ্মীর প্রতিমা চিরতরে অদৃশ্য হইয়াছেন।

আমি অনেক সময়ে ভাবি, ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে জল আসিয়া পড়ে, সন্দেহ হয়, এ ত অভিমানে আত্মত্যাগ নহে? সমগ্র নারী-জীবন যে নারী বিরহ ও বিচ্ছেদ অবহেলা ও অদর্শন সহ্য করিয়াছে, তাহার অন্তরে প্রজ্বলিত বিদ্রোহানলে সে নিজেই নিঃশেষে ভস্মীভূত হইল না ত? নারীর অন্তরে উচ্চতম বৃত্তির অভাব আছে অথবা দেশভক্তি স্থান লাভ করে নাই, এমন অযথা কথা আমি মনের কোণেও স্থান দিই না; কিন্তু নারীর দেহ ও রমণীর মন কি চিরদিন স্বভাবজ বৃত্তিনিচয়ের দাবী ও অধিকার বর্জ্জন করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে? সারাজীবন একাদশীর উপবাস করিয়াও জীবিত থাকা সম্ভব হয়? যাহার আশা করিবার নাই, যেমন হিন্দু বিধবার, তাহার কথা আর যাহার থাকিয়াও নাই, তাহার কথা এক হইতে পারে না। যাহার আশা করিবার নাই সে বিশ্ববিধানের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়া অথবা বিশ্ববিধাতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতেও পারে; কিন্তু অন্যে? চিরবিরহ ও অনন্তবিচ্ছেদ কি রমণীহৃদয়কে বিশুষ্ক করিবে না? বিরহ বিচ্ছেদ নারীর অসন ভূষণের মত। সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন কারে. আকর্ষণ মনোমুগ্ধকর। কিন্তু সহ্যের মত তাহারও সীমা আছে; অসীম ও অনন্ত হইতে পারে না। বেগম সাহেবের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার তাই সেই সন্দেহই জাগে, আপনার অজ্ঞাতে আপন অন্তরের দুরন্ত অভিমানেই কি পতিগরবিনী সতী তাঁহার শঙ্করকে ত্যাগ করিয়া গেলেন? বেগমের কথায় আর একটী মহিয়সী নারীর অকাল প্রয়াণের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জহরলালের দেহাভ্যন্তরে যে প্রেমিক ও কবিচিত্ত মানুষটি বসতি করে তাঁহার প্রেমময় অন্তরের অফুরন্ত প্রেমার্ঘ্য পাইয়াও কমলা কুসুমটি অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। বেগমের স্বামীর মত, কমলার স্বামীর জীবনও যুগ যুগ ধরিয়া বৃটিশের কারাগারে অতিবাহিত হইয়াছিল। উভয়কেই, সুদীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে স্বল্পক্ষণস্থায়ী মিলনের আনন্দ পূর্ণ হইতে না হইতে আবার বিচ্ছেদের আবাহন! জোয়ারের জল আসিতে না আসিতে বিরহের ভাঁটা পড়িত। গৌরীবরবন্দিনী কাশ্মীর দুহিতা কমলা অবশ্যম্ভাবী বিরহে শূন্য প্রাণে হতাশার গভীরান্তরে কালাতিবাহিত করিতে

না পারিয়া বীরাঙ্গনার মত পতিপদচিহ্ন অনুসরণে কারাগারে প্রবেশ করিয়া নারীহৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে দমিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু হায়, শেষ পর্য্যন্ত নিজেই দলিত, পিষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেন! বেগম সাহেবের স্বামীগর্ব্ব ছিল অনন্যসাধারণ; বিশ্ববরেণ্য স্বামীর স্বদেশ সাধনায় উৎসর্গীকৃতজীবন ছিল পরম গৌরবের সামগ্রী। রাজপুতবালার মত বেগম আজাদও দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাকে স্বহস্তে যোদ্ধৃবেশ পরাইয়া কারাগারে প্রেরণ করিতেন। নয়নের উদ্গত অশ্রুকে তিরস্কার করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া হাসিমুখে বিদায় দিতেন। কিন্তু সাধ্বী সতীর সেই হাস্যের অন্তরালে রোদন সমুদ্র আবর্ত্তিত হইত কি না কে বলিতে পারে। সেই অশ্রু সাগরের অবিরাম অবিশ্রান্ত তরঙ্গাঘাতেই বিরহক্লিষ্ট ও বিচ্ছেদজীর্ণ উপলখণ্ডটি চূর্ণীকৃত হয় নাই, তাই বা কে বলিতে পারে? ধৃষ্ট আমি, এ প্রশ্ন আমি মৌলনা সাহেবকে করিয়াছি, উত্তর পাই নাই; হিমালয়ের অটল গাম্ভীর্য্য কে কবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়াছে? পণ্ডিতজীকেও এই প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলাম, দেখিলাম আগে-ভাগেই তিনি উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার রচিত সুমধুর আত্ম-জীবনীর উৎসর্গ পৃষ্ঠায় স্বভাবজ সম্মোহনী ভাষায় "To Kamala who is no more."

আজাদের মত এত সুদীর্ঘকাল কোনও রাষ্ট্রপতিকে যেমন কংগ্রেসের গুরুতর ভার বহন করিতে হয় নাই, কঠিন ও জটিলতাসঙ্কুল বহুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতেও আর কাহাকেও হয় নাই। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৬, এই ছয় বৎসর কংগ্রেসের পক্ষে, ভারতবর্ষের পক্ষে, শুধু ভারতবর্ষই বা বলি কেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে মহা দুর্দ্দিন—মহা দুর্ব্বৎসর। সৃষ্টি নিরয়গামী হইতে চাহিয়াছে। মানুষ যে সভ্যতার গর্ব্ব করে, যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সংসারের সুখশান্তি নির্ভর করে, মানুষের দানব প্রবৃত্তি পাশব বল প্রয়োগে সে সকলের বিলোপ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। শাঠ্য, দম্ভ, পরস্বাপহরণপ্রবৃত্তি, পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, হত্যা, লুণ্ঠন, স্বকীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অপরের স্বাধীনতা হরণের অপপ্রয়াস—যেন প্লেগ মহামারীর রূপ ধরিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে মানুষ শিল্প সুরুচি দিয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়ও দর্শনের বিধান দিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বলে সুন্দরী ধরিত্রীকে স্বহস্তে অধিকতর সুন্দরী করিতে যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত সাধনা করিয়াছে, সেই মানুষ তাহার শিল্প-জ্ঞান, তাহার সুরুচি, তাহার তপস্যার সামগ্রী বিজ্ঞানকে পর্য্যন্ত সৃষ্টি ধ্বংসের কার্য্যে নিয়োজিত করিবে, মানুষ নিজেই কি কোনদিন ভাবিয়াছিল? বিশ্বব্যাপী পৈশাচিক তাণ্ডবের মাঝে ভারতের ক্ষীণকণ্ঠের অহিংসার বাণী মাতৃসম স্নেহে যত্নে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এই—কংগ্রেসকে। একদিকে অনন্ত প্রলোভন, অন্যদিকে বিফলতায় অসীম নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও কংগ্রেস যে তাহার লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই, তাহার উদার, স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ, স্নেহস্নিগ্ধ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল, তাহার মূলে এই আত্মজ্ঞান-বিরহিত ধ্যানী বুদ্ধসম মহামানবটির মধুর প্রভাব কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল, কংগ্রেসের ইতিহাস অনাগত অনন্তকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইবে। সংসার ভাসিয়া গিয়াছে, স্নেহের বন্ধনগুলি একটির পর একটি দুর্গম পথে প্রান্তরে হারাইয়া গিয়াছে, দেহ জরাজীর্ণ, স্বাস্থ্য অবলুপ্ত, কিন্তু ভারতবর্ষের আহ্বানে, কংগ্রেসের কাজে মত্ত শতহস্তীর বল প্রয়োগের কথা আজ কাহার অবিদিত! গান্ধীজী শতায়ু হৌন, প্রার্থিত পরমায়ু একশত পঁচিশ বর্ষ হোক, ভারতের ভাগ্য; আজিকার অমিতপ্রভাব কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির উৎসমূলে এই হরিশ্চন্দ্রের অপ্রমেয় দান বিভব অতীত গৌরবশালিনী ভারতবর্ষকেও গৌরবে পরিপূরিত করিয়াছে, সোনার কাগজে মণিমাণিক্যের অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেও মর্য্যাদা দান সম্পূর্ণ হয় বলিয়া মনে হয় না।

পুণ্যশ্লোক কস্তুরবার পবিত্র স্মৃতির সম্মানরক্ষার্থ ভারতবাসী কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডার স্থাপিত করিয়াছিলেন। উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য ছিল, এক কোটী টাকা। নির্দ্দিষ্ট দিবসে দেখা গেল, এক কোটীর অনেক অধিক অর্থ ভাণ্ডারে সংগৃহীত হইয়াছে। গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে সরলা পল্লীবালা কস্তুরবার স্মৃতিপূজার্থ পল্লীরমণীগণের কল্যাণকল্পে ভারতের একাদশ প্রদেশে শিক্ষালয়, প্রসূতিভবন প্রভৃতির কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। যাঁহারা কস্তুরবার স্মৃতিরক্ষার্থ ভাণ্ডার স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই চিরদুঃখিনী আজাদ-মহিষীর স্মৃতি পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতেও বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। মৌলানা সাহেব কারামুক্ত হইয়া প্রিয়াহীন শূন্য গৃহে আসিয়াই উদ্যোক্তৃগণকে নিরাশ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যের অসংখ্য ও আন্তরিক সাধুবাদ করিয়া বলিলেন, ভারতীয় বীরনারীর স্মৃতিপূতঃ, ভারতীয়গণ পরিচালিত, ভারতীয় নারীগণের একমাত্র চিকিৎসাগার—এলাহাবাদের কমলা নেহেরু হাসপাতাল অর্থের অভাবে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে; তাহার পুণ্য কর্ম্ম ব্যাহত হইতেছে; অর্থের অনটন জন্য তাহার সম্প্রসারণ সম্ভব হইতেছে না। আপনাদের সংগৃহীত অর্থ কমলা নেহেরু হাসপাতালে দান করিয়া নারী-জাতির কষ্টবিমোচনে সহায়তা করুন, বেগমের আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

আজাদের গুণমুগ্ধ দেশবাসী অবনতমস্তকে নির্দ্দেশ পালন করিল। আর ভাবিল, সার্থক আজাদের নিষ্কাম প্রেমসাধনা! আজাদ জীবনে নিজের জন্য কোনও কামনাই করেন নাই; প্রিয়তমা মহিষীর বিয়োগান্ত জীবনের স্মৃতি রক্ষায় তাঁহার দেশবাসীই উদ্যোগী হইয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহার কামনা-বাসনার সংস্পর্শও ছিল না, সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা ইহাই বুঝি; কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মপালন যাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ থাকিবেই। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আজও স্মৃতিপটে অক্ষরে অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, উপন্যাসের দেবী চৌধুরাণী বলিয়াছিল, "আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?" শুনিয়া নিশি মনে মনে দেবীকে ধন্য ধন্য বলিল। ভাবিল, এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়াছিল। ইহার সঙ্গে মরিয়াও সুখ।

নিশিঠাকুরাণীর ভাষান্তর করিয়া আমারও বলিতে ইচ্ছা হয়, এই লোকের সঙ্গে এই দেশে এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরাও ধন্য।

সাম্যবাদী

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ এম্‌-এ

আমাদের শ্রীমান্‌ দিলীপচন্দ্র—কমরেড্‌, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী এবং একনিষ্ঠ সাম্যবাদী বনিয়াছে।

ক্লাশ ফাইভ হইতেই হাতে খড়ি। তখন বিভিন্ন "দিবস" উপলক্ষ করিয়া "ইন্‌ক্লাব্‌ জিন্দাবাদ্‌" ধ্বনি করিয়া ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া সহরে মিছিল করিয়া বেড়ানোই চরম দেশ সেবা, এই শিক্ষা লাভ হয়। ধাপে ধাপে এই শিক্ষা আগাইয়া চলিয়াছে। এখন Matric পরীক্ষার পর অখণ্ড অবসরে বিখ্যাত বিখ্যাত কমরেড্‌দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে রাজনীতিজ্ঞান পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। এখন সাম্যবাদের সমস্ত তত্ত্ব দিলীপের নখাগ্রে। নদীর ধারে সান্ধ্য আড্ডায় দিলীপ ও তাহার সহকর্ম্মীরা দেশ বিদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে যে ভাবে অসংশয় আলোচনা করে এবং চূড়ান্ত মত প্রকাশ করে তাহাতে যে কোন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের জাঁদরেল সম্পাদকেরও তাক্‌ লাগিবার কথা। আপোষ-বাদী, বুর্জ্জোয়াপুষ্ট কংগ্রেসকে তাহারা রীতিমত ঘৃণা করে। চরকা, খদ্দর, অহিংসা আর হরিজনসেবা-মার্কা গান্ধীবাদকে তাহারা পরম কৃপার বস্তুই মনে করে। তীর্থভূমি রাশিয়ায় সাম্যবাদ কি করিয়া উদ্ভব হইয়াছে, বিকশিত হইয়াছে, মোড় ফিরিয়াছে এ সব সহজ কথা তো এখন ক্লাশ সিক্‌সের ছেলেরাও জানে। Lenin, Trosky এবং Stalin এর মধ্যে কাহার মতবাদ বিজ্ঞান-সম্মত; Marxism এর প্রকৃত ব্যাখ্যা কি—Capital না পড়িয়াও তাহাদের তাহা জানিতে বাকী নাই।

আজই Town Hall এর মাঠে Workers Rallyতে microphone বিকম্পিত করিয়া দিলীপ বক্তৃতা দিয়াছে। তাহাতে সে বলিয়াছে মানুষের সমান অধিকারের কথা, ধনিকের উৎপীড়নের কথা, বিশ্ব বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের চাষী মজুরের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির কথা, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা, ধনিকেরা যে খাদ্য অপচয় করে সে ক্ষমাহীন পাপের কথা।—প্রচুর হাততালি পাইয়াছে সে, বক্তৃতা শেষে। আশা হইতেছে দেশের শ্রমিক এতদিনে সত্যপথের নির্দ্দেশ পাইয়াছে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন আসিল বলিয়া।

সর্ব্বহারাদের দুঃখে হৃদয় বিগলিত, তাহাদের উৎসাহে হৃদয় উদ্দীপ্ত—দিলীপ যখন বাসায় ফিরিল তখন রাত বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রুগ্না মাতা শুইয়া পড়িয়াছেন। ভাইবোনগুলি ঘুমে মগ্ন। ভাগ্য ভাল, পিতা ব্যবসায় উপলক্ষে চট্টগ্রাম গিয়াছেন। ছোকরা চাকর পাকের ঘরে বসিয়া ঝিমাইতেছে।

হাত মুখ ধুইয়া দিলীপ ছোকরাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া খাইতে বসিল। কিন্তু কয় গ্রাস খাইয়াই তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল—ভাত ঠাণ্ডা কণ্‌কণে, ডাল পোড়া লাগিয়াছে, তরকারীতে ধোঁয়ার গন্ধ—মাছ নাই। দিলীপ রাগে চীৎকার করিয়া থালা শুদ্ধ ভাত ছড়াইয়া ফেলিল। পিঁড়ি হইতে উঠিয়া উচ্ছিষ্ট হাতেই ছোকরাকে কান ধরিয়া বারান্দায় টানিয়া বাহির করিয়া বলিল "হারামজাদা মাইনে খাস্‌নে? যা খুসী তাই অখাদ্য খাইয়ে মারতে চাস?"—তাহার পর চলিল চড় ও ঘুষি। গোলমাল শুনিয়া মা উঠিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া দিলীপকে ধম্‌কাইলেন—"কি শুরু করেছিস্‌? এত বড়ো ছেলে ঘরময় এঁটো ভাত ছিটিয়ে কত কাজ বাড়ালি বল তো? আর চাকর বাকরকে মার ধোর করিস্‌—ওরা বুঝি মানুষ নয়?"

দিলীপ মহা খাপ্পা হইয়া বলিল "চাকরবাকরকে চাকর-বাকরের মতই রাখতে হয়। আস্কারা দিয়ে দিয়েই তো তোমরা ওদের নষ্ট করেচো।" এই বলিয়া হাত ধুইয়া রাগে গস্‌ গস্‌ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মা এক বাটি ক্ষীর, কলা আর খই আনিয়া বহু অনুনয় করিয়া ছেলের রাগ ভাঙাইলেন।

বাস্তবিক, মায়েরই তো দোষ। বাসার চাকর তো আর ফ্যাক্টরীর শ্রমিক নয়!

আমেরিকায় ভারতীয় যাদুকরের সম্মানলাভ

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"কয় বৎসর পূর্ব্বে একটি প্রিয়দর্শন তরুণ এসে তার অদ্ভুত যাদুশিল্প দেখিয়ে আমাদের চমৎকৃত করেছিল—কেন জানি না, সেই দিন থেকেই তার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই এবং সে আকর্ষণ দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। আজ সেই পি-সি-সরকারের ম্যাজিক দেখে শুধু বাংলায় নয়—শুধু ভারতের নয়—সমগ্র পৃথিবীর লোক চমৎকৃত—এজন্য আমরাই শুধু গৌরব বোধ করি না—সমগ্র ভারতে যাদুকর সরকারের ম্যাজিক গৌরবের বস্তু হয়েছে।" সম্পাদক মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত বাণী আনন্দের অতিশয়োক্তি নহে—উহা যে কতদূর সত্য তাহা সাম্প্রতিক আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।



(১)

যাদুকর পি-সি-সরকার

ভারতীয়দের একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশের সুধীসমাজ হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্মানলাভ কোনও গুণীর ভাগ্যে সম্ভব হয়, ততক্ষণ এদেশীয় জনগণ কাহারও গুণের উপযুক্ত সমাদর করেন না, বা করিতে চান না। এদেশীয় কেহ যদি বিদেশে আপন আবিষ্কার, বিদ্যা বা প্রতিভার জন্য সম্মানলাভ করেন—ভারতীয়গণ তখন তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন প্রদানে কুণ্ঠিত হন না। এদেশের যাদুকর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার চীন জাপান প্রমুখ প্রাচ্যভূখণ্ডে তাঁহার অদ্ভুত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম জাপানের যাদুকর সম্মিলনীর 'সম্মানিত সদস্য' নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। এমন কি ভারতীয় বার্ত্তাজীবী সমিতি তাঁহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া 'পদক' পুরস্কার ঘোষণা করেন।

সূর্য্য যখন আকাশে উদিত হয় তখন তাহাকে দেখিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। যাদুসম্রাটের যশঃকীর্ত্তনে আজ সমগ্র জগত মুখরিত। সম্প্রতি তিনি আমেরিকা হইতে যে সম্মানলাভ করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয়—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিবেন। বিগত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ যাদুকর সম্মিলনী International Brotherhood of Magicians-এর 'ভারতীয় সদস্য' নির্ব্বাচিত হন। তাহার পর আমেরিকার চিকাগো Magicians Round Table-এ তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে

'সম্মানিত সদস্য' নির্ব্বাচিত হন। সেখানে শ্রীযুক্ত সরকারের জন্য একটি চেয়ার সংরক্ষিত হইতেছে এবং রাউণ্ড টেবিলের দৃঢ় বিশ্বাস যে শ্রীযুক্ত সরকার শীঘ্রই চিকাগো পৌঁছিবেন এবং ঐ আসন স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি আমেরিকার কতকগুলি সাময়িক ও মাসিক-পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় যাদুকর যেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাইব।

প্রথমেই লিখিতে হয় The Sphinx নামক আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার (৪৫শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা) জুলাই ১৯৪৬ সংখ্যায় কভারের উপর যাদুসম্রাট পি সি-সরকারের ফটোচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশীয় পত্রিকায় এদেশীয় লোকের সামান্য সংবাদ বা ফটো প্রকাশিত হওয়াই আশ্চর্য্যের কথা। এমতাবস্থায় কভারের উপর ভারতীয় যাদুকরের ছবি প্রকাশিত হওয়া ভারতীয় মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধটি P. C. Sorcar,—Indian Magician শিরোনামায় লিখিত হইয়াছে। উহা লিখিয়াছেন বর্ত্তমান আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর জ্যাক গুইন সাহেব এবং যাদুসম্রাট সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন জগৎপ্রসিদ্ধ যাদুকর জন মূলহল্যাণ্ড সাহেব স্বয়ং। The Sphinx পত্রিকার কভারে ফটো প্রকাশিত হওয়া কতটা গৌরবের কথা, তাহা যাদুকর জন মূলহল্যাণ্ডের লেখা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

.. ...'Only the world's best professional magicians ever are pictured on the covers of the Sphinx, and no one can buy the cover. Therefore, it is considered a very great honour by the magicians to be selected for a cover of the Sphinx, which is America's oldest and leading magazine"......অর্থাৎ কেবলমাত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকরগণের চিত্রই 'স্ফিন্‌কস্' পত্রিকার প্রচ্ছদ পটে প্রকাশিত হয় এবং কেহই ইহা অর্থের বিনিময়ে কিনিতে পারে না। সুতরাং যাদুকর সমাজ আমেরিকার প্রাচীনতম ও প্রধান 'স্ফীন্‌কস্' পত্রিকার প্রচ্ছদ-পটের জন্য নির্ব্বাচিত হওয়াকে বিশেষ সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করেন।"...

ইহা ছাড়া জুন ১৯৪৬ সংখ্যায় আমেরিকার অপর এক মাসিক পত্রিকায়—Linking Ring এ চারিপৃষ্ঠা ব্যাপী SORCAR-great Indian magician শীর্ষক একটি সচিত্র জীবন কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক সভাপতি John Braun সাহেব যাদুসম্রাট সম্বন্ধে আরও কতকগুলি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। Society of American magicians এবং I. B. M-এর প্রাক্তন সভাপতি Eugene Bernstein তাঁহাকে জানান যে..."I feel that you are more than worthy of the excellent publicity which you have received in the Sphinx & the Linking Ring"...

শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকারের লেখা পুস্তক ও প্রবন্ধ পাইয়া সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ যাদুকর Carl W. Jones বলেন, "তিনি পি-সি-সরকারের লেখায় এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহার বাংলা লেখাগুলি পড়িবার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষায় উদ্যোগী হইয়াছেন।" বাঙ্গালীর পক্ষে, ইহাও কম গৌরবের কথা নয়। আমেরিকার প্রবীণতম যাদুকর Dr. Henry R. Evans—ভারতীয় যাদুবিদ্যায় "শ্রীযুক্ত সরকারের স্থায়ী আসন লাভের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন।"

প্রসিদ্ধ যাদুকর John Platt সাহেব আমেরিকার তিন চারিটি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সরকার সম্বন্ধে সচিত্র ও বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মার্কিণ যাদুকর T. J. Crawford সাহেব শ্রীযুক্ত সরকারকে "বর্ত্তমান জগতের একজন খ্যাতিমান লোক" বলিয়া সে দেশের পত্রিকায় লিখিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকার Modern Magic নামক মাসিক পত্রিকা শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকারের সম্মানার্থে SORCAR NUMBER বা যাদুসম্রাট সরকারের নামে একটি 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, আমেরিকার TOPS নামক মাসিক পত্রিকায় প্রায় প্রতিমাসেই তাঁহার সংবাদ ও তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এদেশীয় পত্রিকাগুলিতে যেমন প্রায়ই শ্রীযুক্ত সরকার প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন তেমনি বিদেশের পত্রিকাদিতেও তিনি ভারতীয় যাদু সম্বন্ধে ও তাঁহার নব নব উদ্ভাবিত অত্যাশ্চর্য্য যাদু কৌশল বিষয়ে নানা প্রবন্ধ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। আমেরিকার Magic Capital of the world এর প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রে বিগত আগষ্ট' ৪৫ সংখ্যায় Sorcar's Balloon Target. সেপ্টেম্বর '৪৫ সংখ্যায় The Future of Magic, নভেম্বর '৪৫ সংখ্যায় Good Night Target, মে ৪৬ সংখ্যায় Improved Think-a-Name, জুন ৪৬ সংখ্যায় Sorcar's Magic Circle প্রভৃতি তাঁহার বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। The Sphinx পত্রিকার জুন '৪৬ সংখ্যায় তাঁহার লেখা Floating skull প্রকাশিত হইয়াছে। The Linking Ring এ আগষ্ট '৪৬ সংখ্যা হইতে 'ভারতীয় যাদুবিদ্যা' সম্পর্কে একটি সচিত্র ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে।

বিশ্বভারতী হইতে তাঁহার 'ইন্দ্রজাল' নামক একটি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং উহার ইংরাজী সংস্করণ Indian Magic নামে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুবিদ্যা প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।

ইংলণ্ডের Magic wand নামক পত্রিকায় জুন '৪৬ সংখ্যায় যাদুসম্রাটের সচিত্র জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা উইল গোল্ডষ্টোন সাহেব বহুপূর্ব্বেই তাঁহাকে 'জন্মসিদ্ধ যাদুকর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতীয় যাদুকরের পৃথিবীময় এই সুনাম লাভে ভারতীয় মাত্রেরই গর্ব্বের বিষয়।

'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় ১৩৫০

সালে লিখিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার আমার স্নেহাস্পদ এবং বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের বাহু ছাড়াও বুদ্ধি ও কৌশলের বাহুতে তিনি আমাকে বারংবার সম্মোহিত করে তার প্রতি আমাকে শ্রদ্ধান্বিত করেছেন। হাত সাফাই জিনিষটাকে তিনি এমনভাবেই শিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছেন যে, নিতান্ত বুদ্ধিজীবী লোকেরাও তাঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করতে বাধ্য হবেন। ইন্দ্রজালবিদ্যায় ভারতবর্ষের পুরাতন খ্যাতিকে তিনি বর্ত্তমানে শুধু বজায়ই রাখেন নি, বর্দ্ধিত করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে এইটেই সব চাইতে বড় কথা। তিনি অল্প বয়সেই দেশের অন্যতম গৌরব হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এতে তাঁর বন্ধু হিসাবে আমিও গৌরবান্বিত।"

সকলের সঙ্গে সুর মিশাইয়া আমিও লিখি যে, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকারের প্রতিভার অলৌকিকতার সঙ্কেত দেখে কঠোর বাস্তববাদীও চমকে উঠবে। অদৃশ্য শক্তির কাছে বন্ধুবরের যাদুশক্তির আরো উন্নতি কামনা করি।

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা— শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট এম-এ

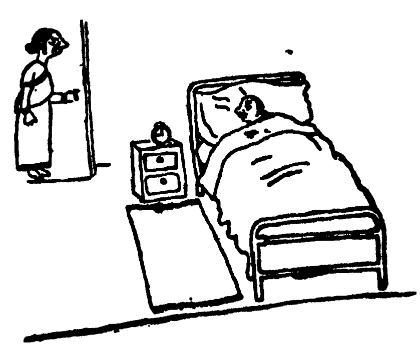
(৫)

বৌভাতের রাত।

'ইহাগচ্ছ' বলে মন্ত্রণামণ্ডলী যার আগমনকে—তাকে নয়, কারণ এ বাড়ীতে শুধু অনুরাগ চলতে পারে পূর্ব্বরাগ নয়, আর বন্ধুরাগ ত কল্পনারও অতীত—সাগ্রহে আবাহন করে নিল তিনি দেখা দিলেন শুধু একটী দেবী প্রতিমার মত। মর্ত্ত্যের মানবী কোথায় তার মধ্যে? তার সবই ত শুধু জৌলুষ, অন্তঃপুরের অন্তরালেই জ্বল জ্বল করবে। তার উপস্থিতি, ব্রীড়াময়ীর কোন সলজ্জ হাসি, অর্দ্ধনম্র আঁখি ভঙ্গী বা নত মুখের ছোট্ট একটী নমস্কারও তাদের এই উন্মুখ শুভ সম্ভাষণকে পুরস্কৃত করবে না। প্রতিমা প্রাণময়ী হয়ে উঠবে না। সুসজ্জিতা সিংহাসনারূঢ়া দেবীতে মানবীর অনুভব প্রকাশ পাবে না।

আজ রাত্রিতে শত বিজলীমালায় সাজানো ঘরটী ফুলে চন্দনে শোভায় সৌরভে স্বর্গের মত মনে হচ্ছে। নববধূর চারদিক ঘিরে কত সুসজ্জিতা তরুণী ও অতিসজ্জিতা প্রৌঢ়া অশ্রান্তভাবে বাক্যালাপ করছে। ঘরের বাইরে বন্ধুর দল। প্রৌঢ়ারা ভাবছে,ওরা হচ্ছে ভোজের আসরে রবাহুতের মত; এ সভায় ওদের শোভা পাবে না। তরুণীরা ভাবছে যে, ওরা কেন এমন দূরে সঙ্কুচিতের মত দাঁড়িয়ে আছে আমরা যখন ওদের দেখে বিমুখ হচ্ছি না বা কুণ্ঠিত ভাব দেখাচ্ছি না। তারা জানে যে, আজকের রাতে সবাই সুন্দর, কারণ আনন্দই হচ্ছে সৌন্দর্য্য। প্রিয়ার মুখের রূপালী হাসিই হচ্ছে রূপ। কে জানে আজ হয়ত তাদের কারো মুখের হাসি ওদের কারো মনে আলো জ্বালিয়ে তুলবে। মেয়েরা সবাই নিজেদের বিকাশ করে তুলছে তাই আজকের রাতে।

বন্ধুরা কিন্তু সবাই পিকেটিং করছে ঘরের সামনে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সুবিধা নিয়ে এ জিনিষটা বড়ই সম্মানজনক হয়ে উঠেছে আজকাল। শীত করছে ভোর বেলা; আচ্ছা, বিছানায় এমন সময় লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকাটাই কি সত্য নয়? তাহলে সত্যাগ্রহ করে পিকেটিং করে যাও—পুলিশরূপিণী গৃহিণী যতই তোমার অসহযোগকে অসহ মনে করে চটে তাড়া করুন না কেন। গরমের ছুটী হয়নি এখনো এবং অধ্যাপক গরম গরম অঙ্ক কষাচ্ছেন ক্লাশে; বেশ, কলেজের পাচীলের পিছনের বটগাছের



বিছানায় পিকেটিং

তলায় চানাচুর সহযোগে পিকেটিং করতে করতে তার সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করতে থাক।

নারীসৈন্ত ব্যূহ ভেদ করে অবশেষে প্রত্যুম্ন কলেজের রথীদের নববধূর সিংহাসনের কাছে নিয়ে এল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের পর পরিচয় পর্ব্ব বলে কোন পর্ব্ব বেদব্যাসের মহাভারতে স্থান হয়নি। যদি পেত তাহলে সেই উনবিংশ পর্ব্বটাই সবচেয়ে বেশী করে মুক্তিকামী পাঠকরা পড়তেন তাতে সন্দেহ নেই। সিনেমার ভাষায় কোন চিত্রকে প্রথম দেখানকে কি মুক্তিলাভ বলে বর্ণনা করে না? কাজেই প্রথম পরিচয়টাকে আধুনিক ভাষায় মুক্তিলাভ বলেই যদি পাঠকরা গ্রহণ করেন তা হলে ভুল হবে না।

পরিচয় দিতে অবশ্য প্রথম আরম্ভ করল প্রত্যুম্ন, কিন্তু ঐতিহাসিক ধারা বজায় রেখে পাউডার-মণ্ডিতা গৌরী সেনাদের রণক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে দিয়ে গৌড়বিজয়ী নীহারিকা আবার বক্তিয়ারের অংশ গ্রহণ করল। কোনখানটায় প্রত্যুম্ন থামল ও নীহারিকা রণক্ষেত্রে নামল তা বোঝা শক্ত, আর তা বুঝে দরকারও নেই আমাদের।

এর নাম হচ্ছে নিরঞ্জন। বাপ মা এ নাম দিয়েছিল যাতে অকালে ছেলের মনে কোন অঞ্জন না পড়ে, অথবা কারো মনোরঞ্জন করতে না ছুটে—অন্তত পড়াশোনাটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু বন্ধুমহলে ওর নাম হচ্ছে নারীরঞ্জন। রঙীণ পাঞ্জাবী ও সর্ব্বদাই পরে, আর নারীদের যে কোন প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত অভিলাষের আভাস পেলেই ও হয়ে ওঠে একেবারে সেই রামায়ণের অঞ্জনানন্দন। কলির গন্ধমাদন ইভনিং ইন প্যারিস ওর পকেটে পকেটেই ঘুরছে। এই দেখুন তার প্রমাণ। এই বলে চট করে ওর পকেটে হাত দিয়ে পুষ্পসারের সুদৃশ্য আধারটী বের করে নীহারিকা উপহারটী বধূকে আর্য্যপুত্রী সম্বোধন করে নিবেদন করে দিল।

আর এই হচ্ছে সৌরভ মিত্র। ওরফে রাসভ মিত্র। ও গান গাইতে চায়, তার উপর কেবল ক্ল্যাশিকাল। তবে ওর ক্ল্যাশিক আর আমাদের কাঁশী যতই এক সঙ্গে ঐক্যতান চালাত থাকে ততই ওর গলার কসরৎ বেড়ে যায়। আজ যদি আর একটু দেরী হত দেবীর সিংহাসন প্রান্তে আমাদের পৌছাতে, তাহলে আমরা রাসভের কণ্ঠ-নিনাদের তূর্য্যধ্বনি বাজিয়ে সবাইকে সরিয়ে দিতে পারতাম।



রাসভ মিত্র

বন্ধু বর্ণনার ব্যঞ্জনা এই বিরাট তরুণের দলকে পেয়ে বসল। কেহ ভেবে দেখল না যে তাদের এই মুখর প্রগল্‌ভতাকে নববধূ কেমন ভাবে গ্রহণ করছে বা কতখানি উপভোগ করছে। পিছন থেকে একজন তাকে ভাল করে দেখবার জন্য উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। তাকে এক ফাঁকে সামনে সরিয়ে এনে প্রত্যুম্ন পরিচয় করিয়ে দিল—হাতীর দাঁতের কাজ করা চন্দন কাঠের বাক্স হাতে এই বন্ধুটীর নাম হচ্ছে জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী। বন্ধুরা কিন্তু উচ্চ হাস্যে প্রতিবাদ করে উঠল, না, না, ও হচ্ছে গজবন্ধু চক্রবর্ত্তী। প্রথম নামটার সার্থক প্রমাণ হাতে হাতেই রয়েছে, আর উপাধিটা হচ্ছে পেশার পরিচয়। পার্শীদের মতন; যেমন ধরুন ধোতিওয়ালা—যদিও সে হয়ত জীবনে স্যুট ছাড়া আর কিছু পরবে না। কারো নাম মার্চেন্ট, যদিও সে নিজে মার্চেন্ট অফিসের কেরাণীর বেশী কিছু নয়। চক্রবর্ত্তীর কাছে সংসারের সব কিছুরই বাঁকা-রূপটার সন্ধান পাবেন যদি চান ত। সাইমন কমিশন থেকে আরম্ভ করে শ্যামবাজারের বাঁ পাশেই কেন রাধাবাজার হল না, তার নায্য ব্যাখ্যা আমাদের সব সময়ই দেয়। এই দেখুন না, আপনাদের এই পাড়ার কোনের কয়ালী কেবিনে সাইন বোর্ড লটকান আছে—কাউল চপ বানানটা অবশ্য শুদ্ধ ইংরেজীতে হয় নি। তবে "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের" হোটিয়ালে ম্লেচ্ছ ভাষার বানানটা যদি অশুদ্ধই হয় দুটো নিগেটিভে মিলে একটা পজিটিভের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে অর্থাৎ বিলিতি স্বাদের চপের বদলে উড়িয়া স্বাদের খাঁটী স্বদেশী জিনিষই পাওয়া যাবে

এই ইঙ্গিত নাকি ওর মধ্যে আছে। তার উপর গজবন্ধু বলে, যে লোকটা এত সাধু ও সত্যবাদী তার দোকানেই পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত।



রোম্যান এসে খাটী রোম্যান প্রথায় অভিবাদন করল নববধূকে, একহাতে চাদর জড়িয়ে নিয়ে এবং অন্য হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে। এ হচ্ছে রোম্যান। বাপ মা নাম দিয়েছিল সুমন; কিন্তু রাসভের ধ্রুপদকে টেক্কা দেওয়ার



বং—রোম্যান

জন্য ও জার্মাণ সঙ্গীত সাধনা আরম্ভ করল। অর্থাৎ দাঁতে কাঁকর ছড়ানো কড়াই মাড়াই করতে করতে গাইত, আর ইংরেজীতে নামের বানান লিখত শুমান। আমরা একদিন এলিজাবেথ শুমানের গানের রেকর্ড জোর করে শুনিয়ে দেবার পর থেকে সঙ্গীত ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিল। কিন্তু কদিন পরে দেখি যে ইতিহাস অনার্সের পরম হংসটী আমাদের পরম বকে পরিণত হয়েছে। বক বক করে বেড়াচ্ছে যে, বাঙ্গালা স্বাধীন জাতি—রোম্যানদের এক পর্য্যায়ের ও এমন কি একই গোত্র। প্রমাণ করে দিয়েছে যে পৃথিবীতে সব সভ্য জাতির মধ্যে কেবল দুটী জাতির মাথায় কোন পোষাক ছিল না। প্রাচীন যুগের রোম্যান ও এযুগের বং-রোম্যান বা বঙ্গম্যান; পদ্মা পার হয়ে থাকলে ব্যঙ্গম্যানও কইতে পারেন। কথাটা অবশ্য বাংলা ইংরিজি মিশিয়ে বেংলিশ (Benglish) হল, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। রামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের মত সর্ব্বভাষা সমন্বয় হচ্ছে। বরং সুবিধা হচ্ছে এই যে, কোন ভাষাই আর খাঁটী করে শিখতে হয় না।

মোট কথা রোম্যানরা বাঙ্গালীদেরই মত ধুতি চাদর পরত; নাম ছিল তখন টোগা আর টিউনিক। চোগা আর চাপকান নয়; সেটা মুসলমানী, রোমানী নয়। পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোকরা পূর্ব্বপুরুষদের কথা সহজে ভুলতে পারে না, তাই ওরা এখনো হাটু পর্য্যন্তই ধুতি পরে। মুসোলিনিকে সব কথা খুলে চিঠি লিখলেই একখানা মুষল পাঠিয়ে দেবে বঙ্গম্যানদের জাতীয় ঝাণ্ডা হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য। জিনিষটা বিদেশী হলেও কাস্তে কুড়ুলের চেয়ে বেশী বেমানান হবে না।

ইতিহাসের কথাই যদি উঠল তবে এর পরিচয় দিই আপনার কাছে—এই বলে একটী লাজুক বিনম্র ও বিনামা-পরা বন্ধুকে সবাই ঠেলে সামনে পাঠিয়ে দিল। ইতিহাসের একেবারে ইতিকথায় গিয়ে পৌছেচে আমাদের হরিহর ওরফে অড়হর। বাঙ্গালীর প্রতিভার একেবারে পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ পোড়া কাঠ। সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে ওর রিসার্চ্চের অর্থাৎ গরু খোঁজার ভিতর কোন পণ্ডিতের পুঁথি বা তথ্যের কোনই ভেজাল নেই। একেবারে স্বকীয় অর্থাৎ "অরিজিন্যাল"। কেবল বাঙ্গালীরই উর্ব্বর মস্তিষ্কে "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" এরকম ইতিহাস জন্মাতে পারে। টেক্‌স্‌ট বুক, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, প্রত্নতত্ব, শিলালিপি সব হার মেনে গেছে। অড়হরের থিসীস হচ্ছে মশুর ডাল সম্বন্ধে। সংক্ষেপে ওর বক্তব্য হচ্ছে এই যে মুশুরী ডালটা সাত্বিক হিন্দুরা যে বাদ দিয়ে চলেছিল তার বিশেষ কারণ আছে। বিদেশী বর্জ্জনটা

কিছু আর জাতীয় কঙ্গরেসের নব রঙ্গ নয়। ওরা যেন না ভাবে যে বিদেশী বর্জ্জনটা ওদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। সেকালের টাক টিকি এণ্ড কোং একালের বিলেত-ফেরত বিদেশীদের মতই বিদেশী বর্জ্জন করে দিয়েছিলেন। মুশুরী ডালটা বাদ গেল, কারণ ওটা মিশর থেকে সরাসরি এদেশে এসেছিল। ক্লিয়োপেট্রার কয়েকটা সখী তার প্রসাধন করত ও গায়ের রং ঠিক রাখত মুশুরী পিষে দুধের সরের সঙ্গে গায়ে মাখিয়ে। ওরা কোন রকমে পালিয়ে এসে প্রথম কিষ্কিন্ধ্যায় জুটেছিল, তাই ও জায়গার নাম বদলিয়ে হল মাইশোর। আদি ও অকৃত্রিম বাংলার স্রেফ অপভ্রংশ। তবে ছোলাটা খাওয়া চলে। কারণ হিন্দুরাই যবদ্বীপে ওটা চাষ করত, তাই কোন কোন শস্যের নাম যব শস্য। হিঁদুয়ানী বাঁচিয়ে সস্তায় স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে ওর মতে ছোলা খাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বলি যে ছোলারই বা দরকার কি? এই দেখুন না ও উপহার এনেছে পেস্তলের একটা পাখা, কেমন সুন্দর পুরুষ্ট নধর, জীবন রস একেবারে উপচিয়ে পড়ছে—তাই আমরা কোরাস গাই—

অড়হর দা-া-স্-অ
তুমি খাইলে কেন ছোলা
তোমার খাদ্য যে গো ঘাস্-অ।

(৬)

পরিচয়পর্ব্বটা প্রাণান্তকর হয়ে উঠছিল—শ্রোত্রী ও বক্তৃদল উভয়তই। এবং তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবেশিনী ও নিমন্ত্রিতাদের দল যাদের এই ছেলেরা ঘরছাড়া করে এতক্ষণ ধরে মৌরসী পাট্টা করে রেখেছে তারাও বহুক্ষণ থেকে দখল আবার সাব্যস্ত করবার জন্য ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা আতঙ্কে বিস্ময়ে ও সরোষে এই অর্ব্বাচীনদের প্রলাপ শুনে অসন্তোষ দেখাচ্ছে। তা স্বাভাবিকও বটে। বন্ধুর দল এসব কৌতুক পরিচয়ের অস্ত্র হানাহানি করত নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সঙ্গে, যদি বাগ্‌যুদ্ধ কখনো হত। তখন কিন্তু তারা নিজেরাই কখনো ভাবেনি যে এরূপ প্রগল্‌ভতা নববধূর সামনে তারা করবে। দোষও তাদের দেওয়া যায় না। এই জীবনে প্রথম একটী নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ যে তাদেরই একজনের নিকটতম হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে সম্পর্ক বা মানসিক বিকাশের ব্যবধানের কথা হয়ত তারা সাময়িক ভাবে ভুলে গিয়েছিল বা আনন্দোৎসবের মধ্যে খেয়াল হয় নি। কিন্তু তা বলে সাংসারিকতায় অভিজ্ঞ প্রবীণরা তা মেনে নেবে কেন? অন্তরালে তাদের অপ্রসন্ন গুঞ্জন ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে গঞ্জনার রূপ ধারণ করতে লাগল।

ক্রমশঃ

কৃত্তিবাস পণ্ডিত

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহামুনি বাল্মীকির অবতার বাঙ্গলার আদি কবি কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কৃত্তিবাসের উপাধি: কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর শেষে লিখিত আছে। (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯, পৃঃ ৫৫৩)

মুখটী বংশ ওঝা বংশ সংসার বিদিত।
তথি উপজিল এই কিত্তিবাস পণ্ডিত॥

সুতরাং তাঁহার কুলোপধি 'মুখটী'; তখনও 'মুখোপাধ্যায়' লিখিবার রীতি প্রচলিত হয় নাই বুঝা যায়। কবে ঐ রীতি প্রচলিত হইল তাহা গবেষণাযোগ্য। নরসিংহ ওঝা ও মুরারি ওঝার নামে মুখবংশের এই ধারাটি "ওঝা বংশ" নামে পরিচিত হইয়াছিল এবং কৃত্তিবাসেরও 'ওঝা' উপাধিই ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্ধৃত পয়ারে এবং তদ্রচিত রামায়ণের শত শত ভণিতায়—'কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি', 'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ', 'লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে' প্রভৃতিতে—কবিবর যথাযথ তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপাধিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামগতি হইতে আরম্ভ করিয়া ডক্টর সুকুমার সেন পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিকই বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। সকলেই পণ্ডিত শব্দটিকে সাধারণ বিশেষণ পদ ধরিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে ভণিতায় কুত্রাপি কৃত্তিবাসের 'ওঝা' উপাধি পাওয়া যায় না। আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের খুল্লপিতামহ সূর্য্যেরও "পণ্ডিত" উপাধি ছিল। বস্তুতঃ সার্ব্বভৌম, শিরোমণি প্রভৃতির ন্যায় "পণ্ডিত" উপাধিও যে একসময়ে বঙ্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল ইহা অনেকের জানা নাই এবং আমাদেরও

ছিল না। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীগ্রন্থ পরীক্ষা করিয়াই আমরা এই তথ্য প্রথম অবগত হইয়াছি। কুলপঞ্জীতে কৃত্তিবাসের নাম কি ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

(১) (বনমালি)সুতা মাধব-শান্তি-বলভদ্র-মৃত্যুঞ্জয়-ভাগো-ভাসো-কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত শ্রীনাথ-শ্রীকান্ত-শ্রীকণ্ঠ-চতুর্ভুজাঃ। কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণস্ত পাঁচালিকারকঃ।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ৪২৭ খ পত্র)

(২) বনমালিকস্ত - - - - তৎসুতাঃ কীর্ত্তিবাস পণ্ডিৎ মৃত্যুঞ্জয় শান্তি মাধব শ্রীধর-শ্রীমানবলোকাঃ।

(অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ৭৫ ক পত্র)

(৩) বনমালিকস্ত - - - তৎসুতাঃ কৃত্তিবাস পণ্ডিৎ শান্তিমাধব মৃত্যুঞ্জয়বলো শ্রীকণ্ঠ-শ্রীমৎ-চতুর্ভুজ মালাধর ভাস্করজগোভাসো শ্রীনাথ শ্রীকান্তাঃ। কৃত্তিবাস পণ্ডিৎ রামায়ণগায়ণকর্ত্তা।

(রাজশাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত বিক্রমপুর হইতে সংগৃহীত পুথির ৩১৬ ক পত্র)

(৪) কির্ত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণ রচিছিলো।

(আড়িয়াদহের ঘটক গৃহে রক্ষিত একটি পুথির ৩৫৭ ক পত্র)

ঘটক গ্রন্থে প্রায় সর্বত্র পণ্ডিতগণের উপাধি যথাযথ লিখিত পাওয়া যায়। কবি কৃত্তিবাসের বিচিত্র উপাধিটিও পূর্বাপর কুলগ্রন্থে যথাযথ কীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে নব্য ন্যায়ের পূর্ণ অভ্যুদয়কালে এই সকল প্রাচীন উপাধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎপূর্বে "পণ্ডিত" উপাধিটি বহুল পরিমাণে বিদ্বৎ সমাজে প্রচলিত ছিল। আমরা একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর" নামে একজন মহা পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। তদ্রচিত একাধিক পুস্তকের পুষ্পিকায় তাঁহার পিতার নাম লিখিত আছে "মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ-শ্রীকান্ত পণ্ডিত" (সা-প-প, ১৩৫৭, পৃঃ ১৫২, ১৫৮)। কুলপঞ্জীর উদ্ধৃত বচন হইতে প্রমাণ হইতেছে—ভাইদের মধ্যে একমাত্র কৃত্তিবাসই উপাধিধারী ছিলেন। আত্মবিবরণীর নিম্নলিখিত পয়ারটি অতঃপর আর অসংলগ্ন মনে হইবে না :

কাহার নাম কুলিয়ার পণ্ডিত কিত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥

৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'পণ্ডিত' কাটিয়া 'মুখটি' করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের মাতামহ : পিতা বনমালীর সম্বন্ধে আত্মবিবরণীতে লিখিত আছে :—

সুদ্বির ভগবান্ তথী বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥

ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে যথাযথ পাওয়া যায় (পৃ ৬৫) বনমালীর "আর্ত্তি" (অর্থাৎ শ্বশুর) ছিলেন 'গাং পুরো' অর্থাৎ গাঙ্গুলীবংশীয় ৪৩ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন শিবপুত্র পুরুষোত্তম (মহাবংশাবলী, পৃ ৫৩)। কুলগ্রন্থ হইতে আত্মবিবরণীর এইরূপ বহু নির্দ্দেশের সমর্থন ও পরিপূরণ লাভ করা যায়। আমরা বাহুল্যবোধে অন্তনির্দ্দেশ পরিত্যাগ করিলাম।

কৃত্তিবাসের বিবাহ : আত্মবিবরণীতে কিম্বা অন্যত্র কৃত্তিবাস নিজের বিবাহ ও পুত্রকন্যাদির বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন। কুলপঞ্জীতে এ বিষয়ে প্রামাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

কৃত্তিবাসের "আর্ত্তি" (অর্থাৎ শ্বশুর) তিনজন—"বং শঙ্কর (একটি পুথির পাঠ শুভঙ্কর) বং ব্যাস বং গুণাকর" (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ ৪০ দ্রষ্টব্য। গুণাকরের নাম আমাদের পুথিতে আছে)। "বন্দ্য"বংশীয় এই তিনজনের মধ্যে একজনের পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বন্দ্যবংশের একটি অনতিপ্রসিদ্ধ শাখা "উলুয়া" নামে পরিচিত। ঐ শাখায় আদি কুলীন দ্বিতীয় সমীকরণের ঈশানের অধস্তন সপ্তম পুরুষ শঙ্করই কৃত্তিবাসের শ্বশুর। আমাদের পুথিতে শঙ্করের কুলবিবরণে পাওয়া যায় "ক্ষেম্য মুং কীর্ত্তিবাসঃ" (৩৩৬ক পত্র)। রাজসাহীর পুথিতে আরও স্পষ্ট লিখিত আছে "অতিক্ষেম্য মুং কির্ত্তিবাস পণ্ডিত" (১২১ পত্র)। এই উলুয়া বংশ কুলাংশে উৎকৃষ্ট নহে। কুলিয়ার শ্রেষ্ঠ বংশে কন্যাদান করিয়া শঙ্করই মর্য্যাদা লাভ করেন, 'অতি-ক্ষেম্য' শব্দদ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের অপর শ্বশুরদ্বয়ের পরিচয় কুলগ্রন্থে গবেষণীয়। আমরা এখনও তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই।

কৃত্তিবাসের পুত্র-পৌত্রাদি : কৃত্তিবাসের অধস্তন বংশলতা কুলপঞ্জী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ ৪০-৪১)। নূতন গবেষণার ফলে তাহার সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। কৃত্তিবাসের পুত্র সংখ্যা ৪ কিম্বা ৫—অর্জুন পাঠক, শ্রীধর, বংশধর ও শঙ্কর। আড়িয়াদহের একটি কুলগ্রন্থে অপর একটি নাম আছে সূর্য্য। পুত্রদের মধ্যে "পাঠক" উপাধিধারী অর্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিদ্বান্ ছিলেন। তৎপুত্র রজনীকর ঘটক। তৎপুত্র বিদ্যানন্দাচার্য্য ও বাণীনাথ "সরখেল"। বিদ্যানন্দের অধস্তন ধারা যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা প্রামাণিক নহে। বিদ্যানন্দের ৩ পুত্র—রমানাথ, চতুরানন ও রামলোচন। অতঃপর কোন নাম অর্জুনের ধারায় কুলগ্রন্থে আর পাওয়া যায় নাই। বিদ্যানন্দাচার্য্যও "কুলিয়া" নিবাসী ছিলেন, এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। "খনিয়া"র চট্টবংশীয় ব্যাসের কুলবিবরণে লিখিত আছে। "ব্যাসস্য বিবাহ মুং বিদ্যানন্দাচার্য্যস্য কন্যা, হানিঃ, কুলিয়া-মধ্যগ্রামবাসী।" উক্ত ব্যাস বিকর্ত্তনের বংশধর এবং আদিকুলীন বহুরূপের দশম পুরুষ অধস্তন (সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ১৭৫ক পত্র)। কুলিয়ার যে পাড়ায় কৃত্তিবাসের বাড়ী ছিল তাহার নাম পাওয়া গেল 'মধ্য-গ্রাম'। বর্ত্তমানে 'মালোপাড়া' কিম্বা 'মালিগাঁ' নামে কোন পাড়া কুলিয়ায় বিদ্যমান আছে কি না, স্থানীয় অনুসন্ধানে নির্ণয় করা আবশ্যক। তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের ভিটি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কৃত্তিবাসের কন্যা : কৃত্তিবাসের ৪ কন্যার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। আড়িয়াদহ ও রাজসাহির পুথি অনুসারে একটি কন্যা "অদত্তা বহির্গতা"। আমাদের নিকট রক্ষিত পুথিতে অপর এক কন্যা "অপাত্রস্থা, গজেন্দ্র রায়ে বিবাহ, হানিঃ।" গজেন্দ্র রায় সম্ভবতঃ "দক্ষবাটী" অর্থাৎ গোড়ারি শ্রোত্রিয় বাদশাহের উজীর হইতে অভিন্ন, শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিয়া

কৃত্তিবাসের কুলহানি হয়। কৃত্তিবাসের "অপরা কন্যাবর ধৃতিকরজটেন নীতা, হানি" (পরিষদের উক্ত পুথি ৪২৭ খ পত্র)। ধৃতি-করজটের পরিচয় অজ্ঞাত, ধৃতিকর নামে মাঘাদিকাব্যের একজন প্রাচীন টীকাকার ছিলেন, তিনি অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। আমাদের নিকট রক্ষিত "ঘটক-কেশরী"র কুলগ্রন্থানুসারে কৃত্তিবাসের কুলনাশ হওয়ার পূর্বেই তাঁহার এক পৌত্র শঙ্কর-সুত কালিদাসের বিবাহ হইয়াছিল (সা-প-প, ১৩৪৪, পৃ-১১৬-৮)। সুতরাং কৃত্তিবাস দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন প্রমাণ হয়। কৃত্তিবাসের কন্যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া অনুমান হয় কবি সম্ভবতঃ কৌলীন্যপ্রথার সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ: সম্প্রতি একাধিক নূতন নির্দেশ আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে জটিল সমস্যার মীমাংসা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। দুইটী মাত্র মূল্যবান তথ্য আমরা আলোচনা করিলাম।

(১) কৃত্তিবাসের শ্বশুর "উন্দুরা" বংশীয় পূর্ব্বোল্লিখিত শঙ্করের এক ভাই ছিলেন "উৎসাহ"। এই উৎসাহের বৃদ্ধপৌত্রই বিখ্যাত নৈয়ায়িক "কণাদ তর্কবাগীশ"। বংশলতা যথা, উৎসাহ—শ্রীরঙ্গ—সুরেশ্বর—কুমুদানন্দ—কণাদ। কণাদ তর্কবাগীশ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ও রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। (৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ J. A. S. B., 1915, p. 276 এবং Vidyabhusana : Hist, of Indian Logic, p. 466 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) এই প্রবাদের সমর্থন আমরা কণাদ-রচিত অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য চিন্তামণিটীকার অনুমান খণ্ডের প্রতিলিপিতে আবিষ্কার করিয়াছি। ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে আছে

সার্ব্বভৌম-পদাম্ভোজভ্রমরীকৃত মৌলিনা।
অনুমান মণিব্যাখ্যা শ্রীকণাদেন তন্যতে॥

কণাদ পরে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। (সা-প-প, ১৩৫১, পৃঃ ৭০) শিরোমণির জন্মাব্দ আমরা ১৪৬০-৬৫ খ্রীঃ মধ্যে অনুমান করিয়াছি (ঐ, ১৩৫০, পৃ. ১৩-১৫) এবং তাহার সমর্থক প্রমাণ সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিরোমণি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, তাহারও লিখিত এবং উৎকৃষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং কণাদের জন্মাব্দ ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না। তাঁহার প্রপিতামহের ভগিনীপতি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্মাব্দও ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে। কারণ, একপুরুষের গড়পড়তা ৩৫ বৎসর বলিয়া আমরা নির্ণয় করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১১৮)। ঊর্দ্ধমুখী গণনায় একটি-মাত্র সূত্র এখানে আলোচিত হইল। অধোমুখী গণনারও একটি নবাবিষ্কৃত উৎকৃষ্ট সূত্র আলোচনার যোগ্য।

(২) কৃত্তিবাসের পিতামহ "মুরারি ওঝা" ৩৪ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তাঁহার সমকালীন অপর দুই জন কুলীনের নাম উল্লেখ করিতে হইবে—একজন 'বৃহদ্বঙ্গপাল'-বংশীয় "বাসু" এবং অপর একজন 'কাঞ্জি'-বংশীয় "কুবের"। ইঁহারা তিনজনই প্রথম কুলীন হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। বংশলতা যথা ;—(বন্ধনী মধ্যে সমীকরণের সংখ্যা লিখিত হইল)।

(ক) আহিত (১)—উৎসো (৪)—শিরো (৭)—নরসিংহ (১৪)—গর্ভেশ্বর (২১)—মুরারি। (খ) মহেশ্বর (১)—মহাদেব (৪)—দুর্ব্বলি (৭) মুকুন্দ (১৩)—উৎসাহ (২০)—বাসু। (গ) কৃষ্ণ (২)—চান্দো (৬)—ভৈরী (৮)—মধু (×)—রবি (২৩)—কুবের।

উক্ত বাসুর সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—"বাসুকন্যা ন্যূন কাং কুবের রাজপণ্ডিত, তৎসুতৌ সুদর্শন-কৃষ্ণৌ।" (পরিষদের পূর্ব্বোল্লিখিত পুথির ৫৪ ক পত্র) 'কাং' অর্থাৎ কাঞ্জিবিল্লী বংশে দুই জন কুবেরের নাম পাওয়া যায়—প্রথম কুলীন কুতূহলের পুত্র এবং উল্লিখিত রবির পুত্র। বাসুর কুলক্রিয়া যে দ্বিতীয় কুবেরের সহিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। তাঁহার "রাজপণ্ডিত" উপাধিটি এখানে লিপিবদ্ধ হওয়ায় অতি মূল্যবান্ একটি তথ্য আবিষ্কৃত হইল। কারণ "কাঞ্জিবিল্লীয় কুবের রাজপণ্ডিত" শূলপাণি প্রভৃতিরও পূর্ব্ববর্ত্তী একজন প্রামাণিক স্মার্ত্ত গ্রন্থকার ছিলেন। হরিদাস তর্কাচার্য্য, গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দন তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলভদ্রের "অশৌচসার" গ্রন্থে "কাঞ্জিবল্লীয়-সৎপণ্ডিত কুবের শর্ম্মার" সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ এই কুবেরকৃত একটি গ্রন্থের রচনাকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি "নবাশ্বিযুগ্মেন্দুমিতে শকাব্দে" অর্থাৎ ১২২৯ শকে (১৩০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে) ভাস্বতীকরণের বৃত্তি রচনা করেন। গ্রন্থ মধ্যে তদ্রচিত "সময় সার"" গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং পুষ্পিকায় আছে "ইতি কাঞ্জিবিল্লীয়-রাজপণ্ডিত-শ্রীকুবেরশর্ম্মবিরচিতা ভাস্বতীব্যাখ্যা সমাপ্তা।" (Indian Culture vol X1, pp. 33-36 দ্রষ্টব্য) উভয় কুবের যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। গ্রন্থরচনা কালে তাঁহার বয়স ন্যূনকল্পে ২৭ ধরিয়া তাঁহার জন্মাব্দ হয় ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ। মুরারি ওঝার জন্মাব্দও কিছুতেই তাহার পরে যাইবে না। কৃত্তিবাসের জন্মকালে তিনি জীবিত ছিলেন এবং তৎকালে তাঁহার বয়স ১০০ বৎসর ধরিলেও উক্ত জন্মকাল ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না। সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৩৫০—১৩৭৫ খ্রী-মধ্যে) কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ নির্ণয় করিতে হইবে। আত্মবিবরণী অনুসারে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস। উক্ত সময় মধ্যে গণনা দ্বারা তিনটি মাত্র বৎসরে এই যোগ পাওয়া যায়।

(১) ১৩৫২ খ্রী, ২২ জানুয়ারি—২৩ মাঘ, রবিবার, শুক্লা পঞ্চমী ২২।৪৫ পল। (২) ১৩৭২, ১১ জানুয়ারি—১৫ মাঘ, রবিবার শুক্লা পঞ্চমী ৫২।৪৫ পল। (৩) ১৩৭৫, ৭ জানুয়ারি—১১ মাঘ, শুক্লা পঞ্চমী ৪৮।৪৫ পল।

তন্মধ্যে ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। এতদনুসারে "গৌড়েশ্বর" (রাজা গণেশের) সভায় অভ্যর্থনাকালে তাঁহার বয়স হয় প্রায় ৪৫। পাঠসমাপনের অব্যবহিত পরেই তিনি রাজদর্শন করেন এইরূপ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পরিশেষে, আমরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের আলোচনা সাদরে আহ্বান করিতেছি। কৃত্তিবাস বাঙ্গলার জাতীয় কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তাঁহার জন্মাব্দ নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হওয়া কর্তব্য। তাঁহার জন্মস্থান ফুলিয়ায় যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে জন্মাব্দ "১৪৪০ খৃষ্টাব্দ" বলিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার সংশোধন আবশ্যক। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর মূল গ্রন্থটি দেখিবার জন্ম বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে বহু সাহিত্যিক চেষ্টা করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম বোধ হয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (সা-প-প, ১৩০৪, পৃঃ ১১৭-৪২)। কিন্তু রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের মূল প্রতিলিপি সমূহ এখন দুষ্প্রাপ্য নহে, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের স্বরচিত বিবরণ অপেক্ষাও অধিকতর ও নূতন তথ্য যে নিহিত রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধানে কাহাকেও ব্যাপৃত হইতে দেখা যায় না। কুলগ্রন্থের প্রতি এই অনাদর নানা কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের ধারণা প্রচলিত মুদ্রিত কুলগ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া গবেষকগণ মূল গ্রন্থের আলোচনা করিলে এই অনাদর পরমাদরে পরিণত হইবে। আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি।

বিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে এম-এসসি

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, জ্যোতিষের সিদ্ধান্তসমূহ পরীক্ষণ হইলেও বিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষীর মতবাদ পরীক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া গাণিতিক ভিত্তিতে কতকগুলি অনুমান মাত্র।

বিশ্বে মহাশূন্যমধ্যে স্থানে স্থানে পদার্থ নাক্ষত্রজগৎরূপে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। প্রথমে নাক্ষত্রজগৎ কি তাহা জানা দরকার। আমরা জানি নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকে এক একটি ছোট বড় সূর্য্য—ইহাদের আয়তনের পার্থক্য যথেষ্ট হইলেও বস্তুমান বা পদার্থ সমাবেশ সকল নক্ষত্রেই প্রায় সমান। দুইটি নক্ষত্রের মধ্যে নূতনতম দূরত্ব ৪ আলোকবৎসর* অর্থাৎ আলো, প্রতি সেকেণ্ড ১,৮৬০০০ মাইল ছুটিয়া এক নক্ষত্র হইতে তাহার নিকটতম নক্ষত্রে যাইতে ৪ বৎসর সময় অতিবাহিত করে। এরকম প্রায় দশ সহস্র কোটি নক্ষত্রের একত্র সমাবেশে একটা নক্ষত্র-জগৎ—মহাসমুদ্রে যেন বহু দ্বীপ লইয়া গঠিত একটা দ্বীপপুঞ্জ। তারপর মহাব্যোমে তাহার চতুঃসীমানার মধ্যে আর কিছুই নাই। একটি নাক্ষত্রজগৎ যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার তুলনায় বহুগুণ দূরে আবার এরকম নাক্ষত্র জগৎ। কোন নাক্ষত্রজগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব অন্ততঃ ৫০ হাজার আলোক বৎসর; কিন্তু এক নাক্ষত্র জগৎ হইতে নিকটতম নাক্ষত্রজগতের দূরত্ব ইহার প্রায় ৮।১০ গুণ। অনুমান করা যায় প্রায় দশ সহস্র কোটি নাক্ষত্রজগৎ লইয়া বিশ্ব। আমরা যে নাক্ষত্র জগতে আছি—তাহাকে ছায়াপথ সমন্বিত নাক্ষত্রজগৎ বলা হয়। ছায়াপথের বহু কোটি নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের সঙ্গে একই নাক্ষত্রজগতের অধিবাসী, বড় দূরবীণ দিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে পাতলা মেঘের টুকরার মত আলোকচিহ্ন সব দেখা যায়; ইহাদের সাধারণ নাম নীহারিকা। ইহাদের বেশির ভাগেরই কুণ্ডলীপাকান আকৃতি। এই কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলি এক একটা নাক্ষত্রজগৎ। এণ্ড্রোমিডা মণ্ডলের দিকে তাকাইলে আমাদের নিকটতম নাক্ষত্রজগৎ এণ্ড্রোমিডা নীহারিকাকে পাতলা একটু মেঘের মত দেখা যায়। ইহা হইতে আমাদের নিকট আলো আসিতে ৮ লক্ষ বৎসর সময় লাগে। এই নাক্ষত্রজগৎগুলি ঘূর্ণায়মান। প্রত্যেক নাক্ষত্রজগতে গ্যাসও আছে, এই সমস্ত বিষয় জ্যোতিষীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

বিশ্বের পদার্থনিচয় যদি সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে বিশ্বকে নিতান্তই ফাঁকা দেখাইবে। তখন এক ঘন ইঞ্চি পরিমাণ বাতাসই ৭ লক্ষ কোটি ঘন মাইল জুড়িয়া ফেলিবে। নাক্ষত্রজগৎগুলি পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে এইজন্ম বিশ্বে পদার্থের গড় ঘনাঙ্ক (density) ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। কয়েকশত কোটিবর্ষ পূর্ব্বে এই গড় ঘনাঙ্ক বর্ত্তমানের সহস্রগুণ ছিল। তথাপি ইহা নিতান্তই নগণ্য। আমরা অনুমান করিতে পারি যে একসময়ে পদার্থনিচয় গ্যাসীয় অবস্থায় সমগ্র বিশ্বে সমভাবে ছড়াইয়া ছিল। ইহা আমাদের নিছক অনুমান—আমাদের সম্মুখে বিশ্বের অতীত অবস্থার একটা রূপ উপস্থাপিত করে। এই অবস্থারই পরিণতি আমরা পর্য্যালোচনা করিব।

পদার্থ ঠিক সমভাবে ছড়ান থাকিলে এই অবস্থা চিরকালই চলিতে পারিত। কিন্তু ইহার সামান্ত ব্যতিক্রমেই যেখানে ঘনাঙ্ক সেখানে আরও পদার্থ পুঞ্জীভূত হইতে চেষ্টা পাইবে। বস্তুকণাগুলি পুনঃ ছড়াইয়া পড়িতে না পায় এমন প্রবলতর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন হইতে হইলে বস্তুপুঞ্জের তর সূর্য্যের বহু কোটি গুণ হওয়া দরকার। এই রকম বস্তু সমাবেশেই এক একটা নাক্ষত্রজগতের উপাদান।

এই আদি নাক্ষত্রজগৎগুলির যে কিছু ঘূর্ণনবেগ ছিল ইহাও অনুমান করা যায়। প্রত্যেক আদি নাক্ষত্রজগতের মধ্যে বস্তুকণাগুলি ক্রমশঃ ঘন সন্নিবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন গণিতশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী এই আদি নাক্ষত্রজগৎ বা নীহারিকার ঘূর্ণন বেগ বাড়িতে লাগিল এবং দুই

* এক বৎসরে আলোক যতদূর ভ্রমণ করে সেই দূরত্বকে অর্থাৎ প্রায় ৬×১০^{১২} বা ছয় কোটি মাইল দূরত্বকে এক আলোক বৎসর বলে।

প্রান্ত চাপা হইয়া পড়িল। আরও বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয় চাপা প্রান্ত হইতে সমদূরে বিষুব প্রদেশ হইতে পদার্থ বিস্তারিত হইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু প্রতিবেশী অন্য নীহারিকার আকর্ষণের ফলে পদার্থ চারিদিকে সমভাবে বিচ্ছুরিত না হইয়া দুই বিপরীত দিকে বাহির হইতে থাকে। কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলিতে এরকম ঘটনাই দেখা যায়। কিন্তু গ্যাসের প্রকাণ্ড পিণ্ডের ঘূর্ণন হেতু তাহার যতরকম পরিণতি গণিতশাস্ত্র মতে সম্ভব মহাকাশে সেই সবরকম নাক্ষত্রজগৎই মিলে। যাহা হউক, এই যে নীহারিকা—ইহার সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব বাড়িতে লাগিল এবং পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে নীহারিকার মধ্যেই আবার বস্তুপুঞ্জ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই পুঞ্জীভূত পদার্থের ভর সূর্য্যের সম পরিমাণ হইলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বস্তুকণাগুলিকে পুনঃ মিলাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিতে পারে। অতএব নক্ষত্রগুলির জন্ম এই রকমেই হইয়াছে ইহা বলা অসঙ্গত নয়। এই নক্ষত্রগঠন সম্ভবতঃ দুই স্তরে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে নক্ষত্রপুঞ্জ গঠনোপযোগী বস্তুপুঞ্জ একজায়গায় মিলিত হইয়াছে, পরে তাহা হইতে পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্রের জন্ম হইয়াছে। তবে পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্র যে আদি নীহারিকা হইতে একবারেই গঠিত হইতে পারে না তাহা নয়।

বহু তারাই যুগ্ম. এই যুগ্ম তারা দুই রকমে গঠিত হইতে পারে। নীহারিকাতে যখন ক্ষুদ্রতর গ্যাসের পিণ্ড গঠিত হয় তাহার কেন্দ্রের দিকে ঘনাঙ্ক বেশি হইলে ঘূর্ণনের ফলে বিষুববৃত্তের চারিদিকে পদার্থ বিচ্ছুরিত হইয়া ইহা আকাশে মিলাইয়া যায়। কিংবা ঐ গ্যাসপিণ্ড বা নক্ষত্রের চারিদিকে একটা বস্তুকণার আবরণরূপে বিরাজ করে। বহু তারার চারিদিকে এইরকম বস্তুকণার আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে গঠিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু কেন্দ্রের দিকে ঘনাঙ্ক বেশি না হইলে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা চাপা গোলকাকৃতি হইতে হইতে বেলুনের আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ মধ্য স্থলে সরু হইয়া উঠে এবং ডাম্বেলের মত হয়। সর্ব্বশেষে পিণ্ডটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পরস্পর কাছাকাছি থাকিয়া একে অন্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। আর এক রকম যুগ্ম তারা আছে যাহারা বহুদূরে থাকিয়া পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণের জোরে একে অন্যের চারিদিকে ঘুরে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গঠিত হয় নাই। সম্ভবতঃ আদি নাক্ষত্রজগতে নক্ষত্র গঠিত হইবার কালে দুইটি পিণ্ড এমন কাছাকাছি ছিল যে তাহারা পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে বাঁধা পড়িয়া পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

প্রাথমিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্র সৃষ্টির অবস্থা পর্য্যন্ত আমরা পর্য্যালোচনা করিলাম। এই পর্য্যালোচনায় নক্ষত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর জড়পিণ্ডের উৎপত্তি-সম্ভাবনা দেখা যায় না। এখন প্রশ্ন, সৌরজগতের মত গ্রহসমন্বিত নক্ষত্র আর আছে কিনা এবং এই সৌরজগতের উৎপত্তিই বা কেমন করিয়া হইল? সৌরজগৎ সম্বন্ধে অধুনা প্রচলিত মতবাদ এই যে, অন্য একটি নক্ষত্র মহাশূন্যে ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ সূর্যের নিকটে আসিয়া পড়ে অথচ এমন কাছাকাছি নয় যে একটি অপরটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বাঁধা পড়িতে পারে, এই নক্ষত্র সন্নিহিত হইবার কালে তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সূর্য্যপৃষ্ঠে প্রকাণ্ড জোয়ার উৎপন্ন হইয়া আগন্তুক নক্ষত্রের দিকে সূর্য্যের অনেকটা অংশ কাঁপিয়া উঠিল। নক্ষত্রটি সূর্য্যের নিকটতর হইলে কাঁপা অংশ সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং নিকটতম অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পদার্থ টানিয়া লইল। তারপর সে তাহার গন্তব্যপথে যাইবার কালে যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল সূর্য্যের এই উচ্ছ্বাস ও বস্তু উদগীরণ ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। ফলে বর্ম্মা চুরুটের মত একটা বিচ্ছিন্ন অংশ রহিয়া গেল। এই বিচ্ছিন্ন অংশ দ্রুত শীতল হইতে লাগিল এবং প্রথমে দুইপ্রান্ত তরল অবস্থায় আসিল। পরে স্বতন্ত্র এক একটি বস্তু পিণ্ড গঠিত হইতে লাগিল। অধিকতর বস্তুমান বিশিষ্ট অংশ হইতে ক্ষুদ্রতর পিণ্ড উৎপন্ন হইল। বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি ও শনিকে যে আমরা মধ্যভাগে দেখিতে পাই, আর ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলিকে তাহাদের দুইদিকে দেখি ইহাই আমাদের প্রত্যাশিত। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলি জন্ম হইতেই তরল অবস্থায় এমন কি কঠিন অবস্থায় ছিল, আর বৃহত্তম দুইটি আদিতে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। সূর্য্যের আকর্ষণের ফলে গ্রহমধ্যে জোয়ার উৎপন্ন হইয়া অনুরূপে উপগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু এইভাবে গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্ট হইয়া থাকিলে নাক্ষত্রজগৎগুলিতে গ্রহসমন্বিত নক্ষত্রের সংখ্যা খুবই কম হওয়ার কথা। দুইটি নক্ষত্রের পক্ষে উপরোক্ত প্রকারে গ্রহ সৃষ্টির অনুকূল সান্নিধ্যে আসা একটি বিরল ঘটনা। একটা নক্ষত্র জগতে লক্ষ লক্ষ বৎসরে এমন একটি ঘটনা ঘটিতে পারে কি না সন্দেহ। তবে নক্ষত্রদের মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব একসময়ে যখন তাহারা নিকটতর অবস্থায় ছিল তখন এরূপ ঘটনা বেশি পরিমাণে ঘটা অসম্ভব ছিল না, সেজন্য অনেক নক্ষত্রেরই গ্রহ নাই একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

বিশ্বের অতীত কি আমরা দেখিলাম, এখন তাহার ভবিষ্যৎ কি দেখা যাউক। প্রথমেই আসে আমাদের পৃথিবীর কথা, জন্মিলেই মৃত্যু—পৃথিবীরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তবে সে মৃত্যু হিমশীতল রূপ লইয়া পৃথিবীর পরিণত বয়সে তাহাকে আচ্ছন্ন করিবে অথবা অপরিণত বয়সে অগ্নিমূর্ত্তিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহার অপমৃত্যু ঘটাইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমরা জানি পৃথিবী সূর্য্যের নিকট হইতে আলো ও তাপ পাইয়াই জীবন রসে সমৃদ্ধ। মাতার দেহশোণিত যেমন স্তনদুগ্ধরূপে ক্ষরিত হইয়া শিশুকে পোষণ করে তেমনই সূর্য্যের দেহ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ দশ কোটি মণ পদার্থ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া কন্যা ধরিত্রীকে আলো ও তাপ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই হেতু সূর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে কিছু তাপ হারাইতেছে। আমাদের পৃথিবীও তাই ক্রমশঃ একটু একটু শীতল হইয়া পড়িতেছে—যদিও আমাদের পরিমাপে তাহা ধরা পড়ে, কম। সূর্য্যের ভিতর পরমাণু ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অথবা হাইড্রোজেন পরমাণু হইতে যৌগিক পরমাণু গঠিত হইয়া এইতাপ যোগান সম্ভব হইতেছে। যদি পরমাণু ভাঙ্গার দরুণ আমরা তাপ পাই, তবে পৃথিবী এখনও সদ্যোজাত

শিশুমাত্র; তাহার পরমায়ুর বহর আরও কোটি বৎসর। যৌগিক পরমাণু সৃষ্টির দরুণ তাপ আসিলে ধরিত্রী এখন কয়েক বৎসরের বালিকা। এদিক দিয়া পৃথিবীর মৃত্যুর কথা ভাবিয়া আমাদের চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই।

এবার তাহার অপমৃত্যুর দিকটা বিবেচনা করা যাউক। দেখা যায় আকাশে হঠাৎ একটা নক্ষত্র ফাটিয়া পড়ে—ইহাকে বলা হয় 'নোভা' বা নবনক্ষত্র।* প্রত্যেক নক্ষত্রকেই তাহার জীবনে একবার এই অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। আমাদের সূর্য্য এখন এই অবস্থার ভিতর দিয়া যায় নাই। যখন সূর্য্য তদুপযোগী হইবে তখন হঠাৎ একদিন সে ফাটিয়া পড়িবে, কয়েকদিনে এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার তাপের মাত্রা এমন বাড়িয়া যাইবে যে জীবনের চিহ্ন মাত্র ধরা হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, বননগর ভস্ম হইয়া যাইবে, আর সূর্য্য অতিদ্রুত স্ফীত হইয়া পৃথিবীকে পর্য্যন্ত কবলিত করিয়া ফেলিবে। কাজেই মনে হয়, পৃথিবী তাহার জীবনের খেলা শেষ করিবার আগেই একদিন অকস্মাৎ অপমৃত্যুর কবলে পড়িয়া যাইবে।

এখন আমরা নাক্ষত্রজগৎগুলি তথা সমগ্রবিশ্বের পরিণাম বিচারকরিয়া দেখিব। নক্ষত্রের জীবনধারা পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা তাহার শক্তির উৎস—যাহার প্রভাবে সে তাপও আলোকে বিকীরণ করে—খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। এই শক্তির উৎস যাহাই হউক না কেন, একদিন তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন নক্ষত্র আর তাপ ও আলোক বিকীরণ করিবে না। তাপ ও আলোক বিকীরণ করিতে করিতে নক্ষত্র তাহার ভর হারাইতেছে অর্থাৎ তাহার ভিতরকার পদার্থ মিলাইয়া যাইতেছে। আর বিকীর্ণ তাপ মহাশূন্যে জমিয়া উঠিতেছে। এই আলো ও তাপ মহাশূন্যে অব্যাহতভাবেই ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু যখন ইহা বস্তুকণার উপর গিয়া পড়ে—সে বস্তুকণা পরমাণু, বৈদ্যুতিক কিম্বা যে কোন জড়কণাই হউক—তখন তাহার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া যায়। সুতরাং শেষপর্য্যন্ত তাহারা অতিদীর্ঘ বেতার তরঙ্গের মত তরঙ্গে পর্য্যবসিত হইবে।

বিশ্বে শক্তির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট; আরও সঠিকভাবে বলিতে হয় যে পদার্থ ও শক্তির মিলিত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। এই শক্তি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। জল যখন নীচে নামে তখন শক্তি সংগ্রহ করে। সেই শক্তির সাহায্যে আমরা আবার জল উপরে উঠাইতে পারি, কিন্তু যতটুকু জল নামিয়া ছিল ঠিক ততটুকু পারি না—কিছুটা শক্তি এমনভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে যে তাহাকে কাজে লাগান যায় না। অনবরত শক্তির কিছুটা অংশ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং এমন একদিন আসিবে যেদিন কাজে লাগাইবার উপযুক্ত শক্তি আর পাওয়া যাইবে না। শক্তির পরিমাণ অক্ষুণ্ণই আছে কিন্তু রূপান্তর আর সম্ভব নয়। তখন সমগ্র বিশ্বে তাপসাম্য উপস্থিত হইবে আর এই সাম্যই হইবে বিশ্বের পক্ষে মারাত্মক।

এখানেও কোন কোন বৈজ্ঞানিক আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইতেছেন। আমরা বাস করিতেছি স্ফীত হইতেছে এইরকম বিশ্বে এবং এই অবস্থাতেই শক্তি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। বিশ্ব যদি সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে তবে শক্তির পদার্থে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। দৈবক্রমে যে যুগে বিশ্ব স্ফীত হইতেছে আমরা সেইযুগে বাস করিতেছি। বিশ্ব স্ফীত হইতে হইতে একটা চরম অবস্থায় পৌছিয়া আবার সঙ্কুচিত হইতে পারে, তখন মহাপ্রলয়ের পর আবার নবসৃষ্টি।

---

* পূর্ব্বে ইহাদের আবির্ভাবকে নব আবির্ভাব মনে করিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল এবং এখনও সেই নামে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হয়।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

পাট

পাট বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থকরী ফসল। প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী কৃষক পাটচাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বর্ষার পচা জলে দিন কাটাইয়া পাটচাষ করিতে হয়। এত কষ্ট করিয়া যাহারা এই সোনার ফসল উৎপাদন করে, তাহাদের অদৃষ্টে কিন্তু দুইবেলা অন্নও জুটে না। অথচ পাট লইয়া যাহারা কাজকারবার করে, কলওয়ালা, আড়তদার, দালাল প্রভৃতি সকলেই যথেষ্ট মুনাফা লুটিয়া থাকে। কৃষকেরা যে পাটচাষ করিয়া বিশেষ কিছু পায় না, তাহার কারণ তাহাদের দুরবস্থা ও শিক্ষার অভাব এবং গভর্ণমেন্টের ঔদাসীন্য। পাটকলওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ ও অর্থবান, দালালরা বুদ্ধিজীবী; ইহাদের চক্রান্তে পড়িয়া চাষী একেবারে কোণঠাসা হইয়া যায়। অভাবের সুযোগ লইয়া ব্যাপারীরা চাষীদের নামমাত্র দাদনের বিনিময়ে ফসলের উপর অধিকার বিস্তার করে। তাছাড়া চাষীরা ভালমন্দ বোঝে না বলিয়া ভাল ভাল পাট এজেন্টরা গলার জোরে খারাপ শ্রেণীর বলিয়া চালাইয়া সস্তায় কিনিয়া লয়। সবচেয়ে বড় কথা, যখন বর্ষান্তে পাট ওঠে, মিলমালিকদের পক্ষ হইতে ঔদাসীনতা দেখাইয়া চাহিদা হ্রাসের অভিনয় করা হয়; অশিক্ষিত চাষী এই ধাঁওতায় ভুলিয়া অভাবের তাড়নায় যেকোন দরে পাট বেচিয়া ফেলে। মোটের উপর পাটচাষী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মরশুম হিসাবে পাট ধরিয়া রাখিতে

পারিত অথবা গভর্ণমেন্ট যদি ধর্মগোলা স্থাপন করিয়া সমবায় নীতি অনুসারে কাঁচা পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার পাটচাষীদের অদৃষ্ট অবশ্যই ফিরিয়া যাইত।

কলিকাতার আশে পাশে হুগলী নদীর দুইধারে যে শতাধিক পাটকল বিশ্বব্যাপী পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা মিটাইয়া অবিশ্রান্ত মুনাফা লাভ করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশের মালিকই ইয়োরোপীয়েরা। বাঙ্গলায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এই সব ইউরোপীয়দের স্বার্থরক্ষা যে গভর্ণমেন্টের পাটনীতির মূল কথা ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সুরু হইবার পর অবশ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন সকলেই আশা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। গত ১০ বৎসরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই বাঙ্গলায় মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত আছে। পাটচাষীদের অধিকাংশই জাতিতে মুসলমান। মুসলীম লীগ কিন্তু এই চাষীদের ভোটের জোরে গদী দখল করিয়াও তাহাদের কল্যাণসাধনের উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। লীগ মন্ত্রীসভার এই উদাসীনতার কারণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৩০টি ইউরোপীয় সদস্যের ভোট। পাটচাষীদের আর্থিক উন্নতি করার অর্থ পাটকলওয়ালাদের লাভের অঙ্ক কিছুটা কমানো এবং এ ব্যবস্থা হইলে পরিষদের ইউরোপীয় সম্প্রদায় যে লীগ মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করিবেন না, লীগদল ইহা ভাল করিয়াই জানে।

যুদ্ধের সময় ভারতীয় পাটের রপ্তানী বহুলাংশে কমিয়া যায়; কিন্তু যুধ্যমান ভারতসরকার সেই সময় পাটের ও পাটজাত দ্রব্যের বড় রকমের খরিদ্দার হইয়া দাঁড়ান। চট, থলে প্রভৃতির উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে তাঁহারা ১৯৪৪ সালের মে মাসে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এক অর্ডিনান্স জারি করিয়া শ্রেণী হিসাবে পাটের সর্ব্বনিম্ন দর ১১ টাকা হইতে ১৭ টাকায় বাঁধিয়া দিলেন। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যাভাবে বাঙ্গালী তখন হৃতসর্ব্বস্ব, ১৯৪৩ সালের বহু লক্ষ লোকক্ষয়কারী ভীষণ দুর্ভিক্ষের জের তখনও চলিতেছে, চাহিদা বেশী থাকায় কাঁচা পাটের মূল্য-রেখা বাড়াইয়া দিতে ভারত সরকার অনায়াসেই পারিতেন, কিন্তু পাটকলওয়ালাদের সুবিধার জন্য তাহা তাঁহারা করেন নাই। বাঙ্গলায় তখন খাজা নাজিমুদ্দিন পরিচালিত লীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত। পাটমূল্য এইরূপ অন্যায় হারে নির্দ্ধারণ করিলে চাষীদের সমূহ ক্ষতি হইবে জানিয়াও নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা ভারত সরকারকে সমর্থনই করিলেন।

তারপর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষের সঙ্গে সঙ্গে পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মেয়াদও শেষ হইয়াছে। ১লা অক্টোবর হইতে প্রকৃতপক্ষে পাটের অন্তর্দ্দেশীয় নিয়ন্ত্রণ ভার পড়িয়াছে প্রাদেশিক সরকারের উপর। এই সময় কেন্দ্রে পণ্ডিত নেহেরু পরিচালিত অন্তর্বর্ত্তী সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন; কাজেই আশা করা স্বাভাবিক যে, পাট সম্বন্ধে সরকারী নীতি এইবার পাটচাষীদেরই অনুকূলে যাইবে। পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিনান্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অন্তর্বর্ত্তী সরকার অন্ততঃ আরও কিছুদিন পাটের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এই ইচ্ছার কারণ ছিল দুইটি। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে এখন শোচনীয় খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে আর্জেন্টিনাদি পৃথিবীর উদ্বৃত্ত দেশসমূহ হইতে ভারতে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে সব দেশ ভারতকে খাদ্য সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে এই সাহায্যের পরিবর্ত্তে ভারতের শ্রেষ্ঠ রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য পাট বা পাটজাত দ্রব্য চাহিদানুসারে বিক্রয় করিতে হইবে এবং এই বিক্রয়ে অন্যায় মুনাফাবৃত্তি চলিবে না। এইজন্যই ভারত সরকার মুনাফাখোর মিলওয়ালাদের যথেচ্ছাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধোত্তর কালেও পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলার গরীব পাটচাষীদের কথাও তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরিষ্কার বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধকালীন ১১ টাকা হইতে ১৭ টাকা দরের তুলনায় অধিকতর উচ্চ হারে তাঁহারা পাটের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দিতে প্রস্তুত। যুদ্ধ শেষ হইলেও ভোগ্যপণ্যের চড়া বাজার শেষ হয় নাই, সঙ্ঘবদ্ধ, অর্থবান ও ফন্দীবাজ মিলমালিক এবং দালাল বা এজেন্টদের কাঁচা পাটের জন্য উচ্চতর হারে মূল্য প্রদানে বাধ্য করিতে হইলে বর্ত্তমানে পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক বলিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার মনে করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকারের কিন্তু এ ব্যবস্থা পছন্দ হয় নাই। চাষীদের কাঁচা পাটের জন্য বেশী টাকা দিবার বাধ্যবাধকতা থাকিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার আত্মস্বার্থে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে পাটকলওয়ালাদের যুদ্ধকালীন মুনাফার হার সংরক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং বিদেশী কলওয়ালাদের দেশী চাষীদের স্বার্থে এই ত্যাগস্বীকারে রাজী না হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যগণ পাটকলওয়ালাদের স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখেন এবং বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীও এই শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের হাতে রাখিতে কৃষকবন্ধু সাজিয়া ঘোষণা করিলেন যে, এবার আর তাঁহারা পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন না। তাঁহারা জানাইলেন যে, তাঁহাদের মতে খোলা বাজারে পাট বেচিতে পারিলে পৃথিবীজোড়া চাহিদার জন্য এবৎসর পাটচাষীরা এমনই অনেক বেশী লাভবান হইবেন। উৎসাহী লীগপন্থীরা এই সুযোগে বাঙ্গলার পাটচাষীদের নাম করিয়া পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক নেহেরু সরকারকে একবার প্রাণ ভরিয়া গালাগালিও দিয়া লইলেন। পাটমূল্য সম্পর্কে সুসমঞ্জস একটি নীতি স্থির করিবার জন্য অন্তর্বর্ত্তী সরকার গত ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও বাঙ্গলা এই চারিটি পাট উৎপাদক প্রদেশের সরকারী প্রতিনিধিবর্গের এবং মিলমালিক ও পাটচাষীদের প্রতিনিধিদের একটি যুক্ত সম্মেলন আহ্বান করেন। বাঙ্গলা সরকার এই সম্মেলনে ইচ্ছা করিয়াই কোন প্রতিনিধি পাঠান নাই। ইহার পর গত ১২ই অক্টোবর দিল্লীতে বসিয়া বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দি প্রকাশ্যভাবে পাটের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত অসহযোগিতার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়া কৃষকদিগকে মরশুম হিসাবে পাট ধরিয়া রাখিবার ঢালোয়া পরামর্শ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গরীব বুভুক্ষু চাষীদের সরকারী সাহায্য না করিলে তাঁহাদের পক্ষে

হাতের পাট ভবিষ্যতে বেচিবার জন্ত ধরিয়া রাখা কেমন করিয়া সম্ভব, মিঃ সুরাবর্দি সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন শেষ পর্য্যন্ত বাঙলা সরকারের সহযোগিতা পাইলেন না, তখন অগত্যা তাঁহারা ১লা অক্টোবর হইতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী মূল্য বাঁধিয়া দিলেন। এই ব্যবস্থায় কিন্তু সুবিধা হইল না। প্রাদেশিক সরকার অন্তর্দেশীয় পাটমূল্য নিয়ন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক পাটের রপ্তানী মূল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ফাটকা বাজারে তেজীভাব দেখা গেলেও কলওয়ালারা অনিশ্চিত বাজারে পাট কিনিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ পাট রপ্তানী ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই বানচাল হইবার উপক্রম করিল।

পাটের রপ্তানী মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই নীতির ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য অবিলম্বেই সাবধান হইয়াছেন। ২৬শে অক্টোবরের এক সরকারী ইস্তাহার মারফৎ ১৯৪৬ সালের পাট রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষার ও ভারতকে সাহায্যকারী পৃথিবীর বিভিন্ন পাট আমদানীকারক দেশকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা ছাড়াও পাটনীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারত সরকার তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর মুদ্রাসঙ্কোচনীতির দিক হইতে লাভবান হইবার আশা করিয়াছিলেন। মিল মালিক বা এজেন্টদের প্রচুর মুনাফা লাভের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইলে মুদ্রাস্ফীতির প্রতাপ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক, যখন শেষ অবধি বাঙলা সরকারের সাহায্যের অভাবে পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি চালু করা বা পাট রপ্তানী ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হইল না, তখন মুদ্রাসঙ্কোচন নীতির উপর জোর দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানীযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাটের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে শুল্ক বাড়াইয়া দিলেন। একখানি অতিরিক্ত গেজেট মারফৎ ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ এ্যাক্ট এ্যামেণ্ডমেণ্ট অর্ডিন্যান্স (১৯৪৬) নামে একটি নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়া রপ্তানী পাটের উপর শুল্ক বাড়ানো হইয়াছে। আগে ৪০০ পাউণ্ড বা প্রায় পাঁচমণ ওজনের কাঁচা পাটের বস্তার জন্য শুল্ক ধরা হইত ১ টাকা ৪ আনা হইতে ৪ টাকা ৮ আনা, এখন এই শুল্ক বাড়াইয়া যথাক্রমে ৪ টাকা ৮ আনা হইতে ১৫ টাকা করা হইয়াছে। আগে ২২৪০ পাউণ্ড বা এক টন ওজনের চটের জন্য রপ্তানী শুল্ক ধরা হইত ২০ টাকা, এখন নূতন আইন অনুসারে ইহা সর্ব্বোচ্চভাবে ৮০ টাকা করা হইয়াছে।

মোটের উপর এখন পাটের উপর হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গিয়াছে। রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য পাটখাতে এখন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব অবশ্যই অনেক বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে পাটের আন্তর্জ্জাতিক চাহিদার হিসাবে মূল্য বৃদ্ধির জন্য কাঁচা পাট বেচিয়া কৃষকদের অধিকতর লাভবান হইবার সম্ভাবনা এবং রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের তথা নিমেয়ার চুক্তির দৌলতে বাঙলাপ্রমুখ প্রাদেশিক সরকারের আয় বাড়িবার ও কার্য্য পরিচালনায় সুবিধা হইবার যথেষ্ট আশা আছে।

অবশ্য একথা না বলিলেও চলিবে যে চাষীদের দু পয়সা বেশী পাওয়াইয়া দিতে হইলে বাঙলা সরকারকে বর্ত্তমান দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। এ পর্য্যন্ত কলওয়ালা, দালাল বা আড়তদারেরা অশিক্ষিত দরিদ্র পাটচাষীদের অবাধে শোষণ করিয়া আসিয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে, চাষীরা উচ্চশ্রেণীর পাট উৎপাদন করিলেও অনেক সময় দালাল বা এজেন্টরা নানাভাবে সেই পাটকে নিম্নশ্রেণীর বলিয়া প্রচার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত গরীব চাষী অপেক্ষা করিতে বা মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না বলিয়া দাম অনেক কম পায়। মরশুম অবধি ধরিয়া রাখিলে পাটের দর সব সময়েই বেশী পাওয়ার কথা, কিন্তু বুভুক্ষু কৃষক পাট কাটিয়াই অভাবের দায়ে যে কোন মূল্যে তাহা বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া যখন পাটের সময় নয়, তখনও চাষীদের দারিদ্র্যের সুবিধা লইয়া এজেন্টরা পরবর্ত্তী ফসলের জন্য দাদন দিয়া থাকে। চরম অনাটনের জন্য এই দাদন গ্রহণ করিয়া অবশেষে চাষীরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজে কাজেই এইসব শোষণ সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে বন্ধ না হইলে পাটচাষীদের আর্থিক উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। এই শোষণ আছে বলিয়াই চাষীদের লাভ কতকটা নিশ্চিত করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে পাটের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস সদস্যবৃন্দও একই কারণে পাটের নিম্নতম দর সম্প্রতি ৪০ টাকা করিবার প্রস্তাব আনেন। বাঙলার লীগ মন্ত্রীসভার এবং পরিষদের লীগ ও ইয়োরোপীয় সদস্যদের প্রতিকূলতাতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যেকালে বাঙলা সরকারের পাটনীতিই কার্য্যকরী হইল, অতঃপর মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভার আমলে বাঙলার এক কোটি নিরন্ন পাটচাষীর (ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান) অবস্থা কিভাবে উন্নীত হয়, তাহা সকলেরই সাগ্রহে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নূতন শিল্পের সংরক্ষণ

ভারতবর্ষ শিল্পজাত ভোগ্য পণ্যাদির জন্য বরাবরই পরমুখাপেক্ষী ছিল। যুদ্ধের সময় বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ থাকায় অথচ ভারতবর্ষ পূর্ব্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের বৃহত্তম ঘাঁটি হইয়া পড়ায় ভারত সরকার সামরিক বিভাগের ভোগ্য পণ্যের চাহিদা মিটাইতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন। অসামরিক দেশবাসীর কথা দূরে যাক, সৈন্যদের প্রয়োজন মিটাইবার মত সঙ্গতিও ভারত সরকারের ছিল না। ভারত সরকার বরাবর এদেশের শিল্পপ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। সম্ভবতঃ বাণিজ্যজীবী ব্রিটেনের জন্য ভারতের বাজার সংরক্ষণের প্রয়াসই এই দুর্নীতির মূল কারণ। যাহা হউক, নিরুপায় ভারত সরকার শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের দায়ে ভারতে নূতন কতকগুলি ভোগ্য-পণ্য উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছিলেন।

এইসব নূতন শিল্পে উৎপন্ন মাল যে অল্প ক্ষেত্রেই অসামরিক দেশবাসীর ভোগে আসিয়াছে, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি।

ফল হইয়াছে এই যে, অবিরাম নিশ্চিত চাহিদার জন্ত প্রথমতঃ এইসব পণ্যের ত্রুটি শোধরাইবার সুযোগ হয় নাই এবং দ্বিতীয়তঃ এইসব জিনিষ দেশের অসামরিক বাজার দখল করিয়া জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় এখন পরিচিত বিদেশী ভোগ্যপণ্যাদি আমদানী সুরু হইয়াছে, এখন মিলিটারী কনট্রাক্ট হইতে ছাড়ান পাওয়া এইসব দেশীয় পণ্যের অন্তর্দ্দেশীয় চাহিদা না হওয়াই স্বাভাবিক।

অথচ একথা না বলিলেও চলিবে যে, যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত এইসব শিল্পকে ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের জন্ত বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। একেবারে নূতন শিল্পের তুলনায় এই শিল্পগুলি তবু কতকটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ইহাদের পরিচালকবর্গের অভিজ্ঞতাও জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

ভারতে এখন পণ্ডিত নেহেরুর পরিচালনায় অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের স্বার্থ সম্পর্কে এই গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গি ভূতপূর্ব্ব ভারত সরকারের তুলনায় অবশ্যই অনেক উদার। ভারতের নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে কিভাবে বাঁচানো যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভারত সরকার সম্প্রতি ট্যারিফ বোর্ডকে এগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিবার নির্দ্দেশ দেন।

ট্যারিফ বোর্ড ১৪টি শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি শেষ করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। এই শিল্পগুলির মধ্যে কোকো পাউডার ও চকোলেট হইতে এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং ফসফেটাদি বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন শিল্প আছে। এইসব শিল্প যাহাতে সস্তায় বিকাইয়া দেশের বাজার দখল করিতে পারে তজ্জন্ত ট্যারিফ বোর্ড ইহাদের কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। বিদেশী পণ্য যাহাতে অসজ্জবদ্ধ দেশী পণ্যকে বাজার হইতে হটাইয়া দিতে না পারে, তজ্জন্ত বিদেশী শিল্পের উপর উচ্চতর হারে কর বসানোও ট্যারিফ বোর্ডের অন্যতম মূল্যবান সুপারিশ।

ভারতে এ পর্য্যন্ত জাতীয় কল্যাণের নামে অনেকগুলি কমিটি ও কমিশন গঠিত হইয়াছে। এইসব কমিটিকমিশন এমন অনেক মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন, সেগুলি কার্য্যকরী হইলে সত্যই ভারতের অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইত। কিন্তু বরাবরই দেখা গিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট কমিটি বা কমিশন বসাইবার সময় যেরূপ উৎসাহ দেখান, রিপোর্টের সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করিতে সেই উৎসাহের শতাংশের একাংশও দেখা যায় না। ইণ্ডিয়ান ফিসকাল কমিশন (১৯২২) বা এক্সটারণাল ক্যাপিটাল কমিটির (১৯২৪) রিপোর্টের পরিণতি এই শ্রেণীর শোচনীয় ঘটনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তবে এবার অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের আমলে ট্যারিফ বোর্ড যে সব শিল্প-সংক্রান্ত রিপোর্ট দিতেছেন, পরিণামে সেগুলি আগের মত উইপোকার পেট ভরাইবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। ভরসার কথা, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্ত লক্ষণীয় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। গত ২৮শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি-খান স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতসরকার অতঃপর ভারতের স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে দেখিবেন, তাহার পর অন্যদেশের কথা বিবেচনা করিবেন। এই ঘোষণা কার্য্যকরী হইলে, অর্থাৎ ভারতের শিল্পপ্রসারের জন্ত ভারতসরকারের সত্যকার দরদ দেখা গেলে ট্যারিফবোর্ডের সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইবে না বলিয়াই আমাদেরও বিশ্বাস। কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া দেশবাসী আশান্বিত ; বলা নিষ্প্রয়োজন এসময় অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ভারতের আর্থিক স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হইলে তাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রমাণিত হইবে ও সুনাম বৃদ্ধি পাইবে। ১।১১।৪৬

মায়ের মেয়ে

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্

আমার কচি মেয়ে
সেদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ এলো ধেয়ে—
শুধালো হায় নেহাৎ অকারণে :
বাবা, মা নাকি মোর হারিয়ে গেছে আকাশ-ভরা তারার বনে ?
চুমু খেয়ে কইনু তারে
মিথ্যে কথা বেবাক্‌টুকুন : তাও কি হতে পারে ?
মেয়ে আমার অবাক্ হয়ে রইলো চেয়ে
আবার গেল ধেয়ে
সেই সে সেথা, যেথা আকাশ কেবল অশেষ হয়ে চলে।
বুক মনে মিষ্টি করে বলে
বাবা, মা বুঝি হায় ডাক্‌লো আমায় : আয়রে আয়—
জবাব দেবার কী ই বা আছে ? দুই্‌ মেয়ে অশ্রু কেবল ঝরায়।

* * * *

আরেক্ সন্ধ্যেবেলা
আকাশজোড়া তেম্‌নি তারার মেলা—
আগুন দিলুম্ মেয়ের মুখে :
একটু যেন উঠ্‌লো হেসে : হয়তো সে গো সকৌতুকে।
হাজার হলেও মায়ের ডাক—সে কি বৃথাই যায়!
হায় গো হায়!!

* * * *

আরেক্ সাঁঝে
এম্‌নি আলোয় মাঝে
লক্ষ্মীছাড়া এই অভাগায় :
প্রিয়া আমার, যাবার বেলায় ডাক দিয়ো হায়!

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি

শ্রীঅতুল দত্ত

প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অচ্ছেদ্য। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণের ক্ষমতা যে রাষ্ট্রের নাই, সে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যের কর্তৃত্ব-মুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই স্বাধীন নহে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সময় সময় অত্যধিক উদার হইয়া "স্বাধীনতা" বণ্টন করিয়া থাকে। এই সব স্বাধীনতা যে একেবারেই অন্তসারশূন্য, তাহার একটি বড় প্রমাণ—এইভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন বৈদেশিক নীতি থাকে না; তাহারা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মুরুব্বির খুসীমত চলিতে বাধ্য হয়। মিশরকে দুইবার এই ধরণের "স্বাধীনতা" দেওয়া হইয়াছিল; একবার সামরিক আইন জারি করিয়া তাহাকে এই "স্বাধীনতা" গিলাইবার চেষ্টা হয়। ইরাক এই ধরণের স্বাধীন দেশ। সম্প্রতি ট্রান্সজর্ডানকে এইরূপ স্বাধীনতাই দেওয়া হইয়াছে; সেখানে বৃটিশের তাঁবেদার আমীর আবদুল্লাকে রাজমুকুট পরাইয়া তাঁহার প্রতিনিধিকে আন্তর্জ্জাতিক আসরে বসাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ত্রিপলিকে এইভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া আন্তর্জ্জাতিক আসরে বৃটিশের "গণ্ডায় আণ্ডা" দিবার আর একটি প্রতিনিধি যোগাড় করিবার চেষ্টাও গোপন নাই। গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী আমেরিকা সম্প্রতি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে যে স্বাধীনতা দিয়াছে, তাহা ১৯২১ ও ৩৬ সালে মিশরকে দেওয়া বৃটিশমার্কা স্বাধীনতা অপেক্ষাও অন্তঃসারশূন্য।

বহু দিনের পরাধীন জাতির জনসাধারণের "স্বাধীনতা" শব্দটির প্রতি দারুণ মোহ থাকে। ঝুনা সাম্রাজ্যবাদীরা ইহা বোঝে। তাই কোনও দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে সেখানকার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতে কতক পরিমাণে আভ্যন্তরীণ কর্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিয়া জনসাধারণকে "স্বাধীনতা" শব্দটির যাদুস্পর্শে বিভ্রান্ত করা তাহাদের একটি অস্ত্র। তখন, এই সব দেশের প্রগতিপন্থী জাতীয় আন্দোলন দমনের ভার লয় দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীরা; আর তাহাদেরই অনুচরেরা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সাজিয়া আন্তর্জ্জাতিক আসরে মুরুব্বি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির পাশে জাঁকাইয়া বসে। ইহা ছাড়া বহু দৃশ্যতঃ স্বাধীন রাষ্ট্রকেও অর্থনৈতিক নাগপাশে বাঁধিয়া অথবা সামরিক শক্তির ভয় দেখাইয়া দলে রাখা হয়। ইহারা আন্তর্জ্জতিক ব্যাপারে একটি প্রবল রাষ্ট্রের মুখ চাহিয়া কথা বলিতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ—দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন বল্‌কান্‌ রাষ্ট্রসমূহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মোট কথা, কোনও দেশ সত্যই স্বাধীন কিনা, তাহার একটি বড় পরীক্ষা—সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের, স্বাধীনভাবে মিত্র নির্ব্বাচনের এবং অন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অবাধ ক্ষমতা তাহার আছে কি না। যদি এই ক্ষমতা প্রকাশের পথ বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত থাকে, তাহা হইল নিশ্চিত বলা যায়যে, সে রাজ্য স্বাধীন নয়।

বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হলপ্‌ করিয়া বলিয়াছেন—ভারতবর্ষকে ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্‌গ্রীব; তাঁহাদের আন্তরিকতায় যেন কেহ সন্দেহ না করে। ভারতের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই আন্তরিকতায় সন্দেহ করে নাই। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা "ভারতবর্ষ সত্যই ভারতবাসীর হাতে আসিতেছে" ধরিয়া লইয়া কাজ করিতেছেন। ভারতবাসী অন্যের কর্তৃত্বমুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহার একটি বড় পরীক্ষা—নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের অধিকার সে পাইয়াছে কি না। নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট এবং বৈদেশিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য পণ্ডিত নেহরু গত ২৭শে সেপ্‌টেম্বর এক সংবাদিক সম্মেলনে নূতন ভারত গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতির মূলকথা—অতঃপর আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিবে—হোয়াইট হল্‌ অথবা বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ জোটের পথই তাহার পথ হইবে না। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ যদি ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে, তাহা হইলেই বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা কার্য্যতঃ প্রমাণিত হইবে—The proof of the pudding is in the eating.

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সমর্থন করিবে। ইহার অর্থ—আত্মপ্রতিষ্ঠ ভারতবর্ষ পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তাহার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াই চলিবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে পরবশ্যতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতবর্ষের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। এই যোগসূত্রের মর্য্যাদা ভারতবর্ষ রক্ষা করিবে। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে—ইন্দোনেশীয় রিপাব্‌লিক, ইন্দোচীনে ভিয়েটনাম, স্বায়ত্বশাসিত ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্বাধীন ভারতের স্বাভাবিক মিত্র। ইহাদের সহিত ভারতের সহযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইবে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, ইন্দোনেশীয় রিপাবলিককে ভারতবর্ষ একরূপ স্বীকার করিয়াই লইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরুর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি—আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কোনও দলে ভিড়িবে না। সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় মিত্র নির্ব্বাচন করিবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ভারতবর্ষ স্বতন্ত্রভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে।

বর্তমানে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে দল-বিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। এংলো-স্যাক্সন শক্তির সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধ গোপন নাই।

এই বিরোধের মূল কারণ চাপা দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের গণতন্ত্র বিরোধী অন্যায় জিদ : এই বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির নিরপেক্ষ পর্য্যালোচকের নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অবিশ্বাস ও তাহাকে কোণঠাসা করিয়া রাখিবার অপচেষ্টাই এই বিরোধের প্রকৃত কারণ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েট-বিরোধী নীতি এখন এত প্রবল যে, মিঃ ওয়ালেস্ কয়েকটি সত্য কথা বলায় তাঁহাকে অপাঙক্তেয় হইতে হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার অপরাধ—ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ইউরোপে গণশক্তির যে জাগরণ আসিয়াছে, তাহাকে সে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়। সে দানীয়ুব নদীতে উহার তীরবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকার পক্ষপাতী তাহার প্রাণসূত্র দার্দ্দনেলিজে দূরবর্ত্তী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কর্ত্তৃত্ব সে বন্ধ করিতে আগ্রহী। সোভিয়েট রুশিয়া জার্ম্মানীতে নাৎসীদের সহযোগী ধনিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটাইয়া জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দিতে চায়। সোভিয়েট অধিকৃত জার্ম্মাণ অঞ্চলে অভিজাত জুঙ্কারদের সম্পত্তি নিঃস্ব কৃষকদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে; প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই অঞ্চলে জনসাধারণ সর্ব্বাগ্রে রাজনৈতিক অধিকার পাইয়াছিল। জাপানেও জঙ্গী সম্প্রদায়ের সমর্থক প্রতিক্রিয়াপন্থী ধনিকের উচ্ছেদ ঘটান সোভিয়েট রুশিয়ার উদ্দেশ্য। এংলো স্যাক্শন শক্তি গণতন্ত্রের নামে সোভিয়েট রুশিয়ার এই প্রগতিপন্থী নীতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইতেছে। ইহার কারণ—দানিয়ুব ও কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলিতে (অবশ্য রুশিয়া ছাড়া), জার্ম্মানীতে, জাপানে—সর্ব্বত্র এংলো-স্যাকশন শক্তি প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিতে চায়। তাহারা ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ বলিতে কেবল জার্ম্মানী ও জাপানের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে রাখাই বোঝে। এইরূপ অবস্থায়, এংলো-স্যাক্শান জাতির সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধ স্বাভাবিক।

ইহা ছাড়া, সোভিয়েট রুশিয়া ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির জাতীয় আকাঙ্খা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে। ইন্দোনেশিয়া হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের দাবী সে একাধিবার জানাইয়াছে; ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতার নামে স্থায়িভাবে মার্কিণ ডলারের চাকায় বাঁধিবার যে চেষ্টা, তাহার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ভারতবর্ষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাবের মধ্যে ভালভাবে আঁট ঘাঁট বাঁধিবার চেষ্টা সোভিয়েট সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সোভিয়েট রুশিয়া মিশর হইতে বৃটিশের অপসরণ চাহিয়াছে; প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে বৈদেশিক প্রভাবের অবসান দাবী করিয়াছে। পারস্তে আজারবাইজানীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সে সমর্থন করিয়াছিল। চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে নিজে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া কথা দিয়াছে এবং সেখানে আমেরিকার হস্তক্ষেপ বন্ধ করিবার দাবী জানাইয়াছে।

এংলো-স্যাকশন শক্তির পক্ষ হইতে বলা হয় যে, সোভিয়েট রুশিয়ার এই পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—সে বিভিন্ন জায়গায় হয় নিজ প্রভাব ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা চাহিতেছে, অথবা এংলো-স্যাকশন শক্তিকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইঙ্গ-মার্কিণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিথ্যা অপবাদ প্রবলভাবে প্রচার করে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষেও এই প্রচারকার্য্যের ফল দেখা দিয়াছে; বহু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির প্রতি কটাক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জগতের প্রগতিশীল শক্তির একমাত্র মিত্র এই রাষ্ট্রটি সম্পর্কে ভারতবাসীর মিথ্যা ধারণা দূর হইবে; তাহারা বুঝিবে—আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির যদি কোনও মিত্র থাকে, তাহা হইলে এই সোভিয়েট রুশিয়া।

অবশ্য সোভিয়েট রুশিয়ার মিত্রতা অহেতুক নহে; সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল হইতে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির পরিপূর্ণ মুক্তি সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ। ঔপনিবেশিক অঞ্চল শোষণ করিয়াই সাম্রাজ্য-বাদের পুষ্টি; এই সব অঞ্চল যত বেশী পরিমাণে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, ততই জগতের সাম্রাজ্যবাদ দুর্ব্বল হইবে। এই দিক হইতে গণ-রাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়া এবং উপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ এক এবং তাহারা পরস্পরের স্বাভাবিক মিত্র।

তাহার পর, পণ্ডিত নেহরু নিউইয়র্কে জাতি সঙ্ঘের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা কিরূপ নীতি অনুসরণ করিবেন, তাহার আভাস দেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ উক্তি—স্বস্তি পরিষদে বড় শক্তিগুলির 'ভিটোর' অধিকার ভারতীয় প্রতিনিধিরা সমর্থন করিবে; কারণ বড় শক্তিগুলির ঐক্যমত্যের উপর জগতের শান্তি নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তিতে আমাদের দেশের অনেকের ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অধিকারের জন্য আগ্রহাতিশয্য অনেক সময় নিছক ভাবাবেগ ছাড়া কিছুই নহে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সঙ্গত অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, ট্রান্স-জর্ডান, ইরাক প্রভৃতি রাষ্ট্রের ভোটের জোরে জগতে শান্তি রক্ষিত হইতে পারে না। স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে জগতে অশান্তি অনিবার্য্য। ইহারা যাহাতে একমত হইয়া বিশ্ব শান্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সেই উদ্দেশ্যেই 'ভিটোর' ব্যবস্থা। ইহা যে গণতন্ত্রসম্মত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইহাই একমাত্র সঙ্গত ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা।

এংলো-স্যাকশন শক্তিগুলি এখন তাহাদের কয়েকটি অনুগত রাষ্ট্রের প্রতিনিধির দ্বারা জাতি সঙ্ঘে ভিটো-ব্যবস্থা সংশোধন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছে; কারণ সোভিয়েট রুশিয়া পর পর কয়েকবার ভিটোর অধিকার প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। নিউ ইয়র্কে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি এই প্রতিক্রীয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিবেন।

পণ্ডিত নেহরু মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিতে ভারতবর্ষ হইতে সদিচ্ছা মিশন পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সব আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সহিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নৈতিক যোগ আছে। ইহাদের সহিত স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের সৌহৃদ্য স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহাতে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা যাহাদের বেসাতি, তাহারা জানিয়া উপকৃত হইবে যে, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-আরব বিরোধ সাম্প্রদায়িক বিরোধ নহে—সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য এংলো-স্যাকসন জাতির হীন চক্রান্তের ফল; তাহারা জানিয়া বিস্মিত হইবে যে, সীরিয়া-লেবননে মুসলমান ও খৃষ্টান এক সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়িয়াছে। পক্ষান্তরে, মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিও জানিবে—প্রকৃত স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, মুসলীম লীগ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে যোগ দিবার পরও মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সদিচ্ছা মিশনের সদস্য নির্ব্বাচনে পণ্ডিত নেহরুর ক্ষমতা ব্যাহত হয় নাই। বৈদেশিক বিভাগ এখনও তাঁহারই হাতে; শাসন পরিষদে মুসলীম লীগের সহিত কংগ্রেসের সম্মিলিত দায়িত্বের ব্যবস্থাও হয় নাই।

সীমান্ত অঞ্চলে উপজাতীয়দের সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, তাহাদের সম্পর্কে শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া উপজাতীয় অঞ্চলের প্রকৃত উন্নতি বিধান নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নীতি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতদিন বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া উপজাতীয়দিগকে শিক্ষা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন গভর্ণমেণ্ট এই নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচর এবং মুসলীম লীগের চক্রান্তে পণ্ডিত নেহরুর সাম্প্রতিক সীমান্ত ভ্রমণ আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু ইহা সত্য—অদূর ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আন্তরিক চেষ্টা সফল হইবেই।

বেলুচিস্তানের অধিবাসীরা অনুন্নত আখ্যা পাইয়া এতদিন শাসনকার্য্যে কোনরূপ অংশ লইতে পারে নাই। পণ্ডিত নেহরু জানাইয়াছেন যে, গণ-পরিষদের অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বেলুচিদের রাজনৈতিক ভাগ্য অনিশ্চিত রাখা হইবে না। বেলুচিদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি পরামর্শ পরিষদ গঠনের কথা এখনই বিবেচনা করা হইতেছে।

সর্ব্বোপরি, নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পরাধীন ভারতবাসীর একটি বহুদিনের কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিবেন। পরাধীন ভারতের বৈদেশিক শাসক অন্য দেশের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য ভারতীয় সৈন্য ব্যবহার করিয়া ভারতবাসীর মুখ মসীলিপ্ত করিয়া থাকে। এখনও বিভিন্ন স্থানে ৪০ হাজার ভারতীয় সৈন্য রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশে, হংকংএ, ইন্দোনেশিয়ায় ও ইরাকে ১০ হাজার করিয়া ভারতীয় সৈন্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়োজিত। নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এই সব সৈন্য ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীনতাকামী সহ-যোদ্ধাদের নিকট ভারতবাসীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

নুরেমবার্গের বিচার

শ্রীগোরা

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে ভার্সাই সন্ধি স্থাপনের সময় পরাজিত জার্ম্মানীকে চিরতরে পঙ্গু করিবার উল্লাসে, বিজয়ী জাতিগুলি উল্লাসে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। অসংখ্য ঋণের বোঝা চাপাইয়া, সামরিক শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া, উপনিবেশ হইতে বঞ্চিত করিয়া ইহাকে এক অক্টোপাশের কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া দিয়াছিল। ভাবিয়াছিল ইহার পুনরুত্থানের পথ একেবারে বন্ধ করা হইল। কিন্তু এমনি আশ্চর্য্যের বিষয় যে মাত্র ২০টি বৎসরের মধ্যেই এই পঙ্গুকৃত জার্ম্মানী সকল বাঁধন কাটিয়া, বাধা ও নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। মৃত্যুঞ্জয়ীর মতই সে আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়া, ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির ত্রাসের কারণ হইয়া পড়িল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। সূর্য্যোদয় হইতে তখনও কিছুটা সময় বাকি রহিয়াছে। রাত্রি শেষের এই আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়া জার্ম্মানী সর্ব্বপ্রথম পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের সমর্থনে জার্ম্মানীর যাহাই থাকুক, ইহাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। ইহার পর জার্ম্মানী অমিতবিক্রমে বিজয় রথ চালাইয়া মাত্র কয়টি মাসের মধ্যেই মধ্য-ইউরোপের ছোট বড় প্রায় সকল রাষ্ট্রগুলিকেই আপন কুক্ষীগত করিয়া ফেলিল। ইহার প্রবল প্রতাপে সারা পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিল. ভূপৃষ্ঠের প্রায় সকল জাতিই আত্মরক্ষার্থে এই বিশ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় দেখিল না। একদিকে জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান—অপর দিকে ইংরাজ, আমেরিকা, রাশিয়া, ফরাসী, চীন হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অসংখ্য রাষ্ট্র। ছয়টি বৎসর ধরিয়া বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধের যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, পৃথিবীর ইতিহাসে সেরূপ আর কখন ঘটে নাই। অবশেষে একে একে ইতালী, জার্ম্মানী ও জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে

সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অবসান হইল। মাত্র দুইটি আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের দুইটি সুসমৃদ্ধ নগরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া লক্ষ লক্ষ নিরীহ বে-সামরিক অধিবাসীর জীবননাশ করায় শেষে জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যুদ্ধ মিটিয়া গেল। বিজয়ী রাষ্ট্র নেতারা বিজয় গৌরবে দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রু সমরনায়কদের ধরপাকড় আরম্ভ করিয়া দিলেন। জার্মানীর হিটলার, হিমলার ও গোয়েবেল্‌স এবং ইতালীর মুসোলিনী শত্রু হস্তে ধরা পড়িলেন না। পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা আত্মহত্যা না আত্মগোপন করিলেন, তাহা এখনও তর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জার্মানীর উক্ত তিন জন ছাড়া গোয়েরিং, রিবেনট্রপ, কাইটেল, হেস প্রভৃতি অন্যান্য রাষ্ট্র ধুরন্ধরেরা ধরা পড়িলেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে ১৮টি মিত্রশক্তি একত্রিত হইয়া জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করিয়াছিল। তখন অবশ্য জার্মানী আপন প্রতাপে তাহার শত্রু শক্তিকে একেবারে কোনঠেসা করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার পর মস্কো সম্মেলনে রুজভেল্ট, চার্চ্চিল ও ষ্ট্যালিন জার্মানীর সমর নায়কদের শাস্তি দিবার কথা ঘোষণা করেন।

যুদ্ধান্তে অধিকৃত জার্মানীর নুরেমবার্গ্ সহরে জার্মান যুদ্ধ-নেতাদের বিচারের জন্য এক আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করা হইল। বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স এই চারিটি জাতির পক্ষ হইতে বিচারক নিযুক্ত হইলেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর এই আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধাপরাধী বিচারালয়ে ২৪ জন নাৎসী নেতাকে আসামী করিয়া তাহাদের বিচার সুরু হইল। এই ২৪ জন হইতেছেন—

হারম্যান উইলহেল্‌ম গোয়েরিং (৫৩)। হিটলারের পরেই ইহার স্থান। জার্মানীতে ইহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন।

কন্ রিবেনট্রপ (৫৩)। জার্মানীর পররাষ্ট্র সচিব। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে গুপ্ত মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এবং ১৯৩৬-৩৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে জার্মানীর দূত হিসাবে কার্য্য করেন।

উইলহেল্‌ম কাইটেল (৬৪)। জার্মানীর ফিল্ড মার্সাল এবং রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিল ও গুপ্ত মন্ত্রণা কাউন্সিলের সদস্য।

আর্ণষ্ট কাল্টেন ব্রানার (৪৩)। হিমলারের অধীনে ইনি পুলিশ রক্ষা বাহিনীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং অষ্ট্রিয়ায় এস, এস বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন।

আল্‌ফ্রেড রোসেনবার্গ, ন্যাশনাল সোসালিষ্ট পার্টির দার্শনিক এবং ইহার পলিটিক্যাল অফিসের নেতা ছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে অধিকৃত পূর্ব্ব রাজ্য সমূহের রাইখের মন্ত্রী ছিলেন।

ডাঃ হান্‌স ফ্রাঙ্ক (৪৬)। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পোল্যাণ্ডের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

উইলহেল্‌ম ফ্রিক (৬৯)। ১৯৩৩-৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাইখের মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৩৯ খৃঃ হইতে রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

জুলিয়াস ষ্ট্রেচার (৬০)। ষ্টারমারের সম্পাদক। ইনি বাকি একজন বিখ্যাত ইহুদী-পীড়ক।

ফ্রিৎস সোকেল (৫২)। যুদ্ধের কাজে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য তিনি জেনারেল কমিশনার ছিলেন। অধিকৃত দেশসমূহ হইতে তিনি বলপূর্ব্বক শ্রমিক সংগ্রহ করিতেন।

আলফ্রেড জেডল্ (৫৫)। ইনি জার্মান সেনামণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন। হিটলারকে যুদ্ধবিষয়ে উপদেশ দান করিতেন।

আর্টুর কন্ সেস্-ইনকোয়ার্ট (৫৪)। একজন অষ্ট্রিয়ান, অষ্ট্রিয়ায় হিটলারের প্রধান এজেন্টের কাজ করিতেন। ইনি অষ্ট্রিয়ায় যখন গভর্ণর ছিলেন তখন নাৎসী-বিরোধীদের নানারূপে নির্য্যাতন করিতেন। ১৯৪০ খৃঃ নেদারল্যাণ্ডের রাইখ-কমিশনার নিযুক্ত হন।

মার্টিন বোরম্যান (৪৬)। ইনি চ্যান্সেলারী পার্টির নেতা ছিলেন।

রুডল্‌ফ হেস (৫০)। ন্যাশনাল সোসালিষ্ট পার্টির ডেপুটী লীডার, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ তিনি বৃটিশের হাতে বন্দী হন।

ডাঃ ওয়ালথার ফাঙ্ক (৫৬)। জার্মানীর অর্থনৈতিক সচিব। রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য ও রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

এরিক রেডার (৭০)। গ্রাণ্ড এডমিরাল। রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য এবং ১৯৪৪ খৃঃ পর্য্যন্ত জার্মান নৌবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন।

প্রোফেসার আলবার্ট স্পীয়ার (৪১)। জার্মানীর অস্ত্রসচিব। ১৯৪২ খৃঃ ডাঃ টডৎএর মৃত্যুর পর টডৎ অর্গানিজেশনের নেতা হন।

বাল্ডুর কন স্কিরাক (৩৯)। নাৎসী-যুবকদলের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। ভিয়েনা হইতে ইহুদী বিতাড়নের ব্যাপারে তিনি যুক্ত ছিলেন।

ব্যারন কনষ্টানটিন কন্ নয়রাথ (৭৩)। এক সময়ে লণ্ডনে জার্মানীর দূত ছিলেন। রিবেনট্রপের পূর্ব্বে তিনি জার্মানীর পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন। ১৯৩৯-৪১ খৃঃ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার রাইখ্‌স প্রোটেক্টার ছিলেন।

কার্ল ডোয়েনিৎস (৫৩)। জার্মান নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ইনি সাবমেরিণ বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন। জার্মানীর পতনের প্রাক্‌কালে ইনি জার্মানীর ফুরার হইয়াছিলেন।

কন প্যাপেন (৬৭)। হিটলারের উত্থানের পূর্ব্বে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মানীর চান্সেলার ছিলেন। ১৯৩৪-৩৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ায় মন্ত্রী, ১৯৩৬-৩৮ খৃঃ দূত ছিলেন। ১৯৩৮-৪৪ খৃঃ তুরস্কের দূত নিযুক্ত হন।

ডক্টর সাক্‌ট (৬৬)। ১৯২৪-৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। হিটলারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন।

হান্স ফ্রিৎসে। গোয়েবেলের প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রিসভার ষ্টেট সেক্রেটারী ছিলেন এবং নাৎসী-বেতার বিভাগের প্রধান ছিলেন।

ডক্টর রবার্ট লে (৫৫)। ইনি শ্রমিকফ্রণ্টের নেতা ছিলেন, এবং বহু বিদেশী শ্রমিককে জার্মানীতে আমদানী করেন।

গোষ্টভ হালব্যাচ (৭৫)। জার্মানীর নৌগঠন বিভাগের নেতা ছিলেন।

এই ২৪ জন আসামীর মধ্যে রবার্ট লে বিচার চলিবার কালে আত্মহত্যা করেন এবং গুরুতর পীড়ার জন্ত হালবাচের বিচার স্থগিত থাকে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া নাৎসী-নায়কদের বিচার চলিতে থাকে। ১৯১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, প্রায় দুই লক্ষ নথীপত্র ঘাঁটিয়া, ৩৬১ দিন অধিবেশনের পর এই বিচারের পালা সমাপ্ত হয়। ১লা অক্টোবর তারিখে ২২ জন অভিযুক্ত নাৎসী-আসামীর বিরুদ্ধে বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়।

গোয়েরিং, রিবেনট্রপ, কাইটেল, ক্যাল্টেনব্রানার, রোসেনবার্গ, ফ্রাঙ্ক, ফ্রিক, ষ্ট্রেচার, সোকেল, যোডল, সেস-ইনকোয়ার্ট ও মার্টিন বোরম্যানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে বোরম্যানকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহার বিচার হইয়াছে।

হেস, ফাঙ্ক, রেডার যাবজ্জীবন, স্থিরাক, স্পীয়ার প্রত্যেকে কুড়ি বৎসর, নয়রাথ ১৫ বৎসর এবং ডোয়েনিৎস ১০ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ পান।

২৪ জন আসামীর মধ্যে মাত্র প্যাপেন,সাখ্ট ও ফ্রিৎসে এই তিনজন মুক্তিলাভ করেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে (১) ষড়যন্ত্র, (২) শান্তিনাশ (৩) যুদ্ধাপরাধ ও (৪) মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এই চার প্রকারের অভিযোগ আনা হয়। গোয়েরিং, রিবেনট্রপ, কাইটেল, রোসেনবার্গ, যোডল ও নয়রাথ উক্ত চারি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন। রেডার উপরোক্ত ১, ২, ৩নং অভিযোগে, হেস ১ ও ২নং অপরাধে, সেস ইনকোয়ার্ট, ফ্রিক ও ফুঙ্ক ২, ৩ এবং ৪নং অভিযোগে, ক্রনার, ফ্রাঙ্ক, সোকেল, বোরম্যান, ডোনিৎস, স্পীয়ার ৩ ও ৪নং দোষে, শিরাখ এবং ষ্ট্রেচার ৪নং দোষী অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন।

মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদিগকে ১৬ই অক্টোবর ফাঁসি দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

মামলার এই রায়ে সোভিয়েট জজ কয়েকটি বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। প্যাপেন, শাখ্ট ও ফ্রিৎসের বেকসুর মুক্তিতে তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহাদিগকেও অপরাধী করিয়া শাস্তিদানের কথা তিনি জানাইয়াছিলেন। হেসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার কথা তিনি জানান।

আসামীদের মধ্যে কয়েকজন ফাঁসির বদলে গুলি করিয়া মারিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এরিক রেডার কারাগারে পচিয়া মরা অপেক্ষা সৈনিকের স্তায় মৃত্যুবরণকে শ্রেয় মনে করিয়া মৃত্যুদণ্ড দানের জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হয় নাই।

কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৭জন নাৎসী যুদ্ধাপরাধীকে বার্লিনে বৃটিশ অধিকৃত এলাকায় স্পাণ্ডাউ কারাগারে রাখা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

যে সকল জার্মান সমর নায়কদের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয় তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্ত জার্মানরা যদি কোনরূপ চেষ্টা করে এই আশঙ্কায় নুরেমবার্গ বিচারালয়ের প্রবেশ পথে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দর্শক হিসাবে মাত্র ৮জন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে ফাঁসি দেখিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহাদিগকেও সর্বদাই প্রহরাধীনে রাখা হইয়াছিল।

ফাঁসির দিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্তও দণ্ডিতদের কখন ফাঁসি দেওয়া হইবে জানান হয় নাই। ফাঁসির আড়াই ঘণ্টা পূর্বে গোয়েরিংকে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তিনি প্রহরী-বেষ্টিত হইয়াও রহস্যজনকভাবে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। ইহার পর অপর সকলের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া দেওয়া হয়।

রাত্রি ১ ঘটিকার সময় সর্বপ্রথম রিবেনট্রপকে বন্দীশালার বিরাট হলটির মধ্য দিয়া ফাঁসির মঞ্চে আনা হইল। বধ্যভূমিতে ১০টি জোর পাওয়ারের ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বলিতেছিল। ফাঁসীর মঞ্চে রিবেনট্রপকে তোলা হইলে একজন তাঁহাকে নাম বলিতে বলিলেন। রিবেনট্রপ কোনদিকে তাকাইলেন না, কোন উত্তরও দিলেন না। পুনরায় নাম বলিবার কথা তাঁহাকে বলা হইল। তখন অকম্পিতকণ্ঠে তিনি নিজের নাম প্রকাশ করিলেন। একজন রিবেনট্রপকে শেষ কথা বলিবার কিছু থাকিলে তাহা বলিতে বলেন। রিবেনট্রপ প্রশ্নকারী বা অন্ত কাহারও দিকে তাকাইলেন না, উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন—ভগবান জার্মানীকে রক্ষা করুন।

ইহার পর একে একে অপর সকলের ফাঁসি হইয়া গেল। মৃত্যুকালে কাইটেল বলিয়াছিলেন—ভগবান জার্মানবাসীদের প্রতি দয়া করুন। আমার পূর্বে কুড়ি লক্ষ জন মৃত্যুবরণ করিয়াছে, আমি আমার পুত্রদের অনুসরণ করিতেছি।

ফাঁসির পর চতুঃশক্তি কমিশন হইতে এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়—মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের ফাঁসীদানকার্য্য আমাদের সম্মুখে সমাপ্ত করা হইয়াছে।

দলিল হিসাবে রাখিবার জন্ত চতুঃশক্তির চারজন প্রতিনিধির সম্মুখে সরকারী ফটোগ্রাফার নাৎসী নেতাদের মৃতদেহের ফটোগ্রাফ তোলে। পরদিন গোয়েরিং ও অপর দশজন জার্মান নেতা যাহাদের ফাঁসী হইল তাহাদের মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয় কিন্তু কোনও চিহ্নও রাখা হইল না।

এইভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ, যাঁহাদের শক্তিমত্তায় সারা পৃথিবী একদিন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের জীবনাবসান হইল। ইতিহাসের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস। যাঁহারা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবীর মানচিত্রের বহুল পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহাদের পরাজয়ের পর বিজয়ীদল পরম উৎসাহে তাঁহাদের স্বদেশে বসিয়া তাঁহাদেরই বিচার পর্ব শেষ করিলেন। এই বিচারে ইংরাজ, আমেরিকা, রুশ ও ফরাসী দীর্ঘ সময় ধরিয়া, লক্ষ লক্ষ নথীপত্র ঘাঁটিয়া, হাজার হাজার লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া বাহিরে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে আসামীদের প্রতি তাঁহারা ন্যায়পরায়ণতার কোনরূপ ত্রুটি রাখেন নাই। আসামীদিগকে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্ত

বারণধরনাই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াই তিনজন আসামী মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা ছাড়া অনেকে আপন আপন অপরাধের লঘুত্বও প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, যাঁহারা প্রধান অভিযোক্তা তাঁহারাই বিচারকের আসন গ্রহণ করিলেন কেমন করিয়া? আর এই বিচার সভায় পৃথিবীর শত্রু, মিত্র, কি নিরপেক্ষ অপর কোনও জাতির স্থান লাভই বা ঘটিল না কেন? অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোক্তাদের শত্রু, তাঁহাদেরই হাতে পরাজিত। অভিযোগকারী নিজে তাঁহার শত্রুর বিচার করিতেছেন, ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক আইনের কোন্ ধারা যে রক্ষিত হইয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। কিন্তু যে ধারাই ইহার মধ্যে থাকুক না কেন তাঁহারা জার্ম্মানীর প্রধান সমর নায়কদের ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলাইয়া যে ভাবে শহীদ করিয়া রাখিয়া গেলেন, ভাবীকালের জার্ম্মান জাতি যে ইহাকে সুদৃষ্টিতে দেখিবে না তাহা বুঝা সহজ। জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমুন্নত জার্ম্মানী যে চিরকাল পদানত থাকিবে না, তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। নুরেমবার্গের এই বিচারে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ উপ্ত হইল কিনা তাহাই সন্দেহ হইতেছে।

দুই শেয়ানের বিবৃতি

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

মার্কিন স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ বার্ণেস প্যারিস হইতে ফিরিয়াই মুখ খুলিয়াছেন। তিনি যখন প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির ভবিষ্যৎ প্রকৃতি কিরূপ হইবে তাহার ছোটখাট দু একটা পরীক্ষা-কার্য্য চালাইতেছিলেন তখন এদিকে দেশে, অর্থাৎ মার্কিন মুলুকে বাণিজ্য-সচিব হেন্‌রি ওয়ালেস চটিয়া আগুন। সমস্যাটা মূলত সুরু হইয়াছে রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া। ইহার চাইতে সংক্ষেপে বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়—রুশ না ব্রিটিশ। কোন পক্ষ? বস্তুতঃ আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে আজ সবাইকে হঠাইয়া দিয়া রহিয়াছে মাত্র রুশ আর ব্রিটিশ। মার্কিনরা নিজ বলে বলীয়ান সন্দেহ নাই। কিন্তু এমনও ত হয়, রাগিয়া গেলে বড় বড় পালোয়ানদেরও লাঠি আগাইয়া দিবার লোকের প্রয়োজন হয়।

মার্কিনদের আজ য়্যুরোপে লাঠি আগাইয়া দিবার লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। য়্যুরোপে মার্কিনদের আস্তানা লইবার পর হইতে—শ্যাম রাখি কি কূল রাখি—এই চিন্তা তাহাদের সুরু হইয়াছে। যদি শ্যাম রাখিতে হয় তবে সব জলাঞ্জলি দিয়া শ্যামের সঙ্গে সমান তালে না হোক, কোন কোন ক্ষেত্রে তাল মিলাইয়া আসরে নাচিতে হইবে। বেতাল হইলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। সব ধরা পড়িয়া যাইবে। তার চাইতে কূলই ভাল। জাত যাইবার ভয় নাই, অথচ পেট ভরিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। তাই বার্ণেস সাহেব যখন কোমর বাঁধিয়া শান্তি সম্মেলনে কূল রাখিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন তখন এদিকে শ্যামের প্রেমে যিনি মজিয়াছেন তাহার অবস্থা কাহিল। তাই মার্কিন ঘরোয়া রাজনীতিতে আজ কলহ সুরু হইয়াছে। তবে ইহা কলহ ই মাত্র। ইহার গুরুত্বও অন্তর্মুখী; বহির্মুখী কোন গতি নাই। এই ঘরোয়া-কলহ দেখিয়া বিশ্ববাসীর ভয় পাইবার কারণ নাই। এই কলহটিকে আগামী মার্কিনী নির্ব্বাচনীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলেই ভাল হইবে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে মার্কিনবাসীরা বহুদিন গণতন্ত্রের নির্য্যাস খাইয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। স্বাদ বদলাইবার জন্য সাধারণতন্ত্রের রস সেবন করিবে কিনা হয়ত এই চিন্তা করিতেছে। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ইহুদী নীতির কথাই প্রথম উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ইদানিং যে সব বিবৃতি প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে খুব অপরিপক্ক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয় তাঁহার সমগোত্রীয় অভিজ্ঞ কূটনীতিবিশারদ, আত্মকলহ সৃষ্টিতে কুশলী অগ্রজ ব্রিটিশকে ডাকিলে কাজটা ভাল হইত। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে শ্রমিক সরকারের রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কিনদের একেবারে কোল ঘেঁসিয়া গেলেও ঠিক যেন ধরা দিতেছে না। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের বিবৃতি অনেকখানি জল ঘোলা করিয়া ফেলিয়াছে। গোটা আরবখণ্ড জুড়িয়া ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগের মেঘ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছে। ব্রিটিশ জাতি মধ্যপ্রাচ্যে বহুকাল কূটনৈতিক নেতৃত্ব ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভুত্ব করিয়া সমস্যাটা তাহার ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে। আরব ইহুদী সমস্যায় ব্রিটিশ শ্রমিক একবারও বলে নাই—আরব ও ইহুদীরা তাহাদের সমস্যা সমাধান করুক, আমরা সরিয়া পড়িলাম। এমন মৌলিক পরিবর্ত্তনের কোন ইঙ্গিত ব্রিটিশ কূটনীতির মধ্যে নাই। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন; তিনি ইহুদীদেরও সন্তুষ্ট করিয়াছেন নির্ব্বাচনের ডানায় ভর দিয়া ওপারে যাইবার আশায়। এইখানটাই ব্রিটিশ কূটনীতি ও মার্কিন কূটনীতির প্রভেদ। ব্রিটিশ শ্রমিক কূটনীতি বিবৃতি দিয়া তেমন কাহাকেও অসন্তুষ্ট করেন নাই। তার কথা ও কাজ চিরকালই যে সে পথে চলে আজও ঠিক তেমনি সেই সেই পথেই চলিতেছে, নচেৎ ব্রিটিশ সংরক্ষণশীল দল শ্রমিক দলের পররাষ্ট্র নীতির সমর্থন করিতেন না। এইখানে বেভিন সাহেব বাজি-মাৎ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্ব আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাক, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, ওয়ালে-বার্ণেস কলহ। বার্ণেস

কলহটিকে জিয়াইয়া রাখিতে গিয়া তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির ছোটখাট একটি খসড়া বিশ্ববাসীকে দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, নিছক ব্যবসা করিয়া গোটা য়ুরোপকে অর্থনৈতিক দাসত্ব বন্ধনে বাঁধিব না। মার্কিনরা চায়—যাতে য়ুরোপ বাঁচিয়া থাকে, য়ুরোপ বাঁচিলেই বিশ্বের শান্তি রক্ষা হইবে। মোট কথা—য়ুরোপ ধনে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে বিশ্বের শান্তি (—অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত ভূমণ্ডলের অঞ্চল—সেই অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী হইবে ও তথায় শান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু প্রাচ্যদেশের অবস্থা কি হইবে? সে সম্বন্ধেও বার্ণেস সাহেব কিছু বলেন নাই, শুধু বলিয়াছেন, "We defend freedom every where" (The statesman october 20, 1946) খুব ভাল কথা। কিন্তু কি সর্ত্তে এই freedom রক্ষা কার্য্যটি চলে? বার্ণেস সাহেব বলিয়াছেন, আমাদের মতে মানব জাতির স্বাধীনতা ও প্রগতি অবিভাজ্য। কথাটা অবশ্যই গালভারি। কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বরূপ কি গগনচুম্বী স্কাই স্ক্রেপার? প্রগতি অর্থে কি নিগ্রো জাতির প্রতি নিগ্রহ? বার্ণেস সাহেবের কথা ধরিয়া লইলে এ সত্য স্বীকার করিতে হইবে যে মার্কিনরা কস্মিনকালেও কোন জাতির অর্থনৈতিক দাসত্ব চাহেন না। কিন্তু গোটা ল্যাটিন আমেরিকার অবস্থাটা কি আমাদের জানিতে কৌতূহল হয়। কার্টেল, মার্জ্জারগুলি কোন সভ্যতার দান? সেখানে কি মার্কিন জাতির কোন কীর্ত্তি আজিও স্পর্দ্ধাভরে বিরাজ করিতেছেন? বার্ণেস সাহেব যে শাক দিয়া আজ মাছ ঢাকিবার আশায় আছেন সে শাকে আজ পোকা ধরিয়াছে। অতএব মাছের আসল স্বরূপটি ধরা পড়িয়াছে।

সেনেটর ভ্যানডেনবার্গ, ইনি মার্কিনী সাধারণ তন্ত্রের পররাষ্ট্র নীতির মুখপাত্র, প্যারিস শান্তি সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি বটেন। মার্কিন-এ গণতন্ত্রীরা যতই কেন শক্তিশালী হউক না, সাধারণ তন্ত্রীদের মতামত তাদের ওজন করিয়া চলিতে হয়, রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ হইবে না বলিয়াই তিনি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববাসী এই মতামতকে প্রামাণ্য বলিয়াই ধরিবে। কিন্তু রাশিয়ার বিরোধের সূত্রটি আমাদের যতদূর মনে হইতেছে, নিছক মতামতের উপরই নির্ভর করিতেছে না। ইহার উৎস মূল যেখানে, সেখানে দৃষ্টি না দিয়া সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে। অথচ ঘটনার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইতেছে। একটা কথা অবশ্যি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিনরা সাধ করিয়া বিরোধ বাধাইবে না। বস্তুত পক্ষে কেহই সাধ করিয়া বিরোধ বাধায় না। ঘটনার অনিবার্য্য গতি যেখানে আগাইয়া লইয়া যায়, সেইখানেই গিয়া দাঁড়াইতে হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৃষ্টান্ত হইতে এই কথাটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে সে জার্ম্মানী রাশিয়াকে ঠেলিয়াই যুদ্ধে নামাইয়া দিল। পক্ষান্তরে জার্ম্মানীর রাশিয়াকে আক্রমণ না করিয়া কোন উপায় ছিল না। রাশিয়ার মত অত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র পিছনে রাখিয়া সম্মুখে কাহারোই সৈন্ত পাঠানো সম্ভবপর নয়। জার্ম্মানী অনেকটা দায় পড়িয়াই রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে। কথা উঠিতে পারে যে জার্ম্মানী যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করে তখন উভয় দেশ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কূটনীতিতে সমানে সমানে বন্ধুত্ব হইতে পারে। ইহার তারতম্য হইলে বন্ধুত্ব হওয়া মুস্কিল, তবে সাময়িক একটা ব্যবস্থা হইতে পারে মাত্র। তাছাড়া কূটনীতির রূপ রাষ্ট্র চেতনা ও আদর্শের উপর অনেকখানি নির্ভর করে—দুই ভিন্ন মতপন্থীর কূটনীতিও ভিন্নরূপ হইতে বাধ্য। কারণ রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বার্থের যে দড়ি টানাটানি হয় তার উপাদান যে শ্রেণীর লোক, তাদের স্বার্থ রাষ্ট্রের মাঝে কতটা শক্তিশালী—তারই উপর নির্ভর করে এই কূট-নীতির রূপের বিভিন্নতা। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে যে গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও প্রভুত্বের খেলা চলিয়াছিল, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে তাহা খানিকটা প্রশমিত হইয়াছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থ নিছক গোষ্ঠী সীমানা পার হইয়া বৃহত্তর সমাজ পরিধির মধ্যে নব্য অর্থনৈতিক রূপ লইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের পথে জনগণের চেতনার বিকাশ কোথাও সুমধুর হইতেছে, কোথাও বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। তাই বর্ত্তমান ইতিহাসের গতিকে জনগণের চেতনাই আংশিকভাবে নির্দ্ধারণ করিতেছে। আজিকার যুদ্ধোত্তর বিশ্বের দুই একটা ঘটনার বিশ্লেষণ করিলেই বোঝা যাইবে যে জনগণের স্বার্থ কূটনীতিতে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছে। নিছক গোষ্ঠীগত প্রভুত্ব ও স্বার্থ আজ আসর জমাইতে পারিতেছে না। তাই যে ব্যক্তি যখনই যুদ্ধ হইবে না হইবে এইরূপ মতামত প্রকাশ করেন, অমনই প্রথম প্রশ্ন হইতেছে তিনি কাহাদের প্রতিনিধি এবং কোন শ্রেণীর লোকদের স্বার্থের বাহন হইয়া কথা কহিতেছেন। যদি সেনেটের ভ্যানডেনবার্গকে মার্কিন দেশের সংরক্ষণশীল দলের মুখপাত্র বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে মার্কিন ধনিকরা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চাহে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে চাহে কাহারা এবং যাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে রাশিয়ার সঙ্গে গোলযোগ ঘটিবে তাহাদের আশঙ্কার উৎস কোথায়? একথা ঐতিহাসিক সত্য যে রাশিয়ার রাষ্ট্র চেতনা ও আদর্শ মার্কিনদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব তার স্বার্থ ও মার্কিন স্বার্থ দুই বিপরীত খাতে বহিতেছে। ইহার মধ্যে মিলনের অবকাশ কোথায়? সম্ভবতঃ এই অবকাশস্থল খুঁজিবার জন্তই এই কথার উদ্ভব হইয়াছে "he (vandenberg) agreed with Marshal Stalin that it was possible to work out "live and let live accommodation between Eastern communism and our Western Democracy"—(The Statesman october 21, 1946.) কিন্তু সদিচ্ছা কি সব ক্ষেত্রেই ফলবতী হয়? মার্কিন অর্থনীতি বর্ত্তমান বিশ্বের প্রতি রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিতেছে। আগামী তিরিশ বছর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অভিযান অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকিবে। যে সব রাষ্ট্র আজ নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িবার প্রয়াস পাইতেছে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন ও রাশিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্যে যদি এই তিনটি দেশের মিতালী সম্ভবপর হয় তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী শক্তি হিসাবে এই শক্তিত্রয় নূতন সভ্যতার বাহন হইতে পারিবে। বর্ত্তমান ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার মূলে এই তিনটি শক্তির সহযোগিতা থাকিলে ভারত ও চীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক অভিযান হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এই বিষয় চিন্তা করিবেন।*

*　　*　　*　　*

* গত সংখ্যায় বলিয়াছিলাম যে "ভারত, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, শ্যাম, চীন, তিব্বত, জাভা ও সুমাত্রা সবাই মিলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে এক রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া তুলিবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই গ্রথিত শক্তি মার্কিন বা রুশ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কাজ করিবে।" অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে যে, ইহা আংশিক সত্য। রাশিয়ার মনোভাব ভারতের প্রতি সহানুভূতিসূচক হওয়ায় পরিস্থিতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

(৩)

ভূপালের নবাব অসীম উৎসাহে ভাঙ্গী কলোনীতে মহাত্মা গান্ধীর নিকট যেমন যাতায়াত করিতে লাগিলেন, অপর দিকে ঠিক তেমনি আপন নিবাস বরোদা-ভবনে নেহরু-জিন্না সাক্ষাৎ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। কয়েকবার সাক্ষাৎও ঘটিল; কিন্তু উভয়ের আদর্শ একমুখী না হওয়ায় শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া সমস্ত আলোচনা অকস্মাৎ ফাঁসিয়া গেল। ইহা লইয়া মিঃ জিন্নার সহিত কংগ্রেসের কতবার যে মিলনের ব্যর্থ প্রয়াস হইল তাহার হিসাব করিলে ঐতিহাসিকের এক গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। যাহাই হউক, ভূপালের নবাবও এবারে মিলনের দূত হইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিলেন। ব্যর্থমনোরথে আপন রাজ্য ভূপালে ফিরিয়া আসিলেন।

কংগ্রেসের সহিত মিটমাট হইল না, বড়লাটেরও তেমন জিদ নাই, আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই, অথচ সমস্ত শাসন ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতেই রহিয়া যাইতেছে, মিঃ জিন্না এবার ভীষণ বেকায়দায় পড়িয়া গেলেন। বিপাকে পড়িয়া নিজেই অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সূত্র খুঁজিতে লাগিলেন। ২৪শে আগষ্ট বড়লাট তাঁহার এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—লীগ যদি অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করে তবে তাহাদিগকে ৫টি আসন দেওয়া হইবে। বড়লাটের বেতার বক্তৃতায় এই সূক্ষ্মসূত্র ধরিয়া লীগ "স্বাধিকার বলে" অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঠিক পূর্ব্বে বড়লাট ও মিঃ জিন্নার মধ্যে যে আটখানি পত্র বিনিময় হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত হওয়ায় মিঃ জিন্নার বেকায়দায় পড়ার রহস্যটি বাহির হইয়া পড়ে। মিঃ জিন্না বড়লাটকে বলিয়াছিলেন:—অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস তাঁহাদের প্রাপ্য ছয়টি আসনের মধ্য হইতে যে একজন তপশীলী সদস্যকে মনোনীত করিবেন, তাহাতে কংগ্রেসকে লীগের সম্মতি বা অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। অপর পাঁচজনের মধ্য হইতে কংগ্রেস ইচ্ছামত কোন মুসলমানকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পালা বা পর্য্যায়ক্রমে কংগ্রেস ও লীগের মধ্য হইতে অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গুরুত্ব-পূর্ণ দপ্তরগুলি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

বড়লাট তাঁহার পত্রে মিঃ জিন্নার উক্ত সকল আবেদন কয়টাই অগ্রাহ্য করেন। দপ্তর বণ্টন সম্বন্ধে বড়লাট মিঃ জিন্নাকে জানান যে, অর্থ, বাণিজ্য, ডাক ও বিমান, স্বাস্থ্য, আইন এই কয়টি দপ্তরের ভার তিনি লীগকে দিতে প্রস্তুত আছেন। কয়েকটি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ দপ্তর লীগের ভাগে না পড়ায় মিঃ জিন্না দুঃখ প্রকাশ করিলেও আর গোল পাকাইতে সাহস করিলেন না। তিনি এবার নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান না করিলেও ইহাতে মুসলমান সদস্যের অভাব হইবে না। বড়লাট অ-লীগ মুসলমানদের লইয়াই সরকার গঠন করিবেন। তাই তিনি অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদান বাঞ্ছনীয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

এইভাবে অনেক জল ঘোলা করিয়া, বহু সময় অপব্যবহার করিয়া লীগ শেষ পর্য্যন্ত অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিলেন। এই গবর্ণমেণ্টে যোগদানের পূর্বে পণ্ডিত নেহরু মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লীগকে পাঁচটি আসন দিবার প্রস্তাব জানাইয়াছিলেন। মিঃ জিন্না তখন আপন মহিমায় থাকিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

৩০শে জুলাই বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত লীগ কাউন্সিলের সভায় মিঃ জিন্না তাঁহার ভক্তদের বলিয়াছিলেন—"আপোষ করিবার আর অবকাশ নাই। অগ্রসর হও।" ইহার পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইলে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মিঃ জিন্না আর একবার বলিয়াছিলেন—অন্তর্বর্তী সরকার বা গণপরিষদে লীগের যোগদানের কোন আশা দেখিতেছি না, কারণ যোগদান করিতে হইলে উহা আমাদের পক্ষে আত্মসমর্পণ বা অপমানের বিষয় হইবে।

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময় মিঃ জিন্না তাঁহার এই সকল পূর্বোক্তিগুলিকে বিস্মৃতির কালো পর্দায় ঢাকা দিয়া দিলেন। সেই জাতীয়তাবাদী মুসলমান স্বীকার করিতেই হইল, অথচ এই একটি লোককে লইয়া মিঃ জিন্নার জিদ এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে আপোষের চেষ্টায় তাহা ক্রমশঃই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল। শেষে আপোষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং আর কোন সম্ভাবনা না থাকায় মিঃ জিন্না আপনা হইতেই তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন।

লীগ মনোনীত পাঁচজন সদস্য, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, মিঃ আব্দুর রব নিস্তার, মিঃ আই-আই-চুন্দ্রীগড় মিঃ গজনফর আলি খাঁ ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ১৫ই অক্টোবর তারিখে সম্রাট অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য বলিয়া ঘোষণা করেন। লীগ মনোনীত হইয়া যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান এক অভাবনীয় ও আশ্চর্য ব্যাপার। বাঙলায় লীগ মন্ত্রিসভার সহিত যখন এখানকার বর্ণ হিন্দুরা অসহযোগিতা করেন, তখন তিনি লীগকে মনে প্রাণে সমর্থন করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এমন কি ১৬ই আগষ্ট তারিখে লীগের যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কলিকাতার ইতিহাসে এক গভীর কলঙ্ক কালি আঁকিয়া দেয়, তিনি নাকি সেদিন ময়দানে লীগের সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভা করিয়াছিলেন। এহেন যোগেন্দ্রনাথ

মণ্ডল লীগ সেবার যোগ্য পুরস্কার হিসাবে বাঙলা হইতে ছিটকাইয়া নয়াদিল্লীর মন্ত্রিত্বের গদিতে গিয়া পড়িলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, লীগ কেবল মুসলমানের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। এতদিন পর্য্যন্ত এই লীগ নিজেদের সকল মুসলমানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়াই কংগ্রেসের সহিত লড়িয়া আসিতেছিলেন। এখন হঠাৎ নিজেদের পক্ষ হইতে একজন অমুসলমান তপশীলীকে মনোনীত করিয়া বসিলেন। লীগ নিছক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান জানিয়াও লীগের এই মনোনয়নকে বড়লাট এবং সম্রাটই বা সমর্থন করিলেন কেমন করিয়া ?

এই ব্যাপারে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে অন্তর্বর্তী সরকারে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিবার জন্তই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এইরূপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে খান আবদুল গফুর খান স্পষ্টই জানান যে—লীগ গণ্ডগোল পাকাইবার জন্তই বাঁকা পথে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর মত আশাবাদী ব্যক্তিও এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি জানাইলেন—লীগের জন্য নির্দিষ্ট ৫টি আসন হইতে ১টি আসন হরিজনকে দেওয়ায় লীগের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই, মনে হয় তাঁহারা হয়ত বা সংগ্রাম করিবার জন্তই অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন।

যাহাই হউক, লীগ অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করায় মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন সম্ভব করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ সাফাৎ আমেদ খাঁ ও সৈয়দ আলি জাহীর পদত্যাগ করিলেন এবং নূতন করিয়া দপ্তর বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু এই সময়ে সীমান্তের উপজাতি অঞ্চলে ভ্রমণের উদ্যোগী হওয়ায় দপ্তর বণ্টন ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে।

নূতন গবর্ণমেণ্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হিসাবে পণ্ডিত নেহরু ১৬ই অক্টোবর সীমান্ত অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। উপজাতিরা তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জানান। কিন্তু (পলিটিক্যাল এজেণ্টের) প্ররোচনায় সরল উপজাতিদের কয়েকজন পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার সহযাত্রী খান আবদুল গফুর খান ও ডাঃ খান সাহেবের উপর কয়েকবার আক্রমণ চালায়। ফলে উপজাতি অঞ্চল ভ্রমণে গিয়া তিন জনেই সামান্ত আহত হন। এই সময় উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব কংগ্রেসের অহিংস আদর্শের যথার্থ পরিচয় দেন, নচেৎ তিনি তাঁহার সামরিক শক্তিকে আদেশ করিলে ঐসকল শত্রু দলের অনেকেরই প্রাণ নাশ হইত।

অনেক হাঙ্গামার পর লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিলেন বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জের মিটিল না। সারা ভারত ব্যাপিয়াই এই সংগ্রাম লাগিয়া রহিল। কিন্তু সকলকে ম্লান করিয়া ছাপাইয়া উঠিল পূর্ববঙ্গের ঘটনা। কলিকাতার নারকীয় হত্যাকাণ্ডও ইহার নিকটে অতি তুচ্ছ হইয়া পড়িল।

পণ্ডিত নেহরু সীমান্ত সফর শেষ করিয়া নয়াদিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। ২৩শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিলে বৈঠকে পূর্ববঙ্গের অত্যাচার ও মুসলীমলীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সম্পর্কে আলোচনা হয়। বাংলার এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার তীব্র নিন্দা করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকার সম্বন্ধে লীগ সহযোগিতার ভাব লইয়া কাজ করিবেন কিনা লীগের নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়। লীগ বড়লাটের মারফৎ এই প্রতিশ্রুতি দিলে ২৫শে অক্টোবর নিম্নলিখিত-ভাবে দপ্তরসমূহ বণ্টন করা হয়—

মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ—অর্থ

মিঃ আই, আই, চুন্দ্রীগড়—বাণিজ্য

মিঃ আব্দুর রব নিস্তার—ডাক ও তার

মিঃ গজনফর আলি খাঁ—স্বাস্থ্য

মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—আইন

ডাঃ জন মাথাই—শিল্প ও সরবরাহ

মিঃ রাজাগোপালাচারী—শিক্ষা ও চারুকলা

মিঃ ভাবা—পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎ

নিম্নের দপ্তর সমূহের কোনও রদবদল হইল না, পূর্ববৎ রহিল—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—পররাষ্ট্র

সর্দ্দার প্যাটেল—স্বরাষ্ট্র, প্রচার ও বেতার

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—খাদ্য এবং কৃষি

মিঃ আসফ আলি—যানবাহন ও রেলওয়ে

সর্দ্দার বলদেব সিং—দেশরক্ষা

মিঃ জগজীবন রাম—শ্রমিক

পরদিন লীগের ৫ জন মুসলমান মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দপ্তরখানা পরিদর্শন করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তারযোগে নিজ দপ্তর গ্রহণের কথা জানাইলেন।

২রা সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইয়াছে; ইতিমধ্যেই বিশ্বের দরবারে ইহা যথেষ্ট সম্মান-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের সম্পূর্ণ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মন্ত্রিগণ যথাযথ কার্য্যসূচী প্রণয়নে ব্যস্ত রহিয়াছেন। পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের স্বার্থকে প্রথম বলিয়া কখন চিন্তাও করেন নাই। অন্তর্বর্তী সরকারকে দেশের খাদ্য, বস্ত্র, বেকার সমস্যা, শিল্প, ব্যবসা প্রভৃতি বহু গুরুতর বিষয়ের সমাধান করিতে হইবে। লীগ বর্ত্তমানে কংগ্রেসকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়া অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন। তবে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি কতদূর রক্ষা করিবেন বলা কঠিন। লীগ সত্যই যদি কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এই দ্বৈত শক্তি এক উন্নত ভারতের সৃষ্টি করিয়া জগতের সমক্ষে ইহাকে এক আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারেন।

দাঙ্গা ও গীতা পাঠ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি

প্রথম অধ্যায়—অর্জুনবিষাদ যোগ। যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধুগণের বিনাশ ভাবনায় অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হইলেন, বলিলেন এরূপ যুদ্ধ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল (শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে)। অর্জুন একবারে non-violent ভাব ধারণ করিলেন, বলিলেন—

> যদি মামপ্রতিকারং অশস্ত্রং শস্ত্রপানয়ঃ।
> ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।গী-।১অ।৪৬ শ্লো।

যদি প্রতিকারপরাঙ্মুখ অশস্ত্র আমাকে শস্ত্রপাণি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ রণে হনন করে তাহা আমার পক্ষে ক্ষেমতর হইবে।

এই চিত্রের সদৃশ একটা আধুনিক চিত্র। non-violent (শান্ত) বীর গেটের সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া; সম্মুখে রাস্তায় গুণ্ডাবৃন্দ লাঠি ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রে শোভিত হইয়া আস্ফালন করিতেছে। ভিতরে ছেলেমেয়েরা ক্রন্দন করিতেছে। শান্ত রোধকারী (non-violent resister) নিহত হইলে সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে, মেয়েছেলেরা নিহত হইবে—অথবা মেয়েরা হত্যা অপেক্ষাও নৃশংসতর দুর্গতি ভোগ করিবে। শান্ত রোধকারী বলিলেন—হে গুণ্ডাবৃন্দ, তোমরা এই পাপ কার্য্য হইতে বিরত হও—বক্তৃতা শেষ হইতে পারিল না, এক ইঁট, তার পর এক ঘা লাঠি, তার পর ছোরার আঘাত * *

দুর্ভাগ্যক্রমে মহাত্মা গান্ধীর কোনও শিষ্য বা ভক্ত বঙ্গদেশে শান্ত ভাবে কিরূপে গুণ্ডা দলকে শান্ত করা যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দেখান নাই।

বঙ্কিমের আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও অনুশীলন (ধর্ম্মতত্ত্ব) এবং পণ্ডিত যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বিবিধ লেখায় দ্বারা প্রণোদিত অনুশীলন সমিতি ও অন্যান্য ব্যায়াম সমিতির প্রচেষ্টায় ভীরু বাঙ্গালী যুবকদের মেরুদণ্ড কিছু সোজা ও শক্ত হইতেছিল। পরবর্ত্তী non-violence প্রচারের ফলে আবার তাহাদের মেরুদণ্ড বক্র এবং হাত-কচলানি বাড়িয়া চলিয়াছিল।

একটা জাতির জীবন বহু বিষয় (factor) এর উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক নির্ণয় করিবে মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে মন তারোলেল ও নিরামিষ ভক্ষণ ফ্যাসান হইয়া হিন্দু জাতির কতটা লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে।

অর্জুন যখন non-violent ভাব ধারণ করিলেন ভগবান তখন গীতার উপদেশ আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে গীতা আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বের অংশ গীতার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। শঙ্কর এই স্থান হইতেই গীতা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভগবান প্রথমেই বলিলেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ—ক্লীব বা কাপুরুষ ভাব ধারণ করিও না। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ—ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যজিয়া উঠ। গীতার শেষ ভগবদোক্তি—কচ্চিদজ্ঞান সম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে—তোমার কি অজ্ঞান সম্মোহ নষ্ট হইল? গীতায় অর্জ্জুনের শেষোক্তি—নষ্ট মোহঃ… স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব—আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে গতসন্দেহ হইয়াছি, তোমার কথা মত কার্য্য করিব—অর্থাৎ যুদ্ধ করিব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিকাংশ ভাগই এই হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগের উপদেশ। কতকটা রাজসিক ভাবের উপদেশ—অধিকাংশ সাত্ত্বিক উপদেশ।

রাজসিক উপদেশ—অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্। তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি—যদি তুমি দেহী নিত্যজাত এবং নিত্য মৃত হয় এরূপ ভাব—তাহা হইলেও তোমার শোক করা উচিত হয় না। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। জন্মিলেই মরিতে হইবে মরিলেই জন্মিতে হইবে। অতএব এই অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করিবে কেন?

অর্জুনকে ভয় দেখাইতেছেন—অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম। সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে। মানীর ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখকর কি হইতে পারে?

লোভ দেখাইতেছেন—হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায়কৃত নিশ্চয়ঃ। হত হইলে স্বর্গ পাইবে জিতিলে মহীভোগ করিবে। অতএব যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠ।

সাত্ত্বিক উক্তি এ অধ্যায়ে বহু। সব তুলিব না। আত্মা নিত্য অবিনশ্বর এই ভাব। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। এই আত্মাকে শস্ত্র ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি দহন করিতে পারে না। ইহা জানিয়া তোমার শোক করা ঠিক নহে—তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানু-শোচিতুমর্হসি।

গীতার আদর্শ পুরুষের বর্ণনা নানা স্থানে আছে। খুব সংক্ষেপে তুলিব।

> দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
> বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ …

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ শূন্য। (২অ ৫৬ শ্লো) ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলির বর্ণনায় অভয়কে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

গীতায় উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা এই নির্ভয় ভাবের উপদেশ দেয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা—ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু (তুলনা—বেদান্ত সূত্র জন্মাদ্যস্য যতঃ)।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ।৭ অ ।৭ শ্লো ।

ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর অন্য কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, ব্রহ্মে সর্ব্ববস্তুই তেমনি গ্রথিত আছে। অতএব কেই বা কাহাকে ভয় করিবে এবং কেই বা কাহাকে হনন করিবে। ব্রহ্মই সকল করেন আর কেহ কর্ত্তা নহে—নিমিত্ত মাত্র।

"ময়ৈবেতে নিহতা পুর্ব্বমেব নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচী" (গী।১১ অ) তাঁহাদিকে আমিই পূর্ব্বে নিহত করিয়াছি তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

কলিকাতায় নিদারুণ দাঙ্গার বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সকল জানা গিয়াছে। ক্লৈব্য ভাবাপন্ন লোক—গুণ্ডার সামনে অশ্রু নয়নে করযোড়ে—হে বাবা রক্ষাকর ইত্যাদি ভাবে স্থিত ব্যক্তি—অনেক স্থলে সম্মান ও ধনপ্রাণ সহ মারা গিয়াছে। কচিৎ প্রাণ পাইয়াছে, সম্পত্তি রক্ষা হয় নাই ; স্থলে স্থলে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানও রক্ষা হয় নাই। সাহসের সহিত যাহারা গুণ্ডাদের সহ যুদ্ধ করিয়াছেন তাহারা বহু স্থলেই ধনে প্রাণে মানে বাঁচিয়াছেন—কচিৎ মরিয়াছেন। অতএব ক্লৈব্য বর্জ্জনীয় —নির্ভীকতা অবলম্বনীয়।

আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার অধিকার সকলদেশের পিনালকোডে দিয়াছে। ব্রাহ্মণ পক্ষপাতী মনু পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন আততায়ী ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত হইলেও তাহাকে নিহত করিবে।

ভীমভাবে (violently) গুণ্ডার আক্রমণ প্রতিরোধ করাটা কি উচ্চ নীতির অননুমোদিত ? নন-ভায়োলেন্স প্রচারের ফলে কেহ কেহ ঐরূপ ভাবেন। তাহার বিপক্ষে নিম্নের কথা কয়টি।

গুণ্ডা আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। গুণ্ডার দেহটা বেশী, না তাহার আত্মা বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু ? ভীমভাবে তাহাকে প্রতিরোধ করিলে নাক ভাঙ্গিতে পারে, হাত পা বা অন্য অঙ্গ হানি হইতে পারে—অথবা তাহার প্রাণও যাইতে পারে। প্রতিহত হইলে গুণ্ডার আত্মা অনেক পাপ—নরহত্যা, লুণ্ঠন, শিশু হত্যা, স্ত্রীধর্ষণ—হইতে রক্ষা পাইল।

ভীমভাবে আত্মরক্ষাকারীর অন্য পুণ্যও আছে। গুণ্ডা যদি দেখে আক্রান্ত—মেষ জাতীয়—নির্ব্বাধায় তাহাকে হনন এবং তাহার বাটীতে অন্য অত্যাচার করা যাইতে পারে, তাহার লোভ বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রথম বারেই যদি সে ঘা খায় তাহা হইলে তাহার অন্যত্র আক্রমণ করিতে যাইবার স্পৃহা লোপ পায় বা কমিয়া যায়। অতএব ভীমভাবে আত্মরক্ষাকারী অনেক লোকের রক্ষা বিধানের কারণ হইয়া পুণ্য অর্জন করে।

বাঙ্গালীদিগকে নির্ভীক হইতে হইবে। সকল স্বাধীন জাতির মধ্যে জনমত এমনভাবে গঠিত করা হয়—যে কাপুরুষ হইতে লোকে ভয় পায়। বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হইয়া কি লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক। দাঙ্গায় লাভ কথাটা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইবে। বলিবে পাঁচ দশ কোটি টাকা লুট হইল ; আট দশ হাজার লোক মরিল—লাভ কোথা ?

জাতীয় জীবনে অমন আট দশ কোটী টাকা লোকসান বা আট দশ হাজার লোক মরা কিছুই নহে। এই ত সেদিন দুর্ভিক্ষে ৩০।৪০ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে কোটী টাকা উপার্জ্জন করিত।

বাঙ্গালী হিন্দুরা ভীতু এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক দাঙ্গার পর তাহাদের সাহস-নির্দ্দেশ (courage index) বাড়িয়া গিয়াছে। চলিত কথা আছে "তোমবি মিলিটারী হাম বি মিলিটারী" ইহাদের মধ্যে সখ্য সহজেই জমে। দুর্ব্বলের সখ্য কেহ চাহে না। দাঙ্গায় হিন্দুরা মুসলমানের সমকক্ষ হইলে সহজেই তাহাদের মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্ব হইবে এবং সম্মিলিত হিন্দু মুসলমান একটী দুর্দ্ধর্ষ জাতি গড়িয়া তুলিবে।

বিপদের সান্নিধ্য যে লোকের কতটা সাহস বাড়ায় তাহা এই দাঙ্গায় পরে দেখিতেছি এবং জাপানী বোমা আক্রমণেও দেখিয়াছিলাম। উত্তর কলিকাতায় প্রথম বোমা বর্ষণের ফলে কতিপয় লোক হত হওয়ায় কলিকাতাবাসীরা দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বিদেশে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তাহারা কলিকাতা ফিরিয়া আসিল। আমার এক আত্মীয় তাহার রম্য কলিকাতার বাটী পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বলে এক হীন আবাসে কয়েক মাস কাটাইয়া পুনরায় কলিকাতা ফিরিলেন। পরে খিদিরপুরের বোমা বর্ষণের ফলে যখন শত শত লোক মরিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এবারে পলাইতেছেন কবে ? তিনি বলিলেন, যা থাকে অদৃষ্টে—এবারে আর কলিকাতা ছাড়িতেছি না।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সাহসই জাতির উন্নতির একমাত্র উপায় নহে। জার্ম্মাণীর অসাধারণ সাহস ও রণদক্ষতা ছিল, তা সত্ত্বেও তাহার পতন হইল কেন ? আমাদের নারায়ণের প্রণাম মন্ত্রে আছে "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় নমঃ"। গীতাতেও আছে—"ভগবানের প্রিয় তিনিই যিনি সর্ব্বভূত হিতে রত" (গীতা দ্বাদশ অধ্যায়)। জার্ম্মাণ জাতি এই "জগদ্ধিত চিন্তা" বা "সর্ব্বভূতহিত চিন্তা" ছাড়িয়া শুধু "আত্মহিত চিন্তা" সেই পূজা করিয়াছিল তাই তাহাদের আত্মহিত লাভ ও হয় নাই।

সৌভাগ্যক্রমে মহাত্মা গান্ধি পরিচালিত কংগ্রেস এই জগদ্ধিতচিন্তা ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। গান্ধির চিন্তার মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষের স্থান নাই, এমন কি গুণ্ডাবিদ্বেষেরও স্থান নাই—যদি চ গুণ্ডাকে বাধা দিতে হইবে সশস্ত্রে।

যাহার অভ্যুদয়ে বহুলোকের মঙ্গল তাহার অভ্যুদয় অনিবার্য্য। সবশেষে আমাদের গীতার এই যথা মন্ত্রটি মনে রাখিতে হইবে :—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ সচমে প্রিয়ঃ। গী (১২ অঃ ১৫ শ্লঃ

যিনি কিছুতেই উদ্বিগ্ন হন না এবং নিজেও কাহারও উদ্বেগের কারণ হন না, যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনি আমার (ভগবানের) প্রিয়।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

পঞ্চম দৃশ্য

মহেন্দ্রবাবুর বাটীর বাহিরের বারান্দা। অনুরাধা হাসিতেছে, বিক্রম গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে।

অনুরাধা। (হাসিতে হাসিতে) থামুন। কী করে যে আপনি ডাক্তারি করেন তাই ভাবি আমি। আমি বাজী রাখতে পারি যে রুগী দেখতে গিয়ে নিশ্চয় তার সঙ্গে আপনি ঠাট্টা ইয়ার্কি জুড়ে দেন।

বিক্রম। কে আমার নামে তোমার কাছে লাগিয়েছে বল তো? ওরা বলে ঐ জন্যেই আমার পসার হল না। কিন্তু কী করব, রুগী দেখলেই আমার ভয়ংকর হাসি পেয়ে যায়।

অনুরাধা। রুগী দেখলে হাসি? তাও আবার একটু-আধটু ফিক্ করে হাসি নয়, ভয়ংকর হাসি পায়?

বিক্রম। হুঁ, তা পায়। চিকিৎসা করতে গিলে মন্দ চিকিৎসা করতুম না, কিন্তু হাসি পায়।

অনুরাধা। কী করে? রুগী রোগের যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছে, তাকে দেখে হাসি পাবে কী করে?

বিক্রম। কেন পাবে না? তোমাদের প্রোফেসর যদি কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়েন, তুমি হাস না? তাঁর বেদনার কথা ভেবে ছেড়ে দাও?

অনুরাধা। সে হল অন্য কথা।

বিক্রম। এ-ও হল অন্য কথা। যন্ত্রণা তো আমার হচ্ছে না। প্রোফেসর পড়ে গেলে তোমার লাভ নেই, তবু হাস। আমার বরং লাভের কথা, যাহোক দুটো টাকা চারটে টাকা হাতে আসবে। আমার হাসি পেতে বাধা কী? তাছাড়া দেখ বাপু, এক একটা রুগী আবার এমনি বেয়াড়া যে দেখলে না হেসে তুমিও থাকতে পারবে না। এই ধর, দাঁতের যন্ত্রণা। কী রকম জানো তো?

অনুরাধা। উঃ, বলে মনে করিয়ে দেবেন না, মনে করলেও কান্না পায়।

বিক্রম। ঠিক তাই। মনে করলেই আমার হাসি পায়। গাল ফোলা, হয়তো নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, হয়তো একটা চোখ ছোট হয়ে গেছে, মুখের আপাদমস্তক গলাবন্ধ জড়ানো, একটা আদি ও অকৃত্রিম নদুড়মামা। আবার হাঁ করতে বললে মুখটা যখন 'ও' করেন, তখন তাঁর যন্ত্রণা দেখে হাসি চাপতে ঘর ছেড়ে পালানো ছাড়া আর উপায় থাকে? বল? তুমিই বল।

অনুরাধা। উঃ, আপনি এমন নিষ্ঠুর! আপনার নিজের নিশ্চয় দাঁতের ব্যথা হয়নি কখনও?

বিক্রম। দাঁতের ব্যথা আমার নিত্য সহচর। মাসে অন্ততঃ একবার তো হবেই। তাই তো সে-সময় সাবধানে পথ হাঁটি, যেন পানের দোকানের সামনে গিয়ে না পড়ি।

অনুরাধা। কেন? পানের হাওয়া দাঁতের গোড়ার পক্ষে খারাপ বুঝি?

বিক্রম। তা জানি না। কিন্তু পানের দোকানে আরসি থাকে যে। যদি নিজের মুখটা দেখে চিনতে না পেরে হেসে ফেলি। সেটা বড় মর্মান্তিক হবে না?

অনুরাধা। (হাসিতে হাসিতে) আপনি ডেঞ্জারাস ডাক্তার।

বিক্রম। জানি। একথা একজনরা বলেছিল বটে। সে বড় বিপদে পড়েছিলুম। একটি ছোট ছেলের লিভারের অসুখ, আমাকে ডেকেছে। বড়লোকের ছেলে, নাদুস-নুদুস নরম দেহ। বাপ ভাল ফি দেবে, চাই কি, বাড়ীর সব রুগীই হাতে আসতে পারে। প্রবল উৎসাহের সঙ্গে হাত লাগালুম। মানে, হাত লাগালুম সেই গোলগাল নরম গরম পেটটিতে। দিলুম এক টিপুনি। ব্যস্। আর যায় কোথা! ছেলে উঠ্‌ল এইসা ককিয়ে—

অনুরাধা। কাঁদবে না? যা আপনার কাঠির মতন লম্বা লম্বা আঙুল। তাতে আবার প্রবল উৎসাহ।

বিক্রম। ছেলে তো ককিয়ে হেসে উঠ্‌ল। সে কী হাসি! জানো তো, হাসি বড় বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগ। যত রুগীও যত হাসে, আমিও তত হাসি। হাসি আর থামে না। হাসির চোটে আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়, আর রুগীর চোখ উঠেছে কপালে। শেষে ছেলের এক দাড়িওলা পিসে এসে আমাকে ঘাড় ধরে টেনে তুলে দেয়, তবে রুগীর পেট থেকে আমার হাত ওঠে, রুগী বাঁচে। মানে, হাসতে হাসতে পেট থেকে হাত সরাতেই ভুলে গেছি—(অনুরাধা উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিতে লাগিল)

অনুরাধা। বেশ করেছেন, ডাক্তার নয়, খুনে আপনি—

জয়ন্ত প্রবেশ করিল। বিক্রমের সহিত অনুরাধার এই সহজ ও কৌতুকোজ্জ্বল ঘনিষ্ঠতা তাহার আনন্দবর্ধন করিল না। তাহার মুখ গম্ভীর হইল।

বিক্রম। এই যে জয়ন্তবাবু এসেছেন, ভালই হয়েছে। আসুন। আচ্ছা, আপনি তো একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি, বলুন তো, গালফোলা দেঁতোরুগী দেখলে আপনার হাসি পায় না?

জয়ন্ত। (গম্ভীরভাবে) সব আইন এখনও তো পড়া হয়নি আমার, তাই বোধহয় হাসি পায় না।

বিক্রম। (উচ্চহাস্য) বাঃ, বেশ বলেছেন। (হাসিতে হাসিতে

উঠিল) আচ্ছা, আপনারা গল্প করুন, আমি একবার ওঁষর থেকে আসি। ডাক্তারবাবু এলেন বোধহয়, গলা পাচ্ছি যেন। প্রস্থান

অনুরাধা। বসুন জয়ন্তদা।

জয়ন্ত। না, আমি বসবার জন্তে আসিনি। তোমার বাবার খবরটা নেবার জন্তেই এসেছিলুম। চলুম।

অনুরাধা। তা, খবর না জিজ্ঞাসা করেই চললেন ?

জয়ন্ত। খবর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হল না। ভালই আছেন নিশ্চয়, নইলে মেয়ে এমন হাস্তমুখরা হয় কী করে ?

অনুরাধা। বীরুদার ডাক্তারির বিবরণ শুনে হাসছিলুম। বেশ লোক বীরুদা নয় ?

জয়ন্ত। হুঁ।

অনুরাধা। এত সিরিয়াস আর এমন কাজের লোক তো। অথচ এত হাসাতে পারেন।

জয়ন্ত। হুঁ। তা দেখছি।

অনুরাধা। আর এমন সাদাসিধে। কোনও চাল নেই। কাল কী মজা হয়েছে জানেন ? বামুনঠাকরুণের জ্বর হয়েছিল বলে আমি আর দিদি রান্না করছি। ওদিকে বাবার জো অসুখ, চব্বিশঘণ্টা দিদিকে চাই। বীরুদা এসে জোর করে দিদিকে উঠিয়ে দিয়ে বসে গেলেন রুটী বেলতে। সে যা সব রুটী হল—(হাসিতে হাসিতে) আপনি যদি দেখতেন—

জয়ন্ত। হ্যাঁ, তাহলে খুবই ভাল লোক বই কি, রুটী বেলতে পারেন—

অনুরাধা। সত্যি। উনি না এসে পড়লে কী যে করতুম আমরা, তা জানি না। বাবার হঠাৎ ঐ রকম বাড়াবাড়ি হয়ে উঠল, আর আমরা দুটো মেয়ে তো মাত্র বাড়ীতে। দিদি বলেন, বীরুবাবু ঘরে এসে ঢুকলেই মনে হয় আর ভয় নেই।

জয়ন্ত। দিদি কী বলেন সে কথার দরকার কী ? তোমার নিজের কথাই বল।

অনুরাধা। আমার তো চমৎকার লাগে। মনে হয় যেন সত্যিই কত আপনার লোক। ক সপ্তাহ নয়, কত বছরের চেনা যেন।

জয়ন্ত। তাই আজকাল তোমার দেখা পাওয়া যায় না, না ?

অনুরাধা। বাবার কাছে থাকি যে।

জয়ন্ত। তা তো থাকবেই। আর যখন বাবার কাছে না থাকো, তখন বীরুদা আছেন। চমৎকার লোক। আচ্ছা, আমি চললুম।

অনুরাধা। আমিও যাই, বাবার কাছে। ডাক্তার এসেছেন। (জয়ন্ত গেল না দেখিয়া) আমাকে কিছু বলবেন কি ?

জয়ন্ত। না, সে এমন কিছু নয়। আমি চলি।

অনুরাধা। তাহলে কাল বলবেন ? এখন—

জয়ন্ত। হ্যাঁ, এখন তুমি যাও।

অনুরাধা চলিয়া যাইতেছিল ; জয়ন্ত আশা করিয়াছিল অনুরাধা তাহাকে বসিতে বলিবে

জয়ন্ত। কাল আমি আসব না, অনুরাধা। আমি চললুম।

তাহার বলিবার ভঙ্গী ও সুর শুনিয়া অনুরাধা বিস্মিত হইল

অনুরাধা। কাল আসবেন না ? কবে আসবেন ?

জয়ন্ত। তা বলা যায় না। যাই যদি আসি—

অনুরাধা। ও কী কথা জয়ন্তদা ?

জয়ন্ত। না, কথা এমন কিছু নয়।

অনুরাধা। না, আপনি বলুন। কী বলবেন বলছিলেন বলুন—

জয়ন্ত। না, আর কথা কইব না, জিব দিয়ে কথা অনেক কয়েছি, এবার দেখি যদি হাত দিয়ে কথা কইতে পারি। (অনুরাধা বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল) অনুরাধা, ফুলের মালার লোভ সম্বরণ করেছি। অন্ত মালা জুটবে কিনা জানি না। কিন্তু যদি জোটে তখন তোমার মনে থাকবে কি ? কে জানে। দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

অনুরাধা কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভিতরে প্রস্থান করিল। প্রবেশ করিল নীলমণি ডাক্তার ও বিক্রম।

নীলমণি। আপনি তো বুঝতে পারছেন ডাক্তার ঘোষ, এসব কেসে কিছুমাত্র ভরসা নেই। প্রেসারটা আরও খানিক নামলে তবে কতকটা—

বিক্রম। তাইবা কতক্ষণ বলুন। যে রকম টেম্পারামেন্ট আর অন্যান্য উপসর্গও বা, তাতে প্রেসার ফের উঠে যেতেই বা কতক্ষণ ?

নীলমণি। এগ্‌জ্যাক্‌টলি সো। ইউ সে গো আপ, এনি মোমেন্ট। তাইতো বলছি, ভয় এখন যোল আনাই—

রাধার প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার কথা চাপিয়া বলিল—

এই যে আসুন। ওষুধ খেলেন উনি ?

রাধা। হ্যাঁ, অনেক কষ্টে খাইয়েছি। কিন্তু ভয়ের কথা কী বলছিলেন ডাক্তারবাবু ?

নীলমণি। হ্যাঁ, বলছিলুম ডাক্তার ঘোষকে যে—ভয়টা যোল আনাই গেছে বটে, কিন্তু এখনও খুব সাবধানেই রাখতে হবে।

রাধা। খুব সাবধানেই তো রেখেছি। কিন্তু কথা শোনেন না যে বাবা, খালি উঠতে চান, খালি কথা কন—

নীলমণি। আসল সাবধানতা ঐ যা বলেছি—কোনও রকম দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ওঁকে করতে দেবেন না। ওরিজ এণ্ড এংজাইটিস হচ্ছে ব্লাড-প্রেসারের বারো আনা কারণ। ঐদিকে খালি লক্ষ্য রাখবেন, যাতে উনি সর্বদা প্রফুল্ল থাকেন, আর রাত্রে ঘুমোতে পারেন। আপনাদের দিক থেকে অবশ্য দুশ্চিন্তা বা অসন্তোষের কারণ কখনও ঘটবে না, তা আমি জানি। তবে বাইরের বা বৈষয়িক কোনও ডিস্টার্বিং নিউজ না কানে ওঠে, এই আর কী। আচ্ছা, গুড্ বাই ডক্টর ঘোষ।

রাধা নমস্কার করিল।

বিক্রম। আপনার ঐ ওষুধটা আমি নিজে দেখছি কোথায় পাওয়া যায়।

রাধা আঁচল হইতে টাকা বাহির করিয়া দিল, বিক্রম ডাক্তারকে দর্শনী দিল

নীলমণি। থ্যাঙ্কস্। হ্যাঁ, ও ওষুধটাতে কয়েকটা কেস্‌এ আমি খুব ভাল ফল পেয়েছি। ওটা আনিয়ে দিন। প্রস্থান

ডাক্তারের সঙ্গে কয়েক পদ গিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া বিক্রম দেখিল, রাধা একদৃষ্টিতে চিন্তাকুলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বিক্রম। কী ভাবছেন?

রাধা। আমার ভাবনার কি কূলকিনারা আছে বীরুবাবু? যাক, সে তো আছেই। আপাতত: ভাবছিলুম ভগবান বিপদে ফেলেন অকস্মাৎ বটে, কিন্তু যখন উদ্ধার করবেন মনে করেন, তখন তার ব্যবস্থাও করে রাখেন অপ্রত্যাশিতভাবে। বাবার এই যে অসুখ বাড়লো, ঠিক এই সময় যদি আপনি না এসে পড়তেন, তাহলে কী যে হত তাই ভাবছি। আপনি যা করেছেন—

বিক্রম। তা যে কোনও লোকই করতো। অতএব ও নিয়ে মিছে ভেবে মাথা খারাপ করবেন না।

রাধা। যে কোনও লোকই করতো কিনা বলতে পারি না। তাঁর একটা কথা আমার মনে পড়ছে। আপনার সম্বন্ধেই তিনি একদিন বলেছিলেন যে, যদি এমন দিন আসে যে আমি নেই আর ও আছে, তা হলে তোমার কথা ভেবে আমি দুশ্চিন্তা করব না, এটা ঠিক।

বিক্রম। পাগল, পাগল ছিল সে। (হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু কণ্ঠে হাসি ফুটিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিবার পর) ওঁর কাছে-কে আছে? অনু?

রাধা। হ্যাঁ।

বিক্রম। তাহলে আপনার সঙ্গে একটা কথা কয়ে নি।

বলিয়া বিক্রম মাথা নীচু করিয়া কী চিন্তা করিতে লাগিল।

রাধা সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া—

রাধা। কী বলবেন বলছিলেন?

বিক্রম। হ্যাঁ, বলি। কী করে বলব তাই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। কিন্তু বলতে হবেই। আমাকেই বলতে হবে। আপনি বসুন।

রাধা। (উদ্বেগে কণ্টকিত হইল, বসিল না) না, আপনি বলুন আগে। কী কথা? বাবার কথা কি?

বিক্রম। ব্যস্ত হবেন না। আপনার বাবার কথাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কথা, আমার, আমাদের সকলের কথাই আছে।

রাধা। বলুন।

বিক্রম। এই যে ডাক্তারবাবু বল্লেন আপনাকে, ভয় আর নেই, সেটা আপনাকে আশ্বাস দেবার জন্তে। উনি আপনাকে চেনেন না, কিন্তু আমি তো চিনি। ও বৃথা আশ্বাসে অন্ত মেয়েদের প্রয়োজন থাকতে পারে, আপনার নেই। ভয় এখনও যথেষ্টই আছে।

রাধা। কিন্তু ডাক্তারবাবু তো হার্ট দেখে বল্লেন হার্ট ভাল আছে।

বিক্রম। সেটা মিছে আশ্বাস নয়, সেটা সত্যি। হার্ট ভাল আছে। কিন্তু এই হাই ব্লাড্‌প্রেসার আর তার সঙ্গে এরকম এক্‌সাইটেব্‌ল্ নার্ভ্‌স্, এ দুটোর ওপর যে মোটেই ভরসা নেই। এতে হয় কী, সামান্ত কারণেই—যাক—

রাধা। তা ব্লাড্‌প্রেসার কি নামানো যাবে না বীরুবাবু? কী করলে নামতে পারে, বলুন?

বিক্রম। সেই চেষ্টাই তো করতে হবে আমাদের। আর তারই জন্তেই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা। নীলমণিবাবু কী করে জানবেন রোগের মূল কোথায়? উনি রোগীকে ওষুধ দিয়ে, আর তাঁর আত্মীয় স্বজনকে আশ্বাস দিয়েই গেলেন। কিন্তু আসল চিকিৎসা আপনাকেই হাতে নিতে হবে, মিসেস সেন।

রাধা উদ্বিগ্ন কৌতূহলে শুনিতেছিল, কথা কহিল না।

আজ দু সপ্তাহ উনি বিছানায় পড়ে আছেন, কিন্তু প্রকৃত রেষ্ট উনি এক মুহূর্ত পাচ্ছেন না। কারণ ওঁর মনের বিশ্রাম নেই এক মুহূর্ত। মনের কাঁটা ওঁকে পাগল করে তুলেছে। কী সে কাঁটা জানেন মিসেস সেন?

রাধা। জানি। আমিই ওঁর সকল রোগের, সকল কষ্টের কারণ, তা জানি বই কি বীরুবাবু।

বিক্রম। জানেন, কিন্তু সবটা জানেন না। আপনার দুর্ভাগ্য ওঁকে অসুস্থ করেছে, কিন্তু সেই অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলেছে ওঁর নতুন চিন্তা—উনি আপনার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়তে চান।

রাধা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

উনি আপনার আবার বিয়ে দিতে চান।

রাধা। আমার বিয়ে? বাবা আমার বিয়ে দিতে চান? এ কী অসম্ভব কথা বলছেন বীরুবাবু?

বিক্রম। অসম্ভব, সেটা আপনার আমার মতো আপনার বাবা কম জানেন না। সেই অসম্ভবের চিন্তাই তো পাগল করে তুলেছে ওঁকে। ঐ অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্তে উনি সম্ভব অসম্ভব কত প্ল্যান গড়ছেন আর ভাঙছেন রাত্রি দিন, চব্বিশটি ঘণ্টা এবং যতই এই অসাধ্য সাধনের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, ততই রোগ ওঁকে বেড়ে ধরছে। আমার সঙ্গে তো অন্ত কথাই নেই।

রাধা। বাবা এই কথা বলেন! সে সম্বন্ধ শেষ করে দিতে বলেন বাবা? বাবা এরই মধ্যে তাকে ভুলে গেলেন? তাকে যে অত ভাল—

বিক্রম। ভুল করবেন না, মিসেস্ সেন। তাকে হারিয়ে ওঁর যা অবস্থা, এক মাত্র ছেলে হারালে কোনও বাপের অবস্থা তার চেয়ে খারাপ হয় কি না আমি জানি না। কিন্তু আপনার কথাও তো উনি ভুলতে পারছেন না। আপনার সারাটা জীবনের কথা—

রাধা। অসম্ভব।

বিক্রম। সম্ভব হলে কি রোগ বাড়তো? না, সমস্যা এত জটিল হত?

রাধা। কিন্তু—আমি কী করব? আমার তো কিছু করবার নেই বীরুবাবু? এ যে কানে শুনলে পাপ হয়। আমি কী করতে পারি?

বিক্রম। বলছি। কিন্তু তার আগে আপনার বাবার ইচ্ছের বাকীটুকু বলি। আপনার তিনি আবার বিয়ে দিতে চান, পাত্রও ঠিক করেছেন। কাকে জানেন?…আমাকে।

রাধা। আ-আপনাকে ?

বিক্রম। হ্যাঁ। আমাকে। কেন নয় বলুন ? আমার বাপমা আত্মীয়স্বজন কেউ নেই যে এ রকম বিয়েতে বাধা দেবে। দুটো পয়সা রোজগার করেও আনছি, অন্ততঃ আমার চেয়ে কম রোজগার করেও লোকে সংসার করছে। তা ছাড়া আমাকে পাত্র স্থির করার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে—আমার সঙ্গে আপনার এই—মানে—এই বন্ধুত্বের সম্বন্ধ। উনি জানেন আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আর আপনিও আমাকে বন্ধুভাবেই দেখেন।

রাধা। বাবার এই ইচ্ছে ? আর আপনিও তাতে সম্মতি দিয়েছেন ?

বিক্রম। আমার সম্মতির কথা তো আসে না, আমার মতামতের কথাও আসছে না। আপনার বাবার মনের ইচ্ছের কথাই বলছি। তিনি চান আপনাকে সুখী দেখতে, তিনি চান একদিন যেন আবার আপনার মুখে হাসি ফোটে, সংসারের দিকে মন ফেরে আপনার। হয় তো আমি পারি সেই মন ফেরাতে—, এই তিনি আশা করেন।

শুনিতে শুনিতে রাধার মুখ কঠিন হইল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইল।

রাধা। আর আপনি ? আপনিও তাই আশা করেন ? বলেছেন বাবাকে ?

বিক্রম। তা বলিনি ; তবে এ-ও বলতে পারি নি যে এ আশা তাঁর দুরাশা।

রাধা। (তীব্র কণ্ঠে) আপনি তাঁর সারা জীবনের বন্ধু ছিলেন, আমার এই অসহায় অবস্থায় আপনাকেই একমাত্র বন্ধু বলে মনে করে আপনার সঙ্গে মিশেছি, আর আপনি মনে মনে আমার সম্বন্ধে—

বিক্রম। ও কথা বলবেন না, ও কথা বলবেন না মিসেস সেন। ছি ছি ছি ছি। আপনি এত বড় ভুল করলেন কী করে। আমার কথাই আসছে না। আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা, কোনও উদ্দেশ্য নেই, ঈশ্বর জানেন। আমি শুধু আপনার বাবার তীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাই বলেছি।

রাধা। সে আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ হতে পারে না আপনি জানেন, তখন এ সব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন ? আমি কী করতে পারি ?

বিক্রম। অভিনয়।

রাধা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

ওঁর সমস্যা কত গুরুতর, কত জটিল, তা বুঝতে পারছেন না ? আপনার আবার বিবাহ দিতে চান, কিন্তু তা দিতে গেলে আপনাকে আগে জানাতে হয় যে আপনি—আপনি—

রাধা। বুঝেছি। আমার সর্বনাশের খবর আমাকে আগে জানাতে হয়। তাও পারছেন না।

বিক্রম। পারছেন না। কারণ, তারপর যদি আপনি বিবাহে রাজী না হন। তার চেয়ে তো আপনার বর্তমান অবস্থাই ভালো, দুর্ভাগ্যের কথা না জেনে আছেন সেই ভালো, যতদিন এমনই কাটে...

রাধা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল

রাধা। তাই আমাকে অভিনয় করতে হবে যেন আপনার প্রতি—

বিক্রম উত্তর দিল না।

না, না, সে হয় না, সে আমি পারব না।

বিক্রম। বেশ, পারতে আমি বলছি না। কিন্তু কেন পারবেন না বলুন তো ? এ তো সত্য নয়। আমাকে বিশ্বাস করুন, যেদিন আপনার বাবা এই টালটা সামলে উঠবেন, যেদিন আপনি আমাকে বলবেন আমার উপস্থিতি এখানে অনাবশ্যক, সেই দিন সেই মুহূর্তে আমি চলে যাব। বিশ্বাস করুন।

শুনিয়া রাধার দৃষ্টি কোমল হইল।

রাধা। সে আমি বিশ্বাস করি। সে কথা নয়। দেখুন অভিনয় যদি বলেন, এতদিনও অভিনয়ই করেছি, তাতে প্রতারণা অবশ্য আছে, কিন্তু গ্লানি নেই। কিন্তু এ তো তা নয়। বাবার ধারণা—আমাকে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন, আমি কিছু জানি না। তা হলে আমি—আমি কেমন করে ও অভিনয়—, না, আমি পারব না, বীরুবাবু, ও আমি পারব না।

বিক্রম। (কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া আস্তে মাথা নাড়িয়া বলিল) তা বটে, তাই বটে। এ আপনি পারবেন না, পারা উচিত নয়। আচ্ছা, থাক। আপনাকে কিছু করতে হবে না। কেবল আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখতে পারবেন মিসেস্ সেন ? সামান্য একটু অনুরোধ ?

রাধা। আপনি অমন করে বলছেন কেন বীরুবাবু ? আপনার চেয়ে বড় বন্ধু আর আমার—আমাদের কে আছে।

বীরু। তবে আপনার কথাতেই বলি। এই বন্ধুত্বটা তো অভিনয় নয় ?

রাধা। না।

বীরু। সেই বন্ধু হিসেবেই বলছি। আপনার বাবার একটা বড় দুঃখ এই যে আপনাকে তিনি জগৎ সংসার থেকে নির্বাসিত করে এই দীর্ঘকাল ধরে একটা বুড়ো মানুষের রোগশয্যার ধারে বন্দী করে রেখেছেন—

রাধা। আমার নিজেরই কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

বীরু। সে আমি জানি। আর এও আমি জানি যে আপনি কোথাও গেলেও ওঁর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকবে না। কিন্তু আপনার নিরানন্দ বন্দী অবস্থা দেখেও খুশী হতে পারেন না। ঠিক কি একটা মিসেস সেন ?

রাধা। হুঁ।

বীরু। সেই জন্যে, ওঁকে প্রফুল্ল রাখবার জন্যে আমরা, মানে আপনি, অমু আর আমি যদি মধ্যে মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায়, এই এদিকে ওদিকে ঘুরে আসি, সেটা কি পারবেন না ?

রাধা। কিন্তু ভালো লাগে না বীরুবাবু, আমার ভালো লাগে না। এই পোড়ামুখ পৃথিবীতে বার করতে আমার ইচ্ছে করে না। আচ্ছা, দেখব।

বীরু। ভাট্ উইল্ ডু। আচ্ছা, আমি একবার ওষুধটার চেষ্টা দেখি, আর আমার বোর্ডিংটা ঘুরে আসব, ছুটি এক্সটেন্সনের দরখাস্ত করেছিলুম, কোনও জবাব এল কিনা—

চলিয়া যাইতেছিল—

রাধা। বীরুবাবু, দাঁড়ান। আপনার কাছে আমি অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করুন। (হাতজোড় করিল)

বীরু। ও কী? আমার কাছে অমন হাতজোড় করবেন না, (রাধার যুক্তকর খুলিয়া দিবার জন্ত হাত বাড়াইয়াছিল, কিন্তু স্পর্শ করিবার ভয়ে নিরস্ত হইল) হাত খুলুন আপনি, হাত খুলে ফেলুন।

রাধা। আগে বলুন ক্ষমা করলেন।

বীরু। কী ক্ষমা করব মিসেস সেন? আপনার অপরাধ কী? আমিই কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারি নি।

রাধা। না, বীরুবাবু, অপরাধ আমার হয়েছিল বইকি, আপনাকে অবিশ্বাস করেছিলুম, আপনার সঙ্গে রূঢ়ভাবে—

বীরু। ঠিক আছে, ঠিক আছে। উই আর ফ্রেণ্ডস্। যান আপনি রোগীর কাছে গিয়ে বসুন। আমি ঘুরে আসি।

বিক্রম চলিয়া গেল। রাধা চিন্তাগ্রস্ত ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহির হইতে দুই ব্যক্তির কথা শুনিতে পাওয়া গেল—

বিক্রম। (নেপথ্যে) আজ্ঞে হাঁ, এইটেই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী।

অজ্ঞকণ্ঠ। (নেপথ্যে) তা হলে ঠিকই এসেছি, তা—আপনি কি এইখানেই থাকেন?

বিক্রম। (নেপথ্যে) আজ্ঞে না, আমি জলপাইগুড়িতে থাকি। আমি ওঁর জামাইয়ের—

অজ্ঞকণ্ঠ। (নেপথ্যে) জলপাইগুড়ি? হাঁ, হাঁ, আর বলতে হবে না। আচ্ছা, তুমি এস বাবা।

মহেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু শিবশেখর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শাদা মাথা, শাদা দাড়ি, পরণে ছোট বহরের মোটা খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের চাদর, গায়ে জামা নাই, আজানু ধূলিধূসর পায়ে চটি জুতা, এক হাতে শাদা ক্যানভাসের একটি ব্যাগ, অন্য হাতে ছাতি ও লাঠি। দেহ দীর্ঘ, অনুন্নত ও ঋজু। তিনি রাধাকে সম্মুখে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—

শিবশেখর। (ব্যস্তভাবে) এই যে রাধা মা, যাক, তা হলে ঠিক বাড়ীতেই এসেছি। বাবা কেমন আছে বল?

রাধা। (এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের প্রথম বিস্ময় কাটাইয়া) জ্যেঠামশাই! আপনি এসেছেন। (প্রণাম করিল) এ কী চেহারা হয়েছে জ্যেঠামশাই? বসুন, বসুন। (চেয়ার ঘুরাইয়া দিল।) দিন ব্যাগ দিন।

শিবশেখর। না, না, ও থাক, আগে বল্ তোর বাবা, বাবা কেমন আছে?

রাধা। দিন পনের আগে একদিন অজ্ঞান মতো হয়ে—

শিবশেখর। (অধীরভাবে) সে শুনেছি, শুনেছি। এখন? এখন আছে?

রাধা। এখন আগের চেয়ে কতকটা ভালো আছেন। এখানে না বসেন আপনি ভেতরে চলুন।

শিবশেখর। আছে? আগের চেয়ে ভালো আছে তো? (ব্যাগ ও ছাতি লাঠি রাখিল।) তবে দাঁড়া, রিক্‌শাটার ভাড়া দিয়ে আসি। ওটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। মনে করেছিলুম, যদি—যদি মহিন্দরটাকে দেখতে না পাই, তবে তোদের বাড়ীতে আর—(নেপথ্যে রিক্‌শার ঘণ্টার শব্দ উঠিল। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন) আরে যাচ্ছি রে বাবা যাচ্ছি। ওটাকে বিদেয় করে এসে বসি। অনেক গল্প আছে তোর সঙ্গে, মহিন্দরের জন্তে ভাবনা নেই।

বলিতে বলিতে বাহিরে গেলেন। রাধা প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখে অপেক্ষা করিতেছে।

মঞ্চ ঘুরিল

মহেন্দ্রবাবুর কক্ষ। খাটের উপর পীড়িত মহেন্দ্র মুদিত নয়নে শুইয়া আছেন, মাথার কাছে দাঁড়াইয়া অনুরাধা হাওয়া করিতেছে।

মহেন্দ্র। (চোখ খুলিয়া) তুই সেই থেকে হাওয়া করছিস মা? থাক্, থাক্, হাত ব্যথা করবে যে।

অনুরাধা। হাঁ, আমি যেন কচি খুকী, এরই মধ্যে হাত ব্যথা করবে। এই তো আসছি আমি।

মহেন্দ্র। তা হোক, আর হাওয়ার দরকার নেই। তুই আয়, পাখা রেখে তুই আয়, আমার কাছে বোস।

অনুরাধা পিতার কোলের কাছে খাটের উপর বসিল। মহেন্দ্র উঠিয়া বসিতে উদ্যত হইলেন

অনুরাধা। ও কী, বাবা? তুমি ফের উঠছ? দিদি না অত করে বারণ করে গেল?

মহেন্দ্র। তোর দিদির কথা ছেড়ে দে। এই বালিশটা একটু তুলে দে তো, হাঁ, এই হয়েছে। আঃ! কিন্তু এর পর? এর পর কে করবে আমার সেবা তাই ভাবছি।

অনুরাধা। কেন? আমরা দুবোন রয়েছি। ভাবনাটা কী।

মহেন্দ্র। তোমরা আর কত কাল করবে মা। হাঁরে, রাধু কোথা গেল?

অনুরাধা। ঐ যে বারান্দায় বীরুদার সঙ্গে কথা কইছে। ডাকব দিদিকে?

মহেন্দ্র। বীরুর সঙ্গে কথা কইছে? না না ডাকতে হবে না, ডাকতে হবে না। তুই বোস।—আহা, বড় ভালো ছেলে বীরু। (মেয়ের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) হাঁরে অনু, তোর দিদি চলে গেলে তুই আমার সব ভার নিতে পারবি?

অনুরাধা। (সাগ্রহে) দিদি কোথা যাবে? শ্বশুর বাড়ী?

মহেন্দ্র। হুঁ।

অনুরাধা। কবে বাবা? জামাইবাবু ফিরে আসছেন বুঝি? চিঠি এসেছে? কই দেখি?

মহেন্দ্র। না, না, চিঠি নয়। চিঠি কি আসে?

অনুরাধা। খবর পেয়েছ বুঝি? কবে দিদিকে নিয়ে যাবে? হ্যাঁ বাবা? কী ভাবছ?

মহেন্দ্র। তোর দিদি চলে গেলে আমার দশা কী হবে তাই ভাবছি।

অনুরাধা। কেন? আমি তো আছি। আমি তোমার সব কাজ করব। দিদির মতন ভালো পারব না হয়তো, কিন্তু তাই বলে তুমি যেন দিদিকে পাঠাতে একটুও দেরী কোরোনা। আমি সব করব। কী? বিশ্বাস হয় না বুঝি আমাকে?

মহেন্দ্র। না, তা নয়। কিন্তু তুমিই বা ক'দিনের? মেয়ে পরের জিনিস, দু'দিন বাদে তুমিও তো পরের বাড়ী চলে যাবে। তখন?

অনুরাধা। (নতমুখে) না বাবা, আমাকে তুমি বিদেয় করে দিও না, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, তোমার কাছে থাকব আমি।

মহেন্দ্র। আমার কাছে ক'দিন থাকবি মা? আমি তো চলে যাব শিগ্‌গিরই। তখন কী করবি বল?

অনুরাধা। কাজের ভাবনা কী বাবা? আমি দেশের কাজ করব। দেশে কত কাজ রয়েছে, ছেলেরাই সব কাজ করবে, আর আমরা কেবল ঘরে বসে ভাবব, নয় গল্প করব? দেশের জন্য কিছু করব না আমরা?

(নিজের উৎসাহের আধিক্যে হঠাৎ লজ্জা অনুভব করিয়া থামিয়া গেল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে বলিল)—জামাইবাবু আসছেন, দিদিকে বলেছ বাবা?

মহেন্দ্র। (ব্যস্তভাবে) না, না, দিদিকে এসব কথা কিছু বোলো না যেন, খবরদার বোলো না। আগে দেখি খবরটা পাকা কি না। মিথ্যে আশা করা, সে বড় কষ্ট মা, সে বড় কষ্ট।

মহেন্দ্রর মাথার দিকের দরজা দিয়া রাধা ও শিবশেখর প্রবেশ করিল

রাধা। বাবা, কে এসেছেন বলতো?

মহেন্দ্র। এ কী! শেখর! তুমি এসেছ?

অনুরাধা। জ্যাঠামশাই!

(সে খাট হইতে নামিয়া একপাশে দাঁড়াইল)

শিবশেখর। হ্যাঁ, আমি এসেছিই তো। এবং আমিই এসেছি তো। কিন্তু তোমার মতলব কী বল তো মহিন্দর? তাড়াতাড়ি সরে পড়বে মনে করেছ?

মহেন্দ্র। রাধু, চেয়ারটা এগিয়ে দে। তাহলে তো বাঁচি রে ভাই। তাহলে বেঁচে যাই।

শিবশেখর। বটে! বুড়োমো হচ্ছে বুঝি? (রাধাকে চেয়ার আনিতে দেখিয়া) আরে রাখ্‌, বাপু তোদের চেয়ার টেবিল। আমি এই বসলুম চেপে গদিয়ান্‌ হয়ে, তারপর যা করতে পারিস কর, কেমন করে তাড়াস দেখি একবার।

বিছানার উপর উঠিয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিলেন।

অনুরাধা আসিয়া প্রণাম করিল

শিবশেখর। এই তো আমার ছোট মা নয়? আরে তুই যে মস্ত লম্বা হয়ে গেছিস এই দু'বছরের মধ্যে। একেবারে ডবল প্রমোশন পেয়ে গেছিস্‌ নাকি? কিন্তু শুধু পেন্নাম করলে তো হবে না। আমার খোরাক চাই। উঃ, কম খোয়ানটা ঘুরেছি তোর বাবার এই অজ্ঞাতবাস আবিষ্কার করতে! চাকরটাকে ডাক না মা একবার, একটু খোরাক দিক।

অনুরাধাকে রাধা ইঙ্গিত করিল

অনুরাধা। আমি আনছি জ্যেঠামশাই।

অনুরাধা বাহিরে গেল। রাধা উভয়কে বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইল

শিবশেখর। কিন্তু হঠাৎ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এসে উঠলে কেন বল তো?

মহেন্দ্র। সে বলবো অখন পরে।

শিবশেখর। তাই বোলো, আমার তাড়া নেই।

মহেন্দ্র। কবে ফিরলে কাশী থেকে? তোমাকে আমার ঠিকানাই বা দিলে কে? অসুখের খবরই বা পেলে কোথায়?

শিবশেখর। ফিরেছি—তা দিন আষ্টেক হবে। হাওড়া ষ্টেশনে নেমেই আমাদের নীলু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। তারই কাছে শুনলুম তোমার এই বেয়াদবির কথা। ফেন্ট্‌ হওয়াও চলছে। ভাবলুম মহিন্দরটা অজ্ঞান তো বরাবরই, এবার আবার জ্ঞান হারিয়ে হ্যাণ্ডিক্যাপে আমাকে বুঝি মেরে দেয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

মহেন্দ্র। তা দেব ভাই, তোমাকে মেরে দেব। শেষ কারণ্ডটা এসে গেছি. ফিনিস্‌ দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে মেরে দেব।

শিবশেখর। দাও দেবে, তোমার ধর্ম তোমার কাছে। কিন্তু সে রকম কথা ছিল না।

রাধা। আট দিন কলকাতায় এসেছেন জ্যাঠামশাই, ডাক্তারবাবুর কাছে ঠিকানাও পেয়েছিলেন, আর আজ আসবার সময় হল আপনার? কে আসতে বলেছিল?

শিবশেখর। এই রে! মায়ের কোপে পড়লুম দেখছি! আরে, আসবার কী জো আছে মা! সে এক কোত্থেকে ঝঞ্ঝাট এল ঘাড়ে—ত্রাসাতন, জ্বালাতন! বেলুড়ে গিয়ে এক সপ্তা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা আর দেখতে দিলে না।

মহেন্দ্র। ঝঞ্ঝাটের তোমার তো অন্ত নেই কোনও দিনই। যত রাজ্যের ঝঞ্ঝাট কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে ঘাড়ে নেবে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় যে তোমাকে।

শিবশেখর। তাই বটে। কাশীতে গেছি শেষ দুটোদিন নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে নিঃশেষ কেসব মনে করে, তাও কি নিস্তার নেই! এক দণ্ড কি শান্তি আছে হে! বলে, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।

রাধা। কাশীতে কেমন ছিলেন জ্যেঠামশাই? দুবছরের পর তো কলকাতায় এলেন, না?

শিবশেখর। তা হবে, বছর দুই হবে বই কি। আছি খুব ভালো, চমৎকার আছি। মা অন্নপূর্ণা দুটো ভাত দিচ্ছেন, আর সারাদিন বগল বাজিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার ভাবনা কী?

মহেন্দ্র। আর এই বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে। ঝঞ্ঝাট।

শিবশেখর। শোনো, বুড়োর কথা শোনো। যথার্থ নয় তো কী? তুই হলে পাগল হয়ে যেতিস মহিন্দর, ভাবনায় চিন্তায় উন্মাদ পাগল হয়ে যেতিস।

মহেন্দ্র। তার জন্তে কাশী যেতে হয় না।

রাধা। আমি কক্‌খনো কাশী যাইনি। আমার বড্ড কাশী যেতে ইচ্ছে করে।

শিবশেখর। (পরম আগ্রহে) যাবি? কাশী যাবি? চল্, আমার সঙ্গে চল্। আমি পরশু যাচ্ছি। অমন জায়গা আর নেই, চ, মায়ে পোয়ে যাওয়া যাক্। পরশু সন্ধ্যে ৭-৫২-এ গাড়ী, বুঝলি? তাহলে আমি এই সাড়ে ছ'টা নাগাদ্ এসে তোকে তুলে নিয়ে যাব। কেমন?

রাধা। পরশু যাব কেমন করে জেঠামশাই?

মহেন্দ্র। তুই যেমন পাগল রাধু। ও বুড়োর কি কোনও হিসেব আছে, না জ্ঞানগম্যি আছে। বল্লেই হল—চল্, কাশী চল্।

শিবশেখর। তুমি থামো তো হে ছোকরা। কেন হবে না? আমি আবার ফিরে আসছি তো দু তিন দিন পরেই। আমার সঙ্গে চলে আসবে। তুমি কিছু ভেবো না মা। আমি তোমাকে নিয়ে যাবই, এই বলে দিলুম। ও বুড়োর কথা ছেড়ে দাও।

রাধা। আমাদের যাওয়া কি অত সহজ জেঠামশাই! আপনারা পুরুষ মানুষ, যত বুড়ো হন আর যাই হন, যখন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে চললেন। আমাদের কি অত স্বাধীনতা আছে?

শিবশেখর। বটে বটে। আমারই ভুল। বুড়ো হওয়ার অনেক গুণ, কিন্তু একটা মহৎ দোষ—বয়সটা বেড়ে যায়, অগ্র পশ্চাৎ খেয়াল থাকে না। বাবাজীর মতটা একবার নিতে হবে বই কি। বাবাজী বুঝি বেরিয়ে গেলেন? ঠিক আমিও ঢুকছি আর বাবাজীও বেরোচ্ছেন, বুঝলে মহিন্দর?

মহেন্দ্র। না, না, শোনো—

শিবশেখর। আমি আসতে পারিনি, দেখিওনি। আজ দেখলুম, চমৎকার জামাই করে—

কথা চাপা দিবার জন্ত মহেন্দ্র ব্যস্ত হইলেন।

মহেন্দ্র। শোনো নাহে, ও শেখর, বলি তোমার দু তিন দিনের জন্তে কাশী ছোটবার কারণটা কী হল আবার? এই তো এলে কত কাল পরে—

ইতিমধ্যে অনুরাধা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে গড়গড়া হাতে মধু। সে গড়গড়া রাখিয়া গেল। অনুরাধা তাহাতে কলিকা স্থাপন করিয়া নলটা শিবশেখরের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

শিবশেখর। দুদিনের জন্তে কাশী ছোটার কারণ? তবে আর গেরো বলেছে কেন? কতকগুলো অপোগণ্ড কাচ্চা বাচ্চা দিলে আমায় কি এক দণ্ড বিশ্রাম দেবে কোথাও? যত পাপের ভোগ এই আমার কপালে!

তিনি ধূম পানে রত হইলেন।

মহেন্দ্র। কাচ্চাবাচ্চা? কার কাচ্চাবাচ্চা? কী বকছ হে পাগলের মতো?

শিবশেখর। পাগলই বটে! এদের জ্বালায় পাগল হতে আর বাকী নেই। কাচ্চা বাচ্চা কি আমার একটা রে মহিন্দর? সাতটি মেয়ে আর চারটি—,না, না, চারটি মেয়ে আর সাতটি—, কে জানে অত খেয়াল থাকে না, এই এতগুলিকে রেখে এসেছি কাশীতে। আবার এই একটি এলেন এ সপ্তাহে। যাই এটাকে রেখে আসি বাড়ীতে।

মহেন্দ্রর বিস্ময় বাড়িল, বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিলেন—

মহেন্দ্র। এই সপ্তাহে এসেছে? কার ছেলে? কত বড়ো ছেলে?

শিবশেখর। (উচ্চহাস্য) নাঃ, তুমি ভয়ঙ্কর বুড়ো হয়ে গেছ মহিন্দর, তোমার আর আশা নেই। বলছি এই সপ্তাহে হল, আর বলে কত বড়ো ছেলে!

মহেন্দ্র। কিন্তু কাদের ছেলে?

শিবশেখর। কাদের ছেলে তা কে জানে? আর জেনেই বা সুবিধে কী হতো বল? পড়ল তো আমার ঘাড়ে। দুর্গ্রহ আর কাকে বলে।

রাধা। (অল্প হাসিয়া) কিন্তু আপনার মুখ দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন জেঠামশাই? আপনার ঘাড়ে পড়ে নি, আপনিই যেন ঘাড় বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মহেন্দ্র। তাই বটে! আর লোক পেলে না, তোমার ঘাড়েই বা পড়ল কেন শুনি?

শিবশেখর। ঐ তো বল্লুম, গেরোর ফের। গিয়েছিলুম বেলুড় মঠে। মহারাজের চরণ দর্শন করতে। কলকাতায় এলেই যাই একবার, এইটুকু কৃপা আছে আমার ওপর। (উদ্দেশে প্রণাম করিলেন ও কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন—) মেয়েটাকে দুদিন আগে গঙ্গার ধারে মরণের মুখ থেকে ওঁরাই উদ্ধার করেছিলেন, হাসপাতালে ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন ওঁরা। সেইখানেই এলেন অপ্রার্থিত ধন।

রাধা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

রাধা। তা আপনি কাশী নিয়ে যাচ্ছেন, ছেলের বাপ মা—

শিবশেখর। বাপের খবর তো জানিনে মা, তবে মা হতভাগী বেঁচে গিয়েছে। তাকে আর বিশ্বনাথের পায়ের তলায় টেনে নিয়ে যেতে পারলুম না। যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল। গঙ্গাতীর থেকে ধরে আনা হয়েছিল, গঙ্গাতীরেই রেখে এলুম। থাক্, সেখানে পতিত-পাবন ঠাকুর আছেন, তাঁর কাছে সৎও নেই অসৎও নেই। পতিতাও যেমন, সাধ্বীও তেমন, সকল মেয়েই মা, সবাই জগৎজননীর অংশ। (নিজের ভাবেই বলিয়া যাইতেছেন, সেই ভাবের মুখে কেহ প্রশ্নের দ্বারা বাধা দিল না। নিজেই চুপ করিলেন। তথাপি পিতাপুত্রী কোনও মন্তব্য বা প্রশ্ন করিল না। পুনরায় বলিতে লাগিলেন—) আমার পায়ে ধরে' কান্না। বল্লুম, আমার পা ছেড়ে দে মা, ছেড়ে দে। ঐ মঠের মন্দির দেখা যাচ্ছে, ঐদিকে চেয়ে দেখ। তোর ছেলের চিন্তা উনিই করছেন, ওঁর চিন্তাটা তুই কর। জগজ্জননীর রাজ্য, যাকে চাসনি, যার আসার ভয়ে মরতে ছুটেছিল—তাকেই ফেলে যেতে কী কান্না!

শিবশেখরের চক্ষু যেন সেই গঙ্গাতীরবর্ত্তী মৃত্যুমুখী জননীর শেষ ক্রন্দন পুনরায় প্রত্যক্ষ করিতে ছিল। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্মশানকালজয়ী চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার শ্বেত শ্মশ্রুর উপর ঝরিয়া পড়িল।

রাধা। ছেলেটিকে কার কাছে রেখে এলেন জেঠামশাই?

শিবশেখর। কার কাছে আর রাখব মা, কে রাখতে রাজী হবে? বলে কয়ে দুটো দিনের জন্তে হাসপাতালেই রেখে এসেছি।

ক্ষণকাল সকলে নীরব রহিল।

মহেন্দ্র। শেখর, ভাই, তোমাকে কী বলব, তুমি মানুষ নও, তুমি—

শিবশেখর (ধমক দিয়া) তুই থাম তো মহিন্দর। আমার বলে ভাবনায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, একা মানুষ, বুড়ো বয়সে এই এক ডজন কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কী বিপদে যে আমি পড়েছি তা আমিই জানি। বলে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে! আমার হয়েছে তাই।

মহেন্দ্র। সত্যিই তো, অতগুলো শিশু, সব দেখা শোনা করছে কে? চালাচ্ছ কী করে?

শিবশেখর। আরে, দেখা শোনার ভাবনা কী? সব হতভাগীরাই তো আর অত সহজে মুক্তি পায় না। আবার যেমন মা-হারা সন্তান আছে, তেমনই সন্তান-হারা মা-ও তো রয়েছে কত। আর সবার ওপোরে আছেন মা অন্নপূর্ণা। চালাচ্ছেন তিনি, ভাবছেনও তিনি। আমার কিসের ভাবনা? যার কাজ সে কি আর ঘুমোচ্ছে রে মুখখু? সে আমার চেয়ে চালাক, এমনকি বোধহয় তোর চেয়েও চালাক, হাঃ হাঃ হাঃ…আমার ভাবনা কী?

মহেন্দ্র। নাঃ, তোমার আর ভাবনাটা কী। যথাসর্ব্বস্ব ঐতেই ঢেলে দিচ্ছ বুঝতে পারছি, আর বুড়ো বয়সে দিগ্‌বিদিক ঘুরে মরছ, ভাবনা আর কী!

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। উঠুন জ্যেঠামশাই, পা ধোবেন চলুন।

শিবশেখর। (বিস্ময়ের ভান করিয়া) পা ধোবো? কেন? পায়ে তো কিছু মাড়াইনি। একটু ধুলো লেগেছে মাত্তর।

অনুরাধা। নাই বা কিছু মাড়ালেন। চলুন হাতে পায়ে একটু জল দেবেন না?

শিবশেখর। (পরম লোভী বালকের মতো) ও—, খাবার দিবি বুঝি? দে মা, এইখানেই দে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। খুব মনে করিয়ে দিয়েছিস ছোট মা। শীগগির দে, শীগগির দে।

রাধা। (সহাস্তে) জেঠামশাই তোর হাইজিন্ টাইজিন্ মানেন না অনু। তুই নিয়ে আয়।

শিবশেখর। আরে মানব না কেন? উদর ও অন্যান্য অবয়ব পড়েছিস তো? উদরের ব্যবস্থা করলে অন্যান্য অবয়বকে আর দেখতে হবে না। এ হল হাইজিনের ওপোর হায়ারজিন, কথামালার শিক্ষা। হাতে পায়ে জল দেবার দরকার কী?

অনুরাধা। আপনি ভারি পেটুক হয়েছেন দেখছি জেঠামশাই।

শিবশেখর। পেটুক বলিসনে মা, অত নীচ আমি নই। এটা হল আমার ঔদর্য্য। সকলের সঙ্গেই কুটুম্বিতে স্থাপন করে চেয়ে-চিন্তে খাই, শাস্ত্রে বলেছে, উদরচরিতানাম্ বসুধৈব কুটুম্বকম্। (বলিয়া উদরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।)

দুই ভগ্নী অদ্ভুত শাস্ত্রবাক্যে হাসিয়া ফেলিল

অনুরাধা। (হাসিতে হাসিতে) মানে কী জেঠামশাই? কুটুমের বাড়ী গিয়ে তার বক্ মানে বকম খাবে?

শিবশেখর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, তা খেতে পার। কিন্তু কম খাবে না। কুটুম্বকম্ কিনা কুটুম্বিতে করে কম খায় লোকে।

রাধা। আঃ, অনু, কী দেরী করছিস? যা, খাবার নিয়ে আয়।

হাসিতে হাসিতে অনুরাধার প্রস্থান

শিবশেখর। দিব্যি আছ হে, মহিন্দর। বুড়ো হওয়ার এড্‌-ভ্যানটেজও আছে দেখছি। দুই লক্ষ্মী সরস্বতীর সেবা খাচ্ছ, আর শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছ। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, পরম শান্তিতে আছ।

রাধা। যাই, আপনার চা-টা নিয়ে আসি। অনু একলা পারবে না।

সে যেন পলাইয়া গেল

শিবশেখর। তোরা সুখে আছ, তা অসুখ করবে না কেন? এ রকম সেবা পেলে আমারও রোজ—

মহেন্দ্র। কোথায় এসে উঠেছ?

শিবশেখর। উঠব আবার কোথায়? যেখানে হোক রাতটা কাটিয়ে দেওয়া বইতো নয়।

মহেন্দ্র। সে জানি, প্ল্যাটফর্ম আছে, পার্ক আছে, রাত তোমার কেটে যাবেই। কিন্তু খাওয়া দাওয়া? সেটা কোথায় করছ?

শিবশেখর। শয়নং যথন হট্ট মন্দিরে বলতে পারলে, তখন ভোজনং যে যত্র তত্র তা আর মাথায় এল না? সে-ও ঠিক হচ্ছে, মা অন্নপূর্ণা কোন হাঁড়ীতে কখন এক মুঠো চাল দিচ্ছেন তা কি আমাকে আগে থাকতে বলে দিচ্ছেন। তাঁর রাজত্ব যে সর্বত্র—

রাধা ও অনুরাধা চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল ও একটি টিপয়ের উপর রাখিল

এই—এই দেখ। খাওয়ানোর কাজ যার সে ঠিক খাবার বয়ে এনে খাইয়ে যাচ্ছে। আমি তো পক্ষীশাবক। পেট তো আমার নয়, যে দিয়েছে ভরানোর দায় তারই। রাধু মা, এ দুটো দিন তবে তোরই আশ্রয় নিলুম। এমন সেবা ছেড়ে আর নড়তে ইচ্ছে করছে না।

রাধা। আপনাকে আমরা নড়তে দিলে তো। এই ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দেব। অনু, জেঠামশাইয়ের জন্তে পান সেজে নিয়ে আয় তো। আর বামুন ঠাকরুণকে বলে আয় সকাল সকাল ময়দাটা ভিজিয়ে রাখুক।

অনুরাধার প্রস্থান

শিবশেখর। পরশু দিনটা খুব দেরী করে আসে, অনেক দিন পরে আসে, তাহলে বেশ হয়।

রাধা। পরশু যবেই আসুক, আমরা আপনাকে ছাড়ছি না। ও কাশী টাশী এখন থাক।

শিবশেখর। না মা, পরশু যেতেই হবে। আবার আসব। বুঝলে মহিন্দর, এরই মধ্যে তোমার সেরে সুরে ওঠা চাই। সকাল সন্ধ্যে দুটি লম্বা মরণিং ওয়াক্ সেরে এসে দুটো দস্যি ছেলে যখন পাশাপাশি পাত পেড়ে বসবে, তখন দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবে না মা, তা বলে রাখছি—হাঃ হাঃ হাঃ……

রাধা। নিন্, খেয়ে নিন্ জেঠামশাই। এই বলছিলেন ক্ষিদে পেয়েছে।

শিবশেখর। ভয়ানক ক্ষিদে—

খাবারের থালি তুলিয়া কোলের উপর রাখিয়াছেন, এমন সময়
বিক্রমের প্রবেশ

এই যে এস বাবা, বেড়ানো হল?

বিক্রম। আজ্ঞে না, বেড়াতে যাইনি। এই ওষুধটা আনতে গিয়েছিলুম।

মহেন্দ্র। বীরু, তুমি শেখরকে চেন না। কী করেই বা চিনবে। ওর পরিচয়—পরিচয় ওর অনেক। গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ছিলেন, নন্‌কো-অপারেশন করে দু'তিন হাজার টাকার প্র্যাকটিস, রায়বাহাদুরী—

শিবশেখর। নাঃ, চুপ করে থাকতে দিলে না। ধান ভানতে শিবের গীত। মহিন্দরটার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে ভীমরথী ধরেছে দেখছি। আরে যত বাজে কথা, ওগুলো কি আমার পরিচয় হচ্ছে? আমি কি চাকরী খুঁজতে যাচ্ছি বাবাজীর কাছে? আসল পরিচয় আমি বলি শোনো বাবাজী, এক গাঁয়ে, একদিনে এসেছি, এক পাঠশালায় পড়েছি, আর, আর এই এক সঙ্গে যাব এই মনস্থ করেছি—তোমার শ্বশুর আর আমার মধ্যে এই সম্পর্ক, বুঝলে বাবা? হাঃ হাঃ হাঃ…

মহেন্দ্র। শেখর, তুমি ভুল করছ—

শিবশেখর। ভুল নয়রে ভাই, ভুল নয়। মনস্থ করেছি এটা তো মিথ্যে নয়, তারপর এক সঙ্গে যেতে পারি কি না পারি, কী বল বাবাজী—

মহেন্দ্র। আঃ, তুমি বুঝতে পারছ না—

শিবশেখর। কী আবার বুঝতে পারছি না, পণ্ডিত মশাই?

মহেন্দ্র। বীরু আমার জামাই নয়। আমার জামাইয়ের, আমাদের এবং সংসারের বন্ধু। উনি নিজেও ডাক্তার।

শিবশেখর। (গম্ভীর হইয়া গেলেন) আই য়্যাম্ সরি, মহিন্দর। আমার অন্যায় হয়েছে। আই এপলোজাইজ, বীরু বাবু। বুড়ো মানুষের জিবকে ক্ষমা—

বিক্রম। না, না, সে কী কথা? আমাকে ওকথা বলবেন না। (রাধার প্রতি) আমাকে আবার একটু বেরোতে হচ্ছে। আপনি এই ওষুধটা এক দাগ খাইয়ে দেবেন এখনই।

রাধা ঘাড় নাড়িল। বিক্রম ঔষধ রাখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত, শিবশেখর হঠাৎ খাট হইতে নামিয়া আসিতে আসিতে বলিল—

শিবশেখর। একটা কথা বলছিলুম, বীরুবাবু। (কাছে আসিয়া নিম্ন স্বরে) এসে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করবার মতো লোক পাইনি, যাকে বকছি, ডাক্তারে কী বলছেন বলুন তো—আপনিও তো ডাক্তার—

বিক্রম। ডাক্তার যা বলছেন—

শিবশেখর। না, না, এ ঘরে নয়, চলুন বাইরে—

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র। এই একটা মানুষ, রাধু। সত্যিই মানুষ একটা। এমনটি আর দেখলুম না।

রাধা। জেঠামশাইয়ের মতন মানুষ কি হয়? আমার বড় ইচ্ছে করে ওঁকে ধরে কাছে রাখি। এই বয়েস, এই খাটুনী, কেউ দেখবার নেই—কোথায় খান, কোথায় শোন—

বলিতে বলিতে এই পরম আত্মীয়ের প্রতি স্নেহে তাহার চক্ষু সজল হইল।

মহেন্দ্র। এই আবার কাশীতে কী কাণ্ড করে তুলেছে শুনলি তো? নিজের সংসার নেই, বিশ্বশুদ্ধ সংসার ওর নিজের হয়েছে।

রাধা। বলেছিলেন এইবার বিশ্রাম নেব মা, সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বলে' কাশী গেলেন—

মহেন্দ্র। ওসব লোকের বিশ্রাম নেই মা। বিষ্ণু কি ঘুমোয় রে! সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মার ছুটি আছে, সংহারকর্ত্তা রুদ্রের ছুটি আছে, পালন-কর্ত্তার ছুটি নিলে চলবে কেন?

অনুরাধা এক ডিবা ভর্ত্তি পান ও একটি অগস্ত কলিকা লইয়া প্রবেশ করিল।

অনুরাধা। কোথায় গেলেন জেঠামশাই?

রাধা। বাইরে বীরুবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন।

মহেন্দ্র। বরাবরই ঐ রকম ছিল, তবে তোর জেঠাইমা চলে যেতে একেবারেই ঘর ছাড়লে। অত বড় প্র্যাকটিস্, অত টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম, কিছুতেই ওর এক বিন্দু মায়া রইল না। বলে এত দিন তো গৃহস্থের ভূমিকা অভিনয় করলুম, কিন্তু কো-একট্রেস্ চলে গেলে আর পালা গাইব কাকে নিয়ে।

অনুরাধা। এবার জেঠামশাইকে আর যেতে দেব না, দেখনা—

—মঞ্চ ঘুরিল—

পূর্ব্বোক্ত বাহিরের বারান্দা। একাকী শিবশেখর দাঁড়াইয়া চাদরে চক্ষু মুছিতেছেন। পরে তিনি বারান্দার একপ্রান্তে রক্ষিত তাঁহার ব্যাগ, ছাতি, লাঠি তুলিয়া লইয়া চোরের মতো চুপে চুপে বাহির হইয়া যাইতেছেন, অর্দ্ধেক বারান্দা পার হইয়া আসিয়াছেন এমন সময় ভিতর হইতে বিক্রম প্রবেশ করিল, তাহার হাতে কয়েকটি ছোট বড় কাগজ, দৃষ্টি কাগজে নিবদ্ধ।

বিক্রম। এই দেখুন, তার উইলই বলুন আর—এ কী? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

শিবশেখর। হুঁ, যাচ্ছি।

বিক্রম। কেন? কোথায়?

শিবশেখর। আমি চল্লুম।

বিক্রম। কেন? এরই মধ্যে চল্লেন? আপনার যে খাওয়া হয়নি। এই অনুরাধা বলছিল আপনি থাকবেন কদিন, তাই ভাবলুম আপনাকে দেখাই—

শিবশেখর। না বাবা, আর থাকতে পারব না। কী করে থাকব? রাধা মা'র মুখের দিকে চাইব কী করে? না, সে আমি পারব না। এ বাড়ীতে আর আসব না আমি, আর আসব না।

বিক্রম। ঈস্! আমি তো বড় অন্যায় করলুম। আপনার কাছে পরামর্শ চাইবার জন্যে সব বলতে গেলুম, একলা কিছু ঠিক করতে পারছি না, এঁদের তো এই জটিল অবস্থা—

শিবশেখর। বিয়ের সময় আসতে পারিনি, কলকাতায় ফিরেছি আজ দুবছর পরে। কবে যে বিয়ে হল, কবে যে এমন ধারা কাণ্ড হল! তাই মহিন্দর এই বনবাসে এসে বাস করছে। আহাহা! ও কী করে এই শেল সহ্য করে আছে, তাই ভাবছি। তাই ওর এই কঠিন ব্যামো। আহারে! (চোখের জল ঝরিয়া পড়িল) ও কি আমার মতো ডাকাবুকো লোক? ঐ মেয়েই যে ওর প্রাণ—(চোখ মুছিয়া) আমি চল্লুম বীরুবাবু—

বিক্রম। আপনিও চলে যাচ্ছেন? আমি যে কী করব কিছু বুঝতে পারছি না।

শিবশেখর। পরামর্শ দেবার শক্তি আর আমার নেই। এতকাল দেবার পালা শেষ করেছি। তবে মনে হয় এরকম করে সমস্যার মীমাংসা হবে না। যাক্, আমি পালাই। তুমি আমার রাধুমাকে বোলো, লক্ষ্মীর আশ্রয় এই লক্ষ্মীছাড়ার কপালে নেই। ওঃ, তাই মা আমার কাশী যেতে চাইছিল, আহাহা, বাছারে।

বাহির হইয়া গেলেন। বিক্রম নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এক মুহূর্ত পরে শিবশেখর পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

শিবশেখর। এইযে, তুমি আছ। দেখ বাবা, আমার নাম কাশীর সব পোষ্টঅফিসে জানে। যদি কোনও দিন যেতে চায়, একটা লাইন লিখে দেয় যেন। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব মাকে। বোলো, বুঝলে? (বিক্রম ঘাড় নাড়িল। শেখর বাহির হইলেন এবং আবার ফিরিলেন) মা খেয়ে গেলুম বলে রাধা মা যেন রাগ করে না। আমি—আমি—আচ্ছা চল্লুম।

যেন জোর করিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। হতবুদ্ধি বিক্রম নীরব নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথম অঙ্কের যবনিকা নামিল।

নোয়াখালি

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

চলিছে খড়্গ, জ্বলিছে অগ্নি, ভগ্ন হতেছে ঘর,
সব সম্পদ নিমেষে উড়িয়া যায়।
সতী-লাঞ্ছন যে নারকী লীলা চলিছে ভয়ঙ্কর
সেকথা ভাবিতে ঘৃণা ও লজ্জা পায়।

হাজারে হাজারে চলে পথে পথে আশ্রয়হারা যত
নিরাশা-আঁধার সবার ভবিষ্যৎ;
চলচ্ছক্তি বিহীন বৃদ্ধ অর্ভক শত শত
আর্ত্তকণ্ঠে পূর্ণ করিছে পথ।

নাচে তাণ্ডবে মানব-শত্রু চরণে ধর্ম্ম দলি
নারী-মর্যাদা লুণ্ঠিত ধূলিতলে
শান্ত নিরীহ পল্লী-বাসীরা নিত্য পড়িছে বলি
দিকে দিকে শুধু পিশাচ নৃত্য চলে।

নরক-বহ্নি শঙ্কার ধূমে ন্যায়েরে করিছে লয়,
মিথ্যা করিছে সত্যেরে উপহাস!
শাসন-রথের সারথি যাহারা নির্বাক চেয়ে রয়
পথের পঙ্কে চক্র করেছে গ্রাস!

মানব কি আজ গিয়াছে মরিয়া দানব দর্প হেরি?
দেবতা কি আজ হয়েছে ভস্মীভূত?
ক্লীবতা কি আজ গ্রাস করিয়াছে মনুষ্যত্বে ঘেরি?
প্রাণবত্তা কি হয়েছে আসনচ্যুত?



সাময়িকী

আচার্য্য কৃপালনী—

নভেম্বর মাসের শেষভাগে যুক্তপ্রদেশের মীরাটে কংগ্রেসের যে ৫৪তম বার্ষিক অধিবেশন হইবে, আচার্য্য জে-বি-কৃপালানী তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—এখনই তাঁহার উপর রাষ্ট্রপতির কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। আচার্য্য ১২ বৎসরেরও অধিক কাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন—কাজেই কংগ্রেসের সকল বিভাগের সকল কার্য্যের সহিতই তিনি সুপরিচিত। গত ২৬ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি সর্ব্বত্যাগী ও অনন্তকর্ম্মা হইয়া কংগ্রেসের ও দেশের সেবা



নোয়াখালি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, আচার্য্য কৃপালানী ও তদীয় পত্নী এবং মিঃ এইচ-এস-সুরাবর্দী

ফটো—তারক দাস

করিয়াছেন, কাজেই তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে অনাচারের সংবাদ পাইয়াই তিনি দিল্লীতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ থাকা সত্বেও সস্ত্রীক পূর্ব্ববঙ্গে গমনকরিয়াছিলেন এবং নৌকাযোগে ও পদব্রজে ঘটনাস্থলসমূহে যাইয়া যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা যেমন মর্ম্মন্তুদ, তেমনই ঘটনাবহুল। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই তাঁহার মত নির্ভয়ে সকল কথা প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী গত প্রায় এক মাস কাল উপদ্রুত অঞ্চলে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। তিনি শুধু স্বামীর আদর্শ গ্রহণ করেন নাই, সকল কাজেই স্বামীর উপযুক্ত সহযোগিনী। আচার্য্য কৃপালানীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সম্মান ও মর্য্যাদা যে সুরক্ষিত থাকিবে, তাহার পরিচয় পাইয়া দেশবাসী তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

কংগ্রেসের প্রস্তাব—

গত ২৪শে অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে বাঙ্গালার অরাজকতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ প্রস্তাব গ্রহণের সময় মহাত্মা গান্ধী কমিটীর সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাব এইরূপ :—

"পূর্ব বাংলায় বর্তমানে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে সেই সম্পর্কে মনের বিভীষিকা ও বেদনা যথাযথভাবে প্রকাশ করা কমিটির পক্ষে দুরূহ। সংবাদপত্রে যে সকল খবর বাহির হইয়াছে এবং জনসেবকগণ বিবৃতি দিয়া পাশবিকতা ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার যে সকল দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ভাল লোক মাত্রেরই মন লজ্জা, ঘৃণা, বিরক্তি ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবেই। নারীহরণ, নারীধর্ষণ, জবরদস্তি, ধর্মান্তরকরণ, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ ও নরহত্যা বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহা যাহারা করিয়াছে তাহাদের নিকট রাইফেল এবং অন্যান্য প্রকার বন্দুক দেখা গিয়াছে।

"কমিটি জানেন, কোন কোন স্থান হইতে জোরের সহিত বলা হইতেছে যে ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা গবর্মেণ্টের ইস্তাহার ও প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিগুলিতে বীভৎসতা ও ব্যাপক সর্বনাশের এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে যে (লোকের মনে) প্রতিক্রিয়া বাড়াইবার জন্য অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয় না।

"কমিটির এই মত যে বিগত বৎসরগুলিতে মুসলীম লীগ যে ঘৃণা ও গৃহবিবাদের রাজনীতি চালাইয়াছেন এবং বিগত মাসগুলিতে প্রতিদিন তাঁহারা যে অত্যাচারের ভয়

দেখাইয়াছেন, পাশবিকতার এই ভয়ঙ্কর প্রকাশ তাহারই সাক্ষাৎ ফল। প্রদেশের অধিবাসীগণের উপর এত বড় অন্তর্বিপ্লব ঘটিতে দিবার প্রধান দায়িত্ব অবশ্যই প্রাদেশিক গবর্মেন্টের উপর পড়িতেছে। আরও প্রাদেশিক লাট ও বড়লাট এই ধরণের ব্যাপারে তাঁহাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া দাবী করেন—সে কারণ বাংলার এই সকল দুর্ঘটনার দায়িত্বের অংশ তাঁহাদের লইতেই হয়। তাঁহাদের দায়িত্ব আরও অধিক হইয়া উঠে, যখন এই কথা স্মরণ করা যায় যে কলিকাতার সর্বনাশকর ঘটনা তাঁহাদের পরিষ্কারভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিল এবং পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট ও লাটের নিকট প্রতিনিধি মারফৎ নিজেদের অবস্থার কথা জানাইয়া প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং রক্ষণের দাবী



দমদমে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদের বিমান হইতে অবতরণ ফটো—তারক দাস

করিয়াছিল। কমিটি বিস্ময় ও অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া পারেন না, যখন দেখা যায় যে সেই অবস্থায়ও শুধু যে প্রতিরোধমূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই তাহা নহে, অত্যাচার আরম্ভ হইয়া যাইবার পরও তাহা বন্ধ করিবার জন্য অথবা অপরাধীগণকে ধরিবার জন্য রীতিমত কোন চেষ্টা হয় নাই। পরিবর্তে বরং ঘটনা অতিরঞ্জনের অজুহাতে তাঁহারা (কর্তৃপক্ষ) তাঁহাদের স্বেচ্ছামূলক উপেক্ষা বা অযোগ্যতা অথবা উভয়ই ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

"এরূপ ঘটনা উপলক্ষে মনের ভাব প্রকাশ করাই যথেষ্ট নহে জানিয়াও কমিটি পূর্ব বাংলার অত্যাচারিতগণের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। আরও, তাঁহারা বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের ভাল লোকের প্রতি এই আবেদন করিতেছেন যে এই সকল অপরাধ-অত্যাচার সম্পর্কে শুধু তীব্র নিন্দা প্রকাশ নহে, এই সকল অরাজক বর্বরতা যাহারই দ্বারা অনুষ্ঠিত হউক না কেন তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য রীতিমত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। সেই সকল প্রতিহিংসামূলক সাম্প্রদায়িক অত্যাচার-সংঘটন সম্পর্কে কমিটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছেন। জাতীয়তাও সাম্প্রদায়িকতা জীবনমরণ দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবস্থায় আসিয়াছে। ভারতীয় জাতীয়তাকে ধ্বংস করিবার এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দিকে দেশের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য এক ধরণের রাজনৈতিক গোপন প্রচেষ্টা আছে—বাংলার দাঙ্গাহাঙ্গামা স্পষ্টরূপেই তাহার অংশ। সুতরাং কমিটি এই সাবধানবাণীর উপর খুবই জোর দিতেছেন যে একমাত্র জাতীয়তার শক্তি দ্বারাই সাম্প্রদায়িকতা নিরোধ করা যায় —পাল্টা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা নহে, পাল্টা সাম্প্রদায়িকতার ফলে বৈদেশিক শাসনই বরাবর চলিতে থাকে।"

কলিকাতার অবস্থা—

বাঙ্গালার নানাস্থানে যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সংবাদ প্রকাশে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বিধি-



লালবাজার কণ্ট্রোলরুমে কলিকাতা দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের সভাপতি স্যার পেট্রিক স্পেন্স ফটো—তারক দাস

নিষেধ আরোপ করায় তাহার প্রতিবাদে কলিকাতা সহরের সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র অক্টোবর মাসের প্রথম

৭দিন সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। তাহার পর গভর্ণমেণ্টের সহিত একটা রফা হওয়ায় সংবাদপত্রসমূহের প্রকাশ আরম্ভ হয়। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে কলিকাতার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়ে, বাস ও ট্রামের বহু কর্ম্মী হতাহত হওয়ায় গত ২৬শে অক্টোবর হইতে ৭দিন কলিকাতায় বাস চলাচল একেবারে বন্ধ ছিল—সে সময়ে ট্রাম চলাচলও প্রায় বন্ধ ছিল। পথে ঘাটে হত্যা-লীলা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি চলিয়াছিল। কাজেই সহরের অধিবাসীদিগের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। বাজারহাট, দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ থাকায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদিগকে অনশনে দিনযাপন করিতে হইয়াছে। ১৬ই আগষ্টের পরও ১০।১২ দিন কলিকাতাবাসীদিগকে অনুরূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমরা যে কোন সভাদেশে সুনিয়ন্ত্রিত শাসনের মধ্যে বাস করি, এখন আর তাহা মনে করাই যায় না।

নোয়াখালির বর্ত্তমান অবস্থা—

ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী ও ডক্টর শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসু নোয়াখালি জেলার উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়া মহাত্মা



গৌহাটী এম-ই-এস ক্যাম্পের অফিসের সম্মুখে শান্তিসেনারা গৃহহীনদের সেবাকার্য্যে রত ফটো—কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য

গান্ধীকে জানাইয়াছেন—"উপদ্রুত অঞ্চলে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—অসংখ্য অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করা। অপহৃতা হিন্দু নারীদিগকে বর্ত্তমানে বোরখা পরাইয়া রাখা হইয়াছে। ফলে কেহ তাহাদের চিনিতে পারে না। এই সকল নারীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বা নারী সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহারা ভীত অবস্থায় পশুজীবন যাপন করিতেছে।"

মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন—

আগামী ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হইবে। তাহার পর ২১শে ও ২২শে মীরাটে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন এবং ২৩, ২৪ ও ২৫শে মীরাটে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে।

সরকারী খেতাব বর্জ্জন—

গত ২৭শে অক্টোবর পাটনায় বিহারবাসী বাঙ্গালী সমিতির সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—যেহেতু বাঙ্গালায় এই ভ্রাতৃবিরোধ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনাপ্রসূত এবং যেহেতু ভারতে তাহাদের প্রতিনিধি বড়লাট এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করেন নাই, বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সকল উপাধি ত্যাগ করা হউক। অন্য একটি প্রস্তাবে সিংহভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য একটি কমিটী গঠিত হয়। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন।



গৌহাটী ক্যাম্পে নোয়াখালী হইতে আগত রমণীগণ
ফটো—কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব—

বর্ত্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। বহু জেলায় চাউল ৩০।৪০ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। যানবাহন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এক স্থানের খাদ্য অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। ওদিকে ধান কাটার লোকের অভাবে মাঠে পাকা ধান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ভ্রাতৃদ্রোহী সংগ্রাম বন্ধ না হইলে বাঙ্গালার বহু লোক খাদ্যাভাবে মারা যাইবে। কলিকাতায় গত ২৭শে ২৮শে অক্টোবরের অবস্থার কথা মনে করিলেই সারা বাঙ্গালা দেশের অবস্থা

বুঝা যায়। এ অবস্থায় কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গঠনমূলক কার্য্যের কথা চিন্তা করাও সম্ভব নহে। অথচ মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, গঠনমূলক কার্য্য ছাড়া তাহা দূর করার আর অন্য উপায় নাই।

পণ্ডিত নেহরুর সীমান্ত ভ্রমণ—

অন্তর্বর্ত্তী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহ-সভাপতিরূপে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের উপজাতি-সমূহের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার জন্য সীমান্ত ভ্রমণে গফুর খাঁ সাংঘাতিকভাবে আহত হন, পণ্ডিতজীর ও খাঁ সাহেবের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। দেশসেবকের পক্ষে ইহাতে দুঃখিত বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যে বৃটীশ সরকার পণ্ডিতজীকে ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক দলের নেতা হিসাবে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সহ-সভাপতি পদে বৃত করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?

শাসকবর্গের বিতাড়ন দাবী—

বাঙ্গালার দাঙ্গা নিবারণে কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে শুধু ভারতবর্ষের নহে, জগতের সকল



ভারত-আফগান-সীমান্তে খাইবারের নিকট সদলবলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

গিয়াছিলেন। ৬দিন ভ্রমণের পর তিনি ২২শে অক্টোবর দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। মুসলীম লীগদল ও সাম্রাজ্য-বাদীরা এই মিলন চেষ্টা সুনজরে দেখিতে পারেন নাই—সেজন্য পথে তাঁহাকে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। সীমান্ত নেতা খান আবদুল গফুর খাঁ ও সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খাঁ সাহেব পণ্ডিতজীর সঙ্গে ছিলেন। আবদুল স্থানের সংবাদপত্রসমূহে আলোচনা হইতেছে। সকলেই বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের বিতাড়ন দাবী করিয়াছেন। ভারতের বড়লাট ও বাঙ্গালার গভর্ণরের উদাসীনতা ও নিরপেক্ষতার জন্য তাঁহাদের অপসারণও দাবী করা হইয়াছে। বৃটীশ শ্রমিক সরকারও এবিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হন নাই। কাজেই নূতন অন্তর্বর্ত্তী

সরকার গঠনে তাঁহাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে কেহই বিশ্বাস করেন না।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—

বহু লোক বিশ্বাস করেন ও প্রকাশ করিয়াছেন যে নেতাজী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এখনও জীবিত আছেন। সম্প্রতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সহ-সভাপতিরূপে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে সুভাষচন্দ্র জীবিত নাই। ঐ ইস্তাহার প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাহার পরও সুভাষচন্দ্রের বহু বন্ধু ও সহকর্ম্মী তাঁহার জীবিত থাকার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করুন—প্রত্যেক ভারতবাসী সর্ব্বদা ইহা প্রার্থনা করে।



সীমান্ত সফর কালে খাইবার পাশ এলাকায় বিক্ষোভ-কারিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার মোটর কার।

লীগের যোগদান—

শেষ পর্য্যন্ত মুসলীম লীগের নেতারা অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিয়াছেন। গত ১৫ই অক্টোবর মিঃ জিন্না বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে নিম্নলিখিত ৫ জন লীগ-নেতা সরকারের সদস্য হইবেন—(১) মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ (২) মিঃ আই-আই-চন্দ্রীগড় (৩) মিঃ আবদুর রব নিস্তার (৪) মিঃ গজনফর আলি খাঁ ও (৫) মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। লীগ যোগদান করায় নিম্নলিখিত ৩ জন সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে—(১) শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু (২) সার সাফাৎ আহম্মদ খাঁ ও (৩) সৈয়দ আলি জহীর। নিম্নলিখিত ৯জন পূর্ব্ব নিযুক্ত সদস্য বহাল রহিলেন—(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু (২) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল (৩) ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (৪) মিঃ আসফ আলি (৫) শ্রীযুত সি-রাজাগোপালাচারী (৬) ডাক্তার জন মাথাই (৭) সর্দ্দার বলদেব সিং (৮) শ্রীযুত জগজীবন রাম ও (৯) মিঃ কুবেরজী হরমুসজী ভাবা।



রাজমাক নামক স্থানে সভায় উপজাতি নেতাদের সহিত করমর্দনরত পণ্ডিত নেহরু

আসামে বন্যায় ক্ষতি—

মহাপূজার পরই আসামে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টির ফলে কয়েকটি জেলা বিপন্ন হইয়াছে। ঝড়ে বহু বাসগৃহ, শস্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে। দুই লক্ষাধিক লোক এমনই দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছে যে কয়েক মাস ধরিয়া তাহাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা না করা হইলে তাহারা মারা যাইবে। দেশের দুর্দ্দশা একপ্রকার নহে।

বাঙ্গালায় মহাত্মা গান্ধী—

বাঙ্গালার হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হইয়া মহাত্মা গান্ধী সদলে গত ২৯শে অক্টোবর দিল্লী হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন। তিনি সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে কয়েক দিন বাস করিয়া গত ৬ই নভেম্বর নোয়াখালি যাত্রা করেন। এখানে অবস্থানকালে বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী কয়েক দিন তাঁহার সহিত সোদপুরে সাক্ষাৎ করিয়া শান্তির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। গান্ধীজি বাঙ্গালার লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং ৫ই নভেম্বর বিকালে মিঃ সুরাবর্দ্দীর থিয়েটার রোডস্থ গৃহে যাইয়া মুসলিম-নেতাদের

এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শুভাগমনে বাঙ্গালায় শান্তি ফিরিয়া আসুক—সকলেই ইহা প্রার্থনা করিতেছে।

কেন্দ্রীয় সেবা সমিতি—

বাঙ্গালার সকল স্থানের দুর্গত জনগণের সাহায্য কল্পে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি, শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকাকে সম্পাদক ও শ্রীযুত ভগীরথ কানোরিয়াকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটি কেন্দ্রীয় সেবা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্য সকল রাজনীতিক, ব্যবসা সম্বন্ধীয় ও সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কলিকাতা ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংসে কেন্দ্রীয় সেবা-সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত। সকলে যেন তথায় নিজ নিজ শক্তিমত সাহায্য প্রেরণ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।



বিমানের গবাক্ষপথে মিঃ এইচ-এস-সুরাবর্দীর নোয়াখালী দর্শন
ফটো—তারক দাস

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া বাঙ্গালায় ও ভারতের সর্ব্বত্র 'হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড' গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা (২) সকল প্রকার আইনসঙ্গতভাবে হিন্দুর অধিকার ও স্বার্থরক্ষা (৩) ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা (৪) হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান (৫) সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নতি লাভের জন্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (৬) এম্বুলেন্স ও মেডিকেল ইউনিট গঠন। এজন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইতেছেন ও সকল স্থানের লোক এই সৈন্যবাহিনী গঠনে সাড়া দিতেছে।



কলিকাতায় দ্বিতীয়বারের হাঙ্গামার পর একটি বিশিষ্ট রাজপথের দৃশ্য—স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ফটো—শ্রীপান্না সেন

সমাজ সংস্কারের জন্য আবেদন—

বাঙ্গালার সকল বর্ণাশ্রমী হিন্দু নেতা সমবেতভাবে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। এই ঘোষণায় বাঙ্গালার সকল ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঘোষণায় বলা হইয়াছে—(১) হিন্দু জাতির বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীসমূহের মধ্যে সামাজিক অধিকার বৈষম্য থাকিবে না। (২) হিন্দুর মন্দিরে ও দেবদেবীর পূজা মণ্ডপে হিন্দু মাত্রেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। কাহারও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মন্দিরে বা মণ্ডপে অপরের প্রবেশ মালিকের অনুমতি-সাপেক্ষ হইবে (৩) হিন্দু সমাজের ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতি হিন্দু মাত্রেরই কাজ করিবে—এ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না (৪) ব্রাহ্মণ হিন্দুমাত্রেরই পূজা-অর্চনাদি ধর্ম্মকার্য্যে পৌরহিত্য করিতে পারিবেন, তাহাতে সামাজিক অবনতি ঘটিবে না। এতদ্বারা কেহ যেন অপরের বৃত্তিচ্ছেদ করিতে উৎসাহিত না হন।

নোয়াখালি ও বিহার—

কলিকাতার ১৬ই আগষ্টের হাঙ্গামা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই গত ১০ই অক্টোবর হইতে সমগ্র নোয়াখালি জেলায় ও ত্রিপুরা জেলার স্থানে স্থানে যে বর্ব্বরতা ও অত্যাচার আরম্ভ

হইয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হাজার হাজার লোককে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হয়—যাহারা তাহাতে বাধা দেয়, তাহাদের গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়া তাহাদের সবংশে নিধন করা হইয়াছে। নোয়াখালির খ্যাতনামা উকীল রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী মহাশয় তাহাতে বাধা দিতে যাইয়া শুধু নিজের জীবন দেন নাই—তাঁহার পরিবারের প্রায় ২৫ জন লোক নিহত হয়। এইরূপ বহু রাজেন্দ্রলালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তরা হিন্দু মহিলাদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ নিজ গৃহে আটক করিয়াছে। এখনও এইরূপ বহু নারী বোরখার মধ্যে আবৃত থাকিয়া পশুজীবন যাপন করিতেছেন। একমাস ঘুরিবার সঙ্কল্প করিয়া তথায় গমন করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ বাঙ্গালার নেতারা দুর্গতদের সাহায্যদান করে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্যামাপ্রসাদ নিজে ঘটনাস্থলে যাইয়া নৌকাযোগে ও পদব্রজে বহু গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালায় লীগগঠিত মন্ত্রিসভা থাকিবে, ততদিন এখানে কিছু করা সম্ভব হইবে না। লীগ-গভর্ণমেণ্ট এদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই বরং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধিতে দুর্বৃত্তদের সাহায্য করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার লাট বা বড়লাট কেহই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ পর্য্যন্ত করেন নাই। লীগ মন্ত্রিসভাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া যদি বাঙ্গালায়



শিয়ালদহ ষ্টেশনে চাঁদপুর ও নোয়াখালী হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থিগণ ফটো—শ্রীপান্না সেন

অতীত হওয়ার পরও তাহাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা হয় নাই। সেখানে সেনাবাহিনী পাঠানো হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সেনাবাহিনী স্থানীয় পুলিসের নির্দ্দেশ মত কাজ করিতেছে। পুলিস সক্রিয় থাকিলে তথায় ঐ সকল অত্যাচার অনুষ্ঠান কখনই সম্ভব হইত না। উপযুক্ত পাহারার অভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে না। দেশনেতারা অনেকেই তথায় যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ানো কখনই সম্ভব নহে। রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালানী ও তাঁহার পত্নী বাঙ্গালার এই দারুণ দুর্দ্দিনে বহুদিন ধরিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে থাকিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গালায় আসিয়াছেন ও নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ৯৩ ধারাও জারি করা হইত, তাহা হইলে এক সম্প্রদায় এত সাহসের সহিত অপর সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইত না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতারা ও বিলাত বা মার্কিণের জননায়কগণ পর্য্যন্ত বড়লাট এবং বাঙ্গালার গভর্ণরের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন—কিন্তু কোন অদৃশ্য হস্ত তাঁহাদের পরিচালন করিতেছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যরূপে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই—বড়লাট বা গভর্ণরের মারফত ছাড়া তাঁহাদের কিছু করিবার উপায় নাই। হয় ত শীঘ্রই এমন অবস্থার উদ্ভব হইবে যে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের কংগ্রেসী সদস্যদিগকে সরকারী পদ ছাড়িয়া দিয়া জনগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আজ যাহারা দিল্লীর সরকারী দপ্তরে কর্তৃত্ব করিতেছেন, অল্প দিনের মধ্যে আবার তাঁহাদিগকে যে কারাগারের প্রাচীরাভ্যন্তরে যাইতে হইবে না, এমন কথাও বলা যায় না। নোয়াখালির পর গত ১লা নভেম্বর হইতে বিহারে হিন্দু কর্তৃক মুসলমান নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছে। বিহারের ঘটনার ব্যাপকতা বা ভয়াবহতা নোয়াখালির ঘটনা অপেক্ষা কম নহে। মিঃ এ-কে ফজলল হক বিহার ভ্রমণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—বিহারে এক লক্ষ মুসলমান নিহত হইয়াছে—এ কথা সত্য না হইলেও পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় যে শত শত মুসলমান ধনেপ্রাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত নেহরুপ্রমুখ বহু নেতা বিহারে কয়েকদিন উপস্থিত থাকিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার কঠোরতা অবলম্বন করিয়া বিহার হাঙ্গামা বন্ধ করিয়াছেন—১০ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে বিহারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুজাতি কখনও প্রতিহিংসা-পরায়ণ নহে—কাজেই বিহারের এই হত্যাকাণ্ড হিন্দুর নাম কলঙ্কিত করিয়াছে। বিহারের ঘটনায় মহাত্মা গান্ধীও বিচলিত হইয়া প্রায়োপবেশনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, সে জন্য পণ্ডিত নেহরুকে ও বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলকে বিহারে অত্যধিক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার লীগ মন্ত্রিসভা যদি এইরূপ কঠোর হইতেন, তবে বহুপূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশেও শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারিত। এই ধ্বংসলীলা ক্রমে যুক্তপ্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মীরাটে ও কাশীতে গত কয়দিন হইতে হাঙ্গামা চলিতেছে, মীরাটের যে স্থানে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য নূতন নগর গঠিত হইতেছিল, দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার একাংশ পুড়াইয়া দিয়াছে। কানপুরেও রাজপথে খুনজখম আরম্ভ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশেও কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল একটু অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিলে শীঘ্রই ইহার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে যাইয়া শান্তির বাণী প্রচার করিতেছেন ও বাঙ্গালার লীগ মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন আহমদ গান্ধীজীর সম্মুখে বসিয়া মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদের কার্য্যের যে ভাবে নিন্দা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কোন ফল হইবে কি না কে জানে।

আজাদ-হিন্দ-সরকার প্রতিষ্ঠা

গত ২১শে অক্টোবর সোমবার সমারোহের সহিত ভারতের সর্ব্বত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গঠিত আজাদ-হিন্দ-সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে।



আজাদ-হিন্দ-সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসে নেতাজী ভবনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কর্তৃক শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে প্রদীপ দান

ফটো—তারক দাস

সর্ব্বত্র নেতাজীর চিত্র মাল্যভূষিত করা হয় ও উক্ত সরকারের প্রথম ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। রাত্রিতে সর্ব্বত্র সকল গৃহ আলোক-মালায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন এলগিন রোডস্থ প্রাসাদটি 'নেতাজি ভবন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়াছে এবং ঐ দিন সকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তথায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের যুদ্ধস্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন। 'নেতাজী ভবন' সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল ও সকলকে তাহা দেখিতে দেওয়া হইয়াছে। ঐ দিন ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী নেতাজীর কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছে ও তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সত্বর ভারতে প্রত্যাগমন কামনা করিয়াছে।

অমরাবতীতে শরীর চর্চ্চা সম্মেলন—

গত ১৩ই অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের অমরাবতীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত শরীর চর্চ্চা সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্মিলনে

শরৎচন্দ্রের প্রদত্ত বক্তৃতায় জাতি গঠনে শরীর চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদান, শরীর-চর্চ্চার প্রতি ভারতবাসীর উদাসীনতা ও যুবকদের কর্ত্তব্যের কথা আলোচিত হইয়াছিল। শরৎবাবুর উপদেশ সর্ব্বত্র আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হওয়া প্রয়োজন।



কলিকাতা মিউজিয়ামে নানা স্থান হইতে উদ্ধার করা বহুপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ফটো—তারক দাস



মিউজিয়ামে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে পুলিশের দ্বারায় উদ্ধার-করা নানারকমের মারাত্মক ছোরাছুরি ফটো—তারক দাস

ভারতে খাদ্যাভাব—

ভারতে যে দারুণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত ৬ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভায় দেওয়ান চমনলাল সেকথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করার প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহেও প্রকাশিত হইয়াছে যে আগামী বৎসর ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বর্ষ অপেক্ষা খাদ্যাভাব অধিক হইবে। এ বৎসর আমেরিকাস্থ ইণ্ডিয়া লীগের চেষ্টায় মার্কিণ খাদ্যমিশন কর্ত্তৃক ভারত পরিদর্শনের ফলে মার্কিণ হইতে ভারতে প্রচুর খাদ্য আসিয়াছে। কিন্তু এইভাবে ভারতকে কয় বৎসর বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে? শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। তিনি ভারতের খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা সাধারণে প্রচারিত হইলে লোক আশ্বস্ত হইতে পারে। ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থায় সরকার মনোযোগী না হইলে গত কয় বৎসরের মত আগামী কয়েক বৎসরও ভারতে খাদ্যাভাবে বহু লোক মারা যাইবে।



মিউজিয়ামে রক্ষিত লুটের মাল—সুটকেশ প্রভৃতি ফটো—তারক দাস

সরকারী তৎপরতা—

১০ই অক্টোবর নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। ১৯শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালানী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও বাঙ্গালার কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বিশেষ বিমানে নোয়াখালি গমন করেন—তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানী, মেজর-জেনারেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কুমার দেবেন্দ্রলাল খানও গমন করেন। সেইদিন দার্জিলিং হইতে বিমানে বাঙ্গালার গভর্ণর, প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী ও বাঙ্গালার পুলিশের ইন্সপেক্টার-জেনারেল

ফেণী ও চট্টগ্রামে যান—পথে নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চল বিমান হইতে দেখিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে তাঁহারা সেই বিমানেই দার্জিলিং ফিরিয়া যান। ইহাই সরকারী তৎপরতা।



দম-দম বিমান ঘাঁটিতে অন্তর্বর্তী-সরকারের সদস্যবৃন্দ—সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, এবং মিঃ আবদুল রব নিস্তার ফটো—তারক দাস

সদস্যগণের বাঙ্গলায় আগমন—

অন্তর্বর্ত্তী কেন্দ্রীয় সরকারের ৪ জন সদস্য—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ও মিঃ আবদুর রব নিস্তার গত ২রা নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দের ও গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩রা তারিখেই বিহারে চলিয়া গিয়াছেন। বড়লাট ও ১লা নভেম্বর নোয়াখালি দেখিয়া ২রা সন্ধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের রক্ষা-সচিব সর্দ্দার বলদেব সিংও দুই দিনের জন্ত বাঙ্গালা ও বিহার ঘুরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনের ফলে বাঙ্গালার এই ভ্রাতৃদ্রোহী হত্যাকাণ্ড বন্ধ হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছেন।

শোক-সংবাদ

পরলোকে মদনমোহন মালব্য—

গত ১২ই নভেম্বর অপরাহ্ণ ৪টা ১০ মিনিটের সময় মনীষী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ৮৫ বৎসর বয়সে পবিত্র বারাণসীধামে ইহলীলা সম্বরণ করেন। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি একজন অক্লান্ত সৈনিক এবং হিন্দু সমাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ভারতের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সংবাদে তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর জন্ম হয়। শৈশবে ধর্ম্ম-জ্ঞানোপদেশ পাঠশালায় সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি এলাহাবাদের সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তারপর মুইর সেন্ট্রাল কলেজ হইতে এফ-এ এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৯২ খৃঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল-এল-বি পাশ করিয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" "হিন্দুস্থান" এবং "অভ্যুদয়" পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯০৯, ১৯১৮ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের



পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

ফটো—শ্রীরবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কামারহাটী) সৌজন্যে

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৩, ১৯২৪, ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতিত্ব করেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে কার্য্য করেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলারের পদত্যাগ করার পর হইতে মৃত্যুকাল অবধি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন।

প্রায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতেই কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি ঐকান্তিকভাবে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলনে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কারাবরণ করেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার যেমন গভীর আস্থা ছিল, হিন্দুশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতেন। তাই বৃদ্ধ বয়সে তিনি "কায়কল্প" চিকিৎসার কঠোরতা বরণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর সামাজিক সংস্কারের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি হিন্দু জাগরণ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন।

কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গঠনমূলক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁহার স্বধর্ম্মের উপর গভীর আস্থা এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রভাব ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের উপর এমনি ভাবে প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে তাঁহারা হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মুক্ত হস্তে তাঁহাকে অপরিমিত অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার জীবনের এক অক্ষয় কীর্ত্তি।

পরলোকে ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ—

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার মহারাজার সভাপণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ গত ২রা কার্ত্তিক ৮১ বৎসর বয়সে



ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ

লালগোলায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল লালগোলার টোলে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রপিতামহী যেখানে 'সহমৃতা' হইয়াছিলেন, লালগোলার সন্নিকটে সেই 'সতীতলায়' তিনি একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মণ্ডলগ্রামে তাঁহার জন্মভূমিতে তিনি একটী দেবীপীঠ ও শ্মশানে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পরলোকে সর্দ্দার অজিৎ সিং—

সর্দ্দার অজিৎ সিং ভারতের একজন পুরাতন বিপ্লবী কর্ম্মী। গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তিনি গত ১৯০৮ সাল হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় বাস করিতেছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি জার্ম্মানীতে থাকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় রেডিওতে সংবাদ প্রচার করিতেন। সম্প্রতি বার্লিনের এক হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সারা-জীবন ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কথা বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

পরলোকে ডাঃ বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতির প্রাণ-স্বরূপ খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ই অক্টোবর সকালে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিজে শুধু ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেন না, বাঙ্গালী যুবকগণকে ব্যায়াম চর্চ্চায় দীক্ষিত করার জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া সারা বাঙ্গালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি মাতুল ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও সেগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতেন।

এক টুকরা কাগজ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

আমার মনে পড়ে,
ভুবন-ভরা ব্যাকুলতা টুকরো কাগজ তরে।
করা হ'ল তাহার জন্য
বাক্স পেটরা ভস্ম,
কতই বেলা হল—ঘরে অন্ন নাহি চড়ে।

২

ব্যাপার সহজ নয়,
নইলে মায়ের মুখ কি আমার এমন মলিন হয়?
যদিও নাই চক্ষে বারি
অশ্রুতে তা বেজায় ভারী,
ভরা শ্রাবণ মেঘের মত কখন যেন ঝরে।

৩

সবার মুখই ম্লান
টুকরা কাগজ, হায় কি তাহা এতই মূল্যবান?
অকারণে সজল আঁখি—
মায়ের পানে তাকিয়ে থাকি
কিসের লাগি বুকের ব্যথা সয়ালে না সরে।

৪

যেন মা মোর আজ—
'চিন্তাদেবী' পালিয়ে গেছে পোড়া সে শোল মাছ।
শ্রীমন্তের কি কনক টোপর
খুঁজতে মায়ের হ'ল তুপর?
সাগর সেচে যায় না পাওয়া কই সে মধুকরে?

৫

জানতে বড় সাধ,
টুকরা কাগজ সে কি কোন বাদশাহী তায়দাদ?
মায়ের আমার সেই মূরতি,
আজও জাগে চক্ষে নিতি,
টুকরা কাগজ দাগ রেখেছে বুকের এ প্রস্তরে।

৬

তাহার পরে ভাই—
পেলেন কিনা টুকরা কাগজ খপর রাখি নাই।
জানতে আমি পারিনি তা,
লেখা তাতে কি মন্ত্র বা—
'রামপ্রসাদের গানের মত মাকে ব্যাকুল করে।

বিবন্ধ ভায়ের বিয়ের নানা জিনিষ কল্‌কাতা থেকে নিয়ে যাচ্ছি, বদ্‌-বলে ও-সব মেলে না, পাত্রপক্ষের যা দাবী, তার একচুল কম হওয়া ত তাঁদের পক্ষে অসহনীয় হবে। সে ব্যাপার ভীতিপ্রদ কম নয়।

সঙ্গে কেবল চোদ্দ বছরের ছেলে। দেশ, কাল, সময়, সব তখন প্রতিকূলে। একজন লোকও যোগাড় করা গেল না, স্বামী কিছুতেই ছুটি পেলেন না। অথচ কন্যাদায় উদ্ধার হবে সে সুযোগ ছাড়া কঠিন।

কোন রকমে মাল নিয়ে ট্রেণে উঠলাম, জায়গা করে নিয়ে বস্‌বার চেষ্টায় আছি। ম্লানমুখে ছেলে এসে বল্লে, "আমরা এত মাল নিয়ে যেতে পারবো না মা; নেমে যেতে বল্‌ছে, না হয় ত পাঁচটা টাকা দিতে হবে।" বুঝলাম ব্যাপার, একা স্ত্রীলোক আছি, সঙ্গে বালক। আমার দেশবাসী এ সুযোগে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ কচ্ছেন। নেমে এলাম, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম তাঁর বক্তব্য, তিনি বল্লেন পাঁচটি টাকা পেলেই আমায় যেতে দিতে পারেন, না হলে বে-আইনি মাল নিয়ে যেতে দিতে অক্ষম। আমার টিকিট অনুসারে কতখানি মাল আমি পেতে পারি সে জ্ঞান আমার ছিল। আশে পাশে অনেকেই দাঁড়িয়ে, ঘটনা নীরবে দেখছিলেন। সত্যই নিজেকে অসহায় ও নিরুপায় মনে হল, তবু মন বেঁকে গেল, বল্লাম, "বে-আইনি আমিও কর্ত্তে অনিচ্ছুক। পাঁচ টাকা দেওয়াও বে-আইন"—কুলীকে মাল তুলতে বল্লাম ওজন করে ব্রেকেই দেব।

—দূরে দেখা গেল আমার কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু আস্‌ছেন, ট্রেণ যাতায়াতের বিড়ম্বনা সকলেই এখন জানেন, তাই আমার দুর্ভোগের আশঙ্কায় সকলেই কোন রকমে কাজ থেকে ছুটি করে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ট্রেণে উঠ্‌লাম, তিল ধারণের স্থান নাই। একটি বেঞ্চ দখল করে বসে আছেন তিনটি চীনা মহিলা সপুত্র—তাঁরা আসামের মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর। আর দুটি বেঞ্চে ১০টি বাঙালী মহিলা, পুত্রকন্যাসহ। এঁরা বসে আছেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একপাশে। আমি চীনা মহিলাদের একটু জায়গা দিতে বলায় তাঁরা রুক্ষ কণ্ঠে প্রতিবাদ কর্ল্লেন। অগত্যা নিরস্ত হওয়াই বিধি, কিছুক্ষণ ধরে চীনা শিশুদের নানা ত্যাগেরও ব্যবস্থা দেখে আমার স্বজাতিরা আমায় বল্লেন প্রতিবাদ কর্ত্তে। আমি যথোচিত বিনয় সহকারেই তাঁদের কাছে এজন্য অনুযোগ অবশ্য কর্ল্লাম। এরপরে সে চীনা নারীত্রয় যে কি রকম অসহিষ্ণু হ'য়ে যা তা বল্লেন, তা লেখা যায় না। পাশেই পুরুষদের কামরা, আমার ছেলেটি গোলমাল দেখে সহযাত্রীদের একথা জানাল। আশ্চর্য্য হয়ে শুনলাম তাঁরা বলছেন, "খোকা তোমার মাকে বল চুপ করে থাকতে, ওরা যে রকম দেখছি হয়ত ছোরা মেরে বসবে।" আমার অত্যন্ত ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হল—এঁরা সকলেই সম্ভ্রান্ত ও প্রায়ই পদস্থ এঁদের এই হল বিবেচনা—ব্যাপার যখন এতটাই গড়াল তখন নিজেই দাঁড়ালাম, মহিলাদের সাথী চীনা ভদ্রলোকটিকে ডেকে বল্লাম, "এরকম ব্যবহার তাঁরা কেন কর্চ্ছেন, এ কি উচিত।"

পুরুষদের কামরার শেষের দিকে যে বাঙ্গালী যুবকটি বসেছিলেন আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি উঠে এলেন—"মা আপনি!"—দেখলাম তিনি আমার স্বামীর ছাত্র, সমস্ত বিবরণই শুন্‌ছিলেন, কেবল আমায় তখনও দেখেন নি, অতিশয় লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লেন, "ক্ষমা করুন মা, আমি বুঝতে পারিনি আপনিই এরকম অপদস্থ হচ্ছেন, পরের ষ্টেশনে এর প্রতিকার আমি কর্চ্ছি।" মিলিটারী বিভাগে বড় পদে তিনি চাকুরী করেন। তাঁর পরিচয়ে তখনই মেল, ফিমেল, দুই কামরার ভাব পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, চীনা ভদ্রলোকটিও তাঁর সঙ্গিনীদের হ'য়ে আমার কাছে মাপ চাইলেন, সঙ্গিনীদের উপদেশ দিয়ে গেলেন। একজন পদস্থ অফিসার আমার সুবিধার জন্য ব্যস্ত—তখন সে কি সম্মান আমার।

—বাকী পথটুকু অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে এলাম। স্বামী উদ্বিগ্ন হ'য়ে ষ্টেশনে এসেছেন। তাঁর ছাত্র নেমে তাঁকে প্রণাম করল, উনি ত ছাত্রকে পেয়ে আনন্দ প্রকাশের পর আমাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, হেসে বল্লাম "শ্রীমানের কাছেই শোন, আমি শুধু ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের "চাপরাশ" সম্বন্ধেই ভাব্‌ছি—তোমার পরিচয়ের চাপরাশ ছাড়া আত্মসম্মান-রক্ষা হত না, চাপরাশ ছাড়া পথ চলায় বড় বিপদ—"



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

শুভাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ডেভিস কাপে ভারতীয় দল ঃ

আগামী ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ থেকে একটি টেনিস দল যোগদান করবে। নিম্নলিখিত টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে অল্ ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের ডেভিস কাপ কমিটি খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করবে বলে জানা গেছে—খস্ মহম্মদ (বরোদা), ম্যান মোহন (পাঞ্জাব), দিলীপ বসু (বাঙ্গলা), কপিলা পাথা (মহীশূর), জিমি মেটা (বোম্বাই), ইরসাদ হোসেন (বাঙ্গলা), সুমন্ত মিশ্র (বাঙ্গলা), কে বি মদন (বাঙ্গলা)। এই সব টেনিস খেলোয়াড়দের কলকাতায় ভারতীয় ন্যাশানাল চ্যাম্পিয়ানসীপ এবং মাদ্রাজের সাউথ ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় অবশ্যই যোগদান করতে হবে। এছাড়া বেঙ্গল লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ (কলকাতা, ডিসেম্বর ১৬-২২শে), ইউ পি লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ (লক্ষ্ণৌ, জানুয়ারী ১৮-২৩শে), এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের(এলাহাবাদ, জানুয়ারী ২৬শে—২রা ফেব্রুয়ারী) যে কোন দু'টি প্রতিযোগিতায় খেলতে হবে। এই সব প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের ফলাফল শেষ নির্ব্বাচন সময়ে যথেষ্ট কাজ দেবে। নির্ব্বাচন শেষ হ'লে পর পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় দ্বারা নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের টেনিস খেলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে। ইউ পি'র লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক ইউ এস গুপ্ত ডেভিস কাপ দলের ম্যানেজার মনোনীত হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে ভারতীয় টেনিস দল আগত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত খেলার পরিচয় দিতে পারবে।

লালা অমরনাথ ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথ ইংলণ্ডের সাসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট দলের পক্ষে খেলবেন বলে তিন বছরের চুক্তি করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড তাঁকে সাসেক্সের পক্ষে খেলতে অনুমতি দিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে, দেড় বছর পর অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডে খেলতে এলে অমরনাথ ইংলণ্ডের পক্ষে খেলবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যে পরিমাণ ফি দেওয়া হয়েছে লালা অমরনাথকে তার থেকে অনেক বেশী দেওয়া হবে ; তিনিই ইংলণ্ডে সব থেকে বেশী 'ফি' পাওয়ার গৌরব লাভ করলেন।

অলিম্পিক গেম ঃ

১৯৩৬ সালে বার্লিনে সর্ব্বশেষ অলিম্পিক গেম হয়েছে। যুদ্ধের দরুণ ১৯৪০ সালের অলিম্পিক গেম স্থগিত ছিল। ১৯৪৮ সালের ২৮শে জুলাই অলিম্পিকের উদ্বোধন হবে এবং ১৪ই আগষ্ট অনুষ্ঠান শেষ হবে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান লিপিতে ১৪টি বিষয় আছে এর মধ্যে হকি ধরা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকি খেলা হবে কিনা তা পাকাপাকি স্থির হয়নি। আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডের হকি মরসুম শেষ হয়ে যায় সেই কারণে হকি খেলার মাঠ পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষ পর্য্যায়ক্রমে তিনবার অলিম্পিক হকি খেলায় বিজয়ী হয়ে হকি খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন সুসভ্য দেশে হকি খেলা চলছে এবং পূর্ব্বাপর অলিম্পিক খেলায় হকি খেলার স্থান ছিল সুতরাং এই খেলাটি অলিম্পিক অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া কোন যুক্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা ঃ

ইংলণ্ড থেকে আগত ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে ভারতীয় এক বাছাই ক্রিকেট দলের খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। যে দল ইংলণ্ডে খেলতে গিয়েছিল তার নামকরণ হয়েছে ইংলণ্ডে ভারতীয় দল। এই দল 'ভারতীয় অবশিষ্ট' দলের সঙ্গে খেলবে। প্রথম ম্যাচ খেলা হবে দিল্লীর উইলিংডন প্যাভেলিয়ন মাঠে ২৩, ২৪ ও ২৫শে নভেম্বর। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে হবে ১৪—১৬ ডিসেম্বর, কলকাতার ইডেন গার্ডেনে হবে ৩১শে ডিসেম্বর, ১ ও ২রা জানুয়ারী ১৯৪৭, লাহোরের লাহোর জিমখানা মাঠে ১৮-২০ জানুয়ারী, মাদ্রাজের মাদ্রাজ ক্রিকেট ক্লাব মাঠে ২৫-২৭শে জানুয়ারী।

নবাব পতৌদী ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় একাদশ দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করবেন এবং অধিনায়ক হবেন। ভারতীয় অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করবে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত মনোনয়ন কমিটি। এই কমিটিতে নবাব পতৌদি এবং প্রফেসর ডি বি দেওধরও আছেন। অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক বিভিন্ন স্থানের খেলায় বিভিন্ন ব্যক্তি হবেন। দিল্লীতে হবেন কর্ণেল সি কে নাইডু, লাহোরে ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ, কলকাতায় মহারাজা কুচবিহার, বোম্বাইয়ে প্রফেসর ডি বি দেওধর, মাদ্রাজে পিল্লো পালিয়া।

মুষ্টিযুদ্ধে নতুন ব্রিটিশ মিডল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ঃ

ইষ্টলাইট হাম্পাসায়ারের ওল্ড রেলওয়ের কর্ম্মচারী ভিক হকিংস (২৩ বছর) ১৫ রাউণ্ড খেলায় ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ মিডল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান এর্নি রোডারিকে হারিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

ইংলণ্ডে ফুটবল খেলোয়াড়দের ধর্ম্মঘট ঃ

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে ফুটবল খেলার মরসুমে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের আর ধর্ম্মঘট হবে না। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের সমিতি খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধির জন্য এক আন্দোলন আরম্ভ করেছিল এবং তাদের দাবী না মেনে নিলে ধর্ম্মঘটের হুমকি দিয়েছিল। অনেক আলাপ আলোচনার পর শ্রমিক মন্ত্রীর মধ্যস্থতায় বিরোধের অবসান ঘটেছে। খেলোয়াড়দের এ আন্দোলন সার্থক হয়েছে। কুড়ি বছরের উপরের খেলোয়াড়দের শীতকালে সপ্তাহে ৭ পাউণ্ড এবং গ্রীষ্মকালে ৫ পাউণ্ড হিসাবে ন্যূনতম মাহিনা দিতে হবে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া খেলোয়াড়দের আরও অনেক দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "ছায়ার আলো" (১ম খণ্ড)—৩॥০

শ্রীসুবোধকুমার রায় প্রণীত নাটক "মহাত্মা গান্ধী"—১।০

শ্রীবিশ্বেশ্বর গোস্বামী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মেঘদূত"—১৲

শ্রীগৌতম সেন প্রণীত রস-রচনা "মদনানন্দের দার্জিলিং যাত্রা"—১।০

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "করুণা দেবীর আশ্রম"—২৲

স্বামী সন্তোষানন্দ-সম্পাদিত "পঞ্চশত"—২৲

দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত "অঞ্জলি"—৩৲

সব্যসাচী প্রণীত শিশু উপন্যাস "দুর্য্যোগের রাতে"—১৲

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে যে সকল ষাণ্মাসিক-গ্রাহকের টাকা পাইব না তাঁহাদের পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩৷০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩৷৵০ টাকা লাগে। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

আষাঢ়—১৩৫৩

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৫৩

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৫৩

ডাক ধর্ম্মঘটে কর্ম্মীশূন্য জি-পি-ওতে কর্ম্মরত ঘড়ি, ২৩। ডাক ধর্ম্মঘটে তালাবদ্ধ অবস্থায় বেঙ্গল টেলিফোনের বড়বাজার শাখা, ২৪। পরিষদ গৃহে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের ভাষণ, ২৫। কাঁটালপাড়া বঙ্কিম জন্মোৎসবে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ, ২৬। ৺প্রতীপচন্দ্র মুখার্জ্জি, ২৭। শা-নগর শ্মশানঘাটে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা, ২৮। পরিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এচ-এস সুরাবর্দী কর্ত্তৃক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আশ্বাস দান, ২৯। টেলিফোন অফিসের সম্মুখে মহিলা ধর্ম্মঘটী, ৩০। প্রতিবেশীবৃন্দসহ কবি কুমুদরঞ্জন, ৩১। ধর্ম্মঘটকালে দিবাভাগে কর্ম্মহীন রুদ্ধদ্বার জি-পি-ও, ৩২। সাহিত্যবাসরের উদ্যোগে কালিদাস উৎসব, ৩৩। রাজবন্দীদের মুক্তি দাবীতে কলিকাতায় নারী শোভাযাত্রী, ৩৪। ধর্ম্মঘটের সময় জি-পি-ওতে পত্রসংগ্রহার্থীর ভীড়, ৩৫। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, ৩৬। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে মহিলা সভা, ৩৭। রায়সাহেব শশিভূষণ পাল, ৩৮। জি-পি-ওর সম্মুখে প্রেসিডেন্সী পোষ্ট মাষ্টার, ৩৯। ডাক ধর্ম্মঘটে জনবিরল জি-পি-ওর সেভিং ব্যাঙ্কের সম্মুখের দৃশ্য।

বহুবর্ণ চিত্র

ঝান্সী-রাণী বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়িকা—লক্ষ্মী স্বামীনাথম্

আশ্বিন—১৩৫৩

১। মঞ্জুশ্রী, ২। বাঙ্গালীর বার্থরাইট, ৩। জাফরনগরের নিহত শের, ৪। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ৫। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ৬। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ৭। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ্ সায়েন্স গবেষণাগারের এক অংশ, ৮। ভারতবর্ষে ম্যাথামেটিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরীর একটি পুরাতন কারখানা, ৯। দক্ষিণ ভারতে রাসায়নিক কারখানার অন্য অংশ, ১০। দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের একটি অংশ, ১১। দাঙ্গার ফলে একটি ত্রিতল গৃহের অবস্থা, ১২। একটি ভস্মীভূত বস্তির দৃশ্য, ১৩। একটি বিখ্যাত বস্তির ভস্মীভূত অবস্থা, ১৪। একটি অগ্নিদগ্ধ বস্তি, ১৫। দাঙ্গার কয়দিন পরে একটি বাজারে খাদ্যান্বেষী জনতার ভীড়, ১৬। কলেজ ষ্ট্রীটে অগ্নিদগ্ধ ডালিয়া ১৭। কলিকাতার রাজপথে দাঙ্গাজনিত মৃত্যুলীলা, ১৮। একটি দগ্ধপ্রায় মোটর লরী, ১৯। হত্যালীলার অপর এক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য, ২০। কলিকাতার রাজপথে শবের দৃশ্য, ২১। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিন কলিকাতার পথে পথে অগ্নিলীলা, ২২। কলিকাতার পথ মিলিটারী পাহারাধীন, ২৩। ঢাকা বাড্ডানগর নট্ট পাড়ার লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত অবস্থা, ২৪। সোনারটুলির শীতলা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ২৫। নবাবগঞ্জের একটি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত মুদীর দোকান, ২৬। নবাবগঞ্জের অপর একখানি মুদীর দোকানের লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত অবস্থা, ২৭। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাক, তার ও আর-এম এস ধর্ম্মঘটী কর্মচারীদের মিলিত আলোচনা, ২৮। মহারাজা সার যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও, ২৯। কুমারী লীলা রায়, ৩০। ভবাণীচরণ লাহা, ৩১। খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৩২। প্রথম চৌধুরী।

বহুবর্ণ চিত্র

রাগিণী টৌরি

কার্ত্তিক—১৩৫৩

১। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ সপ্তগ্রামে রাজবংশের রাধাকৃষ্ণের মন্দির ধ্বংস করিলে বিগ্রহকে এইস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, ২। সপ্তগ্রাম অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাট, ৩। আলান্দির দৃশ্য—দূর হইতে, ৪। জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরের একাংশ, ৫। নৃসিংহ সরস্বতীর সমাধি মন্দির, ৬। গোরা কুম্ভকারের মন্দির, ৭। জ্ঞানেশ্বরের আজ্ঞাচালিত দেওয়ান, ৮। ইন্দ্রায়নী নদী ও তাহার তাহার পুল, ৯। কন্যা কুমারীর পথে ১০। শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর মন্দির, ১১। রাজপ্রসাদ—ত্রিবান্দ্রাম ১২। কেপ কুমারী, ১৩। শচীগ্রামের মন্দির ১৪। ঠাকুরের ফুটবল খেলা, ১৫। নটরাজ নৃত্য, ১৬। গত দারুণ বারি পাতের ফলে জলপ্লাবিত কলিকাতার হেদুয়া, ১৭। কলিকাতার পথঘাট জলমগ্ন- চিৎপুর এবং বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল, ১৮। কলিকাতার পথে ...া, ১৯। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যবৃন্দ ও বড়লাট, ২০। গড়ীয়াহাটা ...ড়স্থ ম্যাণ্ডেভেলী গার্ডেনএর সম্মুখভাগে জলস্রোত, ২১। কলিকাতা লেকের নিকট সদার্ণ এভেনিউর প্লাবণ দৃশ্য, ২২। শ্রীমাণিকলাল দত্ত, ২৩। রাণাঘাট স্পোর্টিং এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জ্জীর সম্বর্দ্ধনা, ২৪। শ্রীমতী প্রভাবতী বাগচি, ২৫। রাজবন্দীদের মুক্তি প্রার্থনায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরাট জনতা, ২৬। ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক বিশাল জনসভায় ডাক তার টেলিফোন ও আর-এম-এসের ধর্ম্মঘটীদের মিলন, ২৭। কলিকাতা রেডিও অফিসের ধর্ম্মঘটে পুলিশ, ২৮। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কার্য্যালয়ের সম্মুখে ছাত্রী পিকেটার্সদের প্রতি পুলিশের অনাচার, ২৯। নূতন দিল্লীর নিখিল ভারত চিত্র ও শিল্পী সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাপনায় এক চিত্র প্রদর্শনীতে বড়লাট ও সার উমানাথ সেন, ৩০। ধর্ম্মঘটী টেলিফোন মহিলা কর্ম্মীবৃন্দ ৩১। মুক্তরাজবন্দীগণ ৩২। জ্যোতিষচন্দ্র গুহ, ৩৩। কিশোরীমোহন চৌধুরী ৩৪। গোষ্ঠবিহারী দে, ৩৫। পণ্ডিত কান্তিচরণ ভট্টাচার্য্য।

বহুবর্ণ চিত্র

দুর্গম পথের যাত্রী

অগ্রহায়ণ—১৩৫৩

১। মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্র-দেবের নূতন তাম্রশাসন—সম্মুখের পৃষ্ঠা, ২। মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্র-দেবের নূতন তাম্রশাসন—পশ্চাতের পৃষ্ঠা, ৩। ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ও লেখক, ৪। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, ৫। যাদুকর পি সি-সরকার, ৬। বিছানায় পিকেটিং, ৭। রাখাল মিত্র, ৮। করালী কেবিন, ৯। বং—রোমান, ১০। নোয়াখালী দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, আচার্য্য কৃপালনী ও তদীয় পত্নী এবং মিঃ সুরাবর্দী, ১১। দম-দমে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, ১২। লালবাজার কন্ট্রোলরুমে কলিকাতা দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের সভাপতি স্যার পেট্রিক স্পেন্স, ১৩। গৌহাটী এম-ই-এস ক্যাম্পের অফিসের সম্মুখে, ১৪। গৌহাটী ক্যাম্পে নোয়াখালী হইতে আগত রমণীগণ, ১৫। ভারত-আফগান-সীমান্তে খাইবারের নিকট সদলবলে পণ্ডিত নেহরু ১৬। সীমান্ত সফরকালে খাইবার পাশ এলাকায় বিক্ষোভকারিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার মোটরকার ১৭। রাজমাক নামক স্থানে সভায় উপজাতি নেতাদের সহিত করমর্দ্দনরত পণ্ডিত নেহরু ১৮। বিমানের গবাক্ষ পথে মিঃ এইচ-এস সুরাবর্দীর নোয়াখালী দর্শন, ১৯। কলিকাতার দ্বিতীয়বার হাঙ্গামার পর একটি বিশিষ্ট রাজপথের দৃশ্য—স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা, ২০। শিয়ালদহ ষ্টেশনে চাঁদপুর ও নোয়াখালী হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থিগণ, ২১। আজাদ-হিন্দ-সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসে নেতাজী ভবনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদীপ দান, ২২। কলিকাতা মিউজিয়মে নানা স্থান হইতে উদ্ধার করা বহু প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, ২৩। মিউজিয়মে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে পুলিশের দ্বারায় উদ্ধার-করা নানা রকম মারাত্মক ছোরা ছুরি, ২৪। মিউজিয়মে রক্ষিত লুটের মাল—সুটকেশ প্রভৃতি, ২৫। দম-দম বিমান ঘাঁটিতে অন্তর্বর্ত্তী-সরকারের সদস্যবৃন্দ, ২৬। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ২৭। ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ ৫৭৬।

বহুবর্ণ চিত্র—ধ্যানভঙ্গ



ফটো : ইন্টারন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস